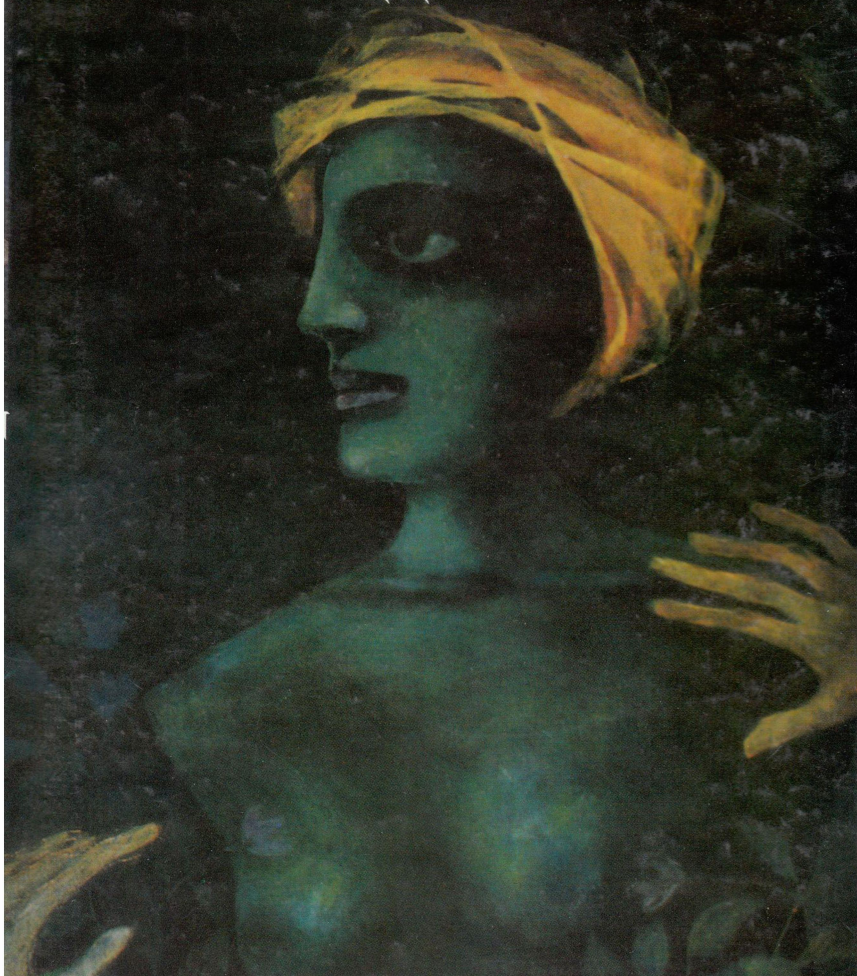


পা র্থি ব

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়



এই পৃথিবী কি পাঠশালা ? কিংবা রঙ্গশালা ? লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর নবীনতম এই বৃহৎ উপন্যাসে দেখাতে চেয়েছেন তার কোনওটাই সম্পূর্ণ সত্য নয় ; চিরকালের মানুষের মানসভূমি নিয়েই গড়ে উঠেছে ‘পার্শ্ব’ উপন্যাসের উপাদান ।

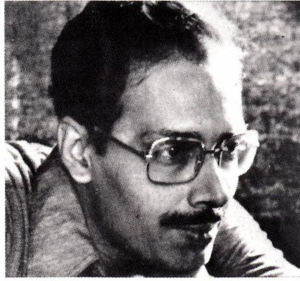
শহর কলকাতা, কলকাতার নিকট-প্রতিবেশী শহরতলী, এবং এই বাংলার একটি গ্রামের বিভিন্ন চরিত্রের বাস্তব ভূমিকা এবং তাদের মানসিক গঠন অনেককালের পরিচিত রূপ-বর্ণ-ছন্দ সৃষ্টি করেছে । আধ ডজন কাহিনী আর উপকাহিনীর বিপুল বিস্তৃতির মধ্যে অসংখ্য চরিত্রের টানাপোড়েন আর এক বিচিত্র বিশ্ব তৈরি করে । এই উপন্যাসেই দেখা গেল সনাতন ঐতিহ্যবাহী স্বাদেশিক প্রেক্ষিতে আধুনিক সভ্যতার দ্বন্দ্বদীর্ঘ চিত্রণ । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সুছন্দ অথচ সুপরিমিত ভাষায় রচিত হয়েছে একালীন মহাকাব্য, ‘পার্শ্ব’ ।

জীবন কেন, এই জীবনের অর্থ কি, কেনই-বা
ওধুমায়ে বেঁচে থাকা? নাকি এর গভীরে
নিহিত আছে কোনও হিরণ্যয় তাৎপর্য?—এমন নানা
প্রশ্নে আকীর্ণ বহুগ্রাহ্য এই জগৎ ও জীবন। সাহিত্যে
ধ্রুপদীয়ানার সনিষ্ঠ সেবক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের এই
বৃহদায়তন উপন্যাসে এই সমূহ সনাতন প্রশ্নেরই স্থির
উত্তর-অন্বেষণ।

আর দশটা উপন্যাসের মতোই এই উপন্যাসেরও
উপকরণ কিছু চরিত্র আর কিছু ঘটনা, সেইসঙ্গে
মানুষের অভ্যন্তরে প্রবহমান চৈতন্যের গূঢ়, গভীর
স্রোত। তবু শাস্ত্রত সাহিত্যে যেমন, এখানেও
তেমনই, এক গভীর দ্যোতনা এ-কাহিনীর শুরু ও
শেষকে তো বটেই, এমন-কি পুরো কাহিনীকেও এক
সময় অতিক্রম করে যায়। এখানেই এর সার্থকতা ও
অনন্যতা।

‘দেশ’ পত্রিকায় দীর্ঘকাল ধরে প্রকাশিত হবার সময়
থেকেই ‘পাখিব’ সর্বস্বত্বের পাঠকের অভিনন্দনধন্য।
এ-কাহিনীর পঞ্চ প্রবাহ শহর-গঞ্জ-গ্রামকে পরিব্যাপ্ত
করে শহুরে ও গ্রামীণ জীবনে জড়িয়ে-থাকা অজস্র
মানুষের আখ্যান-উপাখ্যানকে নিয়ে চলেছে এক
অনিকেত পরিগতির আদ্যর্ষ মোহনায়।

এ-উপন্যাসের উন্মোচন ঘটেছে এক অজ পাড়াগাঁয়ে,
যেখানে বৃদ্ধ বিষ্ণুপদ তার ভাড়া ঘরের দাওয়ায় বসে
প্রত্যাশায় চেয়ে থাকে সামনে তার মেজো ছেলের
অর্ধসমাণ্ড পাকা বাড়িটির দিকে। এই সামান্য দৃশ্য
থেকে শুরু হয় এ-উপন্যাস ক্রমশ নানা প্রবাহে
জীবনের নানা দিকে ছড়িয়ে যেতে থাকে, উন্মোচিত
হতে থাকে জীবনের দেখা ও অদেখা নানান
রূপ-বর্ণ-ছন্দ। এক দিকে বিষ্ণুপদের তিন পুত্র
কৃষ্ণজীবন, রামজীবন, বামাচরণ, কন্যা বীণাপাণি ও
তার স্বামী নিমাই, অন্য দিকে হেমান্ন, চারুশীলা, চয়ন,
ঝুমাঙ্গি, অনু, মনীশ, অপর্ণা, অনীশ, আপা ও তাদের
অনুষঙ্গে সম্পর্কিত আরও অনেক মানুষ। এইসব
মানুষের টানাপোড়েনে তৈরি হয়েছে আরেক বিচিত্র
বিশ্ব, যেখানে সনাতন ঐতিহ্যবাহী স্বাদেশিক প্রেক্ষিতে
আধুনিক সভ্যতার দ্বন্দ্বদীর্ঘ চিত্রণ।



জন্ম : ২ নভেম্বর, ১৯৩৫।

দেশ—ঢাকা জেলার বিক্রমপুর। মোজার দাদু আইন ব্যবসা জমাতে দেশ ছেড়ে গিয়েছিলেন ময়মনসিংহে। সেখানে, ব্রহ্মপুত্র নদীর ধারে, জন্ম। শৈশব কেটেছে নানা জায়গায়। পিতা রেলের চাকুরে। সেই সূত্রে এক যাবাবর জীবন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায়। এরপর বিহার, উত্তরবাংলা, পূর্ববাংলা, আসাম। শৈশবের স্মৃতি ঘুরে-ফিরে নানা রচনায় উঁকি মেরেছে। পঞ্চাশ দশকের গোড়ায় কুচবিহার। মিশনারি স্কুল ও বোর্ডিং-এর জীবন। ভিকটোরিয়া কলেজ থেকে আই-এ। কলকাতার কলেজ থেকে বি.এ। স্নাতকোত্তর পড়াশুনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্কুল-শিক্ষকতা দিয়ে কার্যজীবনের শুরু। এখনও বৃত্তি—সাংবাদিকতা। আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত।

ছাত্রজীবনের ম্যাগাজিনের গভী পেরিয়ে প্রথম গল্প—দেশ পত্রিকায়। প্রথম উপন্যাস ‘ঘণপোকা’। ‘দেশ’ শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত। প্রথম কিশোর উপন্যাস—‘মনোজদার অদ্ভুত বাড়ি’। কিশোর সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিরূপে ১৯৮৫ সালে পেয়েছেন বিদ্যাসাগর পুরস্কার। এর আগে পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার। পরেও আরেকবার ‘দূরবীণ’-এর জন্য।

‘মানবজমিন’ উপন্যাসে পেয়েছেন ১৯৮৯ সালের সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার।

খেলায় তাঁর উৎসাহ অদম্য। বকসিং, টেনিস, ক্রিকেট, ফুটবল, টেবিল টেনিস সম্পর্কে যেমন, আর্থলিটিকসেও তেমনই আগ্রহী।

জীবনের এক সংকটময় মুহূর্তে তিনি জীবনের প্রতি আস্থা ফিরে পান শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সান্নিধ্যে এসে। নিরামিষাশী। ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য। তাঁর রচনাতেও ঘুরে-ফিরে আসে আধ্যাত্মিক অন্বেষণ। পাঠক হিসেবে সর্বগ্রাসী। ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ প্রিয়, প্রিয় প্রিলার এবং কল্পবিজ্ঞানও।



শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

রা-ৰা
বন্দে শ্ৰীশ্ৰীঠাকুৰ অনুকূলচন্দ্ৰম

শ୍ରীঅলোক চক্রবর্তী (সুন্দা)
শ্রদ্ধাংশদেষু—

বাদামতলায় রামজীবনের পাকা ঘর উঠছে ওই। সোঁদা স্যাতা মেঘলা সকালের ম্যাঁদাটে আলোয় ও যেন বাড়ি নয়, বাড়ির ভূত। চারদিকে বড় বড় দাঁতের মতো ইটের সারি যেন খিচিয়ে আছে। গায়ে ভারী বাঁধা; দেড় মানুষ সমান দেয়াল খাড়া হতে বছর ঘুরে গেল। এখন দেয়ালে শ্যাওলা ধরেছে, ভারার বাঁশ পচতে চলল। গেল মঙ্গলবার গো-গাড়িতে সিমেন্টের বস্তা এসেছে অনেকগুলো। খাটের নিচে সেগুলো ডাই হয়ে আছে। ছাদ কি আর ঢালাই হবে? বিষ্ণুপদ যে গতকাল রাতে কালঘড়ি দেখেছে। ও একবার দেখলে আর কথা নেই। দরিয়া পেরোনোর সময় ঘনিয়ে এল।

কালঘড়ির কথা এরা কেউ বিশ্বাস করবে না। তাই বলেওনি কাউকে বিষ্ণুপদ। কথাটা বুকে নিয়ে, কৌটোর মুখ আঁট করে বন্ধ রেখে বসে আছে। আর কৌটোর মধ্যে প্রাণভোমরা চক্কর মারছে বোঁ-বোঁ করতে করতে। বেরোনের পথ ঝুঁজছে। একটা রক্ত পেলেই পগার পার।

আজ এই মেঘলা সকালে, হাওয়ায় বৃষ্টির ঝাপটায় দাওয়ায় বসে বাদামতলার দিকে কাহিল চোখে চেয়ে আছে বিষ্ণুপদ। পারলি না তো বাপ, পেরে তো উঠলি না। তোর ঘর রাজ আমাকে মুখ ভাংচায়, থাকবি বুড়ো? আয়, থাক এসে।

রামজীবনের দোষ কি? জোগাড়-যন্তর কি চাটখানি কথা! এটা জোটে তো সেটা জোটে না, দুশো এল তো চারশো বেরিয়ে গেল। নাকের জলে চোখের জলে হয়ে রামজীবন তবু বাপ আর মাকে পাকা ঘরে রাখবে বলে জান বড় কম টুইয়ে দেয়নি। তা তার ভাগটাও এমনি। এবার সব জোগাড় হল তো অলক্ষণে বর্ষা কেমন চেপে ধরল দুনিয়াটাকে। ডাইনীরা এলো চুলের মতো ঝেঁপে থাকে মেঘ। সারাদিন। একদিন একটু রোদ ওঠে তো হঠাৎ ফের ভূষোকালি মাখান্ধে 'মেঘ থমথম করে ওঠে দিগন্তে। তারপর হাওয়া দেয়। রণপায়ে চলে আসে বৃষ্টি। টিনের চালে দিনরাত নাচুনে শব্দ। ঘরময় বাঁটি, কৌটো, হেঁড়া বস্তা পাতা। চালের পুরনো টিন চালুনির মতো হয়ে এল। ক'টা ফুটোর জল সামাল দেওয়া যায় বাপ! নিত্যানতুন ফুটো দিয়ে জল পড়ছে ঘরে। পাকাঘর এই হল বলে, আশায় আশায় এবার আর ঘরের টিন মেরামত হয়নি। হেমন মিল্লি কয়েক জায়গায় পুটিং ঠেসে দিয়েছিল শুধু। বর্ষার তোড়ে সে সব পুটিং করে ভেসে গেছে।

বিষ্ণুপদ যে জীবনে ঘড়ি মেলা দেখেছে তা নয়। বিষ্ণুপদের ঘড়িই নেই। কাল শেষ রাতে সে ঘড়িটা দেখতে পেল। কালো, গোলপানা, মস্ত বড়। তাতে দুখানা সাদা কাঁটা। একটা বড়, আর একটা ছোটো। কাঁটা দুখানা বাঁই বাঁই করে ঘুরে যাচ্ছে। তারপর ঘুরতে ঘুরতে গতিটা কমে এল। খুব কমে এল। তারপর একেবারে থেমে আসতে লাগল। বড় কাঁটা এক পাক মারলে ছোটোকাঁটা এক ঘর এগোয়, এটাই নিয়ম। বিষ্ণুপদ দেখল, বারোটা ঘরের মধ্যে একটা মাত্র বাকি। বড় কাঁটা খুব ধীরে ধীরে পাক খাচ্ছে আর ছোটো কাঁটাটা শেষ ঘরের দিকে এগোচ্ছে।

কথাটা একমাত্র এক বলা যায় সে হল, রামজীবনের মা। নয়নতারা রান্নাঘরে। বুঝলে একমাত্র নয়নতারাই বুঝবে। বিষ্ণুপদের সব কথা নয়নতারাই একমাত্র বুঝতে পারে। পৌনে একশ বছর বেঁচে আছে বিষ্ণুপদ, নয়নতারা তার সঙ্গে লেগে আছে নাহোক পঞ্চাশ বছর। পঞ্চাশ বছর ধরেই কাছে। বিষ্ণুপদ নিশ্চয়ই সারাদিনে সবকথা ঠিকমতো বলে না, ঠিক কথাও বলে না। কিন্তু নয়নতারা তার সব কথাই নেড়েচেড়ে ভেবে দেখে। কালঘড়ির কথাটাও নয়নতারা ফেলবে না।

লগ্ন দাওয়ার উত্তরশান্তে রান্নাঘর। ভেজা ফুঁটে আর স্যাতানো গুল দিয়ে আঁচ তুলতে আজ সকালে দমসম হয়েছে সবাই। খুব ধোঁয়া হয়েছিল। এখন বোধহয় আঁচ উঠেছে। রান্নাঘর থেকে দুটো গলার আওয়াজও আসছে। একটা তর্ক বেধে উঠছে। ঝগড়ায় গড়াবে। ও দুজন হচ্ছে সেজো আর মেজো বউ। দুজনে প্রায়ই লেগে যায়। হাঁড়ি আলাদা হল বলে। এইসব ঝগড়া কাজিয়ায় নয়নতারা কখনও থাকে না। মাঝখানে পড়ে মিটমিটও করতে যায় না। আসলে নয়নতারা বড় ভীত মানুষ। সবসময়ে সিটিয়ে আছে ভয়ে। মেজো বামাচরণের বউ শ্যামলীর জিভের যেমন ধার, গলার তেমন জোর। সেজো রামজীবনের বউ রাঙা যে খুব ভালমানুষ তা নয়। তবে কমজোরি। হাঁপানী আছে। খুব ভোগে।

নয়নতারা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। হাতে একটা বড় সোলা কচু। বর্ষায় কচুফুঁই সপল। নয়নতারা কচু এসে একবার বিষ্ণুপদের দিকে তাকাল। ভারী নিরীহ চোখ নয়নতারার। গল্পর চোখ। বিষ্ণুপদ জানে, সে নিজেও তেমন বুদ্ধি রাখে না। তার বউ নয়নতারাকেই বউই হাতে তৈরি করেছেন। নয়নতারার কথা কম। কথা কওয়ার ধাতটাই নেই, কায়দাও জানে না। শুধু বিষ্ণুপদের সঙ্গেই যা একটু কয়। মৃদুস্বরে বলল, বৃষ্টি হচ্ছে। গায়ে ছাঁট লাগছে না তো! ঘরে গিয়ে বসলেই তো হয়।

ঘরখানা বড় আঁধার লাগে। একটু আলোয় বসে আছি। তাহলে থাকো। একখানা চাদর এনে দিই, জড়িয়ে বোসো। লাগবে না। এই বেশ আছি। কফ-কাশির ধাত তো নয়। শরীর নিয়ে বড়াই করতে নেই। হাতে কতক্ষণ। যা বাদলা হচ্ছে। বিষ্ণুপদ কথাটা কইবার আগে ভণিতা করতে গিয়ে একটু কেশে নিয়ে বলে, তোমাকে একখানা কথা কইবার জন্য মন করছে। কবো?

শেষ রাতে আমি কালঘড়ি দেখলাম। ব্যাপার সুবিধের নয়।

কালঘড়ি দেখলে ?

তোমার মনে নাই, আমার ঠাকুর্দাও দেখেছিল! সেই যে মাঘের শেষে যেবার ঠাকুর্দা চলে গেল।

নয়নতারার মুখখানা কেমন আরও বোকাটে মার্কী হয়ে গেল। বলল, মনে আছে।

ঠাকুর্দা ঘুম থেকে উঠেই সে কী হাঁকডাক। ওরে তোর! সব তাড়াতাড়ি রান্না-খাওয়া সেরে নে, আজ আর কেউ বেরোবি না ঘর থেকে, সবাই আমার কাছাকাছি থাক, আর গঙ্গাজল তুলসী চন্দনপাটী সব রাখ হাতের কাছে। সব মনে পড়ে ?

পড়ে।

সেদিন শেষ রাতে ঠাকুর্দাও কালঘড়ি দেখেছিল। আমি মকুরা করে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন ঘড়ি ও ঠাকুর্দা ? তা ঠাকুর্দা যা বলেছিল ঠিক হুবহু সেইরকম দেখলাম কাল রাতে। কালে একখানা চক্কর। তাতে দুটো সাদা কাঁটা কঙ্কালের হাতের মতো ঘুরে যাচ্ছে।

নয়নতারার চোখ দুখানা জুলজুল করছে। বেচারার এ দুনিয়াতে সব থেকেও কেউ নেই, একমাত্র বিষ্ণুপদ ছাড়া। এসব কথাই তার বুক উথাল-পাথাল হওয়ার কথাই। নয়নতারা বলে, সেই দিন তো আর ঠাকুর্দা মরেনি।

না। সাতদিনের মাথায় মরল। কি হবে কে জানে! আমিও দেখলাম।

কথাটা বলা ঠিক হল কিনা কে জানে! ও মানুষটাকে একটা উষ্মেগের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হল। নয়নতারা তো বিশেষ সুখে থাকেনি একটা জীবন।

বিষ্ণুপদ ফের বৃষ্টির ভিতর দিয়ে ময়লা আলোয় রামজীবনের ঘরটার দিকে চেয়ে রইল।

রামজীবনের আধখাচড়া ঘর দাঁত বের করে খুব হাসছে। বাঁশের খাচায় আটকে আছে কতকাল।

ধপ করে উবু হয়ে বসে পড়েছে নয়নতারা। চোখে আঁচল। মেয়েদের কত যে কাদতে হয়। সৎসারে রোজই এমন কিছু ঘটনা আছে যাতে মেয়েদের কাদতে হয়। নয়নতারাকে অনেক কাদতে দেখেছে বিষ্ণুপদ।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, রামজীবনের ঘরখানা শেষ হলে বেশ দেখতে হবে কিন্তু।

নয়নতারার কিছু বলল না। ঘুনঘুন করে কাদতে। আকাশ আরও একটু কালে হয়ে গেল নাকি ? আলোটা যেন মরে এল। বৃষ্টির সঙ্গে একটা দমকা হাওয়া আসছে। দমকে দমকে।

নয়নতারার ভেজা গলায় বলে, ওঠো, ঘরে যাও।

ঘরে যেতে হচ্ছে নেই বিষ্ণুপদর। দাঁড়ায় বসে এইরকম চেয়ে থাকতে হচ্ছে করছে আজ। জলেডোবা উঠোনের বাঁ ধারে করবী ফুলের গাছের তলা দিয়ে ওরা তাকে নেবে। তারপর আর ফিরে আসা নেই। আর ঘরবাড়ি নেই, সংসার নেই, নয়নতারা নেই। কেমন হবে তখন ?

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, বুঝলাম না!

কী বুঝলে না গো ?

কিছু বোঝা যায় না। অজান প্রান্তর পড়ে আছে সব। কত কি বোঝা গেল না। এই বলে নয়নতারার দিকে মায়াভরে তাকায় বিষ্ণুপদ। পঞ্চাশ বছরের বন্ধু। নয়নতারাও কি কিছু বোঝে! তারা দুটো বোকা মানুষ। কত কি ঘটে যায় চারদিকে, তাদের কাছে সব আবছা আবছা, ভয়-ভয়, কেমন-কেমন। নয়নতারাকে খুব ভাল কোনও কথা বলতে হচ্ছে করে বিষ্ণুপদর। গাছের মতো ছায়া দিল এতকাল, বসা বাঁধতে দিল, ছানাপোনা হল। এবার উড়ে যেতে দেয় কি করে ? বড় মায়া যে!

তবে কালঘড়ির কথাটা এই বোকা মেয়েটাই বুঝবে। আর কেউ নয়।

মরার সময়টা চতুর্দশী পড়বে কি ? ও সময়টা ভারী খারাপ। আজ কৃষ্ণপক্ষ শুক্লমী। বিষ্ণুপদর ঠাকুর্দা কালঘড়ি দেখার ঠিক সাতদিনের মাথায় গিয়েছিল। যদি সেই হিসেবে বিষ্ণুপদও মরে তা হলে চতুর্দশীই পায় সে।

চকবেড়ের হাট থেকে একখানা পকেট-পঞ্জিকা এনে দিয়েছিল রামজীবন। নয়নতারার দিকে চেয়ে বলল, পঞ্জিকাখানা দাও তো এনে।

কী দেখবে ?

চতুর্দশীটা পাৰো নাকি ?

পঞ্জিকা দেখার দরকার নেই। ঘরে চলো।

আর ঘর। বলে বিষ্ণুপদ একটু হাসে। পূর্বের ভিটে থেকে কেতরে একটা টোঁড়া উঠোনের জলে নামল। গেছে শালার ঘরদোর ভেসে। বেরিয়ে পড়েছে হারা-উদ্দেশ্যে। এইসময়ে ব্যাটারা বড্ড ঘরদোরে সঁধোয় এসে। টোঁড়াই বেশী, তবে চক্করওলারাও আছেন।

দুপুর হয়ে এল। নাইতে যাও।

বিষ্ণুপদ অবাক হয়ে বলে, দুপুর কোথা ? এই তো দশটা বাজল একটু আগে। বেলা এখনও ঢের আছে।

নয়নতারার বিনাবাক্যে ঘর থেকে পঞ্জিকাখানা এনে দিয়ে বলে, ওই দিনে আমিও যাবো।

বিষ্ণুপদ অবাক হয়ে বোকা মুখখানার দিকে চেয়ে বলে, কোথায় যাবে বলছ ?

আমাকে একা ফেলে যাবে নাকি ? এখন কে আছে আমার ?

বিষ্ণুপদ পঞ্জিকা ওল্টাল না। ভাববার মতো কথা। কারও যদি কেউ নেই তবে সংসারটা কি জন্যে ? এতগুলো সন্তান, তাদের ছানাপোনা, এত থেকেও কেউ নেই নয়নতারার, সে ছাড়া ?

বিষ্ণুপদ গলা খাঁকারি দিয়ে বলে, আঙুর কিছু বলা ভাল নয়। যা হওয়ার যখন হওয়ার হবে। দুদিন এদিক আর ওদিক। এ তো ইচ্ছামৃত্যু নয়।

নয়নতারার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলে, স্বপন দেখনি তো ?

তাই। তবে স্পষ্ট দেখলাম।

কেমন দেখতে ?

কি ? কালঘড়ির কথা বলছ ?

হ্যাঁ, সেই অলক্ষণেটা দেখতে কেমন ?

সে খুব বড়। যেন আকাশটা জুড়ে দেখা দিল। বুকটা কেমন মোচড় মেরে থাঁ খাঁ করে উঠল। আঁধার-করা বিশাল একটা চাকা। দুটো সাদা লম্বা সরু হাত ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে।

ঠাকুরদা তাই দেখেছিলেন ?

অবিকল।

তাড়াতাড়ি নেয়ে খেয়ে একটু ঘুমোও। মাথাটা পরিষ্কার হবে, ওসব মনের ভূত নেমে যাবে।

মাথা পরিষ্কারই আছে।

রান্নাঘরে দুটো গলা চুপ মেরে গেছে। দিনটাই এমন স্যাঁতানো যে, মেজাজও সব ঠাণ্ডা মেরে যায়। গরম থাকতে চায় না কিছু।

ছানি কাটানো গেল না বলে বিষ্ণুপদর চোখ কিছু আবছা। পুলিশ হোমিওপ্যাথির ওষুধ দিয়ে ছানিটা আটকে রেখেছে এক জায়গায়। নইলে এতদিনে চোখ একেবারেই অন্ধকার হয়ে যেত। রামজীবন কাটাতে বলে ঠিক করেছিল। যা খরচ হত তাতে ঘরের খানিকটা ইট আর সিমেন্ট হয়ে যায়। বিষ্ণুপদ কাটাতে চায়নি। একা রামজীবন আর কত করবে ?

চোখে এখনও অনেকটাই দেখতে পায় বিষ্ণুপদ। এই মেঘলা দিনের মরা আলোতেও কত কি দেখতে পায়। রামজীবনের আধখাঁচাড়া বাড়ি, নয়নতারার চোখের জল। পল্লিকটা আর খুলল না বিষ্ণুপদ। চতুর্দশী পড়লেই বা কী করার আছে ? ভেবে লাভ কি ?

নয়নতারার ফের ত্যাগ দিল, ওঠো। বসে বসে ভাবতে থাকলে তোমার আরও শরীর খারাপ করবে। ওসব নিয়ে অত ভাবতে নেই।

বিষ্ণুপদ উঠল। পাকা ঘরটার দিকে আর একবার চাইল বিষ্ণুপদ। রামজীবন পেরে উঠল না।

কেউ কেউ পেরে ওঠে না। আবার কেউ কেউ পেরে ওঠে। যেমন কৃষ্ণজীবন। সাততলার ওপর আরামে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাকে। বর্ষা-বাদলা হোক, ঝড়বাতাস হোক, খরা বান হোক, পরোয়া নেই।

মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, রামজীবন বুঝি বড় ভাইয়ের সঙ্গে রেয়ারেধি করেই তুলতে চেয়েছিল পাকা ঘরখানা। কিন্তু তাই কি পারে ? কৃষ্ণজীবনকে ধরতে পারা কি রামজীবনের পক্ষে সম্ভব? সে যে বহুদূর এগিয়ে রয়েছে। রামজীবন তার নাগাল তো পাবেই না, বরং হেঁদিয়ে মরবে। তবু চেষ্টা তো করেছিল! বুকটা সেই কারণে একটু ভরে থাকে। মাতাল হোক কি আর যাই হোক, সারা দিনমানের কোনও না কোনও সময়ে বাপ-মায়ের কথা ভাবে তো।

আজ একটু সাবান দিয়ে চান করব, দেবে ?

সাবান! আবার সাবান কেন! সাবান মাখলে বেশী চান হয়ে যাবে। যা বাদলা, বৃকে ঠাণ্ডা বসে গেলে বিপদ।

রামজীবন একখানা গন্ধ সাবান এনে দিয়েছিল না! আছে ?

সে তো কবেকার কথা। আছে। মাঝে কে বলা ? আমাদের বাংলা সাবানেই কাজ চলে যায়।

দাও, মাখি।

সাবানটা বর্ষা-বাদলায় বের করলে খরচ হবে খুব। জলে ক্ষয়ে যাবে।

আজ অত হিসেব কোরো না। দাও।

দিল্লি। কুয়াতলায় গিয়ে বোসো। বাস্তের তলায় রেখেছি। বের করতে হবে।

বিষ্ণুপদর বড় জানতে ইচ্ছে করে, সাবান জিনিসটা কী দিয়ে তৈরি হয়।

কত কি জানা হল না দুনিয়াটার। সব আবছা রয়ে গেল।

এই বর্ষায় কুয়ো একেবারে টেটপুর। বালতিতে দড়ি না বাঁধলেও চলে। তবে কুয়োর চাকগুলো অনেক পুরনো। জোড় আগুণা হয়ে কাদামাটি ঢুকে জল ঘোলা করে দেয়। চোত-বোশেখে বড় কষ্ট গেছে। কোন্ পাতালে নামাতে হত বালতি। কাদাগোলা জল উঠত, আর তাতে বিজবিজ করত পোকা।

বৃষ্টিতে কুয়োর ধারে বসে আনমনে চেয়েছিল বিষ্ণুপদ। তোড় কমে ভারী মিঠে ঝিরঝিরে ঝর্ণাকলের মতো জল পড়ছে এখন। একবার কৃষ্ণজীবন নিয়ে গিয়েছিল তার বাড়িতে। সাততলায় বাঁধানো ঘরদোরে যেন আলো পিছলে যাচ্ছে। সেই বাড়ির বাথরুমে ঝর্ণাকলের নিচে বসে চান করেছিল বিষ্ণুপদ। তখন মনে হয়েছিল যেন বৃষ্টির মধ্যে বসে আছে।

মানুষ কত কল বানিয়েছে। আরও বানাচ্ছে। কলের যেন আর শেষ নেই।

উঠোনে সাইকেলের ঘন্টি। একটা নয়, তিন-চারটে সাইকেল। একটা হেঁড়ে গলা জিজ্ঞেস করল, রামদা নেই বাড়িতে ?

রামজীবনের বড় স্কীণ গলায় বলে, না। সকালে বেরিয়েছে।

গেল কোথায় ?

বলে যায়নি।

এলে বলে দিও বটতলায় যেতে। জরুরী কাজ আছে।

আচ্ছা।

কথাগুলো মন দিয়ে শুনল বিষ্ণুপদ। এরা সব কারা মাঝে মাঝেই রামজীবনের কাছে আসে তা জানে না বিষ্ণুপদ। দেখে বড় ভাল লোক বলে মনে হয় না। চেহারাগুলোই কেমন যেন রোখাচোখা। এই বৃষ্টিতেও কারও মাথায় ছাতা নেই। উঠোনে সাইকেল এসে থামে, সাইকেলে বসে থেকেই একটা হাঁক দিয়ে চলে যায়। কখনও নামে না, বসে না, বাড়ির কারও সঙ্গে কথাবার্তা কয় না। মনে হয় খুব কাজের লোক সব। খুব তাড়া আছে।

সাইকেল ঘুরিয়ে জলের মধ্যেই চলে গেল হেঁড়াগুলো। কুয়োপাড় থেকে গাছপালার ভিতর দিয়ে, বৃষ্টির ভিতর দিয়ে ছানি-পড়া চোখে যতদূর দেখা গেল, চারজন।

এই দুনিয়াটা নিয়ে আর ভাববার কিছু নেই বিষ্ণুপদর। সে কালঘড়ি দেখেছে। সময় ফুরিয়ে এল। এখন চারদিক থেকে নিজেকে কড়িয়ে তুলে এনে এক জায়গায় জড়ো করা ভাল। কে কি করছে, কার কোন মতলব, কে উচ্ছ্বলে গেল এসব নিয়ে আর মাথা ঘামানো ভাল নয়।

রোজ বড় আশায় আশায় রামজীবনের ঘরখানার দিকে চেয়ে থেকেছে এতদিন। কৃষ্ণজীবনের ঝা-চকচকে ঘরদোরের মতো! না হলেও পাকাঘর তো। এই গা-গঞ্জে একখানা পাকাঘরে থাকারও একটা আরাম আছে। কিন্তু আর আশা নেই। ঘরখানা থেকে মনটাকে সরাতে হবে এইবার।

এই যে তোমার সাবান। কিন্তু বাস্তব নেই, মোড়কের কাগজখানা ফেলা না। ওতে মুড়ে রাখা যাবে।

সাবানখানা হাতে নিয়ে চেয়ে থাকে বিষ্ণুপদ। কি দিয়ে যে কি বানিয়ে তোলে মানুষ। সাবানখান হাতে নিয়ে ভারী আল্লাদ হল বিষ্ণুপদর। খুব হাসল সে। খুব হাসল।

সাবানের মজাই হচ্ছে তার ফেনায়। বগবগ করে ফেনা উঠলে উঠবে তবে না সাবান। কিন্তু ফেনা তুলবে কি, গায়ে ঘষতে না ঘষতেই বৃষ্টিতে ধুয়ে যাচ্ছে সব। খামোখা ক্ষয়ে যাচ্ছে। নয়নভারা বুক-বুক করে আগলে রেখেছিল। থাক, মেখে কাজ নেই।

সাবানখানা কাগজে সাবধানে মুড়ে দাওয়ায় রেখে বিষ্ণুপদ হৈঁকে বলল, তোমার সাবানখানা নিয়ে যাও।

নয়নভারা দৌড়ে এসে চাপা গলায় ধমক দেয়, সাবানের কথা চেঁচিয়ে বলতে আছে? বউদের কানে গেলে পাঁচটা কথা উঠে পড়বে। কে দিল, কোথেকে এল। রামজীবন চুপটি করে এনে দিয়েছিল।

বিষ্ণুপদ অপ্রভুত হয়ে বলে, তাও বটে। যাকগে, যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন তুলে রাখো।

জল ঢালতে ঢালতে আর একখানা সাইকেলের আওয়াজ পায় বিষ্ণুপদ। আওয়াজটা চেনা। পটলের ঝা-কুরকুর সাইকেল। এই সাইকেল একসময়ে বিষ্ণুপদ নিজে চালাত। চালিয়ে সাত মাইল দূরে একখানা প্রাইমারি স্কুলে পড়াতে যেত। তারপর কৃষ্ণজীবন চালিয়েছে, বামাচরণ চালিয়েছে, রামজীবন চালিয়েছে, শিবচরণ চালিয়েছে। এখন চালায় পটল।

সাইকেলটা উঠান অবধি এসে থামল। সেজ বট ছুটে এল কোথা থেকে। ভয়ের গলায় বলল, ওরে শিগগির নিতাইকে গিয়ে একটা খবর দে। ওরা আবার এসেছিল।

কারা মা?

বটভলার ওরা। নিতাইকে এখনই খবর দিতে হবে।

নিতাইদাকে তো দেখলাম কলেনীর মোড় পেরিয়ে কোথায় যাচ্ছে। সঙ্গে কারা সব আছে।

দৌড়ে গিয়ে খবরটা দিয়ে আয় বাবা। কেন যে রোজ আসছে এরা কিছু বুঝতে পারছি না। একুনি যা।

যাচ্ছি। কিন্তু গিয়ে বলবটা কি?

বলিস বটভলার ওরা তোর বাবাকে ঝুঁজতে এসেছিল।

তাতেই হবে?

সকলের সামনে বলিস না। আড়ালে ডেকে চুপিচুপি বলিস।

কুয়োতলা থেকে সবাই শুনতে পেল বিষ্ণুপদ। গায়ে জল ঢালল না অনেকক্ষণ। ভেজা গায়ে বসে রইল। সব জায়গা থেকে নিজেকে তুলে আনা কি সহজ কাজ?

রামজীবন কিছু পাকিয়ে তুলেছে। বটতলা তো এতকাল ভাল জায়গাই ছিল। শীতলার খান আছে। সবাই বলে জাম্রত দেবী। একসময়ে এই জায়গার নামই ছিল শীতলাতলা। গাঁয়ের নাম বিষ্ণুপুর বললে কেউ কেউ বলে, কোন্ বিষ্ণুপুর গো! শীতলাতলা বিষ্ণুপুর?

সেই শীতলাতলায় এখন আড্ডা হয়েছে। খারাপ খারাপ লোক এসে জুটেছে। কাছ ঘেঁষে বাসরাস্তা হওয়ার পর থেকেই অধঃপতন। কাঁচাপয়সার কারবার আছে।

পটল ফের সাইকেল ঘুরিয়ে বেরিয়ে গেল।

দাওয়ায় চালের তলায় দাঁড়িয়ে গামছাটা নিংড়ে নেয় বিষ্ণুপদ। মাথা মোছে, গা মোছে। মুছতে মুছতে অনেক কথা ভাবে। চারটে সাইকেল। চারটে আবছা লোক। হেঁড়ে গলা। সেজো বট ভয় পেয়েছে। রামজীবনের কি কোনও বিপদ?

বৃষ্টি! ফের চেপে এল। একরকম ভাল। বৃষ্টিতে সব ধুয়ে যাক। যত ভাবনা-চিন্তা, যত পাপ-তাপ সব ধুয়ে যাক।

আজ অনেকটা ভাত বেড়ে এনেছে নয়নভারা। বলল, ভাল ঘানির তেল আছে, একটু ভাতে মেখে খাবে নাকি?

তেল-ভাত বিষ্ণুপদর বেশ পছন্দ। সঙ্গে লঙ্কা আর নুন। বলল, দাও একটু। ভাতটা একটু বেশী মনে হচ্ছে।

খাও। কচুরমুখি সেদ্ধ, বেগুনের ঝোল আর ডাল। এই আছে আজ। হবে এতে?

খুব হবে।

নিয়ে উঠে বিষ্ণুপদ একটু ঘুমলো। শরীর কিন্তু খারাপ লাগছে না। শ্বাস ঠিক আছে। নাড়ীও ঠিক আছে। কোথাও কোনও গড়বড় টের পায় না সে। তবু কালঘড়িটা চোখের সামনে ভাসছে। একখানা মোটে ঘর আছে আর। দুটো কাঁটাই সেদিকে ঘুরছে।

জেগে দেখল, পুলিশ ডাক্তার বসে আছে জলচৌকিতে।

হল কি গো বিষ্ণুপদ? কালঘড়ি না কী যেন দেখেছ।

পুলিশের বয়স বিষ্ণুপদর সমানই হবে। বিষ্ণুপদ কথাটা পছন্দ করল না। নয়নভারার কথাটা ফাঁস করা উচিত হয়নি। এরা কেউ তো বুঝতে চাইবে না ব্যাপারটা।

বিষ্ণুপদ একটা হাই তুলে বলে, ডাক্তার কি আর সব সারাতে পারে?

সারাবার মতো কিছু থাকলে সারাতো পারবে না কেন ? কিন্তু তোমার সারাবটা । ক ? রোগটা কোথায় ?
 বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, রোগটোগ কিছু নেই । এ হচ্ছে ফুরিয়ে যাওয়া । ঘড়ির দম শেষ হয়, দেখনি ?
 দম দিলে ফের চলে ।
 বিগড়োলে দম আর নেবে কি ?
 তুমি কি বিগড়েছ ভাই ?
 মনে তো হয় ।
 লক্ষণ তো মিলছে না । থাকগে, হাতটা দাও, নাড়ী দেখি ।
 বিষ্ণুপদ তাক্ষিণ্যের সঙ্গে হাতখানা বাড়াল । পুলিশ নাড়ী দেখতে জানে কিনা তাতে ঘোর সন্দেহ আছে বিষ্ণুপদের । এ
 বিন্দো সোজা নয় । জানুক না-জানুক, পুলিশ ছাড়া তাদের আর ভরসাই বা কে ?
 হাতখানা রেখে দিয়ে পুলিশ বলে, কিছু হয়নি তোমার । নাড়ী দিবি টনটনে আছে ।
 এখনও আছে । নাড়ীটাড়ীতে কিছু বোঝা যাবে না হে ।
 তবে কিসে বোঝা যাবে ? এটা একটা বিজ্ঞান, মানো তো !
 তা মানে বিষ্ণুপদ । মানুষ কত কিছু জানে, কত খবর রাখে, কত গুণ্ধপত্র বের করে ফেলেছে । বিষ্ণুপদ অজান
 জিনিস সব মানে ।
 তবে কি জানো পুলিশ সব জেনেও কিছু যেন অজান থেকেই যায় । এই দেহ-যন্ত্রটার মধ্যে কত কলকজা বোলা তো !
 কী সাংঘাতিক সব কাণ্ড ।
 সেসব তো তোমাকে একদিন আমিই বুঝিয়ে দিয়েছিলাম ।
 সে কথাই তো ভাবি । দেহের মধ্যে কত কী পুরে দিয়েছেন ভগবান ।
 গুণ্ধ দিচ্ছি । খেয়ো ।
 কিসের গুণ্ধ ? অসুখ তো কিছু নেই বললে ?
 তবু দিচ্ছি । ভাবনাচিন্তা কমবে । ঘুম হবে । খিদে হবে ।
 সে সব তো হচ্ছেই ।

॥ ২ ॥

বাসটা এয়ারলাইনস্ অফিসের কাছাকাছি এসেছে বলে টের পাচ্ছিল চয়ন । ঠাসা ভিড়ের মধ্যে সে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ।
 একটু আগে সে একজনের কজিতে ঘড়ি দেখতে পেয়েছিল । বিকেল পৌনে ছটা । সাড়ে ছটার মধ্যে গোলপার্কের কাছে
 মোহিনীদের বাড়িতে তার পৌছানোর কথা । পৌছে যাবে বলে আশাও করছিল সে । সবই ঠিক চলছিল । বাস পাওয়া,
 বাসে ওঠা, পৌনে ছটা—এসব মিলিয়ে মিশিয়ে বিকেলটা ভালয় ভালয় কেটে যাচ্ছিল প্রায় ।
 কিন্তু হল না । ভাপসা গরমে সেম্ভ্রাল অ্যাভেনিউয়ে চলন্ত ডবলডেকারের নিচের তলায় মানুষের গায়ে সঁটে থেকেও
 সে আচমকা চোখের সামনে সেই নির্ভুল কুয়াশা দেখতে পেল । ঘন সাদা কুয়াশা । দুটো সরু রেল লাইন সেই কুয়াশায়
 উধাও হয়ে গেছে । আবছায়া একটা সিগন্যাল পোস্ট । ঝিক করে সিগন্যাল ডাউন হল । কুয়াশার ভিতরে কিছু দেখা যায়
 না । শুধু একটা রেলগাড়ির এগিয়ে আসার শব্দ পাওয়া যায় । ঝিক ঝিক ঝিক ঝিক ।
 বা হাতের বুড়ো আঙুলটা আপনা থেকেই কঁপে কঁপে ওঠে চয়নের । ঝিক ঝিক ট্রেনের শব্দের সঙ্গে এক তালে ।
 আঙুলটা কঁপে উঠতেই আতঙ্কিত চয়ন প্রাণপণে ভিড় কাটিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করতে থাকে । দুর্বল
 শরীরে সে এক অসম্ভব চেষ্টা । তার চারদিকে মানুষের দেয়ালে ফটল ধরানোর জন্য যে শক্তির দরকার তা তার এমনিতেই
 নেই । তার ওপর শরীরে যে কাঁপন উঠে আসছে সেটা ইতিমধ্যেই তার শরীরের আনাচে কানাচে সতর্কবার্তা পাঠিয়ে
 দিয়েছে । সমস্ত শরীর হাড়িকাঠে ফেলা বলির পাঠার মতো নির্জীব আত্মসমর্পণের দিকে ঢলে পড়ছে ।
 একটু নামতে দিন! একটু নামতে দিন দাদা! কাতর কণ্ঠে একথা বলতে বলতে চয়ন প্রাণপণে চেষ্টা করছে দরজার
 দিকে যেতে । দরজা বেশী দূরেও নয় । তিন চার ফুটের মধ্যে । তবু মনে হয়েছে কী ভীষণ দূর!
 নামবেন! তা এতক্ষণ কী করছিলেন! বলে কে একজন ধমক দেয় ।
 বাধা হয়েই চয়ন তার অভ্যস্ত মিথ্যে কথাটা বলে, আমার বমি আসছে ভীষণ! একটু নামতে দেবেন!
 এই কথাটায় বরাবর কাজ হয় । বমিকে ভয় এবং ঘেন্না না পায় কে ? ভীড়ের মধ্যে একটু ডেউ ডেউ খেলে যায় ।
 মানুষের শক্ত শরীরগুলো নমনীয় হয়ে যেতে থাকে ।
 যান দাদা যান! তাড়াতাড়ি এগিয়ে যান ।
 অনেক সময় হয়, এই কাঁপন ওঠার সঙ্গে সঙ্গে খোলা হাওয়ায় দম নিলে কাঁপনটা ধীরে ধীরে কমে যায় । সেটা কৃতিৎ
 কদাচিত্ । কিন্তু অভ্যাসবশে চয়ন এই অবস্থাটা দেখা দিলেই খোলা হাওয়ার দিকে ছুটে যায় ।
 আজ কোনও সৌভাগ্যসূচক দিন নয় তার । স্টপে নেমেই সে বুঝতে পারে, বা হাত ঝিমি ধরার মতো অবশ হয়ে
 আসছে । কাঁপন হড়িয়ে যাচ্ছে সর্বাস্থে । সে চোখে কুয়াশা দেখছে । শ্রবণ ক্ষীণ হয়ে এল । সে একজন অশ্পষ্ট পথচারীকে
 বলল, দাদা, একটু হেলপ করবেন ? আমি এপিলেপটিক—
 কে শুনল বা বুঝল কে জানে! ডান হাতটা বাড়িয়ে সে একটা কিছু ধরার চেষ্টা করল । কিছু ধরল কিনা বোঝা গেল
 না । তবে এ সময়টায় তার সব শক্তি জড়ো হয় ডান হাতের মুঠোয় ।
 এ সময়ে তার ডান হাত বড় বিপজ্জনক । মুঠো করে কিছু ধরলে আর তা ছাড়ানো যায় না, যতক্ষণ না জ্ঞান ফিরছে ।
 একবার অজ্ঞান হওয়ার মুহূর্তে সে কণিকার ডান হাত চেপে ধরেছিল । তারপর অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল । কণিকার আতঙ্কিত
 পার্থিব—২

কিংবদন্তির বাড়ির লোক ছুটে আসে এবং দৃশ্যটি দেখে তারাও ভয়ংকর ঘাবড়ে যায়। মুঠো থেকে কণিকার কজি ছাড়তে না পারার কেউ কাপড় কাচার কাঠের মুণ্ড দিয়ে মেরে চয়নের ডান হাত ভেঙে দিয়েছিল।

এড়া হাত জোড়া লেগেছিল যথাসময়ে। চিকিৎসার খরচও দিয়েছিল কণিকার অভিভাবকেরা। কিন্তু টিউশনিটা ছাড়তে হয়েছিল চয়নকে। দেড়শ টাকার টিউশনি।

এখন সেন্ট্রাল অ্যাডেনিউয়ের ভিড়ে সেরকমই কিছু আবার ঘটতে পারত। মুঠোয় কিছু ধরতে পারেনি ভাগ্যিস। জ্ঞান হারানোর আগে সেই ক্ষীণ সান্ত্বনা নিয়ে সে খাড়া থেকে কাটা গাছের মতো পড়ে গেল।

তারপর কুয়াশা আর কুয়াশা। একটা রেলগাড়ির বন বন শব্দ। তারপর সব মুছে যাওয়া।

জ্ঞান ফেরার পর বেশীর ভাগ সময়েই সে একটা পরিচিত দৃশ্য দেখতে পায়। চারদিকে মানুষের পা। অনেক ওপরে মানুষদের মুখ। অনেক মুখ। সব কটা চোখ তার ওপর নিবদ্ধ। আর টের পায়, তার মাথা মুখ সব জলে ভেজা। ভেজা জামায় জল, ধুলা, কাদা।

কলকাতায় এবার বৃষ্টি হচ্ছে খুব। ফুটপাথের জল সহজে শুকায় না। একটা ছোট জমা জলের গর্তে তার মাথাটা পড়েছে আজ। পা থেকে চপ্পল খসে পড়েছে কোথায়!

কে যেন বলল, কেমন লাগছে? উঠতে পারবেন?

মানুষকে তার খুব খারাপ লাগে না। এদের মধ্যে ভাল আছে, মন্দ আছে, দয়ালু আছে, উদাসীন আছে। কিন্তু কোনও মানুষ হঠাৎ এরকম পড়ে গেলে সকলেই জড়ো হয় চারপাশে। সবাই খারাপ নয়, এটাই যা একটা ভাল ব্যাপার।

চয়ন তার দুর্বল শরীর শোয়া অবস্থা থেকে টেনে তোলে, আগে লজ্জা করত। আজকাল তেমন লজ্জা করে না। এরকম তার অভ্যাস হয়ে গেছে।

একজনের দিকে চেয়ে সে স্তিমিত গলায় জিজ্ঞেস করে, কটা বাজে?

সোয়া ছটা।

তার মানে মোহিনীদের বাড়িতে যাওয়ার সময় নেই নাকি? যাওয়াটা খুব দরকার। মোহিনীর কাল ইংরিজি সেকেন্ড পেপারের পরীক্ষা। মোহিনীর বাবা গত পরশু একটু হুশিয়ার করে দিয়েছিলেন।

সে উঠে বসার পর ভিড়টা পাতলা হচ্ছে।

কে একজন তার হাতের ওপরের দিকটা ধরে বলল, উঠতে পারবেন তো! তাহলে ধীরে ধীরে উঠে পড়ুন।

পারল চয়ন। আগে পাতত না। আজকাল পারে। বাধ্য হয়ে পারতে হয়। তবে এই সময়টা এত দুর্বল লাগে যে মাথাটা অবধি ঘাড়ের ওপর লটপট করতে থাকে। হাত পা সব অবশ। শরীর জুড়ে ঝিকির ডাক।

আমাকে ওই দেয়ালটায় ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিন।

পারবেন তো?

পারব। আমার প্র্যাকটিস আছে।

বলবন লোকটি তাকে দেয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে বলে, ট্যাক্সি নেবেন?

উদ্বেগের মাথায় চয়ন তাড়াতাড়ি বলে, না না। ট্যাক্সি লাগবে না।

বাড়ি যাবেন কি করে?

চয়ন বাড়ির কথায় শিহরিত হল। তার যদি সেরকম একটা বাড়ি থাকত যেখানে অসুস্থ শরীরে ট্যাক্সি নিয়ে গিয়ে নামলেই বাড়ির লোক ছুটে আসবে, ভাড়া মেটাবে এবং ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেবে?

আছে। এখনও মা আছে। ছুটে আসতে পারবে না বা ঘরেও নিয়ে যেতে পারবে না। তবু একমাত্র মা-ই 'কি হল কি হল' বলে চেঁচাবে। কঁাদবেও।

চয়নের সেই অর্থে বাড়ি নেই। দাদার বাড়িতে সে আর মা একরকম জোর করে আছে। একটা সুতোর মতো সম্পর্ক ঘরে আছে বটে, কিন্তু সেটা ঠিক থাকা নয়। উঠি-উঠি যাই-যাই ভাব সবসময়ে। দাদা আর বউদির ভয়, আর বেশীদিন থাকলে বাড়িটার ওপর তার এবং মায়ের একটা দাবী বা স্বত্ত্ব দাঁড়িয়ে যাবে। তাই আজকাল তাদের তাড়াবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে তারা।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে চয়ন। পারবে কি? মোহিনীর কাল ইংরিজি পরীক্ষা। যাওয়াটা দরকার।

যে লোকটা তাকে ধরে তুলেছে সে এখনও দাঁড়িয়ে, বাকিরা চলে গেছে।

লোকটা ভাল প্রকৃতির। বলল, ট্যাক্সি ভাড়া না থাকলে বলুন না, দিচ্ছি। সংকোচের কারণ নেই।

চয়ন মাথা নেড়ে বলে, না। এরকম আমার প্রায়ই হয়।

চিকিৎসা করিয়েছেন?

হোমিওপ্যাথি করাই। এটা ঠিক সারবার অসুখ নয়।

জানি। আমার ছোট বোনটার আছে।

লোকটাকে লক্ষ করে চয়ন। বেঁটে মতো, স্বাস্থ্যটা পেটানো, মাথায় একটু টাক আর গৌফ, রংখানা কটা আর মুখে একটা সাদাশয় ডাব আছে। বেশ লোক।

কোন দিকে যাবেন?

সড়িথে।

সড়িথ তো অনেক বড়। সড়িথে কোথায়?

গোলপার্কের কাছে।

সেখানেই বাড়ি?

না, টিউশনি করতে যাই।

এ অবস্থায় সেখানে গিয়ে কি হবে ? পড়াতে পারবেন ?

পারব। আজ আর অজ্ঞান হবো না। দিনে একেবারের বেশী হয় না।

তার মানে কি দিনে একবার করে হয় ? তাহলে তো সাংঘাতিক কথা!

না, রোজ হয় না। এক দুই সপ্তাহ পরে হয়। কখনও তারও বেশী গ্যাপ যায়।

আমার বোনটার মতোই। কি করেন ?

টিউশনি।

আর কিছু নয় ?

না। আর কি করব ?

আমি সাউথের দিকেই যাব। আমার সঙ্গে যেতে পারেন।

তারও দরকার নেই। একাই পারব। একটু রেষ্ট নিলেই হবে।

আপনার স্ট্যামিনা আছে মশাই। আমার বোনটার যেদিন অ্যাটাক হয় সারাদিন আর উঠতে পারে না। শুয়ে থাকতে হয়।

আমার শুয়ে থাকলে চলে না।

তা বলে—লোকটা একটু ইতস্তত করে কথাটা অসমাণ্ড রাখে।

চয়ন চোখ বুজে ঘন ঘন বড় শ্বাস নিতে থাকে। একমাত্র বড় বড় শ্বাসই তাকে তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক করে তোলে। একটু সময় লাগে, এই যা।

লোকটি দাঁড়িয়ে আছে এখনও। দয়ালু লোক। চয়ন চোখ মেলতেই বলে, কিছু খাবেন ? এ সময়ে একটু গরম দুধ-টুথ খেলে ভাল হয়। কিন্তু দুধ এখানে বোধহয় পাওয়া যাবে না। অন্য কিছু খাবেন ?

চয়ন লাজুক মুখে মাথা নেড়ে বলে, না না। এখন কিছু খেতে পারব না।

খুব দুর্বল লাগছে ?

একটু লাগে।

পকেটে একটা নাম-ঠিকানা লেখা কাগজ রাখবেন। এপিএলপটিকদের ওটা রাখা দরকার।

চয়ন জবাব দেয় না। নাম-ঠিকানা লেখা কাগজ পকেটে রাখলেই বা কি লাভ হবে ? কলকাতার পথচারী জনসাধারণের ওপর তার আস্থা অনেক বেশী। পথেঘাটে এই রকম প্রায়ই হয় তার। তবু দুবারের বেশী তার পকেটের টাকা-পয়সা খোয়া যায়নি। গেছেও সামান্যই। সেটা না ধরলে কলকাতার অনাখ্যায় জনসাধারণই তার দেখভাল করেছে। ঘন ঘন শ্বাস নিতে নিতে মাথা কিছু পরিষ্কার হল। লোকটা তার মুখের দিকে নিবিড় চোখে চেয়ে আছে। একটু লজ্জা করছে চয়নের। লোকটি একটু বেশীই দয়ালু। সে বলল, এবার আর ভয় নেই। আমি চলে যেতে পারব।

আমিও দক্ষিণেই থাকি। যাদবপুরে। একসঙ্গে যেতে আপত্তি আছে ?

লাজুক চয়ন বলে, না না, আপত্তি হবে কেন! তবে টাক্সির দরকার নেই।

দরকার থাকলেও পাওয়া যাবে কিনা সেটাই বড় কথা। আপনি আর একটু জিরিয়ে নিন বরং। এখনও হাঁফাচ্ছেন।

টিউশনিতে কি আজ না গেলেই নয় ?

কাল আমার ছাত্রীর পরীক্ষা। না গেলে কথা হবে।

ছাত্রীর বাবা খুব কড়া ধাতের বুঝি ?

লজ্জিত চয়ন মাথা নেড়ে বলে, তা নয়। তবে টিউটরের তো অভাব নেই। সামান্য কারণে হয়তো ছাড়িয়ে দিতে পারে।

ক'টা করছেন ?

তিনটে।

আমি আপনার মতো বয়সে দিনে ছ'-সাতটা করতাম। ভাল রোজগার ছিল। পরে হোম টিউটোরিয়াল খুলি। এখন চাকরি করি বলে টিউটোরিয়াল তুলে দিতে হয়েছে। আসুন, অন্তত একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক। তাতেও খানিকটা কাজ হবে আপনার।

লোকটার কজির ঘড়িটা বিরাট বড়। সেটা লক্ষ্য করছিল চয়ন। সাড়ে ছটা বাজে। আর দেবী করলে যাওয়াটা অর্থহীন হয়ে যাবে। সে মাথা নেড়ে বলে, আমার দেবী হয়ে যাবে।

বলতে একটু কষ্ট হল তার। লোকটা তার জন্য এতটা দরদ দেখাচ্ছে, মুখের ওপর না বলতে লজ্জা করছে। কিন্তু উপায় নেই।

লোকটা বুক পকেট থেকে একটা ছোটো নোটবই বের করে বলে, আপনার ঠিকানাটা অন্তত দিন। একজন সাধুর একটা মাদুলি পেয়েছি। বোনটাকে ধারণ করিয়েছি গত পরশু। যদি উপকার পাওয়া যায় তবে আপনাকেও একটা জোগাড় করে দেবখন। কতরকম মিরাকল আছে মশাই। কী থেকে কী হয় কে জানে। আমার ঠিকানাটাও জেনে রাখুন। এই যে এল. আই. সি. বিল্ডিংটা দেখছেন এর চারতলায় মেশিন ডিপার্টমেন্টে আমি চাকরি করি। আশিস বর্ধন আমার নাম। এবার আপনার ঠিকানাটা আমায় বলুন।

চয়ন ঠিকানাটা বলল। তারপর অতিশয় সংকোচের সঙ্গে জানাল, বাড়িটা আমার দাদার। সেখানে—

সেখানে কী ?

মানে সেখানে আমার বন্ধু বা পরিচিতরা ঠিক ওয়েলকাম নয়। আমি যদি বাড়িতে না থাকি তবে আমার বউদি খুব একটা পান্ডা দেন না।

লোকটি হাসল, বুঝেছি। আপনি কোন সময়টায় অ্যাভেলেবল ?

দুপুরবেলাটায়া থাকি। বেলা বারোটা থেকে তিনটে।
লোকটা নোটবই পকেটে রেখে বলল, আশা করি আবার দেখা হবে। আপনি সংকোচ বোধ করছেন, নইলে আপনারকে গোল পার্ক অবধি পৌছে দিতাম। চলি।

লোকটা বোধহয় তাকে রেহাই দিতেই ভিড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। যেন একটু স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল। মানুষের ভালবাসা, সহানুভূতি গ্রহণ করতে আজকাল তার লজ্জা হয় না বটে, কিন্তু খুব বেশীক্ষণ সে সইতে পারে না। শুধুই নতমস্তকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে যেতে যেতে সে আজকাল হীনমন্যতায় ভোগে। মানুষের জন্য উল্টে যদি কিছু করতে পারত সে!

ভাগ্যক্রমে পরের বাসটা দু' মিনিটের মধ্যেই পেয়ে গেল চয়ন। কষ্ট করেই সে এল, নাইব বাসের দোতলায় উঠল। এ বাসটা এসপ্লানেডে কিছুটা ফাঁকা হয়। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে বসার জায়গা পেয়েও যেতে পারে। অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর জ্ঞান ফিরলে তার বড় ঘুম পায়। এখন পাচ্ছে। চোখ জুড়ে আসছে বারবার। বসতে পারলে সে একটু ঘুমিয়ে নেবে।

আশিস বর্ধন নামটা তার মনে থাকবে। সে সহজে কিছু ভোলে না। না নাম, না মুখ। তার স্মৃতিশক্তি চমৎকার। কিন্তু লোকটা যদি হট করে তাদের বাড়িতে হাজির হয় তাহলে অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তার একজন উপকারী বন্ধু তার আরও বেশী উপকার করতে উপযাচক হয়ে তাদের বাড়িতে গিয়ে অপমানিত হয়ে আসবে ভাবতেই সে সংকোচে মরে যাচ্ছে।

আগে অবশ্য ব্যাপারটা এরকম ছিল না। ভাল না হোক, বউদি অন্তত খুব খারাপ ব্যবহার বা অপমান করত না কাউকে। কিন্তু গোলমালটা পাকাল পাড়ার পল্টু।

মাস ছয়েক আগে তার দাদা আর বউদি মিলে ভূমূল চৌচামেচি আর অশান্তির পর চয়নকে আর মাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। বাড়িটা দাদার এবং দাদার পয়সাতেই মোটামুটি সংসার চলে। কিছু করার ছিল না তাদের। এক দিদি থাকে উল্টোভাঙা হাউসিং-এ, সেখানেই যেতে হত তাদের। গিয়ে কী হত কে জানে? তবে পোটলা-পুটলি বাস্র নিয়ে একরকম পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল তারা। কিন্তু সদর খুলে বেরোতেই এক বিপরীত দৃশ্য। সামনে পল্টু দাঁড়ানো, পিছনে পাড়ার বিস্তর ছেলে এবং কয়েকজন মহিলাও।

পল্টুই এগিয়ে এসে মাকে বলল, মাসীমা, ঘরে যান। চয়নদা, তুমিও ভিতরে যাও। আমরা না বললে খবর্দার বাড়ি ছাড়বে না।

পল্টু পাড়ার মোড়ল গোছের। তার ক্রাব আছে। মাঝে মাঝে রক্তদান শিবির, নাটক ইত্যাদি করে। তার প্রবল দাপটে পাড়ায় সাটার ঠেক আর দিশি মদের আন্তান উঠে গেছে। পলিটিকসও করে।

ভয়ে চয়ন তার মাকে নিয়ে দরজাতেই দাঁড়িয়ে রইল। ন যথী ন তস্তৌ অবস্থা।

তাদের পাশ কাটিয়ে পল্টু ঘরে ঢুকে সোজা দাদার গলায় হাত দিয়ে চেপে ধরল দেয়ালে, এ পাড়ায় বাস করতে চান? যদি চান তাহলে এবার থেকে মা আর বেকার ভাইকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। করলে আপনারকে এ বাড়ি ছাড়তে হবে। কথাটা আপনার বউকেও বুঝিয়ে দেবেন।

কথাটা শেন নাটুকে এবং বীরভূষাঙ্গক বটে, কিন্তু ঝামেলা অত সহজে মেটেনি। বউদি ঝাঁপিয়ে পড়ল পল্টুর ওপর। তারপর অকথ্য গালিগালাজ। পাড়ার লোক ভিড় করে এল। পল্টুর বীরত্ব নিয়েও প্রশ্ন উঠল। পারিবারিক ব্যাপারে বাইরের লোকের নাক গলানো: কতটা মুক্তিযুদ্ধ তা নিয়েও কথা হতে লাগল। তবে মোটামুটি জনসাধারণের চাপে তারা রয়ে গেল দাদার বাড়িতে। সম্পর্কটা খুবই খারাপ হয়ে গেল এর পর। দাদা পল্টুর এই হামলা নিয়ে প্রবল আন্দোলন করতে লাগল। এমন কি গুণ্ডা লাগানোর চেষ্টাও করেছিল।

দাদার হাতে ছেলেবেলায় বিস্তর মারধর খেয়েছে চয়ন। বড় হওয়ার পর খায়নি। কিন্তু পল্টুর হামলাবাজির পর সেই রাতেই দাদা তাকে একটা লাঠি দিয়ে খুব পেটায়। সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল মার খেয়ে। পরে ভনেছে, বউদি একটা কৌটো ছুঁড়ে মেরেছিল মাকে।

এর পরও তারা আছে। বাড়িটা ছোটো এবং পুরোনো। এ বাড়িতে তারা ভাড়া থাকত একসময়ে। পরে বাড়িওয়ার কাছ থেকে দাদা সস্তায় কিনে নেয়। বাড়ি কেনার পর থেকেই দাদার ভয়, বেশী দিন এ বাড়িতে থাকতে দিলে চয়নের দাবী জান্না যাবে।

এই ঘটনার পর থেকেই চয়নকে কেউ খুঁজতে এলে বউদি ভীষণ চৌচামেচি করে। চয়নের নামও সহ্য করতে পারে না দুজন।

আশিস যেন অসময়ে গিয়ে হাজির না হয়, হে ভগবান! এইটুকু বলে এসপ্লানেডে একটা সীট পেয়ে বসেই ঘুমিয়ে পড়ল চয়ন। গভীর ক্লান্তির ঘুম।

গোল পার্ক টার্মিনাসে কভাষ্টার ডেকে তুলে দিল তাকে। মোহিনী তাকে দেখে আঁতকে উঠে বলে, কী হয়েছে চয়নদা! পড়ে গিয়েছিলে নাকি? জামাকাপড় তো কাদায় মাখামাখি।

চয়ন যথাসাধ্য গভীর হয়ে বলে, রাস্তা যা পিছল।

ইস, ভেজা জামাকাপড়ে থাকবেন?

কিছু হবে না। রোজ তো বৃষ্টিতে ভিজছি, এত জামাকাপড় পাৰো কোথায়?

বাবার ধুতিটটি কিছু দেবো?

চয়ন শিহরিত হয়ে বলে, না না। কিছু লাগবে না।

এ বাড়িতে বিকেলে দুখানা মাখন টোস্ট পাওয়া যায়। এক কাপ চা। কখনও কখনও অবশ্য টোস্টের বদলে বিস্কুট। আজ টোস্ট দুখানা তার বড় দরকার। খিদে পেয়েছে।

সে এক গ্রাস জল চেয়ে খেল এবং পড়াতে লাগল।

চয়নদা, আপনারকে কিন্তু অসুস্থ দেখাচ্ছে। ফ্যাকাসে লাগছে খুব। পড়ার মাঝখানে বলে ফেলে মোহিনী।

মুণী রোগের কথা শুনলে এরা হয়তো আর রাখবে না তাকে। কণিকার বাড়ির তিন্ত অভিজ্ঞতা সে তো ভোলেনি। ভাঙা ডান হাতখানা তার আজও কমজোরি। ভারী জিনিস তুলতে পারে না। সে মুখে একটু হাসির ছদ্মবেশ ধারণ করে বলল, না না, শরীর ঠিক আছে।

মোহিনীর বয়স পনেরো। বিপজ্জনক বয়স। এই বয়সে মেয়েরা বড় চঞ্চল হয়। চয়ন এসব জেনেছে টিউশনি করতে করতেই। তাই আজকাল সে তার কিশোরী ছাত্রীদের চোখের দিকে চায় না। জীবনের জটিলতা যত কম হয় ততই ভাল।

মোহিনী একটু উসখুস করে 'এক মিনিট আসছি' বলে উঠে গেল।

কিছুক্ষণ বাদে মোহিনীর মা এলেন। হাতে এক গ্লাস কমপ্ল্যান আর দুটো টোস্ট।

মোহিনী বলছিল তোমার নাকি কি হয়েছে?

চয়ন বড় অপ্রতিভ হয়ে বলে, তেমন কিছু না। পিছল রাস্তায় একটা আছাড় খেয়েছি।

খুব লেগেছে?

সামান্য। জামাকাপড় নষ্ট হয়েছে জলকাদায়। অবশ্য শুকিয়েও গেছে এতক্ষণে।

শরীর ভাল আছে তো?

আছে।

এটা খেয়ে নাও।

চয়ন কৃতজ্ঞতায় মরমে মরে গেল। কিন্তু বিদের মুখে কী যে চমৎকার লাগল তার খাবারটুকু! বুকেটা ঠাণ্ডা হল, জুড়িয়ে গেল।

পড়ায় সে ভালই। ইংরিজি আর অঙ্ক দুটোই ভাল পারে বলে টিউশনির অভাব হয় না। তবে বেশী টাকা দাবী করতে ভয় পায়।

১৩

নতুন কেনা স্যুটকেসটার দিকে চেয়ে ছিল বীণাপাণি। দেখতে হুবহু চামড়ার জিনিস। কিন্তু বীণাপাণি জানে জিনিসটা পিচবোর্ডের। ওপরটা ঠিক চামড়ার মতো রং করা। সস্তার জিনিস। নিমাই তাতে পাটে পাটে নিজের জামা-কাপড় গুছিয়ে নিচ্ছিল।

বীণাপাণির খুব অম্বলের রোগ আজকাল। সকালবেলাতেও টক জল বমি হয়েছে খানিকটা। বুক এখনও ঢক ঢক করছে তেঁতুলগোলার মতো অম্বলে। মাথাটা ঠিক থাকছে না। শরীরটা দুর্বল লাগছে। বিছানায় বসে সে একদৃষ্টে নিমাইয়ের স্যুটকেস গোছানো দেখছে। শুধু স্যুটকেস নয়, নিমাই গোছাচ্ছে তার আখের। এ অশে মেয়ে হয়ে জ্ঞানানো যে কত বড় পাপ তা বীণাপাণির চেয়ে ভাল আর কে জানে! মাথাটা ধরে আছে খুব। চোখ ঝাপসা। বোধহয় চোখের জলেই হবে। কিছু কান্না নয়। বরং বুকে উথলে উঠছে রাগ। রাগের সাপ ছোবলচ্ছে। বিষ ঢালছে শরীরময়।

বীণাপাণির রাগটা নিমাইও টের পাচ্ছে। তাই চোখে চোখ রাখছে না। মাথা নিচু করে খুব মন দিয়ে স্যুটকেস গোছাচ্ছে। তিনখানা ধুতি আর জামায় পাঞ্জাবিতে গাটো চারেক, সাকুল্যে এ ক'খানাই সম্বল। ওপরে দু'খানা লুঙ্গি আর একখানা গামছা পাট করে রাখতে যত সময় লাগা উচিত তার চেয়ে বেশী সময় নিচ্ছে। এই শেষ সময়টাকে বীণাপাণি কিছু বলবে, আঁকারা-দেওয়া, লাই-দেওয়া কোনও কথা, সেইজন্যই কি অপেক্ষা করছে? আগে, অর্থাৎ বিয়ের পর পর ওই বেটে রোগা কালো এবং অপদার্থ লোকটার মান ভাঙতে পায়ে অবধি পড়েছে বীণাপাণি। তখন দুনিয়াটা একরকম ছিল, আজ সেই দুনিয়াটাই রং চটে, পলেশ্বারা খসে ভোবড়ানো চেহারাটা বেরিয়ে পড়েছে। কত কী ভাল লাগত তখন। এখন সবই বিস্মাদ।

এই মেনীমুখো মানুষটাকেই তার বাবা খুঁজে এনে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। বাবার মতে বড়ই ভাল ছেলে। শাস্ত্রশিষ্ট, স্থিরবুদ্ধি, চরিত্রবান। সবচেয়ে বড় কথা, মা-বাপের প্রতি ভক্তি আছে। ভগবানে বিশ্বাস আছে। চমৎকার কীর্তন গায়। শুধু পয়সাটারই যা অভাব। বড় জাওলিয়ায় এক ঠিকাদারের গুদাম পাহারা দেয়। চাকরি পাকা নয়, তবে ঠিকাদারবাবুটি ভাল, স্নেহ করেন। চাকরির মেয়াদ বাড়তে পারে। পালপাড়ায় নিজেদের একখানা মেটে বাড়ি আছে, তিন-চার বিঘে জমি। সুতরাং মেয়েকে একেবারে জলেফেলা হচ্ছে না। অন্তত অগাধ জল নয়।

বীণাপাণি তখন কতটুকুই বা মেয়ে? বুদ্ধিটি কিছু কার্কেনি, মা-বাপের ওপর নির্ভর। তবে বিয়ে নিয়ে একটা সুখের ভাবনা ছিল বড়। মিথ্যে বলবে না বীণাপাণি, বিয়ের পর সুখ হয়েছিল কিছুদিন। তার বৃষ্টি তুলনা নেই। বীণাপাণি এ কথাও বুকে হাত রেখে বলতে পারবে না যে, নিমাই লোকটা খারাপ। যদি মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবে তাহলেই বুঝতে পারে, এ লোকটার মনের জোর নেই বটে, কিন্তু দোষঘাটও বিশেষ নেই। নরম মনের মানুষ। সবসময়েই বিনয়ী বিগলিত ভাব। সেই কারণেই লোকে নিমাইকে ভালবাসে। ঠিকাদার নিরঞ্জনবাবুও বাসতেন। তবে তার কাজটাই নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে। জাওলিয়ার কাছে একটা রাস্তা তৈরির কাজশেষ করে তিনি আসামে গেলেন আরও বড় কাজে। নিমাইকে নিতে চেয়েছিলেন, তবে বুড়ো মা-বাপ, ক্ষেতি-গেরস্তি, নতুন বউ ছেড়ে তিন চারশ টাকার ভরসায় অতদূর যাওয়ায় গা-ও বিশেষ নেই। জাওলিয়ায় একখানা ফলের ষ্টল খুলেছিল নিমাই। তখনই তার ব্যারাম শুরু হয়। জ্বর, কাশি, বুকে ব্যথা। জল জমেছিল বুকে। এমন কিছু সাজাতিক রোগ নয়। আজকাল কত গুণ্ডু বেরিয়ে গেছে। কিন্তু ওই রোগের চিকিৎসা করতে গিয়েই বড় বিঘে জমি বেচে দিতে হল। হাড়ির হাল।

যে-সব ডাকরারা বক্তৃতা দিয়ে দেশ চালাচ্ছে, মানুষকে ন্যায়-অন্যায় নিয়ে জ্ঞান দিচ্ছে, তারা কি জানে গায়ে গঞ্জে মাঠে ঘাটে লোকে রোগ-ভোগ বিদে-তেষ্টা বিপদ-আপদ নিয়ে কিরকম ভাবে বেঁচে আছে! আর কেমনতরো বেঁচে-থাকাটাই বা এটা? এই মলম কি সেই মলম বলে এই যে স্বাস্থ্যটুকু চালু রাখা—এর মধ্যে আবার ধর্ম-অধর্ম পাপ-পুণ্য ঢোকানোর

কোনও মানে হয় ? আকাশে যে আর কোন এক ডাক্তার থাকে তার তো নাকে তেল দিয়ে ঘুমোনা ছাড়া আর কোনও কাজ দেখতে পায় না বীণাপাণি। পাপ-পুণ্য কালে করে বসে থাকলে কি ভাত জুটেবে ? বীণাপাণির ঘরের পাশ দিয়েই পেট-কোচড়ে পিস্তল নিয়ে এইটুকুন-টুকুন ছেলেরা প্রাণ হাতে করে যে-সব কাজ করতে যায় তা পাপ না পুণ্য তা কে বলে দেবে ? পেট-ভাতের জোগাড় থাকলে যেত ওসব করতে ? বেকারে ভরা দেশ, বাপে খেদায় মায়ে খেদায়, চা-বিস্কুট খাওয়ার, দাড়ি কামানোর অবধি পয়সা জুটতে চায় না, তা করবেটা কি ? কোন ভগবান দেখবে তাদের ? কোন সরকার ? আছে নাকি তারা এদেশে ?

নদেরচাঁদ লোকটা গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসীপাতা যে নয় সবাই জানে সে কথা। তার নামে লোকে দু-গাল ভাত বেশী খায়। নানা দোষ আছে তার, কিন্তু ওই বিপদের দিনে লোক বাছতে গেলে কি চলত ? বিপদে যে পাপ-পুণ্য ভেসে যায়। ভগবানের যদি বিচার থাকত তাহলে পাপ-পুণ্যের নিক্তিখানা ধরার আগে কুলের বাতাস দিয়ে আপদ-বিপদ রোগ-ভোগ তাড়িয়ে মানুষকে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে দিত। না বাঁচলে পাপ-পুণ্য করবেটা কি ?

ভগবানের কাজ ভগবান না করে যদি এক পানীতাপী লম্পট এসে করে তবে সেই লম্পটই তখন বীণাপাণির ভগবান। নদেরচাঁদ তো ভগবানের মতোই এসে দাঁড়াল একদিন। তখন মেটে স্যাঁতসেঁতে ঘরে ধুকছে নিমাই। অ্যালোপ্যাথির পয়সায় টান পড়ায়, হোমিওপ্যাথি চলছে। পথ্যের জোগাড় নেই। জ্যেষ্ঠত্বতো দেওরের বন্ধু নদেরচাঁদ উদয় হয়ে বলল বনগাঁর দিকে আমার কাকার একটা ব্যবসা আছে। তাতে একজন লোক দরকার। তবে পুঙ্খমামুষ হলে চলবে না। মেয়েছেলে চাই।

বীণাপাণি ডগমগে যুবতী। সে জানে মেয়েছেলে হয়ে জন্মানোর কিছু জন্মগত পাপ আছে। তবে শরীরটা যে সব পুরুষেরই ভক্ষ্যবস্তু। যদি একটু দেখনসই হয় তাহলে তো কথাই নেই। ছেলে-বুড়া সকলেই নরখাদকের মতো মনে মনে চোঁট চাটে। এই হালুম-খলুম ভাবটা চারদিকে বড় টের পায় বীণাপাণি। কপালের দোষই হবে, সে দেখতে ভাল। লম্বাটে গড়ন, রংখানো ও ফর্সার দিকে, মুখের ডৌলটি নিখুঁত, দুটি টানা চোখ। নিজেকে কখনও আড়াল করেনি সে।

কথা হাঙ্গল নিমাইয়ের সামনে বসেই। বোকা শাওড়িটাও ঘরে ছিল। এরা দুনিয়ার হালচাল কিছুই জানে না, বোঝেও না। লোকে অচেনা কথা বললে হাঁ করে চেয়ে থাকে। বোকা মাথায় কোনও ভাল বা মন্দের চেউ ওঠে না। এতদিন দুনিয়াতে কাটিয়েও দুনিয়াটা বড় অচেনা এদের কাছে। বীণাপাণিরও তো এর চেয়ে ভাল অবস্থা নয়। তবে সে নদেরচাঁদের চোখে একটা লোভানি দেখতে পেয়েছিল।

নিমাই বলল, ব্যবসাটা কিসের ?

নানান জিনিসের। চালানি ব্যবসা। মাল আনা, চালান দেওয়া। পয়সা আছে।

শাওড়ি বলে উঠল, বউমাকে দিয়ে হয়, ও বাবা নদেরচাঁদ ?

খুব হয়। বউদি তো দিবা চটপটে মেয়ে। কাকা এরকমই খুঁজছে।

দেখবে নাকি বউমা ?

বীণাপাণি জানে, এর মধ্যে একটা চক্রর আছে। তাকে গভীর জলে টেনে নামানোর জন্য কুমীর এসে ডাঙায় উঠেছে।

বাপের বাড়ির অবস্থা একটু ভাল হলে বীণাপাণি দুর্দিনে গিয়ে বাপ-ভাইয়ের ঠ্যাং ধরত। কিন্তু সে সুবিধে নেই।

বউদিরা দাঁতে বিষ নিয়ে ফণা তুলে আছে। বাপ-মায়ের অবস্থা শোচনীয়।

বীণাপাণি সভয়ে বলল, কেমনধারা কাজ গো! আমি কি পারব ?

নদেরচাঁদ উদাস গলায় বলল, মেয়েছেলেরই কাজ।

বোকা শাওড়িটা নেচে উঠে বলল, দে বাবা নদেরচাঁদ, কাজটা করে দে। সবাই মিলে দুটি খেতে পাই তাহলে।

ভয়-ভাবনা-অনিচ্ছয়তা নিয়েই একদিন নদেরচাঁদের সঙ্গে বনগাঁয় এল বীণা। কাকার সঙ্গে কথা বলে বিকেলেই ফিরে যাবে। বাসে বসেই নদেরচাঁদ বলে ফেলল, শোনো বউদি, নিমাইদা অবুঝ লোক বলে তার সামনে বলিনি। যে কাজে তোমাকে নামাতে চাইছি তা একটু অন্যরকম।

বীণা চমকে উঠে বলল, কিরকম ?

খুব মজার। চাকরির একঘেয়েমি নেই। রংদার কাজ।

বনগাঁয়ে বিশ্ববিজয় অপেরা সবে ডানা মেলতে শুরু করেছে। বিশ্ববিজয় অপেরার স্বত্বাধিকারী বিজয় সাহাকে কেউ তার আসল নামে ভাল চেনে না। সবাই জানে কাকা বলে। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়স, কালো, লম্বা, ছিপছিপে চেহারা। অভিনয় তার নেশা। কলকাতার থিয়েটার পাড়া, যাত্রাপাড়া, ফিল্মের স্টুডিওতে এতকাল ঘুরঘুর করেছে। সুযোগ পেয়েছিল কয়েকটা, কিন্তু সুযোগ এক কথা, উন্নতি আর এক জিনিস। শেষে একটা যাত্রাদলের চাকরি পেয়েছিল সামান্য মাইনের। বনল না। তখন মাথায় রাখ চাপল, কলকাতায় আর নয়। দেশে বনগাঁয়ে ফিরে গিয়ে যাত্রাদল খুলবে। কলকাতার পেশাদারদের চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে তবে ছাড়বে।

কিন্তু ভাবা আর করা তো এক কথা নয়। টাকা-পয়সার বন্দোবস্ত নেই, ভাল পালাকার কোথায় পাবে, গানবাজনার লোকই বা কোথা থেকে জুটবে, নটনটা জোটানোও কি সোজা কথা! কিন্তু সবার আগে দরকার টাকা।

নাটকের নেশাই কাকাকে পথ দেখাল। কাছেই বাংলাদেশ বর্ডার। চোরাইচালানের ব্যবসায় লোকে টাকা লুটছে। যাত্রাদল করত হবেই, সুতরাং কিছু না ভেবেই সে চোরাইচালানের কাজে নেমে গেল। কাজটা বড় সহজ নয়। প্রথম প্রথম বিপদ পেড়ত, মারধর খেত, আরেষ্টও হয়েছে। কিন্তু লেগে রইল। ধীরে ধীরে দল তৈরি হল, চোরাই ব্যবসার অলিগলি মুখস্থ হল, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পাকা ব্যবস্থা হয়ে গেল। সবচেয়ে বড় কথা, টাকা আসতে লাগল হাতে।

টাকা ওড়াত না সে। নেশাভাঙ ছিল না, জুয়া খেলত না, মেয়েমানুষের দোষ নেই। দিনরাত শুধু যাত্রার ভাবনা তার মাথায়। কলকাতার নাম-করা অপেরাগুলোর খোঁতা মুখ সে ভেঁটা করে ছাড়বে। মফস্বলের দল নিয়ে সে কাঁপিয়ে দেবে দেশ।

বিশ্ববিজয় অপেরা খুলেছে বছর দুই। গুটি কয়েক পালা করে একটু নামও হয়েছে। তবে সেটা কিছু নয়। বিরূপ চৌধুরীর হাতে পায়ে ধরে দুখানা পালার বায়না করেছে। ঐতিহাসিক পালায় বিরূপবাবুর জুড়ি নেই। গানের জন্য আকাশবাণীর পুরোনো এক গায়ককে ধরেছে। নিমাই পাল। কেউ পৌছে না, কিন্তু নিমাইবাবুর অগাধ জ্ঞান। এইসব ফেলে দেওয়া লোককেই দরকার কাকার। কার ভিতর থেকে কোন প্রতিভা বেরিয়ে আসবে কে জানে!

প্রতিভা খুঁজবার নেশাটা ছিল বলেই কাকা নদেরচাঁদের আনা মেয়েটাকে প্রথম দর্শনেই ভাগিয়ে দিল না। নদেরচাঁদকেও সে একটু খতির করে। তিন চারখানা বায়না করে দিয়েছে ছেলেরা।

মেয়েটা দেখতে ভাল। ছোটোখাটো পাটে চলবে। তবে এখনও বড্ড গৈয়ো আর জড়োসড়ো। ভয়ে আধখানা হয়ে আছে।

নদেরচাঁদ ধরে পড়ল, একে কাজ না দিলেই নয় কাকা।

বলতে নেই, প্রথম দর্শনেই এই কাকা লোকটিকে ভাল লেগেছিল বীণাপাণির। জন্মে সে অভিনয় করেনি। আসর-ভরা লোকের সামনে সে হয়তো কেঁদেই ফেলবে পাট করতে উঠে। তবে এই কাকা লোকটি যে আর পাঁচটা মতলববাজদের মতো নয়, এ যে যাত্রা-পাগল মানুষ, অন্য ধান্দা নেই, তা দশ-পনেরো মিনিট কথাবার্তার মধ্যেই বুঝতে পারল বীণাপাণি।

তবে বোকা-মাথার বুঝ, সেই বুঝকে তো আর বিশ্বাস নেই। এই তো নদেরচাঁদ চাকরির নাম করে নিয়ে এল তাকে, বুঝতে পেরেছিল কিছু বীণাপাণি?

শুধু একটা জিনিসই স্পষ্ট বোঝে সে, তার শরীরখানার দিকে সকলের নজর। মেয়েদের চারদিকে পাপের হাজারো পথ। যদিও এই পা বাড়ায়, পথ পায়ের নিচে হাজির হয়ে যায়।

সে বলেই ফেলল, এ কাজ আমি পারব না।

কাকা তার দিকে চেয়ে নিরাসক্ত গলায় বলল, ইচ্ছে হলে জোর তো কেউ করছে না। জবরদস্তির কাজও নয় এটা। এসব আর্ট, ভালবাসার জিনিস। যদি টান না থাকে তাহলে পারবেও না। তবে এসব কাজ মানুষই করে, অভিনয় করতে তো আর স্বর্গ থেকে আসে না। চেষ্টা করলে পাকা কঠিন নয়।

আমি ঘরের বউ, এসব যাত্রাপালায় নানা খারাপ ব্যাপার হয়, শুনেছি। মেয়েমানুষের ধর্ম থাকে না।

ধর্ম যে যার নিজের কাছে। আগেই তো বলেছি, জবরদস্তির কিছু নেই। বহু ছেলেমেয়ে ঘুরঘুর করে একটা পাটের জন্য। এ বাজারে একটা সুযোগ পাওয়াই যে বড্ড কঠিন। কত মানুষকে ফিরিয়ে দিতে হয় রোজ। তোমাকে যে প্রথম চোটেই ফিরিয়ে দিইনি সেরা কিন্তু মস্ত ব্যাপার। তুমি চাইলে করতে পারো। শিখতে হবে, ধৈর্য ধরতে হবে, কষ্ট করতে হবে। এ লাইন খুব কঠিন। বাড়ি গিয়ে দেখ। রাজি থাকলে এসো। সামনের মাসেই পালা নামবে।

প্রথম দিন এর বেশী কথা হয়নি। কাকা ব্যস্ত লোক। সবসময়ই তার ঘরে ভিড়।

বাইরে এসে নদেরচাঁদ বলল, দিলে তো ডুবিয়ে! ওরকম বেকে বসলে কেন বেলো তো! সারাক্ষণ যে পাখি-পড়া করে শিখিয়ে আনলুম।

শেখালেই হল! এক কথা বলে নিয়ে এলে, পরে দেখি আর এক ব্যাপার। তুমি ভীষণ খারাপ লোক।

এ বাজারে এ এক মস্ত সুযোগ তা জানো? কত বিনোবুদ্ধি নিয়ে বেকার ছেয়েমেয়েরা বসে আছে তা দেখছ না?

আমি এসব পারব না।

সে তো বুঝতেই পারছি। আমার বাসভাড়াটাই জলে গেল।

শেষ অবধি জলে গেল না। বাড়ি ফিরে সকলের নানা প্রশ্নে ভাসা-ভাসা জবাব দিয়ে সে গভীর রাত অবধি নিবিষ্ট হয়ে ভাবল। সামনে তার অনেক বিপদ। তার মধ্যেই যেন একটু ডাঙা জমি হল ওই কাকা।

পরের সপ্তাহে ফের বনগাঁয়ে নদেরচাঁদকে নিয়ে হাজির হল বীণাপাণি। কাকার সামনে সতেজে দাঁড়িয়ে অকম্পিত গলায় বলল, পাট দিন, করব।

তাহলে রোজ রিহার্সালে আসতে হবে। কঠিন কাজ। তোমার কোনও ট্রেনিং নেই। শিখতে সময় লাগবে, খাটতে হবে খুব।

আমাকে কত মাইনে দেবেন?

মাইনে! দল না দাঁড়ালে মাইনে আসবে কোথা থেকে? এ কি কলকাতার পেশাদার দল! শুধু পয়সার লালচ থাকে এসো না, তাতে লাভ নেই। অভিনয় অন্য জিনিস।

অন্য জিনিস তো বুটেই। সিনেমা থিয়েটার কিছু দেখেছে বীণাপাণি। সিনেমার হিরো হিরোইনদের অনেক পয়সা আছে বলেও শুনেছে কিন্তু এই লাইন তার চেনাজানা জগতের বাইরে।

পারবে?

বীণাপাণি কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, আমার বরের খুব অসুখ। বাড়িতে হাঁড়ি চড়ছে না। আমার একটা ব্যবস্থা না করে দিলে কি করে পারব?

কাকা মৃদু হেসে বলে, সকলের গল্পই একরকম, বুঝলে? এদেশে কেউ সুখে নেই। সকলেরই নানা বিপদ। তবে সেসব সয়ে বয়ে এগিয়ে যেতে হয়।

কিন্তু নদেরচাঁদ আমাকে বলেছিল আপনি চাকরি দেবেন।

নদেরচাঁদ জানে না বলেই বলেছে। তবে তোমাকে আমি ঠকাব না। যদি লেগে থাকো, দল যদি দাঁড়ায় তবে ভালই পাবে। এখন অবশ্য থোক টাকা না দিলেও খাওয়া-পরা পাবে, থাকার জায়গা দেবো। কিছু হাতখরচ।

বীণা হাত পেতে কাকার দেওয়া পঞ্চাশটা টাকা প্রায় ভিক্ষে হিসেবে নিল। সেই টাকা পেয়ে শ্বশুরবাড়ির সকলেই খুশি। তাকে বনগাঁয়ে রহস্যময় চাকরিতে পাঠাতে কারও কোনও আপত্তি হল না। শুধু ধুকতে ধুকতে নিমাই বলল, বনগাঁ যে অনেক দূর!

নদেচাঁদ বলল, কিসের দূর! দুনিয়াটা কি আর আগের মতো আছে নিমাইদা ? লোকে কলকাতায় ঘুম থেকে উঠে রাত্রিরে খাবার আমেরিকায় যায়, তা জানো ? দুনিয়াটা এই একটুখানি হয়ে এসেছে। পালপাড়া থেকে বনগাঁ যদি দূর তাহলে কান থেকে কানটাও দূর।

ডাঙা থেকে কুমীরটা শেষ অবধি তাকে বিপদসঙ্কুল জলে টেনে নামালই। হাবুডুবু কিছু কম খেয়েছে বীণাপাণি! তবে না শক্তপোক্ত হয়েছে বনগাঁয়ে তাকে আসতে হয়েছিল একা। যাত্রাদলের আর একটা মেয়ের বাড়িতে কাকা তার থাকবার ব্যবস্থা করে দিল। তিন মেয়ে নিয়ে বিধবা মায়ের সংসার। বুড়ি একটু ভাল মানুষ গোছের। বড় মেয়ে একটা কুলে পড়ায়, সংসার তারই কাঁধে। মেজো একটা ছেলের সঙ্গে বিয়ে বসে চলে গিয়েছিল, ফেরত এসেছে। ছোটো মেয়ে সীমা যাত্রাদলে ঢুকে পরে সিনেমায় নামবার স্বপ্ন দেখছে।

প্রথম প্রথম লজ্জা, ভয়, অনভ্যাস আর অস্বস্তিতে রিহার্সালের পর রিহার্সালে বকুনির পর বকুনি খেত বীণাপাণি। রাতে শুয়ে কান্দত আর সীমা তাকে সাবুনা দিত। একমাস তাকে খাটিয়ে জেরবার করে দিল কাকা। তারপর ভরাভর্তি আসরে একটা ছোটো রোলে সত্যিই নেমে পড়ল বীণাপাণি। কোনওরকমে পাট মুখস্থ বলে যেতে পারল।

কাকা তার মধ্যে কী দেখেছিল কে জানে! এর পরও তাকে দল থেকে বাতায়নি, বরং উঠে-পড়ে লাগল তাকে তৈরি করতে। শুরু হল বেদম খাটুনি। কাকা বলতে লাগল, এবার বড় রোল দিচ্ছি, কিন্তু দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই রোলটা ভাববে। ভাববে তুমি দময়ন্তী, তুমিই দময়ন্তী, দময়ন্তী ছাড়া আর কেউ নও।

তাই ভেবেছিল বীণাপাণি। দ্বিতীয়বার একই পালায় অন্য ভূমিকায় নেমে তার আর বিশেষ ভয় হল না। খানিকটা সহজভাবে পাট করে গেল। নল-দময়ন্তী দিয়ে চাঁদপাড়া, চাকদা, বড় জাগলিয়া, কাঁচড়াপাড়ায় বেশ লোক টানল বিশ্ববিজয় অপেরা। ততদিনে পাকাপোক্ত হয়ে উঠল বীণাপাণি। নেশা ধরল অভিনয়ের।

সবচেয়ে বড় কথা হাতে টাকা আসতে লাগল। আর বেনোজলে ভেসে আসতে লাগল যতকম কামট কুমীর। ডাঙা থেকে তাকে জলে টেনে নামানোর অপেক্ষায় যারা ছিল। তাদের কাছে মেয়েছেলে মানে মেয়েছেলেই। তার বেশি আগ কিছু নয়। কে আট করে, কে লেখাপড়া ভাল, কার গানের গলা আছে বা লেখার হাত আছে সে সব নিয়ে বেশির ভাগ পুরুষেরই মাথাব্যথা নেই। মেয়েমানুষের গুণকে তারা মোটেই দাম দিতে চায় না। তাদের কাছে শরীরটাই আসল কথা।

শরীর বাঁচাতে বীণাপাণিকে কম কটুবুদ্ধি খাটাতে হয়নি। দু-একজন তো খুন করারও হুমকি দিয়েছিল।

শরীরের জন্য একজন পাহারাদার দরকার ছিল। সে চৌকিদার স্বামীর চেয়ে ভাল আর কে হতে পারে ? নিমাই যতই সামান্য মানুষ হোক, তবু কলেরা-বসন্তের টাকার মতো স্বামীরও কিছু উপকার আছে। যাত্রায় নামবার ছ'মাস বাদে নিমাইকে আনতে গিয়েছিল বীণাপাণি। সে বনগাঁয়ে একখানা ঘর ভাড়া করেছে, নতুন চৌকি কিনেছে।

বীণাপাণির টাকায় ওষুধ-পথ্য করে নিমাই তখন শক্ত অসুখ থেকে খাড়া হয়েছে। ফলের দোকানে বসেছেও। বীণাপাণিকে দেখে তার অভিমান আকাশে উঠল বুঝি। বাঁকা গলায় বলল, আমাকে আর তোমার কিসের দরকার।

বীণাপাণি অবাক হয়ে বলে, দরকারের কথা ওঠে কেন ? আমি তোমার বিয়ে-করা বউ, নাকি ? সে ছিলে কোনওদিন।

আজ নয় ?

নিমাই মাথা নিচু করে বলল, আজ আর আমি কে! তোমার কত মোসাহেব জুটেছে।

মোসাহেব অত সস্তা নয়। যাত্রায় নামলেই বুঝি মোসাহেব জোটে ? এখনও আমাকে কেউ পাশাই দেয় না। সব তো একটু-আধটু শিখেছি, আড় ভাঙছে।

যাত্রায় নামলে কেন ? আমি তো বেঁচে ছিলুম।

বাঁচতে না। ঠিক সময় ওষুধপত্র না পড়লে মরতে হত। গাগিয়া পালা দুটো ভাল চলল, তাই কাকা খুশি হয়ে মাস কয়েক হল তিনশো টাকা মাইনে দিচ্ছে।

এই কাকাটি কে বলো তো! খুব শুনছি তার কথা।

কাকার কথা বলার সময় কেমন যেন ভক্তিতে গদগদ হয়ে পড়ে বীণাপাণি। ভারী গলায় বলল, ওরকম মানুষ দেখিনি। নাটক আর অ্যাকটিং নিয়ে সারাক্ষণ বৃন্দ হয়ে আছে। অন্য কোন দিকে মন নেই।

কিন্তু আমি শুনেছি লোকটা স্বাগলার।

সেটাও মিথ্যে শোনেনি। কাকা নাটকের জন্য বুঝি সব করতে পারে। এই যেমন তোমাকে বাঁচানোর জন্য আমি হায়া লজ্জা বিসর্জন দিয়ে যাত্রায় নামলুম, ঠিক তেমনি। ভালবাসার জিনিসকে বাঁচাতে মানুষ সব করতে পারে। কাকা স্বাগলিং করেছে যাত্রার দল বানাবে বলে।

তাহলে তাকে কি ভাল লোক বলা যায় ?

একবার চলো না বনগাঁয়ে, দেখা হোক, কথাবার্তা হোক, তারপর নিজেই বুঝতে পারবে কেমন লোক।

আমি এই বেশ আছি বীণা।

বোকা স্বস্তর আর শাওড়ি ছেলে আর ছেলের বউয়ের আড়াআড়ি দেখে ভয় খেল। খুব স্বাভাবিক। বউ টাকা রোজগার করছে, তারা সেই টাকায় দুটি খেতে পরতে পাচ্ছে। ছেলে আর বউতে আড়াআড়ি ছাড়াছাড়ি হলে তাদেরই বিপদ। পেটে টান পড়বে।

দুই বুড়োবুড়ি তখন ছেলেকে নিয়ে পড়ল, কাজটা খারাপ কেন হবে ? সিনেমা থিয়েটারে আজকাল কত বাবুঘরের মেয়েরা নামে। পাশ-টাশ করা সব মেয়ে। ওসব এখন আর কেউ ধরে না।

শাওড়ি গোপনে তাকে এমন কথাও বলল, মনিবকে খুশি রেখো। মনিব অনুদাতা ভগবান। শরীর যদি ঐটোকাটা হয়ে পড়ে তো গঙ্গায় ডুব দিয়ে এলেই সব পাপ ধুয়ে ফর্সা।

গুণ একখানা ছিল নিমাইয়ের। মা-বাপের গুণের ভক্তি। শেষ অবধি যে সে বনগাঁয়ে বউয়ের ঘর করতে এল সে ওই মা-বাপের জন্যই। তাদের কথায় বা আদেশে ততটা নয়, যতটা তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য।

শ্বত্ৰমশাইয়ের খুব ইচ্ছে, বনগায়ে গিয়ে ব্যাটা-বউয়ের সঙ্গে থাকে। সেটা হতে দিল না নিমাই। বলল, আগে আমি গিয়ে সব বুঝে আসি, তারপর দেখা যাবে।

বনগায়ে এসেই যে নিমাই সব বুঝতে পারল, এমন নয়। তবে বীণাপাণি যে ভারী ব্যস্ত মানুষ এবং তাকে যে সেই গ্রাম্য সরল বোকা বউটির মতো আর পওয়া যাবে না সেটা টের পেতে তার দেরী হল না। এতে তার অভিমান হতে লাগল, সে বেকার লোক, সারাদিন কাজ নেই বলে বসে থাকে, আর তার বউ সকাল-বিকেল রিহার্সাল দিতে যায় নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই—এটা ভাল লাগার কথাও নয়। তার ওপর পালা নিয়ে বাইরে যাওয়া তো আছেই। হয়তো দু' রাত্তির তিন রাত্তির ফেরেই না। বউয়ের বেশ নামডাক হচ্ছে চারদিকে। লোকে পথে-ঘাটে বাজারহাটে নিমাইকে টিটকির দেয়। তাই থেকেই বোঝা যায় যে, বউয়ের নামডাক হচ্ছে।

নাম হচ্ছিল বিশ্ববিজয় অপেরার। বারাসতে নিখিল বঙ্গ যাত্রা উৎসবে বিশ্ববিজয় অপেরার দু'খানা পালা হল, দু'খানাই মারকাট। কলকাতার দলগুলোর মতো অত হ্যাডস্‌ নেই তাদের, নামডাকের অভিনেতা-অভিনেত্রী নেই, তবু বিশ্ববিজয় ফাটিয়ে দিল।

বীণাপাণি সবে তার ঘরবন্দী নারীত্বের খেলস ছেড়ে হাজার মানুষের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার অদ্ভুত মুক্তির স্বাদ পাচ্ছে, এরকম সময়ে ঘরে ফিরে সে রোজ একখানা বিমর্ষ অন্ধকার মুখ দেখে খুশি হবে কেন? দেখে দেখে তেতো হয়ে যেতে লাগল।

কী হয়েছে তোমার বলো তো? এমন গোমড়া মুখ করে থাকো কেন?

নিমাই ঝগড়া করত না। ঝগড়াঝাঁটি, খিটিমিটি তার মোটে আসেই না। সে হল পাশ্চাত্য-পুরুষ। জলে ভেজা, ঠাণ্ডা। শুধু ডাইনে বাঁয়ে মাথা নেড়ে একটা নেতিবাচক ভঙ্গি করে। তার বেশি কিছু নয়। মাঝে মাঝে কাতরভাবে বলত, আমার যে এখানে করার কিছুই নেই। একটু কিছু না করলে কী হয়?

যাত্রার দলে লোকলব্ধ লাগে। সে-কাজে ঢোকাতে চেয়েছিল বীণাপাণি, নিমাই রাজি হচ্ছিল না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

কিসের বাড়াবাড়ি তা আর ভাবল না।

বছর দুই এইভাবে চলল। বীণাপাণি একটু জমি কিনে ফেলল বনগায়ে। দু'খানা ঘর তুলল। নিমাই নিজেই তত্ত্বাবধান করল, কিন্তু উদাসীনভাবে। বীণাপাণির যে উন্মত্ত হচ্ছে তাতে যেন ওর কিছুই না। বীণা ভারী বিরক্তি বোধ করে নিমাইয়ের ওপর।

ওর কিছুই কি ভাল লাগে না বীণার। লাগে। যখন খুব ভোরবেলা ঘুমচোখে সে শুনতে পায়, নিমাই উঠে বারান্দায় বসে সুরেলা গলায় প্রভাতী গাইছে। “ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ” শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দেয়। নিমাইয়ের আর একটা ব্যাপারও ভাল লাগে বীণার। তার বাবার সঙ্গে নিমাইয়ের আবছা একটা মিল আছে। দুজনই ভারী নিরীহ।

বাইরে আজ মেঘলা দিন। গুঁড়ো বৃষ্টির একটা আবছায়া চারদিকে। এইসব দিন বীণাপাণির পক্ষে খারাপ, বিশ্ববিজয় অপেরার পক্ষে খারাপ। বর্ষাকালে বায়না নেই-ই প্রায়। এবারের ভারী বর্ষায় কয়েকটা বায়না কেঁচেও গেছে। আজকাল আর হাত পা ঠুঁটো করে ঘরে থাকা ভাল লাগে না। ঘর যেন গারদ। আর এমন দরকাট-মালা দিনে ওই লোকটা বাঙ্গ গুছিয়ে চলে যাওয়ার জন্য পায়তাদা কষছে। দুধকলা দিয়ে কাল-সাপ পোষারই সামিল হল বোধহয় ব্যাপারখানা।

অথচ এমন কি ব্যাপারটা ছিল? কাকার দলের ছেলেদের সঙ্গে বীণাপাণির চেনাজানা অনেকদিনের। যাত্রার দলে তারাও মাঝে মাঝে ভিড়ে যায়। আবার বর্ডার পেরিয়ে মালও নিয়ে আসে রাতবিরেতে। তারা কে কেমন লোক অত জেনে দরকার নেই বীণার। তবে তারা মাঝে মাঝে জিনিসপত্র গচ্ছিত করে যায় তার কাছে। একবেলা আধবেলা পর নিয়ে যায়। এদের একজন পগা। বীণা তাকে বেশ একটু পছন্দ করে। ভারী মিষ্টি তার কথাবার্তা। চোখ দু'খানা বড্ড ভাবালু। তার কাছে অনেক টাকা থাকে, ডলার থাকে, পাউন্ড থাকে। সে টাকারই কারবারি। সোনার বিকিকিনিও করে বলে শুনেছে বীণাপাণি। তবে সে কারোই হাঁড়ির খবর নিতে যায় না। বন্ধুর মতো সম্পর্ক রেখে চলে। পগা মাঝে মাঝে তার কাছে মট এক-একটা প্যাকেট জিন্মা রেখে যায়। সন্দের পর সে যায় জুয়া খেলতে আর মদ খেতে। সঙ্গে বেশি টাকা থাকলে চোট হয়ে যেতে পারে। বীণাপাণি রেখে দেয়, কোনও কৌতুহল প্রকাশ করে না।

এ ব্যাপারটা নিয়েই নিমাইয়ের বড় অশান্তি। বারবার বলে, ওসব ছোকরাদের জিনিস গচ্ছিত রাখা ঠিক হচ্ছে না। কোনটা কী জিনিস কে জানে। হয়তো অস্ত্রট্রাই রেখে গেল একটা ন্যাকড়ায় মুড়ে, বা বেমা।

অস্ত্রও থাকে, তবে সেটা আর নিমাইকে বলেনি বীণা। সে শুধু বলল, এ জায়গায় থাকলে হলে এদের সঙ্গে ভাব রেখেই থাকতে হয়। এরা বন্ধু থাকলে ভয় নেই।

এ ব্যাপারটা আমার বড় অশান্তির কারণ হচ্ছে।

বীণাপাণি এই ঘ্যানঘ্যান শুনেন শুনেন পরশ আর সন্তুষ্ট করতে পারেনি। খুব এক তরফা খেড়েছে নিমাইকে। মুখে কোনও কথা আটকায়নি। শেষ অবধি বলেছে, তুমি এ বাড়ি থেকে বিদেয় হও। এখানে আর জায়গা হবে না।

কথাটা বলার সময় খোয়াল হসনি যে, নিমাইকে সে যেতে নিয়ে এসেছিল।

এখন নিমাই ওই বাঙ্গ গোছানো শেষ করে চুপচাপ বসে আছে। চোখ দুটো ছলছলে। কিছু বলবে বলে মনে করছে, কিন্তু কথা আসছে না মুখে। এত রাগারাগি করল সেদিন বীণাপাণি, একটিও জবাব দেয়নি। বড় নিরীহ।

আর এত নিরীহ বলেই রেগে যায় বীণাপাণি। সে শুধু চেয়ে আছে এখন। নিমাই চলে গেলে এ বাড়িতে একা থাকবে বীণাপাণি। একটু একা লাগবে। তা লাগুক।

এখন দুজনে খুম হয়ে বসে আছে। বীণা তাকিয়ে আছে নিমাইয়ের দিকে। চোখে জালা, রাগ অজ্ঞোশ; নিমাই চোখ নিচু করে বসে আছে মেঝেয়। ঘরে ছুঁচ পড়লে শোনা যায়। লোকটার কোনও দাম নেই বাইরের দুনিয়ায়। শুধু বীণাপাণির কাছে কিছু আছে। এক কানাকড়ি হলেও আছে। তবু আশ্পর্ধা দেখ।

পার্শ্ব—৩

চোখে জল আসছিল বীণাপাণির। আঁচলটা চোখে তুলতে যাবে, ঠিক এই সময়ে জানলা দিয়ে একটা মুখ উঁকি দিল। পাড়ার একটা ছেলে।

বীণাদি, খবর শুনেছো? পগা কাল রাতে বটতলায় খুন হয়েছে।

আঁ!

লাশ ঘিরে দারুণ ভিড়। পুলিশ এসেছে। বলেই ছেলেরা চলে গেল।

নিমাই মুখ তুলে বীণার দিকে চাইল।

কাল রাতে পগা মস্ত একটা প্যাকেট রেখে গেছে বীণার কাছে। তাতে অনেক টাকা।

॥ ৪ ॥

একটা ন্যাকা বৃষ্টি অনেকক্ষণ ধরে হয়ে যাচ্ছে। হয়েই যাচ্ছে। ধরছে না, কমছে না। জোরেও নয়, আস্তেও নয়। ঘ্যান ঘ্যান ঘ্যান ঘ্যান ঘ্যান ঘ্যান। একখানা পাতলা ঝরোকার মতো ঢেকে আছে চারপাশ।

বৃষ্টি খুবই ভালবাসে মণীশ। মণীশের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি ঘটেছে বর্ষাকালে। এমন কি অপর্ণার সঙ্গে তার চমকপ্রদ প্রেমটাও। এখন মণীশ নাসিং হোম-এ। শক্তিশালী ওষুধে আশ্রিত। সেই গাঢ় কুয়াশার মতো আশ্রিততার ভিতরে এই বৃষ্টির কোনও খবর পৌঁছোচ্ছে না। মাঝে মাঝে গভীর ব্যথায় এক একটা কাতর শব্দ উঠে আসে বৃকের গহন থেকে।

মণীশের বাড়ির অবস্থাটা সন্ধে সাড়ে সাতটার সময় খুব ম্লান ও স্তব্ধ। টি ভি-টা চলছে। বাংলা খবর একটু আগেই শুরু হল। টি ভি-র মুখোমুখি বসে মণীশের ছেলে অনীশ। বাবাকে নিয়ে দু রাত জাগার পর এখন তার চোখের পাতা চুষকের টানে জুড়ে যাচ্ছে বারবার। করুণ গলায় একবার বলেছিল অনেকক্ষণ আগে, মা, একটু চা দেবে? একটু কড়া করে?

অপর্ণা বলেছিল, দিই।

সাড়ে সাতটা নাগাদই ঝুমকি তার কমপিউটার ক্লাস থেকে ফেরে। ফিরে চা চায় বা নিজেই করে নেয়। অপর্ণা একটু দেবী করছিল চা করতে। এখনই তো ফিরবে ঝুমকি।

এ বাড়িতে কারও মন ভাল নেই বলে সংসারটাই যেন এলিয়ে পড়েছে। ছোটো মেয়ে অনু এ সময়ে রোজ টিবিওতে গান শোনে। রাজ্যের হিন্দি গান। অনুশীলা অর্থাৎ অনু দু রাতের টেনশনের পর বাইরের ঘরে ডিভানে গুটিগুটি মেরে ঘুমিয়ে পড়েছে কখন।

বাচ্চা কাজের মেয়েটা রান্নাঘরের মেঝেয় বসে আটা মাখছে। রাতের রুটি হবে। ফ্রিজ খুলে অপর্ণা দেখে নিয়েছে, আনাজপাতি প্রায় কিছুই নেই। রান্না করা ডাল-ডালনাও নয়। দুদিন তাদের এসব খেয়াল ছিল না। কিন্তু আজ রাতে রাঁধতে হবে, খেতেও হবে—ভাবতেই গায়ে জ্বর আসছিল অপর্ণার। ঝিচ্ড়ি করলে ঝামেলা মিটে যেত। কিন্তু স্বাভাবিক বুদ্ধি তো কাজ করছে না মাথায়। ঝিচ্ড়ির কথা মনেই ছিল না।

মণীশ কি চলল? মণীশ চলে গেলে অপর্ণার কি করে চলবে?

আজ সব কাজ ফেলে রেখে অপর্ণার ইচ্ছে করছে কাউকে ডেকে গল্পটা শোনায়, তাদের প্রেম হয়েছিল কত অদ্ভুতভাবে, কী রোমান্টিকভাবে।

বৃষ্টির জন্যই দেবী হচ্ছে মেয়েটার, ভিজি আসবে বোধহয়। মেয়েটার সাইনাস, ঠাণ্ডায় এলার্জি, ইসিনোফেলিয়া খুব বেশী। বারবার জন্য দুদিন ধরে মেয়েটা কেঁদেছে আর ছুটেছে এখানে সেখানে। ঝুমকি বরাবর তার বাপের বেশী ন্যাওটা। এখনও বাপের হাতে ভাত খায়, বায়না করে, কোলে অবধি বসে।

মণীশ যদি চলে যায় তাহলে এ বাড়ির আলোটুকু, সুখটুকু, উত্তাপটুকু সব টেনে নিয়ে যাবে। এটা মণীশের দ্বিতীয় অ্যাটাক এবং ম্যাসিভ। ডাক্তার প্রথমে ছত্রিশ, তারপর আটচল্লিশ এবং তারপর বাহাত্তর ঘন্টার অনিশ্চয়তার সতর্কবার্তা দিয়েছেন। এগুলো কথার কথা। পদ্মপাতার জলের মতোই টলমল মণীশের আয়ু, অপর্ণা জানে।

শক্ত হওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছে অপর্ণা। কিন্তু মুঠোয় ধরবার মতো কিছু পাচ্ছে না। যথাক্রমে কুড়ি, আঠারো এবং চৌদ্দ বছরের তিন ছেলেমেয়ে তাদের। বয়সের অনুপাতে তিনজনই কিন্তু ছেলেমানুষ রয়ে গেছে। সংসারের কোনও আঁচ ওদের গায়ে লাগতে দেখনি অপর্ণা আর মণীশ। আজ ওরা সবচেয়ে বেশী অসহায়, দিশাহারা।

জলের মতো টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। মহার্ঘ টাকা, কিন্তু টাকার কথাটা একদম ভাবতে চাইছে না অপর্ণা। টাকাটা তো আসল নয়, মণীশই আসল। টাকার অপচয়ের কথা ভাবাও বোধহয় মণীশের প্রতি অসম্মান।

ভাবতে চাইছে না। তবু ঘুরে ফিরে মাছির মতো একই জায়গায় এসে বসেছে মনটা। কারণ আছে। গত কয়েক বছর মণীশ একটু টাকা ওড়াত্তিল। না, তার বাইরের কোনও দোষটোষ নেই। আসলে সে একটু বড়লোকের মতো থাকতে শুরু করেছিল। দামী জিনিসপত্র কিনে আনা, ভাল হোটেল আকাশ-ছোয়া দামে সপরিবারে গিয়ে মাঝে মাঝে খাওয়া, সেকেন্ড ক্লাসের বদলে ট্রেনের এ সি কামরায় বেড়াতে যাওয়া। এসব বড়লোকী লক্ষণের পিছনে মণীশের প্রথম জীবনের অভাব-কষ্টের স্মৃতি কাজ করে নিশ্চয়ই। কিছু টাকা হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে যেন সব পৃথিবী নিতে উঠে পড়ে লাগল সে। ইদানীং অপর্ণা লক্ষ করেছে, ছেলেমেয়ে এবং মণীশের মধ্যে একটা ভাব এসে গেছে—আমরা বড়লোক।

এই ভাবটাই মিথ্যে। মণীশের চাকরিটা চমৎকার। বহুজাতিক প্রথম শ্রেণীর কোম্পানিতে সে চাকরি করে। বিশাল মাইনে। কিন্তু সেটা মাইনেই। আমাপা, অফুরন্ত টাকা তো নয়। মাইনে মানেই দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ সমন্বিত টাকা। সীমাবদ্ধ। বৃদ্ধিমান মানুষ কখনও সীমাবদ্ধ টাকার ওপর নির্ভর করে বড়লোকী করতে যায় না। বড়লোকী করার জন্য যে টাকার প্রয়োজন তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ আর বেধ থাকে না। তা মাসের শেষেও আসবে না।

এসব মণীশকে বোঝানো খুব সহজ কাজ নয়। মণীশ অবুঝ ও অত্যন্ত অভিমানী। কথায় কথায় সে বিগড়ে যায়। অপর্ণা তাই মণীশকে শাসন করতে হলে করেছে আরেকের ছলে। বেশির ভাগ সময়ে ঘন আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে শ্বাসবায়ুতে

শ্বাসবায়ু মিশিয়ে বলেছে, শোনো, আমরা কিছু বড়লোক নই। টাকা উড়িয়ে দেওয়াটা কি খুব ভাল ? আমাদের না দুটো মেয়ে আছে, যাদের বিয়ে দিতে হবে ?

সঞ্চয়ের কথা, মিতব্যয়িতার কথা শুনলেই মণীশ চটে যায়। এসব হিসেবী কথা সে একদম সহিতে পারে না। ভবিষ্যতের ভাবনা তার একদম নেই। সে বলে, মেয়ের বিয়ে ফুঁয়ে হয়ে যাবে। আমি কত প্রভিডেন্ট ফান্ড আর গ্র্যাচুইটি পাবো জানো ?

অনেক বলেও মণীশকে এ ব্যাপারে লাগাম পরাতে পারেনি অপর্ণা। আর মণীশের ছায়াতে তিনটে ছেলেমেয়েও হল ওইরকম। টাকা-পয়সাকে টাকা-পয়সা বলে মনে করতে চায় না।

টাকা বোধহয় প্রতিশোধ নেয়। নার্সিং হোমের খাতায় প্রতিদিন মোটা টাকার অংক জুরের পারদের মতো ওপরে উঠে যাচ্ছে। ভাবতেও ভয় পায় অপর্ণা। এ সংসারে একমাত্র সে-ই বাস্তববাদী। সে একা। সে কখনও নিজেদের সীমাবদ্ধতা বিশ্বৃত হয় না। সে জানে, মণীশের চিকিৎসার সব খরচ দেবে তার কোম্পানি। সেজন্য চিন্তা নেই। কিন্তু মণীশ যদি না ফেরে ?

মণীশ না ফিরলে তার পিছনে চালচিহ্নের মতো বহুজাতিক সংস্থাটিও মুছে যাবে। এককালীন কিছু টাকা গছিয়ে দিয়ে কোম্পানি তাদের সম্পূর্ণ ভুলে যাবে। আর তখনই কি শুরু হবে টাকার প্রতিশোধ ?

চায়ের কাপে চামচে নাড়তে নাড়তে যখন সামনের ঘরে এল অপর্ণা তখন অনীশের মাথা ঝুঁকে পড়েছে বুকোর ওপর। নাক ডাকছে। খুব আদর করে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে অপর্ণা নরম গলায় ডাকল, বুবকা, ও বুবকা! চা খাবি না ?

অনীশ রক্তবর্ণ চোখ মেলে চাইল। তারপর লজ্জার হাসি হাসল।

ঝুমিয়ে পড়েছিলাম, না ?

ঝুমের আর দোষ কি ? যা যাচ্ছে আমাদের ওপর দিয়ে!

আর এক কাপ চা করে ফেলেছে অপর্ণা, কিন্তু ঝুমকি এখনও এল না। যদি দেবী করে তাহলে চা নষ্ট হবে। ঠাণ্ডা চা ফের গরম করে দিলে তা ছোঁবেও না। নতুন করে বানিয়ে দিতে হবে। অপর্ণার একটা কান উদ্‌গীরব রয়েছে ডোরবেল-এর জন্য। ঝুমকির বুক দুর্বল। সর্দিকশি জুরে খুব ভোগে। বড্ড রোগা। তবু নানারকম অকাজের ট্রেনিং নিচ্ছে। অনার্স ছাড়া বি এ পাশ করেছে। এম এ পড়ার উপায় নেই। গাদা শুষ্কের টাকা দিয়ে কমপিউটার এবং গান শিখছে। এই অপচয়টাও যদি রোধ করা যেত!

মাছিটা উড়ে উড়ে ঘুরে ফিরে একটা জায়গাতেই এসে বসছে। টাকা। অপর্ণা ভাবছে, টাকা কি প্রতিশোধ নেয় ? টাকাকে যদি অসম্মান, উপেক্ষা করা হয়, টাকাকে যদি যথোচিত মূল্য না দেওয়া হয়, তাহলে কি টাকা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে ?

অপচয় এবং অপব্যয়ে বাঁধ দিতে চেয়েছিল অপর্ণা। পুরোপুরি পারেনি। সঞ্চয়মুখী করে তোলার অনেক চেষ্টা করেছে, মণীশ হয়নি। শুধু আয়কর থেকে বাঁচতে প্রতি বছর এন এস এস আর এন এস সি-তে যা একটু-আধটু জমা হয়। কিছু টাকা জমছে জীবনবীমা-ব্যয়।

নিশ্চল বাড়িতে ডোরবেলের আওয়াজ প্রায় বজ্রাঘাতের মতো চমকে দিল অপর্ণাকে। ঝুমকি এল বুঝি! কত না জানি ভিজ্ঞ এসেছে মেয়েটা!

দরজা খুলল বুবকা। না, ঝুমকি নয়। অনুর বান্ধবী মোহিনী। চমৎকার দেখতে মেয়েটা। বাইরের চটক ততটা কিন্তু নেই। মোহিনীর সৌন্দর্য দেখতে হলে একটু মন দিয়ে দেখলে ধরা যায়। মুখ চোখ যেন সূক্ষ্ম সব যন্ত্র দিয়ে কমপিউটারে মাপজোখ করে তৈরি। কিন্তু মোহিনী খুব ফর্সা নয়, খুব লম্বা নয়। আলটপকা চোখে পড়ে না। কিন্তু মিষ্টি ধারালো মুখখানা আর ভারী পাতার নিচে ঢলঢলে দুখানা চোখ অপর্ণার খুব পছন্দ। একটাই দোষ, বড্ড ইংরিজিতে কথা বলে।

অপর্ণার বাড়িতেও একই অবস্থা। ঝুমকি বাদে বাকি দুজন প্রথম থেকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছে। ওরা বাংলা বলতে একটুও ভালবাসে না। মণীশও ওদের ইংরিজিকে আকর্ষণ প্রশ্রয় দেয়। আন্টি, কি খবর জানতে এলাম।

একইরকম। বোসো। এই ড্রেসটা কবে করালে ?

মোহিনী তার ঘাঘরা আর কামিজের নতুন পোশাকটাকে যেন হাত বুলিয়ে একটু আদর করে বলল, আমার বার্থ ডে ছিল তো গত মাসে। বাবা দিয়েছে।

বেশ পোশাকটা হয়েছে। ঘাঘরার তলয় রঙিন বলগুলো কি তোমারা লাগিয়ে নিয়েছে, না কি ওরকমই ?

এরকমই কিনতে পাওয়া যায়। বাবা বধে থেকে এনেছে।

তাই বলো। এখানে এখনও এসব ফ্যাশন চালু হয়নি।

মিষ্টি করে হাসল মোহিনী, খুশির হাসি।

তবে এই বৃষ্টির দিনে ড্রেসটা পরে ভাল করোনি।

মোহিনী অকপটে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, চট করে চলে এলাম তো, খেয়াল করিনি।

বোসো। চা খাবে ?

আমি তো খাই না। বলে আবার সেই মিষ্টি হাসি।

ওঃ, তাই তো। আসলে আমার এক কাপ চা বাড়তি হয়েছে। কী যে করি!

বুবকা বিরক্ত গলায় বলল, তোমার প্রবলেমগুলো এত ছোটখাটো কেন বলা তো মা! চা-টা আমাকে দিয়ে দাও। আঠারো বছরের ছেলেরা আজকাল ভোট দেয়। বুবকার আঠারো। তার মানে কি বুবকা সাবালক হয়ে গেল! এক কাপ চা বাড়তি হয়েছে, একখাটা বোধহয় মোহিনীর কাছে বলাটা উচিত হয়নি। যেন বাড়তি হয়েছে বলেই অফার করা হচ্ছে। বুবকা বোধহয় সেই কারণেই অপর্ণার ওপর বিরক্ত হল। আজকাল অপর্ণা কত কি শেখে ছেলের কাছ থেকে।

মোহিনী আসতেই এক ডাকে উঠে পড়ল অনু।

অপর্ণা মনে মনে এরকমই একটা কিছু চাইছিল। কেউ একজন আসুক। এই নিস্তরুণ বিষণ্ণ বাড়িটার ভারী বাতাস কেটে যাক কথায় বার্তায় হাসিতে।

অফিস থেকে লিজ নেওয়া এই ফ্ল্যাটটা বেশ বড় এবং স্ট্যাটাস সিগ্নল সবই প্রায় আছে। শুধু গ্যারেজে গাড়িটা নেই। আগের অ্যাসাসডারটা ভাল দাম পেয়ে বিক্রি করে দিয়েছে মণীশ গত মাসেই। একটা মারুতি ভ্যান কেনার কথা। দরাদরি চলছিল। দু-চার দিনের মধ্যেই এসে যেত। কিন্তু মণীশের অসুখটাই বাধা হল বোধহয়। অপর্ণা এরকম খুশি। তেলের যা দাম বাড়ছে, গাড়ি পোষার মানেই হয় না। মণীশ অফিসে যায় আসে পুল কার-এ। তবে গাড়িটা দিয়ে কি হয়? অপর্ণার শখ ছিল গাড়ি চালানো শিখবে। মোটর ট্রেনিং স্কুলে শিখেও ফেলল। লাইসেন্স দিয়ে দিল। আর তারপরই সে ভয়াবহ অ্যাকসিডেন্ট... অপর্ণা সে কথা আর ভাবতেই চায় না।

একটা নতুন আওয়াজ বজ্রাঘাতের মতোই ফের চমকে দেয় অপর্ণাকে, ভুল গুনছে না তো! করিডোরে টেলিফোন বাজছে নাকি? চার মাস ধরে টেলিফোন মুক ও বধির হয়ে ছিল। তারা ক্রমে ভুলে যাচ্ছিল টেলিফোনের কথা। পরশুদিনই ঝুমকি গিয়ে টেলিফোন অফিসে ধরে পড়েছিল, আমার বাবার ভীষণ সিরিয়াস অসুখ, আমাদের টেলিফোনটা ঠিক করে দিল।

এসব আবেদনে কাজ হয় কি?

টেলিফোনের আওয়াজে বুঝকা আর অনুও উঠে দাঁড়িয়েছিল। বিস্ময়ে।

অপর্ণাই গিয়ে সবার আগে ধরল।

হ্যালো।

আপনাদের লাইন ঠিক করে দেওয়া হল।

অপর্ণা বুঝভরা কৃতজ্ঞতা অনুভব করে বলে, কি বলে যে ধন্যবাদ দেবো। আমার স্বামী ভীষণ অসুস্থ, নার্সিং হোমে।

তাই টেলিফোনটা আমাদের এখন ভীষণ দরকার।

অসুখ আছে বলছেন! আচ্ছা ঠিক আছে।

লাইন এখন চালু থাকবে তো!

চেষ্টা তো আমরা সবসময়েই করি। মেশিন সব পুরানো, বুঝতেই পারছেন।

অপর্ণার অভিজ্ঞতা আছে। লাইন চালু হয়েই ফের বন্ধ হয়ে যায়। সে টেলিফোনটা রেখে আবার তুলল। ডায়ালটোন আছে। নিশ্চিন্ত।

বুঝকা উঠে এসেছে। টেলিফোন তুলে নিয়ে বলল, দাঁড়াও, নার্সিং হোমে একটা ফোন করি।

এই তো সন্ধেবেলায় দেখে এলি।

তবু। টেলিফোনটাও একটু বাজিয়ে নেওয়া যাবে।

বাড়ির সকলে যতক্ষণ না ফিরছে ততক্ষণ বস্তু নেই অপর্ণার। সন্দের পর একে একে ফিরতে থাকে সবাই। সকলে যখন ফিরল, কেউ বাকি রইল না, তখন বস্তু। অপর্ণা অস্বস্তি টের পাচ্ছে খুমকির জন্য। আটটা বাজতে চলল।

অফিসের বদান্যতায় তারা বেশ ভাল আছে। খুব ভাল আছে। বাইরে থেকে তাদের বড়লোক বলেই তাঁ ভাবে লোকে। কিন্তু ভাল থাকাকে বিশ্বাস করে না অপর্ণা। যেদিন পিছনে পেখম ধরার মতো মণীশের মস্ত নামজাদা অহংকারী কোম্পানি থাকবে না সেদিন ব্ল্যাকবোর্ডের লিখন মুছে দেবে সময়।

মণীশ বাড়ি করতে আগ্রহী ছিল না। ফ্ল্যাট কিনতে রাজি ছিল, তবে খুব অভিজাত কোনও পাড়ায়। কিন্তু তাতে যা টাকা লাগবে তা মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু মণীশ কেবলই বলেছে, হয়ে যাবে। টাকা ঠিক জুটিয়ে নেবো।

কিন্তু সেরকম জুটিয়ে নেওয়ার মানে অপর্ণা জানে। হয়তো এমন সোর্স থেকে টাকা জোগাড় করবে যাতে চড়া সুদ দিতে হয়। আর ফলে হাঁড়ির হাল হবে।

অন্যদিকে বুদ্ধি কতটা তীক্ষ্ণ তা অপর্ণা জানে না, তবে টাকা-পয়সার ব্যাপারে তার স্বাভাবিক মেধা খুবই বাস্তববাদী। সে মণীশকে ডুব-মরা হাত থেকে বাঁচাতে রোজ রাতে পইপই করে বোঝাতো। বুঝিয়ে বুঝিয়ে মুখে ফেনা তুলে অবশেষে মণীশ অতিশয় তাক্ষিল্য ও উপেক্ষার ভাব দেখিয়ে রাজি হল ইস্টার্ন বাইপাসের কাছাকাছি অপর্ণার মিনি মাসীর একটা চার কাঠা প্লট কিনতে। দাম খুবই সুসাদ্য। তখন ওপাশটায় লোকালয় নেই।

দু'বছর আগে জমিটা কেনা হয়েছে। মণীশ একবারও দেখতে যায়নি। ছেলেমেয়েরা দেখে নাক সিটকেছে। ওঃ, এই জায়গা!

এই তাক্ষিল্য ও উপেক্ষা মেনে নিয়েছে অপর্ণা। দেয়াল দিয়ে প্লটটা ঘেরা করিয়েছে।

মাঝে মাঝে সে ওই চার কাঠা জমির কথা ভাবে আর মনটা আনন্দে ভরে যায়। সব জায়গা থেকে উৎখাত হয়ে গেলেও তাদের জন্য ওই চারকাঠা জমি কোল পেতে থাকবে। সেখানে অনেক গাছ লাগিয়ে এসেছিল অপর্ণা। গাছগুলো হয়েছে। তাদের ঘিরে আগাছাও জন্মেছে অনেক।

আজ এই বিষণ্ণ সন্ধ্যায় অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ভাবনার মধ্যে তার কাছে একটা দ্বীপের মতো ভেসে উঠল ওই চারকাঠা জমি। মণীশ, তুমি জানো না, এখন কত হিসেব-নিকেশের দিন এল আমাদের।

মা! একটু চা হবে?

অনু খুব করুণ গলায় বলে।

অপর্ণা মৃদু ধমক দিয়ে বলে, খালি পেটে চা কিসের? আগে কিছু খেয়ে নে। পাঁউরুটি টোট করে দিচ্ছি।

না, কিছু খাবো না। অবেলায় খেয়ে বমি বমি লাগছে। চা দেবে মা?

মোহিনী তো চা খায় না, ওকে একটু মিষ্টি-টিষ্টি দে। দ্যাখ, ফ্রিজের বোধহয় আছে।

মোহিনী বলে, মাসিমা, আমার সঙ্গে ফর্মালিটি কিসের? মিষ্টি আমি খাই না।

ভূমি তো চা খাও না, কত ভাল ভূমি! আর দেখে অনুর এ বয়সেই চায়ের নেশা।
 টেলিফোনটা রেখে অনীশ রাগের গলায় বলে, ওরা কোনও ইনফর্মেশন দেয় না কেন বলো তো মা?
 কেন, কী বলল?
 বলল, পেশেন্ট স্টেবল, ঘুমোচ্ছেন।
 তাহলে তো ঠিকই আছে। আর কী ইনফর্মেশন চাস?
 ভূমি বুঝছে না। ফোন ধরেই বলে দিল। তার মানে বাবার কেবিনে গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে তো আর বলল না।
 সবাইকেই বোধহয় এরকম বলে দেয়। আমি বরং একবার গিয়ে ঘুরে আসি।
 দূর পাগল! এত অস্থির হওয়ার কী আছে? দু রাত নার্সিং হোমের চেয়ারে বসে কাটিয়েছিস। আজ একটু রিলাক্স
 কর।

মা, ভূমি নিজে রিলাক্স করতে পারছেো কি? বাবা যতক্ষণ না আউট অব ডেনজার হচ্ছে ততক্ষণ আমার রিলাক্স
 করার প্রশ্নই নেই।

টেলিফোনটা আবার বেজে উঠতেই আবার যেন বজ্রাঘাতে কঁপে ওঠে অপর্ণা। কী হল? ফোন বাজছে কেন?
 বুঝকা ফোন তুলল, কে?... ওঃ দিদি! তুই কোথা থেকে ফোন করছিস! অ্যাঁ!... নার্সিং হোম! তোকে কে বলল যে
 আমাদের ফোন ঠিক হয়ে গেছে?... ওঃ হ্যাঁ।

অপর্ণা শুক্ন হয়ে থাকে। কান ঝাঁ ঝাঁ করছে ভয়ে, উত্তেজনায।

কী বলছে রে ও?

বুঝকা হেসে বলে, দিদি নার্সিং হোমে চলে গেছে। ওখানে ওরাই বলেছে যে বাড়ির ফোন ঠিক হয়ে গেছে। তাই দিদি
 ফোন করছিল।

নার্সিং হোমে চলে গেছে! আর দেরি দেখে আমি এদিকে ভেবে মরাছি।

বুঝকা উদাস হাসি হেসে বলে, আমাদের এখন কোনও রুটিন নেই মা। মাথা কারও নর্ম্যাল কাজ করছে না।
 তোমারই কি করছে, বলো! মঙ্গলবার ওই দৃশ্য দেখার পর... ওঃ ইট ওয়াজ এ নাইটমেয়ার!

অপর্ণা চোখ বুজে শক্ত হয়ে যায়। প্রিয় মানুষের ব্যথা সহ্য করাই বোধহয় পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন কাজ। যখন বুক
 জুড়ে সেই ব্যথার বাঁশি বেজে উঠল মণীশের, সে শুধু চিংকার করেছিল অপু... অপু... বাঁচাও... মরে যাচ্ছি...

বুক মথিত করা সেই ব্যথা। যেন এক মত্ত মাতঙ্গ পায়ের তলায় পিষে ফেলেছে ওর বুক। দুটো চোখ ঠেলে বেরিয়ে
 আসছিল, বঁকে যাচ্ছিল মুখ। সে যেন নিত্যকার চেনা মণীশ নয়। এ যেন অন্য মণীশ।

কিছুক্ষণ তারা সকলেই শুধু 'কি হল কি হল' বলে উদ্ভ্রান্ত আচরণ করেছিল। সবার আগে স্বাভাবিক বুদ্ধি ফিরে পেল
 অপর্ণা। সে দৌড়ে বেরিয়ে গিয়ে উল্টোদিকে বাড়ির ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনল। তিনি সাধারণ ডাক্তার। হার্ট স্পেশালিষ্ট
 নন। কিন্তু প্রাথমিক একটা সামাল দিয়েই বললেন, ইমিডিয়েটলি হাসপিটালাইজ করুন। কেস সিরিয়াস।

আজও সেই ঘোষণার ধাক্কা তারা সামলে উঠতে পারেনি। আজও যেন মণীশের সেই ব্যথা এ স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

হঠাৎ ডোরবেল বেজে উঠলে, কেউ জোরে কথা বললে, হঠাৎ দমকা বাতাস বয়ে গেলে কেন যে ধক করে ওঠে
 অপর্ণার বুক! সামান্য শব্দই বজ্রপাতের মতো চমকে দেয় তাকে। আর অপর্ণার চারদিক যেন এক। পাড়ার লাগা অবশেষে।
 রিয়ালিটি ব্যাপারটা সে ঠিক টের পাচ্ছে না। প্রাণপণে সে স্বাভাবিক থাকতে চাইছে। ঠিকঠাক পেরে উঠছে না। অভিনয়
 করে যাচ্ছে। রাতে একা ঘরে সে কেন টের পায়, মণীশের বুক-জোড়া গহন ব্যথা গুমরে বেঁড়াচ্ছে ঘরময়? এরকম ভাবা
 কি স্বাভাবিক?

এত ভয় করে! এত একা লাগে! এত দৃষ্টিভঙ্গি আসে মনে! কাজের মেয়েটা আগে বস্তা পেতে সামনের ঘরে শুতো।
 তাকে এখন শোওয়ার ঘরের মেঝেতে শোওয়ায় সে।

প্রথমবার মণীশের হৃদযন্ত্র বিনীত ভাবেই তার অক্ষমতা জ্ঞাপন করতে শুরু করেছিল বছর দুই আগে। সেবার খুব
 মারাত্মক হয়নি। নার্সিং হোমেও যেতে হয়নি। ব্যথাও উঠে যায়নি চৌদুনে। সেদিন সকালে অফিস যওয়ার সময় খুব
 হাঁসফাঁস, শ্বাসকষ্ট, বুক ব্যথা নিয়ে অফিসে যাওয়ার পোশাক সমেত বিছানায় শুয়ে চারদিক যেন এক। পাড়ার লাগা অবশেষে।
 বলেছিল হার্ট স্পেশালিষ্ট ডাক্তার। বড় ডাক্তার এসে মণীশকে বিছানার বাইরে এক পাও নড়তে, সিগারেট ও স্নেহযুক্ত বা
 মশলাদার খাবার খেতে বারণ করেছিলেন। দিন দশেক শয্যা নিয়ে ছিল মণীশ। সিগারেট ছাড়ল, খাওয়া-দাওয়ার নিয়ন্ত্রণ
 মেনে নিল। সেবার তারা সবাই মণীশের অনিচ্ছাভা নিয়ে এমন দিশাহারা হয়ে যায়নি। ভেবেছিল, ঠিক হয়ে যাবে।

দশ দিনের মধ্যেই সামান্য ডিগবাজি খাওয়া হৃদযন্ত্র ফের ঠিকঠাক চলতে শুরু করে। মণীশ ফিরে আসে স্বাভাবিক
 কাজকর্মে। দু'বছর লম্বা সময়। মণীশের হৃদযন্ত্রের কথা আর কারও মনে থাকেনি। মণীশেরও না। রুটিনমাসিক মাঝে
 মাঝে ই সি জি করা হত। কোনও বেচাল পাওয়া যেত না তাতে।

প্রথমটা ছিল প্রোলগ মাত্র। নেহাতই ভূমিকা। পায়তারা। বহাফেট। লড়াইটা তখন শুরুই হয়নি।

দ্বিতীয়া এল দিগ্বিজয়ী ঘোড়সওয়ারের মতো। সারা পৃথিবী জুড়ে তার দাপট। বুড়ো-বাচ্চা, ধনী-নির্ধন, পাবলিক-ডি
 আই পি সকলেই নতজানু তার কাছে। হার্ট অ্যাটাক—এ দুটি শব্দ যেন দামামা বাজিয়ে দেয় বুকো।

কে জানে কেন, হার্ট অ্যাটাক কথাটা অপর্ণার ভাল লাগে। একটা স্পর্ধিত আভিজাত্য, একটা অমোঘ পরিণতির ধ্বনি
 আছে তাতে। অথচ কী সর্বনেশে ব্যাপার। একটা হার্ট অ্যাটাক মানে কত জন মানুষের কত কী বন্ধ হয়ে যাওয়া।

মণীশ যদি চলেও যায় তাদেরও কত কী বন্ধ করে দিতে হবে। প্রথমেই বন্ধ হবে সব বিলাসিতা, বাহলা, বড়লোকী।
 তারপরও হিসেব করে টিপে টিপে চলা শুরু হবে। এখন যেমন তাদের ছেলেমেয়েরা পাতে মাছ বা ভাত ফেলে উঠে যায়,
 অপ্রয়োজন ফ্যাশনের জিনিস কিনে উড়িয়ে দেয় টাকা, অন্যায্য বায়না করে বসে, ঠিক তেমনটি তো আর হবে না!

মোহিনী উঠে এল রান্নাঘরের দরজায়, মাসীমা, যাচ্ছি। আক্সল তো এখন আউট অফ ডেনজার, তাই না?

কে জানো বাবা! ভূমি কিন্তু রাজ এসো।

আমি প্রায় রোজই আসি। তবে টিউটর পড়তে আসেন তো সন্ধ্যাবেলায়, তাই এ সময়টায় আসা যায় না।
যখন খুশি এসো। আমি তো বাড়িতেই থাকি।
মোহিনী চলে গেল। আচমকা অপর্ণার মনে হল, আচ্ছা, মোহিনীর সঙ্গে অনীশের কোনও গোপন ভাবসাব নেই তো ?
আঠারো বছরের ছেলে, চৌদ্দ বছরের মেয়ে!

১৫ ১১

দোকানটায় ঢুকতে একটু লজ্জা করছে হেমাঙ্গর। প্রায় রোজই সন্দের দিকে এসে হানা দিচ্ছে, একটা জিনিসই রোজ খুঁটিয়ে দেখছে এবং রোজই নানা নতুন প্রশ্ন করছে জিনিসটা সম্বন্ধে—এতে ওরা বিরক্ত হচ্ছে কি ?

অবশ্য কোনও দোকানদারই হেমাঙ্গর ওপর বিরক্ত হয় না। যারা মোটামুটি ভাল দোকানদার তারা লোকের মুখ দেখেই অভ্যস্তরকম বুঝে নিতে পারে। এ দোকানটায় দত্ত বলে যে লোকটি আছে তার সঙ্গে সামান্য আলাপ হয়ে গেছে তার। ধৈর্যশীল দত্ত রোজ তাকে মাইক্রোওয়েভ সম্পর্কে জ্ঞানদান করে। ছাত্রের মতো শেখে হেমাঙ্গ। আর জিনিসটাকে অত্যন্ত পরীক্ষামূলক চোখে দেখে। পরশু দত্ত একটা লাইভ ডেমন্স্ট্রেশন দিয়ে দেখিয়েছে, মাইক্রোওয়েভে বাস্তবিকই ছ'মিনিটে ভাত রান্না হয়। এবং তার ফ্যান গালবার দরকার হয় না। চাল আগে থেকে ভিজিয়ে রাখতে হয়। জলটা মেপে দিলে ফ্যান শুধে ভাত ঝরঝরে হয়ে যায়। ঠাণ্ডা চায়ের কাপটি মাইক্রোওয়েভে রাখলে মাত্র কয়েক সেকেন্ডে চা আতুন-গরম হয়ে যায় এবং চায়ের স্বাদগন্ধে কোনও অস্তিত্ব বদল ঘটে না। মিয়ানো মুড়ি বা ন্যাতানো বিস্কুট ফের নতুন মুড়ি আর টাটকা বিস্কুট হয়ে ওঠে। ফ্রিজের ঠাণ্ডা জিনিস কয়েক সেকেন্ডে হয়ে যায় পাইপিং হট। সবচেয়ে অদ্ভুত হল, মাইক্রোওয়েভে জিনিসটাই গরম হয়, কিন্তু পাত্রটি নয়। যত দেখছে তত মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে হেমাঙ্গ। যত মুগ্ধ হচ্ছে ততই লজ্জিত হয়ে পড়ছে ভিতরে ভিতরে। এই সব জিনিস—অত্যাধুনিক সব যন্ত্রপাতি বা ভোগ্যপণ্যের ছলাকলায় সে যে কেন এত সহজে বশ মানে তা সে ভাল বুঝতে পারে না। মদ মেয়েমানুষ মারিজুয়ানা কি এর চেয়ে বেশী বিপজ্জনক ?

খুবই কুণ্ঠিত পায়, প্রায় নববধূর মতো সে প্রকাণ্ড দোকানঘরটায় ঢুকল। দিব্যি শিশু এর দরজা। ভিতরটা ঠাণ্ডা এবং শব্দহীন। থরে থরে শুধু জিনিস আর জিনিস। যথেষ্ট খন্দেরের ভিড়।

দত্তই তাকে প্রথম দেখল। বোধহয় শিকারীর চোখে অপেক্ষা করছিল তারই জন্য। দত্তর অভিজ্ঞ চোখ হেমাঙ্গর নির্মোহ এবং প্রতিরোধ ভেদ করে দেখতে পাচ্ছে, ভিতরে ভিতরে হেমাঙ্গ ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ছে। হার মেনে নিচ্ছে। দু'মাস আগে এই দত্তই তাকে ওয়াশিং মেশিনটা গছিয়েছিল, ঠিক একইভাবে। ধীরে ধীরে। অপেক্ষা করে করে। সুতো ছেড়ে ছেড়ে। আপনজনের মতো, বালাবন্ধুর মতো ব্যবহার করে করে। আর ওয়াশিং মেশিনটাও নীরবে নিবেদন করেছিল তার হৃদয়, যদিদং হৃদয়ং তব, তদিদং...

আরে, আসুন স্যার। গুড ইভনিং।

ওই দুর্দান্ত শার্ট লোকটা আসলে মাকড়সা। তার চারদিকে এই সব অত্যাধুনিক জিনিসপত্রের মায়াজাল পাতা। আর হেমাঙ্গ নিয়তি-নির্দিষ্ট সেই পতঙ্গ। নইলে স্বপ্নেও হেমাঙ্গ কিছু কম শার্ট নয়। নিজস্ব স্বপ্নে সেও তো লোককে হিপনোটাইজ করে। তবু এইসব ভোগ্যপণ্যের কাছাকাছি এসে যে কেমন যেন এলিয়ে পড়ে। কেমন যেন আনশার্ট, লজ্জাতুর, আত্মবিশ্বাসহীন লাগে নিজেকে।

জিনিস কিনতে সে ভীষণ ভালবাসে। অথচ খামোখা যে এত জিনিস কিনে ঘরে জঞ্জাল বাড়ানো উচিত নয় এটাও সে ভালই জানে। জিনিস কেনা নিয়ে বিভিন্ন মানুষের কাছে তাকে যথেষ্ট ভরসনা সহ্য করতে হচ্ছে। মনের এই দ্বন্দ্বিক প্রতিক্রিয়া—টু বি অর নট টু বি—তাকে কাহিল করে ফেলছে কি ? তাই দত্তের মুখোমুখি সে গোবেচারার মতো দাঁড়িয়ে আছে আজও।

দত্ত সামান্য উঁচু গলায় ডাকল, গৌরী, প্রীজ মিস্টার চট্টরাজকে একটু আ্যাটেন্ড করো।

সাইনবোর্ডের মতো মিষ্টি মেকানিক্যাল হাসি মুখে বুলিয়ে গৌরী এল, আসুন স্যার। মাইক্রোওয়েভ তো!

ওই আর কি! বলে হেমাঙ্গর মনে হল, কথাটার আদ্যন্ত কোনও মানেই হয় না। সে ভিতরে ভিতরে এত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হয়ে পড়ছে যে, ভেবেচিন্তে সাজিয়ে-গুছিয়ে কিছু বলছে না।

ডিসপ্রেস সারকেলে চূড়ান্ত পোজ নিয়ে চারখানা মাইক্রোওয়েভ তাকে একযোগে কটাফে বন্ধ করল।

গৌরী-নাম্নী মেয়েটি বলল, আপনি কিন্তু স্যার এটাই পছন্দ করে রেখেছেন। দিস ওয়ান ইজ দ্যা বেস্ট। ফুল্লি অটোমেটিক, ব্রুনিং করা যায়, টাইমার আছে।

এ সবই হেমাঙ্গর মুখস্থ। সে সোফায় বসে গৌরীর মুখের দিকে সম্মোহিতের মতো চেয়ে থেকে অন্যমনস্ক হাতে ব্রিফকেস খুলে চেকবই বের করল।

কত যেন একজাতি ফিগারটা ?

উনিশ হাজার একশো...

সম্পূর্ণ আনমনা হাত চেকের ওপর অংকটা লিখল এবং সেই করল, তারপর সেটা ছিড়ে মেয়েটার হাতে দিল। সবটাই করল তার হাত। সে নয় যেন।

থ্যাক্স ইউ স্যার, আপনার সঙ্গে কি গাড়ি আছে ?

আছে।

গাড়িতেই তুলে দেবো তো! নাকি কাল হোম ডেলিভারিতে পাঠিয়ে দেবো ?

না না, গাড়িতে তুলে দিন।

ভারী একটা স্বস্তিবোধ করে হেমাঙ্গ। যেন কিছুদিন ধরে একটা টেনশন ও টানাপোড়েন চলছিল মনে মনে। এই ট্রানজাকশনটা হয়ে যাওয়ার পর সে হালকাবোধ করছে। ব্রিফকেসটা বন্ধ করল তার দুটি হাত। হাতই, সে নয়।

জ কুঁচকে সে ব্রিফকেসটার দিকে একটু চেয়ে থাকে। সিঙ্গাপুর থেকে কিনেছিল। আসল গুন্ডি। এই ব্রিফকেসটাও তাকে ঠিক এরকমই টেনশনে ফেলে দিয়েছিল। কেনার পর শান্তি।

দণ্ড এগিয়ে এল।

হয়ে গেল স্যার ?

কুমালে ঘমাক্ত মুখ মুছে হোমাস বলে, শুনেছি মাইক্রোওয়েভে খুব কমপ্রেস হয়। এদের সার্ভিস ভাল তো!

এ প্রেড। তাছাড়া আমরা তো আছিই। কিছু হলে আমাদের কাছে কমপ্রেস করবেন, উই উইল সি টু ইট।

হোমাস জানে, তাই মাইক্রোওয়েভে বিশেষ কমপ্রেস হবে না। প্রথম প্রথম কয়েকদিন শখ করে ব্যবহার করবে বটে, তারপর পড়ে থাকবে। যেমন তার অন্যান্য জিনিস রয়েছে পড়ে। মোটর ড্রিভন ক্যামেরা, ওয়াশিং মেশিন, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, দুটো ফ্রিজ, দুটো টিভি, দুটো ভি সি আর, এগারোটা ব্রিফকেস, আরও কত কী!

বাড়িটা পাওয়া গিয়েছিল খুব বরাতজোরে। তাদের অনেক বাড়ি কলকাতায়। বেশীরাভাগ বাড়িতেই বহু পুরনোকালের ভাড়াটেরা পনেরো বিশ খ্রিস্ট চল্লিশ টাকা ভাড়ায় বসে আছে। কাউকেই নড়ানো সম্ভব নয়।

আচমকা এই একখানা বাড়ি থেকে এক বহু পুরনো ভাড়াটে চলে গেল। হোমাস তার বাবাকে গিয়ে বলল, বাড়িটা আমায় দেবেন ? আমি থাকব।

তার মানে ? আলাদা হতে চাও নাকি ?

না। তবে একটু হাত-পা খেলিয়ে থাকব।

কেন এই এত বড় বাড়িটায় তোমার হাত-পা খেলানোর জায়গার অভাব হচ্ছে নাকি ?

কথাটা ঠিক। তাদের বিশাল দুই মহলা বাড়িতে জায়গার অভাব নেই। হোমাসরা ছয় ভাই, চারজনই বিয়ে করেছে। প্রত্যেকেরই একাধিক কান্ডাবাচ্চা। তবু জায়গার সমস্যা নেই। সামনের দিকের বাড়িটায় হোমাস তিনখানা ঘর নিয়ে যথেষ্ট হাত-পা খেলিয়ে থাকে। তবে অসুবিধে একটাই, বাড়িতে তার অভিভাবকের সংখ্যা বড্ড বেশি। পাঁচ ভাই-ই তার বড়। তাছাড়া বাবা, বাবার ওপরে বিরানব্বই বছর বয়সী দাদু, বিধবা এক পিসি, এক ব্যাচেলর কাকা, মা, এক বিধবা কাকীমা, খুড়তুতো এক দাদা, তার নিজের এক অবিবাহিতা দিদি—সবাই তার অভিভাবক। ফলে প্রাপ্তবয়স্ক ও স্বাধীন হয়ে ওঠা তার কপালে হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু কথাটা তো বাবাকে বলা যায় না। সে খুবই বিনয়ের সঙ্গে বলল, বাড়িটা ফাঁকা ফেলে রাখা ঠিক হবে না। আজকাল বাড়ি ফাঁকা রাখলে জোর করে লোক ঢুকে পড়ছে।

হোমাসর বাবা দুর্গানাথ খুবই অবাক হয়ে বললেন, এ খবরু আবার কোথায় পেলে ? এটা কি মগের মুল্লুক বলে তোমার ধারণা ?

দুর্গানাথ যে খুব কড়া ধাতের লোক তা নয়। বরং রসসরসিকতার দিকেই তাঁর পক্ষপাত এবং স্বভাবে খানিকটা শিথিলতাও আছে। আবার অন্যদিকে অতিকায় ক্ষুরধার বুদ্ধি ও প্রবল পরিশ্রমী। তিন পুরুষের একটি ব্যবসাকে প্রায় একা হাতে ধরে রেখেছেন এবং ফলাও করে তুলেছেন। পশ্চিমবঙ্গের কারখানাগুলিতে শ্রমিক-অশান্তির যে প্রাবল্য রয়েছে, ধর্মঘট-ধীরে চলো-লকআউট ইত্যাদি দুর্গানাথের প্রাণ তৈরির কারখানায় নেই। কোনও অশান্তি নেই তাদের সার্জিক্যাল গুডসের দুটি এবং ওষুধের একটি দোকানেও। সবই নিখুঁতভাবে চলছে। সামান্য অশান্তি দেখা দিলেই দুর্গানাথ সেটিকে গোড়াতেই মেরে দেন। খুব জোরালো যুক্তি ছাড়া দুর্গানাথকে কজা করা অসম্ভব। হোমাস রণে ভঙ্গ দিল। জোরালো যুক্তি তার ছিল না, শুধু একা স্বাধীনভাবে থাকার একটি প্রবল ইচ্ছা ছিল মাত্র।

গড়চা বাই লেনের বাড়িটার মালিক যে তারাই এটা হোমাসরা ভুলেই গিয়েছিল এরকম। ভাড়াটে তোলায় নিষ্ফল চেষ্টা তারা কোনওদিন কোনও বাড়ির জন্যই করেনি। কিন্তু এই বাড়িটার ভাড়াটে মহিমবাবু একদম একা হয়ে গেলেন হঠাৎ। ছেলেমেয়ে দুজনেই অস্ট্রেলিয়ায়, হঠাৎ তাঁর স্ত্রী-বিয়েগ ঘটল। একা বাড়িতে থাকতে পারছিলেন না। তখন ছেলে এসে স্থায়ীভাবে বাবাকে অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে গেল। তাঁদের যথেষ্ট টাকা, বাড়িটা নিয়ে তারা কোনও ঘোঁট পাকাতে চায়নি।

কিন্তু মুশকিল হল, বাড়ি খালি হওয়ার পর নানা লোক আসছে ভাড়া নেওয়ার জন্য। দুর্গানাথ বিরক্ত হচ্ছেন। আসছে দালাল, রাজনীতির লোক, লোকাল মস্তান। একখানা আস্ত দোতলা বাড়ি খালি পড়ে থাকা সমীচীনও নয়। কলকাতায় যখন এত স্থানভাব।

দুর্গানাথ একদিন হোমাসকে ডেকে বললেন, তুমি না গড়চার বাড়িটায় থাকতে চেয়েছিলে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তোমার মতলবখানা কী ?

হোমাস একটু আশার আলো দেখতে পেয়ে বলল, আজ্ঞে আমার একটু নিরিবিলিতে থাকার শখ।

এ বাড়িতে কি সবাই তোমাকে উত্তাক্ত করে ?

না, তা কেন ? আসলে এখানে ঠিক প্রাইভেসি নেই তো। লোকজন আসছে যাচ্ছে।

গড়চার বাড়িটা আমার আর ভাড়া দেওয়ার ইচ্ছে নেই। খালিও ফেলে রাখা যাচ্ছে না। তুমি সেখানে গিয়ে থাকতে পার। তবে একটা শর্ত আছে।

শর্ত! শর্ত কিসের ?

তুমি এখনও ব্যাচেলর। তোমার পক্ষে একা থাকা বিপজ্জনক। তুমি বরং চট করে বিয়েটা সেরে ফেল, তারপর বউ নিয়ে ও বাড়িতে গিয়ে থাক।

আতঙ্কিত হোমাস বলল, আমার ও বাড়িতে যাওয়ার আর কোনও ইচ্ছে নেই বাবা। আমি এখানেই বেশ আছি।

দুর্গানাথ ছেলের অবস্থা দেখে হাসলেন, বিয়ের কথায় ভয় পেয়ে গেলে দেখছি।

আজ্ঞে আমি ওনাদের খুবই ভয় পাই।

শুনেছি মহিলাদের সম্পর্কে তোমার একটু অ্যালার্জি আছে। নারীর প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা এবং তাঁদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখা খুবই ভাল। কিন্তু আতঙ্ক থাকা ভাল নয়। তোমার এই স্বভাবের জন্য তোমার মা-ও কিছু চিন্তিত। থাকগে, তা হলে বিয়েটা করতে চাইছ না ?

আজ্ঞে না।

গড়চার বাড়িটা বেশ বড়ই। ওপর নিচে বোধহয় সাত-আটটা ঘর। এতগুলি ঘর নিয়ে একাই থাকবে ?

যে আজ্ঞে! একা থাকা আমার খুবই প্রিয়।

দুর্গানাথ একটু হেসে বললেন, গড়চার গলির মধ্যে বাড়ি বলে তোমার বিবাহিত দাদারা কেউই ও বাড়িতে যেতে চাইছেন না। তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ফ্ল্যাটও ফাঁকা পড়ে আছে। বাধ্য হয়ে এখন তোমাকেই পাঠাতে হবে দেখছি। তা ওখানেই রান্নাবান্না হবে, নাকি এ বাড়িতে এসে খেয়ে যাবে! সকালের চা ইত্যাদি করে দেওয়ারও তো লোক চাই।

আজ্ঞে লোক রাখলে একা থাকার ব্যাপারটা নষ্ট হয়ে যায়। রান্না আমি নিজেই করে নেবো।

বলো কি ? রান্না নিজে করে নেবে!

চেষ্টা করলে পারব।

পুরুষ মানুষ রাঁধে এ তো কশ্মিনকালেও শুনিনি।

হোমস্ অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, বাবা, দুনিয়ার যত বড় বড় হোটেলের ওস্তাদ রাঁধুনীরা সবাই পুরুষ।

দুর্গানাথ একটু হেঁচট খেয়ে গেলেন এ কথায়। বললেন, তা বটে। খোয়াল ছিল না। মহাভারতের ভীমসেনও মস্ত রাঁধুনী ছিলেন। কিন্তু তুমি কি পারবে ? সবাই সব কিছু পারে না। তোমার মা শুনলে তো মুর্ছা যাবেন। ভাল করে ভেবে দেখ।

আমি ভাল করে ভেবে দেখছি। একা থাকব এবং নিজের সব কাজ নিজেই করে নেবো।

ঘর খাঁট দেওয়া, বাসনমাজা এসবও করবে নাকি ?

ওসবের জন্য একজন ঠিকে লোক রাখলেই হবে।

তার দরকার নেই। বুড়ো দারোয়ান ফটিক আউট হাউস থাকে। ও সব করে দেবেখন।

হোমস্ অবাক হয়ে বলে, ও বাড়িতে দারোয়ানও আছে নাকি ?

ছিল না। বাড়ি খালি হয়ে যাওয়ার পর ফটিককে কারখানা থেকে ওখানে বদলি করেছি। পাহারা না রাখলে বিপদ। ফটিক বিশ্বাসী লোক, সে তোমাকে ডিটার্ভ করবে না। ফটিকের পাশে একটা কুঠরিমতো আছে। একা মানুষ, সেখানেই দিবা থাকে। তোমার হঠাৎ একা থাকার বাই যে কেন উঠল কে জানে! শুনেছি তুমি কিছুটা বায়ুশস্ত, সত্যি নাকি ?

আপনাকে কে বলেছে ?

তোমাকে যারা অহর্নিশ লক্ষ করে তাদেরই এরকম ধারণা।

হোমস্ সামান্য অভিমানী গলায় বলল, আমাকে অহর্নিশ লক্ষ করাটা কি সকলের উচিত ? সেইজন্যই তো আমি একা থাকতে চাই।

তোমাকে লক্ষ করা হয় লক্ষ করার মতো কিছু আচরণের জন্যই। সেইসব আচরণ যদি একা থাকলে বেড়ে যায় ?

আমি কি অ্যাবনরমাল বলে আপনার ধারণা ?

দুর্গানাথ ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলেন, আরে না না। অল্পবিস্তর অ্যাবনরমাল আমরা সকলেই। বাড়াবাড়ি না করলেই হল। আমি তো অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ, তাই সন্তানরা কে কেমন হল তা লক্ষও করি না, মাথাও তেমন ঘামাই না। এ ব্যাপারে যাবতীয় চিন্তা থেকে তোমাদের মা, কাাকা আর দাদু আমাকে অনেকদিন আগেই দিয়েছেন। তাই তোমরা আমার কাছে কিছুটা অচেনা রয়ে গেছ। সেইজন্যই কথাগুলো বলতে হল। আর একটা কথা, ও বাড়িতে যাওয়ার ব্যাপারে তোমার মা আর কাকার মতামত নেওয়াটাও দরকার।

হোমস্ জানে, সেটাই শক্ত কাজ। খুবই শক্ত।

মা শুনেই বলল, ওসব চিন্তা মাথা থেকে তাড়া। কিছুতেই তোকে আমি একা থাকতে দেব না। পাগল নাকি ?

হোমস্কে আবার পিছোতে হল। হতাশ এবং ব্যর্থ। সে প্রাপ্তবয়স্ক, উপার্জনশীল এবং যোগ্যতাসম্পন্ন একজন মানুষ হওয়া সত্ত্বেও এ বাড়িতে তার প্রতি নাবালকের মতোই আচরণ করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে মা। মায়ের কাছে থেকে সে কখনোই পূর্ণবয়স্ক মানুষের মর্যাদা আদায় করতে পারেনি।

মানুষের জীবনে নানা ধরনের দুঃখ থাকে। হোমস্‌র জীবনে এইটেইছিল সাংঘাতিক দুঃখ। মাথার ওপর এতগুলো অভিভাবকের ভার সে আর বহন করতে পারছিল না। নিজেকে তার মনে হত ইঁটচাপা ঘাস। বিবর্ণ, খর্বটু, ভবিষ্যৎ-হীন।

হঠাৎ হোমস্‌র ভাগ্যাকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হল। কিছুদিন বাদে খবর এল গড়চা বাই লেনের বাড়িটার একজন দাবীদার উঠেছে। লোকটা বলছে, তার কাাকা মহিমাবাবু বাড়িটা আদৌ ছাড়েননি, বরং তাকেই থাকতে দিয়ে গেছেন। বাড়ির তার কাকার ব্যবহৃত জিনিসপত্রও কিছু আছে।

কথাটা মিশ্র নয়। বাস্তবিকই মহিমাবাবুর খাট আলমারি চেয়ার টেবিল ইত্যাদি কিছু জিনিস তাড়াভাঙিতে বিলিব্যবস্থা করা যায়নি বলে ফেলেই গেছেন তিনি। দুর্গানাথকে বলে গেছেন, ওগুলোর একটা গতি যেন তিনিই করেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, লোকটি সত্যিই মহিমাবাবুর ভাইপো। সে পাড়ার লোক এবং একজন পাকা উকিলের সহায়তায় বাড়ি দখলের জন্য নানা হুজুত শুরু করে দিল। তালা ভেঙে ঢোকার চেষ্টাও হল একটা। পুলিশ এসে, কিন্তু কেমন যেন গা-ছাড়া ভাব তাদের।

দুর্গানাথ বিপদ বুঝে একটা পারিবারিক মিটিং ডেকে বললেন, বাড়ির পজেশন নেওয়াটাই আইনের বড় কথা। অবিলম্বে বাড়িতে লোক তোকানো দরকার। হোমস্‌ যখন স্বেচ্ছায় ওখানে থাকতে চাইছে তখন ওকেই পাঠানো হোক।

মা অবশ্য বৈকে বলল, হাস্যামার মধ্যে ছেলেকে পাঠানো কেন ? ও কি ভেসে এসেছে ? যদি ওকে মারে ?

বিস্তৃত বিতর্কের পর শেষ অবধি হেমাঙ্গই জয়টিকা পরল। পরদিন বাস্ত্র-বিছানা নিয়ে গিয়ে সে গড়টা বাই লেনের বাড়ির দখল পত্তন করল। সঙ্গে পাড়ার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব। বন্ধুরা অবশ্য সাময়িকভাবে সঙ্গ দিতে গিয়েছিল।

মহিমাবাবুর ভাইপো এক সপ্ত তিড়িংবিড়িং করেছিল বটে, কিন্তু ডাহা একটা মিথ্যা দাবী নিয়ে বেশিদূর এগোতে পারল না। দিন সাতেক বাদে সে নিরস্ত হল।

সেই থেকে হেমাঙ্গ এক সুখী ও একা মানুষ। দোতলায় চারখানা শোওয়ার ও একখানা বড় বসবার ঘর নিয়ে বিশাল ফ্ল্যাটে সে থাকে। একতলাটা কিছুদিন ফাঁকা থাকার পর তার সেজদা গৌরঙ্গ সেখানে একটা সাউন্ড রেকর্ডিং স্টুডিও করে; সেটা চলল না। এরপর টিভি সিরিয়ালের সেট হিসেবে সেটা ভাড়া দেওয়া হয় কিছুদিন। তারপর বিয়েবাড়ি হিসেবে ভাড়া দেওয়া হতে থাকে। অবশেষে ওটা এখন তাদের গুদামঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হেমাঙ্গ এখন নিশ্চিন্ত। সে এখন নিরঙ্কুশ একা।

একা বটে, কিন্তু উৎপাতহীন নয়। তার পৈতৃক বড় বাড়িটা বিভিন স্ট্রিটে হলেও, তার সেজদা শীলা বউল রোড এবং পিসতুতো দিদি চারুশীলা গোপালপার্কে থাকে। তারা সময় অসময়ে এসে হাজির হয় এবং যথেষ্ট হামলা মাটিয়ে যায়। প্রথম প্রথম বিভিন স্ট্রিট থেকে গাড়ি হাঁকিয়ে মা বা ছোড়দি চলে আসত। আজকাল সেটা বন্ধ হয়ে হয়েছে। কিন্তু এই দুই দিদির খবরদারি বন্ধ হয়নি। হেমাঙ্গর প্রত্যেকটা শ্বাসপ্রশ্বাস অবধি এরা দুজন বিভিন স্ট্রিটে ফোন করে জানিয়ে দেয়।

এই যে তার ফিয়াট গাড়ির ডিকিতে মাইক্রোয়েভের বাস্কেট নিয়ে সে বাড়ি ফিরছে এটা দু'একদিনের মধ্যেই রাষ্ট্র হয়ে যাবে। ফি রোববার সে বিভিন স্ট্রিটে মাকে দেখতে যায়। আর তখন কৃতকর্মের জন্য তাকে শতক গল্পনা ওনতে হয় নানাজনের কাছে। মাইক্রোয়েভ তাকে যথেষ্ট বেগ দেবে।

হেমাঙ্গ কি বোঝে না যে এত জিনিসপত্র কোনও কাজের নয়? অবুঝ হেমাঙ্গর ভিতরে একজন যুক্তিবাদী হেমাঙ্গও বাস করে। যুক্তিবাদী হেমাঙ্গ ভালই জানে, এই সব জিনিসপত্র কেনা মানে দুর্লভ অর্থশক্তির অপপ্রয়োগ মাত্র। অবুঝ হেমাঙ্গ বলে, আরে, আয় তো দু'দিনের। যা ইচ্ছে যায় তা করে নেওয়াই ভাল।

ডিকি থেকে বাস্কেটটা ওপরে তুলে দিল ফটিক। ফটিক একটি বেশ লোক। হেমাঙ্গর সব কথাতেই সে সায় দেয় এবং যথেষ্ট খাতির করে। ফটিকের বয়স ষাটের ওপর এবং হেমাঙ্গর বয়স ত্রিশের নিচে হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক আছে।

বাস্কেট খুলে জিনিসটা বের করে রান্নাঘরের তাকে রেখে প্রাণ লাগিয়ে হেমাঙ্গ বলল, জিনিসটা দেখেছ ফটিকদা?

ফটিক সবিস্ময়ে চেয়ে থেকে বলে, রান্নাঘরে টিভি দিয়ে কি হবে দাদাবাবু?

এটা টিভি নয়। মাইক্রোয়েভ। এতে রান্নাবান্না হয়। বসে দেখ।

ফটিক উবু হয়ে বসল। তার চোখের সামনে চোখের পলকে ফ্রিজের ঠাণ্ডা খাবার গরম করে ফেলল হেমাঙ্গ। পোঁপার সেকল। বিনা জলে আলু সেদ্ধ করল।

দেখলে?

ই রে বাবা! এ তো দেখছি অশৈলী কাণ্ডকারখানা! দোয়া নেই, শব্দ নেই, তা হলে কী হল কাণ্ডখানা!

মাইক্রোয়েভ হল পৃথিবীর নতুন বিস্ময়। আলট্রা মডার্ন জিনিস।

তাই তো দেখছি।

ফটিকের জিনিস এত কম যে সেটাও হেমাঙ্গর কাছে বিস্ময়। ফটিকের সঞ্চল মাত্র একটা তোলা উনুন, একখানা কড়াই, একটি হাড়ি আর থালা। একটা ঘটি, একটা বালতি, একখানা মগ ও একটা গামছা আছে তার। আছে দুটি লুঙ্গি, দুখানা ধুতি আর দু'দিনেরো জামা। আসবাব বলতে একটা ছোট টৌকি। এ সবই খুব খুটিয়ে লক্ষ করেছে হেমাঙ্গ। ফটিকের কাছে অনেক কিছু শেখার আছে তার। ফটিকের অতি ছোটো ঘরটা গিয়ে মাঝে মাঝে বসে হেমাঙ্গ। চারদিকে চেয়ে ফটিকের একাবোকা সংসার দেখে। এরকমভাবেও মানুষের তো চলে যায় বেশ!

১৬

ন'পাড়ার ছেলেরা তাকে পেলে কেন মারবে তা ঠিক ঠিক বলতে পারবে না পটল। বোধহয় সে নিতু, নন্দ আর গৌরঙ্গর বন্ধু বলে। ন'পাড়ার তাপসকে ওরা কদমতলায় ইকুলে পথে তিনজনে মিলে মেরেছিল। সে দলে পটল ছিল না। কাজটা ভালও করেনি ওরা। মারপিট ন'পাড়ার বদনাম আছে। মারপিট হয়ে যাওয়ার পরদিন কলোনিতে হামলা করেছিল অন্তত বিশ জন ছেলে। হাতে রড, লাঠি, ডাগার অবধি। বড়রা বেরিয়ে মাঝখানে পড়ে মিটমাট করে নেয়। কলোনির লোকও জানে ন'পাড়া গুণের জায়গা। তাই কেউ গা-জোয়ারি দেখায়নি। কিন্তু বাইরে থেকে মিটলেও আসলে ব্যাপারটা মেটেওনি। নিতু, নন্দ আর গৌরঙ্গ দু'দিন ইকুলে কামাই দিয়েছে, তারপর গোসাঁইপাড়া ঘুরে অনেক দূর হেঁটে ইকুলে যাচ্ছে। পটল অত জানত না। মারপিটের পরদিন কদমতলার কাছে কিছু ছেলে তাকে ভাড়া করে, বাঁশ চালিয়ে সাইকেল সমেত তাকে ফেলেও দিচ্ছিল। তার এই পুরনো সাইকেলখানা সেদিন পক্ষিরাজের মতো না উড়লে মার খেয়ে পিসে যেত পটল। আর কিছু না জানুক পটল সাইকেলটা জানে। এ গায়ে সাইকেলের গুস্তাদ হিসেবে তার নাম আছে, লোকে বাহবা দেয়। তাও এই ঝাঁ-কুরকুর সাইকেল। পেত যদি একখানা এস এল আর বা স্পোর্টস সাইকেল তাহলে আরও কত কী দেখাতে পারে পটল।

ন'পাড়া যেমন ভয়ের তেমনই আরও কিছু ভয়-ভীতির জায়গা আছে তার। ওই যে পঞ্চাননের ইটভাঁটি। ও রাস্তাটা তাকে এড়িয়ে চলতে হয়। পঞ্চানন ঘোষের কাছে ইট বাবদ এখনও সাতশো টাকা বাকি। পটলকে দেখলেই ডেকে তার বাপের উদ্দেশে খারাপ খারাপ কথা শোনায়।

এ সব এড়িয়ে, চোখ কান খোলা রেখে চললে এ জায়গা যে কত সুন্দর তা জানে পটল আর গোপাল। গোপাল কখনও মুখ ফুটে বলতে পারবে না, কত সুন্দর এই গ্রামখানা। গোপালের চোখ থেকে সেটা বুঝে নেয় পটল। গোপাল পাখি—৪

পাখির ডাক শুনতে পায় না, ঝিঝির ডাক শুনতে পায় না, সাইকেলের ঘণ্টি শুনতে পায় না। তার বোবা আর কালা পাঁচ বছর বয়সী এই ভাইটি তবু অনেক কিছু টের পায়। সবচেয়ে বেশী টের পায় বিপদ। তাদের দুই ভাইয়ের ঘরে আর বাইরে অনেক রকমের বিপদ থাকে রাজ। মায়ের মেজাজ বিগড়ালে, বাবা মাতাল হয়ে ফিরলে, কাকীমার সঙ্গে মায়ের ঝগড়া লাগলে, কাকার সঙ্গে বাবার লেগে গেলে তাদের দুই ভাইয়ের ওপরেও কিছু ঝাল ঝাড়া হয়ে থাকে। ইদানিং বটতলার কয়েকটা লোক বাবার বন্ধু জুটেছে। সেটাও এক বিপদ, কারণ লোকগুলো এলেই তাকে বাবার খোঁজে বেরোতে হয়, নয়তো নিতাইকাকাকে গিয়ে খবর দিতে হয়। নিতাইকাকা হল এ গাঁয়ের গান্ধীবাবা। সকলের ভাল করে বেড়ায়, ঝগড়া-কাজিয়া থামায়, সবাইকে ভাল হতে বলে। নিতাইকাকা গাঁটগচ্ছা দিয়ে অনেকের সাহায্য করে, মড়া পোড়াতে যায় আর বকুতাও দেয় মাইকে। তবু নিতাইকাকার মতো লোক থাকতেও বটতলায় বদমাইশি বাড়ছে, মদের টেক হচ্ছে, ন'পাড়ার ছেলেরা কলোনিতে ঢুকে মারপিট করে যাচ্ছে, চুরি ডাকাতি হচ্ছে, ব্র্যাক হচ্ছে।

গান্ধীবাবাই কি পেরেছিল? এই যে দেশ ভাগাভাগি হল বলে তাদের যে সোনার দেশ ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল, তখন গান্ধীবাবা কাদেনি? আর সুভাষ বোস? আর শ্যামাপ্রসাদ? আরও কে নেন? সব ঠিকঠাক জানে না পটল। তবে এরকমই সে শুনেছে বটে তার ঠাকুর্দা আর বাবার কাছে।

তবে সাইকেল চালানোর সময় বেশী ভাবতে নেই। ভাবলেই বিপদ। চোখ কান একেবারে সজাগ রাখতে হয় রাস্তার দিকে। এ গাঁয়ের রাস্তাঘাট সব তার চেনা। সবসময় রাস্তা ধরে সাইকেল চালায় না পটল। তাতে অনেক ঘোরা পড়ে যায়, আর তাতে বাহাদুরীও নেই। বটতলার পানুর দোকান থেকে কেনা বনস্পতির বাটিটা তার বাঁ হাতে ধরা, ডান হাতে সাইকেলের হ্যান্ডেল, রঙে গোপাল শক্ত হয়ে বসে আছে দু'হাতে হ্যান্ডেল ধরে। এই অবস্থায় সে বটতলার শীতলার থানের বাঁ দিকের রাস্তা ছেড়ে ঘোষপাড়ার মাঠে নেমে পড়েছে। চষা ক্ষেতের মতো উঁচু-নিচু আর ঢিবিতে ভর্তি মাঠ। বর্ষার জলে হড়হড়ে হয়ে আছে কাদা। চাকা বসে যায়, এক জায়গায় ঘুরতে থাকে। কত কী হয়। পটল বলেই পারে। গোসাঁইপাড়ায় ঢুকবার মুখে দুধারে দু-দুটো পুকুর, মাঝখানে ক্ষয়া, পিছল, সর্ব একখানা রাস্তা। খুব ওস্তাদ সাইকেলবাজও এ রাস্তায় চালাবে না। নেমে হেঁটে পার হবে। পটল ঠিক পেরিয়ে যায়।

আজও পেরোচ্ছিল। কাল থেকে বৃষ্টি হয়নি। তবে আকাশ মেঘলা হয়ে থম ধরে আছে। ফ্যাকাসে মেঘ। কতকাল রোদের দেখা নেই। একটা দিন বৃষ্টি হয়নি বলে কাদাটা আঁট হয়ে আছে। আঁট কাদা আরও বিপদের জিনিস।

বাঁ ধারের পুকুর থেকে একটা সাপ উঠে ডানধারের পুকুরে নামতে যাচ্ছে। সেটা দেখতে পেয়েই বোধ হয় গোপাল গলায় একটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ তুলে সাবধান করছে তাকে। গোপাল ওভাবেই জানান দেয় বিপদের কথা, ঝিদের কথা, আনন্দের কথাও। ওই শব্দটাই তার স্বপ্ন।

সাপকে বাঁচিয়ে চলার কোনও ইচ্ছেই নেই পটলের। সাপগুলো মহা খচ্চর। দু-দুটো পুকুর ভর্তি হাজারো জলটোঁড়া চারাপোনা আর ছোটো মাছ সব খেয়ে ফেলে। গাঁয়ের লোক সাপ মারে না বলে ঝাড়েবংশে সাপগুলো বেড়েছে কম নয়। একটা দুটো মরলে কি যায় আসে। তাছাড়া হঠাৎ ব্রেক কমলে সাইকেল উল্টে দুজনকে নিয়ে পুকুরে পড়বে। পটল ভয়াক করে সাপের পেটের ওপর দিয়ে পেরিয়ে গেল। পিছু ফিরে দেখার উপায় নেই, সামনে সর্ব রাস্তা। এক চিলতে জায়গা দু-দুটো চাকাকে সমান রেখে পেরোতে হবে। পৃথিবীর কঠিনতম কাজের একটা।

সমস্ত চৈতন্য আর চোখ আর মন একাধি রেখে রাস্তাটা শেষ করে এনেছিল প্রায় পটল। কিন্তু গোপাল তবু অস্ফুট শব্দটা করেই যাচ্ছে। ঘোঁৎ ঘোঁৎ। অন্য কেউ হলে গোপালের ওই বোবা শব্দকে গ্রাহ্যই করত না। কিন্তু পটল জানে, তার এই অবোধ ভাইটাকে লোকে যা ভাবে তা নয়। সে চোখ রাস্তা তুলে এক ঝলক সামনের দিকটা দেখবার চেষ্টা করল।

দেখল, নীল শার্ট পরা কে একজন দাঁড়িয়ে আছে পথের শেষ দিকটায়। কচুবনের আড়ালে তার নিচের অংশ ঢাকা। তার মুখটা দেখতে পেল না পটল।

কিন্তু শক্ত আর জোরালো ঢিলটা সোজা এসে তার বাঁ চোখের নিচে লাগতেই মাথা অন্ধকার হয়ে গেল তার। সাইকেল টলে গেল।

পুকুরেই পড়ত পটল। সাইকেলের সামনে চাকা ডাইনে বাঁয়ে ভয়ংকর মোচড় খেল। কিন্তু মাথার অন্ধকারটা এক ঝাঁকিতে কাটিয়ে নিল পটল। তারপর প্রাণপণে প্যাডেল মারল। দুটো গর্ডের মতো উঁচু-নিচু জায়গা ঝকাং ঝকাং করে পার হয়ে সোজা নীল জামার দিকে সাইকেলখানা বাড়িয়ে দিল সে।

হুড়মুড় করে কচুবনে গিয়ে আটকাল তার সাইকেল। ততক্ষণে নীল জামা পরা ছোকরাটি হাওয়া হয়েছে। আর বাঁ চোখের কোলথেকে টপটপ করে রক্ত ঝরে পড়ছে জামায়, বনস্পতির বাটিতে।

সাইকেলটা কাত হয়ে থেমেছে। বাঁ পা বাড়িয়ে পড়ে যাওয়া আটকেছে পটল। ভয় খাওয়া মুখটা তার দিকে ফিরিয়ে চেয়ে আছে গোপাল।

ন'পাড়ার ছেলেটা একাই ছিল। দল জুটিয়ে আসেনি। ভাগ্যিস। তাই একখানা ঢিলের ওপর দিয়ে গেছে। পটল নেমে গোপালকে নামাল। তারপর সাইকেলখানা শুইয়ে রেখে পুকুরের জলে মুখের রক্ত ধুয়ে নিল। বনস্পতির বাটিটাও চুবিয়ে নিল জলে। বনস্পতি শক্ত জিনিস। জলে খুলে ক্ষয় হয় না।

গোপাল তার দুটো অবাক চোখে চেয়ে আছে। গোলগাল, ন্যাদারোঁদা ভাইটাকে দেখে বড় মায়াল হয় এখন। ঢিলটা ওরও লাগতে পারত। ভাগ্যিস ছোকরার হাতের টিপটা ভাল, তাই গোপালের লাগেনি।

পটলের রাগ হল না। রাগের চেয়ে অনেক বেশী তার ভয়। ততক্ষণে গোপাল আর সাইকেল সমেত তার জলে হাবুডুবু ঝাওয়ার কথা।

সাপটা খুব দাপাচ্ছে এখনও। মরেনি। এক চুলও এগোতে পারেনি। দাপাতে দাপাতে ওখানেই এক সময়ে মরে পড়ে থাকবে। ওই পাপেরই কি নগদ সাজা পেয়ে গেল পটল!

সাইকেল দাঁড় করিয়ে গোপালকে ফের রওডে তুলে দিল পটল। তার ক্ষতস্থান খুব জ্বালা করছে, ফুলে উঠেছে এর মধ্যেই। চারদিকটা খুব ভাল করে দেখে নিল সে। এ দিকটায় পতিত জমি, আগাছা আর জঙ্গল। গোসাঁইপাড়া আর একটু এগিয়ে। পথটা খুব নির্জন।

কালঘড়ি না কি একটা জিনিস দেখেছে দাদু। সে জিনিস দেখলে লোকে নাকি আর বেশিদিন বাঁচে না। তার বাবা রামজীবনের যত দোষ থাক, কিন্তু নিজের মা-বাপকে বড় ভালবাসে। তাই নিয়ে বাড়িতে নানা অশান্তি হয়। কিন্তু মা-বাপের ওপর আর কারও কথাকে গ্রাহ্য করে না রামজীবন। দাদু মাঝে মাঝে নানারকম বায়না করছে আজকাল। দিন তিনেক আগে পুলিশিঠে খেতে চাইল। বর্ষাকালে পিঠে করে না কেউ। তবু হল। আজ সকালে ঠাকুমাতে বলল, দুখানা লুচি করে দেবে? ঠাকুমা ধমক দিয়েছিল, কিন্তু বাবা বলল, না না, করে দাও। বুড়ো মানুষ, ভাল-মন্দ কিছু তেমন খাওয়াতে পারি না।

দাদু লুচির জন্য দাওয়ায় বসে আছে। আটা মাখা হচ্ছে। দেখে এসেছে পটল। আর দেরি করা ঠিক হবে না।

পটল সাইকেলে উঠে প্যাডেল মারতে লাগল। পিছনের চাকায় পাশ্প কিছু কম বলে মনে হচ্ছে। গনার দোকানে আগে পাশ্প করতে পয়সা লাগত না। আজকাল দশ পয়সা করে নিচ্ছে। একটা পাশ্পার হলে...।

না, তাদের অত ফালতু পয়সা নেই।

বাড়ির দাওয়ায় যখন সাইকেলখানা ঠেস দিয়ে দাঁড় করাল পটল, তখন ফের রক্ত পড়ছে। তার খয়েরি জামার বাঁ দিকটায় মস্ত দাগ ধরেছে।

দরজার বাইরে থেকেই রান্নাঘরের ভিতরে বাটিটা ঠেলে দিয়ে পটল বলল, মা, এই যে লুচি ভাজার ঘি।

মা পৌস করে উঠল, লুচি খাওয়ার ইচ্ছে হলে বড়লোক ছেলের বাড়ি গিয়ে থাকলেই তো হয়। তিন দিনেই তো বড় গিল্লির মেজাজ সপ্তমে উঠেছিল। ঘাড় ধাক্কা দিতে পারলে বাঁচে। উঁচু বাড়িতে থাকলেই হল বুঝি! মনটা উঁচু করতে হয় না? বড় ঘরের কুলুঙ্গিতে হাতকাটা তেল আছে। শিশিটা নামিয়ে কাটা জায়গায় তেলটা লাগাতে গিয়ে পটল টের পেল, ক্ষতটা বেশ গভীর। বাঁ দিকের গোটা মুখখানাই ফুলে বিষিয়ে আছে।

গোপাল তার হাঁটু ধরে দাড়িয়ে উর্ধ্বমুখ হয়ে দেখছে। সব সময়ের তার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, সব টের পায়, শুধু কথা কইতে পারে না। ওনতেও পায় না কিছু।

হাঁটু গেড়ে বসে গোপালের করুণ মুখখানার দিকে চেয়ে হেসে পটল বলে, কিছু হয়নি রে। সব ঠিক হয়ে যাবে।

লুচি ভাজার একটা উচাতন গন্ধে চনমন করে উঠল বাতাস। এই কচুঘেচুর সংসারে এমন বিদেশী গন্ধ বড় একটা পাওয়া যায় না। নাক উঁচু করে গন্ধটা নিল পটল। গোপাল শব্দ টের পায় না বটে, গন্ধ কিন্তু পায়।

দাদু উদাস মনে দাওয়ায় জলটোকিতে বসে আছে। লুচি হচ্ছে। কিন্তু লুচির দিকে যেন ততটা মন নেই। সকালে লুচির কথা মনে হয়েছিল, এখন যেন ভুলে গেছে সে কথা। পাকা বাড়ির কংকালটার দিকে চেয়ে আছে।

দাদুর কাছাকাছি গিয়ে দাওয়ায় বসল পটল। কাছ ঘেষে গোপাল। লুচির ভাগ তারাও পাবে। সঙ্গে কিছু থাকতে পারে। না থাকলেও কিছু অসুবিধে নেই। শুধু শুধু লুচিও খেতে চমৎকার।

ও দাদু!

কি রে?

লুচির গন্ধ পাচ্ছে?

বিষ্ণুপদ মাথা নাড়ে, পাচ্ছি। হচ্ছে বুঝি?

বাঃ, হবে না! ঘি নিয়ে এলাম বটতলা থেকে।

বেশ বেশ।

তুমি কি এবার মরে যাবে?

আর কি! এবার গেলেই হয়। বাড়িটা হলে বেশ হত।

হবে তো! মিস্তির আসবে।

তোকে কে বলল?

শুনেছি।

বিষ্ণুপদ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, পারবে রামজীবন? শেষ অবধি পারবে তো! সাপটা যে ফণা তুলে আছে! কখন ছোবলাবে তার তো ঠিক নেই কিনা।

সাপ! কোন সাপের কথা বলছো?

মরণের কথা রে। যে শালা সারাটা জীবন ফণা তুলে রইল। সাপের ছায়া লম্বা হয়ে পড়ে আছে আমাদের ওপর। কবে কখন মজি হবে, দেবে ছুবে। তা সেই সাপের ছায়ায় বসে তো, কিছুই নিশ্চয় করে বলা যায় না। মানুষের সব ঠাট-ঠমক তার কাছে বড় জড়।

পটল কথাটা ভাল বুঝল না। চুপ করে রইল। সামনেই তাদের পাকা বাড়ি আদখানা উঠে থেমে আছে কবে থেকে। পঙ্কজান ঘোষ আর ইউ দেবে কি? সাতশো টাকা এখনও বাকি। তবে কয়েক বস্তা সিমেন্ট এসেছে কয়েকদিন আগে। পটল যতদূর জানে, এ চোরাই সিমেন্ট। বটতলার গিরীনের চায়ের দোকানে কাজ করে পাঁচু। সেই বলেছে, একটা সিমেন্টের ট্রাক লুট হয়েছে কদিন আগে। পুলিশ এল বলে।

পুলিশ এখনও আসেনি। আসবে কিনা কে জানে। বাড়িটার ওপর দাদুর খুব টান।

তুমি কী একটা জিনিস যেন দেখেছো দাদু! কালঘড়ি না কী যেন।

কত কী দেখি। মানে বুঝতে পারি না। বুঝলি! তাদের যেমন মানে-বই আছে, শব্দের অর্থ, বাক্যের অর্থ দেওয়া থাকে, ঠিক তেমনি একখানা মানে-বই থাকলে ভাল হত। আজকাল তো কত সরল জিনিসকেও ভারি গোলমালে লাগে। হ্যাঁ রে, বটতলা থেকে তোর বাবার খোঁজে কারা সব আসে? তারা কি ভাল লোক?

না দাদু। খুব হেক্কোড় মানুষ সব।

কথাটা কী বলি? হেক্কোড় না কি? ওটার মানে কি?

সবাই বলে ওরা সব হেক্কোড়। খারাপ লোক।

কিসের খারাপ করে তারা?

কে জানে! চাউনি দেখলে ভয় ভয় করে।

তা হবে। আগে দুনিয়ায় এত খারাপ লোক ছিল না। এখন খুব হয়েছে, না রে?

পটল মাথা নেড়ে বলে, সবাই ওদের খুব ভয় খায়। খাতির করে চলে।

বিষ্ণুপদ একটা শ্বাস ফেলে বলে, ওই বাস রাস্তাটা না হলেই ভাল ছিল। যতদিন হয়নি ততদিন গণ্ডগোল ছিল না।

যখন প্রথম এসেছিলাম দেশ থেকে তখন কেবল চাষাভুষার রাজত্ব। এক পাল এসে এখানে সেখানে বাঁশ গেড়ে বেড়া তুলে বসে গেলাম। ক্রমে জমিজিরেত একটু হল। কষ্ট ছিল, কিন্তু তেমন ভয়ভর ছিল না।

চোর ছিল না?

খুব ছিল। চোর ডাকাত সব ছিল। তবু ভয় ছিল না। কেন জানিস? এমন মদ আর জুয়ায় ছয়লাপ ছিল না চারদিকে। চোর ডাকাত বাইরে থাকবেই। সে থাকুক। ভয়টা হল, চোর ডাকাত যখন ভিতরে হয়ে ওঠে।

সেটা কেমন?

বললেই কি বুঝতে পারবি? চোর ডাকাতেরা আগে বাইরে থেকে আসত। আজকাল সব গা ঘেঁষেই বসত করে। এমন কি আমাদের মধ্যেই গজিয়ে ওঠে।

মেজো বউ রাঙা লুচির থালা নিয়ে বিরক্ত মুখে দাওয়ায় উঠে এসে বলল, লুচি খাবেন তো! বসুন।

বিষ্ণুপদ একটু অবাক হয়ে বলল, অবেলা হয়ে যাবে না?

খেতে চাইলেন যে!

ক'টা বাজে জানো?

ন'টা বাজে বোধ হয়। নিন, গরম আছে।

বিষ্ণুপদ তবু হাত গুটিয়ে থাকে। আমতা আমতা করে বলে, তোমার শাওড়ি কোথায় গেল?

দোকানে পাঠিয়েছি। ফোড়নের সর্ষে আনতে গেছে। থালাটা ধরুন, আমার মেলা কাজ পড়ে আছে।

ওদের দেবে না?

ওরা সকালে ভাত খেয়েছে।

দু'খানা করে দাও। এখান থেকেই দাও। এ তো মেলা লুচি দেখছি, একটা পল্টনের খোরাক।

আপনার ছেলে হুকুম দিয়ে গেছে যেন সাধ মিটিয়ে খাওয়াই। কম করতে ভরসা হয়নি, তাহলে তো এসে কিলোবে।

বিষ্ণুপদ লুচির থালাটা ধরে থাকে। রাঙা চলে যাওয়ার পরও ধরে থাকে। খায় না। ইচ্ছেটা মরে গেছে।

ও দাদু, খাও।

কি জানি কেন, খেতে ইচ্ছে যাচ্ছে না। তোর ঠাকুমাকে ডাকবি একটু?

লুচি দেখেই বোধ হয় একটু চঞ্চল হয় গোপাল। ঘন ঘন ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে। ওই শব্দ ছাড়া আর কিছু জানে না।

মাতাল রামজীবন মাঝে মাঝে মধ্যরাত্রে ছেলেটাকে ঘুম থেকে তুলে বড্ড মারে। মারে আর বলে, কথা ক' হারামজাদা, কথা বের কর মুখ থেকে। বোবা হয়ে আমাকে জন্দ করবে ভেবেছো শালা? মারের চোটে তোরমুখ দিয়ে কথা বের করে ছাড়বো।

তারপর পেটায় আর পেটায়। কেউ থামাতে পারে না। সারা বাড়িতে হলুহুল পড়ে যায়।

আর অত মারের চোটেও কান্দতে পারে না গোপাল। শুধু গো গো শব্দ করে, আর ফোঁপায়। আর কাঁপে। থরথর করে কাঁপে।

মাও মারে। যখন তখন মারে। গোপালের কোনও বায়না নেই। তবে খিদে আছে। খিদে পেলে জিনিস ভাঙে।

লাফায়। ছোট্টাছুটি করে বিপদ ডেকে আনে। তখন মারে মা।

গোপালকে বোঝে শুধু পটল। আর কেউ নয়। বড় হলে সে গোপালকে নিয়ে দূরে গিয়ে থাকবে। এ বাড়িতে থাকবে না। এদের সঙ্গে থাকবে না।

দাদু লুচি ভাগ করে দিল দুজনকে। দুটো করে।

দুপুরে রামজীবন ইরফান মিস্ত্রিকে নিয়ে ফিরল। খুব কথা হচ্ছিল দুজনে। ইরফান পাকা ঘরখানা ঘুরে ফিরে দেখছে।

কত দিনে পারবে ইরফান?

বাদলাটা না ছাড়লে তো কঠিন হবে রামজীবন!

তাই যদি হবে তো তোমাকে ডাকলুম কেন? ভূমি গুস্তাদ লোক, খাড়া করে দাও।

ভারী জল না হলে হয়ে যাবে। নইলে বালি সিমেন্ট সব ধুয়ে যাবে। পয়সা বরবাদ।

হবে না কিছুতেই?

ইরফান দোনোমোনে করে বলে, ডবল খাটনি না পড়ে যায়। বালি সিমেন্ট সব রেডি আছে?

এনে ফেলব।

ইট ভিজিয়ে রাখবেন। রবিবার এসে হাত লাগাব। একটু কাগজ-কলম দিন। ইট সিমেন্ট আর বালির হিসেবটা লিখে দিয়ে যাই। লোহার শিক, বাঁশ এসবও লাগবে।

সে তো খোকাটিও জানে! লেখো, লিখে দিয়ে যাও।

রামজীবন চান করতে গেল। পটল দুনিয়া ভুলে ইরফানের কাছ ঘেঁষে বসে রইল।

মাটি থেকে ইঁট। ইঁট সাজিয়ে বাড়ি। একটা থেকে আর একটা, তা থেকে আর একটা কেমন হয়ে ওঠে। পটলের বড় ভাল লাগে। মাটি থেকে ইঁট। ইঁট থেকে বাড়ি।
আবার সেই বাড়িও পুরনো হয়। ভেঙে ভেঙে পড়ে। মাটিতে মেশে। মাটি হয়ে যায়। আবার মাটি থেকে ইঁট। ফের ইঁট সাজিয়ে বাড়ি।

১৭

পৃথিবী কি দাড়ি কামায় বাবা ?

না না, পৃথিবী মোটেই তার খোঁচা খোঁচা দাড়ি কামাতে চায় না। কিন্তু মানুষ বারবার জোর করে তার খেউরি করে দিচ্ছে। পৃথিবীর দাড়ি হল সবুজ। যদি আকাশের অনেক ওপরে কোনও স্যাটেলাইটে বসে দেখে, তাহলে দেখবে ওই সবুজ কত সুন্দর! গ্লোরিয়াস গ্রিন। আর কোনও গ্রহই এত সুন্দর নয়।

তুমি কি করে দেখতে পাও বাবা ?

আমি চোখ বুঝে ভিসুয়লাইজ করি। আমাদের মোটে দুটো চোখ, তা দিয়ে তো অত দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু কল্পনাশক্তিও আর একরকম চোখ। তা দিয়েও দেখা যায়। কিরকম জানো ? কালো মিশমিশে আকাশে সবুজ আর নীলে মেশানো একটা স্লিক্ত মুখ। মাথায় বরফের সাদা চুল, গলায় বরফের সাদা একটা বো।

চোখ বুজলে আমিও দেখতে পারো ?

নিশ্চয়ই পারে। তুমি তো ছোটো, তোমার ইমাজিনেশন আরও ভাল। তুমি সহজেই পারবে।

কিন্তু পৃথিবীর দাড়ি কামানোর কথাটা বললেনা!

পৃথিবীর দাড়ি হল তার গাছপালা, শস্যক্ষেত্র। একমাত্র পৃথিবী ছাড়া দৃশ্যমান কোনও গ্রহে প্রাণের লেশমাত্র নেই। তাই পৃথিবী তুলনাহীন। প্রাণহীন নিখর সৌরমণ্ডলে শুধু এই একটা গ্রহেই গাছ জন্মায়, জীবজন্তু ঘুরে বেড়ায়, মানুষ কথা বলে। কিন্তু এই গ্রহের সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণীটিই সবচেয়ে বেশী বোকা। সে পৃথিবীর সবুজ দাড়ি কামিয়ে দিতে চাইছে আর ডেকে আনছে সর্বনাশ। সে ব্রাজিলের রেন ক্রেস্ট থেকে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল সব জায়গা থেকেই কেটে নিচ্ছে গাছ। গাছ কেটে বসতি বানাচ্ছে, কলকারখানা বসচ্ছে, কাঠ পুড়িয়ে আগুন জ্বালচ্ছে, কাঠ দিয়ে আসবাব আর ঘরবাড়ি বানাচ্ছে। গাছ কাটছে, কিন্তু সেই পরিমাণে গাছ বসচ্ছে না। এইভাবে চলতে থাকলে একদিন স্যাটেলাইট থেকে দেখা যাবে, কালো আকাশে যে সুন্দর ঢলঢলে নীলচে সবুজ হাসি-হাসি মুখখানা ভেসে থাকত সেটা একেবারে পাঁপুটে হয়ে গেছে। বুঝতে পারলে ?

কেন এরকম হবে বাবা ?

তুমি সব ঠিকঠাক বুঝতে পারবে না। শুধু জেনে রাখো, গাছ কাটা খুব খারাপ। জঙ্গল উড়িয়ে দেওয়া খুব খারাপ। পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখছে গাছপালা। পৃথিবীর গাল থেকে ওই সবুজ দাড়ি কখনও কামিয়ে ফেলা উচিত নয়। যখন বড় হবে তখন তোমার যেন কথাটা মনে থাকে।

কৃষ্ণজীবনের সঙ্গে তার ছোট ছেলে দোলনের খুব ভাব। এতটা ভাব কৃষ্ণজীবনের সঙ্গে আর কারও নয়। দোলনের মধ্যে সে নানা ভাবে নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছে। তার মত, তার চিন্তা, তার যত জ্ঞান। বারো বছরের দোলনের অত বুঝবার ক্ষমতাই নেই। তবু সে বাবাকে গ্রহণ করার প্রাণপণ চেষ্টা করে। দোলন বোধহয় টের পায় সে ছাড়া কৃষ্ণজীবনের আর কোনও বন্ধু নেই।

কথাটা ঠিক। কৃষ্ণজীবনের তেমন কোনও বন্ধু নেই, যাকে সে সব কথা উজাড় করে বলতে পারে। তা বলে কৃষ্ণজীবনের যে অনেক কথা বলার আছে তাও নয়। তার মুখে যেমন কথা খুব কম, তার ভিতরেও তেমন কথা খুব কম। তার মন ও মস্তিষ্ক দুটোই কিছুটা বোবা।

সাত তলার ওপর একটি সুন্দর ফ্ল্যাটে কৃষ্ণজীবন থাকে। এ তার নিজস্ব ফ্ল্যাট। সে ও তার স্ত্রী রিয়া এই ফ্ল্যাটের যুগ্ম মালিক। অথচ কেন কখনও এই ফ্ল্যাটটা তার নিজস্ব বলে মনে হয় না ? কেন নিজস্ব বলে মনে হয় না তার আর দুটি সম্ভান ও স্ত্রীকে ?

এক অজ পাড়াগাঁয়ের উদ্বাস্তু বসতির ভাঙা ঘর থেকে এতদূর এসেছে সে। কিন্তু নিজের সবটুকুকে আনতে পারা গেছে কি ? সবটুকু কৃষ্ণজীবন কি আনতে পারল ? না বোধহয়। টেনে হিচড়ে আনতে গিয়ে কৃষ্ণজীবনের খানিকটা পড়ে রইল সেই ভাঙাচোরা মেটে বাড়ির আশেপাশে, খানিক পড়ে রইল পথে-বিপথে, খানিকটা কৃষ্ণজীবন এল। কিন্তু পুরোপুরি হল না এই আসা।

যার নাম কৃষ্ণজীবন, যার বাপের নাম বিষ্ণুপদ, তার বউয়ের নাম কি করে হয় রিয়া ? কৃষ্ণজীবন আর রিয়া—এ যেন এক বিষম অসবর্ণ জোড়। না, বর্ণে তাদের অমিল নেই। তারা দুজনেই কায়স্থ। কিন্তু শুধু বর্ণে মিললেই কি হয়! কত যে অমিল! রিয়া তাকে এক সময়ে বলেছিল, আজকাল কত লোক তো এফিডেভিট করে নাম বদলায়। তুমিও বদলে ফেল না!

ভারী আশ্চর্য হয়েছিল কৃষ্ণজীবন। বলেছিল, কেন ?

শোনো, রাগ কোরো না। পুরোপুরি বদলাতে বলছি না। শুধু জীবনটা ছোটো দাও। কৃষ্ণ নামটো চলবে।

কৃষ্ণজীবন গম্ভীর হয়ে বলেছিল, এটা যে খুব অপমানজনক রিয়া!

তার মাথা ছিল পরিষ্কার। লেখাপড়ায় দুরন্ধর। আর চেহারাখানা বেশ লম্বা চওড়া, সুদর্শন। এ দুটি জিনিস তাকে নানাভাবে সাহায্য করছে। যদিও যে ততদূর বিষয়বুদ্ধির অধিকারী নয় যাতে নিজে থেকেই এ দুটি মূলধনকে কাজে লাগাবে। সে ততদূর খারাপ ও ধান্দাবাজও নয়। কিন্তু চেহারা আর মেধা আপনা থেকেই রচনা করে গেছে তার পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিককে। উত্তর চকিশ পরগণা থেকে কলকাতা। ওই মেধা ও চেহারার মৃণয়ায় একদিন শিকার হয়ে গেল রিয়াও।

কিংবা ঠিক তাও নয়। কে করে শিকার তা কে বলবে ?

আজ সাততলার এই ফ্ল্যাটবাড়িতে তার অবিস্বাস্য অধিষ্ঠান। সে থাকে, রিয়া থাকে, তার দুই ছেলে আর মেয়ে থাকে। থাকে, তবু কিছুতেই থাকাটাকে তার বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। কেবলই মনে হয়, এ সবই স্বপ্ন। একদিন ভেঙে যাবে। হঠাৎ গুম ভেঙে জেগে উঠে দেখবে, সব ফক্কিকারি।

এত দুঃসহ ছিল তাদের দারিদ্র্য যে, যখন ক্লাস এইটে পড়ে তখন থেকেই তাকে টিউশনি করতে হত। জনপ্রতি দশটাকা করে রকম ছিল। তিনটে বাড়ি ঘুরে ঘুরে ছোটো ক্লাসের ছেলদের পড়া তাকে। সেই বয়সের তীব্র যিদের কথা কৃষ্ণজীবন কখনও ভুলতে পারে না। কখনও নেমন্তন্ন-বাড়ির ডাক পেলে কী যে আসন হত! ওই খিদেই তাকে জাগিয়ে রাখত রাতে। সে পড়ত। ওই খিদেই শান দিত তার মেধায়। সে বরাবর ফাষ্ট হত। ওই খিদেই তাকে চনমনে, উচাটন রাখত সবসময়। তাই সে সাহস করে পড়তে আসত কলকাতায়। কত দূরে রেল স্টেশন! কতক্ষণ ধরে ট্রেনের ধকল। তারপরও অনেকটা হেঁটে কলেজ। গাড়িভাড়া নেই, টিকিট নেই, বইপত্র নেই, খাতা-কলমেরও অভাব। ট্রেনে টিকিট কাটল না। কতবার ধরা পড়ে নাকাল হয়েছিল। তৈরি চারবার হাজতে নিয়ে গেছে তাকে। সুন্দর চেহারা দেখে এবং অভিশয় দরিদ্র এবং ছাত্র বলে ছেড়ে দিয়েছে শেষ অবধি। মেয়াদ হয়নি।

আজ খিদেটা নেই। আজ তার ভিতরটা মৃত।

তার বাবা এক বোকা মানুষ, তার মা এক বোকা মানুষ। তাদের বোকাসোকা সব ছেলেমেয়ে। তাদের মধ্যে এই একজন হঠাৎ কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠল তা দেখে সবাই ভয় খেল, অবাক হল। কলেজ ইউনিভার্সিটি সে উপকাল হরিণের মতো লঘু পায়। কোথাও আটকাল না। বরাবর দারুণ ভাল রেজাল্ট। বড় আশায় বুক বেঁধেছিল বোকা বাবা আর মা। ভাইবোনেরা ঝকমক করতে দাদার অহংকারে। ক্রান্ত দিনশেষে যখন গায়ের বাড়িতে ফিরে যেত তখন জোনাকি পোকা, অন্ধকার আর আপনজনদেরা ঘিরে ধরত তাকে। সেও কত স্বপ্ন দেখত।

চাকরি বাঁধাই ছিল তার। পড়াশুনো শেষ করতে না করতেই সে অধ্যাপনায় বহাল হল। প্রথমে কলেজে। রিয়া তার অধ্যাপকজীবনের প্রথম বছরের ছাত্রী। সেও এক অধ্যাপকের মেয়ে। একটু ফাজিল, ফচকে ধরনের মেয়ে। নবাগত অধ্যাপকটির সঙ্গে খুনসুটি করতে গিয়েই বোধহয় বিপদে পড়ল। বিয়ে হতে দেবী হয়নি।

যৌবনের উন্মাদনা ছাড়া আর কি! উন্মাদনা মানাই পাগলামি। হিসেব-নিকেশহীন কিছু ঘটিয়ে ফেলা। সেই উন্মাদনা ছিল না বলেই রিয়ার বাবা তাদের গায়ের বাড়ি ও পরিবারের অবস্থা দেখে এসে বিয়েতে অমত করলেন। রিয়া উল্টে গৌ ধরল।

বিয়েটা শেষ অবধি হল বটে, কিন্তু বয়ে আনল নানা উপসর্গ আর জটিলতা। গায়ের ওই বাড়িতে গিয়েই বিবর্ণ হয়ে গেল রিয়া। এই বাড়ি ? এইসব অতি নিম্নমানের মা-বাবা-ভাইবোন ? বোকা, আহামক, হিংসুটে, লোভী! প্রত্যেক রাতে শ্রমের দমলে তাদের রগড়া হতে লাগল। প্রতি রাতে কান্ডত রিয়া। আর প্রতিদিন সকাল থেকে কৃষ্ণজীবনের ভাইবোনের সঙ্গে মন কষাকষি শুরু হত রিয়ার। এই সামাজিক অবস্থায় বড় কাহিল আর অসহায় আর একা হয়ে পড়ছিল কৃষ্ণজীবন।

দু'মাসের মধ্যে তাকে চলে আসতে হল কলকাতার ভাড়া বাসায়। বড় কষ্ট হয়েছিল কৃষ্ণজীবনের। কারণ সে ফাটলটা দেখতে পয়েছিল। সে জানত, নিজের আপনজনদের সঙ্গে এই যে বাঁধন কাটল আর কি কিছুতেই তা গিঁট বাঁধা যাবে না। গাদাবোটকে টেনে নিয়ে যাবে একটি লঞ্চ—এরকমই আশা ছিল সকলের। কিন্তু লঞ্চ শিকল কেটে তফাত হল। সংসারের গাদাবোট যেখানে ছিল পড়ে রইল। উত্তর চব্বিশ পরগনার ওই অজ পাড়াগায়ে আজও তার স্মৃতিতে পরিবারটি অভাবে, অশিক্ষার অন্ধকারে পড়ে আছে। অভাবের সংসারে রগড়া-কাজিয়া-অশান্তি আর নানা পঙ্কিলতার মধ্যে।

কৃষ্ণজীবন পারত। পারল না।

কে কার শিকার তা বুঝে ওঠা মুশকিল। আজ তো কৃষ্ণজীবনের মনে হয়, এক লোলুপ বাঘের থাবার নিচে লম্বমান পড়ে আছে তার মৃতদেহ। ধীরে ধীরে বাঘটা তাকে খেয়ে ফেলছে। তার কিছু করার নেই।

না, রিয়াকে সেই বাঘ ভাবে না কৃষ্ণজীবন। গোটা পরিস্থিতিটাই সেই বাঘ। রিয়া তার একটি থাবা মাত্র।

মাইনে কম ছিল তখন। তবু কষ্টেস্টেটাকা পাঠাত কৃষ্ণজীবন। প্রতি শনিবারে রবিবারে যেত গায়ের বাড়িতে। আর তখন তাকে চোখা চোখা কথা শোনাতো ভাইবোনরা। বিশেষ করে বোনরা। বউয়ের চাকর, বাড়িঘরীন ভেড়া, স্রোণ। এতকাল কৃষ্ণজীবনের মুখের ওপর কী কথা বলার সাহসই কারও ছিল না। এই গরিব, গৌরবহীন পরিবারে কৃষ্ণজীবন ছিল প্রায় গৃহদেবতার মতো সম্মানের আসনে। সবাই তাকে তোয়াজ করত, ভয় পেত। কিন্তু বিয়ের পর সব ভাঙচুর হয়ে গেল। একদিন তার বোন বীণাপাণি বলেছিল, তুই তো লেখাপড়া শিখে জুদলোক হয়ে গেছিস, আমরা সেই ছোটলোকই আছি, আমাদের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখার দরকার কি তার ?

সবচেয়ে বেশী লেগেছিল ভাই রামজীবনের সঙ্গে। আগে কুব বংশব্দ ছিল রামজীবন। কি কারণে কে জানে, সেই রামজীবনই তার ওপর ক্ষেপে গেল সবচেয়ে বেশী। এক শনিবার বিকেলে সামান্য কিছু জিনিসপত্র নিজের পরিবারের জন্য নিয়ে গিয়ে গায়ের বাড়িতে হাজির হয়েছিল সে। তার পদার্পণমাত্র বাড়ির আবহাওয়া খমখমে করে উঠল। ভিতরে ভিতরে একটা আক্রোশ পাکیয়ে ছিল আর থেকেই। সন্দের পর রামজীবন মদ খেয়ে ফিরল। মাতাল নয়, তবে বেশ টং। ফিরেই তাকে দেখে বাবার উদ্দেশ্যে চৌচিয়ে উঠল, এই তো আপনার লেখাপড়া জানা ছেলে এসে গেছে। শালা মেরা লেখাপড়া করেছে। মেলা বই পড়েছে। মেলা ভাল ভাল কথা জানে। কিন্তু শালা নিজের পরিবার, নিজের ভাইবোনের জন্য এক ফোঁটা বিন্দো খরচ করেনি। করেছে বাবা ? আপনিই বলুন, আমাদের কোনওদিন ডেকে বলেছে, আয় তোকে এটা বুঝিয়ে দিই বা সেটা শিখিয়ে দিই ? কোনওদিন জিজ্ঞেস করলে যে, আমরা কে কোন ক্লাসে পড়ি ? আপনার বিদ্যায়ের ছেলে শুধু নিজেরটা গুছিয়ে নিয়েছে। আর আমরা শালাকে তেল দিয়ে গেছি। বলুন সত্যি কিনা! গৌরবের গুণধর ছেলে এখন কললেজে পড়ায়, ছেলেদের ভাল ভাল জ্ঞানের কথা শেখায়। কী শেখাবে ও বলুন তো! ওর চরিত্র আছে, না মায়াদয়া আছে ? ও জানে, মা-বাবা ভাই-বোনকে কেমন করে শ্রদ্ধাভক্তি করতে হয়, ভালবাসতে হয় ? লেখাপড়া জানা বউকে দিয়ে আমাদের কত অপমান করে গেল ? সব শেখানো ছিল আগে থেকে।

রামজীবন যে মদ খায় তা জানত না কৃষ্ণজীবন। হয়তো আগে খেত না। সম্প্রতি ধরেছে। মদ পয়সার জিনিস। এ বাড়িতে চাল কেনার পয়সা জোটে না তো মদ কেনার পয়সা আসবে কোথেকে? কৃষ্ণজীবন জীবনে খুবই কম আত্মবিস্মৃত হয়েছে। সেদিন হল। ওই মাতাল অবস্থায় রামজীবনের চোচামেচি তার সহ্য হয়নি। তার ওপর রামজীবন তাকে শুয়ারের বাচ্চা ও বেজন্মা বলে গাল দিয়েছিল। মায়ের পেটের ভাই হয়েও দিয়েছিল। সে উঠে তেড়ে গিয়েছিল রামজীবনের দিকে, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

রামজীবন একা নয়, সঙ্গে সঙ্গে তার সব ভাইবোন যেন এককণ্ঠা হয়ে উঠে তেড়ে এল তার দিকে। বিস্তর চোচামেচি হয়েছিল। তার মধ্যে রামজীবনের একটা কথা খুব কানে বাজে আজও, তোর টাকায় আমরা পেছাপ করি। তোর লেখাপড়া জানার খেঁচে পেছাপ করি।

রামজীবনকে খুন করতে পারলে সেদিন তার জালা জুড়োতো। কিন্তু আজ আর সেই রাগটা তার নেই। কৃষ্ণজীবন আজ বুঝতে পারে তাকে বড় বেশী ভালবাসত তার পরিবার, অনেক নিভর করত তার ওপর, তাকে ঘিরেই ছিল ওদের স্বপ্ন। সেই স্বপ্নকে চুরমার করে দিয়েছে তো সে নিজেই।

সেই রাতেই ফিরে এল কৃষ্ণজীবন। সে কি মারতে গিয়েছিল রামজীবনকে? সে কি আত্মবিস্মৃত হয়েছিল? তার সঙ্গে কি ওদের আর সম্পর্ক থাকবে না? কী হল! সে কিছুতেই এইসব ঘটনার জট খুলতে পারল না। শুধু টের পেল, তাকে ঘিরে একটা অদৃশ্য পোকা একটা গুটি বুনে যাচ্ছে। তাকে বন্ধ করে দিতে চাইছে নিজস্ব খেলের মধ্যে।

কলকাতার বাসাই বা কোন কোল পেতে বসে ছিল তার জন্য? অভাবী সংসার থেকে মেধা দিয়ে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল সে, কিন্তু গা থেকে গায়ের গন্ধ মোছিনি, মুখে যায়নি তার নিম্নবিশু, প্রায় অশিক্ষিত পারিবারিক ব্যাকখাউন্ড। সে নিজেও টের পায়, পুরোপুরি অদ্রলোক নয়, খানিকটা গেয়ো, খানিকটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন। রিয়া ঝকঝকে আধুনিক, ছলবলে, স্মার্ট। অসবর্ণের সেই শুরু।

তার বাবা বিষ্ণুপদর স্বভাব হল, সংসারের কোনও ব্যাপারেই জোরালো মতামত নেই। বিষ্ণুপদ ছেলেপুলেদের শাসন-টাসন করত না। তার চোখের সামনে কোনও অন্যায্য অবিচার দেখলেও বিষ্ণুপদ রা কাড়ত না। ওটাও একরকম মৃদু-বধিরতা। বাবার কাছ থেকে ওই স্বভাবটি পেয়েছিল কৃষ্ণজীবনও। ভিতরটা যতই টগবগ করুক বাইরেটা শান্ত। সে কখনোই চেষ্টা করেনি রিয়াকে কিছু বোঝাতে বা শাসন করতে। চেষ্টা করলেও হয়তো পারত না। রিয়া বড়ই বেশী প্রখর, বড় বেশী মুখর।

কৃষ্ণজীবনের ওই আংশিক মুক-বধিরতা তার আর রিয়ার মধ্যে কোনও সেতুবন্ধন রচনা করতে দেয়নি। এক ঘরে থেকেও তারা পরস্পরের অচেনা থেকে গেছে। আর রিয়া তার ওপর ক্ষেপে উঠত সেইজন্যই। রাগ বাধা না পেলে অনেক সময়ে ক্ষিতি হয়ে যায়। কিন্তু অনেক সময় উল্টোটাও হতে পারে। মানুষের চরিত্র তো নানা বৈচিত্র্যে ভরা। রিয়া হয়তো চাইত, কৃষ্ণজীবন তার প্রতিবাদ করুক। তাতে বোধহয় রিয়ার ধার বাড়ত। যত সে চূপ করে থেকেছে ততই রাগ বেড়েছে রিয়ার। বাড়তে বাড়তে আজ কৃষ্ণজীবনকে প্রায় পাপোশ বানিয়ে ছেড়েছে রিয়া।

রাগের কারণ অনেক। প্রথম কারণ, কৃষ্ণজীবনের নিম্নবিশু, নিম্নরুচি ও নিচু কালচারের পরিবার। অর্থাৎ কৃষ্ণজীবনের ম্লান পটভূমি। আর দ্বিতীয় কারণ, কৃষ্ণজীবনের নিরীহ অনুভবজক ব্যক্তিত্ব। বা ব্যক্তিত্বের অভাব। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম দরকর ও নানা দাস্যতার কারণ তো আছেই। সব সময়ে যথেষ্ট কারণেরও সন্ধানকার হয় না।

রাগ! রাগই রিয়াকে চালায়। রাগই তার চালিকাশক্তি। তার রাগের চোটে ঝি থাকে না। বাড়িওয়ার সঙ্গে খিচিমিটি বাধে, ছেলেমেয়েরা জড়োসড়ো হয়ে থাকে। তাদের সংসারে আনন্দের লেশমাত্র নেই।

তাকে উসকে তোলার জন্য, যদুে অবতীর্ণ করার জন্যই কি বিয়ের দু'বছরের মধ্যেই একদিন, বাচ্চার জন্য কৌটোর দুখ আনতে ভুলে গিয়েছিল বলে, রাত বারোটা নাগাদ কৃষ্ণজীবনের হাতের বোটানির ভারী বইটা কেড়ে নিয়ে সেটা দিয়েই তার মাথায় মেরেছিল রিয়া? সরাসরি হাত তোলেনি, শুধু বইটা দিয়ে মেরেছিল।

ভারী বই। খুব সজোরে এসে মাথায় লাগতেই ঢলে পড়ে গিয়েছিল সে। মাথা অন্ধকার। আঘাতটা বড় কথা নয়। মানুষ মাঝে মাঝে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতে পারে। সে ওভাবে পড়ে যাওয়ায়, নিজের কৃতকর্মে অনুশোচনায় পিলের মতো আচরণ করতে শুরু করেছিল রিয়া। কৃষ্ণজীবন মাথার সাময়িক অন্ধকার কাটিয়ে উঠে রিয়াকে সাবুনা দিয়েছিল। কান্না খামিয়েছিল। বলেছিল, কিছু স্থানি। আমার একটুও লাগেনি।

আমি যে তোমাকে মারলাম? এ কী করলাম আমি?

মার! একে কি মারা বলে? তুমি বইটা রাগ করে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়েছিলে। আমিই তো এগিয়ে যেতে গিয়ে—ঠিক গুছিয়ে মিথোটা সাজাতে পারল না কৃষ্ণজীবন। সেই দক্ষতা তার নেই। তবে কাজ হল। রিয়া শান্ত হল।

কিন্তু অনেকক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে বলল, তুমি খুব অদ্ভুত!

এ কথাটা কৃষ্ণজীবনের বিশ্বাস হয়। সে কিছু অদ্ভুত। রিয়া মিথ্যে বলেনি।

তার নিজের চারদিকে একটা গুটিপোকাকার খোলস আছে। প্রকৃত কৃষ্ণজীবন বাস করে সেই খোলের মধ্যে। সেখানে শক্ত হয়ে থাকে সে। বাইরের কারও সঙ্গেই তার সম্পর্ক রচিত হতে চায় না সহজে।

সম্পর্ক রচনা হল না তার বড় দুই সন্তানের সঙ্গেও। ব্যস্ততা বা সময়ের অভাব নয়, অগ্রহের অভাব নয়। অভাব পড়ল বাকোর। অভাব পড়ল ভাব প্রকাশের। যখন ছোটো শিশু ছিল তখন একরকম। যখন বড় হল, বুঝতে শিখল, মতামত হতে লাগল, তখন অন্যরকম।

আজ সাততলার ফ্ল্যাটে তার সংসার। রিয়া আর সে দু'জনেই অধ্যাপনা করে। মিলিত রোজগার আর ধার মিলিয়ে কষ্ট করে কেনা। ধার এখনও অনেক শোধ হওয়ার বাকি। কিন্তু কোনওদিন এই ফ্ল্যাটটার সঙ্গেও কেন একটা আপন-আপন ভাব রচনা করা হল না কৃষ্ণজীবনের পক্ষে? কেন কেবলই মনে হয় এ পরের বাড়ি?

এইসব কারণেই কৃষ্ণজীবনের কেবল মনে হয়, তার সবটুকুকে সে জড়ো করতে পারেনি আজও। এখানে ওখানে তার টুকরো-টুকরা পড়ে আছে আজও। অনেকটাই পড়ে আছে ওই অজ পাড়াগায়ে। মেটে ঘর, দারিদ্র্যের ক্লিষ্ট ছাপ চারদিকে, প্রতি পদক্ষেপে এক পয়সা দু'পয়সার হিসেব রাখতে হয় মাথায়। নুন আনতে সত্যিই পাশা ফুরায়। তবু সেইখানে তার অনেকটা পড়ে আছে।

কৃষ্ণজীবন একবার একটা পেপার পড়তে আমেরিকা গিয়েছিল। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে যেতে হয়েছিল তাকে। রিয়ার ইচ্ছেতেই বিশেষ করে। স্বামী একবার বিদেশ ঘুরে এলে তার মুখ কিছু উজ্জ্বল হয়। ফলে একটা আলগা আমন্ত্রণপত্র যা বিশ্ববিদ্যালয়ে হামেশাই আসে, ব্যক্তিবিশেষকে নয়, সেই নৈর্ব্যক্তিক একটি আমন্ত্রণলিপিকে অবলম্বন করে, বিস্তর চিঠি চালাচালির পর সে রাহাখরচ ও অন্যান্য ক্ষতি স্বীকার করে গিয়েছিল। সেখানে সেই ঝা-চকচকে, উন্নত বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সভ্যতার দেশে পা দিয়েও তার মনে হয়েছিল উত্তর চব্বিশ পরগনার সেই অজ পাড়াগাঁ তার সঙ্গেই এসেছে। ধুলোটে পা, চোখে অসহায় আত্মবিশ্বাসহীন দৃষ্টি, ভিতরে কেবলই বিশ্বয়ের পর বিশ্বয়।

খুবই বিশ্বয়ের কথা, পৃথিবীর বাতাবরণের ওপর তার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটি সেখানে বিস্তর কদর পেল। শুধু হাততালি দিয়ে কদর জানানো নয়। সাহেবরা যার মূল্য বুঝতে পারে সেটাকে বাস্তবসম্মত ভাবেই কদর দেয়। একটা ফাউন্ডেশন তার যাবতীয় রাহাখরচ আর হোটেলের ব্যয় মিটিয়ে দিল। সঙ্গে দিল কিছু দক্ষিণাও। এক আশাতীত পুরস্কার। আজকাল মাঝে মাঝে তাকে আমেরিকা যেতে হয়। নিজের উদ্যোগে আর নয়, পুরোপুরি আমন্ত্রণ পেয়েই সে যায়। সারা পৃথিবী জুড়ে একটা দৃষ্টিভঙ্গি আতঙ্কে পরিণত হচ্ছে ক্রমে। ওজোন হোল, গ্রোব ওয়ার্মিং, সমুদ্রের জলস্তরে স্ফীতি। দ্বীপ রাষ্ট্রগুলি ইতিমধ্যেই চারদিকে করুণ আবেদন জানাতে শুরু করেছে—কিছু একটা করো, নইলে অচিরে আমাদের প্রিয় ভূখণ্ড তলিয়ে যাবে সমুদ্রে।

খুবই বিশ্বয়ের কথা, এই পৃথিবীকে প্রগাঢ় ভালবাসে কৃষ্ণজীবন। অন্য কারও সঙ্গে তার তেমন সম্পর্ক রচিত হয় না বটে। কিন্তু এই অদ্ভুত প্রাণময় গ্রহটির প্রতি হয়।

দোলন তার সরু গলায় খুব সাবধানে ডাকল, বাবা!

উঁ! গভীর আনমনা কৃষ্ণজীবন জবাব দিল।

কী ভাবছো বাবা?

কৃষ্ণজীবন মাথাটা সামান্য নত করে বলে, আমার যখন ছোটো ছিলাম তখন আমাদের গায়ে অনেক গাছপালা ছিল।

তুমি কেন শুধু গাছপালার কথা ভাবছো বাবা?

কেন ভাবছি! তোমাকে যে এই পৃথিবীতে রেখে যেতে হবে আমাকে। মানুষ যে কেন তার সন্তানের কথা ভাবে না!

আমি গাছ কাটব না বাবা। আমি কখনও পৃথিবীর দাড়ি কামিয়ে দেবো না।

১৮ ১১

মেঘলা দিনের কালো আলোয় ঘরের মধ্যে দুটি ছাইরঙা মানুষ দুজনের দিকে চেয়ে আছে। বাইরে সরু সরু অজস্র সাদা সুতার মতো ঝুলে আছে বৃষ্টি। টিনের চালে ঝিমঝিম নেশাডু শব্দ। কথা নেই। বীণাপাণি আর নিমাই।

সেদিন অনেকক্ষণ পগার আচমকা মৃত্যুসংবাদটা ভাল করে বসছিল না বীণাপাণির মাথায়। কাঁদবে, না হোঃ হোঃ করে কাঁটারি জেভার মতো আনন্দে হেসে উঠবে, সেটা তার ভিতরে তখনও স্থির হয়নি। আর ওই উজবুক লোকটা, পাঁচ ফুটিয়া, রোগাভোগা, ভীতু আর ধার্মিক লোকটা, চোখ তুলে ভাল করে বীণার দিকে যে তাকাতেই পারল না আজ অবধি, সেই লোকটা কেমন যেন চোখা চোখে চেয়ে ছিল তার চোখে। লোকটার সামনে গোছানো স্যুটকেস। একটু বাদেই চৌকাঠ পার হবে। তারপর হয়তো আর কোনওদিনই উল্টোবাগে চৌকাঠ পেরিয়ে এসে ঢুকবে না বীণাপাণির ঘরে।

বীণাপাণি এরকম অদ্ভুত অবস্থায় আর জীবনে পড়েনি। শোক, আনন্দ, উত্তেজনা, রাগ, ঘেন্না সব একসঙ্গে উথলে উঠছে ভিতরে। ঠিক এই সময়ে যদি চৌকারির তলা থেকে তার পোষা বেড়াল বুঁচকি বেরিয়ে এসে তার কোলে না উঠে পড়ত, তাহলে কী যে করত বীণাপাণি কে জানে! বুঁচকিই সব কাটিয়ে দিল একটা আদুরে মিয়াও শব্দ তুলে। তার বিদে পেয়েছে।

বীণাপাণি বেড়ালটাকে বুকে চেপে ধরল। তার বুদ্ধি এখন স্থির নেই। মাথার ভিতরটা পাগল-পাগল। বুকাটায় বড্ড দাপাদাপি। কী বলতে কী বলবে, কী করতে কী করে বসবে, কে জানে বাবা! আর ওই আহাম্যক লোকটা তাকে কেন যে ওরকম করে দেখতে লেগেছে! বীণাপাণির কি একটু কান্দা উচিৎ? বাড়াবাড়ি হবে না তো!

কান্দল না, তবে কান্দার মতো একটা অবস্থায় সে থেমে রইল। চোখ ভরে উঠল জলে, কিন্তু গড়িয়ে পড়ল না। স্থির হয়ে জানালা দিয়ে বাইরের অজস্র সুতার বুনের মতো একঘেয়ে বৃষ্টির দিকে চেয়ে রইল।

নিমাই এ সময়ে একটা গলা ঝাঁকারি দিল। তারপর তার সরু নরম মেয়েলি গলায় জিজ্ঞেস করল, ছেলেটা কি পগার খবর দিয়ে গেল?

বীণা জবাব দিল না।

নিমাই জবাবের জন্য অপেক্ষা করল একটু। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, এরকম সব কাণ্ড হয় বলেই তোমায় বারণ করেছিলাম।

বীণা চুপ করে যেমন চেয়েছিল তেমন চেয়ে রইল। বাইরে চুপ বটে, কিন্তু তার ভিতরে এ সময়ে একটা কথা কাটাকাটি হচ্ছিল। ঠিক এরকম একটা গোলমালে ব্যাপারের মধ্যে নিমাই চলে গেলে তার কি হবে? ওকে চলে যেতে দেখা কি ঠিক হবে? রাগের মাথায়, ঝোঁকের মাথায় যা ইওয়ার তা হয়ে গেছে। কিন্তু এখন তো সেই অবস্থাই নেই। তাকে বুদ্ধি দেবে কে? বুদ্ধি চাইলে অনেকেই মাথা ধার দিতে আসবে, কিন্তু বীণাপাণির ভাল-মন্দ বুঝে কথা কইবে কি

কেউ ? তার বন্ধু অনেক, কিন্তু আত্মীয় তো এই একজনই। ম্যাদামারা, পাভাভাত, সব ঠিক। তবু নিমাই তো লোভী নয়, পাজি নয়, ধান্দাবাজ নয়। বকাঝকা-অত্যাচার ওর ওপর কম করে না বীণা! তবু নির্ভরও করে। ওকে চলে যেতে দেওয়া কি উচিত কাজ হবে! আটকানোই বা যায় কি করে ?

নিমাই উঠবার মতো একটু ভাব করে ফের বসে পড়ল উরু হয়ে, তারপর খুব সংকোচের সঙ্গে বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। এ কথাটার জবাব অন্তত মাথা নেড়ে হলেও দাও। পণা কি কাল রাতে টাকা পয়সা কিছু তোমার কাছে গচ্ছিত রেখে গেছে ?

এই প্রশ্নটাকেই ভয় পাচ্ছিল বীণা। পণা এসেছিল সন্ধের মুখে। খুব তাড়া ছিল। বৃষ্টি হচ্ছিল তুমুল। নিমাই কোথায় বেরিয়েছে। খুব হাওয়া। হ্যারিকেনের আলোয় একখানা একসরাসাইজ খাতা খুলে “পরশমণি” নামে একটা নতুন নাটকের পাট মুখস্থ করছিল বীণাপাণি। দরজায় ধাক্কা আর ডাকাডাকিতে উঠে দরজা খুলে দেখল, বর্ষাতি গায়ে পণা। জলে স্পসপ করছে। মুখে একগাল হাসি। ফোম লেদারের ব্যাগ থেকে পলিথিনে মোড়া একটা প্যাকেট বের করে বীণার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, কাল সকালে নিয়ে যাবো।

বেশ ভারী প্যাকেট। এরা যে তাকে বিশ্বাস করে, ভালবেসে এসব রেখে যায় তা নয়। এরা জানে এদের টাকা পয়সা মেরে দিয়ে বীণাপাণি পার পাবে না। সীমান্ত জুড়ে এদের জাল বিছিয়ে রাখা আছে। সেই জাল কেটে বীণাপাণি কত দূর যাবে ? যতদিন মাথা নিচু করে চলবে ততদিন ঠিক আছে। গড়বড় করলে রেহাই নেই।

বীণা বাধ্য মেয়ের মতো প্যাকেটটা হাতে নিয়ে বলল, ঠিক আছে।
পণা আবার অন্ধকারে বাতাস-বৃষ্টির মধ্যে মিলিয়ে গেল। দরজা এঁটে বীণাপাণি প্যাকেটটা তোরঙ্গ রেখে তালা দিয়েছিল। এ সব প্যাকেটে কী থাকে তা তার জানতে নেই। জানতে চায়ও না সে। শুধু হেরোইন-টেরোইন না থাকলেই হল। পণা অবশ্য ও কারবার করে না। সে ডলার পাউন্ড আর টাকার লেনদেন করে।

কেউ দেখেনি। কেউ জানে না।
বীণাপাণির অভিনয়ের ব্যাভাস এখন কাজে লাগল। সে অকপটে নিমাইয়ের দিকে চেয়ে কঠিন দৃঢ় গলায় বলে না।
পণা রোজ আমার কাছে টাকা-পয়সা রেখে যায় না।

পাটটা চমৎকার হল।
নিমাই চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, তাহলেই রক্ষে। নইলে বিপদ ছিল।
কিসের বিপদ ?

নিমাই মাথাটা একটু নেড়ে বলে, তা কি জানি ? বিপদ ওদের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে।
বিপদ থাকলে আমার ছিল, তোমার তো আর নয়। তুমি তো বাস্তবপ্যটিয়া নিয়ে ঢোকাঠ ডিঙিয়ে পগারপার হবে।
আমি পড়ে থাকব, একা মেয়েমানুষ।

নিমাই কি একটু তটস্থ হল ? নড়েচড়ে বসল। তারপর স্তিমিত গলায় বলল, বিপদ তো তোমারও ছিল না।
মেশামেশিটা বড্ড করে ফেললে যে ওদের সঙ্গে। ভদ্রলোকের বউ-ঝিরা কি ওরকম করে ?

বীণাপাণি নিজেকে সামলাতে পারল না। থমকানো চোখের জলটা এবার নেমে পড়ল গাল বেয়ে। টপটপ করে নামতে লাগল। গালে ছাঁকা দিয়ে নামতে লাগল। বীণাপাণি একটু ফুঁপিয়ে উঠে বলল, আগে বলো, আমরা কবে ভদ্রলোক ছিলাম! কবে ভদ্রলোকের মতো ছিলাম ? কেউ মানে আমাকে ভদ্রলোকের মেয়ে বলে ? বলো, মানে কেউ ? গোনে কেউ ? সেই চোখে দেখে কেউ ?

নিমাই কথাটা স্বীকার করল না। ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলল, ওটা কথাই নয়। কথা হল তুমি মানে কিনা। তোমার বাবা মাস্টারমশাই ছিলেন। তোমার দাদা অত বড় বিদ্বান লোক।

বীণাপাণি কান্নার মধ্যেও ছিছিকার করে উঠল, তাই বুঝি আজ এই দশা আমার! বনগাঁয়ে যাত্রাদলে সঙ সাজতে হচ্ছে! রাস্তায় মুখোমুখি দেখা হলে আমার মায়ের পেটের দাদা আমাকে চিনতে চাইবে ? আর বাবা! এ যাবৎ খোজ করেছে একবারও, যেয়েটা বঁচে আছে না মরেছে ?

আজ মাথাটা বড্ড গরম তোমার।
লোকে যখন আমাকে ভাল ভাল কথা বলে তখন আমার মুখে থুথু আসে, বুঝেছো ? আর তুমি! তুমিই বা কোন ভদ্রলোকটা শুনি! দাদার কথা বলছো, অমন মানুষের বোনকে বিয়ে করার মুরোদ কি তোমার ছিল ? বাবা আহাশ্বক বলেই না দিল খুলিয়ে!

নিমাই মাথা নিচু করেই বসে রইল। বড় অপরাধী ভাব।
আর বীণা জ্বলতে জ্বলতে ভিজতে লাগল চোখের জলে। বৃঁচকি খিদে চেপে চুপ করে বসে রইল তার কোলে।
নিমাই অনেকক্ষণ বাদে গলা ঝাঁকরি দিয়ে বলল, একটা কথাই কই। কথাটা বাড়িয়ে বলছি না। বিয়ের কথাটা যখন উঠল তখন তোমার বাবাকে আমি কিন্তু বলেছিলাম, কাজটা আপনি ঠিক করবেন না মশাই। জাতে-কাটে এক হলেও, আমরা ঠিক সমান সমান নই। তা উনিও একটু বোকাসোকা মানুষ, লোক চিনতে পারেন না। বললেন, তোমার একদিন খুব উন্নতি হবে। এ আমি দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছি।

বীণাপাণি নাটক করে বলেই নিজের ওপর রাশ টেনে রাখতে পারে। দমকা কান্নাটা সামলে চুপ করে বসে রইল।
নিমাই খুব ভীতভাবে আরও একবার গলা ঝাঁকরি দিয়ে বলে, কাজটা ঠিক হয়নি, জানি। আমি বড় নিচুতলার মানুষ। বড় পতিত। খুব উচ্চতর কোন আঘাটায়। তোমার বাবাই কুড়িয়ে নিলেন। তা বলে সেই বুড়ো মানুষটার ওপর রেগে গিয়েও লাভ নেই। উনিও তাঁর কর্মের ফল ভোগ করছেন।

বীণাপাণি নিমাইয়ের দিকে অসুরবধের সময় মা দুর্গার মতো চেয়ে থেকে বলে, আর আমি কার কর্মফলটা ভোগ করছি শুনি! আমি কার পাকা ধানে মই দিয়ে এসেছি ? দুনিয়াটা বুঝে শুনে উঠবার আগেই আহাশ্বক বাপ আর একটা পার্থিব—৫

আহাশ্বকের গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে কন্যাদায় মিটিয়ে হাত ধুয়ে বসে রইল। একবার ভাবল না মেয়েটা খাবে পরবে কি। শুধু শুনেছিলাম ছেলের নাকি স্বভাবচরিত্র ভাল। ওঃ ভাল চরিত্র ধুয়ে তো জল খাবো কিনা! এর চেয়ে যে স্বাগলারারও অনেক ভাল। তারা তবু পুরুষমানুষ, ডাকবুকে। এমন মেনীমুখে তো নয়!

নিমাই ফের আধোবদন। এই বিদায় নেওয়ার মুহূর্তটা আরও একটু অন্যরকম হতে পারত বোধ হয়। সে তো চলেই যাচ্ছে! তবে আর এই বাক্যবাণ কেন? স্যুটকেসটার দিকে হাত বাড়িয়ে নিমাই ফের গলা খাঁকারি দিয়ে বলে, পাপমুখে একটা কথা আসছে। বলব?

বীণা জবাব দিল না।

নিমাই মাথাটা নিচু রেখেই বলে, আজকাল সবই হচ্ছে-ট হচ্ছে দেখছি চারদিকে। সেইসব দেখেই সাহস করে বলছি। বিয়ে ব্যাপারটা আগে যেমন পাকা ব্যাপার ছিল, আজকাল তেমনধারা নেই। ওসব অং বং মস্তের কী-ই বা দাম। পুরুতরা তো দক্ষিণাটি পেলেই গড়গড় করে মত্ত পড়ে চারহাত মিলিয়ে দেয়। কেউ মানছে না ওসব। আমি বলি কি, তোমারই বা মানবার কি দরকার?

বীণা বুঁচকিকে এত জোরে চেপে ধরল যে বেড়ালটা হাঁচোড় পাঁচোড় করে উঠল। বীণা বলল, কী বলতে চাইছ?

বিয়েটা তোমায় মানতে হবে না। আমরা বড় নিচুতলার লোক, আমরা যাই করি, আমাদের নিয়ে সমাজে কথা ওঠে না। কেউ ভাল করে নজরই করে না আমাদের। তাই বলি কি, এখনও সময় আছে তোমার। নামডাক হয়েছে। দু-পাঁচটা টাকাও আসছে। কাউকে পছন্দ হলে বিয়ে করো।

কথাটা নতুন নয়। আগেও ঠারেঠোরে বলেছে নিমাই। বীণাপাণি দাঁতে দাঁত পিষে বলে, কথাটা বলতে লজ্জা হল না? জিব খসে পড়ল না তোমার?

নিমাই মাথাটা নেড়ে বলে, আমি যদি একটা মানুষের মতো মানুষ হতাম তবে কি বলতে পারতাম? দখল রাখা এখন বড় শক্ত কাজ। জোরালো লোক না হলে কিছুই ওপর দখল থাকে না আজকাল। অনেক ভেবে দেখছি, বিয়েটাও মাঝে মাঝে একটা জুলুম ছাড়া কিছু নয়। যেখানে বনে না সেখানেও ধরে বেঁধে আটকে রাখা! কাজটা অন্যায়। ছোটোলোকদের তো দেখছ! পেটে এক মুখে আর এক নয়। পাঁচুরিকশাওলা এই তো মাসটাক আগে টোপের পরে বিয়ে করে এল। সঙ্গে বাগ্নি-বাজনা, হ্যাঁজাকের আলো। মাস না ঘুরতেই বড় হাওয়া হয়েছে। পাঁচুও দিবা হাসিমুখে রিকশা চালাচ্ছে। যেন কিছুই হয়নি! আমার বেশ লাগল ব্যাপারটা। চাপান নেই, বাঁধান নেই। বেশ তো!

সেটা বুঝি ভাল হল!

খারাপটা কিসের বলো তো! আমাদের আর কি আসে যায়? কে মাথা ঘামাবে আমাদের নিয়ে?

তোমার নিজের আবার বিয়ে বসার ইচ্ছে হয়েছে, সে কথাটা কবুল করলেই তো হয়!

নিমাই জিব কেটে বলে, ও কথা বোলো না।

কেন বলব না? গরজ তো তোমারই বেশী দেখছি!

নিমাই দুঃখিত মুখে বলে, আমার আর্থ নেই। অধিকারী না হলে কি হয়? তোমার মতো মানুষ পেয়েও কি হল কিছু? আর আমার জনাই না তোমার এত আপদ-বিপদ-কষ্ট? অত বড় অসুখটা থেকে বাঁচিয়ে তুললে, খাওয়া পরার জোগাড় করলে। কিছু কম তো করানি! আমার মা-বাবা বড় অভাবী, বড় লোভী। তারাই নামিয়ে দিল তোমাকে। সবই বরাত। এখন ভাবি, কিছু যদি শোধরানো যায়!

আমাকে বোধহয় আজকাল তোমার সন্দেহ হয়!

নিমাই সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, তা সে দোষও আমার আছে। মনে কত পাপ লুকিয়ে থাকে মানুষের!

কার সঙ্গে সন্দেহ হয়? কাকা তো?

সে বড় ভাল লোক। স্বাগলার হোক, কি আর যাই হোক, সে একটা জিনিস নিয়েই পড়ে আছে। পালা ছাড়া আর কিছু নিয়ে ভাবে না। অমন যার ধ্যান সে সহজে এসব দিকে ঝোঁকে? তাকে আমি খানিক চিনেছি। সে ঠিক ওরকম নয়। তবে যদি তোমার তাকে ভক্তি করতে ইচ্ছে করে তো মন্দ কী? কাকাকেই বিয়ে করতে পারো।

সম্প্রদানটা কি তুমিই করবে নাকি?

বড় রেগে যাচ্ছে। আমি হিংসুটে কথা বলিনি। আমার আর ওসব হয় না। বড় কষ্ট দিয়েছি তোমাকে। কোথায় একটা শক্ত গিট পড়ে গেছে, খুলছে না। আমি অত গুছিয়ে কথা বলতে পারি না।

বেশ গুছিয়েই বলেছো। শোনো, যদি কাউকে বিয়েই করতে চাই তবে কি এতদিন তোমার অনুমতির জন্য বসেছিলাম? অনুমতি বা আদেশ দরকার হত নাকি? বরং নিজেকে বাঁচাতেই তোমাকে জোর করে ধরে এনেছিলাম। ভুলে গেছ সব?

ভুলব? আমি কি তেমন নিমকহারাম?

তুমিই তো সবচেয়ে বেশী নিমকহারাম! নাহলে ওকথা কেউ মুখে উচ্চারণ করে? বেইমান নও তুমি!

নিমাই ফের মাথা নিচু করে। অনেকক্ষণ নিচু করে রাখে মুখ।

বীণা দেখতে পায়, নিমাইয়ের চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়ছে মাটির মেঝের ওপর।

আমি মেয়েমানুষ, আমার অত বুদ্ধি নেই। মেয়েমানুষ চলে পুরুষের বুদ্ধিতে। কিন্তু পারলে তুমি আমাকে চালিয়ে নিতে? আমাকে নষ্ট বলে ধরে নিচ্ছে, কিন্তু যদি সত্যিই নষ্ট হই তার জন্য দায়ী কে থাকবে শুনি! তুমি ছাড়া আর কে? বউকে ফেলে চলে যাওয়ার মধ্যেই বুঝি তোমার সব বাহাদুরি? আর ভাবছো আমাকে আবার বিয়ে করার কথা বলে খুব উদারতা দেখানো হল!

পুরুষমানুষের কান্না দু'চোখে দেখতে পারে না বীণাপাণি। তার বুক জ্বলছে। সে মুখ ফিরিয়ে নিল। বাইরে অজস্র সুতো খুলছে। খুলেই আছে। টিনের চালে মিঠে মিহিন বৃষ্টির শব্দ। একটা ব্যাঙ লাফ মেরে নিমাইয়ের সূটাকেসটা ডিঙিয়ে চৌকির তলায় ঢুকে গেল।

নিমাই ধরা গলায় বলল, আমরা একটু বোকাসোকা মানুষ। তোমাকে দেওয়ার মতো বুদ্ধিই কি আমার আছে! জেবেতিতে একটা কথা হয়তো বললাম, সেটা তোমার হয়তো পছন্দ হল না। তোমাকে বড় ভয় খাই বীণাপাণি!

বীণাপাণি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সেটা জানি। আমার পরসায় খাও বলে তোমার ভারী লজ্জা। সবসময়ে জড়োসজড়া হয়ে থাকো, যেন পরীক্ষা হয়ে যাচ্ছে। তাই না?

আজ তুমি বড় সুন্দর করে বলছো। এরকম করে বললে বুকের একটা জোর হয়! বলো, আরও খানিক বলো।

বীণা লোকটার দিকে তাকাল। মাথাটা কি ঠাণ্ডা হয়েছে ওর? অনুতাপ হচ্ছে? সে বলল, তাহলে কথাগুলো সত্যি?

খুব। তুমি যেন সবসময়ে আমার নাগালের বাইরে। যখন বিয়ে করে আনলাম তখন এরকম ছিলে। এখন যেন গুটি কেটে প্রজাপতি বেরিয়ে পড়েছে। সেইজন্যেই কেমন যেন পর-পর লাগে, ভয়-ভয় লাগে।

দেখাট কি আমার, বলো!

নিমাই মাথা নেড়ে বলে, তোমার দোষ কেন হবে? আমিই কি একটা মানুষ? রাগে ভুগে আমার খানিকটা গেছে, ভয়ে দৃষ্টিভ্রান্ত থাকি বলে আমার বারোআনাই বরবাদ। তার ওপর কাজ নেই, কর্ম নেই, আমি ষোল আনাই তো নষ্ট! তুমি ছিলে বলে টিক টিক করে বেঁচে আছি। কিন্তু পুরুষমানুষের এরকম বেঁচে থাকতে নেই, সে আমি খুব বুঝতে পারি।

আমার মাঝে মাঝে ভীষণ মাথা গরম হয়ে যায়। নিজেকে সামলাতে পারি না। জানো তো?

জানব না? এতকাল একসঙ্গে আছি।

জানোই যদি, তবে একটা কথার জন্য চলে যাচ্ছে কেন?

নিমাই এবার হাসল। তার রোগা মুখখানায় কোনও তেমন সৌন্দর্য নেই। তবে হাসলে ভারী ভাল দেখায়। লাজুক গলায় বলল, থাকতে বললে তবে তো থাকব। আমার তো কখনও তোমার ওপর রাগ-টাগ হয় না, অভিমান হয় না। শুধু ভাবি আমি থাকায় বীণার বড় অসুবিধে হচ্ছে।

হাঁড়ি কলসিতেও ঠোকাঠুকি হয়, তা বলে যা নয় তাই ভেবে নাও কেন? আর রাগ করে বাঁধন ছিড়লেই তো হবে না। তোমার মা-বাবাকে খাওয়াবে কি? সব দিক বিচার করে তবে তো কাজ করতে হয়!

মা-বাবার কথা উঠলেই বড় দুঃখিত হয়ে পড়ে নিমাই। তার মা-বাবা বড় লোভী মানুষ। অভাবে অভাবেই এমনটা হয়েছে। একটু খাওয়া পরার আশায় সব ভাসিয়ে দিতে পারে। এমন কি বীণাপাণি যখন যাত্রায় নাম লেখায় তখন নিমাইয়ের মা খুব আশকারা দিয়ে বলেছিল, মনিবকে খুশি রাখতে চেষ্টা করো। শরীর যদি এঁটোকাঁটা হয়ে পড়ে তাহলে গঙ্গায় ডুব দিয়ে নিলেই হবে। একথা বীণাপাণিই বলেছে নিমাইকে। শুনে কানে হাত চাপা দিয়েছিল নিমাই। কিন্তু মায়ের ওপর তা বলে রাগ নেই তার। মা বড় বোকা মানুষ, বাবাও বড় বোকা মানুষ। এ দুটি বোকা মানুষের জন্য তার বড় মায়ী। এ দুজন যদি খেতে না পায়, যদি কান্না পায়, তবে আর নিমাইয়ের বেঁচে থাকার মানে হয় না।

নিমাই কৃতজ্ঞতায় ছলছলে চোখে বীণাপাণির দিকে চেয়ে বলে, তোমার বড় দম্ভা বীণাপাণি! তোমার জন্যই বুড়োটা আর বুড়িটা এখনও বেঁচে আছে। কত আশীর্বাদ করে তোমাকে! তবে তাদের তো বুদ্ধি নেই, বড় লোভী, কখন কি বলে, কি করে তার ঠিক নেই! তুমি ওদের ওপর রাগ করো না।

তোমাকে অত গদগদ হতে হবে না। ওরকম-গদগদ হও বলেই তো তোমার সঙ্গে আমার পট খায় না। বউয়ের সঙ্গে অত হাত-কলানো ভদ্রতা কিসের? তোমার ভাবখানাই এমন যেন পরের বউ চুরি করে এনেছো।

নিমাই আবার নিরাশ-হওয়া গলায় বলে, আমি বড় বোকো মানুষ। খুব বুদ্ধি করে কিছু কইতে বা করতে পারি না।

আজ তোমাকে বোকা মানুষ পেয়েছে। শুধু বোকা বলে বসে থাকলেই হবে! বোকাদেরও তো বাঁচতে হবে, না-কি? আচ্ছা বলো তো, এই বাস্কেটা গুছিয়ে রওনা হচ্ছিলে কোথায়? আমার কাছে লুকিও না।

নিমাই ভারি লজ্জায় পড়ে গেল। মাথা নিচু করে মাটির ওপর আঙুল দিয়ে একটু আঁক কাটতে কাটতে বলল, বসন্তপুন্নের গোকুল একটা যোগালির কাজ দিয়েছিল। আজ সেইখানেই যাচ্ছিলাম।

যোগালির কাজ! সে কিরকম?

বিয়েবাড়িতে গোকুল রান্না করে। তার বেশ নাম-ডাক। বড় একটা বসে থাকে না। দু'তিনজন যোগালি লাগে। মাছ কাটা, মশলা পেষা, জল তোলা—এইসব আর কি।

মা গো! তুমি ওইসব করতে যাচ্ছিলে?

দোষের কি? কাজ অত গায়ে মাখতে নেই। গোকুল একটু খাতিরও করে। তবে পাকাপাকি করতুম না। দু'চারটে বড় জোঁর। পলের দোকানটাই ফের করব একদিন।

সে তো এখানেও করতে পারো। করবে?

এখানে একটা অসুবিধে। তোমায় সবাই চেনে। দোকান দিলে তোমার অপমান হবে না তো!

শোনো কথা! আমার আবার সম্মানটা কিসের? আর দোকানদারই বা কোন খারাপ?

বাঁচালে! আমি শুধু তোমার কথা ভেবেই এতদিন কথাটা মাথায় রাখিনি।

শোনো, খোঁলা রোদে হাওয়ার ষ্টল দিয়ে বসলে হবে না। মাথার ওপর ছাউনি না থাকলে বড় কষ্ট। তুমি রোগা মানুষ, ওসব সহিবে না। দিলে ঘর ভাড়া নিয়ে দোকান দিও।

ও বাবা! সে যে বেজায় ভাড়া চাইবে। বাজারের দোকান, সেলামিও চেয়ে বসবে নির্ধাৎ।

ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না! যা লাগে তা আমি দেবো।

ভূমিই তো দিচ্ছে। শরীর পাত করে দিচ্ছে। দরকার কি ওসব বাবুগিরির? মনোহারী দোকান তো আর নয়! ফলের দোকান খোলামেলাই ভাল।

মনোহারীই বা নয় কেন?

ও বাবাঃ! পাগলী বলে কি?

ওসব পরে ভাবা যাবে। আজ বাদলা দিনে খিচুড়ি আর পাঁপের ভাজা খাবে?

বসন্ত যে বসে থাকবে বটতলায় আমার জন্য!

তোমাকে আজ বেরোতে দিচ্ছে কে?

তাহলে অন্তত তাকে খবরটা দিয়ে আসতে হয়! লোকটা অপেক্ষা করবে। কাল সকাল থেকে যজ্ঞবাড়ির রান্না, আজ বেলাবেলি গিয়ে সব ব্যবস্থাপত্তর যোগাড়-খন্তর করার কথা।

ওই অলক্ষণে বাস্তৱটা খুলে জামাকাপড় সব নামিয়ে রাখা। তারপর ছাতাটা নিয়ে এক দৌড়ে তাকে জানিয়ে এসো গে যে, যেতে পারবে না।

কথার খেলাপ হবে না তাতে?

মোটাই হবে না! মাঝে মাঝে বাঁচার জন্য কথার খেলাপ করতে হয়। তাতে দোষ নেই। আর যোগালির কি অভাব নাকি? চারদিকে কত বেকার লোক!

তা বটে।

দোকান থেকে একটু ঘি এনো। রসময়ের দোকানে পাওয়া যায়। আর পঁচিশ পয়সার তেজপাতা।

ও বাবা! আজ তো দেখছি ভোজবাড়ি?

যাও, দেরি কোরো না।

উঠে পড়ল নিমাই। ছাতা মাথায় সে বেরিয়ে যেতেই দরজা ঐটে দিল বীণাপাণি। না, এখন নিমাইকে তাড়ালে তার চলবে না। নিমাইকে তার দরকার।

তোরঙ্গটা বের করার আগে সে জানালাগুলো বন্ধ করে নিল। সাবধানের মার নেই! তোরঙ্গটা যখন খুলছে তখন বুক কাঁপছিল ভীষণ। মস্ত ভারী প্যাকেটটা সে অস্থির হাতে টেনে হিচড়ে মোড়কটা ছিঁড়ে খুলল। যা দেখল তাতে তার চক্ষুঃস্থির। ডলার আর পাউন্ডের কয়েক কেতা নোট। মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছিল তার। তাড়াতাড়ি উল্টেপাল্টে যতদূর দেখল কয়েকটা একশ ডলারের নোটও আছে। তোরঙ্গের নিচে জামাকাপড়ের তলায় জিনিসটা আবার চাপা দিয়ে রেখে তালা বন্ধ করল সে।

একটু আগে নিমাই যখন চলে যাচ্ছিল তখন মনটা বিষ হয়ে ছিল বীণার। যাচ্ছে যাক। বেঘোরে কোথায় মরে পড়ে থাকবে হয়তো! ভাই থাক! বীণা আর ভাববে না ওর কথা। মনটা শক্ত হয়ে ছিল। যেই পগার খুন হওয়ার খবরটা পেলে অমনি সব ওলট পালট হয়ে গেল কেন? মনটা নরম হল। কেন যেন মনে হতে লাগল, নিমাই ছাড়া সে একা থাকতে পারবে না! সে কি এই এত এত পড়ে পাওয়া টাকার জন্য? সে জানে, এ টাকার কথা জানলে নিমাই কিছুতেই তাকে এ টাকা ছুঁতে দেবে না। বড্ড ধর্মভীরু মানুষ।

বীণাপাণিকে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। সব দিক যাতে বজায় থাকে।

১৯

আই সি এস ই পরীক্ষায় অনীশ পেয়েছিল শতকরা একাশি নম্বর। আর আপা পেয়েছিল তিরিশি। সেই থেকে খুব গোপনে এবং গভীরে অনীশের একটা হীনস্বন্যতা দেখা দিয়েছে। হায়ার সেকেন্ডারিতে সে ওকে টপকে যেতে পারে, আবার নাও পারে। আপা ভাল মেয়ে এবং তার খুব ভাল বন্ধু। আপা তাকে সব বিষয়ে সাহায্য করতে চায়, যদিও অনীশের সাহায্য লাগে না। কিন্তু আপা এতই ভাল যে, অনীশের হীনস্বন্যতার কথা জানতে পারলে নিজের বাড়তি শতকরা দু'নম্বর এখনই তাকে দিয়ে দিতে চাইবে। সেটা অসম্ভব জেনেও চাইবে। আপা একটু ও ধরনেরই। তামিলরা বেশ বাস্তববাদী হয় বলে শুনেছে অনীশ। কিন্তু ব্যতিক্রম তো থাকেই! আপা সেই ব্যতিক্রম। এই কালো, রোগা, নিরহঙ্কারী, এবং সবসময়ে একটু ঘোরের মধ্যে থাকা মেয়েটি মোটেই বাস্তববাদী নয়। আঠারো বছর বয়সেও এই ছোটখাটো মেয়েটিকে মোটেই যুবতী বলে মনে হয় না, বরং বালিকা বলে ভ্রম হয়। আপা পুরোপুরি বালিকাও নয়, মনের মধ্যে এখনও অনেকটাই শিশু।

আপাতত আপা কলকাতার ভিথিরিদের জীবনী লিখছে। সেটা একটা কাণ্ডই। লাল কাপড়ে বাঁধাই খোরোর খাতা সবসময়ে তার সঙ্গে থাকে। ফুটপাথে হাঁটু গেড়ে বসে সে ঘন্টার পর ঘন্টা ভিথিরিদের সাক্ষাৎকার নেয় এবং তা যত্ন করে টুকে রাখে। মাঝে মাঝে টেপ রেকর্ডারও ব্যবহার করে বটে, কিন্তু মাইক মুখের সামনে ধরলে অধিকাংশ ভিথিরিই ঘাবড়ে যায় বলে সেটা ব্যবহার করে খুব কম। বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে একটা বুড়ো ভিথিরিকে আপা বাবা বলে ডাকে। জীবনী-সংক্রান্ত নোট তার অনেক জমেছে। আপার ইচ্ছে ছবিসহ বইটা আমেরিকা বা ইংলন্ড থেকে বেরোবে। খুব বিকি হবে। তার রয়্যালটি থেকে সে ভিথিরিদের জন্য একটা প্রাসাদ বানাবে ইস্টার্ন বাইপাসের কাছে কোথাও।

নাসা এবং রাশিয়ার মহাকাশ গবেষণা প্রকল্পে একটা প্রস্তাব উঠেছিল, বন্ধু দেশের কতিপয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানুষকে মহাকাশে ঘুরিয়ে আনবে। সেই প্রকল্পে নিজের নাম নথিভুক্ত করার জন্য আপা বিস্তর লেখালেখি করেছে। কোনও আশাশ্রয়কর জবাব পায়নি। সে শিখতে ভাল এয়ারো ডায়নামিকস। নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে—অর্থাৎ কেরিয়ার নিয়ে আপা চিন্তিত নয়। সে শুধু চায় পৃথিবীর সামনে ভারতবর্ষকে তুলে ধরতে। ভারতবর্ষের দারিদ্র্য, আধ্যাত্মিকতা, ভারতের বিচিত্র মানুষ ও ইতিহাসকে। আপা সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী। এ নিয়ে সে কাগজে কাগজে চিঠি লেখে। কয়েকটা চিঠি ছাপাও হয়েছে।

আপার সঙ্গ খুবই পছন্দ করে অনীশ। ওর কোনও সেক্স আপিল নেই এবং ওকে মেয়ে বলে না ভাবলেও চলে। ভাবেও না অনীশ। শুধু আজকাল, আই সি এস ই পরীক্ষার ফল বেরোবার পর থেকে তার একটু আফসোস হয়, আপার কাছে দু নম্বরের জন্য হেরে যাওয়াটা তার পৌরুষের পক্ষে অপমানজনক।

চার দিন ক্লাশে যায়নি অনীশ। সবাই জানে, তার বাবার অসুখ। আজ পাঁচ দিনের দিন দুপুরে আপা নার্সিং হোমে এসে হাজির। সঙ্গে ক্লাসের আরও পাঁচটি ছেলেমেয়ে। সুমিত সিং, অর্চনা হায়দার, রোশন, পিটার, রচনা। অনীশ সকালে আসছে না। সকালে উঠতে তার দেরি হয়। আসে দুপুরে, বিকেলে আর মাঝে মাঝে রাতেও।

মণীশকে রাখা হয়েছে ইনটেনসিভ কেয়ারে। সেখানে ঢোকা বারণ। তবে কাচের পার্টিশন দিয়ে শায়িত বাবাকে দেখতে পায অনীশ। হ-হ করা বুক নিয়ে সে দেখে। চব্বিশ ঘণ্টা মনিটরিং-এ রয়েছে তার বাবা। কথা বন্ধ, নড়াচড়া বন্ধ। শুধু ওষুধ দিয়ে নিরন্তর ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়।

বেশীর ভাগ সময়ে বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকে অনীশ। আর ঘটায় ঘটায় খবর নেয়। বাবাহীন পৃথিবী কি সে সহ্য করতে পারবে? বাবা ছাড়া বেঁচে থাকারটা কি মানে থাকবে কোনও? আজকাল এই একটি চিন্তাতেই তার মাথা ভার হয়ে থাকে। মাইনাস বাবা এই পৃথিবীর, এই জীবনের কোনও বর্ণ, কোনও স্বাদ থাকবে না। বড় নিঃসঙ্গ লাগবে তার। ভীষণ একা। ভয় করবে।

পাশ করার পর ইদানিং তার বাবা তাকে মাঝে মাঝে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করছিল, ইউ আর কোয়াইট এ ইয়ংম্যান নাউ। এনি গার্ল? ইজ দেয়ার এনি গার্ল?

না বাবা, নো গার্ল।

মণীশ জু কুঁচকে চিন্তিতভাবে বলে, সাম ডে এ গার্ল মে টেক এ প্রেস ইন ইওর লাইফ। এ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট প্রেস। চুজ হার ইওরসেল্ফ। বাট বি চুজি। ভেরি ভেরি চুজি।

কিন্তু অনীশের জীবনে এখনও সেই অর্থে কোনও মেয়ে বা মহিলা নেই। তার দিগন্ত কেউ আড়াল করে দাঁড়ায়নি। তার অনেক অনেক মেয়ে-বন্ধু আছে। সম্পর্ক খুবই সহজ, জটিলতানূন্য।

এ সব প্রসঙ্গ উঠলে তার মা একটু রাগ করে, কেন এখনই ওসব ওর মাথায় ঢোকাচ্ছে বলা তো? ও তো বলতে গেলেও এখনও দুধের শিশু।

মণীশ গম্ভীর হয়ে বলে, প্রাপ্তে তু ষোড়শবর্ষে পুত্রমিব্রবাদচারেং। আমি চাই আমার ছেলে আমার কাছে জলের মতো সহজ হোক, তাতে কমপ্লিকেশনসের ভয় থাকবে না। অধিকাংশ বাবাই এটা না বলে জেনারেশন গ্যাপ তৈরি হয়।

মায়েরা কখনও বোঝে না এসব। তার মা এখনও ছেলের শৈশব আঁকড়ে পড়ে আছেন। তাই তর্ক করে বাবার সঙ্গে। বাবাকে আকষ্ট ভালবাসে অনীশ। এত ভালবাসে যে, তার মনে হয় বাবা মরে গেলে তাকেও হয়তো আত্মহত্যা করতে হবে।

বন্ধু ও বান্ধবীরা যখন দুপুরবেলা আচমকা এসে হাজির হলে, তখন নিঃসঙ্গ অনীশের মনে হল, এদের সঙ্গে তার দেখা হল দু হাজার বছর পর। কতকাল সেখনি ওদের! এত একা, এত মৃত্যুহিম, এত অসহায় লাগছে নিজেকে যে, অনীশ নিজেকে দেখে নিজেই অবাক!

নার্সিং হোমের লবিটা বিরাট বড়। দুপুরবেলা একটু ফাঁকা। তারা বসে গেল। বন্ধুদের মুখ সমযোচিত গম্ভীর। অনীশ শুকনো মুখে বলে, গ্রীজ নাইল এ বিট। আমি একটু হাসিমুখ দেখতে চাই।

বাস্তবিক ওদের মুখের গাভীর্থ—যতই কৃত্রিম হোক—সহ্য হয় না অনীশের। চারদিকটা শোকার্ত হয়ে পড়লে সে যে জোর পায় না।

বন্ধুরা একটু হাসল। তবে জোর করে। একটু সাহস-টাহস দিল। সুমিতের বাবা মস্ত হার্ট স্পেশালিষ্ট। তবে এখন আমেরিকায় গেছেন একটা কনফারেন্সে। সুমিত মুখে আফসোসের শব্দ করে বলল, ড্যাডি আমেরিকায় না গেলে আমি ড্যাডিকে নিয়ে আসতাম। এনিওয়ে অল বিগ ফিজিসিয়নস্ আর হিয়ার। নো ওরি।

একটু পড়াশুনোর কথা হল, একটু খেলাধুলার কথা হল, একটু পপ মিউজিকের কথা হল। তারপর আপা ছাড়া সবাই চলে গেল।

আপা বলে, তুমি কিছু খাবনি অনীশ? লানচ?

লানচ-ফানচ এখন মাথায় উঠেছে। বিদে পেলে—অর্থাৎ খুব বিদে পেলে দুটো কলা বা বিস্কুট খেয়ে নিই।

তুমি অনেক উইক হয়ে গেছ। চোখের কোল বসে গেছে। চলো তোমাকে কিছু খাইয়ে আনি।

আরে না ভাই, খেতে ইচ্ছে করে না আমার। টেনশনের মধ্যে কি খাওয়া যায়!

তোমাকে শুষ্কের খেতে বলছি না। ট্রাই ফাস্ট ফুড। কিংবা ফ্রুট জুস। এগুলো খেতে কোনও বোরডম নেই। খেয়ে যাচ্ছি তো খেয়েই যাচ্ছি—আমারও ওরকম ভাল লাগে না। চলো, স্ট্রিং না থাকলে তোমার বাবার কোন উপকার করতে পারবে তুমি?

অনীশ রাজী হয়ে গেল। ফলের রস খেতে তার আপত্তি নেই। আর শরীরটা তার বেশ দুর্বল লাগছে আজকাল।

নার্সিং হোমের কাছাকাছি একটা রেইনুয়েটে গিয়ে দুজনে দু'গ্লাস মুসুরির রস নিয়ে বসে গেল। অনীশ তার সব সহপাঠী বন্ধু এবং বাবার সঙ্গে ইংরিজিতেই কথা বলে। ব্যতিক্রম শুধু আপা। এ মেয়েটা ঝরঝরে বাংলা বলে এবং বাংলা ছাড়া ইংরেজিতে কখনও কথা বলে না অনীশের সঙ্গে। আপা বলে, তোমাদের প্যাট্রিওটিজম নেই জানি। এখন যা আছে সেটা হল প্রভিনসিয়াল প্যাট্রিওটিজম। তামিলরা তামিলনাড়ু, কন্নড়রা কর্ণাটক, পঞ্জাবীরা পঞ্জাব নিয়ে পড়ে আছে। কিন্তু তোমরা বাঙালী আপার মিডলক্লাস—তোমাদের সেটাও নেই। আর কিছু না পারো মাতৃভাষায় কথাটা বোঝো বাপু।

আপা বাংলা জানে বললে ভুল হবে, সে বাংলার গোটা ইতিহাস জানে। বাংলা সাহিত্য জানে। বাংলা লোকসাহিত্য অবধি জানে।

এক চুমুকে গ্রাস শেষ করে অনীশ আরও এক গ্রাস নিল। তারপর আপাকে জিজ্ঞেস করল; আচ্ছা, আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর— এ লাইন তুমি শুনেছো ?

আপা অবাক হয়ে বলে, কেন বলে তো!

অনীশ একটু লজ্জা পেয়ে বলে, আমার সতেরো বছর কমপ্লিট হওয়ার পর থেকেই আমার বাবা মাঝে মাঝে এ লাইনটা বলে। আমি তো বুঝতেই পারি না, আঠারো বছর বয়সটাই কেন ভয়ংকর ? বাবার ধারণা আঠারো বছর বয়স হলেই ছেলেরা রান আফটার পার্লস অ্যান্ড ডু আনডুয়েবল থিংস। কিন্তু দেখ আপা, আমাদের আঠারো বছর বয়সটা কি সত্যিই ওরকম ? পড়াশুনো, কেরিয়ার বিল্ডিং, হাজারো টেনশনের মধ্যে আমরা কি বয়সটা টের পাই ? ইজ ইট এ রিয়েলি ডেনজারাস এজ ? লাইনটা কার জানো ?

তোমাকে নিয়ে আর পারাই যায় না। এটা কবি সুকান্তর লাইন।

সুকান্ত! মিন, সুকান্ত ভট্টাচার্য ?

হ্যাঁ বন্ধু। পড়োনি ?

না। জাস্ট নামটা শোনো। পড়বার সময়টা কোথায় বেলো তো ? আমাদের সময় বলে কিছু আছে ?

আমি তাহলে কি করে সময় পাই ?

তুমি! তোমার কথা আলাদা, তুমি একসেপশনাল।

মোটাই নয় বাবা। তবে আমি তোমার মতো কেরিয়ার-কনশাস নই। আমি যা পড়ি তা ভালবেসে পড়ি।

ওই আঠারো বছর নিয়ে কবিতা একদিন আমাকে শোনাবে ?

মুখস্থ নেই। তবে বই দিতে পারি।

ঠিক আছে। আমার বাবা কেন লাইনটা কোট করে তা আমার জানা দরকার! আপা, তোমার কি মনে হয় বাবা সারভাইভ করবে ?

কেন করবে না ? ওঁর বয়স কত ?

পঞ্চাশের ঘরে। আরলি ফিফটিজ। কিন্তু বয়সটা বড় কথা নয়।

নৈরাশ্যের মধ্যেও আশার কথা ভাবতে পারাটাই সবচেয়ে বড় ফিলজফি—তা জানো ?

ভাবতে হলে বুকের জোর চাই। আমি যে একদম জোর পাচ্ছি না আপা। বাবার কিছু হলে আমি বাঁচব না।

আপার চোখ হঠাৎ ছলছল করে উঠল। টেবিলের ওপর রাখা অনীশের হাতটা ধরে থেকে সে বলল, তুমি এই কারণেই ভীষণ ভাল।

কি কারণে ?

পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্মঃ, পিতাহি পরমঃ তপঃ, তুমি কথাটা মানো ?

শুনেছি, অতটা নয়, তবে আমি বাবা ছাড়া অন্ধকার দেখি। মা বলে, বাবাই নাকি আদর আর আশকারা দিয়ে আমাকে নাবালক করে রেখেছে।

মা-বাবা ওরকমই হয়। ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে তারা ভীষণ প্যাশনেট। কিন্তু কি জানো, স্নেহ সবসময়ে নিম্নগামী। মা-বাবা আমাদের যতটা ভালবাসে আমরা কিছুতেই তাদের ততটা ভালবাসতে পারি না।

বাজে কথা আপা। আমি কিন্তু—

তুমি তো প্রকৃতির নিয়ম উল্টে দিতে পারো না। তবে আমি মানছি তুমি তোমার বাবাকে খুব ভালবাসো, যতটা আমাদের বন্ধুদের কারও মধ্যেই দেখি না। আর সেইজন্যই তুমি ভীষণ ভাল।

থ্যাংক ইউ। কিন্তু তুমি জানো না, আমার বাবাও ভীষণ ভাল। আইডিয়াল ম্যান।

কেন জানবো না! তোমার বাবার সঙ্গে তো আমি কত কথা বলেছি। অনেক খবর রাখেন। প্রচুর পড়াশুনো করেছেন। স্মার্ট।

অ্যান্ড অনেস্ট। অ্যান্ড লাভিং। অ্যান্ড কেয়ারিং।

আপা অনীশের হাতে মৃদু চাপড় দিয়ে বলে, শোনো, এখন বাবার কথা অত ভেবো না। মনটাকে অন্যদিকে সরিয়ে নাও।

কি করে ?

জোর করে। সবসময়ে বাবার কথা ভাবছো, অথচ তার জন্য প্র্যাকটিক্যালি তোমার কিছু করার নেই, এটা তোমাকে ভীষণ দুর্বল করে ফেলছে। জোর করে মনটাকে অন্য চিন্তা-ভাবনায় নিয়ে যাও। পৃথিবীটা তো অনেক বড়, কত কি আছে, ভাবতে পারো না!

না।

তাহলে একটা কাজ করবে ? আমার সঙ্গে দাবা খেলবে ?

দাবা ? যাঃ!

দাবা খুব ভাল খেলা। মনটাকে একদম গ্রেফতার করে নেয়। কিছুক্ষণ খুব রিলিফ পাবে। আর যদি থ্রিলার পড়তে চাও আমি তোমাকে একটা দারুণ বই দিতে পারি। রোড টু গনডলফো। পোপকে চুরি করার একটা মজাদার উপন্যাস পড়বে ?

অনীশ হেসে ফেলে। বলে, বাবার কথা ভাবতে তো আমার খরাপ লাগছে না। মনটাকে অত সহজে সরানো যাবে না আপা!

আমি মনে করি কাল থেকে তোমার ক্লাস করাও উচিত। তোমার বাবা নার্সিং হোম-এ, ডাক্তাররা যা করার করবে। তুমি কেন ক্লাসে যাচ্ছে না ?

পড়াশুনোর চিন্তা মাথায় উঠেছে। আমাদের ফিউচারও খুব আনসার্টেন। বাবাই আমাদের সোর্স অফ ইনকাম। চাকরিটা ভাল। কিন্তু আমাদের ব্যান্ড ব্যালাস বা প্রপার্টি নেই।

তাহলে সুকান্তর কবিতাটা তোমাকে শুনিয়ে লাভ নেই, ও কবিতা তুমি বুঝবে না।

তার মানে ?

সুকান্তর আমল আঠারো বছরের ছেলেরা এত হিসেবী ছিল না। পকেটে টাকা নেই, ভবিষ্যতের আশা নেই, অথচ দুনিয়াটা তার নিজের বলে মনে হয়। তুমি সেরকম যুবক বোধ হয় কখনও হবে না।

না না, কবিতাটা আমি তবু শুনতে চাই আপা। কি কারণে আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর, আমাকে জানতে হবে।

‘ভয়ংকর’ শব্দটা এবং আপা দুপুর থেকে বিকেল অবধি তার সঙ্গে রইল। তারপর আপা চলে গেল, কিন্তু ‘ভয়ংকর’ শব্দটা গেল না।

ভিজিটিং আওয়ারে অপর্ণা এসে ছেলের দিকে চেয়ে বলল, তুই ডেবেইস কি বল তো! এভাবে কি নিজেকে শেষ করতে চাস ? দুপুরে কিছু খাসনি। বাবার অসুখ কি আর কারও করে না ?

কাতর গলায় অনীশ বলে, আপোটাাইট নেই মা। গা বমি-বমি করছিল।

খালি পেট বলেই ওরকম করেছে। সকালে শুধু দুখানা বিস্কুট আর চা ছাড়া তার পেটে কিছুই যায়নি।

গেছে মা। আপা এসেছিল। আমরা হুট জুস খেয়েছি।

অত ভাবহিস কেন বল তো! আজ সকাল থেকে তোর বাবার অবস্থা স্টেবল। আমরা তো ফোনে খবর নিচ্ছিই। এখন বাড়ি যা। আমি খাবার সাজিয়ে রেখে এসেছি টেবিলে, খেয়ে নিস। তারপর একটু রেস্ট নে।

আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর... আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর বিভ্রিভি করতে করতে তার বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। কোন এক ঘোরের মধ্যে কোন বাসে চড়ে যেন— বসে বা দাঁড়িয়ে— ঠিক মনে নেই, সে বাড়ি ফিরে এল। তার বাবা ইদানীং তাকে একটা স্কুটার কিনে দেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করেছিল। বাসে ভিড়। কিন্তু অপর্ণা এই প্রস্তাব গুঠার সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করেছে, পাগল নাকি! স্কুটার ভীষণ বিপজ্জনক জিনিস। আমি যতদিন বেঁচে আছি ওসব হবে না।

একটা স্কুটার বা মোটরবাইক থাকলে তার অনেক সুবিধে হত। তার অনেক বন্ধুর আছে অ্যাকসিডেন্ট জিনিসটাই তো অ্যাকসিডেন্ট। রাস্তায় হাটছিল একটা লোক, পাঁচতলার ছাদে কাপড় রোদে শুকোতে দিয়ে ইট-চাপা দিয়েছিল কেউ, বাতাসের তোড়ে কাপড় উড়ে ইট খসে পড়ল সোজা মাথার চাদিতে, লোকে তো এ ভাবেও মরে! খবরের কাগজে এ খবর পড়েছে অনীশ। মৃত্যু-ভয় আছে জেনেও মানুষ উঁচু পাহাড়ে চড়ে, রেসিং কার চালায়, প্লেন ওড়ায়, আরও কত কী করে!

ডেবে লাভ নেই। মা ওসব যুক্তির ধার ধারে না। কিন্তু তার বিবেচক বাবা কথাটা যে ডেবেছিল, তাতেই সে আজ যথেষ্ট কৃতজ্ঞ বোধ করে। বাবার অন্তত আপত্তি ছিল না।

রাত সাড়ে আটটার সময় দাবার এক চাল খেলা শেষ করল ঝুমকি আর অনীশ। জমল না। তারা কেউ মন দিয়ে চাল দেয়নি, কেউ জিততে চায়নি, ডুল চাল ফেরত নেয়নি। মাত্র পনেরো মিনিটে খেলাটা শেষ হয়েছে। ষ্টিপুলো নাড়াঘাটা করতে করতে অনীশ বলে, বাবা তাকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসে রে দিদি!

তাকে।

না, তোকে।

আগে আমাকেই বাসতো। এখন তোকে।

মোটেই নয়।

তোর চেয়ে বেশী কিন্তু আমি ভালবাসি বাবাকে।

চ্যালেঞ্জ।

জানিস তো, ছেলেরা বিয়ে করলেই কাত! কিন্তু মেয়েরা মোটেই সেরকম নয়।

বিয়েই করব না।

ওরকম সবাই বলে, আবার করেও। তারপর বউ-পাগলা ঝগড়া হয়ে সবাইকে ভুলে যায়। মা বাবা ভাই বোন কাউকে আর পাত্তা দেয় না। ছেলেগুলো ভীষণ ট্রচারাস।

তুই মেয়েদের খুব সাপোটার, না ?

তা কেন, যা সত্যি তাই বলছি।

শোন দিদি, আজ আমার ঝগড়া করতে ইচ্ছে নেই। মনটা বিগড়ে আছে। তুই একটা কবিতা পড়েছিস, যাতে এই লাইনটা আছে, আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর ?

ঝুমকি একটু জ্ব কুঁচকে বলে, পড়েছি। সুকান্ত। কেন বল তো ?

আমার একটুও বাংলা নলেজ নেই। এমন কি আপাও কত কী জানে। আমি কবিতাটা জানিই না!

কবিতাটা হঠাৎ তোর মনে পড়ল কেন ?

আজকাল বাবা আমাকে প্রায়ই লাইনটা বলে। কেন বলে তা বুঝতে পারছি না। বাংলা আমি কিছু জানি না।

জানবি কি করে! ইংলিশ মিডিয়মে পড়ে পড়ে ট্যাশ গরু তৈরি হয়েছিস যে। আমি তো তোর মতো ইংলিশ মিডিয়মে পড়িনি। বাবা পড়ায়নি। তুই হচ্ছি ড্যাডিজ ব্রু আইড বয়।

ইংলিশ মিডিয়মে পড়লে ট্যাশ গরু হয় ? ট্যাশ গরু মানে কি বল তো! সামথিং মিস্ত্র আপা ? ক্রস ব্রিড ?

তোকে নিয়ে আর পারা যায় না। অনু আর তুই দুটোই ট্যাশ-গরু।

বল না!

কবিতাটা পড়েছিস ?

বললাম তো বাংলা নলেজ নেই।

ট্যাগ গরু একটা মজার কথা। এ ফানি মিস্ত্রি আপ। তবে আসলে ননসেন্স ভার্স।

আর ও কবিতাটা! আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর!

ওটা ননসেন্স ভার্স নয়। পোয়েট্রি।

বাবা ওটা আমাকে কেন বলে?

বাবার ভয় আঠারো বয়স হওয়ার পর তুই একটু ওয়াইন্ড হয়ে যেতে পারিস।

ওয়াইন্ড! আমি! আমি তো বরাবর শান্ত ছেলে।

ঝুমকি জু কুচকে বলল, তাই বুঝি? আজকাল নিজের ক্যারেকটর সার্টিফিকেট নিজেই দিচ্ছিস? তোর কিল ঘুষি, চুলটানার ব্যথা আজও আমার যায়নি, তা জানিস?

ওঃ, তোর কথা তো আলাদা। দিদিদের সঙ্গে ভাইরা সকলেই ওরকম এক-আধটু করে।

ইস, মায়ের কথাগুলো কেমন মনে করে রেখেছে দেখ!

আম্মা, আমি সত্যিই ওয়াইন্ড হয়ে যেতে পারি বলে বাবা মনে করে?

বাবা তোকে নিয়ে ভীষণ ভাবে। তাই বলে। আঠারো বছর বয়সটা একটু খারাপ।

এই সময়ে রান্নাঘরে একা অপর্ণা। গ্যাসের উনুনে মাছের ঝোল আর ডাল ফুটছে। রুটি বেলেছে কাজের মেয়েটা। রোজ একইরকম একঘেয়ে দৃশ্য। সে এই রান্না করা, খাওয়া, শোওয়া, ওঠা, রান্না করা... ইত্যাদি একটা ছক থেকে বেরোনোর কোনও পথ খুঁজে পায় না। মাকড়সার জাল যেমন এও ঠিক তেমন। নিজের জালের পরিধিতে দিনের পর দিন আটকে থাকে মাকড়সা। অপর্ণাও কি তাই?

আজ বিকেলেও মণীশকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখতে পেল না অপর্ণা। ডাক্তার বলছে, অবস্থা স্টেবল। কিন্তু তেমন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলছে না। আজ মণীশের বস এসেছিল বিশাল একখানা কনটো সা গাড়িতে চেপে, বয়স চম্পিশের নিচে। দারুণ স্মার্ট, পার্শি লোকটা ডাক্তারের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ গম্ভীর মুখে কথা বলছিল। ইংরিজিতে। অপর্ণা পাশেই ছিল, কিন্তু এক বর্ণও বুঝতে পারেনি। অনীশ বা অনু হলে বুঝত। অপর্ণা ওরকম খই-ফোনা ইংরিজি বুঝতে পারে না। মণীশের বস বনাতওয়ালার আবার বিদেশেই জন্ম, সেখানেই লেখাপড়া।

পুরো না বুঝলেও ভাবসাব এবং গলার স্বর থেকে অনুমান করতে পারে, মণীশের বেঁচে যাওয়ার একটা আউটসাইড চান্স আছে। আউটসাইড চান্স কাকে বলে তা অবশ্য অপর্ণা জানে।

ছেলেমেয়েদের মতো অপর্ণা ভেঙে পড়েনি বটে, কিন্তু তাকে অনেক চাপ নিতে, হচ্ছ মনের মধ্যে। অপর্ণা আর কতটা পারবে, তা জানে না। তবে সে পৃথিবীর এবং জীবনের নেতিবাচক দিকটাকে সবসময়ে বড় করে দেখে, সঠিক গুরুত্ব দেয়। তার আশা ভরসা, স্বপ্ন কখনোই মাত্রা-ছাড়া নয়। মণীশ যেমন আদ্যন্ত রূপের ঘোরের বাস করে, অপর্ণার তেমনই সবসময়ে কঠিন মাটিতে পা।

মাছের ঝোল বেশী রাখতে নেই, তাহলে রুটির সঙ্গে ওরা ডাল বাবে না। আসলে রুটির সঙ্গে ডিম বা মাংসই ভাল। কিন্তু অপর্ণার সময় হয়নি বাজার করার। ফ্রিজ মাছ ছিল, তাই রাখছে। মণীশের অসুখ বলে ওরা হয়তো খাবার নিয়ে কথা তুলবে না। খুশী না হলেও না। ওরা খাবারের স্বাদ পায় না এখন। বাবা ওদের ভুবনময়। বাস্তববাদী অপর্ণা, হিসেবী অপর্ণা, একটু কুপণ অপর্ণার চেয়ে ওরা অনেক বেশী পছন্দ করে বেহিসেবী, ক্যাপাটে, স্বপ্নশীল মণীশকে।

সেই একই কারণে কি অপর্ণাও পছন্দ করেনি মণীশকে?

ঘুমচোখে অনুশীলা এসে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াল, মা, এ সময়ে কি ড্যাডিকে নিয়ে ডিসকাস করা ভাল?

কে ডিসকাস করছে?

ওই তো ওরা করছে। দাদা আর দিদি।

ডিসকাস করলে কী হয়?

এ সময়ে তো ড্যাডি সিক। এখন কী ডিসকাস করা ভাল? সুপারস্টিশন আছে না?

কিসের সুপারস্টিশন?

ডিসকাস করাটা আমার ভাল লাগছে না। আমাদের চুপ করে থাকা উচিত!

তা কেন? ডিসকাস করলে খারাপ কিছু হয় না। তুই আজ সারাদিন বেরোসানি, যা একটু ছাদে ঘুরে আয়।

ছাদটা ভীষণ অন্ধকার। আমি ভয় পাই।

উঃ, তোর ভয় নিয়ে আর পারি না বাপু। ভয়ে ভয়েই তুই শেষ হয়ে গেলি। বড় হচ্ছিস, এখনও অত ভয় কিসের!

অনু ছলো ছলো চোখে চেয়ে থাকে। জবাব দেয় না।

অপর্ণা বলে, তাহলে যা না, স্টিরিওটা চালিয়ে গান শোন। পিয়াসার ক্যাসেটটা চালা, আমিও শুনতে পারো।

তার চেয়ে আমি বরং মোহিনীদের বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসি মা? ও রোজ আসে, আমি তো যাই না।

ক'টা বাজে?

পৌনে আটটা মাত্র। কাছেই তো!

একটু দোনোমোনো করে অপর্ণা। পাড়ার একটা কেঁট ঠাকুর সম্প্রতি অনুর পিছনে লেগেছে। ঘন ঘন বাড়ির সামনে দিয়ে যাতায়াত করে। লেটার বস্ত্রে চিঠিও ফেলে গেছে দু দিন। গুরুতর কিছু নয়। তবু সাবধান হওয়া ভাল।

এত রাতে যাওয়া ভাল দেখাবে না।

কেন, কি হয়েছে মা? এক মিনিটের তো রাস্তা!

সেই ছেলেটা যদি পিছু-টিছু নেয়?

নিক না। কী করবে? ওরা তো কাওয়ার্ড টাইপেরই হয়। সামনে আসতে সাহস পায় না। আমি পাস্তাই দিই না।

সে আমি জানি।

ও ছেলেটা একদম হ্যাংলা। মোহিনীর পিছনেও লেগেছিল। ওরকমই চিঠি দিত।
 তারপর কী হল ?
 কী আবার হবে! মোহিনী পাত্তা দেয়নি, তাই আর পিছনেও লাগে না। তুমি ভয় পেও না।
 যা তাহলে। মনটা একটু ভাল লাগবে। ছাড়া নিয়ে যাস। বৃষ্টি আসতে পারে। আধঘণ্টার মধ্যে ফিরবি।
 ঠিক আছে।
 মোহিনী তোর কেমন বন্ধু ?
 জাপ্ট বন্ধু।
 ওরা ভাল লোক তো ?
 খুব ভাল। ওর বাবা ফার্মার ছিল।
 কী ছিল ?
 ফার্মার। চাষ-টাস যারা করে।
 চাষা নাকি ?
 ঠিক তা নয়। তবে ওরকমই। ওদের গ্রামটা ভীষণ নাকি অজ পাড়া গাঁ। শেয়াল ডাকে।
 কে থাকে সেখানে ?
 সবাই। মোহিনী বলেছে ওর দাদু-টাদু সব সেকলে আর আনএডুকেটেড।
 কিন্তু ওর বাবা তো বিরাট চাকরি করে! বিদেশে যায় শুনেছি!
 ওর বাবা একজন প্রাইম এনভিরনমেন্টালিস্ট।
 সেটা আবার কী ?
 ও তুমি বুঝবে না। নাইস ম্যান। খুব শান্ত, ঠাণ্ডা, ভেরি আভারস্ট্যাটিং। ঠিক আমার বাবার মতোই।
 চাষা ছিল বলছিস ?
 খুব গরিব। ওদের সঙ্গে একদম মলে না। সম্পর্কও নেই।
 তাই বল! যাবো মা ?
 যা।

॥ ১০ ॥

রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, কামিনী-কাঞ্চন থেকে তফাত তফাত খুব তফাত থাকে। কাঞ্চনকে এড়াতে পারেনি হোমাস।
 তবে কামিনীকে অনেকটাই পেয়েছে। গড়চার বাড়িতে আসার পর তার জীবন প্রায় কামিনী-শূন্য।
 তবে এই যে একটা গোটা বাড়ি নিয়ে সে একা থাকে এটা কারও কারও কাছে খুব অন্যায্য রকমের বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। বিশেষ করে পিসতুতো দিদি চারুশীলার কাছে। পিসতুতো হলেও চারুশীলা একসময়ে তাদের বাড়িতেই লালিত পালিত হয়েছে। কারণ পিসিমার ছিল দুরারোগ্য নানা আধিব্যাধি। চারুশীলাকে দেখার কেউ ছিল না। সেই শিশুকাল থেকে চারুশীলা তার ওপর শতক খবরদারি করে এসেছে। আজও করে। মাঝে মাঝে এসে বলে, অ্যাই, তোর বাড়িটা সামনের শনিবার ছাড়তে হবে, আমি এখানে একটা পাটি দেবো।

হোমাস আপত্তি করলেও এঁটে ওঠে না। দিদিটি বড়ই প্রখরা। যখন মুখ ছোটায় তখন রোখে কার সাধ্য। হোমাস অগত্যা বাড়ি ছেড়ে কোনও ছোটখাটো ট্যুরে আশেপাশে কোনও জায়গায় চলে যেতে বাধ্য হয়। মেয়েদের সে যে পছন্দ করে না তার অন্যতম প্রধান কারণ কি এই দিদিটি ? হতে পারে। চারুশীলা দুর্দান্ত সুন্দরী। দুটো সিনেমার নায়িকাও হয়েছিল। মুখখানা এমনিতে সুন্দর হলেও ফটোগ্রাফী নয় বলে আর বিশেষ সুযোগ পায়নি। তবে সুন্দরী বলেই ভাল একখানা বর বাগিয়ে নিয়েছে। ওর স্বামী আন্তর্জাতিক সম্মান-টম্মান পাওয়া একজন বিখ্যাত স্থপতি। সল্ট লেকে অনেকগুলো বাড়ি তার ডিজাইন করা। দিল্লি, বোম্বাই, নিউ জার্সি ও লন্ডনের শহরতলীতে সে বেশ কয়েকটা বাড়ি বানিয়ে নাম করে ফেলেছে। দেদার টাকা। উদয়াস্ত ব্যস্ত মানুষ। স্বামী যেমন ব্যস্ত, বউটির তেমনই অখন্ড অবসর। সারাদিন নেই কাজ তো খই কাজ করে বেড়াচ্ছে। পাটি দেওয়ার জন্য চারুশীলার জায়গার অভাব নেই। গোলপার্কার কাছে তার নিজস্ব বাড়িটিই কি কম ? তবু চারুশীলা যে হোমাসের বাড়ি মাঝে মাঝে ধার করে সে শুধু কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বজায় রাখার জন্য।

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর সভ্যতাকে হোমাস খুব অপছন্দ করে না। সে বিজ্ঞানের ছাত্র নয়, কারণ সলিড জিওমেট্রিও ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস তাকে চোখ রাঙিয়ে এমন ভয় দেখিয়েছিল যে, সে পালিয়ে বাচে। কিন্তু বিজ্ঞানের অত্যাচার্য আবিষ্কারসমূহকে সে অতিশয় বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করে। বিশেষ করে ভোগ্যপণ্য ও নিত্য ব্যবহার্য যে সব জিনিস হাতের কাছে এগিয়ে দিচ্ছে বিজ্ঞান, সেগুলিই তাকে আকর্ষণ করে সবচেয়ে বেশী। তবে বিজ্ঞানের কিছু অভিশাপও আছে। তার মধ্যে একটা হল টেলিফোন আর বাড়িটাকে টেলিফোনমুক্ত রাখতে পারলে সে সত্যিকারের স্বাধীন হতে পারত। কিন্তু ভাড়াটে ভদ্রলোক অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে একটা জ্যান্ত টেলিফোনও রেখে গেছেন এবং হোমাসের বাবা সেটা বহাল রেখেছেন। ফলে বহির্জগতের নানা কৌতুহল ও প্রশ্ন তাকে সময়ে অসময়ে ব্যতিবাস্ত রাখে। পিসতুতো দিদি চারুশীলার আক্রমণ ওই টেলিফোনের মাধ্যমেই আসে সবচেয়ে বেশী।

রাত দশটায় হোমাস খাও মনোযোগে ভি সি আর-এ একখানা সায়েন্স ফিকশনের ক্যাসেট চালিয়ে দেখছিল। ঠিক এই সময়ে চারুশীলার টেলিফোন এল।

কি রে কিছুত! কী করছিস ?

হ্যালো আইডল ব্রেন, আবার কিসের দরকার পড়ল ?

পারিবি—৬

তোর ঘরে কিসের শব্দ হচ্ছে বলতো? ভি সি আর চলছে নাকি? একা বাড়িতে বসে ব্লু ফিল্ম দেখছিস না তো!
 তুই একটা অভ্যস্ত বাজে মেয়ে, তা কি জানিস?
 একটু হেসে চারুশীলা বলে, আহা, দোষের তো কিছু নয়। এখন বয়স হয়েছে, একা বাড়িতে থাকিস, ওসব তো হবেই বাবা। স্বীকার করলেই হয়। শুধু শুধু সাধু সেজে থাকা কেন বাপু?
 তোর মতো সবাই রন্দি মার্কী কিনা। আমি একটা সায়েন্স ফিকশন দেখছি।
 আজকাল বেশীর ভাগ ইংরিজি ছবিতেই একটু পার্গেয়াফি থাকে।
 থাকলে থাকে। তোকে আমার মরাল গার্লিয়ান হতে হবে না।
 আবার খিলখিল হাসি শোনা গেল।
 হোমাস গম্বীর গলায় বলে, দেখ, রাত দশটার সময় ইয়ার্কি ভাল লাগে না। ছবিটা শেষ হলেই আমি শুতে যাবো।
 কাল অপিস আছে। তোর মতো বেলা ন'টায় ঘুম থেকে উঠলে আমার চলবে না।
 তুই কিরকম কাজের লোক তো জানি। আমিও একটা দরকারেই ফোন করছি। মোটেই ইয়ার্কি নয় সেটা।
 তাহলে ড্যানতাড়া করছিস কেন? কী দরকার?
 আচ্ছা, তোর একজন চেনাজানা হোমিওপ্যাথ আছে না? চৌধুরী না কী যেন!
 আছে তো। কগদ চৌধুরী।
 অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া কি শক্ত?
 দিন দশেক লাগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে। কেন?
 আমার একটা বন্ধু আছে না, রিয়া, ওর একটু প্রবলেম হচ্ছে।
 কী প্রবলেম?
 মেয়েদের অনেক প্রবলেম থাকে। তাতে তোর কী দরকার?
 যা বাবা! আমি তো শ্রেফ অ্যাকাডেমিক ইন্টারেস্ট থেকে জিজ্ঞেস করলাম।
 সব ব্যাপারে ছেলমানুষদের অত ইন্টারেস্ট ভাল নয়। যাকগে, কাল একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দিবি? বিকেল ছটা সাড়ে ছটা নাগাদ?
 রিয়া মানে সেই মোটাসোটা ফর্সা মতো না? যার হাজব্যান্ড একটু গেরো টাইপের, কিন্তু দারুণ কোয়ালিফায়েড!
 হ্যাঁ। কিন্তু রিয়া মোটেই মোটা নয়। সলিড হেল্থ।
 একটু বেশী সলিড। তোর মতোই।
 কী, আমি সলিড? জানিস, গত এক বছরে আমার ওজন দেড় কেজি কমেছে, দশ গ্রামও বাড়েনি!
 দেখে তো তা মনে হয় না। স্বামী বেচারি হিল্লিদিপ্পি করে মরছে আর বউ গ্যাট হয়ে বসে বসে খাচ্ছে আর মুটেচ্ছে।
 তোর মতো আইডল ব্রেনের অপলার্ফ মেয়েদের দেখে দেখেই আমার বিয়ের ইচ্ছেটা চলে গেছে।
 আর তোকে দেখে বহু মেয়ে চিরকুমারী থাকবে বলে ভৈরি হচ্ছে, তা জানিস? আমার বর হিল্লি দিল্পি করে বেড়ায় সেটা কি আমার দোষ? আমি তো বলেই দিয়েছি, অত টাকা রোজগারের কোনও দরকার নেই, এবার একটু বাড়িতে থাকো। যা আছে তাতেই আমাদের চের। কিন্তু পুরুষদের তো টাকার নেশা। আরও চাই, আরও চাই। এই যে তুই, মামার টাকার পাহাড়ের ওপর বসে আছিস, তাও টাকার গন্ধে কোথায় কোথায় হোক হোক করে বেড়াচ্ছিস। আজকাল তো শুনি গায়ে গল্পের ছোটো ছোটো ইকুলে অবধি অডিট করতে যাস। শুনে ঘেন্নায় মরে যাই।
 একটা ডড়াই পাখির মাথায় যেটুকু ঘিলু আছে সেটুকুও যদি তোর থাকত। জানিস তো, ভগবান খুব ইমপারশিয়াল। যাকে বিউটি দেন তাকে ব্রেনটা দেন না, যাকে ব্রেন দেন তাকে বিউটি থেকে বঞ্চিত করেন। এরকমই আর কি! তবে ব্রেন না থাকা খুব ভাল। ব্রেনলেসরাই জগতে সুখী। পাখির মস্তিষ্ক না হলে কেউ ভাবতে পারে যে, আমি টাকার লোভে গায়ে অডিট করতে যাই?
 তাহলে কেন যাস?
 আমার রুন্নরায় লাইফ দেখতে ভাল লাগে, তাই যাই।
 শেষে একদিন একটা গায়ের বঁধু এনে হাজির করবি নাকি? দেড় হাত গোমটার নিচে নোলক দুলাবে, চোখে জ্যাঝড়া কাজল, কনুই অবধি গয়না, পরনে রোলেক্স শাড়ি!
 তবু তোদের চেয়ে ভাল। রাত হয়ে যাচ্ছে, ছাড়ছি।
 ওরে দাঁড়া দাঁড়া। আমার অ্যাপয়েন্টমেন্টটার কী হবে?
 কী আবার হবে! বলে দেব'খন।
 দেখব'খন বললে হবে না। কালকেই চাই।
 হয়ে যাবে।
 চেয়ারটা বদীদাস টেম্পল ট্রিটে না?
 হ্যাঁ। তুই তো একবার গিয়েছিলি!
 সে তো কবে! তিন বছর আগে।
 তোর কথা শেষ হয়েছে?
 না, না, শোন লোকটার ভিজিট কত?
 জানি না। ঘাট-টাট হবে। কেন, রিয়ার কি টাকার প্রবলেম?
 না। তবে ওর মেয়ের একটা প্রাইভেট টিউটর আছে। ছেলোটা খুব ভাল। দারুণ পড়ায়। কিন্তু বোধহয় ছেলোটা এপিলেপটিক। জানিস তো, এপিলেপসির কোনও চিকিৎসা নেই। রিয়ার ইচ্ছে সেই ছেলোটাকেও নিয়ে যায়। ভিজিট বেশী হলে পেরে উঠবে না।

বেশী নয়। আমার রেফারেন্সে গেলে ভিজিট হয়তো নিতেই চাইবে না। তোরা মেয়েরা এত কিশ্বস কেন রে ?
প্রাইভেট টিউটরের চিকিৎসা করতে চায় সেটা বেশ ভাল, জেসচার, কিন্তু ভিজিট বেশী হলে চিকিৎসা করাবে না এটা
কেমন কথা ?

মেয়েরা হিসেব করে চলে বলেই স্বামীরা টিকে আছে।

বেশী বকিস না। নিজের শাড়ি, গয়না, সাজের জিনিস কেনার সময় স্বামীর টাকার মায়া করিস ? ওই একটা ব্যাপারে
মেয়েরা মোটেই কিশ্বস নয়।

তাহলে ভিজিট বেশী নয় বলহিস ?

আমি খবর রাখি না। তবে কণাদকে বলে দেবোখন যেন প্রাইভেট টিউটরের ভিজিট না নেয়, আর রিয়ার ভিজিট যেন
অবশ্যই নেয়।

ঠিক আছে বাবা, তাই হোক। রিয়া মোটেই বিনা ভিজিটে চিকিৎসা করতে চাইছে না।

এবার কি কথা শেষ হয়েছে ?

আর একটা কথা।

আবার কী ?

একটা ফার্স্ট ক্লাস মেয়ে আছে আমার হাতে। তোর সঙ্গে খুব মানাবে।

সে তো পুরোনো কাসুন্দি। তোর হাতে সব সময়েই পাঞ্জী মজুদ থাকে, আর তাদের সবাইকেই আমার সঙ্গে মানায়।

না মাইরি, এ মেয়েটা দারুণ ভাল।

ভাল না হওয়ার তো কারণ নেই। দুনিয়াতে বিস্তর ভাল মেয়ে আছে।

আমার একটা কি সন্দেহ হয় জানিস ? তোকে কেউ দাগা দিয়েছে। কিন্তু কে যে দিল সেইটেই বুঝতে পারছি না।
আগে তো সব কথা আমাকে বলতিস, আজকাল লুকোস। বলবি সত্যি কথাটা ?

বলছি। আমাকে একজন ভীষণ নাগা দিয়ে গেছে। হল তো!

ইয়ার্কি রাখ। সত্যি করে বল না ভাই!

তুই যা গুনতে ভালবাসিস তাই তো বলছি।

আচ্ছা, তুই কি নারী বিদ্বেষী ?

প্রবল রকমের। তোর মতো মেয়েদের দেখে দেখেই বিদ্বেষটা জন্মেছে।

আমর জন্য কত ছেলে পাগল ছিল তা জানিস ?

জানি। পৃথিবীতে আহাম্মকদের সংখ্যাই বেশী। আমার ঘুম পাচ্ছে, এবার ছাড়ছি।

ওরে দাঁড়া, দাঁড়া। কাজের কথাটাই তো হয়নি।

আবার কিসের কাজের কথা ?

শোন না পাগলা, কাল ডাক্তারের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে একটু প্রবলেম রয়েছে যে!

কিসের প্রবলেম ?

কাল আমাদের অস্ত্র ড্রাইভার দেশে যাচ্ছে। গাড়ি চালাবে কে ?

তার আমি কি জানি ? অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশন থেকে ড্রাইভার নিয়ে নে।

দূর পাগলা, বাইরের একটা অচেনা লোক গাড়িতে থাকলে কি ফ্রীলি কথা বলা যায়, বল! গাড়ি চড়ার আরামটাই মাটি
হয়ে যায়। অস্ত্র থাকলে কথা ছিল না, সে পুরোনো লোক।

কী বলতে চাস খোলসা করে বলবি ? অস্ত্র না থাক, তোর আর একটা গাড়ি আর তার ড্রাইভারও তো আছে।

ছাই জানিস। সেটা তো আমার কর্তা নিজে চালায়। গত সপ্তাহে আমস্টারডাম যাওয়ার আগে ড্রাইভারকে ছাড়িয়ে
দিয়ে গেছে। আমাকে বলে গেছে, যেন এই অয়েল ক্রাইসিসে দুটো গাড়ি ব্যবহার না করি। ফলে ও গাড়ি এখন অস্পৃশ্য।
কর্তা ফিরলে ফের চলবে।

তাহলে মানেটা কী দাঁড়াল ?

মানে দাঁড়াল, কাল তুই একটু সকাল সকাল অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা আমার এখানে চলে আসবি। তোর সঙ্গেই
আমরা দুই বান্ধবী ডাক্তারখানায় যাবো।

অসম্ভব! অসম্ভব!

অসম্ভব কথাটা কাদের অভিধানে থাকে তা জানিস ?

বোকাদের। আমি তো বোকাই।

বোকা একটু আছিস, তবে সেটা ধরছি না। আসলে তুই হক্সিস কলকাতার সবচেয়ে ভাল দশ জন মোটর
ড্রাইভারদের একজন। ইন ফ্যাক্ট তুই-ই হয়তো এক নম্বর।

ভাল দিয়ে লাভ হবে না রে। আমি পারব না। কলকাতায় ট্যাক্সির অভাব নেই।

কী যে বলিস তার ঠিক নেই। পুরুষ ছাড়া শুধু মেয়েরা ট্যাক্সিতে চড়ে কখনও ? যদি নিয়ে পালিয়ে যায় ?

তোকে নিয়ে কেউ পালাবে না, যদি ঘটে তার বুদ্ধি থাকে। তুই হক্সিস যে কোনও পুরুষের গভীর লায়ালিটি। আর,
কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালাদের অনেক দোষ থাকলেও মহিলা হাপিস করার বদনাম নেই। প্রতিদিন শয়ে শয়ে মেয়ে একা একটা
ট্যাক্সিতে চড়ে দাবড়ে বেড়াচ্ছে।

আমরা কি ওরকম ? অত সাহস আমার নেই। তা ছাড়া জায়গাটাও যে ভাল চিনি না। সেই কবে একবার
গিয়েছিলাম। লক্ষী, ভাই, তোর তো পরোপকারী বলে একটা নাম আছে।

আমি আজকাল তেল নিই না রে।

তেল নয়, তোর কিছু ভাল গুণ তো সত্যিই আছে। তোর কি আর সবটাই খারাপ ?
সবটাই খারাপ এমন লোক দুনিয়াতে বিশেষ নেই। ওটা কোনও কমপ্লিমেন্ট হল না। আর তোর মতো দুমকো লোকের কমপ্লিমেন্ট আমি নিইও না।

আমি দুমকো লোক! অচ্ছা বেশ তাই হল। কিন্তু একটা ট্যান্সিভে গিয়ে যদি আমাদের বিপদ হয় তো মামার কাছে মুখ দেখাতে পারবি ? নিজের বিবেককেই বা কি বলবি ?

তুই কলকাতা-চম্বা ঝানু মেয়ে, ন্যাকামি রাখ। তাকে যে-ট্যান্সিভে সীতাহরণ করবে সে এখনও মায়ের পেটে।
কিন্তু ন্যাপ নয় না-ই করল, টাকা-পয়সা গয়নাগাঁতি কেড়ে নিতে পারে তো!

না, পারে না। বাজে কথার সময় নেই। ছাড়ছি।
আহা, শোন না কথটা! ছেলেবেলায় তোর মনটা কত নরম ছিল ভাব তো। আমার একদিন স্কুল থেকে ফিরতে দেবী হয়েছিল বলে কেঁদে ভাসিয়েছিল। মনে আছে. আর একটা কথা শোন, পিন্টুটাও সঙ্গে যাবে। ওর খুব ইচ্ছে তোর সঙ্গে যায়।

উফ, তাদের চক্রান্তে একটা ইনোসেন্ট বাচ্চাকেও টেনে নামালি! তোর মতো ...
আচ্ছা, আচ্ছা, তুই বরং পিন্টুর সঙ্গেই কথা বলে দেখ!

সে যে লড়াইয়ের হারছে তা হেমাঙ্গ বুঝতে পারছিল। কিন্তু করার নেই। চারুশীলার দুই সন্তানের মধ্যে বড়টি মেয়ে নন্দনা, ছোটটি স্পন্দন বা পিন্টু। দুটিই সাহেব-বাচ্চাদের মতো সুন্দর। পিন্টুটা কোনও এক কার্যকরণে হেমাঙ্গর ভীষণ ন্যাওটা। যখন দুধের শিশু ছিল তখনই আর কারও কোলে নয়, শুধু হেমাঙ্গ হাত বাড়ালে ঝাঁপ খেয়ে চলে আসত এবং আর কারও কাছে যেতে চাইত না। হেমাঙ্গ চারুশীলাকে বলত, দেখ, শিশুরা ঠিক মানুষ চেনে। ওরা হচ্ছে ভগবানের লোক, তাই নিষাপ মানুষ দেখলেই তার কাছে চলে আসতে চায়। চারুশীলা বলত, তা নয় রে। ও আসলে তোর মধ্যে আর একটা অবোধ শিশুকেই দেখতে পায়, তাই অমন করে। তোর মাথাটা তো ডেভেলপ করেনি।

পিন্টুর বয়স এখন সাত আট হবে। আজও ওর প্রতি হেমাঙ্গর এক প্রগাঢ় মায়ী। আর পিন্টুও বড় ভালবাসে হেমাঙ্গকে। পিন্টুর কথায় বরাবর হেমাঙ্গ দুর্বল। ফোনে পিন্টুর গলা পাওয়া গেল, মামা, আমি কাল তোমার সঙ্গে যাবো কিন্তু।

যাবে। কিন্তু তোমার মা যে একটি বিষ্ণু তা কি তুমি জানো ?

হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে রোজ যগড়া করে।
আমি ভাল লোক হওয়া সত্ত্বেও করে। এসব দেখে রাখো। বড় হয়ে একদিন বিচার করো। কেমন ?
পিন্টু বুঝল না, তবু বলল, আচ্ছা।

ফোনটা রেখে দিয়ে হেমাঙ্গ ভি সি আর বন্ধ করল। ছবিটা আর দেখতে ইচ্ছে করল না। আগামী কাল তার দু'দুটো এনগেজমেন্ট আছে। খুব গুরুত্বের কিছু নয়। একটা পার্টি, আর তার আগে একজন অসুস্থ ক্লায়েন্টকে নার্সিং হোম-এ দেখতে যাওয়া। দুটোই কার্ডিয়ে দেওয়া যাবে।

মামা জিনিসটা যে কী ভয়ংকর তা ঘুমোনার আগে অনেকক্ষণ ভাবল হেমাঙ্গ। একথা নিশ্চিত যে সে বিয়ে করবে না। কিন্তু তার খুব ইচ্ছে হয়, পিন্টুর মতো নিষাপ ও দেবদুর্লভ সৌন্দর্যের একটি ছেলে তার হোক। সে একবার চারুশীলাকে বলেছিল, পিন্টুকে দত্তক দিবি ?

ইহি! দত্তক নিয়ে পাকাপাকি ব্যাচেলর থাকার ইচ্ছে ? খুব তো স্বার্থপর দেখছি। বিয়ে করে নিজের ছেলের বাপ হ' গে যা। পরের ছেলে নিয়ে টানাটানি কেন রে অলম্বুস ?

অলম্বুস শব্দের মানে হেমাঙ্গ জানে না। জানার দরকারও নেই। হয়তো ওটার কোনও মানে নেইও। চারুশীলার নিজস্ব ডিকশনারি আছে, তাতে এরকম বিস্তারিত শব্দ থাকে এবং যেগুলোর কোনও মানেই হয় না।

কিন্তু মামা জিনিসটা ভাল নয়। একদম ভাল নয়। মায়ীও একধরনের পরাধীনতা, এক ধরনের স্বাধীনতার অভাব, মুক্তির প্রতিবন্ধক। বাচ্চাদের সে খুব ভালবাসে। এই ভালবাসাটা কি একদিন তার কাল হবে ?

পরদিন অফিসের পর হেমাঙ্গ যখন গাড়ি নিয়ে চারুশীলার বাড়িতে হাজির হল তখন আরও একটা মায়ী তার জন্য অপেক্ষা করছিল। সে হল ওই প্রাইভেট টিউটরটি।

রোগা, গোবোচারা ছেলটাকে দেখলেই বোঝা যায়, এর ভিতরে গভীর ও গোপন অসুখ রয়েছে। তবু যেন বাঁচার এক প্রাণপন ইচ্ছে এর দুখানা আয়ত চক্ষুতে এসে বাসা বেঁধেছে। সেখানেই দুটি পিদিমের মতো জ্বলছে এর সবটুকু প্রাণশক্তি। অস্বস্তিতে, লজ্জায়, হীনমন্যতা ছেলটো নুয়ে পড়েছে। কৃতজ্ঞতায় ছলছল করছে চোখ। কেননা তাকে এরা নিজেদের পয়সায় চিকিৎসা করতে নিয়ে যাচ্ছে। তাও আবার গাড়িতে করে। এই বিরল সৌভাগ্যে তার যেন ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না।

কয়েক মিনিট কথা বলেই ছেলটাকে ভারী ভাল লাগতে লাগল হেমাঙ্গর। গরিব, দীনভাবসম্পন্ন, নিরহংকারী লোকেরাই কি ঈশ্বরের চিহ্নিত মানুষ ? কে জানে, হতেও পারে। এ ছেলটোর বাগছে বসলে একটা ভাল অনুভূতি হয়। যেটা অধিকাংশ মানুষের সান্নিধ্যে হয় না।

সাজগোজ করতে চারুশীলা সময় নেয়। আজও নিল। তারপর যখন বন্ধু রিয়া আর ছেলে পিন্টুকে নিয়ে বেরিয়ে এল তখন ঘর একবারে মাতোয়ারা হয়ে গেল নানা সুগন্ধে।

নাক কুচকে হেমাঙ্গ বলে, ইস। তাকে যে ডাক্তারখানায় ঢুকতেই দেবে না।

চারুশীলা ফোঁস করল, ইস! কেন দেবে না শুনি ?

হোমিওপ্যাথি ওষুধ দারুণ সেনসিটিভ। উগ্র গন্ধে তাদের গুণ নষ্ট হয়ে যায়।

যাঃ, বাজে বকিস না।

রিয়া কিন্তু একটু অস্বস্তিতে পড়ে বলে, হ্যাঁ, আমিও কিন্তু ওরকম কথা শুনেছি। কী হবে এখন!

চারুশীলা ধমকের গলায় বলে, ওর কথায় নাচিস না তো। ওটা এক নম্বরের পাজি। লোককে ভড়কে দেওয়াই ওর হবি।
হেমাঙ্গ গম্ভীর থেকেই বলে, আজ তোর কপালে অপমান লেখাই আছে। কণাদ নিশ্চয়ই তোকে বের করে দেবে চেম্বার থেকে। বিদেশ থেকে শুচ্ছের সেন্ট আনিয়ে মাখছিস, তোর আক্কেল নেই? এত সেন্ট মাখলে অন্য সব গন্ধ পাবি কি করে? ফুলের গন্ধ, ফলের গন্ধ, খাবারের গন্ধ, শিশুর মুখের গন্ধ এসবই তো তোর অজানা থেকে যাবে!

চারুশীলা চোখ পাকিয়ে বলল, থামবি? আমাকে আর গন্ধ চেনাতে হবে না। যা একখানা শহরে বাস করি, ম্যাগো, ডাউবিনের গন্ধ, পচা ইঁদুরের গন্ধ, ডিজেলের গন্ধ গা গুলিয়ে দেয়। উনি এসেছেন গন্ধ নিয়ে বক্তৃতা দিতে।

গাড়িতে সামনের সীটে হেমাঙ্গর পাশে চয়ন বসল, জানালার ধারে পিছু। পিছনে কলরবমুখর চারুশীলা আর রিয়া।

গাড়ি চালাতে চালাতে হেমাঙ্গ নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, আপনার শ্রবলমতা কি? এপিলেপসি?

চয়ন মাথা নেড়ে বলে, না না। এপিলেপসি নয়।

তাহলে?

একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়। কুয়াশার মধ্যে একটা ট্রেন ঝিক ঝিক করতে করতে এগিয়ে আসে। তখন আমার বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা নড়তে থাকে। আর তারপর.....

তারপর?

আমার আর কিছু মনে থাকে না।

ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামল। ওয়াইপারটা চালু করে হেমাঙ্গ বলল, অজ্ঞান হয়ে যান?

হ্যাঁ। কিন্তু সেটা ফিটের অসুখ বলে আমার মনে হয় না। আমার বিশ্বাস, ওই ট্রেনের শব্দটা না হলে আমিও আর অজ্ঞান হবো না। কেন যে শব্দটা হয়! আপনি জানেন?

দুনিয়ার কতটুকুই বা আমরা জানি? বাড়ি থেকে আপনার কোনও চিকিৎসা হয়নি?

একটু দোনোমোনো করে চয়ন বলে, হয়েছে। লাভ হয়নি।

অ্যালোপ্যাথি না হোমিওপ্যাথি?

দু'রকমই। মাদুলি-টাদুলিও দেওয়া হয়েছিল।

কখনও ব্যায়াম বা আসন-টাসন করেছেন?

আমি পারি না। শরীরে দেয় না। আমি ভীষণ দুর্বল।

অনেক সময়ে আসন করলে সারে।

চয়ন বিনীতভাবে চুপ করে থাকে। বড্ড কাঁটা হয়ে বসে আছে। এয়ার কন্ডিশনার চলছে বলে কাচের গায়ে ভাপ জমে যাচ্ছে। বাইরে বৃষ্টির জোড় বাড়ছে।

বাড়িতে কে কে আছে?

চয়ন যেন একটু সচকিত হয়ে বলে, মা দাদা বউদি।

কে আর্নিং মেম্বার?

দাদা।

দাদা কোথায় চাকরি করে?

একটা ব্যাংকে।

বাবা নেই, না?

না। আমার দশ বছর বয়সে মারা যায়।

বাড়িটা কি নিজেদের?

আবার একটু দোনোমোনো করে চয়ন বলে, বাড়ি দাদার।

বুঝেছি।

পিছন থেকে চারুশীলা বলে, এই উদ্ভট, ঠাণ্ডা লাগছে, এয়ারকুলারটা বন্ধ করে দে।

দিচ্ছি। কিন্তু এতগুলো লোকের শ্বাসের দূষিত বায়ু বেরোবে কি করে? জানালা খোলা যাবে না, বৃষ্টি হচ্ছে।

তোর দিকের জানালা একটু ফাঁক করে রাখ, তাতেই হবে।

সেলফিস আর কাকে বলে!

হেমাঙ্গ এয়ারকন্ডিশনার বন্ধ করে নিজের দিকের জানালার কাচ একটু নামিয়ে দিয়ে বলল, ব্যাচেলরদের সবাই এক্সপ্লয়েট করে।

তুই আবার ব্যাচেলর কিসের? এক ফোঁটা তো বয়স। বিয়ের যুগি়া আগে হ, তারপর ব্যাচেলর কপচাবি।

কাল তো তুই-ই একটা পাত্রীর খবর দিলি।

ওরকম দিদিরা করেই থাকে। বিয়ের কথায় বেসামাল হয়ে আবার গাড়ি কোথাও ভিড়িয়ে দিস না। এত ঝাঁকুনি লাগছে কেন?

কলকাতার রাস্তা তো আর আমার বানানো নয়।

দেখে চালা। যা বকবক করছিস তখন থেকে। গাড়ি চালানোর সময় অত কথা কিসের?

বকবক তুইও কি কিছু কম করছিস?

করছি বেশ করছি। আমি তো আর গাড়ি চালাচ্ছি না।

বেশী মেজাজ দেখাবি তো গাড়ি থামিয়ে নেমে কোথাও চলে যাবো।

আজ্ঞা বাবা, বকবক করতে করতেই চালা। রিয়া জানতে চাইছে কণাদ চৌধুরী কি বিলেত-ফেরত?

হ্যাঁ। জার্মানি আর আমেরিকাতেও ছিল। বলে হেমাস্ চয়নের দিকে তাকিয়ে বলল, বাঁ হাতটা অমন চেপে ধরে আছেন কেন? সামথিং রং?

ক্রিস্ট মুখে ভয়াভূর চয়ন বরে, সেই রেলগাড়ির শব্দটা হচ্ছে। বড্ড কুয়াশা।

মাই গড!

॥ ১১ ॥

কাল রাতে বামাচরণের আর রামজীবনে তুমুল হয়ে গেছে। সে এমন ব্যাপার যে মনেই হয়নি এরা উদ্ভেলকের ছেলে। ও একে আর এ ওকে শুয়ারের বাচ্চা, খানকীর বাচ্চা থেকে শুরু করে এমন সব গালাগাল দিয়েছে যা সহোদয় ভাইরা পরস্পরকে দিতে পারে না। মুখে মুখে যতক্ষণ হচ্ছিল ততক্ষণ একরকম ছিল, তারপর দুজনেই একজন দা আর একজন টান্সি নিয়ে উঠানে নেমে পড়ল। বউ দুটো আর নয়নতারা প্রাণপণে চেষ্টাচ্ছিল। নয়নতারা ভয়ে আর বউ দুটো রাগে। লোকজন যারা জুটেছিল তারাই শেষ অবধি খুনোখুনি হতে দেয়নি। উঠানে যখন এ কাণ্ড চলছিল তখনও বারান্দায় জলটৌকিতে বিষ্ণুপদ ঝুম হয়ে বসা। নড়াচড়া নেই, ঝগড়া থামানোর উদ্যোগ নেই। বিষ্ণুপদের ভিতরটা কি মরে পাথর হয়ে গেছে? বিষ্ণুপদ নিজেই সেটা বুঝতে পারে না।

গায়ের মাতব্বররা এসে বিষ্ণুপদকে বলল, এর একটা বিহিত তো করতে হবে বিষ্ণুখুড়ো! সম্পত্তি ভাগ করে দিচ্ছেন না কেন?

বিষ্ণুপদ নিস্তেজ গলায় বলল, ভাগ তো ওরাই করে নিয়েছে। আর ভাগের কী?

রাজু হালদার বলল, ভাগের কাগজপত্র নকশা না থাকলে ভাগের মূল্যটা কী বলুন! বামাচরণের জমির মধ্যেই তো রান্নাঘর তুলে ফেলল রমাজীবন। তা হলে আইনটা কী হবে?

এত লোক সোরগোল করছিল যে, বিষ্ণুপদ মাথাটা ভাল কাজ করছিল না। তবে এ কথা ঠিক যে, আজ দুপুরে হঠাৎ ইরফান মিস্ত্রিকে দিয়ে পশ্চিম দিকে একটা ছোটো ঘর গাঁথিয়ে ফেলছিল রামজীবন। তখনই বামার বউ শ্যামলী বেরিয়ে এসে চেষ্টায়েছিল, এটা কী হচ্ছে? ও তো আমাদের ভাগের জমি, ওখানে ঘর তুলছেন কেন?

রামজীবন প্রথমটায় জবাব দেয়নি, শুধু ইরফানকে তাড়া দিচ্ছিল ঘরখানা ঝুটিতে বানিয়ে ফেলতে।

শ্যামলী তখন থাকতে না পেরে সোজা গিয়ে ইরফানকে এক ধাক্কা মেরে বলেছিল, খবর্দার আর একটাও ইট গাঁথবেন না। তাহলে খারাপ হয়ে যাবে।

আর তখন রামজীবন চোখ রাঙিয়ে উঠেছিল, চোপ মাগী!

শ্যামলী তার দেওরের দিকে ফিরে বলেছিল, অভয় যদি মুরোদ তবে উনি বাড়ি থাকতে ঘর তোলেননি কেন? যেই উনি বেরিয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে ঘর তুলে ফেলছেন! মহা শয়তান তো আপনি!

সেই থেকে ঝগড়া চলছে।

শ্যামলী একবার এসে বিষ্ণুপদকেও বলেছিল, আপনি হুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছেন যে বড়! আপনার চোখের সামনে এত বড় অন্যায়াট হয়ে যাচ্ছে দেখেও চুপ করে বসে আছেন! মুখে কি পুটিং ঠেসে দিয়ে গেছে কেউ? না কি গুণধর ছেলের পাকা ঘরে থাকবেন বলে সব অনায়া মেনে নিচ্ছেন?

বিষ্ণুপদর মুখে কোনও জবাব এল না। মাথাটা বড় হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তার চোখের সামনে বহু অনায়া বহুবার হয়ে গেছে, বিষ্ণুপদর মুখে একটিও প্রতিবাদ কেউ শোনেনি। শ্যামলীর দিকে বিষ্ণুপদ শুধু চেয়ে ছিল।

নয়নতারা এসে পক্ষিণী যেমন শাবককে আড়াল করে তেমনি করিই বিষ্ণুপদকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বলল, ওঁকে এর মধ্যে টানছো কেন বউমা? এ লোক তো সাত-পাঁচে থাকেনি কখনও। ভীতু মানুষ। ও সব তোমাদের গণ্ডগোল, তোমরা বুঝে নাও।

আহা, ন্যাকা! কিছু বোঝে না! ভীতু! অমন ছেলের জন্ম তাহলে দিল কি করে?

নয়নতারা বিষ্ণুপদকে বলল, যাও তো, জলটৌকি হাতে করে নিয়ে গিয়ে জামতলায় বসে থাকো তো। বাড়িতে থাকার দরকার নেই।

ভাগ্যিস বৃষ্টিটা তখন ছিল না। বিষ্ণুপদ গুটি গুটি গিয়ে বাইরের জামতলায় বসে রইল। কিন্তু গায়ে শু মাখলেই কি যমে ছাড়ে? সন্ধ্যাবেলাতক বসে থেকে যখন বিষ্ণুপদ ঘরে এল তখনও উঠানে দাপাচ্ছে শ্যামলী, বিস্তার বউ-ঝি কান্ধা-বাচ্চা, দু-চারটে উটকো লোকও জুটে গেছে মজা দেখতে। রামজীব বাড়িতে নেই। ইরফান কাজ বন্ধ রেখে চলে গেছে। তবে রান্নাঘরের দেয়াল চারটে প্রায় ছাদ অবধি গৈঁথে ফেলেছে।

বামাচরণ ফিরল সন্দের কিছু পর। ফিরতেই শ্যামলী এমন চেষ্টায়ে উঠল যেন তার নিকটজন কারও কাল হয়েছে। বামাচরণ এক সরকারী অফিসে পিওনের কাজ করে। সে খুব ফিকিরের লোক, দালালি-টালালি কিসের যেন একটু বাড়তি দু'পয়সা আয় আছে। তবে সে সব সে কখনও ফাঁস করে না। এক বাড়িতে থেকেও, এক হাঁড়ি হয়েও তারা খুব আলগোছ হয়ে থাকে। তবে হাঁড়ি আর এক রাখা যাবে না, বিষ্ণুপদ বুঝতে পারছিল। এক থাকলেই কি আর আলাদা হলেই বা কি? বিষ্ণুপদর আর যে সব ভেবে কাজ নেই।

ঝগড়াটা জম্পেশ করে লাগল সন্দের পর। রামজীবন একটু মাতাল হয়েই রোজ ফেরে। আজও ফিরল। সে ফিরতেই বামাচরণ লাফ দিয়ে উঠানে নামল। তারপর দুজনে গঙ্গাজলের মতো গালাগাল দিতে লাগল দুজনকে। তারপর খুনোখুনির জোগাড়।

বিষ্ণুপদ মাতব্বরদের কথার খেই ধরে বুঝতে পারছিল, তারা বামাচরণের পক্ষে! কাজটা অনায়া হয়েছে।

রাজু হালদার বলল, আপনার চোখের সামনেই অন্যায় ব্যাপারটা হয়ে গেল, এটা কেমন কথা? বামাচরণ কি আপনার ছেলে নয়? আমাদের একটা খবর দিলেই আমরা এসে মীমাংসা করতাম।

রামজীবনকে তার ঘরের কাছে কয়েকজন ঘিরে রেখেছিল। সেখান থেকেই সে গলা তুলে বলল, কোনও হারামীর বাস্তব সালিশ মানব না। শালারা মাতব্বরী দেখাতে এসেছে! আবে এই খানকীর ছেলে রাজু, আমার বাবাকে চোখ রাঙাচ্ছি কেন রে? বাপের ব্যাটা হয়ে থাকলে আমাকে চোখ রাঙাবি আয়! চোখ গেলে দেবো।

বিষ্ণুপদ টের পেল, মাতব্বরদেরও আর সেই দিন নেই। রামজীবন হুমকিতে রাজু খিঁচিয়ে গেল।

ঘর তুলেছি বেশ করেছি। বুকের পাটা থাকলে একটা ইটও খসিয়ে দেখ, দেখ খসিয়ে কী হয়!

রাজুর বয়স পঞ্চাশের ওপর। এক সময় গায়ের রাজনীতিতে বেশ নামডাক ছিল। এখন আর সেসব নেই। লোকেও তেমন মানে না। আগে এই রাজুরই কত হাঁকডাক ছিল। বিষ্ণুপদের একটু কষ্টই হল রাজুর জন্য।

রাজু বিষ্ণুপদকে বলল, শুনলেন রামজীবনের কথা? ওর যদি এরপর একটা বিপদ হয় তখন কিন্তু আমাদের দৃশ্যবেন না। রামজীবন কিন্তু খারাপ সংসর্গে পড়েছে।

বেশ চাপা গলায় বলল, যাতে রামজীবন শুনতে না পায়। রামজীবন অবশ্য শুনতে পেল না, কারণ সে নিজেই চোঁচিয়ে মাতব্বরদের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করছিল।

বামাচরণ তার দাওয়া থেকে নেমে এসে বিষ্ণুপদকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে রাজুকে বলল, এই শালা বুড়োর জন্যই যত গুণগোল বুঝলেন রাজু দাদা? কবে থেকে বলে আসছি, বাবা, বাড়িটা বাগজোখ করে বেড়া তুলে দাও। শালা বসে বসে ঝিমোয় আর কাঁড়ি কাঁড়ি খায়। গা করে না। কেন করে না জানেন? ওই হারামজাদা রেমো ওকে হাত করেছে। রামজীবন ছাড়া উনি চোখে অন্ধকার দেখেন।

বামাচরণ বাপকে শালা বলতেও কেউ তেমন কোনও আপত্তি করল না। শুধু কে যেন—লঠনের আলোয় মুখটা ভাল দেখা গেল না—বিড়বিড় করে বলল, ওভাবে বলছো কেন? ওভাবে বলা কি ঠিক?

বিষ্ণুপদের অবশ্য রাগ-টাগ হল না। কোনওদিনই হয় না। বামাচরণ হয়তো ঠিকই বলে।

বামা চোঁচাচ্ছিল, কেন ওই ঝড়র বুড়ো রামজীবনের পক্ষ নেয় জানো? রামজীবন পাকা ঘর তুললে সেখানে আরামসে থাকবে সেই লোভে। রামজীবন লুচি খাওয়ায়, রসগোল্লা খাওয়ায়, মাঝে মাঝে জামা জুতো দেয়; আর সেই সঙ্গে যত কু পরামর্শও দেয়।

ওপাশ থেকে রামজীবনও কী যেন বলে উঠল।

বিষ্ণুপদর হল গগারের চামড়া। সে শুধু অন্ধকার উঠোন পেরিয়ে ওপাশে রামজীবনের ঘরখানার দিকে চেয়ে রইল। বড় তাড়াতাড়ি কাজ হচ্ছে এখন। একটু বেশী তাড়াতাড়ি কি?

আর এক মাতব্বর কপিল ঘোষ বলল, আচ্ছা খুঁড়ো, আপনার বড় ছেলে কৃষ্ণজীবনের তো আর এই গায়ের বাড়ির ভাগ দরকার নেই। তা তার ভাগেরটা এদিকে বাঁটোয়ারা করে দিলেও তো হয়।

সতীশ পাল মাথা নেড়ে বলে, আইন জানো না বলে বলছো। সে বা তার পুত্র পৌত্রাদি কেউ দাবি তুললে তো ছাড়তেই হবে বাপু। তার ওপর মেয়েদের ভাগের কথাটা ধরছো না কেন? জমি পুরো কুড়ি কাঠাও নয়। ছ'ভাগ করতেই হবে।

ভাগজোখের কথায় বিষ্ণুপদ ফের ভাবনায় পড়ে গেল। ভাগের বড় জ্বালা। ভাগ করতে করতে একশ বছর পর থাকবেই বা কি?

সতীশ পাল বলে উঠল, রামজীবনের রান্নাঘর সরাতে হবে। না সরাতে পারলে জমির দাম ধরে দিক। বথেরা মিটে যাবে।

রামজীবন ওপাশ থেকে চোঁচিয়ে বলে, যে শু-খোগার ব্যাটা এ কথা বলে তার মুখে পেছাপ করি, পেছাপ। বুঝলে! জমি এখনও বাবার। কোন শালাকে মূল্য ধরে দেবো?

খুব হতে লাগল তুলুল সব কাণ্ড। বিষ্ণুপদ শুনল, শব্দের পর শব্দ, আরও শব্দ। এ সব শব্দের যেন ঠিক মানে হচ্ছে না। এ সব যেন ফাঁকা কার্তুজের আওয়াজ।

একটু রাত হচ্ছিল। আরও গড়াত। হঠাৎ একটা ভেজা হাওয়া ছাড়ল। জয়ঢাকের শব্দ তুলল মেঘ। আর তারপর তেরচা হাটের বস্ত্রমের মতো বৃষ্টি নেমে এল। দুনিয়াকে গৈথে ফেলতে লাগল যেন। লোকজন সব বেমালায় গিয়ে গেল। ভাঙাবাঙির মতো। দাওয়ার দু-তিনজন শুধু গাঁ বাঁচিয়ে বসে থেকে কিছুক্ষণ পর ভিজেই রওনা হয়ে গেল।

তারপরই নয়নতারা এসে হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেল বিষ্ণুপদকে।

আজও রোদ নেই। মাঝে মাঝে ছাড়া ছাড়া করে বৃষ্টি হচ্ছে। থামছে। আবার হচ্ছে। রামজীবনের কাঁচা সিমেণ্ট ঘুয়ে যাচ্ছে। ইরফান আসেনি।

আজ সকাল থেকে বাড়িটা বড় নিঝুম। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ঘুলিয়ে উঠছে, পাকিয়ে উঠছে কত আক্ৰোশ, রাগ; তবে বাইরেটা আজ ভারি নিঝুম। যে কোনও সময়ে হঠাৎ বোমা ফাটানোর মতো ধুমুকার লেগে যেতে পারে। দু'ছেলের কেউ বাড়ি নেই। শ্যামলী সকাল থেকে ঘরের বার হয়নি। সবই দেখছে বিষ্ণুপদ। দেখে যাওয়া ছাড়া তার কী কাজ?

বিষ্ণুপদের ঘড়ি নেই। কটা বাজে জানে না। কিন্তু সে ঠিক টের পায়, এইবার নয়নতারা একবার আসবে। এসে দেখে যাবে তাকে। কিছুক্ষণ পর পর এসে তাকে একবার করে দেখে যায় এই কদিন হল। বাড়িটার প্রাণে ভয় ঢুকেছে, বুড়োটা কখন টুকুস করে মরে যায়। ওই কালঘড়ি দেখার পর থেকেই ভয়টা খুব ধরেছে বাড়িকে। মানুষের শোকের একটা বড় কারণ হল, একা হয়ে যাওয়া। বিষ্ণুপদ চলে গেলে বাড়িটা খুব একা হয়ে যাবে। বড় আতঙ্করে পড়ে যাবে।

ভয়-ভর আরও কত আছে। কাল রাতে যখন দু' ভাই সুন্দ উপসুন্দের লড়াই করছিল তখন বুড়ি ভয়ে সৈদিয়েছিল ঘরে। ঠাকুর দেবতার কাছে মাথা কুটছিল। কাল রাতে তারা বুড়োবুড়ি কেউ ঘুমোতে পারেনি। নয়নতারা বিস্তর কঁদেছে। মেলা দু'থর কথ্য বলেছে।

নয়নতারার বাবুগিরি হল তামাকপাতা দিয়ে পান খাওয়া। কলাইকরা একখানা বাটিতে তার পান সুপুরি চুন আর খয়ের থাকে ছোটো ছোটো কৌটোয়। সেই বাটিখানা হাতে করে নয়নতারা ঘর থেকে বেরিয়ে নিঃসাড়ে কাছে এসে উবু হয়ে বসল। বর্ষাকালে পান বেজায় সস্তা, তবু ভারি কুপণের মতো এখানা পানের একটুখানি ছিড়ে নিয়ে তাতে চুন দেয়। সুপুরিগাছ বাড়িতেই আছে কয়েকটা। ভাগজোখ হয়েও যা পায় তাতে নয়নতারার বছর চলে যায়। কিন্তু কিছুটা বিক্রি করে দিতে হয় বলে নয়নতারা সুপুরি খায় এক চিমটি। দাঁতের জোর নেই বলে ছোটো হামানদিতায় ফেলে শুঁড়ো করে নেয়। তাতে খরচাও হয় কম। এক চিলতে কাঁচা তামাকপাতা ঠেসে মুখে পানটা পুরে দেয়। অনেকক্ষণ পানটা মুখেই থেকে যায়, রসস্থ হয়। সারা দিন ওই জিনিসই নয়নতারাকে চাসা রাখে।

পান সাজা থেকে মুখে দেওয়া অবধি লক্ষ করল বিষ্ণুপদ। দেখতে বেশ ভাল লাগল। কত যত্নে টুকটুক করে ভালবেসে পানটা সাজল নয়নতারা! পানের মধ্যেই যেন ওর প্রাণভোমরা।

কিছু বলবে বলে মুখটা তুলল বুড়ি। বিষ্ণুপদ চেয়েই ছিল। একটু হাসল।

নয়নতারা হাসল না। বলল, শ্যামলী আজ ঘর থেকে বেরোলো না। দেখলে ?

দেখলাম।

আবার লাগবে বোধ হয়।

তা লেগে যাবে।

রামজীবনের ওই পাকাবাড়িটাই অপয়া। ওটা যখন উঠতে শুরু করল তখন থেকে অশান্তি।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, শান্তি আবার কবে ছিল ?

শ্যামলী বলে, বীণাপাণি নাকি নটী হয়ে গেছে। লাইনে নেমেছে। খারাপ খারাপ সব কথা। আমি বলি কি, পাঁচজনের কাছে না শুনে একবার নিজেই খবর নাও না। যাত্রায় নামা কি ভাল ?

হঠাৎ বীণার কথা উঠছে কেন ?

কাল রাতে তাকে নিয়ে একটা খারাপ স্বপন দেখেছি। কী সব যেন দেখলুম, ভাল মনে নেই। কিন্তু মনটা খারাপ হয়ে গেল।

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, ভাল খবর কি আর পাবে ? অজান থাকাই তো ভাল।

তুমি এমন করে বলো যে, ভয় খেয়ে যাই।

আর ভয় কিসের! ডাক এসে গেছে। মনটা তুলে নাও।

তুমি ওরকম বলো না তো!

তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য বলিনি। আমার কি মনে হয় জানো, ওরা সব আমাদের চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধি-বিবেচনাপ্রাণ মানুষ। আমরা কি দুনিয়াটাকে বুঝি ? যা সব ঘটে যাচ্ছে চারদিকে তা বুঝি ? এই হাবলা-ব্যাবলা মাথায় কি সব সেধোয় ? আমাদের চেয়ে ওরা বোঝে অনেক ভাল। তা ওরাই দুনিয়াটাকে বুঝে-সুঝে নিক না। আমাদের আমল তো এটা নয়।

সে কথা ঠিক। তবে ভয় হয়, যদি নষ্ট পায়।

সেটাও ওরাই বুঝবে। নষ্ট কি ভাবে পায় তা কি তুমি জানো, নাকি আমিই জানি!

কিন্তু ও কথাও বলি, বীণার বিয়েটা তুমি ভাল দাওনি। নিমাই কি আর তেমন ছেলে ? খাওয়াতে পরাতেই তো পারে না। পেটে টান না পড়লে বীণা কি আর যাত্রায় নামত ?

ওই কথাই তো বলি, আমি বড় আহত। তাই আজকাল ভয়ে আর রা কড়ি না। মুখ বুললেই কত কি ভুলভাল বলে ফেলব। বীণার বিয়েটাও তো ওই আহতকিই হল কি না। ছেলেটা দেখলুম বড় সং। মা-বাপের ওপর অগাধ ভক্তি। ওই দেখেই বুকটা নেচে উঠল, এ আমলে তো এ জিনিস মেলে না। কিন্তু এখন বুঝি, কত বড় বোকার মতোই কাজটা হল। মেয়ে হয়তো আমাকে কত শাপশাপান্ত করে।

আজ আমার বীণার জন্য বড় মনটা খারাপ লাগছে। স্বপন দেখা ইস্তক বুকটা ভার।

তাহলে একবার রামজীবনকে বলো। যে তো এধার ওধার ঘোরাম্ফো করে। সে গিয়ে খবর এনে দেবেন।

সে কি আর এখন যেতে চাইবে ? ঘর উঠছে, সে এখন ঘরের নেশায় বঁদ। হা-টাকা জো-টাকা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাকে নড়ানো যাবে না।

তাও বটে।

আমি বলি কি, আমরা বুড়োবুড়ি তো অনেককাল ভিটে আকড়ে পড়ে আছি, কোথাও যাই-টাই না। তা একবার যাবে নাকি বনগাঁ ? বুড়োবুড়ি মিলে যাই চलो। বেশী দূর তো নয়।

বিষ্ণুপদ হাসল, সে আর বেশী কথা কি! কিন্তু তোমাদেরই তো কিসে যেন বাধে। ছেলেপুলে না হলে নাকি মেয়ের বাড়ি যেতে নেই!

ও বাবা! তাই তো! মনে ছিল না কথাটা। তা হলে একখানা পোস্টকার্ড লিখে দাও, পটল আজই ডাকে দিয়ে আসবে। রিপ্লাই কার্ডে দিও। পটলকে পাঠাচ্ছি পোস্টকার্ড আনতে।

পাঠাতে হবে না। আমার কাছে একখানা জোড়া পোস্টকার্ড আছে। লিখে দিচ্ছি।

তাকে আসতে লিখো একবারটি। বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে মেয়েটাকে।

লিখব'খন। তবে এই অশান্তির মধ্যে এসে তার তো তেমন সুখ হবে না।

তবু আসুক। নিমাইকে নিয়েই যেন আসে।

সব দিক বুঝে-সুঝে বলছো তো!

বুঝবার আবার কি আছে? সেই কবে একবার এসেছিল, বছর চারেক হবে বোধ হয়। মুখখানাই তো ভুলতে বসেছি। আর বুঝসুঝ দরকার নেই, মনটা বড় খারাপ। একবার আসুক। তোমার তাকে দেখতে ইচ্ছে হয় না?

বিশ্বপদ মাথা নেড়ে বলে, না। আমি বড় একা হয়ে গেছি। কেবল মনে হয় আমার আর কেউ নেই।

বলো কি গো! সর্বনেশে কথা যে!

থেকেও কি আছে! তুমিই বলো। ওরা কি আর আমার তোমার? ওরা সব নিজের নিজের। কাউকে আপনার জন ভাবতে পারি না। কৃষ্ণজীবনের কথা ভাবো তো একবার!

তার কথা আবার কি ভাবব?

ভাবো। ভাবলেই বুঝবে।

তুমিই বুঝিয়ে দাও না! জানো তো আমার মাথা নেই।

কৃষ্ণজীবন তো আমাদেরই ছেলে, নাকি?

তবে কার ছেলে?

তাকে কি আমাদের ছেলে বলে মনে হয়? সে যদি রামজীবন বা বামাচরণের মতো হত তাহলে ব্যাপারটা স্বাভাবিক হত। তা তো হল না। কত বিদ্যা শিখে সে এক লাফে কোথায় উঠে গেল। বিলেত-আমেরিকা অবধি ঘুরে আসছে। দুনিয়া-জোড়া নাম। এটা কেমন হল বলো তো! আমাদের ছেলের কি এ রকম হওয়ার কথা? আমরা দুটো বোকাসোকা মেয়েপুরুষ, আমাদের ছেলেপুলেরা তো আমাদের মতোই হবে নাকি! তা তো হল না কৃষ্ণজীবন!

লোকের পাঁচটা ছেলে কি একরকম হয়?

বিশ্বপদ মাথা নেড়ে বলে, না। কিন্তু কেন হয় না তাই তো বুঝি না। রামজীবন, বামাচরণ এরাও কি আর আমাদের ছেলে? তুমি তো জানো, জীবনে আমার সঙ্গে কারও ঝগড়াঝাঁটি হয়নি, মুখে একটাও দুষিত কথা উচ্চারণ করিনি, কাউকে গালাগালি অপমান করিনি। রামজীবন বা বামাচরণ তাহলে ওরকম করে কি করে?

সে কপালের দোষে।

তাই হবে। আমি ভেবে দেখেছি, ছেলেপুলে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনও লাভ নেই। আমরা তো আর তৈরি করিনি ওদের, আমাদের ভিতর দিয়ে জন্মেছে। যার যার নিজের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন আর ওদের নিয়ে ভেবে কি লাভ?

ভাবনা কি ছাড়ে?

আমাকে তো ছেড়েছে। যখনই কৃষ্ণজীবনের কথা ভাবি তখনই বড় অবাক লাগে। আমার প্রাইমারি ইকুলে পড়ানোর বিনো, বিষয়বুদ্ধি নেই, তেমন বড় কোনও বাবু-মানুষ এসে দাঁড়ালে কথা কইতে ভয় খাই। সেই আমার ছেলে ওরকম বাঘা বিদ্বান হয়ে ওঠে কি করে? এ যে অশৈলী কাণ্ড! আর সে অমনধারা হয়ে উঠল বলেই তো এদের সঙ্গে বনল না। একরকম মেরেখের তড়াল তাকে।

পুরনো কথা ভুলে কি লাভ? তুমি কি বসে বসে ও সব ভাবো?

দুটো জিনিস খুব ঘোরাফেরা করে মনের মধ্যে। একটা হল কৃষ্ণজীবনের কথা। ইদানীং খুব তার কথা মনে হয় আর বড্ড অবাক লাগে। আর দু নম্বর হল রামজীবনের ওই বাড়িটা। কেন যে মনে হয়, ওই বাড়িটা যেই শেষ হবে অমনি আমার ঘড়ির সময় ফুরাবে।

সর্বনেশে কথা! তাহলে ওই অলক্ষণে বাড়ি এখনই বন্ধ করে দিতে বলি।

বিশ্বপদ মাথা নেড়ে বলে, বোলো না। ও সব আবোল তাবোল ভাবনা, ওর মধ্যে কোনও সার নেই। মন হচ্ছে এক নিষ্কর্মা মানুষ, সারাদিন অকাজ করে যাচ্ছে। দুনিয়াতে যারা বড় মানুষ তাদের মন হল বিশ্বকর্মা। কত কী ভাবছে আর করে ফেলছে। সেই জন্যই তো দুনিয়ায় কত অশৈলী কাণ্ড ঘটছে। আকাশে এরোপ্লেন উঠছে, চাঁদে মানুষ যাচ্ছে, লোকে টিভি দেখছে ঘরে বসে। ও সব তো আমার মতো বোকাসোকা মানুষের কর্ম নয়। ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে বেঁচে আছি মাত্র। নাড়ী চলাছে, বুক ধুকধুক করছে, খাঙ্কি হাগছি, এইমাত্র। বিশ্বপদ থাকলেই কি, গেলেই কি। দুনিয়ার লাভও নেই, লোকসানও নেই।

নয়নতারা পানের একটুখানি পিক ফেলে হেঁচকি তুলে বলল, আর আমার কথা বুঝি ভাবতে নেই?

সেই তো কথা। তুমিই একমাত্র মানুষ যার কাছে বিশ্বপদ একটা তালেবর লোক। তোমার জন্যই তো দড়ি ছিঁড়তে চাইছে না আমরা।

এ কথায় নয়নতারা হয়তো কঁদে ফেলত, কিন্তু এ সময়ে বৃষ্টি মাথায় করে উঠোনে চারটে সাইকেল এসে ঢুকল পর পর।

ঘটনা পুরনো, বহুবীর ঘটছে। তবু নয়নতারা 'ওই আবার এসেছে' বলে একটা চাপা আত্নানাদ করে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল, বলল, তুমি কথা কইতে যেও না ওদের সঙ্গে। রাঙাকে ডেকে দিচ্ছি।

চারটে জোয়ান মর্দ ছেলে এসে দাঁওয়ার সামনে পা ঠেকিয়ে সাইকেল খামাল, নামল না।

কালো চেহারার একটা ছেলে বিশ্বপদের দিকে চেয়ে থমথমে গলায় বলল, রামজীবন কোথায়?

নয়নতারা কথা কইতে বাধণ করে গেছে। কিন্তু রাঙাকে এখন পাবে না নয়নতারা। রাঙা একটু আগে পুকুরে গেছে এক ডাঁই বাসি কাপড় নিয়ে। বিশ্বপদ ছেলেটাকে দেখল ভাল করে। শক্ত পোক্ত শরীর, বয়সে রামজীবনের চেয়ে ছোটো, চোখের নজর মোটেই সাদা-সরল নয়। চোখে একটু ধমক আছে।

বিশ্বপদ নিরীহ গলায় বলে, সে তো সকালে বেরিয়ে গেছে।

সোডার বোতল খোলার আওয়াজের মতো পরের প্রশ্ন এল, কোথায় গেছে?

সে তো বলে যায়নি।

পিছনে তিনটে ছেলে পাথরের মূর্তির মতো সাইকেলে বসা। বৃষ্টিকে গ্রাহ্য নেই।

সামনের ছেলেটা বিষ্ণুপদর দিকে পলক না ফেলে চেয়ে থেকে বলে, কাল তার বটতলায় যাওয়ার কথা ছিল। যাননি। বিষ্ণুপদর একটুও ভয় হল না। ছেলেটার চোখের দিকে সেও নিম্পলক চেয়ে থেকে বলল, কাল তার যাওয়ার উপায় ছিল না।

কী হয়েছিল ?

একটু ঝামেলায় ছিল।

বটতলা দিয়ে আজকাল সে যাতায়াত করছে না। তাকে বলবেন আজ সন্দের পর যদি না যায় তা হলে কিন্তু মুশকিল আছে।

বিষ্ণুপদ নিরীহ গলায় বলে, মুশকিল! কেন, সে কি কোনও খারাপ কাজ করেছে ?

তাকে বলবেন, আমরা সন্দের পর বটতলায় থাকব। কথা আছে।

বিষ্ণুপদ মাথাটা ডাইনে বাঁয়ে নাড়ল। সে কিছু বুঝতে পারছে না। বৃষ্টি হঠাৎ চেপে নামল। চারজন সাইকেলবাজ আবছা হয়ে গেল বৃষ্টিতে। হ্যাডেল ঘুরিয়ে ওরা চলে যচ্ছে। যেন একটা পেরোয়ারা ধরিয়ে দেওয়ার ছিল, কাজ শেষ করে ফিরে গেল।

উঠোনটা ফাঁকা হয়ে গেল, বটে, কিন্তু মনটা কি হল, চারজন সাইকেলবাজ এখন অনেক সময় ধরে মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করবে। কিছুতেই যাবে না।

বামাচরণের ঘরের দরজা খুলে শ্যামলী বেরিয়ে এল। বিষ্ণুপদ প্রথমটায় ভেবেছিল, বোধ হয় পুকুরে বা কুয়োতলায় যাবে। কিন্তু ঘোমটা টেনে জলময় উঠোনটা পেরিয়ে শ্যামলী উঠে এল দাওয়ায়।

আপনাকে একটা কথা বলছি। আপনার এক ছেলে যদি আর এক ছেলেকে খুন করতে গুণ লাগায় তাহলেও কি আপনি এ রকম নির্বিকার বসে থাকবেন ?

বিষ্ণুপদ সচকিত হয়ে বলে, কে কাকে খুন করাবে বললে ?

আপনার আদরের রামজীবন যে আমার স্বামীকে খুন করানোর সাঁট করছে তা কি জানেন ?

বিষ্ণুপদ ভারি বেকুব হয়ে গেল। চেয়ে রইল শ্যামলীর দিকে।

॥ ১২ ॥

লিফটবাহিত হয়ে কী মসৃণ এই সাততলায় উঠে আসা। তারপর ডোরবেল বাজিয়ে দাও। কয়েদখানার দরজা খুলে যাবে। যখনই সে ফেরে তখনই তার মনে হয়, পাখি কি কখনও বাঁচায় ফেরে ? গাঁয়ের বাড়িতে সে যখন কবুতর পুখেছিল, বারান্দায় ওপরে লটকানো কাঠের বাস্ত্রের ঘরে রোজ ফিরে আসত পোষা কবুতরেরা। গৃহী পাখি। মানুষকে পুষল কে ? মানুষ নিজের কি ? সে ঘর বানাল, কপাট বানাল, নিজেকে পুরল তার মধ্যে। কিন্তু গৃহের মধ্যে কী আশা করে মানুষ ? নিশ্চিন্দ নিরাপত্তা, স্বস্তি, নির্ভরতা, স্নেহ ? আবার এই তার নিজস্ব ঘর তাকে পৃথিবী থেকে খানিকটা আলাদাও করে দেয় না ? মানুষ কি ভাবতে শেখে না, এই ঘর আমার, এই বাড়ি আমার, অন্য ঘর-বাড়িগুলো আমার নয় ? অন্য ঘরবাড়ি উড়ুক পুড়ুক, আমাটাটা থাকলেই হয়। মানুষ এইভাবেই কি ক্রমে উদাসিন হয়ে যায় ঘরের বাইরের পৃথিবীর প্রতি ? অন্য সকলের প্রতি ?

অনেকের সঙ্গেই তার মতের অমিল হচ্ছে আজকাল—মন্ত্রী, আমলা, কতিপয় শিল্পপতি। কৃষ্ণজীবন তাদের কিছুই বুঝিয়ে উঠতে পারে না। সে বরাবর নন-কমিউনিকেটিভ। কিন্তু লিখিত প্রতিবেদনে সে ভুখোড়। সে জানে, তার যুক্তি অকাটা। তার মত আজ বা কাল পৃথিবীকে গ্রহণ করতেই হবে। আজ হলেই ভাল হয়। কাল বড় দেরি হয়ে যাবে না কি ?

ইদানীং তাকে একগাদা কমিটির সদস্য করা হয়েছে। তাকে ডাকা হচ্ছে বিভিন্ন কনফারেন্সে। বিশেষজ্ঞরা তার কথা শুনছেন। এখনও মানতে পারছেন না। সেইসব লিখিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে দেশ ও বিদেশের নানা পত্র-পত্রিকায়। লোকে তার কথার সারবত্তা বুঝতে পারছে। মানতে পারছে না।

আজ দিল্লিতে সমবেদনাসম্পন্ন, বন্ধুভাবাপন্ন এক মন্ত্রী একটু স্কোভের সঙ্গে বললেন, এটা কী করে হয় কৃষ্ণজীবনবাবু, আপনি ইভান্সের প্রোধকেই বন্ধ করে দিতে চাইছেন! ইভান্সি কমে গেলে প্রোডাকশন কমে যাবে, সরকারের আয় কমেবে, আনএমপ্রয়মেন্ট দেখা দেবে।

কৃষ্ণজীবন খুব মৃদুস্বরে বলল, মানুষ অনর্থক কিছু বাহুল্য জিনিস তৈরি করে যাচ্ছে। আমি বিচার করে দেখছি, অনেক কিছু না হলেও মানুষের চলে যায়।

আপনি অনেকগুলো ইভান্সিকে ব্ল্যাকলিস্টে ফেলতে চাইছেন। একটা চালু ইভান্সি কি হট করে বন্ধ করে দেওয়া যায় ? বরং ইভান্সিয়াল ওয়েস্ট রিসাইক্লিং-এর জন্য আপনি যে নানারকম প্র্যাটিকার কথা বলেছেন সেটা ভেবে দেখার মতো। কিন্তু তাতেও অনেক টাকার দরকার। এটা তো নতুন কনসেপশন! কিন্তু, কারখানার ধোঁয়াকে মাটির তলায় চষায়ে ঢুকিয়ে তা থেকে বাই প্রোডাক্ট করার যে প্রস্তাব মনিয়েছেন সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

আমিও জানি না কি করা যায়। সায়েন্সিষ্টরা ব্যাপারটা ভাবলে এবং হাতে-কলমে চেষ্টা করলে কিছু একটা হতে পারে।

মন্ত্রী মাথা নেড়ে বললেন, আমাদের পক্ষে এসব ব্যাপার বড় বেশী নাগালের বাইরে। এটা গরিব দেশ। আমাদের ইভান্সি তেমন শ্রো করেনি, এ তো আপনি জানেন। ভারতবর্ষের কলকারখানার দূষণ পৃথিবীর খুব বেশী ক্ষতি করছে না।

ঘরে কয়েকজন উচ্চপদস্থ আমলাও ছিলেন। তাঁরা বললেন, কোথায় আমরা নতুন ইভান্সির কথা ভাবছি, আর এদিকে আপনি বলছেন ইভান্সি কমাতে হবে।

কৃষ্ণজীবন যে অর্থনীতি বোঝে না, তা নয়। পরিবেশ, অর্থনীতি, বিজ্ঞান সবকিছুই পরস্পরের সঙ্গে অন্বিত। সে এও জানে ইভান্সি কমলে ভারতের ওপর প্রথম ধাক্কাটা হবে মারাত্মক। তবে তার প্রস্তাব যে এঁরা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনাও

করছেন না এবং সে চলে গেলেই যে তার বক্তৃতার কপি বাজে কাগজের ঝুড়িতে চালান হয়ে যাবে, এও সে জানে। সে বুঝতে পারছে এরা তাকে একটু বাজিয়ে দেখছে মাত্র, শুকুড়ু দিচ্ছে না। তবু যে সেমিনারের পর তাকে আলাদা ডেকে মন্ত্রী স্বয়ং কথা বলেছেন, এটাই চের। কৃষ্ণজীবন ক্রান্ত বোধ করছিল।

এরা কি তাকে পাগল ভাবে! তার প্রস্তাব কি এতই অবাস্তব? কিংবা খুব হাস্যকর? অনেক জ্ঞানীগণী তাকে বলেছেন, দৃষ্ণরোধ খুব ভাল কথা, কিন্তু আপনি ইভান্জি কমাতে বলছেন, সেটা তো ঘড়িকে উল্টোদিকে চালানো!

ঠিক কথা। কৃষ্ণজীবন গোটা দুনিয়াকেই ইঁশিয়ারি দিয়ে বলতে চাইছে, ভোগ কমাও, ভোগ্যপণ্য সংযত করো, অল্প নিয়ে থাকো, যদি শেষ অবধি বাঁচতে চাও, যদি সম্ভানসম্ভতির বেঁচে থাকা চাও। মন্ত্রী মানছেন না, আমলারা মানছেন না, অর্থনীতিবিদরা মানতে রাজি নন, তবু দৃষ্ণমুক্ত পৃথিবীর নানা দিকে যে শক্তিত পরিবেশ-চেতনার উন্মেষ ঘটছে তাতে ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণজীবনের কঠোরটিই কি প্রবল হয়ে উঠবে না একদিন? কিছু লোক কৃষ্ণজীবনের কথা শুনছে, অনুধাবন করছে, সমর্থন করছে। তাকে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না বলেই কি মন্ত্রী তাকে নিজের ঘরে আমন্ত্রণ করে আনেননি?

একজন আমলা বললেন, যথেষ্ট গাছপালা লাগানো হচ্ছে, নতুন নতুন বনসৃজন হচ্ছে, পলিউশন তাতেই কন্ট্রোলে থাকবে।

কৃষ্ণজীবন মুক ও বধিরের মতো বসে রইল। তার কথা আসতে চাইছে না। তার পেপারে ভারতবর্ষের বনসৃজনের নামে যে ধাপ্টামো হচ্ছে তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। জলদি জাতের গাছ লাগিয়ে দায় সারা হচ্ছে বটে, কিন্তু সেইসব গাছ তাড়াতড়ি বাড়তে গিয়ে মাটির রসকষ টেনে ছিঁড়ে করে ফেলছে। অন্য দিতে বন দফতরের পরোয়ানায় কাটা হচ্ছে সেইসব গাছ যা বহুদিন ধরে বাড়ছে, বহুদিন বাঁচে এবং মাটিকে ধরে রাখে।

বলে লাভ কি? এরা কি জানে না? এরা কি জানে না আজকাল হিমালয় পর্বতমালায় অবধি বৃষ্টি অনিয়মিত এবং পশু-খানোর অভাব? পাহাড়ী মানুষেরা জ্বালানী ও অন্য প্রয়োজনে নেড়া করে ফেলছে বৃক্ষ সংবলিত পাহাড়গুলিকে! এরা কি জানে না, পৃথিবী ছাড়া গোটা সৌরমণ্ডলে আর একটিও গ্রহ নেই, যতে প্রাণের বিন্দুমাত্র লক্ষণ আছে? জীবজন্তু, গাছপালা দূরে থাক, কোনও গ্রহে একটি জীবগণও নেই? এই মহার্ঘ, অনন্য গ্রহটিকে শুধু অবিম্যাকারিতায় একটি মৃত গ্রহে পরিণত করার অধিকার কার আছে?

নিউক্লিয়ার প্রায়্ট, ডিজেল ইঞ্জিন, কম্প্রেশর, রাসায়নিক ধোয়াশা, ক্ষতিকারক গ্যাস—সবকিছুর বিরুদ্ধেই সোচ্চার কৃষ্ণজীবন। শুধু ভারতবর্ষ তো নয়, গোটা দুনিয়ায় প্রগতির নামে এক বিপুল যন্ত্র সভ্যতার বিস্তারের বিরুদ্ধেই তার জেহাদ। পৃথিবীর মায়াময় বাতাবরণ ছিদ্রময় হয়ে এল। সকল প্রাণের উৎস মহান সূর্য অবিরল ছুঁড়ে দিচ্ছে তার মারক নানা বল্লম। পৃথিবীর মায়াময় আবরণ তা আটকাতে পারছে না আর। উষ্ণ হচ্ছে তার মরু অঞ্চল। বাড়ছে ক্যানসার, চর্মরোগ। অচিরে মেরু প্রদেশের বরফ গলে মহাপ্রবনের জলের ঢল নেমে আসবে সমুদ্রে।

এত কথা কি বলা যায়?

মন্ত্রী তার দিকে চেয়ে ছিলেন। হয়তো ভাবছিলেন, লোকটা কি একটু বেহেড? একটু ডাশ?

মন্ত্রী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ইউ আর আন এক্সপার্ট। আপনি ভেবে দেখবেন।

দুপুরের ফ্লাইটে ফিরে এসেছে কৃষ্ণজীবন।

আনমনে সে কিছুক্ষণ ডোরবেল বাজাল। বিরক্তিকর এক পাখির ডাকের মতো শব্দ হচ্ছে ভিতরে। কে যে এরকম বিরক্তিকর ডোরবেল পছন্দ করেছিল কে জানে! একবার বোতাম টিপলে অনেকক্ষণ ধরে বেজে যায়। অথচ ডোরবেলের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত জোরালো আওয়াজই যথেষ্ট। খামোকা এই শব্দময় শহরে আরও নতুন নতুন বিচিত্র শব্দের দৃষ্টি করা! কে জানে, এ আমলের লোকেরা বোধ হয় শব্দ ভালবাসে! কেবল শব্দ আর শব্দ। সেইজন্যই কি স্টিরিও, রক মিউজিক, চৌচৌয়ে কথা বলা?

দরজা খুলল না। একটা স্পেশার চাবি কৃষ্ণজীবনের কাছে থাকে। সে দরজা খুলে খাঁচায় ঢুকল।

বাড়িতে কেউ নেই। রিয়া তার ছেলেমেয়ে সহ কোথায় গেছে। এ বাড়িতে চক্ৰিশ ঘণ্টার কাজের একটি মেয়েও আছে। তাকেও হয় সঙ্গে নিয়ে গেছে, নয় ছাড়িয়ে দিয়েছে। রিয়া ঘন ঘন কাজের লোক পাল্টায়।

ফাঁকা বাড়িতেই অধিকতর স্বস্তি বোধ করে কৃষ্ণজীবন। লোক থাকলে সে অস্বস্তি বোধ করে। শুধু দোলন ছাড়া। অন্য সব জায়গা থেকে থান্কা খেয়ে প্রত্যাহত হয়েছে তার মন। তারপর জড়ো হয়েছে দোলনের ওপর। দোলনকে সে সবটুকু দিয়ে ভালবাসে। সে ভাবে, আমি দোলনকে একটা সবুজ পৃথিবী দিয়ে যাবো।

কৃষ্ণজীবনের কোনও নেশা নেই। চা অবধি খায় না। সে এক গ্রাস জল খেল। বাড়ির পোশাক পরে নিজের ঘরে গিয়ে বইপত্র নিয়ে বসল।

বইতে ডুব দিলে কৃষ্ণজীবনের কোনও বাহ্যজ্ঞান থাকে না। সে সম্পূর্ণ সমাহিত হয়ে থাকে। ডোরবেলটা তবু শুনতে পেল সে। অনেকক্ষণ ধরে বাজছে। মেকানিক্যাল পাখির ডাক।

কৃষ্ণজীবন গিয়ে দরজা খুলল। মুখটা চেনা, কিন্তু নামটা মনে করতে পারল না সে। তার মগজ অধিকার করে আছে বই।

তারপর হাসল কৃষ্ণজীবন। বলল, ওরা তো কেউ বাড়ি নেই।

মেয়েটা তার দিকে একটু বিস্ফারিত চোখে চেয়েছিল। বলল, আমি একটু ভিতরে আসব?

কেন আসবে তা বুঝতে পারল না কৃষ্ণজীবন। মেয়েটা তার মেয়ে মোহিনীর বান্ধবী। প্রায়ই আসে। নামটা মনে পড়ল না।

দরজা ছেড়ে কৃষ্ণজীবন বলল, আসতে পারো। কিছু দরকার আছে?

আমাদের বাড়ির ফোনে ডায়ালটোন নেই। আমি আপনাদেরটা একটু ব্যবহার করতে পারি?

বিরক্ত কৃষ্ণজীবনের মনেই পড়ল না, তাদের টেলিফোনটা কোথায় আছে। সে টেলিফোন যন্ত্রটাকে সুনজরে দেখে

না। উপকারী যন্ত্র বটে, কিন্তু বড্ড জ্বালায়। টেলিফোনে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলতে ভালবাসে তার বউ রিয়া আর মেয়ে মোহিনী। কী করে বলে কে জানে!

কৃষ্ণজীবন বলল, করতে পারো। হয়ে গেলে যাওয়ার সময় দরজাটা টেনে দিয়ে যেও। আমি আমার ঘরে যাচ্ছি।

কৃষ্ণজীবন তার ঘরে এসে ফের বই খুলে বসল। জগৎ-সংসার ভুলে গেল।

কতক্ষণ কেটেছে কে জানে! হঠাৎ কে যেন ঘরের আলোটা জ্বলে দিল।

এই অন্ধকারে কি করে পড়ছিলেন?

কৃষ্ণজীবন তার ঘোর-লাগা চোখ তুলে তাকাল। সেই মেয়েটি।

কৃষ্ণজীবন কী বলবে ভেবে পেল না। খুব অস্বস্তির সঙ্গে বলল, সঙ্গে হয়ে গেছে, না?

হ্যাঁ। আপনার চোখ খুব ভাল, তাই এই অন্ধকারেও পড়ে যাচ্ছিলেন।

আলো জ্বালতাম। একটু বাদেই জ্বালতাম।

আমার ফোন করা হয়ে গেছে।

দরজাটা টেনে দিয়ে যাও।

আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

কি কথা?

আপনি কখনও লাস্সল চালিয়েছেন?

কেন চালাব না? অনেক চালিয়েছি।

সত্যি? দারুণ ব্যাপার, না!

কৃষ্ণজীবন মেয়েটির দিকে অবাক চোখে চেয়ে বলে, এমন কিছু দারুণ ব্যাপার নয়। সবই অভ্যাস।

আচ্ছা, আপনি তো হাইলি একুডাইট। আপনি কেন চাষ করতেন?

করতাম। আমরা খুব গরিব ছিলাম।

আমি একটু বসতে পারি?

বোসো।

আপনাকে ডিস্টার্ব করছি না তো?

কৃষ্ণজীবন বিরক্ত হচ্ছে। তবু বলল, কিছু বলবে?

আমি প্রায়ই আসি, জানেন তো?

জানি। তোমার নামটা মনে নেই।

অনু। আপনার সঙ্গে ভীষণ কথা বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আপনি সবসময়ে এত ব্যস্ত থাকেন! আসলে আপনি তো থাকেনই না কলকাতায়।

হ্যাঁ।

আর আপনি ভীষণ গম্ভীর বলে একটু ভয় পাই।

কৃষ্ণজীবন খুব অবাক হয়ে বলে, ভয় পাও? কেন?

মনে হয় আপনি ভীষণ রাগী।

কৃষ্ণজীবন দুগুথের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, আমার রাগ নেই। রাগতে পারিই না। রাগতে পারলে হয়তো ভালই হত।

রাগ কি ভাল? আপনি রাগবেন কেন? কখনও রাগবেন না।

কৃষ্ণজীবন ঠিক এ ধরনের কথাবার্তা কখনও শোনে না। মেয়েটি কি খুব সরল? বা মাথায় ছিট আছে? বুঝতে না পেরে সে চুপ করে থাকে।

অনু বলল, আপনার ভয়েসটা দারুণ ভাল। রিয়েল বাস। আর আপনি ভীষণ হ্যাডসাম।

মেয়ের বয়সী একটি মেয়ের মুখে একথা শুনে আর একটু বিশ্বয় বাড়ল কৃষ্ণজীবনের। যৌবনকালে সে শুনেছে বটে যে, তার চেহারাখানা ভাল। কিন্তু ভাল চেহারার কোনও উপযোগ বা প্রয়োজনীয়তা সে তো অনুভব করে না! তার চিন্তার রাজ্যে চেহারার মূল্যই বা কী?

অনু খিলখিল করে হেসে ফেলল। তারপর বলল, কিন্তু আপনি একটু শ্যাঁবি। আজ শেভ করেননি কেন?

কৃষ্ণজীবন নিজের গালে হাত বুলিয়ে নিল নিজের অজান্তেই, বলল, শেভ! করিনি-বলছো?

করেননি। সেটাই মনে নেই?

কৃষ্ণজীবন খুব ভাবিত হয়ে বলে, সকালে খুব তাড়া ছিল। কি জানি ভুলেও যেতে পারি! মিনিটারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। শেভ তো করার কথা।

ফের খিলখিল করে হাসল অনু। বলল, মোটেই করেননি। আপনার গালে স্টাবস রয়েছে।

হতে পারে। তুমি খুব হাসো বুঝি?

অনু একটু গম্ভীর হয়ে বলে, হাসিই তো আমার রোগ। কিন্তু ফর লাস্ট টু উইকস হাসছি না। এই প্রথম আপনার কাছে এসে হাসলাম। আমার বাবা সিরিয়াসলি ইল। হার্ট অ্যাটাক।

ওঃ! বলে কৃষ্ণজীবন খুব অস্বস্তির সঙ্গে চুপ করে থাকে।

এই বয়সের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাৎ বা কথাবার্তা হয়ই না। জানেই না এরা কেমন।

আজ বাবা একটু বেটার। পেইন নেই, সেডেডিক কম দেওয়া হচ্ছে। আজ আমার মনটা খুব ভাল লাগছে।

এসব ক্ষেত্রে কী বলতে হবে তা কৃষ্ণজীবন ভেবে পায় না। একজন প্রম্পটার থাকলে ভাল হত। সে শুধু বলল, বাঃ

বেশ!

আচ্ছা, আপনি বাড়িতে বুঝি লুঙ্গি পরেন ? আমার বাবা পরে পাজামা আর পাজ্জাবি। সব সময়ে ফিটফাট।
কৃষ্ণজীবন প্রচণ্ড অস্থিতি বোধ করছে। এ মেয়েটা কি ফাজিল ? ফচকে ? অসভ্য ? ছিটিয়াল ? এভাবে কৃষ্ণজীবনের সঙ্গে কেউ কথা বলে না। এ বাড়িতে তাকে ভাল করে লক্ষ্যই বা করে কে ? কৃষ্ণজীবন তার লুঙ্গিটার দিকে চেয়ে বুঝতে পারল না, কৃতকর্মের জন্য তার অনুশোচনা হওয়া উচিত কিনা! অদ্রলোকদের কি বাড়িতে পাজামা-পাজ্জাবি পরেই থাকা উচিত ? সে পাজামা তো পরেইনি, এমনকি তার গা আদুর।

আপনি কি একসারসাইজ করেন ?

একসারসাইজ! মানে ব্যায়াম ?

হ্যাঁ। আমার বাবা একটুও করে না। ডাক্তার বলেছে, এখন থেকে রেগুলার হাঁটতে হবে। অনেকটা করে। অবশ্য এখনই নয়। টোটাল রিকভারির পর। আপনি কিন্তু খুব মাসকুলার। হি-ম্যান। আচ্ছা, গ্রামের বাড়িতে আপনার কে আছে ? কৃষ্ণজীবন এতক্ষণে কূল খুঁজে পেল। গাঁ নিয়ে কেউ প্রশ্ন করলে সে আজও কথা খুঁজে পায়। কৃষ্ণজীবন একটু হেসে বলল, সবাই আছে। মা-বাবা, ভাইরা, ভাইদের ছেলেপুলে। আমাদের বেশ বড় সংসার।

সবাই প্রাউম্যান ?

প্রাউম্যান ? না না, চাষের জমি এখন ভাগচাষীদের হাতে। বেশী নেইও। অভাবে বিক্রি করে দিতে হয়েছে। আমার ভাইরা সামান্য চাকরি বা ব্যবসা করে।

আপনার গ্রাম বেশী ভাল লাগে, না শহর ?

কৃষ্ণজীবন স্বপ্নাতুর চোখে মেয়েটির দিকে চেয়ে বলে, গ্রাম। আমি একদিন সেখানেই ফিরে যাবো। চাষ করব। গাছের পর গাছ লাগাব। সবুজে সবুজ করে দেবো চারধার।

আপনি তো পলিউশন এক্সপার্ট। গায়ে কোনও পলিউশন নেই, না ?

আছে, আছে।। পলিউশন সর্বত্র আছে। যেখানে কল-কারখানা নেই, ডিজেলের ধোঁয়া নেই, কেমিক্যাল ফিউম নেই, সেখানে কী আছে জানো ? মানুষকে মানুষের গালাগাল, অশ্রাব্য কথা, করাশন। এগুলোও পলিউশন। ভিতরকার পলিউশন। কলকাতার বস্ত্র বা বুপড়ি দেখনি ?

দেখব না কেন! আমাদের বাড়ির পিছনেই একটা আছে।

ঝগড়া শুনতে পাও ?

হ্যাঁ। কী অসভ্য অসভ্য গালাগাল দেয়।

সে কথাই বলছি। মানুষ এখনও এইসব পলিউশন নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করেনি বোধ হয়। মাতাল, অশিক্ষিত বাপ দৃষ্টিত কথা বলে, গাল দেয়, মারধর করে। ছেলেমেয়েরা সেইসব শিখে নেয়। এইভাবেই এত পলিউটেড হয়ে যায় এরা, যখন আর পৃথিবীর সৌন্দর্য বুঝতে পারে না, জীবনের সৌন্দর্য বুঝতে পারে না। গোটা দুনিয়াকে ঘেন্না করতে থাকে।

ইউ টক নাইস। মুগ্ধ চোখে চেয়ে অনু বলে।

কৃষ্ণজীবন মৃদু হেসে বলে, গ্রামেও সেরকম পলিউশন আছে।

করাল লাইফ আমি কখনও দেখিনি। আমার খুব ইচ্ছে করে।

গাড়ি করে কৃষ্ণজীবন বলে, সব মানুষেরই করে। প্রত্যেক মানুষের রক্তেই একটা ফিরে যাওয়ার টান আছে। কিন্তু যেতে পারে না। শহর বেঁধে রাখে।

আমরা মাঝে মাঝে বেড়াতে যাই। কখনও পাহাড়ে, কখনও সমুদ্রের ধারে, কখনও জঙ্গলে, কী যে ভাল লাগে! কিন্তু তিন চারদিন পর ইট বিকামস্ বোরিং। ভেরি বোরিং। রোজ পাহাড় দেখছি তো পাহাড়ই দেখছি। নার্শি চেক্সেস।

গুণু দেখতে গেলে এবং ইনভলভমেন্ট না থাকলে ওরকম হয়। যে জায়গায় যাচ্ছে সেই জায়গার সঙ্গে তোমার তো আত্মীয়তা নেই! থাকলে বোরভম টের পেতে না। আমি যখন গায়ে ফিরে যাবো, ঠিক চাষী হয়ে যাবো, গেরো হয়ে যাবো, সব বিদ্যে ভুলে যাবো।

ইউ আর প্যাশনটেটল ইন লাভ উইথ ইওর ভিলেজ। আচ্ছা, আপনি কি চান শহর থেকে মোটরগাড়ি, বাস সব ভুলে দিয়ে রিকশা, সাইকেল, ঘোড়ার গাড়ি আর ট্রাম চালু করতে ? হাই ফানি! মোহিনী বলছিল।

কৃষ্ণজীবন ঝান একটি হাসল। বলল, একদিন হয়তো তাই হবে। আমার মতে কী যায় আসে ? আমি যা ভাল বুঝি, বলি। আমাদের চেয়ে তোমরা আরও বেশী দিন পৃথিবীতে থাকবে। তোমাদের সম্ভ্রতিরা থাকবে আরও বেশী দিন। পৃথিবীকে আমরা যদি তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে ফেলি তাহলে তাদের জন্য কী থাকবে ? আমি তো ভাবী পৃথিবীর চেহারা দেখতে পাই, ঘোড়ার গাড়ি ফিরে এসেছে, সাইকেল চলছে। পালকি, গোকুর গাড়ি, নৌকো ...

ইউ আর ফানি।

পাশাপাশি সোলার এনার্জি, ব্যাটারি আর উইন্ডমিল। পৃথিবী বসে থাকবে না। বাঁচবার পথ করে নেবেই। কিন্তু বোকারা কিছু বুঝতে পারছে না।

কারা বলুন তো!

মানুষেরা। ক্ষমতাবানরা। যারা পৃথিবীকে চালাচ্ছে তারা।

অনু মুগ্ধতার সঙ্গে চেয়েছিল। হঠাৎ বলল, ইউ আর নাইস। আই অ্যাডোর ইউ।

কৃষ্ণজীবনের আবার মনে হল, তার একজন প্রম্পটার দরকার। এই পরবর্তী প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের সংলাপ সে বুঝতেই পারে না। কত কী বলে দেয় এরা মুখের ওপর! এরা কি এরকমই নাকি! কিন্তু খারাপ লাগছে না। মোটেই খারাপ লাগছে না তার।

অনু চেয়ারটা আর একটু কাছে টেনে বসল। তারপর বলল, আমি শুনেছি, আপনার কোনও ফ্রেন্ড নেই। সত্যি ?

কৃষ্ণজীবন অপ্রত্যাশিত এই প্রশ্নে আবার চকিত হল। তারপর মৃদু হেসে বলল, না। আমার কোনওদিনই তেমন কোনও বন্ধু ছিল না। কেন বলো তো!

আমি আপনার ফ্রেন্ড হতে চাই।

তুমি!

আমি খুব ভাল ফ্রেন্ড হবো। আই অ্যাডোর ইউ। ইউ আর এ নাইস ম্যান। মাঝে মাঝে চলে আসবো, গল্প করব। আবেল তাবোর গল্প কিন্তু! রাগ করবেন না তো! ফ্রেন্ডের ওপর রাগ করতে নেই।

মাই গড! তুমি তো মোহিনীর বন্ধু!

তাতে কি? আপনি কি ওস্ত কনসেশনের লোক?

না, মানে ...

কথা হারিয়ে গেল। কিন্তু হঠাৎ অনেকদিন পর একটা নির্মল হাসিতে তার মন উদ্ভাসিত হয়ে গেল। কেন যে ভীষণ ভাল লাগল তার এই অবাস্তব, অসম্ভব প্রস্তাবকে!

কি, রাজী?

কৃষ্ণজীবন সকৌতুকে অনুর দিকে চেয়ে বলে, রাজী। কিন্তু আমার তো অভ্যাস নেই বন্ধুত্বের। কি করতে হয় বলো তো!

আই উইল টিচ ইউ।

শেখাবে?

আপনি তো ভীষণ ভাল আর ছেলমানুষ, তাই না? আমি আপনাকে সব শিখিয়ে দেবো। আজ যাই, নার্সিং হোম-এ যেতে হবে। বাই।

অনু চলে যাওয়ার পর আর কিছুতেই বইয়ে মন দিতে পারল না সে। তার আংশিক বোবা মন হঠাৎ যেন অনেক কথা বলে উঠতে চাইছে। মজা লাগছে, হাসি পাচ্ছে। মেয়েটা পাগল বোধ হয়। কিন্তু এ শুড কম্পানি। তার জীবনে এরকম ঘটনা কখনও ঘটেনি। কত বয়স হবে মেয়েটার, হার্ডলি পনেরো বা ষোলো? পোশাকটা কী ছিল যেন? না শাড়ি নয়। কী যেন? বেশ স্মার্ট দেখাচ্ছিল তো! বোধহয় সালোয়ার কামিজ! হ্যাঁ, তাই হবে। বেশ ধারালো বুদ্ধির ছাপওয়ালা মুখ।

একটু রাত্তে নিজস্ব ছোট টেলিফোন আর দোলনকে নিয়ে যখন ছাদে বসে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে তারা দেখার চেষ্টা করছিল কৃষ্ণজীবন তখনও আনন্দের রেশটা রয়েছে।

বাবা, তুমি হাসছো কেন? আমাকে তারা দেখাবে না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আজ বড় মেঘলা, ভাল দেখা যাচ্ছে না।

তুমি হাসছিলে কেন বাবা?

এমনি।

তুমি তো কখনও হাসো না! সবসময়ে গম্ভীর থাকো।

হাসলে কি আমাকে তোমার ভাল লাগে না!

খুব ভাল লাগে।

আজ আমার খুব মজা লাগছে।

কেন বাবা?

এমনিই।

কথাটা খাওয়ার টেবিলে রিয়াও তুলল, কী গো, আজ তোমাকে একদম অন্যরকম দেখাচ্ছে কেন?

কিরকম?

সেই চেনা মানুষটা তো নয় দেখছি! সেই গোমড়ামুখো, ভ্রুকুটি-কুটিল মুখখানা তো দেখছি না। কী হল হঠাৎ?

কৃষ্ণজীবন ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ে গেল।

দোলন নিরীহ গলায় বলে, বাবার আজ খুব মজা লাগছে।

রিয়া জুঁচকে বলে, কিসের মজা?

মোহিনী আর সত্যজিৎ তাদের প্লেট থেকে মুখ তুলে কৃষ্ণজীবনের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তাদের বাবার মজা লাগছে, এরকম অদ্ভুত ঘটনার কথা তারা কখনও শোনেনি।

রিয়া বলল, সবই তো চেপে থাকো। সত্যি বলো তো, তুমি কোনও অ্যাওয়ার্ড বা রিকগনিশন পাওনি তো!

না, না, বলে কৃষ্ণজীবন নিজেকে ঢাকবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। বন্ধুত্বও কি অ্যাওয়ার্ড নয়? রিকগনিশন নয়?

রিয়া একটু বিরক্ত মুখে বলল, বিষ্ণুপুর থেকে একটা চিঠি এসেছে। পোস্টকার্ড!

একটু চমকে উঠল কৃষ্ণজীবন, কার চিঠি! খারাপ খবর নাকি?

ইউ ডিপেন্ডস্। তোমার বাবা তোমাকে একবার যেতে লিখেছেন।

কেন?

কি সব গোলমাল হচ্ছে। বাড়ি ভাগাভাগি হবে। তোমার নাকি যাওয়া দরকার।

ওঃ! বলে চুপ করে থাকে কৃষ্ণজীবন।

আমি একটা কথা বলব?

কি কথা?

তুমি কিন্তু নিজের ভাগটা ছেড়ো না। আজকাল কেউ কিছু সহজে ছাড়ে না। তুমিও বোকার মতো ছেড়ে দিও না।
 হাঁ, মনে চূপ করে থাকে কৃষ্ণজীবন। চোখে ভেসে ওঠে, কুলগাছ ছেয়ে সোনালতার বিস্তার। কী সবুজ মাঠ! মাটির
 মদির গন্ধ নাকে ভেসে এল বুঝি!

১৩

এবার যেমন ভাতাভাত্যে বর্ষা তেমনি গুমসোনো গরম। দুদিন বৃষ্টি নেই। আকাশ থমকানো মেঘলা। ভেজা মাটির
 ভাপ আর গুম-ধরা আকাশের মাঝখানটা যেন সেকাঁ রুটির পেটের মধ্যকার মতো। বাতাস নেই, গাছের পাতাটিও নড়ছে
 না। ঘাম হয়, শ্বাসকষ্ট হয়। দুপুরবেলাটা এই ভ্যাপসা গরমে বড্ড সুনসান। মানুষ দূরের কথা, পথেঘাটে নেড়ী কুকুরটাও
 ল্যাং ল্যাং করে ঘুরে বেড়ায় না।

একখানা রিক্সা ট্যাঙ্কস ট্যাঙ্কস করতে করতে চলছে। তাতে মাইক ফিট করা। ফাটা গলায় চিহ্নি সুরে প্রচার চলছে।
 বিশ্ববিজয় অপেরার আগামী পালা আউরঙ্গজেব! আউরঙ্গজেব!—ব!

পালা নামতে এখনও পাল্কা দুটি মাস। বর্ষা না গেলে, ক্ষেতের কাজ শেষ না হলে নামবার কথাও নয়। আহাম্মক ছাড়া
 এবাবে কেউ গাঁটগন্ডা দেয়?

বটতলায় রিক্সা থামিয়ে পাঁচু সিট থেকে নেমে গামছায় মুখের ঘাম মুছল। নিমাই প্রাস্টিকের বোতল থেকে চকচক
 করে জল ঝাঙ্কল। নিম-গরম জলে তেঁষ্টা যেতে চায় না। যা গরমটা পড়েছে, জলের কি ঠাণ্ডা থাকার জো আছে? টিপকল
 থেকে যখন ভরেছিল তখন ভারি ঠাণ্ডা ছিল।

পাঁচু বলল, একটু জিরিয়ে নাও নিমাইদাদা। আমি একটু বিড়ি টেনে নিই। নইলে জুত হচ্ছে না।
 নিমাইয়ের তাতে বিশেষ আগন্তি নেই। এই দুপুরে ঘুরে ঘুরে বিশ্ববিজয়ের পালার কথা বলে তেমন লাভও তো হচ্ছে
 না। শুনছে কি কেউ? শুনলেও গা করছে বলে মনে হয় না। রিক্সা আর মাইকের দিনভর ভাড়া, নিমাইয়ের মজুরি মিলে
 টাকা কিছু কম যাচ্ছে না। তবে কাকা লোকটাই অমনি। চাপল বাই তো কটক যাই। যত্ন আয়, তত্ন ব্যয়।

নিমাই নেমে বটতলার বাঁধানো তলায় বসতে গিয়ে আঁতকে উঠল। শান তেতে আছে। রোদ নেই, তবু যে কেন
 তাতে কে জানে বাবা!

পাঁচু আড়চোখে কাণটা দেখে বলল, রিক্সার সীটটা নামিয়ে ওটা পেতে বোসো। আমি মকবুলের দোকান থেকে
 বিড়িটা ধরিয়ে আসছি।

সীটটা পেতেই বসল নিমাই। পাঁচু শিগগির আসবে না। অনেকক্ষণ এক নাগাড়ে রিক্সা টেনেছে। হাঁপাচ্ছে। মালিকের
 ভাগেরটা দিয়ে কটা টাকাই বা থাকবে হাতে? মাস দুয়েক আগে টিবি থেকে সেরে উঠেছে। আবার হয়তো শিগগিরই
 রোগে পড়বে। গরিব মানুষদের বাঁচাও যা, মরাও তা।

নিমাই বিড়িটিড়ি খায় না। শরীরে সয় না তো বটেই, তাছাড়া ওসব তার কাছে বাবুগিরির সামিল। দিনে দশটা করে
 টাকা আসছে, এটাকে সে টুক টুক করে জমাচ্ছে। বাজারে একখানা দোকানঘর নিয়ে কথাবার্তা চলছে। এখনো বন্দোবস্ত
 হয়নি। এই ফাঁকে কাকাকে বলে এ কাজে তাকে বহাল করেছে বীণাপাণি। কাজটা খাটনির নয়। তবে এই গরমে বড় কষ্ট।

কষ্টটাকে গায়ে না মেখে টাকাটা রাখছে নিমাই। শতখানেক হলেই পালপাড়ায় গিয়ে বাবার হাতে তুলে দেবে। আর
 তখন বুড়াবুড়ির মুখে যে হাসিখানা ফুটবে সেটাতোই জুড়িয়ে যাবে তার প্রাণ। ওই বোকাসোকা দুটো বুড়াবুড়ির জন্য
 নিমাই না পারে হেন কাজ নেই। কিন্তু কাজই জুটতে চায় না মোটে। দোকানটা হলে বাঁচোয়া। একখানা দোকান হলে
 সারা দিনমান খন্দের সামলে সন্দের পর একখানা কীর্তনের আসরে গিয়ে বসবে—এর চেয়ে বেশি নিমাই আর কিছু চায়
 না। তার ইচ্ছে ছিল, কীর্তন করে তা থেকে যা জোটে তাই দিয়েই চালিয়ে নেবে। পয়সা না থাক, বুকভরা আনন্দ তো
 আছে। গলায় সুর ছিল তার। কিন্তু আজকাল গলার আওয়াজটা তার নিজের কানেই ভাল ঠেকেছে না। বুকে দমেরও যেন
 ঘাটতি হচ্ছে।

টাকাপয়সার চিন্তা বড় দৃষিত চিন্তা। মনে ঠাই দিতে নেই। তবে ঘুরেফিরে কথাটা মনে হয়, সে বড় গরিব। বড়
 টানাটানির মধ্যে সে বড় হয়েছে। খিদের কষ্ট সহিতে পারত না ছেলেবেলায়। কাঁদত। তার কান্না দেখে মাও কাঁদত।
 ফলপাকড় পেড়ে খাবে তা সেরকম ফলস্ গাছও ছিল না পালপাড়ায়।

তবে ভগবানের দয়টা আছেই। খিদের কষ্ট পেতে পেতেই আস্তে আস্তে খিদেটা সয়ে যেতে লাগল। মানুষের দাঁতে
 ব্যথা হয়, মাথা ধরে, জ্বরজারি হয়, লোকে সয়ে থাকে না সেসব? খিদেটাও সেরকম আধিব্যাধি ঠাউরে নিল সে। ও যেন
 দাঁতের ব্যথা, পেটের ব্যামো। আজ আর খিদেকে ভয় নেই তার। খাওয়ার কষ্টটাও নেই। ইদানীং বেশ খাওয়া-দাওয়া
 হচ্ছে তাদের। গেলবার তো বীণাপাণি একটু সরু চালই কিনে ফেলল। দোবেলা মাছ হচ্ছে। ডালের পাতে পটল বা চ্যাড়শ
 ভাজা জুটে যাচ্ছে। গত দু মাসে না হোক তিনবার মাংস হয়েছে। এ সময়টায় এই অপয়া বর্ষায় বীণাপাণির হাতে বাড়তি
 টাকা থাকার কথাই নয়। তবে আসছে কোথেকে?

দুপুরের এই ঝিমধরা গরমে প্রশ্নটা নিয়ে খুব ভাবিত হল সে। গালে হাত দিয়ে বসে ভাবতে লাগল। কাকা ভাল
 লোক, কিন্তু গাড়ল তো নয় যে, এই যাত্রার আকালে বেশী করে টাকা দিচ্ছে বীণাকে!

তবে কি অন্য কেউ দিচ্ছে? দিলে তো বলতে হবে, দেওয়াটা ধর্মত ন্যায্যত দিচ্ছে না, ভিতরে মতলব আছে। ধর্মে
 টাকা নেই, অধর্মে আছে। অধর্মের টাকা বড্ড হুড় হুড় করে আসে, সামাল দেওয়া যায় না।

পাঁচু একটা বিড়ি শেষ করে আর একখানা ধরিয়ে এসে ছায়ায় দাঁড়িয়ে একটু কনুই চুলকুলো, একটা হাই তুললো,
 তারপর উদাস গলায় বলল, আরও ঘুরবে নাকি? তার চেয়ে একটু জিরোই চলো। তুমি এদিকটায় গদি মাথায় দিয়ে শোও,
 আমি ওদিকটায় একটু গড়িয়ে নিই। বেজায় গরম।

নিমাই রাজি হয়ে গেল। বলল, ঘটনাক্রমে বোধী নয় কিন্তু। বটতলা খারাপ জায়গা, কেউ দেখে ফেলতে পারে। কেউ দেখবে না। আর দেখলেই কি? মানুষের শরীর তো, নাকি?

নিমাই কথা বাড়াইল না। শুয়ে পড়ল। ঘুমটাও আসত। তবে চিন্তাটা বড্ড কুটকুট করছে বলে ঘুমটা চোখের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রইল। বীণাকে টাকাটা দিচ্ছে কে? এই যে সকাল থেকে বিকেল অবধি মাইক ফুঁকে বেড়ানোর চাকরিটা বীণা তাকে জোগাড় করে দিয়েছে তার পিছনে মতলব নেই তো! এই ভরদুপুরে কি কেউ আসে-টাসে বীণার কাছে?

মন বড় পানী। কথাটা মনে হতেই জিব কাটে নিমাই। ছিঃ ছিঃ, বীণা তার জন্য জান কিছু কম চুইয়েছে? সে চলে যাচ্ছিল, নিজেই দেখে যেতে রেখেছে। আজ অবধি এই পাপ-মুখে সে বলতে পারবে না যে, বীণার কিছু বেগোছ দেখেছে। তবে কথাটা মনে হচ্ছে কেন? একবার গিয়ে চুপি চুপি হাজির হবে নাকি বাড়িতে? গিয়ে যদি সত্যিই দেখতে পায় যে, বীণা পরপুরুষের সঙ্গ করছে, তাহলে? তাহলেই কি কিছু করতে পারবে নিমাই? দু'ঘা কষাতে পারবে লোকটাকে? নাকি পারবে বীণাকেই ধমক চমক করতে? ওসব গণগোলো না পড়ে যাওয়াটা ই তার পক্ষে মঙ্গল। গিয়ে কিছু বেগোছ দেখলে বিপদ তারই।

ঘুমটা এল আচমকা, নোটিস না দিয়ে। ঘুমিয়ে মেলা স্বপ্ন দেখতে লাগল নিমাই। একটা স্বপ্ন ভারি ভাল। তার মা মর্তমান কলা আর দুধ দিয়ে চিড়ে মেখে খুব খাচ্ছে এক ডেলা গুড় দিয়ে।

ও নিমাইচন্দ্র, ওঠো! ওঠো!

নিমাই উঠে বসে। যেমে একেবারে চান করে উঠেছে।

ডাকনি কেন?

মেঘ চমকাচ্ছে। নামল বলে।

নিমাই একবার ময়লা কালো আকাশের দিকে চেয়ে বলল, নামলে বাঁচি। যা পচা গরমটা পড়েছে!

কোনদিক যাবে এবার? আমাদের টাইম কিন্তু শেষ হয়েছে।

তাহলে বাজারপানেই চল। মাইক-টাইক সব বুঝিয়ে ফেরত দিয়ে দিই।

পোকাটা অনেকক্ষণ কুটকুট করে কামড়াচ্ছে। মাথাটা ঠিক নেই, বীণা টাকাটা পাচ্ছে কোথা থেকে?

ব্রজবাসীর মাইকের দোকান অবধি পৌছোতে পারল না তারা। তার আগেই রেলগাড়ির মতো একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা এল, আর তার পিছু পিছু রসমুত্তির মতো বড় বড় ফোঁটায় হরির লুঠ ছড়াতে ছড়াতে বৃষ্টি।

ভিজে চুবুস হয়ে ব্রজর দোকানে উঠে পড়ল দুজন। ব্রজবাসীর ছোকরা কর্মচারী যন্ত্রপাতি তুলে নিল দোকানে। বলল, ভিজিয়ে ফেললে? এসব ইলেকট্রনিক জিনিস, বরবাদ হলে দাম দেবে কে?

নিমাই কথা বলল না। তবে পাঁচু বলল, বৃষ্টি কি আমার বাপের চাকর যে হুকুম মেনে নামবে? অতই যদি তোয়াজের জিনিস তবে ভাড়া দেওয়ার সময় সঙ্গে একটা ঢাকনা দিয়ে দিস না কেন?

ব্রজবাসীর দোকানের সামনে একখানা বারান্দা আর তাতে বেষ্ট আছে। দুজনে বসল পাশাপাশি। বৃষ্টির ছাঁট আসছে, প্রবল বাতাস।

পাঁচু বলল, একটু চা হলে হত, কী বলো!

নিমাই মাঝে মাঝে খায়, তবে নেশা নেই। বীণাপাণির চায়ের নেশা আছে বলেই নিমাইকে মাঝে মাঝে খেতে হয়। নিমাই উদাস গলায় বলে, তা খা না। ওই তো পল্টুর দোকানে হচ্ছে।

পাঁচু নড়ল না, বসে রইল। খানিকক্ষণ বাদে বলল, এবার বৃষ্টিটা খুব ভোগাবে, বুঝলে! লক্ষণ ভাল নয়। চাষবাসের বারোটা না বাজে।

চাষবাস নিয়ে নিমাইয়ের ভাববার সময় নেই। তার মাথায় অন্য পোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বীণাপাণির ঘরে যদি পরপুরুষ ঢুকেই থাকে তবে এতক্ষণ কি সে আছে? থাকলে এই বৃষ্টিতে সেও বেরোতে পারবে না। টাকাওলা লোক কি? জোয়ানমর্দা? নাকি বুড়োপুড়ো?

পাপের চিন্তা করলে শরীর শুকায়, মন শুকায়। দুনিয়াটাই শুকিয়ে যায়। এই বৃষ্টি-ভেজা বিকেলটা নিমাইয়ের কাছে ভারি শুকনো ঠেকছে। সে হঠাৎ বলল, হ্যাঁ রে পাঁচু, তুই ভগবান মানিস?

পাঁচু একখানা বিড়ি বের করেছে। দেশলাই রাখে না বল ধরতে পারছে না। বলল, তা মানি। শীতলা মানি, কালীঠাকুর মানি। তবে আমরা পানী-তাপী লোক, ভগবানের কথা আর ভাবতে পারি কই বলো!

আমার খুব ভগবানের কথা মনে হয়। একটু শান্তর জানা থাকলে, মন্ত্র নেওয়া থাকলে বেশ হত। কিছু হল না। সংসারের প্যাঁচে পড়ে গেছি।

পাঁচু তাক্ষিল্যের গলায় বলল, তোমার আবার সংসার! টোনাটুনি মিলে গিয়ে হাওয়া লাগিয়ে আছে। পাঁচখানা ছেলেপুলে নিয়ে আমার মতো ফাঁদে পড়তে তো বুঝতে!

বিয়ে কি সকলের সয় রে! সংসার আমার জন্য নয়। ইচ্ছে ছিল সারাদিন কাজটাঙ্গ করব, সন্কেবেলা প্রাণভরে কীর্তন করব। তা আর হল কই?

তোমার একটু সাধু-সাধু ভাব আছে বটে।

নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মেঘের ছায়ায়, বৃষ্টির ঘোরে চারদিকটা ছাইরঙা হয়ে গেল। দুর্জয় গরমটা উড়ে গেল কোথায়। ভেজা গায়ে বাতাস লেগে একটু শীত-শীত করছে। আগে সঙ্গে সবসময়ে একখানা গামছা থাকত। তাতে ভারি সুবিধে। কিন্তু আজকাল বীণাপাণি গামছা নিতে দেয় না। ওটা নাকি ভারি ছোটলোকি ব্যাপার। পাঁচু দিবা তার গামছাখানায় ভেজা মাথা আর মুখ মুছে নিয়ে বসে আছে। নিমাইয়ের সে সুবিধে নেই। পকেটে একখানা রুমাল আছে বটে, কিন্তু তা দিয়ে গামছার কাজ চলে না। পাঁচুর গামছাখানা ধার নিতেও ইচ্ছে যায় না। বড় নোংরা।

গা গরম করতেই গুনগুন করে একখানা গান ধরেছিল নিমাই। কিন্তু কপালের এমনই ফের, যে গানটা মনে এল সেটার মধ্যেই বিষ মেশানো। আমার বধূয়া আন-বাড়ি যায় আমার আসিনা দিয়া...। নিয়মিতই হবে। নইলে এ গানখানাই ভুস করে মাথায় ভেসে উঠল কেন? গান ধরতেই মনটা কু গিয়ে উঠল, বীণাপানির ওসব দোষ আছে কি? নিমাই তো ঝাঝালো পুরুষ নয়, পয়সার জোরও নেই। বীণার আর দোষ কী?

মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রুর কী জানিস পাঁচু?

পাঁচু একটু রাগ করে বলে, গানটা গাইছিলে তাই গাও না। বেশ তো শুনতে লাগছিল। এর মধ্যে আবার ওসব গন্ধমানদন কথা কেন?

না, বলছিলাম আর কি! মানুষের সব চেয়ে বড় শত্রুর হল তার মন।

আরে, ওসব জানি। ওসব হল তত্ত্বকথা। আমার মতো গরিবের মন কোথায় থাকে জানো? পেটে আর অগ্নিকোষে। সারাদিন রিক্সা টেনে মুখে রক্ত তুলতে তো বুঝতে, মনটন সব কোথায় গিয়ে সোঁধেয়। বরং গানটা গাও। কীর্তন শুনলে একটু ভাব আসে আমার।

নিমাই ফের গানটা ধরল। গলাটা খেলছে না ভাল। কিন্তু পাঁচু চোখ বুজে শুনছে গানটা শেষ করে নিমাই বলল, মন ভাল থাকলে দুনিয়াটা ভারি ভাল, আর মন বিগড়োলে পরমানুও তেতো।

আমি বলি কি, ছেলেপুলে করে ফেল এইবেলা। মনটন সব কজায় এসে যাবেখন। সবাই বলে বীণাপাণি সিনেমায় নামবে বলে ছোঁরা রাখছে। তাই ছেলেপুলে হচ্ছে না। সত্যি নাকি?

নিমাইয়ের কান একটু গরম হল। বীণাপাণিকে নিয়ে বেশ কথা হয় এ অঞ্চলে।

পাঁচু দূরের দিকে চেয়ে থেকে বলল, ওটাও অর্ধম হচ্ছে, বুঝলে? আত্মার সব চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের জন্মতে না দেওয়াটাও পাপ।

ছোটলোকে যা ভাবে তাই বলে, সবসময়ে মাথা খাটিয়ে তো বলে না। নিমাই তাই চুপ করে থাকে।

পাঁচু নিজে থেকেই বলে, অবিশ্যি সিনেমায় নামলে অন্য কথা। তখন তো সোনার খাটে মাথা, রূপার খাটে পা। গাড়ি, বাড়ি, টাকায় ভাসাভাসি। টাকা থাকলে তখন আর পাপটাপ অর্শ্য না। রাবণরাজার কথা তো জানো, স্বয়ং শিবঠাকুর তার বাড়ি চৌকি দিত।

বীণাপাণি সিনেমায় নামবে কিনা তা নিমাই জানে না। তবে ছেলেপুলে যে এখনই চায় না সেটা নিমাই জানে। টেজে উঠে মেলা নাচন কৌদন করতে হয়, গলা তুলতে হয় সগুমে, ওসব করতে গেলে শরীরের তাগদ চাই। ছেলেপুলে হয়ে পড়লে অসুবিধে আছে। আর নিমাই-ই বা কোন মুখে চাপাচাপি করবে। নিজেই যে দাঁড়ের পাখি হয়ে আছে।

বৃষ্টিটা ছাড়ল না। তবে চাপটা একটু কমল। চরদিকটা যেমন ধোঁয়াটে হয়ে গিয়েছিল তেমনটা আর নেই।

নিমাই বলল, চল, কাকার কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে বাড়ি যাই।

পাঁচু নড়ল না। বলল, অত তাড়া কিসের? আজ টাকা পেতে দেরি হবে। হাস্কামা আছে।

কিসের হাস্কামা?

বটতলায় একটা ছেলে খুব হল না সেদিন? সেটা নিয়েই কী সব হচ্ছে-ট হচ্ছে।

সে তো পগা।

পগাই বটে নামটা। ডলার আর পাউন্ড বিকিকিনি করত।

সে শুনেছি।

তা তার মহাজন কলকাতা থেকে লোকজন নিয়ে এসেছে। পগার কাছে নাকি মেলা সাহেবী টাকা ছিল।

হ্যাঁ, মাঝে মাঝে ... বলতেই যেন ভগবান জিবখানা টেনে ধরলেন। সে বলে ফেরতে যাচ্ছিল যে, বীণাপাণির কাছেও মাঝে মাঝে টাকা গচ্ছিত রেখে যেত। কথাটা পাঁচকান হওয়া ভাল নয়।

পাঁচু উদাস গলায় বলল, বড় বড় বানরের বড় বড় লেজ। কত খুনখারাপি হচ্ছে কেউ গা করে না। পগা মহাজনের লোক বলে এখন নাড়াঘাটা পড়েছে।

তাতে কাকার হাস্কামা হচ্ছে কেন?

কে জানে বাপু কি বৃত্তান্ত, নাম-ধাম শুনতে চেও না, তবে শোনা যাচ্ছে খুনটা যারা করেছে তারা কাকার দলের ছোঁকরা সব।

আজকের দশটি টাকা গেলে নিমাইয়ের সত্তরটা টাকা হয়। আর তিনটে স্কেপ মারতে পারলে পুরো একশ। একশ হলেই পালপাড়া। মা-বাবার মুখে হাসির ঢল। নিমাইয়ের নিজের রোজগার বলে টাকাটার দামও কি একটু বেশী? কে খুন হল, সে সেটা করল আর কারা তার তত্ত্বালাপ করতে এসেছে এসব নিয়ে নিমাইয়ের মাথাব্যথা নেই। তার ভাবনা হল, হাস্কামায় টাকাটা যদি আজ কাকা না দেয় তা হলে কাল এই বকেয়া টাকাটা দিতে কাকা ভুলে যাবে না তো? নাটক-পাগল লোক, ভুললে দোষ কি? তবে সমস্যা হল, মুখ ফুটে সেটা চাইতে পারবে না নিমাই। দিনের হিসেব দিনকে মিটে গেলেই ভাল।

দোকানটা কবে খুলছে?

নিমাই বেজার মুখ করে বলে, হবে।

হবে সে আমিও জানি। তবে মহেন্দ্র মোটা টাকা হেঁকে বসেছে তো। ছ'হাজারের নিচে নামতে চাইছে না, না?

এ বাজারে দরটা আর নামাচ্ছে কে?

তবে তোমার বউ যখন লেগেছে ও হয়ে যাবে।

এ কথাটা নিমাই বুঝল না। বীণাপাণি তো আর বড়লোক নয়। কাকার দয়ায় খেয়ে পরে কোনওক্রমে আছে। একেবারে হাততোলা অবস্থা। শহরের বাইরের দিকটায় এবং ভিতর ভাগে একটুখানি জমি কিনতে দম শেষ হয়ে গিয়েছিল পার্থিব—৮

বীণার। বেড়া আর টিন দিয়ে যে ঘরখানা তুলেছে সে টাকার জোরে নয়, মনের জোরে। মহেন্দ্র যে ছ'হাজার টাকা চেয়েছে সেটা জানতই না নিমাই। এই শুনল। ফলের দোকান এমন কিছু লাভের ব্যবসা নয়। বনগায়ে ফলটা খাবে কে? পুজোআচ্ছায়া কলাটা শশাটা কিছু বিক্রি হয় আর সিজন ফল। ছ'হাজার টাকা সেলামি দিলে সে টাকা উসুল করতে নিমাইয়ের বহু বছর চলে যাবে। আজই গিয়ে বীণাকে বারণ করতে হবে।

পাঁচু উদাস মুখে বলল, মনোহারি দোকানেও খরচাও আছে। কম করেও পনেরো বিশ হাজার টাকা লাগসই না করলে হবে না। তার ওপর ধরো কাচের বাস্ক, আলমারি এসবেরও খরচ ভালই।

নিমাইয়ের মাথায় ছোটো একটা বজ্রাঘাত হল। একদিন ঠাট্টা করে মনোহারি দোকানের কথা বলেছিল বটে বীণা। তা হলে সে কাণ্ডই হতে যাচ্ছে! নিমাইয়ের চোখটা ঘোলাটে হয়ে এল। এসব হচ্ছেটা কী? বীণার টাকের তো এমন জোর নেই! আর এসব ঘরের কথা তাকে পাঁচুর মুখেই বা শুনতে হচ্ছে কেন? মনোহারির কথা, ছ'হাজার সেলামির কথা তো তাকে বলেনি বীণা! এদিকে বাজারে তো চাড়ির হয়েছে দেখা যাচ্ছে।

পাঁচু তেমনি উদাস মুখে বলে, বিয়ে তোমার সয় না বলছিল। তা দেখ বাপু, তোমার মতো বউ এ তল্লাটে এটা লোকের আছে। তোমার মুরোদ না থাক বউ তো দশভুজার মতো আগলাচ্ছে!

কোনও কারণ নেই, তবু নিমাই তাড়াতাড়ি বলল, হ্যাঁ, বীণার মতো মেয়ে হয় না। আসলে বলতে চেয়েছিলুম কি জানিস, বীণার মতো বউ কি আমার কপালে জোটা উচিত? আমি কি একটা মনিষি?

পাঁচু তার ক্ষয়া দাঁতে হাসল, তা যাই বলো বাপু, কার ভিতরে কী আছে ভগবান জানে। তোমার কথা বলতে হয় তো বলি, যখন কীর্তন গাও তখন কিন্তু মনটা ভারি ভিজ্জ যায়। তোমার গলায় যেন হরি এসে বসেন।

নিমাই লজ্জার হাসি হাসল, হরির আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই।

পর পর দুখানা গাড়ি, একখানা জীপ আর একখানা মারুতি বটতলার দিকে বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে গেল।

পাঁচু বলল, ওই যাচ্ছে।

কে রে?

ওই যারা কলকাতা থেকে এসেছে। জিপ আর মারুতি নিয়ে।

এত কথা তোকে কে বলল?

সকাল থেকে কাকার বাড়িতে রিস্তা ঠেকিয়ে বসেছিলুম তো। ওখানকারই সুধীর বলল। সে কাকার অপেরার একজন বাজনদার। মুখ-পলকা লোক।

চিনি।

কলকাতার বাবুরা চলে গেল বোধ হয়। আবার আসবে ঠিক। একটা গুণ্ণগোল পাকাচ্ছে। মারদাস্তা লাগবে মনে হয়। যাবে নাকি? গেলে বলে', এখন একটু ফাঁকায় পাওয়া যাবে তেনাকে।

নিমাই রিস্তায় উঠে বসল। তার বুকে বড় ভয়। বীণাকে এই এত টাকা জোগাচ্ছে কে? খুব বড় কোনও বাবু? কথটা মুখেমুখি জিজ্ঞেস করতেও তো বাধে। কে দিচ্ছে টাকা? তার চেয়েও বড় কথা, কেন দিচ্ছে? সিনেমায় নামার যে কথা শুনছে পাঁচুর মুখে সেইটাই কি সত্যি নাকি? বীণাকে নিয়ে যে এত মাথা ঘামাতে হবে তা জানা ছিল না তার।

কাকার বাড়িতে আজ যথার্থমে ভাব। বাইরের ঘরখানায় যারা গম্বীর মুখে বসে আছে কাকাকে ঘিরে, তারা কেউ যাত্রার দলের নয়। এরা কাকার অন্য দিককার লোক। শ্বাগলার কাকা আর যাত্রাদলের কাকা দেহে এক হলেও দুটো আলাদা আলাদা মানুষ। এখন যে মানুষটা ঘরে সবার মধ্যমণি হয়ে বসা সে মোটেই যাত্রাদলের কাকা নয়। একে দেখলেই বুক দূরদূর করে।

কাকার বাড়িখানা পাকা আর দু মহলা। মহল না হলেও দুখানা আলাদা ভাগ আছে। সামনের বৈঠকখানা গোছের ঘরখানা বাড়ি থেকে অন্তত দশ বারো গজ তফাতে। গোটা বাড়ি দেয়ালবন্দী। গাছপালা আছে।

ঘরের ভিতরকার চেহারা বারান্দা থেকেই দেখতে পাচ্ছিল দুজন। গতকল সুবিধের নয়।

একটা ছোকরা এগিয়ে এসে বলল, কী চাই?

পাঁচু বলল, আমাদের মজুরীটা?

এখানেই দাঁড়াও। বলে ছেলেটা ঘরে গেল আর পরমুহূর্তেই বেরিয়ে এসে মজুরীর টাকা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, কাকা বলে দিয়েছে কাল থেকে আর বেরোতে হবে না। এখন যাও।

নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। একশ পুরল না।

বাড়ি যখন ফিরল তখন নিমাইয়ের বুকখানা বড় ভার। অনেক কথার জবাব খুঁজে পাচ্ছে না। অনেক কথার জবাব সে কখনও পাবেও না।

হাতমুখ ধুয়ে যখন ঘরে ঢুকে বসল তখন বীণাপাণি উপড় হয়ে বিছানায় শুয়ে একটা খাতায় কী যেন লিখছে।

কী লিখছে?

ও কিছু নয়। একটা হিসেব।

নিমাই একটু গলা খাকার দিয়ে বলল, শুনলুম মহেন্দ্র অনেক টাকা সেলামি চাইছে।

কে মহেন্দ্র?

যার দোকান নেবে বলে ঠিক করেছে!

বীণা মুখ তুলে বলল, নিইনি এখনও। কথা বলছি।

কী দরকার? ছ'হাজার টাকা কি সোজা কথা? আমাদের অত টাকা তো বেচলেও উঠবে না।

তোমাকে ভাবতে কে বলেছে?

না ভেবে কি পারি? তোমার জন্যই ভাবি

আমিও তো তোমার জন্য ভাবি বলেই করছি।

সে খুব জানি। তোমার মতো মেয়ে হয় না। সত্বশে জন্মেছো, তোমার ধরনই আলাদা। তবু বলি টাকাপয়সা হাতে রাখে। মহেন্দ্র যা টাকা চাইছে তা আমাদের নাগালের বাইরে। আমার চাকরিটাও আজ থেকে নট হয়ে গেল।

বীণা অবাক হয়ে বলে, কেন? কাকা তো বলছিল আউরঙ্গজেব খুব ঘটা করে নামাবে। দু মাস ধরে মাইকে প্রচার হবে।

কী সব গুণগোর গুণে এলুম।

কিসের গুণগোল?

ওই যে পগা খুন হয়েছিল, তার মহাজন আজ এসেছে পাইক-পেয়াদা নিয়ে। অনেক নাকি সাহেবী টাকা ছিল পগার কাছে। সেই সব খোজ-খবর হচ্ছে আর কি!

তাতে কাকার কি?

কাকার সঙ্গেই তো গুণগোল। খুনটা নাকি তার দলের ছেলেরাই করেছে।

সন্ধের মরা আলোতেও দেখা গেল বীণাপাণির মুখটা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। লেখা ছেড়ে উঠে বসল সে, আর কী শুনে এলে?

এইটুকুই। কাকার ঘরে আজ সব ষগারা জুটেছে। শলাপরামর্শ হচ্ছে।

তোমাকে কে বলল?

বাতাসে কথা উড়ছে। রিস্তাওলাটা অবধি সব জানে।

বীণা হঠাৎ ভীষণ গভীর আর দুঃখী হয়ে বসে রইল। এ সময়টায় নিমাই ফিরলে উঠে রুটি বা মুড়ি চানাচুর যা হোক কিছু দেয়। আজ নড়ল না।

নিমাই বিছানার একধারে পা তুলে বসল। বলল, আজ ঠাণ্ডা লেগেছে। যা আচমকা বৃষ্টিটা এল।

বীণা হঠাৎ তার দিকে চেয়ে বলল, কাল সকালে বিষ্ণুপুর যাই চलो।

বিষ্ণুপুর? সেখানে কেন?

মা দেখতে চেয়েছে আমাকে। বাবার চিঠি এসেছে আজ।

তা আমার আর কাজ কি? গেলেই হয়। বাড়ি দেখবে কে?

দেখার লোক আছে। এখনই গোছগাছ করে নিই চলো। সকালের বাস ধরব।

গোছগাছ বেশী নয়। একখানা সুটকেসে সবই এঁটে যায়। বীণা তবু আর একখানা টিনের বাস্র নিল। তারপর হঠাৎ বলল, দোকান থেকে একটু মিষ্টিচিপি কিনে আনো তো! বাবা খুব গুজিয়া ভালবাসে।

গুজিয়া এনে নিমাই দেখল, গোছানো শেষ।

খেয়েদেয়ে সকাল সকালই বিছানায় গেল দুজন।

সকালের বাস পাঁচটায়। ভোরের না উঠলে হবে না।

কত রাত হবে কে জানে, হঠাৎ দরজায় ধাক্কা পড়ল।

বীণা? এই বীণা? দরজা খোলো!

দুজনেই উঠে বসল। ভয়ে সিঁটিয়ে থেকে বীণা বলল, কে?

আমি কাকা। দরকার আছে। দরজা খোলো।

অন্ধকারে বীণা হঠাৎ হাত বাড়িয়ে নিমাইয়ের একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে চাপা গলায় বলল, বড্ড ভয় করছে।

॥ ১৪ ॥

মায়ের সঙ্গে ঝুমকির বোঝাপড়ার অভাবটা অনেক দিনের পুরনো। এতই পুরনো যে এখন ব্যাপারটা তার গা-সওয়া, অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। কি থেকে কি হয়, কেমন করে হয় তা জানে না ঝুমকি। শুধু জানে, তিন ছেলেমেয়ের মধ্যে সেই মায়ের সবচেয়ে অপছন্দের সন্তান। সে বড়, সে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েনি, সে একটু অলস, একটু প্রতিবাদী—এগুলো দোষ কিনা কে বলবে? কিন্তু তার মা অপর্ণার চোখে সবটাই তার দোষ। তার সব কিছুর মধ্যে দোষ। এ সংসারে মোট পাঁচ জনের মধ্যে ঝুমকির পক্ষে আছে একমাত্র তার বাবা।

তার বাবার হার্ট অ্যাটাকের পর এ বাড়িতে চলে গেল ভূতের হাতে। শোক, দুর্ভিক্ষ, উদ্বেগ পাথরের মতো চেপে বসল বাড়িটার ওপর। মায়ের সঙ্গে ঝুমকির ব্যক্তিভেদের সংঘাত ক'টা দিন নিরুদ্দেশ ছিল। বাড়িটা নিঝুম আর চুপচাপ হয়ে রইল কিছুদিন।

বাবার সাম্প্রতিক বিপদের অবস্থাটা খানিকটা সামাল দেওয়া গেছে। হার্টের ব্যাপার অবশ্য সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। সুস্থ হয়ে ওঠার পরই হয়তো আর একটা মারাত্মক অ্যাটাক এসে সব হিসেব গুলটপালট করে দেয়। তবু সংকট কাটিয়ে উঠছে তার বাবা। ব্যথা নেই, ঘুমের ওষুধ কম দেওয়া হচ্ছে। দু-এক দিনের মধ্যেই ইনটেনসিভ কেয়ার থেকে কেবিনে স্থানান্তরিত করা হবে তাকে।

কাল থেকে তাই, এ বাড়ির ওপর থেকে ভূতুড়ে ও ভারী আবহাওয়াটি খানিক ফিকে হয়েছে। স্বস্তির শ্বাস ফেলছে তারা। আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই লোকানো গর্ভ থেকে সাপখোপ বেরিয়ে পড়ছে নাকি? নইলে আজ সকালে ঝুমকি একটু বেশীক্ষণ ঘুমোনার জন্য অপর্ণা ওরকম রেগে যাবে কেন?

শুধু ঝুমকির সঙ্গেই লাগে অপর্ণার। আর কারও সঙ্গে নয়। মণীশের সঙ্গে অপর্ণার অনেক বিষয়েই মতান্তর আছে, তবু ঝগড়া হয় না কখনোই। এক গভীর ভালবাসা বুঝি দুটি উলের কাঁটাকে পরস্পরের সঙ্গে নানা নকশায়, নানা বাঁধনে ও সম্পর্কে বেঁধে রাখে। ছেলে বুঝকা মা অপর্ণার কাছে যেন এক দেবদূত। যখন ছেলের দিকে অপর্ণা তাকায়, তখন চোখ

দুখানা স্বপ্নাতুর হয়ে যায়। যখন ছেলেকে ডাকে অপর্ণা, তখন গলায় যেন রবীন্দ্রসঙ্গীত এসে পড়তে চায়। অনু ততটা নয় বটে, কিন্তু অনুরও একটা াবি আছে। সে কোলপোঁছা সন্তান, অর্থাৎ মণীষ ও অপর্ণার আরও সন্তান-সন্তানবীর ওপর দাঁড়ি টেনে তার আসা। অনু লেখাপড়ায় ভীষণ ভাল, খুব বুদ্ধিমতী। বুদ্ধিমতী বলেই সে মায়ের কাছে সরলা বালিকা সেজে থাকে। অন্য সময়ে দারুণ আ্যাডাল্ট।

ঝুমকি বারবার নানাভাবে এই পাঁচ জনের সম্পর্ক বিচার ও বিশ্লেষণ করেছে। শুধু মায়ের সঙ্গে তার শত্রুতা ভিন্ন এ সংসারে তেমন কোনও অশান্তি নেই।

আজ সকালে তার ঘুম ভেঙেছে অপর্ণার বকুনিতে। বউনিটাই খারাপ।

কাজ যে অনেক রাত অবধি ঘুমোয়নি ঝুমকি, অপর্ণা তা জানে না। বলল, কাজ করার ভরে মটকা মেরে পড়ে আছিস। তোকে হাড়ে হাড়ে চিনি। এত বড় মেয়ে, সংসারের কাজে এতটুকু সাহায্য পাই না তোর। কিসের চিন্তায় বিভোর থাকিস শুনি!

হতচকিত, শঙ্কিত ঝুমকি উঠে বসে ঘুমচোখে দুনিয়াকে খান খান হয়ে যেতে দেখে বলল, রাতে ঘুম হয়নি। ইনসোমনিয়া হয়েছিল—

কবে তোর সকালে ঘুম ভাঙে! রোজ কারও ইনসোমনিয়া হয়? এ সংসারটা কি আমার একার?

তার বিচ্ছিন্নি সর্দির ধাত আছে, টনসিল আছে। মাঝে মাঝে পেটে গ্যাস হয়। তা ছাড়া তার কিছু অদ্ভুত চিন্তাভাবনা আছে। ঝুমকি যে মাঝে মাঝে রাতে ঘুমোতে পারে না তার কারণ খানিকটা শরীর, খানিকটা মন। কিন্তু এসব শৌখিন কথা, সূক্ষ্ম যুক্তি, তার মা কখনও মানতে চায় না।

অপর্ণা আজ অনেকক্ষণ বকল মেয়েকে। অনেকক্ষণ। যেন বেশ কিছুদিন ধরে জমানো বিষ একসঙ্গে ঢেলে দিল। এমন নয় যে, ঝুমকি এক তরফা বকুনি খায়। উল্টে সেও ঝগড়া করে। প্রায়ই ঝুমকি মাঝে মাঝে বুঝতে পারে, তার শরীরের নানা অস্বস্তির কারণেই সে নিজেকে সামলে রাখতে পারে না। মাঝে মাঝে সে খিটখিটে হয়ে যায়। রেগে যায়।

আজ ঝুমকি মায়ের কথার একটাও জবাব দেয়নি। একতরফা শুধু সহ্য করেছে। দাঁত বুরুশ করে, চুল আঁচড়ে এবং কিছুটা না খেয়ে সে নিজের ঘরে জানালার কাছে তার বিছানায় বসে আছে এখন। রাগ করলে সে কিছু খায় না। চা অবধি নয়। আর সেই জন্যই অশান্তি আরও বাড়তে থাকে। অপর্ণা রাগের ওপর আরও রাগতে থাকে।

ঠিক এ সময়ে—যখন অপর্ণা রান্নাঘর থেকে তার চিকন গলায় কিছু শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করছিল—ঠিক সেই সময়ে পড়ার টেবিল থেকে একটা স্বপ্নস্বপ্ন মুখ নিয়ে উঠে গেল অনু।

মা!

অপর্ণা ঝাঝালো চোখে তাকাল মেয়ের দিকে, কী বলছিস?

আমাদের বোধ হয় এখন চুপ করে থাকা উচিত।

কেন, চুপ করব কেন?

আমার মনে হয় এখন আমাদের পিস অফ মাইন্ড দরকার। বাবা তো এখনও বাড়ি ফেরেনি!

তাতে কি হল? বাপের জন্য কারও মাথাব্যথা আছে? নাকি মায়ের জন্যই আছে?

খুব নরম পাখির মতো গলায় অনু বলল, আমাদের কিছু সুপারসিশন মানা উচিত। একটা রিচুয়াল আছে। এসব করলে হয়তো একটা পলিউশন হয়।

পলিউশন! কিসের পলিউশন?

সায়েন্সিস্টরা বলছেন, মানুষ যে মানুষের ওপর রেগে যায়, গালাগাল করে, অপমান করে—সেটাও পলিউশন। তাতেও ক্ষতি হয়।

এসব কোথায় শিখছিস?

হয় মা, সত্যিই। আমার মনে হয় বাবা সম্পূর্ণ রিভাইভ করা পর্যন্ত আমাদের চুপ করে থাকা উচিত।

অপর্ণা কি বুঝল কে জানে, হঠাৎ বলল, ঠিক আছে, চুপ করব। তোর দিদিকে ধরে এনে কিছু খাওয়া, তাহলে চুপ করব।

দ্যাটস এ গুড গার্ল! বলে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে গালে চকাম করে একটা চুমু খেয়ে অনু দিদির কাছে এল।

ঝুমকি একটু শক্ত হয়ে ছিল। অনু আর অপর্ণার কথা সে সব শুনেছে। সে সহজে ভাঙবে না।

অনু এসে ঝুমকির পাশে বসল। তারপর বলল, দিদি, ফর মাই সেক, টু সেভ মাই ফেস, একটু খা।

না। আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।

আমি ফ্রুট জুস করে দিচ্ছি, আর স্টোট। নিজে করব।

তোকে কিছু করতে হবে না। আমি তো ভেসে এসেছি, আমার জন্য কিছু করার দরকার নেই।

ভেসে আসবি কেন? এ বাড়ির সত্যিকারের গার্জিয়ান কে বল তো! বাবা যখন বাড়িতে থাকে না তখন মা নয়, আমি তোকে গার্জিয়ান বলে ভাবি।

আমি গার্জিয়ান হতে চাই না। তুই এখন যা, জ্বালাতন করিস না।

অনু গেল না, তবে উপরোধ অনুরোধও করল না। গা ঘেষে চুপ করে বসে রইল।

ঝুমকি মুখ ফিরিয়ে বোনের দিকে চেয়ে বলে, বসে আছিস যে বড়!

অনু ছলছলে চোখে দিদির দিকে চেয়ে বলে, তোর জন্য কষ্ট হচ্ছে।

আমার জন্য তোদের কষ্ট হবে কেন? আমাকে বোধ হয় এরা কোথাও কুড়িয়ে পেয়েছিল। নইলে আমার সঙ্গে সবসময়ে এরকম করত না।

কিন্তু সেটা তো খুব রোমান্টিক ব্যাপার, তাই না?

রোমান্টিক! কিসের রোমান্টিক ?

ধর আমি যদি চাইন্ডহুডে হারিয়ে যেতাম আর যদি কেউ—মানে কোনও কাপল্ আমাকে কুড়িয়ে পেত, তাহলে কিরকম থ্রিলিং হত বাপারটা! আমি জানতে পারছি না কে আমার মা-বাবা, আর তারাও আমাকে সার্চ করে বেড়াচ্ছে—উঃ, দারুণ ব্যাপার।

মোটাই দারুণ নয়।

আমার কাছে কিন্তু খুব থ্রিলিং লাগে। ইন ফ্যাক্ট, আমি মাঝে মাঝে চুপ করে বসে ভাবি যে, আমার আসল মা-বাবা এরা নয়, অন্য কেউ। আমাকে এরা কোনও ডেস্টিডিট হোম থেকে বা অন্য কোনও জায়গায় কুড়িয়ে পেয়েছে। আই অ্যাম অলরাইট হিয়ার, নো প্রবলেম। কিন্তু অন্য কোথাও আমার আসল মা-বাবা আমার কথা দিনরাত ভাবছে, আমাকে খুঁজছে, আমার জন্য কান্দছে। কী ইম্প্যাট্যান্ট ওদের কাছে এই লস্ট আমি! রিয়েল পেরেন্টরা তো একটু বোরিং। কিন্তু লস্ট পেরেন্টরা ভীষণ রোমান্টিক, তাই না ?

ঝুমকি চুপ করে রইল। তবে তার মুখে একটু স্মিত হাসি।

অনু মৃদু স্বরে বলে, একটা কথা জিজ্ঞেস করব তোকে ? ডক্ট প্লে বিগ সিস্টার, প্রীজ! তোর কোনও বয়ফ্রেন্ড হয়নি ?
ঝুমকির মুখ এ কথায় সামান্য কঠোর হয়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে চাপা গলায় বলল, আমার কেন ওসব হবে ? আমার তো কিছু নেই। না রূপ, না গুণ।

ডক্ট ন্যাগ দিদি। সবাই জানে তুই কেমন।

আমি কেমন ?

কোয়াইট অল রাইট। ইউ আর বিউটিফুল ইন ইওর ওন ওয়ে। কিন্তু তুই ভীষণ মেজাজী। আজকালকার ছেলেরা রাগী মেয়েদের ভয় পায়।

রাগী! কই আমি তো রাগী নই।

ভীষণ রাগী। তার মানে ইউ হ্যাভ এ পারসোনালিটি। ওটা সকলের থাকে না। রেয়ার। পারসোনালিটি মিনস্ ট্রং লাইকস্ অ্যান্ড ডিজলাইকস্। আজকালকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে, আমার মধ্যে বা দাদার মধ্যে পারসোনালিটি কিঙ্ক নেই। খুব কথা শিখেছিস।

আমি যখন বড় হবো, ঠিক তোর মতো হবো। একটু স্নব, একটু অহংকারী, একটু দেমাক আর মেজাজ হবে। কেউ চট করে কাছে ঘেঁষতে পারবে না। তবে তখন একটা প্রবলেম হবে।

কি প্রবলেম ?

যারা স্ট্রং পারসোনালিটির হয় তারা কিন্তু একটু লোনলি। চট করে কারও সঙ্গে মিশতে পারে না তো। তাই দে আর ন্যারালি লোনলি সোলস্।

খুব পেকেছিস তো।

আমি এসব নিয়ে খুব ভাবি। পিপল অ্যান্ড দেয়ার ক্যারেকটারিস্টিকস।

তোর কোনও ছেলে-ছোকরার সঙ্গে ভাব নেই তো!

অনু এ প্রশ্ন শুনে খিলখিল করে হাসল, সেই তো দিদিগিরি শুরু হল। বিগ সিস্টার, আমি তো কোএড-এ পড়ি। দেয়ার আর বয়েজ অ্যান্ড বয়েজ। কিন্তু ফ্রেন্ড একটাও নয়।

কেন ?

আমার কনটেন্পোরারি ছেলেগুলোর ডেপথ্ ভীষণ কম। মগজ নেই। মনে হয় অল আর কম্পিউটারস।

ঝুমকি কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করে বলে, তাহলে তোর কী হবে রে ?

কেন, আমার তো একটু এজেড, একটু এরুডাইট, একটু ফিলজফিক পুরুষকে বেশী ভাল লাগে। মানে মেন উইথ পারসোনালিটি। তোর ?

ঝুমকি বিষণ্ণ মুখে মাথা নেড়ে বলে, আমার যে কী ভাল লাগে, আমি বুঝতেই পারি না। তবে মাঝে মাঝে মনে হয়, অন্য একটা ফ্যামিলিতে গিয়ে—মানে বিয়ের পর—একটু অন্যরকম লাগতে পারে।

অনু চোখ বড় বড় করে বলে, তুই এখনই বিয়ের কথা ভাবছিস ? সত্যি!

আহা, ভাবতে দোষ কি ? ভাবা তো কিছু খারাপ নয়। ভাবা আর করা কি এক ?

এনিওয়ে, আমি তো ভাবতেই পারি না।

আমার মতো বয়স হোক, তারপর ভাববি।

অনু ফের হাসে, সেই দিদিগিরি। তুই আমার চেয়ে কতই বা বড়! ইউ আর স্টিল ভেরি টেন্ডার এজেড।

তোর মাথা! মা এখন আমাকে বিয়ে দিয়ে বিদেশ করতে পারলে বাঁচে। আমি শুনেছি, মা প্রায়ই বাবাকে আড়ালে আবড়ালে বলে, ঝুমকির কিন্তু বয়স হল, পাড় দেখতে থাকো।

হি হি। মা একটু পাগলি আছে, না রে ?

একটু সেকেলে।

তুইও একটু সেকেলে। আচ্ছা, মা যখন ওকথা বলে, তখন বাবা কী জবাব দেয় ?

বাবা উড়িয়ে দেয়। বলে দূর দূর। এখনই বিয়ের কি!

বাবারা ওরকমই হয়। আচ্ছা দিদি, তোর কি খিদে পায় না ? সত্যিই পায় না ?

আবার ও কথা! পারলে আমি এ বাড়ির খাওয়া ছেড়েই দিতাম।

আহা, রাগের কথা বলছি না। কিন্তু এমনিতেই দেখি, তোর মিল খুব ফুগ্যাল। একটুখানি করে খাস। চড়াই পাখির মতো। কিন্তু আমি আর দাদা খুব খাই।

আমার ষ্টমাকটা বোধ হয় ছোটো। খেতে আমার ভাল লাগে না।
কিন্তু তুই খুব ফুচকা খাস, আর তেলেভাজা। তাই না ?
ঝুমকি হাসল, খাই। আর অম্বল হয় ভীষণ। তবু খাই।
আমি ফুচকাটা স্ট্যান্ড করতে পারি না। তেলেভাজাও না। ভীষণ আনহাইজিনিক। হাইজিন ডেবে খেলে শুধু শুকতো
আর খোল খেতে হয়। মা গো!

তুই পাতে ভাত ফেলিস, আমি ফেলি না।
আমিও ফেলতে চাই না। কিন্তু মা যে জোর করে বেশী ভাত দেয়।
মা পাগলি আছে। আমার কাছে একটা চকোলেট বার আছে, খাবি ?
না।

রাগ করছিস কেন বাবা! আমার সঙ্গে তো ঝগড়া নয়।
রান্নাঘরে উৎকর্ষ হয়ে আছে অপর্ণা। দুই বোনে গুনগুন করে কথা হচ্ছে ঘরে। কি কথা হচ্ছে ওদের ? ঝুমকি কেন
এখনও কিছু খাচ্ছে না ? খাওয়া নিয়ে বরাবর ঝুমকির নাক সিটকানো। কোনওদিন কোনও খাবার খেয়ে বলে না, উঃ,
দারুণ হয়েছে তো! কোনওদিন বলে না, মা ওমুক জিনিসটা রাঁধবে ? খাওয়াটাই যেন ওর কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে
অপছন্দের কাজ। সেই জন্যই রোগা, সেই জন্যই ওর শরীরে হাজারো রোগ। আর সেইজন্যই ওর অপর অপর্ণার এই
রাগ। সেই শিশুকাল থেকে ওকে খাওয়াতে হিমসিম খেয়েছে সে, গলদঘর্ম হয়েছে, মেরেছে, বকেছে, কৈদেছে। আজ
অবধি স্বভাব পাষ্টাল না। একটা জিনিস চেয়ে খায়, সেটা চা। কিন্তু চা তো কোনও খাদ্য নয়। বরং অনিষ্টকারী। বিশেষ
করে খালি পেটে।

অপর্ণার চোখ কড়াইয়ের দিকে। মাংস ফুটছে। কিন্তু তেমন ভাল গন্ধ বেরোচ্ছে না। কী একটা জিনিস দিতে ভুল
হয়েছে। কিন্তু মনে করতে পারছে না সে। মেজাজ বিগড়ে আছে, মাথা কাজ করছে না। আরও পনেরো মিনিট দেখবে
অপর্ণা। তার মধ্যে ও যদি না খায় তাহলে—

এই ‘তাহলে’-টা নিয়েই হল মুশকিল। তাহলে কী করবে অপর্ণা ? ওকে ধরে মারবে, না আরও বকবে ? কিন্তু লাভ
হবে তাতে ? আরও শক্ত, আরও গৌজ, আরও গুটি পাকিয়ে যাবে। না হলে ঝগড়া করবে। অথচ ঝুমকিকে নিয়ে তার
চিন্তার অর্ধেক ব্যাপ্ত থাকে সবসময়ে। এই মেয়েটাকে কিছুতেই বুঝতে পারে না সে। একদম খোলামেলা নয়, অপর্ণার
সঙ্গে বসে কখনও গল্প করে না। থাকে একটেরে। আলগোছ। কথা যেটুকু বলে তা বাবার সঙ্গে।

মণীশের প্রাণাধিক তিনজনই। ঝুমকি, বুঝকা, অনু। তবু বুঝি ঝুমকিরই কিছু বেশী বশীভূত সে। রোগা, দুর্বল,
আলাপ্যাজিক এই মেয়েটিকে শাসন-টাসন করা একদম পছন্দ করে না মণীশ। বলে, ওকে ওর মতো থাকতে দাও। কোনও
ব্যাপারে জোর জবরদস্তি কোরো না।

মণীশের বুদ্ধি পাকা নয় বলেই বলে। জবরদস্তি না করলে কি বাঁচিয়ে রাখা যেত ওকে এতদিন! উপোস করেই তো
মরে যেত!

ডাক্তাররা বলে, খেতে না চাইলে খেতে দেবেন না। একদিন দু’দিন তিনদিন যদি খাওয়া নিয়ে প্রেশার না দেন তাহলে
আপনা থেকেই খাবে।

ওসব ডাক্তারি বিদ্যোতে বিশ্বাস নেই অপর্ণার। মেয়ে তো আর ডাক্তারের নয়, তার। সে জানে, মেয়ে না খেয়ে
থাকলে মায়ের ভিতরটা কেমন হয়।

পনেরো মিনিট পার করে অপর্ণা প্রস্তুত হল। আর একবার বকুনি দেওয়া দরকার। বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। মাংসটা
চাপা দিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল অপর্ণা। মাথাটা গরম।

ঝুমকির ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল সে। চোয়াল ও ঠোঁট কঠিন।
অনু তাকে দেখে এক গাল হেসে হাত বাড়িয়ে বলল, কম অন মম, জয়েন দা ক্রাউড।

আমি জানতে চাই, এসব আর কতক্ষণ চলবে।

মাংস হলেই দিদি ভাত খাবে।

অপর্ণাকে দেখেই ঝুমকি জানালার বাইরে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। অপর্ণা বলল, কথাটা আমি ওর মুখে শুনতে চাই।

অনু একটা ঠেলা দিয়ে বলে, দিদি, বল না।

বলব না।

অনু করুণ চোখে মায়ের দিকে চেয়ে বলে, মা, ইটস নাউ এ প্রেস্টিজ ইস্যু। দিদি এখন কমিট করলে ওর ইগো একটু
উভেড হবে। তোমার রান্না কি রেডি ?

হয়ে এসেছে।

তাহলে যাও না, আমি দিদির দিকে ঠিক নিয়ে যাব।

অপর্ণা সামান্য শান্ত হল। বলল, যতক্ষণ রেডি না হচ্ছে ততক্ষণ এক কাপ দুধ খেয়ে নিতে বল।

অনু চোখ বড় বড় করে বলে, দুধ! মাই গড, দুধ আবার কবে দিদি খায়। মা, ইউ আর গোয়িং টু ফার। মাংসটা
হোক, দিদি খাবে।

আমি কোনওকালে শুনিনি যে, বাচ্চারা দুধ খায় না। সব বাড়িতেই একটা নিয়ম আছে। মা যা দেয়, ছেলেমেয়েরা
তাই খায়। শুধু এ বাড়িতেই উল্টো।

অনু হাসছিল। বলল, আমার বন্ধুদের মধ্যে কেউ দুধ-টাধ খায় না মা। সব বাড়িতেই এ নিয়ে খুব ফাইট হয়।

খুব জ্ঞান হয়েছে দেখছি।

তবে অপর্ণা আর কথা বাড়াল না। যদি খায় তবেই বাপের ভাগ্যি। সংসারটা আজও অপর্ণা বুঝতে পারে না, ঠিক
কেমন। ভাল না মন্দ ? প্রয়োজন, নাকি না হলেও চলে ? মণীশের সঙ্গে যখন তার ভালবাসা হল তখন মণীশ প্রায়ই বলত,
তাদের এক ডজন ছেলেপুলে হবে। দি মোর দি মেরিয়ার।

অপর্ণা বলত, তাহলে তোমাকে পুলিশে দেবো।

কোন অপরাধে ? ছেলেপুলে হওয়া তো বে-আইনি নয়।

না হলেই কি ? পুলিশের কাছে বলব, এ লোকটা অত্যাচারী। জোর করে—

আরো না ভাই, গুসব ঠাট্টার কথা। তোমাকে তা বলে কষ্ট দেবো নাকি ? কিন্তু আগেকার দিনে তো হত।

তখন ফ্যামিলি প্র্যানিং ছিল না। বেশী ছেলেপুলে হলে কি হয় তা তো জানো। একটি সন্তানই যথেষ্ট। ভালভাবে মানুষ করা যাবে।

শেষ অবধি তিনটে হল। তাতে অপর্ণার বিশেষ আপত্তি হয়নি। কিন্তু এখন ভাবে, এ তিনজন তাদের দুজনকে তিনরকম দুশ্চিন্তায় রাখছে। একটা তো হল, ঠিকমতো বড় হবে কিনা! অসুখ-বিসুখ অ্যাকসিডেন্ট হবে না তো! মানুষ হবে তো! ড্রাগ-ফাগ ধরবে না তো! চরিত্র ঠিক রাখতে পারবে তো! হাজার রকমের প্রশ্ন আর প্রশ্ন।

এটা কি প্রেমের খজনা ? ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটু অচেনা মাত্রাও যোগ হচ্ছে ক্রমে ক্রমে। যত বড় হচ্ছে তত কি নাগালের বাইরে যাচ্ছে ? এই অচেনা ভাবটা সহ্য করতে পারে না সে।

ডোর বেল বাজল। দরজা খুলল অনু। বুবকা দরজার কাছ থেকে চোঁচাল, মা! গুড নিউজ! অপর্ণার বুক কেঁপে ওঠে। গুড নিউজ শুনেও ওঠে।

কি হল আবার ?

দু ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে বাবার সঙ্গে এক মিনিট কথা বলতে পেরেছি।

কথা বলল! অপর্ণার অন্ধকার অভ্যন্তর যেন আলোয় ভরে গেল হঠাৎ। এ কয়দিন শুধু যুগ্মত মণীশকে দেখে এসেছে তারা। এখনও কথা হয়নি। মণীশের কণ্ঠস্বর প্রায় ভুলেই গেছে অপর্ণা।

কী বলল ?

বুবকা মাকে দুহাতে ধরে বলল, তুমি কাদবে নাকি ? চোখ তো টলমল করছে। বাবার কাছে যেতেই দিচ্ছিল না। অনেক ধরে করে যখন গেলাম তখন সেডেটিভের অ্যাকশন বেশী ছিল না। খুব টেনশন ছিল মুখে। আমি যেতেই বলল, তোরা কেমন আছিস ? কি করে চলছে ?

গলার স্বর কেমন গুলিল ? নরমাল ?

নরমাল। তবে একটু হাক্কি। আমি বললাম, আমরা খুব ভাল আছি। কোনও গুণগোল নেই।

একটু হাসল কি ?

একটুখানি। আর কিছু বলার আগেই নার্স বের করে দিল। আর একটা গুড নিউজ হল, বাবা সকালে সু্যাপ খেয়েছে। নিজেই। নো হেল্প্। আজকেই হয়তো কেবিনে ট্রান্সফার করতে পারে।

অপর্ণার দুচোখ বেয়ে উপটপ করে জল পড়ে ভেসে যাচ্ছে বুক। মণীশ ফিরবে। মণীশ ফিরছে। পৃথিবীতে এর চেয়ে বেশী অপর্ণা আর কী চাইতে পারে ?

দুটো পেলব হাত পিছন থেকে তাকে ধরল, মা!

অপর্ণা চোখের জলের ভিতরে দিয়ে ঝুমকির অস্পষ্ট মুখটা দেখতে পেল! মান অভিমান রাগ ভেসে গেল কোথায়। দুহাতে ঝুমকিকে আঁকড়ে ধরে তার বুকেই মাথা গুঁজে দিল সে। যেন সে বাচ্চা মেয়ে, মায়ের বুকে আশ্রয় খুঁজছে।

॥ ১৫ ॥

এক সপ্তাহের পর পর দু'দুটো প্রেমে পড়ে গেল হেমাঙ্গ। একেই বলে ইন কুইক সাকসেশন। কুইক সাকসেশন কথাটার সঠিক বাংলা কী হবে ? উপর্যুপরি ? হ্যাঁ তাই। উপর্যুপরি দু'দুটো লাভ অ্যাফেয়ার। এবং কন্যাহরণের মতোই, অবৈধ প্রেমিকার মতোই খুব গোপনে গাড়ি করে বাড়ি নিয়ে এল সে। কিন্তু ঘরে তুলল না ফটিকের ভয়ে। একটু গাঢ় রাস্তিরে দু'দিনই সে তার দুটি প্রেমিকাকে গাড়ি থেকে কোলে করে বয়ে আনল ঘরে। একটি সৌরচুল্লি এবং অন্যটি ইলেকট্রনিক ওয়াটার ফিল্টার। চুবি করে নয়, লোক ঠিকিয়ে নয়, নগদ দামে কেনা। তবু এইসব জিনিস ঘরে আনার সময় এবং পরে কয়েকটি দিন কেন যে এক অভুত পাপবোধ কষ্ট পায় সে তা কে জানে!

ফটিকের চোখকে অবশ্য ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করা পণ্ড্রম। কারণ ফটিক সকালে ঘর ঝাঁটপাট দিতে আসে। ঘরের জিনিসপত্র তার সবাই দেখা এবং গোনা। নতুন কিছু দেখলেই সে ঝাঁটা ফেলে খেল দেখতে বসে যায়, ই কি নতুন কিনলেন দাদাবাবু ? তা দ্রব্যটা কি ? একটু চালিয়ে ভালকি দেখিয়ে দিন তো।

ফটিক ছাড়া আর দেখাবেটাই বা কে ? সুতরাং সৌরচুল্লি আর ওয়াটার ফিল্টার চালু করে দেখাল হেমাঙ্গ।

ফটিক মুগ্ধ। বাকাহারা। অনেকক্ষণ বাদে বলল, এ বাড়ির বউদিমণির খুব সুবিধে হয়ে যাচ্ছে। কাজকর্ম আর বাকি থাকছে না কিছু। সব কলকজাই সরে দেবে। পাউডার লিপস্টিক মেখে হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন শুধু।

বউদিমণিটা আবার কে রে ?

আপনার যিনি বউ হবেন তার কুথাই বলছি।

কেউ হবেন না। কস্মিনকালেও না।

ফটিক খুব রহস্যের হাসি হাসে। ভাবখানা যেন, ঠাট্টা ইয়ার্কি হচ্ছে! তারপর জিজ্ঞেস করে, তা কত দাম পড়ল দাদাবাবু ?

হেমাঙ্গ মাথাটাচা চুলকোয়। সঠিক দাম থেকে অর্ধেক কমিয়ে বলে। তাতেও ফটিকের চোখ রসগোল্লার মতো হয়ে যায় বিস্ময়ে, অবিস্বাসে। বলে, দেশের বাড়িতে এ টাকায় যে একখানা ঘর উঠে যায়!

হেমাঙ্গ সেটা জানে। আর জানে বলেই আর একদফা পাপবোধ এসে ভালুকের মতো চেপে ধরে তাকে।

এই পাপবোধ থেকে বেরোনোর একটা বন্ধু খুঁজছিল অনেকদিন ধরে। সুযোগটা পেল রবিবার। পিটুর জন্মদিন।

চারুশীলা যখনই যা করে তা বেহেড বাড়াবাড়ি রকমের। বরের টাকা আছে, যথেষ্টর চেয়েও বেশী আছে। ঠিক কথা। কিন্তু টাকা যে এরকম পাগলের মতো ওড়ানো যায়, তা না দেখলে বিশ্বাস হত না। পুঁচকে একটা সাত বছরের ছেলের জন্মদিন মাত্র, বিয়ে-শাদিও নয়। তবু সারা বাড়িতে আলোকসজ্জা, স্তিরিওতে সানাই। নামী ক্যাটারার ডাকা হয়েছে। ছোটো করে ককটেল পার্টি দেওয়া হচ্ছে। হলঘরে বেলুন, রঙিন কাগজের শিকলি, ফুল আর মালা, নানা বর্ণের আলোয় ছয়লাপ। একটা স্কুদে স্টেজের ওপর চলছে কুইজ কন্টেস্ট, অস্ত্রাক্ষরী, ম্যাজিক শো, গান, আবৃত্তি ইত্যাদি। অন্তত পঞ্চাশ জন বান্ধা আর শ' দেড়কে মেয়ে-পুরুষ এসেছে নেমন্তল্লে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারল, ক্যাটারার একশ দশ টাকা করে প্লেট নিচ্ছে।

উত্তেজিত হোমস চারুশীলাকে খুঁজ বোড়াচ্ছিল। ধরা মুশকিল। সবচেয়ে মুশকিল মেয়েদের দঙ্গলে ঢুকে ওকে টেনে আনা। মহিলাদের সমাবেশের ধারে কাছে কখনও যায় না হোমস। সুতরাং সে তক্কে তক্কে রইল। এটা ফুটফুটে অচেনা যুবতী মেয়ে তার হাতে একটা ঠাণ্ডা নরম পানীয় ধরিয়ে দিয়ে গেছে কখন। হোমস সেটাতে একবারের বেশী চুমুক দিতে পারেনি অন্যমনস্কতায়।

চারুশীলার বাড়িটা বিশাল। আর্কিটেক্ট স্বামী মনের সুখে বানিয়েছে। অজস্র খাঁজ-খোঁজ, গুপ্ত জায়গা, আচমকা দু খাপ সিঁড়ি বা একটা ডিপ্রেশন। এ সব কেন কে জানে! তবে ডাইনিং হলের মাঝখানে দিয়ে একটা নারকোল গাছের কাণ্ড সিলিং ভেদ করে ওপরে উঠে গেছে। প্ল্যানে বাড়ির মধ্যেই পড়েছিল গাছটা। সুবৃত্ত—অর্থাৎ চারুশীলার বর সেটা কাটেনি। চাদে উঠলে একদম হাতের নাগালে নারকেল ফলে থাকে। হাত দিয়েই পাড়া যায়।

নানা জায়গায় চেয়ার পাতা। বসবার জন্য একটা আড়াল খুঁজছিল হোমস। হলঘরটায় বড্ড হল্লা। পাশের ঘরে ককটেল সেখানেও শান্তি নেই। আর প্রায় সর্বত্রই মেয়েদের জটলা। হোমস হলঘরের লাগোয়া বারান্দাটা ফাঁকা পেয়ে গেল। একটু অস্বস্তিকার মন্ত বারান্দায় সার দিয়ে মোস্তেড চেয়ার পাতা।

বসতে গিয়ে একটু চমকাল হোমস। না, ফাঁক নয়। একদম কোণের দিকে দুজন মানুষ খুব কাছাকাছি বসা। নিচু গলায় গুনগুন করে কথা কইছে।

হোমস সামান্য অস্বস্তি বোধ করল। কেউ প্রেমট্রেন করছে নাকি? তাহলে মর্ত্তমান রসভঙ্গের মতো তার এখানে থাকার দরকার কী? উঠতেই যাচ্ছিল, হঠাৎ মনে হল, এজন বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে একজন কিশোরী মাত্র। প্রেম কি? নাও হতে পারে।

হঠাৎ কিশোরীটিই আধো অস্বস্তিকার থেকে হোমসকে চমকে দিয়ে ইংরিজিতে বলে উঠল, উই আর টকিং অ্যাবাউট পলিউশনস।

কথাটা বুঝল না হোমস। তবু বলল, দ্যাটস ফাইন, ক্যারি অন।

কিন্তু জুটিটা ভেঙে গেল। বোধ হয় হোমসের জন্যই ডাঙল। মেয়েটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে পুরুষটিকে বলল, অলরাইট, সি ইউ এগেন।

তারপর দৌড়পায়ে চলে গেল হলঘরে।

মেয়েটাকে চিনল না, কিন্তু দু তিনবার তাকাতেই পুরুষটিকে চিনতে পারল হোমস। তার মতোই ভীক-ভীক, গ্যাঞ্জাম-ভীক, দার্শনিক টাইপের লোকটি কৃষ্ণজীবন, রিয়ার স্বামী। একটি বিশেষ ক্ষেত্রে এ লোকটি বিশেষ রকমের বিখ্যাত। স্বয়ং সরকার ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা এর পরামর্শ নেয়।

আরে, কী খবর? বলে চেয়ার বদল করে লোকটার একটু কাছাকাছি বসল হোমস।

লোকটা কম কথা বলে, মোটেই ভাল আড্ডাবাজ নয়, গের্মো টাইপের এবং মুখচোরা। কিন্তু কৃষ্ণজীবন ওই কিশোরীটির সঙ্গে কী নিয়ে কথা বলছিল এতক্ষণ? পলিউশন, গ্লোব ওয়ার্মিং, ওজোন হোল, ডিফরেন্সেশন, সমুদ্রের জলস্তরে স্ফীতি? কিশোরী বয়স কি অত জ্ঞান ধারণ করার বয়স? বিশেষ করে যখন লাগোয়া হলঘরে চলছে ম্যাজিক শো, অস্ত্রাক্ষরী, কুইজ কন্টেস্ট এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত!

হোমস আলাপ জমানোর জন্য ততটা নয়, একটা চাপা উদ্বেগ নিরসনের জন্যই হঠাৎ প্রশ্ন করল, হ্যাঁ ভাল কথা, আপনাদের সেই প্রাইভেট টিউটর চয়ন কেমন আছে বলুন তো!

কৃষ্ণজীবন যেন কিছুক্ষণ আকাশ হাতড়ে বেড়াল। তারপর বলল, চয়ন! সে কে?

আপনার মেয়ে মোহিনীকে প্রাইভেট পড়ায় যে ছেলেটি! একটু এপিলেপটিক!

ওঃ, চয়ন! বলে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে কৃষ্ণজীবন অসহায় ভাবে মাথা নেড়ে বলে, জানি না তো! তার সঙ্গে আমার তো দেখাই হয় না। কী হয়েছে তার?

হোমস হেসে বলল, তাহলে না জানাই ভাল। তবে আমার বন্ধু কনাদ চৌধুরী তার চিকিৎসা করছিল।

হবে। আমাকে কেউ কিছু বলে না।

আর আপনার স্ত্রীর মাইগ্রেন?

কৃষ্ণজীবন ফের অসহায়ভাবে মাথা নাড়ল, জানি না। তবে ভালই আছে বোধ হয়। ওই তো আছে ভিতরে, জিক্সেস করুন না!

দরকার নেই। পরে জেনে নেবো। আপনি বোধ হয় ডোমেন্টিক ফ্রন্টের কোনও খবরই রাখেন না।

সংকুচিত হয়ে কৃষ্ণজীবন বলে রিয়া, আমাকে কিছু বলে না যে।

দেন ইউ আর এ হ্যাপী ম্যান। গুনতে পাই বউদের ঘ্যানঘ্যানানিতে নাকি স্বামীরা জেরবার হয়ে যায়।

কৃষ্ণজীবন একটু হাসল। লোকটা হ্যান্ডসাম, হাসলে খুবই ভাল দেখায়। মেদহীন, কক্ষ, ছিপছিপে চেহারা বয়সের কোনও ছাপই পড়েনি। রিয়ার পাশে একে হয়তো বয়সে কিছু কমই মনে হবে।

হোমস একটু হিংসের গলায় বলে, আপনি কিন্তু বেশ ফিট, তাই না?

কৃষ্ণজীবন এই কমপ্রিমেন্টও নিতে পারল না। অস্বস্তি বোধকরে বলল, আমি কষ্টে মানুষ।

হোমস হেসে ফেলল, কী কথা! কী জবাব! এ লোকের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার চেষ্টা বৃথা। প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার জন্যই সে বলল, একটু ককটেল চলবে? ব্যবস্থা আছে কিন্তু!

কৃষ্ণজীবন এ কথায় শঙ্কিত হয়ে বলল, না না, ওসব নয়। আমি খাই না।

হোমস্ একটা শ্বাস ছেড়ে উদাস গলায় বলে, এইরকম ম্যাসিড স্কেলে জন্মদিন করার কোনও মানে হয়, বলুন! ক্যাটারার ককটেল, ডেকোরেশন! এটা কি অপব্যয় নয়?

একথাটা কৃষ্ণজীবনের যেন পছন্দ হল। সে সঙ্গে সঙ্গে বলল, হ্যাঁ, খুবই অপব্যয়। ভীষণ অপব্যয়। আমার বা আমার ভাইবোনের কখনও জন্মদিন-টিন হত না। জন্মের তারিখও জানা ছিল না। স্কুলের খাতায় আন্দাজে জন্মের তারিখ লেখানো হয়েছিল, মনে আছে।

আচ্ছা, আপনার বাড়ি ত্রেনেছি উত্তর চব্বিশ পরগনায়। কোন গ্রাম বলুন তো! আমার ওদিকে একটু যাতায়াত আছে। বিষ্ণুপুর। শীতলাতলা বিষ্ণুপুর। স্টেশন থেকে দু মাইল দূর। আগে হেঁটে যাতায়াত করতে হত। আজকাল বাসরাস্তা হয়েছে। ছোট গ্রাম।

নামটা চেনা। ওদিকে গেলে খোঁজ নেবো।

নেবেন। একটেরে জায়গা।

কিছু মনে করবেন না, আপনি তো প্রায় একটা ইন্টারন্যাশনাল ফিগার, তবু এখনও বেশ সহজ সরল আছেন। গাঁয়ের লোক বলেই কি?

কৃষ্ণজীবনের একথাটাও পছন্দ হল। আবার একবার হাসল। তারপর মৃদু স্বগতোক্তির মতো বলল, সহজ সরল আর থাকতে দিচ্ছে কি? বুদ্ধিমান মানুষেরা, বিদ্বান মানুষেরা গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসে। ফলে গ্রাম বড় ফাঁকা আর অন্ধকার হয়ে যায়। আজোজোজ লোকেরা সেখানে রাজত্ব করে। ভুল শিক্ষা, ভুল রাজনীতি, ভুল ধর্ম, ভুল নৈতিকতা নষ্ট করে দিচ্ছে আমাদের গ্রামগুলোকে। গাঁয়ে গেলে লক্ষ করবেন, সব সেকেন্ড শ্রেড থার্ড শ্রেড লোক সেখানে ছড়ি ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে।

এত কথা কৃষ্ণজীবনের মুখে একসঙ্গে শুনে হোমস্ অবাক হল। ওই কিশোরী মেয়েটিও কি এ সবই শুনছিল? পলিউশনের কথা বলছিল না!

হোমস্ বলল, জানি। গ্রামে এখন খুব পলিটিকস। আপনি বোধ হয় বিষ্ণুপুর ছেড়ে এসে খুব হ্যাপী নন!

একটুও না। কিন্তু হায়ার এডুকেশন, বোটর জব অপরচুনিটি, হায়ার স্ট্যাটাস টেনে আনে মানুষকে। মুশকিল কী জানেন? একবার চলে এলে আর কখনও ফিরে গিয়ে নিজের গ্রামে নিজেকে ট্র্যান্সপ্ল্যান্ট করতে পারবেন না। গাঁয়ের লোকই থাকতে দেবে না আপনাকে। তবু আমি চেষ্টা করব।

হোমস্ অবাক হলে বলে, কী চেষ্টা করবেন?

ফিরে যেতে। আমি যদি যাই, তাহলে একদম চাষী হয়ে যাবো। নিজের হাতে লাঙ্গল চালাবো, ঘর ছাইব, মিশে যাবো।

হোমস্ হাসল, পারবেন না। আপনিই সবচেয়ে ভাল জানেন যে, আপনি পারবেন না। আমি মাঝে মাঝে গ্রামে যাই বলেই জানি, আপনার অ্যাসেসমেন্ট হান্ড্রেড পারসেন্ট কারেক্ট।

কৃষ্ণজীবন কি একটু বিষণ্ণ হল? কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিষাদ মাখানো গলায় বলল, কিন্তু গ্রামে না ফিরলেও, আমাদের সবাইকেই একদিন গ্রাম্য জীবনে ফিরে যেতেই হবে। এই সব বড় বড় শহর তৈরি করাই ছিল মানুষের মন্ত ভুল। এক জায়গায় এত মানুষকে জড়ো করলে বাতাস বিধিয়ে যায়, জমে ওঠে গাদ, দূষণ। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন আর বাস্তবদর্শী হয়ে যায় মানুষ। ভবিষ্যতে একদিন মানুষ নিজেদের ভুল শুধরে নিতে শহর ভাঙবেই। ভাসবে কলকারখানা, কমিয়ে দেবে রাসায়নিকের ব্যবহার, বহু ভোগ্যপণ্যকে বাতিল করে দেবে।

আপনি জনসংখ্যার দিকটাও তো ভাববেন!

কৃষ্ণজীবন একটু হাসল ফের। উদাস গলায় বলল, আগামী কয়েক দশকে প্রকৃতির নিয়মেই লাখো লাখো মানুষ মরবে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, রোগ ভোগ, যুদ্ধ বা খুন—এ সবই হল জনসংখ্যার সিলিং। একমাত্র এইভাবেই কত মানুষ মরবে তা কি জানেন?

খবরের কাগজে পড়েছি বটে। নাথারটা আলার্মিং।

আবহবলগুলে ওজোন হোল সৃষ্টি হওয়ায় ক্যানসার মহামারীতে দাঁড়িয়ে যাবে। ন্যাচারাল রিসোর্স আর জনসংখ্যার মধ্যে রেশিও রক্ষা করতে পার্জিং হবেই। আমি চোখ বুজলে দেখতে পাই পৃথিবী জুড়ে মৃতদেহের গাদি লেগে আছে। সংকারের লোক নেই।

হোমস্ বারান্দার ঝুঁকো অন্ধকারে লোকটার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়েছিল। সে যতদূর জানে, লোকটা পাগল নয়, বায়ুপ্রস্ত নয়। লোকটা একজন বিশেষজ্ঞ। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরিসংখ্যানের জোরে কথা বলছে। তবু সে স্বগতোক্তির মতো বলল, অতটা কি হবে! বিজ্ঞানীরা যখন উঠে পড়ে লেগেছে তখন একটা কিছু সমাধান তো হবেই। তাই না?

বিজ্ঞানীরা মুষ্টিমেয়। পৃথিবীর যে সংকট আসছে সে সম্পর্কে অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষেরই ধারণা ভাসা ভাসা। আর অশিক্ষিতরা তো সম্পূর্ণ নির্ভরকার। কয়েকদিন আগেই একজন সেন্ট্রাল মিনিষ্টার আমাকে ডেকে বলেছেন, আমি যে কলকারখানা কমাতে বলছি তাতে নাকি উৎপাদন ও উন্নয়ন মার খাবে। তাকে আমি বোঝাতে পারিনি, আগে অস্তিত্বকে রক্ষা করা দরকার, নইলে উন্নয়ন আর উৎপাদন কার কাজে লাগবে? আমি পৃথিবীর লোককে বোঝানোর চেষ্টা করছি, সবগুলো রাষ্ট্রের উচিত অন্যসব ইস্যুকে উপেক্ষা করে পৃথিবীর পরিবেশ ও আবহমণ্ডলকে রক্ষা করার জন্য সব রিসোর্সেস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। কিন্তু কে শুনছে বলুন! রাজনীতিকরা তাদের কুটকলচিতে বন্দী হয়ে আছেন, আমলারা ব্যস্ত প্রশাসনিক কাজে। সাধারণ মানুষ অনুব্রতের বাইরে কিছুই ভাবতে চায় না। এই পৃথিবীর জন্য, মাটির জন্য, গাছের জন্য, প্রকৃতির জন্য তাদের হেনে কিছুই করার নেই। সবচেয়ে ভয়াবহ হচ্ছে এই উদাসীনতা। নেগলিজেন্স। আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে আমি কী করতাম জানেন! কেউ গাছ কাটলে তার ফাঁসির ব্যবস্থা করতাম। সন্তান সংখ্যা যার বেশী হবে তাকে জেল-এ পাঠানোর ব্যবস্থা করতাম। জল বা বায়ু দূষিত হয় এমন কলকারখানার মালিকদের দেউলিয়া করে ছেড়ে দিতাম।

পার্থিব—৯

হোমস্‌ সামান্য সপ্রশংস গলায় বলে, আপনাকে দেখে বোঝা যায় না বটে, কিন্তু ইউ আর এ টাফ ম্যান।
কৃষ্ণজীবন একটুও হাসল না। মাথা নেড়ে বলল, না। আমি বড় অসহায় আর দুর্বল। আমি কিছু করতে পারছি না। এ
বিতন ওস্ত ম্যান।

ওস্ত কোথায়! আপনি তো দারুণ ইয়ং লুকিং।

বাইরেটা। ভিতরে ভিতরে আমি বুড়িয়ে যাচ্ছি দুশ্চিন্তায়, টেনশনে।

অবস্থাটা কি ততটাই খারাপ?

আপনি যতদূর ভাবতে পারছেন তার চেয়েও বোধ হয় বেশী। আমাদের আর একদম সময় নেই।

তাহলে বৈজ্ঞানিকরা এতদিন কী করল মশাই?

তাদের দিয়ে যা করানো হয়েছে তারা তাই করেছে। তারাও রাজনীতি আর প্রশাসনের শিকার। তাদের মস্তিষ্ক আছে,
চরিত্র নেই। তাই তারা নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট, মারগান্ড্র, দূষিত কেমিক্যালস তৈরি করে যাচ্ছে। তাদের লাগানো হচ্ছে
কসমেটিক জিনিসপত্র তৈরির কাজে। লাগানো হচ্ছে লোককে চমকে দেওয়ার জন্য নানা ম্যাজিক আইটেম বানানোর
কাজে। লোককে বোঝানো হচ্ছে, এটা বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানীরা ঈশ্বরের বিকল্প। বিজ্ঞান দুনিয়ার সব রহস্য ভেদ করতে
চলেছে। কিন্তু যারা বিজ্ঞান জানে তারা এ কথা শুনে লজ্জায় জিব কাটে। বিজ্ঞান কোথায় পড়ে আছে তা কি জানেন?
লোকের আকাশে রকেট পাঠানো দেখে, স্যাটেলাইটে টিভি দেখে ভাবছে, বিজ্ঞান বুঝি কেব্দা মেরে দিল। কিন্তু আসলে কি
তাই! বিজ্ঞানের ঘরে পচা ইঁদুরও কি নেই? মহাকাশের কথা বাদ দিয়ে শুধু এই সোবার সিস্টেমের কথাই ধরুন। এরই
এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যেতে কত সময় লাগছে বলুন তো একটা রকেট বা প্রজেক্টাইলার? কত ফ্যুয়েল খরচ
হচ্ছে! কত কোটি ডলার ব্যয় হচ্ছে! দুনিয়ার মানুষকে উপাশ, অশিক্ষা আর রোগেভোগে রেখে এই গবেষণা কী দিচ্ছে
আমাদের? প্রায় কিছুই নয়। আমাদের নিকটতম নক্ষত্রটি পৃথিবী থেকে চার লাইট ইয়ার দূরে। যদি মানুষ কখনও আলোর
গতি অর্জন করতে পারে তাহলেও সেখানে মহাকাশযান পাঠাতে লাগবে চার বছর। যদি না মাঝপথে অ্যাস্টেরয়েডরা সেই
মহাকাশযান ধ্বংস করে দেয়। আলোর গতি অর্জন করাও আইনস্টাইনের মতে প্রায় অসম্ভব। সেই ফ্যুয়েল আমাদের নেই
এবং ওই গতি কোনও ম্যাট্রিক্সের পক্ষে অর্জন করা অসম্ভব, বস্তুগত রূপান্তর ছাড়া। আলোর গতি পেলে ম্যাটার হয়ে যাবে
এনার্জি, আমি কি একটু বেশী টেকনিক্যাল হয়ে পড়ছি?

আমি বুঝতে পারছি। আজকাল সবাই এসব বোঝে।

কৃষ্ণজীবন হতশ গলায় বলে, বুঝছে কই? বৈজ্ঞানিকরা আমাদের খেলনা দিয়ে, ঘুমিকাঠি দিয়ে, রূপকথার গল্প বলে
ভুলিয়ে রাখছে। কিন্তু আমরা পচা ইঁদুরের গন্ধ পেতে শুরু করেছি। আমি হিউটনে এক বক্তৃতায় বলেছিলাম, আমেরিকা
যদি তার একটা বা দুইটা রকেট উৎক্ষেপন বন্ধ রেখে টাকাটা ইথিওপিয়ার মরু-প্রকৃতিকে বেশে আনতে ব্যয় করে তাহলে
পৃথিবীর অনেক বেশী উপকার হবে। আমেরিকানরা তুমুল হাততালি দিল, বাহবা দিল, কিন্তু প্রস্তাবটা কার্যকর করল না।

আপনি কি মহাকাশ গবেষণা বন্ধ করার পক্ষে?

না, আমি ততটা গাধা নই। কিন্তু আপনি হয়তো জানেন না, মহাকাশ গবেষণার বকলমে কিছু মানুষ বড়লোক হয়ে
যাচ্ছে এবং চলছে ওয়াইল্ড শুজ চেজ। আমি বাড়াবাড়ির বিপক্ষে। আমেরিকা যখন চাঁদে মানুষ পাঠিয়েছিল তখন সেটা কত
বড় হাই রিস্ক ভেনচার ছিল তা কি জানেন? তখনও ফুল-প্ৰফ টেকনোলজি ছিল না, শুধু বাহবা পাওয়ার জন্য ওই
সাম্ভাতিক ঝুঁকি নিয়েছিল। এইসব ইউজলেস কাজ তো বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নয়! তার উদ্দেশ্য মানুষের মঙ্গল। কিন্তু সে
কথাটা মানুষ বুঝছে কই! বিজ্ঞান-পাগল মানুষ বিজ্ঞানকে মাথায় তুলেছে, ঈশ্বরের বিকল্প করে তুলেছে, অথচ বাস্তববুদ্ধি
থাকলে মানুষের বোঝা উচিত ছিল, বিজ্ঞানের ভূমিকা হল মানুষের ভূতোর। যার চাকর হওয়ার কথা তাকে মনিব করে
তোলা কি উচিত?

আপনি নিজে বৈজ্ঞানিক, তবে বিজ্ঞানের ওপর ক্ষেপে আছেন কেন?

বিজ্ঞানের ওপর ক্ষেপব কেন! আমার রাগ আত্মমক মানুষের ওপর। অস্ত্র গবেষণায় কত কোটি কোটি ডলার খরচ হয়
তা কি জানেন? এক একটা যুদ্ধে কত কোটি ডলার খরচ হলুন তো! এক একটা ক্ষেপণাস্ত্রের দাম কত, একটা পুণ্ডর
ম্যানুয়াল বোমার? প্রতি মিনিটে কত মিলিয়ন ডলার হারবার হয়ে যায়? ম্যাটার নিচে তেল ফুরিয়ে আসছে, তবু কিছু
আত্মমক শত্রুতা করে জুলিয়ে দেয় তেলের খনি। কত তেল পুড়ে গেল! কত ক্ষতি হল মানুষের! কতখানি বিষিয়ে গেল
পৃথিবীর বায়ু আর জল! কী হবে আপনার এই বৈজ্ঞানিক সভ্যতা দিয়ে, যা বর্বর, অদূরদর্শী, আত্মঘাতী?

লোকটা এত শুছিয়ে কথা বলতে পারে, এটা একদমই জানা ছিল না হোমস্‌র। বরং সে শুনেছে, লোকটা গ্রামা,
মুখচোরা, একটু ক্ষ্যাপাটে এবং আনমনা, হয়তো তাই। হয়তো শুধু নিজের গবেষণা ও উপলব্ধির ক্ষেত্রেই লোকটা সহজ ও
বাকপটী। সে একটা বড় শ্বাস ছেড়ে বলে, ইউ আর পারহায়াপস রাইট।

আই অ্যাম রাইট। আমি ফিকশনাল সায়েন্সে বিশ্বাস করি না, ডেট্রাকটিভ সায়েন্সে বিশ্বাস করি না, ওয়েলফেয়ার
সায়েন্সে বিশ্বাস করি। সভ্যতায় অনেক কদম এগিয়ে গিয়েও যখন মানুষকে বর্বর, আত্মমক, নির্বোধ আর উদাসীন দেখি
তখন মনে হয়, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি-নির্ভর সভ্যতার কোনও দাম নেই। আমাদের কোন সং শিক্ষাই এই সভ্যতা দিচ্ছে না।
চাকা সুতারা উন্টোদিকে ঘোরাতেই হবে।

বারান্দার ঝাঝালো বাতিটা হঠাৎ জ্বলে উঠতেই চমকে গেল হোমস্‌।

এই অলম্বুস! বলেই জিব কাটল চারুশীলা, আরে, আপনিও এখানে! বলে কৃষ্ণজীবনের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল।

হোমস্‌ গম্ভীর হয়ে বলে, যা তো। এখন কাজের কথা হচ্ছে।

সে কি! খাবি না? ডিনার শুরু হচ্ছে যে!

আরও পরে খাবো।

চারুশীলা কৃষ্ণজীবনের দিকে চেয়ে বলে, প্রীজ, আপনি আসুন। রিয়া খুঁজছে আপনাকে। আপনার নাকি আজ রাত বারোটায় প্লেন ধরতে হবে।

আজ্ঞে হ্যাঁ। বলে কৃষ্ণজীবন উঠে দাঁড়ায়। ভারী আপ্যায়িত ভঙ্গি।

হেমান্স বলে, কোথায় যাচ্ছেন রাত বারোটায় প্লেনে?

লন্ডন। এমনভাবে বলল, যেন লিলুয়া-টিলুয়া কোথাও যাচ্ছে।

একা বারান্দায় আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে হেমান্স। পৃথিবীর আসন্ন বিপদ নিয়ে মোটেই দুচিন্তা নেই তার। কৃষ্ণজীবন যতই বলুক, সে জানে পৃথিবীর ভাল করার কথা যারা ভাবছে, তারা ঠিকই ভাল করবে। ঘুরেফিরে তার কেবলই একটা প্রশ্ন আসছে মনে, ওই কিশোরী মেয়েটি এইসব গুরুতর কথাই কি চুপ করে গুনছিল কৃষ্ণজীবনের কাছ ঘেঁষে বসে? কে মেয়েটা?

চারুশীলা আবার এল, কী হচ্ছে বল তো? খাবি না নাকি?

নাও খেতে পারি। প্রতিবাদ হিসেবে।

তার মানে!

এই গরিব দেশে এত খরচ করে কেউ ছেলের জন্মদিন করে? এই অপচয়ের মানে হয় কোনও?

ওঃ, তাহলে এই হল ব্যাপার! আর তুই যে আজেবাজে জিনিস কিনে রোজ টাকা উড়িয়ে দিচ্ছিস!

তোর মাথায় ঘিলু বলে পদার্থটা নেই বলেই বলছিস। জিনিস কিনলে টাকার অপচয় হয় না, টাকাটা জিনিসে কনভার্টেড হয় এবং ঘরে থাকে।

ওটা তো আই-ওয়াশ। জিনিসগুলো বেচলে ফের পুরো টাকাটা কখনও ফেরত পাবি?

ফেরত পাওয়ার প্রশ্নই নেই। জিনিসগুলো আমাকে সারভিস দিচ্ছে।

ছাই দিচ্ছে। আয় বলছি খেতে।

এই গরিব দেশে একশ দশ টাকা প্রেট মূর্খের মতো অপচয়। বহু খাবার নষ্ট হবে। আই প্রটেক্ট!

মারব থাপ্পড়, কিঙ্কস কোথাকার। নইলে পিষ্টুকে লেলিয়ে দেবো। তখন সুড়সুড় করে যাবি।

তুই পিষ্টুটাকে নষ্ট করছিস।

বেশ করছি। আর একটা কথা বলে রাখি, আমার সামনে গরিব কথাটা উচ্চারণ করবি না কখনও। গরিব কথাটাই আমি সহ্য করতে পারি না। গরিবদের দুচোখে দেখতেও পারি না।

হেমান্স অবাক হয়ে বলে, বলতে পারলি কথাটা! জিবে আটকাল না? তুই সত্যি খারাপ হয়ে গেছিস।

তোর চেয়ে খারাপ নই। তাড়াতাড়ি খেয়ে নে। নীলা বগল রোডে ফিরবে। ওর গাড়ি নেই। ওকে নামিয়ে দিয়ে যাবি।

আমার খিদে পাচ্ছে না।

খপ করে তার চুলের মুঠি চেপে ধরল চারুশীলা, খাবি কিনা?

উঃ। যাচ্ছি যাচ্ছি!

খাওয়ার ঘরেই কিশোরীটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। প্রেটে সামান্য একটু মাছের কারি নিয়ে একটু খাওয়ার তান করছে। এটা খিদের ব্যস, কিন্তু এই প্রজন্মের হাই ব্রাও মেয়েরা তেমন খেতে-টেতে চায় না। অন্তত পাবলিকলি নয়।

ভিড়ে মেয়েটার কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল হেমান্স, তুমি কে বলো তো?

মেয়েটা মুখ তুলে তাকে দেখে হাসল, আমি অনু। নন্দনা আমার বন্ধু। আপনি?

আমি! আমি নন্দনার মামা। হেমান্স। তুমি ওটা কী খাচ্ছে?

মাছ। কিন্তু বিচ্ছিরি খেতে হয়েছে।

তবে খাচ্ছে কেন? অনেক আইটেম আছে, নিয়ে খাও না।

আসলে আমার আপেটাইট নেই। মাই ডাডা ইজ সিক। নট ফিলিং হাংরি।

বাবার কী হয়েছে?

হয়েছিল। ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। তবে হি ইজ পুলিং থ্রু। ইনটেনসিভ কেয়ার থেকে পরন্তু কেবিনে ট্রান্সফার করা হয়েছে।

তাহলে তো ভাল খবর।

ভালই। তবু কেন যেন বাবার অ্যাটাক হওয়ার পর থেকে খেতে পারি না।

কৃষ্ণজীবনবাবুকে তুমি চেনো?

মেয়েটা টপ করে তার দিকে একবার তাকাল। তারপর শার্ট হেসে বলল, উই আর ফ্রেন্ডস।

ফ্রেন্ডস!

ভেরি গুড ফ্রেন্ডস।

হেমান্স মেয়েটার পাকামিতে একটু হাসল। একটু চিমটি কেটে বলল, পারহ্যাপস নট এ বয় ফ্রেন্ড?

অ্যাড হোয়াই নট? বলে হিহি করে হাসল মেয়েটা।

মাই গড!

আপনি একটু ওল্ড ফ্যাশনড্, তাই না?

কি জানি! হবে হয়তো।

আসলে ওর মেয়ে মোহিনী আমার খুব বন্ধু।

তাই বলো।

উনিও বন্ধু।

হোমস একটা মুর্গির ঠ্যাং সন্তর্পণে কামড়ে বলল, হি ইজ ইন লাভ উইথ দিস আর্থ। জানো?

সবাই জানে। হি ইজ এ গুড গাই। জেম অফ এ গাই।

বোধ হয় তুমি ঠিকই বলছো। আফটার অল হি ইজ ট্রাইং টু ডু সামথিং ফর ম্যানকাইন্ড অ্যান্ড দিস প্র্যান্টেট।

দ্যাটস হোয়াই আই অ্যাম ইন লাভ উইথ হিম।

এরা যে কী ভাষায় কথা বলে তা ঠিক পায় না হোমস। সে একটু অস্বস্তি বোধ করে চুপ করে রইল।

অনু তার মাছসুন্দ্র প্রেটটা একজন চলন্ত বেয়ারার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, ডু ইউ নো সামথিং অ্যাবাউট ইওরসেলফ?

ইউ আর এ হ্যান্ডসাম ম্যান!

বলে হিহি করে হাসল অনু। তারপর বলল, যাই।

হোমসের হাত থেকে মুর্গির ঠ্যাংটা পড়েই যাচ্ছিল।

॥ ১৬ ॥

বিষ্ণুপদর পেটটা একটু নেমেছে। সকাল থেকে বার চারেক দাস্ত, পেটটা ভার। একটা বিশেষ বয়সের পর শাস্ত্রে আছে মলতাও ন চালিয়েৎ। চালাতে হয়নি, ইদানীং খাওয়া-দাওয়াটা একটু বেহিসেবী মতো হওয়ায় সামাল দিতে পারা যায়নি। রামজীবন খাওয়াচ্ছে খুব। পরন্তু কোথা থেকে ক্ষীর নিয়ে এল এক ভাড়া। থকথকে ক্ষীর, সরে ননীতে একেবারে মাখমাখি, ভাড়াটা একবার তাকে ঝকিয়ে নিয়েছিল রামজীবন। আহা, কী মিঠে গন্ধ! প্রাণ জড়িয়ে জিব রসস্থ হয়ে পড়ল। ইদানীং নোলাটা যে বেড়েছে তা বিষ্ণুপদ নিজেই টের পায়। কাল যখন ডাকে, তখন এরকমই হয়। নোলা বাড়ে।

ক্ষীর দেখে নয়নতারা চেঁচামেচি শুরু করল, ওই বুড়ো মানুষটাকে এই বিষ গেলাবি নাকি রে বাবা? এ কি ওর পেটে সইবে! রামজীবন উদার গলায় বলে, আহা, খাক না মা। সাধ মিটিয়ে খাক। ভালমন্দ অত হিসেব করার কি বয়স এটা? এখন প্রাণ খুলে সাধ মিটিয়ে যা খুশি খেয়ে হরি বলে চলে যাওয়া।

নয়নতারা রাগ করে বলল, আমি বাপু তাদের মতো করে বুঝি না। আমি বুঝি যতদিন রাখা যায় ধরে বেঁধে ততদিনই রাখলাম। ওই ঘন পাকের জিনিস হজম হবে না বাবা। তোর বরং ভাগজোগ করে খেয়ে নে। আমি একটা ফেঁটা বুঝেসুঝে দেবোখন তোর বাপকে।

রামজীবন জিব কেটে বলে, তা কি হয়! বাবার নাম করে এনেছি, বাবাই খাবে। ওতে ভাগজোগ চলবে না।

বিষ্ণুপদ বারান্দায় বসে শুনছিল। শুনে মনে মনে খুব বাহবা দিল রামজীবনকে। এ তার বিদ্বান ছেলে নয়, দোহাঘাটওলা মুখ্য ছেলে, কিন্তু বাপ-মায়ে ভক্তি এর কাছ থেকে লোকে শিখতে পারে। আর নয়নতারার ভরিফও না করে পারে না বিষ্ণুপদ। ওই একটা মানুষই তার ভালমন্দর কথা ভাবে।

নাড়ে পরন্তু রাগেরে একটু ক্ষীর পড়ল। রামজীবন একেবারে সামনে খাড়া দাঁড়িয়ে, দেখল, কম দেওয়া হচ্ছে কিনা। সাদা বাতাসা গুঁড়িয়ে দিল রাঙা, সঙ্গে পাকা একখানা মর্তমান কলা। নয়নতারা একটু আবডাল থেকে হাঁশিয়ারি দিচ্ছিল, বুঝেসুঝে খেও গো। মরা পেট, ওসব খাওয়ার অব্যাস নেই তো। পেটে ঢুকে কী হলুহুল বাধায় কে জানে বাবা!

রামজীবন একটু অসন্তোষের গলায় বলল, খাওয়ার সময় অমন টিকটিক করো না তো মা!

সাধে কি বলি বাবা, ভুগতে তো হবে আমাকেই।

ক্ষীরটা আজও যেন জিবে লেগে আছে। যেমন স্বাদ, তেমনই গন্ধ। দু'হাতার একটু বেশীই খেয়ে ফেলল বিষ্ণুপদ। টেঁকুরখানায় অবধি ক্ষীরের গন্ধ আসছিল।

ভুটভাট শুরু হল শেষ রাতে। কাল সারাদিন থম ধরে রইল পেট। খিদেই হল না। আজ সকাল থেকে নেমেছে। বর্ষা ঋতুটা এমনিতেই ভাল নয়। রোগ সহজে ছাড়তে চায় না। ছাড়া মাথায় দিয়ে বার বার ঘটি নিয়ে দৌড়োতে হচ্ছে পুকুরধারে। এ তো আর কৃষ্ণজীবনের সাততলার ফ্ল্যাটবাড়ির পাকা ঝা চকচকে পায়খানা নয়! নিভান্তই চট দিয়ে ঘেরা কাঁচা ব্যাপার। ওপরে কোনও ছাউনিও নেই। তবে রামজীবনের পাকা ঘরখানা হলে তাতে সব বন্দোবস্ত থাকবে। লাগোয়া না হলেও, কাছেই বারান্দার শেষ দিকটায় স্যানিটারি হচ্ছে। বাবা-মায়ের জন্য জান-কবুল করে লেগেছে ছেলোটা।

চারবার হয়ে গেল। লক্ষণ ভাল বুঝে না বিষ্ণুপদ। শরীরটা কাহিল লাগছে, সিটিয়ে যাচ্ছে যেন। জিবটা খসখসে, বিষাদ নয়নতারা এসে বলল, ক'বার হল।

চারবার।

আরও হবে?

বলি কি করে?

বুঝছো কেমন?

ভয় খাওয়ার মতো কিছু নয়।

থানকুনি আর গ্যাঁদাল রস করে রেখেছি। খাও। বমির ভাব নেই তো!

না।

নয়নতারা গেলোসে রসটা নিয়ে এল। বিষ্ণুপদ ঢুক করে রসটা খেয়ে বরল, সব ভাল যার শেষ ভাল।

দাসীর কথা বাসি হলে তবে কানে যায়। পিচকিরি যে ছুটবে সে তো তখনই বুঝতে পেরেছিলাম।

বিষ্ণুপদ কাহিল হাসি হেসে বলল, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। কিন্তু লোভের ক্ষমতা কি কিছু কম? শয়তানের গায়ে মেলা জোর। তার সঙ্গে আমরা পেয়ে উঠব কেন? তবে যদি এখন কলেরা হয়ে মরি তবে দুঃখ থাকবে না। একখানা জম্পেশ জিনিস খাওয়ায় বটে রামজীবন। তুমিও একটু চেষ্টা দেখেছো তো!

সে খোঁজ আর নিলে কোথায় ?
 খোঁজ নিহনি বটে । দোষই হয়েছে । তবে মনে হয় তুমিও একটু জিভে ঠেকিয়েছো, তাই না ?
 কী পুরুষের সঙ্গেই জীবনটা কাটল ! বলি, দুধ সর স্কীর করে মুখে তুলতে দেখেছো আমায় ? আমার হল সাদা-পাতা
 খাওয়া পচা মুখ, ও সব ভাল ভাল জিনিস কি নয় আমার ?
 তাও বটে । তুমি তো সন্তি দুধটুখ খাও না । তবে এটা একটু খেয়ে দেখলে পারতে । বড় খাঁটি জিনিস ।
 ধোঁয়াটে গন্ধ পাওনি ?
 না তো ! ছিল নাকি ?
 আমি তো ভাঁড় তাঁকেই পেয়েছি । মোষের দুধের স্কীর ।
 মোষের দুধে কি ধোঁয়াটে গন্ধ হয় ?
 তাই তো জানি ।
 বিষ্ণুপদ একটু হাসল, আমাদের আর গরু মোষের তফাত করে লাভ কি ?
 মোষের দুধ তেজী জিনিস । গুরুপাক । পেট ডাকল নাকি ? শব্দ পেলাম যেন !
 ডাকছে ।
 তাহলে আবার হবে । টোটকাতে আর ভরসা পাচ্ছি না । ডাক্তার ডাকি ।
 ব্যস্ত হলো না । ধরেও যেতে পারে । আজকালকার অ্যালোপ্যাথি মানেই তো বিষ । বিষে বিষ ক্ষয় । আজকের দিনটা
 উপোস দিলেই হবে ।
 আজ খুব সকালে রামজীবন বেরিয়ে গেছে । শুনছি আজ নাও ফিরতে পারে । বামাচরণ তো সম্পর্ক রাখছে না । এখন
 বিপদ হলে কাকে ডাকি ?
 বিষ্ণুপদ হাসে, কাউকে ডাকতে হবে না । বিষ্ণুপুরে এতকাল আছি । পাড়া-প্রতিবেশীরা কি আর আসবে না ডাকলে !
 কিছু অত কিছু করতে হবে না ।
 এ বয়সে পেট-ছাড়া কি ভাল ? কথায় বলে, ছেলে হাগে বাড়তে, বুড়ো হাগে মরতে ।
 বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, তাই খারাপ কি ? সময় হলে চলে যাওয়াই তো ভাল ।
 এ কি হাসিঠাট্টার কথা !
 আহা, রাগ করো কেন ? পানের বাটখান নিয়ে এখানেই বোসো । পাহারা দাও । যমদূত এলে তাড়িয়ে দিও ।
 বিষ্ণুপদ আর একবার গেল । ঘুরে যখন এল তখন আর হাসিখুশি ভাবখানা নেই ।
 বুঝলে, একটু শোবো ।
 নয়নতারা উঠে পড়ল । বলল, আগেই ভেবে রেখেছি । বিছানা করাই আছে । শুয়ে পড়বে চलो । রক্তটুকু যাচ্ছে না
 তো !
 না । এখনও ততটা খারাপ নয় ।
 ঘরে অন্ধকার ঘনিয়ে নেয় । বাইরে মেঘলা । বৃষ্টি পড়ছে টিনের চালে খই-ভাজার শব্দ তুলে ।
 নয়নতারা দাওয়ায় বেরিয়ে পটলকে ডাকল । এইবেলা যা দাদা, পুলিশবাবুকে ডেকে নিয়ে আয় । পেট খারাপের কথা
 বলিস, ওষুধ যেন সঙ্গে করে নিয়ে আসে ।
 পটল ছাটা আর সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেল । তার সেই ঝাঁ-কুরকুর সাইকেল । এই নাতিটিকে বড় ভালবাসে
 নয়নতারা । বড় হলে কেমন হবে কে জানে ! কিন্তু এখন অবধি ভারি বাধের, এ বয়সেই বুদ্ধি বিবেচনা খুব হয়েছে, বোবা
 ভাইটাকে বুক বুক আগলে রাখে ।
 দুই বড় আজকাল আলাদা রাখছে । রান্নাঘরটা রান্ডার দখলে । শ্যামলী নিজের ঘরে ঠোঁট জ্বলে বা তোলা উনুনে
 রেখে নিচ্ছে । সেই ঝগড়ার পর থেকেই এই ব্যবস্থা । ভিতরে ভিতরে ভাইয়ে ভাইয়ে জায়ে জায়ে ভাগ হয়েছে ছিল । মনের
 মধ্যকার ভাগটাই এখন বেরিয়ে পড়েছে । যতদিন যাচ্ছে তত ভাগভাগিটা যেন বাড়ছে চারদিকে ।
 নয়নতারা ঘরে এসে দেখতে পায়, চোখ চেয়ে নিখুঁত শুয়ে আছে বিষ্ণুপদ । যেন ভাবন-জগতে ।
 কী হচ্ছে পেটের মধ্যে !
 বিষ্ণুপদ বলে, পেটের মধ্যে নয়, মনের মধ্যে । সেখানে অনেক কিছু হচ্ছে ।
 তোমার তো মন নিয়েই যত জ্বালা । কী যে সারাদিন ভাবো বসে বসে !
 তোমার ভাবনাচিন্তা আসে না, না ?
 তা আসবে না কেন ? মেয়েমানুষের মাথায় তেল-নুন, রোগ-ভোগ, সংসারে পাঁচটা ভালমন্দ এইসব ছাড়া আর কী
 আসবে বলো ! এই যে রোগ বাঁধালে এখন এইটাই মাথা জুড়ে থাকবে ।
 এইমাত্র কী ভাবছিলাম জানো ?
 কী ভাবছিলে ?
 ভাবছিলাম কলকাতায় থাকলে এখন বেশ হত । না, কৃষ্ণজীবনের বাড়িতে নয় । সে বড় সাহেবী জায়গা । কলকাতার
 বড় রাস্তার একটি ধারে যদি বসে থাকতে পারতাম সারা দিনমান তাহলে বেশ হত ।
 রাস্তায় বসে থাকলে আবার ভালটা কী হবে ?
 এই গাঁয়ে গঞ্জে যেমন সব কিছু থেমে থাকে, নড়াচড়া নেই, কলকাতায় তেমনি আবার সবসময়ে সব কিছু কেবল
 চলছে । ধুকুমার করে চলছে । কী শব্দ ! কী হই-চই !
 যাই বলো বাপু, ও আমার নয় না । ক'বার তো গেলুম । কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়, একবার চিড়িয়াখানা । আমার
 মনে হয়, বেড়াতে খারাপ নয়, কিন্তু সারাক্ষণ থাকলে মাথা ধরে যাবে ।

আমারও কি আর ভাল লাগবে! আমরা হলুম মাটি-ঘেঁষা মানুষ। সে কথা বলছি না। কিন্তু মাঝে মাঝে ইচ্ছে যায়, ওরকম ধুক্কার কাওথানা কিছুক্ষণ বসে দেখি। চারদিকটা যেন বড় জীয়ন্ত মনে হয় কলকাতায়। আর এই বিষ্ণুপুরের বাড়ির দাওয়ায় বসে থেকে থেকে কী মনে হয় জানো? এত নিস্তেজ, এত মরা চারধার য়ে, হঠাৎ চমকে উঠে ভাবি, ওরে বাবা, আমি মরে যাইনি তো!

পেট ভাঙল বুঝি! শব্দ পেলাম যেন!

অত ভাবছে কেন? বদহজম হলে ওরকম একটু হয়। কলেরা-টলেরা নয়। ভয় নেই। বরং পানের বাটাখানা নিয়ে এইখানা বোসো। একখানা পান সেজে খাও। দেখি।

পান খাওয়ার আর দেখার কী আছে?

আছে। সবকিছুর মধ্যেই দেখার জিনিস আছে। তুমি যখন পান সাজো তখন ভারি আদর করে, যত্ন করে সাজো। দেখতে বেশ লাগে। ইচ্ছলে যখন পড়া তুমি তখন একখানা বাংলা গল্প পড়াতে হত। তাতে ছিল, জাপানীরা যখন চা তৈরি করে তখন এত যত্ন নিয়ে করে, এত সুন্দর ভঙ্গিতে যে, সেটাও নাকি চেয়ে দেখার মতো ব্যাপার। তোমার পান সাজার মধ্যেও খানিকটা ওরকম কিছু আছে।

কী যে মাথাগুণ বোলে তার ঠিক নেই! সাদা পাতা দিয়ে একটু চুন জেবড়ে মুখে ফেলে দিই। দেখার যে কী আছে বুঝি না!

নয়নতারা পানের বাটা আনতে গেল। কিন্তু সহজে এল না। সংসারী মানুষ, একটা কাজ করতে গেলে সেটার সঙ্গে আর একটা জড়িয়ে পড়ে।

দুর্বল শরীরে একটু ঘুম-ঘুম পাচ্ছিল বিষ্ণুপদর। পেটে হাড়িকলসি ভাঙছে, জিব তেতো। শরীরটা জুত-এর নেই মোটেই। চোখ জড়িয়ে যখন এল তখনই হঠাৎ মনে হল, ঘুমও কি ছোট করে মরণ? ঘুমোলে তো শরীরের বোধ মুছে যায়, সমাজ সংসার, আত্মীয়স্বজন সব মুছে যায়। মরণও তাই। তবে কি নিতি দিন ঘুমের মধ্যে আমরা একটু একটু করে মরি! মরণের পর কি সব ফক্কিয়ারি! মাথায় আজকাল কত কথাই আসে। উড়ুটে সব কথা। বিষ্ণুপদ বৈতরণীর কথা ভাবে, যমরাজার কথা ভাবে, স্বর্গ বা নরকের কথাও ভাবে। ওসব কি আছে বটে? বিষ্ণুপদর তেমন বিশ্বাস হতে চায় না। তবে আছেটা কি? মানুষ জন্মায় বাঁচে, তারপর মরে হারিয়ে যায়? তাহলে তো এর কোনও মানেই হচ্ছে না। বিষ্ণুপদর শাস্ত্রটান্ন পড়া নেই, তবে আজকাল মনে হয়, এই জীবনটার একখানা মানে-বই থাকলে বড় ভাল হত। সহজ করে সব বোঝানো থাকত তাতে।

জানালার সুরু সুরু শিকরে ওপাশের বর্ষার জল পেয়ে সতেজ পেয়ারা গাছটার ডালপালা আর পাতা উকি দিতে থাকে। গাছ যেন হাসছে। খুব হাসছে। গাছখানার স্বর্গ-নরক নেই, কর্মফল নেই। এই ঠাই দিবি একটা গোটা জীবন কাটিয়ে যায়।

চটকাটা ভাঙল পুলিশ ডাক্তারের ডাকে।

আবার কী বদমায়েল হে?

এসো ভায়া, বোসো। তোমাকে আবার এই বাদলায় ছেঁচড়ে আনল কেন?

বালা বালা কি আর হাত পা গুটিয়ে বসে আছি নাকি ঘরে? চাম্বাস দেখতে হচ্ছে। তা খুব নাকি ক্ষীর খেয়েছো?

খুব রটেছে দেখছি। বলে উঠে বসে বিষ্ণুপদ। মাথাটা একখানা চক্কর মারল।

তার রটেছে। তোমার নাতি গিয়ে বলল, ক্ষীর খেয়ে পেট ছেঁড়েছে। জরুরি তলব।

বিষ্ণুপদ হেসে বলে, ছেলে শেষ খাওয়া খাওয়াচ্ছে হে। তা আমারই বা আপত্তিটা কিসের?

দিলুম ঠেসে। মরণ-বাঁচন ভগবানের হাত।

সবটাই ভগবানের ওপর ছেড়ে দিও না! মরণ-বাঁচনে তোমার আমারও একটু হাত আছে। ক'বার হয়েছে?

বার পাঁচেক হবে বোধহয়। বমিটমি নেই।

খিদে আছে?

শোনো পাগল ডাক্তারের কথা! খিদে থাকবে না কেন? এ কি বড়লোকের পেট? গরিবের পেটে সবসময়ে খিদে।

হরি বলে মন! তুমিই যদি গরিব তবে আমরা যাই কোথা! অত বড় বিলেত-ফেরত তালেবর ছেলে থাকতে তুমি গরিব কপচাচ্ছে? এও কি ধর্ম সয়?

বিষ্ণুপদ এক গাল হাসল। পূত্রগর্ব বলে একটা ব্যাপারও তো আছে! বলল, ছেলে তালেবর সে তার নিজের গুণে। আমার কোন গুণটা আছে বোলা!

পুলিন প্রায় ঘরের লোক। সব খবরই জানে। তাছাড়া বিষ্ণুপুরে সবাই সবাকার সব জানে। তালেবর ছেলে যে বাপ-মায়ের থেকে তফাত হয়েছে, তা কি আর গুহ্য কথা কোনও। পুলিন তার পেট টিপে দেখতে দেখতে বলল, টাকাপয়সা না হয় না-ই দিল, চোখের দেখা না হয় নাই দেখল, তবু তো ছেলে বটে হে! গত বিশ বছরে এ গায়ে ওরকম ছেলে আর একটাও বেরিয়েছে? টাকাপয়সায় নও হে বাপু, তুমি অন্য দিকে বড়লোক।

একথাটা বিষ্ণুপদর খুব পছন্দ হল। মাথা নেড়ে বলল, সে খুব ঠিক কথা।

পুলিন পেটে আঙুলের খোঁচা দিচ্ছে বটে, কিন্তু সেটা অভ্যাসবশে। আসলে ডাক্তারি পরীক্ষা করছে না কিছুই। তাকে আজ কিছু কথায় পেয়েছে। বলতে লাগল, আমার দশাই কি কিছু ভাল? আগে তবু রুগী-পশুর আসত, আজকাল ভোঁ ভাঁ। বটতলায় এক হাতুড়ে চোয়ার খুলেছে, হগুয় দুদিন বসছে এসে। শুধু এম বি বি এস ডিগ্রিটা ছিল বলে সেখানে পাকা কাঁঠালে মাছির মতো ভিড়, নাড়ীজ্ঞান নেই, মোট তেরোখানা ওষুধের নাম জানে, লক্ষণ দেখে রোগ চিনতে পারে না, কিন্তু গায়ের পয়সা বের করে নিয়ে যাচ্ছে। দু-দুটো ছেলেকে ডাক্তারি পড়ানো বলে ঠিক করে রেখেছিলুম, তাদুটো ষাঁড় ইলুদ ডিঙোতেই হিমসিম খেয়ে গেল। কপাল! বুঝলে? কপাল! নাও, শুয়ে পড়ো দেখি।

বিষ্ণুপদ শুয়ে পড়ল।

পুলিন পেটে টোকা মেরে দেখল, বুকে পিঠে ঠোঁটোসকোপ দিল, নাড়ীও পরীক্ষা করল।

বিষ্ণুপদের খিদে পেয়ে রয়েছে। বলল, ওষুধের কথা থাক, পথিাটা কী হবে বলে তো! একটু ঝোলভাত খাবো নাকি? তা খেতে পারো। পাঁচবার তো। ও কিছু নয়। বেশী করে জলটা খেও। ফুটিয়ে খেলেই ভাল। বর্ষাটা পেটের পক্ষে একেবারে যম। ওষুধটাও খেও। কয়েকটা ট্যাবলেট দিয়ে যাচ্ছি।

নয়নতারার এতক্ষণে সময় হল আসবার। ঘরে ঢুকেই বলল, কেমন দেখলেন মানুষটাকে?

কিছু নয় তেমন। ক্ষীরের দেনা শোধ হচ্ছে। একদিক দিয়ে ভালই, কোষ্ঠটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

বড্ড নোলা হয়েছে ইদানীং। বারণ করলুম, ভব জোর করে ক্ষীর খেল।

আর বিশেষ খেও না হে বিষ্ণুপদ। কথা কি জানো! বুড়োরা যখন একে একে কেটে পড়তে থাকে তখন বেঁচে-থাকা বুড়োদের বড্ড একা লাগে। ভয়-ভয়ও করে। বুঝলে কথাটা?

বুঝেছি।

তুমি যদি এখন টিকিট কাটো, তাহলে আমার দশটা কেমন হবে জানো? মনে হবে, এই রে, এবার আমার পালা বুঝি!

বিষ্ণুপদ খুব হাসল। বলল, এমনিতে যাবো না। পোক্ত শরীর। তবে কিনা ডাক এলে তো যেতেই হবে।

সেই কালঘড়ি না কোন গুপ্তির পিণ্ডি দেখেছিলেন, সেই থেকেই মাথা বিগড়েছে!

রামজীবন ফিরল সন্ধেবেলা। বাপের খবর শুনেই চলে এল বিষ্ণুপদের কাছে, বাবা! শেষে কি পিড়ঘাতক হলাম?

মুখ থেকে ডকডক করে কাঁচা মদের গন্ধ আসছে। বড্ড খারাপ গন্ধ। গা গুলোয়। বিষ্ণুপদ বলল, ওরে না! সে ব্যাপার নয়।

রামজীবন দুখানা পা সাপটে ধরল বিষ্ণুপদের। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, আমি কুলাসার! নেমকহারাম! একটু কষ্ট করে উঠে আমাকে জুতোপেটা করুন বাবা। দু গালে খাবড়া দিন।

মাতালের মনস্তাপও বড় সাম্ভাতিক জিনিস! সহজে শেষ হতে চায় না। বিষ্ণুপদ দুখানা পা ছাড়ানোর একটা ক্ষীণ চেষ্টা করতে করতে বলল, আমার তেমন কিছু হয়নি। সকালে দুপুরে মিলিয়ে বার ছ-সাত হয়েছে। তাতে ভালই হয়েছে বাবা। পেটের গাদ নেমে গেছে। এ বেলা শরীর বেশ ঝরঝরে।

কিন্তু এত কথার পরও রামজীবনের কান্না থামে না, আমার মতো পাপী কি আর আছে? শালার এই ভাড়া ঘরে আপনাকে ফেলে রেখেছি! পাকা ঘর তুলে তাতে রাখব বলে কতকাল ধরে চেষ্টা করছি। আপনি মরে গেলে পাকা ঘর দিয়ে আমার কী হবে!

মরার এখনই কি! পুলিন ডাক্তারও দেখে গেছে, বলেছে কিছুই হয়নি। অত ভাবছিস কেন?

কিন্তু রাজা যে বলল, ক্ষীর খেয়েই নাকি আপনার ভেদবমি শুরু হয়েছে।

ওরে না। ক্ষীর বলে কথা নয়। বর্ষাকালটা এরকমই হয়। নতুন জল তো!

আজ যে আমি জ্যান্ত শোল মাছ এনেছি! সেটা খাবে কে?

শোল মাছের কথায় বিষ্ণুপদ চান্স হয়ে উঠল। তার অতি প্রিয় মাছ। তেজী গলায় বলল, এনেছিস? খুব ভাল করেছিস। আজ তো পেটটা ধরেই গেছে। সাঁতলে রাখুক, কাল খাবোখন।

নয়নতারার ঘরে ছিল না। কিন্তু শুনেছে ঠিক। বাইরে থেকেই উঁচু গলায় বলল, শোল মাছ খাবে! মাথাটা কি একেবারেই গেছে নাকি? তোমার ওই পেটে শোল মাছ সাম্ভাণ বিষ।

রামজীবন হাহাকার করে উঠল, ও কথা বোলো না মা। শোল মাছ আমি বাবার নাম করে কিনে এনেছি।

তার চেয়ে বাপকে একটু সৈকো বিষ এনে দে। ল্যাঠা চুকে যায়।

বিষ্ণুপদ গলাটা নামিয়ে রামজীবনকে বলল, অত সোরগোলের দরকার নেই। বউমাকে বলিস, তেলঝাল দিয়ে রোঁধে রাখতে। এক ফাঁকে কাল ঠিক খেয়ে নেবো। মুলো দিয়ে শোল অমৃত। তা এ তো মুলোর সময় নয়।

মুলো দিয়ে খাবেন বাবা! আজকাল সব সময়ে সব কিছু পাওয়া যায়। কাল ভোরে গিয়ে জাগুলিয়া থেকে নিয়ে আসব।

আধ ঘণ্টা বা চল্লিশ মিনিট—কতক্ষণ কে জানে—বিষ্ণুপদের আজকাল আর সময়ের হিসেব থাকে না—রামজীবন পা দুখানা বুকে চেপে ধরে রইল। তারপর নয়নতারার আর পটল মিলে প্রায় জোর করে তুলে নিয়ে গেল রামজীবনকে। তারপরও বিষ্ণুপদ শুনতে পেল, নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে রামজীবন মেলা কান্নাকাটি করছে। পান্না দুঃখ উথলে উঠছে এখন তার। হঠাৎ বৃষ্টি নেমে সব শব্দ ডুবিয়ে দিল।

সারা রাত ধরে তুমুল বৃষ্টির শব্দ শুনতে পেল বিষ্ণুপদ। আজকাল মাঝে মাঝে অসময়ে ঘুমিয়ে পড়ে, মাঝে মাঝে বায়ু চড়া হয়ে সময়েও ঘুম আসতে চায় না। আজ রাতে বায়ু চড়েছে।

খুব ভোরে, ভাল করে আলো ফোটবার আগেই বিষ্ণুপদ দাওয়ায় এসে বসল। একটু ধরেছে বৃষ্টিটা। তবে আকাশ মুখিয়ে রয়েছে এখনও। উঠোনে হাঁটুজল দাঁড়িয়ে গেছে। ঘরে জল, দাওয়ায় জল। এত জল বহুকাল হয়নি। আগে এই জলে গা ভেসে যেত। আজকাল একটা নিকালী খালের দরুন ততটা হচ্ছে না। কিন্তু তেমন ভারী জল হলে বিপদ।

রামজীবনের পাকা ঘরের অবস্থাও বড় করুণ। ইরফান সাতদিন ধরে কাজ বন্ধ রেখেছে। এই বাদলায় গাঁথনি থাকছে না, মশলা ধুয়ে যাচ্ছে। ঘরে কয়েক বস্তা সিমেন্ট পড়ে আছে। ভিজে ভিজে জমে না পাথর হয়ে যায়!

রোজকার মতো আজও আধখ্যাচড়া ভূতুরে বাড়িটা বিষ্ণুপদকে মুখ ভ্যাঙচায় যেন, কী বুড়ো, থাকবি পাকা ঘরে? আয় থাকাকি! কালঘড়ি তো আয়ু খেয়ে ফেলল তোর। এরপর যখন ফুরুত হয়ে যাবি তখন ঘর কোথা পাবি বুড়ো? খুব ক্ষীর সঁটাচ্ছিস, শোল গিলছিস, শরীরে আতুতি দিচ্ছিস, কদিন পর তো শরীরখানা পুড়িয়ে ছাই করে সেই ছাই জলে ডাসিয়ে দেবে? কে খাবে বাবা শোলমুলো, কে থাকবে বাবা পাকা ঘরে?

ঘরখানার সঙ্গে বিষ্ণুপদর একটা আড়াআড়ি আছে। তাকে সহিতে পারে না ঘরটা। সেই জন্যই কি কাজ আটকে থাকে? এ বড় অলঙ্ঘ্যে ব্যাপার হল।

বর্ষাটা ছাড়লে বাড়ি ভাগ হবে। আমিন আসবে। মাপজোখ হবে। ছেলেমেয়েরা আসবে। গায়ের মাতব্বররা সব সাক্ষী হবে। ছেলে কৃষ্ণজীবন আর দুই মেয়েকে চিঠি দিয়েছে বিষ্ণুপদ। কঠিন হল শিবচরণ। আজ বছর সাত-আট হল সে বাড়ি ছেড়ে কোথায় চলে গেছে। তার কথা আজকাল আর মনেই পড়ে না বিশেষ। বরাবর কিছু ডাকবুকে ছিল, লেখাপড়ায় মাথা ছিল না। কিন্তু বড় হওয়ার শখ ছিল খুব। গায়ে থেকে কিছু হচ্ছে না, প্রায়ই বলত। তারপর একদিন নিজের জিনিসপত্র নিয়ে, বাড়ির কিছু পুরনো কাঁসার বাসন, নয়নতারার দুটি সোনার দুল, ঘটে জমানো পয়সা, রাঙার বিয়েতে পাওয়া রূপোর চুটকি, রামজীবনের ঘড়ি এইসব জিনিস চুরি করে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেল। খোঁজখবর করা হয়েছে, লাভ হয়নি।

এলেম থাকলে পালিয়ে গিয়ে কেউ কেউ ভাগ্য ফিরিয়ে আসতে পারে। শিবচরণ পারবে কিনা কে জানে! কিন্তু যদি হেরো হয়ে একদিন ফিরে আসে তবে এ বাড়িতে তিতোনা মুশকিল হবে।

শিবচরণ সম্পর্কে আর একটা ভাবনাও আছে। মরে-টরে যায়নি তো! যদি গিয়ে থাকে তবে খবরটা জীবৎকালে পেতে চায় না বিষ্ণুপদ। নিরুদ্দেশ থাকাই ভাল। খরাপ খবর-টবর না এলে ধরে নেওয়া যাবে, ভালই আছে। হয়তো করে-কর্মে খাচ্ছে। কে জানে, হয়তো বিয়েও করেছে, ছেলেপুলে হয়েছে!

নয়নতারা আগে খুব কান্দত শিবচরণের জন্যে। আজকাল বোধহয় ভাটা পড়েছে একটু।

আজ বেহানবেলায় হারানো ছেলের কথা মনে হতে বিষ্ণুপদ ভাল, এ বাড়িতে তো শিবচরণেরও ভাগ আছে। কথাটা মনে রাখতে হবে।

॥ ১৭ ॥

জানালা দুরকম হয়। কোনও জানালায় দৃশ্য থাকে, কোনওটায় থাকে না। চয়নের জানালায় কোনও দৃশ্য নেই। তার একতলার ঘরখানা খুবই অন্ধকার। একটাই দরজা ভিতরদিকে, একটাই জানালা বাইরের দিকে। জানালার ওপাশে একটা সংকীর্ণ গলি, তার ওপাশে দেয়াল। নিরেট দেয়াল, নোনাধরা। জানালার পুরনো শিক আর জং ধরা এলুপাঙেড মেটাল লাগানো। দিনেই আলো জ্বালতে হয়। তবে এ ঘরে ইলেকট্রিক লাইন কেটে দিয়েছে চয়নের দাদা। বাড়ির পিছন দিককার সবচেয়ে খরাপ, ড্যান্স ধরা, অন্ধকার ঘরখানায় থাকে চয়ন আর তার মা। চয়ন এ ঘরে পড়াশুনো করতে হলে জানালার ধারে বসে করে। এ ঘরেই স্টোভ জ্বেলে তার আর মায়ের রান্না হয়। এক চিলতে উঠানে চৌবাচ্চা আছে। তাতে করপোরেশনের জল আসে। জল ব্যবহারের ওপর কড়া বিধিনিষেধ আছে। সকাল আটটার মধ্যে তাদের স্নান করে নিতে হয়। ছাদে যাওয়া বারণ বলে ডেজা কাপড় শুকোতে হয় ঘরের মধ্যেই। সাবান কাচা সম্পূর্ণ নিষেধ।

জানালায় দৃশ্য থাক বা না-থাক, ঘরে থাকলে চয়নের বেশীর ভাগ সময়ই কাটে জানালার ধারে বসে। এ ঘরের যেটুকু আলো তা ওই জানালার সুবাদেই পাওয়া যায়। এই পেছনের গলিটা সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য নয়। আগে খাটা পায়খানার আমলে মেথর আসবার রাস্তা ছিল, আজকাল খিড়িকির রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করে অন্য বাড়ির লোক। মাঝখানে গলিতে ময়লা ফেলা শুক্ন হয়েছিল, সেটা চয়ন চৌচামেচি করে পাড়ার হস্তক্ষেপে বন্ধ করেছে। তবু কিছু কিছু অশ্লীল জিনিস গলিতে নিক্ষিপ্ত হয়। কাকেরা টানা-হ্যাঁচড়া করে।

মলিন আলোটুকু বইতে পড়তে বা লিখতে কাজে লাগে চয়নের। দুপুরে জানালার খাঁজে বসে কোলে বই বা খাতা নিয়ে সে ডুবে যায় নিজের কাজে বা চিন্তায়। ওই গলিপথেই একদিন দুপুরে উদয় হল আশিস বর্ধন।

কি মশাই, চিনতে পারছেন?

চয়নের স্তূতিশক্তি চমৎকার। কোনও নাম বা মুখ সহজে ভোলে না। সে একটু অবাক হয়ে বলে, চিনতে পারছি। আপনি আশিসবাবু, এল আই সিতে কাজ করেন। মেশিন ডিপার্টমেন্ট। কিন্তু গলি দিয়ে এলেন কেন? এদিক দিয়ে তো এ বাড়িতে ঢোকার রাস্তা নেই।

সে জানি। তবে আপনার কথা থেকে আঁচ করেছিলাম যে, সদর দিয়ে ঢোকা একটু আনসেফ। ঢোকার দরকারও নেই। এখান থেকেই কথা বলে চলে যাই। বলে প্যান্টের পকেট থেকে একটা কাগজের পুরিয়া বের করে এলুপাঙেড মেটালের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিয়ে বলে, ধরুন। কালো তাগায় বেঁধে পরবেন।

কী এটা?

মাদুলি। হাবডার এক তান্ত্রিকের দেওয়া।

চয়ন মৃদু একটু হেসে বলে, তাবিজ-কবজ তো অনেক হয়ে গেল। কাজ হয়নি কিছু।

আশিসও হাসল, ওসবে আমারও বিশ্বাস নেই। তবে মানুষ তো সব রকম চেষ্টাই করবে। আমিও যে যা বলে করে যাই, বোনটার জন্য। মুগী না সারলে বিয়ে দেওয়া যাবে না, আর বিয়ে না হলে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

আপনার বোনের কি মাদুলিতে কাজ হয়েছে?

মনে হয় হতেও পারে। গত পনেরো দিন তো অজ্ঞান হয়নি। দেখা যাক।

চয়ন কুণ্ঠিতভাবে বলে, আপনি এত কষ্ট করলেন! দাঁড়ান, আমি জামাটা পরে আসছি।

আশিস বর্ধন জানালার কাছে এসে ঘরের মধ্যে একটু উঁকি দিয়ে বলল, এইটাই বুঝি আপনার আর আপনার মার ঘর?

চয়ন মৃদু হেসে বলে, হ্যাঁ। বাদবাকি বাড়িটা আমার কাছে নিষিদ্ধ। সেইজন্য—

আরে ব্যস্ত হবেন না। এসব সিকুয়েশন আমার জানা আছে। মা বুঝি ঘুমোচ্ছেন! খুব রোগা তো!

সকল চৌকির ওপর পড়ে থাকা মায়ের দিকে একবার তাকায় চয়ন। বলে, হাড় ক'খানা অবশিষ্ট আছে। মায়ের অনেক রোগ, চিকিৎসা তো হয় না। পড়ে থাকে নির্জীব হয়ে। মাঝে মাঝে মনে হয়, মরে-টরে গেছে বুঝি।

রোগটা কী ?

মার চোখে ছানি। প্রশ্রয় খুব বেশী। হাটও বোধ হয় ভাল নয়। বাত।

আপনাদের রান্না করে কে ?

কিছুদিন আগেও মা পারত। আজকাল আমি করি। একটা কুকার ছিল বাবার আমলের। সেইটে কাজে লাগছে।

দাদা বউদির সঙ্গে সম্পর্কটা এখন কেমন ?

সম্পর্ক নেই। দেখা হলেও কথাবার্তা হচ্ছে না।

বকাঝকা বা পরোক্ষ গালাগাল ?

চয়ন মৃদু হেসে বলে, আগে হত। আজকাল সেদিক দিয়ে পিসফুল। আপনাকে তো এত কথা বলিনি, জানলেন কি করে ?

বেশীর ভাগ অভাবের সংসারের ছবিটা একই রকম কিনা। আমি সেদিন আপনার বাড়ির ঠিকানা চাওয়ায় আপনি একটু দোনোমোনো করেছিলেন এবং অসময়ে আসতে বারণ করেছিলেন, তখনই আন্দাজ করে নিয়েছিলাম। কিছু মনে করলেন না তো!

বিবর্ণ একটু হেসে চয়ন বলে, না না, আপনি তো সিমপ্যাথাইজার।

একজ্যাস্টলি। কারণ আমার দাদা আমাকে আপনার চেয়েও একটি বেশী করেছিল। লাথি মেরে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল।

চয়ন চেয়ে রইল লোকটার দিকে।

আশিস জান হেসে বলল, অবশ্য দোষটা আমারই ছিল। দাদার জায়গায় আমি হলেও হয়তো তাই করতাম। যাকগে। তবে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়াতেই কিছু আমি দাঁড়িয়ে যেতে পেরেছি। নইলে একদম বখে গাভডায় চলে যেতাম।

দাদার সঙ্গে আপনার আর সম্পর্ক আছে ?

পরে রিকনসিলিয়েশন হয়েছিল, তবে সংসার তো আর এক হয়নি। শত্রুতাও নেই।

কিন্তু আপনি গলিতে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন, আমার খুব অভদ্রতা হয়ে যাচ্ছে। দাঁড়ান, জামাটা গায়ে দিয়ে আসছি।

একবার বেরোলে ঢুকতে পারবেন তো! সদর বন্ধ বা খোলার ব্যবস্থা কি আপনার হাতে আছে ?

চয়ন মলিন মুখে মাথা নেড়ে বলে, না। বউদি ওপরে ঘুমোচ্ছে। সদর খুলে বেরোলে দরজা টেনে দিলে লেগে যাবে। কিন্তু ফের ঢুকতে হলে ডোরবেল বাজাতে হবে। তবে অসময়ে ফিরলে আমি এই জানালায় এসে মাকে ডাকি। মা খুলে দেয়। তবে মার কণ্ঠ হয়।

তাহলে বেরোনোর দরকার নেই আপনার। আমি যাচ্ছি।

আরে না। আমার টিউশনিতে যাওয়ার সময় তো হয়ে এল।

তাহলে শ্বাসুন। আমি রাস্তায় অপেক্ষা করছি।

তার নতুন একজন বন্ধু হল কিনা তা বুঝতে পারছে না চয়ন। আগে ইস্কুল-কলেজে তার অনেক বন্ধু ছিল। আজকাল বিশেষ কেউ নেই। সে কোনওদিন চায়ের দোকানে বা পাড়ার ঠেক-এ আড্ডা দিতে যায়নি। তার শরীর দেয় না, তার সময়ও হয় না। প্রাণপাত বন্ধুত্ব তার সঙ্গে ছিলও না কারও। সে অনেকটাই একা, সঙ্গহীন। আশিস তার চেয়ে বেশ কয়েক বছরের বড়, তবু যদি বন্ধুত্ব হয় তাহলে খারাপ লাগবে না চয়নের। তার বোধ হয় এখন একজন বন্ধুই দরকার। পোশাক বলতে প্যান্ট, জামা আর চপ্পল। পরতে দুমিনিট লাগে। বেরোনোর আগে একবার মাকে ডেকে বলে যাবে ভেবেছিল। কিন্তু মা এত অকাতরে ঘুমোচ্ছে যে, ডাকতে ইচ্ছে হল না। এরকম ঘুমের মধ্যেই মা একদিন চলে যাবে বোধ হয়। সেদিন চয়ন আরও একটু একা হয়ে যাবে।

বাইরে মেঘলা আকাশ। ভ্যাপসা গরম।

আশিস বলল, আজ টিউশনি কোন দিকে ? সাউথে কি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। গোল পার্কের কাছে, সেদিন যেখানে যাচ্ছিলাম।

ছাত্র না ছাত্রী ? ছাত্রীই যেন বলেছিলেন!

হ্যাঁ।

বড়লোক নাকি ?

পয়সায় তেমন নয়। তবে ছাত্রীর বাড়ি বড় স্যাস্টিট। নাম আছে।

কী নাম বলুন তো!

কৃষ্ণজীবন বিশ্বাস। কাগজে লেখেন-টেখেন। এনভিরনমেন্টের ওপর।

আশিস বর্ধন মাথা নেড়ে বলল, জানি। বিখ্যাত লোক। ইংরিজি কাগজে লেখা পড়েছি। কি রকম দেয় আপনাকে ?

আড়াই।

কমই দিচ্ছে। বাসভাড়াটা বাদ দিন, কী থাকছে বলুন!

এর বেশী চাইতে ভয় করে। হয়তো টিউশনিই পাবো না।

দূর মশাই! বরং উল্টো। যত দাম বাড়াবেন তত ডিম্যান্ড হবে। আমি তো এক গুজরাতির ছেলেকে পাঁচশো টাকাতেও পড়িয়েছি।

ও বাবা!

আজকাল আর ওই উল্লেখ করি না। তবে আমার আর একটা সাইড বিজনেস আছে। শেয়ার বাজারের ব্রোকরি।

পাথিব—১০

সেটা কী ব্যাপার ?

সেটা খুব ভাল ব্যাপার। একটু মেধা আর ক্যালকুলেশনের দরকার হয়। কিছু টাকাও খাটাতে হয়। লেগে থাকলে অনেক পয়সা। করবেন ?

চয়ন খুব লাজুক দৃষ্টিতে আশিস বর্ধনের দিকে একবার তাকায়। পৃথিবীর কত কিছুই সে পারে না। পারবেও না ইহজন্মে। সে স্থিত মুখে চুপ করে রইল।

আশিস বর্ধন তার মনের কথাটা যেন পড়ে নিল। বলল, পারবেন না তো! বাঙালির ছেলেরা ওসব রাস্তায় যেতে চায় না। তারা চায় সেক্ষ প্রফেসর। যাকগে, মাদুলিটা পরবেন কিছু। একটু নিয়ম আছে। শনিবার সকালে একটু কাঁচা দুধে ধুয়ে নিয়ে কালো কাপ বৈধে পরবেন। কাজ হলে হবে। না হলেও ক্ষতি নেই। তাই না ?

এর দাম ?

দুই মশাই! পাঁচ সিকে দক্ষিণা দিয়েছি। আপনাকে কিছু দিতে হবে না। তাত্ত্বিকটার পয়সার লালচ নেই, সেইজন্যই ভরসা হল, কাজ হতেও পারে। চলুন, চা খাই কোথাও বসে।

সম্পর্ক জিনিসটা চয়ন কখনও রচনা করতে পারে না। আপনা থেকেই রচিত হয়ে যায়। বেশীরভাগ সময়েই সেটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক নয়। এই যে আশিস বর্ধন, এইমাত্র চয়ন বুঝতে পারছে, এর সঙ্গেও তার বন্ধুত্ব হবে না। লোকটি মেধাবী, করিৎকর্মা এবং শক্তিমান। এর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হবে কি করে ? সম্পর্কটা উপকারী ও উপকৃতের। অনুগ্রহকারী ও অনগ্রহীতের, উপদেষ্টা ও উপদেষ্টার। এ লোকটা সেদিন তার কিছু উপকার করেছিল এবং আরও কিছু উপকার করতে চেয়েছিল। আজও বাড়ি বয়ে মাদুলি দিয়ে গেল। চয়নের কৃতজ্ঞতাবোধ বড়ই বেশী। কেউ তার জন্য সামান্য কিছু করলেও সে গলে যায়। এই মনোভাব নিয়ে কি বন্ধুত্ব হয়!

আশিসকে নিয়ে পাড়ার কালোর চায়ের দোকানে বসল চয়ন। এ দোকান তার ঠেক নয়। তবে অনেকদিন এ পাড়ায় থাকার সুবাদে চেনা। চা খুবই ভাল বানায় এরা। আশিসকে চা আর ওমলেট খাওয়ায় চয়ন। খাওয়ায়, কিন্তু দামটা দিতে পারল না। কারও সঙ্গে সে জোর জবরদস্তিতে পেরে ওঠে না। আশিস জের করেছে দামটা মেটাল। খুব হীনশ্রুততা কষ্ট পেতে লাগল চয়ন।

আশিস বলল, আমি সাউথেই যাচ্ছি। চলুন নামিয়ে দিয়ে যাই। ট্যাক্সি নেবো।

চয়ন আবার আর একটা কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হয়ে পড়তে চাইল না। পৃথিবীর শক্তিমান লোকগুলোর ওপর ইদানীং তার খুব রাগ হয়।

চয়ন মুদু হেসে বলে, এখনও ঢের দেরি। আমি একটু পরে যাবো।

চলুন, আগেই বেরোই। এই ফাঁকে আমার বাড়িতে ঘুরে আসবেন।

বাড়িতে! বলে চয়ন ভাবিত হয়। এত অল্প পরিচয়ে বাড়ি নিয়ে যেতে চায় কেউ ?

আরে অত ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন! আমি দ্রুত বন্ধুত্বে বিশ্বাসী।

দ্রুত-বন্ধুত্ব!

এ যুগে যা করার তা চটপট সেরে ফেলতে হয়। আমাদের আয়ু কম, সময় কম, অবসর কম, বন্ধুত্ব করার জন্য বেশী ভ্যানভারার স্কোপ কোথায় বসুন! আমি তাই চটপট বন্ধুত্ব করে ফেলি। তাতে দু-চারটে সন্দেহজনক ক্যারেক্টারও যে জোটে না তা নয়। তবে মোটের ওপর আমি ঠিকিনি। আর আপনারও চিন্তার কিছু নেই। চলুন। সবসময়ে অত সংকুচিত হয়ে থাকবেন না। সবসময়ে যদি নিজের ডেফিসিয়েন্সিগুলোর কথাই ভাবতে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে, নিজের কাছেই নিজে বাতিল হয়ে বসে আছেন। তাহলে দুনিয়া আপনাকে পাত্তা দেবে কেন বলুন!

চয়ন লোকটার দিকে আর একবার চোরাচোখে তাকাল। লোকটি সদাশয়, সে আগের দিনই বুঝেছিল। কিন্তু এর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হবে দাতা ও গ্রহীতার। এ তার অনেক উপকার করবে এবং করতেই থাকবে। বন্ধুত্বের জন্য আর একটু সমানে সমানে হওয়া দরকার। তবু জীবনে যা আসে তাই নেওয়া ছাড়া কী আর করার আছে তার ?

সে বলল, চলুন।

ট্যাক্সিতে চড়াটা চয়নের কাছে বেশ একটা অপব্যয় বলে মনে হয়। কলকাতায় এত বাস ট্রাম, তা সত্ত্বেও ট্যাক্সি চড়ে তারা ই যাদের বিস্তর ফালতু পয়সা আছে। আশিস বর্ধনও মনে হচ্ছে, বিস্তর ফালতু পয়সার মালিক।

ধীরে ধীরে আশিস বর্ধনের ছবিটা পরিষ্কার হচ্ছে তার কাছে। আশিস বর্ধন চটপট বন্ধুত্বে বিশ্বাসী, চয়ন তা নয়। আসলে চয়ন তো বন্ধুত্ব গড়েই তুলতে পারে না আজকাল, হীনশ্রুততা ভোগে বলে। কিন্তু মানুষকে সে খুব লক্ষ করে। তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ছাড়াও তার আর যেসব খামতি বা বাড়তি, ষ্টিটিনাটি সব কিছু। লোকে বুঝতেই পারে না, চয়নের চোখে গোয়েন্দার পর্যবেক্ষণ আছে।

ট্যাক্সিতে বসে আশিস বলল, চাকরি পেলে করবেন ?

এখনই। হাতে আছে ?

আরে না। বলে হাসল আশিস, চাকরি কি হাতে থাকে নাকি ? তবে আমি শেয়ারের ব্রোকার তো, বিজনেসম্যানদের চিনি। আমারই খন্দের সব। এদের কারও কোম্পানিতে হয়ে যেতে পারে। তবে কিনা মাইনে খুব কম, খাটুনি বেদম। আসলে দেশে এত বেকার আর এই বাঙালি ছেলেগুলো চাকরি ছাড়া আর কিছু করতে চায় না বলে, এইসব লোকেরা সুযোগটা নেয়। তিনশো চারশো টাকায় বারো ঘণ্টা খাটিয়ে নিচ্ছে।

চয়ন মলিন মুখে বলে, জানি। আমি ওরকম পেরে উঠবো না।

চাকরির বাজার খারাপ। তবু আপনার বায়ো-ডাটাটা আজ লিখে দেবেন তো আমাকে।

চয়ন বলল, আপনি আমার জন্য অনেক কিছু করছেন। আমি তো কিছুই প্রতিদান দিতে পারছি না।

আপনি মশাই, খুব খারাপ লোক।

তাই বুঝি ?

খারাপ ছাড়া কী! এখনও দূরত্বটাই ঘোচাতে পারলেন না। এইসব ছোটোখাটো পরিচয়গুলোকে উপেক্ষা করবেন না। এভাবেই ঘনিষ্ঠতা বাড়ে, ভাব ভালবাসা আসে, আর এ থেকেই জাতীয় সংহতি। বুঝলেন ?

বলেই আশিস হেসে ফেলল।

চয়ন সহজে কারও সঙ্গে ঠাট্টা রসিকতা করে না। কিন্তু এই সহজ লোকটাকে সে বলে ফেলল, আপনিও খারাপ লোক। আমাকে চা ওমলেটের দাম দিতে দেননি।

হবে হবে, বিস্তর চা ওমলেট খাওয়া যাবে। খাওয়ার এই তো শুরু।

যাদবপুরের একটু ভিতরদিকে কলোনির মধ্যে আশিস বর্ধনের দোতলা বাড়ি। একটু জমি আছে সামনে আর পিছনে। মেলা গাছ। যেটুকু জমি পেয়েছে ঘন বুনটে গাছগাছালি লাগিয়েছে। ফলস্ত কুমড়া, লঙ্কা, ট্যাঁড়স দেখতে পেল চয়ন। আরও আছে।

বাড়িতে ঢোকান আগে বর্ধন তাকে বাগানটা দেখাল, এই এরাই আমার প্রাণ। এইসব গাছপালা, জীবনে এই একটাই আমার হবি, নিজের লাগানো গাছের সবজি বা ফল খাওয়া, নিজের গাছের ফুল দিয়ে ঠাকুরপুজো করা। জমি থাকলে আরও কত কী করতাম! আসুন ভিতরে।

একজন এপিলেপটিকের সঙ্গে আর একজন এপিলেপটিকের পরিচয় কি অন্যরকম কিছু ঘটনা? কোনও টেলিপ্যাথি হয়? বা বিশেষ ধরনের সমবেদনা? কে জানে কী! তবে আশিসের হাঁকডাকে যখন জনা তিনেক মহিলা আর দুটো বাচ্চা এসে বৈঠকখানায় জড়ো হল তখন লজ্জায় নতমুখ চয়নও টের পেল, তাকে সবচেয়ে নিবিড় ভাবে লক্ষ্য করছে যে মেয়েটি, সে হল আশিসের ওই এপিলেপটিক বোন, রোগা দাঁত-উচু ফ্যাকাশে মেয়েটিকে দেখলেই বোঝা যায়, অসুস্থ। একবারের বেশী তাকায়নি চয়ন। তবু দেখে নিয়েছে, মেয়েটির মাথায় অনেক চুল, আর চোখ দুখানা ভারি টানা টানা।

এরা বেশ ভাল পরিবার। বেশী এটিকেট নেই। ঝুপঝাপ সবাই বসে পড়ল। হই হই করে কথা বলতে লাগল।

চয়নের কথা আসে না। স্থিত মুখে চুপচাপ বসে থাকতেই সে ভালবাসে। একজন এপিলেপটিক কি আর একজন এপিলেপটিককে দেখে ভরসা পায়? জীবনের ওপর বিশ্বাস ফিরে পায়? আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে? এপিলেপটিকরা কি পরস্পরকে আশ্বস্ত এবং আরোগ্যও করে তুলতে পারে! তার কেন যেন সন্দেহ হচ্ছে, নিজের মৃগী রোগী বোনের জন্যই তাকে বাড়িতে এনেছে আশিস। হয়তো তাকে দেখিয়ে বোনের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা।

আশিসের বড় চা আর খাবার করতে গেল। আশিসের মা গেল নাতি আর নাতনি সামলাতে? আশিস গেল বাথরুম। রইল শুধু মেয়েটি।

আমার নাম রাকা। আপনার কথা দাদা খুব বলে।

বলার মতো কী? আজ তো দ্বিতীয় দিনের পরিচয় মাত্র।

কী জানি কেন বলে! ওর আবার যাকে ভাল লাগে, তাকে এক মিনিটেই লাগে।

ওঁর সঙ্গে একদিনের মাত্র আলাপ, তাও আমার পক্ষে লজ্জাজনক পরিস্থিতিতে। আমি রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম।

দাদা সব বলেছে। আমারও তো ওরকম হয়। ইকুলে কলেজে ক্লাস করতে করতে কতবার হয়েছে। একবার রাস্তায় আর একবার ট্রামেও হয়েছিল। দাদা কিন্তু তা বলে আমাকে বেরোতে বারণ করে না। বরং বলে, না বেরোলে কনফিডেন্স থাকবে না। ওর ভীষণ কনফিডেন্স জানেন তো!

জানলাম। উনি আমাকে আজ একটা মাদুলি দিয়ে আসতে গিয়েছিলেন।

মেয়েটি হাসল, তাও জানি। ও এমনিতে ভীষণ নাস্তিক, কিন্তু অসুখ-বিসুখের বেলায় কিছুই ছাড়ে না, সব বাজিয়ে দেখে। আপনি মাদুলীটা ধারণ করবেন কিন্তু। আমার মনে হচ্ছে একটু কাজ হয়েছে।

করব। তবে গত একমাস আমার অ্যাটাক হয়নি। একজন বড় হোমিওপ্যাথকে দেখাচ্ছি। বোধ হয় কাজ হচ্ছে তাতেও।

দুজনেই দুজনের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ নীরবে। তারপর দুজনেই একসঙ্গে হেসে ফেলল।

রাকা বলল, আসলে কিসে যে সত্যিকারের কাজ হবে কে জানে! ফ্রিকোয়েন্সিটা কমলেই যেন হাতে চাঁদ পাই! তাই না বলুন!

চয়ন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তা তো ঠিকই। কিন্তু যখন যখন দীর্ঘ দিন গ্যাপ যায় তখন ভীষণ টেনশন শুরু হয়, এই বুঝি হবে! এই বুঝি হবে!

উঃ, আপনার সঙ্গে আমার দারুন মিল! আমারও ঠিক এরকমই হয়।

বিকেলটা হাসিতে গল্পে বেশ কেটে গেল চয়নের। অনেকদিন বাদে কিছুটা সময় এমন ভাল কাটল তার। আশিস তাকে বাসরাস্তা অবধি এগিয়ে দিয়ে বলল, দেখলেন তো, এসে ঠকেননি! এ যুগে চটপট বন্ধুত্ব করে নেওয়া ভাল, নইলে ভ্যানচাড়াই আয়ুষ্কয় হয়ে যায়। চলে আসবেন যখন তখন, অলওয়েজ ওয়েলকাম।

অটোমেটিক লিফটে মোহিনীদের সাততলায় ফ্ল্যাটে উঠবার সময় মনে মনে একটা ভারি উচ্চকোটির ভাব হচ্ছিল তার। মনটাও যেন লিফটে করে অনেক ওপরে উঠে বসে আছে আজ। নামতে চাইছে না।

চার বা পাঁচ তলায় কেউ লিফটটা থামাল। চয়ন চোখ বুজে তার আনন্দিত অভ্যন্তরটাকে অনুভব করার চেষ্টা করছিল। লিফটটা থামতেই চোখ খুলল। কিন্তু তাকে আপাদমস্তক শিহরিত করে চোখে ঘনিয়ে আছে কুয়াশা। একটা ট্রেনের শব্দ এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা থরথর করে কাঁপছে।

না, আজ কিছুতেই অজ্ঞান হওয়া চলবে না তার। কিছুতেই না। যেমন করেই হোক তাকে আজ জেগে থাকতেই হবে। দরজাটা খুলতেই তাই সে কুয়াশায় আবছা চোখেই দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কেউ উঠছিল, তাকে একটা ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে এল সে করিডোরে। তারপর সিঁড়ি ধরে ছুটতে ছুটতে উঠতে লাগল সে, না আমার কিছু হয়নি! কিছু হয়নি! আমি ভাল আছি!..... ভাল আছি.....

একটা ল্যান্ডিং অবধি উঠতে পেরেছিল সে। তারপর দড়াম করে পড়ল। সিঁড়ি দিয়ে খানিক গড়িয়ে, তারপর টেরচা হয়ে রেলিং-এ লেগে স্থির হল তার শরীর। ওইভাবেই পড়ে রইল। প্রায় পনেরো মিনিট বাদে তাকে আবিষ্কার করলেন মিসেস মেহতা। তিনি খবর দেওয়াতে, মোহিনী আর রিয়া নেমে এল।

॥ ১৮ ॥

বীণাপাণির বিপদের কথা কেউ জানে না। কেউ না। কত বড় বিপদ নিয়ে যে সে বাস করছে আজকাল। সবসময়ে বুক এত টিবিটিব করে যে, বুকের ব্যামো না দাঁড়িয়ে যায়। সে ভাল করে ঘুমোতে পারে না, খেতে পারে না। মনটায় সবসময় অশান্তি। আজকাল রিহাসালে তার পাটও ভুল হয়।

সেদিন এক চুলের জন্য বেঁচে গেছে বীণাপাণি। শেষ রাগ্তির যখন কাকা তার স্বাগলার কয়েকজন সাকরেন দিয়ে এসে হাজির হল সেদিনই হয়ে গিয়েছিল বীণার। ভয়ে সে দরজা খুলবে কি, নিমাইয়ের হাত শক্ত করে চেপে ধরে বলে ফেলেছিল, আমার বড্ড ভয় করছে!

নিমাই অবাক হয়ে বলল, ভয়ের কী ও তো কাকার গলা।

তবু করছে। তুমি দরজা খুলো না।

নিমাই ডবল অবাক হয়ে বলে, খুবো না! বেলো কী? কাকা আমাদের অনুদাতা, কোন বিপদে পড়ে এসেছে, দরজা না খুললে কি হয়? বলে নিমাই সাড়া দিয়ে বলল, কাকা নাকি? এই খুলছি।

দরজার শব্দ বন্ধ হল।

নিমাই যখন মশারি তুলে বেরোচ্ছে, তখন বীণাও চৌকির অন্য পাশ দিয়ে নামল। তারপর নিচু হয়ে চৌকির তলা থেকে কাপড়ে বাঁধা একটা পুঁটলি টেনে পট করে পিছনের জানালা গলিয়ে কচুবনে ফেলে দিল।

কাজটা ভেবেচিন্তে করেনি বীণা। তবে খুব বিবেচনার কাজই হয়েছিল।

নিমাই দরজা খুলতেই কাকা বলল, কিছু মনে কোরো না ভাই, আমরা বড় জরুরি কাজে এসেছি। বীণাকে ডাকো। বীণার বুকের টিবিটিব সেই থেকে শুরু। সে ঘুমকাতুরে মুখ নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল, কী কাকা? এত সকালে কী ব্যাপার গো? কোনও বিপদ নাকি?

কাকা গম্ভীর মুখে বলল, কিছু লুকিও না। পগা কি তোমার কাছে মাঝে মাঝে বিদেশী টাকা রেখে যেত?

বীণা একটু হাঁ করে চেয়ে বলল, বিদেশী টাকা? তা কি করে বলব? মাঝে মাঝে একটা প্যাকেটমতো কি যেন রাখতে দিত। খুলে তো দেখিনি। হেরোইন-টেরোইন ভেবে ভয়ে আধকানা হয়ে থেকেছি।

পগা যে রাতে মারা যায় সে রাতের কথা মনে করে দেখ তো!

মনে করার কি আছে?

সেই রাতে কিছু রেখে গিয়েছিল তোমার কাছে?

না তো! তার এক মাস আগে থেকেই তার সঙ্গে দেখা নেই।

ভাল করে ভেবে দেখ। ব্যাপারটা কিন্তু খুব সিরিয়াস।

বীণা মাথা নেড়ে বলে, ভাববার কিছু নেই। আমার স্বরণশক্তি খুব ভাল। তবে সে কিছু আরও দু-একজনের কাছেও প্যাকেট রাখত।

সব জানি। লক্ষ্মী আর সনাতন। তাদের কাছেও খোঁজ নিতে হবে। একটা কথা বলি, রাগ করতে পারবে না।

আবার কি কথা?

তোমার কথা আমি বিশ্বাস করছি। তবু তোমার ঘরখানা আমরা সার্চ করব। আমরা সিওর হতে চাই।

বীণার ঘর ছোটো, আসবাবপত্রও নেই। সার্চ করতে দশ মিনিটও লাগল না। কচুবন বা বাড়ির আদাড়-পাঁদাড় খোঁজার মতো ধৈর্য এদের নেই।

কিছু না পেয়ে কাকা যেন খুশিই হল। বীণাকে বলল, বাঁচালে! তোমার ঘরে চোরাই ডলার পাওয়া গেলে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যেত।

বীণা খুব অবাক হওয়ার ভান করে বলে, ওমা গো! পাওয়া গেলেই বা মাথা কেন কাটা যেত তোমার? আমি কি ছাই জানতুম যে, কী আছে ওই প্যাকেটে?

তা ঠিক। আমার বড় বিপদ যাচ্ছে বীণা, মাথাটা ঠিক নেই। নন্দী আর রহমান পালিয়ে গেছে। তাদেরও ধরতে পারছি না। খুনের দায়ে ওদের নামে বোধহয় হলিয়া বেরোবে। আচ্ছা, ঘুমোও। যাই।

নিমাই ব্যাপারটা জানতে ওদের সঙ্গে একটু এগোলো। বীণা সেই ফাঁকে পুঁটলিটা কুড়িয়ে এনে বাস্তবন্দী করল। সুযোগমত ঘটটিতে পুরে সরা চাপা দিয়ে মাটির মধ্যে পুঁতে রাখতে হবে। থাক কিছুদিন। লোকে যখন সব ভুলে যাবে তখন বের করে অল্পে অল্পে বেচে দিলেই হবে।

কিন্তু ভয়ও একটা ছিল। বাজারে লটারির টিকিট বিক্রির ষ্টল আছে পল্টু নামে একটা ছেলের। বিশ্ববিজয় অপেরার লাইটমিশ্রির ভাই। তার কাছে দু'দফায় মোট পঞ্চাশ ডলার ভাঙিয়ে বেশ কিছু টাকা পেয়েছিল বীণা। সুতরাং তার কাছে যে ডলার আছে তা পল্টু জানে। বীণা অবশ্য বুদ্ধি করে বলেছিল তার বড়না কৃষ্ণজীবন বছরে দু-তিনবার বিদেশে যায়, মস্ত

মানুষ, সেই দাদাই তাকে ডলার দিয়েছে। কথাটা অবিশ্বাসের নয় হয়তো, কিন্তু তবু মানুষকে বিশ্বাস কি? পল্টু যদি বলে দেয় তা হলে কী হবে তা ভাবতেই পারে না বীণাপাণি। কাকা এমনিতে ভাল কিন্তু বেইমানি দেখলে কি করে কে জানে। পল্টুকে বলতে বারণ করতে গেলেও বিপদ আছে, তাতে সন্দেহ বাড়বে।

বীণাপাণি ভয় পেয়ে গেল। খুব ভয়।

কাকাকে এগিয়ে দিয়ে এসে নিমাই গম্ভীর মুখে বলল, হল তো! ওইসব আজবাজে লোককে প্রশ্রয় দিয়ে কিরকম ঝগড়াট হচ্ছে!

বীণাপাণি তার পুরুষটার দিকে চেয়ে রইল। কপাল এমনি যে, জুটল এক ল্যাংটো সাধু। চালচুলো নেই, কিন্তু পাপ-তাপের নামে একেবারে মূর্খা যায়। এ যদি ডলারের খবর জানতে পারে তা হলে এখনই পাপের ভয়ে বীণাকে ছেড়ে লম্বা দেবে। এর কাছে বুদ্ধি, পরামর্শ চেয়ে লাভ নেই। বরং নিজের পাপ নিজেই বইবে বীণা। সেই ভাল।

বীণা মৃদুস্বরে বলে, কিসের ঝগড়া? আমরা তো কিছু করিনি।

করিনি, কিন্তু সকালের বাসটা তো ফেল হয়ে গেল। বিটুপুরের বাস ফের সেই দুপুরে।

থাকগে, আর গিয়ে কাজ নেই। তুমি বরং বাজার-টাজার করে আনো, আমি ঘরের কাজ সারি।

যাবে না!

আজ নয়। একটা বাধা যখন পড়েইছে তখন দু'দিন পরেই যাবোখন।

নিমাই একটু ভেবে বলল, সেটা ভাল হবে। হঠাৎ করে চলে গেলে সন্দেহ বাড়ত হয়তো।

বীণা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। নিমাইকে বাজারের রওনা করে দিয়ে সে চারদিকটা ভাল করে দেখে নিল। তার বাড়ির আশেপাশে বসতি নেই বললেই হয়। জংলা জায়গা, উঠোন ঘেঁষে চাষের জমি, ঝোপজঙ্গল। বীণা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। ঘরের ভিটের এক জায়গায় একটা ইঁদুরের গর্ত আছে। সেটাই খুঁড়ে ফেলল। একটা মা-ইঁদুর কিচমিচ করতে করতে পালাল। কয়েকটা বাচ্চা লালচে রঙের কৃষি ইঁদুর জড়ামড়ি করে পড়েছিল। বীণা মায়া করল না। তুলে বাইরে ফেলে দিল। কাক নিয়ে যাবে।

পাপ হল? তা হোক। ওই ইঁদুরগুলো বড় হয়ে কি মানুষের কম সর্বনাশ করত? পাপের বিচার করে বীণার কাজ নেই। এ সংসারে দুটো মানুষের মধ্যে একটা পাপী, আর একটা সাধু। কিন্তু পাপীটাই সংসার চালায়, আর সাধুটার এক পয়সারও মুরাদ নেই।

গর্তটা বুজিয়ে দিয়ে ওপরটা দুরন্ত করে পুরো ঘরটাই গোবরমাটি দিয়ে লেপে ফেলল বীণাপাণি। গর্তের গহীনে রইল মাটির ঘটের ভিতরে ডলার আর পাউন্ডের প্যাকেট। ওপরে কাঠের তক্তা বসিয়ে তার ওপর চাল রাখার মাটির জালাটা বসিয়ে দিল সে। যতদূর সম্ভব নিখুঁত হল বটে কাজটা, কিন্তু ভয়টা রয়েই গেল।

সেই থেকে বীণাপাণির মনে শান্তি নেই। সবচেয়ে বড় অশান্তির কারণ হয়ে রইল পল্টু। যদি বলে দেয়? কিংবা যদি ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করে?

কয়েকদিন অপেক্ষা করল বীণাপাণি। তারপর একদিন নিজেই সন্কে রিহার্সালের পর বাজারের দিকে গেল। দু-চারটে জিনিস কিনল। তারপর যেন এমনিতেই এসে পড়েছে এমন ভাব দেখিয়ে পল্টুর স্টলটার সামনে দাঁড়াল।

এই পল্টু, ভুটান লটারিতে নাকি অনেক প্রাইজ দিচ্ছে?

হাজাকের আলোয় পল্টু বসে একটা বইগোছের কিছু পড়ছিল। লোকজন নেই। মুখ তুলে হাসল, হ্যাঁ। এবার ফার্স্ট প্রাইজ এক কোটি। নেবে নাকি টিকিট?

দূর! আমার লটারির কপাল নেই। শুধু পয়সা নষ্ট।

বহু লোকের পয়সা দিয়েই তো দু-চারজন লাখোপতি কোটিপতি হয়।

পল্টু বেশ ছেলে। বাইশ-তেইশ বছর বয়স, পাতলা ছিপিছিপে চেহারা, রংটা ফর্সা, ওর মিস্ত্রী দাদার মতো নয়। চোখে-মুখে লেখাপড়ার ছাপ আছে।

বীণার বুক দুঃস্বপ্নের করছে তবু। কথা ঝুঁজে পাচ্ছে না। পল্টু কিন্তু সন্দেহ করছে কি না তাও বুঝতে পারছে না। বুকের এই টিবিটবিনি নিয়ে কি বেঁচে থাকা যায়?

বীণা একটু উদাস গলায় রলে, কোটি টাকা প্রাইজ হলে টিকিটেরও তো দাম অনেক।

হ্যাঁ। একশো টাকা করে।

না ভাই, আমাকে বরং একটা লাখ টাকার প্রাইজের টিকিট দে। কেটে দেখি।

আগে তো খুব লটারির টিকিট কিনতে, আজকাল কেনো না তো!

কেটে কেটে হন্দ হয়ে ছেড়েছি।

পল্টু তার পেতে রাখা টিকিটের সারি থেকে বেছে একখানা দিয়ে বলল, এটা পাঁচ টাকার টিকিট। কাল খেলা। ফার্স্ট প্রাইজ পাঁচ লাখ টাকা।

পাঁচটা টাকা জলে গেল। তবু নিল বীণা। পল্টু বোধহয় ডলারের কথা ভুলে গেছে। জয় মা কালী! ওর যেন ব্যাপারটা একদম মুছে যায় মাথা থেকে। কী বোকামির কাজই যে হয়েছিল বনগাঁয়ে ডলার ভাঙানো।

পল্টু বীণার পাঁচটা টাকা নিয়ে আবার বইটা খুলতে যাচ্ছে, বীণাও চলে আসার জন্য পা বাড়িয়েছে, হঠাৎ পল্টু একটু চাপা গলায় বলল, ডলার আর কত আছে?

বীণা এমন চমকে উঠল যে স্বপ্নিও আর একটু হলেই থেমে যেত। সে ফ্যাকাসে মুখে বলল, কিসের ডলার?

পল্টু তেমনি চাপা গলায় বলে, থাকলে দিও। ন্যায্য দাম পাবে। কেউ জানতে পারবে না।

অভিনয় ছাড়া বীণা আর কি পারে? কিন্তু মাঝে মাঝে অভিনয় করার কথা ভুল হয়ে যায়। বিশেষ করে বিপদে পড়লে। কয়েক লহমার ভুল শুধরে নিল বীণা। একটু মিষ্টি করে হেসে বলল, দূর পাগলা! ডলার কোথায় পাবে? বড়দার

সঙ্গে কি আর দেখা হয় নাকি আমার ? সেই একবার দেখা, বিয়ে বাবদ আশীর্বাদ দেওয়া হয়নি, পঞ্চাশ ডলার দিয়ে বলেছিল, ভাঙিয়ে কিনে নিস কিছু । মানিব্যাগে টাকা তখন ছিল না ডলার ছিল । সদ্য বিলেত থেকে ফিরেছে তখন ।

ভায়ালগ যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল বীণা ।

পল্টু বিশ্বাস করল কি না মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই । বলল, তোমার বড়দার কথা খুব তনি । খুব নামকরা লোক নাকি ? কার কাছে শুনিস ? বড়দা তো আর নেতা নয় ।

শুন নিমাইদার কাছে । মাঝে মাঝে নিমাইদা এসে আড্ডা দিয়ে যায় । তার মুখেই শুনেছি, তোমার বড়দা সাংঘাতিক লোক ।

বীণা মলিন মুখে বলে, হ্যাঁ ।

তা হলে তোমার এইখানে পচে মরার দরকার কি ? বড়দাকে বললে নিমাইদার একটা কাজও তো হয়ে যায় বোধহয় । কে বলবে বাবা! আর তোর নিমাইদারই বা কোন বিদ্যে আছে ?

আর কিছু না হোক, নিমাইদা তো বিশ্বাসী লোক ।

ওইটুকুই ।

ওটা কি কিছু কম হল ? আজকাল বিশ্বাসী মানুষ কোথায় পাবে ?

এটা যে কলিকাল তা জানিস ? এখন যত পাঞ্জি লোক তত তার কদর ।

পল্টু একটু হাসল । তারপর বলল, ঠিক আছে, বড়দার কাছ থেকে ফের যদি ডলার পাও তো দিও ।

তুই ডলার নিয়ে কী করিস ?

পল্টু মৃদু মৃদু হাসছিল । বলল, যা সবাই করে । খন্দের আছে গো । ডলার এখন দুনিয়াটাকে চালাচ্ছে ।

বীণা এবার হঠাৎ খুব দুঃসাহসী একটা কাজ করে বসল । ভাবল, সন্দেহভঞ্জন করার এর চেয়ে বড় সুযোগ আর আসবে না । যা হওয়ার হবে । সে বুক ঠুকে বলল, ডলার নিয়ে যা কাও হয়ে গেল! ও বাবা, ওই নাম শুনেই ভয় করে ।

কী কাও ?

কেন, পগা খুন হল না ?

পল্টু মাথা নেড়ে বলে, সেটা মোটেই ডলারের জন্য নয় । ওদের জুয়ার আড্ডার পুরনো কাজিয়া । খুনটা আমার সামনেই হয়, ওই বটতলায় । দোকান বন্ধ করে বাড়ি যাওয়ার আগে আমরা তিন বন্ধু বনমালীর দোকানে চা খাচ্ছিলাম ।

দেখেছিল ?

স্পষ্ট । তবে খুনিয়াদের নাম-টাম জানতে চেও না । ওসব বলতে পারব না ।

না বাবা, জানতে চাইও না । তবে মাঝে মাঝে পগা আমার কাছে একটা প্যাকেট রেখে আসত । তাতে কী থাকত কে জানে বাবা! ভয়ে তো কখনও খুলে দেখিনি । এখন শুনেছি তাতে নাকি ডলার থাকত । তাই নিয়ে কত হান্সামা, ঘর সার্চ হয়ে গেল ।

তাই নাকি ?

যা ভয় পেয়েছিলাম!

পল্টু হঠাৎ কেমন একটা গলায় বলল, তোমার কাছে ছিল না বুঝি ?

আবার চমৎকার ভালমানুষের পার্ট করে গেল বীণা, কোথা থেকে থাকবে ? তার এক মাস আগে থেকেই যে পগার সঙ্গে দেখা নেই ।

পগা আমার খুব দোস্ত ছিল, জানো বীণাদি! যেদিন খুন হল সেদিনও সন্দের পর কিছুক্ষণ আড্ডা মেরেছিল আমার দোকানে এসে । টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল বলে বেশিক্ষণ কথা হয়নি । তারপর খুব ঝমঝম করে নামল । আমি দোকান শুটিয়ে ফেলেছিলাম । চায়ের দোকানে গিয়ে আড্ডা দিতে লাগলাম, আর পগা গেল জুয়ার আড্ডায় ।

বীণার বুকে তোলপাড় হচ্ছে । পগা কি ওকে কিছু বলেছিল ? বলেছিল কি যে, বীণার বাড়ি গিয়েছিল ? বীণার গলা যেন আটকে আসতে চাইছে । তবু অভিনয়ের জোরে পেরিয়ে যেতে চাইল বিপদটা, ইন্স! যদি তোর সঙ্গে থাকত তা হলে হয়তো বেঁচে যেত!

পল্টু মাথা নেড়ে বলে, বাঁচত না । হয়তো সেদিন বেঁচে যেত, পরদিন মরত । ওকে দেগে রেখেছিল যে । তোমার সঙ্গে ওর কেমন ভাব ছিল ?

ভাব! ভাব আবার কি ? কী যে বলিস! মাঝে মাঝে যেত, চেনাজানা ছিল । সে তো কত লোকের সঙ্গে আছে ।

পল্টু একটু বিরস মুখে বলল, সে দিন অনেক ডলার ছিল ওর কাছে ।

কাঁপা বুকে বীণা বলে, কি করে জানলি ?

কি করে আবার! ওই বলছিল ।

বীণার চোখের সামনে একটা পর্দা নেমে এল যেন । আর অভিনয় করে কী হবে ? পল্টু বোধহয় সব জানে ।

কিন্তু সম্পূর্ণ বেহাল মাথা নিয়েও বীণা অভিনয় করে যেতে ছাড়ল না, আর বলিস না । এখন ডলার শুনেই আমার ভয় করে ।

পল্টু হাসল । কেমন যেন হাসিটা ।

বীণার বুকের কাঁপন রয়ে গেল । ঘুম হতে চায় না । খেতে বসলে ভিতরটা কেমন যেন ঘুলিয়ে ওঠে । অশ্বলের অসুখ তো ছিলই । সেটা যেন বাড়ল ।

পরদিন রাতে পাশাপাশি শুয়ে একটু সোহাগের ভাব করল নিমাইয়ের সঙ্গে । তারপর বলল, জানো, আমি একটা লটারির টিকিট কিনেছি!

তাই নাকি ? ও কিসে কী হয় ?

যদি ফার্স্ট প্রাইজটা পেয়ে যাই তো হলে ?

নিমাই বলে, ওই লোভানিই তো মানুষকে দিয়ে কত অকাজ করিয়ে নিচ্ছে।

আহা, আমি বুঝি লোভী ?

আমরা সবাই কম-বেশি লোভী। সে কথা বলছি না। কেটেছো বেশ করেছে। তবে প্রাইজের আশায় বসে থেকো না।

পল্টু বলল তাই কিনলাম। আচ্ছা, পল্টু ছেলেরা কেমন বলো তো!

কেন, ভালই।

কতটা ভাল ?

নিমাই হাই তুলে বলে, ওই যে রকম হয় আর কি! ভাল থাকতে চায়, পারে না। চারদিকে নানা লোভানি তো।

তোমার সঙ্গে খুব ভাব বুঝি ?

আছে একটু।

কিছু বলে-টলে তোমাকে ?

অবাক হয়ে নিমাই বলে, কী বলবে ? কিসের কথা বলছো ?

এই আমাদের কথা-উথা!

তা কত কথা হয়। সব আগড়ম-বাগড়ম কথা। এক-এক দিন এক-একটা বিষয় উঠে পড়ে। তাই নিয়ে খানিক কথা হয়।

লটারির টিকিট ছাড়া ওর আর কিসের ব্যবসা ?

নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, চোরাই কারবার আছে। যখন যেটা পারে করে। লটারির টিকিটে আর ক'পয়সা হয় ?

হয় না ?

হয়ও। মাঝে মাঝে এক-আধটা প্রাইজও লেগে যায়। সে কদাচিৎ। আজকাল লটারিওয়ালাও তো বড় কম নেই।

আচ্ছা আমরা যদি একটা কাজ করি তা হলে কেমন হয় ?

কি কাজ ?

ধরো যদি বনগা ছেড়ে চলে যাই অন্য কোথাও ?

কোথায় যাবে ? পালপাড়া নাকি ? না বিষ্ণুপুর ?

যদি ধরো তাই যাই ? একেবারে ?

সে কী! এখানকাল বাস তুলে দিতে চাও ?

কেন, এখানে আমাদের কে আছে ?

তোমার যাত্রার দল, তোমার নিজের বাড়ি, এসব কষ্ট করে করলে সে কি ছেড়ে যাওয়ার জন্য ?

আমার যে ভাল লাগছে না।

দূর পাগল! বলে নিমাই হাসে, আমাদের কি এত খামখেয়ালি করলে চলে ?

বীণা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, তা হলে চলো, কোথা থেকে ঘুরে আসি।

কোথায় যাবে ?

কাশী বৃন্দাবন নয় গো, কলকাতা যাবো।

কলকাতা! তা যেতে পারো। উঠবে কোথায় ?

উঠব না। সকালে যাবো, বিকেলে চলে আসবো।

তা যেতে পারা যায়।

একটু বড়দার সঙ্গে দেখা করে আসব।

নিমাই একটু চুপ করে থেকে বলে, সে তো মস্ত কথা। শুনেছি কৃষ্ণজীবনবাবু এখন মস্ত লোক, সাততলায় ফ্ল্যাট।

ঠিকানা আছে।

সে তো আছে। চিনতে চাইবে কি ?

মায়ের পেটের বোনকে চিনবে না ?

হয়তো চিনবে। সে চেনার কথা বলছি না। বলছি পাত্তা দেবে কি না। একে তো অবস্থার তফাত, তার ওপর তোমরা সব ঝগড়া করে তাড়িয়েছিলে লোকটাকে।

সংসারে ওরকম কত হয়। আবার জোড়াও লাগে সম্পর্ক।

এটা লাগবে কি না কে জানে!

আমার দাদা কিন্তু মানুষটা বড় ভাল। অপমান আমিও করেছি বটে সে বউদির জন্য। বউদি আমাদের এখন ছোটো নজরে দেখত।

এখনও কি তাই দেখবে না ?

দাদা দেখবে না। দাদাকে আমি চিনি।

তা হলে যাই চলো একদিন, মানুষটাকে একবার দেখেছিলাম অনেক আগে। কাছ থেকে দেখে একটু পেন্নাম করে আসব। তুমি যে অত বড় একটা মানুষের বোন তা ভাবলে আমার গায়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে যায়।

বীণা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, অত বড় মানুষ, তায় আপনজন, তবু আমাদের কপালে তাকে আর রাখতে পারলুম কই নিজের জন হিসেবে! ওই রাফুসীই তো গাপ করে নিল!

আহা ওরকম বলতে নেই। সব দিক বিবেচনা করতে হয়। তোমার বউদিও তো আবার লেখাপড়া জানা মেয়ে।

ছাই!

দিন চারেক বাদে তারা সত্যিই গিয়েছিল কলকাতায়। মাটি খুঁড়ে ডলারের বাড়িল বের করে হাতব্যাগে লুকিয়ে নিয়ে গিয়েছিল বীণাপাণি। তার ইচ্ছে ছিল বড়দাকে ডলারগুলো দেবে। বলবে, তুই বিদেশে যাস, তোর কাজে লাগবে। এর বদলে আমাকে টাকা দে।

দাদা নিরাপদ মানুষ।

ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে তারা যখন পৌছলো তখন বিকেল। লিফটে উঠতে ভরসাই হল না তাদের। এ যন্ত্র তারা চালাতে জানে না। দু'জনে সাততলায় উঠল হেঁটে, ঘেমে, হাপসে। ডোরবেলটা অবশ্য বাজাল, তবে ভয়ে ভয়ে।

বীণা যথাসাধ্য সেজে এসেছে, যথেষ্ট ফিটফাট করে এনেছে নিমাইকেও। তবু দরজা খুলে যে সুন্দরপানা মেয়েটা উঁকি দিলে সে যেন খুব অবাক হয়ে দেখল তাদের।

কাকে চাই?

কৃষ্ণজীবনবাবু কি আছেন? বীণা বলল। এই কি তার সেই ভাইমি? চেনেও না তো বীণা।

বাবা! বাবা তো ইংল্যান্ডে।

বীণার প্রায় বসে পড়ার মতো অবস্থা। দাদা না থাকলে তো এ বাড়িতে তার কোনও অভ্যর্থনাই নেই।

বীণা মলিন হেসে বলল, তুমি বুঝি মোহিনী?

হ্যাঁ। আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

বনগাঁ। আমি তোমার পিসি হই। ছোটো পিসি।

পিসি? মাই গড! তা হলে আসুন ভিতরে, মাকে ডাকছি।

ব্যস্ত হলো না। আমরা বেশিক্ষণ থাকব না। বিকেলের গাড়ি ধরে ফিরে যাবো।

আসুন তো ভিতরে। মা আছে।

রিয়া ছিল। ওদের সাজানো গোছানো মন্ত লিভিং রুম উজ্জ্বলের মতো কিছুক্ষণ বসে থাকার পর রিয়া এল।

কে, তুমি বীণাপাণি না?

হ্যাঁ বউদি। বলে দু'জনে উঠে প্রণাম করল।

রিয়া যে খুব অপ্রসন্ন হয় তা নয়। তবে একটু আলগোছ ভাব। বলল, ও তো নেই।

শুনলাম। আমরা এমনি দেখা করতে এসেছিলাম। তোমরা ভাল তো!

ভালই।

দু-চারটে কথাবার্তা, চা আর সন্দেশ খাওয়ার পর বাইরের লোকের মতোই চলে এল তারা। আর ফেরত এল সব দৃষ্টান্তের আকর সেই ডলার বাড়িলও।

॥ ১৯ ॥

ওয়াজ দেয়ার এনি সার্জারি অন মাই হার্ট, সিস্টার?

সার্জারি? ওঃ নো স্যার, দেয়ার ওয়াজ নো ওপেন হার্ট সার্জারি। ওনলি মেডিসিনস্।

আই ফিল এ সর্ট অফ নাশ্বেনেস ইন মাই হার্ট। ইজ দ্যাট ও. কে?

ইউ আর নাই ও. কে স্যার।

মণীশ কিছু অবিশ্বাসের চোখে পবিত্র সাদা পোশাক পরা তরুণী নার্সটিকে দেখছিল। কেরলের মেয়ে। খ্রীষ্টান, কালো, হাস্যময়ী। ব্রেকফাস্টের ভুজাবশেষ ট্রে শুছিয়ে নিচ্ছে। ডানদিকের পর্দাটা সরানো। আজও মেঘলা বিষণ্ণ আকাশ। গোমড়া ভোর। মণীশের দিন কি ভাবে কাটছে কে তার হিসেব রেখেছে? গুনতির দিন একরকম। কিন্তু ব্যথার দিনগুলি? সংজ্ঞাহীনতার দিনগুলি? দৃষ্টান্তের দিনগুলি? সব কি একরকম? ব্যাথাতুর দিন সবচেয়ে ধীরে কাটে। কাটতেই চায় না। এক একটা সেকেন্ড যেন একটি একটি ঘন্টা। এক একটি ঘন্টাই যেন এক একটি দিন বা মাস। আর দিন যেন বছর বা দশক বা কল্লান্ত।

অনেক ঘুমিয়েছে মণীশ। শুধু ঘুম আর ঘুম। জাগলেই ডাক্তার আবার সন্নেই ঘুম পাড়িয়ে দিত। তার ধারণা হয়েছিল, ওইভাবে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেই তার রূপপটে ছুরি চালিয়েছে ডাক্তার।

জ্ঞান ফেরার পর সে অবশ্য ভাল করে খুঁজে দেখেছে, তার বুকে কোন কাটা দাগ নেই। তবে বুকের ভিতরটা অন্যরকম। মাঝে মাঝে ঝিল ধরে থাকে। মনে হয়, হার্ট থেকে আছে। ধুকপুক নেই।

পৃথিবী হারিয়ে গিয়েছিল কয়েকদিনের জন্য। হারিয়ে গিয়েছিল তার প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র-কন্যা। তার বউ। তার চাকরি। তার সুখ-দুঃখ আনন্দ। ওই কটা দিন আর ফিরে পাবে না মণীশ। চিরকালের মতো হারিয়ে রইল।

মে আই হ্যাভ এ নিউজপেপার?

কেরলের মেয়েটি ছোটো করে মাথা নাড়ল, নো স্যার। সরি।

দি ওয়ার্ল্ড ইজ লস্ট টু মি। আই ওয়ান্ট টু বি আপডেটেড।

আক দি ডব্লিউ স্যার, প্রিজ।

থ্যাংক ইউ।

পৃথিবীর কোনও খবরই রাখে না মণীশ। এই দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠাপটে কত কী না জানি ঘটে যাচ্ছে! ঘটে গেছে! অন্তরীণ ঘুমের মধ্যে পৃথিবী কতবার পাশ ফিরল! খবরের কাগজে এমন কী থাকবে, যাতে তার হৃৎপিণ্ড চাপ পড়তে পারে?

মে আই হ্যাড এ বুক?

এনি বুক স্যার? আই ক্যান গিভ ইউ এ বাইবেল। আই হ্যাড ওয়ান উইথ মি।

ইউ ডু ক্যারি এ বাইবেল?

মেয়েটি লাজুক হাসে, আই ডু স্যার।

ইউ আর এ রিলিজিয়াস পারসন!

ইট ইজ এ গুড কম্পানি।

দেন, গিভ ইট টু মি। ইউ উইল ডু।

মেয়েটি ব্রেকফাস্টের ট্রে নিয়ে চলে গেল। ফিরে এল একখানা কালা মলাটের বাইবেল নিয়ে। এরকম বাইবেল বড় বড় হোটেলের ঘরে ড্রয়ারে রেখে দেওয়া হয়। ইচ্ছে করলে যে-কেউ নিয়েও যেতে পারে। বাইবেল চুরি করলেও দোষ হয় না। পৃথিবীময় বাইবেল ছড়িয়ে দেওয়ার এ এক চমৎকার কায়দা।

মণীশ অবসন্ন হাতে বাইবেলখানা বালিশের পাশে রেখে দিল। একটু জল খেল।

মে আই টক নাউ ফ্রিলি?

নট টু মাচ স্যার। ইফ ইউ উইশ, আই মে রীড দি বাইবেল টু ইউ।

বাইবেল ইজ অ্যান ওল্ড বুক। আই ওয়ান্ট সামথিং নিউ। সামথিং মোর আপ-টু-ডেট।

বাইবেল ইজ নেবার ওল্ড স্যার। ইউ ইজ অলওয়েজ নিউ।

অল রাইট। রীড ইট টু মি অ্যানাদার টাইম। ইজ দি সামার ওভার?

নো স্যার। দি মনসুন ইজ দেয়ার। ভেরি হেভী মনসুন।

ডু ইউ নো এনিথিং অ্যাবাউট দি ক্যালকাটা ফুটবল লীগ?

মেয়েটি হাসে, নো স্যার। আই অ্যাম নট স্পোর্টিং এনাফ।

টেল মি হোয়াট হ্যাপেনড ইন দি ওয়ার্ল্ড হোয়েন আই ওয়াজ ইন শ্রিপ।

নাথিং মাচ।

এনি গ্রেট লীডার ডেড অর কিলড?

নো স্যার।

এনি বিগ প্রেন ক্র্যাশ?

নো স্যার।

এনি আর্থকোয়েক?

নো স্যার।

ইউ কেন্ট দি ওয়ার্ল্ড ইন অর্ডার হোয়েন আই ওয়াজ অ্যাম্রিপ?

মেয়েটি খিলখিল করে হাসে, ইউ ওয়াজ ইন অর্ডার।

ওনলি মি আইট অফ অর্ডার?

নট ভেরি মাচ। ইউ হ্যাড এ শ্বল অ্যাটাক।

ইউ আর লাইং। আই হ্যাড এ ম্যাসিভ অ্যাটাক।

নো স্যার।

ডিড আই বিহেভ ওয়েল হোয়েন ইন পেইন?

ইউ ওয়্যার নাইস স্যার।

ওয়াজ আই ইন ডেলিরিয়াম?

নো স্যার।

আই হ্যাড ড্রিমস, ইউ নো। ব্যাড ড্রিমস।

ঘরটার দুটো ভাগ। একটা যেন বেডরুম, অন্যটা যেন বসবার। বসবার ঘরে তাজা ফুল সাজিয়ে রাখা, সোফা সেট পাতা। এয়ারকন্ডিশনড ঘরে কোনও শব্দ নেই। ভারি ঝকঝকে তকতকে। তার শ্রীপিং স্যুটের বুকপকেটে একটা ভারী যন্ত্র রাখা। রিমোট কন্ট্রোলে চকিচকি ঘন্টা ই সি জি হচ্ছে বোধ হয়। কে জানে কী!

চিরকালের অভ্যাস ছিল, সকালে ঘুম থেকে উঠেই সিগারেট ধরানো। তারপর চা। তারপর খবরের কাগজ। তারপর ... দয়ার দান হিসেবে আয়ু ফিরে পাওয়া গেল। কিন্তু কত দিন? কতদিনের এক্সটেনশন? আবার ব্যথা আসবে। অন্ধকার আসবে। হারিয়ে যাবে পৃথিবী। একদিন মণীশ আর এক্সটেনশন পাবে না।

জানালার গায়ে মৃদু টোকার মতো শব্দে চোখ চায় মণীশ। ইস! বৃষ্টি হচ্ছে! ঝাপসা হয়ে গেল কলকাতার আকাশ-রেখা। এই বৃষ্টিতে ভিজিটিং আওয়ার্সে কেউ আসবে কি? বুবকা, ঝুমকি, অনু বা অপর্ণা? সবাই একসঙ্গে আসে না। একে এক, দুইয়ে দুইয়ে আসে। কিন্তু ওদের সবাইকে একসঙ্গে দেখতে বড় ইচ্ছে করে মণীশের।

সিস্টার, ক্যান ইউ টেল মি একজ্যাক্টলি হোয়েন আই উইল বি রিলিজড?

ভেরি সুন স্যার।

আই ওয়ান্ট এ ডেট।

প্লীজ আফ দি ডিস্টার স্যার।

আজ সকালে কে আসবে? ভাবতে ভাবতে চোখ বুজল মণীশ।

অনেকদিন আগে এক মেঘলা দুপুরে এক ক্ষিপ্ত জনতার ওপর পুলিশ লাঠি চার্জ করছিল। এসপ্র্যানেড ইন্সটে। কার্জন পার্কের ফেনসিং-এ উঠে একজন ফ্রি লাস ফটোগ্রাফার দৃশ্যটা তুলছিল। একজন পুলিশ হঠাৎ তেড়ে এল তার দিকে। হাঁটুতে খটাং করে এসে পড়ল লাঠি। ফটোগ্রাফারটি ব্যথায় চিৎকার করে পড়ে গেল, তারপর অন্য পায়ে পুলিশটাকে একটা লাথি কষিয়ে দিল। খুবই সাহসের কাজ। পুলিশটা পিছুলে হাত দিয়েছিল। হয়তো মেরে ফেলত। কিন্তু সেই সময়ে মার-খাওয়া কিছু লোক ছিটকে এল এদিকে। তাদের বেশরোয়া হতচকিত ধাক্কায় পুলিশটা সরে গেল। ফটোগ্রাফারটি উঠে দাঁড়াল। হাঁটুতে সাম্রাতিক ব্যথা, চোখে জল আসছে, ঠিক সেই সময়ে দুটো গুলির আওয়াজ। আর্ড চিৎকার।

সেই দুপুরে পুলিশ ঠিক দু রাউন্ড গুলিই চালিয়েছিল। তাতে চলন্ত ট্রামের মধ্যে বসে-থাকা একটি লোক মারা যায়। ফটোগ্রাফারটি তার জল-ভরা চোখেও দৃশ্যটা দেখতে পেয়েছিল। অন্য ফটোগ্রাফাররা দেখেছিল একটু দেরিতে।

ফটোগ্রাফারটি তার জখম পা নিয়ে কাছ-যেঁষা ট্রামটায় উঠে পড়ল। তখন হুড়োহুড়ি করে যাত্রীরা নেমে যাচ্ছে। আর জখম লোকটা গোড়াচ্ছে, জল! জল! তখনও পড়ে যাননি। তবে রক্তে ভেসে যাচ্ছিল ট্রামগাড়ির সীট, মেঝে। চকাচক দু-তিনটে ফটো তুলে নিল সে। আর দেখতে পেল, লেডীজ সীটে সাদা মুখে একটি মেয়ে বসে আছে। এত ভয় পেয়েছিল যে, পালাতে অবধি পারেনি।

আরে! পালান, পালান! আসুন শিগগির! বলে ফটোগ্রাফার গিয়ে মেয়েটির হাত ধরে টেনে নামিয়ে নিয়েছিল ট্রাম থেকে। বাইরে টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়া, লোকজন পালাচ্ছে, পুলিশ তেড়ে যাচ্ছে যাকে পাচ্ছে সামনে তার দিকে। দমাস দমাস করে লাঠি পড়ছে।

অন্তত তিনজন পুলিশ লাঠি তুলেছিল। সঙ্গে মেয়েটি ছিল বলে বেঁচে গেল ফটোগ্রাফারটি। পুলিশ মেয়ে দেখে মারেনি।

তীব্র টিয়ার গ্যাসে প্রায় অন্ধ চোখে ছুটতে ছুটতে তারা রেড রোডের দিকে চলে যেতে পেরেছিল। কোথায় থাকেন আপনি? মেয়েটি কোনও জবাব দিতে পারেনি। শুধু কাঁপছিল। ভয়ে, অবিশ্বাসে।

নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে গিয়ে মেয়েটাকে ঘাসে বসাল ফটোগ্রাফারটি। জিরোতে দিল। দুজনেরই চোখ ফুলে ঢোল। দুজনেই হাঁফাচ্ছে।

অনেকক্ষণ বাদে মেয়েটি তার ঠিকানা বলতে পারল।

একা যেতে পারবেন?

না। ভীষণ ভয় করছে।

কিন্তু আমাকে যে পত্রিকা-অফিসে যেতে হবে। এই ফটো কাল কাগজে বেরোবে।

মেয়েটা কাঁদছিলও। কিছু বলল না।

ঠিক সেই সময়ে আকাশ ফুঁড়ে বৃষ্টি নেমেছিল। খুব বৃষ্টি। সাম্রাতিক বৃষ্টি।

আরে, ভিজবেন যে! উঠুন! দৌড়ান! ময়দানে কোনও ক্লাবের টেস্টে ঢুকে পড়তে হবে।

মেয়েটি ওঠেনি। ছোটেনি। বসে রইল মুখ নিচু করে। ক্যামেরা ভিজছিল।

ফটোগ্রাফারটি চলে যেত পারত। যাননি শেষ পর্যন্ত। মেয়েটির সঙ্গে সেও ভিজছিল ক্যামেরা সমেত।

সেই বিকেলে বৃষ্টি আর থামেনি। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে আন্দোলন থেমে গেল, পুলিশের হামলা বন্ধ হল, জনসাধারণ পালাল নিরাপদ আশ্রয়ে। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজেই মেয়েটিতে তার বাড়ি অবধি পৌঁছে দিল তরুণ ফটোগ্রাফার। খানিকটা বাসে, খানিকটা হেঁটে।

তার ফটো পরদিন বেরিয়েছিল কাগজে। নাম সমেত। আরো অনেকেই ফটো তুলেছিল সেদিনকার হাস্যমার। তবে গুলি-খাওয়া লোকটার অমন নিখুঁত ছবি আর কেউ পায়নি। বেশ নাম হয়েছিল তার। পায়ের জখম সারতে কয়েকদিন সময় লেগেছিল।

অফিসের ঠিকানায় প্রায় সাত দিন বাদে চিঠিটা এল। মেয়েলি হস্তাক্ষর, আমি সেই মেয়েটি, যে সেদিন চোখের সামনে লোকটাকে মরতে দেখে পাথর হয়ে গিয়েছিল। বোধ হয় আমার হার্টফেল হয়ে যেত, আপনি আমাকে জোর করে ট্রাম থেকে নামিয়ে না আনলে। আমার বোধ হয় জানও ছিল না। কিরকম যে হয়ে গিয়েছিলাম! বৃষ্টিতে ভিজে আমার জ্বর হয়েছিল, জানেন? তবু ওই বৃষ্টিটাও বোধ হয় দরকার ছিল। ভিজে ভিজে মাথা ঠান্ডা হয়েছিল, শরীরে সাড়া ফিরে এসেছিল। আপনার সঙ্গে আর একবার দেখা হতে পারে কি? আমার যে মুখোমুখি একবার ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানানো দরকার আপনাকে! আর কী অভদ্র আমি! সেদিন তো এক কাপ চাও অফার করা হয়নি আপনাকে?

ফটোগ্রাফারের সময় হয়েছিল আরও সাত দিন বাদে। তারপর আর সময়ের অভাব হয়নি।

আজ সামান্য একটা উপস্থিতি টের পেয়ে চোখ খুলে মণীশ সেই মেয়েটিকে দেখতে পেল। সেই ভয় খাওয়া মুখ! সেরকমই সুন্দর আছে আজও।

কেমন আছে আজ?

মণীশ হাসল, একটা কিরকম থাকা বলো তো? ডাক্তার ছুটি দিচ্ছে না কেন?

এবার দেবে।

সেটাও তো চারদিন ধরে শুনছি। আর কবে?

অপর্যাপ্ত খুব কাছে ঘেঁষে চেয়ারে বসল। বড় ভালবাসায় কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। শান্তিকিনেতন থেকে সেবার একটা গাড়ি ভাড়া করে তাঁতিপাড়া গিয়েছিল তারা। এক জোড়া তসরের থান কিনেছিল অপর্যাপ্ত। পরে কাঁথাফোড়ের কাজ করিয়ে নেয়। সেই শাড়িরই একটা আজ পরে এসেছে। একটু সেজেও এসেছে।

মণীশ অপর্যাপ্তর হাতটা নিজের কপালে চেপে ধরে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, খুব ভয় পেয়েছিলে তোমরা?

পাবো না!

হোয়াট অ্যাভাউট দি ইয়ং রোগস্ ? ওদের কী অবস্থা হয়েছিল ?

বুঝতেই তো পারো। বাবা ছাড়া ওদের কি আর অস্তিত্ব আছে ?

বুবকা ?

পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। নিশ্চয় রাতে অবধি এসে বসে থাকত নিচে। রিসেপশনে যৌজ নিয়ে জ্বালাতন করত ওদের।

বড্ড বান্ধা রয়ে গেছে ছেলেরা। অ্যাডাল্ট হচ্ছে না কেন বলো তো!

তুমি ওকে অ্যাডাল্ট হতে দিচ্ছে কই ? এখনও এমনভাবে আদর দাও যেন কোলের ছেলে। আঠারো বছর বয়স হল, এখন ওকে তোমার একটু ছেড়ে দেওয়া উচিত।

মণীশ একটা শ্বাস ফেলে বলে, ছেড়ে তো দিতেই হবে। বড় হচ্ছে, কত দিকে ইন্টারেস্ট দেখা দেবে, বাবা নিয়ে কি পড়ে থাকবে তখন ?

মণীশের মনটা প্রশান্তিতে ভরে আছে। বুবার জগৎ এখনও সে অনেকটা দখল করে আছে। যতদিন পারবে মণীশ ততদিন এই নোংরা পৃথিবীকে অনুপ্রবেশ করতে দেবে না ছেলে এবং মেয়েদের ভিতরে।

কিন্তু পারবে কি মণীশ ? আর পারবে কি ?

এখানে আমার বড্ড হাফ ধরে যাচ্ছে। ডাক্তার কিছু বলছে না এখনও!

হয়তো আর দু-এক দিন।

মণীশ সবচেয়ে মাথা নেড়ে বলে, অসম্ভব। আমি আর পারছি না। এখানে থাকলে আমার আবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে।

ডাক্তার যদি বারণ করে ?

আমি সাবধানে থাকব। এখানে থেকেও তো কিছু হচ্ছে না। শুধু পড়ে থাকা। আমি পারছি না অপর্ণা। ছেলেমেয়ে ছাড়া আমি আর পারছি না।

অপর্ণা নির্লজ্জের মতোই তার মাথাটা নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে। বলে, ওরকম করতে হয় নাকি ? আমরাও তো তোমাকে ছাড়া যেন ডাঙার মাছ। ছেলেমেয়েগুলো অর্ধেক হয়ে গেছে দুশ্চিন্তায়।

ওরা কখন আসবে ?

অনু আসছে। তুমি গতকাল খবরের কাগজ পড়তে চেয়েছিলে, এরা নাকি দেয়নি। ও চুরি করে খবরের কাগজ দিয়ে যাবে বলে কাগজ কিনতে গেছে।

মণীশ একটু হাসল, খুব বিজ্ঞ, না ?

খুব।

সারাক্ষণ তোমরা কি আমার চিন্তা করো ?

শুধু চিন্তা! ধ্যান বলতে পারো।

তাহলে মাঝে মাঝে অসুখ করা তো ভালই। না ?

ভাল, তবে পালা করে। এবার আমার হার্ট অ্যাটাক হোক আর তোমরা আমাকে নিয়ে ভাবো, কেমন ?

ও বাবা, দরকার নেই। আচ্ছা, মহিলাদের হার্ট অ্যাটাক খুব কম হয়, না ? কই, বেশী শুনি না তো!

হয় মশাই, হয়। হার্ট অ্যাটাক হয়, ক্যানসার হয়, সব হয়।

অনু আসছে না কেন ?

আসবে।

নার্সটা ঘরে নেই, না ?

না তো!

উইল ইউ গিভ মি এ কিস ?

এ মা!

ইট উইল বি এ লাইফ সেভিং কিস। প্রীজ!

অপর্ণা সামান্য ঝুঁকে হালকা করে ঠোঁট ছোঁয় তার ঠোঁটে। তারপর বলল, তাড়াতড়ি ভাল হও তো। মনের জোর করে হও। তোমাকে ছাড়া আমিও আর পারছি না। এই পাগলকে ছাড়া আমি যে পাগল হতে বসেছি!

আজ এখনই কি ভাবছিলাম জানো ?

কী ?

সেই প্রথম দেখা হওয়ার ঘটনাটা। আমি তখন ফ্রি ল্যান্স ফটোগ্রাফার, তুমি কলেজের ছাত্রী। সেই ট্রাম, গুলি, টিয়ার গ্যাস।

মাগো!

অথচ কত রোমান্টিক, তাই না ?

অপর্ণা শিতমুখে হাসল, কী ভীষণ রোমান্টিক!

কতদিন ফটো তুলি না বলে তো! সেই যে বড় চাকরি পেয়ে গেলাম, ফটো প্যাশনটা চলে গেল। ক্যামেরা তিনটে পড়েই আছে।

আর ফটো তুলে কাজ নেই। অনেক হয়েছে।

আচ্ছা, আমার ছেলেমেয়েদের মধ্যে কারও ফটোগ্রাফিতে আগ্রহ নেই ?

সে তো তুমিই জানো। তোমার ছেলেমেয়েকে তুমি ছাড়া আর বেশী কে চেনে ?

মণীশ একটু চুপ করে ভাবে। তারপর বলে, বোধ হয় অনুটার হবে। যে ক'বার ফটো তুলেছে চমৎকার হয়েছে। দাঁড়াও ভাল হয়ে ফিরে ওদের তিনজনকে তিনটে ক্যামেরা দিয়ে বলব, ইচ্ছে মতো ছবি তুলে আনো। যারটা ভাল হবে তাকে প্রাইজ দেবো!

আচ্ছা, সে হবে খন। ভাল হতে না হতেই পাগলামি শুরু হয়েছে তো!

পাগলামি নয়, এটা হল এক ধরনের ইনহেরিটেন্স। আমার প্যাশন, আমার হবি, আমার ট্রেন্ড অফ মাইন্ড সব কিছু ওদের দিয়ে যেতে না পারলে, ওদের ভিতরে আমি বেঁচে থাকব কি করে বোলা ? ওদের মধ্যে নিজেকে দেখতে না পেলে আমার যে সেটা মরে যাওয়াই হবে।

আমি তো একটুও আপত্তি করছি না। ওরা তোমার মতোই হোক। তুমি ভাল হও, তারপর সব হবে। ওরা তোমার কিছুই নষ্ট হতে দেবে না। বাবা যে ওদের কাছে কী তা তো জানোই!

মণীশ আবাবর অনুর খোজ নিতে মুখ খুলেছিল, অমনি একটা দুষ্ট হাসি মুখে নিয়ে দরজা ঠেলে অনু ঢুকল। একটু যেন পা টিপে। চারদিক চেয়ে দেখল। তারপর ঢোলা পোশাকের বুকের ভিতর থেকে একটা ইথরিজি কাগজ বের করে ছুটে এল মণীশের কাছে।

বাবা, কাগজ!

মণীশ তার দুর্বল দুটি হাতে মেয়েকে জাপটে নিল বুকের ভিতর। পরমুহূর্তেই ককিয়ে উঠল, উঃ!

অপর্ণা আতঙ্কের গলায় বলে, কী হল ?

বুক পকেটে যন্ত্রটার কথা মনেই ছিল না।

লেগেছে ?

একটু।

অপ্রস্তুত অনু বলল, এ মা, আমারও মনে ছিল না বাবা। কী হবে ? যন্ত্রটা বিগড়ে যায় যদি ?

আরে দূর! কিছু হবে না।

তোমার হাটে তো চাপ পড়ল!

মোটেরই না। তুই কাছে আয়।

অপর্ণা উদ্বেগের গলায় বলে কী যে করো না! কিছু ঠিক থাকে না তোমার! আমি তো ভয় খেয়ে গিয়েছিলাম।

আরে না, ভয়ের ব্যাপার নয়। আর বকবে না কিছু।

তোমাকে বাড়ি নিয়ে গেলেও তো এরকমই ছড়ম দুডুম কাণ্ড করবে সব। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ছড়াছড়ি, লাক ঝাঁপ, চেষ্টামেরি!

বেঁচে থাকা মানোই তো নিজেকে জানান দেওয়া। নইলে পাথর হয়ে, মনি হয়ে বেঁচে থেকে কী লাভ বোলা!

আগেই বলে রাখছি, এখন কিন্তু কিছুদিন চুপটি করে শুয়ে থাকতে হবে বাড়িতে। ওসব ছড়াছড়ি চলবে না।

মণীশ অপর্ণার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, ডাক্তারের বারণ ?

হ্যাঁ।

তাহলে কি আমি চিরকালের মতো পঙ্গু হয়ে গেলাম ?

উঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারি না। আচ্ছা বাবা, খুব ছড়াছড়ি করো, কিন্তু একটু সামলে!

মণীশ মেয়ের দিকে ফিরে তাকাল। একটু অচেনা লাগছে কি ?

মুখখানা দুহাতে ধরে ভূমিতের মতো চেয়ে থেকে বলল, তুই কি খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাচ্ছিস ?

কেন বাবা ? তুমি তো মোটেই বাইশ দিন হাসপাতালে!

তবু যেন মনে হচ্ছে বাইশ দিনেই তুই আমার চোখের আড়ালে একটু বড় হয়ে গেছিস! কত বয়স হল তো! তেরো না ?

অনু হি হি করে হাসে, মেয়েরা বয়স কমায়, কিন্তু বাবারা মেয়েদের বয়স আরও কমিয়ে দেয়, না বাবা ? আমি তো ফিফটিন কমপ্লিট করেছি, তুমি যেন জানো না!

উরে বাবা! ফিফটিন! তার মানে সিন্সটিন হতে তো আর দেরি নেই!

আই অ্যাম রানিং সিন্সটিন।

মাই গড!

ডান কানে অপর্ণা খুব আশ্চর্য করে বলে, ঝাঁতু হয়। বয়স বসে আছে কিনা!

ওঃ ইউ আর ইমপসিবল।

অপর্ণা হেসে ফেলল খিলখিল করে। মণীশের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে আশ্চর্য করে বলল, তোমার কাছে ওরা কেউ কখনও বড় হবে না। ছেলেমেয়ে ছোটো নেই, শুধু তোমার কাছে এলেই সব ছোটো সাজে।

মণীশ গম্ভীর গলায় বলে, তার মানে কি অ্যাকটিং করে ?

একটু করেও।

শুনে আমার বুক ব্যথা হচ্ছে।

মাগো! বলে আত্নানাদ করে ওঠে অপর্ণা, সত্যি নাকি ?

মণীশ হাসে, সে ব্যথা নয়। অন্য রকম ব্যথা। দুঃখের ব্যথা।

আচ্ছা বাবা, কান মলছি। আর বলব না।

অনু নিশ্চলক বাবার মুখের দিকে চেয়ে আছে। মণীশ নিবিষ্ট চোখে কচি মুখখানা দেখল। অনুরও পনেরো! কিংবা-গড ফরবিড—যোলো! চোখে কি একটু প্রাপ্তবয়স্কায় ছায়া ?

মণীশ চোখ বুজল। অনেক বয়স হয়ে গেল বুঝি তার ?

আবার চোখ চাইল।

অনু ?

উ।

বড় হোসনি মা। এখনই বড় হোসনি। আর কিছুদিন শিশু থাক।

॥ ২০ ॥

নতুন আফটার শেভ লোশনটা মাখবার পর কিছুক্ষণ যেন আকাশে ভেসে রইল হেমাঙ্গ। এত হালকা লাগল মেজাজ, এত ফুরফুরে লাগল নিজেকে, যেন তার কোনও ভার নেই। সে আকাশে মেঘের মতো ভেসে আছে। গন্ধ যে মানুষকে এমন গ্যাস বেলুন করে দিতে পারে তার কোনও ধারণাই ছিল না হেমাঙ্গর। হল। সুগন্ধ সম্পর্কে তার বরাবরই অগ্রহ আছে। দেশ-বিদেশের কম সেট তার সংগ্রহে নেই। সেগুলো মাখবার জন্য নয়, কারণ বেশী সুগন্ধ মাখলে তার অনেকটা এলার্জির মতো হয়। কিন্তু সে মাঝে মাঝে সাবধানে শিশি খুলে বা বাতাসে একটু স্প্রে করে নিয়ে গন্ধ শোকে। তাতে মনটা ভাল হয়ে যায়। কিন্তু এবার চারুশীলার পতিদেবতাটি এই যে আফটার শেভ লোশনটি এনেছে এটা সবাইকে জুটিয়ে দিয়েছে। এরকম দার্শনিক গন্ধ সে কখনও পায়নি।

সকাল দশটায় নিজের অফিসের চেম্বারে বসে হেমাঙ্গ একজন বিষয়ী লোকের সঙ্গে কথা বলছে। বিষয়ী লোকদের সে একদম পছন্দ করে না, কিন্তু এরাই তার অনু-বস্ত্রের যোগানদার। রোজই বিষয়ী লোকদের সঙ্গেই তার শতক কথাবার্তা হয়। সে এদের আয় ও সম্পদকর বিষয়ক পরামর্শদাতা ও ছোটখাটো একজন ভ্রাতা। তার সামনে বসে-থাকা লোকটির নাম বিরজু প্রসাদ সাহা। পদবীটি বাঙালী হলেও লোকটি আসলে ইউ পি-ওয়লা। স্ক্রাপ আয়রন কেনাবেচার ব্যবসায়ে কয়েকশো কোটি টাকা খাটছে। লোকটি মোটেই লালাজীদার মতো বুদ্ধিমান, বিন্দ্যাহীন, ধূর্ত বিনয়ী, মোটা এবং হাত কচলানো টাইপের নয়। এর বাপ-দাদা অবশ্য তাই ছিল। কিন্তু এ রীতিমতো লেখাপড়া জানা স্মার্ট, ট্রিম এবং আধুনিক। ম্যানেজমেন্টে বিলিতি ডিম্বি আছে। কিন্তু এর মনোজগতে কোথাও কোনও ভাবাবেগ, অলস-চিন্তা, বাহুল্য আনন্দ নেই। এ হল আদ্যন্ত ব্যবসায়ী। বাণিজ্যিক রোবট। এর যা পয়সা আছে তাতে হেমাঙ্গদের গোটা পরিবারকে অন্তত ষাট সন্তর বার কেনাবেচা করতে পারে। এইসব লোকদের খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হয়। একটু বেচাল বেকাঁস কথা বললেই ধরে ফেলবে।

কিন্তু আজ হেমাঙ্গ কোনও কিছুতেই মন দিতে পারছে না। সকাল আটটায় সে দাড়ি কামিয়েছে। অবশ্য আফটার শেভটা সে দাড়ি কমানোর পরই মাখে না। স্নান করে খেয়ে বেরোনোর সময় মাখে নেয়। তাতে মন্দির গন্ধটা প্রায় সারাদিন তার মুখমণ্ডলে থেকে যায়। এয়ারকুলার লাগানো ঠাণ্ডা ঘরে গন্ধটা ঝিমঝিম করছে আর তাকে গ্যাস বেলুনের মতো ওপরে এক ঝপুঁরাজে ঠেলে তুলে দিতে চাইছে। ওঃ, ফরাসীর গন্ধ চেনে বটে। গন্ধও যে সুগন্ধ একটা বিজ্ঞান ও শিল্প সেটা যে একদেশের লোক কেন বোঝে না কে জানে! মিশরের মন্দির কবরে যেসব সুগন্ধের পাণ্ডা পাওয়া গেছে তাতে নাকি এখনও সুগন্ধ পাওয়া যায়! হাজার দু'হাজার বছরেও যা নষ্ট হয় না তা কী জিনিস দিয়ে তৈরি কে বলবে ?

এ গন্ধটা ততদূর দীর্ঘস্থায়ী নয়। কিন্তু সকাল ন'টা থেকে লেগে আছে এবং দুপুর গাড়িয়ে বেলা তিনটে সাড়ে তিনটে অবধি থেকে যায়।

বিরজু প্রসাদ সাহা আয়কর সংক্রান্ত একটি বদখত ঝামেলায় পড়েছে, যা প্রতি বছরই পড়ে মিটেও যায়। এই ঝামেলা ও তার সমাধানের মাঝখানে কয়েক হাজার বা কখনও লক্ষ টাকাও হেমাঙ্গর কোম্পানি তুলে নেয়। ফলে এরা—অর্থাৎ বি পি সাহার মতো লোকেরা—তাকে অর্থাৎ হেমাঙ্গর মতো লোকদের নিজস্বের চাকরবাকর মনে করে। একটু ভদ্রস্থ চাকর—যাদের চোখ রাজানো যায় না বা চটানো যায় না। তবে আক্ষরিক অর্থে চাকরই।

একজন মহাপুরুষ বলেছেন, কর মানে হাত। কর দেওয়া মানে হাতে হাত মেলানো। রাজা ও প্রজার করমর্দন। সরকার ও জনসাধারণের সহযোগিতার শুরু তার বদলে হেমাঙ্গ বা হেমাঙ্গর মতো লোকেরা যা করছে তা হল অনেকটা বেড়াল-কুকুরের মল বা মূত্রের ওপর ছাই চাপা দিয়ে রাখা, যেমনটা তার মাকে সে ছেলেবেলায় করতে দেখেছে। গত বছর প্রায় দেড় কোটি টাকা ট্যাক্স বাঁচাতে বি পি সাহাকে সাহায্য করেছে হেমাঙ্গর কোম্পানি। এবং কাজটা করে যথেষ্ট আত্মগৌরব বোধ করেছে। বি পি সাহার মতো ক্রায়োটদের সর্বমোট কত ট্যাক্স বাঁচিয়ে দিয়েছে তার কোম্পানি তার হিসেব করলে যে-কারও মাথা ঘুরে যাবে। আর এই ছাই-চাপা দেওয়ার কাজ দেশ জুড়ে যারা করছে তারা মোট কত ট্যাক্স সরকারের ঘরে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিচ্ছে তার হিসেব করলে গোটা কয়েক পাঁচসালার পরিকল্পনার মূল বিনিয়োগ উঠে আসবে না কি ? হিসেবটা করা হয় না, এই যা।

খুব মনোযোগের ভান করে বি পি সাহার কাগজপত্র দেখছে হেমাঙ্গ। আদতে দেখছে না। গন্ধের বেলুনে চড়ে এখনও সে অনেক ওপরে। ইনস্টিটিউট বি-এর কাছাকাছি ঘুরপাক খাচ্ছে। মাঝে মাঝে সে সাহার বিষয়ী মুখটার দিকে তাকাচ্ছে। মুখখানা গোলপানা, গৌফ আছে, নাকটা একটু মোটা, জ্র ঘন, কপাল ছোট এবং চুল খুব ঘেঁষ। বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের মধ্যে। গত বছর তিন কোটি টাকার কাছাকাছি ট্যাক্স দিয়েছে। সাফল্য কি একেই বলে ? অযোষিত সাফল্য অবশ্য আরও অনেক বেশি।

বি পি সাহার মুখে হাসি নেই। আহা, এই লোকটা যদি এই আফটার শেভ লোশনটা একটু মাখত!

খানিকক্ষণ কাগজপত্র দেখার চেষ্টা করে হেমাঙ্গ বলল, ইটস ও, কে, মিস্টার সাহা।

বি পি সাহা একটা অস্পষ্ট থ্যাংক ইউ বলে উঠে গেল। দরজাটা বন্ধ হল। ঘরে হেমাঙ্গ একা।

মাঝে মাঝে কাজ করতে তার ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে তার অনেক দিনের ছুটি নিয়ে কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করে। মাঝে মাঝে মনে হয়, যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়। কিছুক্ষণ চোখ বুজ চুপ করে বসে সে কোনও একটা সুন্দর

বেড়ানোর জায়গার কথা ভাবল। কিন্তু তেমন আকর্ষক কিছুই মনে পড়ল না। পাহাড়, জঙ্গল, সমুদ্র সে কি অনেক দেখেনি? খুবই আশ্চর্যের বিষয় এবং লোকে শুনলে হয়তো হাসবেও—তার প্রিয় বেড়ানোর জায়গা হল বড় বড় দোকান, যেখানে অজস্র জিনিসের সম্ভার। নতুন নতুন জিনিস। গ্যাজেটস। ইলেকট্রনিকস।

বেশীক্ষণ বিষয়কর্মকে প্রত্যাখ্যান করে থাকা গেল না। একটু বাদেই বেয়ারার চিরকুট। তার কিছুক্ষণ পরেই বি পি সাহার কার্বন কপি আর একজন বিষয়ী লোক। তারপর, আরও একজন। তারপর ইনকাম ট্যাক্স-এর একটা হিয়ারিং সেরে আসতে হল।

তিনটের পর কফি খাওয়ার সময় গন্ধটা সম্পূর্ণ লোপাট হয়ে গেল। অন্তত ততটা রইল না, যতটায় ইনস্যাট বি-এর কাছাকাছি উঠে থাকা যায়।

মেয়েটা এল বিকেলের দিকে। আর এক ঘণ্টা পরে এলেই হত। তখন থাকত না হেমাঙ্গ। দেখা না করেও উপায় নেই। তার এক জ্যাঠার চিঠি নিয়ে এসেছে। ভুনি জ্যাঠা তার বাবার খুড়তুতো দাদা। এক সময়ে কোলিয়ারি ছিল। এখন ব্যবসা না থাক, টাকা আছে।

মেয়েদের মুখের দিকে চট করে তাকায় না হেমাঙ্গ। তাকালেই নানা বখেরা। মুখটা নিচু রেখেই বলল, চাকরি চান? কোয়ালিফিকেশন কী?

আমি একটা অ্যাপ্লিকেশন এনেছি। বায়োডাটা দেওয়া আছে।

ভুনি জ্যাঠার ক্যান্ডিডেটকে খুব একটা হেলাফেলা করার উপায় নেই। এই জ্যাঠামশাইটি রাশভারী ব্যক্তিত্ববান মানুষ। তিন ছেন পুলিশ ও প্রশাসনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি করে। এই তিন দাদাই হেমাঙ্গকে প্রয়োজনে প্রচুর সাহায্য করে থাকে। ভুনি জ্যাঠা কারও অনুগ্রহ নেয় না বড় একটা। আত্মমর্যাদাজ্ঞান খুব টনটনে। কিন্তু এই মেয়েটিকে নিশ্চয়ই বিশেষ কারণেই পাঠিয়েছেন হেমাঙ্গর কাছে। হেমাঙ্গ তার দরখাস্তটা পড়ল। ইলেকট্রিক টাইপ রাইটারে দামী হ্যাডমেড কাগজে ছাপা দরখাস্তটা থেকে জানা গেল, মেয়েটির বয়স কুড়ি এখনও পূর্ণ হয়নি। আর্টস গ্র্যাজুয়েট এবং কমপিউটার ট্রেন্ড।

হেমাঙ্গর জীবনে একটা মস্ত বড় ঘটতির ব্যাপার হল, সে চট করে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। বোধ হয় কতগুলো ব্যাপারে সে অত্যন্ত সতর্ক মানুষ বলেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে চারদিক বিচার বিবেচনা করে। মেয়েটির চেয়েও ভুনি জ্যাঠা তার কাছে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাকটর। তারা—অর্থাৎ হেমাঙ্গর গোটা পরিবারটিই আসলে পূর্ববঙ্গের। তবে দাদুর আমল থেকেই, অর্থাৎ দেশ ভাগের অনেক আগে থেকেই তারা কলকাতার বাসিন্দা বলে পূর্ববঙ্গের পরিচয়টা প্রায় মুখে যাওয়ার জোগাড়। কিন্তু কয়েকটা ব্যাপার এখনও তারা বাঙাল। ঘোরতর বাঙাল। তার মধ্যে একটা হল, আত্মীয় বংশলতা। লতায় পাতায় আত্মীয়দেরও উপেক্ষা করার জো নেই। এই ছোট পরিবারের যুগেও তাদের এই রীতিটি বজায় আছে। আত্মীয়দের উপেক্ষা করা যাবে না। সুতরাং এই মেয়েটির তাদের আত্মীয় হওয়ারই সম্ভাবনা।

হেমাঙ্গ মৃদু স্বরে বলল, কিছু মনে করবেন না, আপনি ভুনি জ্যাঠামশাইয়ের কোনও আত্মীয় নন তো!

এবারও হেমাঙ্গ মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল না। দরখাস্তের দিকে চোখ রেখেই বলল।

মেয়েটি জবাব দেওয়ার আগেই হঠাৎ পর পর দুটো হাঁচি দিল।

হেমাঙ্গ মুখ তুলে দেখল, মেয়েটা রুমালে মুখ চাপা দিয়ে ভীষণ লজ্জার ভঙ্গিতে বসে আছে। আর খুবই উদ্বেগের কথা যে, মেয়েটি আপাদমস্তক সপসপে জেজো।

হেমাঙ্গ ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনের কাচের শার্সির ভিতর দিয়ে দেখল, বাইরে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। বন্ধ অফিসঘরে কৃত্রিম আলোয় এতক্ষণ বুঝতে পারেনি। ভেজা মেয়েটির নিশ্চয়ই ঘরের ঠাণ্ডা সহ্য হয়নি। ইস, আপনি যে ভিজ্ঞে গেছেন!

রোগা চেহারার মেয়েটি সলজ্জ মুখে মৃদু স্বরে বলল, হ্যাঁ। একটু ভিজ্ঞি। ছাতাটা ভুল করে সঙ্গে আনিনি।

হেমাঙ্গ উঠে এয়ারকন্ডিশনারটা বন্ধ করে দিল। বলল, সরি। আমি এতক্ষণ লক্ষ করিনি যে আপনি ভিজ্ঞে গেছেন।

তোয়ালে দেবো?

মেয়েটি মাথা নেড়ে ভীষণ লজ্জার সঙ্গে বলে, না, তার দরকার নেই।

মুখটা চেনা-চেনা লাগছে হেমাঙ্গর। কোথায় দেখেছে একে? তার স্মৃতিশক্তি চমৎকার। কিন্তু মনে করতে সময় লাগবে। মুখখানার মধ্যে একটা ধারাল সৌন্দর্য আছে। মাথায় মেঘের মতো চুল।

আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি বলুন তো!

দেখেছেন, তবে মনে থাকবার কথা নয়।

কোথায় বলুন তো!

নন্দনাদের বাড়িতে। সেদিন ওর ভাইয়ের জন্মদিন ছিল। আমি অবশ্য আপনাকে চিনি।

হেমাঙ্গর টক করে মনে পড়ল। এই মেয়েটি তাকে একটা কোন্ড ড্রিংক দিয়েছিল। সঙ্গে একটু হাসি। হেমাঙ্গর মাথায় একটা টিকটিক ডাকছিল। সে বলল, ওদের বাড়িতে কি আপনার যাতায়াত আছে?

হ্যাঁ। আমার প্রতিবেশী।

হেমাঙ্গ অবাক হয়ে বলে, কিন্তু ভুনি জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে আপনার পরিচয় হল কি করে? উনি তো সল্ট লেক-এ থাকেন।

মেয়েটি মাথা নেড়ে বলে, পরিচয় নেই তো।

তাহলে এই চিঠিটা?

ওটা তো চারুমাসী এনে দিয়েছে।

মাই গড! তাহলে তো আপনি আসরে আমার ওই বিচ্ছু দিদিটির রেফারেন্সেই এসেছেন। কিন্তু ও নিজে চিঠি দিল না কেন? ফোনও করতে পারত।

মেয়েটি সলজ্জ একটু হেসে বলে, উনি বলছিলেন আপনি ওকে বেশী পাতা দেন না। তাই কোন এক আত্মীয়ের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এসে দিলেন। আপনি কিছু মনে করেননি তো! কনস্পিরেসিটায় কিন্তু আমি ছিলাম না।

বুঝেছি। আমার ওই দিদিটিকে আমি ভালই চিনি। এনিওয়ে, আমি দরখাস্তটা রেখে দিচ্ছি। এই ভেজা অবস্থায় আপনার আর বেশীক্ষণ থাকা উচিত নয়। তাড়াহুড়ি বাড়ি চলে যান।

মেয়েটি দরজার কাছ অবধি চলে দিয়েছিল। হেমাঙ্গ আর এবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, বাইরেটা বৃষ্টির তোড়ে সাদা হয়ে গেছে। এ বৃষ্টিতে এ মেয়েটি তো কোথাও যেতে পারবে না। নিশ্চয়ই গাড়ি কমে এসেছে রাস্তায়। আর বাসে এখন সাম্প্রতিক ভিড় হবে।

শুনুন। আপনি বরং একটু অপেক্ষা করে যান। এই বৃষ্টিতে বেরোতে পারবেন না।

আমি ঠিক চলে যেতে পারব।

পারবেন না। রাস্তায় জল জমে গেছে। বেশী বৃষ্টি হলে কলকাতার অবস্থা কী হয় তা আমি জানি।

আমি জল ভেঙেই এসেছি।

এইরকম দুর্যোগের দিনে না আসাই ভাল ছিল। বসুন। সর্দি তো বোধ হয় লেগেই গেছে। আর নতুন করে লাগবে না।

মেয়েটি জড়সড় হয়ে বসল। খুব সংকোচ।

আপনি কি খুব নিড়ি? চাকরি খুঁজছেন কেন?

নিড়ি। তবে আমার বাবা খুব ভাল চাকরি করেন। কিন্তু বাবার একটা হাট অ্যাটাক হয়ে গেল। ম্যাসিভ অ্যাটাক। এখন আমাদের অবস্থা কিছুটা আনসার্টেন। চাকরিটা সেই জন্যই দরকার।

মেয়েটা আর একবার হাঁচল এবং ভীষণ লজ্জা পেল। রুমালে নাক মুখ চাপা দিয়ে ঠেকানোর চেষ্টা করা সত্ত্বেও আরও তিনবার হাঁচতে হল তাকে।

বাবার ম্যাসিভ হাট অ্যাটাকের কথা সেদিন আরও একটা মেয়ে বলছিল না? হেমাঙ্গ একটু ভাবতেই বছর পনেরোর কিশোরীটিকে মনে করতে পারল। কিশোরীটি বড্ড বেশী শার্ট।

মুদু হাসি মুখে হেমাঙ্গ বলে, সেদিন পাটিতে কি আপনার একটি ছোট বোনও ছিল? নিয়ার অ্যাবাউট ফিফটিন!

নাক থেকে রুমাল সরিয়ে মেয়েটা মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ, অনু। আপনার সঙ্গে নাকি তার খুব ভাব হয়ে গেছে বলছিল।

ওটি আর একটি বিচ্ছু, তাই না!

মেয়েটি হাসল। কিছু বলল না।

হেমাঙ্গ দরখাস্তটা তার ব্যক্তিগত ফাইলে রেখে দিয়ে বলে, আমাদের কোম্পানি ছোট, আমরা চারজন পার্টনার এটা চালাই। আমাদের এখানে স্টাফ খুব কম দরকার হয়। কম্পিউটারেও লোক আছে। আপনার জন্য অন্য কোনও ক্লায়েন্টকে বলে একটা কিছু করার চেষ্টা করব। কম্পিউটার ট্রেনিং থাকলে কাজ পাওয়া সহজ।

মেয়েটা আবার হাঁচি দিতেই খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে হেমাঙ্গ। এর তো ভালরকম ঠাণ্ডা লেগেছে। দেখা যাচ্ছে। অথচ বাইরে প্রবল থেকে প্রবলতর বৃষ্টি হচ্ছে। অকালেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। রাস্তায় বোধ হয় এখন হাঁটুজল এবং প্রবল জ্যাম। বৃষ্টি হলেই একটা দুটো গাড়ি ব্রেকডাউন হয়ে রাস্তা আটকে রাখে। কলকাতা অচল হয়ে পড়ে।

মেয়েটা আর একবার উঠবার চেষ্টা করতেই হেমাঙ্গ একটু কড়া গলায় বলে, কোথায় যাচ্ছেন?

বাড়ি যেতে হবে যে।

যেতে তো সবাইকেই হবে। কিন্তু কলকাতায় কেউ কখনও সময়মতো কোথাও পৌছোতে পারে কি? আপনি বরং টেলিফোনে বাড়িতে খবর দিতে পারেন। বাড়িতে কি টেলিফোন আছে?

আছে।

তাহলে টেলিফোন করে দিন। বলে হেমাঙ্গ যন্ত্রটা এগিয়ে দিল।

মেয়েটা এই বদান্যতায় যেন মরমে মরে যাচ্ছে। খুব সংকোচের সঙ্গে বোতাম টিপল। বারতিনেকের চেষ্টায় লাইন পেয়ে মুদুরে বলল, মা, বৃষ্টিতে আটকে গেছি। ফিরতে দেরি হবে একটু।

সেলাপটা শুনবে না বলেই হেমাঙ্গ উঠে এসে জানালার একটা পাল্লা খুলে দিল। এয়ার কন্ডিশনারটা বন্ধ করায় ঘরটা একটু ভেপে উঠছে। জানালা দিয়ে অবশ্য প্রবল বৃষ্টির হাট এল। তবু উঁকি মেরে নিচের অবস্থাটা একটু দেখে নিল হেমাঙ্গ। পথঘাট দেখা যাচ্ছে না বৃষ্টিতে।

জানালাটা বন্ধ করে চেয়ারে এসে বসল হেমাঙ্গ।

মেয়েটা নিজের সর্দির নাক সামলাতে ব্যস্ত।

হেমাঙ্গর এবার মেয়েটির দিকে অকপটে তাকাতে বাধা হল না। সে বলল, আপনাদের সংসার কি বড়?

আমরা তিন ভাই বোন। মা আর বাবা।

ভাই কি করে?

পড়ছে।

আপনার বাবা এখন কেমন আছেন?

একটু ভাল। কাল বাবাকে বাড়িতে আনা হবে।

একটা কাজ করুন। রাস্তায় জল জমে আছে, আমার ছোট গাড়ি ফেঁসে যাবে। একটু যদি অপেক্ষা করেন তো আমি আপনাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে আসতে পারি।

এই বদান্যতায় মেয়েটা ভীষণ হকচকিয়ে গিয়ে বলল, না না! তার দরকার নেই।

এই মধ্যবিত্ত সংকোচের কোনও মানেই হয় না। এটা হল সুযোগসন্ধানীদের যুগ। কোনও সুযোগ বা সুবিধা প্রত্যাখ্যান করতে নেই। কিন্তু এই মেয়েটির এখনও সেইসব কার্যকরী শিক্ষা হয়নি। কিংবা একা পুরুষের সঙ্গে গাড়িতে যাওয়া কি এর কাছে সতীত্ব বিরোধী ব্যাপার? কে জানে কি! মেয়েদের চরিত্র ভাল করে জানে না হেমাঙ্গ।

সে বলল, দরকার না থাকলেও বসুন। এই বৃষ্টিতে যেতে পারবেন না। বরং একটু গরম চা বা কফি খান। আপত্তি নেই তো?

মেয়েটি আবার হাঁচল। লজ্জা পেল। ফর্সা রংটা লালও হয়ে গেল একটু। বলল, দরকার নেই।

কেন যে এত সরকোচ করছেন! বলে বেল বাজিয়ে বেয়ারা ডেকে দু কাপ কফির কথা বলে দিল।

লজ্জায় মরে যাচ্ছে মেয়েটি। যেন চাকরির উমেদারিতে এসে এই আপ্যায়ন গ্রহণ করাটা অন্যায় হয়ে যাচ্ছে।

কফি এল। দেখা গেল মেয়েটি কফিটা খুব উপভোগ করছে। দু হাতে কাপটা ধরে আছে সাবধানে। লজ্জা পাচ্ছে।

কিছু ওর মুখ বলছে, কফিটা ওর খুব দরকার ছিল।

বৃষ্টিটা ঝপ করে অনেকটা কমে গেল কফি খাওয়ার দশ মিনিট পর। ধরেনি অবশ্য। তবে ঝিরঝির করে পড়ছে।

উদ্দাম নাগা-নৃত্যটা বন্ধ হয়েছে। আর একটু অপেক্ষা করতে পারলে রাস্তার জলও কিছুটা সরে যাবে। হেমান্নর ভয় তার ছোট গাড়িটা নিয়ে। ইঞ্জিনে জল ঢুকে মোটর বন্ধ হয়ে গেলে ঠেলাঠেলির অনেক খামেলা।

কফি খেয়ে মেয়েটা সত্যিই উঠল, এবার আমি যাবো।

হেমান্ন একটু হেসে বলল, ঠিক আছে। আসুন।

মেয়েটা চলে যাওয়ার পর হেমান্ন তার কাজকর্মে একটু ব্যস্ত রইল। কয়েকটা বিষয়কর্মজনিত ফোন এল। পার্টনার চঞ্চল বোসের সঙ্গে একটু আড্ডা হল। ঘন্টা দেড়েক বাদে বুঝতে পারল রাস্তার জল নেমেছে। যাওয়া যাবে।

গাড়ি স্টার্ট নিল একবারেই। রাস্তায় কোনও ঝঞ্ঝাট হল না।

ফোনটা এল রাত আটটার পর। বাইরে আবার বৃষ্টি পড়ছে। বিছানায় খুব আলস্যে এলিয়ে আধশোয়া হয়ে টিভি-তে একটা সিরিয়াল দেখছিল হেমান্ন।

ফোনটা কানে তুলতেই হ্যালোর বদলে মেয়েলী গলায় শোনা গেল, ছিঃ!

হেমান্ন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, হাঁচলি নাকি?

ছিঃ ছিঃ! তোর লজ্জা করে না?

কিসের লজ্জা?

একটা মেয়েকে বাড়ি পর্যন্ত পৌছে না দিয়ে বৃষ্টিতে ওভাবে ছেড়ে দিলি? জানিস ওর এখন একশ এক ডিগ্রি টেম্পারেচার!

হেমান্ন অপ্রতিভ হয়ে বলে, ওই বুমকি মেয়েটার কথা বলছিস নাকি?

তবে আর কার কথা বলছি! তোর মনুষ্যত্ব যে এত কমে গেছে, তুই যে এত হৃদয়হীন হয়ে গেছিস তা তো জানতুম না।

বুমকি কি তাই বলেছে তোকে?

বলার আর কী আছে?

আমি ওকে লিফট অফার করিনি একথা বলেছে?

মোটাই তা বলেনি।

তাহলে আমার দোষটা কোথায় বল তো!

ও লজ্জা পেয়েছিল, তাই বলে তুই ওকে জোর করে তো পৌছে দিতে পারতিস!

হেমান্ন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, জোরও করা যায় নাকি? মেয়েটা অমন ভ্যাবাগস্কারাম আর লজ্জাবতী লতা হলে আমার কি করার আছে? আমি হিউম্যান পয়েন্টে যতটুকু করার করেছি।

বেচারার কোন্ড অ্যালার্জি আছে। বৃষ্টিতে ভিজে বুকে কনজেশন হয়ে কী অবস্থা তার ওপর ওর বাবা এখন নার্সিং হোমে। তুই কী বল তো!

হেমান্ন একটু চটে গিয়ে বলে, তখন থেকে কেন যে টিকটিক করছিস। বললাম তো, মেয়েটাকে পৌছে দিতে চেয়েছি, ও রাজি হয়নি।

একটা ছাতা দিতে পারতিস?

আমার ছাতা কোথায়?

কারও কাছ থেকে ধার করেও তো দিতে হয়। তোর মতো সকলের তো গাড়ি নেই। গরিবদের কথাও দিনের মধ্যে কিছুক্ষণ ভাবতে হয়। পৃথিবীতে কত পারসেন্ট গরিব তা জানিস?

লেকচার দিস না। মেয়েটা মোটেই গরিব নয়। ছাতাটা ভুলে ফেলে এসেছিল। ওরকম আনশার্ট, ভুলো মন আর বোকা মেয়েকে আমি কোনও চাকরি দিতে পারব না। সরি।

আহা, চটছিস কেন?

মেয়েটা তোর কাছে গিয়ে চুকলি কেটেছে তো! ঠিক আছে, ওরকম মেয়েকে চাকরি দেওয়ার কোনও দায়িত্বই আমার নেই।

মোটাই চুকলি কাটেনি। ও সেরকম মেয়েই নয়। বোকা হাঁদাও নয়, আনশার্টও নয়। তবে লাজুক সেকথা ঠিক। আর তোর মতো ইডিয়ট ছাড়া সবাই জানে যে লজ্জাই ললনার ভূষণ।

ভূষণ মানে জানিস?

কেন জানব না? তোর মতো মূর্খ নাকি? ভূষণ মানে গয়না।

ঠিক কথা। গয়না হল বাহ্যিক জিনিস, এ যুগে চলে না। ওয়ার্কিং গার্লরা যেমন গয়না অ্যাভয়েড করে তেমনি লজ্জাও অ্যাভয়েড করতে হয়। নাচতে নেমে ঘোমটা টানলে তো চলবে না। চাকরিও করব, আবার নববধূর মতো মাথা নিচু করে থাকব তা কি চলে যে? ও হল অচল মাল।

তোর কথাবার্তাগুলো এত জংলি টাইপের। যাক গে, ক্ষমা করে দিচ্ছি। তোকে যে কেন এত ক্ষমা করতে হয় তা বুঝি না বাবা।

ভূনি জ্যাঠামশাই : এর মধ্যে টেনে নামিয়ে তুই যে কাণ্ডটা করলি সেটা কিন্তু ক্ষমার যোগ্য অপরাধই নয়। জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখা হলে আমি জিজ্ঞেস করব ইদানীং তিনি কেন অন্যের কথায় অজ্ঞাতকুলশীল সম্পর্কে ফলস স্টেটমেন্ট এবং রেকমেন্ডেশন দিচ্ছেন।

মারব থান্ড! কে অজ্ঞাতকুলশীল রে? বুঝকিকে আমি খুব ভাল চিনি।

কিন্তু জ্যাঠামশাই চেনে না।

আমি চিনলেই হবে। ভূনি মামার চেনার তো দরকার নেই।

এইসব মিথ্যাচারের জন্য তোর নরকবাসের মেয়াদ কত বেড়ে যাচ্ছে তা জানিস? ভাল চাস তো এখনও অন্তরটা পরিষ্কার কর। ঝাঁটা বালতি নিয়ে লেগে যা। তোর মনে অনেক ময়লা জমে আছে।

॥ ২১ ॥

দাদুর কাছে পটল শুনেছে, পুলিন ডাক্তার সব বিদ্যেই জানে। হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথি, কবরেজি, এমন কি চাঁদসী অবধি। অথচ পুলিন ডাক্তারের একটা পাশ করা নেই। ধরা পড়লে ডাক্তার দাদুর জেল-জরিমানা সবই হতে পারে।

দুই বুড়ো মানুষে কথা হচ্ছিল একদিন, তখন পটল শুনেছে। ডাক্তারদাদু বড়াই করে বলল, আমি না থাকলে বিষ্ণুপুর শীতলাভলা কবে ওলাবিবির গরাস হয়ে যেত তা জানো? ম্যালেরিয়া, মা শীতলার দয়া, সান্নিধ্যাতিক, সন্ধ্যাস মানুষের কোন রোগ-ভোগ সামাল দিইনি বলে! পাশ-করা ডাক্তার তখন কোথায় ছিল সব! আমি অ্যালোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি আলাদা করে ধরি না বাপু, রোগে পড়লে যার যা সময় দিই। গাঁ গজ্ঞে সব রকমই লাগে। অনেকের অ্যালোপ্যাথি ওষুধ কেনার পরস্যা থাকে না, অনেকের সহ্য হয় না, অনেকে আবার কবরেজির ভক্ত। সব বশোবস্ত রাখতে হয়েছিল সেইজন্যই।

পটল বিদ্যার ব্যাপারটা বোঝে না। তবে ডাক্তার দাদুকে তার বেশ লাগে। মজার মানুষ। বাইরে দিকে পাকা একখানা ঘরে ডিসপেনসারি। চারটে বড় বড় আলমারি ভর্তি ওষুধ। মদন কম্পাউন্ডার লোকটিও ভাল। সন্ধ্যাবেলায় বটতলায় হারুর সাইকেলের দোকানে বসে গীজা খায় বটে, কিন্তু এমনিতে ভরি হাসিখুশি। কাউকে চটায় না, ঝগড়া করে না। ডিসপেনসারিতে নানা লোক আছে। রুগী তেমন কেউ না এলেও, গল্প করতে মেলা লোক আসে। বুড়ো মানুষই বেশী। তাদের কেউ কেউ ডাক্তার দাদুকে দিয়ে ব্রাদ শ্রেণার মাথিয়ে নেয়, কেউ বুকটা একটু এমনিই পরীক্ষা করিয়ে নেয়। বাদবাকি সময় গল্প হয়।

পটল মাঝে মাঝে গোপালকে নিয়ে এসে বসে থাকে এক ধারটায়, কাঠের বেঞ্চে। ডাক্তারদাদু অনেকদিন আগেই বলে দিয়েছে, ও হল জনের রোগ। ও কি সারে রে!

কত অসুখের তো কত ওষুধ বেরিয়ে গেছে দাদু। পেনিসিলিন, আরও সব কী যেন!

দুনিয়ায় কত বোবা-কালো আছে জানিস? ওষুধ থাকলে কবে সবাই ভাল হয়ে যেত।

তাহলে গোপালের কী হবে?

কি আর হবে! বোবা-কালাদেরও ব্যবস্থা আছে। ডিফ্ অ্যান্ড ডাঙ্কদের ইঙ্কল আছে, লেখাপড়া শিখতে পারে।

হোমিওপ্যাথিতে তো কত মরো-মরো মানুষও বেঁচে ওঠে। নেই ওরকম কোনও ওষুধ? থাকলে কি বসে থাকতুম রে! মানুষকে ভগবান অনেক বিদ্যে দিয়েছেন বটে, কিন্তু সবটুকু তো আর দেননি। মানুষ যে ভগবান নয়, এটা যাতে সর্বদা মনে রাখা, সেইজন্যই দেননি।

কথাটা পটলের বিশ্বাস হয় না। ডাক্তারদাদুকে ছেড়ে মাঝে মাঝে মদন কম্পাউন্ডারের কাছেও ব্যাপারটা বলেছে, দাদু না একটা ওষুধ মদনকার। গোপালের জন্য একটা ওষুধ ঠিক পাওয়া যাবে। ভাল করে বুজ্ঞে দেখ।

মদন অবশ্য সরাসরি না করে দেয় না। এক-আধটা পুরিয়া দিয়ে বলে, দেখ খাইয়ে। ঠাকুরের নাম করে খাওয়ায়। শাস্ত্রে বলেছে, মুকং করোতি বাচালং। দেখ কী হয়।

হয়নি। গোপাল এখনও কানে শোনে না। কথাও বলে না।

বটতলায় আগে বুধবার হাট বসত। হাটেই গাঁয়ের মানুষ হস্তার বাজার করে রাখত। আজকাল আর সেই দুঃখ নেই। বটতলায় পাকা বাজার বসে গেছে। তবে বুধবারের হাট এখনও হয়। মেলা ব্যাপারী আসে। তাদের মধ্যে এক জড়িভুটিওয়ালাও আছে। নানারকম হাড়গোড়, তেল, ডিম্ব, শুঁড়ো, পাথর সব থাকে তার কাছে। ভিড়ও হয়। তার কাছ থেকেও ওষুধ নিয়েছিল পটল। একটা গাছের শেকড় মধু দিয়ে বেটে খাওয়াতে হয়েছিল। কাজ হয়নি।

কিসে কাজ হবে, পটল তা নিয়ে আশ্চর্য-পাতাল ভাবে। আকাশে এরোপ্লেন ওড়ে, চাঁদে মানুষ যায়, অ্যাটম বোমা, টেলিফোন কত কী তৈরি করেছে মানুষ, আর গোপালকে কথা কওয়াতে পারবে না? সে একবার তার বড় জ্যাঠাকে চিঠিতে লিখেছিল, আপনি তো বিলেত আমেরিকা যান। গোপালের জন্য ওষুধ এনে দেবেন? সে চিঠির জবাবে জ্যাঠামশাই লিখেছিল, এর কোনও চিকিৎসা নেই। তবে তুমি বড় হয়ে এটা নিয়ে গবেষণা করো। মানুষ চেষ্টা করলে সব পারে।

সাধু-সন্ন্যাসীরা হয়তো পারে। কিন্তু জটাভূটওলা লোক দেখলেই পটল ভয় খায়। তান্ত্রিক শুনেই তার বুক হিম হয়ে যায়। গোপালের জন্য আজও সে কোনও সাধুকে ধরতে পারেনি। তবে জলপড়া, চরণামৃত খাইয়েছে অনেক।

গোপাল যদি কথা বলতে পারত তাহলে তাতে দাদা বলে ডাকত। দুই ভাইয়ে কত প্রাণের কথা হত। সে যখন কথা বলে তখন গোপাল একদৃষ্টে তার মুখের দিতে চেয়ে থাকে। চেয়ে থাকলে গোপাল খানিকটা তার কথা বুঝতেও পারে। পেনিসিল, বই, এক গলাস জল, মাদুর, ঘটি এসব আনতে বলতে ঠিক এনে দেয়। কিন্তু না তাকালে বুঝতে পারে না।

পার্শ্ব—১২

পটল মনে মনে ঠিক করে রেখেছে বড় হয়ে সে ডাক্তার হবে। ডাক্তার হওয়া শক্ত। পড়াশুনা খুব কঠিন। তার আগে কুলের শেষ পরীক্ষায় খুব ভাল ফল হওয়া চাই। তাই সে আজকাল খুব কষে পড়ে। কিন্তু পড়ার ঝোঁকটা বজায় রাখতে পারে না। দুদিন খুব পড়ল তো চারদিন আর রোখাটা রইল না।

ডাক্তারদাদু যে পাশ-করা ডাক্তার নয়, তা সে জানে। তবু আজ বৃষ্টি-ভেজা সকালে ভাইকে নিয়ে সে এসে বসেছে ডিসপেনসারিতে। ডাক্তারদাদু একবার চোখ তুলে তাকে দেখে বলল, কী ব্যাপার রে? তোর দাদুর কিছু হল নাকি আবার!

না, দাদু ঠিক আছে। তবে মায়ের বড় দাঁতের ব্যথা হচ্ছে।

কিরকম ব্যথা? নড়ছে নাকি?

তা জানি না, ব্যথা হচ্ছে খুব।

ব্যথার ওষুধ খাইয়ে চাপা দিয়ে রাখ। পরে দাঁতের ডাক্তার দেখিয়ে নিস। পেয়ারা পাতা সেদ্ধ করা জলে মুখ ধুতে বলিস।

ভেজা গায়ে পটল আর গোপাল বেঞ্চে বসে থাকে। ডাক্তারদাদু একটা মোটা বই পড়তে থাকে। মদন তার টুলে চুপ করে বসে থাকে। আজ আড্ডার লোক নেই, রুগী নেই।

ডাক্তার দাদু, একটা কথা বলব?

কি কথা?

ডাক্তার হতে গেলে কী করতে হয়?

কপাল লাগে। কপাল ছাড়া হয় না। আমার দু-দুটো দামড়াকে কত তৈরি করলুম, তা দুটোই ধ্যাড়াল।

খুব পড়তে হয়, না?

না পড়লে কি হয়! পড়াই তো আসল জিনিস। পড়তে হয়, বুঝতে হয়, মাথা খাটাতে হয়। শরীরের মধ্যে কি সোজা যন্ত্রপাতি রে!

একটু দমে যায় পটল। তার তো তেমন মাথা নেই, সে কি পারবে অত শক্ত জিনিস শিখতে? কিন্তু বোবা-কালো ভাইটার মায়ায় মাথানো করুণ মুখখানার দিকে চাইতে তার বুকে একটা জোর এসে পড়ে। তখন মনে হয়, গোপালের জন্যই তাকে ডাক্তার হতে হবে।

ডাক্তারদাদুর বাড়িতে বোধহয় ইলিশ মাছ ভাজা হচ্ছে। খুব গন্ধ আসছে। পাশে-বসা গোপাল একটু আনন্দান করে। তারপর দাদার দিকে মুখ তুলে তাকায়। পটল তার মুখখানার দিকে চেয়েই বুঝতে পারে, ওর খাওয়ার লোভ হয়েছে। তার ভাইটা একটু লোভী। খেতে ভালবাসে। কিন্তু চুরি করে খায় না, না দিলে খায় না। লোভ হলে শুধু পটলকে এসে ঝাঁকুনি দেয়।

পটল উঠে পড়ল। বাইরে এখনও বৃষ্টি হচ্ছে। তবে তারা দুজনেই ভিজে-মুকুস হয়ে আছে, আর ভিজলেও ক্ষতি নেই।

কোথায় চললি রে বৃষ্টি-বাদলায়? মায়ের জন্য ওষুধ নিলি না?

দাও।

চারটে ট্যাবলেটের একটা রাংতার পাতা দিল মদনকাকা।

ডাক্তার দাদু বলল, তোদের ইলেকট্রিক লাইন এসেছে নাকি? পরণ্ড দিন যেন তার টানতে দেখলাম।

হ্যাঁ। আর দু'চারদিনের মধ্যেই এসে যাবে।

হুঁঃ! খামোখা পরস্যা জলে দিচ্ছে রামজীবন। আমার বাড়িতে তো কবে থেকে আছে, তা হওয়া জ্বলে ক'দিন? ভরসা তো সেই হারিকেন লগ্নন। আদি সনাতন জিনিস। তা শখ হয়েছে যখন লাগিয়ে নে। রামজীবন পরস্যাটা যে কোথেকে আসছে!

আজকার পটল বড়দের অনেক কথার ভিতরকার অর্থ বুঝতে পারে। আগে পারত না। তার বাবা রামজীবনের যে বাজারে কিছু বদনাম আছে তা সে খুব টের পায়। কিন্তু বাবা বলেই যে, সে গাল বাড়বে, এমন নয়। আসলে বাবাকেও তার বিশেষ পছন্দ হয় না। তার বাবা রামজীবন শ্বাগলিং বা চুরি-ডাকাতি গোছেরই কিছু করে বলে, সে আবছা তনেছে। বটতলায় রামজীবনের যে আড্ডা আছে, সেখানে খুব খারাপ খারাপ লোকের জমায়েত হয়। তবে বাবার ওপর তার রাগের কারণ সেনসব নয়। রাগ হয়, কারণ মাঝে মাঝে মতাল হলে এসে রামজীবন গোপালকে বড্ড মারে। মারার কোনও কারণই নেই। গোপাল কিছু দুষ্টিমি করে না, দোষঘটিত করে না।

বৃষ্টিতে গোপালকে নিয়ে বেরোতেই সামনে ইকুলের মাঠে একটা বাজ পড়ল যেন! নীল চোখ-ধাঁধানো আলো দেখেই কুঁকড়ে গিয়েছিল পটল। শব্দটা এত জোরে হল যেন কেউ টাস করে গালে থাণ্ড মারল। আর তারপরই কান দুটোয় যেন তাল লেগে গেল একেবারে।

গোপাল হাঁ করে চেয়ে ছিল পটলের দিকে। অত বড় বাজের শব্দটা ও শুনতেও পায়নি। সবাই বলে, কানে শুনতে পায় না বলেই গোপাল কথা বলতে পারে না। কানটা যদি ভাল হয়ে যায় তাহলেই কথাও কইতে পারবে।

আজ বাজ ঠাকুর ক্ষেপে আছে মনে হয়। বটতলার দিকে একটা আর ঘোষপাড়ার দিকে দুটো বাজ বাতাসে যেন আদন ধরিয়ে দিল। ভয় হচ্ছে। এত বাজ তো কখনও পড়ে না! আকাশটা যেন আরও কালছে হয়ে এল। বাতাস বইছে রাবণরাজার মতো অট্টহাসি হেসে। বৃষ্টিতে তলোয়ারের ধার। কাদা-মাখা রাস্তায় গোপালকে নিয়ে ছুটতে থাকে পটল।

বাড়ি অবধি যেতে পারল না তারা। বৃষ্টি এত জোরে নামল, আর এত বাতাস যে পথঘাট সব গুলিয়ে গেল। বাজ পড়ছে খুব।

ইকুলবাড়ির পাকা দাওয়ায় উঠে পড়ল পটল। গোপাল খুব ঘেঁষ হয়ে দাঁড়ালো তার গায়ের সঙ্গে। ভয় পেলে পটলের সঙ্গে লেপটে থাকে গোপাল।

আজ রবিবার। ইকুল বন্ধ। চারদিকটা ঝাঁ ঝাঁ করছে। টানা লম্বা দুটো টিনের চালের ঘর নিয়ে ইকুল। একটা পাকা দোতলা বাড়ি উঠছিল, সেটার একতলার ছাদ ঢালাই হয়নি, তার আগেই টাকার জন্য কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। চার-পাঁচ বছর ধরে বন্ধ হয়ে আছে, মাঝখানে গাছ উঠেছে, দেয়ালগুলোয় শ্যাওলা।

ইকুলবাড়ির দরজা জানালা সব ভাঙা, বেশীর ভাগেরই পাল্লা নেই। তারা দুজনে একটা ঘরে ঢুকে দেখল, একটা ছাগল তার দুটো বাঁকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভিতরে। মেঝেয় ছাগলের নাদি। বৃষ্টির ঝাপটায় বেঞ্চগুলো সব ভেজা। পাগলা বাতাসে জানালার দু-তিনটে পাল্লা ঠকাস করে বন্ধ হচ্ছে, ফের মচাক করে খুলে যাচ্ছে।

পটল এই ইকুলেই পড়ে। এই ইকুল থেকে যারা পাশ করে গেছে তাদের মধ্যে একমাত্র বড় জ্যাঠামশাই ছাড়া আর কেউ বড় মানুষ হয়নি। সে কি পারবে ডাক্তার হতে? তবে বড় জ্যাঠামশাইয়ের কথা ভাবলে তার খুব অহংকার হয়। জ্যাঠামশাই ইকুলের শেষ পরীক্ষায় খুব ভাল ফল করায়, ইকুল একদিন বন্ধ দিয়েছিল।

ব্ল্যাকবোর্ডে একটা আধখাওয়া অঙ্ক জুলজুল করছে। মোছা হয়নি। অঙ্কটার দিকে চেয়ে থাকে পটল। বড় ক্লাসের অঙ্ক। সে কিছুই বুঝতে পারে না। এখনও এই ইকুলেই তাকে অনেক ধাপ পেরোতে হবে। কত কী জানতে হবে, শিখতে হবে! তারপর পাশ করেও আবার নতুন করে অনেক পড়াশুনো। পড়াশুনোর কথা ভাবতে ভাবতে তার মনটা খারাপ হয়ে যায়। মাথাটা ঝিমঝিম করে।

বেলা অনেক হয়েছে। গোপাল নানারকম ঘোঁষ ঘোঁষ শব্দ করছে। তার খিদে পেয়েছে। খিদে পেলে অমন করে। টিনের চালে একটা সুপুরির ডোঙা ভেঙে পড়ল। ছাগলটা ম্যা করে মিহি সুরে ডাকল। হঠাৎ তখন ইকুলবাড়ির ভূতের কথা মনে পড়ল পটলের। সবাই জানে। ভূতটা হল কমল ঘোষের। এই ইকুল তাঁরই তৈরি করা। মরার পরও মায়ী ছাড়তে পারেননি বলে ছুটির দিনে নির্জন দুপুরে আর গভীর রাতে নাকি ঘুরে ঘুরে ক্লাসগুলো দেখেন। অনেকেই দেখেছে।

পটল আর দাঁড়াল না। গোপালকে টানতে টানতে বৃষ্টির মধ্যেই ফের বেরিয়ে পড়ল। ঘোষপাড়ার রাস্তার পড়ে একবার ফিরে তাকাল পটল। বৃষ্টিতে আবছা ইকুলবাড়ির বারান্দার কি কমল ঘোষ দাঁড়িয়ে আছে! লক্ষ করছে তাদের? গোপালকে টানতে টানতে আরও জোরে দৌড়োতে থাকে পটল। ঘোষপাড়ার পুকুরে দুটো ছেলে গামছা দিয়ে মাছ ধরছে। অনেকক্ষণ বাদে মানুষ দেখে বুকে ফের সাহস ফিরে এল।

বাড়ির মধ্যে একমাত্র দাদুরই কোনও কাজ নেই। মানুষ বুড়ো হলে তাকে আর লেখাপড়া করতে হয় না, ডাক্তার বা মাস্টার হওয়ার চেষ্টা করতে হয় না, চুপচাপ বসে থাকতে হয়। দাদুকে দেখে তাই মনে হয় পটলের। কি করে যে দাদু শুধু বসে থাকে, তা ভেবে পায় না পটল। সে তো দু মিনিট চুপ করে থাকতে পারে না, কী যেন কুটকুট করে কামড়ার তাকে, তাড়িয়ে বেড়ায়।

আজ সারাদিন বৃষ্টি হচ্ছে। বাজ পড়ছে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হতে চলল, বৃষ্টির থামবার লক্ষণ নেই। উঠোন, বাগান, মাঠঘাট সব একাকার হয়ে গেল জলে। আজ আর কোথাও বেরোনার নেই পটলের। সারা দুপুর বই কোলে করে বসে থেকেছে পটল। পড়েনি একটা লাইনও। ভেবেছে। বড় হয়ে সে কত বড় ধনুস্তরী ডাক্তার হবে, জ্যাঠামশাইয়ের মতো কেমন দুনিয়া চষে বেড়াবে, সেইসব ভেবে ভেবেই মাথাটা ভার হয়েছে খুব। বিকেলে একটু ফুটবল খেললে হত। কিন্তু ফিরিসিলি মাঠে আজ একইটু জল। ফুটবল নামেইনি। আকাশ আরও ঘোরালো হয়েছে। এ বৃষ্টি সহজে ছাড়বার নয়।

ঘরময় জল। নানা ফুটোফাটা দিয়ে জল পড়ে। ব্যাং, পোকামাকড়, সাপখোপ অবধি ঢুকে পড়তে থাকে ঘরের মধ্যে। দেয়ালে বড় বড় কঁচো বেয়ে বেড়ায়। ঘরের মধ্যে বড় হাঁফ ধরে যায় পটলের।

দুপুরের ঘুম থেকে উঠে দাদু দাওয়ায় বসেছে। গায়ে মোটা একখানা কাঁথা জড়ানো। চেয়ে আছে সুমুখের দিকে। কী যে দেখার আছে, তা বুঝতে পারে না পটল।

নিজেদের ঘরের দাওয়া থেকে দাদুর দাওয়ার তফাত তিন হাতের বেশী হবে না। পটল সেটা লাফ মেরে ডিঙিয়ে গেল।

ও দাদু!

দাদু গম্ভীর মুখখানা তার দিকে ফিরিয়ে বলে, কি রে? ইকুলে যাসনি?

আজ, রোববার না!

রোববার বুঝি!

দাদু ওইরকম। বার মাস কিছু খেয়াল থাকে না।

কি করছ বসে বসে?

এই বসে আছি। কি আর করব?

ভোমার বসে থাকতে ভাল লাগে?

খারাপ লাগে না। শরীর নেড়ে কিছু তো করার নেই আমার। মনটা সচল রাখতে চেষ্টা করি।

মা যে বলে, অত বসে থাকলে বাত হয়।

তা হয় হয়তো। এখন ডক্কো বেজে গেছে, বাতকে আর ভয় কি?

ডক্কো বেজে গেছে কেন?

চলে যাওয়ার লগ্ন এসে গেছে রে ভাই।

তুমি কি মরে যাবে দাদু?

তা আর বলতে! পা বাড়িয়ে আছি।

মরে কোথায় যাবে?

বিশ্বপদ একটু হাসল, মানুষের বিদ্যোতে এত কিছু আছে, অথচ এ প্রশ্নটার জবাব নেই রে ভাই। কোথায় সে যায়। নাকি কিছুই থাকে না। কে জানে!

তুমি কমল ঘোষকে দেখেছো?

কোন কমল ঘোষ?

আমাদের ইকুলের হেড মাস্টার ছিল না?

ওঃ, সেই কমল ঘোষ! চিন্দো না মানে ? এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় এসে, সেই তো প্রথম ইকুল খোলার জন্য আদাজল খেয়ে লাগল। কত দৌড়-ঝাঁপ ধরা-করা করে, গাঁটগাছা দিয়ে, তবে ইকুল খুলে একটা কাজের মতো কাজ করল। নইলে চার পাঁচ মাইল ঠোড়িয়ে এ গাঁয়ের ছেলেরদের ইকুলে যেতে হত। প্রথম দিকে তো প্রায় ভিক্কে করে ইকুল চালাতে হত, মাষ্টারমশাইরা মাইনে-টাইনে যৎসামান্য পেত। খুব দূরবস্থা গেছে। তবে কমল ঘোষ ছাড়াইনি, দমেওনি। আমার সঙ্গে তেমন বনিবনা হয়নি অবশ্য। আমার বিন্যে বেশী নয় বলে ইকুলে চাকরি দিল না। আমি ভিন গাঁয়ে মাষ্টারি করতে যেতাম।

কমল ঘোষ মরার পর তার ভৃত্য দেখনি ?
ভৃত্য! না দাদা, সেরকম কিছু তো দেখিনি!
কমল ঘোষ এখন তো ভৃত্য হয়ে ইকুলে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সবাই জানে।
বিষ্ণুপদ একটু হাসল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তাহলেও তো একটা সমাধান হয় রে!
কিসের সমাধান দাদু ?
ভৃত্য হয়েও যদি থাকা যায়, তো, সেটাও তো মস্ত কথা। থাকাটাই তো আসল কথা, ভৃত্য হয়েই হোক, মানুষ হয়েই হোক।

তুমি কখনও ভৃত্য দেখনি দাদু ?
বিষ্ণুপদ একটু বিব্রত হয়ে বলে, লোকে তো দেখে বলে শুনেছি। আছে বোধহয়!
তুমি কখনও দেখনি ?
বিষ্ণুপদ একটু চুপ করে থেকে বলে, ভৃত্য কি না জানি না, তবে একবার একটা কাণ্ড হয়েছিল।
বলো! বলে উজ্জ্বল মুখে দাদুর কাছে ঘেঁষে বসল পটল।

তখন এ জায়গায় আমরা সবে এসেছি। চালচুলোর কোনও ঠিক নেই। যে যেখানে পারছে ঘর বেঁধে মাথা গোঁজার জায়গা করছে। দাস্তা হাস্কামাও হচ্ছে, ঝগড়া কাজিয়াও হচ্ছে, সরকারী লোক, পুলিশও আসছে, চোর ডাকাতি আড়কাঠিরও অভাব নেই। সে একটা অরাজক অবস্থা। বনগাঁ ক্যাম্প থেকে আমাদের এখানকার ঠিকানা দিয়েছিল সরকারী লোকেরাই। সেই অশান্তির মধ্যে অতি কষ্টে একখানা ঘর খাড়া করে আমরা আট দশটি প্রাণী কোনওরকমে আছি। হাতের টাকা ফুরিয়ে আসছে। মা একখানা করে গয়না খুলে দেয়, আমি বা বাবা গিয়ে সেটা বেচে টাকা নিয়ে আসি, তবে দুটো ভাত জোটে। এক বছর খুব কষ্ট গেছে। মায়ের বিচ্ছেদার বেচে কিছু চাষের জমি কিনে বাবা চাষবাস শুরু করে দিল। কিন্তু বুড়ো বয়সে ধাক্কাটা খুলল না। রোগে পড়ল। আমিও চাষ করতাম, কিন্তু সেইসময়ে মাষ্টারির চাকরিটা পেয়ে যাই। জমিটা ভাগে বন্দেরবস্ত করে চাকরিটা নিয়ে নিলাম। যাই হোক, বাঁধা একটা রোজগার তো। মাস গেলে ষাট সত্তরটা টাকা তো হাতে আসবে। একেবারে নির্জলা উপাস তো নয়! ইকুলটা দূরে। তখনও সাইকেল কেনা হয়নি। হেঁটেই যেতে আসতে হত। তখন শীতকাল। মাঘ মাসই হবে। প্রচণ্ড শীত পড়ত তখন এদিকটায়। মেলা গাছপালা ছিল তো! এত ঘন বসতিও হয়নি তখন। ইকুলের শেষ ক্লাস নিয়ে যখন ফিরতাম তখন অন্ধকার হয়ে যেত। জংলা রাষ্টা, ফাঁকা মাঠঘাট দিয়ে একা ফিরতে একটু গা ছুম্ ছুম্ করত। হাঁক মারলে শোনার লোক নেই। একদিন সন্ধ্যাবেলা ফিরছি। সেদিন কুয়াশাও হয়েছে খুব। রঘুনাথপুরের দহ বাঁয়ে রেখে বিষ্ণুপুরের দিকে আসছি। সামনে একটি জংলা জায়গা ছিল, আশফলের জঙ্গল। মাঝখানে দিয়ে সপ্ত পথ। একেবারে নিতান্ত রাতের মতো নিঃকরুম। শুণ্ড ঝিঝি ডাকছে।

পটল আর একটু ঘেঁষে বসল।
বিষ্ণুপদ দূর অতীতের দিকে ধূসর চোখে চেয়ে থেকে ধরা গলায় বলে, জঙ্গলটা মাঝ বরাবর এসেছি, হঠাৎ গুনতে পেলাম খুব কাছ থেকে কে যেন বলে উঠল, বিষ্ণুপদ, একটু তড়াতাড়ি যা বাবা। আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। গলাটা খুব চেনা। আমার বাবার গলা। কিন্তু বাবা এখানে এই জঙ্গলে আসবে কি করে ? তার তো বিছানা ছেড়ে ওঠারই সামর্থ্য নেই। আমি চারদিকে চেয়ে দেখলাম, কোথাও কেউ নেই। চাপ অন্ধকার আর কুয়াশায় সব ঢাকা। বললুম, কে ? কে আপনি ? কেউ জবাব দিল না। শুণ্ড একটা পেঁচা ডেকে উঠল আর হুড়ুস করে একটা বান্দুড় উড়ে গেল আকাশে। গাঁয়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আমার। কথাটা স্পষ্ট শুনেছি। ভুল নেই। কিছুক্ষণ হাত পা সব কাঠ হয়ে রই। তারপর হঠাৎ মনে হল, গলাটা বাবারই। হয়তো বাবা আর নেই। মনে হতেই প্রায় ছুটতে শুরু করলাম। মাইলটাক পথ পার হয়ে বাড়ির কাছাকাছি আসতেই কান্নার রোল শুনতে পেলাম। এসে দেখি, বাবা আর নেই।

তারপর কী করলে ?
বিষ্ণুপদ গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, কী আর করব! যা সবাই করে, তাই করলাম সব। তবে ওই একবারই একটা ঘটনা ঘটেছিল। তাই মনে হয়, মরে গিয়েও মানুষের কিছু থাকে। সবটা শেষ হয় না। কিছু একটা থেকে যায়।

সেটাই কি ভৃত্য দাদু ?
তা হতেও পারে। তবে আমার আর কতটুকু জানা আছে বল ভাই! কত কী আছে চারদিকে। টের পাই, কিন্তু ধরতে পারি না।

গ্লেন চলছে ভোরের দিকে। আলোর দিকে। পূর্বাচলে। নিচে অন্ধকার পৃথিবী। আলো ঝলমল রোম ছেড়ে একটু আগেই আবার কালো আকাশে উঠে এল তারা। লন্ডন থেকে অনেক ইতালিয়ান উঠেছিল, রোমে তারা নেমে যাওয়ায় গ্লেন এখন ফাঁকা। আইন সীটের হ্যান্ডব্রেট তুলে দিয়ে অনেকে লম্বা হয়ে ঘুমোচ্ছে। কৃষ্ণজীবন কখনও গ্লেনে ঘুমোতে পারে না। বছরে দু তিনবার সে বিদেশে যায়, সারা বছর দেশের এ-শহর ও-শহর উড়ে বেড়ায়, অজস্র মিটিং সেমিনার, কনফারেন্স

উপলক্ষে। তবু প্রেনে ঘুমোতে গেলেই এখনও তার একটা গ্রাম্য ভয় এসে বাধা দেয়। প্রেন যদি হঠাৎ ক্র্যাশ করে! প্রেন ক্র্যাশ করতে লাগা বা ঘুমোনা দুটোই যে সমান তা কি কৃষ্ণজীবন জানে না? তার ভয়টা বড়ই অযৌক্তিক, তাই গ্রাম্য। এত ওপরে ওঠার তা কথা ছিল না তা। বোধহয় তাই আজ পতনের ভয়।

আর একটা গ্রাম্যতা আছে তার। প্রেনের উইভো সীটে বসবার লোভ। এই লোভে সে এয়ারপোর্টে চলে আসে খুব তাড়াতাড়ি। যদি জাহাজে জেট অনেক ওপর দিয়ে যায় এবং নিচে নির্মেষ আকাশ ও দিনের আলোতেও তেমন কিছু দেখা যায় না, শুধু রিলিফ ম্যাপের মতো ভূমিখণ্ড বা নির্জীব সমুদ্র ছাড়া। তবু সে জানালায় ধারে বসতে চায় এবং উদয় অগ্রহ নিয়ে বাইরে চেয়ে থাকে।

তার ভিতরে এখনও অনেক ছেলেমানুষী আছে, অনেক গ্রাম্যতা আছে, অপরিণামদর্শিতা আছে। বৃষ্টি দেখলে তার আজও ভিজতে ইচ্ছে করে। কোচড়ে মুড়ি নিয়ে খোসাসমেত শশা দিয়ে খেতে ইচ্ছে করে, মায়ের কাছে বসে শীতের সন্ধ্যায় আঁকে পিঠে বানানো দেখতে ইচ্ছে করে। নিজের ফ্ল্যাটে বা হোটেলের ঘরে যখন একা হয় তখন হঠাৎ হঠাৎ সে অর্থহীন আগডম বাগডম সব শব্দ দিয়ে বেসুরো গান বেঁধে গায় এবং নেচে ওঠে। নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলার একটা বড় অভ্যাস তার অনেক দিনের। এইসব নিয়েই সে কৃষ্ণজীবন। সমাজের এক তারিক্কী মানুষ, গুরুতর মানুষ। অবাক হয়ে সে মাঝে মাঝে ভাবে—আমি কি করে এই সব হলাম?

তার ঘড়িতে এখনও লভনের সময়। কিন্তু এই সময় অনুযায়ী মধ্যরাত্রেই দিল্লিতে ভোর হয়ে যাবে। ভোরের আর খুব বেশী দেবীও নেই। তারা চলেছে আলোর দিকে। ভোরের দিকে। এক উন্মত্ত সভ্যতার সীমানা ছাড়িয়ে গরিব দেশের দিকে। দিল্লিগামী এই ফ্লাইটে সে আরও কয়েকবার এসেছে। মধ্য এশিয়ার ওপরেই ভোর হয়ে যায়। তখন এক উঘর প্রান্তর আর রুক্ষ পাহাড়শ্রেণী দেখতে পায় সে। সবুজের লেশমাছ নেই। পাথুরে নিরস সেই উষ্ম পর্বতমালায় ভিতর দিয়ে একটি সর্পিলা রেখার মতো একটিমাত্র পথ কোন দিগন্ত থেকে দিগন্তে চলে গেছে বাক খেয়ে খেয়ে, পাকসাট মেরে। সমস্ত পৃথিবীও কি ওই উষ্মতার পথে? এক অদ্ভুত আর্থিক নিয়মে জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। খাদ্য, অক্সিজেন, উৎপাদন, কর্মসংস্থান, বাসের স্থান, কর্তব্যযোগ্য ভূমির সঙ্গে অনুপাত থাকছে না সেই জনসংখ্যার। মানুষের বসতি এগিয়ে গিয়ে গ্রাস করে নিচ্ছে চাষের জমি, জঙ্গল, জলাভূমি। মানুষের কাছে তার সন্তান কতই না আদরের, অথচ পৃথিবীর চোখে সে সন্তান মৃত্তা বালাই।

প্রকৃতি শোধ নেবে? নির্মম সব রোগ, মহামারী, ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস দিয়ে হ্রাস করবে জনসংখ্যা? নাকি মানুষই মারবে মানুষকে? বেড়ে যাবে গুণ্ডহত্যা, উগ্রবাদ, দাঙ্গা, রাজনৈতিক খুন? মানুষ কি একদিন মানুষেরই মাংস খেয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে? নিজের তিনটি সন্তানকে কোন অনিচ্ছিত ভবিষ্যতের হাতে রেখে যাবে কৃষ্ণজীবন?

ঝিমুনি এসেছিল। অস্বস্তিতে হঠাৎ চটকা ভেঙে সোজা হয়ে বসল সে।

প্রেনে ডিনারটি আজ চমৎকার হয়েছিল। বারবার ঝিমুনি আসছে তার। ঝিমুনির মধ্যেই সে স্বপ্ন দেখছিল, পৃথিবীতে জনসংখ্যা কমানোর জন্য নিয়ম হয়েছে, কারও দুটির বেশী সন্তান হলে বাড়তি সন্তানদের কেড়ে নিয়ে মেরে ফেলা হবে। স্ববরটা শুনেই ইউনিভার্সিটি ফেলে বাড়িতে ছুটে এসেছে কৃষ্ণজীবন, গলা ফাটিয়ে ডাকছে, রিয়া! রিয়া! শীগগির দোলনকে লুকিয়ে ফেনে! লুকিয়ে ফেনে! ওরা কেড়ে নিতে আসছে। আদিগন্ত বিশাল এক ফ্ল্যাটে কোথা থেকে যেন আলুখালু রিয়া ছুটে আসছে আর চৌঁচিয়ে বলছে, দোলনকে যে সকাল থেকে খুঁজে পাচ্ছি না!

দুঃস্বপ্ন! চটকা ভেঙে গেল। একটু শিহরিত হল কৃষ্ণজীবন। অনেকদিন ধরেই একটি অপরাধবোধ কাজ করে তার মনের ভিতরে। তাদের তৃতীয় সন্তান দোলনকে পৃথিবীতে আনা তাদের উচিত হয়নি। পৃথিবীর জনসংখ্যার পক্ষে নিরপেক্ষ অংকের নিয়মে দোলন একটি বাড়তি মানুষ। বাহ্যিক। এই একটি বাড়তি মানুষ থেকে জন্ম নেবে আরও কিছু বাড়তি মানুষ। না, দোলনকে আনা তাদের উচিত হয়নি। কিন্তু জন্মের পর কি দোলন ক্রমে তার নয়নের মণি হয়ে ওঠেনি? দোলনকে ছাড়া এই জীবনটার কথা কি ভাবতে পারে কৃষ্ণজীবন? সে মনে মনে শিউরে ওঠে আবার। কিন্তু এও নির্মম সত্য, যে ভাবাবেগ নয়, পরিসংখ্যানই আজ সবচেয়ে সত্য কথা বলে। দোলন বাড়তি, দোলন বাহ্যিক। দোলনের জন্যই সে পৃথিবীর কাছে অপরাধী। দোলনের জন্য সে লভনের এক বিখ্যাত দোকান থেকে অনেক দাম দিয়ে নিয়ে এসেছে একটা মস্ত মেকানো সেট, ছবি আঁকার রং, পেনসিল, ভিউ মাস্টার। ভবিষ্যতের পৃথিবী দোলনকে এত আদর করবে কি?

প্রেনের মস্ত পেটের মধ্যে লাগেজ হ্যাণ্ড-এ তার সূটকেসে আরও অনেকের জন্য অনেক কিছু আছে। রিয়া এবং ছেলেমেয়েদের জন্য। কিন্তু সবচেয়ে অবাক কাণ্ড, এবার সে বিশ্বস্তপ্রায় চারটি মানুষের জন্যও কিছু জিনিস কিনেছে। কেন কিনল, কেনার কথা কেন মনে এল, সেটাই সে বুঝতে পারছে না। সম্ভবত লভনের ওয়েয়লিতে একটা দোকানের মস্ত অর্থও কাছে লাগানো একটা গ্রাম্য ছবির পোস্টারই তার জন্য দায়ী। শাড়ি পরা একটি মেয়ে কলসী কাঁখে ঘোর বৃষ্টির মধ্যে আবছা একটা পিছল পথ বেয়ে আগাছার জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পুকুরঘাটে নেমে যাচ্ছে। কলী আবছায়া মায়াভরা ছবি। পিছন ফেরা বলে মেয়েটার মুখ দেখা যায় না। কিন্তু সন্দেহ নেই, ছবিটা গ্রাম বাংলার। অথচ ওয়েয়লি হল গুজরাতি পাড়া, বাঙালি ব্যবসাদার নেই।

নিরামিষ ডিনার খাওয়াবে বলে তার বন্ধু, লভনের এক স্কুলের অংকের শিক্ষক ভানুভাই তাকে নিয়ে গিয়েছিল গতকাল। সেখানে ফুটপাথে অজস্র জাপানী শাড়ি সস্তায় বিক্রি হচ্ছে। ওসব দিকে নজর দেওয়ারও কথা নয় কৃষ্ণজীবনের। কিন্তু পোস্টারটা দেখে সে দাঁড়িয়ে গেল। মেয়েটার পায়ের চারদ্বারের নির্ভুল কচুবুন। সামনে তাড়ের ডোঙায় বাঁধানো ঘাট। অজস্র বৃষ্টির জলধার। বিষ্ণুপুর যেন উড়ে এল লভনে। দুটো বোনের কথা ভীষণ মনে পড়ল, যারা জন্মও কখনও আসবে না বিদেশে, কখনও পরনে না জাপানী সামু সান্নি শাড়ি, অতীতের সব অপমানের ওপর কি বিশ্বাসী আজও পলির আশ্রণ ফেলে যাবনি? ওদের জন্য কখনও তো কিছু নিয়ে যায় না কৃষ্ণজীবন! সে সিদ্ধান্ত নেয় আচমকা, আবেগে।

শাড়িগুলো যেমন সুন্দর, তেমনি সস্তা। ওদের জন্য কিনলে কি রিয়া কিছু মনে করবে? তার ভয় শুধু রিয়াকে।

ভানুভাই তাড়না দিয়ে বলল, আরে লে লো ভাই কুছ মেহেস্কা তো নেহি।

না, মোটেই মেহেস্কা নয়। তিন পাউন্ড মানে দেদার সস্তা। আর কৃষ্ণজীবনের তবিলে সদ্য অর্জিত প্রচুর বাড়তি পাউন্ড। তাদের কৌতুহল দেখে দোকানদারনি মাঝবয়সী গুজরাতি মহিলাও নেমে পড়লেন শাড়ি বাছতে। চমৎকার বিরল রঙের দুখানা শাড়ি মাত্র ছয় পাউন্ডে কিনে ফেলল কৃষ্ণজীবন। তারপরই হঠাৎ মনে পড়ল, রামজীবন আর বামাচরণের বউয়ের কথা। দুই বোনকে শুধু দিলে ভাল দেখাবে কি? সুতরাং আরও দুখানা কিনল সে। এখন দিল্লিগামী বিমানে ভোরের প্রত্যাশায় বসে পৃথিবীর দূষণজনিত দূচিস্তার মতোই একটা মৃদু উদ্বেগ অনুভব করল সে। দেওয়াটা উচিত হচ্ছে কি? সংসারের নিয়ম এর কী ব্যাখ্যা করবে? কেমনভাবে নেবে রিয়া?

মনচক্ষে সেই পোষ্টারটা দেখতে পায় কৃষ্ণজীবন। দোকানদারনি বলতে পারেনি, ছবিটা কার আঁকা বা কোন প্রদর্শনের ছবি। কিন্তু মনটা ভারী শিথ হয়ে যায়। গাছপালা, বৃষ্টি, পুকুরঘাট আর সেই মেয়েটি। কী সুন্দর! যেন তার শৈশবের একটা জানালা খুলে গেল হঠাৎ।

একটা পোষ্টারও কত কী করতে পারে!

আবার ঝিমুনি এল কৃষ্ণজীবনের।

হাই।

আরে অনু! কী খবর?

অনু তার সুন্দর চোঁটদুটি ভেঙে হাসির উৎস খুলে দিয়ে বলে, ভাল আর কই! ভালবাসা পেলে লোকে ভাল থাকে, তাই না? আমাকে তো কেউ ভালবাসে না!

তাই বুঝি? কেন তোমাকে কেউ ভালবাসে না? তুমি তো লাভেবল!

মোটেই না। আমার বাবা আর মায়ের সব ভালবাসা নিয়ে নেয় আমার দাদা আর দিদি। আমি বাড়িতে থাকি অরফ্যানে মতো।

অত সহজ নয়। মা আর বাবার ভালবাসা কি অত সহজে মাপা যায়? সে ভালবাসা তো শুধু আবেগ নয়, তাতে শাসন, নিয়ন্ত্রণ, দায়িত্ব, উদ্বেগ সব মিশে থাকে। ওটা বুঝতে একটু সময় লাগে।

তাই বুঝি? আমার কি বুদ্ধি নেই? আমি কি বুঝি না?

আমার বড় দুই ছেলেমেয়েও বোধহয় তোমার মতোই ভাবে। তারা বোধহয় ভাবে, আমি তাদের ভালবাসি না। সেটা তাদের বোধার ভুল এবং কমিউনিকেশনের অভাব।

ইউ আর নট ক্যাপেবল অফ লাভিং। সেইজন্যই তো আমি ফিলাডেলফিয়া চলে যাচ্ছি, সুমনের কাছে।

সুমন! সে কে বলো তো!

আপনি বুঝি আমার সব বয় ফ্রেন্ডকে চেনেন! সুমন সিং আমার বয়ফ্রেন্ড। দার্লিন শার্ট। ইন দি মেকিং অফ এ বিগ ডক্টর।

বয়ফ্রেন্ডের কাছে যাচ্ছে! তার সঙ্গেই থাকবে নাকি?

হোয়াই নট! উই উইল লিভ টুগেদার।

সে কী?

অনু কাঁধ দুটো ঝাঁকিয়ে বলে, সো হোয়াট! আমাদের সময়ে আমরা আদিকালের সব নিয়ম আর ভ্যালুজ উড়িয়ে দেব। আমরা মানি না যে, ম্যারেজস আর মেড ইন হেডেন। লিভ টুগেদার করলে কত সুবিধে বলুন তো!

কৃষ্ণজীবন অনুর দিতে চেয়ে বলে, যদি গিয়ে দেখতে পাও যে, সুমনও আর একটা মেয়ের সঙ্গে বসবাস করছে?

অনু ফের কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, সো হোয়াট? আমি তো আর জেলাস টাইপের নই। সুমন না চাইলে আমি আর একজন ফ্রেন্ডকে খুঁজে বের করে নেবো।

হতাশ মৃত কণ্ঠে কৃষ্ণজীবন বলে, তুমি এরকম কেন অনু? নর-নারীর সম্পর্কের মধ্যে কি কোনও রচনা নেই? কোনও নির্মাণ নেই?

অনু খিলখিল করে হেসে উঠে বলে, আপনি ভীষণ গুস্ত টাইমার।

তা হবে।

হঠাৎ অনু তার দিকে ঝুঁকে মুখের পানে সকৌতুকে চেয়ে থেকে বলে, রাগ করলেন?

কৃষ্ণজীবন মাথা নেড়ে বলে রাগ নয়। মনটা খারাপ লাগছে।

আচ্ছা, আপনি কেন নিজেকে বদলাতে পারেন না বলুন তো!

বদলাবো! কেন বলো তো!

আপনি ভীষণ সেকেলে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন আর ইনস্টিটিউশন্যাল, তাই না!

তাই নাকি?

তাই-ইতো। নইলে কেন ম্যারেজটাকে এত ভ্যালুয়েবল মনে করেন?

ম্যারেজ থেকেই তো ফ্যামিলি, আর ফ্যামিলি থেকে ক্র্যান। পরিবার হল মানুষের ভিড়। তার শিকড়। পরিবার না থাকলে মানুষ পরগাছার মতো হয়ে যায়, যাযাবরের মতো জীবনযাপন করে।

আপনার পরিবার কি আপনারকে শিকড় মেলতে দিয়েছে? তাহলে আপনি কেন আর গাঁয়ের বাড়িতে যান না? আপনার নিজের পরিবারের সঙ্গে কেন আপনার মাখামাখি নেই?

কৃষ্ণজীবন মাথা নেড়ে বলে, তোমার দেখার মধ্যে একটু ভুল আছে। বাইরে থেকে বোঝাও যায় না, কিন্তু পরিবার মানুষকে কিছু একটা দেয়ই। সেটা হয়তো তার একটা পরিচয়, একটা পদবী, একটা ঠিকানা। আর এই আইডেন্টিটিই তাকে লক্ষ কোটি মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যেতে দেয় না।

আমি তো হারিয়েই যেতে চাই! কি হবে বাবা-মা-ভাই-বোন আঁকড়ে থেকে বলুন তো! আমার তো একদম ভাল লাগে না। বাবা-মায়েরা ভীষণ ন্যাগিং টাইপের হয়, ইচ্ছেমতো চলতে দেয় না, এটা বারণ করে, সেটা বারণ করে। আমাকে আমার মতো হতে দেয় না কিছুতেই।

তুমি কিরকম হতে চাও?

আমি আমার মতো হতে চাই। আমার ইচ্ছেমতো যা-খুশি হবে, যা-খুশি করব। কোনও প্রম্পটার চাই না। লাইফ ইজ নট এ গাইডেড ট্যুর।

কৃষ্ণজীবন সামান্য ঘামতে থাকে দুচিন্তায়। অনুর দিকে চেয়ে থেকে বলে, ভাই তুমি ফিলাডেলফিয়া চলে যাচ্ছে?

আবার টোন্টের মনোরম একটা ভঙ্গি করে অনু বলে, যেতাম না তো, যদি এখানে কেউ আমাকে ভালবাসত।

তুমি জানো না, তোমাকে কতটা ভালবাসেন তোমার মা আর বাবা।

ওরকম ভালবাসার কথা বলছি না। আই অ্যাম টকিং অ্যাবাউট রোমান্টিক লাভ।

ওঃ, মাই গড! রোমান্টিক লাভ! তার জন্য তো বয়স পড়ে আছে তোমার সামনে।

এইটেই তো ঠিক বয়স। আর বেশী বয়স হলে আমার মন যে হিসেবী হয়ে যাবে। ভাঙচুর করতে পারব না যে।

ভাঙচুর করতেই হবে?

করণ মুখ করে অনু বলে, নইলে যে কেউ আমাকে ইম্পট্যান্স দিচ্ছে না। টিন এজার বলে ভীষণ নেগলেট করছে!

ওটা তোমার ভুল ধারণা। কেউ তোমাকে নেগলেট করছে না। কিন্তু বয়ঃসন্ধিতে মানুষ একটু বেশী সেন্টিমেন্টাল হয়,

তাই সবাই নেগলেট করছে বলে ভাবে।

অনু মাথা ঝামরে বলে, অন্তত একজন তো করছেই। আর তার জন্যই তো আমি সুমন সিং-এর কাছে চলে যাচ্ছি। রাগ করে।

কে নেগলেট করছে তোমাকে?

আপনি।

আমি! বলে ভীষণ বিব্রত হয়ে পড়ে কৃষ্ণজীবন, আমি তো কই তোমাকে নেগলেট করি না। কত আড্ডা দিই তোমার সঙ্গে।

তাই বুঝি! আমি কিন্তু ঠিক টের পাই, আপনি আমাকে একদম পান্ডা দিতে চান না। ইউ আর ম্যারেড টু ইওয়ার ওয়াইফ, ইউ আর ম্যারেড টু ইওয়ার ওয়ার্ক, ইউ আর ম্যারেড টু ইওয়ার ফ্যামিলি, আমার জন্য আপনার একটুও ভালবাসা নেই।

আচ্ছা বাবা আচ্ছা। কী করলে প্রমাণ হবে যে—বলে কৃষ্ণজীবন ব্যাকটা সঙ্কোচবশে অসমাপ্ত রাখে।

অনু খিলখিল করে হাসে, আগে বলুন, আমার জন্য লভন থেকে কী এনেছেন!

তোমার জন্য? ওঃ, তোমার জন্য ... শাড়ি—হ্যাঁ একটা দারুণ শাড়ি!

দূর! শাড়ি আমি পরি নাকি?

তাহলে?

এক বাস্ক চকোলেট আনলেন না কেন?

চকোলেট! বলে হাঃ হাঃ করে হাসতে চেষ্টা করল কৃষ্ণজীবন। কী ছেলমানুষ! বালিকা বললেই হয়।

একটা এয়ারপকেটে জপ করে কিছুটা নেমে গেল প্লেন।

চটকা ভেঙে চোখ চাইল কৃষ্ণজীবন। না, লজ্জার কিছু নেই। স্বপ্ন স্বপ্নই। তবু নিচে উষর এক পাথুরে ভূখণ্ডের উপর ভোরের অপরূপ আলোর দিকে চেয়ে নিজের কাছে নিজেকেই লুকেতে ইচ্ছে করে কৃষ্ণজীবনের। অনূকে নিয়ে স্বপ্ন দেখার মধ্যে কোনও গোপন পাপ নেই তো মনে?

মন বড় বিচিত্র এক জিনিস। কিছুতেই তার টিকির নাগাল পাওয়া যায় না। মন কতভাবে যে নাকল করে বেড়ায় মানুষকে। নইলে সে কেন তার অবচেতন মনেও অনুর চিন্তা পোষণ করবে? কোনও মানে হয় এর?

গায়ের আর একটা জিনিস সঙ্গে করে এনেছে কৃষ্ণজীবন। খিদে। তার প্রেশার, ব্লাডসুগার, কোলেস্টেরল নেই।

সেজন্য বাঘের মতো খায়। তার খিদে প্রচণ্ড, ব্রেকফাস্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে গোটা ট্রে চোখের পলকে উড়িয়ে দিল।

দিল্লি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে সারাটা দিন পড়ে থাকতে হল কৃষ্ণজীবনকে। সে রিক্লাইনিং চেয়ারে পড়ে পড়ে ঘুমোলে। তারপর বিকেলে ধরল কলকাতার প্লেন।

উইসকনসিন ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা ও গবেষণার চাকরির একটা প্রস্তাব তার কাছে এসেছে। মনস্থির করতে পারে না কৃষ্ণজীবন। সে গায়ের ছেলে। গরিব গ্রাম, গরিব দেশ। আমেরিকায় গেলে সে লোভনীয় চাকরি পাবে, থাকবে মহা আরামে। তার চেয়েও বড় কথা, তার কাজের পরিসর বেড়ে যাবে অনেক। খুব খুশি থাকবে রিয়া এবং তার তিন ছেলেমেয়ে। সবই ঠিক। তবু বিদেশে বসবাসের কথা ভাবলেই কেন যে তার ভিতরটা হাহাকার করে ওঠে। এই নোংরা, গরিব, জনাকীর্ণ অকৃতজ্ঞ স্বদেশ কেন যে তাকে সম্বাহিত করে রেখেছে কে জানে! না, কোনওদিনই দীর্ঘ প্রবাস তার সহ্য হবে না।

চারটে শাড়ি নিয়ে রাতে রিয়া তার বিষ ওগরাল।

কেন ওদের শাড়ি দেবে? ওরা কি তোমাকে চেনে? দাদা বলে খাতির করে? ঝগড়ার সময় তো পারলে গলাধাক্কা দিয়েছিল।

কৃষ্ণজীবন ব্যথাহত মুখে বলল, সংসারে তো ভুল বোঝাবুঝি হয়। তা বলে সম্পর্ক তো মিথ্যে হয়ে যায় না।

ও সম্পর্ক কোনও সম্পর্কই নয়। চুকেবুকে গেছে, ওদের নিয়ে ফের মাতামাতি শুরু করলে পেয়ে বসবে।

আমি ওদের কখনও কিছু দিই না। কখনও না। সব লেনদেনই তো বন্ধ। এটা কি ভাল?

লেনদেনের কথা বলছে। তাহলে বলি, সম্পর্ক থাকে দেওয়া আর নেওয়ার মধ্যে। তুমি তো দিলে, ওরাও কিছু দিক। এই তো সেদিন বীণা হঠাৎ করে এসে হাজির। হাতে দু' টাকার মিষ্টির ব্যস্ত ও তো ঘরে আনেনি ভাইপো-ভাইবিরদের জন্য! অবাক হয়ে কৃষ্ণজীবন বলে, বীণা এসেছিল ?

তুমি লন্ডন যাওয়ার তিন চারদিন পর।

কী বলল ?

কী আবার বলবে! বোধহয় দাদার সংসারটা একটু দেখে গেল, গিয়ে কুটকচালি করবে। বরটা তো একটা হাঁদা গঙ্গারাম।

কিছু বলেনি ? কোনও দরকারের কথা ?

না। হয়তো তোমাকে পেলে বলত।

কৃষ্ণজীবন একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বলে, তোমাকে ভয় পায় ওরা। তাই কিছু বলেনি। হয়তো বিপদে পড়ে এসেছিল।

তার মানে তোমার মাথায় হাত বোলতে। তোমার ওই বোনটি কিন্তু সোজা পাত্রী নয়। শুনতে পাই সে যাত্রা থিয়েটার করে বেড়ায়। চরিত্রের কোনও বালাই নেই। স্বামীটা তো মেনিমুখে! খুব সাবধান কিন্তু। পেয়ে বসবে। একবার সাহায্য করলে বারবার করে যেতে হবে।

কৃষ্ণজীবন এখনও সংসারের সব প্যাঁচ বোঝে না। তবে সে বিমর্ষ বিবর্ণ মুখে বসে রইল। কথাটা মিথ্যে নয় যে, বীণাপানি যাত্রায় নেমেছে।

রিয়া গম্ভীর মুখ করে বলে, কিছু মনে কোরো না, তোমার যা স্ট্যাটাস, যা নাম, তাতে এইসব সাব স্ট্যাডার্ড লোকজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাটা ভীষণ বেমানান। কথাটা যতই খারাপ শোনাক, কিন্তু খুব সত্যি।

কৃষ্ণজীবন একটাও কথা বলতে পারল না। হার মেনে নিল। রিয়া শাড়ি চারখানা তুলে রাখল তার নিজস্ব আলমারিতে। চিরকালের মতো।

রাত্রে ঘুম হল না কৃষ্ণজীবনের। কেন যে খুব মনে পড়ছে ওদের কথা! তার ভাইবোন যদি নষ্ট হয়ে দিয়ে থাকে তবে তা কার দোষ ? ওরা যদি সাব স্ট্যাডার্ড থেকে গিয়ে থাকে তবে তা কার দোষ ? তার সঙ্গে যে ওদের যোজন যোজন তফাত হয়ে গেল সে কার দোষ ? ছোট্ট বীণা তো তার হাত ধরে ধরে হাঁটতে শিখেছিল। সাইকেলের রডে পাখির মতো হ্যান্ডেল আঁকড়ে বসে থাকত আর তাকে নিয়ে নিয়ে পাড়ায় টহল দিত কৃষ্ণজীবন। ডাবলে কত কী মনে পড়ে! আর এক বোন সারা, তাকে কত কাল দেখেনি সে। রামজীবন, বামাচরণ, শিবচরণ এদের সবাই যে একদিন লতানে গাছের মতো উষ্ম হয়ে তাকে আঁকড়ে ধরে উঠে আসতে চেয়েছিল অন্ধকার থেকে আলেয়। অশিক্ষা, দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা, আত্মবমাননার হাত থেকে আকাশের ঈশ্বর নয়, দাদাকেই তারা বেশী নির্ভর করত।

এগারোতলার ছাদে নিশত রাত্রে ভূতশব্দের মতো উঠে আসে কৃষ্ণজীবন। আকাশে কালো ঘন মেঘ। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। তুমুল হাওয়া। ফাঁকা ছাদে আলসের ধারে দাঁড়িয়ে বিপুল শহরের অন্ধকার দিগন্তের দিকে শূন্য চোখে চেয়ে থাকে সে। ভেজে। শীত করে।

উজানে যাবে কি নদী ? আবার কি রচনা করা যাবে সব বিস্মৃত সম্পর্ক ? নাকি ভুলে যাওয়া ভাল ?

সে ঠিক বুঝতে পারে না। শুধু বুঝতে পারে, তার বুকের প্রকাণ্ডে বড় গোপন একটা ব্যথা হয়। তার চোখে জল আসতে চায়। তার বুক ফাঁকা হয়ে যায় হাহাকারে।

অনেক রাত। বৃষ্টির তোড় বাড়ল সাজ্যাতিক। হাওয়ায় প্রায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে কৃষ্ণজীবনকে। তবু সে শান্ত ও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির অজস্র চাবুক খেল সারা শরীরে। এ যেন তার প্রায়চিত্ত। এ যেন তার নানা অপরাধের গুণাগার। এ যেন মাটি ভুলে গিয়ে বৃষ্টির অনুতাপ।

একসময়ে তার শরীর ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল শীতে। হাত পা অসাড়, কান বধির, চোখ দৃষ্টিহীন হয়ে যাক্ষিল প্রবল বৃষ্টিতে।

তারপর একসময় সিঁড়িতে শরীরের জল ছড়িয়ে ধীর পায়ে নিজের ফ্ল্যাটে নেমে এল সে। দরজা খুলল। গা মুছল। তারপর নিজস্ব স্টাডিতে বসে রইল চুপ করে। বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়ল।

॥ ২৩ ॥

বনগাঁয়ের জমাটি অঞ্চলে নয়, খানিকটা দূরে, গরিব পাড়ায় তার দুঃখী ঘরখানা। উঠোন ছাপিয়ে বর্ষার জল ঘরে ঢুকতে চাইছে। কয়েক আঙুল মোটে বাকি। ঘরের মাটির ভিত গলে যাচ্ছে জলে। এখানে সেখানে গর্তের মুখ যাচ্ছে খুলে। সাপ, ইঁদুর, ব্যাঙ, উচ্চিৎড়ে, বিছে ঢুকে পড়েছে ঘরে। সারা দিন একরকম জলবন্দী হয়ে আছে তারা। বীণাবাণি আর নিমাই। শুধু বীণা জানে, যতটা দেখায়, ততটা গরিব সে আর নয়। জালার নিচে, মাটির গভীরে প্রান্তিকে মোড়া অনেক ডলার।

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। তাই বুঝি আজকাল তার অশ্বল বেড়েছে তিনগুণ! হাতে পায়ে জোর নেই। অল্প পরিশ্রমেই হাঁফ ধরে। কড়ার নিচে ব্যথা হয়।

নিমাই আর সে কথা ফুরিয়ে ফেলেছে। ঘরে মাত্র দুটি প্রাণী, বাইরে দুর্ভোগ, টানা বৃষ্টি, জল। যাত্রার রিহার্সাল বন্ধ, কোথাও যাওয়ার নেই। দুদিন তারা ঘর থেকে বেরোয়নি। আজ তৃতীয় দিনে সকালবেলাটা ভেজা, স্নাতানো। বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে। নিমাই বসে আছে দরজার কাছে। হাতে একটা কঞ্চি। জল মাপছে। চৌকালের নিচেই জল। বীণাবাণি বসে আছে তাদের স্নাতানো বিছানায়।

তিন দিন আগে রিহার্সালে গিয়ে সন্ধেবেলায় শুনল, রিহার্সাল হবে না। কাকার বাজারের ঘরখানা থমথমে। লোকজন নেই। কাকা বসে বসে লম্বা খাতায় পালা লিখছে।

এই শান্ত বিভোর চেহারাটা দেখে বোঝা ও যাবে না যে, এর একটা অন্য চেহারাও আছে। সেই চেহারাটা কেমন তা অবশ্য বীণাবাণি জানে না। জেনে কাজও নেই। এই বিভোর চেহারাটাই সে মনে রাখতে চায়। অন্য চেহারাটার কথা ভাবলে তার ভয় করে। সেদিন ভোরবেলায় তার বাড়িতে গিয়ে যখন দলবল নিয়ে হাজির হয়েছিল কাকা, তখন সেই অন্য চেহারার একটা ছায়া দেখেছিল বীণা। ধরা পড়লে কাকা তাকে কী করত? মারত? তাড়িয়ে দিত? ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন সেদিন। কিন্তু তার পরও কয়েকটা দিন সে কাকার মুখোমুখি হলে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করেছে।

কাকার সামনে একটা বেঞ্চে বসে বীণা চুপ করে চেয়ে ছিল।

কাকা খাতা থেকে মুখ না তুলেই বলে, কি খবর বীণা?

খবর আর কি? পালা কবে নামবে তাই ভাবি। বসে বসে আর ভাল লাগছে না।

কাকা মৃদু গলায় বলে, সময় হোক। এই বাদলার সময়টায় আমাদের খুব আকাল।

তা জানি। এ সময়টায় অন্য কোনও কাজ পেলে হত।

কেন, তোমার কি ঘরসংসারের কাজ নেই?

বীণা একটু লজ্জা পেয়ে বল, গরিবের সংসারের আর কত কাজ থাকবে বোলা তো!

ছেলেপুলে হোক, তখন দেখবে কাজ করে কূল পাবে না।

বীণা মুখটা ঘেন্নায় ফিরিয়ে নিল। ছেলেপুলের কথা এখন সে ভাবতেই পারে না। ওসব ঝগড়াট আর পোষাবে না।

কাকা ভাঁড়ের চা আনাল।

বীণা চা খেতে খেতে বলল, অন্তত রিহার্সালটা হলেও একটু সময় কাটবে।

জানি। সাত আটটা দিন বাদ দিয়ে রিহার্সাল ফের শুরু হবে। এখনও সেই ঝগড়াটা যাচ্ছে। তাই বন্ধ রেখেছি।

কোন ঝগড়াট?

নতুন করে আর কী শুনবে! সবাই তো জানে। পগা খুন হওয়ার পর থেকে পাপা সিং নানা গুণগোল পাকাচ্ছে, জানো না?

বীণার বুকা ধক করে ওঠে। পগা নামটাই আজকাল তার শত্রু। সে আবছা শুনেছে বটে, পাপা সিং হল পগার মহাজন। বিরাট, পয়সা, দুর্দান্ত মানুষ। পগা ছিল তার বিশ্বাসী লোক। তার ওপর অতগুলো ডলার আর পাউন্ড খোয়া যাওয়াতে লোকটা ক্ষেপে গেছে।

বীণা বিবর্ণ মুখে বলে, এখনও মেটেনি?

এগুলো মেটে কখন জানো? পাল্টি দু-একটা লাশ পড়ার পর। তার আগে নয়।

মা গো! বীণার ভিতরটা যেন অবশ হয়ে যায়। এ সবের জন্য কি সে-ই দায়ী?

বিবশ গলায় বীণা স্বগতোক্তির মতো বলে, খুন হবে!

কাকা চায়ের ভাঁড়টা জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে বলে, সেরকমই মনে হচ্ছে। মনটা তাই ভাল নেই।

বীণা সম্বোধিতর মতো কাকার দিকে চেয়ে থেকে অপলক। এ লোকটা তার অনুদাতা, এ লোকটা তার শরীর চায়নি কখনও, এ লোকটা তাকে পাঁচজনের চোখের সামনে তুলে ধরেছে। আজ এর বিপদের সময় কি বীণার কিছু স্বার্থত্যাগ করা উচিত?

বীণা সামান্য হাঁফসানো গলায় বলে, পাপা সিং কী চায় বোলা তো!

কাকা বাইরের দিকে চেয়ে থেকে মৃদু গলায় বলে, কি আর চায়। ডলার আর পাউন্ডগুলো ফেরত চায়, তার বিশ্বাসী লোকের খুনের বদলা চায়।

বনগা তোমার এলাকা, এখানে ও লোকটা তোমার কী করতে পারে?

কাকা স্নান হেসে বলে, ওসব বাইরে থেকে মনে হয়। হিসেবটা অত সহজ নয়। এই এলাকায় বহু লোক আছে যারা দু-চার হাজার টাকায় দু-তিনটে খুন হাসতে হাসতে করে যাবে। পাপা সিং-এর অনেক টাকা।

বীণার বুকা হিম হয়ে গেল কথটা শুনে। সে কাকার দিকে অর্থহীন চোখে চেয়ে থেকে স্থলিত গলায় বলে, আমার ভয় করছে কাকা। কী হবে তাহলে!

কাকা উদাস চোখে বীণার দিকে চেয়ে বলে, দুনিয়াটা বড় কঠিন ঠাই বীণা। আমার রাস্তায় সবসময়েই বিপদ।

বীণা দুর্বল গলায় বলে, মিটামিট করে নেওয়া যায় না?

কাকা বিষণ্ণ মুখে বলে, মিটামিট করতেই তো চেয়েছিলাম। খুনটা যারা করেছে, তারা দুজন আমার ডান হাত আর বাঁ হাত। তারা এখন ফেরার। ফলে কাজ-করবার বন্ধ হওয়ার মুখে। আমাকে মুশকিলে পড়ে যেতে হয়েছে। তারা খুব কাজের ছেলে ছিল। মিটামিট করে ফেলতে পারলে দুজন ফিরে এসে কাজে হাত দিতে পারত। কিন্তু পাপা সিং বিগড়ে আছে। শুনছি এখানে অনেকের সঙ্গে কথাটা বলছে, প্রায়ই আসছে, যাচ্ছে। কিন্তু আমার সঙ্গে আর দেখা করছে না। তাইতেই বুঝতে পারছি যে একটা কিছু করবে। ভয়টা পাপা সিংকে নয়, ভয় এখানকার ছেলে-ছোকরাদের। এদের মধ্যে অনেকেই পগার বন্ধু ছিল। তারা পাপার সঙ্গে গা ঘষাঘষি করছে।

এ কথায় আরও বিবল হয়ে গেল বীণা। লটারিওয়ালা পল্টুও তো পগার বন্ধু ছিল। পল্টু কি জানে? পল্টুকে যেন আজকাল, কেমন কেমন লাগছে বীণার। মুখে তেমন কিছু বলছে না, কিন্তু যেন একটু ইশারা ইঙ্গিত দিচ্ছে। পগা কি সেই রাতে ওকে কিছু বলে গিয়েছিল। পল্টু কি পাপা সিংকে বলে দেবে?

বুকের ভেতরটা এমন ভোলপাড় করতে থাকে যে, একটা বাখাই চাগাড় দিয়ে ওঠে যেন। বীণা ‘উঃ’ বলে মুখে হাত-ঢাকা দিয়ে শক্ত হয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

পার্শ্ব—১৩

কাকা একটু উদ্বেগের গলায় বলে, কি হল তোমার ? অশ্বলের ব্যাথাটা নাকি ?

বীণা একটু থম ধরে থেকে মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ।

তাহলে বাড়ি চলে যাও। চা না খেলেই পারতে। অশ্বলের অসুখে চা-ফা খেতে নেই।

অশ্বলের ব্যথার চেয়েও অনেক বড় ব্যাথা ঘনিয়ে আসছে বীণার কপালে। ঠাকুর না কক্কন, কাকা যদি খুন হয়, তাহলে বীণার ভাত জুটবে না। আলেয়ার মতো মিলিয়ে যাবে যাত্রার মন্দির মায়াময় আলোর রোশনাই। দর্শকের হাততালি। এই একটা লোকের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তার অদৃষ্ট। আশ্চর্যপূর্ণ।

মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছিল তার। একথা ঠিক যে, যাত্রায় নেমে তার আরো দুটো হাত গজায়নি বা টাকাপয়সার ছড়াছড়িও হয়নি। তবে পায়ের নিচে একটু দাঁড়ানোর মতো জমি পেয়েছে, আর ভবিষ্যতের একটি রঙিন ছবি টাঙাতে পেরেছে চোখের সামনে। সব যাবে। কাকা যদি যায়, তো সব ভেসে যাবে বীণার। উঠে যাবে বিশ্ববিজয় অপেরা। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তড়ানোর মতো মানুষ এ যুগে তো বেশী নেই!

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে বীণা। মাথাটা এমন হয়ে আছে যে, পরিষ্কার করে কিছু ভাবতেই পারছে না। তার মন প্রশান্তির মতো বলছে, কাজটা ঠিক হচ্ছে না। কাজটা ঠিক হচ্ছে না।

বীণা শুধু একটা কথাই জিজ্ঞাস করতে পারল, অনেক কষ্ট করে বলতে হল যেন। ধরা গলায় বলল, তাহলে কি হবে কাকা ?

কাকা তার দিকেই চেয়ে ছিল। বলল, সেটা নিয়েই তো ভাবছি। তবে ঝগড়াটা তো আর চিরকাল থাকবে না। এই দেখ, এবার নিজে পালা লিখি। মনের মতো করে। খুব জাঁকজমক করে নামাবো। প্রথম শো করব কলকাতায়। কলকাতাকে দেখিয়ে দিতে হবে যে, মফস্বলেও ভাল জিনিস হয়।

কথাগুলো বীণার কানে ঢোকে, কিন্তু তাকে চেতিয়ে তুলতে পারে না। সে বিহ্বলভাবে চেয়ে থাকে শুধু। কাজটা সে ভাল করছে না। তার জন্যই যদি খুনখারাপ হয় তবে সেই পাপ কি তাকেও অর্শাবে না ? তার চেয়েও বড় কথা, পল্টু যদি বলে দেয় ? পল্টু যদি শত্রুতা করে ?

বীণা দুর্বল শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়ায়, আসি কাকা।

এসো। কয়েকদিন বিশ্রাম করে শরীরটা ঠিক করে নাও। আট দশ দিন বাদে রিহার্শাল শুরু হবে।

বীণা বেরিয়ে আসে। রাত্তায় পড়ে একটু এগিয়ে যেতেই পল্টুর লটারির দোকানটা চোখে পড়ে। লোডশেডিং-এ হাজারক জেলে বসে আছে। দু-তিনটে ছেলেছোকরা আড্ডা দিচ্ছে।

পা ভারী লাগছিল বীণার। পল্টু শত্রুপক্ষের লোক কিনা তা সে বুঝতে পারছে না। কিন্তু দিদি বলে ডাকে, ভদ্র ব্যবহারও করে। আবার এমনভাবে তাকায় যে, নানা সন্দেহে বুকটা দূরদূর করে ওঠে বীণার।

একটু দূর থেকেই বীণা অভিনয়ের গলায় বলল, এই পল্টু!

পল্টু হাজারকের আলো থেকে অন্ধকারে ভাল দেখতে পেল না তাকে। চোখটা হাত দিয়ে আড়াল করে বলল, কে! বীণাদি ?

হ্যাঁ।

কি খবর ?

খবর তো তোর কাছে। আমার টিকিটে প্রাইজ উঠেছে কিনা দেখেছিস ?

পল্টু হাসল, তোমার আর লটারির প্রাইজের দরকার কী ?

বীণার কয়েক সেকেন্ড লাগল কথাটা বুঝতে, তারপর হঠাৎ তার মনে হল, এ-কথাটার দু' নম্বর একটা অর্থ আছে। বুকটা কঁপে গেল। গলাটা শুকিয়ে গেল।

পল্টু খুব হালকা গলায় বলল, আর একটা টিকিট নেবে ? এক কোটি টাকা প্রাইজ। খেলা পরশু!

না, আজ নয়।

ছেলেগুলো না থাকলে বীণা পল্টুর সঙ্গে একটু কথা বলত। আর কথা বাড়াল না সে, বাড়ি ফিরে এল। তখন নিমাই ঘরে ছিল না। বীণা ঘরে এসে আলো জ্বেলে ঠাকুরের আসনে একটু ধূপ দীপ জ্বেলে, জল বাতাসা দিয়ে চুপ করে বসল বিছানায়। অনেক ভাবতে হবে তাকে এখন। তবে একটা কিছু ঠিক করতে হবে।

বীণা চোখ বুজে সব ঘটনাটা মনে মনে ঝালিয়ে নিল। বৃষ্টির মধ্যে পগার আসা, চলে যাওয়া। তারপর তার খুনের খবর। তারপর অনেক কিছু। সেই থেকে বীণার জীবনে শান্তি নেই। বৃকে শঙ্ক হয়, মনে সবসময়ে ভয়-ভয় ভাব। তার তেমন অন্তরঙ্গ আর বিশ্বাসী কেউ যদি থাকত, তাহলে তাকে সব বলে, পরামর্শ নিতে পারত বীণা। কিন্তু কেউ নেই তার। নিমাই আছে বটে। কিন্তু ও বড় বেশী সং আর বোকা। শুনেই চোঁচোমেচি করবে, ভয় খাবে, টাকা ফিরিয়ে দিতে বলবে। কে জানে, হয়তো পাঁচজনকে বলেও বেড়াবে।

সেদিন কলকাতায় গিয়ে বড়দাকে পেলে খুব ভাল হত। বিদেশী টাকা দিয়ে স্বদেশী টাকা নিয়ে আসতে পারত। তা হল না।

এখন তার কী করা উচিত ? কাকাকে যদি বাঁচাতে হয় তবে বাস্তবলতা তার ফেরত দেওয়া উচিত। গল্প একটা বানিয়ে বললেই হবে। তাই কি করবে বীণা ?

তার ততদূর হিসেবনিকেশ জানা নেই, যাতে কত ডলার আর পাউন্ডে কত টাকা হয়, তা হিসেব করে দেখবে। আসলে কত পাউন্ড আর ডলার বাস্তবে আছে তাই সে আজ পর্যন্ত ভাল করে শুনে দেখেনি। তবে অনেক আছে। ভাঙলে যা হবে তাতে সারা জীবন চলে যাবে বীণার। শুধু চলেই যাবে না, আরও কিছু বেশীই ভাল থাকতে পারবে তারা। কাকার হাত-তোলা হয়ে, অনুদাস হয়ে থাকতে হবে না তাদের। উজ্জ্বল শৈশব হবে।

নিমাই একটু বেশী রাতেই ফিরল। হাবড়ায় গিয়েছিল কীর্তন করতে। ভাত খেতে বসে বলল, আজ তোমাকে খুব ভাবিত দেখাচ্ছে।

ভাবিত! তাহলে আমার মুখের দিকে তাকাও মাঝে মাঝে ?

নিমাই হেঁ হেঁ করে বিনয়ী হাসি হেসে বলে, শোনো কথা! তোমার চন্দ্রবদনটি ছাড়া আর কোনও মেয়েমানুষের মুখের দিকে তাকাই নাকি কখনও ?

মাঝে মাঝে তাকালেই পারো। কেউ তো বারণ করবে না। তাতে একঘেয়েমিটাও কমবে।

খুব হাসল নিমাই। হেসে-টোসে বলল, এ মুখ কি একঘেয়ে হয় কখনও! নিত্য নতুন লাগে যে।

ভালবাসারই কথা, তবু বীণার ভিতরটা যেন রি-রি করে কথাটা শুনে। বলে, আর মুখের গুণ গাইতে হবে না। ষাও। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

নিমাই একবার বীণার মুখের দিকে চেয়ে বলে, খারাপ কথা নাকি ? গুরুচরণ কিছু ?

ধরো তাই।

নিমাই খেয়ে উঠল। আঁচিয়ে এসে বিছানায় মশারির মধ্যে বসল দুজন।

নিমাই মুখখানা খুব গম্ভীর করে বলল, বলো বীণাপাণি।

বীণা নিমাইয়ের দিকে চেয়ে রইল। হারিকেনের আলোয় মুখটা খুব আবছা। কিন্তু ওই মুখ এবং ওই মুখের পিছনে চরিত্রটাকে বীণা খুব ভাল করে চেনে।

একটু আদুরে গলায় সে বলে, আচ্ছা, এটা যে কলিকাল তা তো জানো!

নিমাই হেসে বলে, শোনো কথা! এটা কোনও গুরুচরণ ব্যাপার হল ?

দাঁড়াও, কথাটা তো এখনও ফেঁদে বসিনি। বলছি, তুমি কলির ধর্ম মানো কিনা!

কলির তো ধর্ম নেই। সবই অধর্ম। দু' চারজন যারা ধার্মিক, কলির শেষে তারাই টিকে থাকবে, বাদবাকি সব ফৌত হয়ে যাবে।

ফৌত একদিন সবাই হবে। সাধুও হবে, চোরও হবে। সত্য ত্রেতায কি কেউ মেরিনি নাকি ?

তা অবশ্য ঠিক। তবে কিনা—

দাঁড়াও। তোমার মতো অতটা না জানলেও আমি কিন্তু রামায়ণ মহাভারত অনেক শিখেছি। পৌরাণিক পালার পাট করি। অনেক ভাল কথা জানা আছে। আমাকে যা খুশি বোঝাতে পারবে না।

নিমাই সঙ্গে সঙ্গে একমত হয়ে বলে, সে আর বলতে! তুমি অনেক শিখেছো এ ক'দিনে।

তাই বলছি, কলিযুগের ধর্মটা হল বেঁচে থাকা। তাই নয় ?

নিমাই মাথা চুলকে বলে, প্রথমেই বড্ড পায়তারায়ে ফেলে দিলে। আসল কথাটায় আসছো না।

আসল কথাটা তোমার মাথায় ঢোকাতেই আজ বাসর বসিয়েছি। বুঝলে ?

বুঝছি। এবার বলো।

বলি, গুরুকম সাধু-সাধু ভাব করে থাকলে কি আমাদের পেট চলবে ? নাকি টিকে থাকা যাবে ?

টিকে তো আছি। চলেও যাবে। দোকানটা বসাতে পারলে আর চিন্তা নেই। এখানে সবাই আমাকে ভাল লোক বলে জানে।

বীণা একটু হেসে তরল গলায় বলে, তুমি কেমনতরো ভাল লোক ? তোমার বউ তো যাত্রা থিয়েটার করে বেড়ায়। তাহলে তুমি ভাল লোক হলে কিভাবে ? লোকে বলে, তুমি একজন যাত্রাওয়ালীর স্বামী। আর সবাই জানে যাত্রাওয়ালীর স্বামী মানেই একটা মেরুদণ্ডহীন লোক।

নিমাই একটু চুপ করে থেকে হতাশ গলায় বলে, কথাটা হয়তো মিথ্যে নয়। তবে বাজে লোকের কথায় কিই বা আসে যায় বলো।

বাজে লোক হোক, আর যাই হোক, লোকে বলে তো ?

লোকের মুখ বন্ধ করতে চাও নাকি ?

চাই। আমার অভিনয়ের নেশা আছে বটে, এরকমভাবে আর থাকতে ইচ্ছে করে না। একটু ভালভাবে থাকলে বেশ হত।

নিমাই মাথা চুলকে বলে, প্রসঙ্গটা ধরতে পারছি না। কলিযুগ নিয়ে শুরু করেছিলে। কথাটা কোথায় দাঁড়াল ?

আমার মাথায়। আচ্ছা হাঁদারাম বাবা!

নিমাই ভারি কাঁচুমাচু হয়ে বলে, কথাটা যে বড্ড সাঁটে বলছো। ভাল করে বুঝতে পারছি না। জানোই তো, আমি বড় বোকাসোকা মানুষ।

অত বোকা হলে কি কাজ হয় বাপু ? কলিযুগটা বোকাদের জন্য নয়।

তাই দেখছি।

শোনো, এ যুগে একটু পাপ-টাপ করলেও ভগবান ক্ষমা করে দেন। বুঝতে পারলে ?

নিমাই পারল। উজ্জ্বল হয়ে বলল, তা ক্ষমা করবেন না কেন ? তিনি যে পতিতপাবন! পাপীকে উদ্ধারের জন্যই আসেন। তবে কথাটা হল, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। পাপ করলে লোকে পথভ্রষ্ট হয়। প্রায়শ্চিত্ত হল পুনরায় চিত্তে গমন।

ও বাবা! প্রায়শ্চিত্তের কথা আসছে কেন ?

আসবে না ? পাপ করলে অনুতাপ, ঋাপন এইসব করতে হয়।

তোমাকে নিয়ে আর পারি না। আচ্ছা, এই যে আমি যাত্রা-টাত্রা করি, এটাও তো পাপ! নাকি ?

নিমাই একটু ধক্ষে পড়ে বলে, পাপ করলেই পাপ। নইলে নয়।
 ধরো যদি আমি লটারিতে টাকা পাই, সেটা কি পাপ ?
 না তো! পেয়েছো নাকি ?
 না গো! তবে যদি ওরকমই কোনও পড়ে-যাওয়া টাকা কখনও পেয়ে যাই, তাহলে কি সেটা নেওয়া অধর্ম হবে ?
 তোমার মন কি বলে ?
 নিমাই ফাঁপড়ে পড়ে বলে, এ তো গাছের মগডালে জল। টাকাটা পাচ্ছে কোথায় ?
 ধরো, যদি পাই ?
 আমি তো বাপু কিছু বুঝতে পারছি না। বড্ড গণ্ডগোলে ফেলে দিচ্ছে আমাকে!
 আমি তোমার আপনজন তো!
 একশোবার।
 কথাটা মনে রেখো। পাপে-তাপে, দোষে-ঘাটে, আমি কিন্তু সর্বদাই তোমার আপনজন।
 খুব ঠিক কথা।
 আমাকে কখনো ঘেন্না কোরো না পাপী বলে।
 শোনো কথা! বলে নিমাই খুব হাসল।
 সে রাতে বেশ একটু ভালবাসাবাসি হয়েছিল তাদের মধ্যে। একটু বেশী মাখামাখি। কিন্তু বীণা তবু সাহস করে কবুল করতে পারেনি। নিমাইয়ের ওপর সে নির্ভর করতে পারে না। বড্ড ভয় হয়। লোকটা ধর্মভীরু, লোকটা বড় দুর্বল। এসব লোক ভাল হলে কি হয়, এরাই বিপদ ডেকে আনে।
 আজ বর্ষাকাতর দিনে, তিন দিন বাদেও বীণা কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। তার সামনে সবটাই ভারি আবছা, ভারি সন্দেহজর্জরিত। বুকে বুকজোড়া ভয়।
 তার কি বুকের ব্যামো দাঁড়িয়ে যাবে ?
 নিমাই মুখ ফিরিয়ে বলল, ডুবল গো!
 কী ডুবল ?
 আর এক আঙুল বাকি। জল ঢুকছে।
 হাঁড়িকুড়ি, বাস্ক-প্যাটরা যেটুকু আছে তাদের সব ওপরে তোলা, উনুন জ্বলেনি। বীণা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, ডুবুক। সব ভেসে যাক!

॥ ২৪ ॥

কাউকে কোনও উপলক্ষে ফুল দেওয়া একদম পছন্দ নয় আপার। একমাত্র পূজোর সময় ছাড়া। ঐ একটা ব্যাপারে তার দুর্বলতা আছে। তবে ঠাকুরপুজায় ফুলও খুব বেশী দেওয়া উচিত বলে সে মনে করে না। সামাজিক অনুষ্ঠান বা শোকের সময় যে সব ফুল ও মালা দেওয়ার প্রথা আছে সেটা তার কাছে ফুলের অপমান বলে মনে হয়। তবু আজ আপা এক গোছা রজনীগন্ধা নিয়ে অনীশদের বাড়িতে এল সকালে।
 কাকাবাবু, আপনি তো খুব ভাল আছেন দেখতে পাচ্ছি। একদম যুবক দেখাচ্ছে আপনাকে!
 মণীশ হেসে বলে, থাক, আর তোমাকে বানিয়ে বানিয়ে বলতে হবে না।
 আপা এ বাড়িতে আলো-হাওয়ার মতো অব্যবহৃত আসে যায়। একখানা চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসে বলল, আমি মিথ্যা কথা বলতে পারি না যে!
 মণীশ এ মেয়েটিকে খুব পছন্দ করে। মমতা মাখানো চোখে মেয়েটির রোগা মুখখানার দিকে চেয়ে বলল, মিথ্যা বলা না তা জানি। তবে ভুল দেখছে। কয়েকদিনেই তো আমার মনে হচ্ছে বড়িয়ে গেছি।
 একদম নয়। শুনুন, শরীরবিজ্ঞানীরা বলছেন, মাছমাংস না খেলে এ রোগটা কম হয়। আপনি ননভেজ ছেড়ে আমার মতো পুরো ভেজ হয়ে যান।
 মণীশ হাসল, সেটা পরে ভেবে দেখব। এখন ডাক্তার কড়া হুকুম দিয়েছে, রোজ একটা করে ছোট মুগীর সুরুয়া খেতে হবে।
 মুগীদের কপাল খারাপ।
 আচ্ছা, তোমার হাতে ফুল কেন ? কোথাও যাচ্ছ ফুল নিয়ে!
 জিব কেটে আপা বলে, এ মা, এ তো আপনার জন্যই এনেছি। অভ্যাস নেই বলে দিতেই ভুলে গেছি। এই নিন।
 মণীশ ফুলের গোছটা নিয়ে একটু গন্ধ শোকার চেষ্টা করে বলে, এসব ভদ্রতা আবার করতে গেলে কেন ? তুমি তো আমার মেয়ের মতোই। আচ্ছা, কলকাতার রজনীগন্ধায় গন্ধ থাকে না কেন বলা তো! রজনীগন্ধায় তো বেশ চড়া গন্ধ হওয়ার কথা।
 বাসী ফুলে কি গন্ধ থাকে বলুন! কলকাতায় ঢুকলেই সব জিনিসের গন্ধ হারিয়ে যায়, গুণ হারিয়ে যায়, চরিত্র হারিয়ে যায়।
 মণীশ খুব হাসল, বলল, তুমি রীতিমতো ফিলজফার হয়ে উঠেছো দিনকে দিন। তোমার নতুন অ্যাডভেঞ্চার এখন কী হচ্ছে বলা তো!
 আপা একটু কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, হল না তো। আমি এভারেস্ট এক্সপিডিশান যাওয়ার একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম। ওরা জবাবই দিল না।

কারা ?

একটা দেশী দল ।

তুমি কখনও পাহাড়ে উঠেছো ?

না তো! কিন্তু সুযোগ দিলে প্রথম বারেই ঠিক উঠে যেতাম ।

উঃ, কী পাগল তুমি!

আমি সবসময়ে বড় কিছু করার কথা ভাবি । আমার মনে হয়, পৃথিবীর যে কোনও শক্ত কাজই আমি পেরে যাবো । কিন্তু বাড়ির আর সবাই কোথায় ? কাকিমা, অনীশ, অনু, ঝুমকিদিদি! এখন সকাল আটটা বাজছে । বাড়ি চূপচাপ কেন ? বুঝকা বোধ হয় সকালে জগিং করতে গেছে । ঝুমকির জ্বর । অনু একটু বেলা অবধি ঘুমায় । আর কাকিমাকে বোধহয় টয়লেট বা রান্নাঘরে পাওয়া যাবে ।

বুঝকা জগিং করছে শুনে খুশি লাগছে । ও আপনাকে এত ভালবাসে যে, আপনার অসুখের সময় ও একদম পাগলামতো হয়ে গিয়েছিল ।

জানি । হি ইজ নট প্রোয়িং টু অ্যাডাল্টহুড । একদম শিশুকাল থেকে আমার ন্যাওটা । আমি যদি হঠাৎ মারা-টারা যাই তাহলে যে ওর কী হবে!

আপনি ওকে কেন এত দখল করে আছেন কাকাবাবু ? সেই জন্যই তো ও এত পলকা, টক করে ভেঙে যায় ।

মণীশ এবার হাসল না । মাথাটা নেড়ে বলল, ঠিক বলেছো । ছেড়ে দিতে ইচ্ছেও করে, আবার ভয়ও পাই । সমাজটা কি রকম তা তো জানো । ড্রাগ, গার্লস, মদ, খারাপ লোক । তার ওপর পলিটিক্স আছে, গুণ্ডামি আছে, সন্ত্রাস আছে, আকসিডেন্ট আছে ।

এবার আপা হাসে, ওইসব ভেবে ভেবেই বুঝি আপনার অসুখ হল! সমাজটা খারাপ বটে, কিন্তু আমাদের তো এর মধ্যেই ঝাঁপট দিয়ে, একটু সাফসুরত করে থাকতে হবে! নাকি!

তুমি খুব স্বাধীন, না ?

আমাকে কে আটকে রাখবে বলুন! আমার বাবা সকাল থেকে রাত অবধি টাকা রোজগার করে । মার সারাদিন পুজোপাঠ । আমার দুটো দাদা ক্যারিয়ার নিয়ে দারুণ ব্যস্ত । আমি একটু একা, তাই স্বাধীন । সারা দিন শহর চাষে বেড়াই, অবশ্য যখন স্কুলটুল থাকে না ।

অত ঘুরে বেড়াও তাহলে এত ভাল রিজাল্ট করো কী করে ?

হয়ে যায় । আমি বেশী পড়িও না । যখন পড়ি তখন গল্পের বই-ই বেশী পড়ি ।

তুমি যে আমার কাছে একটা বিন্ময়, সেটা জানো ?

আপা হাসল, বন্ধুরা অমেকে ওকথা বলে । আসলে আমি তো ক্যারিয়ারের কথা ভেবে পড়ি না । পড়ি প্রশ্ন থেকে । তাই একবার পড়লেই সব বুঝে যাই ।

তোমার মাথা তাহলে খুবই পরিষ্কার ।

খুব মাথা নেড়ে আপা বলে, মোটেই তা নয় কাকাবাবু । আমার মাথায় যে রাজ্যের আজোবাজে চিন্তা । আমি সব সময়ে ভাবি । আর ঘুরি । ঘুরি আর ভাবি ।

এত ঘোরো কেন আপা ?

আমি দেশটাকে বুঝবার চেষ্টা করি । এত দুঃখী মানুষ আর কোনও দেশে নেই । ভাত্রে দুঃখী, ভাবে দুঃখী, চিন্তায় দুঃখী, কল্পনায় দুঃখী, কাজে দুঃখী । আমি বুঝবার চেষ্টা করি ।

তুমি দারুণ মেয়ে । একদিন কি তুমি দেশের প্রধানমন্ত্রী-টন্ত্রী হবে নাকি ? হলে আমি অবাক হবো না কিন্তু ।

দূর! প্রধানমন্ত্রী হয়ে কী হবে ? মন্ত্রী-টন্ত্রীর কি এসব লোকের কাছাকাছি আসতে পারে ? তারা তো এসকট নিয়ে ভি আই পি হয়ে ঘুরে বেড়ায় । প্রধানমন্ত্রী হলে আমি মরেই যাবো ।

তাহলে কি মাদার টেরিয়ার মতো হতে চাও ?

সবেরপে মাথা নেড়ে আপা বলে, মা টেরিয়ার কথা মনে হলেই আমি ভারি লজ্জা পাই ।

মণীশ অবাক হয়ে বলে, লজ্জা পাও! কেন বলো তো ?

লজ্জা পাবো না ? মা টেরিয়ার একজন মেমসাহেব । কতদূর থেকে এসে তিনি কলকাতায় দুঃখী আতুরের সেবা করছেন, তাই না ? সাহেবদের সঙ্গে আমরা কোন ব্যাপারেই পারি না । অলিম্পিকে পারি না, বিজ্ঞানে পারি না, শিল্পে পারি না, সভ্যতায় পারি না, কিন্তু সেবাটুকু তো পারতে পারতাম! তাই না কাকাবাবু ? সেবা তো সহজ কাজ ছিল, তার জন্য গায়ের জোর, কসরং বা মেথার দরকার হয় না । কিন্তু সেটাও একজন মেমসাহেবের কাছ থেকে শিখতে হচ্ছে কেন? আসলে শিখছিও না, মা টেরিয়ার নিজের কাজ করে যাচ্ছেন, আর আমরা আমাদের মতো দিল্লি গুয়ে বসে আছি ।

বিষগ্ন মুখে মণীশ বলে, তুমি বোধ হয় ঠিকই বলছো আপা । এ দেশের জন্য কারও কিছু করার নেই ।

ওটা কথা নয় কাকাবাবু । আসলে দেশটাকে বুঝে ওঠাই খুব শক্ত । কেউ তো সে কাজ করেনি ; বুঝতে হলে গোটা দেশটা পায়ে হেঁটে ঘুরতে হবে । প্রত্যেক জায়গার লোকজনকে চিনতে হবে, শুনতে হবে অনেকের অনেক দুঃখ আর সমস্যার কথা । অনেক সময় লাগে, অনেক কষ্ট করতে হয় । কার মাথাব্যথা আছে বলুন!

মণীশ এই বাচ্চা মেয়েটার দিকে শ্রদ্ধাপূত চোখে চেয়ে থেকে বলে, এর চেয়ে অবাক-করা কথা আমি বহুকাল শুনি নি । তোমার মধ্যে দারুণ প্যাশন আছে আপা । তুমি বোধ হয় একটা কিছু করবে । খুব বড় কিছু । অল মাই গুড উইশেস ।

আপা লাজুক হেসে বলে, কাকাবাবু, ভেঙেছ খুব ভাল । আরও ভাল কী জানেন ?

কী বলো তো! আবার বোধ হয় তুমি চমকে দেবে আমাকে! মনে রেখো, আমার হাট কিন্তু জখম । এমন কিছু বোলো না যাতে হাট ডিগবাজি খায় ।

আপা খুব হাসল। বলল, না, সেরকম কিছুই নয়। আমি বলতে চাই ভভেঙ্কার চেয়ে বেশী দরকার সহযোগিতা। কো-অপারেশন। আমার সঙ্গে একদিন পায়ে হেঁটে ঘুরবেন ?

ও বাবা! মরে যাবো যে!

আপা মাথা নেড়ে বলে, কিছু হবে না। প্রত্যেকটা মানুষই আলাদা আলাদা গল্প। যত জানবেন তত মজা। মিন্টো পার্কের কাছে দেখাবেন যখন ট্র্যাফিক গাড়ি থামে তখন একটা লোক রেড ক্রসের কৌটো ঝাঁকিয়ে পয়সা চায়। আর একটা লোকও এ কাজ করে টৌরস্টীর মোড়ে। আমি দু'জনকেই পাকড়াও করেছিলাম। ওরা কেউ রেড ক্রসের লোক নয়। আসলে ওভাবেই ভিক্ষা করে। এ দেশে যার যা আছে বা নেই সবাই সেই আছে বা নেইকে একটা ব্যাপারেই লগ্নি করতে চায়। সেটা হল ভিক্ষা। যার একটা হাত নেই সে সেই নেইটাকে ভিক্ষার কাজে লাগায়। ভিক্ষা করতে কে আমাদের শেখাচ্ছে জানেন ? আমাদের সরকার। সরকার নিজেই পৃথিবীতে সবচেয়ে নির্লজ্জ ভিখিরি। এ দেশে কত সম্পদ আছে, কোথায় কী পাওয়া যায়, আমাদের সত্যিকারের অভাব কতখানি তা কেউ খুঁজে দেখেনি আজ অবধি। খুঁজলে হয়তো দেখা যাবে, আমাদের দেশে রিসোর্সের অভাব নেই। শুধু খুঁজে দেখা হয়নি, এই যা।

মণীশ চোখ বুঝে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর স্বগতোক্তি মতো বলল, অথচ তোমার তো আঠেরোর বেশী বয়স নয়, তাই না আপা ?

আপা সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমি একটু বেশী পাকা, না কাকাবাবু ? আমার মাও সেই কথাই বলেন।

এ বয়সে এতটা ভার মাথায় নিয়েছো, তোমার সাহস তো সাজাতিক।

আমি আরও অনেক বেশী ভার নিতে চাই।

তুমিই বোধ হয় আমাদের ভাবী প্রধানমন্ত্রী!

ঠাট্টা করছেন কাকাবাবু ?

না আপা, ঠাট্টা করছি না। তুমি আমাকে সবসময়েই অবাক করে দাও। এইসব কথাগুলি তোমাকে কেউ শেখায়নি তো আপা ? তুমি কি নিজেকে ফিল করো ?

খুব ফিল করি কাকাবাবু। এত বেশী করি যে, আমার জীবনে একটুও শান্তি থাকে না। মাথা এত গরম হয়ে যায় যে, রাতে ঘুম আসতে চায় না।

মণীশ দুর্ভিক্ষ মুখে বলল, তোমার তুলনায় আমার ছেলেমেয়েরা কত নাবালক আর নাবালিকা রয়ে গেছে।

আপা গম্ভীর মুখ করে বলে, আজকাল সব ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলাই নিজেদের ছেলেমেয়েকে বোতলবন্দী করে রাখতে চায়। তাদের দোষও নেই। সমাজে নানারকম দূষণ বাড়ছে তো। কিন্তু মুশকিল হল, চারদিকে দূষণ বেড়ে গেলে তার কিছুটা ঘরের মধ্যেও ঢুকবেই। ঘরের পাশে বেড়াল মরে পড়ে থাকলে ঘরে পচা গন্ধ আসবে না ? আবর্জনা জমে থাকলে মশা মাছি তো তার কিছুটা ঘরেও ছড়িয়ে দিয়ে যাবে। যাবে না, বলুন ?

হ্যাঁ আপা।

আমাদের বাড়ির কাছেই একজন মাতাল থাকে। মদ খেলেই সে ভীষণ গালাগাল করে। কখনও একে, কখনও ওকে। আমাদেরও মাঝে মাঝে গালাগাল করেছে। আমরা নাকি তামিলনাড়ু থেকে এসে পশ্চিমবঙ্গকে লুটেপুটে খেয়ে নিছি। আমার মা আর বাবা ভয় পেয়ে ওদিককার জানালা বন্ধ রাখত। কিন্তু আমি বুঝলাম, ওটা কোনও প্রতিকার নয়। আমি সেই মাতালটার সঙ্গে আলাপ করে ফেললাম। সে বস্তির লোক, গরিব, চোর এবং রগচটা। প্রথমতায় ভাব করতে চায়নি, সন্দেহ করেছিল। তার বউ, ছেলে আর মেয়েরাও একটু কেমন যেন অ্যাগ্রেসিভ টাইপের। তবু আমি লেগে রইলাম। এক মাস ধরে রোজ গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করতাম, জিজ্ঞেস করতাম তারা কেমন আছে। একটু একটু করে ভাব হয়েই গেল। আমি লোকটার কাছে অনেকবার জানতে চেয়েছি, সে কেন সবাইকে গালাগাল করে। লোকটা জবাব দিতে পারেনি। তখন বুঝতে পারলাম, ওর রাগটা বিশেষ কারণও ওপর নয়। ওর মনটাই বিগড়ে গেছে। মদ খেলেই ভিতরের নানারকম জমে-থাকা বিষ গালাগাল হয়ে বেরিয়ে আসে। তখন আরাম পায়। খুব সহজ লোক, ওকে বুঝতে অসুবিধে হয় না। এখন সে আমার খুব বন্ধু।

তাকে মদ ছাড়াতে পেরেছো ?

আপা মাথা নাড়ে, না কাকাবাবু। ওটা ছাড়া সোজা কথা নয়। চেষ্টা করছি। বিষ-মদে কত মানুষ মারা যায় সে সব বলছি। কিন্তু ওরা তো বিষকে ভয় পায় না, মরে যাওয়াকেও নয়। কিভাবে ছাড়াবো বলুন তো!

তা বটে।

তবে এখন আর গালাগাল দেয় না। ঘরে বসে মাতাল অবস্থায় গজগজ করে খানিকক্ষণ, তারপর ঘুমোয়।

তোমার মতো বুকের পাটা কম মানুষেরই আছে। আমার বাসার পাশেই তো বস্তি, কই আমার তো কখনও ওখানে ঢোকার ইচ্ছেই হয়নি।

ওটাই তো আমাদের মুশকিল। আমরা সব জায়গা থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিই, প্রত্যাহার করে নিই। মনে ভাল ভাল ইচ্ছে থাকে, কিন্তু সেগুলো করি না।

তুমি কি আমাকে বকছো ?

না তো কাকাবাবু! ছিঃ, বকবো কেন ? আপনি দারুণ মানুষ একজন।

বকলেও দোষ নেই আপা। তুমি যে খুব নতুন কথা বলছো তা নয়, কিন্তু যেটা বড় কথা তা হল, তুমি যা বলো তা প্র্যাকটিসও করো। আমরা করি না।

আমি আপনাকে অনেকক্ষণ যন্ত্রণা করছি।

না না, আমার খুব সেলফ পিটি হচ্ছে ঠিকই, তবে তোমার কম্পানি খুব ভালও লাগছে। ডোরবেল বাজল নাকি ? ওই বোধ হয় বুঝকা এল!

বুবকই। সাদা টি শার্ট, কালো শর্টস, পায়ে দৌড়োনার জুতো। ঘর্মাঙ্ক, হাঁফাচ্ছে। ঘরে ঢুকেই মণীশের দিকে চেয়ে বলে, কেমন লাগছে বাবা ? আরে আপা! কখন এলে ?

অনেকক্ষণ। বকে বকে কাকাবাবুর মাথা ধরিয়ে দিলুম।

অনীশ এসে সাবধানে তার বাবার বিছানায় একটু আলগোছে বসল। পাছে ধপ করে বসলে খাটের ঝাঁকুনিতে হাটবিট বেড়ে যায় মণীশের। তারা সবাই এখন অত্যধিক বাবা-সচেতন। মণীশের হাতটা নিজের সবল হাতে ধরে নাড়ীটা একটু বুঝবার চেষ্টা করল সে। তারপর বলল, মনে হয় সবই ঠিক আছে, না বাবা ?

মণীশ ছেলের মুখের দিকে ভূষার্ত চোখে চেয়ে থেকে বলে, ঠিকই আছে। ভাবছিস কেন ? আপা কত ফুল নিয়ে এসেছে দেখ, তোর মাকে বল সামনের ঘরে সাজিয়ে রাখতে।

ফুল! বলে অবাক হয়ে অনীশ আপার দিকে তাকায়, তুমি ফুল এনেছো নাকি ? এ তো ভাবা যায় না।

আপা সামান্য লজ্জা পেয়ে বলে, ফুলটা আজ পাগলামি করে কিনে ফেললাম। কাকাবাবুকে একটু ইমপ্রেস করব বলে।

আমি খুব ইমপ্রেসড আপা। থ্যাংক ইউ।

কাকাবাবু, আপনার কি হাঁটাচলা বারণ ?

মণীশ মুখটা একটু বিকৃত করে বলল, ডাক্তারদের কথা আমি কিছু বুঝতে পারি না। বলেছে ফুল রেন্ট। তার মানে শুয়ে থাক। কিনা আমি জানি না। তবে আমার এইসব অফশুটরা আমাকে শুইয়েই রেখেছে। এমন কি পাশ ফিরতে অবধি দিচ্ছে না। সাতদিন এভাবে থাকলে আমাকে বোধ হয় পাগলাগারদে পাঠাতে হবে।

আপনার নিজের কেমন লাগছে ?

খুব উইক, কিন্তু উঠতে বা একটু-আধটু চলাফেরা করতে কোনও অসুবিধে নেই।

তাহলে উঠে পড়ুন তো! চলুন ডাইনিং টেবিলে বসে একটু কালো কফি খাবেন।

বুবকা ভ্রু কুঁচকে বলে, খুব ডাক্তার হয়েছো, না ? মাথা-ফাতা ঘুরে গেলে কি হবে ?

আপা একটা ছোট্ট ধমক দিয়ে বলে, চুপ করো তো! আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে মস্ত এক হার্ট স্পেশালিস্ট থাকেন। আমি প্রায়ই তাকে অ্যাসিস্ট করি। কত কিছু জানি, তুমি ধারণাও করতে পারবে না। রুগীকে রুগী বানিয়ে ফেলে রাখা মানে জোনো ? বিশেষ করে যারা হার্ট পেশেন্ট! একজারশান না করে যতদূর সম্ভব নরমাল রাখতে হয়। তোমরা কাকাবাবুকে জড়ভরত বানাতে চাও নাকি ? আপনি উঠুন তো কাকাবাবু।

মণীশের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে বলে, তোমার কাকিমারও একটু পারমিশান নিয়ে এসো। নইলে হয়তো রাগ করে কথা বন্ধ করে দেবে। বেশী শুয়ে থাকলে তো বেডসোরও হয়, না ? কথটা কাকিমাকে বোলো, যাও।

একটু বাদে যখন ডাইনিং টেবিলে তারা কফি ইত্যাদি নিয়ে বসল তখন অপর্ণা বেজার মুখে বলল, আমার বাড়িতে এত অসুখবিসুখ যে কেন হচ্ছে বুঝতে পারছি না। একজনকে বাড়ি নিয়ে আসতে পারলাম তো মেয়েটা জুরে পড়ল। বৃকে সাজাচিত্র কনজেশন, জুর এখনও নামেনি। এত টেনশন যাচ্ছে।

তার কথাতাকে কেউ কোনও গুরুত্বই দিল না। হয়তো শুনতেই পেল না কেউ। অনু তার বাবার কানে কানে কী বলছে আর খুব হাসছে দুজনে। আপা আর অনীশ খুব নির্বিড়ভাবে ওদের পড়াশুনোর বিষয়ে কিছু বলছে। টেবিলে অপর্ণা আলাদা এবং একা। কিন্তু বরাবরই কি সে একা নয় ? এ বাড়িতে তার তিন ছেলেমেয়ে আর ওদের বাবা যখন একসঙ্গে থাকে তখন অপর্ণা স্পষ্ট বুঝতে পারে, ওরা এক দলে। সে আলাদা। সে আউট অফ দি সার্কল। বর্জিত, অবহেলিত, উপেক্ষিত।

অথচ অপর্ণা কি প্রাণপাত করে দিচ্ছে না সংসারের পিছনে ? সে কি খরচ হচ্ছে যাচ্ছে না, ক্ষয় হচ্ছে না এই তার আপনজনদের জন্য ? ওরা কখনও কেউ কেন গুরুত্ব দেয় না তাকে ? রান্নাঘরের বাইরে কি তার কোনও ভূমিকা নেই ?

সে চারজনের দিকেই চাইল। না, তাকে কেউ লক্ষ করছে না। পাগা দিচ্ছে না। সে খামোখা বসে আছে এখানে। খুব হঠাৎ করে অভিমান হল অপর্ণা। নিঃশব্দে সে নিজের কাপটা নিয়ে রান্নাঘরে চলে এল।

হ্যাঁ, এইটাই তার সঠিক জায়গা। এখানেই তাকে মানায়। ভাবতে ভাবতে চোখে জল এল অপর্ণার। কত ভালবেসে সে বিয়ে করেছিল মণীশকে। কত ভালবাসার ভিতর দিয়েই না এল তাদের তিন সন্তান। টুক-টুক করে বড় করে তোলা ওই তিনজন কেন তার দিকে ফিরেও চায় না ? মণীশ কি আজকাল আগের মতো গুরুত্ব দেয় তাকে ? খুব ভাল হয় এখন যদি অপর্ণা মরে যায়। তাহলে ওরা হাড়ে হাড়ে বুঝবে অপর্ণা কে ছিল, কী ছিল ওদের সংসারে।

কেন যে তার মতো বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন মহিলার আজকাল এত অভিমান হয়! কেন যে সহজেই চোখে জল চলে আসে! অপর্ণা তার টলটলে জলভরা চোখে রান্নাঘরের জানালা দিয়ে তেতো পৃথিবীটার দিকে চেয়ে রইল। উথলানো ডালের জল পড়ে গ্যাস নিবে যাচ্ছে, তবু গা করল না।

ক্ষীণকণ্ঠে একটা ডাক বাতাসে পাখির ডাকের মতো ভেসে এল, মা!

রান্নাঘরের পাশেই ঝুমফির ঘর।

ডাকটা শুনল অপর্ণা। নড়ল না। ডাকুক গে।

আবার ডাকটা এল, মা! ও মা!

অপর্ণা চোখ মুছে গম্ভীর মুখে দরজায় এসে দাঁড়ায়, কী বলছিস ?

ঝুমফি একেই রোগা। অসুখে যেন বিছানায় মিশে গেছে। নিজের মাথাটা চেপে ধরে বলে, একটু কাছে এসে বসবে ? কেন ?

এসো না। কাছে একটু বোসো। আমার কাছে কেউ কেন কখনও আসো না বলা তো!

কাকে চাই ? অপর্ণা গম্ভীর গলাতে বলে।

তোমাকে।

অভিমানটা এবার ফেটে পড়ল জল-বেলুনের মতো, আমাকে! আমাকে আর তোমাদের কী দরকার? আমি তো এ বাড়ির কাজের লোকের চাইতে বেশী কিছু নয়।

ঝুমকি রোগা মুখে এবার হাসল, ঝগড়া হয়েছে বুঝি!

মোটাই ঝগড়া হয়নি। কী দরকার বেলো, গ্যাসে রান্না চড়ানো।

গ্যাস নিবিয়ে দিয়ে এসো।

অত সময় নেই। বরং তোমার বাবাকে ডেকে দিচ্ছি।

বাবা! বাবা কি উঠেছে?

বাইরের ঘরে বসে চা খাচ্ছে।

ঝুমকির মুখটা আলো হয়ে গেল, গুড নিউজ মা। তাহলে তোমার মুখ ওরকম ভার কেন?

মোটাই ভার নয়। কাজ আছে। তোমার বাবাকে ডাকছি।

বাবাকে আকঠ ভালবাসে ঝুমকি। বোধ হয় একবার ইচ্ছে হল, বাবাকে ডাকিয়ে আনার। কিন্তু ইচ্ছেটা সংবরণ করে বলে, না, বাবা নয়। তুমি এসো একটু।

বলছি না, রান্নাঘরে এখন আমি ভীষণ ব্যস্ত। ওই বোধ হয় ডালের জল পড়ে গ্যাস নিবে গেল। গ্যাসের গন্ধ আসছে।

রান্নাঘরে গিয়ে ছোট ঝামেলাটা সামলাতেই আরও দুবার ঝুমকির ডাক শোনা গেল।

আর পারে না অপর্ণা। ঝুমকির কাছে এসে কপালে হাত দিয়ে বলল, জ্বরটা কি আছে? আমার তো জল-হাত, বুঝতে পারছি না।

নেই মা। আজ সকালে ছেড়ে গেছে। তুমি বোসো একটু আমার কাছে।

গোমড়া মুখে অপর্ণা বিছানার একপাশে বসল।

তুমি কি কেঁদেছো মা? চোখ ছিলল করছে কেন?

কাদিনি।

কেঁদেছো। তোমাকে যে আমি ভীষণ চিনি।

লক্ষ করো নাকি? আমি যে একজন মানুষ এ সংসারের এক ধারে পড়ে আছি এটা কি মনে থাকে?

মাথাটা অপর্ণার কোলের দিকে নামিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা করে বলে, তুমি কি খুব অ্যাটেনশন চাও মা?

মোটাই সে কথা বলিনি। তোমরা ব্যস্ত মানুষ, আমার দিকে মনোযোগ দেওয়ার সময় কোথায় তোমাদের?

ঝুমকি হাসল, কিন্তু এটা তো জানো, সবাইকে ছাপিয়ে কিন্তু তুমি, তোমাকে কখন দরকার জানো? যখন মন খারাপ লাগে, একা লাগে, যখন ভয় পাই, তখন সারা পৃথিবীতে এই একজনকেই সবার আগে মনে পড়ে। তা জানো? বাইরের মনোযোগটা বড় কথা হল বুঝি? তুমি যে আমাদের মন সত্তা সব জুড়ে আছো!

অপর্ণার বাঁ হাতখানা আপনা থেকেই ঝুমকির মাথায় বিলি কাটতে লাগল। আর চোখের বাঁধ ভেঙে জল পড়তে লাগল ফেঁটায় ফেঁটায়। তারপর ধারায়।

॥ ২৫ ॥

খোঁচাখুঁচি করা হোমস্পর একটা বদ অভ্যাস। এটা যে ভাল অভ্যাস নয়, তাও সে জানে। তবে মানুষ তো অভ্যাসেরই দাস। বিখ্যাত ডেস্টিন্ট অতীত নন্দীর চেষ্টারে তাকে যেতে হয়েছিল রিটার্নের কিছু জরুরি কাগজপত্র আনতে। বিদেশ প্রত্যাগত নন্দী মস্ত ডাক্তার, তার কাছে সবসময়ে ডি আই পিদের ভিড়; এইসব লোককে কিছু কাগজপত্রের জন্য বা জিজ্ঞাসাবাদের কারণে নিজের অফিসে পারতপক্ষে টেনে আনে না সে। নিজেই চলে যায়। এটুকু পাবলিক সারভিস সে ইচ্ছে করেই দেয়। নন্দী হয়তো বড় বড় ব্যবসায়ীদের মতো মস্ত ক্লায়েন্ট নয়, কিন্তু গুরুতর ক্লায়েন্ট। এর মতো লোক হাতে থাকলে আরও অনেক লোক চলে আসে। সাধারণ মানুষদের স্বভাবই হল, জেনে বা অজান্তে ডি আই পিদের অনুসরণ করা।

উপরন্তু নন্দী তার অনেকটা বন্ধুর মতোই হয়ে গেছে।

বিকলে প্রবল ঝড়বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার দরুন নন্দীর চেষ্টারে ভিড় ছিল না তেমন। নন্দী শেষ রুগীটিকে বিদায় দিয়ে ব্রিফকেস থেকে দরকারি কাগজপত্র বের করে দিল। তারপর বলল, আচ্ছা মশাই, আপনার দাঁতে কোনও কমপ্রেন নেই?

কমপ্রেন! না তো!

আছে কিনা তা আপনি জানান?

হোমস্প অবাক হয়ে বলে, আমার দাঁত আর আমি জানবো না?

নন্দী হেসে বলে, অত সোজা নয়। দাঁতের কমপ্রেন তৈরি হয় খুব ধীর গতিতে। প্রথমটায় বোঝাও যায় না। যখন বোঝা যায় তখনও কেউ সহজে ডেস্টিন্টের কাছে আসতে চায় না। যখন ট্রাবল বাড়তে শুরু করে আসে বটে, কিন্তু তখন আর দস্তাংপাটন ছাড়া চিকিৎসা থাকে না। সাহেবরা কিন্তু নিয়মিত দাঁত চেক আপ করায়। ওটাই উচিত কাজ।

সাহেবদের কথা আলাদা। তারা মদ মাংস বেশী খায়। আমার সে অভ্যাস নেই। শোওয়ার আগে আমি রোজ দাঁত ব্রাশ করি।

মাঝে মাঝে একটু ক্লিনও তো করে নিতে পারেন। আমার খুব ভাল যত্ন আছে, ব্যথা দেবো না।

ক্লিন! তাই বা করাবো কেন? আমি পান-টান খাই না, সিগারেটও নয়।

নন্দী হাসল, আচ্ছা, ঠিক আছে। তবু একবার দেখে দিলে আপত্তি নেই তো?

হোমস্প অবাকের ওপর অবাক হয়ে বলে, আরে কমপ্রেন হলে তো আপনার কাছেই আসবো!

নন্দী কথাটায় কান দিল না। একটু সহজাত কর্তৃত্বের ভাব আছে তার। বংশগত অভ্যাসই হবে। কারণ, নন্দীদের একসময়ে বিরাট জমিদারি ছিল। ওর দাদু ছিল রায়বাহাদুর।

রিক্রাইনিং চেয়ারে তাকে বসিয়ে আলো-টালো ফেলে হেমাঙ্গর দাঁত পরীক্ষা করে নন্দী অবশ্য বলল, আরে বাঃ, এ তো সত্যিই পারফেক্ট দাঁত! চমৎকার! শুধু বাঁ দিকে কষের দাঁতে একটা কেরিজ দেখা যাচ্ছে। ওটা সিল করে দিচ্ছি।

ঘুরন্ত উকো দিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করে নন্দী খানিকটা পুটিং-এর মতো জিনিস ঠেসে দিল।

তারপর বলল, আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন?

কেন, আমার দাঁতের কি এতই খারাপ অবস্থা যে, ঈশ্বরবিশ্বাসের দরকার হবে!

আরে নাঃ, দাঁত ফার্স্টক্লাস আছে। তবে, এই যে চমৎকার দাঁতের সারি, এটা কি একটা কেমিক্যাল অ্যাকসিডেন্ট? মানুষের শরীর, গরু, মোষ, জীবজন্তু, গাছপালা এসবই অ্যাকসিডেন্টাল বলে আপনি বিশ্বাস করেন? নাকি সৃষ্টিকর্তা বলে কেউ আছে?

হঠাৎ একথা কেন?

ডারউইন থেকে শুরু করে বড় বড় সায়েন্টিস্টরা কেউই সৃষ্টিতত্ত্বকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারছেন না! একটা র্যানডম অঘটন বলে জোড়াতাল্লি দেওয়া এক্সপ্লানেশন দিচ্ছেন। আপনি কি সেটা বিশ্বাস করেন?

কি বললে আপনি খুশি হবেন?

আরে, আপনার কি নিজস্ব কোনও মতামত নেই!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেমাঙ্গ বলে, হিসেবের খাতা থেকে চোখ তোলার সময় পেলে তো ভগবান-টগবান নিয়ে ভাববো! সময়টা কোথায়?

নন্দী জু কুঁচকে বলে, তার মানে কি আপনি আমার চেয়েও ব্যস্ত লোক? আমার দুটো চেয়ার, একটা হাসপাতাল আর তিনটে নার্সিং হোম অ্যাটেন্ড করতে হয়, তা জানেন? তবু আমি সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে ভাববার সময় পাই।

হেমাঙ্গ ফাঁপরে পড়ে বকল, ভগবানের কথা আমার মনেই হয় না যে!

কেন হয় না? এই যে আপনার চারদিকে জমজমাট পৃথিবী, চারদিকে প্রাণের প্রকাশ, এসব দেখে এর পিছনকার প্যাটার্নটির কথা আপনার জানতে ইচ্ছে করে না? এই জড় জগৎ থেকে দুম করে জীব সৃষ্টি হয়ে গেল—আর সেটা সম্ভব করে তুলল মস্তিস্কহীন, কল্পনাহীন জড়বস্তুই—এটা কি বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা!

তা তো মনে হচ্ছে না।

ওরকম জলে-পড়া ভাব করবেন না। ব্যাপারটা ভাবার মতো কিনা বলুন তো!

খুবই ভাবার মতো কথা।

নন্দী হেসে ফেলল, আচ্ছা আজ আর আপনাকে বিবৃত করব না। বেশ বিপদে পড়েছেন দেখা যাচ্ছে।

বিপদটা অবশ্য সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে এল না। হেমাঙ্গ এক কৌটো স্টেরিলাইজড প্র্যাক্টিকের টুথপিক কিনেছিল বড় একটা ওষুধের দোকান থেকে। সেই টুথপিক দিয়ে দাঁতের সিলিংটা একটু খুঁচিয়ে দেখতে ইচ্ছে হল তার, রাতের খাওয়ার পর। কারণ সবসময়েই দাঁতে একটা ফরেন জিনিস ঢুকে থাকার অস্বস্তি হচ্ছিল তার। খোঁচাখুঁচির ধাক্কায় সিলটা হঠাৎ আলগা হয়ে গেল। আর তারপর থেকেই—ব্যথা নয়, একটা সিরসিরে ভাব ফুটো দাঁতটায় টের পেতে লাগল সে। ব্যাপারটা সাইকোলজিক্যাল না ফিজিক্যাল সেটা ভাবতে ভাবতে দৃষ্টিভ্রান্তি নিয়েই সে ঘুমোলে। সে স্বপ্ন দেখল, একদিন সকালে উঠে সে দেখছে সে সম্পূর্ণ ফোকলা, আর তার দাঁতগুলো সব খসে ঝরা শিউলির মতো বালিশে আর বিছানায় ছড়িয়ে পড়ে আছে। আতঙ্কে চোঁচিয়ে উঠতে গিয়ে নিজের চোঁচানিতেই ঘুম ভাঙল হেমাঙ্গর। ঘড়িতে দেখল, ভোর সাড়ে চারটে।

বেলা সাড়ে দশটায় হেমাঙ্গ একটা ছোট্ট রেল স্টেশনে নামল। গজ পার হয়ে জলকাদায় থকথকে একটা গোঁয়ো পথ রিকশায় ডিঙিয়ে একটা দীন বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে নামল। আজ রবিবার। রবিবারে রবিবারে সে মাঝে মাঝে এরকম শৌখিন অডিট করে বেড়ায়। টাকার জন্য নয়, এইসব আউটিং তাকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে।

মাঝবয়সী কেরানিবাঁবু অপেক্ষা করছিলেন। রিকশা থেকে হেমাঙ্গ নামতেই, অফিসঘর থেকে বেরিয়ে এসে, বারান্দা থেকেই হাঁক মারলেন, আসুন স্যার, আসুন।

জলকাদায় ভরা উঠানে পা ফেলার জন্য জোড়া জোড়া হুঁট পাতা। সাবধানে পা ফেলে হেমাঙ্গ বারান্দায় এসে উঠল। ব্যারাক বাড়ির মতো টিনের দীনদরিদ্র বাড়ি। চল্টা ওঠা মেঝে, নোনাদার দেওয়াল, জীর্ণ দরজা-জানালা। কেমন একটা ভ্যাতভ্যাতে গন্ধ।

অফিসঘর আজ তার সম্মানে কিছুটা সাজানো হয়েছে। টেবিলের ওপর একটা এমব্রয়ডারি করা সবুজ টেবিলক্লথ পাতা। চেয়ারের পিছনে একটা তোয়ালে।

ভাব আনি স্যার?

দাঁতের ফুটোটা বারবার জিব চলে যাচ্ছে। হেমাঙ্গ বলল, আনুন।

কোন্ট ড্রিংস্প্রিং আছে স্যার।

না, ভাব হলেই চলবে।

তারপর একটু চা খাবেন তো!

সেটা পরে হবে। কাগজপত্র সব রেডি তো!

আজ্ঞে, সব রেডি। ম্যাডামও আজ এসেছেন। আপনি এলে খবর দিতে বলেছেন। ডাবটা খেয়ে নিন, গুঁকে ডাকছি।

ম্যাডাম মানে হেড মিস্ট্রেস। কেরানিবাঁবু পর্যন্ত হেমাঙ্গর কোনও অসুবিধে নেই। খাতাপরে কোনও অনিয়ম বা অসম্পূর্ণতা থাকলে মুদ্র অসন্তোষ প্রকাশ করা যেতে পারে। কিন্তু মহিলারা এগ్গি নিলেই মুশকিল। তাঁদের সঙ্গে কখনও

পাখিব—১৪

১০৫

এটে ওঠে না হোমাস। আর কে না জানে হেড মিস্ট্রিসরা সাধারণত রাশভারী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। মহিলা হন, যাঁদের হোমাস বরাবর ভয় পায়।

সে বলল, ঠিক আছে। তবে ওঁর একটু পরে এলেও হবে। আমরা বরং কাজটা শুরু করে দিই।

কিন্তু প্রধান শিক্ষিকা ডাবের পিছু পিছুই এলেন। তাঁকে দেখে নিজের অজান্তেই চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল হোমাস। ছিপছিপে, ফর্সা, অল্পবয়সী, ধারালো চেহারার এই মহিলাকে হেড মিস্ট্রিস বলে মনেই হয় না। খুবই শহুরে চেহারা। অত্যাধুনিক সাজপোশাক। উপরন্তু বিদেশী সুগন্ধী চারদিকটা মোহময় করে রেখেছে মেয়েটির।

লজ্জা পেয়ে মেয়েটি বলল, আরে! দাঁড়ালেন কেন? বসুন!

হোমাস ধপ করে বসে পড়ল। সে গায়ে গজ্ঞে অনেক বালিকা বিদ্যালয়ে অডিট করতে গেছে, কিন্তু এরকম হেড মিস্ট্রিস কখনও দেখেনি। এ তো রূপালি পর্দা থেকে নেমে এসেছে! কিংবা তাও নয়। আরও একটা বেশী মাত্রা যোগ হয়েছে। অনেকটা রবীন্দ্রনাথের নভেলের নায়িকা-টায়িকাদের মতো। তার মানে এ নয় যে, হোমাস রবীন্দ্রনাথের সব নভেল পড়েছে বা পড়ে। কিন্তু একটা আন্দাজ আছে তো! সূচরিতা, লাভণ্য এদের কথা খামচা খামচা ভাবে যেটুকু জানে হোমাস, তা হয়তো এরকমই। হোমাস অধোবদন হল।

হোমাস যে নার্ভাস বোধ করছে সেটা মেয়েটি স্পষ্ট বুঝতে পারল। সংকোচহীন চোখে হোমাসকে একটু মেপে নিয়ে বলল, আপনার তো মস্ত বড় ফর্ম, এ সব ছোটোখাটো অডিট আপনারা করতে এলে আমরা যে ভয় পেয়ে যাই!

হোমাস জানে, কেন সে গা-গজ্ঞে অডিট করতে যায়, তা প্রায় কাউকেই বুঝিয়ে বলে লাভ নেই। কেউ বুঝবে না। এ মেয়েটি তো নিন্দ্যই নয়। সে মৃদু মিষ্টি হাসি দিয়ে প্রসঙ্গটিকে পাশ কাটাল। নিবিশ্ভাব্য প্রাপ্তিকের ঠ্ট দিয়ে ডাবের জলটা ধীরে ধীরে টেনে নিতে লাগল ভিতরে। এবং টের পেল, তার সেই দাঁতটা সিরসির করছে। খুব মৃদু, খুব সামান্য, তবু করছে।

স্কুলের দফতরি গোটা চারেক মিষ্টি, দুটো সিঙাড়া, দুখানা নিমকি, কয়েক টুকরো আপেল, কয়েকটা আঙুর, দুটো সিন্সাপুরী কলা দিয়ে সাজানো দুটো প্লেট অতি সন্মানের সঙ্গে রেখে গেল সামনে, সঙ্গে পরিষ্কার কাচের গ্লাসে জল।

মেয়েটি বলল, খান।

হোমাসের অভিজ্ঞতা সর্বত্রই অল্পবিস্তর একইরকম। সর্বত্রই এরকম মিষ্টির প্লেট সাজিয়ে দেওয়া হয়, হোমাস স্পর্শও করে না। সে মৃদু স্বরে বলল, আমি খেয়ে এসেছি। ওসব নিয়ে যেতে বলুন।

অন্যান্য জায়গায় এই মৃদু আপত্তিকে সম্মতির লক্ষণ বিবেচনা করে প্রচণ্ড চাপাচাপি করা হয়। এমনকি প্রবল আপত্তিকেও অগ্রাহ্য করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই শহুরে মেয়েটি মৃদু হেসে বলল, আমি নগেনবাবুকে আগেই বলেছিলাম, এত জলখাবারের আয়োজন করবেন না, বড়লোকেরা বেশী খান না। উনি শুনলেন না। নষ্ট হবে, জানাই ছিল।

হোমাস মৃদু হেসে বলে, নষ্ট হবে না। কেউ খেয়ে নেবে, যাদের খিদে আছে।

মেয়েটি একটু মিষ্টি হেসে বলে, ঠিক আছে। কিন্তু দুপুরে খাবেন তো! অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে যে আপনার জন্য বিরতি রান্নাবান্না হচ্ছে।

খাবো। এই বলে নিঃশেষিত ডাবটা চেয়ারের পাশে নামিয়ে রেখে রুমালে মুখ মুছে সে বলল, আমি বড়লোক একথা আপনাকে কে বলল?

বুঝতে অসুবিধে হয় না।

কথাটা শুনে হোমাস একটু খুশিই হল। মেয়েটির দিকে সে মোটেই তাকাচ্ছে না। সে জানালা দিয়ে কখনও মাঠের একটা লাল গরুরকে দেখছে, কখনও দৃশ্যহীন সিলিং-এর দিকে চেয়ে গলাটা একটু চুলকে নিচ্ছে, কখনও দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের বাঁধানো ফটোর ওপর একটা ধ্বংসীল মার্কডসাকে বসে থাকতে দেখছে, তবু কি করে যেন এর ফাঁকে ফাঁকে না তাকিয়েও মেয়েটাকে দেখতে পাচ্ছে সে। দুইমিতে ভরা বিজুর মতো মুখ, নিতান্তই চব্বিশ পঁচিশ বয়সের এই মেয়েটি, কি করে হেড মিস্ট্রিস হলে? বাপ-দাদার জোরে? নাকি রাজনীতির ব্যাকিং-এ?

প্রশ্নটা করতে অনেক সময় লাগল হোমাসের। ঘণ্টা দুয়েক বাদে যখন কাগজপত্র খাতা হিসেব ইত্যাদি নিয়ে তিনজনে খুবই বাস্তব, তখন হঠাৎ এক ফাঁকে হোমাস বলল, আপনি বেশ অল্প বয়সেই হেড মিস্ট্রিস হয়েছেন, না?

মেয়েটি একটু অবাক হয়ে বলে, অল্প বয়স? মোটেই না। আমার আঠাশ চলছে।

আঠাশ কি অনেক বয়স?

অনেক। হেড মিস্ট্রিস হতে গেলে বয়সটা ফ্যান্টার নাকি?

হোমাস তটস্থ হয়ে বলে, না, তা অবশ্য নয়। তবে কিনা—

নগেনবাবু তাড়াতাড়ি হোমাসের কানের কাছে মুখ এনে বললেন, ম্যাডামের বিলিতি ডিগ্রি।

ওং, দ্যাট এক্সপ্রেসন্স ইট।

মেয়েটি ঠাণ্ডা গলায় বলে, হোয়াট এক্সপ্রেসন্স হোয়াট?

আপার বিলিতি ডিগ্রি, আর কে না জানে, আমরা মনে মনে এখনও সাহেবদের প্রতি দাস্যভাব পোষণ করি!

মেয়েটি অবাক হয়ে বলে, তাই নাকি? আমার তো সেরকম মনে হয় না।

কোরিনি নগেনবাবু অতিশয় বিগলিত কণ্ঠে বললেন, ম্যাডামের জন্মই তো বিলেতে। লিভারপুলে।

শুনে হোমাস প্রথা ভঙ্গ করে মেয়েটার মুখের দিকে এক বলক সোজাসুজি তাকাল। ভক্তির ভরে। তারপর মুখটা নামিয়ে নিয়ে বলল, তা হলে এই গায়ের স্কুলে পড়ে থাকার দরকার কি?

মেয়েটি নগেনবাবুর দিকে একটু শাসন-করা দৃষ্টিক্ষেপ করে হোমাসের দিকে চেয়ে বলে, ওটাও কোনও নিয়ম নয়। বিলেতে জন্ম হলে বা বিলিতি ডিগ্রি থাকলে, এ দেশের গায়ের স্কুলে চাকরি করা তো বেআইনী নয়।

ওটা তর্কের কথা। ঘটনা গুরুমভাবে ঘটে না।

মেয়েটি একটু চুপ করে থেকে বলে, সবাই ঠিক আপনার মতোই প্রশ্ন করে। বিলেতে জন্ম, বিলিতি ডিম্বি, তা হলে গায়ের কুলে পড়ে আছে কেন? আমি তো মানেই বুঝতে পারি না।

হেমাঙ্গ মেয়েদের রাগকে সাজাতিক ভয় পায়। সে জানে, রেগে গেলে মেয়েরা অপ্রতিরোধ্য। সে তাড়াতাড়ি মোলায়েম গলায় বলে, এটা যদি আপনার একটা মিশন হয়ে থাকে তো ভাল কথা। প্রফেশন হলে কিছু লোকে অবাক হবেই। কারণ, ইচ্ছে করলেই আপনি যে-কোনও ভাল কুলে কলকাতাতেই চাকরি পেতে পারেন।

মেয়েটি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সেটা ঠিক কথা। এটা আমার একটা মিশন। আমি এ দেশের গায়ের কুলে চাকরি করছি অবস্থাটা বুঝবার জন্য। ঠিক চাকরি করার জন্য নয়।

কেমন বুঝছেন?

খুব ভাল নয়।

দুজনেই একটু হাসল। তারপর আবার কাজ। কাজের মাঝখানে মাঝখানে হেমাঙ্গ মেয়েটির গা থেকে উড়ে আসা মাদক গন্ধটি পাচ্ছিল। বিলিতি ডিম্বিধারী, বিলেতে জন্মগ্রহণকারী মেয়েটি তাকে আরও একটু ততস্থ করছে, অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। তার দাঁতটা কি একটু বেশি সুলসুল করছে?

বৈঠকখোটা টাক-মাথা আ্যিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার এলেন একটু বাদেই—এবার যে একটু উঠতে হবে। কিছু মুখে দিয়ে আসবেন চলুন। খাবার রেডি।

খেতে গিয়ে আর এক দফা বিপদে পড়তে হল হেমাঙ্গকে। তার আর মেয়েটির খাওয়ার আয়োজন হয়েছে একটা ছোটো টেবিলের দুধারে। মুখোমুখি। দুজনের বেশি বসার জায়গাও নেই। একথানা একটের ঘরে তারা দুজনই মাত্র। আ্যিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারমশাই বশব্দদ দরজার কাছে একটু তফাতে দাঁড়ানো।

হেমাঙ্গর যত সংকোচ, যত আড় হয়ে থাকা। মেয়েটির সেসব নেই। খেতে বসে বলল, আপনার সঙ্গে কিছু আমার ফর্মাল পরিচয়টাই হয়নি। আমার নাম রশ্মি রায়। আপনার নাম অবশ্য আমি জানি।

হেমাঙ্গর দাগী দাঁতটা অকারণে সুলসুল করে ওঠে এ কথায়।

হেমাঙ্গ কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। একটু ভাবতে হল। তারপর সম্পূর্ণ অনগ্রহে প্রশ্ন করল, আপনি কি আগাগোড়া বিদেশেই লেখাপড়া করেছেন?

না। আমার আড়াই বছর বয়সে আমরা দেশে চলে আসি। আমি পড়াশুনা করেছি কলকাতায়। বি এস-সি পাশ করে ফের বিলেতে চলে যাই। দু'বছর হল ফিরেছি।

আবার যাবেন?

রশ্মি মৃদু হেসে বলে, বিলেত এখন আর অত সুখের দেশ নেই। তবে সামনের বছর হয়তো যাবো। পারমানেন্টলি।

পারমানেন্টলি কথাটায় আবার দাঁতটা সুলসুল করল কেন? দাঁতটার কি কোনও রি-অ্যাকশন হচ্ছে? দাঁতের কি কাতুকুড় আছে? দাঁতের কি মস্তিষ্ক বা হৃদয় থাকা সম্ভব?

পারমানেন্টলি কেন?

কিছু কাজ করার ইচ্ছে আছে। বিদেশ ছাড়া কাজ করার উপায়ও নেই। এই যে স্কুলটা দেখছেন, এর যে কত প্রবলেম, ভাবতেই পারবেন না। তার ওপর ফান্ড নেই, পলিটিক্যাল প্রেসার আছে, ইন ফাইটিং আছে, ডেস্টেড ইন্টারেস্ট আছে। এইটুকু একটু ক্লব নিয়েও কত কি হয়, না দেখলে বিশ্বাস হত না। আপনি আজ খুব আলগাভাবে অডিট করেছেন, ভাল করে হিসেব দেখেননি। দেখলে অনেক ভুতুড়ে এন্ট্রি খুঁজে পতেন।

হেমাঙ্গ একটু হাসল, পেয়েছি। তবে গায়ের স্কল বলে, বড় ধরনের গজগোল না থাকলে আমি প্রশ্ন তুলি না।

শো কান্ড অফ ইউ। প্রশ্ন উঠলে আমাকে বিব্রত হতে হত। আমার ইচ্ছে ছিল, ছোট্ট একটা গায়ের স্কলকে ধীরে ধীরে একটা মডেল স্কল তৈরি করব। একটা একজাম্পল তৈরি করব।

পারলেন না?

একদম নয়। একটা বিল্ডিং গ্র্যান্ট বের করতে, একটা এইড বের করতে, একটা উইং খোলার জন্য পারমিশন পেতে যে কী ছোট্টাছুটি করতে হয়। তাও কাজটা হয় না। এতদিন বাদে বুঝতে পারছি, এখানে পশ্চিম করে কোনও লাভ নেই। ভারতবর্ষ তার নিজস্ব দর্শনে চলবে, তাকে চালানো যাবে না। যারা সে চেষ্টা করেছেন কেউ পারেনি।

হেমাঙ্গ পশ্চাৎস চোখে এক ঝলক রশ্মিকে দেখে নিল। কিছু বলল না। মেয়েটা বুদ্ধিমতী, সময় থাকতে সার সত্যটা বুঝতে পেরেছে।

রশ্মি একটা বড় শ্বাস ফেলে বলল, একজন লোক স্কুলটাকে তিন বিঘা জমি দান করে গেছেন। আপনি বিশ্বাস করবেন না, সেই জমিটা আজ অবধি আমরা দখল করতে পারিনি। আদালতের হুকুম পাওয়া সত্ত্বেও। কেন জানেন? কিছু পাওয়ারফুল লোক ওই জমিতে চাষ করায়। কোনও সভ্য দেশ হলে এটা হতে পারত না।

ভারতবর্ষের জন্য লজ্জাবোধ করেই যেন হেমাঙ্গ মুখ নামিয়ে নিল এবং বেগুন বড়ির পাতুরিটা সরিয়ে রাখল, খেল না।

রশ্মি বলল, আপনি কিছু খাচ্ছেন না! না খেলে মাস্টারমশাই দুঃখ পাবেন। এ আয়োজনটা ওঁর নিজের। স্কুলের টাকায় নয় কিছু।

হেমাঙ্গ ফের অস্বস্তিতে পড়ল।

রশ্মি মৃদু স্বরে আদেশ করল, খান। আপনার বিদে পেয়েছে।

হেমাঙ্গ মৃদু স্বরে বলে, আমি মেয়েদের সামনে খেতে পারি না।

সে কী! বলে রশ্মি খিলখিল করে হেসে ফেলল, আপনার বউও তো একটি মেয়েই, তার সামনে খান তো! তখন?

সেই জন্যই তো বিয়ে করিনি!

বশি! খুব হাসল, প্রথমে আপনাকে খুব গোমড়োমুখে মনে হয়েছিল, তা তো নন! আচ্ছা বাবা, আমি উঠে যাচ্ছি।

আরে না, আপনি বসুন। আমি থাকি। কিন্তু তাকাবেন না।

বশি! খুব স্নেহে চেয়ে থেকে বসল, ও লজ্জাটা তো মেয়েদের থাকে। আমার অবশ্য নেই।

এই ছোটোখাটো কথা অদৃশ্য মাকড়সার মতো একটা জাল বুনে যাচ্ছে কি? তৈরি হচ্ছে একটা প্যাটার্ন? হেমাঙ্গ এই প্যাটার্নটিকে ভয় পায়। কোথাকার জল কোথায় গড়ায় কে জানে? হয়তো তারা আজ একসঙ্গে এক গাড়িতেই ফিরবে। হয়তো তারপর দক্ষিণ কলকাতাতেও! হয়তো কাছাকাছিই তাদের বাড়ি।

আচ্ছা কলকাতায় আপনি কোথায় থাকেন? উইগু হোমস হঠাৎ জিজ্ঞেস করে।

হাজরা।

হোমস হাঁ করে থাকে দু সেকেন্ড। তার দাগী দাঁতটা সুলসুল করে। হাজরা যে তার গা ঘেঁষে!

॥ ২৬ ॥

মেঘ দেখলে আজও তার একইরকম আনন্দ হয়, ছেলেবেলায় যেমন হত। বৃষ্টি তাকে এখনও সম্বোধিত করে। এ বছর তার সাথ মেটাতে বৃষ্টিও হচ্ছে বটে। একদিন দুদিন শুকনো যায় তো চারদিন ধরে নেমে থাকে।

আজ এক বৃষ্টি-ঝমঝম দিন। মেঘলা আকাশ চারদিকে আধার ছড়িয়ে দিচ্ছে আজ সকালে। হেদহীন বৃষ্টি নেমে আছে শেখরত থেকে। ঝাঁঝালো বৃষ্টির ভিতর দিয়ে চলছে রেলগাড়ি। দরজা খোলা, জানালার পাল্লা নেই। হুহু করে বৃষ্টির ছাট এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে কামরার ভিতরটা। কোনওরকমে একটা খাঁজের আড়ালে বেষ্টিত বসে আছে সে। বেষ্টিত কাঠ চুরি হয়ে যাওয়ায় বসটাও ভীষণ কষ্টকর হচ্ছে। বেষ্টিত লোহার কাঠামোর ওপর কোনওরকমে শরীরের ভারখানি রাখা। জলকণায় সে ভিজছেও। কিন্তু কোনও বিরক্তি বা রাগ নেই তার। বৃষ্টি-মুগ্ধ দু'খানি চোখ পেতে সে দেখছে মাঠঘাট, দরিদ্র শহরতলি, দোকানপাট, ছোট্ট স্টেশন। কয়েকটা ভেজা চড়াই বসে আছে ওপরের মাল রাখার র্যাকে। বিনা টিকিটে রেলগাড়ি চেপে তারা কোথায় যাচ্ছে তা তারাও জানে না। পাখির তো দেশ নেই। তবে বাসা আছে, বাসায় আছে ডিম, আছে ওম, ওরা সেই টানে ঠিক ফিরে যাবে যথাস্থানে।

এবার কি বন্যা হবে? যা বৃষ্টি! হতেও পারে। খবরের কাগজে আসাম আর বিহারের বন্যার খবর দিচ্ছে। বছরওয়ারি ঘটনা। এ দেশে নদীর কোনও সংস্কার নেই। সে সারা দেশ ঘুরে দেখে, অধিকাংশ নদীই শুখার মরসুমে ঝাঁ করে শুকনো বালিয়াড়ি বুকে নিয়ে। কোথাও ভিত্তির করে একপাশ দিয়ে নর্দমার মতো একটা ধারা প্রবহমান থাকে, কোথাও তাও থাকে না। তখন চাষ মার খায়, নদীর নাব্যতা বলে কিছু থাকে না। অগভীর খাতে যখন বর্ষার ঢল নামে তখন দুকূল ছাপিয়ে গ্রামের পর গ্রাম আর শহর ভেসে যায়। কেন প্রতি বছরই হবে খরা বা বন্যা? নদী সংস্কার করা হলে, জায়গামতো পাহাড়ে বাঁধ দিয়ে জল সঞ্চয় করলে, নিয়মিত ড্রেজিং করা হলে, নিকাশী খাল কাটা হলে কত অনায়াসে কাজে লাগানো যেত জলের মতো মহার্ঘ সম্পদ। এখনও এ দেশের কত উষর ভূমি তেঁস্তা নিয়ে চেয়ে আছে বৃদ্ধিমান মানুষের দিকে। অথচ ধী-সম্পন্ন মানুষ কেন কিছুই করছে না? তার ধী খেয়ে নিল কে? পলিটিকস? না কি স্বার্থ? না কি আলস্য ও দুর্দর্শিতার আদ্যন্ত অভাব? অস্ট্রেলিয়ায় নদীর সংখ্যা কত কম, সেখানে চাষীদের জল পয়সা দিয়ে কিনতে হয়, তবু কখনও জলের অভাবে চাষ মার খায় না। এক ফোঁটা জলের কোনও অপচয় করে না ওরা। ভারতবাসী যেন জানেনই না নদীকে কিরকমভাবে ব্যবহার করতে হয়। এরা যেন বুড়ো বয়সেও হামা-টানা শিশুর মতো আবেধ। এবং নির্বোধ। গোটা ভারতবর্ষকে জলপথে নানাভাবে জাল বদ্ধ করার একটি প্ল্যান সে কর্তাব্যক্তিদের কাছে পেশ করেছিল। সেই প্ল্যান কার্যকর হলে, শুধু কৃষি নয়, পরিবহন ব্যবস্থাতেও একটা প্রভূত ওলটপালট ঘটতে পারত। এদেশে গরুর গাড়ি, জেট প্লেন, ভাঙা স্ট্রেট, কম্পিউটার, বিজ্ঞান ও কুসংস্কারের এক অসাধারণ সহাবস্থান। জলপথ থাকলে দিশ নৌকো ডিজেল ট্রাকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাল পরিবহন করতে পারত। কর্তব্যজ্ঞিতা সর্বিনয়ে বলেছেন, প্ল্যান তো ভাল, কিন্তু আমাদের অত টাকা কোথায়? সে নিজের ভিতরে ভিতরে অসহায় রাগে মাথা কুটে মারে। এ সব নির্বোধরা কি জানে না, বৃক্ষপতনের ফলে ন্যাড়া প্রকৃতি একদিন আর বাদলমেঘ আকর্ষণ করতে পারবে না? খরার পর খরা আর অজন্মায় শুকোবে মাটি? বাড়বে সামুদ্রিক নোনা জলের স্তর এবং তা গ্রাস করবে নিচু সব ভূখণ্ড? আগামী শতাব্দীর মাঝামাঝি মানুষের অস্তিত্বে যে নাতিশ্রাস উঠবে সে তার শব্দটা অবধি আগাম শুনতে পায়। এরা কেন পায় না। খুব কি সময় আছে আর? মানুষের সর্বনাশের আগাম লক্ষণগুলি কি ধরা পড়ছে না এদের বোধবুদ্ধিতে?

একটা গল্পে সে পড়েছিল, পিপড়াদের চলন দেখে একটি গায়ের লোক অনুমান করেছিল, বন্যা আসছে। বন্যা সত্যিই এসেছিল। দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাংশে গায়ের লোকেরা হাওয়ার চলন দেখে সঠিক নির্ধারণ করতে পারে, প্রচণ্ড সামুদ্রিক ঝড় আসছে। চীনের প্রাকৃত মানুষেরা বাবা প্রাণীর হাবভাব দেখে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস নির্ধারণ করতে পারে। অশিক্ষিত, প্রকৃতি-লালিত মানুষেরা অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির কথা জানে না বটে, কিন্তু তাদের জন্যও আছে এইসব প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। মাঝে মাঝে যা যন্ত্রপাটিকেও হার মানায়। তার ইচ্ছে ছিল, সারা পৃথিবী ঘুরে আদিবাসী, উপজাতি, যাযাবরদের কাছ থেকে এই অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি ও ডিডাকশনের কৌশল শিখে নিয়ে তাকে আরও পরিশীলিত করে কাজে লাগাতে। পৃথিবীর জন্য কত কিছু করার ছিল তার, কত কী করতে সে আজও চায়! কিন্তু আজকাল তার কেবলই মনে হয় নানা আইন-কানুন, অবহেলা, ওলাসীনা, স্বার্থ আর রাজনীতি যেন তাকে হাত-পা বেঁধে একটা বাস্তব বন্দী করে ফেলেছে। তাকে কিছুই করতে দিচ্ছে না কেউ।

গাড়িতে লোকজন নেই বললেই চলে। একে ছুটির দিন, তাতে বৃষ্টি, কোনও স্টেশনে একটা দুটো লোক উঠছে, নেমে যাচ্ছে। ঠায় একা সে-ই বসে আছে ট্রেনে। তার নেন কোথাও যাওয়ার নেই, কোনও স্টেশনেই নামবার নেই। আজ বৃষ্টিভেজা দিনে ভাঙাচোরা ট্রেনের কামরায় সে একেবারে সম্পর্কহীন একা। বড় আনমনা। বাইরের আবহা দিগন্তের দিকে

চেয়ে সে পৃথিবীর সঙ্গে তার ও মানুষের সম্পর্কের বুনটটা আবিষ্কারের চেষ্টা করছে। পারছে না। তার কেবলই মনে হয়, এককাল পৃথিবীতে বাস করেও, পৃথিবীর সব ধনসম্পদ লুটপাট তহনছ করেও মানুষ—বোকা মানুষ ধরতেই পারেনি, এই পৃথিবীর সঙ্গে তার সম্পর্কটা কী। পৃথিবীর ভূখণ্ডকে সে স্বার্থপরের মতো ভাগজোখ করে নিয়েছে, সে তৈরি করছে নানা জটিলতার বেড়াজাল, সংকীর্ণ দেশাত্মবোধ। মানুষ কি কখনও দেখে না, পাখি যখন এক দেশ থেকে অন্য দেশে উড়ে যায় তখন তার পালংপাট লাগে না, ভিসা লাগে না, কাস্টমস ডিঙাতে হয় না? পৃথিবীকে ভাগজোখ করার সে কে? সে কেন দেশ ভাগ করে নিজের ভিতরে সৃষ্টি করে আঁটন বাঁধান? সে কেন গাটো এই গ্রহটির কথা ভাবে না! কালো মহাশূন্যে সবুজভর নীল প্রাণময় এই তুলনাহীন পৃথিবীকে সে কেন গোটাগুটি নিজের বলে ভাবতে পারে না? এ যেন পৃথিবীকে শরিকানায় ভাগ করে নিজের নিজের কোট আঁকড়ে থাকা। আর এই শরিকানার কাজিয়ায় চলে যাচ্ছে মানুষের আয়ু ও শ্রম, এই কাজিয়ায় আহুতি হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর মহার্ঘ জলবায়ু, তার যতেক সম্পদ। তার খুব ইচ্ছে করে ভিথিরির মতো দেশে দেশে ঘুরে মানুষকে এইসব কথা বোঝাতে। সবাই এক হয়ে এই পৃথিবীর কথা ভাবে, পৃথিবী ছোট একটি গ্রহ, তার অফুরন্ত সম্পদ নেই। যা আছে, যেটুকু আছে তাকে যত্ন করে সঞ্চিত রাখো। মেক্সিকোয় ভূমিকম্প হলে উদাসীন থেকে না চীন, ইথিওপিয়ায় দূর্ভিক্ষ হলে তার ক্ষুধা যেন স্পর্শ করে সুইডেনকেও, আফ্রিকায় মহামারী হলে তা যেন উদ্বিগ্ন করে আমেরিকাকেও।

সে ভারতবর্ষের এক সরল, গরিব, উদ্বিগ্ন মানুষ। সে একজন গ্রামবাসী হিসেবেই যাবে রষ্ট্রনায়কদের কাছে। বলবে আমি রাজনীতি জানি না, আমি জানি না অর্থনীতির কূট তত্ত্ব, আমি শুধু চাই পৃথিবীর গভীর অভ্যন্তরে তার হৃৎপিণ্ডের যে স্পন্দনটুকু আজও ধুকধুক করছে তা অব্যাহত হোক। মানুষ তাকে বোকা বলবে, দুয়ো দেবে, প্রত্যাখ্যান করবে। করুক। সেই অপমান তার গায়ে লাগবে না।

একসময় বহুদিন ধরে যাভায়াত করেছে বলে স্টেশনটা ভুল হল না তার। ভুল হওয়ারই কথা ছিল। প্রবল বৃষ্টিতে বাইরেটা বড়ই আবছা এবং সে ছিল গভীরভাবে অন্যমনস্ক। তবু স্টেশনের বেড়ার গায়ে মন্ত কাঠচাপা গাছটাই বোধ হয় চেনা দিল তাকে। যেন বলে উঠল এই যে অনেকদিন বাদে! এসো এসো। সে উঠল স্বপ্নাথিতের মতো, বাস থেকে নাইলনের ব্যাগটা নামিয়ে ছাতা খুলে প্র্যাটফর্ম পা দিল। বৃষ্টির ঝরোখা ঘিরে ফেলল তাকে।

তখন ছাতা জুটত না। কচুপাতা বা টোকা আটকাতে পারত না বৃষ্টিতে। ভেজা গায়ে ট্রেনে উঠে কলকাতায় যেত সে। সারা দিন ভেজা জামা প্যান্ট গায়েই শুকাতো। সর্দি লাগত না। গরিবের শরীর সব সয়ে নিত। এক জোড়া রবারের সস্তা জুতো থাকত তার। শীতে গ্রীষ্মে পরত। ছিড়ে গেলে সেলাই করে নিত, সোল ক্ষয় হয়ে গেলে ভিতরে ভরে নিত পিচবাঁক, যতদিন পারত সেই জুতোতেই চালিয়ে নিত। নিত্যন্ত অকেজো হয়ে গেলে, আর এক জোড়া কিনতে যে সময় লাগত বাড়তি টাকা জোগাড়ের জন্য তখন খালি পায়ে হাঁটতে হত মাইলের পর মাইল। তবু সেই সব দিনের স্মৃতি কেন কেবলই আনন্দের শিহরণ বয়ে আনে আজও।

স্টেশনে পা দিয়ে ঠিক সেইরকমই মনে হল তার। সব পুরনো দিন ফিরে এল বুঝি!

টেশনে লোকভিড় নেই। টেশনের শেড—এর তলায় সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। তাড়াহুড়ো নেই। সে কিছুক্ষণ শিউরানো রোমকূপ নিয়ে অনুভব করল তার হারিয়ে যাওয়া নিজেকে। শৈশবের সে এসে কি অলঙ্কে হাত ধরেছে আজকের তার?

তাড়া নেই। কিছুমাত্র তাড়া নেই। খুব ধীরে ধীরে চুমুকে চুমুকে চা খাওয়ার মতো সে তার চারদিককার সব কিছুকে গ্রহণ করছে ভিতরে। উপভোগ করছে। ধীর পায়ে সে বেরিয়ে এল টেশনের বাইরে, যেখানে দোকানপাট, রিক্সা-ভ্যান গাড়ি, বাসের আড্ডা। আজ বড্ড ফাঁকা-ফাঁকা। আজকাল শীতলাতলা বিষ্ণুপুরের বাস হয়েছে। এক টানে নিয়ে যায়।

একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দোকানীকে জিজ্ঞেস করল সে, শীতলাতলা বিষ্ণুপুরের বাস কোথা থেকে ছাড়ে?

এই চৌপাখী থেকেই ছাড়ে। আজ কি আর বাস পাবেন? সকালের দিকে দু'খানা গেছে। ফেরেনি এখনও।

বাসের অনিচ্ছায় সে একটুও যাবড়ে গেল না। মনে হল এটাই যেন ঈশ্বরের অভিপ্রেত, সে বরাবর হেঁটে টেশনে এসেছে গেছে। আজও তাই যাবে।

স্টেশনের চৌহদ্দি পেরিয়ে যখন নির্জন ফাঁকা রাস্তায় এসে পড়ল তখন নিবিড় ঝিমঝিম, অনুভূজক বৃষ্টি ঘিরে ধরল তাকে। ঘিরে ধরল ভেজা মাটির গন্ধ। ঘিরে ধরল গাছপালা। এরা কি জানে যে, সে এদের বন্ধু? সে পৃথিবীর প্রতিটি বৃক্ষের বন্ধু, কীটপতঙ্গের বন্ধু, তৃণভূমি, নদী, পশুপাখি সকলের বন্ধু সে। কিন্তু এরা কি টের পায় তা?

কবে পিচ্চ হয়েছিল, তারপর গরুর গাড়ি, ট্রাক আর বাসের ধাক্কায় কবে উড়ে গেছে রাস্তার মসৃণতা। মাঝে মাঝে ডোবার মতো বড় বড় গর্ত। জলে ভরভরত। সে জল বাঁচিয়ে চলার চেষ্টাই করল না। ছেলেবেলার মতো জল ভেঙে, খানখন্দ ভেঙে, কাদা ঘেঁটে হাঁটতে লাগল। একদিন সে শহরের বাস ঘূচিয়ে চলে আসবে গায়ে। মাটি মাখবে, ভাব করবে পৃথিবীর সঙ্গে।

আলপখ ধরে গেলে রাস্তা অনেক কম হত। কিন্তু সে দেখল, ক্ষেতগুলো জলে ডুবে আছে। পিছল আল ধরে যাওয়া ঠিক হবে না। ক্রমে নিবিড় থেকে নিবিড়তর গায়ের মধ্যে চলে যেতে যেতে তার দু'খানা চোখ রূপমুগ্ধ সম্মোহিত হয়ে যেতে লাগল। ফ্রান্স বা ইংল্যান্ডের চমৎকার পরিচ্ছন্ন কান্ট্রিসাইড এ নয়। তবু এই গীনদরিদ্র, শতাব্দীকাল পিছিয়ে থাকা পল্লী বাংলার সঙ্গে তার এখনও নাকীর টান।

সে যখন গায়ের কাছাকাছি হচ্ছিল, যখন দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল সুপরি আর নারকোল গাছের জড়ামরি তখন শীতলাতলা বিষ্ণুপুরে বটতলার অনতিদূরে ঘোষপাড়ার নাবালের ধারে বহু মানুষ বৃষ্টির মধ্যেও জমা হয়েছে। নাবালে অনেক জল। তার মধ্যে উল্টো হয়ে অর্ধেক অন্তর্জালিতে পড়ে আছে একটা লাশ। মুণ্ড সমেত মাজা অবধি ডুবে আছে জলে। পায়ের চটি আর কালো প্যান্টওলা দু'খানা পা ছড়িয়ে আছে কাদামাখা ডাঙায়। গায়ের সবুজ জামাটা বাতাসে একটু ফুলে বেলুনের মতো ভেসে আছে জলের ওপর।

যারা দেখছিল তাদের কারও মুখে কথা নেই। তারা হয়তো কেউ জানে, কেউ হয়তো জানে না, কেউ জেনেও জানে না, এরা ভয় পেয়েছে। অস্তিত্বের ভয়ঙ্কর অনিশ্চয়তার একটি দৃশ্য তাদের চোখের সামনে। কত আদরের শরীর, কত তাক্সিলা ও অবহেলায় জলকাদায় পড়ে আছে মরা কুকুর-বেড়ালের মতো। এদের অনেকের আজ দুপুরের ভাত মুখে রুচবে না, রাতে ঘুম হবে না ভাল করে। এরা অনেকেই এখন কিছু দিন খুব ভয়ে ভয়ে থাকবে। চমকে উঠবে বাতাসের শব্দে। টিনের চালে বেড়াল লাফ দিলেও কেঁপে উঠবে ভয়ে।

একটু-আধটু ফিসফাস চলছে। কেউ কেউ বলছে খুন-হওয়া লোকটা রামজীবন বা ন'পাড়ার দুলু মণ্ডল। কেউ একজন বলল, মনে হচ্ছে গদাই।

গণার সাইকেলের দোকানের বাস্কা ছেলে কালু অবশ্য জানে। কিন্তু মরে গেলেও সে মুখ খুলবে না। শেষ রাতে সে পেছাপ পেছাপ করে উঠেছিল। ঝাঁপ খুলে বেরিয়েই সে বটতলায় একটা চৌচানি শুনতে পায়, বাবা রে: তারপর কে একটা খিঁচি দিয়ে বলে উঠল, চোপ শুয়োরের বাস্কা, মুখে ইয়ে ভরে দেবো...

কালুর পেছাপ পেটের মধ্যেই শুকিয়ে গেল ভয়ে, সে টপ করে দোকানে ঢুকে ঝাঁপ টেনে ফুটোয় চোখ রাখল। সাত আটজন লোকে একজনকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের হাতে বড় বড় ল্যাজা, গজা, ভোজালি। এত জোরে লাথি মারছে, চাঁটি মারছে যে পটকা ফাটার মতো আওয়াজ হচ্ছে। লোকটা চৌচাতে পারছে না, তার মুখে একটা নোংরা কাপড় গোঁজা। এত কিছু অন্ধকারে থেকেও দেখা যাচ্ছিল, বাদুর দোকানের হাজাকবাতির আলোয়। বাদু ভোরবেলা গরু দুইতে গুঠে।

কালু লোকটাকে দেখেছে। তাকে সে চেনেও। যারা নিয়ে যাচ্ছিল তাদেরও। কিন্তু কালু জানে, তাকে এখানে বাস করতে হলে মুখে কোনও নাম উচ্চারণ করা চলবে না।

ঘোষপাড়ার নাবালে কি হল তা কালু আর জানে না। সে ভয়ে আর বেরোয়নি। ঘুমোতেও পারেনি। সকালে বেরিয়ে সে লাশটার কথা শুনল। কিন্তু খুব গম্ভীর হয়ে। দেখতে গেল না। সকাল থেকে সে মন দিয়ে সাইকেল মেরামতির কাজ করে যাচ্ছে।

যখন চা আর পাউরুটি খাচ্ছিল বাদুর দোকানের বেঞ্চে বসে তখন নাটা এসে কাছে দাঁড়াল। ভয়ে বুক শুকিয়ে গিয়েছিল কালুর। পাউরুটির ডেলা আটকে গেল গলায়। বিষম খেল।

নাটা চাপা গলায় বলল, ঝাঁপ খুলে বেরিয়েছিল কেন ? মজা দেখতে ?

কালু মাথা নেড়ে বলে, না তো! আমার পেছাপ পেয়েছিল, তাই।

মুখ দিয়ে যদি একটা কথাও বেরোয় তাহলে ফিনিস হয়ে যাবি।

কালু কথা কইতে পারেনি। শুধু মাথা নেড়ে বলেছিল, কিছু দেখিনি।

সাত আটজন খুনিয়ার মধ্যে নাটা ছিল। সবচেয়ে বেশীই ছিল। তার হাতে ছিল চকচকে মস্ত একটা ভোজালি। কালু সিটিয়ে আছে ভয়ে।

কাল রাত থেকে রামজীবন বাড়ি ফেরেনি। সকালে উঠে পটল শুনতে পেল, তার মা কান্নাকাটি করছে রান্নাঘরের দরজায় বসে। বারাদায় দাদু মাথায় হাত দিয়ে বসা। ঠাকুমা ভাবলা মুখে একটা কুলোয় চাল ঝাড়তে বসে থেমে আছে। বৃষ্টি পড়ছে অঝোরে।

রাঙা কাদতে কাদতে বলছিল, ওই বটতলাই ওকে খাবে। সেই কাল দুপুরে ইটের ভাঁটিতে যাবে বলে বেরিয়েছিল, সঙ্গে পাঁচশ টাকা। দুপুরে এসে খাওয়ার কথা, বিকেল গেল, রাত গেল, এখনও কোনও খোঁজ নেই!

বামাচরণ গামছা পরে নির্বিকারভাবে কাঠকয়লার গুড়ো আর নসি মেশানো মাজনে দাঁত মাজতে মাজতে ঘর থেকে বেরিয়ে খানিক দাঁড়িয়ে কান্নাকাটি শুনল, তারপর ঘটি হাতে পুকুরের দিকে চলে গেল বৃষ্টির মধ্যে। যেন সে এ বাড়ির কেউ নয়।

শ্যামলী বেরোলা না, কিন্তু দরজার আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে শুনছিল। তার শাড়ির আঁচল দেখা যাচ্ছিল।

দৃশ্যটা, ঘটনাটা ঘুমের মাথায় বুঝতে অনেক সময় লাগল পটলের। তার বাবা ফেরে অনেক রাতে, যখন সে ঘুমিয়ে কাদা। বাবা যে রাতে ফেরেনি এটা তার জানা ছিল না।

সে মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, কাদছো কেন মা ? কী হয়েছে ?

সাইকেলটা নিয়ে যা তো বাবা। বটতলায় খুঁজে আয়। আমার বুক কাঁপছে, অশ্রুর ব্যথায় মরে যাচ্ছি। একটু আগে বমি হয়েছে এক কাঁড়ি। সারা রাত ঘুম হয়নি তো!

পটল আর একটিও কথা বলেনি। মুখে চোখে একটু জল ছিটিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়েছে।

বটতলা অবধি যেতে হয়নি তাকে। তার আগেই মল্লিকদের বাড়ির সামনে একটা জটলা দেখে সে সাইকেল দাঁড় করাল।

দেবদাস মল্লিক জটলার দিকে চেয়ে বলছিল, কে খুন হয়েছে তা আগ বাড়িয়ে কি বলা যায় ? পুলিশ আসবে, লাশ তুলবে, তারপর বোঝা যাবে। দিনকাল যা পড়েছে এ সব নিয়ে বেশী কথা না বলাই ভাল। বটতলাটা তো একটা বিভীষিকা হয়ে উঠেছে দিনকে দিন।

খুন কথাটা শুনেনি পটল পাই পাই করে সাইকেল চালিয়ে দিল। নামল এসে বটতলায় গণার সাইকেলের দোকানে। কালু অন্য দিনের চেয়ে বেশী মনোযোগ দিয়ে একটা টিউবের লিক সারাজিল।

কালুর সঙ্গে তার খুব ভাব। গণা না থাকলে কালু অনেক সময় বিনা পয়সাতেও তার চাকায় পাম্প দিয়ে দেয়।

এই কালু, কোথায় কে খুন হয়েছে রে ?

খুন! বলে কালু আকাশ থেকে পড়ে, জানি না তো!

বটতলায় আজ দোকানপাট খোলেনি তেমন। লোকজন দেখা যাচ্ছে না। থমথমে ভাব।

এই যে শুনলাম কে খুন হয়েছে! আমার বাবা নয় তো!

কালু মাথা নেড়ে বলে, আমি কিছু শুনিনি।

কালু যে মিথ্যে কথা বলছে তা এক লহমায় বুঝে গেল পটল।

লোকজন সব কোন দিকে গেছে জানিস?

আমি কিছু জানি না। কাজ করছি এখন।

বাদুর দোকানে জিজ্ঞেস করতেই চা-ওলা ছেলেটা বলল, ঘোষপাড়ার নাবালে যাও। কেটে ফেলে রেখে গেছে রাতে।

কে খুন হল?

কে জানে!

আমার বাবা নয় তো!

ছেলেটা নির্বিকার মুখে নিষ্ঠুরের মতো বলল, হতে পারে। দেখগে, চিনতে পারো কিনা।

পটলের হাত পা থরথর করে কাঁপছিল। সাইকেলটা সে কালুর সামনে ফেলে রেখে বলল, এটা রইল। এখন চালাতে পারব না।

দৌড়তে দৌড়তে পটল যখন নাবালের ধারে পৌছোলো তখন ভিড়টা বেড়েছে। মেলা লোক, কিন্তু গুণগেল নেই।

জীবনে খুন-হওয়া মানুষ কখনও দেখেনি পটল। মানুষকে যে এভাবে অনাদরে ফেলে রাখা যায়, মারা যায় তা তার কল্পনাত্তেও ছিল না কখনও। জলে আধ-ডোবা লোকটার নিথর পা দুখানার দিকে বিক্ষারিত চোখে চেয়ে ছিল সে। আমার বাবা নয় তো!

হতে পারে তার বাবা-ই ওটা। সবুজ জামা আর কালো প্যাণ্ট তো বাবার আছে।

কাছেই দশরথ সাহা দাঁড়িয়ে। সে মুখ তুলে লম্বা লোকটার দিকে চেয়ে করুণ গলায় বলল, দশরথ জ্যাঠা, এ আমার বাবা নয় তো!

দশরথ সাহা তার দিকে চেয়ে একটু যেন চমকে উঠল। তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, কেন তোর বাবা বাড়ি নেই?

না। কাল দুপুর থেকে আর ফেরেনি।

দশরথ সাহা কেমনধারা মুখ করে বলে, যা বাড়ি যা। পুলিশ এসে লাশ না তুললে কিছু বলা যাচ্ছে না। গিয়ে বামাচরণকে পাঠিয়ে দে।

সে আসবে না। কী হয়েছে বলুন না!

কে কি বলবে বাবা? দেখছিস তো কাণ্ডখানা! লোকে নানা কথা বলাবলি করছে। তুই আর থাকিস না এখানে।

কেন জ্যাঠা? আমি থাকলে কী হবে?

কী যে হবে তা দশরথও জানে না। দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, বাড়ির বড় কাউকে পাঠিয়ে দি গে যা।

পটল কি করবে বুঝতে পারছিল না। তাদের যে আর কেউ নেই। দাদু বুড়া মানুষ, বসা মানুষ, দাদু কি আসতে পারবে এত দূরে?

পটল হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে ছুটতে লাগল বটতলার দিকে। জ্যাঠা এখনও বোধ হয় বেরোয়নি। সে গিয়ে হাতে পায়ে ধরে ঠিক নিয়ে আসবে।

সাইকেলের দোকানের কাছাকাছি আসতেই সে একজন নতুন মানুষকে দেখতে পেল। জলকাদা মাথা মানুষ, কিন্তু এ গায়ের হেটো মানুষ নয়। লম্বা চওড়া চেহারা, বাবু মানুষ। মুখটা পটলের বড্ড চেনা।

কিন্তু লোকটাকে নিয়ে ভাববার সময় ছিল না তার। সাইকেলটা তুলে নিতে যাচ্ছিল, এমন সময় লোকটা ডাকল তাকে, এই, তুই পটল না?

উদ্ভ্রান্ত চোখে পটল লোকটার দিকে চাইল। চিনতে পারল। তারপর হঠাৎ ভ্যা করে কেঁদে গিয়ে লোকটাকে জাপটে ধরল সে, বড়জ্যাঠা, আমার বাবা খুন হয়ে গেছে।

কৃষ্ণজীবন ভীষণ অবাক হয়ে বলল, খুন হয়ে গেছে! বলিস কী?

ঘোষপাড়ার নাবালে পড়ে আছে বাবা।

কৃষ্ণজীবন তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, ওরকম করিস না। আয় তো, দেখে আসি।

পটল অব্যবহারে কাঁদছে। নাক দিয়ে, চোখ দিয়ে জল পড়ছে তার। পৃথিবীতে এখন বড়জ্যাঠার চেয়ে বড় স্বপ্ন আর সহায় তার কেউ নেই যেন, এমনভাবে আঁকড়ে ধরল সে কৃষ্ণজীবনকে।

নাবালের ভিড়ে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণজীবন লাশটাকে দেখল। তারপর পটলের দিকে চেয়ে বলল, কে বলেছে যে ও তোর বাবা?

সবাই জানে।

কৃষ্ণজীবন পটলকে শক্ত করে ধরে বলল, রামজীবনের বাঁ পায়ের গোড়ালিতে মস্ত কাটা দাগ আছে। আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন মহাদেব ঘোষের বাড়িতে পেয়ারা চুরি করতে গিয়েছিল রামজীবন। মহাদেব ঘোষ একটা দা ছুড়ে মেরেছিল। দাগটা এখনও আছে। আরও বেশি করে আছে। এ লোকটির বাঁ পায়ের গোড়ালিতে কোনও দাগ নেই।

পটল হাঁ করে কিছুক্ষণ জ্যাঠার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে, এ আমার বাবা নয়?

কখনোই নয়। চল, বাড়ি চল।

পটলের মনে হল, বড়জ্যাঠা যেন মানুষ নয়। যেন দেবদূত।

শরীর ছাড়া মানুষের আর কী আছে, আর কিসের প্রয়োজন তা বুঝতে পারে না চয়ন। কোনও দেবতা এসে যদি চয়নকে বলত, তোমাকে একটা মাত্র বর দেবো। যা খুশি চাইতে পারে। কী চাইবে চয়ন। করজোড়ে সমস্ত অন্তর দিয়ে সে বলবে, পৃথিবীর আর কোনও সম্পদ চাই না, শুধু আমার শরীরটাকে ভাল করে দাও। তাও ভাল বলতে সে পেশীফোলানো দেহশ্রী ব্যায়ামবীর হতে চায় না, সে লম্বাচওড়া জার্মান বা আফগানও হতে চায় না, সে শুধু চায় একটু সুস্থ থাকতে, যেখানে সেখানে সেখানে যখন তখন অজ্ঞান না হয়ে যেতে। বাস এইটুকু মাত্র। কত সাধারণ হেটো মেঠো মানুষেরও তো এইটুকু আছে। এ কি খুব বেশী চাওয়া তার ?

হয়তো-বা বেশীই। উন্টয়েভস্কিই না জীবনের শেষ দিকে এসে বলেছিলেন, শরীর যে মানুষের কত বড় সম্পদ তা আজ আমি বুঝি। খ্যাতি, সফলতা সবকিছুর পরও কেন তার ওই বিলাপ যদি সেটা সত্যিই মহার্ঘ্য হয় ?

জাগা অবস্থায় সকাল থেকে রাত অবধি চয়নের কাছে পৃথিবীটা বিবর্ণতায় মোড়া, বিষণ্ণতায় মাথা। তার সঙ্গে পায়ের পামো বেড়ালের মতো ঘোরের শরীরের ভয়।

গতকাল রাতে চয়ন কেরোসিনের টেবিল বাতিটা জ্বালিয়ে বই পড়ছিল। চৌকিতে অস্থির মা ঘুমোচ্ছিল নিঃশব্দে। হঠাৎ মায়ের শ্বাসের শব্দটা খেয়াল করল চয়ন। কেমন কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে। হাঁফধরা। সঙ্গে কি ক্লীণ একটা কৌকানির শব্দও ?

চয়ন উঠল, যা দেখল তাতে তার হাত-পা হিম। চোখ ওল্টানো, হাঁ করা মুখ, শ্বাস নিতে কী কষ্টই যে হচ্ছে!

মা! মা! বলে চয়ন কয়েকবার ডাকল। সাড়া পেল না।

দরজা খুলে উঠোন পেরিয়ে সে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দরজাটায় ধাক্কা দিয়ে ডাকল, দাদা! বউদি! শিগগির এসো! মা কেমন করছে।

কয়েকবার ডাকবার পর ওপরের জানালা দিয়ে অয়ন বিরক্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে, চোঁচাচ্ছিস কেন ?

একটু এসো। মা কেমন করছে।

অয়ন নেমে এল। বউদি এল না। অয়নের হাবভাবে ব্যস্ততা নেই, উদ্বেগ নেই, উত্তেজনা নেই, এল, দেখল। তারপর চাবির গোছটা চয়নের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ডাক্তার রাহাকে একটা খবর দে।

চয়ন এত ঘাবড়ে গেছে যে, একগোছা চাবির ভিতরে কোনটা সদরের চাবি তা খুঁজে পাচ্ছিল না। কাঁপা হাতে একটার পর একটা চাবি দিয়ে চেষ্টা করছিল খুলতে। হয়তো এক চাবিই দু'তিনবার লাগল। অয়নকে জিজ্ঞেস করবে সে কথা মনেই হল না তার। কতদিন হল, তার কেবলই মনে হয় মা তার একার। এ মা অয়নের নয়। এ দায় তাকে একা বইতে হবে।

দরজা খুলে বেরোতেই সে গলদঘর্ম হয়ে গিয়েছিল। যখন দুটো মোড় পেরিয়ে রাহার বাড়ির দরজায় পৌছালো তখন তার শরীরে আর একটুও জোর নেই, বুকে নেই দম।

দোতলা থেকে একটা পুরুষকণ্ঠ জিজ্ঞেস করল, কে ?

চয়ন জবাব দিতে পারল না। তার গলায় শব্দ নেই। সে শুধু ক্লান্ত ঘাড়টা লটকে ঊর্ধ্বমুখে চেয়ে রইল। খরার আকাশের দিকে এভাবেই বোধ হয় হত্যা চাষী তাকিয়ে থাকে।

তবে ল্যাম্পপোস্টের আলো পড়েছিল তার মুখে। ডাক্তারবাবু চিনতে পারলেন, কি রে চয়ন ?

চয়ন তার প্রাণপণ শক্তিতে গলা হেঁড়ে বলে উঠল, মা!

ডাক্তারবাবু নেমে এলেন। চয়ন তখন সিঁড়িতে বসে হাঁফাচ্ছে।

কী হয়েছে ? ষ্ট্রোক নাকি ?

চয়ন শুধু মাথা নেড়ে জানাল যে, সে জানে না।

সামান্য উত্তেজনা, সামান্য উদ্বেগ, একটু আচমকা দৌড়ঝাঁপ তাকে যেন রসাতলে ফেলে দেয়। ডাক্তারবাবুর পিছু পিছু বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে সে নিজের ওপর যেন্নায় মরে যাচ্ছিল। ডাক্তারবাবুর কোনও কথাই সে স্পষ্ট জবাব দিতে পারেনি।

ডাক্তার এসে মাকে দেখলেন, তারপর অয়নের দিকে তাকিয়ে বললেন, কার্ডিয়াক অ্যাজমা ছিল নাকি ?

অয়ন বলে, ঠিক জানি না।

হাসপাতালে নিতে পারবে ?

হাসপাতাল! বলে অয়ন খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল।

ডাক্তার একটু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, অবশ্য সেখানে নিয়েও খুব লাভ হবে না। শরীরে তো কিছুই নেই দেখছি, ক'খানা হাড় মাত্র। এক কাজ করো, নন্দী ফার্মাসি থেকে একটা অকসিজেন সিলিন্ডার আনাও। আর ওষুধ। ওদের দোকানের ভিতরে লোক থাকে। ডাকলেই উঠে ওষুধ দেবে। তাড়াতাড়ি করো। আমি বসছি।

কাঁচা ঘুম থেকে উঠে-আসা বিরক্ত অয়নের মুখ দেখে কেরোসিনের আলোতেও চয়নের মনে হয়েছিল, বিছানায় ওই যে ক'খানা হাড়ের অস্তিত্ব নিয়ে পড়ে আছে মা, আজও নির্লজ্জের মতো পৃথিবীতে মা হয়ে জন্মানোর গুণাগার দিচ্ছে, এ মা অয়নের নয়। অয়নরা মায়ের পেটে জন্মায় না। অয়নদের মা বলে কেউ থাকে না।

অয়ন চয়নের দিকে চেয়ে বলল, দৌড়ে যা।

চয়ন জানত তাকেই যেতে হবে। ঝিক্‌কি না করে সে তোশকের তলা থেকে প্রাস্টিকের ছোট ব্যাগটা বের করে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। এবং তারপরই বুঝতে পারল, শরীরময় অস্তিত্বের কত অসুবিধে। তার হাঁটু ডেঙে আসছে। তার হাঁফ ধরে যাচ্ছে।

তবু নন্দী ফার্মাসি অবধি গেল চয়ন। দরজা খোলালো। সিলিভার আর ওষুধ নিল। তারপর তার পক্ষে গন্ধমাদন বণ্ডার মতো ভারী সিলিভার কাঁধে নিয়ে সে ফিরল।

উঠানটা সে যে কী করে পেরোলো তা সে নিজেও জানে না। দরজার চৌকাঠটা কোনওক্রমে ডিঙিয়ে সে সিলিভার সমেত পড়ে যাচ্ছিল মেঝেয়। ডাক্তারবাবু ধরলেন, আহা, ওরকম অস্থির হলে চলে ? বিপদে মাথা ঠিক রাখতে হয়।

তখন কানে ঝিঝি শোকা ডাকছে চয়নের। তবু পকেট থেকে ওষুধ, ডিসপোজবল সিরিঞ্জ আর অ্যাস্পুলের প্যাকেটটা বের করে দিল।

আর সময় ছিল না তার। দরজার বাইরে নিজেকে নিক্ষেপ করল সে। কয়েক পা টলেমলো করে হেঁটে চৌবাচ্চার দিকে সরে গেল, যেখানে বাসন মাজবার ছাইগাদা, নোংরা ফেলার বালতি। সেখানেই অন্ধকারে নিজেকে ঢেলে দিল সে। তারপর নিশ্চিন্তে অজ্ঞান হয়ে গেল।

কেউ একজন দেখেছিল তাকে। ওপর থেকে। সে জানত না।

কিন্তু চোখে মুখে জলের ঝাপটা খেয়ে যখন চোখ খুলে তাকাল তখনও খুব বেশী সময় যায়নি। হয়তো কয়েক মিনিট। সামনে বউদিদের কিশোরী ঝি রূপা দাঁড়ানো। হাতে মগ।

ওপর থেকে বউদি চাপা তীব্র স্বরে ডাকছিল, এই রূপা! কী করছিস ওখানে ? চলে আয়!

রূপা অবশ্য পাশ্চাৎ দিল না। চয়নের দিকে চেয়ে ফ্রক পরা মেয়েটা বলল, আমার মায়েরও এ রোগ আছে। পীরবাবার জলপড়া দিলে সেরে যায়।

চয়ন ভেজা গায়ে উঠে বসল। শরীরে ভাঁটির টান। পরনির্ভর এই জীবনের ভার আর বইতে হচ্ছে করে না।

মেয়েটা এগিয়ে এসে হাত ধরে বলল, ভর দিয়ে ওঠো, পারবে ?

ওপর থেকে বউদি চেঁচাল, এরপর কিছু চুলের মুঠি ধরে হেঁচড়ে আনবো।

চয়ন বলল, তুই ওপরে যা রূপা। আমি পারব।

রূপা খুব একটা চাপা গলায় নয়, বরং একটু শুনিয়েই বলল, চোঁচাক না মাগী, সবসময়েই তো চোঁচায়। সামনের শনিবার খুঁড়ো এলে তার সঙ্গে চলে যাবো। মা গো! এ বাড়িতে মানুষ থাকতে পারে!

রূপার গলা নিশ্চত রাতে স্পষ্টই শুনতে পেল বউদি। তাই বোধ হয় আর একটাও কথা বলল না। জানালা বন্ধ করে দিল।

চয়ন ভয় পেল। সে জানে, জল অনেক দূর গড়াবে। বউদি সহজে ছাড়বে না। সে মৃদু গলায় বলে, ওপরে যা রূপা, নইলে হয়তো মারবে।

রূপা ফ্যাক করে হেসে বলে, অত সোজা নয়। প্রথম প্রথম চড়-চাপড় হজম করছি, তারপর একদিন যেই মারতে এসেছে অমনি বেলনা তুলে আমিও তেড়ে গেছি। বাস মর্দানী সব ফুস করে উবে গেছে। আজকাল তো আমি গাল দিলেই উল্টে গাল দিই। ওঠো তো, ভর দিয়ে ওঠো।

ভর দিতেই হল চয়নকে। নইলে উঠতে পারত না।

তুমি যখন থাকো না তখন আমি এসে মাঝে মাঝে বুড়ি মাকে দেখে যাই। ইস, কেমন মড়ার মতো পড়ে থাকে! মনে হয় বুঝি শ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে।

• চয়ন খুব বড় বড় করে শ্বাস নিতে লাগল।

বুড়ি মাকে নিয়ে আলাদা হয়ে যাও না কেন ?

চয়ন এ কথার কীই-বা জবাব দেবে ? সে একটু হাসবার চেষ্টা করল মাত্র।

রূপা ওপরে গেল না। তার পিছু পিছু ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল।

ডাক্তার ইঞ্জেকশন দিয়ে নাকে নল লাগিয়েছে। তারপর নাড়ী ধরে বসে আছে। পাশে বিরক্ত অয়ন।

ডাক্তার মায়ের হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলল, সবসময়ে অ্যালার্জি থেকে। অবস্থা খুব ভাল নয়। এ ঘরে আলো নেই কেন বলো তো!

অয়ন গলা ঝাঁকারি দিয়ে বলল, লাইনটা খারাপ।

আলো থাকারটা দরকার। আর ঘরটা ভীষণ স্টাফি। সম্ভব হলে দোতলায় শিফট করো। এখানে তো কেরোসিনের গ্যাস জমে আছে। স্টোভ জ্বলে নাকি ?

অয়ন বলল, মাঝে মাঝে জ্বালতে হয়।

রুগীর পক্ষে খারাপ।

প্রাস্টিকের ব্যাগটা কোথায় ফেলেছে তা অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছিল না চয়ন। ডাক্তারের ভিজিটটা দিতে হবে।

কী খুঁজছো ?

ছোট একটা কালো প্রাস্টিকের ব্যাগ।

দাঁড়াও। বলে রূপা উপর হয়ে এদিক ওদিক খুঁজে চৌকির পায়ার কাছ থেকে ব্যাগটা কুড়িয়ে এনে দিল।

ডাক্তারবাবু চলে যাওয়ার পর সদর বন্ধ হলে চয়ন এসে মায়ের কাছে বসল। আর সঙ্গে সঙ্গে ওপরে জানালা খুলে বউদি চোঁচিয়ে উঠল, আই রূপা হারামজাদী বজ্জাত, কতবার ওপরে আসতে বলেছি তোকে ?

রূপা উঠোন থেকে সমান তেজে জবাব দিল, অমন ঘাঁড়ের মতো চোঁচাচ্ছে কেন ? বুড়ো মানুষটার অসুখ করেছে বলে দেখতে এসেছি সেই তখন থেকে চোঁচিয়ে যাচ্ছে। কেন, কী কাজ তোমার ?

ফের মুখে মুখে কথা! আমি হুকুম করছি, তুই ওপরে আসবি। উল্টে চোপা করছিস!

যাবো না ওপরে, কী করবে ? গলাটা কেটে ফেলবে ? এঃ, হুকুম দেখাতে এসেছে!

এই শুনছো! ওকে কান ধরে নিয়ে এসো তো।

এ কথাটা অমনকে উদ্দেশ্য করে বলা। অয়ন কিছু উপদেশ দেবে বলেই বোধ হয় দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু রূপা আর বউয়ের ঝগড়ায় বিব্রত হয়ে চুপ করে ছিল। এবারে মুখ ফিরিয়ে রূপার দিকে চেয়ে বলল, যা না ওপরে। রূপা ঝাঁঝিয়ে উঠে বলে, কেন যাবো? মাঝ রাত্তিরে তো আর ঘরের কাজ নেই। একটু দেখতে এসেছি, অমনি কেমন ঝাঁকাস্কে দেখে। আচ্ছা মেয়েমানুষ বাবা!

ওপর থেকে বউদির গলায় একটা বিস্ফোরণ শোনা গেল, শুনলে! তুমি পুরুষমানুষ না কী! অ্যা! চুলের ঝুটি ধরে ওকে দু'ঘা দিতে পারছো না? মুখের সামনে দাঁড়িয়ে ঝি-চাকর যা-খুশি বলে যাবে! তোমার ব্যক্তিভূত নেই?

অয়ন যে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তা চয়ন খুব বুঝতে পারছে। রূপার গায়ে হাত তোলার মতো সাহস তার নেই, বউয়ের অবস্থা হওয়ার মতো বুকের জোরেরও অভাব।

বউদি চৈচিয়ে বলল, মেনীমুখো পুরুষ বলেই তো কেউ মানে না, ভয়ও খায় না। দিবিয়া বাড়ি দখল করে আপদেরা বসে আছে। পারলে তাড়াতে? একদিন এ বাড়ি ওই ছোট তরফের ভোগেই যাবে। ভাল মানুষটি সেজে থাকে বলে সোজা পার ভেবো না। ভিরিম খায়, চোখ উল্টে পড়ে থাকে—ওসব ন্যাকামি তের জানা আছে। তলায় তলায় কী করছে জানো? নইলে ওই সোমথ মেয়েটা রাতবিরেতে গিয়ে ওরকম ঝাপ খেয়ে পড়ে নাকি? মুখের অত জোরই বা আসছে কোথেকে যদি না তোমার যুধিষ্ঠির ভাইয়ের উসকারি থাকত!

এই আঙ্গুলটা খুব নতুন। রূপার সঙ্গে কত অনায়াসে তাকে জড়িয়ে নোংরা ইঙ্গিত করে ফেলল বউদি! প্রতিবাদ করার মতো জোর বা ক্ষমতা নেই চয়নের। অবস্থা হ্রস্বপণ্ডের একটি প্রবল দূরদূরিন নিয়ে সে মায়ের মৃতপ্রায় মুখের দিকে চেয়ে বসে রইল।

জবাব দিল রূপা, বেশী কথা কইবে তো আমিও কথা কইতে জানি। যখন দেশ থেকে আনিয়েছিলে তখন তো কত ভাল ভাল কথা! ভাল হয়ে থাকবি, তোর বিয়ে অবধি আমরা দিয়ে দেবো। মেয়ের মতো ভালবাসবো। যাদের কথার ঠিক নেই তাদের সঙ্গে খানকীর তফাত নেই, বুঝলে!

খানকী আমি না তুই? মাঝরাতে উঠে একেবারে আলুথালু হয়ে গিয়ে বুকের ওপর পড়ল—যেন উত্তম-সুচিত্রা! ডুবে ডুবে জল খাস একাদশীর বাবাও টের পায় না, না? অত দরদ কিসের রে? ধুমসো মেয়ে, ফ্রক পরে কচি খুকি সেজে থাকলেই বুঝি লোকের চোখে ধুলো দেওয়া যায়? এই, তুমি এখনও দাঁড়িয়ে মজা দেখছো? পায়ের চটিটা খুলে ওর দু'গালে মারতে পারছো না?

অনেকক্ষণ বাদে অয়ন মানুষের মতো একটি আচরণ করল। ওপর দিকে চেয়ে বলল, কেন চিৎকার করছো বলো তো? মায়ের যে ভীষণ অসুখ।

আহা, মায়ের অসুখ! অসুখ তো নিত্যদিন আছে। আর তোমার নাকের ডগায় দাঁড়িয়ে যে মেয়েটা আমাকে যা খুশি বলছে! তোমার মতো পুরুষের ঘোমটা দিয়ে থাকা উচিত।

দ্বিধাবিভক্ত অয়ন নিজেই জোড়া দিতে পারছে না। কেরোসিনের ম্লান আলোতেও তার অসহায় মুখখানা দেখতে পাচ্ছিল চয়ন। সে মৃদুস্বরে বলল, তুই ওপরে যা দাদা! আমি তো মায়ের কাছে আছিই।

অয়ন সামান্য দ্বিধার সঙ্গে বলল, তুই কি এর মধ্যে অস্জ্ঞান হয়ে পড়েছিলি! কই, দেখিনি তো!

লজ্জিত চয়ন বলে, হঠাৎ মায়ের এরকম হওয়ায় বোধ হয় মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল। চৌবাক্তার কাছে গিয়েছিলাম। রূপা এসে চোখে মুখে জল দিয়েছিল।

অয়ন একটা স্বাস ফেলে বলে, এই তাহলে ব্যাপার!

উঠানে রূপা হঠাৎ কি একটা কথার উত্তরে চৈচিয়ে বলল, গলায় তুমি দড়ি দাও গে। সকাল হোক না, পাড়ার লোক যদি জড়ো না করি তাহলে আমার নামে কুকুরকে ভাত দিও। পাশের বাড়ির বিস্তি বলেছে, এ বাড়ির বউদিটা এক নম্বরের হারামি।

শুনলে! শুনলে তুমি?

অয়ন বিবর্ণ মুখে রূপার দিকে ফিরে বলল, কী করছিস তুই! কোন সাহসে এত কথা বলছিস?

কেন, আমি কি কাউকে ভয় পাই?

চুপ করবি কিনা!

আগে তোমার বউকে চুপ করাও!

অসহায় অয়ন একবার চয়নের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে ধীরে ধীরে ওপরে চলে গেল। চয়ন ঘর থেকে শুনতে পেল, ওপরে স্বামী-স্ত্রীতে প্রবল কথা কাটাকাটি হচ্ছে। তবু ভাল। পাড়া জানান দিয়ে যা হচ্ছিল তার চেয়ে এটা বরং ভাল। ওদের স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া খুব হয়। কিন্তু পরদিন আবার বেশ ভাবসাব, হাসি-হাসি মুখ, ওগো-হ্যাঁ গা।

রূপা দরজায় এসে দাঁড়িয়ে আছে। মুখখানা ফেটে পড়ছে রাগে।

চয়ন একবার তাকাল তার দিকে। বহুর পনেরো-ষোলোর সতেজ মেয়ে। রংটা চাপা, মুখে একটা রক্ষ উগ্র ভাব আছে। মাথায় একরাশ কৌকড়া চুল। মাত্র মাসখানেক হল এসেছে। চয়নের সঙ্গে ভাল করে দেখাও হয় না। তবে এক মাসে সে এটা লক্ষ করেছে যে, দাদার অন্য সব ঝি তার সঙ্গে যেমন খারাপ ব্যবহার করে, এ মেয়েটা তেমন করে না।

চয়ন মৃদু স্বরে বলল, ঝগড়া করলি কেন?

বাঃ, ওই তো ঝগড়া করল। আমি কি লাগতে গেছি। ওপর থেকে দেখলাম তুমি চৌবাক্তার ধারে দড়াম করে পড়ে গেলে, তাই ছুটে নেমেছি। তাকে কি দোষ ছিল? মৃগী যে কেমন খারাপ ব্যায়রাম তা আমি হাড়ে হাড়ে জানি।

এখন কী হবে? তাকে যদি তাড়িয়ে দেয়?

দিক না! জলে পড়ে যাবো না ঠিকই। সামনের চাটুজ্জে বাড়ি থেকে তো দুশো টাকায় সাধছে। বর-বউ চাকরিতে যায়, বাচ্চা রাখতে লোক চাই।

চয়ন একটু হাসল। এ বয়সের মেয়েদের আজকাল চাকরির অভাব হয় না ঠিকই। বরং প্রচণ্ড চাহিদা।

চয়ন পরিশ্রান্ত বোধ করছে, একটা গভীর মন খারাপের গহ্বর তৈরি হয়েছে বৃকের মধ্যে। মা চলে যাচ্ছে। সে কিছুই করতে পারছে না। মায়ের নিবৃত্ত মুখের দিকে চেয়ে চয়ন বলল, আমার জন্যই তো অশান্তিটা হল তোর। কেন যে তুলতে এলি আমাকে। জানিস তো বউদি আমাকে পছন্দ করে না।

রূপা দরজার চোকাঠে উবু হয়ে বসে তার দিকে চেয়ে বলে, শোনো দাদাবাবুর কথা! একটা লোক আঁস্তাকুড়ে পড়ে থাকবে, কিছু করব না বুঝি! মুগী খুব খারাপ রোগ। মাকে সেজন্য আমরা পুকুরে বা নদীতে যেতে দিই না। উনুনের ধারেও যাওয়া উচিত নয়। একবার তো ভাতের ইড়িতে পড়ে গিয়ে মুখটুখ পুড়ে গিয়েছিল। তোমাকে দেখার তো কেউ নেই, না?

দরকারও হয় না। চলে যাচ্ছে।

তোমাকে ওই শয়তানটা দেখতে পারে না কেন বলো তো? সবসময়ে তোমাদের নিয়ে খারাপ খারাপ কথা বলে। বলুক গে। কী যায় আসে!

তোমার গায়ের চামড়া বেশ পুরু আছে বাপু। অত ভয় খাও কেন? দেখলে তো চোটপাট করলুম বলে কেমন চুপসে গেল!

চয়ন মৃদু হেসে বলে, তোর খুব সাহস, না?

আমি কাউকে ভয় খাই না।

দেশে থাকতে লেখাপড়া করিসনি?

রূপা মুখটা একটু ঝামরে বলল, সবাই কেন ওকথা জিজ্ঞেস করে বলো তো! লেখাপড়া করে কি তোমাদের আর দুটো করে হাত-পা গজিয়েছে? তোমার বউদি তো শুনি বি এ পাশ, আহা, কী বি এ পাশের ছিঁরি! মুখ তো আমাদের মতোই আঁস্তাকুড়! না বাপু, আমি বেশী পড়িটুড়িনি তবে বাংলা অক্ষর চিনি। সোজা বই হলে একটু-আধটু পড়তেও পারি। কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং করে লিখতেও পারি একটু।

বাড়িতে কে আছে?

যেমন সকলের থাকে। মা বাপ তিনটে ভাই আর চারটে বোন। রোজগারপাতি নেই। বাবার একটা ভটভটি আছে, ভাগের। আর ক্ষেতে কিছু ধান হয়। একটা ভাই মাছের ভেড়িতে সদ্য কাজে ঢুকেছে।

তুই একটা বেশ মেয়ে। তবে একটু ঝগড়াটি, তাই না?

ঝগড়াটি না হলে শেয়ালে শকুনে টেনে নিয়ে যেত এত দিনে, বুঝলে? মুখের জোর আর গলার জোর না থাকলে আমাদের মতো মেয়েদের খুব বিপদ।

চয়ন একটু অবাক হয়ে বলে, বেশ বলেছিস তো!

নিজের কানেই তো শুনলে, তোমার বউদি তোমাকে আমাকে নিয়ে কেমন খারাপ কথা বলছে। কিছু করিনি তাও। মুখ বুজে থাকলেই পেয়ে বসত। আরও বলত। এমন ঝামা ঘষে দিয়েছি যে, আর বলবে না কখনও।

চয়ন মৃদু ভ্রূন একটু হাসল। তারপর নরম গলায় বলল, যা, যুমো গে।

তুমি কী করবে? মাকে আগলে বসে থাকবে?

মাকে নিয়েই তো থাকি।

অবস্থা কি খুব খারাপ?

মায়ের শরীরে কি কিছু আছে বল! ক'খানা হাড় শুধু।

জানি। আমি এসে মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে দেখে যাই।

চয়ন কৃতজ্ঞতায় ভরে গিয়ে বলে, মাঝে মাঝে দেখিস। কেউ দেখে জানলে ভরসা পাই।

ডেরো না তুমি। এ বাড়িতে যে ক'দিন আছি, দেখব।

রূপা চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ শুদ্ধ হয়ে বসে ছিল চয়ন। মা সারা রাত নানারকম শব্দ করল। শ্বাসের শব্দ, কষ্টের শব্দ। ভোরবেলার দিকে শান্ত হল যেন। ডাক্তার বেলা আটটা নাগাদ এসে দেখে-টেখে বলল, ফাঁড়াটা এ যাত্রা কেটেছে। কিছু এ রোগে কিছু বলা যায় না।

সকালে আজ টিউশনিতে যাবনি চয়ন। সারাদিন মায়ের পাশে বসে রইল চুপ করে। কিছু ভাবল না। কিছু করল না। এমন কি খেতে অবধি ইচ্ছে হল না।

বিকেলের দিকে সামলে উঠল তার মা। দুটো একটা কথা বলল।

টিউশনিতে কি যাবো মা? একা থাকতে পারবে?

যা বাবা। কামাই হলে যদি ছাড়িয়ে দেয়! যা। একাই তো থাকি। পারব।

সারাদিন খাবনি বলে যে খিদে পেয়েছিল তাও নয়। শরীরটা অবসন্ন লাগছিল তার। এর বেশী কিছু নয়।

কিন্তু মোহিনী তাকে দেখেই বলল, মাষ্টারমশাই, আপনার কী হয়েছে?

চয়ন অপ্রতিভ মুখে বলল, তেমন কিছু নয়। মার শরীরটা ভাল নয়। রাত জাগতে হয়েছিল।

তাহলে আজ না এলেই হত। একটা ফোন করলেই পারতেন।

সারাক্ষণ ঘরে থাকতে ভালও লাগছিল না।

মায়ের কী হয়েছে?

হার্ট ভাল নয়।

মোহিনীর চোখ একটু ছলছল করল বোধ হয়। মুখের দিকে তাকায় না বলে স্পষ্ট দেখতে পেল না চয়ন। তবে মেয়েটা বড্ড মায়ারী। মনটা খুব নরম।

মোহিনী হঠাৎ বলল, আপনি বোধ হয় কিছু খাননি আজ ।
না না, খেয়েছি ।
দাঁড়ান তো । আসছি ।
মোহিনী উঠে গেল । লজ্জায় মরমে মরে যাচ্ছিল চয়ন । গ্রাইভেট টিউটর হিসেবে সে কি বড্ড বেশী প্রশ্রয় পাচ্ছে না ?
এতটা কি তার পাওনা ?

॥ ২৮ ॥

বিড়ির গন্ধটা নিমাইয়ের সহ্য হচ্ছিল না । বিড়ির মধ্যে যে কী মধু আছে কে জানে বাবা! লোকে সারাক্ষণ ফুসফুস করে টেনেই চলেছে, টেনেই চলেছে । বিটকেল বাঁজালো গন্ধটা নাক এলেই নিমাইয়ের পেটে গৌতলান মারতে চায় একটা অবস্থি । তবু সইতে হয় । না সেয়ে উপায় কী ? যার সঙ্গেই কথা কইতে যায় সেই দু'চার কথার পর ফস করে একটা বিড়ি বা সিগারেট ধরিয়ে ফেলে । বিড়িই বেশী । সিগারেট বিড়িতে চারদিকটা ছয়লাপ ।

গণেশ সাহা মস্ত মানুষ । মণিমালা অপেরার মালিক । চিৎপুরে গদি । এরকম সব মানুষের সামনে এসে বসতে পারাটাই ভাগ্যের কথা । কত উমেদার আসে, দরজার বাইরে থেকেই খেদিয়ে দেওয়ার কথা । সেটা যে করেনি সেটাই সৌভাগ্য বলে বিবেচনা করছে নিমাই ।

গনেশের বিড়ির ধোয়া সুতরাং সইতে হচ্ছে নিমাইকে । নাক চেপে থাকবে, তারও উপায় নেই । নাক চেপে থাকলে গনেশ সাহার অপমান হতে পারে ।

কথা অবশ্য বীণাই কইছে । বলে-কয় ভাল । আগে একটু আলাপও ছিল । কাঁচড়াপাড়া যাত্রা উৎসবে দল নিয়ে গিয়ে বছরটাক আগে বিশ্ববিজয় অপেরার পালা দেখেছিল গণেশ । তখনই আলাপ । বীণা পায়ের ধুলো নিয়েছিল, গনেশ আশীর্বাদ করেছিল । সেসব আজ আর মনে থাকার কথা নয় । ছিলও না গণেশের । আজও পায়ের ধুলো নেওয়ার চেষ্টা করেছিল বীণা । পেরে ওঠেনি । ঘরখানা বড্ড ছোট, তার মধ্যে রাজ্যের টেবিল চেয়ার পাতা । আর গণেশ একখানা হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে বসে । টেবিলের নিচে অতি দুর্গম জায়গায় তার পা । বীণা নিচু হয়ে যখন অন্ধকারে গণেশের পা খোঁজাখুঁজি করছিল তখন ঠকাস করে কপাল ঠুকে গেল টেবিলের কানায় । গণেশ শশব্যস্ত হয়ে বলল, থাক থাক ।

শিয়ালদায় নেমে চিৎপুর অবধি আসতেই তারা যেমে, হাপসে অস্থির । একখানা শহর বটে এই কলকাতা । কোনওদিকেই এগোনো যায় না । বাসে ট্রামে গন্ধমাদন ভিড়, রাস্তায় থিক থিক করছে মানুষ-পোকা, হকার, বাজার, রাগী আর তেড়িয়া সব বাঘ-ভালুকের মতো লোক । বাসে ট্রামে সুবিধে হল না বলে হেঁটেই আসতে হয়েছে । ঠিকানা খুঁজে বের করতে দম আরও বেরিয়ে গেছে । গলির গলি তস্যা গলির মধ্যে এই ঘরখানা । বুকচাপা অন্ধকার । হওয়া নেই । লোড শেডিং বলে দিনের বেলাতেও মোম জ্বলছে । হাতপাখা হাতে মোটা মানুষ গণেশ বসে । বন্ধ ঘরে গণেশের বিড়ির ধোয়া একেবারে আঁট হয়ে বসে আছে । নড়ছে না ।

বীণা বলল, আপনি তো আমার পাঁট দেখেছেন গণেশদা । একবার চান্স নিয়ে দেখুন, প্রাণ দিয়ে করব ।

গনেশ ভারি বিমর্ষ গলায় বলল, আরে ভাই, বায়নাই হচ্ছে না তো পাঁট, গত বছর এসময়ে অন্তত গোটা কুড়ি আগাম বায়না হয়েছিল । এবার তো মাছিও বসছে না ।

কেন, মণিমালা অপেরার তো খুব নাম ।

সে ছিল । পৌরাণিক পালাগুলো একসময়ে রে রে করে আসর মাতিয়ে দিত । তা এখন একটু অন্যরকম করতে গিয়ে মার খাচ্ছি । দু'দুটো পালা বসে মার খেল । শাখা-সিঁদুর চলল না, সতীর জ্বালা তিন-চার জায়গায় হল, কিন্তু ক্র্যাপই পেল না ।

তা বলে তো আর দল বসে থাকবে না ।

বসার মতোই অবস্থা । সিনেমার পাঁচু চাটুজ্জেকে সাতের দরে রাখলুম, তাতেও কিছু হল না । লোহার কারবারটা ছিল বলে রক্ষে, নইলে পেটের ভাতে টান পড়ত ।

ওকথা বলবেন না । আপনার তো খুব নামডাক । এখন একটু পড়তি অবস্থা যাচ্ছে বলে কী, আবার বায়না হবে ।

তা বিশ্ববিজয়ও তো ভালই করছিল । ছেড়ে আসতে চাও কেন ?

বিশ্ববিজয় ভাল দল । কাকার মতোও মানুষ হয় না । কিন্তু বনগাঁয়ে চিরটা কালই কি পড়ে থাকব ?

লাইম লাইটে আসতে চাও নাকি ? সে বড় শক্ত কথা । রোজ কত ছেলে মেয়ে এসে ধরনা দিচ্ছে । অনেকে পয়সাকড়িও চায় না, শুধু একটা চান্স চায় । আমি বলি কি, বিশ্ববিজয় ছেড়ো না । এখানে তো খুব কমিশিটশন, ওখানে তা নেই । বিশ্ববিজয় কম পয়সায় পালা করে, তাই বায়নাও হয় । আর আমাদের অবস্থা দেখ, হাতি পোষার বরচ । বছরে কতগুলো মাস আর্টিস্টদের বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দিতে হয় । আমরা কম পয়সায় করতে পারি না ।

দেখবেন, বায়না ঠিকই হবে ।

কোথায় আর হচ্ছে! শাখা-সিঁদুর আর সতীর জ্বালা এ দুটো পালায় কম পয়সা ঢেলেছিলাম ? সবই কপাল । পালা দুটো চলল না হয় কথা ছিল ।

আচ্ছা, আমার চেহারা তো খুব খারাপ নয় । পাঁট দেখেও তো লোকে ক্র্যাপ দেয় । একেবারে কি ফেলনা ভাবছেন আমাকে ?

গণেশ একথায় রাগ করল না । মাথা নেড়ে বলে, ওরে বাপু, চেহারা তো আমরা মেক-আপ আর আলো দিয়েই পেট্রীকে পরী বানিয়ে দিই । ওটা কোনও কথা নয় । চন্দ্রা মল্লিককে মেক-আপ ছাড়া দেখেছো কখনও ? রাস্তায় হেঁটে গেলে কেউ ফিরেও তাকাবে না । সেই চন্দ্রা যখন স্টেজে নামে তখন লোকে পাগল হয়ে যায় ।

সে জানি। চন্দ্রাদির সঙ্গে আমার আলাপও আছে একটু।

নাম করে ফেললে সব দোষই ঢেকে যায়।

আমাকেও একটু নাম করতে দিন না। দেখবেন, ঠকবেন না।

গণেশ বিড়িটা একটা অ্যাশট্রের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বলল, নতুন একটা পালা এবারে নামাচ্ছি। বাবু-বিবি। যদি এটা লাগে তাহলে তোমার কথা ভাবব'খন। এ সিজনটা যেতে দাও।

বীণা খুব আবদার মাখানো গলায় বলে, আমার কথা আপনার মনেই থাকবে না। এই তো বললেন, কত ছেলেমেয়ে আসছে পার্টের জন্য।

তা আসছে। মণিমালা অপেরার বুকের পাটা আছে বলেই নতুন আর্টিস্ট নামায়। সুনীতি বিশ্বাস, জয়ন্ত হালদার, যোগেন বোস এরা সবাই এই আমার হাতের তৈরি। সুনীতি নেমকহারামি করেনি, এখনও আছে। যদিও মেলা টাকা চাইছে আজকাল। আর যারা নাম করেছে সবাই বড় বড় দলে গিয়ে ভিড়েছে। তবু কি ডেডে পড়েছি? আবার নতুনদের দিয়েই বছর চারেক আগে 'সাধক বামাক্ষাপা' আর 'ঝড়ের রাত' নামিয়ে কেমন হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছিলুম!

সে আর বলতে। ঝড়ের রাত তো এই সেদিন অবধিও চলেছে।

সব নতুন মুখ ছিল। বুঝলে?

বাবু-বিবির কান্টিং কি শেষ?

ও বাবা! শেষ হবে হয়েছে। রিহার্সালই তো চলছে পনেরো দিনের বেশি।

একটা ছোটখাটো রোলও কি পড়ে নেই?

তাই কি থাকে! আমাদের সব গোড়া বোধে কাজ করতে হয়। পুজোর সময় থেকেই পালা নামবে, আর ক'টা দিন হাতে আছে?

আর ক'টা দিন আগে এলে বোধ হয় ভাল করতুম, তাই না?

তা করতে। বড্ড দেরী করে ফেলেছো। তবে চিন্তা কিসের? ব্যয় কম, সুযোগ হয়তো পেয়ে যাবে। সঙ্গে এটি কে বসো তো!

বীণা একটু লজ্জা পেয়ে মুখ নামিয়ে বলল, আমার বর।

গণেশ পুরনো আমলের মানুষ। যাত্রাওয়ালির ঘর-সংসার আছে জেনে যেন খুশিই হল। বলল, বাঃ বেশ। তা তুমি কী করো হে বাপু?

নিমাই তটস্থ হয়ে বলল, এই টুকটাক।

বীণা তাড়াতাড়ি নিমাইয়ের আহাষকি ঢাকবার জন্য বলল, ফলের ব্যবসা আছে।

গণেশ প্রশান্ত মুখে বলল, খুব ভাল ব্যবসা। ফল শুদ্ধ জিনিস। তা গানটান জানো নাকি? একটু আগে যেন শুনছিলাম শুনশুন করে একটু গাইছিলে! কীর্তনের মতো!

ভারি লজ্জা পেয়ে গেল নিমাই। গান জানান ওই হল একটা মুশকিল। যখন তখন যেখানে সেখানে বে-খেয়ালে গলায় সুরটা খেলে ওঠে। মাথা নামিয়ে বলল, আজ্ঞে গানটান জানি না। হেঁড়ে গলায় কি আর গান হয়? একটু কীর্তন-টির্তন করি আর কি!

খুব ভাল। গলায় সুরও আছে মনে হচ্ছে। তা ফলও ভাল, কীর্তনও ভাল, কিন্তু কচি বউটিকে এই লাইনে ঠেলছো কেন? সংসার যে রসাতলে যাবে।

নিমাই আভাস্তরে পড়ে গেল। কথাটা ন্যায্য বটে, কিন্তু প্রকাশ্যে কথাটার পৌ ধরা যায় না। বীণাপাণি খর চোখে চেয়ে আছে। আমতা আমতা করে নিমাই যা বলল তারও কোনও মানে হয় না। সে বলল, আজ্ঞে, দিনকাল যা পড়েছে।

গণেশ সাহা আর একখানা বিড়ি ধরিয়ে বলল, আমার ছেলেরা সব লায়েক হয়েছে। বড়জনই এখন দলের কাজকর্ম দেখছে। আমাদের সেকলে রুচি সে বেশী পছন্দ করছে না। তার ইচ্ছে সিনেমার লোকজনকে টেনে আনে। কান্টিং ভাল হলে, পালা যাই হোক, চলবে। আমার সঙ্গে মতে মেলে না, তবে মেনেও নিতে হচ্ছে। এদের আমলে তো নতুনদের দলে ঢোকানি কঠিন হবে।

বীণার মুখখানা একেবারে ফ্যাকাসে মেরে গেল। ঘামছেও খুব। রুমালে মুখ মুছতে গিয়ে ঘামের সঙ্গে রূপটানের সবটুকুই প্রায় পুঁছে ফেলল। কেমন ন্যাত্যানো গলায় বলল, আমিও তো গান গাই।

গণেশ সাহা বিড়ির ধোঁয়ায় ঘরটাকে একেবারে জতুগুহ বানিয়ে বলল, বলছি তো, সিজনটা শেষ হোক। দেখব।

আমার নাম ঠিকানা লিখে রাখুন তাহলে। নইলে ভুলে যাবেন।

গণেশ বোধ হয় বীণার হাত থেকে বাঁচার জন্যই অনিচ্ছা সত্ত্বেও এদিক ওদিক খুঁজে একটা কাগজের টুকরো আর ডটপেন বের করে নাম ঠিকানা টুকে নিল। তারপর বলল, এবার এসো গিয়ে।

নিমাই তড়াক করে উঠে পড়ল। যত তাড়াতাড়ি ঘরটা থেকে বেরনো যায় ততই মঙ্গল। তার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

বাইরে বেরিয়ে এসে বীণার কাঁদো-কাঁদো মুখটার দিকে চেয়ে খুব সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করল, এবার কোথায় যাবে?

বীণাপাণি বাঁধের সঙ্গে বলল, কেওড়াতলায়!

এ হল রাগের কথা। রাগের সময় লোককে ঘাঁটাতে নেই। বীণা একটা মন্ত বড় হাতব্যাগ বয়ে বেড়াচ্ছে। অত বড় ব্যাগ আনার দরকার ছিল না। ভারী জিনিস, ওর কষ্ট হচ্ছে। নিমাই হাত বাড়িয়ে বলল, ব্যাগটা বরং আমার হাতে দাও। তোমার কষ্ট হচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে বীণাপাণি ব্যাগটা দ্বিগুণ জোরে পাজরে চেপে ধরে বলে, না। মেয়েদের ব্যাগ ভুমি বাইবে কেন? খরাপ দেখাবে।

নিমাই একটু হাসল। মেয়েরা যেন কিছুতেই পুরুষদের বিশ্বাস করতে চায় না। নিমাই হাতটা গুটিয়ে নিয়ে বলল তেটা পায়নি?

কেন বলো তো!

একটা ডাব খাবে নাকি ? এখানে বেশ সস্তা।

আমার আর কিছু হবে না জানো ?

কী হবে না ?

কেউ নেবে না আমাকে। বিশ্ববিজয় অপেরা উঠে যাবে। তখন না খেয়ে বনগায় পড়ে মরতে হবে।

এর জবাবে নিমাইয়ের কিছু বলার ছিল। কিন্তু গরম যেমো দুপুরে চিৎপুরের পাগল-করা ভিড়ের গলিতে দাঁড়িয়ে কথটা বলা যায় না। বললেও নেবে না বীণা। রেগে যাবে। মেজাজ বুঝে কথা না বললেই বিপদ। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বীণা কোন দিকে যাবে তা যেন ঠিক করতে পারছে না। তার চোখে জল আসছে। ধরা গলায় বলল, এর পর বয়স হবে, রূপ যৌবন যাবে। কে পুঁছবে আমায় আর ? মণিমালা অপেরার মতো ছোট দলই এত প্যাঁচ কষছে! বড় দলতো কথাই বলতে চাইবে না।

নিমাই জানে, এটা কোনও প্রশ্ন নয়। তাই জবাব দেওয়ার দরকার নেই। মুখে শুধু একটু কষ্টের ডাব ফুটিয়ে রাখা। যেন ওর দুগ্ধে বুক ফেটে যাচ্ছে তার। অভিনয় সেও একটু জানে। সবাই জানে। না জানলে কি জগৎসংসার চলত ?

বীণাপাণি আরও কিছুক্ষণ ভিড়ের রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল। ওর মাথায় কেন যেন ভূত চেপেছে আজকাল, বিশ্ববিজয় ছেড়ে বড় দলে ঢুকবে, কলকাতায় বাসা করবে। আরও অনেক কিছু। বীণাপাণিকে কিছু বোঝানোর নেই নিমাইয়ের। যা ভাল বুঝবে তাই করুক। তার দুর্দিনে বীণাপাণি যে তার জন্য অনেক করেছে সেটা ভোলে কি করে নিমাই ? খারাপ অসুখ থেকে সারিয়ে তুলেছে। দোকান করে দেবে বলে ভরসা দিয়েছে। বীণাপাণি তো আর খারাপ মেয়ে নয়।

বশংবদ নিমাই বীণার কাছ ঘেঁষেই চিন্তিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

অনেকক্ষণ বাদে বীণা বলে, চলো।

চলো। কোনদিকে যাবে ?

এমনি হাঁটি চলো। মনটা ভাল নেই।

সে তো জানি।

লোকটার কথা শুনে তোমার কী মনে হল বলো তো! সত্যিই ডাকবে আমাকে ?

নিমাই সাজিয়ে শুছিয়ে মিথো কইতে পারে না। বলল, এরা সব ঘৃণু লোক। মনের কথা বুঝতেই দেয় না।

তার মানে ডাকবে না, এই তো!

মনে তো হয়, না। ব্যবসা খারাপ যাচ্ছে।

এদের কেউ পৌছে না, জানো ? বায়না হয় না। তবু কেমন ডাঁট দেখাচ্ছে। ফিল্ম স্টার নিচ্ছে না হাতি! পাঁচু চাটুজ্জের কোনও বাজার আছে নাকি ? ফিল্মে চাল পায় না বলে যাত্রায় এসে ঢুকেছে।

তাই হবে। সাতের দর না কী একটা বলছিল যেন।

সাতের দর মানোও জানো না ? মাসে সাত হাজার টাকা মাইনে। মণিমালা অপেরা দেবে সাতের দর, হুঁ!

হাঁটতে হাঁটতে তারা চিৎপুরের ট্রাম রাস্তায় এসে ওঠে।

হ্যাঁ গো, তুমি ফোন করতে পারো ?

ফোন! কাকে করবে ?

বড়দার বাড়িতে।

জরুরী কথা আছে নাকি ? দুপুরে কি বড়দাদা বাড়িতে থাকবেন ? অফিস নেই ?

তাই তো! মনে ছিল না। তাহলে চলো আর দু-একটা গদিতে যাই।

নিমাই একটু নিবে গিয়ে বলে, যাবে!

যাই না। বড় জোর ঘাড় ধাক্কা দেবে, তার বেশী তো আর নয়। তা আজকের দিনটা ঘাড় ধাক্কা খেয়েই যাক।

একটু চেনাজানা না থাকলে কি গিয়ে সুবিধে হবে ?

একেবারে যে নেই তা নয়। পুষ্প অপেরার ম্যানেজার পানুবাবুর সঙ্গে তো কাকা একবার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল।

নিমাই মিয়নো গলায় বলে, সে কি আর মনে রেখেছে ?

চলোই না দেখা যাক। গদিটা কাছেই কোথাও হবে।

আবার খুঁজতে খুঁজতে দুজনে হয়রান হয়। পুষ্প অপেরাও ছোট দল, বাজারে তেমন নাম নেই। তবে ধৈর্য ধরার একটা মৃগা তো আছেই। অবশেষে একটা গলির শেষে পুরনো একটা দৌতলা বাড়ির ওপরের তলায় পুষ্প অপেরার একটা রংচটা সাইন বোর্ড দেখতে পাওয়া গেল।

পুরনো ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে উঠে একখানা টানা বারান্দার একেবারে শেষ ঘরখানায় পুষ্পের অফিস। দুজন লোক বসা। একজন বোধ হয় কোনও জ্যোতিষী। সেই বিষয়েই কথা হচ্ছিল।

অন্য জন পানুবাবুই। কাঁচা পাকা ঢুলের মাঝবয়সী মানুষ। বেশ শৌখিন পোশাক। আদ্রির পাঞ্জাবি, হাতে তিন রকম পাথরের আংটি, গলায় সোনার চেন। কালোর মধ্যে চেহারা মন্দ নয়।

বীণা এবার আর পা খুঁজল না। খুব শিক্ষা হয়েছে। তবে জোড় হাতে নমস্কার করে বলল, পানুবাবু, চিনতে পারছেন ? পানুবাবু চিনতে পারলেন না। বা চিনতে চাইলেন না। একটু চেয়ে থেকে বললেন, না তো! তুমি কোথা থেকে আসছো ?

বনগী। বিশ্ববিজয় অপেরায় পার্ট করি। কাকা আলাপ করিয়ে দিয়েছিল আপনার সঙ্গে। মনে নেই ?

অ। বোসো, বোসো। কাকার খবর কী ? ভাল আছে তো!

আছে। আমি একটা আবদার নিয়ে এসেছি।
 এখানেও লোডশেডিং। তবে সুখের কথা হল, পানুবাবু বা জ্যোতিষী বিড়ি খাচ্ছে না, আর ঘরখানা দোতলায় বলে একটু আলো-হাওয়া আছে। নিমাই বসে মৃদু মৃদু ঠ্যাং নাচাতে লাগল। কথাবার্তা যা হবে সে যেন আগে থেকেই তা জানে।
 বীণা গলা খাকারি দিয়ে বলল, আমি যদি দলে আসতে চাই তাহলে নেবেন?
 পানুবাবু মৃদু একটু হাসলেন। তারপর বললেন, সে তো খুব ভাল কথা। কিন্তু দল কোথায়?
 কেন, দল উঠে গেছে নাকি?
 এইবার তুলে দেবো। লোকে যা চায় তা দিতে পারছি কোথায়? পেরেও উঠব না।
 তাহলে আমার কী হবে? অনেক আশা নিয়ে এসেছিলাম যে!
 আমরাই মাইনে পাচ্ছি না ঠিকমতো। গত বিশটি বছর ম্যানেজারি করে এখন গুনাগার দিতে হচ্ছে। কর্তা আর টাকা-পয়সা ঢালবেন না। বড় বড় দলের চাপে আমাদের এখন নাবিশ্বাস উঠছে। কয়েক লাখ টাকা ঢাললে তবে একটু তোলা যায় হয়তো। টাকারই জোগাড় নেই।
 বীণা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, এবার আপনাদের পালা নামছে না?
 পানুবাবু একটা মাছিকে তাড়ানোর জন্য হাতের ঝাপটা মেরে বললেন, দুটো পুরনো প্রে নামবে। কয়েকটা বায়না হয়েছে। দেখা যাক।
 তাতে হয় না?
 পুরনো লোকরা সব রয়েছে যে! তাদের তো আর তাড়াতে পারি না।
 নতুন মুখও তো দরকার হয়। হয় না?
 দরকার হলেই বা উদ্যোগ কে নেবে বলা! স্বয়ং মালিকেরই গা নেই। তাঁর এখন নানা ব্যবসা। খুব ফলাও অবস্থা।
 যাত্রার বাজার তো এখন খুব ভাল।
 আরে ভাল তো বড় বড় নামকরা দলগুলোর কাছে। আমাদের নয়।
 জ্যোতিষী লোকটার চেহারা বেশ পরিপাটি। গলায় রুদ্রাক্ষ আর কপালে একটা সিঁদুরের ফোঁটা আছে। মিটিমিটি দেখছিল দুজনকে।
 নিমাইয়ের মাথাটা এই গরমে আর রোদে একটু গোলমালই হয়ে গিয়ে থাকবে। হঠাৎ জ্যোতিষীর দিকে চেয়ে বলে ফেলল, আজ, হাত দেখাতে কত দক্ষিণা লাগে-?
 জ্যোতিষী লোকটা একটু অবাক হল যেন। একটু হাসল, তারপর বলল, কেন, হাত দেখাতে চান নাকি?
 কখনও দেখাইনি কাউকে। ভাগ্যটা বিশেষ ভাল যাচ্ছে না।
 জ্যোতিষী মিটিমিটি হেসে বলল, কেমন যাচ্ছে! কাজকর্ম নেই নাকি?
 নেইই বলতে পারেন।
 দেখি হাতটা।
 নিমাই হাতটা লুকিয়ে ফেলে বলে, আজ্ঞে, দক্ষিণাটা না জেনে দেখাই কি করে? পরে পয়সা দিতে না পারলে?
 পয়সা লাগবে না।
 বলেন কি? বিনা পয়সায় কি কিছু হয়?
 আমি ওরকম জ্যোতিষী নই।
 নিমাই চেয়ার বদল করে জ্যোতিষীর পাশে এসে বসল। হাতখানা মেলে দিয়ে বলল, দেখাতে একটু-ভয় ভয়ও করে।
 কি জানি কী লেখা আছে হাতে! হয়তো অপঘাতে মৃত্যু।
 পানুবাবু একটা দেশলাই কাঠি দিয়ে দাঁত ঝোঁচাচ্ছেন। আড় চোখে দেখছেন এদিকে। বীণা একটু অবাক চোখে চেয়ে আছে। নিমাই এমন অদ্ভুত কাণ্ড কখনও করে না।
 জ্যোতিষী হাতটা মন দিয়ে মিনিট খানেক দেখল। তারপর ছেড়ে দিয়ে বলল, অপঘাতে মরবেন না।
 নিজের এই হঠাৎ করে হাত দেখানোর কাণ্ডটা ঘটিয়ে নিমাইয়েরও এখন লজ্জা লজ্জা করছে একটু। বিনয়ে বিগলিত হয়ে বলল, বাঁচা আর মরা সমানই হয়ে এসেছে। কেমন দেখলেন হাতখানা?
 জ্যোতিষী একটু হাসল। বলল, সবটাই কি কারও ভাল বা মন্দ হয়? তবে আপনি লোক খারাপ নন।
 একটা ব্যবসা করার খুব ইচ্ছে। হবে?
 এ হাত ব্যবসাদারের হাতই নয়। তবু করুন।
 এই রে, একেবারে জল ঢেলে দিলেন যে!
 কত বয়স হল?
 সে সব কি আর হিসেব আছে? ত্রিশের কাছাকাছি তো হবেই। বেশীও হতে পারে।
 ত্রিশের পর একটু ভাল হতে পারে।
 জীবনে হাত দেখায়নি নিমাই। জ্যোতিষীরা কিরকম বলে-কয় তার ধারণাও ছিল না। অবাক হয়ে বলল, কিরকম ভাল হবে?
 জ্যোতিষী একটু হেসে বলে, দেখুন না কি হয়!
 নিমাই ভাবল, বিনা পয়সায় যথেষ্ট হয়েছে। হাতটা সরিয়ে নিল সে।
 বীণা উঠল। পানুবাবুকে বলল, আসি তাহলে।
 এসো গিয়ে। কাকার দলে আছো এখনও?
 আছি।

চলছে কেমন ?
 খারাপ নয় । তবে মফস্বলের দল তো ।
 তাতে কি ? মফস্বল কি আর ভাল হয় না ?
 দুজনে ফের বেড়িয়ে পড়ল । রাস্তায় এসে বীণা বলল, হ্যাঁ গো, তুমি হঠাৎ হাত দেখালে কেন ?
 নিমাই লজ্জা পেয়ে এক গাল হেসে বলে, সবাই দেখায় । শখ হল ।
 খুব বিদঘুটে লোক আছে তুমি! বলে হাসল ।
 তুমি কিছু মনে করেনি তো!
 করেছি । পয়সার কথা বলছিলে কেন ? পয়সা লাগলে কি দিতে পারি না আমরা ?
 ও বাবা! খামোখা হাত দেখিয়ে নষ্ট করার মতো পয়সা কি আমাদের আছে ?
 আচ্ছা, একটা সত্যি কথা বলবে আজ ?
 বলব না কেন ? কী জানতে চাও ?
 আমি দেখতে কেমন ?
 নিমাই অবাক হয়ে হেসে ফেলল, কেন, হঠাৎ আবার সন্দেহ হচ্ছে নাকি ? বনগাঁয়ে তো তোমার রূপের সুখ্যাতি সবাই করে ।
 ছাই করে । তুমি হচ্ছে এক নম্রের মিথ্যুক । যদি আমি সুন্দরীই হবো তাহলে লোকে পাতা দিচ্ছে না কেন ?
 পাতা দিচ্ছে না কে বলল ? এদের অবস্থা টাইট । সব গরিব দল । তোমার উচিত বড় বড় দলের কাছে যাওয়া ।
 তারা আরও পাতা দেবে না । আমি দেখতে একটুও সুন্দর নই ।
 নিমাই যেন নতুন করে বউকে একটু দেখল ভাল করে । তারপর বলল, তাহলে তাদের চোখ নেই ।
 আচ্ছা, তুমি তো ভগবানের লোক । তুমি যখন বলছ তখন চলো একটা বড় দলের গদিতে যাই ।
 আজই ?
 আজই! আমাদের কি আর রোজ রোজ কলকাতায় আসা হয় ? চলো ।
 নিমাই একটা স্বাস ফেলে বলে, চলো ।

॥ ২৯ ॥

ছেলেটাকে ধরেছিল আপা । তার নাম সঞ্জয় পাল । ক্লাসমেট ।
 একদিন সঞ্জয় আপার কাছে পঞ্চাশটা টাকা ধার চাইল, দেবে আপা ? পরও শুক্রবার দিয়ে দেবো । খুব লেট হলে সোমবার ।
 আপা একটু অবাক হল । সঞ্জয়দের খুব বড় ব্যবসা । ভাল অবস্থা । অবাক আপা বলেছিল, এ তো রাজ ভিখারির মতো সিচুরেশন । তুমি ধার চাইছ!
 সঞ্জয় লাজুক হয়ে গিয়ে বলল, জানো তো, বাবা একটু টাইট ভাবে রাখে আমাকে । পকেট মানিটা খুব হিসেব করে দেয় ।
 তোমার পকেট মানিরই বা দরকার কী সঞ্জয় ? গাড়ি করে কুলে আসো, তোমার তো আমার মতো বাস-ভাড়াও লাগে না ।
 একটা জিনিস কিনবো । নাইক-এর টি শার্ট এসেছে একটা দোকানে । কিছু কম পড়ছে টাকায় ।
 তখনই আপা সন্ধিহান হয়েছিল । তার একটা অ্যান্টেনা আছে । তাতে সবসময়ে অব্যবহিকতা ধরা পড়ে । টাকাটা দিয়ে আপা বলল, তোমার টি শার্ট কোন দোকানে পাওয়া যাবে ?
 সঞ্জয় লিভেস স্ট্রিটের একটা দোকানের নাম বলল ।
 সুজিতার সোনার বালাটা তার ব্যাগ থেকে চুরি গেল সাত দিন পর । মোটা ভারী বালা, তাতে ঘড়ি সেট করা । সুজিতার খুব শখের জিনিস । ভারী বলে লেখার সময় খুলে হাত ব্যাগে রেখে দেয় । সুজিতা একটু অগোছালো । সাবধানী নয় । রিসেস-এর সময় ব্যাগ টেবিলে রেখেই বেরিয়ে গিয়েছিল । ফিরে এসে দেখে, ব্যাগ আছে, বালা নেই । সেই সঙ্গে নেই দেড়শ টাকা । খুব যোজায়ুজি হল, কুলের হেড মিসকে জানানো হল । কিছু লাভ হল না তাতে ।
 পরদিন আপা অনীশকে এসে ধরল, শোনো অনীশ, আমার মনটাই সন্দেহ-পিচাশ । সবসময়ে পচা ইঁদুরের গন্ধ পাই । তোমাদের মতো সরল নই । আমার মনে হচ্ছে, সুজিতার যা হল সেরকম আরও হবে ।
 অনীশ হেসে বলে, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না । একটা বুড়ি গুচিবায়ুলা মহিলা হয়ে যাবে । কিসের গন্ধ পেলে ?
 এটা কোনো ড্রাগ অ্যাডিক্টের কাজ ।
 অনীশ হাঃ হা করে হেসে উঠল, তোমার মনটা সত্যিই সন্দেহ-পিচাশ । এই কুলে ড্রাগ অ্যাডিক্ট কেউ নেই । আমরা সবাই মাস-প্রমিঞ্জ করেছি, কেউ ড্রাগের পান্সায় পড়ব না, মনে নেই ? রেগুলার র্যালি হচ্ছে কুলে । পোস্টার সেটে রাখছি ঘরে । উই আর ভেরি সেনসিটিভ টু ড্রাগ ।
 তুমি হচ্ছে ভাল ছেলে । পারফেক্ট গুড বয় । আমি তো তা নই । তোমাকে একটা কথা বলি, একটু খেয়াল রেখো ।
 তোমার কাকে সন্দেহ হয় ?
 এখন বলব না ।
 সঞ্জয় নয়, এবার ধার চাইল অনয় লالا । খুবই মেধাবী ছেলে । তার বাবা আর মায়ের মধ্যে ডিভোর্স হয়ে গেছে । মা কৈ প্যারিসে, অনয় বাবার সঙ্গে কলকাতায় । কুল শেষ করেই সে প্যারিসে চলে যাবে ।

আপা খুব সাহায্যকারী মেয়ে। প্রত্যেকের দায়ের দফায় আপা সর্বদা প্রস্তুত। ক্লাসে সবাই আজকাল তাকে মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে আশি বলে ডাকে। এমন কি মিস-রাও।

অনয়কে টাকাটা দিয়ে আপা বলল, শোনো, আমাকে সত্যা করে বলবে টাকাটা কেন নিচ্ছ ?

অনয় খুব উদাসভাবে বলল, ধার নিচ্ছি আপা। বাবা তিন দিন হল বাইরে। আমার হাতখরচ নেই। বাবা কাল ফিরবে। দিয়ে দেবো।

আপা আর কিছু বলল না। সঞ্জয় আর অনয় যথাসময়ে তার টাকা ফেরতও দিয়ে দিয়েছিল। তবু আপা কেমন যেন দুশ্চিন্তায় রয়ে গেল।

দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটল তিন দিন বাদে। শ্যামশ্রী নামে একটা সরল সোজা মেয়ের কাছে একটা দামী আর্টের বই ছিল। দৃশ্যপ্য বই। অনেক বিশ্ববিখ্যাত আর্টিস্টের ছবির প্রিন্ট। রিসেসে সে বইটা হাপিস হয়ে গেল। আবার স্কুলে একটা হৈ-চৈ হল। নাম-করা ইংলিশ মিডিয়ম স্কুল। এখানে পড়ে সব বিশিষ্ট পরিবারের ছেলে-মেয়ে। চুরির ঘটনা তাই স্কুল কর্তৃপক্ষকে উদ্ভিগ্ন করে তুলল। ছাত্রছাত্রীদের মিটিং ডাকা হল। গার্ডিয়ানদেরও মিটিং হল।

ছাত্রছাত্রীদের যে মিটিং ডাকা হল তাতে প্রিন্সিপাল উঠে বললেন, চুরির ব্যাপারে আপা কিছু বলবে।

আপা উঠে দাঁড়াল। এবং স্পষ্ট ভাষায় বলল, আমি কাউকে আঙুল তুলে দেখাব না। কিন্তু যারা চুরি করছে তাদের জানাতে চাই যে, আমি তাদের চিনি। আরও জানাতে চাই যে, আমি জানি তারা ড্রাগ অ্যাডিক্ট। আমি প্রিন্সিপালকে কথা দিয়েছি আর একটাও চুরির ঘটনা ঘটলে আমি তাদের নাম প্রকাশ করে দেবো।

এর পর আপার ওপর অনেকেই অসন্তুষ্ট হল। শ্যামশ্রী বলল, তুই যদি জানিস তবে চোরকে ধরছিস না কেন আপা ? বইটা না পেলে যে আমি ভীষণ মুশকিলে পড়ব! এটা তো অন্যায়।

আপা শ্যামশ্রীর কথার জবাবে খুব ভদ্র গলায় বলল, দেখ শ্যামশ্রী, বইটা তুই এনেছিলি বন্ধুদের ন্যূড ছবি দেখাবি বলে। বইটা আনার পর তোর পিছনের বেঞ্চে বসে খুব হাসাহাসি করছিলি। কাজটা তোর ভাল হয়নি।

শ্যামশ্রী বলল, ন্যূড তো কী ? ও তো ফাইন আর্ট, সব মাস্টারপীস।

ঠিক কথা। মাস্টারপীস দেখার চোখ কি তোর হয়েছে ? চোরকে ধরে দিলেও বইটা তো পাবি না। চোর বই বেচে দিয়েছে।

সুজিতাও এসে ধরল আপাকে, চোরের নাম জানলে তোর বলে দেওয়া উচিত আপা। আমার বাবা তো পুলিশে ডায়েরি করেছে। আমি ততটা চাই না। বাবা ফেরত পেলে পুলিশ কেস তুলে নেবে।

আপা গম্ভীরভাবে বলল, শোন, চোর আমাদের ক্লাসমেট। এত উঁচু ক্লাস অবধি আমরা সবাই একসঙ্গে এতদিন পড়ে এসেছি। অনেকটা আত্মীয়ের মতো। আমার পরিবারের কেউ এরকম করলে আমরা তো তাকে পুলিশে দিই না। আমি চোরদের আর একটা চান্স দিতে চাই।

আমার বাবার কী হবে ?

ওটা ডোমেশন বলে ভেবে নে।

তাহলে তুই বড় বড় কথা বললি কেন বক্তৃতায় ?

বললাম আবার যাতে চুরি না হয় তার জন্য।

দূর! বলে রাগ করে চলে গেল সুজিতা।

পরদিন স্কুল ছুটির আগে আপা অনীশের কাছে এসে বলল, শোনো, তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা আছে।

বলো।

তুমি একটা সাহসের কাজ করতে পারবে ?

কেন পারব না ? কাজটা কিসের ?

তুমি একা পারবে না। সুমিত, পিটার আর গুরমিককে সঙ্গে নাও।

নিশ্চি। ওরা একট্রা ক্লাস করছে। কিন্তু কাজটা কী বলবে তো ?

আমি পনেরো মিনিট পরে বেরোবো। হেঁটে যাবো বড় রাস্তা অবধি।

সে তো রোজই যাও।

আজ তোমরা আমাকে ফলো করবে।

ফলো ? কেন ?

একটু দূরে থেকে ফলো করতে হবে। যেন আমার সঙ্গে কেউ আছে তা বোঝা না যায়।

অনীশ ধৈর্য হারিয়ে বলে ওঠে, বাট হোয়াই আপা ? হোয়াই ?

আজ হয়তো একটা ঘটনা ঘটবে। কিন্তু তোমরা চট করে এগোবে না। দূরে থাকবে। শুধু লোকগুলোকে চিনে রাখবে, যাতে পরে দেখলেও চিনতে পারো।

অনীশ রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়ে বলে, তুমি গ্রীক ভাষায় কথা বললে আমি কি করে বুঝবো ?

আপা শান্ত চোখে অনীশের দিকে চেয়ে বলে, কাল যখন ইন্ডেন্টস মিটিঙে বক্তৃতা দিয়েছিলাম তখনও কি বুঝতে পারেনি যে, আমি মৌচাকে টিল মেরেছি ?

না তো!

এই জন্যই তো তোমাকে শুভ বয় বলি।

একটু খুলে বলবে ?

আমার সন্দেহ হচ্ছে, আমাদের ক্লাসে এবং অন্য সব ক্লাসেও কয়েকজন করে ড্রাগ অ্যাডিক্ট আছে। আমাদের ক্লাসে দুজনকে আমার খুব সন্দেহ হয়। আরও দু একজন থাকতে পারে।

পার্শ্ব—১৬

আমার বিশ্বাস হয় না আপা।
তা জানি। কিন্তু আমি যে পচা ইঁদুরের গন্ধ পাই।
বুঝলাম।
কাল আমি যেই বললাম যে, চোরদের আমি চিনি, সঙ্গে সঙ্গে আমি চোরদের একটা চ্যালেঞ্জও তো জানিয়ে রাখলাম।
তাই না ?
অনীশ দৃষ্টিস্ফুট মুখে বলে, তাই তো! এটা আমার মাথায় আসেনি। এ কাজ কেন করলে আপা ?
ইচ্ছে করেই করেছি। আমি ওদের চমকে দিয়েছি, ভয় পাইয়ে দিয়েছি।
অনীশ মাথা নেড়ে বলে, দ্যাটস রাইট।
ওরা যদি সাধারণ চোর হয় তাহলে কিছু করবে না। চুপচাপ থাকবে। বড় জোর আমার কাছে এসে অন্যায্য স্বীকার করবে। কিন্তু ড্রাগ অ্যাডিক্ট হলে তা করবে না।
কী করবে আপা ?
ওরা যাদের কাছ থেকে ড্রাগ কেনে তারা বাজ্রে লোক। ব্যবসা মার খেলে তাদের চলবে না। তারা এদের অনেক সময়ে প্রোটেকশন দেয়।
তুমি এত জানলে কী করে ?
আমি পায়ে হেঁটে কলকাতা শহর ঘুড়ে বেড়াই, জানো তো!
তা আর জানি না!
অভিজ্ঞতায় আমি সত্যিই বুড়ি।
তারপর বলো। এ তো সাসপেন্স থ্রিলারের মতো ব্যাপার।
থ্রিলারই তো। আমার মনে হচ্ছে ওরা ড্রাগ পেডলারদের খবর দিয়েছে, তারা আজ হোক, কাল হোক আমাকে অ্যাটাক করবেই।
কি করে বুঝলে ?
আমার অ্যাক্টিনা আছে। ক্লাসে আজ আমার দিকে দুজন ছেলে খুনির চোখে তাকাচ্ছিল। তাদের একজনকে আমি বলতে শুনেছি, শী উইল বি টট এ লেসন টু ডে।
তাদের নাম আমাকে বলছ না কেন ?
সেটা পরে হবে। আমি আগে পেডলারদের চিনতে চাই।
অনীশ প্রণোদিত হয়ে বলে, এত রিক্স নিচ্ছ কেন ?
ব্যাপারকে আটকাতে গেলে রিক্স থাকেই।
আমরা তোমাকে গার্ড দিয়ে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দেবো।
দূর বোকা। তাতে আসল কাজটাই হবে না।
আপা, তোমাকে আমি রিক্স নিতে কিছুতেই দেবো না।
তাহলে আমি আর একদিন তোমাদের না জানিয়ে বেরোবো। ওরা তো তাকে তাকে থাকবেই।
ওরা তোমাকে কী করবে ? মারবে ?
আপা হাসল, আমি রোগা মেয়ে, কুংফু কারাটে জানি না। ওরা তো ধরেই নিতে পারে যে একটু চোখ রাঙালে বা দুটো থাঙ্গড় মারলেই আমি ভী করে কেঁদে ফেলব। আর তার পর থেকে লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে যাবো। তাই না ?
অনীশ মৃদু হেসে বলে, সে তোমাকে যারা চেনে না তারা তা ভাবতে পারে। কিন্তু ভাবলে ভুল করবে।
আমি চাইছি ওরা ভুলটা করুক।
তার মানে তুমি মার খাবে!
খাবো। কয়েকজন বন্ধুর ভালর জন্য মার খেতে আপত্তি নেই।
বাঃ, বেশ কথা আপা। চমৎকার প্রস্তাব। এতদিন তোমাকে বুদ্ধিমতী বলে জানতাম।
এখন আর তা মনে হচ্ছে না ?
না। তুমি মেয়ে-গাফীজী হতে চাইছো। আজকাল ওরকম ভালমানুষীর কোনও দাম নেই।
ভালমানুষী কে বললে ? এ হল স্ট্যাটেজি। তুমি কি ভাবছো চুপ করে মার খেয়ে যাবো ? মোটেই তা নয়।
তা হলে কী করবে ?
চিনে রাখবো। চাইদের ধরতে না পারলে ড্রাগ অ্যাডিক্টদের কাছে বক্তৃতা দিয়ে কোনও লাভ নেই। এত তো পাবলিসিটি হচ্ছে, তবু অ্যাডিকশন বাড়ছে তো ?
তোমার ওপর মাঝে মাঝে আমার ভীষণ রাগ হয়। ইউ লাভ টু লিভ ডেনজারাস্‌লি।
না বাবা না। আমি ঠান্ডা মেয়ে। আমি শান্তিতে বেঁচে থাকতে চাই।
তোমার কাণ্ড দেখে তা মনে হয় না।
আমার কাজটা করবে কি না বলো।
কী করতে হবে আমার বলে দাও।
একটু দূরে থেকে আমাকে ফলো করবে। বোকার মতো আমাকে বাঁচাতে যেও না। যদি কিছু হয়তো দূর থেকেই চিনে রাখবে। কথা দাও কিছু করবে না।
ঠিক আছে।
শোনো, কিছু ঘটতে পারে, নাও পারে। আগে থেকে খুব বেঁচে প্রত্যাশা রেখো না। অ্যান্টি ক্লাইমেঞ্জও হয়ে যেতে পারে।

অনীশ খুবই বিষাদ বোধ করল। কিন্তু আপা তার বন্ধু হলেও তার ওপর অনীশের প্রচণ্ড বিশ্বাস। তার আজকাল কেবলই মনে হয়, আপা কোনও ভুল করতে পারে না।

সে গিয়ে সুমিত, পিটার আর গুরমিককে ঘটনাটা বলল।

সুমিত বলল, গেম রুম থেকে কয়েকটা হকি স্টিক বের করে নিলেই তো হয়।

গুরমিক বলল, ঠিক কথা।

পিটার বস্ত্রিৎ করে। সে বলল, নো প্রবলেম। আপার গায়ে হাত তুললে হাত ভেঙে দেবো, সে যতো বড় মস্তান হোক।

ছুটির পর আপা একটু অপেক্ষা করল। ছেলেমেয়েদের দঙ্গলটা কেটে যাক। গুগ্গারা যদি তাকে মারে তাহলে এরা বিপদে পড়বে।

একটু পরে সে একা বেরোলো। রাস্তা ফাঁকা। নির্জনই বলা যায়। সে একবারও পিছন ফিরে তাকাল না। ভয় পেল না। স্বাভাবিকভাবে হেঁটে যেতে লাগল বড় রাস্তার দিকে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটার পর একটা প্রাইভেট গাড়ি গা ঘেঁষে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাদের স্কুল বাসও চলে গেল হুস করে।

সামনে ঝাউতলার নিচে তিনটে লোক দাঁড়িয়ে। কালো, বিচ্ছিরি চেহারা।

তাদের দিকে তাকালই না আপা। সোজা হেঁটে যেতে লাগল।

আচমকাই হেঁচটটা লাগল। আপা 'মা গো' বলে সম্পূর্ণ বেসামাল হয়ে উপুড় হয়ে পড়ল ফুটপাথের শানে। হাঁটুতে খটাং করে একটা শব্দ হল। কনুইটাতে এত লাগল যে মাথা ঝিমঝিম করে উঠল তার। হাতের বই-খাতা ছিটকে গেছে রাস্তায়। বৃষ্টিভেজা পথে জলাকাদায় মাখামাখি হল তার বই-খাতা, সে নিজে।

বিহ্বলতা কাটিয়ে ওঠার আগেই একটা লাথি এসে তার রোগা কোমর প্রায় ভেঙে দিল।

একটা বিচ্ছিরি অসংস্কৃত গলা চাপা গলায় বলল, এই শালী কুত্তি, কার নাম বলবি তুই? অ্যাঁ! কার নাম বলবি?

বলতে বলতেই একজন কে যে তার চুল ধরে টেনে তুলল।

চটাস করে একটা চড় পড়ল তার গালে, বল শালী খানকী, কার নাম জানিস তুই?

আপার দু' চোখ বেয়ে জল পড়ছে টপ টপ করে। ঠোঁটের কষ বেয়ে লাল। জীবনে সে কারও কাছে কখনও মার খায়নি। কিন্তু নৃশংস পশু-মানুষদের ওপরেও তার রাগ নেই। তার মনে হয় এরা বড্ড বোকা, বড্ড দুর্বল, বড্ড অসহায়।

কথার জবাব দেওয়ার সাধ্য নেই তার। মার খেয়ে তার মাথা অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। এখনই সে নির্বাপিত হবে। মারাও যেতে পারে।

ঠিক এই সময়ে তিন জোড়া পা দৌড়ে আসছিল। ওদের বারণ করেছিল আপা। তবে আসছে কেন? সে চায়নি ওরাও তার সঙ্গে মার খাক।

প্রথমে পৌছলো গুরমিক, তার পায়ে পায়ে পিটার, একটু পিছনে অনীশ। দুজনের হাতে হকি স্টিক।

অনীশের রাগ সবচেয়ে বেশী। তার হকি স্টিক এত জোরে একটা লোকের হাতে লাগল যে লোকটা 'বাপরে' বলে হাতটা চেপে ধরেই দৌড়ে পালাল।

দ্বিতীয় লোকটাকে গুরমিক মারল পায়ে। তারপর লোকটা পড়ে যেতেই সে দুমদাম মারতে লাগল দক্ষ হাতে।

তিন নম্বর লোকটাকে নেওয়ার কথা ছিল পিটারের। কিন্তু বেগতিক দেখে লোকটা দৌড় মেরে উল্টো দিকের একটা গলিতে ঢুকে গেল।

গুরমিকের মার খেয়েও ভূপাতিত লোকটা একটা ব্যাঙের মতো লাফ মেরে সরে গিয়ে পালাতে লাগল।

পথচারী লোকজন সব ছুটে আসছে চারপাশ থেকে। স্কুলের দারোয়ান, মিসরাও আসবে।

অনীশ আপাকে তুলল।

খুব লেগেছে তোমার আপা?

আপার মুখ দিয়ে টস টস করে রক্ত পড়ছে। চোখ ভরা জল। তবু সে বলল, বোকা।

কে বোকা?

তোমরা। বারণ করেছিলাম না?

করেছিলে। সেটা তুমিই বোকা বলে। খুব লেগেছে? রক্ত পড়ছে যে!

কিছু নয়; ঠিক আছি।

হাসপাতালে নেওয়ার দরকার।

না বাবা। মুখে জল দেবো। স্কুলে নিয়ে চলো।

চলো।

কাউকে ধরতে দিল না আপা। নিজে হেঁটে গেল স্কুল অবধি।

স্কুলের মিসরা বেরিয়ে এসেছিলেন ফটকে। ঘটনায় তারা হতবাক।

আপাকেই একমাত্র নির্বিকার মনে হচ্ছিল। সে গিয়ে চোখে মুখে জল দিল। একটু বিশ্রাম নিল বসে।

তারপর প্রিন্সিপাল এলেন, আপা, তুমি কিছু জানো?

কিছু নয় ম্যাডাম।

অনীশ বলেছে তুমি জানো কে এই ঘটনার পিছনে আছে। তাদের নামগুলো আমাদের দরকার।

ম্যাডাম, আমাকে আর দু-একটা দিন সময় দিন।

কী করবে তুমি?

আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলব।

কে বন্ধু ?

যারা এই ঘটনার পিছনে আছে।

তারা কি তোমার বন্ধু! এটা কি বন্ধুর মতো কাজ ?

মানুষ মাত্রই ভুল করে। তারা আমাকে শত্রু ভাবছে।

তুমি আর বিপদের মধ্যে থেকে না আশা। নাম বলে দাও। এটা আমার আদেশ।

নাম বলে দিলেই আমার এত প্যান সব নষ্ট হয়ে যাবে। নাম তো আমি অনেক আগেই বলে দিতে পারতাম।

প্রিন্সিপাল অসন্তুষ্ট হলেন। মুখটা গম্বীর করে বললেন, এ ছুলে এসব কী হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। তুমি গোঁ ধরে না থাকলেই ভাল করতে। যাকগে, আমি জোর করব না। ডাক্তার আসছে। ততক্ষণ অপেক্ষা করো। আমার গাড়ি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে।

ডাক্তার এল। হাত পায়ের ক্ষতে গুণ্ডা ব্যাণ্ডেজ লাগানো হল। প্রেসক্রিপশন নিয়ে গুণ্ডা কিনে আনল দারোয়ান। আপনার বাড়িতে টেলিফোনে জানানো হল, আপা একটা কাজে আটকে আছে। ফিরতে দেরি হবে।

আপাকে পৌঁছোতে সঙ্গে গেল অনীশ, গুরমিক আর পিটার।

অনীশ বলল, কেমন লাগছে এখন আপা ?

আপা হাসল, একটু ক্লান্ত। কিন্তু বেশ ভাল লাগছে।

গুরমিক বলল, একটাকে খুব পিটিয়েছি।

আপা বলল, মারাটাই তো ভুল। মারতে নেই।

তুমি একটা ইমপসিবল্ মেয়ে আপা। আরে বাবা, মানুষ বরাবর লড়াই করে বেঁচে আছে। উল্টে মার না দিয়ে কি বাঁচতে বোলে!

আপা ক্লান্ত গলায় বলে, গুরমিক, তুমি গায়ের জোরে বিশ্বাস করো, আমি করি না। যারা আমাকে মেরেছে তাদেরও আমি যেম্না করতে পারি না।

গুরমিক ধমকে উঠল, হেট দেম আপা, হেট দেম। গেন্না না করলে এই দুনিয়াতে কি বেঁচে থাকা যায় ? হ্যাঙ ইওর ফিলজফি আপা আন্টি। আজ যারা তোমাকে মেরেছে কাল তারা তোমাকে খুন করবে, যদি না তুমি উল্টে মারো।

ওরা ভীতু বলেই মেরেছে। ওদের অস্তিত্বে, রুজিরোজগারে যে আমি বিপদ ডেকে আনছিলাম।

ওসব ছাড়া আপা। কেসটা আমাদের হাতে ছেড়ে দাও। ক্লাসমেটদের নাম বলে দাও আমাদের। আমরা দেখে নিচ্ছি।

জানি। তোমরা আমার ভালই চাও। আর আমি ওদেরও ভাল চাই। কয়েকদিন অপেক্ষা করো।

ইউ আর রিয়েলি ইম্পসিবল্।

অনীশ মূদু স্বরে বলল, আমি জীবনে কখনও মারপিট করিনি আপা। আজ প্রথম একজনকে হকি স্টিক দিয়ে মারলাম। খুব জোরে মেরেছি। লোকটার হাত ভেঙে যাওয়ার কথা।

আপা করুণ গলায় বলে, আহা রে! কেন যে ওরকম করলে!

অনীশ বলল, কিন্তু তুমি জানলে অবাক হবে, জীবনে প্রথম একটা বদমাশ লোককে মারতে পেরে আমার অদ্ভুত লাগছে। আই অ্যাম এনজয়িং ইট।

আপা সরু গলায় বলে, ওটাও একটা দ্রাগ অনীশ।

কোনটা ?

মার দেওয়াটা। ওটাও নেশা। যারা একবার মারে এবং সেটা উপভোগ করে তারা আবার মারবে। হয়তো অকারণে মারবে। মারতে আনন্দ পাবে। পৃথিবী তো সেই কারণেই শেষ হয়ে যাচ্ছে।

তোমাকে আমি বুঝতে পারি না আপা। হয় তুমি কোনও গডেস ইন ডিজগাইস অথবা একটু লুনাটিক।

আমি তোমাদের চোখে লুনাটিক হতেই পারি। কিন্তু আমার চোখ দিয়ে যদি তোমাকে পৃথিবীটা দেখাতে পারতাম!

পৃথিবীটাকে তুমি কিরকম দেখ আপা ? ইজ'নট ইট এ হেল ?

নোংরা, খারাপ, নিষ্ঠুর। তবু কী যে সুন্দর!

আপা, আজ রাতে ভাল করে ঘুমোও। আজ মাথা কাজ করছে না।

আমার মাথা তেমন কাজ করখনও করে না। কাজ করে আমার মন। আমার হৃদয়।

আপাকে বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে চার বন্ধু হেঁটে হেঁটে খানিক দূর এক সঙ্গে এল। কেউ কোনও কথা বলছিল না। তারা বীরের মতোই একটা কাজ করেছে। তবু নিজেদের বীরত্বটাকে অনুভব করছিল না। তারা আপা সম্পর্কে কোনও মন্তব্যও করতে পারছিল না। তারা খানিকটা বিহ্বল।

তারা ভাবছিল। শুধু ভাবছিল।

॥ ৩০ ॥

সেদিন গায়ের কুলের অডিট সেরে রশ্মি রায় আর সে একসঙ্গেই ফেরে। এক ট্রেনে, এক কম্পার্টমেন্টে পাশাপাশি বসে এবং একই টায়গিরি উষ্ণ, নরম অন্ধকার ও নিকট সান্নিধ্যে। যে কেউ শুনলে বলবে, তবে আর কি, হয়েই তো গেছে। হয়ে যায়নি, তবে এই এতটা একসঙ্গে থাকার ধকল আজও সামলে উঠতে পারেনি হোমাজ। আর সেই মাদক গন্ধটা, সেই মারাত্মক বিদেশীসেন্ট মেয়েটার গা থেকে উড়ে এসে কুংফু কারাতে চালিয়ে হোমাজের হৃদয়কে প্রায় ধরাশায়ী করে ছেড়েছিল। প্রেমের মধ্যে কি গন্ধেরও একটা ভূমিকা আছে ? কোনও কোনও সেন্ট কি হৃদয়-বিদারক ? কই, সেসব সেন্টের প্রস্তুতকারকরা তো নোবেল প্রাইজ পায় না! তাদের অবশ্যই নোবেল-টোবেল দেওয়া উচিত।

রাস্তা কম নয়। মেয়েটোও কথা বলতে ভালবাসে। ফলে দুজনের মধ্যে একটা কথার জালও শক্তভাবে বোনা হয়েছিল। প্রথম স্কুল নিয়ে, তারপর ভারতবর্ষের এলানো কর্মবিমুখ জীবনদর্শন নিয়ে, প্রশাসনিক পরিকাঠামোর জটিলতা নিয়ে, মানুষের দুরারোগ্য দুর্নীতি নিয়ে, চিকিৎসার অতীত ধাক্কাবাজি নিয়ে। কথাবার্তা পার্সোনাল লেভেলে এল ট্যান্সিভে, শিয়ালদা থেকে হাজারার মাঝখানে।

বশি! রায় জিজ্ঞেস করল, আমি একটু বেশি কথা বলি, তাই না? অ্যাম আই এ বোর?

না। আপনার কথা খুব ইন্টারেস্টিং। বোধ হয় জমেও ছিল অনেক কথা।

ঠিক বলেছেন তো! বশি! মিষ্টি করে হাসল, গত দু'বছরের অভিজ্ঞতা খুব খারাপ, একজসটিং। হাফিয়ে উঠছি। কাকে বলব? আজ আপনাকে পেয়ে ফ্লাড গেটটা খুলে দিলাম। কেন যে দিলাম বুঝতেই পারছি না। হয়তো আপনাকে খুব সিমপ্যাথেটিক মনে হয়েছিল।

হোমস মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে চিরকাল অদক্ষ শ্রমিক। সে অনেকটা ভেবে নিয়ে বলল, ঠিকই করেছেন। কথা জমিয়ে রাখলে খুব কষ্ট।

বশি! বিষণ্ণ গলায় বলে, বাবা মা আমার এইসব মিণ-টিশন পছন্দ করে না। বাবা তো বলেই দিয়েছিল, গাঁয়ের স্কুলে গিয়ে ত্যাগের মহিমা দেখাতে পারো, কিন্তু কেউ ওর কোনও দাম দেবে না। গান্ধীজী, বিনোবা ভাবে থেকে শুরু করে বেশ কয়েকজন ওসব করতে গিয়েছিল। কিছুই হয়নি। যে দেশের গ্রামীণ অর্থনীতির জোর নেই, সেখানে ত্যাগ-ত্যাগ দেখাতে গেলে কয়েকটা হাততালি আর অনেক টিটকিরি জুটবে। তার বেশি কিছুই হবে না।

আপনার কি মোহভঙ্গ হয়ে গেছে?

বশি! মৃদু হেসে বলে, একরকম তাই। তবে মেয়েগুলো বড্ড ভাল। এত ভালবাসে আমায়। প্রায়ই তরিতরকারি, গাছের ফল এনে দেয়, আর আমাদের সেসব দান বয়ে আনতে হয় আমাকে। অন্তত জনা দুই খুব ভাল লোককেও পেয়েছিলাম। কিন্তু ভালদের তো আজকাল ভয়েস থাকে না। আচ্ছা, আপনাকে এত কথা বলছি কেন বলুন তো? ভীষণ টকেটিভ হয়ে গেছি তো আজ!

কথা বলা সরলতার লক্ষণ।

আমি কি সরল?

ওভাবে জিজ্ঞেস করলে বিপদে পড়ে যাই।

বশি! খুব হাসল। তারপর বলল, কিন্তু আপনি তো কিছু বলেন না নিজের সম্পর্কে। শুধু একটা জিনিস লক্ষ করলাম, মেয়েদের আপনি ভীষণ লজ্জা পান, আর কোনও মহিলার সামনে খেতে পারেন না!

হোমস লজ্জিত হয়ে বলে, আমি কখনও কো-এডুকেশনে পড়িনি, ছেলেবেলা থেকেই মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা বা বন্ধুত্ব রেস্ট্রিক্টেড ছিল। বাবার ধারণা, বেশি মেলামেশা করলে নারীজাতির ওপর ছেলেদের শ্রদ্ধা কমে যায়।

বশি! অবাক হয়ে বলে, এ তো প্রায় মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা!

হয়তো আপনি ঠিকই বলেন। কিন্তু অভ্যাসটা মজ্জাগত হয়ে গেছে।

বশি! খিলখিল করে ছেলেমানুষের মতো হেসে বলে, বেচারী!

এই 'বেচারী' শব্দটাই বুঝি আর এক পা এগিয়ে আসা।

বশি! বলল, আচ্ছা, নারীজাতিকে শ্রদ্ধাই বা কেন করতে হবে বলুন তো! শ্রদ্ধার চেয়ে অনেক বেশি দরকার বন্ধুত্ব, ভালবাসা। তাই নয়?

আপনি এসব বিষয়ে আমার চেয়ে বেশি জানবেন। উন্নত সমাজব্যবস্থা দেখেছেন। আমরা তো কুপমকুক। কীই বা জানি!

বশি! তার চশমা, দুল ইত্যাদির একটা মিলিক তুলে অন্ধকার ট্যান্সিভে তার দিকে ঘুরে তাকাল, ওটা কি বিনয়? নাকি একটু হুল?

কী যে বলেন! আমার পরিবারটা বেশ রক্ষণশীল। আমরা অ্যাডাল্ট হওয়ার পরও আমাদের ওপর খবরদারি বজায় রাখা হয়। আমি এখনও একটা পারিবারিক শাসনব্যবস্থার মধ্যে আছি। অনভিপ্রেত কোনও কাজ করলে তার জন্য জবাবদিহি করতে হয়। স্বাধীনতা একদম নেই।

বশি! একটা দুঃখের স্বাস ফেলে বলে, বুঝতে পেরেছি। আপনি সেই পরিবারে মানুষ যেখানে এখনও বর্ণাশ্রম মানা হয়, লাভ ম্যারেজকে বরদাশ্তা করা হয় না, এটোকাটা বিচার করা হয়, বউদের ঘোমটা দিতে হয়, এটসেট্টা, এটসেট্টা। তাই না?

অনেকটা তাই।

আপনি বোধ হয় বাড়ির পছন্দ করা মেয়েকেই বিয়ে করবেন!

বিয়ে করলে তো! ওই একটা ব্যাপারে এখনও ফ্যামিলি প্রেসারকে ঠেকিয়ে রাখা গেছে।

কিন্তু একদিন ভালমানুষের মতো টোপর পরে তো একটা অচেনা মেয়ের গলাতেই মালা দিতে হবে!

বশি! হাসিতে খুব সঙ্কুচিত হয়ে হোমস বলল, ব্যাপার কি জানেন? আমার অভিভাবকরা আমার ভিতরে নারীজাতির প্রতি এমনই বেশি শ্রদ্ধার সম্ভার করে দিয়েছেন যে, কোনও নারীকে বিয়ে করার কথাই আমি ভাবতে পারি না। অতিরিক্ত শ্রদ্ধার ফলই হবে।

বশি! ভীষণ হাসছিল। মুখে রুমাল অবধি চাপা দিতে হল তাকে। তারপর বলল, আপনি কিন্তু খুব বিচ্ছু। মুখে ভালমানুষীর ভাব, কিন্তু ভিতরে ভিতরে দুট্টা আছেন।

হোমস এ মেয়েটার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে মেশামেশি করছে, সুতরাং তার সঙ্কোচটা খানিকটা কেটেও গেছে। সে খুব সাহস করে বলল, আমার মতো প্রবলেম তো আপনার নেই। আপনি তো ইচ্ছে করলে ঘর-সংসার করতে পারেন।

রশ্মি মিষ্টি করেই বোধ হয় হাসল, অন্ধকারে ভাল বোঝা গেল না। তারপর বলল, মেয়েদের বুঝি ঘর-সংসার করা ছাড়া আর কিছু করার নেই? ঘর-সংসার ঘর-সংসার শুনে শুনে পাগল হওয়ার জোগাড়।

রাগ করলেন নাকি?

না, রাগ করলে বুঝতেই পারতেন। শুনুন, ছেলেদের বিয়ে করা আর মেয়েদের বিয়ে করা কিছু এক ব্যাপার নয়। ছেলেদের বিয়ে করা অনেকটা আনন্দের ব্যাপার, একটু ভারমুক্ত হওয়ার ব্যাপার। কারণ তাকে দেখাশোনা করার একজন আসছে। কিন্তু মেয়েদের বিয়ে করা মানেই হচ্ছে ভয়, উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা। নিজের পরিবার ছাড়তে হবে, সন্তানধারণ থেকে আরও অনেক কিছু দায়দায়িড়ি নিতে হবে। এবং তার পরে সংসার ছাড়া তার আর কিছু করার থাকবে না।

হোমস্‌ অত্যন্ত সমবেদনার সঙ্গে বলল, ঠিক কথা। মেয়েদের বড়ই কষ্ট।

রশ্মি শের তার দিকে চেয়ে বলল, মুখটা ভাল দেখতে পাচ্ছি না। খুব সব্ব এটাও একটা বিচ্ছিন্নি, তাই না?

বিশ্বাস করুন, বাস্তবিকই মেয়েদের কষ্টটা আমি বুঝতে পারি।

রশ্মি সবেগে ডাইনে বাঁয়ে মাথা নেড়ে বলল, কোনও পুরুষই কখনও মেয়েদের সত্যিকারের কষ্ট বুঝতে পারে না। সিমপ্যাথাইজার হতে পারে, বন্ধু হতে পারে, কিন্তু মেয়েদের আসল সমস্যাটা শুধু মেয়েরাই টের পায়। আপনি কিছুতেই সেটা বুঝতে পারবেন না।

হোমস্‌ মৃদু স্বরে বলে, ছেলেদের প্রবলেক মি মেয়েরা বুঝতে পারে?

খুব পারে। ছেলেরা হল ডমিনেটিং, ইগোয়িস্ট আর কেয়ারলেস।

হোমস্‌ খুব মৃদুস্বরে বলল, আমরাও তাই মনে হয়।

আপনি খুব বিচ্ছিন্ন। এমন ভাব করছেন যেন ভাঙ্গা মাছ উল্টে খেতে জানেন না। মনে মনে হাসছেন তো!

হোমস্‌ কাঁমামাচু হয়ে বলে, না, না, মোটেই হাসছি না। ইদানীং দেখছি মেয়েতে আর ছেলেতে একটা কেমন যেন আকচাআকচি শুরু হয়েছে, অনেকটা মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের মতো। খুব লেখালেখিও হচ্ছে কাগজে।

রশ্মি খুব হাসছিল, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল বুঝি? না মশাই, জীবনটা ফুটবল নয় মোটেই।

ট্যান্সি হাজরায় ঢোকার পর রশ্মি বলল, মোটে তো সন্ধে। আসুন, এক কাপ কফি খেয়ে যান।

হোমস্‌র এর প্রতিবাদে কিছু বলার ছিল না। সে ট্যান্সি ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়ল। তারপর রশ্মি রায়দের বাড়িখানা দেখে তাজব হয়ে চেয়ে রইল। ফটক, ফটকের ওপাশে অনেকটা লন, ফুলের বাগান, আর চারদিকে সবুজের সমারোহের মধ্যে ঝিনতলা বনেদী একখানা প্রকাণ্ড বাড়ি। না, তাদের বাড়ির চেয়ে বড় নয় ঠিকই, কিন্তু ভুবু বেশ বড়।

বাড়ির ভিতরটাও দেখবার মতো। মেহগনি, আবলুস বা বার্মা সেগুনের সেকলে মজবুত সব চেয়ার-টেবিল-আলমারি-বুককেস। বিশাল বৈঠকখানার এক কোণে একটা মস্ত পিয়ানো অবধি রয়েছে। পেগ্গায় বড়লোক, সন্দেহ নেই।

হোমস্‌ খুব উজ্জ্বলের মতো হালল, আপনি বোধ হয় রোজ গাড়ি করে শিয়ালদায় গিয়ে ট্রেন ধরেন, না?

রশ্মি একটু অবাক হয়ে বলে, কি করে বুঝলেন?

হাত গুনতে জানি যে!

রশ্মি আর অবাক না হয়ে হেসে ফেলে বলে, খুব চালাক, না? কিন্তু কি করব বলুন, এখনও কলকাতার ট্রাম-বাসে ওঠার অভ্যাস হল না। এত ভিড়, আর লোকজনও তো তেমন সভ্যতাব্য নয়।

ফেরনও তো গাড়িতেই?

হ্যাঁ। সন্ধে ছটা থেকে গাড়ি শিয়ালদায় গিয়ে থাকে। আজ ড্রাইভারের ছুটি বলে গাড়ি যায়নি।

আপনি চালাতে পারেন না?

ও বাবা! কলকাতায় গাড়ি চালাবো! ভয়েই মরে যাই যে। লভনে চালাতাম।

রশ্মির বাবা বা মা কেউই বাড়িতে ছিলেন না। ফলে পরিচয়ের ঝামেলাটা ছিল না। হোমস্‌ নিচিন্তে বসে এক কাপ কফি খেল। তারপর উঠল।

আজ যাই।

ঠিকানাটা দিয়ে যান তো। আর ফোন নম্বর।

এটা কি আরও এক প্য এগিয়ে আসা! হোমস্‌ রশ্মির ডায়েরিতে নিজের ঠিকানা আর ফোন নম্বর লিখে দিল।

রশ্মি ঠিকানাটা দেখেই বলল, গরচা! ওমা, এ তো হাটপথ!

হোমস্‌ মৃদু হেসে বলে, অনেক সময়ে সামান্য হাটা পথও লক্ষ বছরে পেরোতে পারে না মানুষ।

খুব কথা শিখেছেন!

হোমস্‌ দিন তিনেক রশ্মির মুখ মনচক্ষে দেখতে পেত, রশ্মির গলার স্বর শুনতে পেত মনেরই কানে। কফির স্বাদ আর সেই সেন্টও তার জিব আর নাককে কয়েকদিন দখলে রেখেছিল।

দিন সাতেক বোধ হয় ক্রিয়াটা রইল। তারপর বিস্তৃতির জল মিশাতে-মিশাতে নেশার জিনিসটা ফিকে হতে লাগল। আর ঠিক সেই সময়েই একদিন একটা ফোন এল।

আমি রশ্মি বলছি। মনে আছে তো আমাকে!

মনে থাকবে না! যা পেগ্গায় বাড়ি!

ইস্‌, কী বিচ্ছিন্ন লোক! বাড়িটাকে মনে রেখেছেন, আর বাড়ির জন্যই আমাকে?

ঠিক তা নয়। তবে বাড়ি জিনিসটাও কিন্তু একটা ফ্যাক্টর। উপেক্ষা করার জিনিস নয়।

বুঝলাম। বাড়িটা না দেখলে বোধ হয় আমাকে মনেও থাকত না!

তা নয়। আপনার বাড়ির সঙ্গে আপনার যদি একটা কনটেক্ট হয়, তাহলে আপনিই জিতবেন। বলুন, কেমন আছেন!

ভাল।

আপনার স্কুল কেমন আছে ?

টিকে আছে এখনও । ওনুন, রবিবারে ফ্রি আছেন ?

আমি তো সব সময়ে ফ্রি ।

মোটাই নয় । রবিবারে রবিবারে তো আপনি অডিট করেন বলছিলেন ।

সেটা সব রবিবারে নয় । এই রবিবারে আমার ছুটি । কেন বলুন তো ?

আমাদের বাড়িতে আসবেন বিকালে ? ছটা সাড়ে ছটা নাগাদ ?

যেতে পারি । কিন্তু কারণটা কি ?

আপনি না সেদিন আমার বন্ধুত্ব মেনে নিয়েছিলেন! এমনিই আসুন ।

খাওয়া-দাওয়া আছে ?

রশ্মি খিলখিল করে হাসল, কিন্তু আপনি তো মেয়েদের সামনে খান না । কি করবেন তাহলে ?

না তাকালে খেতে পারি ।

রশ্মি খুব মায়াবী গলায় বলল, একটা ছোট্ট অনুষ্ঠান আছে । আর আমি ফরাসী দেশে রান্না শিখেছি । রাঁধতে ভীষণ ভালবাসি । সেদিন কয়েকটা নতুন রেসিপি এক্সপেরিমেন্ট করব ।

ও বাবা! আমি কি গিনিপিগ নাকি ?

রশ্মি আবার খুব হাসল, না হয় তাই হলেন ।

আচ্ছা । যাবো । মেয়েদের জন্য পুরুষদের কত স্বার্থই তো ত্যাগ করতে হয় ।

রশ্মি হাসল, ছাড়ছি । বাই ।

হোমস ফোনটা রেখে দিয়ে খুব গম্ভীর একাগ্রতা নিয়ে চিন্তা করতে বসল । মানুষের মন স্বভাবতই এলোমেলো । চিন্তাগুলোকে পর্যায়ক্রমে বা পরস্পরায় সাজাতে পারে না বলে তার সিদ্ধান্তে আসতে দেরি হয় না কখনোই আসতে পারে না । কিন্তু প্রশ্নটা হল, এটা কী হচ্ছে ? এটা কি কোনও সংকেত ? কোনও পূর্বলক্ষণ ?

ফোনটা সে করল অগতির গতি চারুশীলাকে ।

কি রে হাদারাম, কেমন আছিস ?

শোন, আমার একটা প্রবলেম হয়েছে ।

তোর তো বরাবরই প্রবলেম । এবার একটা বিয়ে কর । তাহলে আর প্রবলেমে পড়লেই আমাকে ফোন করতে হবে না ।

তুই বড্ড সেকেন্দ্রে ।

বিয়ে করতে বললেই বুঝি সেকেন্দ্রে হয় ? তা তুই করতে চাস কী ? লিভ টুগেদার করবি নাকি ? তোর ভাবসাব আমি একটুও ভাল বুঝি না ।

দেখ, বিয়েটাও একটা লিভ টুগেদার ছাড়া কিছু নয়, সে হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমানি মতে বা রেজিস্ট্রি করলেও হেরদরে ক্যাপশন গোত্র । বিয়ের সুবিধে এই যে, ছাড়াছাড়ি হলে অ্যালিমনি বা কমপেনসেশন পাওয়া যায় ।

ও বাবা, এ তো খুব অত্যাধুনিক মতামত হয়েছে দেখছি । জানিয়ে দেবো নাকি বাড়িতে ?

তা জানাতে পারিস । কিন্তু তাতে সত্যটা তো; বদলে যাবে না । বিয়েকে উদ্ভবকন কেন বলে জানিস ? ওর মানে হল বেঁধে মারা ।

মোটাই তা নয় । উদ্ভবকন মানে বিয়ে নয় মোটেই । বিয়ে হল উদ্বাহ বন্ধন । বাংলাটা তুই কিছু জানিস না ।

ওই হল । উদ্বাহটাও এমন কিছু ভাল ব্যাপার নয় । বুঁজলে হয়তো দেখা যাবে ওটার মানেও খুব খারাপ ।

তুই বরং ইংরিজিতে বল না, ভুল একটু হবে ।

ইংরিজিতে বললে যে তুই কিছুই বুঝবি না । তোর কাছে ইংরিজি তো গ্রীক ভাষা ।

তোর কাছে যেমন বাংলা ? তোর জন্মদিন কবে যেন! এবার তোর জন্মদিনে একটা ভাল বাংলা ডিকশনারি প্রেজেন্ট করব তোকে ।

দিস । ডিকশনারি দিয়েই শুরু কর । হাত আসুক ।

ইস! আমি কেপ্পন না তুই কেপ্পন! বিয়ে তো করতে চাস না খরচের ভয়ে । বউ খাবে, পরবে, এটা ওটা চাইবে, তাতে তোর টাকা খরচ হবে । হ্যাঁ রে, তুই এত টাকা চিনলি কবে থেকে ? হাড় কল্পস হয়েছিস মাইরি!

রোজগার করলে তুইও টাকা চিনতিস । পরের ঘাড়ে পড়ে দিবা লাইফটা কাটিয়ে গেলি । সিদ্দাবাদের কাঁধে যে সেই বুড়োটা চেপে বসেছিল, কিছুতেই নামে না, তুই হলি তেমনি । শুধু চেপে বসা ? লোকটাকে ছিঁবড়ে করে দিলি ।

আচ্ছা, তুই না একটা গায়ের মেয়ে বিয়ে করবি বলেছিলি! তাই না হয় কর না বাবা । গায়ের মেয়েদের ডিম্যান্ড কম হয় । রুজ লিপটিক চাইবে না, ডুরে শাড়ি পোলে খুশি, পাটিটাটি দেবে না, মোষের মতো খেটে তোর খরচ বাঁচিয়ে দেবে ।

গায়ের মেয়ে তুই খুব চিনেছিল দেখছি! গায়ে যাস কখনও ? গিয়ে দেখিস তোর মতো আধুনিকা গণ্ডায় গণ্ডায় ঘুরে বেড়ায় আজকাল । সেই দিন আর নেই রে নাতি, খাবা খাবা চিনি খাতি ।

মোটাই নয় । এখন তোর প্রবলেমটার কথা বলবি ?

বি সিরিয়াস । প্রবলেমটা কিন্তু সত্যিই প্রবলেম । নো হাসিঠাট্টা । প্রীজ!

আচ্ছা, মনে থাকবে ।

প্রবলেমটা একটা মেয়েকে নিয়েই । টল, ফেয়ার, ইয়ং অ্যান্ড বিউটিফুল । হাইলি এডুকটেড । বিলেতে লেখাপড়া করেছে । পেপ্যায় বড়লোক ।

বাড়িয়ে বলছিস না তো! প্রেমে পড়লে কিন্তু লোকের মাত্রাজ্ঞান থাকে না । কাণ্ডজ্ঞানও নয় । আগে বল জাতে কি ?

ওং, তোকে নিয়ে আর পারি না । আমি প্রেমে পড়িনি ।

পড়িসনি ? এর পরও যদি প্রেমে না পড়ে থাকিস তাহলে এখন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখা ।

একটু শুনবি চারুদি ? একটু পেশেন্স নিয়ে ?

বল ।

মেয়েটা আদর্শবাদী । একটু নারীমুক্তি ঘেঁষা, অর্থাৎ একটু অ্যাগ্রেসিভ টাইপের ।

চারুশীলা ফোঁস করে ওঠে, নারীমুক্তিতে বিশ্বাস করলেই সে অ্যাগ্রেসিভ হয় বুঝি! বেশ কথা তো!

ফের ফোড়ন কাটছিস ?

আচ্ছা বল ।

পদবী রায়, জাতটাটা জানি না ।

জানিস না কেন ? রায় মে বি এনিথিং ।

তা হোক না এনি থিং । আমি তো আর ইন্টারেস্টেড নই ।

নোস যদি তবে ফোন করে জুলাঙ্কিস কেন ?

বলছি । মেয়েটা একটা গাঁয়ের স্কুলের হেডমিস্ট্রেস । চাকরিটা শখের । তবে ওই স্কুলে অডিট করতে গিয়ে আলাপ ।

এক সঙ্গে ফিরলাম । ওর বাড়িতে কফিও খেয়েছি । দি ম্যাটার শুড এন্ড দেয়ার । কিন্তু মেয়েটা একটু আগে ফোন করে সামনের রবিবার ওর বাড়িতে নেমন্তন্ন করেছে । আমি অ্যাকসেপ্ট করেছি ।

বেশ তো । তারপর ?

তারপরই তো তোকে ফোন করছি । কিছু বুঝতে পারছিস ?

এ তো দুইয়ে দুইয়ে চার । সোজা অঙ্ক ।

ভ্যাট । এ মেয়ের আমাকে পাশা দেওয়ার কথাই নয় ।

তবে দিচ্ছে কেন ?

সেটাই যদি জানবো তবে তোকে জিজ্ঞেস করছি কেন ? আমি মেয়েদের সাইকোলজি কিছু জানি না । একটু অবাক লাগছে ।

আগে জানতে হবে তুই যতটা বলছিস মেয়েটা ততটাই কিনা । তুই তো হাঁদারাম । বয়সটাও ভাল নয় । এ বয়সে যাকে চোখে পড়ে তাকেই উর্বশী বলে মনে হয় ।

এ মেয়েটি গ্যারান্টিড সুন্দরী । ঠিকানা দিচ্ছি, দেখে আসিস গিয়ে ।

দেখাশোনা তো করতাই হবে বাবা । সেটা না হয় পরেই হবে । কিন্তু তোর প্রবলেমটা কী ?

এটাই তো প্রবলেম । মেয়েটা ডাকছে কেন ?

তোকে পছন্দ করছে বলে! বিলেতে কতদিন ছিল ?

জিজ্ঞেস করিনি । তবে লেখাপড়া যখন করেছে তখন বেশ কিছুদিন থেকেছে নিশ্চয়ই । সামনের বছর পারমানেন্টলি বিলেতে চলে যাবে ।

তুই লভনে কতদিন ছিলি যেন ?

বছর যানেক । একটা শর্ট কোর্স করতে গিয়েছিলাম ।

তোর তো সেখানে অনেক বন্ধু আছে!

আছে কয়েকজন ।

তাদের কাছে চিঠি লিখে বোজ নে ।

অতদূর করতে যাবো কেন ?

খোঁজ নিয়ে দেখ, ওখানে কোনও অ্যাফেয়ার ছিল কিনা ।

সেটা জেনেই বা কী হবে ?

যা বলছিস তা যদি সত্যি হয় তাহলে ধরে নিতে হবে যে এতদিনে তোর মতো একটা হাবাগঙ্গারাম, অপদার্থ, শুড ফর নাথিংকে উদ্ধার করতে ভগবানই ওকে পাঠিয়েছেন ।

তুই একদম বোকা । বলছি তো আমি ইন্টারেস্টেড নই ।

ঠিক আছে, রোববার ওর বাড়ি থেকে ঘুরে আয় । একটু বুদ্ধি খাটিয়ে ওদের বণ্টা জেনে নিবি । বুঝেছিস বোকচণ্ডী ?

আমি ওসব পারব না । শুধু জানতে চাইছি, এত অল্প পরিচয়ে এতটা এগোনো কি স্বাভাবিক ?

প্রেম জিনিসটা এরকমই হয় । তোর অভিজ্ঞতা নেই বলে জানিস না ।

তুই বলতে চাস মেয়েটা আমার প্রেমে পেড়েছে ?

হাবুডু বু যাচ্ছে ।

অসম্ভব । এ খুব ধারালো মেয়ে ।

ধারালো মেয়েরা আজকাল ইচ্ছে করেই ব্যক্তিভূত্বীন, ম্যাডাটে মার্কী, জো-হুজুর টাইপের পুরুষদের পছন্দ করছে । তাতে তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বজায় থাকে, যা খুশি করতে পারে, স্বামীকে ইচ্ছেমতো চালাতে পারে ।

আমি ম্যাডাটে মার্কী! ব্যক্তিভূত্বীন!

তার ওপর পয়সাওলা ঘরের ছেল, অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশনও ভাল । তোকে তো এ ধরনের মেয়েরা লুফে নেবে ।

ক্যাচ উঠলে তো লুফবে! আমি তো ক্যাচ তুলিনি ?

তুলেছিস, কিন্তু জানতি পারছিস না ।

ইয়ার্কি করিস না চারুদি । তোকে না আগেই বলেছি, বি ভেরি সিরিয়াস!

সরি। ভুলে গিয়েছিলাম। আর ইয়ার্কি করব না। বল।
 যা বলার তা বলেছি। এবার ভেবে বল তো ব্যাপারটা কি!
 সত্যি বলব?
 সত্যি না তো কি বানিয়ে বলবি?
 মেয়েটা তোকে একটু বাজিয়ে দেখতে চাইছে। তোর চেহারাটা খ্যাঁদা বোঁচার ওপর মন্দ নয়। মুখে একটা বোকা-
 বোকা ভালমানুষী আছে, যা থেকে তোকে অনেকটাই বলে মনে হতে পারে। তবে আমি এটাও বিশ্বাস করছি যে, তুই এখনও
 ওর প্রেমে পড়িসনি। পড়লে তোর গলা শুনেই আমি বুঝতে পারতাম।
 পড়িনি। আর বেশিদূর এগোতেও চাই না। নেমন্তন্নটা কি কাটিয়ে দেবো?
 তা কেন? যা না। তবে সব ইনফর্মেশন না নিয়ে কিছু করে বসিস না।
 আমি কি সেরকম লোক?
 তুই কিরকম লোক? বোকারা কত অকাজ করে ফেলে। মেয়েটার নাম কি?
 রশ্মি রায়।
 নামটা তো বেশ!
 মেয়েটাও বেশ।
 তবু তোর পছন্দ নয়?
 পছন্দ নয়তো বলিনি! তবে আমি প্রেমে পড়িনি।
 চারুশীলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তোর জন্য এই কারণেই আমার মাঝে মাঝে বড় দুঃখ হয়।

॥ ৩১ ॥

সেদিন জলকাদায় বৃষ্টিতে গাঁ-গঞ্জের কাঁচা-পাকা রাস্তায় এবং ক্ষেতে খামারে অনেক ঘুরতে হল কৃষ্ণজীবনকে।
 কারণটা হল নিরুদ্দেশ রামজীবন।
 সে বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই কান্নার আওয়াজ পেয়েছিল। বাবা আর মা তাকে দেখে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল বটে,
 কিন্তু মুখে তেমন হাসিখুশি ভাবটা ছিল না। এটা হওয়ার কথা নয়। পথে আসতে আসতে সে পটলের কাছেই শুনে
 নিয়েছিল ঘটনাটা।

রাঙাকে ডেকে বলল, কেঁদো না বউমা। রেমো কি মাঝে মাঝে এরকম চলে-টলে যায় নাকি?
 রাঙা মাথা নিচু করে বলে, গেলে আমাকে অন্তত বলে যায়। কাল কিছু বলেনি। বটতলায় ওর কিছু খারাপ বন্ধ
 আছে। মাঝে মাঝে এসে খুঁজে যায়। তাদেরই ভয়। মেরে-টেরে ফেলবে কিনা কে জানে?
 যে লোকটা খুন হয়েছে সে রেমো নয়, নিশ্চিন্তে থাকো। জেবো না, আমি খুঁজতে বেরোচ্ছি।
 আপনি এতটা পথ এলেন, এখনই বেরোবেন কি? আগে একটু চা করে দিই।
 আমি চা বিশেষ খাই না। তবে বৃষ্টির দিন, দাও একটু।
 রাঙা দৌড়ে গেল। মুড়ি মেখে চা করে নিয়ে এল। বলল, দুপুরে কী খাবেন বলুন! একটু পোস্ত করি?
 কৃষ্ণজীবন হাসল, খাওয়ার সময় হবে কিনা কে জানে! রেমো কোথায় কোথায় যেতে পারে একটা ধারণা দাও তো!
 আমাদের কিছু বলে না তো। বটতলার বন্ধুরা জানে হয়তো। কিন্তু তারা যা লোক, কে জিজ্ঞেস করতে যাবে তাদের?
 বন্ধুদের নাম জানো?

না, শুধু একজনের নাম শুনেছি, পঞ্চা।
 পটল জ্যাঠার কাছ ঘেঁষেই আছে। সঙ্গে গোপাল। পটলের চোখে বিশ্বাসের ঘোর। এই তার জ্যাঠা! তার মন্ত জ্যাঠা!
 সে পঞ্চা নামটা শুনেই বলল, ওদের আমি চিনি জ্যাঠা। গণেশ, পঞ্চা, চিত্ত, রতন।

বামাচরণ বা শ্যামলী এতক্ষণ ঘর থেকে বেরোয়নি। তারা যে এ বাড়িতে আছে তাই মনে হচ্ছিল না! কৃষ্ণজীবনের।
 হঠাৎ দরজা খুলে বামাচরণ বেরিয়ে এল। পরনে বাইরের পোশাক প্যান্ট আর জামা। মুখে একটু বিগলিত হাসি। জন্মে যা
 কখনও করেনি আজ হঠাৎ তাই করল বামাচরণ। দাওয়ায় উঠে টিপ করে একটা প্রণাম ঠুকে বসল কৃষ্ণজীবনকে।

কৃষ্ণজীবন একটু হাসল, কেমন আছিস রে বামা?
 ওই আছি আর কি! তুই ভাল তো দাদা? বাড়ির খবর-টবর সব ভাল?
 কৃষ্ণজীবন একটা অস্ফুট হ্যাঁ বলে তার চেয়ে তিন বছরের ছোটো ভাইকে দেখছিল। বামার গালে খোঁচা খোঁচা
 কাঁচাপাকা দাড়ি। গায়ের লোক অবশ্য নিয়মিত দাড়ি কামায় না। কিন্তু বামাচরণের মুখে বেশ বয়সের ছাপও পড়েছে,
 মাথার চুল বিরল হয়ে টাক প্রায় বেরিয়ে পড়েছে। চুল যা আছে তার বেশির ভাগই পাকা। জামা প্যান্ট যেমন ময়লা
 তেমনি ভাঁজহীন, চেহারা-ছবিতে ভদ্রলোকের ছাপটাই নেই। কৃষ্ণজীবনের ভারি কষ্ট হল দেখে। কেন যে শ্রীহীন হয়ে
 বড়িয়ে যাচ্ছে এরা। বাইরের লোক তাকে আর বামাচরণকে পাশাপাশি দেখলে বিশ্বাসই করবে না যে, বামাচরণ
 কৃষ্ণজীবনের চেয়ে বয়সে ছোট। কিংবা সম্পর্কে ভাই।

সংসারে যে চাপা আড়াআড়ি তা বুঝতে কষ্ট হল না কৃষ্ণজীবনের। আড়াআড়ি না থাকলে এতক্ষণ বামাচরণের উচিত
 ছিল রামজীবনের খোঁজে বেরিয়ে পড়া। আড়াআড়িই শুধু নয়, হয়তো ভাগাভাগিও। এ সংসারের সঙ্গে বন্ধন কি ছিন্ন হয়েছে
 কৃষ্ণজীবনের? সে যে কোনও খোঁজই রাখে না!

বামাচরণের বউ শ্যামলীও এসে প্রণাম করে ঘোমটা টেনে দাঁড়াল। একে সে মুখ চেনে, এক-আধবার দেখেছে।
 কেমন আছো বউমা?

ভাল দাদা।

কৃষ্ণজীবন একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করল। না, এরা ভাল নেই। একদম ভাল নেই।

প্রান্তিকের প্যাকেটটা তুলে নিল কৃষ্ণজীবন। সে শাড়ি ভাল চেনে না। দোকানে গিয়ে বাঁশবনে ডোমকানা অবস্থা হয়েছিল তার। মস্ত দোকান, সেলসম্যান শাড়ির পর শাড়ি খুলে দেখাতে দেখাতে পাহাড় করে ফেলেছিল প্রায়। সে অবশেষে সেলসম্যানেই সাহায্য চাইল অসহায়ভাবে। বহুকাল সে মাকে, বাবাকে, বোনদের, ভাইয়ের বউদের কিছুই দেয়নি। কাজেই মায়ের জন্য গরদ, বাবার জন্য খুব ভাল ধুতি আর বাফতার পাঞ্জাবির কাপড়, বোন আর ভাইয়ের বউদের জন্য পিঠির সিঁচ কিনে এনেছে। ভাইপোদের কথা খেয়াল ছিল না। ওদের জন্য টাকা দিলেই হবে।

শাড়ি ধুতি গরদে মলিন বাড়িটা যেন ঝলমল করে উঠল। এমনকি দৃষ্টিভ্রান্তি সৃষ্টিয়ে থাকা রাস্তার মুখে অবধি চওড়া হাসি দেখতে পেল কৃষ্ণজীবন। নির্বিকার বিষ্ণুপদ অবধি ধুতিটা পরখ করে দেখল খুব। বাড়িতে একটা হিল্লোল বয়ে গেল।

শাড়ি বুকে নিয়ে টিপ টিপ প্রণাম করল দুই বউ।

সরো আর বীণার শাড়িদুটো কী হবে মা? কৃষ্ণজীবন জিজ্ঞেস করে।

নয়নতারা বলে, রেখে যা। রেমো দিয়ে আসবেখন। বনগায়ে অনেক লোক যায়। আর সরোর বর তো আসে-টাসে। ভাবিস না।

বামাচরণ খুশির গলায় বলল, ও আমিই পৌছে দিতে পারব।

কৃষ্ণজীবন মুড়ি আর চা খেয়ে উঠল। বলল, এখনও বেলা বিশেষ হয়নি। রেমোকে যদি কাছেপিঠে পেয়ে যাই তো নিয়ে আসছি। দেরি হলে তোমরা খেয়ে নিও।

রাঙা বলে উঠল, আপনি পটলকে সঙ্গে নিয়ে যান দাদা। ও চেনে সব।

পটল এক পায়ে খাড়া। জ্যাঠার সঙ্গে তার কাছে এক অলৌকিক অভিজ্ঞতা। জ্যাঠার সঙ্গে কথা কইলেই নাকি কত কী শেখা যায়।

বটতলা অবধি অবশ্য তেমন কথা হল না। জ্যাঠা হাঁটে যেন স্টিম ইঞ্জিনের মতো জোরে। ভাল রাখতে পটলকে ছুটতে হচ্ছিল।

জ্যাঠা, তুমি কি ওইসব লোকের সঙ্গে কথা কইবে?

না বলে উপায় কি?

ওদের সবাই ভয় খায় কিন্তু।

কেন, কী করে ওরা?

খুন জখম করে, জুয়া খেলে, মদ খায়।

বাবাকে বারণ করতে পারিস না?

ও বাবা! যা মারবে তা হলে!

খুব মারে নাকি?

বম বম করে পেটায়! কিন্তু গোপাল তো দোষ করে না। গোপালকে কেন পেটায় বলো তো।

সত্যিই তো! ওতো বোবা মানুষ।

এমনিতে মারে না। কিন্তু মদ খেলে যেন খুন চাপে।

তুই এত রোগা হয়েছিস কেন?

আমি তো রোগা।

বড্ড রোগা। স্বাস্থ্য ভাল করে ফেলতে পারিস না?

কিছুতেই হয় না। আমার অমনি চিমসে চেহারা, মা বলে।

বটতলা এখন বেশ জমজমাট জায়গা। দোকান-পাট, বাসের আড্ডা। এমন ছিল না। শীতলা মন্দিরটা ছিল। একটা বটগাছের তলায় হাট বসত সপ্তাহে দু'দিন। কত ফাঁকা ছিল। জঙ্গল ছিল।

আর কাউকে নয়, পঞ্চায়েকই পাওয়া গেল চায়ের দোকানে। কালা বেঁটেমতো, দাড়িওলা একটা ছেলে। রাস্তার দিকে

তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে একটা বেঞ্চের ঝুঁকে বসে আছে।

পটল চাপা গলায় বলে উঠল, জ্যাঠা, ওই পঞ্চা!

কৃষ্ণজীবন বলল, আয় তা হলে, ওকেই জিজ্ঞেস করি।

আচরণের বিষয় এই, কৃষ্ণজীবন কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই পঞ্চা টপ করে উঠে দাঁড়াল। মুখে বিগলিত হাসি, দাদা, কবে এলেন?

আজই সকালে।

অনেকদিন আসেননি বিষ্ণুপুরে!

না।

ভাল আছেন তো?

পটল নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। পঞ্চা হল এ অঞ্চলের ভয়ের লোক। কাউকে আমল দেয় না। জ্যাঠার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছে যেন গুরুদেব।

কৃষ্ণজীবন অবাক হল না। সে একে না চিনলেও এ গায়ের সবাই তাকে চিনবে এটাই স্বাভাবিক। সে ছিল এ গায়ের মুখ উজ্জল-করা ছেলে। আজও তার কথা বলাবলি হয়। বিদ্যা সকলের থাকে না, কিন্তু বিদ্বানকে খাতির করে না এমন পাষাণের সংখ্যা—ঈশ্বরের দয়ায়—এখনও কম।

একটা দুটো কথা বলে কৃষ্ণজীবন জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, রেমোটর খবর কিছু জানো ? সে কাল থেকে বাড়ি ফেরেনি।

রামজীবন! কেন, সে তো কাল পিপুলপাতি গেছে।

পিপুলপাতি ? এ দিকে বাড়িতে সবাই ভাবছে।

কী কাণ্ড দেখুন তো। খবর দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কার কাছ থেকে যেন টাকা আনতে যাওয়ার কথা বলছিল।

নাম বলেনি ?

না। তবে পিপুলপাতি মাঝে মাঝে যায়।

এখন তো বাস পাবো না, না ?

সকালের দিকে দুটো দক্ষিণে গিয়েছিল। তার মধ্যে একটা ফিরল একটু আগে। স্টেশনে যাবে, তারপর আবার ফিরবে। বর্ষার জন্য আরও তিনটে বাস বসে গেছে বলে এই অবস্থা।

বাসটা কখন ফিরবে ?

ধরুন তা ঘণ্টাখানেক তো বটেই। বেশীও হতে পারে।

কৃষ্ণজীবন ঘড়ি দেখে নিল। সাড়ে দশটা বাজছে। হেঁটে গেলে সে চল্লিশ মিনিটে পিপুলপাতি পৌঁছে যাবে। অবশ্য গাঁয়ের লোকের দূরত্বের মাপ সম্পর্কে তার বিশ্বাস নেই। এ দেশের গাঁয়ের লোকের দুটি জিনিসের খুব অভাব। সময় আর দূরত্বের আন্দাজ।

পঞ্চা জিজ্ঞেস করল, যাবেন নাকি ?

যাবো। ওর বউ খুব ভাবছে।

এসে যাবে ঠিক।

তবু একটু ঘুরেই আসি।

তা হলে এই মাঠ সোজাসুজি যান। রাস্তা আছে। পথ অনেক হবে। পাকা রাস্তায় গেলে সময় লেগে যাবে।

কৃষ্ণজীবনের আপত্তি হল না। সে পটলকে জিজ্ঞেস করল, যাবি ?

মা তো তোমার সঙ্গে যেতেই বলেছে।

আসি হে পঞ্চা।

আসুন দাদা। আমার সঙ্গে দেখা হলে খবর দিয়ে দেবোখন যে আপনি এসেছেন।

তারপর খেতখামার আর কাদামাটির মধ্যে নেমে পড়ল কৃষ্ণজীবন।

বিষ্ণুপুর তোর কেমন লাগে রে পটল ?

ভাল লাগে জ্যাঠা। খুব ভাল লাগে।

কেন ভাল লাগে বল তো!

পটল ভাবিত হয়। কেন ভাল লাগে ? সত্যিই তো! সে তো জানে বিষ্ণুপুরে তেমন কিছু নেই। এ নাকি গরিবদের জায়গা। কিন্তু তার তবু ভাল লাগে যে।

পটল বলল, এমনিতেই বেশ ভাল লাগে। মা আছে, ঠাকুমা আছে, গোপাল আছে, ইন্সুল আছে।

কলকাতায় ক'বার গেছিস ?

দু'-তিনবার হবে। তোমার বাড়িতেও তো গেছি জ্যাঠা, তোমার মনে নেই ?

আমার সব মনে থাকে। সাততলার বারান্দায় রেলিং-এর ওপর উঠতে গিয়েছিল বলে বকুনি দিয়েছিলাম।

হ্যাঁ গো! কী উচুতে তোমরা থাকো! ইচ্ছে করলে তো তোমরা উড়ন্ত ঘুড়ি ধরে ফেলতে পারো, না ?

তা পারি।

ধরো না ?

না। আমার কি আর তোর বয়স আছে ?

আচ্ছা, ভূমিকম্প হলে বাড়িটা পড়ে যাবে না তো!

পড়তেও পারে। বিষ্ণুপুর ছেড়ে তোর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না ?

খুব করে। যদি তোমার মতো লেখাপড়া শিখতে পারি তবে তো! শিখতে পারলে বিলেত যাবো।

এই যে বললি বিষ্ণুপুরকে ভালবাসিস, তা হলে বাইরে যাবি কেন ?

এখানে কিছু নেই যে! কলেজ অবধি নেই।

একদিন হবে। গাঁয়ের দুঃখ কী জানিস ? যারা ভাল কিছু করে তারা আর গাঁয়ে থাকে না। সবাই বলে, গাঁয়ে কিছু নেই।

তোমার কি বিষ্ণুপুর ভাল লাগে জ্যাঠা ?

খুব লাগে। গাঁয়ে কিছু নেই, এ কথা ভাববি কেন ? গাঁয়েই তো ভগবানের সম্পদ ছড়িয়ে আছে। গাছ আছে, মাটি আছে, মস্ত আকাশ আছে। আমি তো ভাবি, একদিন কলকাতা ছেড়ে গাঁয়ে চলে আসবো।

আসবে ? বিস্ত্রিত পটলের চোখ বিস্ফারিত হয়।

খুব ইচ্ছে করে।

তা হলে কী মজাই না হবে! তুমি এলে আর ছোট জ্যাঠায় আর বাবায় ঝগড়া হবে না, বাবাও মদ খেয়ে গোপালকে মারবে না, আমি তোমার কাছে কত কী শিখতে পারবো।

তুই আশেদকরের নাম শুনেছিস ?

না তো! কে ?

একজন পণ্ডিত লোক ছিল। সে বলেছে, আগে আমাদের গাঁওলো ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বনির্ভর। মানে জানিস ?

জানি।

ঠিক জানিস তো, নাকি ভয়ে বলছিস ?

জানি জ্যাঠা। বইতে আছে।

ভাল। আগে আমাদের গ্রামগুলোতেই সব থাকত, কামার, কুমোর, তাঁতি, জোলা, জেলে, চাষা, কবিরাজ, সব।

গল্পের গন্ধ পেয়ে পটল বলল, হু।

তারপর ইংরেজ এল, রাস্তাঘাট করল, আর বড় বড় কল বসাতে লাগল। গ্রামগুলো জুড়ে ছিল গোটা দেশটার অর্থনীতির সঙ্গে। কী হল তাতে জানিস ?

না তো!

বড় বড় কলে কাপড় বোনা হতে লাগল, জিনিস তৈরি হতে লাগল, বিলেত থেকেও আসতে লাগল। তাতে কামারের ব্যবসা মার খেল, তাঁতি মাথায় হাত দিয়ে বসল। যে ছোট্ট গ্রামখানা একদিন ডগমগ করত তা হারিয়ে গেল বিরাট দেশের অর্থনীতির সঙ্গে একাকার হয়ে। তোর কি বুঝতে শক্ত লাগছে ?

না। একটু একটু বুঝতে পারছি।

এখন একটুই বুঝে রাখ। বড় হয়ে ভাল করে বুঝবি। এই যে বিষ্ণুপুর, একে তো তুই ভালবাসিস!

খুব বাসি জ্যাঠা।

কী করলে বিষ্ণুপুরের ভাল হয় তা জানিস ?

না তো!

ভাববি। খুব ভাববি। তোকে ভারতবর্ষ নিয়ে ভাবতে হবে না। শুধু বিষ্ণুপুরের যদি ভাল করতে পারিস তা হলেই হবে। ভাববি বিষ্ণুপুরের দারিদ্র্য ঘোচাবে, এখনে তাঁত বসাবো, কামারশালা বসাবো, বিষ্ণুপুরের মানুষের তৈরি জিনিসই শুধু বিষ্ণুপুরের মানুষ ব্যবহার করবে।

এখন যে সব মনোহারি জিনিস কলকাতা থেকে আসে!

আসবে। কিছু তো আসবেই। কিন্তু যা গায়েই হয় তা বাইরে থেকে আনবি কেন ?

তাতে ভাল হবে জ্যাঠা ?

তাতেই ভাল হবে। কিন্তু হবে কিনা তা কে জানে! কিন্তু একবার যদি গায়ের মানুষ সবাই মিলে ভাবে আর কাজে নেমে পড়ে তা হলে বেশ হত। পরের মুখ চেয়ে থাকতে হত না।

আশ্বেদকর কি এই কথা বলেছেন ?

বড় হয়ে পড়িস। বুঝবি। হ্যাঁ, আশ্বেদকর বলেছেন। আরও সব বড় বড় লোক এখন বলছেন।

কী বলছেন জ্যাঠা ?

বড় বড় কলকারখানা কমিয়ে দিতে। ধর যদি জাহাজও তৈরি করতে চাস তা হলে তার নানা অংশ তৈরি করার ভার দিয়ে দিলি ছোট ছোট সব কামারশালায়, ছোট ছোট কারিগরদের হাতে। সব যখন তৈরি হল তখন একটা জায়গায় এনে সেগুলো জুড়ে দিলি, এভাবে কত বড় কাজ হয়। কিন্তু এ দেশে তো সেরকম হল না। ইংরেজরা যন্ত্র আনল, আমরা আরও বড় যন্ত্র বানাতে লাগলাম। যন্ত্রে যন্ত্রে দুনিয়াটা ভরে গেল। বাতাস বিধিয়ে গেল। তেল ফুরিয়ে গেল, ত তাদের জন্য আর পৃথিবীটা তেমন সুন্দর রইল না। তুই বুঝতে পারছিস না, না ?

পারছি জ্যাঠা। তুমি বলো না!

বিষ্ণুপুর খুব সুন্দর একটা গ্রাম। এটাকে খুব ভালবাসিস।

বাসিই তো জ্যাঠা।

শুধু ভালবাসলে হয় না। যাকে ভালবাসিস তার ভালর জন্য কিছু করতেও হয়। করবি ?

করব জ্যাঠা। তুমি বলে দিও কি করতে হবে।

বলব। আমি সবাইকে শেখাতে চাই। সবাইকে বলতে চাই। কেউ শোনে না।

আমি শুনব।

পিপুলপাতিতে পৌছতে পাক্কা একটি ঘণ্টা লাগল তাদের।

ছোট গ্রাম। খোঁজখবর করতেই একজন চাষী বলল, রামজীবন ? হ্যাঁ চিনি। ওই তো বিধুবাবুর বাড়িতে যাতায়াত।

ওই সাদা পাকা বাড়ি।

বিধুবাবুর বাড়িতেই খোঁজ পাওয়া গেল। রামজীবন কাল রাতে থেকে গিয়েছিল। খুব জলঝড় হচ্ছিল বলে ফিরতে পারেনি। একটু আগে বেরিয়ে গেছে।

স্বস্তির শ্বাস ফেলল কৃষ্ণজীবন।

পটল!

কী জ্যাঠা ?

হেঁটেই ফিরে যাই চল।

চলো না। আমি খুব হাঁটতে পারি।

সাইকেল চালাতে পারিস ?

পটল সাইকেলের কথায় টগবগ করে ওঠে। আমি তো সাইকেলের রেস করি। বিষ্ণুপুরে কেউ আমার সঙ্গে পারে না।

সেই পুরনো সাইকেলটা ?

হ্যাঁ। বড্ড পুরনো। ঝাঁ-কুরকুর শব্দ হয়।

তোর নতুন সাইকেল কিনতে ইচ্ছে করে ?

করে তো।

তা হলে একটা কিনে নিস। আমি টাকা দিয়ে যাবো।

ইস্। না জ্যাঠা, তোমাকে দিতে হবে না।

লজ্জা পেলে নাকি ?

পটল একগাল হেসে মাথা নামিয়ে বলে, তুমি কত দিলে সবাইকে, কত টাকা খরচ হয়ে গেল!

তোর বুঝি খুব টাকার হিসেব ?

আমরা গরিব যে বড্ড।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কৃষ্ণজীবন বলে, তাও তুই ভাল আছিস। আমার মতো কষ্ট করতে হয়নি।

আমি শুনেছি জ্যাঠা, তুমি না খেয়ে কুলে যেতে।

রোজ নয়, মাঝে মাঝে। কষ্ট করা খুব ভাল। মানুষ কষ্ট করতে যত না চায় তত বেশী কষ্ট পায়। আমি এক সময়ে পেট ভরে ভাত খেতে পেতাম না বলেই আজও ভাতে অমৃতের স্বাদ পাই। যারা রোজ ভালমন্দ খেয়ে বড় হয় তারা খাবারের স্বাদই পায় না। কথটা বুঝলি ?

তোমার কথা আমি সব বুঝতে পারি জ্যাঠা।

খুব ভাল। তুই ভাল ছেলে। পরীক্ষায় কিরকম নম্বর পাস ?

মোটামুটি।

অঙ্কে ?

পঞ্চাশ ঘাট।

দূর বোকা। অঙ্কে পাবি নব্বই থেকে একশ। তবে না!

কেউ শেখায় না যে!

কারও দরকার নেই। শুধু ভাববি, আমি পারব। পারব পারব ভাবতে ভাবতে, বিশ্বাস করতে করতে পেরেও যাবি।

তুমি তাই করতে ?

তাই তো। তবে যা পড়বি ভালবেসে পড়বি। যেন নিজের জন্য নয়, অন্যকে শেখানোর জন্য পড়ছিস। তাতে আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

জলে কাদায়, আঘাটা দিয়ে, নানা অচেনা পথে বিপথে এই যে ঘুরে বেড়াল কৃষ্ণজীবন এটা যেন তার শ্রিয়মাণ জীবনে সম্ভার করে দিতে লাগল প্রাণশক্তি। সে একদিন ফিরে আসবেই প্রকৃতির কোলে।

তারা যখন ফিরল তখন দুপুর। রামজীবন ফিরে এসেছে। তবু বাড়িটা কেমন যেন হাসিমুখি নয়।

ক্লান্ত কৃষ্ণজীবন উঠোন পেরিয়ে দাওয়ায় উঠে মোড়ায় বসল। নয়নতারা একটা হাতপাখি নিয়ে কাছে বসে বাতাস করতে লাগল।

কত কী এনেছিস বাবা! এককাঁড়ি টাকা খরচ হল তো!

তাতেকি মা ? কিছু তো দিই না।

দেওয়া তো আছেই। বেঁচে বর্তে থাক, তাতেই আমার হবে।

রেমোকে দেখছি না। কোথায় গেল ?

আছে বাবা, দেখবি। আজকের দিনটা মায়ের কাছে থেকে যা না! মায়ে পোয়ে একসঙ্গে একটু গল্প করব। কেমন সাহেব-সাহেব চেহারা হয়ে গেছে তোর। চিনতে পারি না।

সাহেব-সাহেব! কী যে বলো মা!

সত্যি রে। অনেক ফর্সা আর কেমন যেন। আগে যেমন লালমুখো সাহেবদের দেখতাম তেমনই।

রান্নাঘর থেকে খুব রান্নাবান্নার শব্দ আসছে। আয়োজন হচ্ছে বড় করছি বোধ হয়।

চানটা করে আয় বাবা।

পুকুরে যাবো।

নানা, ও পুকুরের জল বড্ড পচে গেছে। কুমোর জল তুলে দেবেখন পটল।

ঠিক এই সময়ে হঠাৎ ওপাশের ঘর থেকে রামজীবন বেরিয়ে এল। তারপর আত্নানাদ করে উঠল, দাদা!

কৃষ্ণজীবন রামজীবনের দিকে চেয়ে একটু হাসল, আয়।

রামজীবন দাওয়া থেকে লাফ দিয়ে পড়ে ছুটে এল। তারপর দড়াম করে পড়ল কৃষ্ণজীবনের পায়ে।

দাদা রে!

বলে পায়ে মাথা ঘষে কাঁদতে লাগল রামজীবন।

কৃষ্ণজীবন তুলতে গেল তাকে। শক্ত হাতেও পারল না।

করছিস কী রেমো ?

আমাকে ক্ষমা কর দাদা। আমি কুলাঙ্গার। আমি মহাপাপী। আমি অচ্ছৎ।

রামজীবন একবার মুখ তুলল। সত্যিকারের চোখের জলে তার মুখ ভেসে যাচ্ছে। তবে সেই চোখের জলের কতটা দাম তা কে বলবে ? তার মুখ থেকে কাঁচা মদের গন্ধ আসছে ডকডক করে।

কৃষ্ণজীবন এইবার বোধ করল তার দীর্ঘ পথ যাওয়া আসার ব্যর্থ পরিশ্রম। আর ক্লান্তি। রামজীবন সম্পূর্ণ মাতাল।

মোহিনী অনেকদিন ধরে তাকে বলছে, চয়নদা আপনি বাবাকে একবার বলুন না, বাবা হয়তো আপনাকে একটা চাকরি দিতে পারে।

সে কখনও মোহিনীকে বা আর কাউকে মুখ ফুটে চাকরির কথা বলতে পারেনি আজও। কিন্তু তার দীনতা, দারিদ্র্য সবই বোধ হয় বিজ্ঞাপিত হয় তার পোশাকে, চেহারায়, আচরণে, চরিত্রে। তার খিদে পেলে মোহিনী ঠিক টের পায়, দৌড়ে গিয়ে মাকে বলে আসে। মোহিনীর মা এক মহান মহিলা। এ বাড়ি থেকে সে কদাচিৎ উপোসি ফিরে গেছে। এদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় সে নুয়ে থাকে।

মোহিনীর বাবা কৃষ্ণজীবনকে সামান্যমাত্র চেনে সে। উদ্ভলোক কলকাতায় কমই থাকেন। বছরে দু'বার তিনবার বিদেশে যান। তার ওপর আছে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় কনফারেন্স। সরকার ঐকে পরিবেশ বিষয়ক উপদেষ্টা নিয়োগ করেছে। বিদেশে বড় চাকরির লোভনীয় প্রস্তাব আসছে। তিনি যেতে চাইছেন না। কিন্তু কতদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন বিদেশের আকর্ষণীয় আমন্ত্রণ? না, মোহিনীর বাবা হয়তো টাকার লোভে যাবেন না। কিন্তু মস্তিষ্কবান মানুষদের এদেশ ধরে রাখতে পারে কই? টাকার জন্য নয়, কাজের স্বাধীনতা, গবেষণার সুবিধা, অত্যাধুনিক সাজসরঞ্জাম ছাড়া উন্নত গবেষণা তো সম্ভব নয়। আর গবেষণার পিছনে অটল টাকা খরচ করার মতো তহবিলও তো এদেশের নেই। সুতরাং মোহিনীর বাবা কতদিন ঠেকিয়ে রাখবেন নিজেকে? চয়ন শুনেছে, তার বাবা সরকারকে যেসব প্রস্তাব দেন তার কোনওটাই কার্যকরী হয় না। কৃষ্ণজীবনবাবু সেই কারণেই কিছু ক্ষুব্ধ।

একদিন চয়ন মোহিনীকে বলেছিল, তোমার বাবা যদি বিদেশে চলে যান, তোমরাও তো তাঁর সঙ্গে চলে যাবে?

আমার তো যেতে একদম ইচ্ছে করে না। কিন্তু যেতে তো হবেই।

তোমাদের খুব মিস করব তাহলে। এত ভাল তোমরা!

মাষ্টারমশাই, আপনার অঙ্কে যা মাথা, আর ইংরিজি যা ভাল জানেন, আপনি ইচ্ছে করলেই তো অনেক ডিগ্রি পেতে পারতেন।

মোহিনীর কিছু ঠিক নেই। কখনও ডাকে চয়নদা, কখনও মাষ্টারমশাই। চয়ন ম্লান মুখ করে বলে, সকলের সব কিছু হয়ে ওঠে না। ওর জন্য দুঃখ করে লাভ নেই।

শরীরটা সারিয়ে নেন না কেন?

এপিলেপসি কিসারে?

তেমন করে চিকিৎসা করালে নিশ্চয়ই সারে।

তুমি জীবনের ভাল দিকগুলোকেই দেখতে পাও। এ খুব ভাল।

আপনি সবসময়ে কেন একটা হতাশার মধ্যে ডুবে থাকেন, মাষ্টারমশাই?

চয়ন মাথা নেড়ে বলে, ঠিক হতাশা নয়। সম্পূর্ণ হতাশ হলে তো বেঁচে থাকাই কঠিন হত। মাঝে মাঝে মনে হয়, একটা কোনও অঘটন ঘটে আমার জীবনটা পাল্টে যাবে। বুঝেছো? অঘটনের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও উপায় খুঁজে পাই না। কিন্তু মানুষের তো চাঙ্গ আর প্রোবাবিলিটি ফ্যাক্টরের ওপর নির্ভর করা উচিত নয়। তার দাঁড়ানো উচিত পৌরুষ, আত্মবিশ্বাস আর কঠিন শ্রমের ওপর।

ওসব বড় শক্ত কথা।

কাজটা আরও শক্ত। আমি পেরে উঠি না। যেন একটা গর্তের মধ্যে আছি, বেরোতে পারছি না। বেরোলেই পৃথিবীর আলো, হাওয়া, আনন্দকে ছোঁয়া যাবে। কেবল হাঁচোড়-পাঁচোড় করি।

হাঁচোড়-পাঁচোড় কথাটায় খুব হাসল মোহিনী। বলল, এমন ভাব করছেন যেন আপনি প্রতিবন্ধী।

অনেকটা তাই মোহিনী। হাত পা মগজ সব থেকেও কত মানুষ যে ঠুটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছে এদেশে!

মাষ্টারমশাই, আপনার কনফিডেন্স ভীষণ কম। একটা চাকরি-টাকরি যদি হয়, দেখবেন, আত্মবিশ্বাস ফিরে আসবে।

চাকরির ব্যাপারে মাঝে মাঝে তাকে খোঁচায় মোহিনী, বাবাকে বলুন। আমার বাবার অনেক ক্ষমতা।

কিন্তু ভয় পায় চয়ন। উনি যদি বিরক্ত হন। খুব গম্ভীর চিন্তাশীল মানুষ। ওসব মানুষের সঙ্গে আজবাজে স্বার্থ নিয়ে কথা বলতে যাওয়া মানেই সিরিয়াস চিন্তার স্তরকে ছিন্তা করে দেওয়া।

মোহিনী নিজেও তার বাবাকে একটু সমীহ করে চলে। তাই সে একদিন বোধ হয় তার মাকে বলেছিল। পরদিন মোহিনীর মা এসে বললেন, চয়ন, সত্যিই তো, তুমি একবার ওঁকে বললেই তো পারো।

চয়ন সম্বন্ধে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, যে আজ্ঞে।

আমি ওঁকে একটু বুঝিয়ে বলে রাখবখন। এবার উনি বিদেশ থেকে ফিরলেই একবার বোলো। ওঁকে তো অনেক প্রোজেক্ট থেকে ডাকছে আজকাল। আর শোনাও, সামনের মাস থেকে তুমি জিতুটাকেও পড়াও। এতদিন ওর স্কল থেকে বলেছে যে, প্রাইভেট টিউশন যেন না নেয়। কিন্তু ক্লাস এইট থেকে এত পড়ার চাপ, অঙ্কে তেমন ভাল নম্বর পাচ্ছে না।

এই বদান্যতায় আরও বিনীত হয়ে পড়ে চয়ন। উদ্ভমহিলা অধ্যাপিকা, স্বামী অধ্যাপক। এদের ছেলেমেয়েদের ইচ্ছে করলে এঁরা নিজেরাই হয়তো পড়াতে পারেন। চয়নকে রাখা হয়েছে, চয়নের ধারণা, একজন গরীব মানুষকে সাহায্য করার জন্যই।

অবশেষে অবশ্য কৃষ্ণজীবনের মুখোমুখি একদিন হতেই হল তাকে। পড়াতে যেতেই মোহিনী বলল, চয়নদা আজ বাবার সঙ্গে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট। বাবা বেরিয়ে যাবেন, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। আসুন।

বিদ্যান ও যশস্বী মানুষটির মুখোমুখি হতে সঙ্কোচে মরে যাচ্ছিল চয়ন। গিয়ে দেখল, আদুর গা, লুঙ্গি পরা উদাসীন মুখের মানুষটি, যতটা না গম্ভীর, তার চেয়েও যেন বেশী বিষণ্ণ।

বোসো।

চয়ন সন্ধ্যাচে বসল। প্রাথমিক পরিচয়ের দরকার ছিল না। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে এই টিউশনির জন্য দরখাস্ত করেছিল চয়ন। তখন ইনি তার ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন।

তার দিকে একটু চেয়ে থেকে কৃষ্ণজীবন একটু হাসলেন, চাকরি চাও ?

চমৎকার পেটানো স্বাস্থ্য আর সুদর্শন চেহারার মানুষটিকে হাসলে আরও চমৎকার দেখায়। বয়সের কোনও ছাপই পড়েনি চেহারায়।

চয়ন মৃদুস্বরে বলল, আপনাকে বিরক্ত করার ইচ্ছে ছিল না।

জানি। তুমি খুব লাজুক। আমিও তাই।

চয়ন মাথা নিচু করে থাকল।

কৃষ্ণজীবন তাঁর গম্ভীর গলায় বললেন, বাড়িতে কে কে আছে তোমার ?

মা, দাদা আর বউদি।

বাবা নেই ?

না।

মাকে কিরকম ভালবাসো ? খুব ?

একটু অবাক হয়ে চয়ন বলে, বাসি। ভালই বাসি।

কতটা ভালবাসো ?

চয়ন অস্বস্তিতে পড়ে গিয়ে আমতা আমতা করে বলে, মা ছাড়া কেই বা আছে!

ওটা জবাব হল না। মা কারও কাছে বোঝা, কারও কাছে মাথার মণি। আজকাল মা-বাপকে ছেলেমেয়েরা তেমন ভালবাসতে পারে না। ফলে কাউকেই পারে না। এটা হল একটা পিকিউলিয়ার লাভলেনসেন্সের যুগ। লক্ষ করেছে ব্যাপারটা ?

আজ্ঞে, আমি আর কতটুকু দেখেছি!

আজকাল মা বাপ মরলেও ছেলে তেমন কাঁদে না, কেন বলা তো!

চয়ন একটু ভেবে সংকোচের সঙ্গে বলল, আপনি বোধ হয় ঠিকই বলেছেন। আজকাল সেন্টিমেন্টটা যেন কিছু কমে গেছে।

সেটা কি ভাল ?

না বোধ হয়। আমার মা কয়েকদিন আগে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। আমার তখন মনে হয়েছিল, মায়ের আর বেঁচে থাকার দরকার কী ?

কেন ওরকম মনে হল তোমার ?

মা বড্ড কষ্ট পাচ্ছে। শরীরে, মনে।

তোমার সংসারটা বোধ হয় সুখের নয়, না ?

চয়ন মাথা নিচু করে রইল।

কৃষ্ণজীবন নামক জ্ঞানী মানুষটি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, সব সংসারই একটা অন্যটার কারবন কপি। কোনও সংসারই কেন পিসফুল নয় বলা তো! আভ্যাকারেট, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ, ঘেন্না, জেলাসি। পরিবার থেকে ওটা ধীরে ধীরে সমাজেও সংক্রামিত হয়ে যায়, তাই না ?

চয়ন চুপ করে থাকে। জ্ঞানী মানুষটি তাকে একটা চাকরি দিলেও দিতে পারেন, কিন্তু তার জন্য এই ভালবাসার ধাঁধা কেন ? চয়ন বুঝে উঠতে পারল না।

তোমার দাদা মানুষটি কেমন ?

ভাল।

বউদি ?

ভাল।

জ্ঞানী মানুষটি হাসলেন। হেসে বললেন, ভাল হলে তো ভালই। কিন্তু তোমার মুখ দেখে মনে হয় তুমি খুব মানসিক প্রশ্বাসে আছো। সত্যি বলছি ?

চয়ন মৃদু মাথা নেড়ে জানাল, সত্যি।

কৃষ্ণজীবনবাবু আচমকা তাকে আর একটা বিপদে ফেলে দিয়ে বললেন, চাকরি চাও, না সাকসেসফুল হতে চাও ?

চয়ন বুঝতে না পেরে বলে, আজ্ঞে ?

অনেকে চাকরি পাওয়াটাকেই সাকসেস বলে মনে করে। তুমিও কি তাই মনে করো ?

চয়ন খুব অপ্রতিভ হয়ে বলল, আমি ঠিক বুঝতে পারি না। একটা চাকরি হলে আপাতত বেঁচে যাই।

সাকসেস কাকে বলে জানো ?

ঠিক বুঝতে পারি না।

জ্ঞানী মানুষটি হঠাৎ যেন কেমন বিষণ্ণ আর গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, ইউনিভার্সিটির ভাল ভাল সব ছেলেও আজকাল চাকরির পরিধির বাইরে আর কিছু বুঝতে চায় না। চাকরি ছাড়াও যে সাকসেস বলে আর একটা ব্যাপার আছে, তা তারা বুঝতেই পারে না।

যে আজ্ঞে।

ধরো চাকরি হল না, খুব সামান্য আয়ে তোমার চলে, কিন্তু তোমার নৈতিক চরিত্র ভীষণ ভাল, চোর ছ্যাঁচোড় নও, নেশা ভাঙ করো না, পাঁচজনের দায়ে দফায় গিয়ে বুক দিয়ে সাহায্য করো এবং সবচেয়ে বড় কথা, যদি তুমি তোমার চারপাশের লোকজনকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসতে পারো, সেটা কি সাকসেস নয় ?

আজ্ঞে তা তো বটেই।

চাকরি করাটাও একটা কাজ। প্রয়োজনীয় কাজ। রুজি-রোজগারের জন্যই এর দরকার। কিন্তু আরও একধরনের কাজ আছে। সেটা হল ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। এমন কিছু লোককে দরকার, যারা রুজি-রোজগারের জন্য নয়, দুনিয়ার জন্য আদাজল খেয়ে লেগে যাবে। তুমি আরণ্যকে উপন্যাসটা পড়েছো ?

আজ্ঞে পড়েছিলাম।

ওতে কে যেন একটা মানুষের কথা ছিল, যে-লোকটা জঙ্গলে নতুন নতুন গাছ লাগিয়ে বেড়াতে। জঙ্গলটা তার নিজের নয়, গাছ লাগালে তা থেকে কোনও লাভও হত না। তবু কেন লাগাত জানো ? জঙ্গলটাকে সুন্দর দেখাবে বলে। ওইটেই হল ভালবাসা।

যে আজ্ঞে।

পারবে পৃথিবীটাকে ওরকম ভালবাসতে ?

চয়ন এই জ্ঞানী মানুষটিকে কি করে বোঝাবে যে, পৃথিবীর সঙ্গে তার কোনও পরিচয়ই নেই। ভূগোলের ম্যাপ ছাড়া পৃথিবীর আর কোনও চেহারা তার জানা নেই। কলকাতার বাইরে সে কদাচিৎ গেছে। তাও বাড়ি আর টিউশনির বাড়ি, নির্দিষ্ট প্রতিদিনকার যাতায়াতের পথের বাইরে এই কলকাতা শহরকেই বা সে কতটুকু চেনে ? এই বিদ্বান, ভ্রমণশীল, বহুদর্শী মানুষটিকে সে কী করে বলবে যে, তার পরনির্ভর পরাবলম্বী জীবনে সে কেবলই গ্রহীতা মাত্র, দাতা নয়। প্রতিদিনকার লাঞ্ছনা, আত্মবমাননা, নিজেকে নিয়ে হাজারো সমস্যায় জর্জরিত, তার পৃথিবীর জন্য কিছু করার সাধ্যই নেই। রাস্তার যে কোনও মানুষ, একজন ঠেলাওলা কি রিকশাওলাকেও সে হিংসে করে।

কিন্তু সে একথা বলতে পারল না। চুপ করে রইল।

জ্ঞানী মানুষটি তাঁর প্রগাঢ় কষ্টবরে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, কমপিউটার হ্যান্ডেল করতে পারো ?

চয়ন সভয়ে বলল, আজ্ঞে না।

শিখে নিতে পারবে ?

চয়ন দ্রুত মনে মনে হিসেব করে নিল। কমপিউটার শিখতে যে টাকা লাগে, তা কি তার টিউশনি থেকে বাঁচানো টাকায় সম্ভব ? না। কোনও আশাই নেই।

দুর্ভাগ্যবশত সে চুপ করে রইল।

জ্ঞানী মানুষটি বললেন, আমাকে একটা পি সি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কম্পিউটারের ডাটা ভরবার জন্য একজন মানুষ চাই। একটু সায়েন্স জানা লোক। আমার তো সময় হয় না।

চয়ন ভাঙা বুক নিয়ে চোখ নামিয়ে রাখল। জবাব দিল না।

জ্ঞানী মানুষটি তার দিকে চেয়ে বললেন, শেখোনি, না ?

আজ্ঞে না।

তোমার অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন কী তা জানি না। তবে শুনেছি তুমি অন্ধ আর ইংরিজিতে খুবই ভাল। তাই কি ?

কাজ চালিয়ে নিতে পারি।

যদি কলকাতা ছেড়ে বাইরে যেতে হয়, পারবে ?

পারব।

মকে কে দেখবে ?

মা ? বলে চয়ন চোখ তুলে জ্ঞানী মানুষটির দিকে তাকায়। উনি কিছু আন্দাজ করতে পারছেন ? উনি কি তার সংসারের ভাগাভাগির কথা জানেন ?

হ্যাঁ, মা। তাঁকে দাদা বউদি দেখবে ?

হয়তো তা দেখবে।

হয়তো কেন ? তুমি কি নিশ্চিত নও ?

চয়ন আবার চুপ করে থাকে।

তোমাদের কি ভাগের মা ?

চয়ন প্রমাদ গোঁলে।

জ্ঞানী মানুষটি হেসে ওঠেন, আরে লজ্জা কিসের ? লজ্জা পাওয়ার দরকার নেই। গল্পটা মোটামুটি একই রকমের। তোমার মা, আমার মা, সব মা এখন ভাগের মা। এখন দেশও ভাগের মা, পৃথিবীও ভাগের মা। এ হল ভাগের যুগ।

যে আজ্ঞে।

টাইপ করতে পারো ?

শিখেছিলাম। এখন বোধ হয় স্পীড কমে গেছে।

আর কী জানো ?

আর! আর তো কিছু জানি না।

বয়স কত ?

ঠিক হিসেব নেই। আঠাশ হতে পারে।

সার্টিফিকেট এজ কত ? ওটাই দরকার ।

ছাব্বিশ প্রাস ।

টিউশনি করে কত পাও ?

ছ'সাতশো টাকা হয় ।

আরও বেশী হওয়ার কথা ছিল ।

শরীরের জন্য বেশী পেয়ে উঠি না ।

ওঃ, তোমার তো আবার ক্রনিক একটা ট্রাবল আছে ।

যে আছে ।

তুমি আপাতত আমার মেয়েকে আর ছেলেকে পড়াতে থাকো । আমি শুনেছি তুমি ভাল টিউটর । কিন্তু আমার আরও কিছু জানবার আছে ।

আজ্ঞে, বলুন ।

জ্ঞানী মানুষটি হাসলেন । বললেন, প্রশ্ন করে সেটা হয়তো জানা যাবে না । কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যেই নুকোনো, অব্যবহৃত কিছু গুণ থেকে যায় । সে হয়তো সারা জীবন নিজের সেই গুণটার কথা জানতেই পারে না । গুণটা থেকেও নষ্ট হয় । তোমার ভিতর সেরকম কিছু আছে কিনা দেখতে হবে । তুমি জানো, তোমার সেরকম কিছু আছে কিনা ?

আজ্ঞে না ।

তুমি কি কথাটা বিশ্বাস করো ?

আপনি যখন বলছেন তখন—

জ্ঞানী মানুষটি প্রশ্নয়ের হাসি হাসলেন, আমার একটা ছোট ভাই আছে, সে খুব মদ খায়, লেখাপড়া শেখনি, খারাপ খারাপ কথা বলে । কিন্তু তার একটা সামাজিক গুণ আছে । সে মা-বাবাকে ভীষণ ভালবাসে । বাবাকে পাকা বাড়িতে রাখবে বলে ধারকর্জ করে ঘর তুলছে । বাবা-মায়ের যা খেতে ইচ্ছে করে, এনে দেয় । তার অনেক বড় দোষ থাকলেও, ওই একটা গুণে এখনও সে পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়নি । ওই ভালবাসা তাকে টগবগে চনমনে রাখে । ভালবাসার এই প্র্যাকটিক্যাল দিকটার কথা কেউ আজকাল ভাবে না, না ?

চয়ন আবার চুপ ।

জ্ঞানী মানুষটি তাঁর প্রগাঢ় গলায় বললেন, লোকে কত ভালবাসার কথা বলে, কিন্তু ভালবাসা কাকে বলে তা তার জানাই নেই । প্রেমিক প্রেমিকারা কত ভালবাসার কথাটপা বলে ঘর বাঁধে, তারপর তাদের ঝগড়ার জ্বালায় বাড়িতে কাকপক্ষী বসতে পারে না । ভালবাসার গভীরতায় যেতেই পারে না তারা । বাবা-মা ছেলেমেয়েদের কত ভালবাসে বলে তো! ভাল করে অবজার্ব কোরো, ওই ভালবাসার মধ্যে কতখানি স্বার্থপরতার ভেজাল মিশে আছে । ভালবাসতে গিয়ে সম্ভাবনের মনুষ্যত্বটাই পস্কু কয়ে দেয় তারা । যদি সত্যিই ছেলেকে কেউ ভালবাসে, তাহলে সেই ভালবাসার সূত্র ধরেই দুনিয়ার সব শিশুকই সে ভালবাসতে বাধ্য ।

যে আজ্ঞে ।

গুধু আমাকে অন্ধভাবে সমর্থন করে যেও না । ব্যাপারটা আর একটু তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করো । ধরো, আমি আমার বাচ্চা ছেলেটাকে খুব ভালবাসি । সাধারণত আমরা সেই ভালবাসার জন্য কী করি ? ছেলেকে এডুকেশন দিই, ক্যারিয়ার তৈরি করি, বিপদ-আপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করি, খারাপ সংসর্গে যাতে না পড়ে নজর রাখি, তাকে অটেল খেলনা দিই, পোশাক দিই, প্রশ্রয় আর আদর দিই, তাই না ?

ঠিকই তো!

অথচ ছেলেকে রেখে যাবো এমন একটা পৃথিবীতে যেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে ড্রাগ পেডলার, খুনে, ছিনতাইকারী থেকে শুরু করে আরও নানা বিপদ । ছেলেকে যদি সত্যিই ভালবাসি তাহলে দুনিয়াটাকেই সাফসুতরো করে রেখে যেতে পারলে নিশ্চিন্তে চোখ বোজা যেত । তাই না ?

যে আজ্ঞে ।

ছেলের মুখের হাসি অনাবিল করে তুলতে প্রকৃত ভালবাসে যে বাপ সে অন্য ছেলেদেরও মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলবে । নইলে কেবল আমার ছেলে, আমার ছেলে বলে হেঁদিয়ে মরলে তো হবে না ।

যে আজ্ঞে ।

জ্ঞানী মানুষটি মৃদু হেসে বললেন, আমি আগে খুব কম কথা বলতাম । অনেকে আমাকে বোবা বলে ভাবত । কিন্তু 'আজকাল এত কথা চলে আসে, যে মাঝে মাঝে আমি লজ্জিত হয়ে পড়ি ।

চয়ন মৃদুস্বরে বলল, আপনি যা বলছেন তা অতি সত্য ।

ব্যাপার কী, জানো, আজকাল আমার মনে হয়, কিছু কথা বলে না গেলে এগুলো অকথিতই থেকে যাবে । আমার কথা লোকে মানুক বা না-মানুক, উচ্চারণ করাটা দরকার ছিল ।

যে আজ্ঞে ।

তুমি ভালবাসার কথাটা মনে রেখো । যা কিছু দেখবে, যাকে দেখবে, তাকেই ভালবাসবার চেষ্টা কোরো । ভালবাসা মানেই কিছু ভাল করা । তার ভালর জন্য কিছু যদি না-ই করলে, তাহলে ভালবাসা বন্ধা হয়ে গেল, মিথ্যা হয়ে গেল ।

চয়ন জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ মানুষটির দিকে খানিকটা উদ্বেগ, খানিকটা বিস্ময় নিয়ে চেয়েছিল । ইনি বিজ্ঞানী, ইনি সারা দুনিয়ার বিশিষ্ট জ্ঞানীদের শ্রদ্ধার পাত্র, ইনি এসব নিয়ে ভাবেন কখন ?

জ্ঞানী মানুষটি কিছু তাক্ষিল্যের সঙ্গে বললেন, চাকরির জন্য ভেবো না । কিছু একটা হয়ে যাবে । তোমার ঘুমন্ত অভ্যন্তরে কী আছে তা খুঁজে দেখো । যদি কিছু পাও, আমাকে নিঃসন্দেহে বোলো । নিজেকে খুব কম মানুষই বুঝতে পারে ।

পার্থিব—১৮

যে আক্ষে।

মানুষের একটা অনাবিকৃত গুণ হঠাৎ আবিকৃত হয়ে তাকে চোখের পলকে বিশ্ববিখ্যাতও করে তুলতে পারে। কিন্তু আবিকার হওয়াটাই হচ্ছে প্রথম কথা।

যে আক্ষে।

যখন টাকার দরকার হবে, আমাকে বা মোহিনীর মাকে বোলো। লজ্জা করো না। আমরা বড়লোক নই, কিন্তু তোমার কাছেই মানুষ।

আক্ষে, মনে থাকবে।

জ্ঞানী মানুষটি একটি বড় শ্বাস ফেলে উঠলেন। উনি এখন বেরোবেন।

বিদায় নিয়ে মোহিনীকে এসে পড়াতে বসল সে।

মোহিনী চাপা গলায় বলল, কথা হল মাষ্টারমশাই?

হল। মোহিনী, তোমার বাবা একজন গ্রেট ম্যান।

পিভুগর্বে উজ্জ্বল হল মোহিনীর মুখ। সে বলল, কিসে বুঝলেন?

উনি একজন গভীর মানুষ। কত ভাবেন!

বাবাকে আমি খুব ভয় পাই। দূরের মানুষ তো! কিন্তু আমার বাবা যে ভীষণ ভাল তা আমি জানি।

ভাল বললে কিছু বলা হয় না। ভালর চেয়েও অনেক বেশী কিছু।

চাকরির কথা কী হল?

চয়ন একটু হেসে বলে, ওঁর কথা শুনে আমার চাকরি করতেই আর ইচ্ছে হচ্ছে না।

ওমা! সে কী চয়নদা? এত বলে-কয়ে মাকে পটিয়ে বাবার সঙ্গে বসালাম যে আপনাকে!

চয়ন লজ্জার হাসি হেসে বলে, ভয় নেই। একটা চাকরি জুটিয়ে দেওয়া ওঁর পক্ষে শক্ত কাজ নয়। উনি সেটুকু করবেন। কিন্তু আমাকে উনি খুব প্রভাবিত করেছেন আজ।

তাই বলুন! বলে মোহিনী নিশ্চিত হল।

তুমি তোমার বাবাকে কতটা চেনো মোহিনী?

সত্যি কথা বলব? মোহিনী মৃদু হেসে বলে।

বলো।

বাবাকে একদম চিনি না। বাবা এত ব্যস্ত! কাজে, চিন্তায় আর দৃষ্টিভ্রমে যে, বাবার কাছে ঘেঁষতেই পারি না। কখনো-সখনো একমাস দেড়মাসেও একটাও কথা হয় না।

বাবার কাছে চুপটি করে কখনও বসতে ইচ্ছে হয় না?

মাঝে মাঝে হয়। সাহস পাই না। সবসময়ে দেখি, বাবা কী নিয়ে যেন খুব টেনশনে আছেন। রাত জেগে বসে ভাবেন, পায়চারি করেন। মাঝে মাঝে ছাদে চলে যান। কখনও চুপ করে চোখ বুজে অনেকক্ষণ স্থির বসে থাকেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চয়ন বলে, ওরকমই হওয়ার কথা।

বাবা আমাদের কথা ভাবেন না। ভাবেন পৃথিবীর কথা, মহাকাশের কথা, ইনফিনিটির কথা।

তার মধ্যে তোমরাও আছে মোহিনী। সেই ভাবনার মধ্যে আমরা সবাই আছি।

॥ ৩৩ ॥

ছিনের মরার কথা ছিল না। রাতের শেষ বনগা লোকাল চলে যাওয়ার পর স্টেশন চত্বরের একটু বাইরে তাকে রিকশা থেকে টেনে নামিয়ে চারটে লোক কচাকচ কেটে ফেলল। রক্তে ভাসাভাসি হয়ে গেল জায়গাটা। এটা হল মঙ্গলবারের কথা। শুক্রবার রাতে মরল দিলীপ। বীণাপাণির বাড়ির কাছাকাছিই ক্ষেতের মধ্যে শনিবার সকালে মাঠ-বাউন্ডি লোকেরা তার লাশ দেখতে পায়। তিন টুকরো হয়ে পড়ে আছে। মাথাটা আলের ওপর আলগোছে বসানো। মুখে বীজৎস একখানা ভ্যাংচুনি স্থির হয়ে আছে।

দুটোই কাকার লোক। ছিনের বয়স উনিশ-কুড়ি। ডাকাবুকো। একটু বেশী মস্তানি করত। দিলীপের বয়স চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। কাকার টাকাপয়সার হিসেব রাখত। বিশ্বাসী। যেখানে খুন হল, তার একটু দূরেই তার বাড়ি। বাড়িতে বউ আর একটা বাচ্চা।

দুটো লাশই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখে এল নিমাই। এরা সব কাকার স্বাগলিং-এর লোক। যাত্রাদলের নয়। পাপা সিং-ই করছে, সবাই জানে। পাপা সিং-এর একটা লোক খুন হয়েছিল, তার বদলে দুটো লাশ নামিয়ে দিল। কিন্তু এতেও শোধবোধ হল কিনা সেটাই বোঝা যাচ্ছে না।

নিমাই ভাবিত হয়ে পড়ল। তার চোখের সামনে সর্বদা দু-দুটো লাশের দৃশ্য ভাসে। ঝাওয়ায় বড় অরুচি হল। ঘুমটাও হতে চায় না। ছিনের লাশটা তাকে বেশী ঘাবড়ে দেয়। ছেলেটার গলা, পেট, বুক সব ফাঁক। আলো হাওয়া ঢুকে পড়ছে শরীরের ফুটো দিয়ে।

এ সব বুঝে উঠতে নিমাইয়ের ভারি কষ্ট হয়। মারকাট ব্যাপারটাই তার বুঝ-সমঝে আসতে চায় না। ঝগড়া-কাজিয়া, দু' চার ঘা চড়-চাপড় অবধি ঠিক আছে। গালাগাল দাও, তাও না হয় সওয়া গেল। কিন্তু খুন জিনিসটা তার বোধবুদ্ধির চৌহদ্দিতে আসে না।

ছিনের বাবার একখানা ছোট দোকান আছে। বাজারের পিছন দিকটায়। ভাঙা কুঁড়ো ডাল, সস্তা চাল, খোল ভুসি, চিটে গুড়, নারকালের দড়ি, তামাক, কিছু দশকর্মের জিনিস এইসব নিয়ে দোকান। গরিবগুর্বো সব খন্দের তার। বিহারের

লোক। নামটি রামপ্রসাদ। মাথায় একটু টাক আছে, রোগা পাকানো চেহারা। রামুর দোকানে মাঝে মাঝে গিয়ে বসে নিমাই। রামু বেশ খাতিরও করে তাকে। বসায়, নানারকম কথা হয় দু'জনে। বাড়ি থেকে ঠেকুয়া বা ছাতুর লাডু এনে খাওয়ায় ছুটি পরবে বা জন্যটমীতে। ভুট্টার খই খাইয়েছিল একদিন। কিন্তু আসল কথা হল, রামু লোকটা ভাল। নিমাইয়ের গান শুনে ভারি খুশি হয়, ভাবে বিভোর হয়ে যায়। বাঙালী না হলেও বাংলা ভালই জানে। ছিনে তার দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে। মাঝে মাঝে বলে, আমার এই তিন নম্বর ছেলেটাই হারামি। ভক্ত গোছের, সরলসোজা রামুর সঙ্গে ইদানীং বড় ভাব হচ্ছিল নিমাইয়ের। বড় দুই ছেলের একজন দেশে, ক্ষতি গেরস্বী দেখে, আর একজন তিনটে মোষ নিয়ে দুধের কারবার ফেঁদেছে এখানেই। এক বউ দেশে, আর একজন এখানে। ছিনেকে স্বভাবের জন্য কয়েকবার বাড়ি থেকে তাড়িয়েছে রামু। ইদানীং ছিনে আর বাড়ি আসছিল না। পয়সা হচ্ছিল, তালেবর হচ্ছিল। একটু-আধটু নেশাভাঙও শুরু করেছিল বোধ হয়। রামু দৃষ্টিস্তা করত।

যা যুগটা পড়েছে, ছেলেপুলে হয়ে কোনও সুখ নেই। কোনটা পড়ল, কোনটা মরল, কোনটা গোপ্তায় গেল এই নিয়ে সারাক্ষণ বুকের মধ্যে ডুগডুগি বাজে। তবু রামুর একটেরে দোকানটায় গিয়ে বসলে ছায়া-ছায়া অঙ্ককার কাঁচা ঘরে নানা গন্ধের মিশেল দেওয়া বাতাস স্বাসে টেনে একটা আরাম বোধ করে নিমাই। সব জায়গা সমান নয়। একএক জায়গা যেন অন্যরকম। মনটা যেন বেশ স্থির, ভাল হয়।

ছিনের জন্য বড় কৈদেছে রামু। বড্ড কৈদেছে। সেটা না হয় বোঝা গেল, বাপ হয়ে ছেলের জন্য কাঁদবে না তো কী! কিন্তু নিমাইয়ের নিজের ঘরেও কান্নার একটা ঢেউ উঠেছে। বীণাপাণি দুটো খবরই কৈদে ভাসাল। নিমাই যতদূর জানে, ছিনে বা দিলীপের সঙ্গে বীণার তেমন ভাবসাব থাকার কথাই নয়। মেয়েরা এমনিতেই একটু কাদে। কিন্তু সেটা একটুই। এতটা নয়।

দিলীপের খুন হওয়ার দিনটায় নিমাই বলে ফেলল, অত কাঁদছো কেন বলো তো! দিলীপের সঙ্গে মুখচেনা ছিল বই তো নয়! ছিনের বেলাতেও বড্ড কাঁদলে। হঠাৎ এত কান্নায় পেল কেন তোমায়?

বীণা গম্ভীর মুখে বলে, চেনা ছিল তো!

তা থাকলেই বা!

বীণা জবাব দিতে পারল না। গুম হয়ে বসে রইল।

আর কিছু বলতে তেমন সাহস হয়নি নিমাইয়ের। ইদানীং বীণার মেজাজটা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। কিন্তু কেন হচ্ছে, তা নিমাই শত ভেবেও বের করতে পারে না। সেই যে লালনের একখানা গান আছে, সে আর লালন একখানে রয় লক্ষ যোজন ফাঁক, এ হল সেই বৃত্তান্ত। এক ঘরে বসবাস, এক বিছানায় শোয়া, মস্ত-পড়া বউ, তবু যেন বনগাঁয়ে থেকেও বীণা বিলেতের মতো দূরে। সব সময়ে নয়। এক এক সময়ে তাকে বেশ চেনা মেয়ে বলে মনে হয়। হাসি-ঠাট্টাও করে, তরল কথাটখা হয়। আদর-সোহাগও যে হয় না, তা নয়।

খুন দুটো নিমাইয়ের মাথাতেও চেপে আছে গন্ধমাদন হয়ে। তবে তার শোক নয়, ভারি দৃষ্টিস্তা হয়। ভয় হয়। অস্বস্তি হয়। সে খুনের ব্যাপারটা বোঝে না। ভগবানের দেওয়া মানুষের এই শরীরখানা, এখানার ওপর ছোরাছুরি চালায় আর একজন একইরকম শরীরওয়ালা লোক—এটা ভাবতেই তার ভারি অবাক লাগে।

সে বোকা বটে, কিন্তু যতটা লোকে তাকে ভাবে, ততটা নয়। এই যে খুনখারাপি হচ্ছে এতে কাকার পায়ের তলা থেকে মাটি সরছে। এটা সে বোঝে। সে বোঝে কাকা যদি দাঁড়িয়ে থাকতে না পারে তবে আর কারও না হোক, তাদের কপালে কষ্ট আছে। লোকটা দিলদরিয়া, টাকাকে খোলামকুটির সমান বিবেচনা করে। পালা যখন থাকে না তখনও দলের লোকদের দু'পাঁচশো করে মাইনে দেয়। টাকাটা বড় কম লাগে না তাতে। কলকাতার পেশাদার দলের মতোই বিশ্ববিজয়কে দাঁড় করানোর ইচ্ছে তার। কিন্তু এ যা শুরু হয়েছে, কাকার অবস্থা বিশেষ ভাল ঠেকছে না নিমাইয়ের।

কথাটা কাকাও বলে ফেলল রোববার বিকেলে। নিমাই গিয়ে বসেছিল কাকার বাজারের কাছে ঘরখানায়। ঘরে মেলা ভিড়, খুন দুটো নিয়েই নানা কথা হচ্ছিল। কাকা গুম মেরে ছিল সারাক্ষণ। বাজারে নানারকম কথা ওড়াউড়ি করছে। সবাই নানারকম বলে যাচ্ছে।

লোকজন সব গত হওয়ার পর কাকা আর সে রাত দশটা নাগাদ একসঙ্গে খানিকদূর এল। আর কেউ ছিল না সঙ্গে। কাকা হঠাৎ বলল, দলটা তুলে দিয়ে এবার বোধ হয় কলকাতাতেই সটকাতে হবে।

কাকার দুটো দল। একটা মধ্য গুণাদের। আর একটা নটনটীদের। কোনটায় কথা বলছে তা অবশ্য বুঝতে পারল না নিমাই। কলকাতায় সটকালে দুটো দলই উঠে যাবে। সে চুপ করে রইল।

কাকা বলল, শুধু নাটক আর পালা নিয়ে থাকব বলেই এখানে আসা। আর যত পাপতাপ সবই এর জন্য। কথাটা তুমি ভাল বুঝবে বলেই বলা।

নিমাই বলল, বুঝছি।

একটা ভুল থেকে কত ফঁেসো বেরোলো দেখ। পগাকে খুন করাটাই মস্ত ভুল হয়েছে। তার পর থেকেই অশান্তি।

আপনার সময়টা খারাপ যাচ্ছে।

সময় ভাল আর পড়ল কবে? বরাবরই খারাপ।

নিমাই সন্তপণে বলল, পুলিশ কিছু করবে না?

পুলিশ! বলে কাকা একটু চুপ করে থেকে বলল, ওইজন্যই তো বলি, তুমি বড্ড ভালমানুষ। কোন রাজ্যে থাকা? পুলিশকে তো আমি এ বেলো কিনি তো ওরা ওবেলা কেনো। এ দেশে থানা পুলিশ নিলাম হয়, বুঝলে? যার দর যত বেশী ওঠে, পুলিশ গিয়ে তার কাছে স্বয়ংবরা হয়।

নিমাইকে যতটা বোকা ভাবে লোকে, সে ততটা নয়। পুলিশ সম্পর্কেও নিমাইয়ের কিছু জানা আছে। কথাটা এমনি বলার জন্যই বলে ফেলেছিল। এবার বলল, আপনি তাহলে কীই বা করতে পারেন!

বনগাঁ সেই আগের মতো তো আর নেই! পাশ্টেছে। পাপা সিং টাকা ঢালছে। ছেলেছোকরাদের ভিড়িয়ে নিচ্ছে দলে। খুনটা যা দেখলে তার চেয়েও খারাপ জিনিস আছে। এরপর দলের ছেলেরা ভাগবে। তখন আরও বিপদ।

আপনি আর কিছ করতে পারেন না, না ?

দুনিয়াতে আমি একটা জিনিসই পারি। তা হল যাত্রা-থিয়েটার আর অভিনয়। ওটাই আমার কাজ। আর যা করি তার খানিকটা পেটের দায়ে, খানিকটা যাত্রাদলের স্বার্থে।

এসব নিমাইয়ের শোনা। সে একখানা ডাওয়াইয়া গান শুনেছিল, ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে। কাকার অবস্থা এখন তাই। এ লোকটার জন্য মায়া হয় তার।

একখানা তত্ত্বকথা বলব কাকা ?

বলো না! তোমার কথা আমার ভালই লাগে।

মনে রাখতে হয়, দুনিয়ার সবটুকুই আমার নয়, অন্যেরও ভাগ আছে। তেমনটাই ধরে নিন না।

ওটা কেমন কথা হল!

সেজা কথাই। এই যেমন আপনি আছেন, তেমনি পাপা সিংও আছে। সবাই ভাল হোক মন্দ হোক কিছু করে বাঁচবে। তাই না ? তা ধরে নিন, সব লড়াইতে কিছু হার কিছু জিত আছেই। এক এক সময়ে হারটাকেও জিত বলে ধরতে হয়। নইলে কঠিন হবে।

কথাটা বড্ড ধোঁয়াটে হয়ে গেল।

আজ্ঞে, আমি কথাগুলোকে তেমন শুছিয়ে বলতে পারি না। ওইটেই আমার দোষ। থাক, ভেবেচিন্তে পরে একসময়ে বলবখন।

তা বোলো। তোমাকে বুদ্ধি পরামর্শ দিতে বলি না। সে সব বিষয়বুদ্ধি তোমার ঘটে নেই, জানি। তবে তোমার লাইনের কথাই যদি বলে যাও আমার খারাপ লাগবে না।

তা জানি। আপনিও ভাল লোক। কিছুদিন গা-ঢাকা দিলে হয় না!

হয়। সেইজন্যই কলকাতায় যাওয়ার কথা ভাবছি।

সেটা ভাল বিবেচনা করলে যাবেন।

আমাকে চিৎপুরের দল সবসময়েই ডাকে। মোটা মাইনে, খাতির-যত্ন সব পাই। কিন্তু তাতে আর মন লাগে না। আমি হলাম একটা যাত্রাদলের মালিক, এর স্বাদই আলাদা।

আজ্ঞে।

দিলীপের বিয়ে হল এই সেদিন। আমার ভরসায় বিয়ে করেছিল। সে ঠাণ্ডা লোক। নিজে কোনও বিপদের কাজে যেতে সাহস পেত না। তবে বিশ্বাসী ছিল খুব। দু' পাঁচ লাখ টাকা ফেলে দিয়েও নিশ্চিন্ত। দিলীপ গিয়ে আমার অনেক ক্ষতি হল। একটা কাজ করতে চাও ?

কী বলুন না!

তুমি তো ধার্মিক মানুষ!

নিমাই লজ্জা পেয়ে বলে, কী যে বলেন আজ্ঞে। ধর্মটা করতে দেখলেন কখন!

দেখতে হয় না। মুখ দেখেই বোঝা যায়।

কাজটা কী ?

দিলীপের কাজটা করবে ?

বাপ রে!

ভয় পেলেন নাকি ?

ওটা পেরে উঠব না।

হাজার টাকা মাইনে পাবে। কাজ শুধু হিসেব রাখা আর বখরাটা শুনে ভাগ করে দেওয়া।

ওটি পারব না। মাপ করতে হচ্ছে।

পাপের টাকা বলে আপত্তি হচ্ছে তো! নিমাইচাঁদ, পাপের টাকাটাতেই জগৎসংসার চলছে।

নিমাই ভারি সংকুচিত হয়ে পড়ল। কথাটা বড় খাটি। কলিযুগে পাপের টাকার ছোঁয়াচ বাঁচানো শক্ত। ও শালা কলবার মতো সবাইকে ধরে ফেলে। সে একটু সংকোচের সঙ্গে বলে, কথাটা কি জানেন! আমার ইচ্ছে হয় একটু আলগোছ হয়ে থাকি। সব কাজে মনটা সায় দেয় না। নইলে আমিই কি একটা খুব সাধু ? আপনারা আমাকে ভাল দেখেন সে আপনাদের গুণ। আমার নয়।

বুঝছি। তুমি ভাল।

নিমাই সবগে মাথা নেড়ে বলে, ভাল কথাটা বলবেন না। বরং বলুন বোকা। আমি বোকা লোক। আজকাল ভাল হতে চাইলেই বোকা। বউয়ের পয়সায় খাই, বনের মোষ তাড়াই। মাঝে মধ্যে আবার ভাবি, বউ পয়সা পাচ্ছে কোথেকে ? না যাত্রা থেকে। তা যাত্রায় পয়সা আসছে কোথেকে ? না স্বাগলিং থেকে। তাহলে হরদরে কাশ্যপ গোত্রই দাঁড়ায়। ও যদি পাপ হয়, তবে আমিও পাপের পয়সাতেই প্রতিপালন হচ্ছি। তাই না ?

অন্ধকারে ভাল বোঝা গেল না, তবে কাকা বোধ হয় একটু হাসল। বলল, এই হচ্ছে তোমার লাইনের কথা। কাজের নয়, তবে শুনতে ভাল।

আজ্ঞে।

একটা কথা বলি নিমাই।

বলুন না!

তুমি না করো, কাজটা বীণা করুক। ওর হিসেব নিকেশের মাথা আছে। তোমার আপত্তি নেই তো ?

বীণা কি আমার কথামতো চলে নাকি ? তার ইচ্ছে হলে করবে।

তুমি একবার বলে দেখো।

আজ্ঞে বললেই রাজী হবে। তার অত শুচিবায়ু নেই।

ওকে আমার বেশ বিশ্বাস হয়। তেমন কিছু করতে হবে না। টাকাটা হেফাজতে রাখবে। প্রয়োজনমতো দেবে একে ওকে। যেমন আমি বলব।

মেলা টাকা নাকি ?

তা একটু বেশী তো বটেই।

আমার তো ভাঙা ঘর। চোরের লাথিতে বেড়া ভেঙে পড়বে।

টাকা আমার সিন্দুকে থাকবে। হিসেব রাখাটাই ওর কাজ।

বলব'খন।

কাকাকে বাড়ি অবধি এগিয়ে দিয়ে একা যখন আঁধার পথে বাড়ি ফিরছিল নিমাই তখনই ঠিক করেছিল, বীণাকে প্রস্তাবটা দিয়ে দরকার নেই। বীণার সব ভাল, কিন্তু দুর্বলচিত্ত। লোভ সামলাতে পারবে না।

বীণা সম্পর্কে কথাটা হঠাৎ কেন মনে হল, তা ঠিকঠাক বলতে পারবে না নিমাই। বীণাকে সে কখনও সেরকম কিছু করতে দেখেনি। তবু কথাটা মনে হল। সে প্রস্তাবটা বীণাকে না দিলেও কিছু নয়। কাকা হয়তো কালই বীণাকে নিজে থেকেই চাকরির প্রস্তাব দেবে। তখন ?

বাড়ি ফিরে রাতে শোওয়ার সময় সে বলেই ফেলল, কাকা তোমাকে একটা কাজের কথা বলতে পারে। কাজটা নিও না।

কী কাজ ?

যে কাজটা দিলীপ করত।

বলো কী! আমাকে কাকার অত বিশ্বাস হবে ?

নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, কাজটা আমাকে দিতে চেয়েছিল। আমি রাজী হইনি। ও কাজ ভাল নয়।

কত মাইনে দেবে ?

নিমাই নিস্তেজ গলায় বলে, তুমি কাজটা নেবে বলে ভাবছো নাকি ?

তবে কি হাত-পা কোলে করে বসে থাকব ? পুজোয় মোটে তিনটে না চারটে বায়না হয়েছে। অপেরার অবস্থা তো ভাল নয়। পেট চলবে কি করে ?

তা বটে।

মাইনের কথা কিছু বলেনি ?

বলেছে। হাজার টাকা।

ও বাবা! তা হলে তো চমৎকার প্রস্তাব। হ্যাঁ গো, এতেও তোমার গোমড়া মুখে হাসি ফুটছে না ?

বড় ভয় পাই যে।

তুমি ধর্মভীরু মানুষ, বেশ কথা। কিন্তু ভেবে দেখ তো, আমি কি স্বাগলিং করতে যাচ্ছি ? আমি তো শুধু হিসেব রাখব। টাকা পয়সা গুনে-গেঁষে তুলে রাখা এ তো আর কোনও পাপের কাজ নয়!

ও কথাটা ঠিক হল না। যত সাদামাটা ভাবা যাচ্ছে ততটা সাদামাটা নয়। এতে করে তুমি কাকার স্বাগলিং-এর দলের লোক হয়ে যাচ্ছে। ওদের সঙ্গেই ওঠাবসা করতে হবে।

তা তো এমনিতোও হয়। কাকার দলের গুণারা কি আর ঘোমটা দিয়ে থাকে নাকি ? পাগলু, বিশ্বনাথ, চারু ওরা তো স্বাগলিং করে আবার যাত্রাও করে।

তবু একটু ভেবে দেখো। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো।

শোনো গো যুধিষ্ঠির, আমাদের টাকার দরকার। টাকার গায়ে পাপ-পুণ্য ছাপ মারা থাকে না। আর যদি পাপ হয় তো আমার হবে, তোমার তো হবে না! তুমি আমার শালগ্রাম শিলাটি হয়ে থেকে। উঃ, হাজার টাকা মাইনে, শুনেই আমার গায়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

লোভে পড়লে বীণাপাণি! একটু ভাবো।

অনেক ভেবেছি। ভেবে ভেবে মাথা ঝাঁঝরা হয়ে গেল।

পাপ ছাড়াও কথা আছে। সেটা হল বিপদ-আপদ। পাপা সিং কাকার পিছনে লেগেছে দেখছো তো! দু-দোটে মার্ডার হয়ে গেল। এ সব মনে রেখে তবে কাজটা নেবে কিনা ঠিক করো।

বিপদের কথা বলছো! বিপদ তো আমাদের বন্ধু মানুষ। কবে বিপদ ছিল না আমাদের ? তুমি এত ভগবান মানো আর এটা জানো না, আমাদের ভাল মন্দ যাই হোক ভগবান ভরসা। বিপদ হলে তিনি দেখবেন। জেনেওতো তো আর পাপ করতে যাচ্ছি না।

তা বটে। তবে পাপের কাছ ঘেঁষেই বাস করতে হবে। আমার বড় ভয় করে।

বীণাপাণি তাকে জড়িয়ে ধরে একটু আদর করে বলে, তোমাকে আমার এইজন্যই মাঝে মাঝে বড় বকতে ইচ্ছে হয়। তুমি এমনধারা কেন গো! সব সময়ে পাপের ভয়ে সিঁটিয়ে থাকো, জড়োসড়ো হয়ে থাকো! আজ্ঞা একটু পাপ-টাপ না করলে পুণির জোরটাই বুঝবে কি করে ?

কত পাপ আপসে মাপ হয়ে যাচ্ছে। পায়ের তলায় পিঁপড়েও তো কত মরে। মশা মারতে ইচ্ছে যায় না, তবু দেখ, চুলকাতে গেলুম, আঙুলে লেগে পুচ করে একটা রক্তে টুপটুপে মশা মরে গেল। এরকম তো কত হয়।

উঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারি না আমি। পাপ-পাপ করতে করতে মাথাটা না খারাপ হয়ে যায়। ওগো, সেই কিসে যেন আছে না, একবার কৃষ্ণনামে যত পাপ হরে। মানুষের সাধ্য নাই তত পাপ করে।

আছে। বোধহয় চৈতন্যচরিতামতে।

তাহলে ? তুমি তো সারাদিনে কতবার হরির নাম করো, কৃষ্ণের নাম করো। তোমার কি আর পাপ থাকে ? তুমি হলে গঙ্গাজল। যতই ময়লা ফেল গঙ্গাকে কি অপবিত্র করতে পারবে ?

ও শুনলেও পাপ হয়। আমাকে সবাই সাধু ভাবে কেন বুঝি না! অত সাধু তো আমি নই।

নিমাইয়ের নাকটা আদর করে টিপে ধরে বীণাপাণি বলে, সাধু না, তুমি হলে একটি বিষ্ণু। তবে বিষ নেই।

তা বটে।

আমি যখন পাপ করব তখন তুমি কৃষ্ণনাম কোরো। তাহলে আমার পাপও কেটে যাবে। সাধুর বউয়ের পাপ হয় না।

নিমাই অন্ধকারে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বীণাপাণি বলল, ও কি ? অত বড় দীর্ঘশ্বাসটা ফেললে কেন শুনি ? কী এমন খারাপ কথাটা বললাম ?

চাকরিটা কি সত্যিই নেবে বীণাপাণি ?

তুমি ওরকম করো না তো। হাজারটা টাকা মাসে মাসে যদি হাতে আসে তাহলে কত কী করা যাবে! এবার তোমার দোকানটার কথাও ভাবতে হবে। একদিন যদি দোকানটা দাঁড়ায় তাহলে সব ছেড়েছুড়ে দেবো, দেখো।

কথাটা শুনতে সুন্দর, কিন্তু সত্য নয়। নিমাই জানে, বীণাপাণি ঘর গেরস্থালির মধ্যে নিজেকে আর আঁটিয়ে নিতে পারবে না। তা সেও সহিবে নিমাইয়ের। কিন্তু কাকা যে চাকরির কথা বলছে তা যে বড় যন্ত্রণা দিচ্ছে তাকে!

নিমাই খুব মৃদুস্বরে বলে, কি জানো বীণাপাণি, বেকার লোকদের কোনও মতামত থাকে না। সে হল খাঁচায় পোষা পাখি। যে দানাপানি দেয়, সে যা শেখাবে তাই বলতে হবে।

বীণাপাণি একটু চুপ করে থেকে ঝাঁঝালো গলায় বলে ওঠে, বলতে পারলে তুমি কথাটা ? মুখে এল ? তোমার জন্য এত করার পরও এই তার প্রতিদান ?

নিমাই খুব করুণ গলায় বলে, রাগ করো না বীণাপাণি। তোমার রাগকে আমি বড় ভয় পাই। আমার অবস্থাটা কি তুমি বোঝো না ?

খুব বুঝি। কিন্তু তুমি আহাশ্বক বলেই তোমার সব কথা মেনে চলি না। কাকার তো স্যাঙাতের অভাব নেই। সবাইকে ছেড়ে কেন আমাকেই চাকরিটা দিতে চাইছে বলা! এটাকে ভগবানের আশীর্বাদ বলে ধরে নিতে পারছো না ?

চাকরিটা কাকা আমাকেই দিতে চেয়েছিল প্রথমে। আমি রাজী হইনি বলে তোমার কথা তুলল।

ওই একই কথা।

কাকার ধারণা, আমি ধর্মভীরু লোক, টাকা এদিক ওদিক করব না।

আমিই কি তা করব ?

তা বলিনি। আমি বলছি কাজটার বিপদ আছে, লোভ আছে, বিশ্বাস-অবিশ্বাস আছে।

থাকুক। বিপদের কাজগুলোও তো মানুষকেই করতে হয়, নাকি ?

তা হয়। বলে নিমাই চুপ মেরে গেল।

দিন সাতেক বাদে এক সকালে নিমাই রামপ্রসাদের দোকানে বসে ছিল। দুনিয়াটা খুব অদ্ভুত। কত কী ঘটে যায়, কিন্তু জলে দাগ কাটার মতো মিলিয়েও যায়। রামপ্রসাদ একটু রোগা হয়েছে হয়তো, কিন্তু আর সবই ঠিক আছে। তাকে দেখে হাতজোড় করে বলল, রাম রাম নিমাইবাবু। বসুন।

মুখবীণা একটা ডালের বস্তার ওপর বসে পড়ল নিমাই। তেমনি ছায়া-ছায়া দোকানখানা, ভারি নিরিবিলি, তেমনি সব গন্ধের মিশেল দেওয়া বাতাস। নিমাই একখানা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কেমন আছেন রামপ্রসাদদাদা ?

ছিনেটা চলে গিয়ে মনটা ভাল নেই দাদা। কাজ কারবারে মন ভি লাগে না।

সে তো ঠিক কথা। সময় লাগে। সময়ে সব ঠিক হয়ে যায়।

ওই শালা কাকা এক নম্বর বদমাশ লোক। কত ছেলেছোকরার সর্বনাশ করল। এখন পাপা সিং যদি ওর কলিজাটা উথরে লেয় তো আমি খুশি হই।

নিমাই জানে বাজারে কাকার তত সুনাম নেই। সে মৃদুস্বরে বলে, পাপের ঠিকানা পাণি নিয়ে নেবে। আপনি আমি তো পেরে উঠব না।

ওটা ঠিক কথা। কিন্তু পাপা সিং কাকাকে ভি লিবে। দেখবেন।

নিমাই বসে বসে খানিকক্ষণ ভাবল। বীণাপাণি কাকার চাকরি এখনও শুরু করেনি। তবে এইবার করবে। কথা পাকা হয়ে গেছে। কাকা অবশ্য তাকে বলেছে, কাজটা তুমি নিলেই আমি বেশী খুশি হতাম নিমাই।

একটা লোক দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাল। তারপর রামপ্রসাদকে একটা ঠিকানা জিজ্ঞেস করল। নামটা শুনেই নিমাই একটু সচকিত হল। লোকটা তারই নাম বলছে যে!

নিমাই বস্তা থেকে নেমে এসে একটু আগু হতেই চিনতে পারল। মস্ত কুটুম। বীণাপাণির সেজদা রামজীবন।

আরে দাদা যে!

রামজীবন নিশ্চিন্তির শ্বাস ফেলে বলে, বাঁচা গেল। ভাবছিলাম কত না জানি ঝুঁজতে হবে!

চলুন, বাড়ি চলুন। রিকশা ডাকি।

বাড়ি আসতেই রামজীবনকে দেখে একদফা কেঁদে ভাসল বীণা। এতদিনে মনে পড়ল আমাকে ? আমি যে বেঁচে আছি তা জানিনে তোরা ?

রামজীবন যখন মদ খায় তখন একরকম, কিন্তু যখন খায় না তখন তার মতো ভালমানুষ নেই। বীণার যাতায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, কাদিস না! তাকে কি কেউ ভুলতে পারে ? কত আদরের ছিল। বড়দা এই কাপড় দিয়ে গেছে। দেখ খুলে।

বীণা হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা বুকে জড়িয়ে ধরল, বড়দা দিয়েছে ?
এসেছিল হঠাৎ করে। সকলকে অনেক দিয়ে-থুয়ে গেল।
শাড়িটা খুলে মুখখানা আলো হয়ে গেল বীণাপাণির।

॥ ৩৪ ॥

ফুলে এবং কলেজে বরাবর পরীক্ষায় সে একটা রচনার জন্য অপেক্ষা করেছে। তোমার প্রিয় ঋতু। রচনাটা কোনওকালেই আসিনি, এলে মণীশ যা লিখত তাতে নম্বর পাওয়া যেত কিনা তা সে জানে না, তবে একটা পুরো খাতা বোধ হয় শেষ করে ফেলত রচনা দিয়েই। শরৎকাল তাকে পাগল করে দেয়, যৌবন ফিরিয়ে আনে, শৈশব এসে হাত ধরে। লোকে বসন্তের গুণগান যে কেন করে তা বুঝে উঠতে পারে না সে। কালিদাসও করেছিল। আস্থা ছানিপড়া চোখ বাবা, এমন শরৎ ঋতুর কাছে কি বসন্ত লাগে ? বসন্তের বিরুদ্ধে তার কোনও নালিশ নেই। কিন্তু শরৎ সবার উর্ধ্বে। চির শরতের কোনও দেশ থাকলে মণীশ সেখানকার সিটিজেনশীপ নিয়ে ফেলত।

আজ যখন তার দুই মেয়ে আর এক ছেলের মা অপর্ণা সকালবেলায় জানালা খুলে দিল তখন ঘুমচোখ বুজে থেকেই সে অনুভব করতে পারল শরৎ ঋতুকে।

অপু!

বলো।

আমি যেন শরৎ ঋতুতে মরি।

মা গো! সকালে উঠেই মরণের কথা মুখে এল ? তুমি কী গো ?

মণীশ উঠে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। ডাকল, অপু, আমার কাছে এসো, এখানে দাঁড়াও।

অপর্ণা বিছানাটা দ্রুত হাতে পাট করছিল। বলল, আসছি।

এফুনি।

অপর্ণা এল। পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল, কী গো ?

এই শরৎকালকে কেমন লাগে বলো তো তোমার ?

আহা, কেমন আবার লাগবে! আমি কি তোমার মতো ভাবের মানুষ ? ঋতু কোথা দিয়ে চলে যায় টেরই পাই না।

বেশ বেরসিক আছে! কিছু। পৃথিবীটাকে কেন অনুভব করো না বলো তো ?

আমাকে অনুভব করার মতো অবস্থায় রেখেছে কিনা! যা খেলা দেখালে কয়েকদিন। ভয়ে আধমরা হয়ে ছিলাম।

তুমি এখনও শকটা কাটিয়ে উঠতে পারোনি, না ? কেন অপু ? বিপদ-আপদ তো আসতেই পারে।

তুমি তো জানো না, তুমি কতখানি জুড়ে আছে আমার ভিতরটা। আমাদের তুমি ছাড়া আর কী আছে বলো।

মণীশ হাসল, বলল, এটোতো ভালবাসার কথাই অপু। কিন্তু একটু স্বার্থপরতার গন্ধ আছে, তোমার জগতে মোট চারজন লোক। আমি, বুবকা, ঝুমকি আর অনু। তার বাইরে আর কেউ নেই, না ?

একটু গম্ভীর হতে গিয়েও অপর্ণা হাসল, এই বুঝি আমাকে চিনেছে ? তুমি কি ভাবো আমি আর কারও জন্য চিন্তা করি না ?

করো ? তাহলে তোমার ভালবাসার একটু কণা আজ এই শরৎ ঋতুকে দাও। কলকাতায় প্রকৃতি নেই, তবু দেখ, রোদে কী এক অদ্ভুত সোনার মতো রং। আকাশ কী রকম অলৌকিক নীল!

অপর্ণা মুখ তুলে দীর্ঘকায় মণীশের দিকে চেয়ে বলে, প্রকৃতি দেখতে চাও ? তাহলে চলো রবিবার আমাদের জমিটা দেখে আসি। কত গাছপালা আপনা থেকেই হয়েছে। আমার লাগানো গাছগুলো কুটিপাটি হচ্ছে ফুলে। চুরি হয়ে হয়েও রাশি রাশি শিউলি ফুল ছড়িয়ে থাকে ঘাসে।

ওঃ, তোমার সেই কপণের চার কাঠা জমি ?

মোটাই কপণের জমি নয়। সস্তায় কিনেছি বলে কি দোষ হয়েছে ? একদিন দেখো ওই চার কাঠার কী দাম হয়।

তোমাকে নিয়ে আর পারি না। সব জিনিসেরই দামটাই কেন তোমার মনে আসে ? এই যে শরতের দারুণ মোহময় একটা সকাল এর কি কোনও দাম হয় ?

তোমার হল ফটোগ্রাফারের চোখ। তোমার মতো করে কি সব কিছু আমি দেখতে পাই ?

না অপু, এই যে আলোটা, এই যে চারদিকের বাতাবরণে একটা ম্যাজিক্যাল চেন্স, কোনও ফটোগ্রাফারের সাধ্য নেই তা ছবিতে ফুটিয়ে তোলে। কোনও মহৎ শিল্পীও পারে না, কবিও পারে না, কেউ পারে না। যে পারে সে ওই প্রকৃতি। তার মতো আর্টিস্ট আর কে আছে বলো!

একটা পাগলকে নিয়ে আমার ঘর। উঃ, শরৎকাল আমারও ভাল লাগে, বাপু, তা বলে তোমার মতো পাগল হয়ে যাই না।

কেন হও না অপু ? কিছুতেই কেন কখনও তুমি পাগল হও না ?

অপর্ণা হেসে ফেলল, বলল, বাড়িতে একটা পাগলই কি যথেষ্ট নয় ? পাগল বাড়লে সংসারটা কি চলবে ? তবে ভেবে না, তোমার পাগলামির অনেকটাই তোমার ছেলেমেয়েরাও পেয়েছে।

খুব ভাল অপু। সবাই মিলে তোমাকেও একটু পাগল করব এবার থেকে।

করতে হবে না। পাগল হতে আর বাকিই বা কী ? শোনো, আজ অফিসে জয়েন করবে মনে রেখো, নটা পনেরোতে পুল কার চলে আসবে। তৈরি হতে থাকো। বাথরুমে ঢুকলে তো চল্লিশ মিনিট।

মণীশ হতশায় মাথা নেড়ে বলে, নাঃ, তোমাকে পাগল করা যাবে না অপু। ইউ আর এ স্টার্বোর্ন পারসন।

মণীশ বাথরুমে গেল।

অপর্ণা ধীর পায়ে মণীশের ঘর ছেড়ে ঢুকল বুবকার ঘরে। ছেলেটা পাশ-বাঁশি আঁকড়ে ধরে গভীর ঘুমে ঢলে আছে। মাথাটা বাঁশি থেকে পড়ে গেছে নিচে। অপর্ণা ছেলের ঘুমন্ত মুখের দিকে একটু চেয়ে থাকে। ওপরের ঠোঁটের সীমানায় কোমল গোঁফ। গালে সামান্য দাড়ি, এখনও শেভ করতে শুরু করেনি। এবার করবে। আদরের কোলের ছেলেটা বড় হল। হোক। অপর্ণার ডিতা অন্য জায়গায়। বোকা ছেলেটা কুলের বাইরে সেদিন মারপিট করে এসেছে। ড্রাগ বিক্রি করে যারা তাদের সঙ্গে। এ সব কি ভাল? আপাই বা কেন ওসব ষগাওগাদের পিছনে লাগতে গিয়েছিল? যদি এবার তারা উল্টে মারে? যদি মেরেই ফেলে? অপর্ণার জীবনে এইসব কারণেই কোনও শান্তি নেই।

ঘটনাটা সে মণীশকে বলেনি। মণীশ আকষ্ট ভালবাসে ছেলেকে। শুনলে টেনশন হবে।

বুবকাকে খুব বকেছিল অপর্ণা সব শুনে। বুবকা তাকে এখনও সব কথা বলে। বকুনির পর বুবকা অবোধ শিশুর মতো জিজ্ঞেস করল, তাহলে কি করা উচিত ছিল মা? আপাকে ওরা যে মারছিল! আমার কি চূপচাপ চলে আসা ভাল হত?

অপর্ণা এ প্রশ্নের সরাসরি জবাব দিতে পারেনি। শুধু বলেছিল, তোমাদের উচিত ছিল আপাকে জোর করে আটকানো, ওর এত সাহস কেন?

সাহসের জন্যই তো আপা হল আপা। আমরা কেউ আপনার মতো নই কেন মা?

ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে অপর্ণা বলল, আজকাল দিন ভাল নয় বাবা, গুগরা বোমা মারে, পিস্তল চালায়, ছোরা বসিয়ে দেয়। আমি বড় ভয় পাই, তুই বরং ওই ইঙ্কল ছেড়ে দে।

তুমি একদম পাগলী আছো। কুল ছাড়ব কেন? আমরাও পাল্টা গুগামি করব।

অপর্ণা অবাক হয়ে বলে, গুগামি করবি? ও কথা বলতে আছে?

ভেবে দেখেছি মা, গুগামি ছাড়া কিছু করার নেই। আমরা অলরেডি কুলে একটা প্রতিরোধ বাহিনী তৈরি করেছি।

আতঙ্কিত অপর্ণা বলল, না বাবা, না। তুমি ওসবের মধ্যে থেকে না। আমি আপাকেও বলব তো। ও কেন এই গুগোল পাকাল!

আপা কিছু খারাপ তো করেনি মা!

করেছে। ও তুমি বুঝবে না। ওকে আসতে বলিস তো!

বুবকা হাসল, আপা আমাদের সঙ্গে রাগ করে কথাই বলে না। ও বলছে আমরা নাকি ওর মিশনটাই নষ্ট করে দিয়েছি। আপাটা একটা ভূত।

কিছুক্ষণ বুবকার শান্ত মুখখানার দিকে চেয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে এল অপর্ণা। অনেক কাজ। মণীশ আজ প্রথম অফিসে যাচ্ছে দীর্ঘ ছুটির পর।

মণীশ স্নান করে যখন তৈরি হয়ে এসে টেবিলে বসল তখন তাকে খাবার বেড়ে দিতে দিতে অপর্ণা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, আপা মেয়েটাকে তোমার কেমন লাগে বোলা তো!

আপা! শী ইজ এ ক্লাস বাই হারসেলফ্। কেন?

এমনিই। জানো, ও নাকি ওদের কুলে কয়েকজন ড্রাগ অ্যাডিক্টকে ধরেছে। তাদের বাঁচাতে ড্রাগ পেডলাররা এসে আপাকে অ্যাটাক করেছিল।

মণীশ বিস্মিত মুখে বলে, সর্বনাশ! কবে?

কয়েকদিন আগে।

তারপর?

কুলের ছেলেরা গিয়ে পেডলারদের মেরে তাড়ায়।

দ্যাটস গুড। তাড়াল কেন? মেরে আধমরা করে পুলিশে দেওয়া উচিত ছিল। এমন কি মেরে ফেললেও ক্ষতি ছিল না। দে ডিজার্ড ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট।

ছেলেদের দলে যে বুবকাটাও ছিল।

ছিল? আই ফিল প্রাউড ফর হিম। দরকার হলে আমাকেও দলে নিতে পারে।

তুমি মারপিট করবে?

আলবাৎ। এক সময়ে আমি সেন্ট্রাল ক্যালকাটায় অলিতে গলিতে মারপিট করতাম। সিনেমা হল-এ, বাসে, ময়দানের খেলার লাইনে।

ওঃ, তাই বোলা। সেইজন্যই ছেলে সেটা পেয়েছে।

কেন, তুমি কি জানো না নাকি?

জানি। তবে মনে ছিল না।

শান্ত গৃহস্থ হয়ে গেছি সখি, কিন্তু ভিতরে এখনও আগুনটা নিবে যায়নি। খুঁচিয়ে তুললে আবার গনগনে আঁচ উঠবে।

তুমি ছেলেকে সাপোর্ট করছো?

একটু করছি। তবে আত্মীয় বা গোঁয়ারত্বমি ভাল নয়। ড্রাগ পেডলাররা অর্গানাইজড ক্রিমিনালস। ওদের সঙ্গে

লাগতে গেলে নিজেদেরও অর্গানাইজড হতে হবে।

শোনো, আমি বলি কি, বুবকার কুলটা চেঞ্জ করে দাও।

কেন বোলা তো! এত ভাল কুল!

নিপদ হতে কতক্ষণ?

শোনো অপু, আমি কিন্তু কোনওদিন ভয়টয় পাইনি। তোমাকে উদ্ধার করেছিলাম পুলিশের গুলির মুখে দাঁড়িয়ে। মনে আছে?

ওগো, ওসব কথা ভুলে যাও। বুবকা আমার একটা মাত্র ছেলে।

বুবকা আমারও একটা মাত্র ছেলে।

তাও ওকথা বলছ?

মণীশ শান্ত গলায় বলে, ভয় পেও না অপু। পুলিশের এক বড় কর্তা আমার বিশেষ বন্ধু। তাকে আজই একবার লালবাজারে ফোন করব। আমি যখন ফ্রিল্যান্স ফটো জার্নালিস্ট ছিলাম তখন থেকে বন্ধু।

কে বলে তো!

বিনয় মিত্র। তুমি চিনবে না। নর্থ বেঙ্গলের ছেলে। স্পোর্টসম্যান ছিল। সে অ্যাকসন ভালবাসে।

উঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারি না। পুলিশ কি আজকাল কিছু করতে পারে? অর্গানাইজড ক্রাইমের কথা তো তুমিই বললে। যারা অর্গানাইজড তারা কি পুলিশকে ভয় পায়? পুলিশ তো তাদেরই লোক হয়ে যায়।

এ লোকটা পারচেজেবল নয়। অন্তত তিনচার বছর আগেও ছিল না।

দোহাই তোমার, এর মধ্যে পুলিশকে টেনে এনো না। তাহলে ভিমরুলের চাকে ঢিল মারা হবে।

মণীশ একটু হাসল। বলল, মন্দ বলোনি। আমার চেয়ে তোমার গ্র্যাটিক্যাল বুদ্ধি বরাবর বেশি ছিল। আচ্ছা, বুবকাকে আমি একটু সাবধান করে দেবোখন।

এখনই দাও। আমি ওকে ডাকছি।

আচ্ছা বাবা, আচ্ছা।

বুবকা এল। ঘুম-চোখে বাবার কাছটিতে এসে দাঁড়িয়ে অনেকটা শিশুর মতোই বলল, কি বাবা?

বোস। কী হয়েছে, ব্রিফল বলতো!

ইকুলের ব্যাপারটা? নাথিং মাচ।

মারপিট করেছিস?

একটা লোককে হকি স্টিক দিয়ে মেরেছি।

খুব জোরে মেরেছিস?

খুব জোরে। লোকটা খোঁড়াছিল।

আমি হলে মাথায় মারতাম। অজ্ঞান করে দিতাম।

আমি এই প্রথম একজনকে মারলাম বাবা, অ্যাড আই এনজয়েড ইউ।

আই নো। কিন্তু একটা কথা।

কী কথা বাবা?

মারপিট একবার শুরু হলে সহজে থামে না। আজ মেরেছো, কাল কিন্তু মার খেতে হবে। আর ইউ রেডি ফর দ্যাট?

হ্যাঁ বাবা। আমরা এখন স্কুলের চারদিকে নজর রাখি। দল বেঁধে বেরোই।

কখনও একা বেরোবে না।

কিন্তু টিউটোরিয়াল থাকলে? তখন তো সব বন্ধুকে পাওয়া যাবে না।

তাহলে শ্রবলেম।

আমি কিন্তু ভয় পাই না। মা ভয় পায়।

ভয় পাওয়া ভাল নয়। তবে বিচক্ষণ হওয়া ভাল। স্কুলের অথরিটি কী করছে?

কি করবে? তারা তো আর মারপিট হলে ঠেকাতে পারবে না।

তুই আমাকে ভাবিয়ে তুললি। মুশকিল কি জানিস, এ দেশে বাস করে কয়েক কোটি ভেড়া আর কয়েকটা বাঘ। এক লক্ষ ভেড়াও একটা বাঘ দেখলে পালায়। তোকে রাস্তায় যদি গুগারা মারে রাস্তার অন্য লোকেরা মুখ ফিরিয়ে পালাবে।

বুবকা হাসল, আমি কিন্তু ভেড়া নই।

সেটা বুঝতে পারছি। কিন্তু তুই ভেড়ুয়া হলেই তোর মা বেশি নিশ্চিন্তে থাকতে পারত।

অপর্ণা চোখ বড় বড় করে দুজনের কথোপকথন শুনছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আচ্ছা, তুমি কী গো? কোথায় তোমাকে বললাম ওকে একটু বুদ্ধি বলেতে যাতে বিপদের মধ্যে না যায়, আর তুমি ওকে গুগামি করতেই উৎসাহ দিচ্ছো?

মণীশ অপর্ণার দিকে ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে বলল, দুনিয়াটা তো ওরও। বিপদ-আপদের মধ্যেই ওকে বেঁচে থাকতে হবে। আমরা যেমন করে শেখাবো সেরকম শিখলে ওর হয়তো চলবে না। দুনিয়াটা পাটে যাচ্ছে অপু।

দুনিয়ার অনেক কিছু পাল্টায়, কিন্তু অনেক কিছু আবার কোনওদিনই পাল্টায় না। সেটা হল মা আর ছেলের সম্পর্ক। বুঝলে? আরও একটা জিনিস পাল্টায় না, সেটা হল গুঁ ম করাটা যে খারাপ সেই বোধটা।

মণীশ ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলে, ঠিক আছে বুবকাবাবু, আপনি আর মারপিটের মধ্যে যাবেন না। লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাকবেন।

বুবকা শিশুর মতো মুখ করে মায়ের দিকে চেয়ে বলে, মা তুমি তো দেখনি যখন গুগারা আপাকে মারছিল। যদি দেখতে তাহলে তুমিও হকি স্টিক নিয়ে ঝাপিয়ে পড়তে। আপা একটা রোগা ভাল মেয়ে, তাকে ওরকম মারতে পারে কোনও মানুষ? আর কী সব খারাপ গালাগাল করছিল!

অপর্ণা আদর মাখানো গলায় বলে, আচ্ছা, তুই বল তো, আমি কি গুগাদের সাপোর্ট করছি? আপাকে মারা তো খুবই খারাপ হয়েছে। কিন্তু তোরা ওদের সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠবি না। ওরা খুনে।

বুবকা ফের তার সরল মুখখানা তুলে বলল, মা, ব্যাপারটা আরও খারাপ। ওরা শুধু গুগা নয়, ওরা ছেলেদের ড্রাগ ধরিয়ে দিচ্ছে। আমাদের স্কুলের কত ছেলে ড্রাগ নিচ্ছে জানো? ওদের কি নন-ভায়োলেস দিয়ে ঠেকানো যায়?

অপর্ণা ঝাঁঝালো গলায় বলে, তার জন্য পুলিশ আছে। তোমাদের কী দরকার আইন হাতে নেওয়ার ?
আমরা জাট রেজিস্ট্রি করছি। এটা আমাদের প্রোটেক্ট। পুলিশ যতক্ষণ না অ্যাকশন নিচ্ছে ততক্ষণ তো নিজেদের প্রোটেক্ট করতে হবে।

পুলিশ কি অ্যাকশন নেয়নি ?

নিয়োছে। পরন্তু থেকে দেখছি, পুলিশ পোস্টিং হয়েছে। কয়েকজনকে আশপাশের গলি থেকে ধরে নিয়ে গেছে।

তাহলে ?

তাহলে কী মা ? প্রিন্সিপালকে কারা যেন ফোন করে ভয় দেখাচ্ছে, পুলিশ কেস উইথড্র করতে বলছে।

অপর্ণা কান্দো-কান্দো হয়ে মণীশের দিকে চেয়ে বলল, শুনলে ? হুমকি দিচ্ছে। এবার ঠিক বুঝকি মারবে।

অত সোজা নয় মা। আমাদের অনেকের গার্ডিয়ানই খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল মানুষ। তারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে অ্যালার্ট করেছে। ভয় পেও না মা, ওরা কিছু করতে পারবে না।

আপা যে কেন এসব করতে যায়! বলে অপর্ণা রাগ করে মুখ ফিরিয়ে নিল।

মণীশ খাওয়া শেষ করে উঠতে বলল, আমার যদি আপার মতো একটা মেয়ে থাকত তাহলে বুক ফুলিয়ে বেড়াইতাম। আপা ইজ এ জেম।

তোমরা আমাকে শাস্তিতে থাকতে দেবে না কোনোদিন।

শান্তি একটা বোগাস জিনিস অপু। নার্সিংহোমে থেকে সেটা আমি বুঝেছি।

তুমি নিজেই তো একটা গুণ্ডা। সেইজন্যই তোমার শাস্তি ভাল লাগে না।

তা নয় অপু। তোমরা যে শান্তির কথা ভাবো সেটা হল নিস্তরঙ্গতা, নিকটত্ব, নিখরতা। আমি যখন কোমার মধ্যে ছিলাম তখন তো আমার ওইরকম শান্তিই ছিল! চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, ফ্রিকশন নেই, টেনশন নেই। মরে গেলে তো আরও চমৎকার শান্তি, একদম ঠাণ্ডা। বেঁচে থাকাটা কিন্তু নিছক শান্তি নয়। নিরন্তর সূক্ষ বা স্থল কিছু-না-কিছু ফ্রিকশন হয়েই থাকে। তুমি ভার্সাস তোমার পারিপার্শ্বিক। তুমি ভার্সাস তোমার আইডিয়াস। তুমি ভার্সাস তোমার অতীত ও বর্তমান। তুমি ভার্সাস ভাল অথবা মন্দ। যদি জীবন-বিমুখ হয়ে একটা কোর্টরের মধ্যে নিজেকে ভরে রাখতে পারো, তাহলে তুমি তোমার মতো শান্তি পেয়ে যাবে। আর যদি খোলা জীবনের মধ্যে এসে দাঁড়াতে চাও তাহলে সংঘর্ষ হবেই।

বড্ড লেকচার দাও তুমি। আমার কিছু ভাল লাগছে না।

দূর বোকা মেয়ে! বুককার ঘটনাটাকে অত বড় করে দেখছে কেন ? ও যাদের মেরেছে তারা স্মল টাইম ড্রুগ্‌স। ওরা তেমন কিছু করবে বলে মনেও হয় না। আর যদি কিছু করেই তাহলেও বুঝকি তো তৈরি আছে। তাই না ? বুঝকি আছে, তার বন্ধুরাও আছে। সকলের কথাই ভাবো। শুধু বুঝকি আড়াল করতে চাইছে কেন ? ওকে কাপুরুষ হতে বোলো না। তাতে বন্ধুদের কাছে ওর সন্মান থাকবে না, ওর নিজের কাছেও না। ওর আত্মবিশ্বাস আসবে। বুঝেছো ?

অপর্ণা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

বুঝকি কোমল গলায় বলে, এবার একটু বাথরুমে যাবো, মা ?

যাও। বলে অপর্ণা উঠে গেল।

পুল কার আসার সময় হয়নি। মণীশ একটু বাইরে এসে দাঁড়াল। আজকাল সিগারেট খাওয়া ছেড়েছে বলে অনেক সময় বড্ড ফাঁকা আর অর্থহীন লাগে। এখন লাগছিল। সিগারেট চিরকালের মতো ছেড়ে গেল তাকে। আর কী কী ছেড়ে গেল ? হিসেব করতে হবে, ভাবতে হবে। মনে হয় আরও অনেক কিছু তাকে ছেড়ে গেছে।

কিন্তু শরতের এই সকালবেলাটা তার বড় ভাল লাগছিল। আজ তার অনেকদিন পর এই প্রথম বাইরে যাওয়া। যেন দীর্ঘ রাত্রির পর ভোর।

মণীশ কখন চলে গেছে তা আজ টের পেল না অপর্ণা। এ রকম কদাচিৎ হয়। মণীশের অফিসে যাওয়ার সময়টায় বরাবর কাছে থাকে অপর্ণা। কিছু কথা থাকে না, কোনও ভাবপ্রবণতাও নয়। হয়তো নিছক অভ্যাস। আজ অপর্ণা শূন্য শোওয়ার ঘরটায় চুপচাপ নিজের মনের মধ্যে ডুবে বসে আছে। খড়কুটোর মতো কত কী ভেসে যাচ্ছে মাথার ভিতর দিয়ে।

পৃথিবীটা কেন এত খারাপ ? কেন এত নিষ্ঠুর ? কেন চারদিকে সবসময়েই এত বিপদ আপদ ? এত সব ঝামেলা আর গণ্ডগোলের মধ্যে কী করে বেঁচে থাকবে অপর্ণার ছেলে আর মেয়েরা ? কই, অপর্ণার ছাত্রীজীবনে তো এরকম খারাপ ছিল না পৃথিবীটা!

মা!

অপর্ণা ধীরে মুখ ফেরাল। দরজায় দাঁড়িয়ে বুঝকি। লম্বা, পুরুষালি চেহারা। আরও বাড়বে। লম্বা চওড়া হবে। এখনও নাবালকত্ব গভীরভাবে তার কাছে চোখে আর মুখে। এখনও শিশুর মতো সরল।

আয়। বলে হাত বাড়ায় অপর্ণা।

বুঝকি তার কাছে এসে বসে, তোমার মনটা খারাপ মা ? আর ইউ ইন টেনশন ?

ভীষণ। বলে ছেলের মাথাটা কাঁধে চেপে ধরে সে।

বুঝকি তার নিশাপ গলায় বলে, তুমি এত ভাবো কেন মা ? কত ছেলে দুনিয়া জুড়ে কত কী করছে! বারো বছরের ছেলে প্লেন চালাচ্ছে, যোলা বছরের ছেলে রাইফেল কাঁধে যুদ্ধে যাচ্ছে, কেউ আর্টিলারি পেয়েছে নৌকায়। আমি তো তেমন কিছুই করিনি। একটা বদমাশকে একটু মেরেছি।

তোমার আর বীর হয়ে কাজ নেই বাবা। আমার কোল জুড়ে থাকো।

কোল! হিঃ হিঃ, কী যে বলো মা!

তোর বাবা যে গুণ ছিল তা জানিস ?

জানি। তুমি অনেকবার বলেছো। বাবা তোমাকে একটা অদ্ভুত সেমিকনশাস অবস্থা থেকে রেসকিউ করেছিল। তুমি পুলিশের গুলিতে চোখের সামনে একটা লোককে মরতে দেখে একদম বুরবক হয়ে গিয়েছিলে।

তা ছাড়াও আছে। তোর বাবা ট্যান্ড্রিওয়ালাদের ত্যাঁদডামি দেখলে মার লাগাত, পুলিশের গাড়িতে ইট ছুঁড়ত। এই তো এক বছর আগেও একজন দোকানদারকে কিসের দাম জিজ্ঞেস করায় সে একটা তেড়িয়া জবাব দিয়েছিল, তোর বাবা তাকে কলার ধরে এমন ঝাঁকুনি দিয়েছিল!

তারপর কী হল মা ?

খুব হাস্যম্মা হল। অন্য দোকানদাররা ছুটে এল, জোট বাঁধল। তোর বাবা ভয় পেল না। এমন চোঁচামেচি বাঁধিয়ে দিল যে, ভয়ে মরি। তবে কথার তোড় আছে, গলার জোরও আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই খন্দেরদের এককাতা করে ফেলল। তখন দু'দলে এই লাগে কি সেই লাগে।

বাবা তো ঠিক কাজই করে মা, তাহলে বাবাকে গুণা বলছো কেন ?

একে গুণাই বলে। অত সাহস কি ভাল ?

তুমি মা, এক নম্বরের ভীতু।

অপর্ণা মুখে কিছু বলল না। কিন্তু সকালটা আজ বড় ভারী হয়ে রইল বুকের মধ্যে। শরৎ ঋতু নাকি দারুণ সুন্দর! অশ্রুত মণীশ তো তাই বলে। কিন্তু আজ সকালের এত রোদেও যেন আলো খুঁজে পেল না অপর্ণা।

বিকলে ডোরবেল বাজতেই অপর্ণা দরজা খুলল গিয়ে। সামনে বুবকা। তার পিছনে আরও কয়েকটা ছেলে আর মেয়ে।

এসো, এসো। বলে অপর্ণা দরজা ছেড়ে দাঁড়ায়।

বুবকা একগাল হেসে বলে, ওদের নিয়ে এলাম মা। ওরা তোমার ভয় ভাঙাতে এসেছে।

॥ ৩৫ ॥

পোড়া মাংসের স্বাদটা আজও জিবে লেগে আছে হেমাঙ্গর। সঙ্গে একটা পান্চাত্য স্যালাড ছিল। ছিল ভেটিকি মাছ, টমেটো আর ধনেপাতা দিয়ে রান্না একটা বিচিত্র পদ। তন্দুরী রুটিটা হয়েছিল টাটকা পাউরুটির চেয়ে নরম। সবই দারুণ। তবু পোড়ানো মাংসের ফরাসী আইটেমটা আজও হেমাঙ্গকে লোভাতুর করে রেখেছে। সঙ্গে ছিল রশির চমৎকার দস্তপঙ্ক্তি আর আধ খোলা চোঁটের হাসিটিও।

বাওয়ার টেবিলে রশির কয়েকজন ড্র উঁচু, উন্নাসিক, ইংরিজি মাধ্যম বন্ধু ও বান্ধবীও ছিল। ছিলেন রশির সুপুরুষ, রাশভারী, সংলাপ-বিমুখ বাবা এবং একজন বেশ ব্যক্তিভূসম্পন্ন ও আধুনিক মা। না, এঁরা কেউ হেমাঙ্গকে তাম্বিল করেননি। বরং তাকে বেশ একটু খাতিরই করা হচ্ছিল। একটু বেশীই যেন। তার কারণ বোধ হয় এই যে, হেমাঙ্গ ঠিক তাদের মতো নয়। একটু গোঁয়া, একটু সংকুচিত।

হেমাঙ্গর বা-পাশে-বসা রশির মা একটু চাপা স্বরে বলে ফেললেন, জানেন তো, রশি একরকম ইউ.কে.-তেই মানুষ। এবার গিয়ে সিটিজেনশিপ নিয়ে নেবে।

তাতে হেমাঙ্গর কিছুই যায় আসে না। সে ভেটিকি মাছের চমৎকার স্বাদে প্রায় সন্মোহিত অবস্থায় বলল, ইউ.কে. ভাল জায়গা। ভালই হবে।

আজকাল ওসব দেশে খুব রেসিট মুভমেন্ট হচ্ছে। তাই ভয় পাই।

হেমাঙ্গ একটা তন্দুরী রুটি ছিড়ে মাছের কাঁথটিতে ডুবিয়ে তুলে মুখে দেওয়ার আগে বলল, তা বটে।

এ দেশে থেকেই বা কী হল বলুন! ও দেশে বরং লেখাপড়াই হবে। পি-এইচ ডি করে ওখানেই প্রফেসরশিপ নিয়ে নেবে। আমরা একা হয়ে যাবো।

সঙ্গে যান না!

যাবো ? আমাদের যে এখানে অনেক বিষয়সম্পত্তি। রশির বাবা বিদেশে থাকতে রাজিও নন।

এক চামচ ফ্রায়েড রাইস নিল হেমাঙ্গ, তারপর বলল, আপনি ?

সত্যি কথা বলতে কি আমার এ দেশ একটুও ভাল লাগে না। ও দেশে থাকলে একটুও বোর হই না।

হেমাঙ্গ ভদ্রমহিলার দিকে একবার তাকাল। দারুণ পেট করা মুখ এবং প্রচুর রূপটানে বয়সটা বোঝা যায় না। মেয়েটি মায়ের উল্টো। রূপটানের বলাই-ই নেই। হেমাঙ্গ চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, সেটা ঠিক কথা। ওসব দেশে এন্টারটেনমেন্টের অভাব নেই।

আমার তো পায়ে হেঁটে হেঁটে লভনে ঘুড়ে বেড়াতে বেশ লাগে। উইক এন্ডে কান্ট্রি সাইডে চলে যেতাম। কী যে ভাল লাগত!

হ্যাঁ। কান্ট্রি সাইডটা খুবই ভাল।

ভদ্রমহিলা সামান্য বিস্মিত হয়ে বলেন, আপনি গেছেন নাকি ?

হেমাঙ্গ লজ্জিত হয়ে বলে, শর্ট একটা কোর্স করতে গিয়েছিলাম।

ওমা ? কই, রশি বলেনি তো আমাকে! হেমাঙ্গ একটু খতমত খেয়ে বলে, ওটা কোনও ঘটনাই নয়। বিলেত, আমেরিকা আজকাল অনেকের কাছে জলভাত।

তাই বুঝি ?

আমি একজন স্নাগলারকে জানি, প্রতি সপ্তাহে লভন যায়।

যাঃ, বানিয়ে বলছেন!

ঠিক আছে, তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো।

ভদ্রমহিলা বিস্মিত হয়ে বললেন, সত্যিই যায়?

কখনো-সখনো হয়তো এক-আধটা সগুহা ফাঁক থাকে। কিন্তু খুব ঘন ঘন যায় জানি। ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলার ছাড়াও যায় ব্যবসাদার, ট্রাভেল এজেন্টের লোক, কুরিয়ার সার্ভিসের লোক।

বোধ হয় ঠিকই বলছেন আপনি। এত আজোবাজে লোক যায় বলেই বোধ হয় ওরা আর বিদেশীদের পছন্দ করছে না। যে আজ্ঞে।

রশি় একটু ঘুরে, তিনটে চেয়ারের দূরত্বে বসে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে খাচ্ছিল। একবার চোখাচোখি হতে একটু হাসল রশি়। বলল, কেমন খাচ্ছেন বুঝতে পারছি না। মা, ওঁকে একটু দেখেও খাওয়াও।

হোমস্ট্র মদু হেসে বলল, দারুণ!

রক্ষা এই যে, এ বাড়িতে ডিনারের আগে ককটেল ছিল না। সাধারণত এসব ঘ্যাম বাড়িতে ওটা থাকেই। তবে হোমস্ট্রকে একবার রশি় জিজ্ঞেস করে নিয়েছিল, আপনি কি ড্রিংক করবেন? আমাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে।

হোমস্ট্র পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ডে মদের কোনও ভূমিকাই নেই। ফলে সে জিনিসটা কখনও উপভোগ করে না। দুর্ভাগ্যবশত তাকে অবশ্য বিভিন্ন পার্টিতে যেতে হয় এবং ভদ্রতা রক্ষার্থে হাতে গেলাসও ধারণ করতে হয়। এক বা দু চুমুক খেয়ে সে গেলাসটা গোপনে কোনও ফ্লাওয়ার ভাস-এর পিছনে বা টেবিলের তলায় বা পর্দার আড়ালে জানালার তাকে রেখে দেয়। সে বেশ উদ্বেগের গলায় বলে ফেলল, না, আমি ড্রিংক করি না। আপনাদের কি ককটেলও আছে না কি আজ?

রশি় হেসে ফেলল, বলল, না। বাবা একটু রক্ষণশীল মানুষ। বাড়িতে ওসব পছন্দ করেন না। তবে কেউ চাইলে দেওয়া হয়।

বাঁচা গেল।

ককটেল ছিল না বলেই বেশ নিশ্চিন্ত মনে ডিনারটাকে উপভোগ করতে পারছিল হোমস্ট্র। এরকম ডিনার সে বহুকাল খায়নি। কিন্তু প্রশ্ন হল, খাওয়াটা আদৌ হচ্ছে কেন? একটা উপলক্ষ তো থাকবে? এই উপলক্ষটাই ধরতে পারছে না হোমস্ট্র।

একবার সে আলগোছে রশি়র মাকে জিজ্ঞেস করল, আজ কি আপনাদের কোনও অকেশন আছে?

অকেশন! না তো!

এই জন্মদিন-টনুদিন!

রশি়র মা তাঁর চড়া লিপস্টিক চিরে হাসলেন। মাথা নেড়ে বললেন, ওসব কিছু নয়। রশি় ফ্রান্সে রান্না শিখেছিল কিছুদিন। মাঝে মাঝে রাধে আর সবাইকে খাওয়ায়।

→ রান্না কি কোনও মেয়ের হবি হতে পারে?

কেন হবে না বলুন তো!

মেয়েরা রাধতে ভালই বাসে না।

সব মেয়ে কি সমান? রশি় একটু আলাদা ধরনের। এমন কি ওর সঙ্গে আমারও মিলে না।

রশি় যে একটু আলাদা তা ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারছে হোমস্ট্র। এরকম দুর্দান্ত ব্যাকগ্রাউন্ড, এরকম দারুণ সুন্দরী, তবু কোনও দেমাক নেই। কিংবা থাকলেও সেটা ঠুনকো বা বোকা দেমাক নয়। রশি় বেশ একটু অন্যরকম। হোমস্ট্রর মেয়েদের সম্পর্কে অনীহার ভাবটা কি রশি় কাটিয়ে দিচ্ছে!

এসব সেই গত রবিবারের কথা। আজ বুধবার। পোড়া মাংসের আশ্চর্য স্বাদ আর গন্ধটা কেন আজও আবিষ্ট করে রেখেছে হোমস্ট্রর নাক আর জিবাকে?

সেদিন ডিনারের পর বাড়ি ফিরতে না-ফিরতেই চারুশীলার ফোন, কি রে, কিরকম হল?

হোমস্ট্র তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, তোর রান্নার নাকি প্রশংসা করে সবাই! ছো!। রান্না কাকে বলে তা আজকের ডিনারটা খেলে বুঝতে পারতিস। অধোবদন হয়ে থাকতে হত।

নিজে রোধেছে?

আলবাৎ! ফরাসি দেশে গিয়ে পয়সা খরচ করে রান্না শিখে এসেছে। তাদের মতো গুচ্ছের মশলা দিয়ে টাগরায় জ্বালা-ধরানো রান্না নয়। এসব রান্না কিরকম জানিস, জিবে শান্তি, পেটে শান্তি, মনে শান্তি।

তোর তো দেখছি ষ্ট্রোক হয়েছে।

তার মানে?

লাভ-ষ্ট্রোক। শেষ অবধি একটা রাধুনীর প্রেমে পড়লি নাকি?

রান্না জিনিসটাকে মিনিমাইজ করছিস? রান্নাও যে একটা আর্ট তা জানিস? আজকাল সব ম্যাগাজিনে আর পেপারে কত রকম রান্নার রেসিপি ছাপা হয় দেখিস না? বড় বড় হোটেলের শেফরা কত মাইনে পায় জানিস? ওনলে মাথা ঘুরে যাবে। রান্না মোটেই ফেলনা জিনিস নয়।

চারুশীলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তুই পেটুক তা জানি। কিন্তু ওই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তোকে কেউ হাত করে ফেললে সেটা আমাদের পক্ষে খুবই দুঃখের ব্যাপার হবে। তোকে যা বলে দিয়েছিলাম সেটা খোঁজ করেছিলি?

কী বলেছিলি?

ওরা বামুন না কায়েত?

ওই নিয়েই থাক। বামুন-কায়েত জেনে কী হবে? চোরের মন কেবল বোঁচকার দিকে। রশি় আমার একজন ভাল বন্ধু। আর কিছু নয়।

কবে দেখাবি?

দেখাবো মানে ? দেখানোর কী আছে ?

তোর যা অবস্থা দেখছি তাতে মনে হয়, গতিক সুবিধের নয়। ছাইক্রোন হতি পারে।

শ্রীকান্ত থেকে কোট করলি নাকি ? একটু-আধটু বই-টাই পড়ছিস তাহলে ?

আমি তো পড়িই! তুই যে কিছুই পড়িস না। এই পিসটা বোধ হয় তোর পাঠ্য বইতে ছিল, তাই ধরতে পারলি।

গল্প উপন্যাস পড়ে অকাজের লোকেরা। আমার অত ফালতু সময় নেই। আর ওইসব গল্প উপন্যাস পড়েই তো তোর মাথাটা গেছে। সব জায়গায় প্রেমের গন্ধ পাক্সিস। তুই একটা যা-তা।

গল্প উপন্যাস পড়লে তোর নিরৈট মগজেও বুঝতে পারতিস যে, তুই অলরেড রশ্মি রায়ের জালে আটকা পড়ে গেছিস। গল্প উপন্যাস মানুষকে অনেক বেশী কনশাস করে তোলে। যাক গে, আসল কথাটা বল। মেয়েটাকে কবে দেখাবি ?

দেখানোর কিছু নেই, বললাম তো।

আচ্ছা ছোটলোক বটে তুই, কেমনও ভীষণ। তোকে যে এত খাওয়া, তোর কি উচিত নয় ওকেও নেমস্তন্ন করে একদিন খাওয়ানো ?

এ কথায় হেসাম একটু ভাবাচাচা খেয়ে বলে, কেন, আমি খাওয়াতে যাবো কেন ?

ওটাই যে অদ্ভুত। দুনিয়াটা চলছে লেনদেনের ওপর। শুধু একতরফা খেয়ে এলেই হল ?

পাটি দিতে হবে বলছিস ?

হবে না ? তুই কী রে!

ঠিক আছে, কোনও ভাল হোটেল নিয়ে গিয়ে একদিন খাইয়ে দিলেই হবে।

এই না হলে তোকে দুনিয়ার পয়লা নম্বর গবেট বলা হয় কেন ?

কেন, প্রস্তাবটা কি খারাপ ?

ও তোকে বাড়িতে ডেকে যত্ন করে রঁধে খাওয়া, আর তুই ওকে হোটেল নিয়ে গিয়ে খাওয়াবি ? এটা কি বিলেত ? না কি তুই মস্ত বড় সাহেব হয়েছিস ?

হোমস অসহায়ভাবে বলল, তাহলে কি করব ? বিভিন স্ট্রিটের বাড়িতে নেমস্তন্ন করলে হাজারটা কথা উঠবে। কুমারী সুন্দরী মেয়ে বলে কথা! জবাবদিহি করতে জেরবার হবে আমার। আর এ বাড়ির রাধুনী হল ফটিক, সেই রান্না আমার মতো সহনশীল মানুষ খেতে পারে, কিন্তু রশ্মি পারবে কি ?

তোকে আর বোকা-বুদ্ধি খাটাতে হবে না। রশ্মিকে নেমস্তন্ন করবি আমার বাড়িতে।

তোর বাড়ি ? অ, বুঝেছি। এই ফাঁকে দেখে নিতে চাস তো ?

দেখলে কি তোর ভাগে কম পড়বে ?

নেমস্তন্ন যদি নিতে না চায় ? যদি না আসে ?

তোর বলার ভাগ বলবি, তারপর আমি বুঝব। ওর ফোন নম্বরটা আমাকে দে। তুই আগে নেমস্তন্ন করবি, তারপর আমিও বলব।

তুই কিন্তু ব্যাপারটা পাকিয়ে তুলছিস। আমি ব্যাচেলর মানুষ, আমি ওকে নেমস্তন্ন না করলেও কিছু যায় আসে না। এই পান্টা নেমস্তন্ন মানেই সম্পর্কটাকে আরও ঘুলিয়ে তোলা।

তোর মাথা! এ যুগে কেউ অত সহজে আছাড় খায় না। বিলেত-ঘোরা মেয়ে, খুব সোজা পাত্রী নয়। আর তুই বোকা হলেও সেয়ানা।

আরও একটা প্রবলেম আছে। তুই যা রাঁধিস তা কি ও খেতে পারবে ?

চাটবে। তবে ভয় নেই, আমার রান্নার লোক আছে।

তা জানি। তার রান্না খাওয়াবি ? তার হাতে হাজা নেই তো ?

মুকুন্দ সদাচারী মানুষ, তোর মতো স্বেচ্ছ নয়। সাহেবী রান্নাও জানে। আমিও ওকে হেল্প করব। তোর ভয় নেই।

এ পর্যন্ত হয়ে ছিল। কিন্তু কঠিন হল, রশ্মিকে নেমস্তন্ন করাটা। একটা আচমকা লজ্জা আর সংকোচ বাধা দিচ্ছিল হোমসকে পান্টা নেমস্তন্নটা কি ঠিক হচ্ছে ? চারুদি একটা গগণগোল পাকিয়ে তুলছে না তো! শেষ অবধি অবশ্য সে দ্বিধা সংকোচ খেড়ে ফোনটা করে ফেলেছিল। আচর্যের বিষয় রশ্মি এক কথাতাই রাজি হয়ে গেল। সামনের রবিবার সন্ধ্যাবেলায় চারুশীলার বাড়িতে সে সানন্দে যাবে।

পৃথিবীর সব ঘটনার রাশ তার হাতে নেই। অনেক সময়ে ঘটনা ঘটে যায়, মানুষকে তা মেনে নিতে হয় মাত্র। পারিবারিক প্রথা অনুযায়ী এবং অভ্যাসবশে হোমস ভগবান মানে, কিন্তু তার জীবনে কোনও ধর্ম্যাচরণ নেই। মাঝেমধ্যে সে ভগবানের ওপর নির্ভরও করে। এখনও তার জীবনে এক সংকটমুহূর্ত। ভগবানের ওপর ভর করা ছাড়া তার আর উপায় নেই। পোড়া মাংসের স্বাদ তাকে পেড়ে ফেলেছে বটে, কিন্তু সে সেই স্মোহন কেটে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে। ঘটনার গতিক তার সুবিধের ঠেকছে না।

আজ কিছু কেনাকাটা করলে কেমন হয় ? জিনিসপত্র কিনলে তার মনটা ভাল হয়ে যায়।

অফিস থেকে বেরিয়ে বেশ খানিকটা ঘুরে সে প্রায় হাজার টাকা দামের এক জোড়া জুতো কিনল। জুতো কিনতে তার যে কেন এখনও এত ভাল লাগে! জুতোর মধ্যে কোন আনন্দ লুকিয়ে থাকে কে জানে বাবা!

দামটা একটু বেশী পড়ে গেল, কিন্তু জুতো জোড়া এতই ভাল যে পায়ে দিয়েই একটা চমৎকার আরাম বোধ করল সে। জুতো তৈরির কলাকৌশলও এত অত্যাধুনিক হয়ে যাচ্ছে যে, সূক্ষ্ম সাইকোলজির সঙ্গেও জুতোর যোগসূত্র স্থাপিত হয়ে গেল বুঝি। পায়ে দিলেই মন অবধি ভাল হয়ে যায়।

নতুন জিনিস কিনে এনে সে সেটা প্রথম দেখায় ফটিকেই। ফটিক বুঝদার সমঝদার মানুষ নয়। তবে সে-যাই দেখে তাতেই মুগ্ধ হয়, অবাক হয়। তারিফ করার ধরনটাও তার আলাদা রকমের।

আজ জুতো দেখে ফটিক বলল, এ খুব জম্পেশ জিনিস বলেই মনে হচ্ছে। হেসে-খেলে পাঁচ-সাতটা বছর চলে যাবে।
আহা, টেকার কথা হচ্ছে না, জিনিসটা কেমন বলো।
এ তো জুতো বলে চেনাই যায় না, যেন এক জোড়া জাহাজ। এতে কোনও কলকজা লাগানো নেই তো দাদাবাবু ?
আরে না। জুতোর কলকজা আসবে কোথেকে ?
কি জানি, আজকাল সবকিছুতেই বড্ড কলকজা লাগানো থাকে। দই-ঘোঁটার কল, সরবতের কল, আটা-ময়দা মাখার কল। তার ওপর তোমার ওই বাস-উনুন-উঃ রে বাকী, কী অশৈলী কাণ্ডই যে হয় ওতে!
ফটিকের সঙ্গে কথা বলে একটা আরাম হয় হোমাস্বর। ফটিকের ভিতরে সভ্যতা ঢোকেনি, শহর ঢোকেনি, বিজ্ঞান বা সাহিত্য ঢোকেনি। ফটিক নিরুশ্বাস আছে। তাকে শিক্ষিত বা চালাক-চতুর করে তোলার কথা চোঁটা কখনও করে না হোমাস্বর।
বরং ফটিকের সরলতা আর বিশ্বাস সে নিজেই শিখে নেওয়ার চেষ্টা করে।
ফটিকদা, জুতো জোড়া একটু পায়ের গলিয়ে দেখ, কী আরাম!
ফটিক শিহরিত হয়ে বলে, পায়ের দেবো! আমার কি মাথা খারাপ হল নাকি ? সুনলেও পাপ!
আরে দূর! পাপ কিসের ? জুতো তো পায়েরই জিনিস। পরে দেখই না একবার।
মরে গেলেও পারবো না। কী বলো না তুমি দাদাবাবু!
হোমাস্বর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তোমাকে আর মানুষ করা গেল না। আচ্ছা, তোমার জুতো নেই ?
তা থাকবে না কেন ? এক জোড়া রবারের জিনিস আছে। হাওয়াই চটি।
চটি! শীতকালেও ?
খুব ভাল জিনিস। শীত গ্রীষ্মে সমান পরা যায়।
ফটিকের সঙ্গে তার যে একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠছে সেটাকে খুবই উপভোগ করে হোমাস্বর। সারা দিন তার মেলামেশা কিছু টাকার কুমিরের সঙ্গে। তারা হচ্ছে টাকা-সর্বশ্ব মানুষ। সারা দিন টাকার কথা সুনতে সুনতে হোমাস্বর একটা মানসিক ক্লান্তি আসে। তার আত্মা ক্লিষ্ট হয়। টাকার হিসেব কষতে কষতে সে নিজেকে বুড়ো বলে ভাবতে শুরু করে। তাই বাড়িতে এসে যখন ফটিককে দেখে তখন একটা আনন্দিত বিশ্বাস ঘটে তার। এই তো একটা মানুষ যার প্রয়োজন এত কম, এত অল্প নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে যা প্রায় অবিশ্বাস্য। বাঁচতে ফটিকেরও কিছু টাকার দরকার হয় বটে, কিন্তু ফটিকের মধ্যে টাকা-সর্বশ্বতা নেই। এরকম লক্ষ লক্ষ মানুষ ছড়িয়ে আছে ভারতবর্ষে, যাদের অবস্থা ফটিকের চেয়েও খারাপ। কিন্তু ফটিকের চরিত্রে লোভ জিনিসটাই দেখতে পায় না হোমাস্বর। কাছাকাছি এরকম একটা লোক থাকলে অকারণেই ভাল লাগতে থাকে।
বুধবার রাত্রিটা ভাল ঘুম হল না হোমাস্বর। নানা সজ্ঞাবনা ও তজ্জনিত দুশ্চিন্তায় তার মাথাটা গরম। তার নিশ্চিন্ত একক জীবনে চোরাপথে কি সিঁদ কাটা হচ্ছে ? রশ্মি রায় কি ঢুকে পড়ছে তার সংসারে ? বিডন স্ট্রিটের বাড়ি ছেড়ে একা থাকতে এসে তবে কি লাভ হল তার ?
বৃহস্পতিবার সকালে সে ফটিককেই জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, ফটিকদা, যদি হট করে আমার একটা বিয়েটিয়ে হয়ে যায় তাহলে কেমন হয় বলো তো ?
বিয়ে! সে তো খুব ভাল জিনিস। তখন বউদিদি রান্নাবান্না করে দেবেন, ঘরদোর সামলাবেন, বাড়িটা সরগরম রাখবেন।
বউ কি শুধু রান্না করে আর ঘর সামলায় ?
আমাদের ঘরের বউ ওরকমই হয়। বউ এলে কাজ করে।
ধরো যদি কাজ করতে না হয় ?
বউয়ের আর কোন উপযোগ আছে তা ভেবে পেল না ফটিক। সবচেয়ে মাথা চুলকে বলল, বাবুদের বাড়িতে বউরা কাজ করে না বটে, কিন্তু তাতে আধিব্যাধি হয়। গতর তো পুষে রাখবার জিনিস নয়।
হোমাস্বর একটু হাসল, তুমি একটা বেশ লোক ফটিকদা। মনে মুখে ফাঁক নেই।
ঘটনাবিহীন বৃহস্পতি কাল, শুক্র গেল। শনিবার চারুশীলা ফোন করল রাতে, এই কিছুত, কালকের কথা মনে আছে তো ?
আছে।
তুমি রশ্মিকে নিয়ে আসবি।
না, রশ্মি নিজেই চলে যাবে বলেছে।
তুই আনলে ভাল হত না ?
না, হত না।
তাহলে তুই সকাল সকাল আসবি। এ বাড়িতে ও তো কাউকে চেনে না। লজ্জা পাবে।
লজ্জা পাবে! সে জিনিস নয় রে। এ অন্য ধাতুতে গড়া।
তা হোক। তোর নিজেরই উচিত ওকে রিসিভ করা।
ঠিক আছে ভাই, যাবো।
বিকেল চারটের মধ্যে চলে আসবি।
বড্ড আর্লি হয়ে যাচ্ছে না ?
হোক। শরৎকালে বেলা তাড়াতাড়ি শেষ হয়।
তোর সব ব্যাপারেই বড্ড বাড়াবাড়ি।
এ কথা খুবই ঠিক যে, সব ব্যাপারেই চারুশীলা কিছু বাড়াবাড়ি আছে। টাকা জিনিসটাকে সে ব্যবহার করে ইচ্ছেমতো লাগাম ছেড়ে। রবিবার দিন সে তার বিদঘুটে আর্কিটেকচারের বিশাল ঘরখানা নতুন করে সাজিয়েছে।

ঝাড়পোঁছ পালিশে ঘরখানা আয়নার মতো ঝকঝক করছিল। পুরনো কিছু আসবাব হয়তো-বা জলের দরে নীলামঘরে বেচে দিয়ে সে কয়েকটা নতুন ধরনের আসবাব কিনেছে। একখানা গ্লাসটপ নতুন পেগ্গায় সেন্টার টেবিলও লক্ষ করল হোমাস্ট। যথায়োণা জায়গায় প্রচুর পরিমাণে রজনীগন্ধার স্তিক সাজানো। একটি মনোরম সুগন্ধী শ্বেপ করা হয়েছে সারা ঘরে।

হোমাস্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, এটাকেই বাড়াবাড়ি বলে, তা জানিস?

চারুশীলা গম্ভীর মুখে বলল, মোটেই বাড়াবাড়ি নয়! এটুকুর দরকার ছিল।

টুকু? হোমাস্ট চোখ কপালে তুলে বলে, এটাই যদি ভোর কাছে কুকু হয়, তাহলে খানি হয় কিসে? সোফাসেট নতুন কিনলি বুঝি?

কিনলাম।

কত পড়ল?

তা দিয়ে ভোর কী দরকার? তুই যে শুচ্ছের জিনিস কিনে ঘরটা জঙ্গল বানান্সিস?

ভোর কেনা আর আমার কেনায় তফাত আছে। আমি ডেকোরেশনে বিশ্বাস করি না।

এ যুগে ডেকোরেশনরই দাম। ডেকোরেশন জীবনে নতুন মাত্রা যোগ করে।

ভোর মাথা। খাওয়ার আয়োজনও বোধ হয় রয়্যাল স্টাইলেই হবে? একটা মেয়ের জন্য এত!

একটা মেয়ে কেন? আজ আমি কয়েকজনকে নেমন্তন্ন করছি।

সভয়ে হোমাস্ট বলে, কাকে?

চারুশীলা মুখ টিপে হেসে বলে, ভয় নেই, বাড়ির কাউকে নয়। আমার বান্ধবী আর তাদের বরেরা। খাওয়ার ঘর দেখে যা।

খাওয়ার ঘরেও দেখা গেল, চারুশীলা টাকা ছড়িয়েছে। দেওয়ালে বিশাল প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর ওয়ালপেপার সদা লাগানো। বড় দেওয়াল বলে দৃশ্যটা খুলেছে চমৎকার। মাঠ, ঘাট, ক্ষেত, খানের মড়ই, কুঁড়ে ঘর। প্রমাণ সাইজই বলা যায়। তবে গ্রামীণ দৃশ্যে কেন একটি আধুনিক মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তা হোমাস্ট বুঝতে পারছিল না। মেয়েটা একটু চেনা-চেনাও।

একে চিনিস? মনে পড়ে? এ হল ঝুমকি! এদের বাড়ির সবাই আজ আসবে।

হোমাস্টর ভুল ভাঙল। মেয়েটা ছবির নয়, রক্তমাংসের। একটু হেসে এগিয়ে এল, কেমন আছেন?

হোমাস্ট এই মেয়েটার মধ্যে সেই ডেজা, ভীতু মেয়েটার একটা আদল পেল মাত্র। শুধু আদলটুকুই। আজকের ঝুমকি অন্যরকম। তেজী চানুকের মতো চেহারা। একটু রোগার দিকে। মুখখানা যেন খুব যত্ন করে কেটে কেটে তৈরি করা।

হোমাস্ট বলল, আপনি কেমন আছেন?

মেয়েটা জবাব দিল না। ঘাড় হেলিয়ে হাসল। হাসিটা খুবই ভাল। পৃথিবীতে ভালরও কি শেষ নেই? ভালর পরও আরও ভাল, আরও ভাল—এটা কি ভাল?

॥ ৩৬ ॥

আমার খুব ভূতুরে ভয় হয়েছে আজকাল, জানো?

ভূতের ভয়? সে কি! গায়ে গঞ্জে কতদিন কাটালে, এ ভয় তো ছিল না তোমার!

তাই তো ভাবি। দেশের গায়ে রাত-বিরেতে একটা পুকুরঘাটে গেছি কত, ভয় বলে কিছু টের পাইনি। এখন হচ্ছে কেন বলা তো?

বিষ্ণুপদ একটু হাসে। বলে, আমি পাশে থাকলেও ভয় করে?

কি হয় জানো? হঠাৎ মাঝ রাত্তিরে ঝম করে ঘুমটা ভেঙে যায়। ভাঙা মসজিদে তক্ষক ডাকে। আর বাঁশবনে কেমন মড়মড় শব্দ হয়। একটা হাওয়া বয়ে যায় হঠাৎ করে। শেয়াল ডাকে। তখন বুকটা কেমন উথাল-পাখাল করে। মনে হয়, কারা সব যেন আনাগোনা করছে চারপাশে। ফিসফিস করে কথা কইছে। কী একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে যেন। তখনো, না ঘুমিয়ে পড়লে?

শুনছি। ঘুম কি আর মাইনে-করা চাকর যে ডাকলেই এসে হাজির হবে! ভাঁটির বয়স, এখন সবই কমতে থাকে। তা তোমার ভূতের বৃত্তান্তটা বলা, শুন।

তাই তো বলছি। হ্যাঁ গো, এরকম কি ভাল?

নিশ্চয় রাতে কতরকম মনে হয়। মানুষ তখন একা। একা হওয়াটা মানুষ পছন্দ করতে পারে না। তার জন চাই।

নয়নভারা গালের পানটা একটু চিবিয়ে নিয়ে একটা হেঁচকির মতো শব্দ করে বলে, এই যে তুমি আমার কাছটিকে আছো, কাছেই আছো তো! তবু ভয়-ভয় ভাবটা বড্ড চেপে ধরে। মনে হয়, আমার বুঝি কেউ নেই। বড্ড অন্ধকার লাগে চারদিকটা। গাটা কেমন ছমছম করে। মনে হয়, কোন অজান দেশে চলে এলাম। চারদিকে অজান সব জিনিস।

এও বয়সেরই দোষ।

বেঁচে থাকলে বয়স তো বাড়বেই। তাতে দোষের কি? কত বুড়ো মানুষ হেসে-খেলে বেড়াচ্ছে।

বিষ্ণুপদের দীর্ঘশ্বাসের শব্দটা নিশ্চয় রাতে বেশ বড় হয়ে শোনা গেল। স্বাসটা ফেলে বলল, আমরা যে কেমন একা হয়ে যাচ্ছি তা টের পাও? আপনজন, রক্তের সম্পর্কের মানুষের অভাব নেই। তবু কেমন যেন সব ছেড়ে যাচ্ছে। দূরের মানুষ হয়ে যাচ্ছে। টের পাও না?

তা যদি বলা তবে বলতে হয়, ছেলেপুলে কি চিরকাল আগলে রাখা যায়? তাদের পাঁচটা কাজ আছে, কুজিরোজগার আছে।

ওইটেই তো পরিস্থিতি কঠিন করে দেয়। যত বুড়ো হবে তত একা!

অমন করে বোলো না তো। তোমার কথা শুনলে মাঝে মাঝে বুক কেঁপে ওঠে আমার।
বলি কি আর সাথে! কৃষ্ণ তফাত হল, বামা তফাত হল, একটা কোথায় নিরুদ্দেশ হল, মেয়ে দুটো কালেভদ্রেও আসে না। মাঝে মাঝে ভাবি, দুনিয়াটাই কেড়ে নিল সবাইকে। কেমন জানো? ছেলেবেলায় যখন গুলি খেলতাম, মাঝে মাঝে কোঁচড় বা পকেট থেকে পড়ে যেত। সব কটা কুড়িয়ে পেতাম না, কিছু হারিয়ে যেত।

এবার নলনতারার দীর্ঘশ্বাসটা বেশ শব্দ করে হল। বলল, তা নয় গো। হারাবে কেন? সবাই-ই তো আছে। আমাদেরই আছে। শিবুরাণের কথা খুব মনে হয়। তুমি কি ভাবো বলো তো! বেঁচে আছে?

বিষ্ণুপদ একটা হাই তুলে বলে, না থাকার কি? আছে ঠিক। হয়তো জীবনে উন্মত্তিও করে ফেলেছে।

একদিন আসবে?

না এসে যাবে কোথায়?

আমি মরার আগে আসবে তো!

তুমি এখনই মরছো না। আগে আমার পালা।

তোমার একটা মরার বাই হয়েছে আজকাল।

কথাটা ভুল বললে। ইচ্ছে করে কেউ মরতে চায় না। এই যে আমাদের কথাই ধরো, কোন ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে পড়ে আছি, কেউ পৌছেও না আমাদের, বেঁচে থাকার কষ্টও কত, তবু কিন্তু মরতে ঠিক ইচ্ছে যায় না। মরার কথা ভাবলেই কেমন যেন হাফ-ধরার মতো লাগে। সেই যে কালঘড়ি দেখেছিলাম, তার পর থেকেই একটা মরণের ভয় মাঝে মাঝে এসে ভালুকের মতো চেপে ধরে।

নয়নতারার অন্ধকারেই তার মানুষটার দিকে তাকায়, বলে, মরার মতো কিছুই তো হয়নি তোমার। বয়সও এমন কিছু নয়, ভগবানের দয়ায় তেমন কোনও অসুখ-বিসুখও নেই। তবে ভাবো কেন?

ভাবনার সঙ্গেই তো সারাদিন যুদ্ধ করি। হাতে কাজকর্ম নেই, মাথাটা বোঁদা হয়ে গেছে।

কাজকর্ম একটু একটু করলেই তো পারো!

সেটাও ইচ্ছে যায় না। কেবল মনে হয়, পশুশ্রম করে হবোটা কি? যে কাজই করি, মনে হয়, ছাইভস্ম। জীবনে আমার আর যেন কিছুই করার নেই।

ওটাই তো তোমার দোষ। শরীরটা বড্ড বসিয়ে ফেলেছো। দাঁড়াও, কাল থেকে তোমাকে হাটেবাজারে পাঠাবো।

রন্ধে করো! বিকিকিনির মধ্যে আমি আর যেতে পারব না। পয়সার হিসেব গুলিয়ে ফেলব। ওসব কথা থাক, তোমার ভুতের বৃত্তান্ত বলো।

বললাম তো। নিশত রাতে ওরকম সব হয়।

বিষ্ণুপদ উঠে একটু জল খেয়ে বলল, তোমার যেমনটি হয়, অনেকটা তেমনতর আমারও হয়। আমার যেন মনে হতে থাকে, মেহ ছাড়বার সময় যত কাছে এগিয়ে আসতে থাকে তত প্রেতলোকের ছায়া এসে পড়ে চারধারে।

না গো! তুমি কি বলছো আমার মরার সময় হয়েছে।

তা কি জানি! এটা বুঝি যে, বয়স ভাঁটির দিকে। এখন ওসব হলে বুঝতে হবে ঘাঁটি ছাড়ার সময় হয়েছে।

তুমি বাপু, একটু কেমন যেন আছো। বড্ড ঠোট-কাটা।

তোমাকে ছাড়া আর কাকে এসব বলব বলো তো!

আমি যে ভয় পাই। সংসার-টংসার নিয়ে জড়িয়ে মড়িয়ে আছি, এই বেশ আছি। ওসব কথা তুললে কেমন ঘাবড়ে যাই। হ্যাঁ গো, একটু তীর্থ করতে যাবে? মনটা ভাল করে আসি চলো।

ও বাবা, সে তো মন্ত খরচের ব্যাপার!

দূরে নয় গো। কাছেপিঠেই কোথাও যাই চলো। রামজীবনকে বললে খরচ দিয়ে দেবে।

বিষ্ণুপদ বলল, ওর এখন অনেক খরচ। ঘর শেষ করতে পারছে না বলে মাথাটাও গরম। বলতে যেও না।

গেলে ভাল হত কিন্তু। তারকেশ্বর বা ওরকম কাছেপিঠে গেলেও কি অনেক খরচ? কাশী-বৃন্দাবন তো যেতে চাইছি না। এক জায়গায় থেকে কেমন দম বন্ধ হয়ে আসে।

তীর্থেই বা কোন শ্বাস ফেলার জায়গা আছে বলো তো! সব জায়গাতেই ভিড়।

আচ্ছা, তোমার কি ভগবানে ভক্তি নেই? সত্যি করে বলো তো! এতকাল ধরে তোমাকে দেখছি, কোনওদিন মুখ ফুটে ভগবানের কথাটা বললে না। কত ব্রত করেছে, পূজো করেছে, তোমার তাতে কখনও যেন গা ছিল না। হ্যাঁ গো, তুমি কি নাস্তিক?

বিষ্ণুপদ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কল্পন গলায় বলে, তাও ঠিক বুঝতে পারি না।

সত্যি কথাটা বলেই ফেল না।

বিষ্ণুপদ দুর্বল গলায় বলে, যা ভাবছো তা নয়। কিন্তু তোমাদের মতো করে নয়।

তা হলে কার মতো করে?

আমার নিজের একটা রকম আছে। তোমরা যে পূজো-আচ্ছা করো তার মধ্যে একটু ব্যবসা-বুদ্ধি আছে। ফুল বাতাসা দিয়ে ভগবানের কাছ থেকে কিছু আদায় করে নেওয়া। দমাদম বাজনা, ট্যাঙ্গ স্ট্যাঙ্গ স্ট্যাঙ্গ বাজিয়ে দুর্গাপূজো হয়, ও আমার কেন যেন ভাল লাগে না। আমার মনে হয়, ভগবান ঠাণ্ডা সুস্থির একজন মানুষ। তাঁকে বুঝতে হলে নিজেকেও একটু ঠাণ্ডা বা সুস্থির হতে হয়।

তুমি কত জানো। আমার হল মেয়েলি বুদ্ধি।

আমি যে একটা জান-বুঝাওলা মানুষ এ কেবল তোমার মতো বোকার কাছে। আমি কীই বা জানি? কতটুকুই বা বুঝি!

বিদ্যার জাহাজ না হলেও তুমি বাপু অনেক জিনিস স্পষ্ট টের পাও। অনেক বিষানেরও সেই ক্ষমতা নেই।
এই না হলে নয়নতারা! তা ভাল, এরকমই বোকাসোকা থেকে। সংসারে বোকা আর ভালদের দাম না থাক, তাদের ওপর ভগবান সন্তুষ্ট থাকেন।

বাকি রাতটুকু আর দুজনের কারোই ঘুম হল না। কথা কয়ে, জল খেয়ে আর এপাশ ওপাশ করে কেটে গেল।
রোদ উঠবার অনেক আগেই তারা উঠে পড়ে। তখন অন্ধকার থাকে, চারিদিকটা থাকে ঘুমন্ত। একটা দুটো পাখি সবে ডাকতে শুরু করে। একটা সময় আছে, ইরফানের মোরগটা যখন জানান দেয়।

সকালে নয়নতারার মেলা কাজ থাকে। ঘরদোর সারা, লেপাশোছা, আরও অনেক কিছু। বিষ্ণুপদর কোনও কাজ থাকে না। জলটোকিতে বসে আজ সে শরতের একটু হিম মাখানো ভোরবেলাটিকে বড় ভালবাসল।

ডেকে বলল, কয়েকটা শিউলি তুলব নাকি গো? তোমার ঠাকুর পুজোয় লাগবে।

তা তোলে। বাসি কাপড় ছেড়ে হাত পা একটু ধুয়ে নাও।

বাঁশের সাজিটা নিয়ে বারান্দা থেকে নেমে পড়ল বিষ্ণুপদ। এই ফুল তোলাটা তার একটা দৈনন্দিন কাজ করে নিলে কেমন হয়?

গাছ দুটো ঝেঁপে কী ফুল! কী ফুল! মাটিতে ঘাসে কোথাও পা রাখার জায়গা নেই। ফুলে ফুলে ছয়লাপ হয়ে আছে।

বিষ্ণুপদ হাঁক দিল, হ্যাঁ গো, মাটিতে পড়া ফুল কি পুজোয় লাগে?

নয়নতারার উঠানের এক প্রান্ত ঝাঁট দিতে দিতে বলল, শিউলিতে দোষ হয় না, যেটা পায়ে লাগবে সেটা কুড়িও না।

গাছেও মেলা আছে।

তবে গাছেরগুলোও তোলে।

গাছের পাতায় পাতায় বোঁটা আলগা হয়ে কত শিউলি ঢলে পড়ে আছে। একটু নাড়া খেললেই টুপ করে খসে পড়ে।
শিউলির বোঁটা কেন এরকম তা বুঝতে পারে না বিষ্ণুপদ। দুনিয়ায় একঢালা নিয়ম কিছু নেই। শিউলির ধর্ম শিউলির, বেল ফুলের ধর্ম কেবল বেল ফুলেরই। একই মাটির একই রস টেনে কত নানারকম হচ্ছে। বড়ই আশ্চর্য লাগে বিষ্ণুপদর।

সাজি ভরে উঠতে সময় লাগল না মোটেই। বিষ্ণুপদ ওপচানো সাজি নয়নতারার ঠাকুরের সিংহাসনের সামনে রেখে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলল, আরও কিছু কাজ দেবে নাকি?

ওমা! এ যে ভূতের মুখে রাম নাম!

কেন, কাল রাতেই তো বললে আজ থেকে আমাকে দিয়ে মেলা কাজ করাবে।

তাই লক্ষ্মী মানুষটির মতো কাজ চাইছে? মরে যাই!

দোষটা কি আমার? তুমিই তো কিছু করতে দাও না আমাকে।

একটা জীবন কম খেটেছো নাকি? কম কষ্ট করেছে? তখন এ জায়গার কী অবস্থা! হাট নেই, বাজার নেই, পথঘাট নেই! হেঁটে হেঁটে পায়ে কড়া পড়েছে। সাইকেলে কত মাইল যেতে হত যেন! উরেবাস, যখন ফিরে আসতে তখন মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে যেত।

আহা, তখন যৌবন-বয়স। ও বয়সে কষ্ট করাই ভাল। গায়ে লাগে না। বরং ভালই হয় তাতে।

সেই জন্যই বুড়ো বয়সে কষ্ট করতে দিই না। তা একটু-আধটু করতে চাও তো করো। এই তো বলছিলে, কাজ করতে গিয়ে মনে হয় ছাইভষ্ম করছি। হঠাৎ মন পান্টালে কেন?

এই দেখ, ওকালতি পাশ করে এলে নাকি? তখন বলেছিলাম, তখন একরকম মনে হয়েছিল বলে। এখন মনে হচ্ছে, তুমি কথাটা খারাপ বলনি।

তা হলে যাও, বাগানে বসে একটু গাছপালার সেবা দাও।

কাজটা বিষ্ণুপদর খুব পছন্দের। এবার ভারী বর্ষায় গাছ বেড়েছে খুব। বাগান দেখার কেউ নেই বলে আগাছায় একেবারে বনবিবির থান হয়ে আছে। দা আর কোদাল নিয়ে লেগে গেল বিষ্ণুপদ। লেগে গিয়ে বুঝল, শরীরের সেই ক্ষমতা আর নেই। হাত পায়ে যেন জরা একেবারে বাটখারার মতো চেপে বসে আছে। দমেও বেশ ঘাটতি হচ্ছে।

নয়নতারার বাগানদার কোণে কখন এসে দাঁড়িয়ে তার কাও দেখছিল। এবার চোঁচিয়ে বলল, ওগো, অত ছুড়মাড় কোরো না। বয়স বসে নেই। ধীরে সুস্থে সইয়ে সইয়ে করো। কোদাল চালাতে হবে না, গাছের গোড়াগুলো একটু সাক্ষ করে দাও, তাতেই হবে।

রোদ উঠল। বউরা উঠল। ছেলেরাও উঠে পড়ল। রামজীবন সকালে উঠে বাপ-মাকে প্রণাম করে রোজ। আজ বাপকে খুঁজে না পেয়ে বলল, ও মা, বাবা কোথায় গেল?

বাগানে কাজ করছে।

অ্যা! বলা কি? বাবার কি আর সেই ক্ষমতা আছে? ছিঃ ছিঃ!

ওরে, কিছু হবে না। কাজে থাকলেই ভাল থাকবে।

খুঁজতে খুঁজতে যখন আতা গাছের তলায় বিষ্ণুপদকে খুঁজে পেল রামজীবন, তখন বিষ্ণুপদ মস্ত একখানা আতা ভেঙে মগ্ন হয়ে থাকছে। আতার মাখন লেগে আছে চৌটের পাশে।

বাবা!

আয় রে, বোস। আতা খাবি?

বসবার মতো জায়গা এটা নয়। বর্ষা গেছে এবার খুব। মাটির পোরে পোরে এখনও জল ঢুকে আছে। চৌসে বসলে পাছার কাপড় ভিজি যাবে।

এং হেঃ, এ যে ঠাণ্ডা লাগিয়ে ফেলবেন বাবা! বাগানের কাজ করতে গিয়ে হাটের গড়বড় হয়ে গেলে? আপনি উঠুন, ঘরে যান। আতা পেড়ে ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বিষ্ণুপদ একটু হেসে বলে, অমন হুড়ো দিচ্ছি কেন ? বেশ লাগছে এখানটায়। বোস না ঘাসের ওপর!
রামজীবন বলল, মায়ের আঙুল দেখে অবাক হই। সকালেই লাগাল বাগানের কাজে! কেন, গায়ে কি
কামলার অভাব!

তোর মা লাগায়নি। আজ এমনিতেই একটু ইচ্ছে হল। শরীর নাড়লে খিদেটাও পায়।

তা বটে। কিন্তু বেশি নাড়ানাড়ি কি ভাল এই বয়সে!

তোরা সবাই মিলে আমাকে এমন বুড়োই বানালা যে, নিজেকে বুড়ো ভাবতে ভাবতে অর্থব্ধ হয়ে যাচ্ছি।

তা একটু হাটাহাটি করলেই তো পারেন। বসা শরীরকে হঠাৎ দুনো খাটালে হিতে বিপরীত হবে যে ?

আচ্ছা, একটা কথা বলবি ?

কি কথা বাবা ?

তোর এত পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, তবু খারাপ অভ্যাসগুলো এল কোথা থেকে রে ?

রামজীবন যেন একটু লজ্জা পেয়ে মাথা নামাল। কিন্তু কথাটা পাশ কাটাল না। একসময়ে রামজীবনই ছিল বিষ্ণুপদের
ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে সুপুরুষ। কৃষ্ণজীবনও খুব সুপুরুষ আর জ্যোত্স্ন সমর্থ বটে, কিন্তু তত লম্বা-চওড়া না হলেও
রামজীবনের রং আর মুখের গড়ন ছিল চমৎকার, ছেলেবেলায় যাত্রাপালায় বালক কৃষ্ণ সাজত। কিছু শূণ ছিল, কিন্তু
অগুণগুলোই কেন যে বেড়ে উঠল কে জানে! আজকাল আর রামজীবনের চেহারায় কোনও জলুস নেই। চোয়াড়ে একখানা
মুখ, গায়ের রঙ তামাটে, মাথার চুলে এই বয়সেই পাক ধরেছে। পাশাক-আশাকের তেমন কোনও চাকচিক্য নেই।
মুখখানা যখন তুলল রামজীবন, তখন বড্ড বিমর্ষ একটা ভাব এসেছে মুখে। একটু গলা ঝাঁকারি দিয়ে বলল, কুসঙ্গে পড়েই
তো ওসব হয় বাবা!

আর একখানা মস্ত আতা ভেঙে বিষ্ণুপদ তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, নে, খা।

হাত বাড়িয়ে নিল রামজীবন। কিন্তু খেল না। চুপ করে বসে রইল।

বিষ্ণুপদ বলল, এ গাছে যে এত আতা হয় জানতামই না। এইটুকু ছিল গাছটা।

গত বছর থেকে ফলন দিচ্ছে। বাগানটা জঙ্গল হয়ে থাকে বলে কেউ আসেও না, লক্ষ্যও করে না। গত বছর অবশ্য
বিশেষ ফলন হয়নি। দু-চারটে মাত্র। এ বছর ঢেলে দিয়েছে।

বিষ্ণুপদ আতার মধ্যে মুখ ডুবিয়ে খেতে খেতে বলে, গাছ কত সয় বর, ফল দেয়। গাছের কাছে শিখতে হয়। কত
কী শেখার আছে!

রামজীবন মাথাটা নত করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, সংসারটা আমার জন্যই ছারোখারে যাচ্ছে বাবা।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, তুমিও কেউ নও, আমিও কেউ নই, নিজেকে নিমিত্ত ভাবিস কেন ?

আমি মোদা মাতাল লোক, পয়সা ওড়াই, ঝগড়া বিবাদ করি।

আতার একখানা বিচি ফুড়ক করে ফেলে বিষ্ণুপদ বলে, সবাই একরকম হয় না। কৃষ্ণজীবন তো অনেক ফারাকে।

তুই আর বামা নিজেদের আর ছাড়িয়ে উঠতে পারলি না।

সেই কথাই তো বলছি।

বটতলার ওরা কারা বল তো! চিনতে পারছি না। মাঝে মাঝে আসে।

বন্ধুবান্ধবের মতোই। তবে চক্কটা ভাল নয়!

খুনখারাপি করে নাকি ?

তা করে।

তোর সঙ্গে সম্পর্কটা কেমন ধারা ?

বিকেলের দিকে বসা হয় মাঝে মাঝে।

তোর কি ওদের কাছে কোনও দেনা আছে ?

হয়ে যায় মাঝে মাঝে।

দেনা করিস কেন ? আমরা যখন খুব গরিব ছিলাম তখনও বাবা শেখাত, দেনা করতে নেই। আমরা তো অল্পেঅল্পে
চালিয়ে নিতে শিখেছি। তুই পারিস না ?

মদ আর জুয়াই আমাকে খেল।

আর কিছু নেই ?

আছে বাবা। সেসব আপনার গুনে কাজ নেই।

চুরি-ডাকাতি ?

ফের অধোবদন রামজীবন মুখখানা অনেকক্ষণ বাদে তুলে বলল, দুটো ডাকাতিতে ছিলাম।

ওইটেই খারাপ করেছিস। গেরস্তরা কত কষ্টে রোজগার করে, তা কেড়ে নিস কেন ?

আতা খেতে খেতে এত সরলভাবে কথাটা বলল বিষ্ণুপদ যে, রামজীবনের বুকে কথাটা যেন দুটো টোকা মেরে উড়ে
গেল। রামজীবন উদাস গলায় বলল, দিনকাল যা পড়েছে বাবা, এসব ছাড়া আর উপায় কি বলুন! গা-গজের অবস্থা তো
আরও খারাপ।

বিষ্ণুপদ ছেলের দিকে চেয়ে বলে, এই যে আতা দেখছিস, বিচিতে ভরা। গিজ গিজ করছে বিচি। বিচি ফেলে তবে
আতার মাখটুকু খেতে হয়। তাই না ? মানুষের জীবনটাও তেমনই মেলা বিচি। ওসব বাদছাদ দিয়ে তবে খেতে হয়।
বাঁকা পথ নিবি কেন ? এ বংশের যা ধারা, তাতে ওসব কি তোর সইবে ? কঠিন হয়ে পড়বে যে!

বাবাকে নিয়ে একটা বিশ্বাস আছে রামজীবনের। বাবা তাকে কখনও বকেনি, মারা তো দূরের কথা! যখন বসে যাচ্ছিল
সে, তখনও কিছু বলত না কখনও। সেই নিরীহ মানুষটি আজ যে সব বলছে তাও শাসন করার জন্য নয়। ভালবাসার জন্যই।

রামজীবন হাতের আখখানা আতার দিকে চেয়ে রইল। থাকতে থাকতে বুঝতে পারল তার চোখে জল আসছে। একটু স্থলিত গলায় বলল, আপনাদের কষ্ট আমি তো দেখতে পারি না।

কষ্ট কি? কষ্টের বোধ না থাকলে কষ্টও নেই। চিরটা কাল আমরা এই ভাবেই তো দিবা কাটিয়ে এসেছি। আরও কত লোক আছে! আমাদের বাড়িতে যারা ভিক্ষে চাইতে আসে তারা তো আমাদের চেয়েও কত খারাপ আছে।

রামজীবন মাথা নেড়ে বলে, ওসব আমার সহ্য হবে না বাবা। আমার কিছু একটা করাই চাই।

বিষ্ণুপদ হঠাৎ বলল, তুই কি কৃষ্ণকে হিংসে করিস?

হিংসে! বলে রামজীবন একটু থমকে গেল। একটু সময় নিয়ে গলাটা এক পর্দা নামিয়ে বলে, বড়দাদা বড় হয়েছে, আমরা তো হলাম না। বড় জ্বালাপোড়া হয় বাবা।

যখন জ্বালা হয় তখন খুন চাপে তোর মাথায়?

তা চাপে বাবা।

তা হলেই বোঝ মনের মধ্যে কেমন যম বসে আছে আসন পেতে! ঠাকুর বলেন, বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘে খায়।

বাবা, জ্বালাপোড়ারও একটু দরকার হয়। নইলে যে টগবগ করে না ভিতরটা। ওই হিংসেটাই তো আগুন!

রান্নার আগুন আর ঘরপোড়া আগুন কি এক?

তা নয় বটে।

বিষ্ণুপদ খুব হাসল, আতা খেয়ে আমার খুব কথা আসছে রে আজ।

আপনি আরও বলুন বাবা। আমার তনতে ইচ্ছে যাচ্ছে।

দূর পাগল, আমি কি একটা পণ্ডিত লোক নাকি!

আমার কাছে আপনার চেয়ে বড় আর কে আছে?

ওই তো মায়ায় বাঁধিস!

মায়া ছাড়া সংসারের আর আছেটাই বা কি!

বিষ্ণুপদ বলল, মায়া আছে। আবার বৈরাগ্যও আছে।

বড়দাদা যদি আমাদের পিছনে থাকত বাবা, তা হলে কিন্তু এরকমটা হতে পারত না। আজ যে আমরা পণ্ডিত হলাম তার জন্য আপনার বড় খোকাই কিন্তু দায়ী।

ওরকম ভাবতে পারিস। আবার অন্যরকমও ভাবা যায়।

সে কি রকম?

কৃষ্ণও কিছু কম কষ্ট করেনি। জামা নেই, জুতো নেই, বই খাতা নেই, পেটে ভাত নেই, সে একটা দিনই গেছে! সেখান থেকে এত উপরে উঠেছে—সে তার নিজের জোরে।

তা না হয় হল। কিন্তু সে ডাঙায় উঠল বলে যারা ডুবছে তাদের টেনে তুলবে না? বউয়ের আঁচল ধরে বসে রইল গিয়ে, এরকম কি কথা ছিল? আমরা যে তাকে মাথায় করে রেখেছিলাম বাবা!

যেমনটি চাস তেমনটিই যদি সব পাওয়া যেত, তা হলে আর সংসারের মহিমা কি? ভগবানের তো ক্ষমতার অভাব নেই! লহমায় মানুষের সব দুঃখ ঘুটিয়ে দিতে পারেন। দেন না বলেই মানুষের কিছু মান-মর্যাদা এখনও আছে।

পরসার দুঃখটাই দুঃখ নয় বাবা, সে যে আমাদের ছেড়ে চলে গেল।

পরসার দুঃখকে দুঃখ বলে ভাবিস না, সে খুব ভাল। কিন্তু সংসারের আরও সব দুঃখ আছে। আমরা হিষ্টি শতচ্ছিন্ন কাপড়, রিপু দিয়ে, সেলাই দিয়ে চালাতে হয়। রেগে যাস কেন?

মাখাটা গোলমাল লাগে।

হিংসের চোটেই মদ খাস?

রামজীবন কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে হঠাৎ বলল, আপনি কি অন্তর্যামী বাবা?

দূর বোকা! আমাকে ঠাওরালি কী তোর!

আমি যে বড়দার ওপর রাগের চোটেই মদ খাওয়া ধরেছিলাম, এত জ্বালাপোড়া নেবাই কিসে?

মদে কি জ্বালা জ্বড়ায়?

না বাবা। একটু অন্যরকম লাগে।

তাই তো। বড়দা অন্যরকম হয়ে যাস তখন! রামজীবন বলে চিনতে পারি না।

রামজীবন হাসল, বড়দার ওপর আমার বড় রাগ বাবা। কিছুতেই রাগটাকে কমাতে পারি না।

আমার একটা কথা মনে হয়।

কী বাবা?

যখন ছোটো ছিলি, তখন তুই ছিলি কৃষ্ণজীবনের সবচেয়ে ন্যাওটা। ছায়ার মতো পিছু পিছু ঘুরতি। যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই রাম। মনে আছে?

থাকবে না? খুব মনে আছে।

আমার মনে হয় আজও তুই বড়দাদাকে মনে মনে সবচেয়ে বেশি ভালবাসিস। কিন্তু হিংসের চোটে, রাগের চোটে তা বুঝতে পারিস না। রাগ আর হিংসের চাপানে ভালবাসাটা ঢাকা পড়ে আছে। ঠিক যেমন পানায় ভর্তি পুকুর। ওপর থেকে মনে হয় ডাঙা, কিন্তু নিচে টলটল করছে জল।

কেমন সুন্দর কথা বলেন আপনি বাবা! রোজ এমন করে বলেন না কেন?

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, ওরে, আমার তো মনে হচ্ছে আতা খেয়ে আমার একটু নেশা হয়েছে। নইলে এত বলি কি করে?

রামজীবন খুব হাসতে লাগল। শরতের সকালটা যেন সোনা ঝরিয়ে দিতে লাগল চারদিকে।

দেশে ও বিদেশে এত বেশি কনফারেন্স, সেমিনার এবং বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হয় তাকে যে, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিটা ঠিকমতো করে উঠতে পারে না। এ ব্যাপারে কৃষ্ণজীবনের অপরাধবোধ প্রবল। চাকরি ছেড়ে দিলেও এখন তার বিশেষ ক্ষতি নেই। বিদেশে ভাল চাকরির প্রস্তাব তো আছেই, তা ছাড়া এমনিতেই বিদেশ থেকে বক্তৃতা বাবদ সে বিদেশী মুদ্রা যা পায় তাতে স্বচ্ছন্দে সংসার চালিয়ে দিতে পারে। শ্রীর রোজগারের টাকাটাও কম নয়। কিন্তু কলকাতার চাকরিটার ওপর তার একটা মায়ার আছে। বিজ্ঞানহীন, ঔৎসুক্যহীন, উৎসাহহীন এই দেশের নিরুদ্যম ছেলেমেয়েদের মধ্যে সে একটা বিন্দুও তরঙ্গ প্রবাহিত করতে চায়। সংসারে বা সমাজে তাকে যতই বাস্তববোধহীন, অনামনক এবং প্রায় বোকা বলে মনে হোক না কেন, সে যখন ক্লাস নেয় তখন সমস্ত ক্লাস থাকে চিত্তাঙ্গিত, সম্বোধিত। তার চেহারা ভাল, গলার স্বর ভাল, চমৎকার ইংরিজিও বলতে পারে, কিন্তু সে সবচেয়ে ভাল পারে নিজেকে উজার করে দিতে। ক্লাসে কে শুনছে বা শুনছে না, কে নোট নিচ্ছে বা নিচ্ছে না সেটা বড় কথা নয়। সে মগ্ন হয়ে যায় তার বিষয়বস্তুতে। এত ডুবে যায় যে, ক্লাস শেষ হওয়ার ঘণ্টা অবধি কানে যায় না।

এবার শূজার আগে কয়েকটা দিন কৃষ্ণজীবন প্রাণ ঢেলে পড়াল। তার ছাত্রী ও ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই কৃতী হবে, যশস্বী হবে কৃষ্ণজীবন জানে। দেশে ও বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে এরা। কিন্তু শেষ অবধি এদের বেশির ভাগই মোটা বেতনের চাকরি করবে। চাকরিই করবে। প্রভুত ধনাগম হবে এদের। গাড়ি-বাড়ি হবে। নাম হবে। অহঙ্কার হবে। তাতে পৃথিবীর কিছু এসে যাবে না। কিছুই ইতরবিশেষ হবে না এই বিশাল গরিব ভারতবর্ষের। রুজি-রোজগারেই সীমাবদ্ধ থাকবে এদের জ্ঞান। গবেষণার ভিতর দিয়ে পৃথিবীর কিছু উপকারও করবে বটে এরা, তবু সীমাবদ্ধ থাকবে নিজেদের সীমাবদ্ধতায়। ওই খোলসটা ভাঙা দরকার। পৃথিবীতে জ্ঞানী ও কৃতীর কোনও অভাব নেই। অভাব নিজের সংসার, নিজের অভ্যাস ও চরিত্রের খোলে বন্দী নয় এমন মানুষের। কে কত বড় বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক হল, কে পেল কোন শিরোপা তা জেনে কোন লাভ হবে চরিত্র পরগনার মূর্খ এক গরিব চম্বীর ?

নিজের সীমাবদ্ধতাকে বড় বেশি টের পায় বলেই কৃষ্ণজীবন আজকাল আরও একটু বেশি অস্থির। সে কিছুতেই অর্জিত জ্ঞান ও দার্শনিকতার সঙ্গে জনজীবনের যোগাযোগের রাস্তাটা খুঁজে পায় না।

তার এক প্রাক্তন ছাত্রের সঙ্গে ওয়াশিংটনে দেখা হয়েছিল তার। ধীরেশ। একটা বেসরকারি সংস্থায় বিশাল চাকরি করে। তাকে বাড়িতে নিয়ে গেল নিমন্ত্রণ করে। বেশ বড়সড় বাড়ি। উলারের তেজে বাড়ি যেন ঝলমল করছে। ঝলমল করছে সুন্দরী বাঙালী স্ত্রী এবং মেয়ে। অনেকক্ষণ ধীরেশের সফলতার চিরুণ্টোলা লক্ষ্য করে মিতবাক কৃষ্ণজীবন বলেছিল, তুমি অল্প বয়সেই খুব উন্নতি করেছে।

ধীরেশ লজ্জার সঙ্গে বলল, এ কোশানিতে আমিই একমাত্র বাঙালী স্যার।

কৃষ্ণজীবন ধীরেশের দিকে চেয়ে বলে, এতে তুমি খুশি তো!

ধীরেশ উজ্জ্বল হাসি হেসেছিল।

কৃষ্ণজীবন তার ধীর, অনুগোষ্ঠিত কণ্ঠে বলল, এর পর যদি কখনও আসি আমি জানতে চাইবো পৃথিবীর ঋণ তুমি কতটা শোধ করেছে।

তার মানে স্যার ?

আমাকে অনেকেই পাগল বলে জানে, অ্যাবনরমাল মনে করে। কিন্তু আমি মনে করি প্রত্যেকটা মানুষই এই পৃথিবীর কাছে নানাভাবে ঋণী। যে যেমনই হোক, যত বড় বা ছোট, তার উচিত সেই ঋণ একটু করে শোধ করা। রোজ শোধ করা। যে-মানুষ পৃথিবীর ঋণ শোধ করে না, কিন্তু সুখভোগ করে, ঐশ্বর্য সম্বল করে, সে লুটেরা, তরুর। আর যাই করো, শুধু নিজেকে নিয়ে থেকো না।

ধীরেশ অপ্রতুষ্ট : তার সুন্দরী বউয়ের মুখবার। কৃষ্ণজীবন তাদের ডিনারের আসরটি প্রায় মাটি করে দিয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে আরও সব অতিথিরা এসে যাওয়ায় আবহাওয়া পাল্টে গেল। রবীন্দ্রসঙ্গীত, সুরা, সুস্বাদু খাবার ও নানা প্রসঙ্গের আভাষ মাটি হতে হতে ডিনারটা বেঁচে গিয়েছিল।

সেই থেকে কৃষ্ণজীবন কিছু সাবধান হয়েছে।

ইউনিভার্সিটির ঠিকানায়ে সেই ধীরেশের একটা চিঠি পেল কৃষ্ণজীবন। ধীরেশ চিঠির সঙ্গে পাঁচ হাজার ডলারের একটা চেক পাঠিয়েছে। লিখেছে, স্যার, অনেকদিন ধরে আপনার কথা ভাবছি। মনে হচ্ছে, আমি সত্যিই পৃথিবীর জন্য কিছু করছি না। হয়তো সেরকম কিছু করার কথা ভাবলেও কী করব তা স্থির করতে পারব না। কিন্তু আপনি কিছু করার চেষ্টা করছেন। আপনি যা করছেন তাতে আমার সমর্থন ও সহযোগিতা জানাতেই চেকটা পাঠাচ্ছি। আপনি টাকাটা কাজে লাগালে মনে করব আমিও পৃথিবীর খানিকটা কাজে লাগলাম। শুনলাম আপনি অষ্টোবরে লস এঞ্জেলসে আসছেন। আমার বাড়িতে যদি পায়ের ধুলা পেন্ন তবো ধন্য হবো।

কৃষ্ণজীবন চেকটার দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ ভাবল। তাই তো! বক্তৃতা দিয়ে বেড়ানো এবং ভাবনা-চিন্তা করা ছাড়া সে তো এমনি কিছু করে না যাতে টাকাটা কাজে লাগানো যাবে! সে কি ধীরেশের চেয়ে কম স্বার্থপর ?

চেকটা সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরল কৃষ্ণজীবন। তারপর ভাবতে বসল, কী করা যায়! কীভাবে কাজে লাগানো যায় টাকাটা ? ধীরেশ তো তার পৃথিবীর ঋণ শোধ করতে লেগেছে। কিন্তু সে এখন কী করে ?

বাড়িতে কেউ ছিল না। বিকেল পার হয়ে সঙ্গে ঘনঘোর হল সাততলার ঘরে। একা ভূতগ্রস্ত কৃষ্ণজীবন বসে বইল তার চেয়ারে। কোনও সিদ্ধান্তে পৌছোতে পারল না।

সন্দের পর রিয়া ফিরল তার ছেলেমেয়ে নিয়ে।

কি গো, বসে বসে কী করছো অন্ধকারে ?

একটা কথা ভাবছি।

কী কথা ?

আমার একটি ছাত্র কিছু টাকা পাঠিয়েছে। তার ইচ্ছে, কোনও সং কাজে টাকাটা খরচ করা হোক।

ওমা, এ তো ভাল কথা! দৃষ্টিস্তার কী আছে ?

আমি ভেবে পাচ্ছি না। তুমি বলতে পারো টাকাটা কিভাবে খরচ করা যায় ?

কত আশ্রম, মিশন আছে। দিয়ে দাও। দুর্গতের সেবা হবে।

কৃষ্ণজীবন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সেটাও ভেবেছি। কিন্তু সেটা তো ধীরেশ নিজেই করতে পারত। আমাকে টাকাটা পাঠাল কেন ?

তুমি সব ব্যাপারই কেন জটিল করে নাও বলে তো!

কৃষ্ণজীবন ম্লান হেসে বলে, খুব বেশি সহজ আর শটকাট করাই কি ভাল ? ধীরেশ তো আমেরিকাতেই টাকাটা কোনও সমাজসেবায় দিতে পারত। দেয়নি।

তা হলে যা ভাল বোঝা করো।

কৃষ্ণজীবন চুপ করে গেল। ধীরেশ তাকে একটু বিপাকে ফেলেছে।

দোলন কৃষ্ণজীবনের অন্ধ অনুকারী। বাবা যা বলে তাই তার কাছে বেদবাক্য। কৃষ্ণজীবন কবে তাকে শিখিয়ে দিয়েছিল, বাইরে থেকে ফিরে হাত পা মুখ ধুতে হবে, সে অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করে। আজও হাত মুখ ধুয়ে পোশাক পাল্টে তবে বাবার কাছে এল দোলন।

বাবা, আজ আকাশে মেঘ নেই, তারা দেখবে না ?

চলো যাই।

টেলিস্কোপ আর দোলনকে নিয়ে ছাদে উঠে এল কৃষ্ণজীবন। দোলন তারা দেখতে লাগল, কৃষ্ণজীবন বসে রইল তার পাশে।

আচ্ছা বাবা, আকাশে কটা যেন নীহারিকা আছে!

আমাদের জানার মধ্যে কয়েক শো কোটি। জানার বাইরে কত আছে তার তো হিসেব নেই।

শুনে শেষ করা যাবে না ?

না। সংখ্যাকে হার মানতেই হয় এক সময়ে। সংখ্যা দিয়ে আকাশের তারার হিসেব অসম্ভব।

দোলন অসহায়ভাবে বাবার দিকে চেয়ে বলে, তা হলে ?

কৃষ্ণজীবন মৃদু হেসে বলে, আকাশের দিকে চাইলে তুমিও যা আমিও তা। শিশুমান্ন।

তুমি তো কত জানো বাবা!

হ্যাঁ বাবা, যত জানছি, ততই বোকা হয়ে যাচ্ছি। থই পাই না।

আলোর গতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল তো, বাবা!

হ্যাঁ।

ওই স্পীডে যদি যাওয়া যায় তা হলেও কি আমরা কখনও আমাদের ছায়াপথের শেষে পৌঁছতে পারব না ?

না। আলোর গতিতে কোনও বস্তু কখনও ছুটতে পারে না। যদি পারে তবে সে আর বস্তু থাকে না।

তা হলে ?

আকাশের কথা আকাশের কাছেই থেকে যাবে। কিছু জানা যাবে, অজানা থেকে যাবে আরও অনেকটাই।

আমি তো গল্পের বইতে পড়ি, অনেক দূরের গ্রহ থেকে নানারকম মানুষ আসে। সত্যি বাবা ?

না দোলন। আজ অবধি আকাশের কোথাও কেউ আছে বলে জানা যায়নি।

একদম না ?

তা বলা যায় না। কিন্তু নক্ষত্রগুলো এত দূরে যে, তাদের গ্রহমণ্ডল আছে কি না তা ধরা যাচ্ছে না। আমরা যে সব নক্ষত্রের আলো দেখতে পাই সেগুলো হাজার, লক্ষ, কোটি বছর আগেকার পুরনো আলো, পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে অতটা সময় লেগেছে তাদের। এখন সেখানে কী হচ্ছে তা জানা যাবে ফের হাজার, লক্ষ, কোটি বছর পর।

উরেবাস!

সত্যিই উরেবাস। ওসব নিয়ে ভেবো না, মন খারাপ হবে।

আমি যখন ইকুলে বন্ধুদের কাছে তোমার কথাগুলো বলি তখন সবাই খুব অবাক হয়। বিশ্বাস করতে চায় না।

কী বলো ?

আমি আকাশ আর গ্রহ নক্ষত্রের কথা বলি। ওরা কেউ আমার মতো এত জানে না। বলে, ভ্যাট, গুল মারছিস।

জানে না বলেই বলে।

সূকান্ত নামে একটা ছেলে আছে, তার বাবা নাকি বলেছে মানুষ একদিন আকাশটা জয় করে নেবে। তাই বাবা। আমি কিছু বলেছি, পারবে না।

নেগেটিভ কথা না বলাই : : : : : তুমি বোধ হয় ঠিকই বলেছো। মানুষের ক্ষমতা খুব সামান্যই।

কোনওদিন পারবে না বাবা ?

না পারাটাই স্বাভাবিক।

বিজ্ঞান নাকি সব পারে বাবা ?

কৃষ্ণজীবন স্তিমিত গলায় বলে, বিজ্ঞান আমি কতটুকু জানি দোলন ? যতটুকু জানি তা দিয়ে কিছু অনুমানও করা যায় না। তোমরা বড় হয়ে তেমন বিজ্ঞানের সন্ধান কোরো। এখন অবধি মানুষের বিজ্ঞান বড় দুর্বল। বড় সামান্য।

বিভু বলে একটা ছেলে আছে, সে বলে, ভগবান-টগবান নেই। সব বাজে কথা। বিজ্ঞানের যুগে কি কেউ ভগবান মানে ? সত্যি বাবা ?

আমি জানি না দোলন। মানুষের অজানা কত কি আছে এখনও।

ভগবান নেই বাবা ?

কৃষ্ণজীবন একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে, হয়তো আছেন। বিজ্ঞান কিছু বলেনি যে ভগবান নেই।

বিজ্ঞান তা হলে কী বলেছে, বাবা ?

বিজ্ঞান বলে, যতদূর জানা যায় ততদূর পর্যন্ত ভগবান বলে কাউকে পাওয়া যায়নি।

ভগবান কি অনেক দূরে ?

হয়তো খুব কাছেই। আমরা ভুল করে দূরে তাঁকে খুঁজি।

আচ্ছা, ভগবান তো দূরের তারাগুলোকে চেনে, না বাবা ? ইচ্ছে করলেই চলে যেতে পারে ?

যারা ভগবানকে মানে তারা ওরকমভাবে বলে না। তারা বলে ভগবানই এই সব ঐহ-নক্ষত্র হয়ে আছেন, গাছপালা হয়ে আছেন, জীবজন্তু হয়ে আছেন, তুমি-আমি হয়ে আছেন।

সত্যি বাবা ?

তাই তো শুনি।

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তো!

তুমি তো খুব ছোট। এসব বুঝতে সময় লাগে।

আকাশের কথা ভাবতে ভাবতে আমার খুব মন খারাপ হয়ে যায়।

কেন যায় দোলন ?

ওই যে তুমি বলো, মানুষ কখনও আকাশের অন্য সব নক্ষত্রে যেতে পারবে না।

কৃষ্ণজীবন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, কিছু জিনিস আমাদের জানার বাইরেও থাক না দোলন।

কেন বাবা ?

মানুষ চোখ দিয়ে দেখে, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে। কিন্তু চোখ আর বুদ্ধিই তো সব নয়। অনুভব করতে হয়। ভাবতে হয়। বিশ্বজগতের সঙ্গে নিজেকে একাকার করে দিতে হয়।

সেটা কেমন বাবা ?

আমি কি সব কথার জবাব দিতে পারি ? ওই যে বললাম, আমার আজকাল কেবলই মনে হয়, আমি কিছুই জানি না।

দোলন বাবার কাছ ঘেঁষে বসে মুখের দিকে চেয়ে বলে, তুমি যখন ফরেনে যাও তখন আমার খুব কান্না পায়। কেন যাও বাবা ? এবার আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে ?

তোমার যে ইচ্ছা থাকে!

পূজোর ছুটিতে আর সামারে নিয়ে যাবে ?

আর একটু বড় হও, তখন নিয়ে যাবো। এখন মাকে ছেড়ে বাইরে গেলে তোমার কষ্ট হবে।

মাকেও নিয়ে যাবো। দিদিকেও। দাদাকেও।

ও বাবা, অত পয়সা কোথায় পাবো দোলন ? প্রেনের টিকিটের যে অনেক দাম!

তবে তুমি যে যাও!

আমার টিকিটের টাকা অন্যেরা দেয়। নইলে কি যেতে পারতাম ?

কেন দেয় বাবা ? তারা আমাদেরটা দেবে না ?

আমি তাদের কাজ করে দিই বলে তারা আমার ভাড়া দেয়। তুমি বড় হয়ে যখন কাজ করবে তখন তোমারটাও দেবে।

ব্যাপারটা গভীর হয়ে কিছুক্ষণ ভাবল দোলন। তারপর হঠাৎ উঠে পড়ে বলল, চলো বাবা, রিমোট কন্ট্রলের গাড়িটা চালাই দুজনে মিলে।

প্রস্তাবটা কৃষ্ণজীবনের খুবই পছন্দসই। বাচ্চাদের খেলনা নিয়ে খেলতে তার এখনও ভাল লাগে। ব্যাটারিচালিত ছোট ভিডিও গেম, রিমোট গাড়ি বা রুবিক কিউব নিয়ে মাঝে মাঝে সে দোলনের সঙ্গে মেতে যায়। তাতে তার মাথার ভার কমে যায়, মন হালকা হয়।

আজও দোলনের রিমোট গাড়ি নিয়ে খেলতে খেলতে মনটা ভালই লাগছিল তার। কিন্তু একটা পিন ফোটার মত ছোট্ট খোঁচা বিধেই রইল ভিতরে। ধীরে ধীরে টাকাটা তাকেই কেন পাঠাল ?

সামান্য সব চিন্তা ও উদ্বেগ কৃষ্ণজীবনকে বড্ড অনামনক করে দেয়। গুরুতর চিন্তা-ভাবনায় ছেদ পড়ে। চেকটা সে কি ভাঙবে, না কি ফেরত পাঠাবে ? সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

রাত গভীর হল। রাতের খাওয়া শেষ করে সবাই শুতে চলে গেলে রোজই অধিক রাত অবধি কিছু পড়াশুনা করে কৃষ্ণজীবন। এটা তার প্রিয় অভ্যাস।

ফোনটা এল অনেক রাতে। বারোটা বাজবার দশ মিনিট পর।

কী করছেন ?

কে বলছেন ?

হিঃ হিঃ! আমি অনু।

অনু! ওঃ, এত রাতে জেগে আছে কেন ?

আজ আমার ঘুম আসছে না। আমি তো জানি আপনি রাত জেগে পড়েন, তাই ফোন করছি। কেমন আছেন আপনি ?

তুমি কেমন আছো ?
ভাল নেই। মন খারাপ।
কেমন মন খারাপ ?
আমার মাঝে মাঝে ভীষণ মুড অফ হয়ে যায়।
তুমি খুব মুড়ি, তাই না ?
খুব। আচ্ছা, আমি আপনাকে ডিস্টার্ব করছি না তো!
না। আমি ছেলেমানুষদের সঙ্গে কথা বলতে ভালবাসি।
আমি মোটেই ছেলেমানুষ নই। আপনি আমার ফ্রেন্ড না ? ফ্রেন্ডকে বিলিটল করতে নেই, জানেন না ?
ওঃ, তাই তো। কিন্তু দোলনও তো আমার খুব বন্ধু।
দোলন আর আমি তো এক নই। আপনি বড়ও সেকলে। এত ওন্ডি সেজে থাকেন কেন বলুন তো! আমি একটু ওন্ডিই বটে।
মোটেই না। ইউ আর এ নাইস পারসোনেবল ম্যান। আই লাইক ইউ ভেরি মাচ।
কৃষ্ণজীবন শকাজড়িত এক রকমের হাসি হাসল। তারপর বলল, তুমি একটি পাকা আর বিচ্ছ মেয়ে।
পাকা আর বিচ্ছ ? তা হলে ছেলেমানুষ নই তো!
এড অ্যাডাল্ট হওয়ার ইচ্ছে কেন ? যতদিন পারো শৈশবকেই ধরে রাখো। শৈশবের মতো সুন্দর সময় আর নেই। বড় হলে দেখতে পৃথিবীটা একদম বিচ্ছিরি।
কিন্তু আপনি তো পৃথিবীটাকে খুব ভালবাসেন।
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কৃষ্ণজীবন বলে, তা বাসি। সেই ভালবাসার জ্বালায় জ্বলেপুড়ে মরছি।
কবে দেখা হবে বলুন তো! আপনাকে আমার ভীষণ দরকার।
তাই বুঝি ? তবে আসো না কেন ?
যদি হ্যাংলা ভাবেন সেই ভয়ে ঘন ঘন যাই না। যদিও খুব যেতে ইচ্ছে করে। আপনার কথা শুনতে শুনতে আমার কেমন একটা হিপনোটিক কন্ডিশন হয়।
এটা কি কমপ্লিমেন্ট ?
না। স্টেটমেন্ট অফ এ ফ্যাক্ট।
শোনো অনু, তুমি রোজ এলেও তোমাকে হ্যাংলা ভাববো না। এতে হ্যাংলামির কি আছে ?
আপনি বিরক্ত হবেন না ?
একদম না।
আসলে আমার স্কুলেও পড়ার ভীষণ প্রেশার ছিল। সময় পাচ্ছিলাম না। বাবার হার্ট অ্যাটাক হওয়ায় আমার অনেক ব্যাক লগ জমে গেছে।
তোমার বাবা এখন কেমন আছেন ?
অফিসে যাচ্ছে। নাউ হি ইজ ও-কে। কিন্তু হার্ট একটা ভীষণ আনপ্রেডিক্টেবল থিং। তাই না ?
ঠিকই বলেছো।
অনু হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল।
হাসলে কেন ?
হার্টের কথায়। আপনার হার্ট, আমার হার্ট, সব হার্ট-ই কিন্তু আনপ্রেডিক্টেবল।
কথাটার মানে কি অনু ?
আমাদেরও তো হার্ট অ্যাটাক হতে পারে ? পারে না ?
তুমি খুব দুট্ট মেয়ে।
আপনি মিনিংটা ধরতে পারলেন কি ?
পারলাম।
আপনি কি জানেন যে, ইউ আর কোয়াইট অ্যাট্রাকটিভ ?
জানি না। কেউ এরকমভাবে আমাকে বলেনি কখনও।
আমি বলছি বলে রাগ করবেন না তো!
এটা তো খুশি হওয়ার মতোই কথা অনু। এই বয়সে টিনএজারদের কাছ থেকে এরকম কমপ্লিমেন্ট তো রেয়ার জিনিস।
শুনুন, আমার কিন্তু খুব বকবক করতে ইচ্ছে করছে।
করো না!
আপনি যে হাই তুললেন এইমাত্র!
যাঃ, কোথায় হাই তুলেছি ?
তোলেননি তো!
না। আমার হচ্ছে ইচ্ছে-ঘুম।
আমার আজ কেন ইনসোমনিয়া হচ্ছে, জানেন ?
কি করে জানবো ? শুনলাম তো মুড অফ।
হ্যাঁ, তাই। আজ আমি সকাল থেকে অনেকের সঙ্গে ঝগড়া করছি।

ও বাবা, ঝগড়াও করো নাকি ?

আসলে ঝগড়া করে আমি সকলের কাছে হেরে যাই।

সেটা কিন্তু খুব ভাল। কি নিয়ে ঝগড়া হল ?

তার কোনও মাথাযুগু ছিল না। এটা সেটা নিয়ে। মুড় অফ থাকলে যা হয়। আজ যেমন আমার একজন বন্ধুকে বলেছিলাম, তোর নাকটা কিন্তু বিচ্ছিন্ন। বাস লেগে গেলে। তারপর মায়ের সঙ্গে লাগল, দিদির সঙ্গে লাগল। রাতে ঘুম আসছে না, গুয়ে গুয়ে মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ আপনার কথা মনে হল। মনে হল, আপনার মতো ভাল বন্ধু আমার আর কেউ নেই।

সত্যি ?

সত্যি। ভীষণ সত্যি।

॥ ৩৮ ॥

নিমাইচরণ আছো নাকি ? ও নিমাইচরণ!

নিমাই ঘরেই ছিল। মাটির মেঝেতে মেলা গর্ত হয়েছে, ধসে বসেও গেছে কিছু জায়গা। মাটি কুপিয়ে এনে ভরাট করছিল গলদঘর্ম হয়ে। শাবলটা রেখে দরজার কাছে এসে দেখে, সনাতন দাঁড়িয়ে আছে। রোগা, কালো, ছোটখাটো সনাতনের সঙ্গে নিমাইয়ের নিজের একটা ভারি মিল আছে।

ক্ষেত কোপাচ্ছিলে নাকি হে! কাদামাটি মেখে বসে আছো যে!

নিমাই হাসল, না। বর্ষার পর দেখছি ঘরে মেলা গর্ত হয়ে আছে। পোকামাকড়ের তো অভাব নেই। মাটি ঠাসছি।

বীণাপাণি নেই বুঝি ঘরে ?

না। এসো, ঘরে এসো বোসো।

দুনিয়াতে ভাল লোকের বড় অভাব যাচ্ছে। খুব টানাটানি। সনাতনকেও তাই তেমন ভাল লোক বলা যায় না। আজকাল পেটের দায়ে লোকে নানা ধান্দা আর ফিকিরে ঘেরে। টাকাটা সিকেটার জন্য জলের মতো মিছে কথা কয়। একসময়ে পগার সঙ্গে সাঁট ছিল সনাতনের। তবে ভাগীদার নয়, সঙ্গে সঙ্গে পিকির নিয়ে ঘুরত। পগা খুন হওয়ার পর কাকার দল এর ওপরেও হামলা চালিয়েছিল, যদি চুরি-হওয়া ডলারের সন্ধান পাওয়া যায়। সনাতন ভাল লোক না হতে পারে, তবে নিমাইয়ের সঙ্গে বেশ বনিবনা আছে। একটা জায়গায় একটু অমিল। নিমাই এক বিয়ের বউ নিয়েই হিমসিম খায়, সনাতনের তিনখানা বিয়ে। সনাতন কিছু লাখোপতি লোক নয়, টানাটানির সংসারে তিনখানা বউ নিয়ে থাকতে বৃকের পাটা লাগে। সনাতনের ওইটেই আছে। আর বিশেষ কিছু নেই।

রবারের চটিজোড়া বাইরে ছেড়ে সাবধানে ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক চেয়ে সনাতন বলল, বসার ব্যবস্থা নেই দেখছি।

নিমাই উদার গলায় বলে, বিছানাতেই বোসো না। জলচৌকি আর মোড়া উঠোনে, ডালের বড়ি রোদে দেওয়া হয়েছে। তা কি খবর-টবর বোলো।

খবর বিশেষ কিছু নেই। দোকানখানা বেচে দিতে হল। চলছিল না তেমন।

নিমাই একটু অবাক হয়ে বলে, বেচে দিল! এখন দোকানই হল বাঁধা লক্ষী। আমি কতকাল ধরে চেষ্টা করেও দোকান দিতে পারলাম না আজও। আর তুমি বেচে দিলে!

বাজারে বা জমাটি জায়গায় দোকান হলে কি বেচতাম নাকি! তেমন আহাম্যক পাওনি। পাড়ার মধ্যে ছোট্টো কারবার। বাকি না দিলে দোকান চলে না, আদায় উসুল করতে নাভিস্থাস ওঠে। ডিমসুতো থেকে জুর পেট-খারাপের অ্যালোপ্যাথি ওষুধ অবধি রাখতে হত। মাল কিনবার পয়সাটা কোথেকে আসবে বোলো! তার ওপর ঘরে তিনখানা চামুড়া খাড়া হাতে সর্বদা আমার মুণ্ড খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাই দিলাম বেচে। যা দাম উঠল তা ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিয়ে দিয়েছি। এখন ঘরে খানিক শান্তি হয়েছে। মেয়েমানুষের মন্তর হল টাকা। যখনই লাফঝাপ করবে কিছু টাকা ফেলে দাও, মুখে কুলুপ।

তা নয় বুঝলুম, কিন্তু তোমার এখন চলবে কিসে ?

আরে, সেই পরামর্শই তো আসা তোমার কাছে। হাত পা ধুয়ে বোসো জুত করে। একটু বুদ্ধি বের করি দুজনায়।

নিমাইয়ের মনটা প্রসন্ন হল। তার সঙ্গে পরামর্শ খুব কম লোকই করে। সে হাত মুখ ধুয়ে গামছায় কষে হাত পা মুছে আগোগোছে বিছানায় বসল। বলল, তারপর বোলো।

সনাতন খুব নিবিষ্ট হয়ে ভাবছিল। বলল, দুনিয়ায় মেলা লোক করে-কর্মে যাচ্ছে, চোখের সামনে সব ধাঁ করে বড়লোক হয়ে যাচ্ছে, দেখছো তো! কিন্তু নিমাইচরণ, আমরা কমতিটা কিসে বলতে পারো? আমাদের কিছু হচ্ছে ন কেন!

সকলের কি সব হয় ? না সব ?

তুমি একটা সাধু-বোষ্টম মানুষ, ওকথা বলতে পারো। কিন্তু আমার বৈরাগ্য নেই। আমার দুটো পয়সার মুখ দেখতে হচ্ছে যায়। তিনখানা সংসার বলে নয়, একটু মনের মতো থাকবে—এ আমার অনেক দিনের ইচ্ছে। কিন্তু কি করলে যে হবে, তা বুঝতে পারি না।

এক আহাম্যক এলেন আর এক আহাম্যকের কাছে বিষয়বুদ্ধি নিতে। সে বুদ্ধি থাকলে আমিই কি বসে থাকতাম নাকি!

সেইটে ভাবি বলছি তো তোমার কথাই আমার মনে পড়ে সবসময়ে। ভাবি কি জানো, আমারও ভিতরে মাল আছে, তোমারও ভিতরে আছে। একবার তেড়েফুঁড়ে লাগলে আমরাও কম যাই না। কি বোলো ?

গামছাখানা কোল থেকে তুলে নিমাই নিজের মুখটা মুছে বলে, কী করতে চাও বোলো তো!

দোকান-টোকান আর করে লাভ নেই ভায়া। বড় ভাদভাদে কাজ। পয়সা নেই, তার ওপর রোজ লোকজনের সঙ্গে আদায় উসুল নিয়ে ঝগড়া-কাজিয়া হচ্ছে। ও আমার আর ভাল লাগে না। একটু বড় কিছু ফাঁদতে না পারলে জীবনটাই বৃথা।

নিমাই একটু চুপ করে থেকে বলে, বড়লোক হতে সাধ হয়েছে বুঝি ? কাজটা শক্ত ।
সনাতন তার সরু মুখখানা ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে এগিয়ে এনে বলে, শক্তটা কিসের ? আমাদের কোন জিনিসটা নেই বলা তো!
আমার কথা বলতে পারি। আমার টাকা নেই, বড় হওয়ার তেমন তেজোলা ইচ্ছেও নেই। সেইজন্যই বীণার হাতে-
তোলা হয়ে বসে আছি। মনে হচ্ছে আমাকে দিয়ে তেমন কিছু হবে না।

সনাতন একথায় যেন বসে বসেই নেচে উঠল, কেন হবে না ? বুদ্ধি করে, মাথা ঠাণ্ডা রেখে ঠিকমতো টাকা খাটালে না
হবে কেন ? চারদিকে দুনিয়াটা ধাঁ-ধাঁ করে বেড়ে উঠছে, আমি যেন পিছিয়ে পড়ছি। অথচ ভেবে দেখেছি, আমার কিছু
কমতি নেই। তোমারও নেই।

বললাম যে, আমার টাকা নেই। টাকা হলে ভেবে দেখতাম।

তোমার বউয়ের কিম্বদন্তি টাকা আছে।

তোমার মাথা! বউ কত টাকা মাইনে পেতে জানো ? বড়লোকের কুকুরের পিছনেও তার চেয়ে ঢের বেশী খরচ হয়।
এই সবে দুদিন হল কাকা অন্য একটা কাজে লাগিয়েছে, কিছু বেশী পাচ্ছে।

নুন-পান্তার জোগাড়টুকু তো আছে। তাই বা কম কিসে ? আমি বলি কি এরকম জড়ভরত হয়ে থাকার চেয়ে কিছু
একটাতে নেমে পড়ি চল।

কিসে নামবে ? ভেবেছো কিছু ?

না। তোমার সঙ্গে সেই নিয়েই কথা। কিছু একটা ঠিক করো তো! এভাবে আর পারা যায় না।

দোকান বেচে কত টাকা পেলে ?

ও দোকানের দামই বা কী ? মালের দাম সমেত দোকানঘরের জলেরই দাম ধরো।

কে কিনল ?

লটারিওলা পন্থী। পাড়ার মধ্যে দোকান বলে দরটাও উঠল না।

না চেলেই ভাল করত।

ও কথা বোলো না। বাজারে চার হাজারেরও বেশী অনাদায়ী টাকা পড়ে আছে। মাল তুলতে পারছিলাম না।
আমাদের ওপর বাকির খদ্দের। পশু কিনল দোকান করবে বলে নয়। সে অন্য কারবার ফাঁদবে। এটাকে গুদামঘর করবে। তা
তার যা-খুশি করুকগে। আমার আর ওসব ছোটখাটো কারবারের দিকে নজর নেই। তুমি কথাটা গ্রাহ্য করছো না কিন্তু!

করছি। কিন্তু মাথায় বুদ্ধি খেলছে না। সময় লাগবে।

সময় কি আর বসে থাকবে ভায়া! বয়সও বসে পান-তামাক খাবে না, জিরোবে না। কলঘড়ি টিকটিক করে খরচ হয়ে
যাবে। আয়তে বেড় পাই এমন জিনিস করতে হবে।

আমার বিষয়বুদ্ধিতে মেলা ফাঁক। আমাকে দিয়ে বড় কিছু হওয়ার নয়। বীণা মনোহারি দোকানের কথা বলে,
তাইতেই আমি ভয় খাই। ছোটখাটো একটা ফল-পাকুড়ের দোকান অবধি আমার দৌড়।

ফলের দোকান থেকে ক' পয়সাই বা পাবে ? একটু বড় কিছু ভাবো। ঠিকাদারি-টারি করলে হয় বা একটা কারখানা
গোছের কিছু।

উরেব্বাস! তোমাকে নির্ধাৎ ভুতে পেয়েছে।

কেন ? কী এমন বললাম ?

আমি এক ঠিকাদারের চৌকিদার ছিলাম, তাতে টাকার খেলা বড় কম দেখিনি। গোড়াউনে দেড় দু'লাখ টাকার মাল
সবসময়ে থাকত। পাঁচ-সাতটা ট্রাক রোজ খেপ মারত। পঞ্চাশটা কর্মচারী আর শ'খানেক কুলির বেতন, ইট, পাথর,
সিমেন্ট, কাঠ কত কি জোগাড় করতে হত, হিসেব রাখতে হত! ও সে এক গন্ধমাদন ব্যাপার।

সনাতন একটু যেন দমে গেল। তারপর বলল, আচ্ছা, প্রাস্টিকের ব্যাগের কারবারটা কেমন ? ধরো যদি নিজেরা তৈরি
করে বেচি ?

সব ব্যবসাই ভাল। সব কিছুরই বাজার আছে। তবে অক্লিসিক্স জানা চাই।

কে একজন বলছিল সেদিন, এ তল্লাটে দেশলাই তৈরির কারখানা নেই। সেটা করলেও তো হয়।

হয় তো বটেই। ফেল কড়ি, মাখে তেল। দেশলাই করতেও কম হাঙ্গামা নাকি ?

তুমি সব কথাতেই জল ঢেলে দিছো! সকালবেলাটায় তোমার কাছ থেকে দুটো ভাল কথা শুনে এলাম।

নিমাই হেসে বলে, ভাল কথা আজকাল আর পেতে আসতে চায় না। ভাল কথা মানেই মিছে কথা। মন-রাখা কথা।
কথা দিয়ে কীই বা হয়! তা বাড়ির অবস্থা কী তোমার ? ঝগড়াঝাঁটি হচ্ছে না তাহলে ?

সনাতন একটা ভ্যাঞ্চারি দেওয়ার মতো মুখ করে বলে, আমাদের সংসারে ঝগড়া দিয়ে দিন শুরু হয়, ঝগড়া দিয়েই
শেষ হয়। ঘুম ভাঙল কি লেগে পড়ল। মানুষ যে মানুষের এত শত্রু হয়, তা না দেখলে বিশ্বাস হবে না। ভাবি, একটা কাজ
কারবার নিয়ে মেতে থাকলে সংসার থেকে একটু তফাতে থাকতে পারতাম।

সংসার মানেই ভেজাল। ও নিয়ে ভেবে কী হবে ?

আজকাল আর ভাবি না। টাকাপয়সা দিয়ে দিয়েছি, এখন নিজের নিজের আখের দেখুক।

নিমাই হাসল, ওটা একটা কথা হল ? সংসার যদি এত জঞ্জাল তবে তিন তিনটে বউ ঘাড়ে নিলে কেন ?

সনাতন চুপ করে রইল। কৃতকর্মের জন্যই দুঃখেই বোধ হয়। তারপর বলল, একটা বড় রকমের কিছু আমাকে
করতেই হবে। তখন তোমাকেও সঙ্গে নেবো।

নিও। বেকার বসে আছি, কোনও কাজে লাগলে ভালই হবে। তবে হঠাৎ করে বড় লাফ দিও না। মাজা ভাঙবে।

তা ভাঙুক। তেমন বড় করে না ফাঁদতে পারলে বেঁচেই বা কী সুখ হচ্ছে বলা তো! তোমার কাছে দুদণ্ড বসলে মনে
বেশ শান্তি পাই।

সনাতন আরও খানিক আগভূমি বাগডুম বলে বিদায় নিল। দোকানে গিয়ে এখন সময় কাটছে না তার। নিমাই হাতের কাজ সারতে ফের উঠে পড়ল। ঘরের পিছন দিকটার ভিত ক্ষয়ে গেছে অনেক। বেড়ার নিচে বেশ বড় গর্ত। চোর এলে আর সিঁদ কাটতে হবে না। সেখানটায় মাটি চেপে বসানো কঠিন কাজ। অনেকটা সময় লাগল নিমাইয়ের। ঘরে আর একটা গর্ত বেরোলো মাটির একটা জালার নিচে। সেটায় মাটি ঠাসতে গিয়ে ভিতরে সাদামতো কী একটা নজরে পড়ে গেল তার। প্রাস্টিকে মোড়া একটা টিফিন বাস্কেটের মতো।

নিমাই হাত ঢুকিয়ে জিনিসটা টেনে বের করল। তারপর অবাক হয়ে দেখল, সাদা রঙের খুব বড় একটা টিফিন বাস্কেট। কিছুদিন আগে তাকে দিয়েই এটা কিনিয়ে এনেছিল বীণা। বাস্কেটটা খুলে সে আরও হাঁ হয়ে গেল। ভিতরে বেশ একটা মোটাসোটা প্যাকেট ওজন আছে। প্যাকেটটা খুলে এত হতভম্ব হয়ে গেল নিমাই যে, পাক্সা দশ মিনিট চেয়ে বজ্রাহতের মতো বসে রইল। দরজা জানালা হাট করে খোলা। সেটা খেয়াল ছিল না নিমাইয়ের। তার মনে তো পাপ নেই। মৃদু একটা গলা খাঁকারির শব্দে একবার চেয়ে দেখল, সনাতন ফিরে এসেছে। দরজার বাইরে থেকে হাঁ করে দেখছে তাকে। কিন্তু হঠাৎ কি মনে করে সে পট করে ঘুরে পা চালিয়ে চলে গেল।

এই সেই জিনিস যার জন্য এত খুনখারাপি, এত অশান্তি! এল কোথা থেকে? না, বেশী বুদ্ধি খাটাতে হল না তাকে। দুইয়ে দুইয়ে যোগ করলে যে চার হয় এটা এ যুগে কে না জানে?

নিমাই প্যাকেটটা সাবধানে মুড়ে ফের গর্তের মধ্যেই রেখে দিল। ওপরে মাটি ঠেসে দিল ভাল করে। গোবর মাটি গলে সারা ঘর নিকিয়ে দিল। আজ রোদ উঠেছে চড়চড়ে। তাড়াতাড়ি ঘর শুকিয়ে যাবে।

উঠানে কলরমের অমগাছটার স্তলয় বসে নিমাই আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগল। অনেক কথাই মনে পড়ল তার। বীণা তাকে একদিন বলেছিল, হঠাৎ লটারির টাকা পেলে সেটা অধর্ম হবে কিনা! আরও অনেক কিছু।

বীণার নতুন চাকরিটা হওয়ার পর থেকে দিনের বেলাটায় নিমাইকেই রাখতে হয়। বীণা সময় পায় না। কাকার কারবার দু'মাস কিমিয়েছিল, এখন আবার রমরম করে চলছে। বীণার এখন অনেক কাজ।

রান্না সামান্যই হয়। একটা ঝোল আর ভাত। বড় জোর তার সঙ্গে কিছু একটা সেদ্ধ। নিমাই সেটা করে ফেলল। স্নান করে চুপচাপ বসে রইল ফের গাছতলায়।

বীণা ফিরল দুপুর গড়িয়ে। মুখখানা বেশ হাসিখুশি। নতুন চাকরিতে নতুন রকমের সুখ আছে। শোনা যাচ্ছে ঝাংলিহটা ঠিকমতো চললে বিশ্ববিজয় অপেরার পালাও নামবে। সেটা পুজোর মধ্যেই।

খেতে বসে বীণা বলল, কী গো, মুখখানা আজ অমন কেলে হাঁড়ির মতো কেন? কী হল আবার?

বলতে সাহস হয় না।

বীণা একটু অবাক হয়ে বলে, কী এমন কথা!

বিজ্ঞেস করলে সত্যি কথা বলবে তো?

বলব না কেন? কী হয়েছে?

আজ ঘর মেরামত করতে গিয়ে জালার নিচের গর্তে একটা জিনিস পেলাম। একটা প্যাকেট। তাতে মেলা ডলার আর পাউন্ড।

বীণার মুখখানা হঠাৎ ছাইবর্ণ হয়ে গেল। চোখের পলক নেই।

এ কি পগার সেই জিনিস বীণা?

বীণা মাথাটা ধীরে নামিয়ে নিল। তারপর ক্ষীণ স্বরে বলল, হ্যাঁ।

সে রেখে গিয়েছিল তোমার কাছে?

হ্যাঁ।

বলোনি তো!

বলেছি ভূমি রাখতে দিতে আমার কাছে?

না। কিন্তু সে পরের কথা। বলোনি কেন?

বলিনি, তোমাকে বিপদে ফেলতে চাইনি বলে।

নিমাই দুঃখ ছলোছলো চোখে বলে, পরের জিনিস ফিরিয়ে দিলে না কেন? ওতে যে কত সর্বনাশ হয়ে গেল!

কাকে ফিরিয়ে দিতাম বলো তো! কার টাকা ওটা? পগা রেখে গিয়েছিল। সে খুন হল তো টাকার ওয়ারিশ কে? কাকে গিয়ে বলব যে, এই হল পগার টাকা, আপনি নিন?

কাকা যখন এল তখন দিলে না কেন?

ওকে দেব কেন? ও টাকা তো কাকার নয়, পাপা সিং-এর কিনা তাও ঠিকমতো জানি না। তবে পাপের টাকা, এটা ঠিক। তাই ভাবলাম, এ টাকা আসলে কারও নয়। যে পাবে তার। কাউকে বলিনি, লুকিয়ে রেখেছি। তবে তোমাকে বলতে চেয়েছি অনেক বার। কিন্তু ভূমি অবুধ মানুষ, সাধুসন্ত মানুষ, ভূমি সংসারী মানুষের মাথা দিয়ে চিন্তা করবে না। তাই সাহস হয়নি।

টাকটা আমাদের তো নয় বীণা।

তাই বা বলছো কি করে? টাকার গায়ে কি কারও নাম লেখা আছে? পগা তো আমাকে বলে যায়নি এ টাকা কাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। বলে গেলে দিলাম।

কিন্তু দুটো লোক যে খুন হল!

খুন হয়েছে তার আমি কী করব বলো? এক-আধবার ইচ্ছে হয়েছে কাকাকে গিয়ে টাকটা দিয়ে আসি। পরে ভেবেছি, সময়মতো দিইনি, এখন দিলে হয়তো লোকটা রেগে যাবে, আমাকেও আর বিশ্বাস করবে না। সংসারে চলতে অনেক কুটবুদ্ধি চাই গো। শুধু ভালমানুষী নিয়ে চলা কঠিন।

নিমাই মাথা নেড়ে বলে, কথটা মানতে পারি না। টাকাটা যখন আমাদের নয় তখন ওটা লুকিয়ে রেখে নিজের অশান্তি বাড়াতে গেলে কেন ?

তোমাকে বলব বলে ভেবেছিলাম। তবে আরও পরে। আমাদের যা অবস্থা তাতে চলে না। ভেবেছিলাম তোমাকে সব খুলে বলে এ টাকা দিয়ে তোমাকে একটা ভাল দোকান করে দেবো। তারপর নাটক-ফটক সব ছেড়ে দিয়ে সংসার করব। এরকম ভাবতে পারলে বীণা!

জানি তো, তুমি মানবে না। তবু টাকাটা ঘরে আছে বলে একটু যেন জোর পাই। আগে বলো, টাকাটা কি সরিয়ে ফেলেছো ?

না বীণা। সরাবো কেন ? যেখানে ছিল সেখানেই আছে।

আমাকে তোমার ঘেন্না হচ্ছে ?

নিমাই সবগে মাথা নেড়ে বলে, তোমাকে ঘেন্না করার সাধিই আমার নেই। কিন্তু বড় মায়ী হয়, দুঃখ হয়। লোভের জালে পড়লে মানুষের বড় কষ্ট।

তোমার কেবল ওই কথা!

আমি যা বলি তা যদি মানতে না পারো মেনো না। কিন্তু কথটা বড় ঝাটি। তবে কিনা আমার মুখে মানায় না।

আমি তো বলছি তুমি ভাল লোক। তোমাকে কোনও পাপ করতে হবে না। পাপ শুধু এই পাপীয়সীই করুক। তুমি বাধা না দিলেই হল।

তাহলে কি তুমি আমার কেউ নও ? সম্পর্কটা কি এমন যে, তোমার মন্দ হলেও চুপ করে থাকব ?

চুপ করে না থাকলে যে আমাদের উপায় নেই!

নিমাই কিছুক্ষণ দম ধরে থেকে বলে, টাকাটা নষ্ট করে ফেলবে বীণা ?

বীণা চমকে উঠে বলে, বলাকী! লক্ষ্মী সেধে ঘরে এসেছেন, নষ্ট করে ফেলব কেন ?

নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, লক্ষ্মী চোরাপথে এলে আর লক্ষ্মী থাকে না কিনা। টাকাটা বড়ই অলক্ষ্যে। পগা গেল, আর দু-দুটো তরতাজা লোক চলে গেল। সেই খুন-হওয়াদের একজনের চাকরিতেই তুমি ঢুকেছো। কেমন যেন অসোয়াস্তি হচ্ছে। লক্ষণ কিছু ভাল দেখছি না।

বীণা একটু নরম হয়ে বলল, টাকাটা নিয়ে তুমি যে অশান্তি করবে তা জানতাম। শোনো, ও টাকা যেমন আছে থাক, আমি ওটাতে হাত দেবো না। টাকাটা আমাদের ঘরে ঘুমিয়ে থাকবে। তাহলে তোমার আপত্তি নেই তো ?

নিমাই কাহিল মুখে বীণার দিকে চেয়ে থেকে বলে, কিসে পাপ হয়, কোথা থেকে কোন ফুটো দিয়ে কর্মফল এসে তোকে, তা কে জানে! আমি বোকাবুদ্ধির মানুষ। সাদামাটা কী বুঝি জানো ? ওসবের মধ্যে জড়তে নেই! রাস্তায় পয়সা পড়ে থাকলেও আমি কখনও কুড়োই না। পয়সা বড় মারাত্মক জিনিস।

তুমি ভয়েই মরলে। ভয়-ভয় ভাব সবসময়ে থাকলে মনটা দুর্বল হয়ে যায়। অত ভয় পেয়ো না তো! আমরা গরিব মানুষ, আমাদের অত ঝুটিনাটি পাপ ভগবান ধরবেন না। গরিবের পাপ তাপ ভগবান মকুব করে দেন।

ওকরম বুদ্ধি ভাল নয় বীণা। পয়সা জিনিসটাই খারাপ। কত লোভী, পাপী, খুনী, কুপণের হাত ফেরতা হয়ে তবে আমাদের হাত দিয়ে আসে। আমার কী মনে হয় জানো ? পয়সার মধ্যে ওসব মানুষের ছাপ থেকে যায়। এক একটা টাকা যেন অনেক লোভ পাপ দীর্ঘশ্বাস ধরে রাখে।

তোমাকে যে পাগলামিতে ধরেছে গো!

তা হবে। আমার মনটা বড় খারাপ। তার ওপর সনাতনটাও দেখে গেল।

বীণা ভয়ঙ্কর চমকে উঠে বলল, সনাতন দেখে গেল মানে ?

আজ সকালে এসেছিল বুদ্ধি পরামর্শ করতে। নতুন কারবার খুলতে চায়। সে চলে যাওয়ার পর ঘর সারতে গিয়ে বাস্কাটা পেলাম। পেয়ে যখন মাথায় হাত দিয়ে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছি, তখন কী মনে করে সনাতন ফিরে এসেছিল। দরজার বাইরে থেকেই নজর করেছে বোধ হয়। কিছু না বল তাড়াতাড়ি চলে গেল।

সর্বনাশ!

নিমাই মাথাটা বুঝদারের মতো নেড়ে বলে, সর্বনাশেরই কথা কিনা! টাকা বড় সর্বনেশে জিনিস। তার ওপর এ হল বেওয়ারিশ টাকা, অধর্মের জিনিস। যতক্ষণ ঘরে থাকবে ততক্ষণ তোমাকে ভয়ের বাঘে খাবে, লোভের ভালুক এসে সাপটে ধরবে। সনাতন জেনে গেল বলে ভয় পাছো, হস্তের টাকা হলে ভয়ের কিছু ছিল, বলা ?

তুমি ভাষণটা একটু থামাবে ? কত বড় বিপদ ডেকে আনলে বলা তো! আহাম্মকের মতো সব বের করে বসেই বা ছিলে কেন ? এখন কী হবে!

নিমাই মুখ কাঁচুমাচু করে বলে, আমি তো জন্ম-আহাম্মক। আমার কথা বাদ দাও।

বীণা কান্দো-কান্দো হয়ে বলে, পশু খানিকটা জানে। একবার ওকে কয়েকটা ডলার বেচে যে কী বোকামিই করেছি! নাঃ, বনগায়ে আর থাকা যাবে না। হ্যাঁ গো, পালপাড়ায় যাবে ?

পালপাড়া! সেখানে গিয়ে কী হবে ?

হবে কিছু একটা।

পালাতে চাইছো নাকি ? ওতে সুবিধে হবে না। পালপাড়া তো আর তেমন দূরের জায়গা নয়। এদের পাল্লার মধ্যেই।

বীণা কান্দো-কান্দো মুখ করে বলল, তাহলে কী হবে ? আমার যে সব গেল। কাকার কানে কথটা গেলে যে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

নিমাই খুব শান্ত ঠাণ্ডা গলায় বলল, মানুষ ভয় পেলে নানা আগড়ম্ব বাগড়ম্ব ভাবতে থাকে, উট্টোপাল্টা সব চিন্তা আসে। বীণাপাণি, ভয়টাকে যে কেন ঘরে পুষে রেখেছো সেটা ভাল করে ভেবে দেখ।

সব নষ্টের গোড়া তো তুমি! কেন যে মাটি খুঁড়ে বের করলে লুকানো জিনিসটা!

নিমাই মাথা নেড়ে বলে, সব ভবিতব্য। আমার তো ও বস্তুর যৌজ পাওয়ার কথাই নয়। কিন্তু দেখ ভবিতব্য এমন যে, তুমিই আমাকে ক'দিন ধরে কেবলই বলে যাচ্ছে, ওগো, ঘরদোর যে গেল গর্তগুলো এবার বুজিয়ে ফেল। জানোই তো ঘর সারতে গেলে ওটা চোখে পড়বে যেতে পারে! মাটির নিচে যে তোমার প্রাণভোমরা রয়েছে সে তো আমার জানার কথা নয়! খুলে দেখে তো আমার ভিরিমি খাওয়ার জোগাড়।

বড্ড বকো তুমি। অত কথা বললে মানুষের পেটে কথা থাকে না। তোমার জন্যই আমার একদিন মরণ লেখা আছে কপালে। কেবল নীতিকথা কইলে পেট চালাই কি করে? শোনো, ও টাকা কারও হক্কের টাকা নয়। কেউ ওর ওয়ারিশও নয়। আমার হাতে যখন আছে তখন ওটা আমার। কাউকে দানছত্তর করতে পারব না, মা-লক্ষ্মীকে তাড়াতেও পারব না। ওসব অলক্ষ্যে চিন্তা মাথা থেকে তাড়াও। ও টাকাকে রক্ষা করতে হলে কী করতে হবে, সেইটে ভেবে দেখ। পালপাড়ায় গেলে আপাতত হয়তো কথা উঠবে না।

উঠবে। কাকার চাকরি ছেড়ে পালাপাড়ায় যেতে হলে জুতসই একটা অজুহাত চাই।

অত সব খুঁটিনাটি নিয়ে ভাববার সময় নেই। আমি টাকাটা এমন ভাবে লুকিয়ে ফেলতে চাই যাতে কেউ মাথা খুঁড়েও সন্ধান না পায়। কিন্তু এ বাড়িতে সেটা হবে না। বড্ড খোলামেলা বাড়ি।

নিমাই মৃদুরে বলল, টাকাটার ফাঁদে ভাল করেই জড়িয়ে পড়লে বীণা!

আচ্ছা, তুমি কেমন ধারা মানুষ বলো তো! জীবনে এত দুঃখকষ্ট সয়েছো, এত হেনস্থা হয়েছে, তবু তোমার একটুও লোভ হয় না কেন? হ্যাঁ গো, তোমার মাথার ব্যামো নয়তো এটা!

নিমাই এই গুরুতর পরিস্থিতিতেও এ কথা শুনে হাসল। বলল, পাগল বলতে চাইছো তো! সে তো অনেকবার শুনেছি।

সনাতন দেখে ফেলেছে, এখন আমার বড় ভয় হচ্ছে। সনাতনটা ভীষণ পাঞ্জি।

অত ঘাবড়ে যেও না। সনাতন দেখেছে বটে, কিন্তু বুঝেছে কিনা তা এখনও জানি না। কথা হোক তখন যদি টানটানে কিছু বলে তো বোঝা যাবে।

পল্টু বুঝেছে। বনগা আমার পক্ষে বিপদের হয়ে উঠছে।

পল্টু তেমন লোক নয়। সনাতনের দোকানটা কিনেছে, জানো তো! পল্টুর হাতে এখন মেলা টাকা। ও নিজের কারবার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, তোমাকে নিয়ে ভাবছে না।

কি করে বুঝলে?

আমার ভীষণ ভাব যে ওর সঙ্গে। খুব খতির করে। সে পেট-পাতলা লোক নয়।

কাউকে বিশ্বাস নেই গো। বনগায়ো যা সব লোক থাকে!

নিমাই ফের মাথা নেড়ে বলে, বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘে খায়।

আচ্ছা, আমি নয় খারাপ। পচে গেছি, নষ্ট হয়ে গেছি। তবু এই দুর্দিনে দয়া করে আর শত্রুতা কারো না। আমি পাপ করি, তাপ করি, নরকবাস তো আমিই করব। তুমি তো করবে না!

শত্রুতা কিছু করলাম নাকি?

ওটাই শত্রুতা। ওই যে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে, টাকা নষ্ট করে ফেলতে বলছে, ওটাই এক ধনের শত্রুতা।

আমি সাত দিন সাত রাত ভেবেও ঠিক পাবো না, কথাটা বলায় শত্রুতা হল কি করে!

সে তুমি ভাবো গে। এখন শোনো, ওই সনাতন শয়তানটা কী দেখেছে আর কী আঁচ করেছে সেটা বুঝবার চেষ্টা করো। ছুটপাট করো না। মাথা ঠাণ্ডা রেখে কথা বলে দেখো। হয়তো মুখ বন্ধ রাখতে ঘুষ চাইবে।

তাও দেবে?

না, দেবো না।

আমার মাথা গরম হওয়ার কারণ নেই বীণাপাণি। কিন্তু তুমি বড় উচাটন হয়ে পড়েছো। সনাতন আমার মতোই অপদার্থ লোক। বুদ্ধি নেই, চার চোরকো চালাকও নয়। সবচেয়ে বড় কথা ভীত মানুষ। কিছু দেখে থাকলেও এখনই অস্থির হওয়ার কিছু নেই। শান্ত হও বীণাপাণি। ষাও।

খাওয়া! তাই তো! দুজনে ভাত পাতে বসে আছি সেটাই যে খেয়াল ছিল না এতক্ষণ!

তাই দেখছিলাম। সব ঠাণ্ডা মেরে গেল। ঝোলটা কেমন হয়েছে?

তুমি তো সুন্দর রাঁধো।

আজ স্বাদ পাচ্ছে?

পাচ্ছি গো।

বীণাপাণি কয়েক গ্রাস ভাত খেল। কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল যে জোর করে খাচ্ছে। তার খিদে নেই বা রুচি হচ্ছে না।

নিমাই হঠাৎ বলল, তোমার সবচেয়ে বেশী ভয় কাকে বীণাপাণি? সবচেয়ে অবিশ্বাস করো কাকে? সে কি আমি?

বীণাপাণি অবাক হয়ে বলে, ওমা! সে কি কথা?

সেইজনাই না ওসব কথা চেপে রেখেছিল! আমাকে তুমি বিশ্বাস করো না, না?

মোটাই তা নয়। আসলে তুমি দুর্বল লোক বলে তোমাকে সব কথা বলতে ভয় পাই।

বুঝেছি। ঠিকই করো। আমাকে বিশ্বাস করা বোধ হয় ঠিকও নয়।

আহা, আবার অভিমান করছে দেখ। আমার মন ভাল নেই, এখন অমন মুখ গোমড়া করে থেকো না তো! একটু বল-ভরসা দাও।

নিমাই বীণাপাণির দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলে, তোমার-আমার সম্পর্কটা ঠিক এরকম হওয়ার কথা নয় বীণাপাণি। এ যেন, সে আর লালন একখানে রয়, লক্ষ্য যোজন ফাঁক।

অনেক চেষ্টা করেও ঝুমকি কল্লয়ার শহরটাকে ঠিকমতো সাজিয়ে গুছিয়ে বানিয়ে নিতে পারে না। সে যায়নি, কখনও যাবে না হয়তো কোনও বিদেশে। সে বড় জোর যাবে কলু-মালানি, দক্ষিণ ভারত বা ঘাটশীলা। কিংবা কে জানে। কিন্তু বিদেশ তার কপালে লেখা নেই। বাঙালী মেয়েরা সুন্দর, মুখ, উচ্চ মেধা কিংবা দুর্দান্ত ভাগ্য থাকলেই মাত্র বিদেশ-টিদেশ যায়। তার কোনওটাই নেই। তবু কেন মনে মনে বারবার লভন শহরটাকে তৈরি করতে চাইছে সে! কেন দেখতে চাইছে তার রাস্তাঘাট? বাড়ি ঘর? দোকানপাঠ? মিউজিয়াম? আভারগ্রাউন্ড?

এক একদিন কথা বা প্রসঙ্গ একটা কিছুতে এমন মজে যায় যে আর অন্য প্রসঙ্গই উঠতে চায় না। চারুশীলামাসির বাড়িতে সেদিন নেমস্তন্ন করে আনা হয়েছিল রশি রাই নামে একজন বিলেত-ফেরত মহিলাকে। দেখতে ফর্সা-টর্সা, ফিগারও ভাল, মুখখানা তেমন কিছু নয়। কিন্তু চেহারার চেয়েও যেটা বেশি ঝলমল করছিল সেটা হল মেয়েটির বিদ্যা, বুদ্ধি, স্মার্টনেস, পারসোনালিটি। এত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল ঝুমকি যে, জীবনে এই প্রথম তার দুঃখ হয়েছিল, যে পুরুষমানুষ নয় বলে। পুরুষ হলে সে নির্ঘাৎ রশির প্রেমে পড়ে যেত। পুরুষ না হয়েও কিছু কম পড়েনি। আর সেই সঙ্গে রশির মুখে সেদিন লভনের গল্প শুনে শুনে সেই অচেনা শহরটারও প্রেমে পড়ে গেল সে। লভন শব্দটাই যেন এটা দূরের ঘটনার। ওই নামটার মধ্যে কত শিররণ, কত বিস্ময়।

এক ফাঁকে চারুশীলামাসি তাকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল।

ঝুমকি, একটা সত্যি কথা বলবে?

কী হয়েছে মাসি?

তুমি তো এই আধুনিক যুগের মেয়ে, আমার চেয়ে অনেক মর্ডান। মেয়েটিকে তোমার কেমন লাগছে বলো তো!

মেয়েটা তো দারুণ মাসি।

দারুণ বলতে কি বলো তো! দেখতে ভাল, না বুদ্ধিমতী?

দেখতেও ভাল, বুদ্ধির তো কথাই নেই।

মুখের ডৌলটা দেখেছো ভাল করে?

দেখছি। সারাক্ষণ তো চেয়েই আছি। বেশ ডৌল। ঢলঢলে।

বলছো? কিন্তু আমার যেন একটু রুক্ষ-রুক্ষ লাগছে। অবশ্য চটক আছে।

না মাসি, রুক্ষ কেন হবে? একটুও তো রুক্ষ নয়। বরং ভারি মিষ্টি। তবে সুন্দরী বলতে যা বোঝায় তা নয়। বড় টানা চোখ বা টিকোলো নাক তো নয়। এ হল আল্লাদী চেহারা।

ঠিক বলেছো। বড় বেশী আল্লাদী। একটু ন্যাকা নাকি? কি মনে হচ্ছে?

ঝুমকি খুব হাসল, তা একটু হতে পারে। বিলেতে থাকলে ওরকম হয়।

আচ্ছা, অহংকারী নয় তো! দেমাক থাকলে মুশকিল।

তা থাক না দেমাক। ওর দেমাক ওর কাছে। আমাদের কি?

আসলে হয়েছে কি জানো, তোমাকে খুলেই বলি, আমার যে ওই একটা হাবাগঙ্গারাম ভাই আছে, হেমাঙ্গ, ওর সঙ্গে একটা বিয়ের চেষ্টা করছি। ওর তো উদ্যোগী হয়ে বিয়ে দেওয়ার লোক নেই। ব্যাচেলার থাকারই মতলব। তাই আমি রশির সঙ্গে ওকে ট্যাগ করার চেষ্টা করছি। তোমার কি মনে হয়, দুজনকে মানাবে?

ঝুমকি একটু ভাবল। তার মনে হল, চারুমাসি একটু বাড়িবাড়ি করছে। হেমাঙ্গর মুখে কোনও বোকামির ছাপ নেই। দেখতেও বেশ ভাল। লম্বা, ছিপছিপে, ফর্সা এবং তীক্ষ্ণ চেহারা। তবে মুখে একটু কেবল-কেবল ভাব আছে ঠিকই। তবে সেটা ইচ্ছাকৃত বলেই মনে হয় ঝুমকির। সে বলল, বেশ মানাবে মাসি।

চেহারা মানালেই হবে না, অন্য দিকগুলোও দেখতে হবে। সবার আগে জাত আর গোত্র। কী করে জানা যায় বলো তো!

জাত আর গোত্র কি কোন বিরাট সমস্যা নাকি? ঝুমকি খুব ভাবল সেদিন। যদি জাত বা গোত্র না ঠিকঠাক হয় আর যদি দুজনের মধ্যে প্রেম হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে কী হবে? ঝুমকি খুব সরলভাবে জিজ্ঞেস করল, ওদের মধ্যে কি লাভ অ্যাফেয়ার আছে মাসি?

চারুশীলার মুখখানা চোখা করে বলে, তাই তো থাকার কথা। কিন্তু আমার ভাইটাকে তো দেখছো, একদম আনখাট। প্রেম করতে ভয়ে মরে।

হি হি করে হাসল, ঝুমকি, ভয়টা কিসের?

তা ও-ই জানে।

হেমাঙ্গ কাছাকাছি ছিল না। ভাগ্নে আর ভাগ্নীকে নিয়ে অন্য ঘরে গল্প করছিল। পাশাপাশি ওদের কেমন দেখাবে কে জানে। ঝুমকি বলল, আপনি বোধহয় ঠিকই বলেছেন। উনি পালিয়ে আছেন তখন থেকে।

কী অভদ্রতা হচ্ছে দেখ? ডাকো তো ওকে। ওপরে আছে বোধহয়।

বাড়িটা বিরাট এবং বাড়ির মধ্যে নানারকম খোপ, খোঁদল, বিচিত্র ঘর, বিচিত্রতর বারান্দা। একেই বোধহয় ভুলভুলিয়া বলে। তিনতলাতেও সেই ধাঁধা। ছেলের জন্য একখানা অদ্ভুত ঘর বানানো হয়েছে। দেয়ালে রঙের বদলে মজাদার সব ছবি। একটা দেয়ালে পুরো একটা কমিকস আঁকা রয়েছে। বিছানার ডিজাইন নৌকার মতো, টেবিল চেয়ার সবই পঙ-পাখির আকৃতির। রঙচঙে সিলিং। ঢুকলেই মনে হয়, বুঝি রূপকথার দেশ। সেই ঘরে দেখা গেল, ভাগ্নে-ভাগ্নীকে নিয়ে এয়ারগানে টার্গেট প্র্যাকটিস করছে হেমাঙ্গ।

ঝুমকি খুব মৃদুস্বরে বলল, শুনছেন, আপনাকে মাসি ডাকছেন।
হেমাঙ্গ তার দ্রুত কুণ্ঠিত মুখ ফিরিয়ে বলল, ডাকছে, কেন বলুন তো!
আপনাদের অতিথি অপেক্ষা করছেন।
হেমাঙ্গ এয়ারগান রেখে উঠে পড়ল। বলল, চারুদিটা একদম যাচ্ছেতাই।
ঝুমকি লোকটাকে ভাল করে দেখল। প্রেমে-পড়া মানুষের মুখ কেমন দেখতে হয় তা ঝুমকি জানে না। এ লোকটার মুখে তেমন কোনও বিশেষ বিলক্ষণ দেখতে পাচ্ছে না সে। একে যত বোকা বলে জাহির করে মাসি, ততটা বোকাও বোধহয় হেমাঙ্গ নয়।

চলুন, বলে হেমাঙ্গ তার আগে আগে হাঁটতে লাগল। সিঁড়ির মুখে এসে হঠাৎ তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, আপনি কি চাকরি পেয়ে গেছেন?

না তো।

চাকরি কেন করবেন? বাড়িতে খুব অভাব, না কি শখ?

না, শখ নয়। বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল। বাবা আর কদিন চাকরি করতে পারবেন কে জানে!

ওঃ হ্যাঁ, সেদিন তো বলছিলেন এসব কথা। খুব দরকার কি?

হলে ভাল হত।

অনেক মেয়ে স্বামীর অধীন থাকবে না, পরিবারের অধীন থাকবে না বলে চাকরি চায়।

আমি সেরকম নই।

না হলেই ভাল। যারা চাকরির মধ্যে স্বাধীনতা খোঁজে তারা কেন বোঝে না যে চাকরিটাও অধীনতা?

অধীনতা হলেও তার কতগুলো নিয়মকানুন আর সিকিউরিটি আছে। সংসারি মেয়েদের সেটা থাকে না।

সিকিউরিটি? প্রাইভেট কোম্পানিতে ওসব থাকে না। বিশেষ করে ছোটো ছোটো কনসার্নগুলোয়।

মেয়েরা শখ করে চাকরি করে না। বাধ্য হয়েই করে।

হেমাঙ্গ কথাটা মানতে চাইল না। ল্যাভিঙ-এ দাঁড়িয়ে হঠাৎ তার দিকে মুখোমুখি হয়ে বলল, একটা কথা বলি আপনাকে। চাকরি করতে হয় তো মাস্টারি করুন। অনেক সেফ, অনেক ভাল।

ঝুমকি মৃদু হেসে বলে, কুলের চাকরি আরও দুর্লভ। কলকাতায় বা আশে পাশে তো নয়ই, এমন কি আজকাল গাঁয়ের কুলে পর্যন্ত মেয়েদের চাকরিতে ভীষণ কম্পিটিশন।

আপনি বি-এড পড়েছেন?

না।

পড়ুন না! রশ্মি রায়ের কুলে হয়তো হয়ে যেতে পারে। নাহলেও ক্ষতি নেই। আমার সঙ্গে অনেক কুলের চেনাজানা আছে। কম্পিউটার শিখে কী করবেন?

আমার কম্পিউটার খুব ভাল লাগে।

মুশকিলে ফেললেন।

কুলের চাকরিতেও আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমি তো তার জন্য তৈরি হইনি।

হঠাৎ হেমাঙ্গ বলল, চাকরি করলে মেয়েদের অনেক কিছু হারিয়ে যায়, তা জানেন?

অবাক হয়ে ঝুমকি বলে, কী হারায়?

হেমাঙ্গ মাথা নেড়ে বলে, তা বলব না। বলতে গেলেই দেখি ঝগড়া লেগে যায়। মেয়েরা তো সহজে কিছুই মেনে নেয় না।

ঝুমকি মৃদু হেসে বলে, মানাতে পারলে মানবে না কেন?

হেমাঙ্গ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আপনার সঙ্গে প্রথম আলাপেই একটা বিবাদ হোক, আমি তা চাই না। আজ আমার নার্ভাসও লাগছে।

ঝুমকি হেসে বলে, নার্ভাস কেন?

আমার পাগলী দিদিটিকে কতদিন চেনেন?

খুব বেশিদিন নয়।

চিনলে বুঝতেন কেন নার্ভাস। ওই যে মেয়েটি এসেছে ওটির সঙ্গে দিদি আমার একটা মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে চাইছে। আমি সেটা টের পাচ্ছি আর ভিতরে ভিতরে রেগে যাচ্ছি। ও যে কেন এসব কাণ্ড করে কে জানে!

ঝুমকি খুব সাবধানে বলে, রশ্মিদি কিন্তু খুব ভাল মেয়ে।

সে তো বটেই। আমিও জানি। কিন্তু ভাল মেয়ে বলেই কি তার ওপর হামলা করতে হবে? চারুদি ভালই জানে ওর এসব চেষ্টায় কিছু হবে না।

ঝুমকির এ প্রসঙ্গে কথা বলা উচিত নয়। তাই সে চুপ করে রইল।

হেমাঙ্গ নিজেই বলল, আমি ঝামেলাহীন জীবন পছন্দ করি বলেই একা থাকি। ও যে কেন আমার শান্তিটা নষ্ট করতে চায়।

দুজনে এসে যখন দোতলার মেয়েলি বসার ঘরটায় ঢুকল তখন রশ্মি চা খাচ্ছে আর চারুশীলা তাকে নিজের বোকা ভাইটা সম্পর্কে নানাবিধ বড় বড় কথা বলছে।

রশ্মি হেমাঙ্গকে দেখে মুখ টিপে হেসে বলল, আপনি লভনে কিছুদিন ছিলেন, বলেননি তো!

আজকাল বিলেত যাওয়াটা তো শক্ত ব্যাপার নয়। কে না যাচ্ছে বলুন!

তা অবশ্য ঠিক। আপনাকে এতক্ষণ দেখিনি কেন? কোথায় ছিলেন?

ভাগ্নে-ভাগ্নীদের একটু সঙ্গ দিচ্ছিলাম। এ বাড়িতে তো আপনি ঠিক আমার অতিথি নন, আমার দিদির অতিথি। ও একাই এত কথা বলে যে আমরা কিছু বলার চাপ পাই না।

চারুশীলা হেসে একটা ধমক দিল, আঁই মিত্যুক! কবে আমি বেশী কথা বলি রে?

যে বলে সে টের পায় না। আমরা পাই।

মারব থাণ্ড! রশ্মি, খবরদার আমার ভাইটিকে বিশ্বাস করো না। ভীষণ ফাজিল।

রশ্মি হেসে বলে, আমি ওঁকে একটু জানি। উনি মেয়েদের সামনে খেতে লজ্জা পান, আর-নারী স্বাধীনতার পক্ষপাতী নন।

ঝুমকি মুখ লুকিয়ে হেসে ফেলল।

হেমান্স একটা চেয়ার টেনে বসে বলল, সংখ্যালঘুদের প্রোটেকশনের ব্যবস্থা সব সরকারের আছে। আমারও প্রোটেকশন দরকার। আপনারা তিন মহিলা, আমি একা।

সেইজন্যই পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন?

খানিকটা সেইজন্যও। আর আমার এ দিদিটির জন্যও। ছেলেবেলা থেকেই লোকের সামনে ও আমাকে নাকাল করে আসছে। জনসমক্ষে তাই ওর কাছাকাছি থাকি না।

তাই বুঝি! আচ্ছা, আপনাকে আমরা কেউ অ্যাটাক করব না। নিশ্চিন্ত হয়ে বসুন।

সন্ধ্যাবেলাটা বেশ কাটছিল ঝুমকির। এক একটা বাড়ির এক এক রকম পরিবেশ। এ বাড়ির পরিবেশ তার বরাবর খুব ভাল লাগে। চারুমাণি হাসিখুশি মজার মানুষ। দারুণ সুন্দরী। সিনেমায় নায়িকার পাট করেছেন। সব মিলিয়ে একদম ঝলমল করছেন সবসময়। মন-খারাপ নিয়ে এলে মন ভাল হয়ে যায়। তার চেয়েও ভাল লাগছে রশ্মি রায়কে। ঠাণ্ডা মেজাজের বুদ্ধিমত্তা মেয়ে। কথা বলে কী সুন্দর! পাশাপাশি যদি নিজেকে তুলনা করে ঝুমকি তাহলে সে কিছুই নয়। না আছে বিচ্ছিন্নতা, না এদের মতো বুদ্ধি, না তেমন ব্যক্তিত্ব।

কিছুক্ষণ কথা-টখা হওয়ার পর চারুমাণি হঠাৎ ঝুমকির দিকে চেয়ে বলে, এই মেয়েটা, তুমি না গান জানো?

গান! বলে ঝুমকি অবাক হয়, কে বলল?

আমি জানি, তুমি নাকি খালি গলায় দারুণ গান দাও।

না, না, বলে লজ্জায় মরে যাচ্ছিল ঝুমকি। এদের সামনে গান গাইবে কি, বসে থাকতেই তার সংকোচ হচ্ছিল।

শেষ অবধি অবশ্য আপত্তি টিকল না। গাইতে হল। খুব বেছে চিন্তা করে দুটি গান গাইল ঝুমকি। রবীন্দ্রসঙ্গীত। কেউ কিছু বলল না তাকে। কিছু গানের পর সবাই খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। অনেকক্ষণ বাদে রশ্মি বলল, গান জানি না বলে আজ আমার খুব দুঃখ হচ্ছে।

বাস, একটুই। হয়তো আরও কথা উঠত, তার গান নিয়ে তার আগেই ঝুমকি রশ্মির কাছ ঘেঁষে বসে বলল, আমাদের লভনের কথা একটু বলবেন? আমার খুব বিদেশের কথা শুনতে ভাল লাগে।

রশ্মি একটু হাসল বলল, বিদেশের কথা শুনতে সবারই ভাল লাগে। গরিব দেশের মানুষদের ওটা একটা এন্টারটেইনমেন্ট।

তারপর ধীরে ধীরে কথায় কথায় লভন শহরটা যেন একটা কুয়াশা ভেদ করে জেগে উঠতে থাকল ঝুমকির চোখের সামনে। সে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিল। তারপর হেমান্স বলল। তারপর চারুশীলাও। এরা সবাই বিস্তর বিদেশে ঘুরেছেন। ঝুমকির ভারি দুঃখ হচ্ছিল নিজের জন্য। কত পিপাসা তার বুকে। কত ইচ্ছে। এই জীবনে কিছুই ঘটবে না তার।

গত চারদিন সে একটা ঘোরের মধ্যে আছে। সে কখনও রশ্মির কথা ভাবছে। কখনও লভনের কথা। মাঝে মধ্যে হু হু করছে বুকের ভিতরটা আত্মগ্লানিতে। কখনও খুব নিজীব বোধ করছে সে। মাঝে মাঝে সে ভাবছে, আচ্ছা, এত ছোটো, এত সামান্য হয়ে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় নাকি? আমি তো একটু সুন্দর, একটু মেধাবীও হতে পারতাম! কিংবা আরও স্মার্ট!

অপরূপ সাকাল বেলায় ঝুমকির ঘরে এসে দাঁড়াল। মেয়ের দিকে চেয়ে বলল, তোর আজকাল কী হয়েছে বল তো! চা খেয়েছিস, এঁটো কাপটা পর্যন্ত বেসিনে রেখে আসিসনি। বাসি কাপডটা ছেড়ে মেঝেয় ছড়িয়ে রেখেছিস, বাথরুমের বালতিতে রেখে না এলে ঝি ওটা কোনোদিন ধোবে? ঘুম থেকে উঠে বিছানাটা তুলিসনি। তোর হল কি?

মার সঙ্গে ঝুমকির সম্পর্কটা একটু আড়াআড়ির, আবার কখনও একটু ভালবাসাবাসিরও। হয়তো একেই লাভ-হেট রিলেশন বলে।

ঝুমকি তার রোগা করুণ মুখখানা তুলে বলে, আচ্ছা মা আমি কেমন মেয়ে বলা তো!

ও আবার কি কথা? কেমন মেয়ে আবার কি।

মা, আমি তো একদম গোপ্তামাটা একটা মেয়ে তাই না?

গোপ্তা আবার কিসে পেলি?

সব ব্যাপারে। চেহারায়ে গোপ্তা, লেখাপড়ায় গোপ্তা, কাজে কর্মে গোপ্তা, স্মার্টনেসে গোপ্তা। আমাকে নিয়ে কী করবে তুমি?

কম্পিউটারের পরীক্ষায় ফেল করেছিস নাকি?

সে না হয় করব। কিন্তু সে কথা বলছি না। আমি ভাবছি, আমার মতো একটা অপদার্থ মেয়েকে দিয়ে কি হবে! আমার বেঁচে থাকারই কোনও মানে হয় না।

হঠাৎ এত নিজেকে নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিস কেন?

আজকাল আমি মাঝে মাঝে নিজের একটা অ্যাসেসমেন্ট করি। করতে গিয়ে সব ব্যাপারেই দেখি, আমি ভীষণ বাজে। এমনকি বুঝা আর অনুও কত ভাল আমার চেয়ে।

পাঁচটা ছেলেমেয়ে কি সমান হয় ?

তা তো হয় না মা । কিন্তু যে খারাপ তার তো নিজের একটু করুণা হবেই । সে তো জানতে চাইবেই যে, সে কেন আর পাঁচজনের মতো ভাল নয় ।

অপর্ণা বিছানায় বসে মেয়ের দিকে চেয়ে বলল, তোর মাথায় মাঝে মাঝে পোকা ঘুরে বেড়ায় । কেন, তাকে কি কেউ খারাপ বলেছে ?

মুখের ওপর কি কেউ বলে ? বুঝে নিতে হয় ।

কার কাছ থেকে কি বুঝলি ?

সে আছে ।

তুই এত চাপা কেন বল তো! মায়ের কাছে মেয়েরা তো সব খুলে বলে । তুই কখনও কিছু বলিস না । কেন রে ? আমাকে মা বলে মনে হয় না তোর ?

তুমি খুব ভাল-মা । একটু রাগী, তবু ভাল ।

ভাল হয়েই তো মরেছি । ভাল বলেই তো তোরা কেউ গ্রাহ্য করিস না আমাকে ।

তা নয় মা । আমার সবসময়ে কথা বলতে ভাল লাগে না ।

সে জানি, তোমার বুক ফাটলেও মুখ ফোটে না । কিন্তু এরকম কি ভাল! মানুষ মনের ময়লা কথা দিয়েই তো কাটিয়ে দেয় । কি হয়েছে তোর ?

অমনি তুমি দৃষ্টিভাঙ্গা শুরু করলে নাকি ?

মা হলে বুঝবি, সন্তানের জন্য মায়ের বুক কেমন সবসময়ে দুরুদুরু করে ।

দূর! দুরুদুরু করার মতো কোনো ঘটনাই নয় ।

তাহলে বলতে দোষ কি ?

ঝুমকি হেসে ফেলে বলে, কি হয়েছে জানো ? আমার একটু পরশ্রীকাতরতা এসেছে ।

সেটা আবার কি ?

সেদিন চারুশীলামাসির বাড়িতে একটা মেয়েকে দেখলাম, সে বিলেতে জন্মেছে, পড়াশুনা করেছে, এরপর আবার ওখানেই গিয়ে থাকবে ।

তা ওরকম তো কতই আছে । আজকাল কত ছেলেমেয়ে বিদেশে থাকে ।

তা তো থাকেই । মেয়েটা দেখতেও দারুণ ভাল, লেখাপড়ায় ব্রিলিয়ান্ট, ব্যক্তিত্ব আছে । এত ভাল লাগল মেয়েটাকে । একটুও অহংকার নেই । সোশ্যাল ওয়ার্ক হিসেবে একটা গায়ের স্কুলে পড়ায় । ওই মেয়েটার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকেই কেমন যেন নিজের কথা ভেবে মনটা খারাপ হয়ে যায় ।

কেন রে ঝুমকি, তুই কিছু খারাপ আছিস ?

তা নয় মা । খারাপ কেন থাকবে ? বেশ তো আছি । কিন্তু মাঝে মাঝে ভীষণ মনে হয়, আমার আর কিছু গুণ থাকলে বেশ হত । অন্তত দেখতেও যদি সুন্দর হতাম!

তুই কি দেখতে খারাপ ? একটু রোগা, এই যা । যার চোখ আছে সেই জানে, তোর মতো মুখচোখ খুব কম মেয়ের আছে ।

মায়ের চোখ দিয়ে দেখো না মা । মায়ের চোখ সবসময়ই ভুল দেখে । কোন মায়ের কাছে তার মেয়ে অসুন্দরী বলো তো! আর একটু ক্রিটিক্যালি দেখ তো!

খুব ক্রিটিক্যালি দেখেই বলছি । আমার মতো খুঁটিয়ে তো কেউ কখনও তোকে দেখেনি! যখন আঁতুড়ে ছিল তখন থেকে তোর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতাম ।

জানি মা । তুমি তোমার প্রথম সন্তানকে দেখবে, এটা ই তো স্বাভাবিক । কিন্তু কী দেখলে মা ? বেশী ভালবাসা, আদর আর আবেগ থাকলে কি আসল চেহারা চোখে পড়ে ?

আচ্ছা, তোর চেহারার সেদিন কেউ কোনও নিন্দে করেছে ?

না তো! তাই কেউ করে ? চেহারাটাই তুমি ধরছো কেন, আর কোন দিক দিয়েই বা আমি কি হয়েছে বলো তো!

তোকে নিয়ে আর পারি না বাপু । হঠাৎ যে কেন এত শোকতাপ!

মা, আমার খুব ইচ্ছে করে একটা বিদেশী শহরে গিয়ে থাকি । পরিকার পরিকল্পনা, সুন্দর একটা শহর । শীতকালে বরফ পড়বে, বসন্তকালে গাছপালা ফুলে ভরে যাবে, খুব সবুজ হবে মাঠঘাট ।

বিদেশে যেতে চাস ? তোর বাবা কী বলে জানিস ? বলে, আমার ছেলেমেয়েরা কেউ ইউরোপ বা আমেরিকায় গেলে আমার বোধহয় হার্ট অ্যাটাক হবে ।

আমার জন্য বাবার হার্ট অ্যাটাক হবে না মা । আমি কোন গুণে বিদেশে যাবো বলো তো! কে আমাকে নেবে ? কেন নেবে ?

ও কথা বলিসনি । যদি বিয়ে হয় বিদেশে ?

ঝুমকি হেসে ফেলল, তোমার কল্পনারও বলিহারি ।

অপর্ণা একটু কাছে ঘেঁষে এল, শোন ঝুমকি, সবসময়ে অত নেগেটিভ চিন্তা করতে নেই । নিজেকে যদি সবসময়ে হ্যাক-ছি করতে থাকিস তাহলে অন্য সবাইও তোকে হ্যাক-ছি করতে শুরু করবে । আমি মনে করি, যে যার নিজের মতোই হয় । তুই কেন অন্যের মতো হতে যাবি । তুই যেমন আছিস তেমনই ভাল ।

ভাল তো!

নিশ্চয়ই ভাল । অন্যের মতো হতে যাবি কেন ?

তাহলে তুমি কেন সবসময়ে আমাকে বকো আর বলো, তুই অমকের মতো নোস, তমকের মতো হলি না বলো না ?

অপর্ণা হেসে বলল, রাগের মাথায় বলি।

রাগের মাথায় সত্যি কথাই তো বলো!

সত্যি হলেও হতে পারে। এই যে আমি বলে মেয়েটা, কী দসী বল তো! আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি ওর মতো সাহসী হলে বেশ হত। সব মেয়েরই এরকম হওয়া উচিত। আবার ভাবি, দূর! আপার মতো আপা হোক, সবাই কেন হতে যাবে!

আমি ক'দিন যাবৎ কী ভাবছি জানো? এই যে আমি, আমার যা আদর, যা ইম্পর্টান্স তা শুধু তোমার আর বাবার কাছে, বুঝি আর অন্যর কাছে। আমার যদি খারাপ কিছু হয় তোমরা গুটিকয় লোক দুঃখ পাবে। যদি আমার ভাল কিছু হয় তাও আনন্দ করবে শুধু তোমরাই। কই, বাইরের জগতে তো আমার কোনও গুরুত্বই নেই। কেউ তো ফিরেও তাকায় না আমার দিকে।

দূর বোকা! কী সব বকছিস? বাইরের জগৎ হল বাইরেরই জগৎ। ভিতর আর বাইরের মধ্যে তফাৎ থাকবে না?

আমার কী মনে হয় জানো মা? শুনলে তুমি হাসবে। আমার মনে হয়, আমার যদি লক্ষ লক্ষ মা-বাবা থাকত, কোটি কোটি ভাই-বোন থাকত তাহলে বেশ হত।

অপর্ণা সত্যিই হেসে ফেলল। বলল, আচ্ছা, তোর মাথায় এমন অদ্ভুত সব কথা আসে কেন রে?

তাহলে আমি কত মানুষের আদরের বুমকি হতে পারতাম বলো তো!

আমি তো সাত দিন সাত রাত্তির ধরে বসে ভাবলেও এরকম অদ্ভুত কথা মাথায় আসত না।

আমার মাথায় এরকম অনেক কথা আসে মা। আচ্ছা আমি কি একটু ছিটিয়াল?

তোমরা সবাই একটু ছিটিয়াল। বিশেষ করে তোমার বাবাটি। বাবার কাছ থেকেই পেয়েছো তোমরা।

তুমি যে বাকো এত ভালবাসো তা তো বাবা একটু ছিটিয়াল বলেই! নরমাল গেরত্ব হলে এত ভালবাসতে পারতে?

অপর্ণা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, ভালবাসার কথা তুই কী জানিস রে বুমকি? ভালবাসার মধ্যেও যে কত কাঁটা, কত জ্বলনি তা যদি জানতিস!

॥ ৪০ ॥

গত সাত দিন ধরে হোমস্ ভাবছে। ভাবছে, একটা পারসোনাল কমপিউটার তার দরকার আছে কিনা। উইথ প্রিন্টার। সাদামাটাভাবে দেখতে গেলে, দরকার নেই। কারণ তার অফিসেই কমপিউটার রয়েছে। তার জীবিকার যাবতীয় তথ্য তার মাথাই ঠৌর করা আছে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে দেখতে গেলে তার পি-সি-র কোনও প্রয়োজন নেই। কিন্তু উপর-উপর চিন্তা করে সমাধানো পৌছানো না গেলে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত। অনেকটা তলিয়ে দেখলে হয়তো ব্যক্তিগত কমপিউটার কেনার একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ সে খুঁজে পাবে। লোকের কাছে জবাবদিহি বা অজহাত খাড়া করাটাই তো সবচেয়ে বড় সমস্যা। তাই সাতদিন ধরে সে গভীরভাবে ভাবছে। ভাবতে গিয়ে চৌরঙ্গীর কাছে ট্রাফিক লাইট ভায়েলেন্ট করে সে ট্র্যাফিক পুলিশের ধমক খেয়েছে। আনমনে আটকাতে গিয়ে একটা পুরনো আমলের পার্কার ডুয়েফোন্ট কলমের কাপ্যের প্যাচ কেটে ফেলেছে। এবং রশ্মি রায় একদিন ফোন করে 'আমি রশ্মি' বলায় সে গভীর অন্যাননকৃত্যর সঙ্গে প্রশ্ন করেছে, কে রশ্মি!

এইসব দুর্ঘটনার পরও সে অন্যাননকৃত্য কাটাতে পারেনি। তার চেয়েও বড় কথা পি-সি কেনার ব্যাপারে এখনও কোনও স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। আসতে পারেনি আরও একটা গুরুতর কারণে। বড্ডল রোডে তার সেজদি নীলা থাকে। তার দেওরের বিয়ের জন্য একখানা বাড়ি দরকার। গড়িয়াহাটের আশেপাশে এবং বড্ডল রোডের গা ঘেঁষেই বিস্তার বিয়ে বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও সেজদি গর্চার বাড়িতেই বউভাত করার জন্য গৌ ধরেছে বলে প্রায়ই যাতায়াত করছে। সেজদি আবার হিসেবী লোক। হোমস্‌র ঘরে জিনিসপত্রের বহর দেখে ভিন্নি খাওয়ার জোগাড়। প্রথম দিনই সব দেখেখুঁতে বলে দিন, দাঁড়া, তোর এই অপব্যয়ের কথা বাকো বলে দেবো। এভাবে পাগল ছাড়া কেউ টাকা নষ্ট করে?

তার পরও দিদিদের খবরদারি এবং অত্যাচার করে বন্ধ হবে তা ভাবতে ভাবতে হোমস্‌র বলল, সুব জিনিসই কাজে লাগে। মর্ডান টেকনোলজির খবর রাখিস না, সংসার করিস কি করে?

সেজদি রাগে গরগর করতে করতে বলল, খবর রাখি না তোকে কে বলল? ফিজিক্সে আর্নাস নিয়ে বি এসসি কি এমনি এমনি পাশ করেছে? কিন্তু খবর তুই-ই রাখিস না। ওই ডাকুয়াম ক্রিনার দিয়ে কী পরিষ্কার করিস তুই? ওতে ময়লা যায়? আমার ঘরেও একটা পড়ে আছে। শুষ্কের টাকা নষ্ট। বিজ্ঞাপন দেখে কিনলেই হল?

হোমস্‌ তর্কের লাইনে না গিয়ে মোলায়েম গলায় বলল, তোর দেওরের কোথায় বিয়ে ঠিক হল রে? দেনা-পাওনা কি রকম?

বিয়ে এবং দেনা-পাওনা দুটো জিনিসকেই হোমস্‌ আদ্যন্ত ঘেন্না করে। কিন্তু সে এও জানে, মেয়েদের বিবাহ প্রসঙ্গে ডাইভার্ট করতে পারলে তারা আর অন্যান্য তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাবে না। হলও তাই। নীলা ডাইভার্টেড হয়ে গেল। দেওরের বিয়ের এবং দেনা-পাওনার একটা বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে হোমস্‌র অপব্যয়ের ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেল। আপাতত।

মুশকিল হলে, সেজদি আজকাল মাঝে মাঝে আসছে। একতলায় অনেক জায়গা। বিয়ে উতরে যাবে। সেখানে মজুর লাগিয়ে সরাই, ঝাড়পোচ এবং রং হচ্ছে। যতদিন বিয়েটা না পার হয় ততদিন পি-সি কেনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েও কোনও লাভ নেই। কেনা যাবে না। সেজদি তাহলে ফ্যাসাদে ফেলে দেবে। কারণ, রোজ দুপুরে সেজদি মিষ্টিদিদের কাজ দেখতে এসে তার ঘরেই জিরায়। ডুপ্লিকেট চাবি চেয়ে নিয়েছে।

মাইকেলের কয়েকটা লাইন আজকাল প্রায়ই মনে পড়ে হোমস্‌র। কী কৃষ্ণে তুই রে অভাগী, কাল পঞ্চবতী বনে কালকূটে ভরা দেখেছিলি এ ভুজগে। ভুলভাল হতে পারে, সেই ইঙ্কলের পর মাইকেল আর পড়া হয়নি। তবে ব্যাপারটা মোদা এরকমই। এই বুজগটি রশ্মি। কারণ চারুদি মারফত রশ্মি সম্পর্কে মেলা গুজব ছড়িয়ে গেছে তাকে জড়িয়ে। সেজদি—দেখা হলেই—নানাবিধ প্রশ্ন করছে। বিলিতি মেয়ে? মানিয়ে গুছিয়ে নিতে পারবে তো? সুন্দরী বলতে ঠিক কি রকম? রং ফর্সা না ফ্যাকাসে?

ব্যাপারটা জটিলতর করে তুলছে রশ্মি নিজেও। চারুশীলার সঙ্গে সে আজকাল প্রায় রোজ রাতে টেলিফোনে কথা কয় বলে খবর পেয়েছে হোমাস্‌। কি কথা হয় কে জানে! হোমাস্‌র নিজের ফোন তিন চারদিন হল ডেড। চারুদির কাছ থেকে কোনও রানিং কমেন্টারি পাওয়া যায় না। কিন্তু উদ্বেগ রয়েছে। খুব উদ্বেগ। তার পায়ের তলায় কি ভূমিক্ম শুরু হল? দুটি মেয়ে যখন পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে তখন কত কি হয়ে যেতে পারে। চারুদির সঙ্গে রশ্মির এত কিসের কথা? কেন কথা? তাকে নিয়েই কি কথা হয় ওদের?

এরকম অদ্ভুত ধরনের সমস্যা পীড়িত হয়ে হোমাস্‌র দিন কাটছে। না, সাদামাটাভাবে কাটছে না। তার মধ্যেই কাজ করতে হচ্ছে। বিস্তার ইনকাম ট্যাক্স থেকে বিপন্ন ক্লায়েন্টদের উজ্জ্বল উদ্ধার করতে হচ্ছে। আইন ও হিসেবের নানা জটিল, কুটিল এবং জটিলতর ফন্দিফিকিরে মন দিতে হচ্ছে। দৈত্যো হাসি হাসতে হচ্ছে এবং ফাঁকে ফাঁকে ভাবতে হচ্ছে, কেন তার একটা পারসোনাল কমপিউটার দরকার। শুধু অন্যদের বোঝালেই চলবে না, নিজেও বোঝাতে হবে। টেকনোলজি-মুগ্ধ, বেহিসাবী হোমাস্‌র মধ্যে আবার একজন হিসাবী ও সতর্ক যুক্তিবাদী হোমাস্‌ও বাস করে। কিছু কিনলেই তার দ্বৈত সত্তায় একটা দ্বৈত উপস্থিত হয়। তখন হোমাস্‌ একটা আত্মগ্রন্থিতে কষ্ট পায়।

গাঁয়ের নাম বিষ্টপুর। স্কুলেরও একটা বড়সড় নাম আছে। বাসরাস্তায় নেমে মাইলটাক হাঁটতে হল হোমাস্‌কে। তারপর যথারীতি খাতির যত্ন এবং বিশ্রী গরমিলে ভরা হিসেবের খাতা নিয়ে বসতে হল। ব্যাপারটা একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে। স্কুল অডিটের কাজটা এবার ছাড়তে হবে তাকে। ছেড়েই দিত, শুধু শহুরে গন্ধটা গা থেকে ঝেড়ে ফেলতেই মাঝে মাঝে গায়ে আসা।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে হেডস্যার নানা গল্প ফেঁদে বসছিলেন। তার মধ্যেই হঠাৎ চেনা নামটা আচমকা জানালা দিয়ে উড়ে আসা একখানা পাটকেলের মতো পড়ল। কৃষ্ণজীবন। হেডস্যার বলছিলেন, এই স্কুল থেকেই পাশ করে গেছে ডিস্ট্রিক্ট ক্লারকশিপ নিয়ে। স্ট্যান্ডও করেছিল। এখন দুনিয়াজোড়া নাম। মস্ত এনভিরনমেন্টালিস্ট। চেনেন নাকি?

হোমাস্‌ একটু অবাক হয়ে বলে, বিলক্ষণ চিনি। এই গায়ে বাড়ি?

আজ্ঞে। তার মা বাপ ভাই সব এখানে। আমেরিকা থেকে শিগগির একটা বইও বেরোবে শুনছি। ডারলিং আর্থ।

অতটা আবার হোমাস্‌ জানত না। বলল, পাবলিক না জানুক আমি তাঁকে জানি।

কাজ শেষ করে কৃষ্ণজীবনের গ্রামটা একটু ঘুরে দেখল হোমাস্‌। আর পাঁচটা গাঁয়ের মতোই গরিব সাধারণ গাঁ। গৌরব করার মতো কিছুই নেই। কৃষ্ণজীবনের মতো দু-চারজন লোকের জন্যই যা একটু অহংকার।

ফিরে এসে পরদিন অফিস থেকেই কৃষ্ণজীবনের বাড়িতে ফোন করল সে। এবং আচর্যের বিষয়, কৃষ্ণজীবনকে বাড়িতেই পেয়ে গেল। অধ্যাপকদের ওই এক সুবিধে, সপ্তাহে একাধিক ডে অফ।

একটু উৎসাহিত গলায় হোমাস্‌ বলল, আরে মশাই, আমি তো আপনার গায়ে ঘুরে এলাম। একটা অডিটে গিয়েছিলাম।

কৃষ্ণজীবনের গলায় একটা আলাদা মাত্রা যোগ হল, গিয়েছিলেন? কী দেখলেন?

কী আর দেখব? দেয়ার ইজ নেচার, মাঠ ঘাট পুকুর অ্যান্ড এন্ডরিথিং।

কৃষ্ণজীবন মৃদু শব্দে হাসল, দেখেননি।

কী দেখিনি?

কিছুই দেখেননি। বাইরে থেকে কি দেখা যায়?

তা অবশ্য ঠিক। আমার তো সেন্টিমেন্টটা নেই, আপনার মতো।

সেন্টিমেন্ট এক মস্ত জিনিস। খুব মূল্যবান। লোকে কেন যে আজকাল আর এর মূল্য দেয় না।

একটু দেয়। এখনও দেয়।

দেয় না হোমাস্‌বাবু। লোকে শিকড় ভুলে যাচ্ছে।

জানি কৃষ্ণজীবনবাবু।

দুঃখের বিষয় কী জানেন? যারা ওই গায়ে থাকে তারাও গ্রামটাকে ভাল করে চেনে না। কূটকচালি নিয়ে মেতে আছে।

সে কথাও ঠিক। কিন্তু আমার একটু হলেও সেন্টিমেন্ট আছে। আমি গায়ে যাই শহুরে গন্ধ গা থেকে মুছে ফেলতে।

কিছুক্ষণের জন্য।

আজ অফিসের পর চলে আসুন, আড্ডা মারা যাবে।

আপনার সময় নষ্ট হবে না তো! শুনেছি আপনি খুব ব্যস্ত মানুষ।

তাতে কি? আপনার কাছে আমার গাঁয়ের গল্প শুনব সেটা কি কম লাভ?

আপনি সত্যিই বিষ্টপুরকে ভীষণ ভালবাসেন, না?

ভীষণ।

আপনার কি আমেরিকা থেকে বই বেরোচ্ছে একটা।

লাজুক কৃষ্ণজীবন সংকুচিত গলায় বলে, বেরোচ্ছে একটা। ওরকম কত বেরোয়।

বইটার নামও আমি শুনে এসেছি। ডারলিং আর্থ।

কৃষ্ণজীবন মৃদু স্বরে বলল, ওরা খবর রাখে বুঝি?

খুব রাখে। আপনার কথা বলতে তারা গর্ব অনুভব করে।

চলে আসুন, কথা হবে।

হেমাস্বর সময়ের অভাব নেই। অফিসের পর কোথাও যেতে তার খারাপও লাগে না। দুটো কথা শুনলে বা বললে সময়টা কাটে। অফিস থেকে বেরিয়ে একটা মিষ্টির প্যাকেট কিনে নিল হেমাস্বর। তারপর সোজা গাড়ি চালিয়ে চলে এল গোলপার্কার কাছে।

কৃষ্ণজীবন তাকে সোজা নিয়ে গেল নিজের ঘরে। বসাল। পাখা খুলে দিল। তারপর খাপ পেতে বসল তার মুখোমুখি। লোচাখি পণ্ডিত মানুষ, কিন্তু চেহারাখানা গুলবাগের মতো। এখনও মাসকুলার, শক্তপোক্ত এবং দুর্দান্ত হ্যান্ডসাম। চোখ দুখানা ঝলমল করছে অভ্যন্তরীণ জীবনীশক্তি এবং উদ্দীপনায়।

বলুন কেমন দেখলেন বিষ্ণুপুর। ওই গাঁয়ে আমি বড় কষ্ট করে বড় হয়েছি। খাওয়া পরার কষ্ট, মানুষের ব্যবহার দেখে কষ্ট, দারিদ্র্য দেখে কষ্ট। কিন্তু সব সত্ত্বেও কিছু একটা ছিল। সেটা আজও অজানা থেকে গেছে। কিছুতেই বুঝতে পারি না বিষ্ণুপুরের ওপর কেন আমার এত ময়া।

সেটাই তো স্বাভাবিক।

সোংসাংহে ঘাড় নাড়ল কৃষ্ণজীবন, হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো ঠিকই। আপনি সেন্টিমেন্টের কথা বলছিলেন। এটা সেই সেন্টিমেন্টই হবে। কিন্তু সেন্টিমেন্টেরও একটা লজিক থাকে, রুট থাকে। আমি সেইটে খুঁজে পাই না। আপনার চোখ দিয়ে কি দেখলেন বলুন।

হেমাস্বর লোকটার ছেলেমানুষের মতো আবেগ দেখে একটু হাসল। অবাকও হল। বলল, আর পাঁচটা গাঁয়ের মতোই তো।

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে সায় দিল কৃষ্ণজীবন, সে তো ঠিক কথা। বরং আরো অনেক গ্রামের চেয়ে বিষ্ণুপুর আরও শ্রীশ্রী। আরও গরিব, আরও কম সবুজ। নাম বিষ্ণুপুর। লোকে তাচ্ছিল্য করে বলে বিষ্ণুপুর। তবু বিষ্ণুপুর আমাদের শিখিয়েছে কি করে পৃথিবীকে ভালবাসতে হয়।

ভালবাসা কি বাইরের জিনিস কৃষ্ণজীবনবাবু? সেটা তো ভিতরের জিনিস। ভালবাসা আপনার ভিতরেই ছিল।

কৃষ্ণজীবন সঙ্গে সঙ্গে নেড়ে সায় দেয়, ঠিক ঠিক। সব ঠিক কথা। একটা গ্রামের সঙ্গে সেই গ্রামের একটা ছেলের সম্পর্ক কোনও হাইল ফিলজফিক্যাল জিনিস নয়। আমি জানি। বিষ্ণুপুর আমাদের দেশও নয়। আমরা উদ্ভাস্তু ঢাকা জেলার আর একটা গ্রাম থেকে আমরা ওখানে এসে ডেরা বাঁধি। আমার বাবা এখনও দাখিলা গ্রামের কথাই বলেন, তাঁর আজন্মকোশোরের গ্রাম। কিন্তু বিষ্ণুপুর হাজ সাংখিং ফর মি। আমি কি হিপনোটাইজড? কে জানে! আমার মনে হয়, সব জায়গা ছেড়ে আমি একদিন ওখানে ফিরে যাবো।

তা কেন? আপনার ফিস্ত তো অনেক বড়।

জানি, জানি। আমার ফিস্ত তো সারা পৃথিবী। তবু আপনাকে বলছি, বিষ্ণুপুর আমাদের পৃথিবীকে চিনতে শিখিয়েছে। আমি তো অকৃতজ্ঞ নই।

মনে মনে হেমাস্বর বলল, আপনি একটি পাগল। মুখে বলল, ঠিক কথা। কেন বলল তা সে বুঝতে পারল না।

কৃষ্ণজীবন হঠাৎ খুব অন্যমনস্ক হয়ে গেল। ভাবালু গলায় বলল, দিনরাত লোকের ঝগড়া করত, দলাদলি করত, প্রায়ই দাঙ্গাহাঙ্গামা হত, খুব কূটচালি হত, ইকুলে লেখাপড়া একদম হত না। বিষ্ণুপুরের সবই ছিল খারাপ। বিচার করে দেখলে, বিষ্ণুপুরের কোনও সৌন্দর্যও ছিল না। তবু যখন আমি নিজের হাতে চাষ করতাম তখনই মনে হত বিষ্ণুপুরের মাটির ভিতর থেকে একটা গ্রামের স্পন্দন লাগল বেয়ে আমার শরীরে উঠে আসছে। বর্ষাকালে ভীষণ বাজ পড়ত, ঝড়-বাদল তো ছিলই। কিন্তু ভয় করত না। খোলা মাঠের মধ্যে, ঝড়-বাদলে, বজ্রপাতের মধ্যে খুব তুচ্ছ লাগত নিজেকে। মনে হত, এই তো এইটুকু মাত্র আমি। আমি মরে গেলেও তো কিছু নয়। ওই বিরাট আকাশ, ভীষণ বৃষ্টি, মস্ত নীল আগুনের ঝলক—এত ঘটনার মধ্যে আমার মৃত্যু এমন কীই বা! শুধু আমার মতো একটা পোকাকে মারার জন্য তো ভগবান এত আয়োজন করেননি। তিনি আমাকে দেখাচ্ছেন কত বড় তিনি, কত তাঁর ক্ষমতা। আমি কি বোঝাতে পারছি আপনাকে? আমি শুছিয়ে কথা বলতে পারি না।

আপনি বোঝাতে না পারলেও আমি কিছু বুঝতে পারছি। আপনি কি ঈশ্বর মানেন? কয়েকবার ভগবানের কথা বললেন, স্যারেন্টিস্টরা তো নাস্তিক হয়।

কেউ কেউ হয়। আমি নাস্তিক কিনা তা কে বলবে? আসলে বিশ্বজগৎটা এত বিরাট, ইনফাইনিট যে, আমার ব্রেন ফেল করতে থাকে। একটা সময় আসে যখন আমার সবাই স্তব্ধ ও মুক হয়ে যায়। আকাশটা কোথাও শেষ হচ্ছে না, আর সময় নিরবধি কেবলই বয়ে চলেছে। স্তব্ধ নেই, শেষ নেই। খুব গভীরভাবে ভাবলে আপনিও দেখবেন, স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়, কথা হারিয়ে যায়। ওই স্তব্ধতাই বোধ হয় ঈশ্বর। তাই না? নাকি আমি ফের গুলিয়ে ফেলছি সব?

হেমাস্বর মৃদু হেসে মাথা নাড়ল, গুলিয়ে ফেলেননি। তবে প্রসঙ্গ ছিল বিষ্ণুপুর।

হ্যাঁ হ্যাঁ, বিষ্ণুপুর। ওখানকার জল-হাওয়া—মোটা আমাকে কিছু বলতে চাইত। আমার বন্ধুর মতো ছিল সব। আপনি শুনলে হাসবেন, আমি গাছের সঙ্গে, পোকামাকড়ের সঙ্গে, কুকুর-বেড়াল-গরুর সঙ্গে, পাখির সঙ্গে কথা বলতাম। খাওয়ার কষ্ট, পরার কষ্ট, অত পরিশ্রম, তবু মন ভাল থাকত। সবসময়ে যেন আনন্দ একটা নদীর মতো কুলকুল করে বয়ে যেত বৃকের ভিতর দিয়ে। আমি কি ভাবালু হয়ে যাচ্ছি?

না। বেশ তো বলছেন।

আসলে তখন খুব মনে হত, আমি কখনও একা নই। আমার সঙ্গে বিষ্ণুপুরের গাছপালা, পশুপাখি সবাই আছে। ওই যে ভালবাসা ওটাই আমাকে এমনও ধরে রাখে। বাঁচিয়ে রাখে। এখন তো বুড়ো হতে চললাম, কত বয়স হল, তবু মনে হয় এখনও এক যুক্তিহীন বাচ্চা ছেলে আমাকে হাত ধরে বিষ্ণুপুরের দিকে কেবলই টানে। খুব টানে।

হোমস মাথা নেড়ে বলে, এরকম হতেই পারে।

আচ্ছা, বসুন। আপনার সঙ্গে আমি খুব অভদ্রতা করছি। বাড়ীর কারও সঙ্গে বোধ হয় আপনার পরিচয় নেই!

হোমস মৃদু হেসে বলে, কেন থাকবে না। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আমার তো পুরনো আলাপ। ডাক্তার দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম, মনে নেই?

ওঃ, তা হবে। বলে কৃষ্ণজীবন খুব হাসল, আমার কিছু মনে থাকে না।

গুধু বিষ্ণুপুরের কথা খুব মনে থাকে, না?

কৃষ্ণজীবন যখন হাসে তখন তার মুখখানা সত্যিই শিশুর মতো হয়ে যায়। হাসিটা হেসে কৃষ্ণজীবন ঘর ছেড়ে চলে গেল এবং এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল রিয়াকে নিয়ে।

দেখ, কে এসেছেন।

রিয়া তটস্থ হয়ে বলে, আগে বলবে তো? ডোরবেল শুনেনিলাম, কিন্তু বুঝতে পারিনি কে এসেছে। ছি ছি, দেখুন তো, শুকনো মুখে এতক্ষণ বসে আছেন!

ব্যস্ত হবেন না। আমি ঐর কথা শুনছিলাম।

রিয়া হাসল, আজকাল খুব কথা বলে। আগে কিন্তু মুখ থেকে কথাই বেরোতো না। ভীষণ গম্ভীর আর মুখচোরা ছিল। তবে সব বিষয়ে নয়, মনের মতো বিষয় পেলে তবেই বলে।

কৃষ্ণজীবন লাজুক মুখে বসে রইল, যেন অপরাধ হয়েছে।

রিয়া জিজ্ঞেস করে, কী খাবেন বলুন তো! নোনতা কিছু করে দিই?

বলতে নেই হোমস খেতে ভালবাসে। ফটিকের হাতের রান্না বা হোট্টেলে খেয়ে সেরকম তৃপ্তি নেই। বিশেষ করে ভোজনরসিকদের। সুতরাং কেউ খাওয়াতে চাইলে সে খুব একটা প্রতিবাদ করে না।

তবে পেটুক না ভাবে সেই জন্য নরম করে একটু আপত্তি করল, না না, ঝামেলা কেন করবেন?

ঝামেলা হবে কেন? আমার একজন ভাল রাঁধুনি আছে। কচুরি খাবেন তো? আর হিং দিয়ে আলুর দম?

কচুরির কথায় হোমসের খিদে চাগিয়ে উঠল। বলল, ব্যাচেলর মানুষ সব খাই।

রিয়া চলে যাওয়ায় কৃষ্ণজীবন মৃদু স্বরে বলল, আমি সত্যিই আজকাল বোধ হয় একটু বেশী কথা বলে ফেলি। আপনি কিছু মনে করেননি তো!

হোমস মাথা নেড়ে বলে, আপনার গলার স্বর এত আট্টাকিট এবং যা বলেন তাতে এত কনভিকশন থাকে যে শুনতেই হয়। আমি শহুরে মানুষ, তার ওপর মডার্ন টেকনোলজির অঙ্গ ভক্ত। তাই বোধ হয় আপনার সঙ্গে আমার চরিত্রের একটু পার্থক্য আছে।

কৃষ্ণজীবন যে অভ্যন্তরের একটা অস্থিরতা সবসময়ে ঢেকে রাখে বা রাখতে চেষ্টা করে তা বুঝতে খুব একটা কষ্ট হয় না।

সেই অস্থিরতায় হঠাৎ মাথা নেড়ে কৃষ্ণজীবন বলে উঠল, টেকনোলজি! নিশ্চয়ই টেকনোলজিরও দরকার। সেই টেকনোলজি আমাদের লোভ দেখাবে না, অলস করবে না, বস্তুর ভার বাড়িয়ে তুলবে না। টেকনোলজি হবে হেলপফুল। অতিরিক্ত টেকনোলজি প্রকৃতির নিয়মকে গুরুত্বহীন করে দিতে চায়। আমাদের জীবনে প্রকৃতিরও যে একটা ভূমিকা আছে সেটা কিছুতেই বুঝতে চায় না মানুষ।

কিন্তু এবার তাকে বুঝতেই হবে বুঝতেই হবে।

ডারলিং আর্থ বইটা আপনি কি এসব নিয়েই লিখেছেন?

হ্যাঁ, ওইসব, আরও অনেক কিছু। হয়তো পড়ে লোকে হাসবে। তবু আমার কথা তো আমাকেই বলতে হবে। তাই না?

তা তো বটেই। কবে বেরোচ্ছে বইটা?

হয়তো অক্টোবরের শেষে। আমাকে লস এঞ্জেলসে যেতে হবে। ওরা যখন কোনও বই পাবলিশ করে তখন খুব একটা পাবলিসিটি দেয়। লেখককে সাংবাদিকদের মুখোমুখি বসিয়ে দেয়। অনেক রকম প্রশ্ন করা হয়। চোখা চোখা প্রশ্ন।

বলে খুব হাসল কৃষ্ণজীবন। যেন ব্যাপারটা খুব মজার।

হোমসের কাছে মোটেই মজা বলে মনে হচ্ছিল না।

এই ক্ষ্যাপাটে লোকটা মার্কিন সাংবাদিকদের গোলমালে, ক্ষুরধার সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে তো? পারবে হয়তো। কারণ কৃষ্ণজীবনকে যতই থামা বা ক্ষ্যাপাটে মনে হোক, দুনিয়ার জ্ঞানীণীরা তো একে রাহাখরচ দিয়ে সম্মানের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে এর কথা শুনবার জন্যই!

কিন্তু আড্ডা মারার পক্ষে লোকটা ভাল কি? মোটেই নয়। সবসময়ে যেন অন্যমনস্ক, সবসময়ে মুখের ভাব পাটে যাচ্ছে। ভিতরকার একটা অস্থিরতার সঙ্গে যেন লোকটার নিরন্তর লড়াই। এ আড্ডাবাজ মানুষই নয়।

কৃষ্ণজীবন অনেকক্ষণ নীরবে বসে রইল। একটাও কথা বলল না।

হোমসও চুপ করে বসে রইল।

এক সময়ে কৃষ্ণজীবনই নীরবতা ভেঙে প্রশ্ন করল, আপনি টেকনোলজির এত ভক্ত কেন বলুন তো!

আমি টেকনোলজি বা প্রকৃতি সব কিছুই ভক্ত। তবে আধুনিক যন্ত্রপাতি আমাকে খুব মজা দেয়। ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ, সোলার কুকার। হয়তো আমি নিজে টেকনিক্যাল লোক নই বলেই একটা বিশেষ কাজ করে। আবার গাছপালা, সবুজ ক্ষেত, নদী এসবও ভাল লাগে। তা না হলে কি প্রায় প্রতি উইক-এন্ড এই গাঁয়ে যাই শখ করে?

কৃষ্ণ জীবন একটু হাসল। বলল, নিশ্চয়ই। ভালবাসাটাই আসল জিনিস।

“নিশ্চয়ই” এবং “ভালবাসাটাই আসল জিনিস” এ দুটো কথাকে মেলাতে পারল না হেমাঙ্গ। কথামতো তার কথার প্রকৃত জবাবও নয়। কৃষ্ণজীবন কি তাহলে নিজের সঙ্গে কথা বলছে? তার সঙ্গে নয়? এ কি সলিলোকি? হেমাঙ্গ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কৃষ্ণজীবনের মতো লোকেরা একটা ভিন্ন স্তরে বাস করে। এরা ঠিক তার লেভেলের মানুষ নয়।

রিয়া যখন কচুরির থালা নিয়ে এল তখন ঘরের আবহাওয়াটাই গেল পাল্টে। নীরবতার বলয়টা ভেঙে স্বাভাবিক হল আবহ। খেতে খেতে আর একটা ব্যাপারও লক্ষ করল হেমাঙ্গ। কৃষ্ণজীবন খেতে ভালবাসে। খুব প্যাশন নিয়ে, আবেগ নিয়ে খায়। উপভোগ করে না, ক্ষুধার্তের মতো আক্রমণ করে খাদ্যবস্তুকে।

রিয়া বলল, আচ্ছা, আপনি কেন একা থাকেন বলুন তো? নিজের বাড়িঘর ছেড়ে একা একটা মন্ত বাড়িতে থাকেন, তাই না?

একা থাকার একটা আলাদা মজা আছে।

ভয়-ভয় করে না?

কিসের ভয়? ভূতের নাকি?

রিয়া খুব হাসল, বলল, আমার কিছু খুব ভূতের ভয়। এই যে ফ্ল্যাট দেখছেন এখানেই একা থাকতে হলে আমি ভয়ে মরে যাবো।

না, আমার ভূতের ভয় নেই।

চারুশীলা খুব আপনার কথা বলে। মুখে বাড়িগুলো লক্ষীছাড়া বললেও ভীষণ ভালবাসে আপনাকে।

হ্যাঁ, তা বাসে। কিন্তু মাঝে মাঝে সেটা প্রায় আমার গলার ফাঁস হয়ে ওঠে।

বিয়েতে নেমন্তন করবেন তো?

বিয়ে! বলে হেমাঙ্গ হাঁ করে রইল, কার বিয়ে?

আপনার।

আমার? এ খবর কে দিল আপনাকে?

কেন চারুশীলাই তো বলছিল।

কী বলছিল?

একজন বিলেতফেরত সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আপনার বিয়ে। নামটাও জানি। রশ্মি রায়।

কী সর্বনাশ! দোষী জানিল না কী দোষ তাহার, বিচার হইয়া গেল!

ও মা, আপনি জানেন না নাকি?

না তো! রশ্মির সঙ্গে আমার একটুখানি মাত্র বন্ধুত্ব। তাও অডিট করতে গিয়ে। নাথিং সিরিয়াস।

কিন্তু চারুশীলা যে খুব জোর দিয়ে বলল।

ওর কথা একদম বিশ্বাস করবেন না। দিনকে রাত করতে পারে।

আচ্ছা যা হোক, আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম যে আপনার বিয়ে।

লোককে বোকা বানাতে চারুশীলার জুড়ি নেই।

রশ্মি কিন্তু ভীষণ ভাল মেয়ে। বিয়ে করলে বেশ মানাত আপনার সঙ্গে।

বিয়ের প্রশ্নই ওঠে না।

কেন বলুন তো!

এমনিই। রশ্মির মতো মেয়ে আমাকে বিয়ে করতে চাইবে কেন? চারুদির যত সব আকাশ-কুসুম চিন্তা।

এবার খুব অবাক হয়ে রিয়া বলল, ও মা, সে কি কথা! কে বলল আপনাকে যে রশ্মি আপনাকে বিয়ে করবে না?

আমি জানি।

এ মা! আপনি কিছুই জানেন না। রশ্মির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে যে।

পরিচয় হয়েছে? কি করে?

রশ্মি যে প্রায়ই আসে চারুশীলার বাড়িতে। গতকালও এসেছিল।

কচুরিটা মুখে বিশ্বাস ঠেকছিল হেমাঙ্গর।

সে বলল, আমি এত সব খবর জানি না।

খিলখিল করে হেসে রিয়া বলল, আপনি অনেক কিছুই তো জানেন না দেখছি। এমন কি একটা মেয়ে যে আপনার প্রেমে পড়েছে সেই খবরটা অবধি নয়। আপনি তো দেখছি আমার কর্তাটির মতোই আনমনা মানুষ।

আমি আনমনা নই, তবে লেস ইনফর্মড। আমাকে না জানিয়ে পৃথিবীর ঘটনাবলী অনেক এগিয়ে গেছে।

আপনার কিন্তু এ খবরটা জানার কথা।

কিন্তু প্রেমের কথা বলছেন কেন? আমরা তো প্রেমে পড়িনি!

কি জানি বাবা! আমার তো মনে হল মেয়েটির আপনারকে ভীষণ পছন্দ। আপনার প্রসঙ্গ উঠলেই এমন লজ্জা পাচ্ছে, ব্রাহ্মণ করছে আর মিষ্টি মিষ্টি হাসছে যে, ভুল হওয়ার কথাই নয়।

খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে হেমাঙ্গ বলল, এটা কি করে হল তা আমি একদম বুঝতে পারছি না।

এই ব্যক্তিগত ব্যাপার আমি প্রকাশ্যে বলে ফেললাম বলে কিছু মনে করবেন না। আমি তো জানতাম আপনাদের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

হোমস বেষীক্ষণ বসতে পারল না। কচুরিগুলো খানিক ফেলে খানিক গিলে উঠে পড়ল। তার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে। অস্বস্তিটা মানসিক, কিন্তু সেটা শরীরটাকেও চঞ্চল আর অস্থির করে তুলেছে। কোনওরকমে বিদায় নিয়ে সে নিচে এসে গাড়ি ছাড়ল। প্রথমে ভেবেছিল, চারুশীলার কাছে গিয়ে একটা জবাবদিহি চাইবে। কিন্তু সেটাও বিপজ্জনক। কে জানে হয়তো রশ্মি সেখানে এসে বসে আছে। এমন নয় যে, রশ্মিকে তার অপছন্দ। এমনও নয় যে, বিয়ে করা তার পক্ষে একটা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু যেটা বিনয়কর তা হল, রশ্মির পক্ষে তার প্রেমে পড়াটা। এরকমও হয় নাকি? এত অল্প পরিচয়ে?

॥ ৪১ ॥

হ্যা গো, তর্পণের দিন কি এসে গেল নাকি?
নয়নভারা একখানা পুরোনো জং-ধরা কৌটো খুলবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে বলে, সে এখনও দেরি আছে।
পঞ্জিকাকানা দেখে রেখে।
পঞ্জিকা তো এ বছর আনাই হয়নি। রামজীবন প্রতিবার একখানা হাফ পঞ্জিকা এনে দেয়। এবারটায় বুঝি ভুলে গেছে।

তা হলে?
ও নিয়ে ভাবতে হবে না। ভুল তো কোনওদিন হয়নি। এবারও হবে না। বাংলা ক্যালেন্ডার আছে।
খেয়াল রেখো।
কৌটোটা একটু খুলে দেবে নাকি? বর্ষার পর কৌটো-বাউটের মুখ জং ধরে বড় আঁট হয়ে বসে। দেখ তো পারো কিনা।

বিষ্ণুপদ কৌটোটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটু দেখল। চাড় দিয়ে খোলার জিনিস নয়, প্যাচের ঢাকনাও নয়। এ হচ্ছে বসানো ঢাকনা। ভিতরে মাল আছে, বেশ ভারী। নাড়লে ঝুম ঝুম শব্দ হচ্ছে।
বিষ্ণুপদ খোলার চেষ্টা করতে করতে বলল, কী আছে এর মধ্যে?
তা কি ছাই জানি? রাজ্যের কৌটো, কোনটার মধ্যে কী কে জানে। খুললে বুঝব। চাল, ডাল, তিল, পোস্ত কিছু একটা হবে। যা-ই থাক, ছাটা পড়ে আছে হয়তো। চনচনে রোদে একটু রেখে দিলে দোষ কাটে।
উঠানের মাঝখানে চটাই বিছিয়ে বিস্তর জিনিস রোদে দিয়েছে নয়নভারা। কিছু মশলাপাতি, ডাল, পুরোনো তেঁতুল হালধি।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, হাত পিছলে যাচ্ছে। আঁচলটা দাও তো, সঁটে ধরে খুলে ফেলি।
থাক বাপু, বেশি কসরতে কাজ নেই। রেমো আসুক, খুলে দেবে।
বিষ্ণুপদ নিজের ধুতির খুঁট দিয়ে আরও কয়েকবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে বলে, এ একেবারে তোমার আমার মতো কৌটো আর ঢাকনা দুজনকে-দুজনায় সঁটে ধরেছে। কেউ কাউকে ছাড়তে চাইছে না।
নয়নভারা বালিকার মতো একটু হাসল, শতুরের মুখে ছাই দিয়ে তাই যেন থেকো। কৌটো আর ঢাকনা-তোমার মাথায় খেলেও বাপু সব অদ্ভুত কথা!

চটাইয়ের দিকে চোখ কুঁচকে চেয়ে ছিল বিষ্ণুপদ। বলল, সাদামতো ওটা কী দিয়েছো রোদে? সাণ্ড নাকি?
হ্যা, গেলবার পটলের জ্বরের সময় আনানো হয়েছিল।
বড় দানা?
বড়ই।

ভিজিয়ে লেবুপাতা, চিনি আর নুন দিয়ে খেতে ভারী চমৎকার। একখানা পাকা কলা আর একটু কৈরানো নারকোল হলে তো কথাই নেই।

বড্ড নোলা হয়েছে আজকাল, না গো?
তা বুড়ো বয়সে একটু হয়। সাণ্ডতে কোনও দোষ নেই। খেলে পেট ঠাণ্ডা থাকে। কী বলো?
দেবোখন ভিজিয়ে। কৌটোটা খুলতে পারলে?
না। বুড়ো হাড়ে কি আর সেই শক্তি আছে? আগে হলে এক মোচড়ে খুলে ফেলতাম।
না গো, কৌটোর মুখে মরচে পড়লে বড্ড এঁটে যায়। কথায় কথায় বুড়ো বয়স এনে ফেল কেন?
বিষ্ণুপদ ফর্সা রোদের উঠানে চোখ দুখানা ফেলে রেখে বলে, দিনে পনেরো বিশ মাইল সাইকেল চালাতাম, নিজের হাতে চাষ করতাম। শরীরে তখন হাতির মতো জোর ছিল। এখন কেমন ঝিম মেয়ে গেছি। মনে হয় ভেজা কাঁথা জড়িয়ে বসে আছি।

জাঁতির কোণা দিয়ে মুখটা আলগা করে অবশেষে খুলে ফেলল নয়নভারা।
কৌটোর ভিতরে চেয়ে বলল, সর্ষে গো!
শনে বিষ্ণুপদ খুব হাসল, আর ভাল জিনিস কিছু বেরোলো না! সর্ষে? আমি তো ভাবছিলাম সোনাদানা হীরা-জহরত কিছু বেরোবে।

আমাদের কপালে কি তাই আছে গো! তা সর্ষেই খারাপ কি? রোদে মচমচে করে শুকিয়ে রাখলে ঝাঁঝ উঠে যাবে।
কচুবাটা খাবে আজ? ছাইগাদা থেকে মানকচুটা তবে তোলাই।
উদাসভাবে বিষ্ণুপদ বলে, বর্ষাকালটা তো কচুয়েঁচু খেয়েই কাটলাম। এ সময়ে নতুন ফুলকপি ওঠে, খুব স্বাদ।

এখানে কি আর ওঠে ? সে কলকাতায়, দামও তেমনি ।

বিষ্ণুপদ একটু খেদের সঙ্গে বলে, ওইটেই তো মুশকিল । ভাল জিনিসের দামটাও আবার ভাল । আজকাল শুনি, বড়লোকরা নাকি বেশী খায়-টায় না । বেশী খেলে নাকি কিসব হয় । প্রেসার, কোলেস্টেরাল, হার্টের ব্যামো । আর আমাদের দেখ, পেলাম তো খেলায় । মরি মরব, মরণ তো আর খগনো যাবে না, তা খেয়েই না হয় মরলাম । কী বলো ?

মরবে কোন দুঃখে ? বড়লোকদের ভাল খেয়ে খেয়ে অরুচি, তাই বেশী খায় না ।

বিষ্ণুপদ যেন একটু অবাক হয়ে বলে, অরুচিটা হয় কি করে বলো তো! আমার তো অরুচি হয় না কখনও । তেলাপিয়া মাছ থেকে গমের ঝিচুড়ি কোনটাই তো এ পোড়া জিবে কখনও খারাপ লাগেনি । খিদের ভাবটারও কখনও মন্দা হল না ।

নয়নতারা হাসে, বড়লোকদের জিব তুমি পাবে কোথায় ? ওসব বড়লোকদেরই হয় । অরুচি, অখিদে ।

একবার বলে দেখো তো রেমেটাকে । বললে একদিন ঠিক এনে দেবে ।

ফুলকপি তো! বলে দেখব'খন ।

আগে বাগানেই হত দু'চারটে । আজকাল আর বাগান কেউ করে না । করলে আর বাজার থেকে দুনো দামে কিনতে হত না ।

কে করবে বলো! কার দায় ? যতদিন ভূমি করেছে ততদিন হয়েছে । এখন বাগানে একখানা কুমড়াবিচিও কেউ পোতে না । আমি মরে মরে দু'চারট যোগাড় লাগাই, গরু ছাগলেই খেয়ে যায় সব । ভাগের জমি বলেই বৃষ্টি কারও গা নেই ।

বিষ্ণুপদ হঠাৎ বলল, বুঝলে, সামনের বছর অবধি যদি বাঁচি, তাহলে আমি বাগানটায় হাত লাগাবো । জলটল না হয় পটলকে দিয়ে দেওয়াবো ।

খুব বাঁচবে । হেসে-খেলে এখনও মেলা বাঁচবে ।

বিষ্ণুপদর মেজাজটা আজ ভাল ।

নয়নতারা সর্ষে রোদে দিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই বলল, একখানা গরদ দিয়ে গেল না তোমাকে কৃষ্ণজীবন ?

গরদ বলে গরদ! একেবারে আসল জিনিস ।

কত দাম হবে মনে হয় ?

তা কি আর জিজ্ঞেস করিনি! মিটিমিটি হাসল শুধু, বলল না । দাম ভালই হবে মনে হয় । জীবনে গরদ ক'টা চোখে দেখছি যে, দাম জানব ?

একদিনও তো পরতে দেখলাম না!

বাপের! পরব কি গো ? সারা দিন গোবর-ন্যাভা, জলকাদা ঘাঁটছি, গরদ পরে বসে থাকলে তো চলবে না । ওসব বড়মানুষদের ঘরে হয় ।

ওইটে কৃষ্ণজীবন ভুল করল । সাধ করে গরদ এনে দিল, কিন্তু বুদ্ধি করে যদি ও-টাকায় কয়েকখানা আটপৌরে শাড়ি এনে দিত তাহলে কত সুবিধে হত বলো তো!

শখ করে দিয়েছে । কী করবে বলো!

গলাটা একটু নামিয়ে বিষ্ণুপদ বলে, ও গরদ তোমার গায়ে তো উঠবে না, ও পরে বেড়াবে বামার বা রেমোর বউ । তুমি পটলটি যেই তুলেছো সেই খাবা মারবে সব জিনিসে ।

নয়নতারা একটু হেসে বলে, এতদিনে তাহলে সংসার চিনতে শিখলে!

আগেই চিনেছি, চুপ করে থাকি বলে বোকা ভেবো না ।

বোকা তো তুমি নও, তবে বোকা ভাবব কেন ?

তাই বলছি গরদটা দু'চারদিন পরে নাও । আমাদের তো বেশি কিছু নেই । তোমাকে সারা জীবন দিতে-থুতেও পারিনি কিছু । মনে ইচ্ছে অনেক হয়েছে । পারলাম কই ?

নয়নতারা বলে, ওরকম বোলো না তো! দাওনি তে কী হয়েছে ? পারলে কি দিতে না ? ছেলের দেওয়াই তোমার দেওয়া । ছেলে তো তোমারই ।

তাই ধরে নিচ্ছি । কিন্তু একটু পরো । না পরলে কি দেওয়ার দাম থাকে ?

আচ্ছা পাগলামি শুরু করলে দেখছি । গরদটাকে একটু জুড়োতে দাও ।

বিষ্ণুপদ মৃদু স্বরে বলে, আমাদের এখন ভাঁটির ব্যস । কোনও কাজে দেবী করা ভাল নয় ।

আজ বাড়ি ফাঁকা । রাঙা তার দুই ছেলে নিয়ে দিন কয়েকের জন্য বাপের বাড়ি গেছে । বামাচরণের বউ নিজের ঘর থেকে বড় একটা বেরোয় না আজকাল । তার হাঁড়িও আলাদা । তারা বুড়োবুড়ি একটু একা হয়েছে । সকালের দিকটায় দুজনে কথা হচ্ছে ।

নয়নতারা আর একটা কৌটো খুলে কী যেন দেখছিল । বলল, ঠিক আছে, পরব না হয় । শীতলামন্দিরে গিয়ে একটু পুজোও দিয়ে আসব গরদ পরে । কতকাল যাই না ওদিকে ।

আজ রাঁধবে-বাড়বে কি ?

সেই তো ভাবছি । রেমো তো সকালে বেরিয়ে গেল । বাজার করলে হত একটু । তেমন কিছু নেই । তেলেরও টান রয়েছে ।

বিষ্ণুপদ একটু হাসল, তাতে কি তোমার আটকায় ? চিরটা কাল তো টানাটানির সংসারেই হাত পাকালে । সন্দেহ পোড়া ছাঁচড়া দিয়ে দিবা খেয়ে গেলাম আমরা । কিছু লাগলে বলো, এনে দিই । কৃষ্ণজীবন তো কিছু টাকাপয়সা দিয়ে গেছে সেদিন ।

নয়নতারা চোখ পাকিয়ে বলল, ওতে হাত দেবে কেন? আছে ক'টা টাকা থাক না। দুর্দিনে কাজে লাগবে।

বিষ্ণুপদ একটি দুঃখের হাসি হেসে বলে, তোমার বড় সরল মন। দুর্দিন আর আসবে কি? চিরটা কাল তো দুর্দিন মাথায় করেছে কাটিয়ে এলে। তার চেয়ে খারাপ আর কী হবে? তাই তো বলি, চোখ ওল্টালে ছেলেরা বউরা সব হাঁটকে মটকে নিয়ে নেবে। ভুতভূজিতে যাবে সব কিছু। তার চেয়ে ও টাকা নিজেরা খরচ করাই ভাল।

তোমার কেবল খরচই বৃদ্ধি। ও বৃদ্ধি ভাল নয়। চলছে চলুক না।

আম্মা কেপ্পন মানুষ তুমি।

বিষ্ণুপদ আর কথা বাড়াল না। বসে বসে নয়নতারার কাজ দেখতে লাগল। জিনিসপত্রের কী যত্ন মানুষটার। একটা দানা অবধি নষ্ট হয় না। একটু তিল, একটু ধনে, একটু ডাল কি চাট্রি পোস্ত সব কুলায় বেড়ে রোদে দিয়ে নির্দোষ করে যত্নে আবার কৌটোয় ভরে রেখে দেয়। গরিবের সংসারে কত অভাব থাকে। সাধ্যমতো নয়নতারা চিরকাল গতর খাটিয়ে ফুটো নৌকা সামাল দিয়েছে। অনুযোগ করেনি, ঝগড়া করেনি। এই একজনের কাছে নিজেকে বড় ঋণী লাগে বিষ্ণুপদর। বড় মায়াও হয়। এই মানুষটাকে কোনওদিন হাতে করে একখানা ভাল জিনিস এনে দেয়নি। কী খেতে ভালবাসে, কোন রঙের শাড়ি পছন্দ সেই খোঁজটাও নয়নি কখনও।

তুমি বড় ভাল মানুষ গো!

বিষ্ণুপদর কথাটা শুনে কুলা থেকে মুখ তুলে নয়নতারা একটি হাসল, তুমি ভাল বলেই আমিও ভাল। মেয়েমানুষ জলের মতো, যে পাড়ে থাকে তার মতোই হয়।

সে তো তুমি বললে। একালের মেয়ে-বউরা বলবে?

আমাদের আর একাল দিয়ে দরকার কি? ওরা ওদের মতো থাক।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, সে কথা তো আমিও তোমাকে বলি। তোমার মতো মানুষ হলে সংসারে অশান্তি হয় না। সব দিক বুঝে, ঠিক রেখে চলতে জানা চাই।

মেয়েদের কথা বলছো! পুরুষগুলোরও হাল একবার চেয়ে দেখ। তুমি যেমন মানুষ তেমনটা একালে পাবে খুঁজে? নেশা-ভাঙ নেই, বায়নাঙ্কা নেই, তর্জন গর্জন নেই, মেয়েমানুষের দোষ নেই। তা আমার ভাগ্য সেদিক দিয়ে বড় ভাল। খাওয়া-পারার কষ্ট সয়ে নিরেছি শুধু তুমি ভাল বলে।

বিষ্ণুপদ খুব হাসল দুলে দুলে। তারপর বলল, সেই ভাল। তুমি ভাল, আমিও ভাল। দুজনেই দুজনের কাছে ভাল, কেমন তো?

নয়নতারারও হাসল, বলল, হ্যাঁ তো।

উঠানের আগল ঠেলে এই সময় দুটি মানুষ ঢুকল উঠানে। একটি বেশ বলমলে শাড়ি-পরা মেয়ে। সঙ্গে একজন পুরুষ। বিষ্ণুপদ চোখ কঁচকে ঠাঠর করে বলল, কে?

নয়নতারা কুলাটা নামিয়ে রেখে কলধ্বনি করে উঠল, ও মা! এ যে নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় না! বীণাপাণি! আয় আয়।

বিষ্ণুপদ যে খুব খুশি হল তা নয়। এই মেয়েটি সম্পর্কে ভাল কথা শোনা যায় না। লোকে আজকাল খারাপ কথাই বলছে। ভবু জলটোঁকি ছেড়ে বিষ্ণুপদ উঠে দাঁড়াল।

বীণাপাণি দৌড়ে এসে মাকে জড়িয়ে ধরল, কেমন আছো মা?

তোকে নিয়ে খারাপ স্বপ্ন দেখে যে কী মন খারাপ আমার! তোর বাবাকে নিয়ে বনগাঁয়ে যাবো বলে ঠিক করে ফেলেছিলাম। তারপর আর যাওয়া হল না।

বীণা আর নিমাই বিষ্ণুপদকে প্রণাম করে বারান্দায় মাদুর পেতে বসল। দুজনের কারণে মুখেই সুখের ছাপ দেখতে পেল না বিষ্ণুপদ। নিমাইয়ের দিকে চেয়ে বলল, কেমন চলছে তোমার?

নিমাই শুকনো মুখ করে বলল, ওই টুকটাক করে চলছে।

জবাবটায় বিষ্ণুপদ খুশি হল না। জটা কৌচকানোই রইল। বলল, কেন বাবা, তুমি কাজকর্ম কিছু করো না?

একটা দোকান খুলবার ইচ্ছে আছে।

বিষ্ণুপদ দেখল, বীণাকে নিয়ে নয়নতারা গিয়ে ঘরে ঢুকল। মেয়েদের নানা কথাবার্তা থাকে।

বিষ্ণুপদ বলল, দোকান তো তোমার একখানা ছিল।

ছিল। সে তুলে দিতে হয়েছে।

তাহলে তোমাদের চলছে কিসে?

বীণা কিছু পায়।

কথাটা শুনেছি। শুনে আমার ভাল লাগেনি। বীণা যাত্রাদলে কেন নামল বলতে পারো?

আজ্ঞে, আমি বারণ করেছিলাম। শোনেনি।

কেন শোনেনি?

তখন আমার বুকের দোষ হয়েছিল। রোজগারপাতি বন্ধ। পেটের দায়ে আর আমাকে বাঁচাতেই নেমেছিল।

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, ওসব ভাল ব্যাপার নয়। চারদিকে মেয়েদের যে কত বিপদ।

বীণা তো আমার কথা শোনে না। আপনারা বলে দেখুন।

আমি! বলে বিষ্ণুপদ আকাশ থেকে পড়ল, আমার কথায় কি কাজ হয় বাবা? বলিও না কাউকে কিছু। তোমাকে বললাম, ধর্মভীরু মানুষ বলে।

ধর্মভীরু মানুষদের এখন ভাত জোটে না।

তাই দেখছি। একটা ভারি উল্টোপাল্টা রকম চলছে এখন। কী বলো?

আজ্ঞে ।

অনেকদিন এদিকে আসো-টাসোনি । দেখতে হচ্ছে যায় । তোমার মুখখানাই তো ভুলতে বসেছিলাম ।

বড় আটকা পড়ে আছি ওদিকে । বীণা মন করল, তাই আসা ।

যাত্রাদল কি ও অনেক টাকা পায় ?

না, তেমন কিছু নয় । আগের চেয়ে এখন একটু বেশি পাচ্ছে ।

একটা কথা কি জানো ? মেয়েদের রোজগার হঠাৎ খুব বেড়ে গেলে লক্ষণটা ভাল নয় । ওর মধ্যে একটা কিছু ঢুকে থাকে ।

নিমাই সামান্য লজ্জিত হয়ে বলে, তেমন কিছু বাড়েনি ।

বিষ্ণুপদ সামান্য চুপ করে থেকে বলে, দুনিয়াটায় এখন টাকা আর মেয়েমানুষ ছাড়া যেন কিছু নেই । আর একটা জিনিসও দেখি, খুব বেড়েছে । নেশা ।

তা যা বলেছেন ।

বনগাঁ কেমন জায়গা ?

ভাল মন্দ মিশিয়ে ।

দোকানটা কবে করবে বাবা ?

খোজা হচ্ছে । সুবিধেমতো পেলেই খুলে ফেলব ।

তখন বীণাকে যাত্রাদল থেকে ছাড়িয়ে নিও ।

আজ্ঞে, চেষ্টা করব ।

জামাটামা খুলে তেলটেল মাখো । কুয়োয় চান করবে, না কি পুকুরে ?

নিমাই একবার আকাশের দিকে চেয়ে বলল, এখনও বেলা অনেক আছে । এগারোটার বেশি বাজেনি । হবে'খন সব ।

বিষ্ণুপদের কথা ফুরিয়ে গেল । আজ দম ধরে অনেক কথা বলে ফেলল । এত বেশী কথা মানুষ নয় সে । কথা বেরিয়ে যাওয়ায় শরীরটাও একটু কাহিল লাগছে । ঘামও হচ্ছে যেন একটু ।

নয়নতারা বেরিয়ে এসে বলল, ওগো, একটু এধারে শুনে যাও ।

বিষ্ণুপদ উঠল । কাছে যেতেই নয়নতারা চাপা গলায় বলল, জামাইকে তো আর কচুয়েঁচু খাওয়াতে পারি না । একবার বাজারপানে যাবে নাকি ?

বাজার! কতকাল যাইনি ।

আজ যে রেমেটাও বাড়ি নেই । পারবে না ?

পারব । টাকা দেবে নাকি ?

দেবো ।

বাজারের দরদাম কিছু জানি না । ঠিকিয়ে দেবে হয়তো । কী কী আনতে হবে বলে দাও । বুদ্ধি খাটিয়ে কিন্তু আনতে পারব না ।

একটু মাছ তো লাগবেই । একটু সর্ষের তেল । কয়েকটা আলু আর দুটো বেগুন ।

নয়নতারা টাকা বের করে দিল । একখানা ব্যাগ ধরিয়ে দিল হাতে, তারপর বলল, ছাড়াটাও নিয়ে যাও । রোদ বেশ চড়া লাগছে ।

বাজার করতে ছাতায় সুবিধে হয় না । ও থাক । তেমন গরম নয় ।

চটিজোড়া পরে রওনা দিতে যাবে এমন সময় নিমাই 'হাঁ হ্যাঁ করে ওঠে, আহা আপনি বাজারে যাচ্ছেন কেন ? কিছু নেই নাকি বাড়িতে ?

নয়নতারা বলল, সে যা আছে তাতে জামাইকে দুটি ভাত বেড়ে দেওয়া যায় না ।

নিমাই মাথা নেড়ে হেসে বলে, আজ্ঞে, ওসব বলে লজ্জা দেবেন না । আমি তালেবর লোক নই । গরিবের ছেলে, দুটি ডালভাতই অসুত । বুড়ো মানুষকে এই দুপুরে বাজারে পাঠাতে হবে না ।

বিষ্ণুপদ না-যেতে পারলে বাঁচে । ঘটনাটা কী দাঁড়ায় তা দেখার জন্য দাঁড়িয়ে রইল ।

নয়নতারা বলল, পাঠাতে হতই বাবা । দুচারটে জিনিস না হলেই চলবে না ।

হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা বিষ্ণুপদের হাত থেকে নিয়ে নিমাই বলে, তাহলে দিন আমি এনে দিই ।

সে কি হয়! তুমি জামাইমানুষ, ধুলোপায়ে বাজারে পাঠাবো ?

নিমাই এক গাল হেসে বলে, দু'গ্রাস ভাত না হয় বেশী খাবে । দিন, আমার খেটে অভ্যাস আছে ।

বীণাপাণি দরজায় এসে দাঁড়িয়ে বলে, ওকেই দাও না । বাজার ভাল করে ।

নিমাই বাজারে রওনা হয়ে যাওয়ার পর হাফ ছাড়ল বিষ্ণুপদ । জলটোকিতে বসে ধুতির খুঁটে মুখের ঘাম মুছল, ফাঁড়াই কেটেছে বলা যায় । বাজারে যাওয়ার নামে যেন অকূল পাথারে পড়ে গিয়েছিল । বয়সকালে বাজারহাট এত ভাল লাগত যে সারাদিন বাজারেই পড়ে থাকতে হচ্ছে যেত । আর মনে হত গোটা বাজারটাকেই গন্ধমাদনের মতো তুলে বাড়িতে নিয়ে আসে । কিন্তু এখন যেন কোথাও যাওয়ার নামে কে যেন ভেজা কষল জড়িয়ে দেয় গায়ে ।

ও বাবা! তুমি যে চিনতেই চাইছো না আমাকে! কতকাল পর এলাম মুখে একটু হাসি অবধি দেখলাম না ।

এই হাসিই মা । হাসতেই তো যাচ্ছিলাম, তোর মা কাজের কথা পেড়ে ফেলল যে!

বীণাপাণি তার দীর্ঘ বেগীটি খুলতে খুলতে কাছটিতে এসে ধপ করে বসে পড়ল মেঝের ওপর, কত বুড়ো হয়ে গেছে বাবা! কেনমন যেন দেখাচ্ছে তোমাকে!

অপ্রতিভ বিষ্ণুপদ মেয়ের সামনে কেমন যেন স্বস্তি বোধ করছিল না । বড় অপ্রতিভ লাগছে । মাথায় কথা আসছে না ।

বীণা বাপের দিকে চেয়ে বলল, চুল পেকে শনের নুড়ি হয়েছে, গালের চামড়া ঢালঢাল করছে, রোগাও হয়েছে অনেক। কই, মা তো তোমার মতো এত বুড়িয়ে যায়নি।

বয়স তো হচ্ছে।

সে তো বুঝলাম, কিন্তু মুখখানা অত গম্ভীর কেন? আমাকে দেখে একটুও খুশি হওনি তুমি!

পাগল! কী যে বলিস! কতকাল পর এলি, খুশি হবো না কেন?

মাথা নেড়ে বীণাপাণি বলে, খুশি কেন হওনি তা জানি। তুমি ভাবো, তোমার বীণাপাণি যাত্রায় নেমে নষ্ট হয়ে গেছে! হ্যাঁ বাবা, তাই ভাবো তুমি?

বিব্রত বিষ্ণুপদ বলে, ওই দেখ, কী কথা! আরে দূর! তা ভাববো কেন?

বীণাপাণির চোখ দুটো ছলছল করতে থাকে, তাই ভাবো বাবা, আমি জানি। তোমার মতো ভাল একজন মানুষের মেয়ে হয়ে কি আমি নষ্ট হয়ে যেতে পারি বাবা?

বিষ্ণুপদ আমতা আমতা করে বলে, তাই কি বলেছি?

আমার তো খবরও তোমারা রাখো না। তাই তো একটুখানি পথ পালপাড়া। একবার কেউ গিয়ে উকি মেরে দেখে আসত না আমাকে। ঠিক যেন বেড়াল পার করে দিলে! এক দুঃখী সংসার থেকে আর এক দুঃখী সংসারে গিয়ে পড়লাম। কীই বা আমার বয়স বলে! একা দোকান কোট ছেড়ে গিয়ে একেবারে কুস্তিপাকে। সংসারটা বড় নয় বলে রক্ষে। তার পর তোমার জামাইয়ের হল অসুখ। কী দিনই গেছে। খিয়ার জোগাড় নেই, ওষুধ আনতে সংসারের ভাতে টান পড়ে যায়, গায়ে কাঁথাকানি জোটে না। হ্যাঁ বাবা, এমন জামাইয়ের মধ্যে তুমি কোন কার্তিক ঠাকুরটি খুঁজে পেলে বলো তো!

বিয়ের সময় তো চাকরি করত।

আহা, কী চাকরি! ঠিকাদারের ওদামের দারোয়ান। তাও উপরি নিলে কিছু হত। তাও নয়, ইনি হলেন চড়কচা-মারা সাধুবাবা। এদিকে পেটে ছুঁচো বুকডন মারছে।

এখন আক্রমণ জীবনে অনেক সয়েছে বলে বিষ্ণুপদ চুপ করে থাকতে পারল। মেয়ের এসব কথা বলার হুক আছে। সত্যিই তো, নিমাইয়ের মধ্যে এমন কী দেখেছিল বিষ্ণুপদ? চেহারা নেই, চাকরি ভাল নয়, শুধু পাঁচজনে বলেছিল, ছেলেটি ভারি সং প্রকৃতির। দেখেও তাই মনে হয়েছিল বিষ্ণুপদের।

বীণার চোখের বাটি ছাপিয়ে গেল। টপ টপ করে গাল ভাসিয়ে জল আসছে। বিষ্ণুপদ অসুট স্বরে বলে, কান্দিস কেন?

কান্দব না? অত অভাবের সংসারের দিলে বলেই তো আমার এত হেনস্থা হল। যাত্রায় নেমেছি বলে ঘেন্না করো? যাত্রায় নামলাম বলেই তো প্রাণে বাঁচলাম! নইলে মরতে হত যে!

বিষ্ণুপদ একবার হাঁ করল। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে নাকি? দমটা কম পড়ছে কেন হঠাৎ?

বীণা আঁচলে চোখ চেপে ধরে কান্দছে। বিষ্ণুপদের বড় আত্মগোপন হচ্ছে তাতে। সে বড় নির্বোধ, বড় আহ্ব্যক। কত তুলের জালে জড়িয়ে ফেলল নিজেকে আর সন্তানদেরও। সারাজীবন ধরে কত ভুল দেখল, ভুল বুঝল, ভুল করল। আজ তাই বেঁচে থাকতেই ভয় হয়। ভয় হয়, আরও বেঁচে থাকলে পরের পর আরও কত ভুলভাল হতে থাকবে!

এ গায়ে হরিশ বলে একজন লোক থাকত। এখন সে আর এখানে থাকে না। তারই লতায়-পাতায় তাই হল ওই নিমাই। হরিশের সঙ্গে তখন খুব দহরম মহরম চলছে বিষ্ণুপদের। এক একটা সময় আসে যখন এক একটা লোক এসে যেন ভর করে। তখন হরিশ যা বলে তাই ছিল বিষ্ণুপদের কাছে বেদবাক্য। হরিশই একদিন সম্বন্ধ আনল। বলল, পাত্র জজ ম্যাঞ্জিটের নয়, তবে এমন চরিত্রের ছেলে পাবেন না। সংসারটাও ছোটো। শুধু, বুড়োবুড়ি। হরিশের কথায় অন্য সকলের মত খানিকটা অগ্রহাই করেছিল বিষ্ণুপদ। পাত্রপক্ষ এক পয়সা পণ বা আর কিছু দাবি করেনি। পাত্রটিকে বিষ্ণুপদ দেখেছিল। লম্বা-চাওড়া মিলিটারি নয়। কিন্তু ভারি কমলীয়, নরম-সরম মানুষ। বড্ড মিঠে কথাবার্তা। চোখের দৃষ্টিতে একটা দেবভাব ছিল। এখনও কি আছে? কে জানে।

বিষ্ণুপদ গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, ওরে, জামাই কি খারাপ ব্যবহার করে?

মুখটাকা বীণাপাণি মাথা নাড়ল, না। সে মুরোদ আছে নাকি?

কোন দিক দিয়ে খারাপ বল তো! পয়সা নেই তা তো জানি। সে তো আমারও নেই। তা বলে তোর মা আমার নামে বলে বেড়ায় না।

বীণাপাণি আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মুখ তুলল। একটু ঠাণ্ডা হয়েছে। ধরা গলায় বলল, ওরকম সং মানুষ হয় না। কিন্তু সেটাই কি সব বাবা? পুরুষের আর কিছু গুণ থাকতে নেই? বড্ড ভীতু আর মুখচোরা। সাহস করে কোনও কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না। কিছু একটা ফলিয়ে তুলতে পারে না। সব সময়ে কেমন জলে-ডোবা ভাব। ওরকম মেনিমেথো মানুষের ঘর করতে গেলে একটু উল্টো রকমের না হলে চলে? বলো তো!

বিষ্ণুপদ অবাক হয়ে বলে, সং-এর উল্টো যে অসৎ! ভালর উল্টো যে খারাপ!

তাই বললাম বুঝি! আর কাকেই বা বলছি! তুমিও তো আর ভিন্ন রকমের না!

বিষ্ণুপদ একটু হাসল, আমি নিমাইয়ের চেয়েও আর এক কাঠি সরেস রে।

হ্যাঁ বাবা, আমার একটা জিনিস গম্ভীর রাখবে?

জিনিস! কী জিনিস রে?

একটা ছোট প্যাকেট।

দামী জিনিস নাকি?

দামীই। তবে কাউকে কিছু বলতে পারবে না। খুব লুকিয়ে রাখবে। তুমি জানবে, আর মা।

বিষ্ণুপদ আবার আতান্তরে পড়ে গিয়ে বলে, আমি গম্ভীর রাখব কোথায় বল তো! বাস্তব-প্যাঁটারা যা আছে সব খোলামেলা। তালটাল নেই। চাবিও সব হারিয়ে গেছে।

রাখবে না ?

রাখতে পারা যায়। তবে নিরাপদ হবে না। আমাদের তো সিন্দুক বা স্টিলের আলমারি নেই। তার ওপর বয়স হয়েছে। কবে চোখ বুজব আর সব ছেলেরা বউরা ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেবে। আমাদের কাছে রাখা ঠিক হবে না রে মা।

তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু গচ্ছিত না রাখলেই যে নয়।

এমন কী জিনিস রে ?

আছে বাবা। সব বলা যায় না।

কেন বলা যাবে না ? চুরি তো আর করিসনি।

চুরি নয়। তবে জিনিসটার পিছনে অনেকে লেগেছে। রক্ষা করতে পারব না বোধহয়।

নিমাই জানে ?

জানে বাবা। আর জেনেই তো বিপদ হল। এ মানুষটাকে নিয়ে চলা যে কী দায়!

॥ ৪২ ॥

ঘুমের মধ্যেই চয়ন একটা হেঁচকির শব্দ শুনতে পেয়েছিল। একটা বা দুটো। দু'দিন হল সে ঘন-ঘন অজ্ঞান হচ্ছে। শরীর বড্ড দুর্বল। হেঁচকির শব্দে তার একটু সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে সে উঠতে পারেনি। বিছানার সঙ্গে মিশে গিয়ে ঘুমিয়ে ছিল অতল ঘুমে।

সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। মা চলে গেছে। মা চলে গেছে। পাখি ফুৎফুৎ। শুধু কয়েকখানা হাড়ের অবয়ব পড়ে আছে বিছানায়। মুখখানা হাঁ। তার সামনে মাছি উড়ছে।

চয়নের প্রথমে কোনও শোক হল না। বরং ভয় হল। এখন যে অনেক ঝামেলা। লোক ডাকো, সংকার করো, শ্রাদ্ধ করো। চয়নের শরীর আজ এত ধকল সইতে পারবে কি ? চয়ন মায়ের নাড়ি দেখল, শ্বাস দেখল। এত বড় একটা ঘটনা ঘটল কত ঘটনাহীনভাবে।

চয়ন মায়ের মৃত্যু নিয়ে প্রথমেই কোনও হই-চই করল না। তার মনে হল, এক কাপ চা দ্রুত খেয়ে নেওয়া দরকার। নইলে সে কিছুতেই কিছু পেরে উঠবে না। কিন্তু চা করতে গিয়ে দেখল তার হাত পা থরথর করে কাঁপছে। চা করা অসম্ভব।

সে বেরোলো। গলির মধ্যে একটা দোকান আছে। সেখানে বসে শান্তভাবে পর পর দু কাপ আশুন-গরম চা খেয়ে নিল সে। তারপর বাড়ি ফিরে খুব সম্ভবপণে দোতলায় উঠল।

দাদা!

অয়ন দরদারানের এক চিলতে জায়গায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিল। কাগজটা সরিয়ে তাকে দেখে বলল, কী ?

একবার নিচে আয়।

অয়ন তটস্থ হয়ে বলল, হয়ে গেছে নাকি ?

মনে হচ্ছে।

কখন ?

টের পাইনি। সকালে উঠে দেখছি মারা গেছে।

অয়ন একটু স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর বলল, যা যাচ্ছি। ছুঁয়ে বসে থাক। সেটাই নাকি নিয়ম।

চয়ন নিচে নেমে এল। ঘরে ঢুকে মায়ের বিছানার একপাশে বসল। তাদের ঘরটা এমনিতেই চূপচাপ। এখন যেন পাথরের স্তব্ধতা। অয়ন এল, বউদি এল। নতুন আর একটি মি রেখেছে ওরা। সে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনল।

তারপর এল পাড়া-প্রতিবেশী কয়েকজন। মৃত্যু একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নিতানৈমিত্তিক, তবু প্রতিটি মৃত্যুই মানুষকে কিছু বলতে চায়। কোনও একটি সত্যের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে চূপ করে থাকে। মৃত্যুর কোনও উদ্ধারণ নেই, তবু অস্ফুট কিছু নীরবে বলে ও যায়।

ডাক্তার একবার নাড়িটা ধরেই ছেড়ে দিয়ে ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিলেন। বললেন, এতদিন বাঁচবে বলে আশা করিনি। তোমাদের ভাগ্য ভাল। কিছুই তো ছিল না শরীরে!

তারা দুই ভাই নয়, কিন্তু বউদি বেশ কাঁদছিল। চোখভরা জল। একটু ফোঁপানি। খুবই সময়োপযোগী কান্না। তবে বিশ্বাসযোগ্য নয় একেবারেই। তা হোক, মায়ের জন্য একজন কেউ কাঁদছে—এটা চয়নের খারাপ লাগল না।

চয়ন কাঁদছে না, তার কারণ, তার কান্না আসছে না। জ্ঞানবয়সে সে কখনও কেঁদেছে বলে মনেই পড়ে না তার। বিরল সৌভাগ্যই বলতে হবে, বউদি একবার তার কাছাকাছি এসে কাঁধে হাত রাখল। কান্নাভেজা গলায় বলল, কী খারাপ লাগছে বলো তো!

চয়ন সম্ভাপ মেশানো গলায় বলল, হ্যাঁ।

পাড়ার ছেলেদের ডাকতে হয় না। চলে আসে। গায়ে গেঞ্জি, কোমরে গামছা, মুখে একটু ক্যাডুয়াল ভাব।

মৃতদেহ ফেলে রাখার মানেই হয় না। তাদের আত্মীয়স্বজন কিছু আছে বটে, কিন্তু কে গিয়ে খবর দেবে ? আর তারা আসবে কিনা তারই বা ঠিক কী ?

চয়ন শুধু বলল, দিদিকে জানানো দরকার।

অয়ন বলে, আমাদের দরকার ? না তার ? গত বছরখানেকের মধ্যেও তো সে আসেনি।

চয়ন মুখ নামিয়ে নিল। বাস্তবিকই তাই। দিদির একটা ভয় ছিল, অয়ন চয়নের ঝগড়া পাকিয়ে উঠলে চয়ন আর মা গিয়ে তার ঘাড়ে ভর করতে পারে। ভয়টার কথা বলেওছে দিদি নিজের মুখেই।

পল্টু পাড়ায় একটা ক্লাব করেছে। পরোপকারী ক্লাব। সে এসে বলল, কী দাদা, ঘাটখরচা দিতে পারবেন তো! না পারলে বলুন, আমাদের সংস্কার ফান্ড থেকে দিয়ে দিচ্ছি।

এই পল্টুর সঙ্গে ফাটাফাটি ঝগড়ার কথা ভোলেনি অয়ন। সে গম্ভীর মুখে বলল, ঘাটখরচা আমরাই দেবো।

খাট এল, ফুল এল, ম্যাটাডর এল। মায়ের জন্য আজ কত আয়োজন!

বউদি জিজ্ঞেস করল, চা খাবে চয়ন?

চা?

খাও। তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে। শাশানবন্ধুদেরও দিতে হবে। সকালেই তো সব চলে এসেছে।

চয়ন চা খেল। এত ডামাডোলেও বুঝতে পারছিল, তার দাদা বেশ ভাল কোয়ালিটির চা খায়।

একটা কর্তব্যবোধ খোঁচা দিচ্ছিল চয়নকে। দিদিকে না জানানো ঠিক হবে না। তারা মোটে তিন ভাই-বোন। দিদি একটু গা বাঁচিয়ে থাকে বটে, কিন্তু খবর না দিলে পরে অশান্তি হবে। চয়ন অশান্তিকে ভয় পায়।

একটা পুরোনো ডায়েরিতে দিদির পাশের বাড়ির ফোন নম্বর পাওয়া গেল। খবরটা টেলিফোনেই দিয়ে দিল পল্টু। ফলে, অপেক্ষা করতে হল কিছুক্ষণ।

দিদি এল। আলুথালু হয়ে মায়ের বুকের ওপর পড়ে কাঁদল। সঙ্গে দুই ছেলেমেয়ে। তারা কিছু হতভম্ব। জামাইবারু ভারীকী গম্ভীর মানুষ। মুখচোখে শোক ফুটিয়ে রাখছিলেন।

এ সবই কুট চোখে লক্ষ্য করছিল চয়ন। লক্ষ্য করাই তার স্বভাব। তার হবি।

চয়ন! এখন তোরা কী হবে বল তো ভাই! বলে দিদি একদম তাকেও জড়িয়ে ধরে কাঁদল।

চয়নের বড় অস্থিতি হচ্ছিল। সে বলল, সব ঠিক হয়ে যাবে।

দিদি অয়নের প্রতিও শোকপ্রকাশ করল। কাঁদল।

ফলে একটু দেরিতেই বেরোলো মা। ম্যাটাডর ভানে একটা তুচ্ছ মতদেহ ভেঁ-ভেঁ করে শাশানমুখো যখন ছুটছে তখন কলকাতার রাস্তায় ঘাটে অফিসের ভিড়। মৃত্যুর মতো মহান ঘটনাও কলকাতার ব্যস্ততার কাছে তুচ্ছ। মৃত্যু কত অর্থহীন, কত গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে ডবলডেকার, বাস, ট্যাক্সির ব্যস্ত রাস্তায়।

মা একদম ঝামেলা করল না। শাশানে দাহ করার উনুন চট করে পাওয়া গেল। দাহ মিটে গেল মাত্র একঘণ্টায়। শুকনো শরীরটা নিজেই যেন ইন্ধন হয়ে উঠেছিল!

বাড়িতে ফেরার পর অয়ন ডেকে বলল, ক'টা দিন ওপরেই হবিষ্য করিস।

কৃতজ্ঞতায় নুয়ে সে বলল, আচ্ছা।

ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক। তোর শরীর ভাল নয়। তোর বউদি সাগু ভিজিয়ে রেখেছে। খাওয়ার সময় ডাকবে।

আচ্ছা।

একা ঘরে ভয়-টয় পাবি না তো?

না। ভয় কিসের?

না, ভয় নয়। তবে ঘরে এসে এক সুগভীর ক্লান্তি ও শূন্যতাকে অনুভব করছিল চয়ন। এই শূন্যতাই কি শোক? শোক কেমন তা তো সে জানেও না ভাল করে। বিছানাটা এখনও পাতাই রয়েছে। শুধু চাদরটা নেই। আজ থেকে সে ঢৌকিতে শুতে পারবে। আজ থেকে তার আর কোনও বাড়তি কাজ রইল না। আজ থেকে নিশ্চিন্ত। এবং একা।

সে চুপ করে কিছুক্ষণ মায়ের বিছানাটায় নাসা তোষকের ওপরেই সটান হয়ে শুয়ে রইল। সে কি সুখী? না দুঃখী? না নির্বিকার? মাতৃবিয়োগের মতো বৃহৎ ঘটনার পরও কেন উথাল-পাখাল লাগছে না তার?

ওপর থেকে বউদি ডাকছিল।

চয়নের বিছানা ছেড়ে উঠতে কষ্ট হল। দরজার কাছে এসে ওপরের দিকে চেয়ে বলল, কী বলছো?

আগুন আর লোহা ছুয়ে ঘরে যেতে হয়। নিমু যাচ্ছে নিচে লোহা আর আগুন নিয়ে। তারপর চান করো। ধড়া পরতে হবে।

ধর্মের সঙ্গে, শাস্ত্রাচারের সঙ্গে কোনও যোগ নেই চয়নের। তবু সে যন্ত্রের মতো কাজগুলো করে গেল। স্নানের পর শরীরটা বেশ ম্লিন লাগছিল তার। সারাদিন কিছু খায়নি বলে শরীরটা বড্ড দুর্বল।

বউদি এক কাপ চা নিয়ে এল। ঘরে ঢুকে বলল, চা খেয়ে একটু শাদে ওপরে এসো।

সাপ্রহে চায়ের কাপ হত বাড়িয়ে নিল চয়ন। এখন যেন ঠিক এই জিনিসটুকুরই প্রতীক্ষা ছিল তার। বলল, যাবো বউদি। একটু জিরিয়ে নিই।

নাও। তোমার তো রোগা শরীর, তার ওপর কত ধকল গেল আজ। একবার ভেবেছিলুম তোমাকে শাশানে যেতে বাধণ করব। মুখাঙ্গি তো তোমার দাদারই করার কথা।

তা হোক বউদি। মার জন্য তো আর কোনওদিন কিছু করতে হবে না। এই একটা দিন, কষ্ট কিছু নয়।

বউদি কোনওদিনই সুন্দরী ছিল না। এখনও নয়। তবে এখন কেন জানে না চয়নের কাছে বউদির মুখশ্রী খরাপ দেখাল না। এলো চুল পিঠময় ছড়িয়ে আছে। একটু শ্যামলা রং। মুখখানা গোলপানা। কোথাও বোধ হয় একটু শ্রী ছিল কখনও। এখনও রেশটা আছে।

বউদি জানলার তাকটায় একটু বসে বলল, বনুর কাণ্ডটা দেখলে? মা মারা গেছে, কিন্তু এল যেন পাড়া-প্রতিবেশীর মতো। হুশ করে এল, হাউমাউ করে একটু কাঁদল, শাশানযাত্রীর রওনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে চলে গেল। বলল, ছেলেমেয়েদের নাকি পড়া আছে।

বনু তার দিদির ডাকনাম। কারও কাছ থেকেই কোনও প্রত্যাশা নেই বলে মানুষকে একটু নিরপেক্ষভাবে বুঝতে পারে চয়ন। দিদি আসলে এ সংসারের সঙ্গে একদম জড়াতে চায় না নিজেকে। চয়ন যতদূর জানে, দিদির সংসারটি বেশ সুখের।

টাকাকড়ি আছে, ভরা সংসার। ওইটুকুর মধ্যেই দিদি নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে চায়। মা বা ভাই তার কাছে দূরের ও বাইরের লোক।

চয়ন জবাব দিল না দেখে বউদি বলল, তোমাদের হবিষ্যির জন্য কত দিয়ে গেছে জানো? মাত্র দশটি টাকা।

চয়ন মাথা নত করে বলে, কীই-বা আর হবে বলা!

কথাটার কোনও মানে হয় না। বউদি অবশ্য কথাটার মানে খুঁজল না, নিজের মনেই বলল, টাকা তো ওর কাছে কেউ চায়নি। কিছু না দিলেও তো পারত। আরও একটা কাণ্ড করেছে। তোমরা রওনা হওয়ার পর এ ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র হাটকে দেখে গেছে।

কেন?

বোধ হয় সোনাদানার সন্ধানে ছিল।

আমাদের ঘরে সোনাদানা কোথেকে আসবে?

সে ও-ই জানে। কী খুঁজেছে জানি না। তবে ঢুকেছিল।

চয়ন ম্লান হেসে বলে, যা ছিল কবে বিক্রি হয়ে গেছে।

আমি তো তোমার চোখে খারাপই চয়ন, কিন্তু বোধ হয় বনুর মতো নই।

চয়ন সভয়ে বলল, খারাপ কেন হবে বউদি? খারাপ তো ভাবি না।

বউদি ধরাগলায় বলে, খারাপ তো আর এমনই হয়নি। পরিস্থিতির চাপেই হয়েছে। আমাদের সংসারের ব্যাপারে বাইরের লোক নাক গলাতে এসেছিল বলেই তো এত অশান্তি। তুমিই বলা!

চয়ন ম্লান মুখে বসে রইল। সে তো আর বলতে পারে না, পাড়ার ছেলেদের নিয়ে পল্টু সেদিন হামলা না করলে তাকে সেদিন মা-সহ এ বাড়ি থেকে বের করেই দিচ্ছিল দাদা আর বউদি।

বউদি বলল, চা খাও। ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

চয়ন চায়ের তেমন স্বাদ পেল না। এই যে বউদি ঘরে এসেছে, তার মনে হচ্ছে এর পিছনেও একটা উদ্দেশ্য আছে। সে এখন একা। এবং অসহায়। মা থাকতে যে খুব একটা সহায় হত তা নয়। তবে মা ছিল বলেই দাদা বউদির হয়তো একটু চম্ফলঙ্কা ছিল। পাড়ার ছেলেদের ভয়ও ছিল। কিন্তু এখন চয়নের আর কোনও আড়াল নেই, বর্ম নেই।

বউদি হঠাৎ খুব করুণ গলায় বলল, তুমি খুব একা হয়ে গেলে, না চয়ন?

চয়ন মুখ নিচু করে বলল, হ্যাঁ। খুব ফাঁকা লাগছে।

আমাদের তবু সংসার-টংসার আছে। তোমার তো তা নেই।

চয়ন মাথা নেড়ে কথটা সমর্থন করল। কিন্তু তার বুক দুরদুর করছে। এ সব হল কোনও অগ্রিয় প্রস্তাবের ভূমিকা। এর পর কিছু একটা আসছে। আজ মা মারা গেছে, আজই হয়েছে বলবে না কিছু। কিন্তু গেয়ে রাখল। ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করার মতো ভুল আর দাদা-বউদি করবে না। তবে এখন প্রতিরোধহীন চয়নকে কথার ফাঁদে ভুলিয়ে ঠিকই বের করে দেবে একদিন।

বউদি বসেই রইল। গেল না। চয়ন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। একসময়ে, দাদার বিয়ের ঠিক পর পরই, বউদির সঙ্গে কত ভাব হয়ে গিয়েছিল চয়নের! একসঙ্গে বসে গল্প করা, সিনেমায় যাওয়া, বাপের বাড়ি যেতে সঙ্গী হওয়া, রেস্তোরাঁতে খাওয়া অবধি। তারপর ধীরে ধীরে সম্পর্কের নকশা পাল্টে গেল। সেটা হল, দাদা তার বাড়িওয়ার কাছ থেকে বাড়িটা কিনে নেওয়ার পর থেকেই।

চাকরি-বাকরির চেষ্টা করছো না চয়ন?

করছি।

তোমার তো ভনি ঝঞ্ঝে খুব মাথা।

চয়ন মৃদুস্বরে বলে, তাতে কিছু হয় না আজকাল।

শুধু টিউশনি করে কি চলবে?

খুব চেষ্টা করছি।

করো। তোমার জন্য আমরা সব সময়েই চিন্তা করি। একটু বিশ্রাম করে নাও। তারপর ওপরে এসো।

বউদি চলে যাওয়ার পর চয়ন চায়ের কাপ শেষ করে আবার চিংপাত হয়ে গুল। ঘরটা আজ থেকে তার একার। সামনে বন্ধনহীন জীবন। তার কি ভাল লাগছে? না খারাপ? কামুর আউটসাইডার উপন্যাসের নায়কেরও কি এরকম ভাবান্তরহীনতাই ছিল?

চূড়ান্ত ক্লান্তিতেই বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিল চয়ন। দাদাদের ঝি এসে ডেকে তুলল। চোখ চেয়ে চয়ন দেখল, ঘুমের মধ্যে সে খুব কঁদেছে। চোখের কোলে জল। বুকটা ভার।

সে বলল, আমি খাবো না। বউদিকে বলা গিয়ে আমার বড্ড বমি-বমি করছে। খেতে পারব না।

ঝি মাথা নেড়ে চলে গেল।

সারা রাত অকাতরে ঘুমোলো চয়ন। যেন আজ একটা অনির্দিষ্ট ছুটি পেয়েছে। কিরকম ছুটি, কেন ছুটি তা সে বুঝতে পারল না।

বউদি আবার চা নিয়ে এল সকালবেলায়, চয়ন, আজ তোমার শরীর কেমন?

বড় দুর্বল লাগছে।

আজ তাহলে আর বেরিও না। হবিষ্যি খাবে তো? রাঁধছি কিছু।

কিছু তো খেতেই হবে। রাঁধো।

তোমার দাদা বলছিল, এ ঘরটার অনেকদিন কলি ফেরানো হয়নি। একটু মেরামতিরও দরকার।

চয়ন চারদিকে তার শিথিল চোখ একবার ঘুরিয়ে দেখে নিল। ঘরটার অবস্থা চূড়ান্ত শ্রীহীন। প্রচুর ঝুল জমে সিলিংটা প্রায় কালা হয়ে এসেছে। দেয়ালের চাপড়া যে কত জায়গায় খসে পড়েছে তার হিসেব নেই। জানালা দরজার অবস্থাও খুব খারাপ। পান্ডাগুলোর কাঠ ক্ষয়ে গেছে অনেকটা করে।

চয়ন নিরাসক্ত গলায় বলে, মেরামত আর রং করলে ঘরটা ভালই হবে। বউদি, তোমরা কি আমাকে আর এখানে থাকতে দেবে ?

বউদি একটু অবাক হয়ে বলে, কেন বলো তো!

চয়ন ভীষণ লজ্জা পেয়ে বলে, না, মানে এখন তো মা নেই। একটা ঘর আটকে আমি পড়ে থাকব। তোমাদের অসুবিধে হবে না ?

বউদি একটু চুপ করে থেকে বলল, আমরা ভাবছিলাম, নিচের তলাটা ভাড়া দিয়ে দেবো। যদি দিইও তুমি জলে পড়বে না। হাদে একটা চিলেকোঠা তো আছেই। থাকতে পারবে না সেখানে ?

চয়ন হাঁফ ছাড়ল। চিলেকোঠা! সেও তার কাছে স্বর্ণ। চিলেকোঠার পাকা ছাদ নেই, অ্যাসবেটস। একটু গরম হবে। তা হোক, একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয় তো। কলকাতার বাড়ি ভাড়া যেখানে উঠেছে চয়নের মতো লোকের পক্ষে তার নাগাল পাওয়া শক্ত। কৃতজ্ঞতায় ভরে গিয়ে চয়ন বলল, খুব পারব বউদি। খুব পারব।

আরও কয়েকবার আনমনে সে 'খুব পারব' কথাটা উচ্চারণ করল।

বউদি বলল, ওপরে অ্যাসবেটস হলেও ঘরটা কিন্তু ভালই।

জানি বউদি। একসময়ে ওই ঘরে আমি পড়তে যেতাম।

হ্যাঁ, তুমি তো জানোই। সংসারের খরচ যা বেড়েছে, নিচের তলাটা ভাড়া না দিলে চলছে না। তোমার দাদা অফিস থেকে অনেক টাকা লোন নিয়েছিল, মাইনে থেকে কেটে নিচ্ছে।

হ্যাঁ বউদি, ভাড়া দেওয়াই ভাল।

বউদি একটু হাসল, এর আগেও অনেকে ভাড়া নিতে এসেছে, কিন্তু এ ঘরটা দেওয়া হবে না জেনে ফিরে গেছে। পুরো একতলাটা হলে ভাড়াটাও ভাল পাওয়া যাবে। তুমি কিছু মনে কোরো না কিন্তু।

চয়ন কৃতজ্ঞতায় মরে যেতে যেতে বলল, না বউদি, কিছু মনে করার নেই। চিলেকোঠায় আলো-হাওয়া আছে। আমার ভালই হবে। তবে আর একটা কথা বলব ?

বলো না কেন ? লজ্জা কিসের ?

টিউশনি করে আমি যা পাই তা খুব খারাপ নয়। মা চলে যাওয়ায় আমার খরচ কমেও গেল। আমার কাছ থেকে ভাড়া হিসেবে কিছু কিছু নেবে ?

কী যে বলো!

কিন্তু বউদির গলায় একটা আনন্দের চাপা ভাবও স্তনতে পায় চয়ন।

চয়ন মিনতির স্বরে বলল, না বউদি, আমার কোনও কষ্ট হবে না। সামান্য কিছু দিতে আমার কষ্ট হবে না।

আচ্ছা, সে পরে ভেবে দেখা যাবে। কাল থেকে খাওনি, তোমার শরীর ওইজন্যই দুর্বল লাগছে। কিন্তু এমন সব নিয়ম। এক কাছ করো সাণ্ড ভেজানো দু'গাল খেয়ে নাও। খাবে ? তাহলে পাঠিয়ে দিই।

দাও। আমি একটু টিউশনির বাড়ি যাবো। খবর দেওয়া নেই তো!

পারবে ?

পারব বউদি।

বউদি চলে গেল। একটু বাদে কলা, নারকোল কোরা আর চিনি দিয়ে মাখা বাটি ভরা সাণ্ড দিয়ে গেল। চয়ন পেট ভরে খেল। তারপর বেরোলো। ঘরে বসে থেকে লাভ নেই। একঘেয়ে লাগবে। তার চেয়ে পড়াতে বসলে মনটা ভাল থাকবে।

আজকের দিনটা কেমন যেন। রোদ হাওয়ায় হালকা একটা দিন। মনটা ফুরফুর করে পতাকার মতো। অনেক ওপরে উঠে নড়ে। মন থেকে একটা ভার নেমে গেছে আজ। দাদা-বউদি এখনই তাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে না। আপাতত সে রয়ে গেল। চিলেকোঠা তো কী হয়েছে ?

সারাটা দিন আজ হালকা পায়ে নেচে নেচে বেরিয়ে গেল। বিকেলে মোহিনীদের বাড়ি।

মোহিনী অবাক হয়ে বলে, এ কী চয়নদা ? কী হল ?

মা চলে গেলেন।

ওমা! তা আপনি আজ এলেন কেন ?

ঘরে ভাল লাগছিল না।

বসুন, বসুন। মাকে ডাকি।

মোহিনীর মা এসে দাঁড়ালেন।

ইস, কবে হল চয়ন ?

কাল সকালে।

এখন কী হবে ?

চয়ন ম্লান হাসল, মা একরকম বেঁচেও মরেই ছিল।

তা হলেও তো মা!

চয়ন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কেন কে জানে, এখন তার মায়ের জন্য কষ্ট হচ্ছে। কান্না পাচ্ছে।

রিয়া বলল, দাদা-বউদির সঙ্গে তো তোমার সম্পর্ক ভাল নয়। মায়ের ব্যাপারে দাদা সাহায্য করেছে তো! করেছে।

রিয়া একটা শ্বাস ফেলে বলল, যাক। কিন্তু এখন কী করবে চয়ন ? ও বাড়িতে থাকতে পারবে ?

পারব। বউদি বলেছে, থাকতে দেবে।

বলো কী! এ তো খুব ভাল কথা।

আজ্ঞে।

কিছু খাবে? তোমার তো অশৌচ, এখন অনেক রেষ্ট্রিকশন। তোমাকে বরং এক গ্লাস ফ্রুট জুস দিই। মোহিনীর বাবা বিশেষত থেকে কমলালেবুর রস এনেছিল। খাও। আর কিছু খাবে? সন্দেশ?

না। কিছু নয়।

ঠিক আছে। পড়াবে নাকি?

পড়াতেই এসেছি। আমার কষ্ট হবে না।

পড়াও তাহলে।

রিয়্যা চলে যাওয়ার পর মোহিনী বলল, চয়নদা, আপনার কান্না পাচ্ছে না?

না। কী জানো, মা চলে যাওয়ায় কেমন যেন ভারমুক্ত লাগছে।

সে কী চয়নদা!

বলছি তো। আমার শোকের চেয়েও যেন বেশী মনে হচ্ছে ফ্রিডম। মায়ের জন্য সারাক্ষণ উদ্বেগ ছিল, অশান্তি ছিল। রাত্রিতে হত, খাইয়ে দিতে হত। সব সময় মনটা পড়ে থাকত ঘরে। গিয়ে মাকে বাঁচা দেখতে পারো তো!

আপনার খুব কষ্ট ছিল, চয়নদা, না?

খুব কষ্ট। যখন ভাবি, আমার জন্য তো মা এর চেয়ে অনেক বেশী কষ্ট করেছে তখন নিজেকে খুব অকৃতজ্ঞ মনে হয়।

আমি বোধহয় খুব হৃদয়হীন, না মোহিনী?

তা কেন চয়নদা? আপনি তো খুব নরম মনের মানুষ।

গরিবের মন বলে কিছু থাকে না। কতগুলো দারিদ্র্য আছে এতই খারাপ যে, মানুষকে নষ্ট করে দেয়।

আমার বাবাও খুব গরিব ছিল। ভীষণ গরিব। কিন্তু বাবা কখনও হার মানেনি।

তোমার বাবার কথা জানি মোহিনী। আমারও ওরকম হতে ইচ্ছে করে।

মোহিনী একটু হাসল। বলল, কিন্তু বাবা কখনও তার দারিদ্র্যের গল্প করে না।

॥ ৪৩ ॥

আজকাল বড্ড ভ্রম হয়ে যাচ্ছে সব কিছু। এই যে সে বাজারে যাচ্ছে একথাটাই তার দু-চার পা গিয়ে খেয়াল থাকছে না। হঠাৎ অবাক হয়ে ভাবছে, আমি এ যাচ্ছি কোথায়? কী করতে যাচ্ছি? মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে নিতাই-গৌর স্মরণ করে তবে মনে পড়ে। রাস্তাঘাটে নোনা মানুষের সঙ্গে দেখা হলে নিমাই পট করে লোকটাকে যেন চিনতে পারে না। হাঁ করে চেয়ে থাকে। তারপর ঠাঠর করে স্মরণ করতে হয়। খেতে বসে খাবারের স্বাদ পায় না তেমন। ডাল মনে করে ঝোল দিয়ে খেয়ে যায়। বীণাপাণির লুকানো বিলিতি টাকার পুঁটলিটি পাওয়ার আগে সে ছিল একরকম। আর ওই ঘটনাটির পর এখন নিমাই আর একরকম। মন কেবলই বলছে, বড্ড পাশ হয়ে গেল, বড্ড অন্যায় হয়ে গেল। এ কি আমাদের সইবে?

নিমাইয়ের মনের ভিতরটা কেউ দেখতে পায় না, নিমাই একা পায়। সেখানে সে এক জড়সড় মানুষ। মনের মধ্যে সর্বদা ভয়ের জুজ্বলি। ভগবানের চোখকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করে ফল হয় কি? ভগবান তো সব দেখতে পান। বীণা কি সে কথা বিশ্বাস করে না? বীণার কি পাপের ভয় নেই? ও-টাকার জন্য অনুদাতা কাকার কত ক্ষতি হল। গোটা তিনেক লাশ পড়ে গেল। ওই টাকার জন্য বীণা এখন বনগাঁ ছেড়ে পালাতে চাইছে। তবু টাকা সে ফেরত দেবে না।

ঝগড়া করে কোনও ফল হয় না। অনেক কথা ভেবে রাখে নিমাই, কিন্তু বীণা যখন মুখ ছোঁয়া তখন বেনো জলের সব কথা ভেসে যায় নিমাইয়ের। সে কি পারে বীণার সঙ্গে? ছেড়ে যাবে বলেও ভাবে নিমাই। কিন্তু যাবে-যাবে করেও কেন যেন যাওয়া হল না আজও।

বড় আনমনা হয়ে সে একটা মাঠ পেরোলো। তারপর বটতলার এলাকায় এসে উঠল। হ্যাঁ, বাজারের কথাই বলেছিলেন বটে! শাওড়ি ঠাকরন। কিন্তু কী কী কিনতে হবে তা যে বেবাক ভুলে বসে আছে সে!

তবে বাজার-হাট খুব ভাল জায়গা। পাঁচজনের সঙ্গে দেখা হয়, কথা হয়, শিক্ষালাভ হয়। নানা দুঃখের কথা একটুক্ষণ ভুলে থাকা যায়। বটতলা তেমন বড় জায়গা নয়। দোকানপাট আছে। সস্তা বাজার তেমন নেই। এখানে সেখানে আলু বেশন কচু-টুটু নিয়ে দু-চারজন বসে আছে। বেলা হয়েছে বেশ, এত বেলায় কি আর ব্যাপারীরা থাকে?

দরদস্তুর করে নিমাই পাঁচশ গ্রাম আলু আর সরু সরু বেশন কিনল কয়েকটা। একটু কাঁচা লঙ্কাও। পটলের দামটা বেশী ঠেকল বলে নিতে সাহস পেল না। কয়েকটা উচ্ছে কিনে ফেলল। মাছের বাজার বলে কিছু নেই। একজনকে পেয়ে গেল, জিয়ল মাছের একটা কানা উঁচু গামলা নিয়ে বসে আছে। দু'খানা মাগুর মাছ কিনতে শাওড়ির দেওয়া পয়সা ফুরাং তো হলই, নিজের ট্যাকের পাঁচটা টাকাও বেরিয়ে গেল। তা যাক। স্বস্তরবাড়ি তো এসেছে একবারে শুধু হাতে।

বটতলার তেমাথায় দাঁড়িয়ে নিমাই ভাবছিল, কিছু ভুল হল কিনা। আরও যেন কিছু বলে দিয়েছিলেন শাওড়ি। মনে পড়ছে না। জরুরি জিনিসই যেন! কিন্তু আজকাল গবেট মাথাটায় নানারকম ভয় আর দুশ্চিন্তার বজ্রকুড়ি। কোনও কথাই মাথার মধ্যে ভাল করে বসে না।

বটতলা মানে আসল বটতলাই। পেট্রায় একখনা বটগাছ ঝুঁটিটির নামিয়ে মৌরসীপাট্টা গেড়েছে। তারই তলায় শীতলার থানা। থানের গা ঘেঁষেই নানারকম দোকান-টোকান। বনগাঁর মতো জমজমাট নয়, তেমন ঝা-চকচকেও নয়। তবে এখানে কিছু লোকজন আছে। ওরকমই একটা দোকান থেকে একজন ফুলপ্যান্ট আর সবুজ হাওয়াই শার্ট পরা লোক হঠাৎ বেরিয়ে এসে তার দিকে চেয়ে বলে উঠল, নিমাই নাকি হে!

নিমাই হাঁ হয়ে গেল। কে লোকটা?

লোকটা কাছে এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বড় অবাক গলায় বলল, কখন এলে হে ?

তবু নিমায়ের মনে পড়ছিল না যেন। তবে ভক্ত করে কাঁচা মদের খানিক গন্ধ নাকে এসে লাগল। নিমাই দু'পা পিছিয়ে দাঁড়াল বটে, কিন্তু সেজো স্বধ্বাী রামজীবনকে চিনতেও পারল।

এই একটু আগেই এসেছি।

লোকটা মদ খেলেও মাতাল হয়নি। হাতের থলিটার দিকে চেয়ে বলল, তা থলি নিয়ে এখানে ঘোরাঘুরি করছ কেন ? বাড়ি যাও।

নিমাই বিগলিত একটু হেসে বলল, গিয়েছিলাম। মা একটু বাজার করতে পাঠালেন।

রামজীবন অবাক হয়ে বলে, তোমাকে ? মায়ের যে দিন দিন কী হচ্ছে! জামাই এসেছে, তাকে কেউ বাজারে পাঠায় ? জিব কেটে নিমাই বলে, আরে না। স্বপ্তরমশাই নিজেই আসছিলেন, আমি তাঁকে আসতে দিইনি। বুড়ো মানুষ।

ছিঃ ছিঃ। বলে রামজীবন থলিটা প্রায় কেড়ে নিয়ে মুখটা ফাঁক করে দেখে ঠোট বেকিয়ে বলে, এই কি জামাইভোগ নাকি ? মাগুর মাছ তো রুণীর পথি।

নিমাই শশব্যস্তে বলে, আজে, জামাইয়ের যুগ আর নেই। আমিও কি আর তেমন জামাই ?

রামজীবন বিরক্ত হয়ে বলে, নিজেকে সবসময়ে অত ছোট ভাব কেন বলো তো! তুমি কমটা কিসে ? যত বৈষ্ণব-বিনয় দেখাবে তত লোকে পেয়ে বসবে। আর দাপে খাপে চলো, সবাই খাতির করবে।

নিমাই কি এই সার সত্য জানে না ? খুব জানে। কিন্তু আরও যেটা জানে, তা হল, সকলের আর্থ থাকে না। সকলে সবকিছুর অধিকারী নয়। সবাইকে মানায়ও না। তাহলে তো দুনিয়াটা অন্যরকম হত। সে মুখ নামিয়ে বলল, যে আজে।

তোমার ওই মেনীমুখো স্বভাবের জন্যই তো বীণাটা ব্যথ গেল। যাত্রাদলের নটী হয়ে যা খুশি করে বেড়াচ্ছে আর তুমি ঘর সামলে জেরবার হচ্ছে। বুক চিতিয়ে হাঁকডাক মারো দেখাবে ভয়ে পেছাখপ করে দেবে।

অভিজ্ঞতাবলে নিমাই জানে, নেশাখোরদের কিছু বোঝানোর চেষ্টা করতে নেই। যখন টং-এ চড়ে থাকে তখন তারা আর অন্যের কথা নিতে পারে না। নিজেরাই বকে যায়।

নিমাই তাই বিনীতভাবে বলল, চেষ্টা করব।

রামজীবনের অবশ্য নেশা হয়নি। সে এক পাত্র দু'পাত্রে কাত হওয়ার লোকও নয়। তবে সব সময়ে একটু চাপান দিয়ে রাখে। তাতে মনটা বেশ চনমনে থাকে। ফুর্তি-ফুর্তি ফুরফুরে খোসমেজাজী একটা ভাবও পেয়ে বসে তাঁকে। থলেটা একটু নাচিয়ে নিয়ে বলল, এসো, ওদিকটায় মুর্গি পাওয়া যাবে।

মুর্গি! বলে নিমাই যেন আতকে ওঠে।

কেন, খাও না নাকি ? বৈষ্ণবপানা একটু ছাড়ো তো!

নিমাই মাথা নেড়ে বলে, সে কথা হচ্ছে না। গরিবের কি বাছাবাছি করলে চলে ? সব খাই। কিন্তু মুর্গির বেজায় দাম পড়ে যাবে যে!

রামজীবন হেঃ হেঃ করে হেসে বলল, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না বাপু! স্বপ্তরবাড়ি বলে কথা! পয়সা খরচ নিয়ে তুমি মাথা ঘামাবে কেন ? এসো এসো। ডিম তো নিশ্চয় খাও ?

খাই। তবে দরকার নেই।

দরকার নেই কেন ?

অত হজম হবে না।

খুব হবে। ডালের মুখে একখানা ডিমভাজা কেমন ওতরাবে বলো। হজম নিয়ে মাথা ঘামায় পয়সাওলা। এই তো তুমিই বললে যে গরিবের বাছাবাছি করলে চলে না। আমিও তাই বলি। হজম হলে হল, না হলে না-ই হল, সেটে তো দিই।

রামজীবন একরকম হাত ধরেই টেনে নিয়ে গেল তাকে। মুর্গিওলার কাছ থেকে দু'খানা মুর্গি কিনে ফেলল। দশটা দিশি ডিম। এক সবজিওলার ঘর থেকে কুশি কুশি গুটি চারেক ফুলকপি, বরবটি, কয়েকটা মুলো। বড় বেহিসেবী কেনাকাটা হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল নিমাইয়ের। কিন্তু কিছু বলতে সাহস হচ্ছিল না। তবে হঠাৎ তার মনে হল, শাড়ি যেন সর্ষের তেলের কথা বলেছিলেন!

গলা খাঁকারি দিয়ে নিমাই বলল, বোধ হয় একটু সর্ষের তেলও লাগবে।

আহা, আগে বলতে হয়! তা শিশি কোথায় ? থলিতে তো দেখছি না।

বোধ হয় ভুলে গেছেন। অনেকদিন বাদে মেয়ে আসায় খুব বেসামাল হয়ে গিয়েছিলেন তো!

কথাটা মানল না রামজীবন। বলল, আরে না, মায়ের মাথাটাই গেছে। দাঁড়াও, একটা বোতল জোগাড় করি।

বলেই হাওয়া হয়ে গেল রামজীবন। কয়েক মিনিট বাদে যে বোতলটা নিয়ে ফিরে এল তার তলায় তখনও ধেনোর তলানি টলটল করছে। নিমাই কথাটা ভুলতে সাহস পেল না, সকলের কি আর্থ থাকে ?

সেই বোতলেই মুদী যন্ত্র করে তেল ভরে দিল। রামজীবন তার পর পেঁয়াজ রসুন কিনল, আদা কিনল, গরম-মশলাও বাদ দিল না।

একটু ঘি হলে হত, না ?

এই গন্ধমাদন কেনাকাটা দেখে নিমাইয়ের বড় লজ্জা হচ্ছিল। সে একটা এমন কি মানুষ যার জন্য লোকে এত আয়োজন করবে ? সে মাথা নেড়ে বলল, ঘি আমার লাগবে না।

দূর পাগল! ঘি না হলে মাংসে স্বাদ হয় নাকি ?

মাতালের হাত খুব দরজা হয়, নিমাই জানে। তবে অভিজ্ঞতা ছিল না। লোকটার মেলা পয়সা চলে যাচ্ছে দেখে তার মায়া হচ্ছে। তারা যেমন লোক, এত খরচপাতি করাটা তাদের মানায় না। সে একটা বানানো কথা বলেই ফেলল, ঘিয়ের গন্ধ আমার ঠিক সহ্য হয় না।

রামজীবন তার পিঠে একটা খাবড়া মেরে বলে, আসল ঘি খাওনি তাই বলছ। এখানে গবা ময়রার দোকানে সরবাটা ঘি হয়। একবার খেলে বুঝবে।

অতএব ঘিও হল। তার পর বাড়িমুখো রওনা দেওয়ার আগে রামজীবন বলল, আর কিছু ভুল হল না তো?

আজ্ঞে না। বেলা হয়েছে, দেরি করাটা ঠিক হবে না।

তুমি একটু কেপ্পন আছো, না?

হিসেব করেই বরাবর চলে আসছি তো। হিসেবী না হলে কম পয়সায় সংসার চালাতে শক্ত কাজ। মাথাও খাটিতে হয় বিস্তর; কোনটা আজ না হলেও চলে, কোনটা বাদ দিয়েও হয়।

ওসব হচ্ছে মেয়েলী বুদ্ধি। মেয়েমানুষের বসে বসে কেবল হিসেব করে। আমি বাপু, ওরকম কপ্পনপনা সহ্য করতে পারি না। পুরুষমানুষের কি আর ওসব পোষায়?

রামজীবনের হাতে দড়িবাঁধা দু'দুটো মুগি মাথো মাথো ঝটপট করছে, কোঁক ছাড়ছে। নিমাই চমকে চমকে উঠেছে। কেঁটার জীব, একটু পরেই মারা পড়বে। মাছ-মাংস সে খায় বটে, তবে এ ব্যাপারটা সহ্যে পারে না।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে রামজীবন বলল, তা এখন রোজগারপাতি কী তোমার?

মান মুখে নিমাই বলে, দোকানটা দেব-দেব করছিলাম। দেখি।

রামজীবন মুখটা একটু বিকৃত করে বলে, দোকান দিয়ে কী হবে শুনি? ক' পয়সা আসবে? অন্য লাইন ধরে নেবে।

নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, লাইন তো কত ভাবছি। কিছু মাথায় আসছে না।

গা-গঞ্জে লাইনও বড় একটা নেই। গুজ্জের সেলামি দিয়ে দোকান যদি করেও ফেল, দেখবে পড়তায় ফেলতে পারবে না। যাদের ঘরে মেলা টাকা আছে, খাওয়া-পরার চিন্তা নেই, তারা দোকান খুলে বসে মাছি তাড়াতে পারে। আমি তো শুনি, বনগায় দু'নশ্বরী খুব রবরবা।

দু'নশ্বরী! সেটা কি রকম?

এই ধরো বাংলাদেশ থেকে মাল এনে বেচলে, নয়তো এদিক থেকেই ওদিকে মাল চালান দিলে। ওসব কারবারে বসে থাকতে হয় না।

নিমাই বিবর্ণ মুখে বলে, তা বটে।

আমি বলি কি, চোখ-জান বুজে আগে কিছু পয়সা পিটে নাও। তারপর ধর্মকর্ম করে পাপ কাটিয়ে নিতে পারবে।

নিমাই পাশ-চোখে একবার রামজীবনকে দেখে নিল। বেশ শক্তপোক্ত চেহারা। সে শুনেছে রামজীবনের রোজগারটা সোজা পথে হয় না। কী করে না-করে তা বাড়ির লোকও জানে না। তবে যা করে তা নিশ্চয়ই ঢাক বাজিয়ে বলার মতো নয়। সে এসব মানুষের সঙ্গ করতে একটু ভয় পায়।

মাঠটা পার হচ্ছিল দু'জনে। হঠাৎ রামজীবন তার দিকে ফিরে বলল, না হে, কাজটা ঠিক হবে না।

নিমাই একটু আনমনা ছিল। চমকে উঠে বলল, কোন কাজটা?

তোমাকে যা করতে বললাম ও কাজ তোমাকে মানাবে না।

নিমাই ততস্থ হয়ে বলে আজ্ঞে।

রামজীবন একু গলা ঝাঁকরি দিয়ে বলল, দু-চারটে তোমার মতো লোকেরও দুনিয়ায় থাকা দরকার। এই যে আমার বাবাকে দেখ, এই বাবাকে দুনিয়াসত্ত্ব লোক আহাম্মক বুরবক বলে জানে। লোকটা জীবনে বাঁকা পথে যায়নি, তর্জন-গর্জন করেনি, চুরি-চামারি করেনি। গরিব থেকে গেছে। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে আহাম্মকই। কিন্তু বাবার কাছটিতে বসলে আমার যেন মনে হয় গঙ্গাস্নান হয়ে যাচ্ছে। কেন হয় বলো তো?

উনি বড় ভাল লোক।

রামজীবন মাথা নেড়ে বলে, ভাল বললে হয় না। ভাল মানে কি আহাম্মক? তা তো নয়। এই সেদিন সকালে বাবার কাছে বসেছিলাম। কথা হচ্ছিল, আমাকে আর বড়দাকে নিয়ে কথা। শুনে মনে হল, দেখতে বোকাসোকা হলে কি হয়, বাবা কিন্তু অনেক ভলিয়ে দেখে। অনেক বোঝে।

নিমাই সায় দিয়ে গেল।

রামজীবনের গলাটা একটু উদাস হয়ে গেল হঠাৎ। বলল, বড়দা কত বড় মানুষ সে তো জানো। আমার বড় হিংসে হয় বড়দাকে। বিনোয় তো ছাড়তে পারব না, তাই পয়সায় ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। আর এই দুনিয়ায় পয়সা করতে গেলে তো সাদা রাস্তায় হয় না।

যা বলেছেন।

কিন্তু কী হল জানো? জাতও গেল, পেটও ভরল না। জোফুরি লাইনেও আজকাল জোর কম্পিটিশন। খারাপ লোকদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে করতে গা থেকে ভদ্রলোকের গন্ধটাই উব গেল। কী হল বলো তো লাভটা?

প্রশ্নটা নিয়ে নিমাইও ভাবতে লাগল। সাদায়-কালোয় ভরা দুনিয়া। কোন রঙটা গায়ে মাখবে মানুষ? বিশেষ করে গরিব মানুষেরা? নিমাই মাথা নেড়ে বলে, আমিও তো তাই ভাবি।

আজ বুঝছি, বড়দাকে হিংসে করতে যাওয়াটা আমার ঠিক হয়নি। সে আমাদের পাত্তা দেয়নি বটে, ভাইবোনকে মানুষ করারও চেষ্টা করেনি, কিন্তু সে দোষ তো তার একার নয়। আমরাই বা কোন মাথাওলা ছিলাম? বড়দার সময়ও ছিল না, পাস করেই চাকরি পেয়ে গেল। সময়টা দেবে কখন? উপরন্তু একটা দজ্জাল বউ জুটল। সে-ই খেয়ে ফেলল মানুষটাকে। আজকাল তাই ভাবি, বড়দাকে হিংসে করাটাই মস্ত ভুল।

নিমাই চুপ করে রইল। ব্যাপারটা সে তেমন কিছু জানে না। তবে শুনেছ, কৃষ্ণজীবনকে এরা ভাইবোন মিলে একবার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

বাড়িটা ফটকে এসে পড়েছে দু'জন। রামজীবন হঠাৎ তার দিকে ফিরে বলল, না হে, পাপ পথে যেও না। একদিকে এক-আধজন রাশ টেনে না রাখলে চলে না।

বাড়িতে ঢুকে একটা হই-চই হাঁক-ডাক বাঁধিয়ে বসল রামজীবন। জামাকাপড় বদল করে একটা লুঙ্গি পরে নিয়ে কামিনী ঘোপের নিচে মূর্গি কাটতে বসে গেল। বীণাপাণি মশলা পিষতে বসে গেল। ব্যস্ত হয়ে পড়লেন শান্তি ঠাকরুনও।

নিমাই তার ভার হয়ে থাকা মনটা নিয়ে বারান্দার এক ধারে মোড়ায় বসে রইল। স্বত্বরমশাই স্নান করতে গিয়েছিলেন কুয়ার ধারে। বারান্দায় উঠে এসে ভেজা কাপড় নিংড়োতে নিংড়োতে বললেন, আজ নাকি পেটায় সব বাজার হয়েছে! রেমে কেনাকাটা করল বুঝি?

নিমাই মাথা নেড়ে বলল, যে আজে। বারগ শুনলেন না।

ওর হাতটা খুব দরাজ, বুঝলে!

সে আর বলতে!

স্বত্বরমশাই ভেজা কাপড়টা উঠোনের তারে টান-টান করে মেলে দিয়ে গিয়ে একখানা জামা চড়িয়ে বারান্দায় এসে বসলেন ফের। বললেন, একটা কথা ছিল নিমাই।

আজে, বলুন।

বীণা একটা জিনিস আমার কাছে গচ্ছিত রাখতে চায়।

জানি।

আমরা দুজনায় বুড়ো হয়েছি, বাস্তব-প্যাটরাও তেমন নেই। তুমি কি জানো বাবা জিনিসটা কী?

নিমাই অধোবদন হল। তারপর ক্ষীণ গলায় বলল, জানি।

কী জিনিস বলো তো!

নিমাই খুব নিরীহ গলাতেই বলল, সে আপনার মেয়েই আপনাকে বলবে'খন।

স্পষ্ট করে বলছে না। তোমার ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে, কোথায় একটা কিল্ডু আছে। খোলসা করে না বললে জিনিসটা রাখি কি করে বলো তো!

নিমাইয়ের হঠাৎ কী যে হল কে জানে! মুখ নিচু ছিল। কোলের ওপর টপটপ করে চোখের জল খসে পড়তে লাগল। বিম্বুদপন নিমাইয়ের দিকেই চেয়ে ছিল। হঠাৎ বলল, আমার চোখে ছানি আসছে বাবা। চারদিকটা কেমন অস্পষ্ট আর ধোঁয়া-ধোঁয়া দেখি। মাঝে মাঝে ভাবি, ছানিটা বোধ হয় ভগবানেরই আশীর্বাদ। স্পষ্ট করে সব না দেখাই ভাল।

নিমাই উঠল। পায়ে পায়ে উঠোনের সীমানা ডিঙিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা যেন বড্ড উথাল-পাথাল করছে। নিজের খামতি, দুর্বলতা, নিজের অপদার্থতা আজ যেন আরও ঘুলিয়ে উঠল তার নিজের চোখে। মাথাটা কাজ করছে না।

সামনেই একটা নর্দমার মতো। পচা জল জমে আছে। কাঁচা রাস্তা গাছপালার ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেছে। ওপরে মস্ত আকাশটা যেন রোদের হাসি হাসছে তার দুর্দশা দেখে। নিমাই তার কাতর জলভরা দু'খানা চোখ মেলে হাঁ করে চেয়ে রইল শুধু। বড় কষ্ট হচ্ছে তার। এরা আজ ভাল খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেছে। তার মুখে কিছু রুচবে না আজ। তার খিদে মরে গেছে, বাঁচার ইচ্ছে মবে গেছে, বড্ড গ্লানি হচ্ছে মনে।

অনেকক্ষণ বাদে বীণা যখন এসে তাকে স্নান-খাওয়ার জন্য ডাকল তখন নিমাই একটা নিমগাছের গোড়ায় ঠেস দিয়ে বসে ঘুমিয়ে পড়েছে। চোখের কোলে তখনও জল।

রাতে তারা যখন ঘরে দুজনায় হল তখন বীণা বলল, তুমি এরকম করছ কেন বলো তো!

নিমাই বোধহীনভাবে বীণার দিকে চেয়ে বলল, আমি আমার বেশে নেই।

বীণা চাপা হিংস্র গলায় বলল, তোমাকে একটা কথা বলেই দিই। তুমি যদি আমার টাকা নিয়ে বেশী মাথা ঘামাও তাহলে কিল্ডু ভাল হবে না। তুমি ও-টাকার কথা ভুলে যাও। পাপ হোক কি আর যাই হোক, তোমার তাতে কী? এমন সব কাণ্ড করছ যে লোকে টের পেয়ে যাচ্ছে।

নিমাই ভয় পেল না। কিন্তু মেনেও নিল না। চুপ করে রইল।

বাবাকে কিছু বলানি তো!

নিমাই মৃদু স্বরে বলল, বলতে হয়নি। উনি নিজেই কিল্ডু সন্দেহ করছেন।

বাবা কী বলেছে তোমাকে?

কী জিনিস গচ্ছিত রাখতে চাইছ তা জানতে চাইলেন।

তুমি কি বললে?

বললাম তুমিই ওঁকে বলবে।

বীণার ঝংকারে ভরা গলা হঠাৎ কয়েক পর্দা নেমে গেল। বলল, কী বলব তা আমি ভেবে পাচ্ছি না। বাবা তো আর এক আত্মক। তোমার মতোই।

নিমাই বিছানার একটি পাশে বসে রইল বজ্রাহতের মতো।

বীণাপাণি তার দিকে কূট চোখে চেয়ে থেকে বলল, তুমি এর পর এমন বেকাঁস কিছু হয়তো করে ফেলবে যাতে আমি ধরা পড়ে যাবো।

নিমাই আস্তে করে বীণার দিকে মুখ ফেরাল। তারপর বলল, আমাকে এবার বিদায় দাও বীণা। আমার মনে বড় কষ্ট।

বিদায় নেবে তা তার জন্য আমার অনুমতি কি দরকার? নিলে নেবে।

অনুমতিরও দরকার হয়। তুমি আমার ওপর অত রোগে না থাকলে বুঝতে পারতে।
 বীণাপাণি বিষ-গলায় বলল, চঃ কোরো না। একে তো তোমার জন্যই বনগায় আমার বসবাস করা বিপদের ব্যাপার
 হয়ে উঠল, তার ওপর এসব ন্যাকামি আমার সহ্য হচ্ছে না। তুমি কাছে থাকলেই বিপদ।
 নিমাই মাথা নেড়ে বলল, সে কথাই ঠিক। ভেবে দেখলাম, আমি বড় অপদার। আমি থাকলেই তোমার অসুবিধে।
 ওই লোকটা সেদিন যদি প্যাকেটটা দেখে না যেত তাহলেও ভয়ের কিছু ছিল না। কী যে কাণ্ডটা করলে তুমি!
 নিমাই কান্না সামলে ধরা গলায় বলল, কাল সকালে আমি বিদেয় হয়ে যাবো। কিন্তু একটা কথা বলে যাই। হঠাৎ
 করে উধাও হয়েছ এটা নিয়ে বনগায় কথা হবে।
 কেন হবে? আমি তো বাপের বাড়ি এসেছি। কাকাকে বলেওছি সে কথা।
 চিরকাল তো এখানে থাকতে পারবে না। ফিরতে হবে।
 আমি তোমার মতো বোকাও নই, আহাৎকও নই। আমি মাথা উঁচু করেই ফিরব।
 নিমাই ক্লিষ্ট মুখে বসে রইল।
 কী চাও তুমি বলে তো! তুমি চাও টাকাটা আমি কাকার হাতে তুলে দিই? ও টাকাটা ওয়ারিশ কি কাকা?
 আমি যা বলেছিলাম তা তুলে যাওয়াই ভাল। ওসব আগড়ম্ব বাগড়ম্ব কথা। আমার মাথায় ওরকম সব বোকা-কথাই
 আসে।

তার গেক্সিটা বুকুর কাছে হঠাৎ খামচে ধরে বীণা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, ফের ন্যাকামি হচ্ছে!
 নিমাই একটা অর্ধস্টুট যন্ত্রণার আওয়াজ করল। সে দুর্বল মানুষ। বীণা বড় হিংস্র মুষ্টিতে তার বুকুর লোম অবধি
 খিমচে ধরেছে। ঝাঁকুনিতে তার ঘাড়ো মট করে লাগল। নিমাই জলভরা চোখে বীণার দিকে চেয়ে বলল, আমাকে সত্যিই
 ছেড়ে দাও বীণা। আমি আর পারি না।

॥ ৪৪ ॥

বেলা দুটোর সময়ে চারুশীলা তার লিভিং রুমের ঠিক মাঝখানটায় কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত বিরস মুখে
 চারিদিকে চেয়ে দেখে নিয়ে ঘোষণা করল, বাড়িটার আর্কিটেকচারাল ডিজাইন ভীষণ সেকেলে আর যাচ্ছেতাই। তোমারও
 নিশ্চয়ই তাই মনে হয় ঝুমকি? কী বিচ্ছিরি সব কোণ আর খাঁজ! জানালাগুলো যথেষ্ট প্যানোরামিক নয়। ফ্লাশ ডোরের
 চেয়ে অনেক ভাল কি জানো? ডেকোরোটিভ ডাবল ডোর। আর ফ্রেমিংটাও দেখ। এ তো আর আসল মার্বেল নয়,
 অনেকটা মার্বেলের মতো দেখতে। নাঃ, আর একটা মডার্ন বাড়ি করতেই হবে মনের মতো।

চারুশীলার বরের একটা পারসোনাল কশিউটার আছে। সেটা বিশেষ ব্যবহার হয় না। উদ্দলোক দেশ ও বিদেশে
 এত বনবন কর ঘুরে বেড়ায় যে নিজের বাড়িতে থাকার বা জিনিসপত্র ব্যবহার করার সুযোগই হয় না বড় একটা। এই
 পিসি-তে প্রায়ই এসে প্র্যাকটিস করে ঝুমকি। চারুশীলাই বলেছে, রোজ দুপুরের দিকে চলে আসবে। তোমার প্র্যাকটিসও
 হবে আর আমিও কথা কয়ে বাঁচবো।

ঝুমকির আত্মসম্মানবোধ প্রবল। একটু অনাদর বা উপেক্ষা বুঝতে পারলেই সে হাজার হাত তফাত হয়ে যায়। হয়তো
 অভিমান আর হীনস্বন্যতা থেকেই সে এরকম। অন্তত তার বাবা একদিন এরকমই বলেছিল তাকে। তবু ঝুমকি তার
 নিজেরই মতো। চারুশীলার পাগলামি এবং অপচয় দেখে সে অবাক হয়। অনেক টাকা আছে চারুশীলাদের, কিন্তু টাকার
 অহংকার নেই। চারুশীলা পাগলের মতো টাকা খরচ করে। ঝুমকি আসছে যাচ্ছে মাত্র কয়েক মাস হল। তার মধ্যেই সে
 অন্তত বার পাঁচেক দেখল, চারুশীলা জলের দরে পুরনো আসবাব কিছু না কিছু বিক্রি করে নতুন আসবাব আনছে। পাল্টে
 ফেলেছে সোফার কভার, জানালার পর্দা, বাসনপত্র। বাইরের ঘরের মেঝের পুরনো মার্বেল টাইল তুলে ফেলে নতুন টাইল
 পাতা হল এই তো সেদিন।

এখন বাড়িটাও পাল্টাতে চায় দেখে ঝুমকি একটু অবাক হয়ে বলল, কেন মাসি, এ বাড়ির ডিজাইন তো ভীষণ
 মডার্ন। সেকেলে বলছ কেন?

চারুশীলা চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখে নিতে নিতে বলল, আমার কাছে বড় পুরনো হয়ে গেছে। একরকম প্যাটার্ন কি
 রোজ দেখতে ভাল লাগে?

ঝুমকি একটু হাসল, তোমার অনেকগুলো বাড়ি থাকা উচিত ছিল। ঘুরে ঘুরে থাকতে পারতে।
 চারুশীলা ঝুমকির দিকে চেয়ে ঙ ওপরে তুলে বলল, আরে, ঠিক তো! এজন্যই আগের দিনের লোকেরা অনেকগুলো
 করে বাড়ি করত। আসুক তোমার মনো, কথটা বলতে হবে তো! এত এত বাড়ি তৈরি করে দিচ্ছে লোককে, নিজের কেন
 তবে একখানা মোটে বাড়ি?

ঝুমকি ঠাট্টা করে বলে, ক'টা বাড়ি চাও? গোটা দশেক?
 আরে না। করপোরেশনের কী সব আইন-টাইন আছে বোধ হয়। অতগুলো করতে দেবে না।
 দেবে। শুনেছি নিজেদের বাড়ি থাকলে সরকারি ফ্ল্যাট বা বাড়ি পাওয়া যায় না।
 বেজার মুখ করে চারুশীলা বলে, সেইজন্যই তো সল্ট লেক-এর প্লটটা নিয়ে ভয়ে থাকি। ওটা আমার নামে।
 এটা তোমার মনোর নামে। সবাই ভয় দেখাচ্ছে, টের পেলে নাকি জমি কেড়ে নেবে। আমি অবশ্য সল্ট লেকে যেতে চাই
 না।

কেন মাসি, ফ্যান্টাস্টিক জায়গা তো!
 মোটেই নয়। ভাল ডিজাইনের বাড়ি করব, দেখবে কে বলে! ক'টা লোক ওখানে? তা ছাড়া ওখানে থাকলে কেউ
 যাবে না।

কেন, নির্জনতা তোমার ভাল লাগে না? আমার তো খুব ভাল লাগে।

ও বাবা, নির্জনতা আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। আমি চাই সবসময়ে হই-চইয়ের মধ্যে থাকতে। নির্জনে থাকলে আমার নম বন্ধ হয়ে আসে, কান্না পায়। আরও একটা ব্যাপার আছে। গুনলে তুমি হাসবে।

কী গো মাসি?

হাসবে না তো! নির্জনে আমার ভীষণ ভূতের ভয় হয়।

ঝুমকি হেসে ফেলল, কলকাতায় আর ভূত কোথায় মাসি? তারা সব আলো আর শব্দের ঠেলায় পালিয়ে গেছে।

ভয়ের জন্য কি ভূতের দরকার হয়? ভূত নেই তা জানি, কিন্তু তার ভয়টা তো আর নেই হয়ে যায়নি। ফাঁকা বাড়িতে একা থাকলে আমার দিনের বেলাতেও ভূতের ভয় করে। আমাকে কেমন একা থাকতে হয় জানো তো। কর্তা হিন্দি-দিব্লি-লন্ডন-নিউ ইয়র্ক করে বেড়াচ্ছেন। ছেলেমেয়েরা ইঙ্কলে, তখন কী রকম যে লাগে! এই, আমি তোমাকে ডিস্টার্ব করছি না, তো!

না, না। আমি তো তোমার সঙ্গে গল্প করতেই আসি।

রোজ আসবে। আমি তো ভীষণ বকবক করতে ভালবাসি।

তুমি সিনেমা করা ছেড়ে দিলে কেন?

চারুশীলা ঠোট বৌকিয়ে বলল, বিয়ের পর আর করতে দিল কই? আর আমারও ভীষণ বোরিং লাগত। মোটিভেশন ছিল না তো! ভাল অভিনয় করব, টাকা রোজগার করব, সবাইকে আট্রাক্ট করব—একটা কোথাও অ্যাশিশন তো থাকবে! আমার কিছুই ছিল না। তার ওপর আমাদের বাড়িটাও তো খুব কনজারভেটিভ। আমার এক কাকা ডিরেক্টর ছিলেন, তিনিই নামিয়ে দিয়েছিলেন।

মোট ক'টা ছবি করেছিলে?

চাবটে। দুটোয় নায়িকা। সে দুটোই ফ্লপ। আর দুটোতে সাইড রোল। সে দুটোও চলেনি।

এই বলে চারুশীলা খুব হাসল।

ঝুমকি বলল, আমি একটাও দেখিনি।

দেখবে কি করে? সুপার ফ্লপ যে। রি-রান তো হয় না।

তুমি যদি আজও সিনেমা করতে তাহলে একজন নায়িকার সঙ্গে পরিচয় আছে বলে গল্প করতে পারতাম বন্ধুদের কাছে।

আমার কিছু ভাই একদম ভাল লাগত না। বড্ড একঘেয়ে। শুটিং-এর মতো বোরিং জিনিস হয় না। তার ওপর আবাব নায়িকাদের পারবলিক লাইফ নেই। দোকানে বাজারে যেতে পারে না, রাস্তায় বেরোতে পারে না।

তোমার হয়েছে সেরকম?

চারুশীলা মুচকি হেসে বলে, নায়িকা বলে নয়, তবে এককালে রাস্তায় বেরোলে সবাই তাকাত।

এখনও তাকায়। তুমি এখনও যা সুন্দর! কী ফিগার!

যাঃ। কত মুটিয়ে গেছি!

একটুও মুটিয়ে যাওনি।

তোমাকে আর মন-রাখা কথা বলতে হবে না। কত বয়স হল বলো তো!

তোমার বয়স বোঝাই যায় না।

খুব যায়। আয়নায় যখন নিজেকে দেখি তখন দেখতে পাই মুখের চামড়া কত লুজ হয়ে গেছে।

ওটা তোমার সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার। মোটেই চামড়া লুজ হয়নি। তুমি তো মোটে আলি থার্টিজ।

মিড থার্টিজ। এখন আর হিসেব করি না। ভয় করে। কর্তা কী বলে জানো? আমার একটা চুল পাকলেই নাকি ডিভোর্স করবে।

ওটা তো ঠাট্টা।

পুরুষমানুষদের বিশ্বাস নেই ভাই। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কত সুন্দরীদের দেখছে।

ঝুমকি লজ্জার হাসি হেসে বলে, যাঃ। মেসো তোমাকে যা ভালবাসে!

একটা জিনিস শিখে রাখো, পুরুষমানুষকে বেশী একা ছেড়ে দিতে নেই।

তুমিই-বা ছাড়ো কেন? সঙ্গে থাকলেই পারো!

আগে সঙ্গেই থাকতাম। সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবী ঘুরে বেরিয়েছি। এখন ছেলেমেয়ে জ্বলে পড়ছে, আমার হাত-পা বাঁধা। বিয়ে হলে বুঝবে।

বিয়েতে আমার কাজ নেই বাবা।

চারুশীলার জ্র হঠাৎ কঁচকে গেল। চিন্তিত মুখে হঠাৎ একটা চেয়ার টেনে এনে ঝুমকির মুখোমুখি বসে বলল, আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় যে ওরা দুজনে দুজনের প্রেমে পড়েছে?

কারা মাসি?

আহা, আমার ভাই হেমাঙ্গ আর রশ্মি। কী মনে হচ্ছে?

অবাক হয়ে ঝুমকি বলে, কি করে বলব বলো তো!

কিছু মনে হয় না ওদের দেখে?

তোমার ভাই মেয়েদের বেশ ভয় পায়।

আর রশ্মি?

রশ্মি খুব চালাক।

একটু দমে গিয়ে চারুশীলা বলে, তাহলে কি ব্যাপারটা হয়ে ওঠেনি বলছ!

আমি বুঝতে পারি না মাসি। দুজনেই হাইলি এডুকেটেড, দুজনেই অ্যাডাল্ট, আভারস্ট্যাভিং।
চারুকীলা হতাশ গলায় বলে, আমারও কি রকম মনে হয়, ওরা ঠিক প্রেমে পড়ছে না। দেয়ার ইজ এ সুইট রিলেশন,
বাট নাথিং মোর দ্যান দ্যাট। কিন্তু কেন বলো তো? ওরা প্রেমে পড়ছে না-ই বা কেন?
এমনভাবে বলছ যেন প্রেমে পড়া আর জলে লাফিয়ে পড়া একই ধরনের ব্যাপার। লাফ দিয়ে পড়লেই হল!
চারুকীলা একটু হাসল, তোমরা এ-যুগের ছেলেমেয়েরা কিরকমভাবে প্রেমে পড়?
আমরা মোটেই সহজ পাঠ্যপত্রী নই। কত টেনশন আমাদের! কেরিয়ার আছে, প্ল্যানিং আছে, তারপর অ্যাডজাস্টমেন্ট,
টেম্পারামেন্ট এসব ফ্যাক্টর আছে।

দূর! অত ফ্যাকরা থাকলে কি প্রেম হয়?
হয়। তবে আবেগটা বেশী থাকে না।
প্রেম তো একটা আবেগই। তোমার নেই?
আছে হয়তো। তবে বুঝতে পারি না।
তুমি এ পর্যন্ত কারও প্রেমে পড়নি?
ঝুমকি ভীষণ লজ্জা পেয়ে বলে, প্রেমে পড়তে খুব ভয় পাই। আমি পড়লেও সে হয়তো পড়বে না। আমার তো
চেহারা নেই!

কী নেই?
চেহারা।
তোমার মাথা! বলে চারুকীলা হেসে ফেলে, রোগা বলে বলছ? রোগা হওয়ার জন্য কত মেয়ে কত সাধ্যসাধনা করে
তা জানো? গায়ে একটু মাংস লাগলেই তুমি তো ভীষণ সুন্দরী!

যাঃ!
তা হলে দেখবে?
কী দেখব?
আমি আজ থেকে তোমার খাওয়ার চার্ট করে রোজ তোমাকে খাওয়াবো। সাত দিনের মধ্যেই তুমি আর তোমাকে
চিনতে পারবে না।

মুখটা বিমণ্ড করে ঝুমকি বলল, আমি তো খেতেই পারি না। মায়ের সঙ্গে খাওয়া নিয়েই তো আমার রোজ ঝামেলা
হয়। মা বলে আমার পাকস্থলীটা নাকি একটা হাঁসের ডিমের মতো ছোট।
চারুকীলা বলে, তোমাদের বয়সী রোগা মেয়েদের তো ওইটেই ভীষণ দোষ। খেতে চাও না।
ঝুমকি মুদু হেসে বলে, মোটাসোটা হলেও আমি মোটেই সুন্দরী হয়ে উঠবো না। আমার ফেস কাটিং ভাল নয়।
চারুকীলা হঠাৎ আনমনা হয়ে গেল। ঝুমকি সুন্দর কিনা সেই পয়েন্ট নিয়ে আর মাথা ঘামাল না! কিন্তু ঝুমকির আর
একটু গুনতে হচ্ছে করছিল। চারুকীলা বলল, আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না ঘটনাটা ঘটা উচিত ছিল?

কোন ঘটনা মাসি?
হেমাঙ্গ আর রশ্মির একটা আভারস্ট্যাভিং। ওদের তো বেশ ভালই মানাত।
তা মানাত, একটু ধৈর্য্য ধরো, হয়েও যেতে পারে।
হবে? বলে চারুকীলা খুব হতাশা মাখানো মুখে খানিকক্ষণ বসে থেকে বলে, যদি না হয়? না হলে আমার একটা
হার হয়ে গেল।

হার কেন মাসি?
মনে মনে যে আমি একটা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমার ওই হাঁদা ভাইটার একটা গতি করেই জাড়বো।
এমন কিছু বয়স তো আর হলে যায়নি।
চারুকীলা মাথা নেড়ে বলে, বয়সটা বড় কথা নয়। আসল কথা হল অ্যাটিচুড। ও মেয়েদের ভীষণ ভয় পায় এবং
অপছন্দ করে। নরমালি বিয়ে দেওয়া প্রায় অসম্ভব। কিন্তু যদি প্রেমে-ট্রেমে পড়ত তাহলে হয়ে যেত। রশ্মিকে দেখে আমার
মনে হয়েছিল, হয়তো হয়েই যাবে। রশ্মি কিন্তু ওর ওপর একটু উইকনেসও দেখাচ্ছে।

ভালই তো মাসি। এবার তুমি একটু ধৈর্য্য ধরো না!
কিন্তু হেমাঙ্গ যে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কিছুতেই রশ্মির সঙ্গে দেখা করাতে পারছি না।
ঝুমকি হি হি করে হেসে ফেলে বলে, তোমার যে কী সব অদ্ভুত প্রবলেম। কে কার প্রেমে পড়ছে না বলে তোমার
চোখে ঘুম নেই! তুমি কিন্তু খুব অদ্ভুত।

চারুকীলা একটু লজ্জা পেয়ে বলে, ঠিকই বলেছ। আমার সব সামান্য সামান্য ব্যাপার নিয়ে অকারণে টেনশন হয়।
কেন বলো তো! এটা কি কোনও নার্স ডিজিজ?

ডিজিজ নয়। আসলে তোমার হাতে অনেকটা ফাঁকা সময় থাকে। কিছু কাজ করতে হয় না। তাই আবেল-তাবেল
ভাবনা আসে।

কী করব বলো তো!
বেরিয়ে পড়বে। খুব ঘুরে বেড়াবে। সিনেমা থিয়েটার দেখবে, গান শুনবে, এগজিভিশনে যাবে। ইচ্ছে করলে কোনও
একটা ট্রেনিংও নিতে পারো।

সিনেমা থিয়েটার আমার বেশি ভাল লাগে না। তার চেয়ে জীবনে সিনেমা বা নাটকের মতো কিছু ঘটিয়ে তুলতেই
আমার বেশি ভাল লাগে। ধরো একজনের সঙ্গে আর একজনের একটা প্রেম ঘটিয়ে দিলাম বা বন্ধুত্ব করে দিলাম বা
বিয়ে—যা হোক একটা কিছু।

ও বাবা! তুমি তো সাংঘাতিক। ঝগড়া লাগিয়ে দাও না তো!
না রে মেয়ে। আমি বুঝি ততটাই খারাপ? আচ্ছা হ্যাঁ, তোমার প্রেমে সত্যিই কেউ পড়েনি?
ঝুমকি মুচকি হেসে বলে, তুমি ঘটতে চাও নাকি একটা?
আগে বলো, কেউ পড়েছে কিনা।
না, কেউ কখনও আমার প্রেমে পড়েনি।
চিঠি দেয়নি? পিছু নেয়নি? কথা বলার চেষ্টা করেনি?
না। একদম না।
বাজে কথা। সত্যি করে বলো তো!
সত্যিই বলছি।
হতেই পারে না।
কেন হতে পারে না মাসি? পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী আছে, সবাইকেই কি প্রেমে পড়তে হবে? ওটা ছাড়া
বুঝি তাদের আর কাজ নেই?
যৌবনের একটা ধর্ম আছে তো!
যৌবনের ধর্ম অনেক বড়। প্রেমটা কোনও ফ্যান্টারি নয়।
চারুশীলা জুঁকটকে ঝুমকির দিকে চেয়ে বলে, তাহলে যুগটা সত্যিই খুব পাশ্টে যাচ্ছে।
যাচ্ছে নয়। গেছে। তা বলে প্রেম করা লোপাট হয়নি। আছে। তবে তোমাদের আমলের মতো নেই।
তুমি তাহলে বলছ যে আমি সেকলে হয়ে গেছি?
ঝুমকি ফের মুচকি হাসল, চেহারায় বুড়ি হওনি, কিন্তু মনে মনে বড্ড প্রবীণা হয়েছে।
দাঁড়াও, তোমার ব্যবস্থাও হচ্ছে।
রক্ষে করো। আমার এখন সবচেয়ে বড় চিন্তা বাবার পাশে দাঁড়ানো।
বাবাকে নিয়ে অত ভেব না। উনি ভাল হয়ে গেছেন।
গেছেন ঠিকই, তবে আমি চাই বাবাকে একটু নিশ্চিন্ত করতে। হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পর থেকেই বাবার একটা দুশ্চিন্তা
হয়েছে, যদি, দুম করে মরে যাই তাহলে আমার পরিবারটার কী হবে? আমি একটা চাকরি পেলে মনে হয় বাবা মনের দিক
থেকে একটু রিলিফ পাবে।
চারুশীলা হঠাৎ সচকিত হয়ে বলে, আচ্ছা, তোমার চাকরির চেষ্টা হোমান্সরই তো করার কথা ছিল? করেনি কিছু?
ঝুমকি চাপা হাসি হেসে বলে, পারলে করতেন নিশ্চয়ই, তুমি ব্যস্ত হয়ে না।
ছিঃ ছিঃ। ভীষণ পাজি তো! দাঁড়াও, এখনই টেলিফোন করছি।
না মাসি, না। ওসব করতে যেও না।
চারুশীলা বলল, কেন করব না? আমাদের একটা প্রেক্ষিজ নেই? এত করে চিঠিপত্র দিয়ে, ষড়যন্ত্র করে তোমাকে
পাঠালাম ওর কাছে, ও পাত্তা দেবে না কেন?
হয়তো পেরে উঠছেন না। চাকরি কি গায়ের জোরে হয়?
খুব হয়। ওর অনেক কানেকশন। দাঁড়াও তো।
এই বলে চারুশীলা উঠে গেল।
এই উজবুক, তুই এরকম কেন রে?
ওপাশ থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে হোমান্স বলে, কি রকম?
তুই এত গৈতো, এত পাজি কেন?
দুনিয়ায় সবাই কি ভাল হয়?
ভাল না হোস, কথার দাম নেই কেন?
তোকে আবার কি কথা দিয়েছি?
আমাকে নয়। ঝুমকিকে।
ঝুমকিকে? তার আবার কী হল?
তুই ওকে বলসনি ওর জন্য চাকরির চেষ্টা করবি?
চাকরি কি ছেলের হাতের মোয়া?
হ্যাঁ, মোয়া, তুই চেষ্টা করলেই হয়ে যেত। তুই চেষ্টাই করিসনি। আচ্ছা, একটা এত ভাল মেয়ে কম্পিউটার জানে,
ভাল ছাত্রী, কী দারুণ সুন্দর স্বভাব, ওর একটা চাকরি হতে পারে না?
এতলো কোনও কোয়ালিফিকেশন নয়। কম্পিউটার হাজার হাজার ছেলেমেয়ে জানে। চাকরির জন্য আরও কিছু
শেখার দরকার ছিল।
তুই চেষ্টা করেছিস?
সেরকমভাবে করিনি। তবে করলেও লাভ হত না। ওই কোয়ালিফিকেশন নিয়ে ভদ্র মাইনের চাকরি পাবে না। হয়তো
কোনও ফার্মে দুকিয়ে দিতে পারব, কিন্তু ওরা খাটিয়ে খাটিয়ে জান শেষ করে দেবে। যা খুশি মাইনে দেবে।
তাহলে তোর কিসের ক্ষমতা?
আমি খুব ক্ষমতাবান নাকি?
ওসব আমি শুনতে চাই না। এক মাসের মধ্যে ঝুমকির একটা চাকরি ঠিক করে দিতে হবে।
কেন, ওর হঠাৎ হল কি? এত জরুরি দরকার কেন?

দরকার আছে।

আচ্ছা, তাহলে কাল যেন অফিসে এসে দেখা করে।

কখন যাবে ?

না থাক। অফিসে আসতে কষ্ট করতে হবে। তার চেয়ে বরং তোর বাড়িতে যেন আসে কাল সন্ধ্যাবেলা। আমি তোর বাড়িতে যাবো।

উঃ, বাচালি! হবে তো!

তা বলতে পারি না।

এক কাজ কর না, এখনই চলে আয়। ঝুমকি এখানেই আছে।

এখনই!

কেন, তোর এমন কী কাজ ? নিজেরই তো ফার্ম বাবা, চলে আয় না। বিকেলটা তাহলে তিনজনে মিলে কোথাও গিয়ে কাটিয়ে আসি। ডিনার সেরে ফেরা যাবে।

জ্বালালি!

আয় না লক্ষ্মী তাই আমার! আসবি ?

দেখছি।

দেখছি-টখছি নয়। আধঘন্টার মধ্যে চলে আয়। গাড়িতে বেশী করে তেল ভরে নিস।

আচ্ছা।

বাচালি। থ্যাঙ্ক ইউ।

ফোনটা রেখে উজ্জ্বল মুখে চারুশীলা বলল, আসছে।

কিন্তু খবরটায় যেন ভীষণ ঘাবড়ে গেল ঝুমকি। বলল, এত ঝামেলা করতে গেলে কেন মাসি ? উনি আমাকে ন্যাগিং বলে ডাববেন। চাকরির জন্য বেশি উমেদারি করা কি ভাল ?

যাঃ, ওর কাছে আবার অত ফর্মালিটি কিসের ? হেমাঙ্গ এমনিতে বোকা হলেও, এ নাইস ম্যান।

আমার ভাল লাগছে না মাসি।

ভাল লাগবে। দাঁড়াও, তোমার মাকে একটা ফোন করে দিই। যেতে দেরি হবে।

না মাসি, ডিনারের তোমারা যাও। আমি যাবো না।

তাই কি হয় ? তিনজন না জুটলে আনন্দই হবে না।

আমি খুব লজ্জা পাই মাসি।

অত লজ্জা কিসের ? একটু স্মার্ট হও তো!

ব্যাপারটা ঝুমকির একদম ভাল লাগছিল না। কারও কাছে এভাবে চাকরির দরবার করতে তার বড় অপমান লাগছে। কিন্তু চারুমাশি একটু অবুধ, খামখেয়ালী। মনে মনে ঝুমকি স্থির করল, হেমাঙ্গ চাকরি দিলেও সে নেবে না। বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করে দেবে।

হেমাঙ্গর এসে পৌছতে ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। এসেই বলল, আজ বেরোনো অসম্ভব। মিছিলে মিছিলে সব রাস্তা জ্যাম। গলিঘুঁজি দিয়ে অতি কষ্টে এসেছি।

চারুশীলা বলল, বেরোবি না! আমি যে সাজগোজ করলাম!

তুই তো সবসময়ই সেজে থাকিস। নিরুর্মাদের আর কীই বা কাজ।

মারব খাণ্ডড়। বাড়ির অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নেই বুঝি ?

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন! হাসালি। তোর সংসার তো চালায় চাকর ঠাকুররা। তাদের মোটা রোজগার আর উপরি হয়। কোথায় কোন জিনিসটা আছে তা জানিস ?

চারুশীলা একটু থমকে হেসে ফেলল, বলল, জানি ঠিকই। তবে মনে থাকে না। আমি তো তোর মতো বস্ত্রবাদী নই। আসল কথাটা হল প্র্যাকটিক্যাল নোস। তোর মতো বোকা সুন্দরী বড়লোক মেয়েরা হয়ও না। যাক গে, মেয়েটা কোথায় ?

ওকে একটু সাজতে পাঠিয়েছি ভিতরের ঘরে। একদম সাজতে চায় না।

সাজের দরকারই বা কী ? তুই সবাইকে নিজের মতো বানাতে চাস কেন ?

কিন্তু সাজেরও যে রকমফের আছে, প্রয়োজন আছে, সেটা ঝুমকি ঘরে এসে দাঁড়াতেই হঠাৎ টের পেল হেমাঙ্গ। সাজেইনি বলতে গেলে, শুধু নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়েছে। তাতেই রোগা মেয়েটা যেন ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে।

॥ ৪৫ ॥

হেমাঙ্গর কোনও ওয়ারিশন থাকবে না। তার জিনিসপত্র বা টাকাপয়সা দশ ভূতে লুটেপুটে খাবে। তার মুখাগ্রি বা শ্রদ্ধ হবে কি ? ক'জন কাদবে তার জন্য ? একজন ব্যাচেলর মারা গেলে কান্নাকাটি করার লোক পাওয়া কঠিন। তবে মরার পরের অবস্থাটা নিয়ে হেমাঙ্গ চিন্তিত নয়। বরং মরার আগেই কিছু সমস্যা ও জটিলতা দেখা দেবে। মাথরাতে স্ট্রোক হলে ডাক্তার ডাকবে কে ? বেডপ্যান এগিয়ে দেওয়ার দরকার হলে কি হবে ? কিংবা মাথা ধোয়ানো ? কিংবা পাশে বসে একটু আহা-উহু করা ? সুতরাং বুড়ো বয়সটাকে হেমাঙ্গ খুব ভয় পায়। ব্যাচেলরদের খুব বেশিদিন বেঁচে না থাকাই ভাল।

কিন্তু আজকাল বেঁচে থাকাটাকেই সে নানা প্রশ্নে কণ্টকিত করে তুলছে। এই বেঁচে থাকাটার মানেই বা কী ? অধীত বিদ্যা ভাঙিয়ে উপার্জন। খাওয়া, ঘুম, কাজ। ব্যাঙ্কে টাকা জমছে নিয়মিত, প্রত্যেকটা দিনই যেন এক ছাঁচে ঢালা। ওঠা

নেই, পড়া নেই, কিছু নেই। কপাল তার এমনই যে, জীবন-সংগ্রামটা অবধি করতে হয়নি। পয়সাওলা পরিবারে জন্ম হয়েছিল, নিজেও দিবা পাস-টাস করে গেল, পয়সা উপার্জন করতে লাগল। যারা বেঁচে থাকার লড়াই করে, অত্যেকটা পয়সার জন্য যাদের ঘাম ঝরাতে হয়, যারা ছপ্পড় ফুঁড়ে পায় না তাদের কাছে বোধ হয় জীবন এমন আদুনি নয়। হেমাঙ্গর অনেকদিন ইচ্ছে হয়েছে একদিন সকালে ঠেলাওলা সেজে বেরিয়ে পড়ে, বা এক সপ্তাহের জন্য ট্যান্ডি চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে দেখে। হেঁড়া জামাকাপড় পরে মাঝে মাঝে ভিক্ষে করতেও ইচ্ছে হয় তার।

আজ সকালে উঠে তার মনে হল, বার্কোর একা এবং অসহায় দিনগুলির জন্য তার কিছু আগাম প্রতুতি নিয়ে রাখা দরকার। তার বয়স যদিও ত্রিশের এদিক ওদিক, তবু প্রতুত হয়ে থাকা ভাল। অন্তত ভাবনাচিন্তা এখনই শুরু করা দরকার। জন্মাবধি এ পর্যন্ত তার জীবন অতীব মসৃণ এবং তৈল নিষিক্ত মেশিনের মতো ক্রটিহীন। কিন্তু কিছু পরে সমস্যা সৃষ্টি হতে থাকবে।

পরমানন্দকে সে মাঝে মাঝে টাকা দেয়। পরমানন্দ চায় না, সে নিজে থেকেই দেয়। পরমানন্দ আসলে তথাগত। ইচ্ছলে তার গলাগলি বন্ধ ছিল। তথাগত ছিল ফার্স্ট বয়। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছিল ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে। চাকরি করেছিল কিছুদিন। তারপর রামকৃষ্ণ মিশনে ব্রহ্মচারী হল, কিছু পরে সন্ন্যাসী। মিশন ছেড়ে সে এখন আলাদা আশ্রম করেছে কয়েকজন অনুগামী নিয়ে। আগাগোড়া তথাগতকে লক্ষ করে এসেছে হেমাঙ্গ। তথাগত ঈশ্বরের সমীপবর্তী হতে পারল কিনা, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে ফেলল কিনা এসব জানার কৌতুহল ছিল প্রবল। সেসব না হলেও পরমানন্দ একটা সন্তোষের ভাব নিয়ে থাকে। সোনারপুরের কাছেই সে একটা অনাথ আশ্রম, একটা আশ্রমিক বিদ্যালয়, তাঁত সেঁতার আর মন্দির নিয়ে আছে। তাতে দেশের কতটা উপকার হচ্ছে তা জানে না হেমাঙ্গ। তবে জীবনের একটা অর্থ হয়তো পরমানন্দ পেয়েছে।

একদিন সে পরমানন্দকে জিজ্ঞেস করেছিল, যদি সন্ন্যাসীই হবি তা হলে এত লেখাপড়া শিখতে গেলি কেন? সময়টা নষ্ট হল।

পরমানন্দ স্থিত মুখে বলল, নষ্ট হয় না। কাজে লাগে। ঠাকুরেরই কাজে লাগে।

হেমাঙ্গর ঠাকুর নেই বলে কথাটা খুব গভীরে ফোকে না তার।

আর একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, আগে তুই ক্রিকেটের খুব ভক্ত ছিলি। এখনও আছিস? ইন্ডিয়া-পাকিস্তান টেস্ট ম্যাচ হলে টিভিতে দেখিস?

পরমানন্দ অবাক হয়ে এবং পরে হেসে বলে, কেন দেখব না? খুব দেখি।

এর পরের প্রশ্নটা হঠাৎ মাথায় কি করে যে এল হেমাঙ্গর কে বলবে? সে জিজ্ঞেস করল, তুইতো সন্ন্যাসী, যখন খেলা দেখিস তখন সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য হয়ে দেখিস?

এ কথায় পরমানন্দ খুব হতবাক হয়ে ঋণিকক্ষণ চেয়ে ছিল হেমাঙ্গর দিকে। তারপর বলল, হেমাঙ্গ, তুই কিন্তু খুব অদ্ভুত! কেন?

তুই আমাকে চমকে দিয়েছিস। বড় মারাত্মক প্রশ্ন। পক্ষপাতশূন্যতা।

ওটা তো জবাব হল না।

ওটাই জবাব। বোধ হয় ঈশ্বর স্বয়ং ছাড়া আর কেউ পক্ষপাতশূন্য হতে পারে না।

তা হলে সন্ন্যাসী হয়ে তোর কী লাভ হল?

লাভ হয়েছে কে বলল? লাভ লোকসান নয়। এটা একটা মোড অফ লাইফ। সন্ন্যাসও একটা রিসার্চ, এক ধরনের গবেষণা।

সেই সঙ্গে কি একটা স্যাটিসফ্যাকশনও? একটু ইগো? একটু সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সও?

পরমানন্দ খুব হাসল। বলল, তোকে নিয়ে পারা যায় না।

হেমাঙ্গ সামান্য উত্তেজিত হয়ে বলে, দেখ, সন্ন্যাসীদের বাইরে যতই বৈরাগ্য মাখা থাক, ভিতরে ভিতরে সে কিন্তু সংসারী মানুষদের চেয়ে নিজেকে উন্নত স্তরের মানুষ ভাবে। তুইও কি ভাবিস না? সত্যি করে বল তো, এই আমাকে দেখেই কি তোর মনে হয় না যে, ইস, হেমাঙ্গটা কোন অন্ধকারে লোভলালসার মধ্যে পড়ে আছে!

পরমানন্দ স্থিতমুখে বলে, অতটা হয় না। তবে ইগো একটা পাঞ্জি জিনিস। মৃতদেহের দাহ শেষ হওয়ার পরও একটা পিণ্ডাকার জিনিস থাকে। সেটা পুড়ে পুড়ে শেষ হতে চায় না। লোকে ওটাকে বলে অস্তি। অর্থাৎ যার লয়ক্ষ্য নেই। ইগো ঠিক ওরকম। তবে সংসারী তার ইগোকে পুষে রাখে, তাকে যত্নাওক্তি করে। যেন পোষা পাখি। আর সন্ন্যাসী তার ইগোকে তাড়ানোর একটা চেষ্টা অন্তত করে। সেটাই তার তপস্যা।

নইলে সংসারী আর সন্ন্যাসীতে তফাত নেই বলছিস?

তফাত সামান্যই। শুধু অ্যাটিচুডের তফাত। পারপাসের তফাত।

আমি পারপাসের তফাতটাই জানতে চাই। তুই কেন বেঁচে আছিস তা বুঝিস? বেঁচে থাকাটার পারপাস কী?

সেটাই তো বুঝবার চেষ্টা করছি। কেন জন্ম, কেন এই বেঁচে থাকা, কেন চৈতন্য, কেন অনুভূতি। শুধু পান, ভোজন, রমণ, অশ্বিত্য এর তো কোনও উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নেই।

আমাকে বুঝিয়ে দে। বুঝতে পারলে আমিও সব ছেড়েছুড়ে সন্ন্যাসী হব।

সন্ন্যাসী হবি! কোন দৃষ্ণে। দুনিয়ায় সবাই সন্ন্যাসী হলে যে সৃষ্টি রসাতলে যাবে। চাষবাস, ব্যবসাবাগিজ্য, শ্রোডাকশন সব লাটে উঠবে। সন্ন্যাসীরও তখন ট্যানা কমপ্লু বা ভিক্ষে জুটবে না।

তোর আশ্চর্য পাটোয়ারি বুদ্ধি। সংসারীরা কাজকর্ম করে দুনিয়ার ইকনমি আর শ্রোডাকশন বহাল রাখুক, আর তোর মতো সন্ন্যাসীরা তাদের ঘাড় ভেঙে খেয়ে দিবি ঈশ্বর-সাধনা করে পরব্রহ্মে লীন হয়ে যাক। ভগবান যদি এতই বোকা লোক হয়ে থাকে তবে তার জন্য তপস্যা করার মানেই হয় না।

সন্ধ্যাসীরা কাজ করে না, কে বলল ? ঠাকুর নিজেই তো সংসারী ছিলেন। সন্ধ্যাসীরাও সংসারেরই কাজ কর, তবে বৃহৎ সংসার।

ওটা তত্ত্বকথা নয় তো রে ?

পরমানন্দ মৃদু মৃদু হাসছিল। বলল, তত্ত্বকথা যখন ফলিত হয় তখনই ধর্ম। কিন্তু মুশকিল হল সব তত্ত্বকে ফলিয়ে তোলা কঠিন কাজ।

হোমস্ হতাশ হয়ে বলে, তোর ইঙ্কল, অনাথ আশ্রম, তাঁত এসবও আমার কাছে ছেলেখেলা বলে মনে হয়। তুই তো রোজগার করে এর চেয়ে অনেক বেশি করতে পারতিস বৃহৎ সংসারের জন্য। তাই না ? তুই কি এসকেপিস্ট ?

তুই আজ আমার স্বরূপ না বের করে ক্ষান্ত হবি না নাকি ?

স্বরূপ আবার কিছু আছে নাকি ?

আছে বৈকি। ভগ্ন সন্ধ্যাসীরস্বরূপ তো তার করুণ দুর্বল চেহারাটা।

তুই ভগ্ন বলে নিজেকে জানিস ?

ভগ্ন ছাড়া আর কি ? তবে অ্যাটিচুডটা মিথ্যে নয়। বুঝবার এটাও হয়তো একটা রাস্তা।

আমার পক্ষে সন্ধ্যাসী হওয়ার কোনও বাধা নেই। বিয়ে করব না, কোনও বাইন্ডিং নেই, বেঁচে থাকার অর্থও কিছু পাচ্ছি না। তোর আখড়ায় আমাকে থাকতে দিবি ?

থাকবি ? এ আর বেশি কথা কি ? চলে আয়।

আমি ঝাঁটপাট দিতে পারব না, কষ্ট করতে পারব না, খারাপ রান্না খেতে পারব না আগেই বলে দিচ্ছি।

দূর পাগল! তাকে কি আমি চিনি না ? আমরা কি খারাপ খাই ?

আরও একটা শর্ত আছে। মোটা মোটা ধর্মের বইগুলো পড়তে ভীষণ খটোমটো। আমি ওসবও পড়ব না।

তাকে কিছু করতে হবে না। চলে আয় তো! এ সপ্তাহেই আয়।

দূর বোকা! এত তাড়াতাড়ির কথা বলছি নাকি ? আমি আসব বুড়ো বয়সে, যখন দেখাশোনার কেউ থাকবে না, কথা বলার কেউ থাকবে না, তখন আসব।

পরমানন্দ খুব হাসল, তাই বল। ওস্তাদ এজ হোম হিসেবে এসে থাকবি তো! কিন্তু বুড়ো বয়স অবধি ইচ্ছেটা থাকবে না হয়তো।

না থাকলে আসব না। তবু একটা টেক তো রইল। দায়ে দক্ষায় আসা যাবে।

বাস্তবিকই তথাগত তথা পরমানন্দের আশ্রমের জন্য বেশ কিছু টাকা অযাচিতভাবেই দিয়ে রেখেছে হোমস্। এমনকি একটা অ্যাটাচড বাথগ্লা পাকা ঘর তার টাকাতেই করা হয়েছে দোতলায়। হোমস্ বলে রেখেছে, ওই ঘরটাই আমাকে দিবি।

পরমানন্দ হেসে কুটিপাটি হয়ে বলেছে, এরকম শর্তাধীন দান কি আসলে দান ? তুই টাকাই বা দিচ্ছিস কেন ? এমনি আয়, তোর জন্য জায়গা থাকবে।

এটা প্রায় এক বছর আগেকার কথা। তখন কিছুদিন হোমস্‌র খুব মানসিক নিঃসঙ্গতা চলছিল। তারপর আবার কাজকর্ম ইত্যাদি নিয়ে জড়িয়ে পড়ায় পরমানন্দের কাছে যাওয়া হয়নি। পরমানন্দকে তার কোনওদিনই পুরোপুরি সন্ধ্যাসী বৈরাগী বলে মনে হয় না। হতে পারে, সেও এক বিবাহভীত, সংসারভীত, ঝামেলাভীত, কম্পিটিশনভীত, পলায়নকামী মানুষ। সন্ধ্যাসীর ছদ্মবেশের ভিতরে, পরমানন্দের ভিতরে পালিয়ে আত্মগোপন করে আছে ভীষণ তথাগত। রামকৃষ্ণ মিশন ছেড়ে কেন যে আলাদা আশ্রম খুলল তারও কোনও সদুত্তর কখনও দেয়নি পরমানন্দ। হতে পারে, মিশনকে নয়, সন্ধ্যাসের ভাবটুকুই তার প্রয়োজন ছিল।

আজ সকালে আবার ডিপ্রেসনটা টের পাচ্ছে হোমস্। ছুটির দিন। শরতের এক চমৎকার সকাল। অথচ এক বুক অন্ধকার নিয়ে সে বসে আছে ডিনার টেবিলে। সামনে ইলেকট্রিক কেটলিতে তৈরি করা পাইপিং হট চা।

আজ কোথাও নেমস্তন্ন নেই। আজ বাড়িতেই থাকে বলে ফটিককে বাজারে পাঠিয়েছিল। ফটিক বাজার করে ফিরে এল একটু আগে। আন্ত মুগি এনেছে। যেদিন হোমস্ বাড়িতে যায় সেদিন ফটিকের একটু আছাদ হয়। কারণ সেও একটু ভালমন্দ খেতে পায় সেদিনটা। আজ ফটিকের আনন্দের দিন। কিন্তু হোমস্‌র নয়। এত অর্থহীন বেঁচে থাকার কোনও মানেই সে খুঁজে পাচ্ছে না।

আজ একবার পরমানন্দের কাছে গেলে কেমন হয় ? তার সন্ধ্যাসে ফাঁক থাকতে পারে, কিন্তু পরমানন্দ সব সময়ে একটা শুলির আবহাওয়ার মধ্যে থাকে। তাকে ঘিরে সব সময়েই কিছু লোক। বাচ্চা সন্ধ্যাসী, অর্ধা, প্রার্থী, নানা ধরনের মানুষ। সব সময়ে জীবনের একটা ধারার মধ্যে, নানা কাজের মধ্যে ডুবে থাকে পরমানন্দ। ব্যক্তিগত উন্নতি, সঞ্চয়, সম্মান নিয়ে কোনও বালাই নেই। নেশন নেই। পরমানন্দের কাছে বসে থাকতেও ভাল লাগে হোমস্‌র।

ফটিক মুগি কাটতে চিনে গেছে। নিঃশব্দে পোশাক পরে নেয় হোমস্। দরজায় তাল দিলে নিচে নেমে ফটিকের সামনে চাবিটা ফেলে দিয়ে বলে, আমার দেরি দেখলে খেয়ে নিও ফটিকদা, একটু বেরোচ্ছি।

ই বাবা! রাঁধতে বললে যে!

ফ্রিজে রেখে দিও।

এবেলা তবে খাবে না ?

ঠিক নেই। একটা জরুরি কাজের কথা মনে পড়ে গেল।

বেরোবার মুখেই বাধা পেল হোমস্। বেশ বড় বাধা। ফটক থেকে সিঁড়ি বেয়ে একতলার বারান্দায় উঠে আসছিল রশ্মি।

বেরোচ্ছিলেন! ইস! আর একটু হলেই আপনাকে মিস করতাম।

হেমাঙ্গ কেন যে খতমত খেয়ে গেল কে জানে! বলল, আসুন! আপনি তো কখনও আসেননি এ বাড়িতে!
রশ্মি মৃদু হেসে বলে, আসতে বলেছেন কখনও? ব্যাচেলর্স ডেন বলে কথা, তাই না? মেয়েদের বোধ হয় আসতে
নেই?

লজ্জা পেয়ে হেমাঙ্গ বলে, না, তা নয়। আসলে আপ্যায়ন করার মতো ব্যবস্থা নেই কিনা! ওপরে আসুন।
ও মা! আসব কি? আপনি যে বেরোচ্ছেন!

তেমন জরুরি কাজ কিছু নয়। এক বন্ধুর কাছে যাচ্ছিলাম।

তা হলে যান না! আমি এমনিই এসেছিলাম। আমার জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট মিস করার দরকার নেই।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট কিছু নেই। আমার বন্ধুটি এক সন্ধ্যাসী। যে কোনও সময়েই তার কাছে যাওয়া যায়।

সন্ধ্যাসী! হঠাৎ সাধুসঙ্গ করছেন যে বড়!

সাধু বলে নয়। বালাবন্ধু এক সঙ্গে পড়েছি।

তা হলে তিনিও তো ইয়ং ম্যান। এত অল্প বয়সে সন্ধ্যাসী কেন?

তা কে বলবে? আমার তো মনে হয় এসকপিষ্ট।

বেশির ভাগ মানুষই তো তাই। কত দূরে থাকেন তিনি?

বেশি দূর নয়। সোনারপুর। যাবেন?

রশ্মি অবাক হয়ে বলে, আমি! সন্ধ্যাসীরা তো নারীমুখ দেখেন না।

আমার বন্ধুর অত শুচিবায়ু নেই। ওর ইকুলে, তাঁতকলে কত মেয়ে পড়ে, শেখে।

দুর্কতে দেবেন তো, কিন্তু পাণ্ডা দেবেন না হয়তো।

চলুন না। আপনাকে পাণ্ডা না দিলে আমিও বসব না।

রিক্স কিন্তু আপনার। চলুন। গাড়ি বের করতে হবে না, আমি গাড়ি এনেছি।

অপ্তিন অফ ইংল্যান্ড গাড়ি আজকাল কলকাতায় দেখাই যায় না। কলকাতা ডেরে আছে একঘেয়ে অ্যান্ডাসাডার, মার্কুতি
আর প্রিমিয়ার গাড়িতে। গাড়ির ভিতরটা কিছু অন্ধকার এবং বিষণ্ণ। আজকালকার খোলামেলা ঝলমলে গাড়ি নয়। যেন
একটা গর্তের মতো অভ্যন্তর। তার ওপর কালো বা কালচে ধরনের চামড়ায় মোড়া সীট।

এ গাড়ি কোথায় পেলেন?

রশ্মি মৃদু হেসে বলে, অনেক পুরনো। বড় একটা বের করা হয় না। বাবা ইংল্যান্ড থেকে এনেছিল। মাইনটেনেন্সের
খরচ অনেক। একজন পুরনো মিস্ত্রি আছে, সে-ই সারিয়ে-টারিয়ে দেয়। তবে না চালালে ব্যাটারি ডাউন হয়ে যায়,
যন্ত্রপাতিতে মরচে ধরে। আজ বেরোবার সময় বাবা বলল, গাড়িটা একটু চালিয়ে নিয়ে এসো। তাই আজ এটা বের
করেছি। ভয় নেই, মাঝপথে ট্রাবল দেবে না। এটার নাম আমরা রেখেছি 'দি ওল্ড রিলায়েবল'।

বেশ গাড়ি।

আধুনিক নয়, এই যা। আপনার কি আজ মুড একটু অফ?

কেন বলুন তো!

গম্ভীর মনে হচ্ছে।

মুড অফ বলাটা ঠিক হবে না। আসলে...

আসলে?

আমার মাঝে মাঝে কেমন যেন সব কিছু মিনিংলেস লাগে। ঠিক বোঝাতে পারব না কেমন।

মিনিংলেস না লাগাটাই তো আশ্চর্যের!

তার মানে?

মিনিংলেসের কি মানে থাকে?

বলে রশ্মি একটু হাসল। মেয়েটা হাসলে রূপ যেন ফুলঝুরির মতো উপচে পড়ে। মাথার ওপর ছোট কনভেক্স
আয়নার মুখখানা দেখছিল হেমাঙ্গ। চারুদি খবর নিয়েছে। এর সঙ্গে তার বর্ষে মিল, বয়সে মিল। যোটক বিচারটা এখনও
হয়ে ওঠেনি। হাওয়া বুঝে ওটাও করা হবে। সম্ভবত মিলেও যবে। কথাটা হেমাঙ্গর মা ও বাবার কাছে পৌঁছে দিয়েছে
চারুদি। বাড়ি থেকে সবুজ সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, রশ্মির বাড়ি থেকেও আত্মহ দেখা গেছে। আর রশ্মি?
হেমাঙ্গ বুঝতে পারছে না বটে, কিন্তু অন্যরা বলছে, রশ্মিও নাকি রাজি। খুব রাজি। কিন্তু ওর কোনও ব্রীড়া নেই কেন?
ভাবী বর বলে যদি ধরে নিয়েও থাকে, তবে দেখা হলে কই লজ্জায় রাঙা হয় না তো! কিংবা চোখে একটা ঝলমলে ভাব
ফুটে ওঠে না তো! সে কি বিলেতবাস এবং অনেক পুরুষসঙ্গ করার ফল? হবেও বা!

রশ্মিকে তার কেমন লাগে? অনেক ভেবেছে হেমাঙ্গ। রশ্মি এক অদ্ভুত ভাল মেয়ে। কাছে এলেই তার ভাল লাগে।
কিন্তু এই মেয়েটির সঙ্গে তার নিরাবরণ ঘনিষ্ঠতা হবে, এই মেয়েটি তার সঙ্গে দিনরাত বসবাস করবে—ঠিক এরকমটা
কেন সে ভাবতে পারে না!

আপনার ডিপ্রেসনের কথাটা এবার একটু বলবেন?

হেমাঙ্গ কুণ্ঠিত হয়ে বলে, বলার মতো কিছু নয়। হয়তো ছেলেমানুষী।

হয়তো তা নয়। কে জানে: বলুন তো একটু শুনি।

আপনি কি সাইকিয়াট্রিস্ট?

নয় কেন? আমি সাইকোলজি নিয়ে পড়াশুনো করেছি। কাজও করেছি। আমার প্রিয় সাবজেক্ট।

ও বাবা, তা হলে তো আপনাকে বলা ঠিক হবে না। হয়তো আমার ভিতর সূক্ষ্ম পাগলামি ধরে ফেলবেন।

সূক্ষ্ম কেন, আপনার চারুদিদি তো বলে, আপনি খুব পাগল।

হয়তো তাই। বলে মান মুখে বসে থাকে হোমাস।
মুখে একটু চুক চুক করে আফসোসের শব্দ করে রশ্মি। তারপর বলে, আহা রে, কেমন দুঃখী মুখ করে বসে আছে দেখ! পাগল তো আমরা সবাই। কিছু কম, কিছু বেশি। আমি ডিপ্রেশনের কথাটা জানতে চাইছি। ওটা পাগলামি নয়।
বললাম তো, একটা অর্থহীনতা। মনে হয়, জীবনের আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল। সেটা জানাই হল না, কি ছাই শরীরসর্বশ্ব হয়ে বেঁচে থাকা।

রশ্মি একটু চুপ করে থেকে বলল, শরীর ছাড়া তো বাঁচাও যায় না। শরীর কি উপেক্ষার বস্তু?
তা নয়। কিন্তু শরীর ছাড়াও, এই অস্তিত্ব ছাড়াও যেন আরও কিছু ছিল। জানা হল না।
ঈশ্বর কি?

হতে পারে। আমার ঠাকুর-দেবতার বায়ু কিন্তু নেই।

আমার আবার একটু আছে। সে যাক গে। আপনার যখন মন খারাপ হয় তখন কী করেন?

কিছু না। চুপচাপ একা বসে থাকি।

শুনেছি, মন খারাপ হলেই আপনি অকাজের জিনিস কেনেন!

কে বলল?

যেই বলুক, কথাটা কি মিথ্যে?

লজ্জিত হোমাস বলে, আমার একটা বদ-অভ্যাস।

চারুদি আপনাকে খুব ভালবাসেন। আপনার সব কিছু ওঁর নখদর্পণে।

ও একটা স্পাই।

ভালবাসার জনের ওপর একটু গোয়েন্দাগিরি করতে হয় মাঝে মাঝে।

কেনাকাটা করা ছাড়া আর আমার কোনও বদ-অভ্যাস নেই। চারুদির অবশ্য নানা সন্দেহ আছে।

ব্যাচেলরদের সকলেই একটু সন্দেহ করে। ওটাকে গুরুত্ব না দিলেই হয়। কিন্তু আপনি এত জিনিসপত্র কেনেন কেন?
শুনেছি সেন্সর জিনিস আপনার কোনও কাজে লাগে না!

জিনিসপত্র কিনি সে কথা ঠিক। কিন্তু আমি খুব মেটেরিয়ালিস্ট নই।

সেটাও মনে হয়। ডিপ্রেশনটা আপনার কখন হয়?

তার কোনও ঠিক নেই। আজ ভোরবেলা হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে মনে হল, সব যেন শূন্যতায় ভরা।

আপনি নাকি কনফার্মড ব্যাচেলর?

হ্যাঁ। বিয়ে করাটাও এক অর্থহীন রিচুয়াল।

মেয়েদের ভয় পান?

বোধ হয় আমিও এসকেপিষ্ট।

আপনি আমাকেও ভয় পান না তো!

আপনাকে? না, আপনাকে নয়।

ঠিক বলছেন? প্রথম দিন কিন্তু খুব লজ্জা পাচ্ছিলেন আমার সামনে। খেতে অবধি পারেননি।

লজ্জা আর ভয় কি একই জিনিস?

ঠিক এক নয়। তবে লজ্জা আর ভয়ের মধ্যে একটা মিলও আছে।

কি রকম?

লজ্জাও এক রকমের ভয়। লজ্জার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকে, ইনফিরিয়রিটি থাকে।

আর কিছু নয়?

থাকতে পারে। লজ্জা জিনিসটা ইউনিভার্সাল নয়। যেমন নয় অভিমান।

হোমাস খানিকটা ভাবল। তারপর বলল, বোধ হয় ঠিকই বলেছেন। পশ্চিম দেশেও দূটি অনুভূতির খুব অভাব। কিন্তু আজ আপনি বড্ড মাষ্টারি করছেন। আমাকে নিয়ে ভাববেন না। আমার ডিপ্রেশন কয়েক দিনেই কেটে যায়।

কিন্তু আসে কেন? হাজার মানুষের হাজারো ডিপ্রেশন, তার আবার হাজার কারণ। আপনারটা কেন আসে? আপনার তো মানিটারি প্রবলেম নেই, ফ্যামিলি প্রবলেম নেই, জব স্ট্রেস নেই। তা হলে?

ওসব থাকলে বোধ হয় ডিপ্রেশনটা হত না। আমার মনে হয় জীবনে বাঁচার লড়াই করাটাও দরকার। তা হলে এইসব ফ্যান্সি জিনিসগুলো কেটে যায়।

তার কোনও মানে নেই। তবে আপনি সাইকোলজিক্যাল কেস নন।

তা হলে মনোরোগী নই?

রশ্মি হাসল। যাদবপুরের সক্রান্তায় ঢুকে সে গাড়ির স্পীড কমিয়ে সাবধানে চালাতে চালাতে বলল, আর বেশি কথা বলবেন না কিন্তু। আমি খুব নার্ভাস ড্রাইভার। কলকাতার রাস্তায় গাড়ি চালানো এক নাইটমেয়ার।

কষ্ট করে চালাচ্ছেন কেন? স্টিয়ারিং আমাকে দিন।

আপনার যে ডিপ্রেশন! বলে হাসে রশ্মি।

গাড়ি চালাতে ওটা বাধা নয়। গাড়ি চালিয়ে নেয় গাড়ি চালানোর অভ্যাস।

বেঁচে থাকাকাটাও কি ওরকমই এক অভ্যাস নয়?

রশ্মি গাড়ি দাঁড় করাল। সীট বদল করল। হোমাস নিপুণ হাতে গাড়িটা চালু করে বলল, বেশ গাড়ি। চালিয়ে আরাম।

রশ্মি তার উড়োখুঁড়ে চুল দু'হাতে পাট করতে করতে বলল, জীবনটাও ঠিক ওরকম। চালাতে পারলে আরাম। শুধু স্টিয়ারিংটা আর কারও হাতে দিতে হয়।

রশ্মি খুব হাসছে। হেমাঙ্গ ততটা হাসতে পারছে না; সে হাসছে কৃত্রিম হাসি, সঙ্গ দিতে।

পরমানন্দের ঠেক-এ পৌছানোর পর সে হাঁফ ছাড়ল।

প্রায় বিধা চারেক জমি আর একটা ছোটো পুকুর নিয়ে পরমানন্দ তার শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সজ্জ গড়ে তুলেছে। একা হাতে। বিস্তর গাছপালা, ফুল আর সবুজ ঘাসে তৈরি করেছে এক মায়ার রাজ্য। তারই ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটা কুটির, একটা দোতলা বাড়ি আর একটা টিনের শেড-এ ল্যাবরেটরি।

পরমানন্দ রবিবার মঠে যায়। বেলুড়ে। সেটা খেয়াল রাখেনি হেমাঙ্গ। তবে পরমানন্দের অনুগত ভরুণ আর এক সন্ন্যাসী প্রেমানন্দ এসে আদর করে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। পাখা খুলে দিল। বলল, চা না কফি?

আশ্রমে চা কফি অফার করা হয় বুঝি? ঠাকুরকেও চা বা কফি ভোগ দেন তো?

রশ্মির এই প্রশ্নে প্রেমানন্দ একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, না, তা দিই না। তবে খাওয়ার আগে নিবেদন করে নিই।

রশ্মি খুব হাসি-মুখে বলে, তবু ভাল যে চা কফির চেয়ে কড়া নেশা নেই। থাকলে ঠাকুরের বিপদ ছিল, তাই না?

প্রেমানন্দ একটু লজ্জা পেল। বলল, তা হলে খাবেন না?

খাবো না কেন?

প্রেমানন্দ তড়িঘড়ি চলে গেল সামনে থেকে। পালাতে পারলে বাঁচে।

হেমাঙ্গ রশ্মির দিকে চেয়ে বলল, পারেনও বটে আপনি। এসব ধর্মকর্ম বোধ হয় আপনার ভাল লাগে না?

লাগবে না কেন? আমি একটু ধর্মও করি। আমার খরাপ লাগছে না তো!

তা হলে ওভাবে বললেন যে!

একটু মজা করলাম। কিন্তু আপনি এখানে কেন আসেন বলুন তো! ধর্ম করতে?

না। তবে হয়তো একদিন এখানেই এসে পার্মানেন্টলি থাকব।

ওমা! কেন?

কোথায় আর যাবো?

এ জায়গাটা কি খুব ভাল?

খরাপ তো নয়!

রশ্মি খুব হাসতে লাগল। হাসলে মেয়েটাকে এত ভাল দেখায়! তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে হেমাঙ্গর দিকে চেয়ে বলল, আপনার খুব মৃত্যুভয়? না?

॥ ৪৬ ॥

মাঝরাতে যখন সন্তর্পণে দরজাটি খুলল নিমাই তখন তার চোখভরা জল। এত জল যে, চোখে কিছু ঠাঠর করার উপায় নেই। তার ওপর কুয়াশা বড় জমাট। তেমনি জমাট অন্ধকার। সব মেনে গলাগলি করে এসে দাঁড়িয়েছে আজ এক সঙ্গে। ঘরে একটা লণ্ঠন জ্বলছে টিমিয়ে। বিছানায় বীণাপাণি কেমন একটু এলোমেলো হয়ে শুয়ে। নিমাই আজ ওই বিছানায় শোয়নি। জলচৌকিতে বসে রইল। কত মশা কামড়েছে তাকে সে টেরও পায়নি আজ। মনের জ্বালা এবল হলে শরীরের জ্বালা ডুবে যায়। এই যে বীণাপাণি তাকে বিদেয় দিল, আর কি কখনও ফিরে আসতে পারবে নিমাই? আর হয়তো দেখাই হবে না, ক'টা বিলিতি টাকার জন্য এতকালের একটা সম্পর্ক ভেঙে দিতে বীণার বাধল না! দুনিয়াটা এই রকম করেছে একটু একটু চিনতে হবে তাকে।

এক ধাপ মোটে সিঁড়ি, তার পরই উঠোন। অন্ধের মতোই আন্দাজে সিঁড়িতে পা রাখল নিমাই। দু' চোখে আজ যেন বান ডেকেছে। বুকটা বড় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে। বড় অভিমান হচ্ছে তার। বড় অপমানও লাগছে। বড় দুঃখ হচ্ছে। দরজাটা খুব চুপিসাড়ে, বিনা শব্দে ভেজিয়ে দিল নিমাই। ঘুমোও গো, মনের সুখে ঘুমোও। এইরকমধারা একদিন বিষ্ণুপ্রিয়াকে রেখে নিমাই সন্ন্যাস নিয়েছিল। সে কত সুখের ছেড়ে-যাওয়া। আর এ নিমাইয়ের যাচ্ছে তার বড় অনাদর। বড় গল্পনা।

উঠোনে পা ফেলতেই পায়ের তলা থেকে কী যেন একটা হড়কে সরে গেল সড়াৎ করে। সাপখোপ নেই এখানে? থাকলে দিক না ঠেক। ল্যাটা চুকে যাক। মরা মুখটা দেখুক বীণাপাণি। বৃকে পড়ে কাঁদুক।

কিন্তু মানুষের মনের মতো করে কবে কি ঘটবে? সাপও যদি হয়ে থাকে সে ব্যাটাচ্ছেলেও কামড়াল না নিমাইকে। পালাল। চোখের জলটা গামছা দিয়ে চেপে মুছল নিমাই। সামনেটা বড় আঁধার। কুয়াশা এত চেপে বসেছে যে, হাতখানেকের বেশী নজর যায় না। কোনদিকে যে আগুড়, রাস্তা যেকোন দিকে তা বুঝে ওঠা মুশকিল। রাত আর একটু কাবার করে বেরোলে হত।

একটা কুকুর হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠল কোথা থেকে। বাড়ির কুকুরই হবে। কামড়ায় যদি তো কামড়াক। নিমাইয়ের আর ভয় কিসে?

কুয়াশা বটে তবে ঠাণ্ডা তেমন নেই। একটু সিরসিরে ভাব আছে। টপ টপ করে বেশ বড় বড় ফোঁটায় শিশির পড়ছে গাছপালায়। শিউলির গন্ধ ছেড়েছে খুব।

তাদের একখানা মাত্র টর্চ আছে। সেটা সঙ্গে নিলে নিমাইয়ের একটু সুবিধে হত। কিন্তু বীণাপাণির টর্চ বীণাপাণির জন্যই রেখে এসেছে সে। বনগাঁর বাড়িতে তার সুটকেসখানা আছে। টিনের সস্তা জিনিস। কয়েকখানা মোটে জামাকাপড়। সেটারও আর কোনও দরকার নেই তার। মায়ী বাড়িয়ে লাভ কি?

দোকান-টোকানের কথা ভেবে আর লাভ নেই। নিমাই জানে, এখন কিছুদিন তাকে গতর খাটিয়ে বেতে হবে। যোগালির কাজ হোক, মাটি কাটার কাজ হোক, ছুতোয়ার কাজ হোক, বেড়া বাঁধার কাজ হোক, কিছু না-কিছু জুটেই যায়।

পরিশ্রমের কাজটা এখনও খুব একটা পেরে ওঠে না নিমাই। তবে গতর পুষে রাখলে তো আর চলবে না! পেটটা তার একার নয়, পালপাড়ায় দুটো অসহায় বুড়োবুড়ি আছে। বীণাপাণির কাছে নিমাই যদি ত্যাগ হয়ে থাকে তবে তারাও তো ত্যাগ হল!

মাঝ-উঠানে দাঁড়িয়ে নিমাই দিক ঠাঠর করার চেষ্টা করছে। আঙ-পিছু, বাঁ-ডান সব সমান। কোন দিকে গেলে পথে পড়া যাবে বুঝতে পারছে না।

একটা ক্ষীণ ম্যাডাটে আলো হঠাৎ এসে নিমাইকে চমকে দিয়ে তার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল। ব্যাটারি ক্ষীণ, তবু একটু আলো তো! কুয়াশা ফুড়ে আসতে খুব কষ্ট হয়েছে আলোটার। নির্জীব হয়ে পড়েছে এইটুকু ধকলেই।

খুব চাপা একটা গলা শোনা গেল, কে?

শুভরমশাই! নিমাই একবার ভাবল, জবাব না দিয়ে চলে যাবে। আবার গুরুজন বলে অবহেলাও করতে পারল না।

ক্ষীণ গলায় বলল, আমি নিমাই।

অ। পেছাপ করবে নাকি? ওই বাঁ দিকে কচুবনের দিকে গিয়ে সেরে এসো।

আজ্ঞে, ঘুম আসছিল না বলে এই একটু বেরিয়েছি।

বাতি নিয়ে বেরোতে হয়। ঘরে লঠন রাখেনি?

আজ্ঞে আছে।

ঘুম আসছে না কেন?

বায়ুটা চড়েছে বোধ হয়।

এ সময়টায় হিম পড়ে। এসো, বারান্দায় উঠে এসো।

নিমাই ইতস্তত করল একটু। বসটা ঠিক হবে কি? বেরোনোর মুখে এ একটা বাধাই পড়ল কি?

কিন্তু বুড়ো মানুষটাকে এড়িয়ে যায়ই বা কি করে নিমাই? বরং একটু বসেই যাবে সে। রাতটা একটু পাতলা হোক।

নিমাই নিঃশব্দে বারান্দায় উঠলে বিষ্ণুপদ টর্চটা জ্বেলে একটা মোড়া দেখিয়ে দিয়ে বলল, বোসো বাবা।

আপনি ঘুমোননি?

বুড়ো বয়সের ঘুমের কোনও ঠিক নেই। একদিন পেলায় ঘুম হল, তো আর একদিন একেবারেই হল না।

চারদিকে অন্ধকারে সাদা কুয়াশা। যেন দুধসাগরে ডুব দিয়ে আছে সব কিছু। নিমাই চুপ করে বসে রইল।

বিষ্ণুপদ মৃদু গলায় বলল, আজ আবার সেই স্বপ্নটা দেখলাম। সেই যে ঘুমটা চটকে গেল আর এল না।

দৃঃস্বপ্ন নাকি?

খারাপই। তবে এই বয়সে আর কতই বা খারাপ হবে! কিন্তু বড় ভয় খাইয়ে দেয়। কালঘড়ি আমার ঠাকুরদাঁও দেখেছিল কিনা!

কালঘড়ি? সে আবার কী জিনিস?

বিষ্ণুপদ ব্যাখ্যাতর গলায় বসে, ঘড়ির বৃত্তান্তটাও আবৃত্ত। জন্নো ঘড়ি নিয়ে কারবার করিনি বাবা। গা-গজের লোক আমরা, ঘড়ি লাগে কিসে? তবু যে কেন দেখি! সে তো ছোটখাটো জিনিস নয়। আকাশজোড়া মস্ত একটা ঘড়ি। যেন কুলকিনারা নেই তার। একটা বড় কাঁটা, আর একটা ছোট কাঁটা, তা তাও যেন আকাশে এ-মুড়ো ও-মুড়ো জুড়ে। কাঁটা দুটো এগুচ্ছে। বুঝলে! এগুচ্ছে।

নিমাই কিছু বুঝল না। তবে কিছু বলতে হয় বলে বলল, তা স্বপ্ন কত রকমেরই তো হয়।

তা হয়। তবে আমার ঠাকুরদাঁ এই স্বপ্নটা দেখার পর আর বাঁচেননি। এ বংশে ওটা একটা ব্যাপার বলতে পার।

কালঘড়ি মানেই, হয়ে এল।

নিমাই এবার একটু ভাবিত হয়ে বলে, তবে তো মুশকিল।

গরতে তো তৈরিই আছে। তবে মরার আগেও কিছু ভাবনা-চিন্তা থাকে।

মরার কথা ভাবছেন কান?

মরার কথা ভাবি না। ওটা ভাবনার বিষয়ই নয়। কথা কী জান? মরার সময় এলে মানুষের মনের মধ্যে একটা ত্যাগহুড়ো পড়ে যায়। যেমন পাড়ি ধরার সময় মানুষের হয়, কোন পৌলটো পড়ে রইল, কোনটা নেওয়া হল না, ছেলেপুলেগুলো সব উঠতে পারল কিনা, কুলির ভাড়া বেশী দেওয়া হল কিনা। বুঝেছে ব্যাপারটা? মরার সময়ও মানুষের ওরকমই হয়। কোনটা করা হল, কোনটা বাকি রইল। বুঝলে ব্যাপারখানা? এই মাঝরাত্তির বসে সেই সবই ভাবছি।

যে আজ্ঞে, বুঝেছি।

ঘুম আসছে না বলে ভাবনা নেই। সামনে লম্বা ঘুম। সে ঘুম এলে সব কৃপিত বায়ু একেবারে ঠাণ্ড। তাই জেগে বসে মশা ভাড়াঙ্কি।

কথাটা ঠিকই বলেছেন। ভাবনারও যেন শেষ নেই। একটা যায় তো আর একটা আসে।

তুমি বুঝদার মানুষ। এই ভাবনা-চিন্তার কথাটা লোককে বোঝাতে পারি না। কত কি ভাববার আছে বলা তো দুনিয়ায়?

তা বটে।

ক'দিন আগেও এক রাত্তিরে কালঘড়ির স্বপ্ন দেখেছিলাম। সেই থেকে মাথাটা খুব বেগোছ হয়ে গেল। তোমার শাওড়ি তো কাঁদাকাটাও শুরু করেছিলেন। কালঘড়ির লক্ষণটা সুবিধের নয় ঠিকই। তবে কী জানো, ওই মরার ভাবনাটা আছে বলেই মানুষ ভাবনা-চিন্তাটা অন্তর করে।

কিন্তু আপনার আর চিন্তাটা কিসের বলুন! রামুদাদা বুক দিয়ে আগলে রেখেছে, অমন পিতৃ-মাতৃভক্ত ছেলে দেখা যায় না। বড়দাদাও—বলতে নেই—মস্ত কেওকেটা মানুষ। ভাতকাপড়ের কষ্টটাও তেমন নয়। পালপাড়ায় আমার মা-বাবার অবস্থাটা যদি এমন হত তা হলেও ভাবনার কিছু ছিল না।

বিষ্ণুপদ গলাটা আরও খাদে নামিয়ে বলল, তারা আছেন এখনও ?

আছেন আজ্ঞে ।

দু'জনেই ?

দু'জনেই ।

তুমি তো ভাগ্যবান বাবা । যত পারো বাঁচিয়ে রেখো । ওঁরা মহাশয় ।

দুধ-মাখানো অন্ধকারের দিকে চেয়ে নিমাই মিহিন গলায় বলল, ভাগ্য কি আর ওঁরা করে এসেছেন ? বুড়ো বয়সটায় বড় কষ্ট যাচ্ছে । আমার অসুখের সময় ক'বিঘে জমি বিক্রি হয়ে গেল । এখন হাড়ির হাল । আমার যা হোক, ওঁরা কষ্ট পেলে বড় কষ্ট হয় আমার ।

তোমরা কি কষ্টে আছ বাবা ? কই, বীণার চেহারা দেখে তো মনে হয় না ।

নিমাই একটু ফাঁপরে পড়ে যায় । আমতা আমতা করে বলে, কষ্টও বটে, আবার তেমন কষ্ট নয়ও বটে ।

মানোটা কি হল ?

আমাদের মতো মানুষের তো পায়ের নিচে ডাঙা জমি থাকে না । এর-ওর দয়ায় বেঁচে থাকা ।

এ কথাটারও মানে বুঝছি না । খোলসা হও বাবা । কাকা না কে যেন একটা লোকের কথা শুনেছি । সে কেমন লোক ?

সে আমাদের ভগবান । অসময়ে বড় দেখেছে আমাদের আজও দেখে । কিন্তু কপালটাই আমাদের নিমকহারাম ।

কেন বাবা, কপালের দোষটা কী হল ?

নিমাই ফের ফাঁপরে পড়ল । তারপর মৃদুস্বরে বলল, সে অনেক কথা । আপনাকে বলতে পারব না ।

বিষ্ণুপদ একটা শ্বাস ছেড়ে কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে, আমি এখন গাছপালার মতো হয়ে গেছি । ইট-পাথরের মতো । যখন কওয়ার লোক পাবে না আমার কাছে বোলো । বুদ্ধি পাবে না বটে, কিন্তু বুক হালকা হবে ।

যে আজ্ঞে । কথাটা মনে থাকবে ।

তোমাকে আমি বীণার জন্য বেছেছিলাম কেন জানো ?

নিমাই লজ্জা পেয়ে বলে, জানি ।

বিষ্ণুপদ নিবিড় গলায় বলে, তোমার মুখে চোখে একটা কিছু ছিল । কত ভুল দেখি আমরা, ভুল বুঝি । তবু মনে হয়েছিল, নিমাইয়ের মধ্যে ভক্তি আছে । গরিব হোক কি যাই হোক, ভক্তিতে কম কথা নয় ।

আমাকে আর লজ্জায় ফেলবেন না । ওসব শুনলেও পাপ হয় । এ যুগে ভক্তির কীই বা দাম বলুন !

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, দাম নেই । ভক্তি বিশ্বাস সব তামাদি টাকা । চলে না । তা আমার দেখবার চোখটিও যে পুরনো, সেও তামাদি । এ যুগের চশমা ধার পেলে অন্যভাবে দেখার চেষ্টা করতাম ।

নিমাই বিনীতভাবে চুপ করে থাকে ।

বিষ্ণুপদ বলে, গরিব মানুষ আমরা, বরাবর হা-ভাত জো-ভাত করে কেটেছে । তার ওপর ভিটেমাটি ছেড়ে এই ভিনদেশে এসে হাড়িড়ে পড়ে আরও খারাপ হাল হল । আমার ছেলেমেয়েরা সব দোঁতে কুটো দিয়ে বড় হয়েছে । কষ্ট করারই ধাত । তাই ভেবেছিলাম গরিবঘরে মেয়ে গেলে আর নতুন কষ্ট কিসের ? পয়মন্ত হলে, ধার্মিক লোকের ঘর করলে ভালই থাকবে ।

যে আজ্ঞে ।

এখন দেখছি গোটা অঙ্কটাই ভুল হয়েছিল । কিন্তু এ অঙ্ক তো আর ফিরে কষা যায় না । দেখছি, তোমরা ভাল নেই । কেন নেই বাবা ?

নিমাই গলাটা একটু সাফ করার চেষ্টা করে । কিন্তু ফের তার চোখ ভরে জল এসেছে । গলায় আটকে আছে শুকনো ভাতের ডেলার মতো কান্নার গিট । তার সময় লাগল ।

আজ্ঞে, দোষটা তো আপনারও, আমারও । বীণা বোধ হয় আরও একটু ভাল পাত্র চেয়েছিল । আমাকে বাছা আপনার ঠিক হয়নি ।

সে সবই তো ভাবি বাবা । ঠিক বৈঠক মিলেমিশে এমন গোলমালে ফেলে দেয় । বীণা আমার কাছে কী একটা গম্ভীর রাখতে চায়, সেও বলে না কী, তুমিও কবুল করো না । মনে হয়, জিনিসটা খুব সাদা জিনিস নয় । একটু ভয়-ভীতির ব্যাপারও আছে ।

আজ্ঞে আছে ।

বিষ্ণুপদ একটু চুপ করে থেকে বলে, সেই জন্যই তোমাদের আসা ?

বীণা জানে ।

আমি জিনিসটা রাখব না বাবা । তোমার ভয় নেই । তোমার মুখ দেখেই বুকেছি, জিনিসটা ধর্মের জিনিস নয় । হক্কেরও নয় ।

আপনি বড় জ্ঞানী মানুষ ।

বিষ্ণুপদ একটু হাসল, তোমার শাশুড়ি ঠাকরুণেরও তাই বিশ্বাস । আমি নাকি একটা জ্ঞানী । কী যে সব বলো তোমরা মাথামুণ্ড !

বই-পড়া জ্ঞানের কথা বলিনি আজ্ঞে । কাণ্ডকাণ্ডজ্ঞানের কথা বলছিলাম ।

তাহলে ধরেছি ঠিক ?

যে আজ্ঞে ।

বড় শীত করছে আমার । তুমি বরং একটু মুড়িসুড়ি দিয়ে বোসো । এ সময়টা বড় ঠাণ্ডা লেগে যায় । তোমার বুকটাতো আবার কমজোরি ।

ঠাণ্ডা লাগছে না তেমন। ঠিক আছে।

তোমরা থাকবে ক'দিন?

নিমাই ঘাড় হেঁট করল। মিনমিন করে বলল, বীণা বোধ হয় কয়েক দিন থাকবে।

তুমি?

আমি সকালেই যাচ্ছি।

কাজকর্ম যখন নেই, তখন যাবেই বা কোথায়?

ছোটখাটো কাজের আশা আছে। বসে থাকলে চলবে না।

বীণা কি তোমার সঙ্গে খরাপ ব্যবহার করে?

তটস্থ হয়ে নিমাই বলে, আজে না তো? ও কথা কেন বললেন?

বিষ্ণুপদ ফের একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বলে, বউ যখন রোজগার করে তখন তার দারোগার মেজাজ হয়।

নিমাই ফের মিনমিন করে বলে, সেরকম কিছু নয়।

বিষ্ণুপদ একটু হেসে বলে, কেন দারোগার মতো মেজাজ হয় জানো?

আজে না।

মেয়েদের তো রোজগার করার কথা নয়। করেওনি কোনওদিন। হঠাৎ আজকাল তাদের আয় হতে শুরু করেছে।

তাই বড় দৈমাক হয়।

নিমাই শুকনো একটু হাসল। কিছু বলল না।

বিষ্ণুপদ খুব দূরের গলায় বলে, তার ওপর যাত্রাপাটি। সে বড় খরাপ জিনিস। অন্য সব ধরাছি না। ওই যে ক্ল্যাপ পায়, আলো-বাজনা, হাজার জনের চোখের সামনে নিজেকে জাহির করা, ওর একটা অহংকার আছে। বড় দৈমাক হয়।

তখন মাটিতে পা পড়তে চায় না, মানুষকে মানুষ বলে মনে করতে ইচ্ছে হয় না। যাত্রা তো একটা মিথ্যে মায়ার জগৎ।

যে আজে।

বীণাপাণি নিজেও কষ্ট পাবে। তোমাকেও দেবে।

নিমাই আবার চুপ। বুকের মধ্যে কান্নাটা ধাক্কা দিচ্ছে, উথলে আসতে চাইছে বমির মতো।

শোনো বাবা, আমি চোখে ভাল দেখতে পাই না। কিন্তু কানে ভালই শুনি।

নিমাই শঙ্কিত হয়ে পড়ল। কথাটার মানে কি? কী শুনেছেন উনি?

বিষ্ণুপদ মৃদুস্বরে বলে, যখন দরজা খুলে তুমি বেরোচ্ছিলে তখন আমি একটা কান্নার মতো শব্দ শুনেছিলাম। ভুল নয় তো!

নিমাই চুপ করে থাকে।

বিষ্ণুপদ অনেকক্ষণ কিছু বলল না। বুম হয়ে বসে রইল। তারপর বলল, কান্না জিনিসটা পুরুষ মানুষের বড় সহজে আসে না বাবা।

নিমাই বুড়ো মানুষটির দিকে অন্ধকারে জলভরা চোখে চেয়ে রইল। তারপর কাঁপা গলায় বলল, বীণার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল বাবা। আমি যাচ্ছি।

বিষ্ণুপদ একটু নড়ল। জলচৌকিতে অসমান পায়ায় একটা শব্দ হল, ঢক।

বিষ্ণুপদ ব্যাপার জড়ানো মাথটা নেড়ে বলে, বুঝছি বাবা। ছেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু দিয়ে যাচ্ছে কাকে?

সে তো জানি না। বীণা বুঝবে।

ও কি বোঝে? বুঝলে আর কথা ছিল কি?

আমার বড় অপমান হচ্ছে। বীণা চাইছে না।

বিষ্ণুপদ আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, আমার নৌকা তো খাট ছাড়ার মুখে। ভাল মন্দ কিছু বুঝেও উঠতে পারলাম না। তবে বলি, তুমি বড় সচ্চরিত্রের ছেলে। সৎ থাকা বড় কঠিন।

নিমাই দু'হাতে মুখ ঢেকেছে। চোখ ভেসে যাচ্ছে জলে। অপরূপ ফোঁপানি উঠে আসছে গলায়। কুকুরটা হঠাৎ এ সময়ে খেঁকিয়ে উঠল দু'বার।

দুনিয়া তার নিজের নিয়মে চলবে। কত লোক কত কী করে বেড়াচ্ছে। কে কার কড়ি ধারে? আমি কি পারি দুনিয়ার সব কিছু নিজের মতো ঘটিয়ে তুলতে? আমি তা করার কে?

এ কথার জবাব হয় না। জবাব দেওয়ার মতো অবস্থাও নয় নিমাইয়ের। সে কাঁদছে। বিষ্ণুপদ একটা হাত বাড়াল তার দিকে। কাঁপা-কাঁপা দুর্বল হাত। হোঁওয়ার চেষ্টা করল তাকে। নাগাল পেল না। হাতটা ফের সরিয়ে নিল বিষ্ণুপদ।

নিমাইয়ের কান্না থামল হেঁচকি উঠে যাওয়ার পর। নিজেকে বড় যেদা হতে থাকে নিমাইয়ের। সে বড় দুর্বল। তার মনের কিছুমাত্র জোর নেই। বীণাপাণি কি সাথে তাকে ম্যাদাটে পুরুষ বলে হ্যাটা করে? করাই উচিত।

বিষ্ণুপদ গলা খাঁকারি দিল খুব সন্তপণে। তারপর বলল, একটু জল খাবে বাবা?

আজে না।

তোমার জন্য আমার যদি কিছু করার থাকত তো করতাম। কিন্তু আমি এখন দুনিয়ার বার। কিছু করতে পারি না, হাত পা কোলে নিয়ে বসে বসে নেমি। চোখের সামনে কত কী হয়ে যায়। আগে মনে হত এটা ভাল হল না, ওটা ঠিক হল না। আজকাল ভাবি, বিচার করার আমি কে? আমার কি অত জ্ঞান বা বুদ্ধি আছে? দুনিয়াটা কি আমি চিনি? লোকে যা করছে করুক। ভাল মন্দ তারা বুঝবে।

নিমাই কান্নার পর অবসাদ নিয়ে বসে আছে। শ্বশুরমশাইকে তার কোনওদিন খরাপ লাগে না। একটু আলগা মানুষ, কিন্তু বড় মিঠে মোলায়েম। কোনও উগ্রতা নেই। পৃথিবীতে চারদিকে বড় শক্ত শক্ত মানুষ। যেন তাদের কাঁটাওলা গা, জিবে দাঁতে ধার, চোখে যেন খুনির দৃষ্টি।

মাঝরাগিরে কোথায় যাচ্ছিলে বাবা ?
 আজে, রওনা দিচ্ছিলাম ।
 এই মাঝরাগিরে অন্ধকারে ?
 মাঝরাতেই ভাল সবাই জেগে গেলে নানা কথা উঠবে, জিজ্ঞাসাবাদ হবে, বাধা পড়বে ।
 তা ঠিক । তবে এখনও রাত মেলা আছে । একটু বসে যাও ।
 শ্বশুরমশাইয়ের দিকে চেয়ে দেখল নিমাই । অন্ধকারের মধ্যে কালো একটা অবয়ব মাত্র । মুখের ভাব তো বোঝা যায় না । লোকটার খুব মায়া আছে তার প্রতি । নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ঠিক আছে ।
 বিষ্ণুপদ আর একটু ঝিম মেরে থেকে বলে, বীণা বনগীয়ে থাকতে চায় না কেন বলো তো ? সে কি ওই জিনিসটার জন্যই ?
 আজে হ্যাঁ ।
 ওখানে কি ওর অনেক শত্রু ?
 কে জানে! ও ভয় পাচ্ছে ।
 তুমি পাও না ?
 না আজে । আমার আর ভয় কিসের ? পরের ধন নিয়ে তো বসে থাকিনি ।
 বীণার ভয় থাকলে তোমারও হয়তো আছে ।
 আজে সেরকম ভয়ের কিছু আছে বলে তো মনে হয় না । আজকালকে কি না করছে বলুন । চুরিধারি, খুনখারাপি সব করেই দিবি্য বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে । কে কার বিচার করবে ?
 তা বটে ।
 তাই বলছি, সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে বীণারও ভয় নেই । তবু যদি ভয় খায় তো কিছু করার নেই ।
 তোমাকে কি বীণা ত্যাগ দিয়েছে ?
 নিমাই লজ্জিত হয়ে বলে, একরকম তাই ।
 কি জন্য ?
 ও ভাবছে ওর টাকার বাড়িলের কথা আমি চাউর করে দেব । দুর্বল মানুষ, আমার পেটে কথা থাকে না । তাই ।
 এ বড় অদ্ভুত কথা!
 নিমাই চুপ করে থাকে ।
 বিষ্ণুপদ বলে, কত টাকা হবে ? লাখো লাখো নয়তো!
 আজে আমি জানি না । বিলিতি টাকা, হিসেব বড় খটোমটো । তবে মনে হয় বেশ মোটা টাকাই হবে । কথাটা বলে ফেললাম, হয়তো বীণা শুনলে রাগ করবে । তা করুক, আপনকে জানানো উচিত বলে মনে হল ।
 বিষ্ণুপদ একটু চুপ করে থেকে বলে, আমারও একটা আশঙ্কা ছিল । তুমি কিছু শুয় কথা ফাঁস করেনি । কেউ গম্ভীর রেখেছিল ?
 যে আজে । সে খুন হয়েছে । ওয়ারিশান নেই । ওই টাকার জন্য পরে আরও খুনখারাপি হয় । অনেক কাণ্ড ।
 টাকার জন্য তোমাকে ছাড়ছে বীণা!
 যে আজে । আমিও আর পেরে উঠছি না । মনটা বড্ড ভার হয়ে আছে ।
 বিষ্ণুপদ হঠাৎ টর্টটা একটু জ্বালল । তারপর নিরাসক্ত গলায় বলে, চলো, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি একটু ।
 এগিয়ে দেবেন ? বলে অবাক হয়ে নিমাই অবয়বটার দিকে চায় ।
 এগিয়ে দিই । পথটা অন্ধকার, তুমি হয়তো ঝুঁজেও পাবে না । চলো ।
 নিমাই উঠে পড়ে । বলে, আপনাকে যেতে হবে না । আমি পারব ।
 তুমি বুঝবে না বাবা । বীণার জীবনে তোমাকে তো আমিই এনেছিলাম । আজ ফের তোমাকে বিদায় দেওয়াও আমার একটা কর্তব্য । বোধন করলাম আর বিসর্জন দেবো না ? চলো ।
 চোখে জল এল নিমাইয়ের । নিচু হয়ে সে হঠাৎ একটা প্রণাম করল বিষ্ণুপদকে । তারপর বলল, চলুন তাহলে ।
 মান টর্টের আলোয় কুয়াশা আর অন্ধকারে একটা অনির্দিষ্ট পথেরেখা ধরে দু'জনে পাশাপাশি এগোতে লাগল । মন্ডুর পা । মুখে কথা নেই ।

॥ ৪৭ ॥

প্রফেসর শর্মা তার কটেজের পলকা দরজাটা বারকয়েক টেনে এবং ঠেলে দেখে নিয়ে কৃষ্ণজীবনের দিকে চেয়ে বললেন, ইউ থিংক ইট ইজ সেফ ?
 কৃষ্ণজীবন মৃদু হেসেছিল । জবাবে বলেছিল, বাইরে একটা ফ্লাডলাইট সারা রাত জ্বলে । বন্যজন্তুরা আসে না আলো দেখলে ।

শর্মা সমুদ্র হননি । জু কুঁচকেই ছিল ।
 এখানকার জঙ্গলমুখী নিরালা কটেজ মোটেই খুশি করেনি ডঃ পটেলকেও । লনে পাতা বেতের চেয়ারে বসে পাইপ টানতে টানতে বললেন, ইট সিমস্ এ হস্টেড প্লেস । ইট গিভস্ মি শিভারস্ ।
 ডঃ স্বামী ধার্মিক বিজ্ঞানী । তিনি কোনও মন্তব্য করেননি । কিন্তু এই প্রাচীন নির্জন জঙ্গলের মাঝমধ্যখানে তৈরি হোয়াইট টাইগার লজকে তাঁরও বিশেষ পছন্দ হচ্ছিল না । তিনি বিরক্তিমাত্রা মুখে পাঁচচারি করছিলেন লনে ।

মধ্যপ্রদেশ সরকারের যে-টুরিস্ট অফিসারটি তাঁদের সঙ্গে এসেছেন, তিনি কৃষ্ণজীবনকে একবার গাড়ির মাথায় বলেছিলেন, টোয়েন্টি সিগ্ন টাইগারস—ইয়েস, বাট নো ম্যান-ইটারস।

জঙ্গলের নিবিড়তা আর নির্জনতা মুগ্ধ করেছে শুধু কৃষ্ণজীবনকেই। লোকালয় ছাড়িয়ে অনেকটা ভিতরে ঢুকে তবে এই লজ। ছড়ানো ছিটানো ডিটাচড এক একটা কটেজ। পিঠোপিঠি দুটি করে ঘর। কৃষ্ণজীবনের ভাগ্যে জুটেছে সবচেয়ে দূরবর্তী ঘরখানা। মুখোমুখি জঙ্গল। তাত সে খুব খুশি। যদিও সরকারি অফিসারটি তাকে চুপি চুপি বলেছিল যে বান্ধবগড় জঙ্গলের বাঘেরা প্রায়ই লজের ভিতর দিয়ে যাওয়াত করে।

জঙ্গলপুরে সরকার আয়োজিত সেমিনারটি ছিল পৃথিবী জুড়ে এরকম হাজার হাজার নিষ্কর্মা সেমিনারের একটি। আলোচনা হয়, কাজের কাজ কিছুই হয় না। যাতায়াত ভাড়া, ফি বাবাদ কিছু টাকা আর ফাউন্ডার মধ্যে একটু দেশভ্রমণ। কৃষ্ণজীবন এসব সেমিনারে যাওয়া একদিন ছেড়ে দেবে। আপাতত ছাড়েনি। কারণ সেমিনারগুলি কেন অসাড় ও নিষ্ফল। সেটাও তার ভালভাবে জানা দরকার। মাঝবয়েসী বা বৃদ্ধ, সফল ও সুখী, প্রতিষ্ঠিত ও পরিবার-বংশল বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে যে আর নতুন দিগন্তের তালা খোলা যাবে না সেটা সে যেমন বোঝে তেমন কি বোঝে সরকার বা প্রশাসন? এঁদের মাথা আছে কিন্তু দেশ বা পৃথিবীর জন্য তেমন মাথাব্যথা নেই। কিছু সুখসুবিধা ও প্রতিষ্ঠার মধ্যে এঁরা গুটি পাকিয়ে থাকতে চান। ডানা মেপতে চান না আর। বুঝে গেছেন, আর করার কিছু নেই।

বিকলে তাঁরা বান্ধবগড় পৌছেছেন সরকারি বদান্যতায়। সেমিনারের পর ফাউ হিসেবে জঙ্গলে একটু বিশ্রাম। জঙ্গলপুর থেকে রাস্তা বড় কম নয়। স্বামী চেয়েছিলেন খাজুরাহো যেতে। সেটা মনপূত ছিল শর্মারও। তিনি একটু এরোটিকার ভক্ত। শুধু কৃষ্ণজীবন চেয়েছিল জঙ্গল। পটেল তাকে সমর্থন করেছিলেন বটে, কিন্তু লজটি দেখে তাঁর বিশেষ ভাল লাগছে না।

অথচ ভাল না লাগার কারণ নেই। সরকারি লজের সব ব্যবস্থাই এখানে রয়েছে। লাগোয়া বাথরুম, গরম-ঠাণ্ডা জল, রুম হিটার। এসব না হলেও কৃষ্ণজীবনের চলত।

কৃষ্ণজীবন যখন তার ঘরে পোশাক পাশ্বে পায়জামার পর পাঞ্জাবি চড়িয়ে আলোয়ান জড়াচ্ছিল তখনই সরকারী অফিসার আনোয়ার বিনীতভাবে এসে দাঁড়াল দরজায়।

স্যার, একজনকে মীট করবেন?

কে বলুন তো?

লোকটা রাজবাড়িতে থাকে। পঁচিশ মাইল সারকামফারেরে জেনমনিয়া নেই। রাজবাড়ি, এখন ভূতের বাড়ি।

বিস্মিত কৃষ্ণজীবন বলে, থাকে কেন? তাত্ত্বিক নাকি?

না স্যার, ঠিক তাত্ত্বিক নয়। তবে পুরোহিত। পরিত্যক্ত রাজবাড়িতে একটা বিগ্রহ আছে, তার পূজো করে রোজ।

চল্লিশ টাকার মতো পায় মাসকাবারে। ব্যস, ওই জন্যই থাকে।

মাত্র ওই ক'টা টাকার জন্য?

সেইটাই তো আশ্চর্যের। বউ বাচ্চা সব গাঁয়ে থাকে, বিশ পঁচিশ মাইল দূরে। জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের ওপর কেল্লায় লোকটা একা থাকে। লোকে বলে জিন পরীরা ওকে খাওয়ায়।

লোকটা বেশ সাহসী বলতে হবে। তার সঙ্গে দেখা করা যায়?

নিশ্চয়ই। রোজই আসে এদিকে। কালকেই দেখতে পাবেন সকালবেলায়।

বাঘের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হেঁটে আসে রোজ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। হাতে লাঠিও থাকে না।

সাবাস!

সাধুবাদটা তার মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে এল। যে মানুষ জঙ্গল, স্বাধীন, একাকিত্ব ও নির্জনতাকে ভয় পায় না তেমন মানুষকে তার খুব পছন্দ।

লোকটা কি খুব গরিব?

খুব। জঙ্গল থেকে আতা, বেল এইসব ফল-টল তুলে এনে বিক্রি করে। এখানে টুরিস্ট লজে যারা আসে তারাই কখনও কখনও কেনে। গাঁয়ের লোক তো পয়সা দিয়ে ফল কেনে না।

লোকটার কেমন করে চলে তা আর জিজ্ঞেস করল না কৃষ্ণজীবন। এ দেশের কোটি কোটি গরিবের কী করে চলে সে রহস্য ভেদ করতে কে পারবে? কেউ জানে না।

সন্ধের পর লজের ময়ানোয়ান সন্মানিত অতিথিদের জন্য ছোট্ট একটা ককটেলের আয়োজন করলেন লজের রিসেপশনে। কৃষ্ণজীবন জীবনে কখনও মদ খায়নি। সে একটা সফট ড্রিং নিয়ে বসে রইল। সর্বদাই তার বিচরণ চিন্তার রাজ্যে। বাস্তবতার মাধ্য সে কমই থাকে। তার সামনে আস্তে আস্তে চারজন মানুষ নরমাল থেকে হাই হয়ে যেতে লাগল। মদ খাওয়া মানে যেন হলুদে চড়ি কিছুক্ষণের গগনবিহার। স্বাভাবিকতা থেকে কিছুক্ষণের ছুটি। অনেক পয়সা খরচ করে এই ছুটিটুকু কিনতে হয় মানুষকে। আবহমানকাল ধরে গরিব-দুঃখী থেকে রাজা-গজা অবধি এই জিনিসের নেশা করে আসছে। সস্তা বা দামী—যে যেন পারে। সুরার বন্দনা কিছু কম হয়নি পৃথিবীতে। কিন্তু কেন, সেই কারণটা কৃষ্ণজীবন আজও খুঁজে পায়নি।

পটেল একটু বেশিই মাতাল হয়ে গেল। বোধহয় ইচ্ছে করেই। মদ খেতে খেতেই বলছিলেন, আমার ভীষণ ভূতের ভয়। আমার ঘরে আর কাউকে শুতে হবে রাতে।

কিন্তু পটেল এতই মাতাল হয়ে পড়লেন যে, ভূতের ভয় গৌণ হয়ে গেল। তাকে ধরাধরি করে নিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল ঘরে।

এই নির্জন অরণ্যাবাসে নিশুত রাত্তির হয়ে গেল সন্ধের কিছু পরেই। ডিনারের পর যখন যে যার শোওয়ার ঘরে দিয়ে দরজা দিলেন তখনও ন'টা বাজতে দু'এক মিনিট বাকি।

পার্থিব—২৬

হেমন্তের শেষ। যথেষ্টই শীত পড়েছে এখানে। একটু রাতের দিকে যখন চাঁদ উঠল তখন বাইরের ফ্লাড লাইটটা নিবিয়ে দিয়ে কৃষ্ণজীবন একটি বেতের চেয়ার বাইরে টেনে এনে বসল। অল্প কুয়াশায় মাথা কী বন্য ভয়ংকর জ্যোৎস্না! জঙ্গলে নীল গাইয়ের ডাক, পাখির ডাক, হরিণের গলা ঝাঁকারি শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে পাতায় পাতায় শিশির পড়ার শব্দ। চারদিককার গাছপালা যেন কৃষ্ণজীবনকে একা দেখে একটু ঘন হয়ে সরে এল কাছাকাছি। যেন কৃষ্ণজীবনের কাছে তারা কিছু শুনতে চায়।

এইসব রাতের সৌন্দর্য দেখে গড়পড়তা বাঙালি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে ওঠে বা আহা উহ করে চাঁদের নানাবিধ প্রশংসা করে। কবিতাও মনে পড়ে কারও কারও। সৌন্দর্য ওভাবেও দেখা যায়। কিন্তু অরণ্যের জ্যোৎস্না বা অন্ধকার, গ্রীষ্ম বা শীত বরাবর অন্যভাবে মুক করে দেয় কৃষ্ণজীবনকে। সে যেন হাজার হাজার বছর পিছিয়ে চলে যায় মানুষের আদিম আরণ্যক একাকিত্বে। চারদিকে সভ্যতার নানা নির্মাণ মিথ্যা হয়ে যায়। মুগ্ধ, সন্মোহিত, ভূতগ্রস্ত কৃষ্ণজীবন তার অধীত সব বিদ্যা বিস্মৃত হয়। ভাষা অবধি ভুলে যায়, তার মন মাথা সব কিছু হয়ে যায় মুক ও বধির। না, কৃষ্ণজীবনের ভয় করে না। একটুও ভয় করে না। জঙ্গলের অনেক গভীরে পাহাড়ের ওপরকার পরিত্যক্ত কেল্লায় যে লোকটা একা থাকে কৃষ্ণজীবন তার চেয়ে কিছুমাত্র কম সাহসী নয়।

কত রাত অবধি বসে রইল কৃষ্ণজীবন তা তার নিজেরও খেয়াল ছিল না। সময় যেন এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হয়তো আড়াল থেকে বাঘের চোখ তাকে লক্ষ করে গেল, তাকে দেখে গেল ভালুক ও নীল গাই, তাকে নজর করল রান্ডচরা পাখি।

যখন অবশেষে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বিছানায় ঢুকল সে, তখন তিনটে বাজতে সামান্যই বাকি। সকালে হাতির পিঠে চড়ে এবং লানচের পর জীপ নিয়ে তাদের জঙ্গলে দু' দফা ঘুরে বেড়ানোর কথা। সে সব বেড়ানোর মধ্যে শৌখিন বাবুয়ানা আছে। কৃষ্ণজীবনের ভাল লাগে পায়ে হেঁটে, একা গভীর গভীর জঙ্গলে দিশাহীন ঘুরে বেড়াতে, গাছপালার মধ্যে নিখর হয়ে চুপ করে বসে থাকতে।

সকালে ব্রেকফাস্টের পরই শর্মা এবং স্বামী হাতির পিঠে চড়ে বাঘ দেখার জন্য কিছু উদ্বেল হলেন। পটেলের হ্যাংওভার, সম্ভবত প্রেশারটাও বেড়েছে। সুতরাং যাবেন না।

হাতির পিঠে যখন কাঠের মস্ত তক্তা পাতা হয়েছে এবং রওনা দেওয়ার তোড়জোড় চলছে ঠিক সেই সময়ে লোকটা এল। সাধারণ গ্রামবাসীর মতোই চেহারা। কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। হেঁটো ধুতি, গায়ে মোটা আধময়লা সাদা একটা জামা, তার ওপর সুদূর চাদর, পায়ে রবারের চটি। হাতের ব্যাগে কিছু কতবেল।

আনোয়ার তাকে ধরে এনে মান্য অতিথিদের সামনে দাঁড় করাল।

এই সেই লোক স্যার কেল্লায় থাকে।

লোকটাকে সবাই দেখল, বিশেষ গুরুত্ব দিল না। দু-চারটে মামুলি প্রশ্ন করে ছেড়ে দিল।

কৃষ্ণজীবন তাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করল, কেল্লাটা কেমন?

লোকটা কম কথার মানুষ। হয়তো বা লাজুক বা কথা ভালবাসে না। সামান্য মাথা নেড়ে বলল, ভালই।

দেখতে যাওয়া যায়?

অনেকেই যায়।

আপনি ওখানে একা থাকেন কেন?

এমনিই।

একা থাকতে ভালবাসেন?

হ্যাঁ।

কিরকম লাগে?

ভাল।

গাছপালা ভালবাসেন?

হ্যাঁ।

নির্জনতা ভাল লাগে?

হ্যাঁ।

আমি যদি কেল্লায় যেতে চাই তাহলে নিয়ে যাবেন?

আপনাদের হাতি আছে, নিয়ে যাবে।

কৃষ্ণজীবন লোকটাকে দেখে খানিকটা হতাশই হল। এ ঠিক প্রাকৃত বিভূতিভূষণ নয়। হয়তো দজ্জাল বউয়ের ভয়ে পালিয়ে থাকে।

ভূতে বিশ্বাস করেন?

কেন করব না?

ভূত দেখতে পান?

না।

লোকে বলে জিন আর পরীরা আপনাকে খাবার দিয়ে যায়।

না।

এ লোকের সঙ্গে কথা বলে কোনও উন্মোচন ঘটানো যাবে না। কৃষ্ণজীবন তাই ক্ষান্ত হল। জঙ্গলে নির্জন কেল্লায় দীর্ঘকাল একা বসবাস করেও এর মধ্যে কোনও কিছুই সম্ভাব্য হয়নি। লোকটা যেমন ভোঁতা ও কল্পনাহীন ছিল তেমনই রয়ে

গেছে। বোকা মানুষেরা ওকে নিয়ে কিংবদন্তী বানিয়ে চলেছে। তবে হয়তো অরণ্যর কাছ থেকে ও একটা জিনিস শিখেছে। সেটা হল নিশ্চুপ থাকা, কথা কম বলা।

কতবেল কেউ কিনল না, লোকটা একটু দাঁড়িয়ে থেকে গায়ের দিকে চলে গেল।

হেলেদুলে সকালটা কাটল হাতির পিঠে। অজস্র প্রাচীন গুহা, সম্বর, নীল গাই, বহু পুরোনো এক শায়িত বিষ্ণুমূর্তির ওপর দিয়ে নেমে আসা ঝরনা ইত্যাদি দেখা হল বটে, কিন্তু যাকে দেখতে আসা সেই বাঘের দেখা পাওয়া গেল না কোথাও। বাঘ ছাড়াও যে জঙ্গলে আরও অনেক কিছু দেখার আছে সেটা বুঝতে চাইলেন না শর্মা বা ডঃ স্বামী। একটু ঝুঁতঝুঁত করছিলেন, ছাব্বিশটা বাঘের একটারও তো দেখা মিলবে!

তবে “কিল” পাওয়া গেল। হরিণের সদ্যভুক্ত দেহাবশেষ। এক জায়গায় বাঘের পদচিহ্নেরও হদিশ মিলল। কিন্তু বাঘ নয়।

দুপুরে লানচের পর আর এক দফা বেরোনো হল। কিন্তু বাঘহীন ভ্রমণই সার হল শুধু। বেলা পড়বার আগেই খানিকটা ক্লান্ত হয়ে ফিরে এল তারা।

গাইডেড সরকারি ভ্রমণ শেষ হয়েছে। কাল সকালে তারা ফিরে যাবে। কৃষ্ণজীবন চায়ের টেবিলে বসল বটে, কিন্তু মনটা বড় চনমন করছিল তার। এভাবে নয়, এই অরণ্যকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যও তার একা পাওয়া দরকার।

ক্লান্ত বিশেষজ্ঞরা ঘরে গেলেন। আনোয়ারকেও দেখা যাচ্ছে না কোথাও। শুধু বেয়ারা দুজন বিষণ্ণ গভীর মুখে টেবিল পরিষ্কার করছে। এই সুযোগ।

কৃষ্ণজীবন উঠল এবং পায়ে পায়ে লজের সীমানা ভিড়িয়ে চলে এল মুক্ত জঙ্গলের ভিতরে। জীপ-রাষ্ট্রটি সম্বলিয়ে এড়িয়ে সে ঘাসজঙ্গলের ভিতরে ঢুকে গেল একা। শেষবেলার রঙিন আলোয় কী অপার্থিব যে দেখাচ্ছে চারদিক!

সে শব্দ করছিল না। শব্দ করছিল বিচিত্র পাখিরা। শব্দ করছিল দূরবর্তী নীল গাই। হরিণের পায়ের দ্রুত শব্দ।

একটা মস্ত গাছের বেড় পেরিয়ে পাথরের চাতাল। উচ্চাবচ একটা জায়গা। ক্ষয় পাথরের একটা প্রাকৃতিক হ্রাপত্য। যাকে সারাদিন এত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খোঁজা হল তার দেখা যে এত অপ্রত্যাশিত পাওয়া যাবে কে জানত?

সামনেই খোলা চাতার ঘর ওপর নিজের বর্ণের আঙনে যেন দাঁড় করে জুলছিল বাঘ। পায়ের তলায় সদ্য শিকার-করা হরিণ। বোধহয় তখনও হরিণের রুধিও ধক ধক করছিল। বিশাল বাঘটা অবহেলায় একগানা পা হরিণের ওপর রেখে দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো দম নিচ্ছে। ভগ্নিটা তাক্ষিল্যের। অবজ্ঞাভরে সে একবার কৃষ্ণজীবনের দিকে তাকাল।

চোখে চোখ। কৃষ্ণজীবন চোখ ফেরাতেই পারল না। বিষয়ে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল।

পালানোর কথা বা লুকিয়ে পড়ার কথা মনেই হল না। সে শুধু অরণ্যের পটভূমিতে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী রাজাকে দেখছিল। রাজা জুলে যাচ্ছে নিজের দাঁড়ি দাঁড়ি গাত্রবর্ণে। শেষবেলার পড়ন্ত আলো যেন তাকে ঘিরে নেচে উঠছে উল্লাসে।

কৃষ্ণজীবনও আরও কয়েক পা এগিয়ে গেল। মাত্র পনেরো বিশ ফুটের তফাতে বাঘ দাঁড়িয়ে। কৃষ্ণজীবনের কোনও আড়াল নেই, অস্ত্র নেই। কৃষ্ণজীবন পালাচ্ছেও না। চোখ অবধি সরাল না।

বাঘ চকিতে একবার পিছু ফিরে কী যেন দেখে নিল। তারপর ফের কৃষ্ণজীবনের দিকে তাকাল।

কৃষ্ণজীবন চাপা স্বরে বলল, নমস্কার।

বাঘ একটা হাই তুলল মাত্র।

আপনাকে বিরক্ত করলাম। মাপ করবেন।

বাঘ চেয়ে রইল তার দিকে।

আমি আপনার একজন বন্ধু।

আবেগে, আনন্দে কৃষ্ণজীবনের গলা বন্ধ হয়ে আসছিল। সে মৃদুস্বরে বলল, আসি।

সামান্য, খুব সামান্য একটা ভূ-র-র শব্দ এল বাঘের গলা থেকে।

কৃষ্ণজীবন ধীরে ঘুরে গিয়ে আন্তে আন্তে হেঁটে লেজে ফিরতে লাগল। একটু দূরে থেকেই সে সোরগোল শুনতে পাচ্ছিল একটা। লজের এলাকায় ঢুকতেই দেখল, সবাই সার বেঁধে দাঁড়িয়ে। উত্তেজিত কথাবার্তা হচ্ছে।

তাকে দেখেই ছুটে এল আনোয়ার, স্যার! আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

কৃষ্ণজীবন একটু অবাক হয়ে বলে, কাছেই! কেন?

বাঘ বেরিয়েছে স্যার! বাঘ! শিগগির ঘরে ঢুকে যান।

কৃষ্ণজীবন শ্বিত মুখে বলল, তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, আনোয়ার সাহেব। হি ওয়াজ এ নাইস জেন্টলম্যান।

তিন দিন বাদে গল্পটা সে দোলনকে বলছিল রাতে, তার বিছানার পাশে বসে। দোলনের ঠাণ্ডা লেগে একটু জ্বর হয়েছে। অসুখ হলেই সে বাবাকে আরও বেশি করে চায়। দুটো হাতে সে কৃষ্ণজীবনের একটা হাত শক্ত করে ধরে আছে। চোখ বড় বড়। মুখখানা হাঁ।

বাঘটা যদি তোমাকে খেয়ে ফেলত বাবা?

কৃষ্ণজীবন সামান্য উদাসভাবে বলল, ওরা মানুষখেকো বাঘ নয় বাবা।

যদি কামড়ে দিত?

কথাটা তো তখন আমার মনেই হয়নি। এত সুন্দর দেখাচ্ছিল বাঘটাকে, আঙনের মতো, আলোর মতো, আমি সব জুলে গিয়েছিলাম। কী ভদ্র, কী সহবত! আর কী সাংঘাতিক অহঙ্কার!

দোলন ভয়ানক গলায় বলে, আর কখনও ওরকম করো না বাবা।

কৃষ্ণজীবন একটু হেসে তার প্রিয় পুত্রটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, বাঘ তো মানুষের করুণার পাত্র বাবা। সারা পৃথিবীতে কয়েকটাই মাত্র বেঁচে আছে। মানুষেরই দয়ায়। বাঘ-মারা বীরদের কত গল্প আছে, আমি যখন পড়ি তখন

চোখে জল আসে। কেন জানো? বাঘের দাঁত, নখ আর খিদে ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু মানুষের কত কী আছে। বন্দুক, বুদ্ধি, অকারণ হিংস্রতা।

কিন্তু বাঘ যখন মানুষ মারে বাবা?

বাঘ যত মানুষ মেরেছে, মানুষের হাতে মারা পড়েছে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি। তুমি ভেবো না বাবা, বাঘের দেখা পাওয়া এখন ভাগ্যের কথা।

খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল দোলন। বাবার সব কথা সে আকর্ষণে বিশ্বাস করে। তবু খুব চিন্তিতভাবে সে বলল, বাঘটা কি তোমার বন্ধু হয়ে গেল বাবা? আবার যদি দেখা হয় কিছু করবে না তোমাকে?

চিন্তিত হল কৃষ্ণজীবনও। খানিকক্ষণ ভেবে বলল, বাঘ তত বুদ্ধিমান নয়। তার খিদেই তাকে চালায়। মানুষের নিষ্ঠুরতা তার চেয়ে ঢের বেশি।

তাহলে বাঘ কি মানুষের চেয়ে ভাল?

এ প্রশ্নের জবাব কলকাতার সাততলার ফ্ল্যাটে বসে খুঁজ পায় না কৃষ্ণজীবন। এ প্রশ্নের জবাব রয়েছে দূরের বান্দবগড় জঙ্গলে, যেখানে এই রাতের অন্ধকারে এখন আদিম পৃথিবীর নিয়মে চলছে সব কিছু।

দোলন ঘুমিয়ে পড়ল কৃষ্ণজীবন উঠে আসে নিজের ঘরে। চুপচাপ বসে থাকে চেয়ারে। দুখানা বাঘের চোখ বহু দূর থেকে নিস্পন্দ চেয়ে থাকে তার দিকে।

না, এ তার কোনও বীরত্বের গল্প নয়। বরং এ এক করুণ কাহিনী। লুণ্ঠপ্রায় ব্যাঘ্র-প্রজাতির একজনের সঙ্গে তারই স্বক্ষেপে দেখা হয়েছিল কৃষ্ণজীবনের। দুজনের মধ্যে একটু দৃষ্টি বিনিময় হয়েছিল মাত্র। তারা কেউ কাউকে আক্রমণ করেনি, এইমাত্র।

সাতদিন পর অনু নাগাল পেল তার। অনুরই জন্মদিনে, তার বাড়িতে। ইদানীং তারা কয়েকটি প্রতিবেশী পরিবার নিকটস্থ হয়েছে পরস্পরের। এর-ওপর বাড়িতে গুর বা এর নিমন্ত্রণ হয় প্রায়ই। অনুর বাড়িতে কৃষ্ণজীবনের আসা এই প্রথম। রিয়া আসে, ছেলেমেয়েরা আসে। সে কখনও আসেনি। অনুর বাবা নিজে নিমন্ত্রণ করে এসেছিলেন বলে আসা।

আপনি কী বলুন তো?

কৃষ্ণজীবন বাচাল মেয়েটির দিকে চেয়ে হেসে বলে, কী হল?

শুনলাম আপনি বাঘের মুখে পড়েছিলেন ইচ্ছে করে?

গল্পটা খুব ছড়িয়েছে দেখছি।

গল্প নাকি? এটা তো ঘটনা।

ইচ্ছে করে পড়িনি। মুখেও পড়িনি।

তাহলে?

যেমন বন্ধুর সঙ্গে পাথোঘাটে দেখা হয় ঠিক তেমনিই দেখা হয়ে গিয়েছিল।

অনু গোলাকার চোখে চেয়ে বলে, বাঘের সঙ্গে দেখা নাকি? ওকে দেখা-ইওয়া বলে? কী পাগল আপনি!

রিয়া শুনতে পেয়ে এগিয়ে এল, কাকাবাবুকে আচ্ছা করে শাসন করো তো! সত্যিই পাগল। আমাদের কাছে তো এসব বলেন না, দোলনের কাছে শুনে ভয়ে মরি।

রিয়া সরে যেতেই অনু মুখ ভেঙে বলে, কাকাবাবু না হাতি! আপনি আমার বন্ধু না?

তাই তো।

আমি কাকাবাবুটাবু ডাকতে পারব না কিন্তু। বন্ধু বলে ডাকব। কাকাবাবু ডাকলে কি বন্ধুত্ব হয়?

আমি অত জটিল ব্যাপার বুঝতে পারি না।

কেন পারেন না? বাঘের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারেন আর আমার সঙ্গে পারেন না?

কে বলে পারি না!

কেমন এড়িয়ে চলেন আমাকে।

এড়িয়ে চলি না তো?

খুব অ্যাভয়েড করেন আমাকে। এই যে মধ্যপ্রদেশে গেলেন একবারও বলেননি তো!

বলা উচিত ছিল, না?

বন্ধুকে বলতে হয়। আমি কত খোঁজ করেছি আপনার। এবার থেকে যখন যাবেন আমাকে একটু খবর দেবেন।

অপর্ণা একটা খাবার ভরা প্লেট নিয়ে এগিয়ে আসে, আমার মেয়ে আপনাকে জ্বালাচ্ছে তো খুব? ও ভীষণ টকেটিভ?

বেশ ভাল মেয়েটি আপনার।

মাথা তো শার্প, কিন্তু পড়ে না একদম।

পড়বে। ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।

আপনি এত বিদ্বান মানুষ। আমার মেয়েটা বোধহয় আপনার সঙ্গে সমানে সমানে কথা বলে! আপনি নাকি গুর বন্ধু।

অপর্ণা হাসছিল। ভারী সুন্দর হাসিটি। একটু দুটুটি মেশানো, কিন্তু সত্যিকারের হাসি। অনেকটা অনুর মতোই।

আসুন, একটা মেয়ের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই। ইউ উইল লাইক হার। এই আপা, এদিকে এসো।

রোগা, ক্ষয়া, কালো চেহারার একটি মেয়ে হাসিমুখে এগিয়ে এসে বলল, গুঁকে আমি চিনি। উনি বিখ্যাত লোক। আর আমি তো সামান্য একটা মেয়ে, দেওয়ার মতো পরিচয়ই নেই।

অপর্ণা হেসে বলে, খুব সামান্য হলে আর ভাবনা ছিল কি? বুঝলেন, এ মেয়েটি কিন্তু সাংঘাতিক।

কৃষ্ণজীবন আপনার দিকে চেয়ে ছিল। তার জহরির চোখ নেই। কিন্তু অনেক দিন বাদে সে একটি পরিষ্কার ও স্পষ্ট মেয়েকে দেখল। লাভণ্য নেই, স্বাস্থ্য নেই, কিন্তু চোখে এক গহিন গভীরতা আছে যেন।

দুনিয়াটা চারদিকে হাঁ-হাঁ করা খোলা। কিন্তু কোনদিকে যাওয়া যায় সেইটে মাঝে-মাঝে ঠিক করা বড় শক্ত হয়ে ওঠে। দুনিয়ায় এমন কেউ নেই যে তাকে দেখলে খুশি হয়। সে গেলে 'এসো, বোসো' করার লোক নেই। পালপাড়ায় শুধু বুড়োবুড়ি আছে। কিন্তু তাদের মুখে হাসি ফোটার মতোই বা কোন সুসংবাদ নিয়ে যাচ্ছে সে ? ভোরবেলা শ্বশুরমশাই শীতলাতলার মোড় অবধি এগিয়ে দিয়ে গেলেন। বটতলায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কথাও হল দুজনের।

কি করবে বাবা, এবার ?

নিমাই বড় নীরস গলায় বলে, দেখি।

পুরুষমানুষ বসে গেলে তার আর জাত থাকে না। বসা-পুরুষের বড় কষ্ট। এই আমাকেই দেখ না। তবে বুড়ো হয়েছি বলে ক্যামা-ঘেন্না। আছে। তোমার বয়সটা তো কিছু নয়। এই বয়সে বসা হলে কষ্ট বেশি।

আজ্ঞে, সে বড় ঠিক কথা। বসে থাকতে কে চায় বলুন! কিন্তু কিছু যে হয়ে ওঠে না। বীণা দানাপানি দেয়, তাই টিকে আছি। বড় লজ্জার ব্যাপার।

বিশ্বপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তোমাকে দেওয়ার মতো বুদ্ধিও আমার নেই। দুনিয়ার হালচাল মাথায় সঁধেয় না। নিজেই ভেবেটেবে ঠিক করে নিও। তারপর ভাগ্য।

আজ্ঞে। আমার জন্য ভাববেন না।

তোমার জন্য ভাবি না বাবা, মেয়েটার জন্য ভাবি। তার আর কোনও আড়াল রইল না। পুরুষ ছাড়া মেয়েরা হল লোভানী জিনিস। চারা গাছের চারদিকে বেড়া না থাকলে যা হয়।

আমাকে দিয়ে সেই কাজটাই কি ঠিকমতো হয় বাবা ? আমি কি একটা তেমন পুরুষ ?

কেন বাবা, বীণার কি চরিত্রের দোষ হয়েছে ?

জিব কেটে নিমাই বলে, ছিঃ ছিঃ, বীণা সেরকম মেয়ে নয়। বলছিলাম বেড়ার কথা যা বললেন ওসব হল শক্ত-সমর্থ পুরুষের কাজ। আমার নয়।

নিজেকে অত ছোটো ভেবো না বাবা, তাতে আমার কষ্ট হয়। তোমার মুখে সুলক্ষণ আছে। কপালের ফেরে নানারকম হচ্ছে। লাগাম তো সবসময়ে মানুষের হাতে থাকে না। শুধু একটা কথা বলে দিই।

বলুন বাবা।

রাগ করে আবার আত্মঘাতী হয়ে বোসো না। শ্বাস যতক্ষণ আশ ততক্ষণ। শেষ অবধি চেষ্টা করো বাবা। কথা মনে থাকবে ?

যে আজ্ঞে। মাঝে মাঝে বেঁচে থাকতে হচ্ছে যায় না বটে। তবে কিনা শেষ অবধি ভগবানে মনটা ফেলে দিলে খানিক জুত পাই।

তাই করো বাবা। ভক্তরা চিরকাল কষ্ট পায়। নতুন কথা আর কি ?

আসি তাহলে ?

এসো গিয়ে। জ্বরদস্তি তোমাকে আটক করলাম না। তার কারণও একটা আছে। শুনে যাবে নাকি ?

তুনেই যাই।

বীণার কাছ থেকে পৃথক হলে তোমার নিজের ওপর ভরসা আসবে। রাগ-অভিমান তখন উল্টোপথে ধেয়ে গিয়ে পৌঁ হয়ে দাঁড়াবে। যদি সেটা হয়ে ওঠে তবে মঙ্গলই হবে বাবা।

আপনার আশীর্বাদ। আসি তাহলে।

প্রণাম করে নিমাই অন্ধকারে পা বাড়াল। না, অন্ধকার আর ততটা ছিল না। আকাশ ম্যাডাটে আলোয় কিছু ফিকে হয়েছে। একা হয়েই নিমাইয়ের সমস্যা দেখা দিল, এখন সে কোথায় যাবে ? কার কাছে ?

যাওয়ার জায়গা বলতে আপাতত পালপাড়াই আছে। বুড়োবুড়ির সঙ্গে দেখাও হয় না অনেক দিন। ভাঙা হোক, ধসা হোক, নিমাইয়ের ভদ্রাসন বলতে ওই পালপাড়ার বাড়িখানাই। বাপ-মায়ের ভিটে।

ষ্টেশন অবধি হেঁটে গেলে ট্রেন পাওয়া যাবে। বাসও আছে। হাঁটা পথ ধরে কয়েক পা এগোনোর পরই হঠাৎ পিছুটানটা টের পেল নিমাই। বীণাপাণিও এখনও ঘুমে অচেতন। জেগে কি কাঁদবে নিমাইয়ের জন্য ? না কাঁদুক, একটু কি দাপাবেও না ? তেমন দরের বর না হলেও এতকালের সম্পর্ক কি এমন ঠুনকো হয়ে ভেঙে যাবে ?

পা ধীর হয়ে এল নিমাইয়ের। একবার ভাবল, দূর ছাই, মরুক গে আত্মসম্মান, বীণার কাছে ফিরেই যাই।

তারপর নিমাই আবার বিজ্ঞ হল। সংযম এল। না, চলে যাওয়াই ভাল। মেয়েমানুষের হাততোলা হয়ে বেঁচে থাকাকে কি বেঁচে থাকা বলা যায় ? বড় অপমান হচ্ছিল তার। বড় গঞ্জনা সহিঁতে হচ্ছিল। তার চেয়ে কষ্ট আর বেশী কী আছে ?

কতবার চোখের জল মুছল নিমাই তার হিসেব নেই। কতবার বেতুল হয়ে খেমে গেল। কতবার ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে হল। ঘর-সংসার ভেসে গেল তার। ছিঁড়ল সুতোয় বাঁধন। সামনে এক দিশাহারা ভবিষ্যৎ। কে জানে কী হবে ?

ক্রমে রোদ উঠল। চারদিক স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠল সোনালি আলোয়। ষ্টেশন দেখা যেতে লাগল।

চা খাওয়ার বাতিক নেই নিমাইয়ের। কখনও খায়, কখনও খায় না। আজ ষ্টেশনের চত্বরে একটা দোকানে বসে এক ভাঁড় চা খেল সে। সঙ্গে দুখানা ময়দার বিস্কুট। খেয়ে বাইরের বেশে অনেকক্ষণ উদাস হয়ে বসে রইল।

এখান থেকেই বাস ধরে পালপাড়া যাওয়া যায়। অনেক বাস। নিমাই তাড়াহুড়ো করল না। পালপাড়া তার জন্য সোনার থালায় ভাত বেড়ে বসে নেই। দু' মাস আগে একশটি টাকা পাঠানো হয়েছিল বুড়োবুড়ির কাছে। সে টাকা কবে উড়ে গেছে। সংসারে এখন হাঁড়ির হাল। খুব দুঃখকষ্টের মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে তাকে। সেটা ধীরে স্তেহে হোক।

বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল নিমাই। সে বড় ভালবাসে বীণাপাণিকে। বীণা ছাড়া জীবন কি এখন থেকেই আলুনি লাগতে শুরু করল ? তার হাতে-পায়ে যেন সাড় নেই, বুকে একটুও জোর পাচ্ছে না। বড় ন্যাতানো লাগে যে নিজেকে।

বেলা বাড়ছে বলে জোর করেই একসময়ে উঠে পড়ল নিমাই। বাস ধরল। বাসে বসেই হঠাৎ তার নদেরচাঁদের কথা কেন মনে হল কে জানে।

নদেরচাঁদই বীণাকে যাত্রা দলে নিয়ে এসেছিল। বোধহয় বীণার সঙ্গে কেটু আশনাইও হয়ে থাকবে। নদেরচাঁদ মেয়েবাজ মানুষ। তবে কিনা শেষ অবধি নাগালে পায়নি। ফুঁসেছিল কিছু দিন। তারপর অন্য ধাক্কায় লেগে পড়ল। সম্পর্কে একটু দূরের ভাই হয় নিমাইয়ের। অবস্থা ভাল।

পালপাড়ায় বাস থেকে নেমে ইটতে ইটতে ভরদুপুরে সে নিজের বাড়ি না গিয়ে নদের বাড়িতে হাজির হল গিয়ে। বেশ বড় পাকা বাড়ি, ফলস্ত গাছপালা আছে। গোয়াল আছে, গরু আছে। ধানের মরাই আছে। নদের মা সম্পর্কে তার কাকিমা। তার সঙ্গে প্রথমে দেখা।

নিমাই নাকি রে ? কী খবর তোদের ? অনেক দিন দেখি না।

নিমাই দাওয়ায় বসে একটু দম নিয়ে বলল, এবার থেকে দেখবে। খুব দেখবে। নদে কোথায় ?

ছিল তো। দেখ গে ভিতরের ঘরে।

নদে ঘরেই ছিল। জানালার ধারে বসে গোঁফে কেয়ারি করছে। শৌখীন মানুষ।

নিমাইদা যে! খবর-টবর কি ?

আমি তোরা কাছে একটু কাজে এসেছি।

কী বলো তো! বোসো না চেয়ারটায়। হল কী তোমার ? মুখচোখ ওরকম দেখাচ্ছে কেন ?

নিমাই সামলাতে পারল না নিজেকে। চেয়ারে বসে দু' হাতে মুখ ঢাকা দিয়ে আচমকা কঁদে ফেলল।

আরে দেখ দেখ! হল কি গো নিমাইদা ?

নিমাই মাথা নাড়ল শুধু। কিছু বলতে পারল না। তার বুকে অনেক কান্না জমে আছে। টইটুসুর। টুসকি লাগলেই চলকে পড়ছে আজ।

ঝগড়া করে এসেছো নাকি বীণার সঙ্গে ? না কি অন্য কিছু ?

নিমাই জবাব দিল অনেকক্ষণ বাদে। ধরা ফৌপানো গলায়। বলল, নদে, আমাকে একটা কাজ জোগাড় করে দে। যেমন-তেমন কাজ।

কাজ! বলে নদেরচাঁদ চুপ করে রইল। তারপর বলল, বুঝেছি।

কী বুঝলি ?

ঝগড়াই করেছো।

ঝগড়া নয়।

তবে ?

সে অনেক কথা। পরে শুনিস।

বাড়ি যাও নিমাইদা। মাথা ঠাণ্ডা করো। তোমার বউ কিন্তু খারাপ মেয়ে নয়।

খারাপ কি বলেছি ? বীণা খারাপ নয় তা আমার চেয়ে ভাল কে জানে ? খারাপ হল কপাল।

বাড়ি যাও। আমি একটু বেরোচ্ছি। বিকেলে যাবো'খন তোমার বাড়ি। শুনব সব।

ক্লাস্ত শ্রান্ত নিমাই উঠল। বলল, যাই।

শ্রীহীন, পড়ো-পড়ো টিনের ঘরের বাড়িতে যখন এসে ঢুকল নিমাই তখনই টের পেল, তার অভ্যাস কত পাল্টে গেছে। তারাও গরিব বটে, কিন্তু এখানে যেন আরও বড় অভাবের বাঘ হানা দিয়ে গেছে।

মায়ের সঙ্গে উঠোনেই দেখা। রোদে বসে কুলোয় করে খুদকুড়ো কিছু বাছছে। মাটির দাওয়ায় সিঁড়িতে চাদর মুড়ি দিয়ে বসা তার জরাজীর্ণ বাবা। দৃশ্যটা খানিক দাঁড়িয়ে আগে দেখল নিমাই।

নিমাইকে দেখে মা চোখ কপালে তুলে বলে, ওমা গো! তুই!

এই এলাম একটু।

মায়ের চোখে কি একটা প্রত্যাশা, একটু লোভ চকচক করে উঠল নাকি ? বনগাঁ থেকে ছেলে এসেছে, পকেটে হয়তো মেলা টাকা!

বাবা চোখে ভাল দেখে না। ঘড়ঘড়ে গলায় যেন একটু আহ্লাদ উথলে উঠল, নিমাই নাকি রে! উরেকবাস, কী কাণ্ড!

কাণ্ডটা যে কী তা নিমাই এদের কাছে প্রকাশ করতে পারবে না। বীণাপাণি এ বাড়ির প্রাণভোমরা। সেই বীণার সঙ্গে ছাড়ান-কাটান হয়েছে শুনলে বুড়োবুড়ি মুর্খা যাবে।

মা বলল, খাবি তো এবেলা ? চালের জোগাড় দেখতে হয় তাহলে।

কেন, চাল নেই ?

মা একটু দমিত গলায় বলল, আমরা তো খুদ সেক্ক করে জাউ-ভাত খাই। সঙ্গে শাকপাতা, পেঁপে, ধুঁতুল সেক্ক দিয়ে দি। সে তুই খেতে পারবি না।

খুব পারব। ওতেই হবে।

বীণাকে আনলি না বাবা ?

না মা, সে বাপের বাড়ি গেছে।

ঘরদোরের অবস্থা ভাল নয়। চালের টিন ঝুরঝুর করছে। আগে বেড়ার ঘর ছিল, পরে মেটে ঘর তুলেছিল তারা। মাটির ঘরের পিছনে খিদমত দিয়ে হয়। লেফা-পোছা, মাঝে মাঝে কাদামাটি চাপান দেওয়া। তা সেসব আর মা পেরে ওঠে না। মেলা গর্ত, খন্দ ভৈরি হয়েছে দেয়ালে আর ভিটেতে। তাদের বনগাঁর ঘর এর চেয়ে আর একটু ভাল, পয়-পরিষ্কার। তফাতটা দেখাক করার মতো নয়, কিন্তু তফাত একটু আছে।

বেশি কথা কইলে বিপদ। নিমাই আবার পেটে কথা রাখতে পারে না। তাইসে ঘরে এসে ধুতি জামা ছেড়ে গামছা পরে নিল। তারপর লেগে পড়ল ঘরদোর সারতে। সকালের চা আর বিস্কুট পেট থেকে অনেকক্ষণ আগে উখাও হয়ে গেছে। খিদে আঁচড়া-আঁচড়ি করছে পেটে বনবেড়ালের মতো। নিমাই। এক ঘটি জল খেয়ে নিল। তারপর লোহার বালতি নিয়ে পুকুরে নেমে পড়ল কাদামাটি তুলতে।

মা বলল, ওরে, করিস কি? হা-ক্লান্ত হয়ে এলি, একটু জিরিয়ে নে। কিছু তো দাঁতেও কাটিসনি বাবা।

দাঁতে কাটার মতো জিনিস যে ঘরে নেই তা নিমাই জানে। চাট্টি মুড়ি খেতে হলেও দোকান থেকে বাকিতে আনতে হবে। নিমাইয়ের পকেটে এখনও কয়েকটা টাকা আছে। কিন্তু বাবুগিরি করে নষ্ট করা যাবে না। সে বলল, স্বস্তরবাড়ি থেকে আসছি, তারা কি আর খালি মুখে ছাড়ে?

তোর রোগা শরীর।

শরীর কি বসিয়ে রাখার জন্য মা? ঘরদোরের যা ছিঁরি হয়েছে, না সারালে তোমরা দেয়ালচাপা পড়ে মরবে যে।

মা শুধু বলল, তা ঠিক। আমরা কি পারি আর ওসব?

নিমাই অবশ্য পারল। অনেক বেলা অবধি বালতি বালতি মাটি টেনে ঘর সারল, উঠানোর চারধার থেকে আগাছা সাফ করল, ঘরদোর উঠোন সব নিকিয়ে ফেলল। তারপর আগুনের মতো খিদে নিয়ে বসল জড়ি-ভাত খেতে।

মনে হল, অমৃত কি এর চেয়ে ভাল?

এ সবের ফাঁকে ফাঁকে বুকুর মধ্যে কি বিরহের কোকিলটা ডাকেনি? ডাকছে, থেকে থেকে ডাকছে। হ-হ করে জ্বলে যাচ্ছে বুকুর ভিতর শুকনো পাতা। বড় মোলায়েম করে ডাকতে হচ্ছে যাচ্ছে, বীণাপাণি! ও বীণাপাণি!

টপ করে এক ফোঁটা চোখের জল পড়ল হাতের পরাসে। সেটা খেয়ে ফেলল নিমাই। খিদের আগুনে বিরহের আহুতি হোক। জনুর শোধ আহুতি হয়ে যাক।

লোলা পড়ার আগেই নদে এল।

চলো নিমাইদা, একটু কোথাও গিয়ে বসি।

পালপাড়ায় বসার জায়গা মেলা। তারা গিয়ে মাঠের ধারে ঘাসে বসল।

এবার বলো, বৃন্তান্তটা কী।

নিমাই কিছুক্ষণ থম ধরে থেকে বলে, তুই আমাদের মেলা উপকার করেছিস। তোর জন্যই বীণার একটা হিল্লো হল।

সে আর বেশি কথা কিসের? তোমাকে অত গন্দগদ হতে হবে না।

বলি কি, এবার আমারও একটা হিল্লো করে দে।

সে কি কথা গো! শুনলাম যে বনগাঁয়ে তুমি মনোহারী দোকান দেবে।

সে প্রস্তাব ভেসে গেছে। সে আর হবে না।

কেন, হলটা কী?

তোকে সব বলব'খন। তবে কথাগুলো একটু আগে শুঁছিয়ে নিই। আমি তো ভাল কইতে পারি না। হড়হড় করে সব কথা যদি বেরিয়ে যায় তাতে ভাল হবে না। কিছু কথা চাপতে হয়, কিছু ছাড়তে হয়। না শুঁছিয়ে কি বলতে পারি। কয়েকটা দিন সময় দে।

তা বটে। সকালে কেঁদে ফেলেছিলে, তখনই বুঝেছি ব্যাপার গুরুত্বগণ।

আমার একটা কাজ না হলেই নয় রে নদে। চেষ্টা করবি?

নদে একটু চিন্তিত হয়ে বলে, কাজ তো মেলা নিমাইদা, কিন্তু সেসব তোমার জন্য নয়। তুমি হলে সাধু মানুষ। মিথ্যে কথা কইবে না, চুরি করবে না, অন্য পথে যাবে না। তোমার জন্য কি এই কলিকালে কোনও কাজ আছে? তবে একটা খবর দিতে পারি তোমায়। ভাল খবর।

কী খবর রে?

তোমার সেই পুরোনো ঠিকাদারবাবু আবার এ তল্লাটে কাজ করছে।

নিমাই অবাক হয়ে বলে, তাই?

কাঁচড়াপাড়ার দিকে কি সব সরকারী ভবন-টবন হচ্ছে। একবার গিয়ে দেখতে পারো।

নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, বড় ভালবাসতেন আমায়। কিন্তু এখন কি আর চিনতে পারবেন? তাঁর মেলা লোক-লস্কর, কত জনকে মনে রাখবেন?

গিয়ে একবার পেনামা ঠুকে দাঁড়াও সামনে। কিছু হল হল, নইলে মনে করে নেবে, চেষ্টা তো করেছিলাম, হয়নি তো কি করা যাবে?

খবরটা ভাল। খুবই ভাল। কিন্তু নিমাইকে মনে রাখা শক্ত। সে ছোটোখাটো, রোগাভোগা, ক্ষম্মা মানুষ। মনে রাখার মতো চেহারাখানাও তো নয়।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, নিরঞ্জনবাবু তাকে মনে রেখেছেন। পরদিন সকালবেলায় যখন নিরঞ্জনবাবুর কাছে কাঁচড়াপাড়ায় গিয়ে হাজির হল নিমাই তখন নিজের নামধামও বলতে হল না। নিরঞ্জনবাবু তার দিকে চেয়েই বলে উঠলেন, নিমাই না?

নিমাই তাড়াতাড়ি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, যে আজ্ঞে।

বলেই তার চোখে জল এল কৃতজ্ঞতায় ।

তা কি করছে এখন ?

কিছু নয় । বসে আছি ।

বিয়ে করেছিলে না ?

আজ্ঞে ।

তবে তো সংসার হয়েছে । চলছে কিসে ?

নিমাই মাথা চুলকালো । চোখে ফের জল আসছে ।

দৈববাণীই যেন শোনা গেল নিরঞ্জনবাবুর গলায়, কাজ চাও নাকি ?

নিমাই মরমে মরে গেল । উনি আসামে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, নিমাই যায়নি । সেই লজ্জা আজ তাকে অধোবদন রেখেছে ।

নিরঞ্জনবাবু বললেন, তুমি ধর্মভীরু সং লোক । আমি এখানে আরও বছরখানেক কাজ করব । বেশিও হতে পারে । লেগে পড়তে পারো কাজে ।

নিমাই নিরঞ্জনবাবুর দিকে চেয়ে জলভরা চোখে ধরা গলায় বলল, আপনার বড় দয়া ।

কাঁদছো কেন ? কী হয়েছে ?

আজ্ঞে, কিছু হয়নি । আমার মনটা বড় দুর্বল । দয়া-মায়া দেখলে চোখে জল আসতে চায় ।

পাগল আর কাকে বলে! তুমি একটা দোকান দিয়েছিলে না ?

সে টোকেনি ।

নিরঞ্জনবাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন, চৌকিদারের চাকরি যেমন করার করবে, সঙ্গে আর একটা কাজও করতে পারো । গোড়াউনের ধারেরই কাজ হচ্ছে । সাইটে একটা চা-বিক্রুটের দোকানও খুলতে পারো । কাল থেকেই লেগে পড়ো কাজে । আগে যা দিভাম তার চেয়ে কিছু বেশিই পাবে । টাকার দাম কমছে ।

নিজের কানকে, নিজের ভাগ্যকে যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না নিমাইয়ের! কলিকালে সং হওয়া হয়তো আত্মমর্কি, কিন্তু সে বৃকের মধ্যে ওইটুকু পুষে রেখেছিল বলেই নিরঞ্জনবাবুর তাকে চিনতে ভুল হল না । ওইটুকুর জন্যই ফের পুরোনো চাকরি ফিরে এল ।

সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে নিমাই আজ কীর্তন করতে বসল । গাইতে গাইতে চোখ ভেসে গেল জলে । ভগবানের নামে কত জয়ধ্বনি দিল সে । এই যে মরতে মরতেও বেঁচে থাকা, এই যে প্রাণপাখি খাঁচা ছেড়ে গিয়েও ফের ফিরে আসে, এটুকুই তার দয়া ।

মা বলল, আহা, কী গলাখানা তোর । শুনলে বুক জুড়ায় । গা বাবা, খুব গা ।

শোওয়ার আগে আজ ঠাকুরকে উদ্দেশ্য করে ভক্তিরত্ন প্রণাম করল নিমাই । বলল, বীণাকে ভাল রেখো ঠাকুর । তার স্মৃতি হোক ।

রাতে তার ঘুমের মধ্যে বিরহের কত ঢেউ যে এসে ভাঙল তার ঠিকঠিকানা নেই । বীণাপাণিকে স্বপ্নে দেখল । কী যে দেখল তা জাগার পর আর মনে রইল না ।

সকালে পকেটের টাকা বেশিরভাগই মায়ের হাতে দিয়ে বলল, এ দিয়ে কষ্ট করে কয়েকটা দিন চালাও । আমার কাজ হয়েছে । আর তেমন কষ্ট হবে না ।

ওরে, বীণাপাণির খবর কি ? তোকে যে কেমনধারা দেখছি ।

বললাম তো বাপের বাড়ি গেছে ।

সে তো শুনলাম । কিন্তু তুই লুকিয়ে কাদিস কেন ?

অত খতেন নিও না তো । নিমাই রাগ করে বলে ।

খতেন নেবো না ? ঝগড়া করেছিস নাকি ?

না গো, ঝগড়া করার মুরোদ কি আমার ? তারটা খাই, তারটা পরি, ঝগড়া করলে চলবে ?

তাহলে হল কী ?

কিছু হয়নি ।

বড় ভয় হয় যে বাবা ।

ভয় পেয়ো না । ভগবান এখনও আছেন ।

নিরঞ্জনবাবু কিছু আগাম দিলেন । চাকরির পাশাপাশি দিন তিনেকের মধ্যে দোকানটাও ঠুকে দিল নিমাই । চা, বিক্রুট, কোয়াটার পাউরুটি আর ঘুগনি । লেবারাররা খুব খেতে লাগল দোকানে ।

এত সব ঘটে যেতে মাত্র দিন দশেক লাগল । মাত্র দিন দশেক আগেই না এক ভোরবেলা শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে তার মনে হয়েছিল দুনিয়ায় তার আর যাওয়ার জায়গা নেই ? চোখের জলে দুনিয়াটিকে ডুবজল করে ফেলেনি নিমাই ? ভগবান যে এখন টাকটা-সিকোটার দৃষ্টি রাখছেন দিলেন সে কি এমনি ?

এগারো দিনের মাথায় পুরোনো খোলটা ভাল করে ছেয়ে নিল নিমাই । সন্দের পর সেটা ডুগডুগ করে বাজিয়ে, কখনও করতাল নিয়ে কীর্তনে বসে যায় । আজকাল নাম গান করতে তার সহজেই চোখে জল আসে । বৃকের মধ্যে বিরহের কোকিলটাও বড় ডাকে । আর বৃকের মধ্যেই আরও একটা ব্যাপার হয় । উত্তরে বাতাসে নাড়াবন যেমন আশুনে হু হু করে পুড়ে যায় তেমনি একটা কিছু পোড়ে । বড় জ্বালা ।

বীণাপাণি : ত্যাগই দিল তাহলে ? খবরটাও নিল না তো! নিমাইও খবর করল না । বৃকের যেখানটায় সেই রাতে খামচে ধরেছিল বীণা, সেখানটায় যেন আজও ব্যাথাটা থাবা গেড়ে আছে ।

এই যে নিমাইদা, কেমন খবরটা দিয়েছিলাম তোমায় ?
 নদে! আয়, বোস।
 দুপুরের টিফিনের সময়। দম ফেলার ফুরসত নেই নিমাইয়ের। তবু ভারি কৃতার্থ লাগে নদের কাছে। যত্ন করে এক
 গ্রেট ঘুগনি তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, খা। কেমন হয়েছে বল দেখি।
 আর একটু খাল দিয়ে কসা করলে খুব জমত।
 ওরে, কসা করলে পাউফ্রুটি ডোবাবে কিসে ? কোল না হলে হয় ? দেখ না কেমন ডুবিয়ে থাকছে।
 তা বটে। তা কেমন হচ্ছে তোমার ?
 তোর জনাই হল।
 আরও বড় কিছু ধরলে পারতে। কটা টাকাই বা হয়।
 জিব কেটে নিমাই বলে, এর বেশি চাইতে নেই। আমার তো এতেই মনে হয় রাজা-গজা হলাম বুঝি। বুড়োবুড়ি চাট্রি
 ষেতে পাচ্ছে, আমারও দুবেলা জুটে যাচ্ছে। আমার মত মানুষ আর কী চায় রে ? এটুকু জুটলেই হল।
 তোমার দ্বারা কিছু হবে না নিমাইদা। তোমার মনটাই এইটুকুন।
 তা বটে।
 আমিও যে এইটুকুন।

॥ ৪৯ ॥

তোমার বড় মেয়ের কত বয়স হল তা জানো ?
 কেন জানব না ? উনিশ।
 মোটেই নয়, কুড়ি পেরিয়ে একুশ।
 বাড়াম্হে। কুড়ি পেরোলেও একুশ হয় না, একুশ পূর্ণ হলে একুশ হয়।
 বাপদের একটা দোষ কি জানো ? ছেলেমেয়েদের বয়স হলেও সেটা স্বীকার করতে চায় না। তুমি হলে সেইসব
 বাপদের মধ্যে আরও এক কাঠি। আচ্ছা না হয় কুড়িই হল, কুড়িও কি কম ?
 এসব হিসেব-নিকেশ উঠছে কেন অপু ? বিয়ের কথা ভাবছো নাকি ?
 ভাববো না ? তুমি ভাবো না বলেই আমাকে ভাবতে হয়। আমার তো আর তোমার মতো চোখ বুজে থাকার অভ্যাস
 নয়।
 কী সর্বনাশ! তুমি ঝুমকির বিয়ের কথা ভাবছো! আজকাল কি মেয়েদের কুড়িটা কোনও বয়স ? তুমি যে গৌরীদানের
 যুগে ব্যাক করে যাচ্ছে!
 পাত্র বাছতে বাছতে কুড়িই বাইশ তেইশে গিয়ে দাঁড়াবে। মেয়ের বিয়ে বলে কথা, আগে থেকে চেষ্টাটা অন্তত শুরু
 করতে হয়।
 মণীশ কিছুক্ষণ অপলক চোখে তার বউয়ের দিকে চেয়ে থেকে বলল, তোমার কথাবার্তা এত প্রবীণা গৃহিণীর মতো
 হয়ে যাচ্ছে কেন বোলা তো! বড়িয়ে যাচ্ছে নাকি ?
 অপর্ণা হেসে ফেলল। তারপর মুখটা একটু গম্ভীর করার চেষ্টা করে বলল, অস্বীকার করে লাভ নেই যে, আমাদের
 বয়স হল।
 ওভাবে বোলো না অপু। কানে লাগে। এই তো সেদিনও তুমি যুবতীটি ছিলে, আজও আছে। অন্তত আমার চোখে
 তো অন্যরকম লাগছে না। তবে প্রবীণাটি হলে কবে ?
 প্রবীণা না হলেও মধ্যবয়স্কা।
 তার মানে কি বিগতযৌবনা ?
 যৌবনের খবর কি আমার রাখার কথা! আমি শুধু জানি আমার ছেলেমেয়ের বয়স হচ্ছে, সংসারের দায়িত্ব বাড়ছে।
 একটা কথা বোলা অপু। সাজগোজ করে যদি বেরোও তাহলে কি আজকাল পুরুষের অ্যাডমিরেশন পাও না ? দু-চার
 জোড়া মুগ্ধ চোখ কি তোমার দিকে চেয়ে থাকে না ?
 অপর্ণা রাগ করতে চেষ্টা করল। জরুজি করেও হেসে ফেলে বলে, আমি আজকাল সাজি নাকি ? পুরুষদের লক্ষ
 করতেও আমার বয়ে গেছে।
 একটু লক্ষ কোরো অপু। যদি দেখ যে, পুরুষের চোখ এখনও তোমাকে লক্ষ করছে তাহলে নিশ্চিতভাবে জেনো,
 তোমার যৌবন যায়নি।
 যে-পুরুষটিকে নিয়ে আছি সে লক্ষ করলেই হল। আর আমার কাউকে চাই না।
 আমার চোখ তো ভুল চোখ। সেই যে ট্রামগাড়িতে ভয়ে আধমরা যুবতীটিকে দেখেছিলাম, চারদিকে টিয়ার গ্যাস,
 গুলি আর ট্রামের মধ্যে পড়ে থাকা লাশের ভয়ংকর অবস্থায়, দেখেই আমার ভিতরে যে একটা উথাল-পাথাল হয়েছিল,
 আজও তোমাকে দেখলে ঠিক সেরকমটি হয়। কই, পাষ্টাওনি তো তুমি! আমার চোখে তোমার বয়স বাড়ছে না, যৌবন যায়
 না। তাই বলছি আমার চোখ হল ভুল চোখ।
 ভুল চোখই তো। তোমার চোখে আমার বয়স বাড়ছে না, ছেলেমেয়ের বয়স বাড়ছে না।
 মেয়ের বিয়ের কথা উঠছে কেন বোলা তো!
 দেখতে থাকা ভাল। বয়স হয়ে গেলে আর ভাল পাত্র পাবে না।
 না, অপু, তুমি সেজন্য বলছো না।
 তবে কেন বলছি ?

রাত্রে শোওয়ার আগে বিছানায় দুজন পাশাপাশি আধশোয়া। গায়ে পাতলা কবল। একটু বাদেই বেড সুইচ টিপে আলো নিবিয়ে দেবে অপর্য। তার আগে দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে আছে নির্নিমেষ।

মণীষ হঠাৎ বলল, তুমি আমার হার্ট অ্যাটাকের কথা ভেবে বলছো না তো ? হয়তো ভাবছো, আমার অনিচ্চিত্ত আয়ু, তাই তাড়াতড়িঝুঝুকের বিয়েটা দিয়ে দেওয়া ভাল। তাই ভাবছো অণু ?

তারি বিবৃত বোধ করে অপর্য। বলে, যাঃ! ওকথা কেন ভাববো ? কী যে যা-তা বলো না!

কিন্তু অপর্য নিজের অপ্রস্তুত মুখটাকে লুকোতেও পারে না। মণীষের অনিচ্চিত্ত হৃদযন্ত্রের কথা ভেবে ভেবেই যে আজকাল বেশীর ভাগ সিদ্ধান্ত নেয়। এটাও নিয়েছিল।

বাড়ি করার কথা বলবে না অণু ?

বাড়ি! হঠাৎ বাড়ি কেন ?

তোমার যে চার কাঠা জমি কেনো আছে। আমি বেঁচে থাকতে থাকতে সেখানে একটা বাড়ি করে ফেল। এখনই শুরু করলে আমি হয়তো বাড়িটা দেখেও যেতে পারি।

বেড সুইচ টিপল না অপর্য। মণীষের দিকে খানিকক্ষণ অপলক চেয়ে থেকে বলল, আমাকে কঁাদাতে চাও ? বউয়ের চোখের জল বুঝি খুব ভাল লাগে ?

বলতে বলতেই অপর্যর চোখ ভরে উঠল জলে। মণীষ সেদিকে চেয়ে রইল, কিন্তু একটুও উদ্বল হল না। তার মুখখানা ক্লান্ত, বিমর্ষ, আনমনা। একটু ধরা গাড়ি স্বরে বলল, তুমি বাস্তববাদী অণু। ঠিকই ভাবো। কিন্তু তোমাকে আজ বলি, আমি কিন্তু তোমার চেয়েও বেশি ভাবি। আমার বউ আর তিনটে অপোগণও বাচ্চাকে আমি কার জিম্মায় দিয়ে যাবো।

অপর্যর ফোঁপানির শব্দ শুনতে পাচ্ছিল মণীষ। অন্য সময়ে হলে সে অস্থির হত। সে কারও কান্না সহ্য করতে পারে না। আজ বাধা দিল না। চিত হয়ে শুয়ে সিলিঙের দিকে চেয়ে বলল, আমি প্রভিডেন্ট ফান্ডের লেনেনের জন্য একটা দরখাস্ত দিয়েছি। বাড়ির প্র্যান করার জন্য একজন আর্কিটেক্টের সঙ্গে একটু কথাও হয়েছে।

অপর্য কান্নার মধ্যেই বলল, চুপ করো।

কৈদো না অণু। তোমার কথাটা আমি অন্যভাবে ধরিনি। নিজের মৃত্যুর কথা আমি তো সবসময়ে ভাবি।

অপর্য হঠাৎ তার গলা জড়িয়ে ধরে হেঁচকির মতো শব্দ করে বলে, কেন ভাববে ? কত লোক তো হার্ট অ্যাটাকের পরও অনেকদিন বেঁচে থাকে। তুমি কেন থাকবে না ?

বেঁচে থাকতে তো আমার আপত্তি নেই অণু। বাঁচলে তো ভালই। কিন্তু হার্ট যখন বিগড়ে বসেছে তখন তাকে বিশ্বাস করা কি ঠিক হবে ? আমি বাড়িটাই আগে করে ফেলতে চাই। ঝুমকির বিয়ে নিয়ে তত মাথাব্যথা নেই। কিন্তু তোমাদের নিরাশ্রয় করে যাওয়াটা অপরাধ হবে।

আবার ওসব বলছো ?

তোমার জমিটা আমার পছন্দ ছিল না। কিন্তু মনে হয় তুমি খুব বুদ্ধিমতীর কাজই করেছে।

আর বোলো না। চুপ করো, পায়ে পড়ি।

মণীষ নিজেই বাড়িটা নিবিয়ে দিয়ে বলে, ভাবাবেগ নিয়ে বসে থাকা তো ঠিক নয় অণু। তুমি কঁাদছো কেন ? তুমি তো জানো আমি কিরকম ফুর্তিবাজ হুল্লোড়বাজ মানুষ। যতক্ষণ বেঁচে আছি হাসি-খুশি-মজা নিয়েই তো বাঁচতে চাই। কিন্তু সেটা ইদানীং হচ্ছে না। ভবিষ্যতের চিন্তা এসে পড়ছে। কেবল ভাবছি তোমাদের কী হবে। প্রিয়জন মারা গেলে প্রথমটায় শুধু তার অভাবের জন্য হাহাকার হতে থাকে। কিন্তু সেই কষ্টটা বেশীক্ষণ থাকে না। তারপরে আসে অবশ্যস্বাবী হিসেব নিকেশ। আমাদের জন্য লোকটা কতখানি রেখে গেল, আমাদের কষ্টটা নিয়ে গেল। তখন শুরু হয় লোকটার বিচার।

তোমার মুখের কি কোনও আগল নেই ? তুমি কি জানো তোমার প্রত্যেকটা কথা আমার বুকে এসে লাগছে ?

কেন জানব না ? তবু তোমাকে শক্ত হতে বলি। আমি আগে পরস্যা ওড়াতে ভালবাসতাম। একটু বড়লোকী করতে ভাল লাগত। আজকাল দেখ না কত হিসেবী হয়েছি ? আমার অপব্যয় তুমি চিরকাল অপছন্দ করতে। আমি আজকাল ভাবি, তুমিই ঠিক।

অপর্য মণীষের বুকের মধ্যে নিজেকে এগিয়ে দিয়ে বলল, প্রীজ! ঘুমোও।

মণীষের শিথিল একখানা হাত আলতো জড়িয়ে রাখল অপর্যকে। আলিঙ্গন করল না। মণীষ চাপা স্বরে বলল, হার্টের একটা ধাক্কা আমার জীবন-দর্শনটাই পাশ্টে দিয়ে গেল। মৃত্যুটা কী জিনিস বলো তো অণু! তোমাদের ছেড়ে আমি কোথায় যাবো ? তোমাদের ছাড়া আমি যে কিছু ভাবতে পারি না।

অপর্য মণীষকে প্রগাঢ়ভাবে চুমু খেল। চেষ্টা করল তাকে যৌন আবেগে অন্যমনস্ক করার। কিন্তু পারল না। মণীষ আজ বিষণ্ণ, আনমনা। মণীষকে আজ ভুতে পেয়েছে।

মণীষ অপর্যকে কোমলভাবে নিরস্তুর করে বলে, আমার মৃত্যুর ঠিক পরের অবস্থাটা নিয়ে আমি খুব চিন্তা করি অণু। আমি মরে গেলে তোমরা খুব কঁাদবে, পাগলের মতো হয়ে যাবে শোকে। আমার মৃতদেহ নিয়ে যেতে দেবে না, খাট ধরে পড়ে থাকবে তুমি ...

অপর্যর হাত এসে মুখটা চাপা দিল মণীষের। অপর্য ফের নতুন করে কৈদে উঠল, ও কথা কি করে বলছো তুমি ? এমন করে কেউ বলে ?

শোনোই না। এ শুধু কথার কথা তো নয়। জীবনে সত্যগুলোর মুখোমুখি হবে না অণু ? শুধু ভয় পেলে, শুধু কঁাদলেই কি হবে ?

চুপ করো! চুপ করো ? আর বোলো না।

শোনো, অণু, নিষ্ঠুর সত্যটার কথা শোনো। তোমাদের শোক খুব সত্য। আমার জন্য তুমি কঁাদবে, ঝুমকি-বুবকা-অনু কঁাদবে। বাড়িটা ভীষণ ফাঁকা হয়ে যাবে। সব সত্য। কিন্তু শোকের পাখর বুকে চাপা দিয়ে কতদিন থাকবে তোমরা ?

একদিন চোখের জল মুখে উঠতে হবে তোমাদের। ঘর-গেরস্থালিতে চোখ ফেরাতে হবে। দিনের পর দিন কাটতে থাকবে। শোক কমতে থাকবে। ধীরে ধীরে বাড়িটা আর তত ফাঁকা লাগবে না। সব সময়ে আমার কথা আর মনে পড়বে না। শোক তো পুকুরে ডিল। ধীরে ধীরে ঢেউ মরে যায়। আবার নিখর হয়ে যায় জল। এ বাড়িতে, এ সংসারেও তেমনি ধীরে ধীরে আমার অভাবটাও তোমাদের অভ্যাস হয়ে যাবে। ছেলেমেয়েরা বড় হবে, ওদের সংসার-টংসার হবে, ছেলেমেয়ে হবে, তোমার হবে নাচিনা-নাচনী। আমি তখন নেই হয়ে যাবো। শুধু স্মৃতি। তাই না অপু ?

অপর্ণা উঠে বসে ঝোঁপা ঠিক করলে করতে বলল, আমি ঝুমকির কাছে গুতে যাচ্ছি। তুমি একা থাকো। এরকম অসভ্য লোকের সঙ্গে আমি থাকতে চাই না।

দু'হাতে অপর্ণাকে ধরে ফেলে মণীশ নিজের বুকে টেনে নেয় তাকে। বলে, শোনো, আমার কথা শেষ হয়নি এখনও। তুমি ভীষণ খারাপ লোক। আগে জানলে তোমাকে আমি বিয়েই করতাম না।

মণীশ হেসে ফেলে। তারপর অপর্ণাকে একটি আদর করে বলে, মরার কথা বলছি বলে রাগ করছো কেন ? মৃত্যুচিন্তা তো খুবই স্বাভাবিক। এই চিন্তাই তো মানুষকে জীবনের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। ধরো আমাদের যদি মৃত্যু না থাকত, যদি আমরা কেউ বুড়ো অথর্ব না হতাম, হাজার হাজার বছর যদি এরকমই থাকতাম তাহলে কি সেটা ভাল হত ? বড় একঘেয়ে হয়ে যেত না কি ? এই যে আমাদের বাইশ বছরের বিবাহিত জীবনের সুখ, এটা কি বাইশ হাজার বছর টিকিয়ে রাখা সম্ভব হত অপু ? আমরা দুজনে কি দুজনকে বাইশ হাজার বছর সহ্য করতে পারতাম!

ঘন হয়ে মণীশের বুকে লেপটে থেকে অপর্ণা বলল, পারতাম। আমি পারতাম।

মণীশ একটু হেসে বলল, নিষ্ঠুর সত্য হল, পারতাম না। কেউ পারতাম না। জীবনটা ক্ষণস্থায়ী বলেই কিছুটা সুন্দর। মৃত্যুটা কী তা আজ অবধি কেউ জানে না অপু। মৃত্যুর পরও কি আমি একটুখানি থাকব ? আত্মা হয়ে ? ভূত হয়ে ? যেমন ভাবেই হোক আমি একটু থাকতে চাই। যদি ভূত হই তাহলে এ বাড়িতে তোমাদের কাছাকাছিই এসে থাকব। নিশুত রাতে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে ঘুরে তোমাদের দেখব, আদর করব।

উঃ মা গো! তুমি বোধহয় মানুষ খুন করতেও পারো। আমার বুকের ভিতরটা কেমন করছে ওসব শুনে! ছাড়ো তো আমাকে, ছাড়ো! আমি কিছুতেই তোমার কাছে থাকব না।

তোমাকে ছাড়া কাকে এসব কথা বলব বলো তো! আর কে আমার এসব আবেল-তাবেল শোনার জন্য বসে আছে ? এক বুক কথা জমে থাকে, একজন কাউকে তো বলতে হবে! তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার ?

এসব বুঝি ভাল কথা ?

ভাল নয়, কিন্তু আমার যে এখন এইসব কথাই মনে হয়। মরতে আমার একটুও ভয় নেই, কিন্তু কষ্ট আছে। মনের কষ্ট।

অপর্ণা দু'হাতে বেঁটন করে মণীশকে। সোহাগে ডরা গলায় বলে, তুমি মরবে কেন ? এসব ভেবো না। তোমাকে আমি ঠিক বাঁচিয়ে রাখব। আমার ইচ্ছের জোর আছে। আমার ভালবাসারও জোর আছে।

কী হয় জানো! আজকাল পৃথিবীকে বড় সুন্দর লাগে। তোমাদেরও যেন বেশী করে ভাল লাগে। এতকাল হেলাফেলা করে যখন বেঁচে থাকতাম তখন পৃথিবীর এত রূপ চোখেই পড়ত না।

গ্লীজ! আর নয়। একদিনে অনেক বলেছো। রাত বাড়ছে। তোমার যে ঘুম দরকার।

ঘুমের কথাই তো হচ্ছে। টানা লম্বা চিরনিদ্রা। আমার ঘুমোতে ইচ্ছেই করে না আজকাল। ইচ্ছে করে যতক্ষণ পারি জেগে থেকে পৃথিবীটা ভাল করে দেখে নিই।

তোমার সঙ্গে আজ কথাই তো বলতে পারছি না। ঝুমকির বিয়ের কথা তুলেই মস্ত ভুল করে ফেলেছি।

না, ভুল করেনি। বিয়ে দেওয়া যে দরকার তা আমি জানি। কিন্তু কোনটা আগে, কোনটা পরে তা স্থির করাটাই এখন জরুরী।

কী বলছো ?

বলছি, আমার হাতে কতটা সময় আছে তা যখন জানি না তখন দেখতে হবে কোন কাজটা আগে করা দরকার, কোনটা পরে হলেও চলবে। আমি প্রথমেই বাড়িটা করে ফেলতে চাই। বুঝলে ?

আজ অনেক খারাপ খারাপ কথা বলেছো। তবু তার মধ্যে এই একটা কথা যা শুনতে ভাল লাগছে। আমাদের একটা বাড়ি দরকার। ভাড়ার বাড়িতে থাকতে আমার একটুও ভাল লাগে না। পার্মানেন্ট কিছু না হলে একটা টেনশন থাকেই।

মণীশ একটু হেসে বলে, ওনলে তুমি রাগ করবে। কিন্তু জমির দলিল কখনও মন দিয়ে পড়ছো ?

কেন বলো তো!

দলিলে পরিষ্কার লেখা থাকে জমিটা তোমার নয়। সরকারের। তোমাকে কেবল ভোগ দখলের স্বত্ত্ব দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর এক ছটাক জমিও তোমার নিজের নয়। আবার দেখ, জমিটা কি সরকারেরই! তাও নয়। কারণ, একদিন, অনেক অনেক বছর পরে পৃথিবীর সব সৃষ্টি যখন ধ্বংস হয়ে যাবে, পৃথিবী যখন একটা ঠাণ্ডা অন্ধকার গ্রহে পরিণত হবে তখন কোথায় সরকার, কোথায়ই বা তার অধিকার ? পার্মানেন্ট কথাটাকে বিশ্বাস কোরো না অপু। আমরা কেউ কোথাও কখনোই পার্মানেন্ট নেই।

তুমি আজ বড্ড জ্বালাচ্ছো তো!

তোমার মনটা খুব খারাপ করে দিলাম তো!

তা তো দিয়েছিই। আমার কান্না দেখতে তুমি বরাবর ভালবাসো।

আচ্ছা, ক্ষমা করে দাও।

ক্ষমা কি এত সহজ ? আমার মনটা এমন ভেঙে দিয়েছো যে আর কিছুতেই ভাল হবে না। শুধু যদি অনেক আদর করো আর অনেক ভাল ভাল কথা বলো তাহলে হয়তো একটু ভাল লাগবে।

মণীশ শুধু আর একটু জড়িয়ে নিল অপর্ণাকে। তার বেশী কিছু করল না। তেমনি বিষাদ মাথানো গলায় বলে, শুধু এইটুকুর জন্যই কি জীবন ?

আবার মাথা গরম হল বুঝি ?

না। আমার মাথা খুব ঠাণ্ডা। কিন্তু ভেবে দেখ তো, মানুষ জন্মায় কেন ? এই জন্মের উদ্দেশ্যটা কী ?

কিছু একটা তো আছেই।

একটা মানুষ জন্মায়, বড় হয়, লেখাপড়া শেখে, রোজগার করে, বিয়ে হয়, সন্তান হয়, টাকা জমায়, বাড়ি করে, তারপর বুড়ো হয় মরে যায়—ব্যাপারটা অদ্ভুত না ?

কেন, অদ্ভুত কিসের ?

শুধু এসবের জন্য তার জন্মানোর দরকারটা কি ? তার চৈতন্য, বুদ্ধি, বিচারবোধ, এক্সপ্রেশন এসব তো কাজেই লাগে না। তার অস্তিত্বটা একদম একটা ফালতু ব্যাপার বলে মনে হয় না তোমার ?

আমি কি তোমার মতো ভাববার সময় পাই ?

ভাবো না কেন অপু ? ভাল করে ভেবে দেখো তো, এই সামান্য অর্থহীন ক্রিয়াকর্মের জন্য আমাদের জন্মানোর সত্যিই কি জরুরী প্রয়োজন ছিল ? জন্মটাকেই আমার আজকাল কাঠগড়ায় দাঁড় করাত ইচ্ছে করে। জন্মালাম কেন অপু ? এই জীবনটা যে বড় অর্থহীন। সম্পূর্ণ মিনিটেলস। ভেবে দেখ তো, সত্যিই এর কোনও অর্থ আছে!

আমার কিন্তু আবার কান্না পাচ্ছে।

কান্নাটা কোনও সলিউশন নয়। আমি তোমার কাছে একটা সলিউশন চাইছি।

আমার কাছে সলিউশন চাইছো! আমি কি একটা সামাজিক জ্ঞানী লোক।

মণীশ একটু হেসে বলে, জ্ঞানীরাই কি পারে ? তারাও তো হাতড়ে মরছে। প্রাণের রহস্য ভেদ করা কি অত সোজা ?

তরাই যদি না পারে তাহলে আমি পারব কি ভাবে ?

কে যে জানে তাই তো জানি না। কার কাছে যাবো অপু ? কে বুঝিয়ে দেবে এই অর্থহীন জীবনের প্রকৃত মানে ?

আচ্ছা, আরও লক্ষ লক্ষ লোক তো আমাদেরই মতো বেঁচে আছে। আছে তো! তারা কি এত মাথা ঘামায় এ নিয়ে ?

তাই কি আমাকেও মাথা না ঘামাতে বলছো ?

বলছি। ওসব ভাবলে তোমার শরীর খারাপ হবে।

মানুষ যদি মাথা না ঘামাত তাহলে পৃথিবীর কোনও সত্যই আবিষ্কার হত না অপু। প্রশ্ন, কেবল প্রশ্ন করে করই না মানুষ এত জেনেছে। কিন্তু জানা আরও কত বাকি। সবচেয়ে ভাইটাল প্রশ্নই হল, এই জন্ম কেন ? কেন এই বেঁচে থাকা ?

তোমাকে কি আজ রাতেই সব জানতে হবে ?

প্রশ্নটা কত সিম্পল দেখ, কত প্রাসঙ্গিক। কিন্তু জবাবটা নিয়েই যত মুশকিল।

এবার ঘুমোও। পায়ে পড়ি।

আজ কি আমার ঘুম আসবে ?

ও মা গো! ঘুম না হলে যে ভীষণ খারাপ হবে। তুমি তো ট্র্যাংকুইলাইজার খেয়েছো! ঘুমের ওষুধ খেয়ে না-ঘুমোনা ভীষণ খারাপ।

তাহলে আর একটা খাই। কিন্তু ঘুমটা চটে গেছে।

ইস্! আমার যে ভয় করছে!

ধুস! ভয়ের কিছু নেই। শরীরটা প্রকৃতির দান। তাতে সবরকম রক্ষাকবচ দেওয়া আছে। অত ভয় পেও না।

আমারই ভুল। আমার মাথা কুটতে ইচ্ছে করছে। কেন যে মেয়ের বয়সের কথা ভুলতে গেলাম!

কথাটা তুমি না তুললেও কি আমি ভাবি না ভেবেছে ? সবসময়ে ভাবি, আমার কত কী করার আছে, কত দায়িত্ব আমার মাথার ওপর। তার মধ্যে ঝুমকির বিয়ের কথাও যে মনে না হয় তা তো নয়। তুমি কথাটা তুলে কিছু ভুল করানি অপু।

তোমাকে আর ঝুমকির বিয়ের কথা ভাবতে হবে না। ও মেয়ের বিয়ে দিলে তুমি থাকতে পারবে না। ছেলেমেয়ে তোমার চোখের মণি তা আমি জানি।

তবে কথাটা তুললে কেন ?

ঝুমকির কি বিয়ের ইচ্ছে হতে নেই ? আমাকে যখন বিয়ে করে এনেছিল তখন তো স্বশ্রমশাইয়ের মনের স্বর নাওনি।

তোমার আমার কথা আলাদা। এখন বলো তো, ঝুমকির কি বিয়ের ইচ্ছে হয়েছে ?

তা আমি কি জানি ?

তবে যে বলছো ঝুমকির ইচ্ছে হয়েছে!

মেয়েটা তো একটা আস্ত পাগল। বাবাকে সাহায্য করবে বলে হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজছে।

বিয়ের পর প্রথম প্রথম তাদের সারা রাত কেটে যেত গল্প আর ভালবাসার নানা প্রকাশে। আজ বহু দিন বাদে তারা প্রায় ভোর রাত অবধি জেগে রইল। তারপর ঘুমোলে। দুজনের বাহুপাশে বাঁধা হয়ে দুজনে। বহুদিন বাদে। মৃত্যুর ছায়া সাপের মতো দুলতে লাগল শিয়রে। অনিচ্ছিত ওই আক্রমণকারী না থাকলে কি এত ভালবাসা হয় ?

তিন দিন বাদে বাড়ির প্র্যান নিয়ে এল মণীশ।

অপু! শীগগির এসো। বুবকা, ঝুমকি, অনুকে ডাকো। বাড়ির প্র্যান এনেছি।

সে এত হাঁকডাক করতে লাগল যেন প্র্যান নয়, বাড়িটাই বয়ে নিয়ে এসেছে। “দ্যাখো, দ্যাখো” বলে সে সবাইকে ডেকে বাড়ির প্র্যান বোঝাতে লাগল। প্র্যানটা বেশ বড়লোকী। প্রত্যেক ছেলেমেয়ের জন্য আলাদা ঘর এবং আলাদা স্টাডি।

মণীশ আর অপর্ণার শোওয়ার ঘর যদিও একটাই, তবু তাদের আলাদা ড্রয়িং রুম আছে। মোট ছ'খানা বাথরুমের ব্যবস্থা করেছে মণীশ, তার একটা ফি-চাকরদের জন্য। ইনডোর গেম এবং জিমন্যাসিয়াম, মিউজিক রুম ইত্যাদিও রয়েছে।

প্র্যান দেখে অপর্ণা চোখ কপালে তুলে বলে, তুমি ডেবেছোটা কী ? আমরা কি কোটিপতি ?

আহা, নিজের বাড়ি বলে কথা। এটুকু না হলে আরামে থাকা যায় নাকি ?

এটুকু ? এটাকে এটুকু বলে ? যা প্র্যান করেছে তাতে আমার চার কাঠাই খেয়ে নেবে। লংকা গাছ, লাউ গাছ লাগাবো কোথায় ?

মণীশ খুব দমে গেল; বলল, তাহলে! পছন্দ হয়নি তোমার ?

আহা, কেমন বাক্সদের মতো অভ্যস্ত করছে দেখ। পছন্দ হবে না কেন ? কিন্তু আমরা তো আর রাজাগজা শেঠিয়া নই। আমাদের এত বড় বাড়ির দরকার নেই তো! বড় বাড়ি মেনটেন করার খুব কষ্ট। ঘরদোর ঝাড়পোছ করবে কে বলো তো ? ফি তো পাঁচশো টাকা চাইবে।

কেন, ড্যাকুয়াম ক্লিনার কিনব।

উঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারি না। আমরা হচ্ছি বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবার। অত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে আমাদের ভালও লাগবে না। যে যার নিজের ঘরে একা একা থাকলে কি ভাল লাগে ? আমরা আর একটু ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকব।

ঝুমকি, বুঝকা, অনু তিনজনেই সমস্বরে বলে উঠল, তাদের আলাদা আলাদা ঘরই চাই। প্রাইভেসি চাই।

অপর্ণা রাগ করে বলে, এত বড় বাড়ি করতে কত টাকা লাগবে জানিস তোরা ? বাপটাকে কি মারতে চান ?

॥ ৫০ ॥

ভাঙুনে নদীর ধারে বাড়িমর করতে আছে বাবু ? কাজটা ভাল হল না।

এ কি ভাঙুনে নদী ?

আগে তো খুব ভাঙত। আজকাল অট্টবোধ দেওয়া হয়েছে। এখন ভাঙছে না বটে, তবে নদীকে বিশ্বাস কি ?

আমার যে এ জায়গাটাই পছন্দ!

পছন্দের কী আছে? গাঁ-গঞ্জ জায়গা, গরিব দেশ। শখে শখে কিনলেন বটে, কিন্তু টেকা দায় হবে।

কেন, এখানকার লোক কি খুব খারাপ ?

বাঁকা মিঞা মাথা চুলকে বলল, খারাপ ভাল নিজেই বুঝে দেখুন। গগন দাস দামখানা কি কম নিল ? ঠারঠোরে আপনাকে কত বললাম, বিশ হাজারের একটি পরসাত ওপরে উঠবেন না। এ জমির দাম হাজার দশেক হলেই চের। তা আপনার উত্থন বাই চেপেছে, শুনলেন না। গগন দাস চেপে বসে রইল। ত্রিশ হাজারটা বড্ড বাড়াবাড়ি দাম হয়ে গেল কিন্তু। একখানা মোটে ঘর আর তিন কাঠা জমির অত দাম হয় ? গলাখানা বাড়িয়ে দিলেন বলেই না গগন কোপখানা দিল। খালধারে মহলের জমিটা কত সরেস ছিল, নিনেন না। দামটাও পড়তায় এসে যেত।

বাঁকা মিঞা বুঝবে না, কোনও কোনও জমির দাম শুধু টাকার নিরিখে হয় না। এইখানে নদী একখানা পেলায় বাক মেরেছে। বাকের একেবারে মুখে জমিখানা। আদিগন্ত থে থে করছে জল। নদীর দিকটায় একখানা দাওয়া ফুটিয়ে নিলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাবে শুধু চেয়ে থেকে। নদী কখনও ক্লান্ত করে না, একঘেয়ে হয় না। হু হু করে পাণ্ডলে হাওয়া বয় এইখানে। যদি ঝড় আসে তবে এইখানে বসে ঝড়ের আদিগন্ত রূপ দেখা যাবে। উখালপাখাল নদী, পাক খাওয়া মেঘ আর জলপ্রপাতের মতো বৃষ্টি। গগন দাস দু'পাঁচ হাজার টাকা বেশী নিয়ে থাকলেও হেমাঙ্গ সেটাকে ক্ষতি বলে মানে না। টাকা তো কাগজে ভড়ং, কী দাম তার ?

হেমাঙ্গ বাঁকা মিঞার দিকে তাকিয়ে বলে, একখানা বাথরুম করে দিতে পারবে ?

বাঁকা মিঞা একটু হাসল, চাইলে পারব না কেন ? তবে কলের জল তো পাবেন না। সে বন্দোবস্ত নেই। ডিজেল পাশ্প বসালে অবশ্য হয়। তাহলে আবার ওপরে জলের ট্যাংক করতে হয়। অতটা করবেন কি ?

না না, অত শহুরে ব্যাপার করলে মজাটাই মাঠে মারা যাবে। বালতির জলেই চলে যাবে। তবে একটা ঘেরা জায়গা না হলে আমার অস্বস্তি হয়।

হয়ে যাবে। মেঝেটা বাঁধিয়ে নেবেন। নইলে এখানে মা মনসার বড় উৎপাত। মেটে ভিটি হলেই গর্ত হবে। তেনারা সৈঁধিয়ে বসে থাকবেন। পাকা মেঝে হলে খানিকটা নিশ্চিন্ত।

হেমাঙ্গ একটু বিবর্ণ হয়ে বলে, তাই করো।

বছরে কদিন থাকবেন ?

মাঝে মাঝে চলে আসব। সারা বছর তুমিই দেখে শুনে রাখবে।

বাঁকা মিঞা একটা অসন্তোষের শ্বাস ছাড়ল। সে গাঁয়ের মাতব্বর লোক। গগন দাসের ঘরটা হেমাঙ্গ কেনায় সে খুশি হয়নি। না হওয়ারই কথা। জমি কতটা সরেস নিরেস তা বুঝবার মতো বিষয়ী বুদ্ধি তার হেমাঙ্গর চেয়ে কিছু বেশীই আছে। একটু আড়াআড়িও আছে গগন দাসের সঙ্গে।

কিন্তু হেমাঙ্গ খুশি। এইখানে সে এখন দু'দিন থাকবে। নদীর মুখোমুখি। একা। আপনমনে। কাজের জঞ্জাল থাকবে না, শহুরে সমস্যা থাকবে না। বেশ থাকবে সে।

গগন দাসের মাটির ঘরখানা যথেষ্ট মজবুত। চালে নতুন টিন লাগানো হয়েছে। একখানা টোঁকি ও বিছানার ব্যবস্থাও হয়েছে। টাকায় কি না হয় ? বেশ কয়েক বছর আগে হেমাঙ্গদের কয়েকটা ট্রাক ছিল। সেগুলো ক্যানিং অবধি ট্রিপ মারত। সেই ট্রাকগুলোর একটা চালাত বাঁকা মিঞা। ট্রাকের ব্যবসাতা ভাল চলেনি। পরে সেগুলো বিক্রি হয়ে যায়। কিন্তু বাঁকা মিঞার সঙ্গে সম্পর্কটা রয়ে গেছে। বাদা অঞ্চলের লোক। বিচক্ষণ এবং বিষয়ী। এখন ক্যানিং-এর তার একখানা দোকান

আর এই গাঁয়ে চাষবাস। দোকান ছেলেরা দেখছে। বাঁকা মিঞা গাঁয়ে মাতব্বর হয়ে বসে একটু-আধটু পলিটিক্স করছে। হোমস্পর কেন এই গাঁয়ে একটা বাড়ি করার দরকার হল তা গত সাতদিন মাথা ঘামিয়েও বাঁকা মিঞা বুঝতে পারছে না। তবে সাহায্য করছে।

আজ রাতে হোমস্পর এখানেই থাকবে জেনে নিজের লোক ডাকিয়ে এনে ঘরদোর সাফ করিয়ে নিকিয়ে দিয়েছে। জল তুলিয়েছে। দুপুরে মাছডাত খাইয়েছে, রাতেও খাওয়াবে।

বিকেলের আলো এখনও যথেষ্ট আছে। লালচে হয়ে এসেছে বটে, তবু আদিগন্ত ফটোগ্রাফের মতো দেখা যাচ্ছে। সামনেই ভটভটিং ঘাট। বাঁ দিক থেকে একটা খাল এসে বড় গাঙে মিশেছে। ঘাটে গোটা দুই ভ্যান রিক্সা দাঁড়ানো, সওয়ারি নেই। ইটে বাঁধানো সরু রাস্তার দু'পাশে কয়েকটা দীন চেহারার দোকান ঘর। আর একটু ভিতরপানে এগোলে মানুষের অনাড়ম্বর ঘর-গেরস্থান।

বাদায় কি মানুষ থাকে? আমরা হলাম জানোয়ার।

হোমস্প মুঞ্চ চোখে নদীর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ওই খালটার ওপারে তার ফিয়াট গাড়িটা গঞ্জের ঘাটে এক দোকানের সামনে পার্ক করা আছে। দুটো দিন পেট্রল আর ডিজেলের গন্ধ নাকে আসবে না। স্বাসবায়ুর জন্য পরিষ্কার বাতাস পাওয়া যাবে। আর হয়তো বা পাওয়া যাবে শহুরে নানা টানাপোড়েনে খণ্ডবিখণ্ড হোমস্পর ছিন্ন অংশগুলি। নিজেকে জুড়ে নেওয়া খুবই জরুরী এখন।

জানোয়ার! না, জানোয়ার হতে যাবে কেন?

তা নয় তো কী বলুন। এখানে মনিষ্যের জীবন আছে আমাদের? বাদার লোকের জন্য কে ভাবে বলুন। সরকারের তো মাথাবাখাই নেই।

পলিটিক্স বুঝক না বুঝক-বাঁকা মিঞা সবসময়ে অন্যায় অত্যাচার অবিচার ইত্যাদি নিয়ে কথা বলতে ভালবাসে। কথা শুরু হলে থামতে চায় না। হোমস্পর এখন সে সবে দরকার নেই। সে এখন একা হতে চায়। চুপচাপ হতে চায়।

সে বলল, তুমি এসো গিয়ে বাঁকা। আমি ঘরে বসে জিরোই।

তা জিরোন। চা খাবেন কখন?

না হলেও হয়।

না হবে কেন? ভূষণের দোকানে বলে দিয়ে যাচ্ছি, যখন হাঁক মারবেন ঘরে পৌছে দিয়ে যাবে। রাতের দিকে একটু সজাগ থাকবেন, চোর আসে।

আমার সঙ্গে দামী কিছু নেই।

প্যান্টখান শাটখানা তো আছে। কব্বল আছে, ঘড়ি আছে। চোরের তো বাছবিচার নেই। যা পাবে নিয়ে যাবে। তার লাভ না হোক, আপনার তো ক্ষতি।

ঠিক আছে, সজাগ থাকব।

পাকা বাঁশের একখানা লাঠি পাঠিয়ে দেবোখন, পাশে রেখে ঘুমোবেন। টর্চ আছে তো!

আছে।

তাহলে আপনি জিরোন গিয়ে। রাতে খাওয়ার সময় ডেকে নিয়ে যাবো।

বাঁকা বিদেয় হলে ঘরে এসে বিছানায় বসল হোমস্প। বড় নতুন আর অদ্ভুত এক অনুভূতি হচ্ছে। তার। নিখুম সন্ধ্যারের মতো কিছু একটা ঘনিয়ে উঠছে তার চারদিকে। জলের অবিরল কলকল শব্দ সৃষ্টি করছে রোমাঞ্চ। ঝাঁপের জানালাটা খোলা। সেইটে দিয়ে তাকালে নদীর প্রসার চোখে পড়ে। এখানে বড় গাঙ খুব চওড়া। কিছুক্ষণ বিছানায় আসনপিড়ি হয়ে বসে নদীর দিকে চেয়ে থাকে হোমস্প। নদী তার বড় প্রিয়। নদীর দিকে চেয়ে থাকলে তার ঘটীর পর ঘটী কেটে যায়।

বেলা আর একটু মরে এলে সে ঘরের বাইরে এসে তার তিন কাঠার সম্পত্তিটা ভাল করে আবার দেখল। চারদিকে বাঁশের নতুন বেড়া দেওয়া হয়েছে। গগন দাসের শখ অহ্লাদ বিশেষ ছিল না। কয়েকটা গ্যাঁদা গাছ লাগিয়েছিল, তাতে মরকুটে ফুল ফুটেছে। একখানা নারকোল গাছ আছে। আর কিছু আগছা। গগন দাস এখানকার বাস তুলে বসিরহাট চলে গেল গুড়ের ব্যবসা করতে।

হোমস্পকে দেখছিল আরও কয়েকজন। গুটিকয়েক বাস্কা ছেলেমেয়ে আর একটা বউ-মানুষ। বেড়া ঘেঁষে যে মেটে রাস্তাটা এখন তার ওপাশে একটু ঢাল। সেইখানে তারা দাঁড়িয়ে। কলকাতার এক বাবু এ গাঁয়ে ঘর কিনেছে—এটা একটা খবরের মতো খবর। হোমস্পর একটু লজ্জা হল। সে ঘরে এসে ফের কিছুক্ষণ নদী দেখল। অনবরত ভটভটিং, নৌকো আর লঞ্ছের যাতায়াত। কত কাজে কত মানুষ কত দিকে যায়, আসে।

এখানে শীত বেশ চড়া। হাওয়াটা কনকন করছে বড়। হোমস্প জানালার ঝাঁপ ফেলে দিল। কিছুক্ষণ শুয়ে রইল চুপচাপ। এমন কাজহীন, বাস্তবহীন সময় কি করে কাটাতে হয় তা সে এখনও শেখেনি। সময় লাগবে।

গত একমাস তার মন ভাল নেই। সে উদ্বিগ্ন, অশান্ত। তার একা এবং সুখী জীবনে কিছু একটা হানা দিচ্ছে। যেন কড়া নাড়ার শব্দ পাচ্ছে হোমস্প। সে চাক না-চাক ঘটনাটা হয়তো ঘটেই যাবে।

এটা ঠিক যে, হোমস্প চায় না। অন্তত তার মস্তিষ্ক চায় না। তার বোধ-বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে সে প্রত্যাখ্যান করতে চায়। কিন্তু বুকের ভিতর কেন তবু একটা দুর্বলতা-রক্তপথও তৈরি হচ্ছে?

মাসখানেক আগে শনিবারের এক সকালে টেলিফোন এল, কী করছেন আজ?

কোনও প্রেম্যাম করিনি তো!

আমি একটু এলে কি কিছু মনে করবেন? আমার একটা কথা আছে।

হোমস্পর বুক নানা আশঙ্কায় একটু দুরুদুরু করে উঠল। কিন্তু বলতেই হল, আসুন।

রশ্মির আসতে ঘন্টা খানেক লাগল। বোধহয় সাজগোজের জন্য। এমনতে কখনও তাকে সাজতে দেখেনি হোমস।
স্মেলিন খুব বলমলে রেশমী শাড়ি পরেছে, চোখে বোধহয় কাজল বা সূর্য্য জাতীয় কিছু। কিন্তু ভাল করে তাকাতেই পারছিল
না হোমস। তার বুক বিট্টে করছিল। একটু শ্বাসকষ্টও কি? কিছু একটা উঠলে উঠছিল বুকের ভিতরে? ওই হোমসকে তো
সে চেনে না।

এ কী! পোশাক পরেননি যে এখনও? শীগগির করুন।

হোমস অবাক হয়ে বলে, আমার কি কোথাও যাওয়ার কথা?

ওঃ, বলিনি বুঝি। আজ যে আমাদের বাড়িতে আপনার ভীষণ নেমস্তন্ন।

আগে বলেননি তো!

মুখটা একটু করুণ করে রশ্মি বলল, সেটা আমার দোষ নয়। নেমস্তন্ন যিনি করেছেন দোষটা তাঁর।

কে করছেন নেমস্তন্ন?

আমার মা। কিন্তু মা ভীষণ ভুলো মনের মানুষ। নেমস্তন্ন করবেন বলে ভেবেছেন, প্রিপ্যারেশনও নিচ্ছেন, কিন্তু আসল
কাজটাই করতে ভুলে গেছেন। ভুলটা আজ সকালে ধরা পড়ল। মা ভীষণ লজ্জায় আছেন। আপনি কি কিছু মনে করবেন?

নাঃ। বলে হোমস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, ব্যাচেলরদের তো মতামতের দাম নেই। আর নেমস্তন্ন খেতে আমি
পছন্দও করি। কিন্তু এখন তো সকাল নটাও বাজেনি। এখনই কি?

নেমস্তন্নটা ব্রেকফাস্ট থেকে শুরু হবে যে। একদম সেই ডিনার অবধি।

ও বাবা!

সেইজন্যই তো বলছিলাম ভীষণ নেমস্তন্ন। সহ্যশক্তির পরীক্ষা। আর স্তনন, ব্যাচেলর বলে কেউ আপনাকে কিছু বেশী
অপমান করছি না। মায়ের ভুলো মন বলেই এই বিপত্তি।

একটু কাহিল মুখে হোমস বলে, ব্রেকফাস্টটা স্কিপ করলে হয় না? আমার যে সকালে খাওয়ার অভ্যাস বিশেষ নেই।

তাই কি হয়? পারফেক্ট ইংলিশ ব্রেকফাস্টটা তৈরি হচ্ছে দেখে এসেছি। শুধু আপনার জন্যই। ব্রেকফাস্টের পরই
একটা আউটিং আছে। খাওয়া-দাওয়া সেখানেই।

কোথায় বলুন তো!

ডায়মন্ডহারবার রোডে। 'ঠাকুরপুকুর' ছাড়িয়ে মাইল দুই গেলে একটা স্পষ্ট আছে। খুব সুন্দর একটা বাগানবাড়ি।

গুনে ভিতরটা অনিচ্ছেয় ভরে গেল। সেই বাগানবাড়ি, সেই ফিস্তির মতো বিচ্ছিরি ব্যাপার, হয়তো বা সঙ্গে
রবীন্দ্রসঙ্গীত বা তাস খেলার ব্যবস্থা, হয়তো মদের বোতল। সবচেয়ে বড় কথা নানা রঙের, হরেক চরিত্রের একগাদা
লোক, দৈত্যো হাসি, সাজানো সাজানো কথা।

শঙ্কিত হোমস জিজ্ঞেস করল, বনভোজন নয় তো!

কয়েকজন থাকবে। আপনার অসুবিধে হবে তাতে?

না। অসুবিধে আপনার কি?

আপনি যে বেশী হরোড় পছন্দ করেন না তা আমি জানি। বেশী লোককে বলাও হয়নি। কিছু ক্রোজ রিলেটিভকে
নেমস্তন্ন করা হয়েছে। দশ বারোজন। প্রীজ, তৈরি হয়ে নিন।

নিশ্চি। কিন্তু আপনি একটু বসুন। এক কাপ কফি খান। এর আগে একদিন তো খুলো-পায়ে বিদায় নিলেন।

রশ্মি বসল। মিষ্টি হেসে বলল, চা বা কফিতে আমি কিন্তু চিনি খাই না।

এই ছুটির দিনটায় এরকমভাবে হরোড়ে বেরোতে একটুও ভাল লাগছিল না হোমসর। কিন্তু রশ্মি—রশ্মিই তাকে
টানছে। ভীষণ টানছে। কফি করতে করতে এই সত্যটা হঠাৎ টের পায় সে। সারা দিন ভিড়ের মধ্যেও রশ্মির সুন্দর
মুখখানা মাঝে মাঝে দেখা যাবে—সেই লোভ ফণা তুলছে ভিতরে। সে কি ব্রতভ্রষ্ট হচ্ছে? সে কি কামুক বা সংসারমুখী
হয়ে যাচ্ছে? সে কি প্রেমে পড়েছে?

এই চিন্তাই তাকে অস্থির করে তুলল।

কফি খেতে খেতে আচমকা রশ্মির আর একটা প্রশ্নও অগাধ জলের দিকে ঠেলে দিল তাকে। রশ্মি খুব মৃদু লাজুক
গলায় হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, ইংল্যান্ড জায়গাটা আপনার কেমন লাগে?

ইংল্যান্ড! কেন, ভালই তো।

কতটা ভাল?

খুব ভাল। জিনিসপত্রের দাম একটু বেশী এই যা।

আমি সে কথা জানতে চাইছি না। ইংল্যান্ডে যদি সেটল করতে হয় তাহলে কেমন লাগবে আপনার?

হোমস একটু শিহরিত হয়। তারপর চোখ সরিয়ে নিয়ে মাথা নেড়ে বলে, ভাল লাগবে না।

কেন?

নিজের দেশ ছাড়া আমার কোথাও ভাল লাগবে না। আমি একটু হোম-সিক।

ইংল্যান্ড থাকারও একটা আলাদা চার্ম আছে। আপনি তো মাত্র কিছু দিন ছিলেন। বেশী দিন থাকলে বুঝতে
পারতেন।

গলাটা সামান্য বিষণ্ণ শোনাল কি রশ্মির? কানের ভুলও হতে পারে। খুব সংকোচের সঙ্গে হোমস বলল, হঠাৎ
ইংল্যান্ডের কথা বললেন কেন?

রশ্মিও খুব সংকুচিত হয়ে বলল, এমননি।

অজানা আশংকায় বুকের মধ্যে অস্থিরতাটা একটু বেড়ে গেল হোমসর।

রশ্মি কফির কাপটা রেখে বলল, কখনও তেমন দরকার হলেও ইংল্যান্ডে সেটল করতে পারবেন না?

বিশ্বয়ের একটা ভান করতে হল হোমাসকে। বলল, ইংল্যান্ডে সেটল করার কোনও দরকার হবে কেন তাই বুঝতে পারছি না। কেউ তো আমাকে ডাকাডাকি করছে না ইংল্যান্ড থেকে!

যদি করে ?

হোমাস এ প্রশ্নটার কোনও নিষ্ঠুর জবাব দিতে পারল না। রশ্মির অসাধারণ মুখশ্রী অবলোকন করতে করতে স্তিমিত গলায় বলল, আগে তো ডাকুক। সেখানেই কত লোক বেকার বসে আছে।

আমি শুধু যদি-র কথা বলছি। যদি ডাক পান, যাবেন ?

হোমাস বুঝতে পারছে, তার সঙ্গে রশ্মির যে খোলামেলা হাসি-ঠাট্টার সম্পর্কটা ছিল সেটা হঠাৎ বদলে গেছে। দুজনেরই কিছু সংকোচ বোধ করছে। একটা সুস্থ লজ্জার পর্দা দুজনের মাঝখানে বার বার উড়ে আসছে। রশ্মি যে আর এক বছরের মধ্যেই স্থায়ীভাবে ইংল্যান্ডে চলে যাবে তা জানে হোমাস। হোমাসকে কে ডাকবে তাও সে বুঝতে পারছে। চারদিকের কী যে অঘটন ঘটিয়ে দিল!

নেমন্তুটাও ছিল খানিকটা অদ্ভুত। হোমাসের বুঝতে অস্বিধে ছিল না যে, নেমন্তুনের মধ্যমণি সেদিন ছিল সে-ই। রশ্মির মা ব্রেকফাস্ট থেকেই তার ওপর অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে শুরু করলেন। রশ্মির রাশভারী বাবা অবধি তার সঙ্গে বেশ কয়েকটা প্রাসঙ্গিক কথা বলে ফেললেন।

বাগানবাড়িতে জড়ো-হওয়া আত্মীয়স্বজনরাও সেদিন সব ফেলে তার ওপর মনোযোগ দিতে লাগল। বহুকাল এরকম ভি আই পি ট্রিটমেন্ট পায়নি সে। সবাই যেন তটস্থ, অতি অমায়িক, অতি সতর্ক। আর চারদিক থেকে জোড়ায় জোড়ায় কৌতূহলী চোখ তাকে বিদ্ধ করল সেদিন।

এমন অস্বস্তির মধ্যে যে আর কখনও পড়েনি। ভাল বাদ্যবস্ত্র তার অতিশয় প্রিয়। কিন্তু সেদিন সে খাবারের স্বাদগন্ধ বুঝতেই পারল না মানসিক উদ্বেগে। শুধু লক্ষ করল, লোকজনের সামনে রশ্মি তার কাছে বেশী আসছে না, কথাও বলছে না। কিন্তু দূর থেকে মাঝে মাঝে তাকে চেয়ে দেখছে। এক-আধবার তারা দুজনে দুজনের দিকে ‘কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে চেয়েও রইল।

এক ফোঁটা মদও খায়নি হোমাস, তবু যখন বাড়ি ফিরল তখন যেন টলেমালো অবস্থা। সে নয়, তার ভিতরটার অচেনা হোমাস গলায় একটা ফাঁস আটকে বসে আছে।

সেই রাতেই ফোন করল চারুকীলা, এই গবেটে, কেমন হল আজকের পিকনিক ?

তোকে পিকনিকের কথা কে বলল ?

আমার স্পাই আছে। বল না কেমন হল।

ভালই।

শুধু ভাল ? আর কিছু নয় ?

পিকনিকের মধ্যে আবার আর কিছু কি থাকবে ?

তোকে কি সাথে গবেটে বলি! তবু তরে গেছিস।

তার মানে ?

যদিও তুই একটা আশু হাদারাম আর চূড়ান্ত অপদার্থ, তবু কি করে যে পার পেয়ে যাস সেটা ভেবেই অবাক হই। বোকা আর অপদার্থের জন্যই বোধহয় ভগবান খেটে মরেন।

হোমাস গম্ভীর হয়ে বলে, ব্যাপারটা কী খুলে বলবি ?

অনেকবার বলেছি। এরপরও না বুঝলে বুঝতে হলে তোর মাথা একদম নিরেট। কি করে সি এ পাশ করলি রে ? সি এ পড়তে বুঝি মগজ লাগে না ?

বেশী লাগে। সে কথা থাক। ব্যাপারটা কী ছিল ?

ওদের সবাইই তোকে দারুণ পছন্দ।

ওরা কারা ?

রশ্মির মা বাবা আত্মীয়স্বজন। ওরাও আমাদের মতো একটু ক্যানিশ। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে খুব ভাল-ডালবাসা।

আমাকে পছন্দ করার ওরা কে ?

কেন, তুই-ই বা এমন কে যে পছন্দটাও করা যাবে না তোকে ?

কথা ঘুরিয়ে দিস না। আসলে কথাটা কী ?

আহা, ন্যাকা! সবাই তো বুঝিস, তবে অত বোকা সাজছিস কেন ? রশ্মির মা-বাবার আগেই পছন্দ হয়েছিল। আজ আত্মীয়রাও দেখল। তাতে কি দোষ হয়েছে ?

দোষী জানে না কী দোষ তাহার, বিচার হইয়া গেল ? আমাকে পছন্দ করছে, কিন্তু আমার মতামতটাও তো নেওয়া দরকার।

তোর আবার অমতের কথা ওঠে কেন ? ওরকম পাত্রী পাচ্ছিস সেই তোর ভাগ্য। তাই তো বলছিলাম, বোকাদের জন্য ভগবান আছেন।

বিয়ে আমি করছি না।

অত তড়াপাতে হবে না। রশ্মিকে দেখলে তো চোখ দিয়ে নাল গড়ায়। বিডন স্ট্রিটে খবর হয়ে গেছে। বিয়ে করবি কি না করবি সেটা মামা বুঝবে। তোর ইচ্ছেয় সব হবে নাকি ?

ইয়ার্কি করিস না চারুদি। আমার ব্যাপারটা ভাল লাগছে না।

রশ্মিকে তোর পছন্দ নয় ?

রশ্মির কথা উঠছে কেন ?

উঠবারই কথা কিনা। ওরকম মেয়ে লাখে একটা পাওয়া যায় না, তা জানিস? অমন চেহারা, ফিগার, কোয়ালিফিকেশন একসঙ্গে পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা?

কথা এই পর্যন্তই হয়েছিল। সে রাতে হোমাস্‌ ভাল করে ঘুমোতে পারল না।

পরের সপ্তাহের শনিবার রশ্মিই ফোন করল। রাত দশটার পর। প্রথম প্রশ্নটাই চমকে দিল তাকে।

কী করছো?

বিস্ত্রিত হোমাস্‌ আমতা আমতা করে বলে, টিভি দেখছি।

একটু কথা বলো আমার সঙ্গে।

কথা! বলে শুদ্ধ হয়ে গেল হোমাস্‌। ও তাকে 'তুমি' করে বলছে, তারও কি বলা উচিত? গলা ঝেড়ে হোমাস্‌ বলল, তোমার বুদ্ধি ঘুম আসছে না?

না। হঠাৎ তোমার কথা মনে হল। একটু কথা বলবে? প্রীজ!

কী বলব বলো তো!

যা বুশি। আবোল-তাবোল।

হোমাস্‌র মন বার বার ব্রেক কষছে। এগোতে পারছে না। কথা হারিয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে, বুদ্ধি ও বিবেচনার বিরুদ্ধে এ সে কোন আবেগে ভেসে যাচ্ছে?

॥ ৫১ ॥

নিমকহারাম শব্দটাই বারবার মুখে উঠে আসতে চাইছে। এই লোককেই না বীণাপাণি মরণের হাত থেকে উদ্ধার করে এনেছিল? তার পাঠানো টাকাতেই না আজও প্রতিপালন হয় ওর বাপ-মা? তার পয়সাতেই না ও দিনের পর দিন ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে বসে বসে খায়? মুখের একটা কথায় রাত না পোয়াতেই বিয়ে-করা বউকে ছেড়ে চলে গেল! গেল তো যাক! বীণাপাণিও জীবনে আর ওর মুখ দেখবে না।

সকালে ঘুম ভেঙে বিছানাটা খালি দেখেই বুকটা ছ্যাৎ করে উঠেছিল তার। নিমাই রোজই খুব ভোরে উঠে পড়ে। বাইরে-টাইরে খুটখাট কাজ করে। তার ঘর খালি দেখে চমকানোর কিছু ছিল না। কিন্তু কখনও কখনও মনটা যেন কু গিয়ে ওঠে। বীণাপাণি কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারল না। বাপের বাড়ি বলে কথা, জামাই চলে গেছে জানলে একটা সোরগোল উঠবে হয়তো। একটু বুজি দেখল, নিমাই তার সামান্য জামা আর ধুতি নিয়ে যায়নি। পরনে যা ছিল, তাই নিয়েই গেছে। পয়সাকাড়িও হোয়নি। তবে সে যে বিদেয় হয়েছে তাতে সন্দেহ ছিল না বীণাপাণির। সে টের পাচ্ছিল। ঘরে একটা ঝাঁঝী ভাবই জানান দিচ্ছে সে কথা।

আজ বীণা কাদল না। তার জ্বলুনি হচ্ছিল বুক। নিমকহারাম! নিমকহারাম! মুখচোখ স্বাভাবিক রেখে সে বেরোলো। পুকুরঘাট গেল। ফিরে এসে বাসি কাপড় ছাড়ল। তারপর রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে বসে বলল, মাথাটা ধরে আছে। একটু চা দাও তো মা।

নয়নতারা জামাইয়ের জন্য হালুয়া আর রুটি তৈরি করছিল। বলল, দিই। জামাইকে ডাক তো, রুটি ক'টা গরম গরম খেয়ে নিক।

বীণা জুঁচকে একটু ভাবল। তাহলে মাও টের পায়নি! অবশ্য পারবেই বা কী করে? নিমাই কি কাউকে বলে গেছে? তেজ করে বোধ হয় রাত থাকতেই রওনা দিয়েছে। বে-আক্কেলে লোক, দরজা ভেজিয়ে রেখে গেছে। চোর-টোন আসতে পারত।

চোরের চিন্তাতেই হঠাৎ চমকে ওঠে বীণাপাণি। আসতে পারত কেন? এসেছিল কিনা তাই বা কে জানে! ডলার-পাউন্ডের প্যাকেটটা ছিল বালিশের তলায়। আছে তো?

প্রায় পাখির মতো উড়ে ঘরে এল বীণা। বালিশ উল্টে দেখল। প্যাকেট আছে। বুকটা হঠাৎ এত ধকধক করছিল যে বলার নয়।

আবার রান্নাঘরে এসে বসতেই নয়নতারা বলল, অমন ছুড়ম করে কোথায় গিয়েছিলি?

একটা জিনিস দেখে এলাম। হ্যাঁ মা, এখানে চোর-ছ্যাঁচড়ের উপদ্রব কেমন গো?

আছে মা, ভালই আছে। তবে আমাদের বাড়িতে আছেটাই বা কি? নেবেই বা কি? কিন্তু জামাই কোথায় গেল?

সকাল থেকে জামাই-জামাই করছো কেন? তাকে আমি একটা কাজে পাঠিয়েছি।

নয়নতারা অবাক হয়ে বলে, কোথায় পাঠালি আবার! আমি যে জলখাবার করে বসে আছি।

খাওয়ার লোক আছে মা। সে একটু বনগাঁয়ে গেছে।

বনগাঁ! বলে হাঁ করে থাকে নয়নতারা, হঠাৎ গেল কেন?

বললাম তো কাজ আছে।

তা কখন ফিরবে?

ফিরবে না।

দেখ কাণ্ড! কই, কালও তো কিছু বলিসনি!

বললাম তো, হঠাৎ একটা জরুরি দরকার পড়ে গেল।

জামাই নেই শুনে নয়নতারা ভারি হতাশ হয়েছে। মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি সকাল থেকে রান্নাবান্নার জোগাড় করছি। নিমাই কচুর শাক খেতে ভালবাসে বলে এই উই কচুর শাক কেটে এনেছি। কী হবে এখন?

বীণা মুখ গোমড়া করে বলে, বলেছি তো, কিছুই ফেলা যাবে না। কচুর শাক ভারি তো একটা জিনিস!

সকালটা এভাবে পাশ কাটানো গেল। একটু বেলায় বারান্দায় যখন বাবাকে গম্বীর আর দুঃখী মুখে বসে থাকতে দেখল, বীণা তখন কাছে গিয়ে ডাকল, বাবা!

বিষ্ণুপদ মেয়ের দিকে চোখ ফিরিয়ে একটু দেখল, তারপর বলল, আয়, বোস এসে এখানে। কিছু বলবি?

তুমি সারাক্ষণ একদুট্টে ওই ঘরখানার দিকে চেয়ে কি দেখ বাবা?

বিষ্ণুপদ ম্লান একটু হেসে বলে, ঘরখানা আর শেষ করতে পারল না রামজীবন। একটু করে হয়, আবার থেমে থাকে। তাই দেখি চেয়ে চেয়ে।

কাছটিতে মৃদু স্বরে বলল, ওটার মধ্যে মানুষের একটা লড়াই আছে যে। মানুষ কত চেষ্টা করে, সব কি হইয়ে তুলতে পারে? খানিকটা হয়, খানিকটা হয় না। চেয়ে চেয়ে দেখি। আমার আর কী দেখার আছে বল!

বীণাও ঘরখানার দিকে চেয়ে ছিল। অনেকটা উঠেছে। ছাদ ঢালাই থাকি। ভারার বাঁশ এখনও বাঁধা আছে, তাতে শ্যাওলা ধরেছে, পচেও গেছে অনেকটা। বীণা জানে, মেজদা যদি মদ-টন না খেত, তাহলে হয়তো হয়েও যেত ঘরখানা। এই ঘরখানা নিয়ে মেজদা আর সেজদায় তুমুল ঝগড়া বেঁধেছে, তার খবরও বীণা পেয়েছে মায়ের কাছে।

বীণা হঠাৎ বলল, এ বাড়িতে কি আমার ভাগ আছে বাবা?

বিষ্ণুপদ আনমনা ছিল। জবাবটা দিল একটু দেরিতে, আছে।

ভাগ হলে আমি কতটা জমি পারবো?

পারি খানিকটা। কেন রে, থাকবি এখানে এসে?

থাকি না থাকি, একখানা ঘর তুলে রাখতে পারলে হয়।

কেন, বনগাঁ, তোর ভাল লাগে না?

তাও লাগে।

আর পালপাড়া? সেখানে কেমন লাগে?

বীণা একটু মাথা নিচু করে থাকে। তারপর বলে, সেখানে অভাব ছাড়া আর কিছু নেই বাবা। সংসারটা যেন এক পেট খিদে নিয়ে বসে আছে।

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, মরে গেলে আর খিদেও থাকে না, তেঁটাও থাকে না।

বীণা অবাক হয়ে বলে, হঠাৎ মরার কথা কেন বাবা?

বিষ্ণুপদ একটু যেন অপ্রস্তুত হল। বলল, বলছি কি, খিদেটা হল বেঁচে থাকার লক্ষণ। খিদে পায় মানে বেঁচে আছে।

তুমি মাঝে মাঝে বড় অদ্ভুত কথা বলো বাবা। ভয় করে।

ওরে না, ভয় পাওয়ার মতো কথা নয়। মাঝে মাঝে বোবাক ভুল হয়ে যায়। বেঁচে আছি, না মরে গেছি। মাঝরাত্তে স্বপ্ন-টপ্ন দেখলে ওরকম হয়। তখন খিদে পেলে বা বাহ্যে পেছাপের বেগ হলে বুঝতে পারি—না, বেঁচেই আছি। তাই বলছিলাম।

বীণা ফিকে একটু হাসল, তোমার মাথায় সব উদ্ভট চিন্তা।

বিষ্ণুপদ নির্বিকারভাবে বলে, ওই ঘরখানার কাছে আমি কত কিছু শিখি!

ঘরের কাছে শেখো! সে কী গো বাবা! ঘরের কাছে আবার শিখবে কি? তোমার মাথাটাই গেছে।

তাও গেছে। মাথাটা চিরকালই গবেট। এ মাথা দিয়ে কিছু করতে পারলাম না মা।

দুঃখ পেলে বাবা? ওভাবে বলিনি।

ওরে না। দুঃখ-টুঃখ আজকাল আর ভেতন হয় না। ওসব পার হয়ে এসেছি। এখন শুধু চারদিকটা চেয়ে চেয়ে দেখি। আগ যা সব দেখেও দেখতে পেতাম না, এখন তা পাই। সময় দিবি কেটে যায়।

বীণাপাণির ঘোর সন্দেহ হতে থাকে, তার বাবার মাথায় একটু ছিট দেখা দিয়েছে। বরাবরই একটু যেন ছিল, এখন বেড়েছে।

আমার কথা তোমার মনে হয় বাবা?

বিষ্ণুপদ ঘরখানার দিকে চেয়ে ছিল। বলল, হয়। সকলের কথাই মনে হয়। মনে-হওয়া নিয়েই তো আছি। এখন তোরা কথা আরও বেশী মনে হয়।

কেন বাবা?

বিষ্ণুপদ চোখ না ফিরিয়েই বলে, নিমাইকে ধরে রাখতে পারলি না মা!

বীণা একটু চমকে উঠল, ধরে রাখব মানে! তাকে তো একটা কাজে পাঠিয়েছি।

বিষ্ণুপদ নিরুত্তেজ গলায় বলে, তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। অন্ধকারেই বেরিয়ে যাচ্ছিল, ডেকে বসিয়ে কথা কইলাম। তারপর টর্চ ধরে এগিয়ে দিলাম বটতলা অবধি। বড় দাগা পেয়েছে।

বীণা কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বলল, কি কথা হল?

সব কি মনে আছে! নানা কথাই হচ্ছিল।

এড়িয়ে যেও না বাবা। কী বলে গেল তোমাকে?

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, নিমাই কান্দছিল।

বীণা পুরুষের কান্না সহ্য করতে পারে না। কান্নার কথায় তার রাগ হল। ঝাঁঝের গলায় বলল, ভাত-কাঁদুনে পুরুষ দু চোখে দেখতে পারি না। কী বলে গেল তোমাকে? ডেকে তুলেছিল নাকি ঘুম থেকে?

না। আমার মাঝে মাঝে বায়ু চড়ে যায়। তখন বারান্দায় এসে বসে থাকি। হঠাৎ শুনলাম তোদের ঘরে দরজা খোলায় শব্দ। তারপরই নিমাইয়ের কান্নার শব্দটা পাই। ডেকে বসলাম।

আমার নামে অনেক কুশ্লে গিয়ে গেছে, না?

বিষ্ণুপদ যেন শক্তিত চোখে একবার মেয়ের দিকে তাকিয়ে নিল। তারপর ফের চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, তোমার বিয়েটা যে ভাল হয়নি মা, তার জন্য আমিই দায়ী। তুমি যদি আজ আমাকে খুব বকাবকি করো, গালাগাল দাও, তাতে যদি তোমার বুকাটা ঠাণ্ডা হয়, তো তাই করো মা।

ও কথা কেন বলছো বাবা! তোমাকে বকব কেন! আমারও কি কপালের লিখন বলে কিছু নেই?

কপালের কথা আজকাল আমার তেমন বিশ্বাস হয় না। কর্মফলে হয়। মানুষ মোটাবুদ্ধির হলে বড় ভয়ের কথা। সে যে কত অকাজ করে ফেলতে পারে! আমার মতো আহাশ্বক নেই।

কথা ঘুরিয়ে ফেলছো কিন্তু বাবা। বলতে চাইছো না।

নিমাই তোর নামে বানিয়ে কিছু বলেনি। সে তেমন লোক নয়। সেও হয়তো আহাশ্বক, কিন্তু পাজি নয়।

পাজি নানা রকমের হয়। তোমার জামাই আমার জন্য কী করেছে বলো তো! অন্য মেয়ে হলে কবে ছেড়ে চলে যেত। আমিই যে পেনে-পুয়ে রেখেছিলাম ওকে! শুধু ওকেই বা কেন, ওর বাপ-মা কার পয়সায় খেয়ে-পরে আছে বলো! তার এই প্রতিদান?

বিষ্ণুপদ একটু ভেবে নিয়ে বলল, তুই কি যাত্রাদলে অনেক টাকা মাইনে পাস?

না বাবা। কিন্তু কষ্ট করে হলেও তো পাঠাই!

তোকে কত করে মাইনে দেয়?

তার কি কিছু ঠিক আছে! পালা যখন চলে তখন কিছু বেশী দেয়, যখন পালা থাকে না, তখন তিনশো-চারশো, যখন যেমন হয়। তবে কাকা লোক ভীষণ ভাল। যাত্রা তার প্রাণ। আর আমাকেও খুব দেখে। তাই বেঁচে বর্তে আছি।

তুই কি এখন পালা ছাড়াও অন্য কাজ করে দিস?

দিই বাবা। কাকার টাকাপয়সার জিন্মা আর হিসেব রাখি। এ কাজটা তোমার জামাইয়ের করার কথা ছিল। সে পাপের টাকা বলে কাজটা নেয়নি। আমি নিয়েছি। কলিযুগে বেঁচে থাকা ছাড়া আর কোন ধর্ম আছে বলো! ধর্ম ধুয়ে কি জল খাবো?

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, ঠিকই কথা।

ধর্ম ধরে বসে থাকলে কোথায় তলিয়ে যেতাম তার ঠিক নেই। তোমার জামাই কথাটা বুঝতে চায় না। কেবল কোনটায় ধর্ম হল, কোনটায় অধর্ম হল, তাই বিচার করে মরছে। অথচ ফুটো পয়সার মুরোদ নেই।

তাই কি কাল ওকে বকেছিল?

না বাবা। সব তুমি জানো না। তোমার জামাই তোমাকে কী বলেছে কে জানে! তবে তার জবানিতে শুনেছো, এবার আমারটাও শোনো। আমার কাছে কিছু বিদেশি টাকা আছে। চুরিও করিনি, জোচ্চুরিও করিনি। একজন গচ্ছিত রেখেছিল। সে খুন হয়ে যায়। তার কোনও ওয়ারিশ নেই। এখন বলো টাকাটা আমি কাকে ফেরত দেবো? যারা টাকাটা চায় তাদের কারোই ওটা হরকের টাকা নয়। তাহলে কি আমার অধর্ম হল নাকি? টাকার গায়ে কি কারও নাম লেখা আছে?

তা বটে।

তুমি আমার কথাটা বুঝতে পারছো বাবা?

পারছি। টাকা কি অনেক?

তা, খারাপ হবে না। ডলারের দাম ওঠে পড়ে। রোজ একরকম থাকে না।

কাঁচা ঘরে থাকিস, তোর চোর-বাটপাড়ের ভয় নেই?

নেই আবার! খুব আছে! সেইজন্যই তো তোমার কাছে গচ্ছিত রাখতে চেয়েছিলাম। রাখবে বাবা?

রাখলে তোর সুবিধে হবে?

হবে বাবা। বনগায়ই তো বেশী ভয়। সেখানে ওই টাকা নিয়ে ধুকুমার হচ্ছে। একটা পাজি লোক জেনেও গেছে। সেটা তোমার জামাইয়ের দোষেই। যদি বলে দেয় তো আমার ওপর হামলা হতে পারে।

বিষ্ণুপদ একটা হাসল।

হাসছো কেন বাবা?

টাকাটা কত হতে পারে তাই ভাবছি।

হিসেব করিনি। তবে আমাদের কাছে অনেক।

আরও খুন হয়েছে নাকি?

হয়েছে। কিন্তু কোনটাই তো আমার দোষে হয়নি। আমি তো টাকাটা চুরি করিনি। তোমার জামাই তোমাকে উল্টো বোঝায়নি তো!

না। এরকমই যেন বলছিল।

তাহলে বাবা? টাকাটা রাখবে তোমার কাছে?

গচ্ছিত থাকলেই কি হয়? টাকা রক্ষা করার সাধ্য কি আছে?

তার মানে?

টাকা রক্ষা করা এক মস্ত দায়। আমার বয়স চলে গেছে, মাথা কাজ করে না, চারদিকে সব লোভী চোখ। আমার কাছে কি রাখতে আছে? মোটাবুদ্ধির কাজ হবে না!

তাহলে কী হবে বাবা?

মাথা ঠাণ্ডা করে খানিক ভাব। টাকার সঙ্গে অনেক বিপদ-আপদ লেগে থাকে। ওগুলোই টাকার ময়লা।

আমার যে বনগায়ে ওই টাকা নিয়ে যেতে ভরসা হয় না।

বনগাঁ থেকে তাহলে বাস উঠিয়ে দে। পালপাড়ায় গিয়ে থাক।
তুমি যে কী বলো না, তার ঠিক নেই। বনগাঁ ছাড়লে মাসকাবারি মাইনে কে দেবে তুমি? সেটাই তো কঠিন প্রশ্ন।
কয়েকটা দিন বাবা। তারপর বিপদ কাটলে এসে নিয়ে যাবো।
কাটবে?
কাটবে বাবা। ক’দিন পর আর লোকে ও টাকার খোঁজও করবে না।
এই ছুট করে বাপের বাড়ি এলি, এতে লোকের সন্দেহ হবে না?
অতঃকালে ভাবছে বলো?
তাই কবে যাবি?
দিন সাতেরকের কথা কাকাকে বলে এসেছিলাম। দু-চারদিন বেশী থাকলে দোষ হবে না।
তাহলে এ-কটা দিন টাকার কথাটা ভুলে যা। ভাল করে খা, ঘুমো। আর কষে ভাবতে থাক।
আমার মাথায় অত ভাবনা আসে না। কী ভাববো?
টাকার কথাই ভাব। টাকাটা দিয়ে কী হবে, কী করতে চাস, এসবই ভাবতে থাক। টাকাটা পেয়ে তোর লাভ হল, না
লোকসান হল, তাও ভাব।
লোকসান কেন হবে বাবা?
লোকসান নানারকম আছে। ভেবে দেখ।
তোমার জামাই কোথায় গেছে, কিছু বলে গেছে?
শুণ করে নয়। তবে মনে হয় বাপ-মায়ের কাছেই যাবে প্রথমে। ওদিকে খুব টান।
সেটাই হয়েছে আমার আর এক জ্বালা।
বিষ্ণুপদ ঙ্গ কুঁচকে বলে, তোর শ্বশুর শান্তি ডিকি ভাল নয়?
ভাল হবে না কেন? ভালই। তবে তারা সব কাঙাল ধরনের লোক। সবসময়ে হাতজোড় করে আছে যেন।
সেটা তোর ভাল লাগে না?
কেন লাগবে? একটু লোভীও।
পরসূনা না থাকলে মানুষ কি আর মানুষ থাকে? কি-রকম ধারা হয়ে যায় যেন। এখন যা, পুরনো খেলুড়ি আর বন্ধুদের
সঙ্গে বেশ করে কয়েকটা দিন গল্প-টল্প কর। অত ভাবিস না।
তোমার জামাই যে নতুন চিন্তায় ফেলে গেল।
জামাই তোকে বিপদে ফেলবে না ইচ্ছে করে। সে ভেতম লোক নয় বোধ হয়।
তার আহাম্যকিকেই যে ভয় পাই।
বিষ্ণুপদ একটু হাসল। বলল, আহাম্যক ছাড়া আর কী? খুব আহাম্যক। এ যুগে অচল।
বাপের বাড়ি সাতটা দিনই কাটাল বীণা। তবে খুব আনন্দে নয়। নিমাইয়ের কোনও খবর নেই। বনগাঁয়ে কী হচ্ছে কে
জানে। ঘরে পাশের বাড়ির একটা ছেলের রাতে এসে শোওয়ার কথা, সে শুচ্ছে তো! নানা চিন্তা।
বনগাঁ যাওয়ার দু-দিন আগে রাঙা ফিরে এল।
মেজদা মেজবৌদি কথাই বলে না বীণার সঙ্গে। আলাদা ঘরে তারা নিজেদের মতো থাকে। এসে একবার গিয়ে প্রণাম
করে এসেছিল তাদের। দায়সারা একটু কুশল প্রশ্ন করেছিল। দেখে খুশি হয়েছে বলে মনেও হল না। কেমন আলগা ভাব।
সেই তুলনায় সেজো রাঙা কিছু মিস্তকে। বীণাকে দেখে জড়িয়ে ধরে বলল, ইস! কত দিন আসিনি!
বেশ গল্প হল রাঙার সঙ্গে। তার চেয়েও বেশী ভাল লাগল দুটো ভাইপোকে। তারা পিসির সঙ্গে সারাদিন লেগে
থাকে। গোপাল কথা কইতে পারে না, কিন্তু তারও বুকে কথা আছে নিশ্চয়ই। সে চোখ দিয়ে সেই কথা বলে। তাই
গোপালের চোখদুটো অমন মায়ারী বোধ হয়।
ও সেজবউদি, তোমার তো দু-দুটো আছে, গোপালকে দাও না আমায়। আমি পুষি নেবো।
নাও না ভাবুরবি, নিলে তো বাচি। ওটার জন্য ভেবে ভেবেই তো আমার বুকের দোষ হওয়ার জোগাড়।
তুমি মুখে বলছো, সত্যিই কি আর দেবে?
রাঙা হেসে বলে, যার সম্পত্তি তাকে একবার জিজ্ঞেস করে নাও। ওর বাপকে।
সেজদা! সেজদা আপত্তি করবে না।
তাহলে তো ভালই। কিন্তু পুষির কথা বলছো কেন গো? তোমার কি হতে নেই?
লজ্জা পেয়ে বীণা বলে, কই আর হল?
সে তুমি যাত্রা-থিয়েটার করো বলে হওয়াচ্ছে না। বাচ্চা হলে ফিগার নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে, তাই না বলো!
না গো, বাচ্চার ঝকি আছে। দেখবে কে?
লোক রাখবে। পরসার তো আর অভাব নেই!
না নেই! তোমাকে বলেছে। আমি কি সিনেমায় পার্ট করি যে, পরসার থাকবে?
শুনি যে!
কী শোনো?
তোমার নাকি অনেক পরসার!
ছাই শুনেছো। দাও না গো এটাকে। খুব আদর করে রাখব, দেখো।
নিমাইবাবুর অনুমতি নিয়েছো?
নিমাইবাবুর অনুমতি! কেন বলো তো! এতে তার অনুমতির আবার কী দরকার?
পুরুষ মানুষরা ভাই, অন্যের ছেলেপুলে ঘরে ঢোকানো পছন্দ করে না।

তোমার সব অদ্ভুত ভাবনা! সে লোক খারাপ নয়। বাচ্চা-কাচ্চা ভালও বাসে।

দেখো বাপু।

সে দেখব। আগে বলো দেবে কিনা।

রাঙা ফাঁপরে পড়ে বলে, দিতে আপত্তি নেই। কিন্তু তুমি সামলাতে পারলে হয়! বোবা বটে, কিন্তু ভীষণ দুই।

হোক গে। একটাকে ঠিক সামলে রাখব।

খুব বুঝে চলতে হবে কিন্তু। খিদে পেলে রোগে যায়।

তুমি এবার ফাঁড়া কাটিছো।

না গো। বোবা ছেলের মনের কথা না বুঝলে বিপদ। এখানে সবাই মিলে দেখে রাখি। ওখানে তুমি আর নিমাইবাপু।

তা বটে।

তাই বলছিলাম, নিতে চাচ্ছে নাও, কিন্তু কঠিন হবে। আরও একটা কথা আছে। ও সবচেয়ে বেশী ভালবাসে কাকে জানো? পটলকে। সারাদিন পটল ওকে বুকে-বুকে করে আগলে রাখে। দাদা ছাড়া গোপাল অচল।

তাহলে আমাকে দুটোই দাও।

রাঙা খুব হাসল, তাহলে তো আমি হালকা হই। এর পর পটলের বাপ বা ঠাকুমা দাদু সবাইকেই নিয়ে যাওয়ার বায়না করবে না তো! সে ভাই পেলে উঠব না।

গোপালকে ঘুরে ঘুরে দেখে বীণা। একা ঘরে তাকে আদর করে, আর ভাবে, আহা! আমার এরকম একটা হল না?

সাত দিন পেরোনোর পর বীণাকে বনগাঁয়ে যেতেই হল। শেষ অবধি গোপালকে নেওয়া হল না। দোনোমোনো করে টাকাটাও সঙ্গেই রাখল। গচ্ছিত রেখে যেতে ভরসা হল না।

বনগাঁয়ে ফিরল সন্ধ্যাবেলা। ঘর খুলল। হারিকেন জ্বালল। চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখল। সবই এক আছে। তবু ফাঁকা। বড্ড ফাঁকা। নিমাই নেই।

রাতে আর রান্না করল না বীণা। কয়েকখান রুটি আর আলুর ঘ্যাঁটা রান্নায় খাওয়ার জন্য করে দিয়েছিল মা। সেটা খাওয়া হয়েছিল না। রাতে সেই ঠাণ্ডা রুটি তরকারি খেয়ে শুয়ে রইল।

শ্যামল তার ফেরার কথা জানত না। রাতে শুতে এসে বলল, ওঃ তুমি এসে গেছ? ভালই হয়েছে। কাকা তোমার খোঁজ করতে এসেছিল কাল।

ওঃ, কিছু দরকার আছে?

তা বলেনি। তবে মুখটা খুব গম্ভীর দেখছিলাম।

বীণা একটু ভয় পেয়ে গেল কি? মুখে কিছু বলল না। কিন্তু গভীর রাতে সে একটা নতুন গর্ত খুঁড়ে একটা মেটে হাড়ির মধ্যে সরা চাপা দিয়ে প্যাঁকেটটা রাখল। গর্ত ভরাট করে লেপে পুঁছে দিল। তারপর দৃষ্টিভ্রমের পাথর বুকে নিয়ে শুয়ে রইল।

॥ ৫২ ॥

চিলেকোঠাটা এত ছোটো যে একটা চৌকিও ভাল করে আঁটে না। টেবিল চেয়ার বা আলনা গোছের কোনও আসবাব চয়নের নেই, তাই রক্ষা। চৌকিটা এঁটে গেল কোনওরকমে। একদিকের দেয়ালে সাঁটিয়ে দেওয়ার পর অন্য দিকের দেয়ালের সঙ্গে দু'বিঘ্ন পরিমাণ ফাঁক রইল। লম্বাখির দিকটায় ফাঁক পাওয়া গেল ফুট দেড়েক। চয়নের মনে হল, এই ঢের। এর চেয়ে বেশি সে আর কী চায়? আঁটিয়ে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টাই তো সে করে এসেছে এতদিন। তার জীবন-সংগ্রাম তো এটুকুই। অল্পের মধ্যে, কমের মধ্যে নিজেকে সন্তুর্পণে আঁটিয়ে নেওয়া। ঘরে জায়গা না থাক, ছাদটা আছে। খুব বড় নয়, তবু সেইটাই ঢের বেশি বলে মনে হয় তার। হু-হু করে হাওয়া বয়, বুক ভরে দম নিতে কোনও অসুবিধে নেই। চিলেকোঠার ছাদ নেই, অ্যাসফল্টের দূ-একটা ফুটো-ফাটা আছে, বর্ষায় জল পড়বে। তা পড়লেও খুব একটা ক্ষতি নেই। বিছানাটা গুটিয়ে রাখলেই ২০-২২ সন্নিবিধে রান্না নিয়ে। রাধবার জায়গা ওই ফুট দেড়েক জায়গা। তারও একটা সমাধান মাথা খাটিয়ে বের করে দেখিয়েছে সে। চৌকিতে বসলে ঘরের দিকে মুখ করে ফুট দেড়েক জায়গায় সোঁত জ্বলে দুটি ডালভাত ফুটিয়ে নেওয়া শক্ত কাজ নয়। বাথরুমটা অবশ্য একতলায়। নতুন ভাড়াটে এলে সেটা ব্যবহার করতে দেবে কি না সন্দেহ থেকে যাচ্ছে! দাদা-বউদি এখন তেমন খারাপ ব্যবহার করছে না। হয়তো এই সমস্যারও একটা সমাধান হয়ে যাবে। আপাতত অত ডেবে মনকে ভারাক্রান্ত করে লাভ নেই। খোলা ছাদ ও এক চিলতে ঘর এখন তার কাছে লটারির ফার্স্ট প্রাইজ বলে মনে হচ্ছে। একতলার এঁদো ঘরের চেয়ে এ তো স্বর্গবাস। আরও একটা নিশ্চিন্তির কথা হল, বউদি একশ টাকা করে ভাড়া নিতে রাজি হয়েছে। প্রথমটায় রাজি হচ্ছিল না। বলেছিল, ভাড়া কেন? তুমি বরং এ পাড়াতেই একখানা ভাল ঘর দেখ। এ বাড়িতে তো তোমার অসুবিধেই হচ্ছে!

চান বলেছে, তা নয় বউদি, অসুবিধে আমার নেই। বরং তোমাদেরই হচ্ছে, যতদিন ঘর না পাই ততদিন সামান্য কিছু নাও। ইলেকট্রিক বিল, বাড়ির ট্যাক্স বাবদও তো খরচ আছে।

তোমার সামান্য আয়।

চলে যাবে বউদি। আমার অল্পেই চলে। মা নেই বলে বরং খরচ বেঁচে গেছে খানিকটা।

বউদি দোনোমোনো করল। তারপর বলল, ঠিক আছে, একশ টাকা করে দিও। কিন্তু ঘরেরও খোঁজ রেখো। চিলেকোঠায় আমাদের সব পুরোনো জিনিসপত্র থাকে! তোমার জন্য সব সরাতে হয়েছে। দোতলায় আর কতটুকুই বা জায়গা বলে। একতলায় ভাড়াটে আসছে, সেটা খালি করে দিতে হবে।

এ ঘরের মেয়াদ কতদিন চয়ন তা জানে না। একটা অনিচ্ছয়তা ঝেঁকেই গেল। সম্পর্কটা হয়তো এই ঘরের দখলদার নিয়েই ফের খারাপ হতে থাকবে।

এক রবিবারের সকালে ভাড়াটেরা এল। টেম্পো থেকে যখন তাদের তৈজসপত্র নামানো হচ্ছিল তখন ছাদ থেকে দেখাছিল চয়ন। জিনিসপত্র দেখে অনুমান হল, এরাও নিছক মধ্যবিত্তই। এ বাড়িতে অবশ্য খুব পয়সাওলা লোকের ভাড়া আসবার কথা নয়। তবু প্রত্যাশা তো নানারকম থাকে।

লোকগুলোর চেহারাও মধ্যবিত্ত ধরনেরই। মাঝবয়সী একজন রোগা খেঁকুরে ধরনের লোক, তার সাধারণ চেহারার গিন্গি আর একটি যুবতী মেয়ে। মেয়েটিও কাশো, রোগা এবং শ্রীহীন। তবে সে-ই সর্দারি করছিল। কুলিদের ধমক-ধামক দিল, মা-বাবাকেও শাসন করছিল রাস্তায় দাঁড়িয়েই। বেশ ডাকবুকো এবং মুখরা মেয়ে। চয়ন যুবক হিসেবে কিছুই নয়। তার যৌবন বয়ে যাচ্ছে সে টেরও পায় না। কোনও যুবতীকে দেখলেও তার চাঞ্চল্য হয় না।

এ যুবতীটিকে দেখে অবশ্য চাঞ্চল্যের কারণও নেই।

সামান্য জিনিসপত্র। আধঘণ্টার মধ্যেই জিনিস উঠে গেল ঘরে। নিচের তলায় তেমন সোরগোল উঠল না। নিচের তলার বাথরুম এদের সঙ্গেই ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতে হবে তাকে—এই দৃষ্টিভঙ্গিটা রোববারের সকালটায় তাকে কিছু বিমর্ষ রাখল। এরা যদি আপত্তি করে? যদি অপমান করে তাকে?

ভিতরের উঠোনটা ছাদ থেকে দেখা যায়। চয়ন উঠোনের দিকে চেয়ে লোকগুলিকে অনুধাবন করার চেষ্টা করল। বউদিদের নতুন ঝি তিন কাপ চা আর কয়েকখানা বিস্কুট একটা ট্রেতে সাজিয়ে নিয়ে গিয়ে পৌছে দিল ঘরে। তারও কিছুক্ষণ পর বউদিও গেল। অনেকক্ষণ বাদে ভদ্রলোককে দেখা গেল, উঠানে বেরিয়ে চৌবাচ্চার কাছে এসে এক মগ জল তুলে হাত ধুচ্ছে। ধুতির ওপর গোল্ডি, তার ওপর একটা ফুলহাতা সোয়েটার। লোকটা ভাল না মন্দ, রাগী না শান্ত তা অনুমান করা শক্ত। চয়ন শুনেছে, ভদ্রলোক বউদির দূর-সম্পর্কের পিসেমশাই এবং রাইটার্সে কাজ করেন। শেয়ালদা নর্থ লাইনে সোদপুর বা কোথাও ভদ্রলোকের একটু জমি কেনা আছে, সেখানেই বাড়ি করে রিটারায় করার পর চলে যাবেন। এইটুকু তথ্য একজনের চরিত্র সম্পর্কে অনুমান করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

কিছু চয়ন এত উদ্বিগ্ন কেন? চয়ন নিজেই নিজের এইসব উদ্ভট উৎকর্ষায় ভীষণ অবাক হয়। পরে যখন উদ্বেগটা প্রশমিত হয় তখন তার নিজের এইসব ছেলেমানুষি উৎকর্ষার জন্য সে লজ্জিত হয়। সে আসলে অচেনা লোকদের সম্পর্কে ভীষণ অস্বস্তিতে থাকে। চেনা হয়ে গেলে আর ভয়টা তত থাকে না।

চেনা হল আরও সাতদিন বাদে।

সকালে টিউশনিতে বেরোবার সময়ে দরজায় তাল লাগাচ্ছিল চয়ন, ঠিক এই সময়ে মেয়েটা এক রাশ ভেজা জামাকাপড় নিয়ে ওপরে এল। একেবারে মুখোমুখি দেখা।

মেয়েটা নিঃসঙ্কোচে বলে উঠল, আপনিই চয়ন তো! অয়নদার ভাই?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমরা নিচে নতুন ভাড়া এলাম।

জানি।

আমার নাম অনিন্দিতা। আপনি তো টিউশনি করেন, না?

হ্যাঁ।

আমিও করতাম। তবে একটা চাকরি পেয়েছি।

ওঃ।

মেয়েটি হাসল। রোগা মুখখানায় শ্রী বলতে ওই হাসিটি। দাঁতগুলির সেটিং খুব ভাল। এবং ঝকঝকে। বলল, তা বলে সামাজিক কিছু নয়। একটা নার্সিং হোম-এর রিসেপশনিষ্ট। কেমন হবে কে জানে! নিয়ে তো নিলাম।

ভালই করেছেন।

টিউশনি আর ভাল লাগছিল না। এ বাড়ি ও বাড়ি দৌড়োদৌড়ি করা কি সোজা? বাস-ট্রামের অবস্থাও তো ভাল নয়। সবসময়ে ভিড়।

ঠিক কথাই তো।

প্রথম পরিচয়ে এরকম নিঃসঙ্কোচে কথাবার্তা বলতে পারাটা আধুনিক যুগের মেয়েদের একটি ভাল লক্ষণ। অকারণ লজ্জা-সংকোচের বলাই নেই। একটু প্রশ্নোত্তার সঙ্গেই চয়ন মেয়েটির দিকে চেয়ে রইল।

আপনার তো শুনেছি শরীর ভাল নয়।

শরীরের কথায় নিবে গেল চয়ন। দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, না, শরীর ভাল নয়। আমি এপিলেপটিক।

তাহলে তো টিউশনি করতে আপনার কষ্ট হয়!

কষ্ট! বলে চয়ন যেন একটু ভেবে বলল, অভ্যাস হয়ে গেছে।

আমাদের ঘরে আসবেন। গল্প করা যাবে।

যাবো।

মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করে মনটা বেশ ভাল লাগছিল চয়নের। আলাপ হওয়াটাই ছিল দরকার। অচেনা থাকলে তার ভয় আর উদ্বেগটা যেত না। এরা বোধহয় তেমন খারাপ লোক নয়। গত সাতদিন ধরে সে নিচের বাথরুমটা ব্যবহার করে আসছে। একটু ভয়ে ভয়েই। কিন্তু কেউ কিছু বলেনি। না, সে অবশ্য ওদের ঘরে গিয়ে গল্প করতে বসবে না। বউদি তাতে বিগড়ে যেতে পারে। এই আলাপ-পরিচয়-ঘনিষ্ঠতা জিনিসটার মেয়ে-মহলে অন্যরকমের ব্যাখ্যা হয়, সে জানে।

মেয়েটির বাবা এবং মায়ের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে চেনা হয়ে গেল তার। আরও দিন চারেকের মধ্যে। সত্যোশবাবু হিসেবি লোক। বাড়ি করার জন্য প্রকৃতি হিসেবে টাকা জমাচ্ছেন। প্রথম আলাপের পাঁচ মিনিটের মধ্যে বলে ফেললেন, এখন ইটের দর কত করে যাচ্ছে জানো? আঁট আঁটা করে। আমি যখন বাড়ি শুরু করব তখন কোথায় ঠেলে উঠবে তাই ভাবছি। আচ্ছা, ফ্লাই অ্যাশ দিয়ে কোথায় ইঁট তৈরি হয় জানো?

চয়ন জানে না। তাই মাথা নেড়ে বলল, আজ্ঞে না।
 বাপ আর মেয়ের মুখশ্রীতে খুব মিল। হনু উঁচু, রোগা, ভাঙা মুখ। তবে মেয়ের মতো বাপেরও দাঁতের সেটিং ভাল।
 এবং ঝকঝকে।
 সত্যেশবাবু বললেন, বাড়ি করতে গেলে মেয়ের বিয়ের টাকা থাকে না। মেয়ের বিয়ে দিলে বাড়ির টাকা থাকে না।
 অথচ দুটোই দরকার।
 চয়নকে কথাটা স্বীকার করতে হল।
 সত্যেশবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এইজনাই লোকে ঘুষ খায়। বুঝলে? কিন্তু সরকারকে কথাটা কে
 বোঝাবে বলে তো! আমি অবশ্য ওসব টাকা ছুই না। কিন্তু তাতে লাভটা কী হল?
 চয়নকে একথাটাও মানতে হয় যে, সত্যতার কোনও দাম নেই।
 ভদ্রমহিলা পরদিন তাকে চা খাওয়ালেন। সত্যেশবাবু ছিলেন না। অনিন্দিতা আর তার মা ছিল। চা খুব খারাপ
 কোয়ালিটির। সঙ্গে বিকুট ছিল, সেটা খেতে ইচ্ছে করল না চয়নের।
 তোমার মায়ের কথা শুনলাম। তুমি নাকি মায়ের খুব ন্যাওটা ছিলে!
 চয়ন কী বলবে। না ভেবেচিন্তেই বলল, আমি রোগা বলে মায়ের একটা টান ছিল হয়তো।
 ওটাই তো হয়। কমজোরি সন্তানের ওপর মায়ের মায়া বেশি। দাদা-বউদির সঙ্গে তোমার বনিবনা কেমন?
 চয়ন সতর্ক হল। সে জানে, চায়ের নেমন্তনের সময়টা ওরা বেশ ভালই বেছেছে। আজ দাদা-বউদি সিনেমায় গেছে।
 বাড়ির ঝি গুধু আছে ওপরে। কুটকচালির প্রকৃষ্ট সময়। সে উদাসভাবে বলে, আমার সঙ্গে সম্পর্ক তো খুবই ভাল।
 ভাল হলে বুঝি তোমাকে রৈঁধে খেতে হত।
 অনিন্দিতা মৃদু ধমক দিল, আঃ মা! ওসব কথা থাক।
 ভদ্রমহিলা থেমে গেলেন।
 মাকে সরিয়ে মেয়ে তার ভূমিকা নিল, আপনি তো গ্র্যাজুয়েট, না?
 হ্যাঁ।
 দিদি বলছিল, আপনি ইংরিজি আর অঙ্কে খুব ষ্ট্রং! তাহলে কম্পিটিটিভ দেননি কেন?
 চয়ন মৃদু হেসে বলল, দেওয়া হয়নি নানা কারণে।
 সংসারের অশান্তি বুঝি?
 পোড়-খাওয়া চয়ন শুধু একটু হাসল। কিছু বলল না। এরা তার কাছ থেকে কথা আদায় করতে চায় নাকি? তাহলে
 এদের সম্পর্কে তাকে আরও সজাগ থাকতে হবে।
 সবক'ই ছিল চয়ন। তবু সম্পূর্ণ এড়ানো যায় না। নার্সিং হোমে মেয়েটির শিফট ডিউটি। চয়ন যখন সকালের টিউশনি
 সেরে এসে দুপুরের ভাত রাঁধতে বসে তখন ডিউটি অফ থাকলে মেয়েটি ছাদে শাড়িটাড়ি মেলতে এসে পিঠের কাছে
 দাঁড়িয়ে গল্প করে।
 কী রাঁধছেন? আচ্ছা, রোজ ওই বিচুড়ির মতো কী একটা করেন বলুন তো!
 চয়ন বলে, এটা খুব স্বাস্থ্যকর। চালডাল সবজি সব একসঙ্গে চাপিয়ে দিই। একবারেই হয়ে যায়।
 এমা! রোজ একরকম খান কী করে?
 আমার তো খারাপ লাগে না।
 একটু ঘি দিলেও না হয় হত!
 ওসব আমার সহ্য হয় না।
 মশলা লাগে না?
 না, তাও লাগে না?
 আপনাকে নিয়ে পারা গেল না। আচ্ছা, একটু শুকতো খাবেন? আমাদের আজ শুকতো হয়েছে।
 চয়ন সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার পদ্ধতি নিয়ে বলে, না! আমি আবার ওসব খাই না। এটাই বেশ লাগে।
 আপনি বোধ হয় আপনার বউদিকে ভয় পাচ্ছেন। যদি কিছু বলে, তাই না?
 চয়ন মৃদু হাসল। তারপর বলল, যতদূর নির্দোষ থাকা যায় ততই ভাল।
 আপনি খুব সাবধানী মানুষ।
 না। আমি খুব ভিত্তি।
 মেয়েটা তার পিঠের খুব কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালে। এ ব্যাপারটাও তার পছন্দ হচ্ছে না। এ কি বড্ড গায়ে-পড়া? তাহলে
 তো বন্ধিই হল একটা। রোজ জ্বালাবে।
 ভদ্রতা বজায় রাখতে সে বলে, নতুন চাকরি কেমন?
 খুব ভাল মনে হচ্ছে না। কাল একজন পেশেন্ট মারা যাওয়ায় খুব হামলা হল। পেশেন্টের হয়ে কিছু লোক ইট
 পাটকেল ছুঁড়ে ভাঙচুর করে গেছে। পুলিশ এসেছিল।
 ও বাবা!
 নার্সিং হোমে এসব অবশ্য হয়। পেশেন্টের ডেলিভারি হতে সময় লাগছিল। তারপর কী সব কমপ্লিকেশন দেখা দেয়।
 দোষটা ডাক্তারের নয়। আজকাল লোকেরা বড্ড অল্পে রেগে যায়। তাই না?
 কথাটা বোধ হয় ঠিক।
 খুব ঠিক। কারও ঈর্ষ্য নেই। মা তো শুনে খুব ভয় পেয়ে গেছে। বলছে, চাকরি ছেড়ে দে। আমি বললাম, দেখি
 আরও কয়েকটা দিন। আটশোটা টাকা ছুট করে ছাড়ব কেন?

আটশো!

ট্রেনিং পিরিয়ড বলে কম দিচ্ছে। বারোশো স্টাটিং। কিছুদিন তো করে দেখি।

এইভাবে কথা গড়ায়। কোথাও পৌছোয় না। তবে চয়নের পূঁজিতে একটা অভিজ্ঞতা যোগ হতে থাকে।

নতুন আরও অভিজ্ঞতা যোগ হচ্ছিল অন্য দিক থেকেও। মোহিনীর মা তাকে আর একটা মোটা মাইনের টিউশনিতে নিয়োগ করেছেন। শুধু অঙ্ক এবং মাসে চারশো টাকা। বাড়িটা চয়নের একেবারে অচেনা নয়। মোহিনীদেরই প্রতিবেশী। ছাত্রের মা চারুশীলার সঙ্গে সে একবার হোমস্কাবুর গাড়িতে চেপে হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল। টিউশনিতে নিয়োগের আগে চারুশীলা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, শুধু অঙ্ক করতে আপনি কত নবেন বলুন তো!

চয়ন বিনীতভাবে বলল, একটা তো মোটে সাবজেক্ট। দেড়শ দিতে কি আপনার অসুবিধে হবে?

চারুশীলা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলে, দেড়শ? ওটা তো মেড সারভেন্টের চেয়ে কম মাইনে। আপনার সেলফ রেসপেক্ট বলে কিছু নেই দেখছি! ছিঃ, ওই জন্যই তো বাঙালীর উন্নতি হয় না।

চয়ন থতমত খেয়ে বলল, না, ভুল বুঝবেন না। আমি তো মোহিনীকে পড়াতে এদিকে আসিই। এক্সট্রা কোনও পরিশ্রম তো নয়।

চারুশীলা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলল, মেধার সঙ্গে পরিশ্রম এক করে ফেলবেন না। যাকগে, পাঁচশো টাকার নিচে আমি দিতে পারব না। দিতে আমার লজ্জা হবে।

চয়ন অত্যন্ত বিপাকে পড়ে বলল, এতটা যে রেন্ট নয়। নিতে আমার ভীষণ লজ্জা হবে।

ওই জন্যই তো আপনার জীবনেও উন্নতি হবে না। ঠিক আছে, চারশো টাকা করে নেবেন। রাজি তো!

তাও বেশি হয়ে যাচ্ছে।

আমি কিন্তু মোটেই আপনাকে দয়া দেখাচ্ছি না। রেন্ট এরকমই হওয়া উচিত বলে মনে করি।

বাস্তা একটা ছেলেকে শুধুমাত্র অঙ্ক করানোর জন্য এত টাকা নিলে অন্যায় হবে না?

তাহলে আপনি ওকে ইংরেজি বা অন্য সাবজেক্টও একটু দেখাবেন। ইংরিজির টিউটর ওর দরকার হয় না। ইংলিশ মিডিয়মেই পড়ে। তবু দেখাবেন। শুনেছি আপনার বেসিক গ্রামারের নলেজ খুব ভাল।

প্রথম দর্শনেই পিক্টিকে ভীষণ পছন্দ করে ফেলল চয়ন। দেবশিশুর মতো নিম্পাপ চেহারা। বুদ্ধিমান এবং মনোযোগী। একটু দুটুও আছে। তবে সেটাও উপভোগ্য।

মুশকিল হল পিক্টিকে পড়ানোর সময় চারুশীলা প্রায়ই এসে হাজির হন। ভদ্রমহিলার নানারকমের খেয়াল। এসে বললেন, আচ্ছা, আপনার তো বোধহয় সোয়েটার নেই! সোয়েটার গায়ে দেন না কেন?

কলকাতার শীতে লাগে না। র‍্যাপারেই চলে যায়।

আপনার র‍্যাপারটা ভাল নয়। চলুন তো, গড়িয়াহাটা থেকে আপনাকে একটু পুলওভার কিনে দিই।

চয়ন প্রমাদ গোলে। কোনও জিনিসের বাড়াবাড়ির ভাল নয়, সে জানে। পরে এই ভালবাসা বা করুণা উলটো রূপ নিতে পারে।

পুলওভার অবশেষে সন্টিই কিনে দিয়েছে চারুশীলা। এবং আজকাল রাতের খাবারও তাকে খেয়ে আসতে হচ্ছে সপ্তাহে তিনদিন।

চারুশীলা অত্যন্ত হটফটে চঞ্চল মহিলা। এ-ঘর ও-ঘর সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছেন, মুহূর্মুহ টেলিফোন করছেন, যখন তখন ফোনকাটা করতে বেরিয়ে পড়ছেন। কিসের যে অতৃপ্তি, কেন যে এই অস্থিরতা তা অনুমান করতে পারে না চয়ন। তবু এই স্বাভাবিকতার অভাবের জন্যই বোধ হয় চারুশীলাকে তার খুবই ভাল লাগে। মনে হয়, আমার বউদি যদি এরকম হত!

শুনুন, সামনের শনিবার আপনি একটু তৈরি হয়ে আসবেন। আমরা এক জায়গায় যাবো। সকালে।

চয়ন অবাক হয়ে বলে, কোথায়?

ব্যাঙেল। রিয়া আর ছেয়েমেয়োরো যাবে। আর আমার একটা ভাই আছে, হোমস্—চেনেন তো! দারুণ আউটিং।

চয়ন মৃদুস্বরে বলে, কিন্তু আমি!

চারুশীলা হেসে বলে, কেন, আপনি কি অঙ্ক?

তা নয়। তবে—

ওসব শুনিছি না। সবসময় অত দুঃখ-দুঃখ মুখ করে থাকবেন না তো! মুখে হাসি নেই কেন? জোর করে হাসবেন। হাসতে হাসতে ওটা অভ্যাস হয়ে যাবে। গোমড়া মুখ আমার একদম নয়।

সুতরাং ব্যাঙেলেও যেতে হয়েছিল তাকে। চারুশীলা আরও লোক জুটিয়েছিলেন। বুঝি আর অনু নামের দুই বোন। রশ্মি রায় নামে একজন প্রায়-মেমসাহেব মেয়ে। পুরুষ বলতে সে, হোমস্ আর দুইজন ড্রাইভার।

এই ব্যাঙেলে যাওয়াটা চয়নের কাছে এক বিশাল উন্মোচন। সে জীবনে ব্যাঙেলে আসেনি, চন্দননগর দেখেনি। কলকাতার বাইরে যাওয়ার সুযোগ তার হয়ই না। তার ওপর গাড়িতে চড়ে, এত আরামে।

চারুশীলা মাসখানেকের মধ্যে তাকে একটা নতুন টেরিকটনের জামা, একজোড়া জুতো এবং একটা দামী জাপানী ফাউন্টেন পেন উপহার দিয়ে ফেললেন। চয়নের হাঁফ ধরে যাচ্ছিল। রিয়া এবং মোহিনীরাও ভাল। তবে তাদের সংখ্যম আছে। চারুশীলা অনেকটা উদ্ভা।

প্রায় বছরখানেক বিদেশবাসের পর চারুশীলার স্বামী ফিরলেন দেশে। ভদ্রলোক বিদেশে একটা বিরাট কন্ট্রাকশনের কাজ করছিলেন। প্রচুর টাকার কাজ। তাঁর দেশে ফেরাটাকে চারুশীলা একটা উৎসব দিয়ে সেলিব্রেট করলেন। বিরাট পার্টি হল বাড়িতে। এবং গ্র্যান্ড হোটেলে হল আর একটা রিসেপশন। দুই জায়গাতেই হাজির ছিল চয়ন। পার্টি এবং গ্র্যান্ড হোটেলের অভ্যন্তর দুটোই যোগ হল তার অভিজ্ঞতায়।

আর যোগ হলেন সুব্রত। চারুশীলার স্বামী। এমন তদগত, কর্মপ্রাণ মানুষ সে বড় এটা দেখেনি। মানুষটি খুব লম্বা চওড়া নন, বরং মাঝারি বা ছোটখাটো মাপেরই। কিন্তু মুখের আদলটি মায়ার মাখানো। সর্বদাই মুখে হাসি। ইনি কয়েক কোটি টাকার মালিক এবং প্রতি বছরই কোটির কাছাকাছি আয় করেন তা চেহারা দেখে ধরাই যায় না।

চয়ন জীবনের অন্যান্য দিক দেখছে আর অবাক হচ্ছে। সে শুনেছে সুব্রত নকশাল আন্দোলন করতেন, একবার জেলও খেটেছেন। তাঁর এই রূপান্তর কিছু বিস্ময়কর।

সুব্রত দেশে ফেরার পর চয়নের ওপর থেকে চারুশীলার মনোযোগ একটু অপসৃত হল। চারুশীলা স্বামীর সঙ্গে নানা আউটিং ও নিমন্ত্রণে যেতে লাগলেন। চয়ন হাঁফ ছাড়ল।

তারপর চারুশীলা একদিন সুব্রতকে ডেকে আনল পড়ার ঘরে, একে তুমি একটা চাকরি দাও।

সুব্রত হাসছিলেন, বললেন, আচ্ছা আচ্ছা, হবে।

হবে-টবে নয়। এখনই দাও। এ ছেলেটা হাসতে ভুলে গেছে। ভীষণ দুঃখী হয়ে থাকতে ভালবাসে।

চয়ন লজ্জায় পড়ে গেল।

সুব্রত বললেন, একটু সময় দেবে তো।

সময় দিলে চলবে কি করে? ছেলেটা খুব ভাল, জানো? আমি পাঁচশো টাকা মাইনে দিতে চেয়েছিলাম, নেয়নি। কারটেল করে চারশোতে নামালো।

সুব্রত হাসতেই লাগলেন। কিছু বললেন না।

এর দিন সাতেক বাদে চারুশীলা আবার পড়ার ঘরে হানা দিয়ে বললেন, শুনুন, সামনের রবিবার আমরা ফের আউটিং-এ যাচ্ছি। সামাজিক জায়গায়।

কোথায়?

তা কে জানে! আমার পাগল ভাই কোথায় অজ্ঞাতবাস করবে বলে জঙ্গলের মধ্যে একটা মাটির বাড়ি কিনেছে। কাউকে ঠিকানা বলছে না। আমি গোয়েন্দা লাগিয়ে ঠিকানা জোগাড় করেছি। ও শুক্রবার শুক্রবার সেখানে পালায়। আমরা রবিবার গিয়ে ওকে সারপ্রাইজ দেবো। আপনিও যাচ্ছেন কিন্তু।

॥ ৫৩ ॥

কাকা ডেকে পাঠিয়েছিলেন বটে, কিন্তু ভয়ের কিছু ছিল না। বিকেলের দিকে ভয়ে আধমরা বীণাপাণি যখন গিয়ে তার সামনে দাঁড়াল তখন কাকা হেসে-টেসে বলল, ভাল খবর আছে বীণা। নতুন পালার তিনটে আগাম বায়না পেয়েছি। আদাজল খেয়ে লাগতেই হবে। বাপের বাড়ি গিয়ে অনেক সময় নষ্ট করে এলে।

বুক থেকে যেন ভাবী পাখর গড়িয়ে নেমে গেল। স্বাস সহজ হল। বীণা বলল, পালা নামবে! উঃ, কতদিন পর।

কাকা বিশ্ণু মুখে বলে, হ্যাঁ, এবারটা অনেকদিন ফাঁক পড়ে গেল। কত ঝামেলা হচ্ছিল! এবার আর চিন্তা নেই।

নায়িকার পাট নয়, তবে খুব বড় পাটই দেওয়া হল বীণাকে। হাতে হাতে সবাইকে জেরপ্ত করা কাগজ বিলি করছিল কাকা। বলল, আগে নিজের নিজের পাট মুখস্থ করো, তারপর রিহার্সাল। সাত দিন সময় দিচ্ছি। তার মধ্যে কণ্ঠস্থ হওয়া চাই।

রাত্রিবেলা লঠনের আলেয় পালাটা পড়ল বীণা, তার একাকী ঘরে বসে। পড়তে পড়তে চোখে জল এসে গেল। এক দুঃখী মেয়েকে নিয়ে সামাজিক নাটক। কাকার নিজের লেখা। এ পালা জমে যাবে খুব।

অনেক রাত অবধি জেগে পালাটা শেষ করে লঠন কমিয়ে যখন বিছানায় শুয়ে পড়ল বীণা তখন তার বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। বড্ড ফাঁকা লাগল বিছানাটা। পাশে লোকটা ছিল এতদিন। এবার থেকে কি ফাঁকাই থাকবে জায়গাটা? সারা জীবন।

থাকলে থাকবে। বীণা প্রথম প্রথম ভয় পাবে, মন খারাপ হবে। তার পর ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে। একটা নিষ্কর্মা লোকের ঘর-সংসার করে সুন্দর জীবনটা নষ্ট করবে নাকি সে? তার জায়গা তো হাজারটা লোকের চোখের সামনে, মঞ্চের ওপর। নাটক ছাড়া বাঁচবে না সে। লোকটা থেকে বরং বাধা হচ্ছিল। নানা বায়নাক্ষা। মূর্তিমান বিবেক। এই-ই ভাল হয়েছে।

সারাটা রাত খানিক ঘুমে, খানিক জাগরণে, আর ভয়-ভয় একটা ভাব নিয়ে কেটে গেল বীণার। পরদিন সকাল থেকে আর নাওয়া-খাওয়ার সময় রইল না। দিন-রাত মুখস্থ করতে লাগল পাট। প্রায় সব মিনেই ঘুরে ফিরে সে আছে। বলতে গেলে নায়িকার চেয়েও তার পাট বড়। গুরুতরও বটে। ধরতাইগুলো বুঝে নিতে আঙুলিছু অন্য পাটগুলোও প্রায় ঠোঁটস্থ করে ফেলতে লাগল। তার গলায় দু'খানা গান আছে। সুর পরে বসবে। গানগুলোও সে মুখস্থ করে নিজের সুরে শুনশুন করে নিতে লাগল। নিমাইয়ের কথা বিশ্বরণ হতে সাত দিনও লাগল না।

শুধু নিমাই কেন, বাবা-মা, ভাই-বোন, ডলার-পাউন্ড কিছুই আর মনে পড়ে না। কাকা ইচ্ছে করেই তার পাটের মেয়েটার নামও রেখেছে বীণাপাণি। খুব তেজী মেয়ে। সব সময়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার লড়াই। নায়িকাটা একটু চিচ-কান্দুনে, আদুরি-আদুরি, ন্যাকা ধরনের পাট। দু' নম্বর মেয়েটা ঠিক তার উল্টো এবং সে-ই নায়িকাকে প্রায় ঠেকা দিয়ে পাতে দেওয়ার যোগ্য করে তুলেছে।

বীণা নিজে তেজী ধরনের মেয়ে নয়। বরং ভিত্তি আর নরম ধরনের। কিন্তু নাটকের বীণাপাণির পাট মুখস্থ করতে করতে তার যেন তেজ-বীর্য এসে যেতে লাগল।

সাত দিন পর যখন রিহার্সাল শুরু হল তখন তার পাট করা দেখে কাকা অবধি বলে ফেলল, নাঃ, বীণাটার হবে। খুব ওপরে উঠবে মেয়েটা। পালা প্রায় একাই জমিয়ে দিয়েছে।

এই প্রশংসাত্মক বীণাপাণির মেডেল। আর সে কী চায় ?

তাদের পালায় প্রশ্ৰুতাদের বলাই থাকে না। নিতান্তই কেউ পাট ভুলে গেলে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য একটা লোক থাকে। সে বাজনারদের মধ্যে বসে থাকে ঘাপটি মেরে। কাজেই মুখস্থ রাখাই সবচেয়ে ভাল।

দিন কুড়ির মধ্যেই রানাঘাটে প্রথম পালা হবে। তার পর আরও দু'-তিন জায়গায়। জমলে বায়না আসবে হু-হু করে। কলকাতার অপেরার খাঁই বেশি। বিশ্ববিজয়ের খাঁই কম, আন্তরিকতা বেশি।

একা ঘরে কেমন লাগছে বীণার ? নিমাইকে ছাড়া কেমন হচ্ছে এই থাকাটা ? এসব নিজেকেই জিজ্ঞেস করে সে। কিছু খারাপ তো লাগছে না তার! একা বলেও বোধ হয় না। দিনরাত নাটকের চরিত্রাই তার আশেপাশে ঘুরে বেড়ায় মেন, কথাও কয়। একটু একা লাগে না তার।

তবে কেউ কেউ নিমাইয়ের খোঁজ করে। একদিন কাকাও জিজ্ঞেস করে বসল, আচ্ছা নিমাইকে তো দেখি না আজকাল! গেল কোথায় ?

গেল কোথায় সে খোঁজ বীণাপাণিও রাখে না। তবে অনুমানের ওপর বলে, পালপাড়ায়। জমিজমা দেখতে গেছে।

একা আছো নাকি ? ভয়টয় নেই তো ওখানে ?

একা থাকতে ভয় কি ?

কাকা জবাবটায় খুশি হল না। বলল, মেয়েদের ভয় থাকেই। নিমাই কবে ফিরবে ?

বললাম তো চাষবাস দেখতে গেছে। ফিরতে দেরি হবে হয়তো।

কাকা একটু ভেবে বলে, চাও তো একটি মেয়েকে তোমার কাছে রাতে রাখতে পারো। পুটুকে তো জানো! ওর বর ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

পুটুকে ভালই চেনে বীণা। মাথা নেড়ে বলল, কাউকে দরকার নেই। একা আমি বেশ আছি। সারা দিন পালাটা নিয়ে ভাবি, মুখস্থ করি, একা একা রিহার্সাল করি। অন্য লোক থাকলে বকবক করবে, গল্প হবে, আমার তাতে অসুবিধেই হবে বরং।

সঙ্গে সঙ্গে কাকা বলল, তা হলে থাক।

বীণা বলল, ভয়ের কিছু নেই। চারদিকে প্রতিবেশী রয়েছে। তারা লোক ভাল।

একা থাকার ভয়টা কাটিয়ে উঠছে বীণা। একা থাকতে সে এখন মজা পাচ্ছে। সময়মতো রান্নাবান্না করতে হবে, কাচাকুচি করতে হবে, কথা শুনে চলতে হবে, মতামতের দাম দিতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা আর নেই। কেমন অবাধ স্বাধীনতা! যা খুশি তাই করতে পারে বীণা।

রানাঘাটে যাওয়ার দিনটা যত এগিয়ে এল ততই বুকের ঢিবিটি বাড়তে লাগল তার। একা ঘরে অতগুলো ডলার আর পাউন্ড রেখে যাওয়া কি ঠিক হবে ? রাতে কাউকে শুতে রাজি করানো যাবে ঠিকই, কিন্তু সারা দিন ঘরখানা ফাঁকা পড়ে থাকবে যে!

নতুন দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত হওয়ায় একা থাকার আনন্দটা অনেকটাই মাটি হয়ে গেল তার। লুকিয়ে রাখার মতো জায়গা তো আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সঙ্গে নিলে হয়। তবে পালা করতে গেলে জিনিসপত্র বড় ঘাঁটা পড়ে যায়। এক সঙ্গে, থাকা, কখন কার চোখে পড়ে যাবে। চুরিও যে যেতে পারে না তা তো নয়!

বীণা খুব ভাবতে লাগল। রানাঘাটে দুই রাতের পালা। দুটো রাত কোনওরকমে কাটিয়ে দিতে পারবে সে। কিন্তু তার পর ? আরও নানা জায়গায় একের পর এক পালা নামবে। তখন কী হবে ? এই জন্যই না আর একবার নিমাইকে হাতে পায়ে ধরে রেখে দিয়েছিল সে। যত অপদার্থই হোক, তবু তো পাহারাদার!

এখন কী করে বীণা ?

যত তাড়াহুড়া পারা যায় ডলারগুলো ভাঙনো দরকার। দেশি টাকা হলে ব্যাঙ্কে বা পোস্ট অফিসে রেখে দিতে পারবে। কেউ টেরও পাবে না। কিন্তু ভাঙনোতেই যে বারবার বাধা পড়ছে।

বীণা একবার ভাবল, পন্থুর কাছে যাবে। আবার ভাবল, থাকগে। পন্থু ছেলেটাকে তার মোটেই বিশ্বাস হয় না। বনগিরি ডলার ভাঙনোর বিপদ আছে। চাটুর হয়ে যাবে।

রানাঘাটে যাওয়ার জন্য বাস্স গোছাতে গিয়ে সে ডলারের প্যাকেটটা একটা পুরনো রাউজে জড়িয়ে বাস্তবের তলায় রেখে ওপরে অন্য সব জিনিস চাপিয়ে নিল। যা হওয়ার হবে। প্যাকেটটা সঙ্গে না থাকলে সে মন দিয়ে পাটও করতে পারবে না।

একখানা পুরনো বাস ভাড়া হল। তাইতে পিকনিক পার্টির মতো একদিন সকালে চেপে বসল সবাই। ভারি হাসাহাসি, কথা চালাচালি করতে করতে এক বুক উত্তেজনা নিয়ে তারা পৌঁছে গেল দুপুরের আগেই। যে ক্লাব তাদের বায়না করে এনেছে তারা বেশ বড়সড় আয়োজন করেছে। বিশাল প্যাভেল। শোনা গেল টিকিট ভালই বিক্রি হয়েছে। দুপুরে খাওয়াল চমৎকার। খাড়া খাড়া মাছের টুকরো পড়ল পাতে, বড় বড় চিটুজুতোর সাইজের বেগুনী, ঘন মুগডালে মাছের মাথা, টমেটোর চাটনি আর দুই। কাকার বারণ আছে, পালার দিনে বেশি খেতে নেই। তাতে আইটাই হয়, পাট করে জুত হয়না। বীণা তাই সাবধানে খেল। অম্বলের ব্যামোটোও বড় ভোগাচ্ছে।

একটু রাতের দিকে যখন ভরাভর্তি আসনের নামল বীণা তখন মনে হল, এই তো তার জগৎ। এ ছাড়া সে আর কী চায় ? প্রাণ ঢেলে অভিনয় করল সে। কত যে ক্ল্যাপ পেল তার ইয়ত্তা নেই। পালা জমেছে। লোকে নিচ্ছে।

পালার এক ফাঁকে কাকা বলে গেল, কালকেও এই আসরেই পালা বসবে বীণা। সুপারহিট। কাকার মুখে ভণ্ডির হাসি দেখে বীণার বুকখানা জড়িয়ে গেল। কাকা তার জন্য যা করেছে তা তার বাবাও করেনি, স্বামীও নয়। এ লোকটার জন্যই বেঁচে আছে বীণা। কৃতজ্ঞতায় তার চোখে জল আসতে চাইছিল।

যে হাজার খানেক লোক পালা দেখছিল তাদের মধ্যে রোগাভোগা ছোটখাটো নিমাইও ছিল। সঙ্গে নদেরচাঁদ। নিমাই মোটেই পালা দেখতে আসেনি। সে দেখতে এসেছিল বীণাপাণিকে। না, তেমন পরিবর্তন হয়নি। একই রকম আছে। তবে সাজগোজ করায় দেখাচ্ছিল ভারি সুন্দর। যেন এ তার বউ নয়, সিনেমার মেয়েছেলে। বেশ ভরা লাগছিল বুকখানা তার।

নদেরচাঁদ কনুইয়ের ঠেলা দিয়ে বলে, কথা বলবে পালার পর ?

ও বাবা, না।

বিয়ে-করা বউ, কথা কইবে না কেন ?

ওরে না না। কথাই নেই।

পার্ট কেমন লাগল ?

ভালই বোধ হয়, আমি কি অত বুঝি ?

কেমন ক্ল্যাপ পাচ্ছিল দেখলে ?

দেখলাম।

তোমার বউ কিন্তু জাতে উঠে গেল। আরও নাম হবে।

হোক। ওর ভাল হোক। কত কষ্ট করেছে। ভগবান এবার ওকে সুখশান্তি দিলে বড় ভাল হয়।

একবার দেখা করে গেলে ভাল করতে নিমাইদা।

ওরে দেখা করাটা একতরফা হলে হয় না। দু' তরফেরই গরজ চাই। ওর গরজ নেই যে।

গরজ তোমারও নেই বোধ হয় ?

আমি কি একটা মনিষ্যি রে ? আমার কত কি মনে হয়। গরজ আছে, তবে ভয় লাগে। দেখা করে কাজ নেই। বীণা পছন্দ করবে না।

নদে মাথা নেড়ে বলে, কাজটা ঠিক হল না নিমাইদা।

নিমাইয়ের চোখে জল আসছিল। বীণাপাণি বড় অবহেলা করল তাকে। বড্ড দাগা দিল। এত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কি পাওনা ছিল তার ? কিছু বিলিতি টাকাই যেন দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল মাঝখানে।

পালা শেষ হওয়ার পর আর কাঁচরাপাড়া ফেরার বাস নেই। রাত গভীর। চেনাজানা মেলা লোকের বাড়ি আছে রান্নাঘাটে। খাকার অসুবিধে নেই। নদে বলল, চলো, সুখরঞ্জনর বাড়ি যাই। তাকে বলা আছে।

নিমাই আনমনে বলল, তুই যা।

আর তুমি ?

আমি! আমি একটু কোথাও বসে থাকব। আর ঘন্টাটাক পরেই তো বাস।

তোমার অত তাড়াহুড়োর কী আছে ?

আছে। সকাল পাঁচটা ছুঁটার মধ্যে গিয়ে দোকান না খুললে অতগুলো লেবার খাবে কোথায় ? ঘুগনির মটরদানা ভেজানো রয়েছে, পাঁড়কটির সাপায়ার আসবে, দুধওলা আসবে।

তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ছোঁড়াটা তো আছে।

ওরে না, ওকে দিয়ে কি কাজ হয় ? আমি না থাকলে কাজে গা লাগবে না।

ভারি তো দোকান। দিলেই না হয় একদিন লোকসান।

লোকসান বলে নয়, পাঁচজন নির্ভর করে তো। ব্যবসা মানে কি শুধু পয়সা উপার্জন ? একটু সেবাও তো দিই।

তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না।

যা না তুই সুখরঞ্জনর বাড়ি। আমি ঠিক চলে যাবোখন।

নদে মুখ বাজার করে বলে, তা হয় নাকি ? এক সঙ্গে এসেছি, একসঙ্গেই ফিরব। চলো তা হলে কোথাও বসে মশা তাড়াই।

বড় রাস্তায় বাস রুটের ধারে একটা দোকানের বারান্দা পেয়ে গেল তারা। ফাঁকা নয়, বারান্দাতেও জনাকয়েক শুয়ে আছে মুড়িসুড়ি দিয়ে। সম্ভবপর্বেই বসল তারা।

নদে বলল, বীণাপাণি আজ কিন্তু ফাটিয়ে দিয়েছে।

নিমাই বলল, হ্যাঁ।

অমন মিয়োনো গলায় বলছো কেন ? তোমার ভাল লাগেনি ?

লেগেছে। তবে বড় উগ্র পার্ট।

তার মানে ?

যে পার্টটা করল সে মেয়েটা যেন হাক্টারওয়ালি। কী তেজ বাবা! সব যেন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে চায়।

ওরকমই তো চাই।

কেন চাস ?

ওরকম না হলে এত অন্যায়ের সঙ্গে লড়াই করা যায় ?

তোর বউদি যদি ওরকমটি হয় তবে তোর কেমন লাগবে।

একটু ভেবে বলিস। কথায় কথায় ফৌস করা কি ভাল ?

নদে একটু হাসল। বলল, তোমার মতো মাটির মানুষ হলে অবশ্য ওরকম তেজী মেয়েকে সামাল দেওয়া মুশকিল।

নিমাই মাথা নেড়ে বলে, তেজ অন্য জিনিস। এ ঠিক তেজ নয়, এ হল ঝাঁঝ। ভেতর থেকে যেন সবসময়ে হক্কো বেরোচ্ছে।

একটু ভেবে নদে বলল, হ্যাঁ, নিমাইদা, তুমি কি সত্যি বীণাপাণিকে ত্যাগ দেওয়ার কথা ভাবছো ?

আমি ভাগ্য দেওয়ার কে ? ভাগ্য যদি দিতে চায় তো সে দেবে। আমি ওরকম পাপ-কথা ভাবি না।
তোমার রকমসকম আমার তো সেরকমই ঠেকছে। কী হয়েছিল সেটাও বলানি আমাকে।
স্বামী-স্ত্রীর ভিতরকার কথা বলিই বা কী করে ? একদিন যদি ওঁহিয়ে বলতে পারি তো বলব। তবে এটুকু মনে হয়,
বীণাপাণি বিপদের মধ্যে বাস করছে।

তা বিপদে তাকে একা রেখে চলে এলে কেন ?
সে তো ইচ্ছে করলেই বিপদ কাটাতে পারে। কিন্তু চাইল না। তাই নিয়েই ঝগড়া।
অন্য কোনও ছেলে-ছোকরা জুটেছে নাকি ?
ওরে না। বীণার এখনও সে দোষটা নেই। বড় ভাল মেয়ে।
ভালও বলছো আবার এক সঙ্গে থাকছো না এটা কী রকম ব্যাপার হচ্ছে বলো তো ?
সে অনেক কথা। তোকে তো আমি বলেইছি, দোষটা আমারই বোধ হয়। আমি দুর্বল মানুষ, তেজ-টেজ নেই, খেটে
খাওয়ার ক্ষমতা নেই। বীণাপাণির হাত-ভোলা হয়ে বসে যেতাম। পোষা শ্রাণী যেমনটা হয়।
আর নিজেকে আসামী বানিয়ে ভালমানুষ সেজ্ঞা না তো। তোমাকে আমি জন্ম ইস্তক চিনি। তা এখনো যা করছো
সেটা তো বনগায়েও করতে পারতে। ব্যাসাই যদি করবে তো বনগায়ে করতে কে মাথার দিবা দিয়ে নিষেধ করেছিল ?
রাগিস না ভাই। বীণাপাণি দোকান দিয়ে দেবে বলেছিল। সেই আশায় ছিলাম। কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠেনি।
হল না কেন ?
তার বড় নজর। মনোহরি দোকান দেবে বলে ঠিক করেছিল। অনেক টাকার ধাক্কা।
ও শু এইটেই কারণ নাকি ?
আরও আছে।

যাকগে, তোমাকে আর বলতে হবে না। আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। চোখ দুটো একটু বুজে নেই। বাস এলে ডেকে দিও।
ঘুমো।
বসে বসেই নদে ঘুমিয়ে পড়ল। এমনকি নাকও ডাকতে লাগল ঘড়ঘড় করে। নিমাই চুপ করে বসে রইল। অন্ধকার
ঠাণ্ডা রাত। একটু কুয়াশা হয়েছে। চারদিকটা ভারি নিম্নম। বসে বসে সে একটাই কথা ভাবতে লাগল। বীণাপাণি।
আজকাল তার শয়নে, স্বপনে, জাগরণে কেবল বীণাপাণির কথা মনে হয়।
পাঁচজন বীণাপাণিকে বাহবা দিচ্ছে বলে তার একটুও হিংসে হয় না। বরং তার মনে হয়, বীণাপাণির মতো মেয়ের
যোগ্যই সে নয়। সে অনেকটাই ছোটলোক। বীণাপাণি গরিব হলেও বড় ঘরের মেয়ে। তার সঙ্গে খাপ খায় না।
বীণাপাণিকে বিয়ে করেই যেন অপরাধ হয়েছে তার। আজ যদি বীণা নিজের ভাগ্য নিজে গড়ে নেয় তা হলে নিমাইয়ের
হিংসে হবে কেন ? তবে সে বড় ভালবেসেছিল বীণাপাণিকে। অনেকটা ভালবাসা। সেইটে বড় মনে হয়। ফাঁকা লাগে,
উদাস লাগে।

দুটো জুলন্ত চোখে অন্ধকার ফুটো করে পয়লা বাসটা এসে পড়ছিল। নদেকে ঠেলা দিয়ে উঠে পড়ল নিমাই, ওরে,
এসে গেছে।

যখন ভোরবেলা এসে নিজের ঠেকটিতে পৌছালো নিমাই তখন তার অ্যাসিষ্ট্যান্ট বিশেষ উনুনে আঙন দিয়েছে।
কয়লার ধোঁয়ার কুড়ী উঠছে মিষ্টি গন্ধ ছাড়তে ছাড়তে। ধোঁয়ার গন্ধ কারও মিষ্টি লাগে না, একমাত্র নিমাইয়েরই লাগে।
উনুন ধরতে না ধরতেই ঘুগনি বলিয়ে দিল নিমাই। পাঁড়কটি এসে গেল। তারপর কাজ আর কাজ। দম ফেলার
ফুরসত নেই। আজকাল কুলি-কামিনরা ছাড়াও বাইরের লোক আসছে তার ঘুগনি খেতে। দু-চারজন বাবু মানুষও বসে
যাচ্ছে সকালে এক কি দু' ভাঁড় চা; স্টেটে নিতে। খন্দরে থই-থই করছে।

একজন সেদিন বলছিল, নিমাইবাবু, দুপুরে আর একটু ভাষী টিফিন হলে সুবিধে হয়। পাঁড়কটি ফোনানো জিনিস,
ওতে সুবিধে হয় না। হাতকটি চালু করে দিন, দেখবেন কেমন চলে।

কথাটা ভাবছে নিমাই। হাতকটি বেচলে লাভও বেশি হয়। কিন্তু খাটনি বেশি। তবে ছাড়াটা সে চালু করে দিয়েছে।
পরিশ্রমও কম। কয়েকটা পেতলের কানা-উঁচু থালা কিনেছে। ছাতু, নুন, চাটনি, পেঁয়াজ আর লঙ্কা। পশ্চিমের মানুষেরা
পেট ভরে খায়।

সারা দিন হাজারো কাজের মধ্যে বারবারই বীণাপাণি এসে হানা দিল আজ। কয়েকটা দিন চোখের আড়ালে থাকায়
একটু ভুল পড়েছিল। কাল যাত্রায় তাকে দেখে আবার যেন একটা ছাঁপা দিয়ে বোনো জলের মতো স্মৃতি ঢুকে পড়ছে।

দুপুরের পর একটু নিরালা হল নিমাই। নিবন্ত উনুনের পাশে বেঞ্চ বসে হাঁ করে ভাবতে লাগল। তার অনেক দোষ,
অনেক খামতি। এত খামতি দিয়ে ভগবান যে কেন পাঠাল তাকে দুনিয়ায়! চারদিকে বড় বড় সব মানুষ। সে কেন একরঙি ?
সে কেন এত ভিতু ? এত দুর্ভাগ ?

সন্দের পর সারা রাত শুদাম চৌকি দিতে হবে। গডকাল যাত্রায় যাবে বলে অন্য লোককে টাকা দিয়ে মোতায়ন করে
যেতে হয়েছে। আজ ফের তার পালা। দুপুরে একটু ঘুমনো দরকার। তা ঘুমটা আজ আর এল না। সন্দের পর মাথায়
কানে একটা কক্ষটার জড়িয়ে হাতে খেঁটে লাঠি নিয়ে গুদামের বাইরে ছোট ছাউনিতে বসে রইল নিমাই। হাতে টর্চ। এ
দিকে আজকাল খুব চুরি হচ্ছে। হওয়ারই কথা। বেকার বাড়ছে, রোজগার নেই মানুষের, করবেটা কী ?

আজ বসে বসে অন্য চুরির কথা ভাবছিল নিমাই। বীণাকে চুরি করল কে ? বিলিতি টাকা, নাটক, হাততালি ? এই
বীণাই তাকে না মরন্ত অবস্থা থেকে বৃকে আগলে ফিরিয়ে এনেছিল! তখন ভালবাসত, এখন আর বাসে না নাকি ? বীণার
কি কখনও মনে পড়ে তার কথা ?

ভাবতে ভাবতে রাত কেটে গেল। ঘুম এল না। মাথাটা বড্ড গরম। সকালবেলাতে ঠাণ্ডা জলে চান করে কাজে লেগে
পড়ল নিমাই।

একদিন নিরঞ্জনবাবু এসে তার ব্যবসা দেখলেন। বললেন, কেমন লাভ হচ্ছে ?

নিমাই অপ্রস্তুত হয়েই বলে, আজ্ঞে হিসেব তো করি না।

তোমাকে নিয়ে বড় মুশকিল দেখছি। হিসেব ছাড়া ব্যবসা হয় ? হিসেব করেই করতে হয় সব কত যাচ্ছে কত আসছে কত পড়তা হল দেখবে না ? একখানা খাতা করো।

যে আজ্ঞে।

নিমাই খাতা করল। তারপর হিসেব কষতে বসল। একখানা পুরনো প্রাণ্টিকের ভেতর তার টাকা থাকে। সেখানা খুলে সব টাকা-পয়সা বের করে যখন গুনে-গেঁথে তুলল তখন তার মাথাটা ঘুরেই গেল একটু। কম করেও মাসে হাজার থাকেনক টাকা তার আয় হচ্ছে যে! সতি না স্বপ্ন ? হাজার টাকা যে অনেক টাকা।

আরও তিন দিন বাদে নদে এল। সব গুনে-টুনে বলল, ফুঃ। হাজার টাকা আবার এ বাজারে একটা টাকা নাকি ? ওরে, আমার যে এ-ই ঢের।

তোমার ঢের নিয়ে তুমি থাকো। ভাল করে ঘুগনি খাওয়াও তো!

বড় একটা প্রেটে ঘুগনি ঢেলে যত্ন করে দিল নিমাই। বলল, ব্যবসাটা আরও বাড়াবো, বুঝলি ?

বুঝলাম। তোমাকে দেখে আমার হিংসে হয়। অল্পেই বেশ খুশি হয়ে যাও।

অনেকে যে বেশিতেও খুশি হয় না। তেঁটা আরও বেড়ে যায়। অল্পে খুশি হই—এটাই আমার ভগবানের আশীর্বাদ।

এই ব্যবসাই যদি করবে তা হলে একটা দোকান দাও নিমাইদা। আর চৌকিদারের চাকরিটাও ছাড়া।

ও না। চৌকিদারের চাকরি আমার লক্ষী। এই চাকরি করতে করতেই বিয়ে হয়েছিল।

নদে হেসে বলল, তা হলে তো চাকরিটা অপয়াই। বিয়েটা তোমার ভাঙার মুখে।

ও কথা বলিসনি। নিরঞ্জনবাবু বড় ভাল লোক।

শোনো, আমি বনগাঁ গিয়েছিলাম। বিশ্ববিজয় অপেরার এখন তুঙ্গে বৃহস্পতি। মেলা বায়না পাচ্ছে।

তা হোক। কাকা নাটকের জন্য প্রাণ দিতে পারে। ওর অপেরার ভাল হোক।

কিন্তু একটা খবর একটু খারাপ। বীণাপাণির সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

নিমাইয়ের বুকটা একটু কঁপে উঠল, তাই নাকি ?

হ্যাঁ, সে তোমার নাম শুনেই রেগে যাচ্ছে।

নিমাই মলিন একটু হাসল, নামটা তুললি কেন ?

তোমার অবস্থা দেখে মায়া হচ্ছিল বলে। তা সে কোনও কথাই কানে তুলল না। বলল, ওর হয়ে দূতীয়ালি করতে হবে না। ওই নিমকহারামকে আমি ভুলে গেছি।

নিমাই ফ্যাকাসে মুখে হাসবার আর একটা চেষ্টা করে বলল, কথটা তো মিথ্যেও নয়। তার নুন অনেক খেয়েছি।

॥ ৫৪ ॥

তুমি আজকাল কুল-টুলেও বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছে! হল কি তোমার ? প্রেস্টিজ বলে কিছু নেই নাকি ? ডাকলেই যেতে হবে ? একটু থতমত খেয়ে গেল কৃষ্ণজীবন। অপ্রস্তুত হয়ে বলল, প্রেস্টিজ! না, প্রেস্টিজের কি আছে ? ওরা ডাকল, গোলাম।

সেটাই তো আমার আপত্তির কারণ। যাকে দেশ-বিদেশ থেকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে, যার ঘর-সংসারের দিকে মন দেওয়ার সময় নেই, সে যদি এখন এসব ছোটখাটো ব্যাপারেও তু বললেই ছুটে যায় তা হলে সেটা কেমন দেখায় বলো তো!

গুণগোলটা কোথায় হল তা বুঝতে পারছিল না কৃষ্ণজীবন। একটা মিশনারি ক্লকের কর্তৃপক্ষ তাকে ডেকেছিল সেমিনারে। কৃষ্ণজীবন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সামনে তার কথা বলার সুযোগ কমই পায়। এই সুযোগটা পেয়ে সে খুশিই হয়েছিল।

অবাক হয়ে কৃষ্ণজীবন খুব সরলভাবে বলল, কোনও দোষ হয়েছে নাকি ? বাচ্চাদের শেখানো তো ভালই। ওরাই তো ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে দেখবে।

ছাই দেখবে! তোমার বকবকানি এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বের করে দিয়েছে এতক্ষণে। এসব আজবাজে অনুষ্ঠানে যাচ্ছে, অথচ ইতুর বিয়ের নেমস্তনে গেলো না! কত দুঃখ পেলে ওরা বলো তো! মেসোমশাই নিজে এসে নিমন্ত্রণ করে গিয়েছিলেন। তোমার জন্য আমাদেরও যাওয়া হল না।

কৃষ্ণজীবন সংসারী নয় বটে, কিন্তু খুব বোকাও নয়। ইতু হল রিয়ার এক মাসতুতো বোন। ব্যাঙেলে ওদের বাড়ি। সম্পর্ক খুব একটা নেই। নেমস্তনে যাওয়ার ব্যাপারটা খুব জরুরী কিছু ছিল না। কিন্তু রিয়া হঠাৎ ব্যাপারটাকে ভীষণ গুরুত্ব দিতে যে কেন শুরু করল কে জানে! ব্যাঙেল যেতে হলে পুরো দিনটা বরবাদ হত। সেমিনারে যাবে বলে কথা দেওয়া ছিল, কথার খেলাপ হত।

কৃষ্ণজীবন অপরাধীর মতো মুখ করে বলল, তুমি গেলে না কেন ? তোমাকে তো যেতে বলে গিয়েছিলাম!

এত দূরের রাস্তা বাচ্চাদের নিয়ে আমি একা যাবো ? সেটা কি ভাল দেখাত ?

তার কি বুঝত না যে, কথার খেলাপ করাটা ঠিক নয় ? তেমন হলে গাড়িটা নিয়েও যেতে পারতে। ড্রাইভার রতন থাকত।

গাড়ি অতদূর নিয়ে গেলে তুমি কি খুশি হতে ?

না, গাড়ি নিয়ে বেরোনার ব্যাপারে কৃষ্ণজীবনের আপত্তি আছে। পৃথিবীর ভারাক্রান্ত আবহাওয়ায় সে নিজের অবদান যোগ করতে চায় না। তবু গাড়িটা কেনা হয়েছে স্ট্যাটাস সিদ্ধল হিসেবে। কিনিয়েছে রিয়াই। ওরাই যোরে বেড়ায়। কৃষ্ণজীবন কখনও আপত্তি করে না। তবে তেল পোড়ানো যে তার পছন্দ নয় এটা তার পরিবারের সবাই জানে।

কৃষ্ণজীবন কাঁচামাছ হয়ে বলে, খুশিই হতাম। তোমার তো প্রয়োজনটা জরুরীই ছিল।
সামান্য একটা কুলের সেমিনারে না-গেলেও তোমার চলত। ওই ক্যাংলাপানা, কালো সাউথ ইন্ডিয়ান মেয়েটা যে
তোমাকে কী মন্ত্র করল কে জানে!

কৃষ্ণজীবন একটু ব্যাকুল হয়ে বলে, সে বড় ভাল মেয়ে।
ভাল হোক না, কিন্তু কুলে পড়া মেয়ে তো! তার কথাটারই গুরুত্ব বেশি হল?
মেয়েটার গুরুত্ব যাই হোক, বিষয়টার গুরুত্ব ছিল।

দেখ, ওসব বোলো না। পৃথিবীর ভাল-মন্দ নিয়ে ভাববার জন্য অনেক বড় মাথা আছে। তোমার জন্য কিছুই ঠেকে
থাকবে না। একটি দিনের জন্য পৃথিবী ক্ষয় হয়েও যাচ্ছিল না।

কৃষ্ণজীবনের মুশকিল হল, সে ভাল অভিনেতা নয়। এ সময়ে তার হয়তো খুব নরম গলায় বলা উচিত ছিল, আই
অ্যাম সরি রিয়া। আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। কাম অন, লেট আস ফরগেট দি হোল থিং। কিন্তু সেটা ঠিক পেরে ওঠে না
সে। ওসব কৃত্রিম কথা বলতে গেলে সে মনে হেঁচট খায়। রিয়ার এখন তাকে অপমান করার দরকার, তাই করছে।
অপমানটা সে বরাবর মেনে এবং সয়েও নেয়। এসব ছোটখাটো ব্যাপার তাকে দমিত করে না।

ক্যাংলা কালো সাউথ ইন্ডিয়ান বাচ্চা মেয়েটার নাম আপা। অন্যদের বাড়িতে পরিচয় হয়েছিল। এ বাড়িতে আজকাল
প্রায়ই আসে। তারই জন্য তাদের কুলে যেতে রাজি হয়েছিল কৃষ্ণজীবন। সে জানে, রিয়া যতটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করল ততটা
তুচ্ছ আপা নয়। আপার ধাত অন্য। কৃষ্ণজীবন মানুষকে খানিকটা চেনে। অধ্যাপিকা রিয়া বুদ্ধিমতী, শিক্ষিতা, সম্প্রতি
ডক্টরেটও পেয়েছে। তবু আপার পাশে তাকে দাঁড় করানোই যাবে না। আপার যা আছে তা খুব কম মেয়েরই আছে।
সাধারণ মেয়েদের মতো কোনও দুর্বলতা তার নেই। এইটুকু বয়সেই সে অনেক বিস্তার লাভ করেছে হৃদয়বৃত্তায়।

তোমার সস্তা হাততালি পাওয়ার লোভ খুব বাড়ছে। বুঝলে! অহংকারও বেড়েছে।
কৃষ্ণজীবন একটা দীর্ঘশ্বাস খুব সন্তর্পণে ছাড়ল। তারপর হেলানো চেয়ারে এলিয়ে চোখ বুজে বাক্য-বুলেটে ঝাঁঝরা
হতে লাগল নীরবে। তার মুক-বধিরতা আজকাল এইসব পরিস্থিতিতে কাজে লাগে।

আজ সে কুলের একরাশি ফুলের মতো ছেলেমেয়ের সামনে এক ঘটনা ধরে বক্তৃতা দিয়েছে চোপ্তা ইংরিজিতে। বিষয়
ছিল, “সেত দি আর্থ”। তার প্রিয় বিয়। বক্তৃতাও নয় ঠিক। একজন ব্যাখিত মানুষের মুখ থেকে পৃথিবীর অন্তর্নিহিত যন্ত্রণাই
যেন মথিত হয়ে বেরিয়ে এল। তার সঙ্গে মিশে গেল অবিমুখ্যকারী মানুষের কৃতকর্মের জন্য মনস্তাপ। হল ফেটে পড়ল
হাততালিতে।

বক্তৃতার পর আর্থ ঘটনা ছিল প্রশ্নোত্তরের পালা। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরাও আজকাল পৃথিবীর সমস্যা নিয়ে কত
ভাবছে। নানা সুন্দর ও প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করেছিল তারা। দিনটা অনেক দিন মনে থাকবে তার।

আপা সেমিনারের শেষে সোজা এসে তার হাত ধরল, আপনি আজ আমার কথাই যেন বললেন। আমিও কত ভাবি,
কিন্তু এলোমেলোভাবে। আপনার চিন্তাগুলি খুব বিন্যস্ত।

কৃষ্ণজীবন হেসে বলেছিল, তুমি এরকম বাংলা শিখলে কোথায় থেকে?

কিছু ভুল বললাম?

না তো! তবে এরকম বাংলায় কেউ কথা বলে না।

আমি মনে করি একটা ভাষায় যত শব্দ আছে তার সব কিছুই মুখের ভাষায় প্রয়োগ করলে একঘেয়েমি কেটে যায়।
ভাষা তো ব্যবহারের জন্যই, না?

তা বটে।

প্রিন্সিপালের ঘরে যখন চা কেক নিয়ে আপ্যায়িত করা হচ্ছিল তাকে তখন স্বয়ং প্রিন্সিপাল হঠাৎ প্রশ্ন করলেন,
আপাকে আপনি কত দিন চেনেন?

খুব সম্প্রতি। কেন বলুন তা!

আপা আমাদের সব চেয়ে ভাল ছাত্রী। কিন্তু খুব একরোখা। ওকে নিয়ে ওইটেই প্রবলেম।

একরোখা হওয়াই তো ভাল।

প্রিন্সিপাল একটু চিন্তিতভাবে শুধু বললেন, হুঁ।

তাকে বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে গেল যে-দুটি ছেলেমেয়ে তাদের মধ্যে একজন আপা, অন্যজন অনুর দাদা বুবকা।

বুবকা বলল, আপা আমাকে খুব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে, যেগুলোর পরিসব নয়।

কি কথা বলে?

বলে যে, গড়ের মাঠে যত ঘাস আছে, তার ওপর যেসব গঙ্গাফড়িং লাফিয়ে বেড়ায়, আকাশে যে মেঘ ভাসছে বা টু
মিলিয়ন লাইট ইয়ার দূরে যে স্টারটা মিটিমিট করছে, এসবের সঙ্গে নাকি আমার রিলেশন আছে। এটা কি সত্যি হতে পারে?
কৃষ্ণজীবন একটু হাসল। তারপর বলল, আপা হয়তো খুব মিথ্যেও বলে না। কে জানে, হয়তো আছে।

কিরকমভাবে আছে? হোয়ার ইজ দি লজিক?

লজিকা না, লজিক নেই। তবে খুব সূক্ষ্ম জিনিস বুঝতে গেলে শুধু যুক্তি দিয়ে বোঝা যায় না। অনুভূতি চাই।

আপা বোঝে, আমি বুঝি না কেন? আমার কি ফাইনার ফিলিং নেই?

তা নয়। তবে সুস্পষ্ট জিনিসটাই তো অদ্ভুত। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে এর কোনও মানেই হয় না। এই যে আমরা
জন্মেছি, সভ্যতা তৈরি করছি, কথা কইছি—এসবের মানে কি বোলা তো? কেন এই প্রাণ, এই শরীর, এই অনুভব, এইসব
পারসেপশন? জড় বিশ্বে হঠাৎ এসব কোথা থেকে এল? কেনই বা এল?

কেমিক্যাল রি-অ্যাকশনস। ডায়ালেকটিক ...

যদি তাই হয় তাও স্পষ্ট হল না। আবছা থেকে গেল।

কিন্তু ঠার বা ঘাসফড়িং-এর সঙ্গে আমার রিলেশন কি ?

আমি তা জানি না। তবে এটা জানি, সারা পৃথিবীতে যে প্রাণের প্রকাশ দেখতে পাই তার মধ্যে একটা স্মৃষ্টি উদ্ভিদ আছে। আছে প্রাণ ও জড়ের মধ্যেও একটা অদৃশ্য আত্মীয়তা। তুমি, আমি, গাছ, পাখি আলাদা ঠিকই, আবার খুব একটা অনাত্মীয়ও নই। গোটা দুনিয়াটাই যেন একটা ছক, একটা সূরে বাঁধা।

তবে আমি তা টের পাই না কেন ?

চেষ্টা করলে হয়তো পারে।

আপা পায় ?

আপা হাসল না। গভীর হয়ে বলল, শোনো বুদ্ধুরাম, ভালবাসা ছাড়া ওসব টের পাওয়া যায় না।

কি বোণাস কথা দেখুন। হচ্ছে সায়েন্সের কথা, ও ভালবাসা এনে ফেলল!

কৃষ্ণজীবন তার দু'পাশে বসা দুটি প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করল না। কে জানে, হয়তো এই বিবাদই ওদের বন্ধুত্বে আটকে রেখেছে।

কৃষ্ণজীবন খানিকক্ষণ ওদের তর্ক শোনার পর বলল, আপা যে ভালবাসার কথা বলছে সেটা অলৌকিক কিছু নয়। আমার মনে হয় ভালবাসা একটা এমন জিনিস যা সব জ্ঞানকে গ্রাস করে নিতে পারে।

বুবকা উত্তেজিত গলায় বলে, হোয়াট ইজ দি মিনিং অফ দিস ? আমি তো বুঝতে পারছি না।

কৃষ্ণজীবন বলে, আমিও বুঝতে পারি না। কিন্তু এটা জানি ভালবাসাই মানুষকে শেখায়, জানায়, ভালবাসাই মানুষকে মানুষ করে।

সেটা কিরকম ভালবাসা ?

আপা অন্য পাশ থেকে বলে উঠল, তুমি বুঝবে না।

কেন বুঝবে না ?

তার কারণ আছে। তুমি আজ সেমিনারে বক্তৃতা শুনে বেশ উদ্বুদ্ধ হয়েছিলে তো!

বুবকা বলল, ইট ওয়াজ ইমপ্রেসিভ, ইয়েস।

কিন্তু পৃথিবীর জন্য তুমি কিছু করবে কি ?

কেন করব না ?

করবে না। কারণ, তুমি কয়েকদিন পরেই সব ব্যাপারটা ভুলে যাবে। আমরা যে যার কেরিয়ার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ব। চাকরি বা কিছু করব। আমাদের সব ফ্যামিলি হবে। তারপর পৃথিবী একদিকে থাকবে আর আমরা থাকব নিজেদের দাফা নিয়ে। তাই না!

আমি অত সেলফিস নই।

মানছি বুবকা। তুমি অন্তত তোমার বাবাকে ভীষণ ভালবাসো।

যাঃ ওর সঙ্গে এর কী সম্পর্ক ?

আছে। বাবাকে যখন ভালবাসো তখন তুমি সেলফিস নও। তাই না ?

তা তো নই-ই।

এবার বুঝতে চেষ্টা করো, বাবা তোমার কাছে যেমন, এই পৃথিবীটা তোমার কাছে যদি তেমন হয়, তা হলে কেমন হবে ? বাবার অসুখ হওয়ায় তুমি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলে, রাতে গিয়ে বসে থাকতে নার্সিংহোমের ফটকের বাইরে। মনে নেই ?

থাকবে না কেন ?

যখন পৃথিবীর গভীর, গভীরতর অসুখ টের পাও তখন কি ওরকম অস্থির হও ?

মাথা নেড়ে বুবকা বলে, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। দিস ইজ গ্রীক টু মি।

আপা বলল, সেইটেই তো সমস্যা। ইট ইজ গ্রীক টু এভরিবডি।

কৃষ্ণজীবন একখানা হাত বুবকার পিঠে রেখে ধীর গলায় বলল, অত ভেবো না। রাগ করারও কিছু নেই। আপনার মতো স্মৃষ্টি অনুভূতি আমারও নেই। কিন্তু আপা যা বলছে তার মধ্যে একটা সত্য থাকলেও থাকতে পারে। ব্যাপারটা তুমি হাইপথেটিক্যালি নাও।

নিতেই হবে ? যদি না মানি ?

তা হলেও ক্ষতি কিছু নেই।

বুবকা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, আপা খুব বিচ্ছিন্ন মেয়ে, জানেন ? একটুও পড়াশোনা করে না, কিন্তু হায়ার সেকেন্ডারিতে ঠিক আমাদের বিট করবে। কি করে যে পারে কিছু বুঝতে পারি না। ও ব্ল্যাক আর্ট জানে বোধ হয়!

আপা বলল, তুমি একটি বোকাম।

কৃষ্ণজীবন আবার নীরবে বসে ওদের ঝগড়া শুনল কিছুক্ষণ। বুঝতে পারল, আপনার কাছে তার বন্ধুরা নানাভাবে হেরে যাচ্ছে, রেগে যাচ্ছে। অথচ কিছু করতে পারছে না।

আজ রাতেও আপাকে নিয়ে খানিকক্ষণ ভাল কৃষ্ণজীবন। তারপর বাড়ি নিখুম হল। সে বসল তার বইপত্র নিয়ে।

ফোনটা এল গভীর রাতে। বারোটার পর।

ফচকে গলায় মেয়েটা বলল, কী করছেন ?

ডটস্থ হয়ে কৃষ্ণজীবন বলে, আরে! তুমি এখনও জেগে আছে নাকি ?

আমার একটা পরীক্ষা আছে সামনে। তাই পড়ছি।

ওঃ।

আচ্ছা, আপনি দাদাদের কুলে নাকি আজ একটা দারুণ বক্তৃতা দিয়েছেন ?

কে বলল তোমাকে ?

কী যে আপনি! দাদাই তো বলল!

ওঃ, তাও তো বটে!

আপনি খুব বক্তৃতা দেন, না ?

এটা কে বলল ?

মোহিনী। শি ইজ মাই বুজুম ফ্রেন্ড।

সে তো জানি।

আপনি কিন্তু ভীষণ আনসোশ্য্যাল।

কেন বলো তো!

বন্ধুর সঙ্গে রিলেশন রাখেন না। আমি কতবার ফোন করি আপনাকে। কই, আপনি তো করেন না!

কৃষ্ণজীবন একটু হেসে বলে, আমি ভাল কথা কইতে পারি না যে! তোমাকে ফোন করে কী বলব বলো তো!

খবর নেবেন। কথা বলতে পারেন না, তা হলে অত ভাল বক্তৃতা করেন কি করে ?

বক্তৃতা তো সাজানো ব্যাপার। কথা তো তা নয়। কথা একটা আলাদা জিনিস। আমি ভাল পারি না।

মোহিনীও তাই বলে।

তোমার কী মত ?

আমার মত হল, আপনি যা আছেন তাই ভাল।

তার মানে কি ?

আপনাকে আমার বেশ পছন্দ। একটু চালাকও আছেন, একটু বোকাও আছেন।

দূরকম থাকাই ভাল বলছে ?

হ্যাঁ। পুরুষদের ওরকমই আমার ভাল লাগে।

তুমি বেশ পাকা মেয়ে।

গাল দিচ্ছেন না তো!

না। পাকা মানে ম্যাচিওরড।

আজকাল সবাই ম্যাচিওরড বাবা। সবাই সব বোঝে।

তাই নাকি ?

আমাদের জেনারেশনকে তো আপনি চেনেন না। চিনলে বুঝতেন। কবে দেখা হবে বলুন তো!

তোমার সময় হলেই হবে।

মোটেই না মশাই। পরীক্ষার পর হয়তো গিয়ে শুনবো, আপনি কাম্বাটিকা না হয় আজারবাইজান চলে গেছেন। যা গ্রোব-ট্রাটার আপনি!

মোহিনীর কাছে খোঁজ নিয়ে এসো।

হঠাৎ কৃষ্ণজীবনের মনে হল, বাইরের ঘরের এক্সটেনশন লাইনটা কেউ ধরে আছে। শুনছে তাদের কথা। একটা তৃতীয় স্বাসের শব্দ আসছে টেলিফোনে।

সে অভিনয় জানে না। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার উপায় তার নেই। কয়েক মাস আগে কর্ডলেস টেলিফোনটা সে এনে লাগিয়েছিল বাইরের ঘরে। খুব ভুল হয়েছিল বোধ হয়।

সে বলল, আজ ছাড়ছি অনু।

ওমা, এত তাড়া কিসের ? এখনই তো কথা বলতে মজা, আর একটু জেগে থাকুন না প্রীজ! একটু আড্ডা মারি।

অসহায় কৃষ্ণজীবন বলে, কিন্তু, রাত জাগা কি তোমার পক্ষে ভাল ?

আমার যে আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

কি কথা ?

আচ্ছা, আপনারা নাকি আজ খুব ভালবাসার কথা বলেছেন ?

ভালবাসার কথা ? ওঃ, হ্যাঁ। কিন্তু সেটা তো—

দাদা কিছুই বুঝতে পারেনি। খুব অ্যাজিটেটেড।

ওটা অন্য ধরনের ব্যাপার।

আমাকে একদিন ভালবাসার ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবেন ?

তৃতীয় পক্ষ শুনছে। শঙ্কিত কৃষ্ণজীবন বলে, ওঃ, ওটা কোনও ব্যাপার নয়। আসলে ওটা হল...

কৃষ্ণজীবন এত নার্ভাস হয়ে গেল যে, কথাই খুঁজে পেল না আর। অনু খুব হাসছিল।

ফোনটা তৃতীয় পক্ষ নামিয়ে রাখল। তারপর দরজায় আচমকা দেখা দিল রিয়া। চোখ জ্বলছে। মুখখানা টকটক করছে লাল।

প্রথম দিন সারা রাত ঘরের কাছে জলের টেউ-ভাঙার অবিরল শব্দ শুনতে পেল সে। শুনল নিশুত রাতে বিচিত্র পাখির ডাক। শুনল গুস্তাদি গানের খালার মতো তীব্র ঝিঝির শব্দ। কানে বিশ্বতপ্রায় শেয়ালের দলবদ্ধ চিৎকার। আর বাতাস নানা বিচিত্র হুতাশে কত ফাঁক-ফোকর দিয়ে বাঁশির শব্দ তুলে বয়ে গেল নিরন্তর। চালের টিনে খটাং খটাং কত যে শব্দ উঠল!

ভাল ঘুম হল না হেমাঙ্গর। বারবার উঠে বসল। বারবার জানালার খাঁপ তুলে কুয়াশায় আবছা অন্ধকার নদীকে দেখার চেষ্টা করল। টর্চ জ্বেলে ঘরে সাপ বা বিছে ঢুকেছে কিনা তা তদারক করল। তারপর ফের শুল। উঠল। জল খেল। মাঝে মাঝে একটু একটু ভয়ও করল তার। এই বেড়ার ঘরের নিরপত্তা কতটুকু? বেড়া কেটে ঘরে ঢুকে পড়তে পারে দুই লোক, চোর। দামাল নদী যদি হঠাৎ পাড় ভেঙে গ্রাস করে নেয় ঘরসুদ্ধ তাকে? যদি ঝড় এসে উড়িয়ে নেয় ঘরের চাল?

সকালবেলা অন্ধকার থাকতেই উঠে পড়ল হেমাঙ্গ। জানালা খুলে সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় বসে রইল। কালো আকাশে প্রথম 'খানা আবছা দিগন্তজোড়া পাখনার বিস্তার ফুটে উঠল। আলোর দুটি ডানা। সেই ডানা আকাশের অন্ধকারময়তায় রাতের তারাকে মুছে নিল। একেই কি ভোর বলে—যেমনটা সে কলকাতায় কখনও দেখতে পায় না? এত অপরূপ! দিগন্ত থেকে দিগন্তে হালকা কুয়াশার মায়াজালে জড়িয়ে অস্ফুট ভোরের আলো কত ম্যাজিক দেখাতে থাকে। দু'খানা চোখ আজ দৃশ্যের ঐশ্বর্যে ভুবে গেল তার। প্রকৃতির এত অলঙ্কার আছে জানত না সে। কালো নদীর ওপর সোনালী আলপনা ঐকে উঠে আসছে সূর্য। পলক ফেলতে পারে না হেমাঙ্গ। আবেগে তার শ্বাসকষ্ট হতে থাকে।

তারার আলোয় আলো হয়ে যেতে লাগল চারদিক। রবীন্দ্রনাথ রোজ কেন সূর্যোদয় দেখতেন তা হেমাঙ্গ যেন একটুখানি বুঝতে পারে।

এখানকার মানুষ রাত থাকতেই উঠে পড়ে। আলো ফুটতে না ফুটতেই বাঁকা মিঞা হাজির। সঙ্গে ছোট ছেলে ফজল। ফজলের হাতে কেটলি। তাতে গরম দুধ। একটা ঠোঙায় বেশ কয়েকটা দিশি নিমকি বিকৃত।

খেয়ে নিন। এ আমার রাজা গাইয়ের দুধ।

হেমাঙ্গ আতঙ্কিত স্বরে বলল, দুধ! ও তো আমি কখনও খাই না।

তা বললে চলবে কেন? এ দুধের স্বাদ একটু চেখেই দেখুন। হরিয়ানার গাই বা জার্সি গরু নয় যে, দশ-বিশ সের করে সাদা জল দেবে। এ দিশি গাই, দুধের স্বাদই আলাদা।

হেমাঙ্গ বিরস মুখে বলে, আচ্ছা রাখো। মুখটুকু আগে ধুই, চা খেয়ে নিই, তারপর খাবো।

ফজলকে বলতে হল না। সে বালতির বাসি জল ফেলে টাটকা জল এনে দিল টিপকল থেকে। হেমাঙ্গ দাঁত ব্রাশ করল, মুখ ধুল। ফজলই এনে দিল চা। চায়ের পর দুধটাও খেতে হল তাকে।

কেমন বুঝছেন এ জায়গা?

রাতে খুব শব্দ হয়, না?

কিসের শব্দ?

জলের, বাতাসের, পাখির, ঝিঝির—অনেক শব্দ।

বাঁকা মিঞা খুব হাসল। বলল, ওসব সয়ে যায়। থাকুন, দেখবেন ওসব আর কানে আসছে না। তবে থাকতে পারবেন কিনা তাই ভাবছি।

কেন বাঁকা মিঞা, পারব না কেন?

আপনার হল শখের থাকা। শখ তো দু-চার দিনের। তারপর আর গাঁ ভাল লাগে না।

হেমাঙ্গ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, দেখা যাক।

দেখুন। আপনারা এরকম মাঝে-মাঝে এসে থাকলেও এদিককার লোকের ভাল হয়। তারা বল-ভরসা পায়। বাবুরা আসে না বলেই তো আমাদের দুঃখ।

বাবুরা এসে কি করবে?

কিছু করতে হবে না। আমাদের কোন তেপান্তরে বাস দেখছেন তো! এখানকার লোক ভাবে, আমরা বুঝি জন্মই, মনিষি নয়। এ গাঁয়ে গত পাঁচসাত বছরের মধ্যেও কোনও এম এল এ আসেনি, মন্ত্রী তো দূরস্থান। এখানকার সবচেয়ে বড় ভি আই পি হলেন পামের গাঁয়ের হাই স্কুলের কয়েকজন মাস্টারমশাই। তাঁরাও তেমন কেউবিশি নন, এখানকারই লোক সব। আপনারদের আনাগোনা হলে আমাদের একটু কেমন যেন ভরসা হতে থাকে। সেটা যে কেমন তা বোঝানো যায় না।

দুধটা সত্যিই ভাল। অভ্যাস নেই বটে, কিন্তু খেতে বেশ লাগল।

বাঁকা মিঞা বলে, গেলাসটায় একটু জল ঢেলে তলানিটা খেয়ে নিন।

কেন?

দুধের পাত্র-ধোওয়া জল খেলে খুব পোষ্টাই।

হেমাঙ্গ এই গ্রাম্য সংস্কারের কথা শুনে হাসল। তবে খেলও। হোয়েন ইন রোম, বিহেভ লাইক রোমানস্।

দুপুরে কী খাবেন?

বেশি আয়োজন করো না। তেমনটা যা খাও তা হলেই আমার হবে।

চালটা কি একটু মোটা ঠেকছে?

খারাপ লাগছে না।

মোটা চালের ভাত খেতে আপনারদের অসুবিধে হয়, কিন্তু এখানে মোটা চাল ছাড়া পাওয়া যায় না। সরু চাল খেতে হলে সেই সন্দেশখালি বা সোনাকালি যেতে হবে।

না না, তার দরকার নেই। আমার খেতে কোনও কষ্ট হচ্ছে না।

বাঁকা মিঞা একটু হাসল, আপনার দেখছি এ জায়গার ভূতে পেয়েছে। সবই ভাল লাগছে। এখানেই আমার হাড়ে ঘূণ ধরল, কিন্তু কী ভাল কিছু তো দেখলাম না। এ হল মরা জায়গা। যা ছিল তাই আছে। এ জায়গার কোনও উন্নতিও নেই, অধোগতিও নেই। অধোগতির আর আছেটাই বা কী বলুন, তলানিতে এসে ঠেকেছি, পাছবেড়ায় পিঠ।

তবু তো আগেকার মতো কলেরা বসন্তে গাঁ কে গাঁ সাফ হয়ে যাচ্ছে না। সেটাও তো একটা ভাল লক্ষণ।
তা যা বলেছেন। কলেরা-টলেরা হয় না আজকাল। টিপকল হয়ে ইস্তক হচ্ছে না। কিন্তু বেঁচে থাকাটাও যে মরার মতোই হচ্ছে। ধুকতে ধুকতে টিকে থাকাকে কি আর বেঁচে থাকা বলে ? বেড়াতে বেরোবেন নাকি ?

নদীর ধার দিয়ে একটু হেঁটে এলে হয়।
তাহলে বেরিয়ে পড়ুন। ডান ধারে যাবেন না, ওদিকটায় লোকে হাগে। বাঁ ধারে একখানা মেটে বাঁধ আছে, অনেক দূর অবধি গেছে। ওদিকটা তত অপরিষ্কার নয়। তবু সাবধানে যাবেন। বাঁধের ওপর রাস্তা আছে। লোক চলাচল আছে।

ঘরে তলা দিতে হবে নাকি ?
না দিলেও হয়। তবে ভেজিয়ে রেখে শেকলটা তুলে দিয়ে যাবেন। কুকুর-টুকুর ঢুকে পড়তে পারে।

এই বলে বাঁকা মিঞা চলে গেল। হেমাঙ্গ পোশাক পরে ঘরে শেকল দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। রোদ উঠেছে বটে, কিন্তু নদীর ওপর দিয়ে কনকনে বাতাসও আসছে। বাঁধটি চমৎকার। উঠে দাঁড়ালে নদীর বাঁকটা বহু দূর অবধি দেখা যায়। জলে রূপোলি রোদ্দুর খেলা করছে। উজান-ভাটেনে ভটভটি, নৌকা চলছে মধুর গতিতে।

বাঁধের ধারেও মানুষ প্রাকৃতিক কাজ সারে। দমকা হাওয়ায় মাঝে মাঝে দুর্গন্ধ আসছে। নাকে রুমাল চাপা দিতে হচ্ছে হল তা। আবার ভাবল, এসব সয়ে নেওয়াই ভাল। অত গুচিবাই হলে চলবে না।

এই অজ্ঞাতবাসের কথাও যে জানাজানি হয়ে যাবে তা হেমাঙ্গ জানে। হয়তো জানাজানি হয়েও গেছে এতক্ষণে।
এক রবিবার রাতে রশ্মির সঙ্গে তার যে প্রণাঢ় সংলাপ হয়েছিল টেলিফোনে সেটাই হেমাঙ্গকে এত দূর ছুঁত করিয়েছে।

উইক ডে-গুলো তত ভয়ের নয়। ভয় হল শুক্রবার বিকেল থেকে রবিবারের রাত অবধি। রশ্মির বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণের পর নিমন্ত্রণ আসছে আজকাল। পাটি হচ্ছে ঘন ঘন। বিয়ের কথাটা খুব স্পষ্টভাবে ওরা উচ্চারণ করছে না হেমাঙ্গর সামনে।

কিন্তু বিডন স্ট্রিটের বাড়িতে প্রস্তাব গেছে এবং গৃহীত হয়েছে।
স্বয়ং বাবাই ডেকে পাঠালেন এক রবিবারে। অতি ব্যস্ত ও অনামনস্ক মানুষ। অনেক কথা খেয়াল রাখতে পারেন না।

সেদিনও তাঁর কোথায় যেন একটা জরুরি মিটিং ছিল। হেমাঙ্গকে দেখে বেশ ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললেন, ওরা এসেছিল-। তা ভালই তো। সবই তো ঠিক আছে। ভূমি কি বোলা ?

বিনা ভূমিকায় এরকম কথা বললে যে তার কোনও মানেই দাঁড়ায় না সেটা দুর্গানাথবাবুর মাথাতেই ছিল না। তিনি বোধ হয় মিটিঙের জরুরিতর বিষয়টি নিয়েই ভাবছিলেন।

হেমাঙ্গ অবাক হয়ে বলে, কিসের কি ঠিক আছে বাবা ?
দুর্গানাথবাবু ছেলের প্রশুটি অনুধাবন করতে পারলেন না। অত্যন্ত উদারভাবে বললেন, আমি অবশ্য আমার ছেলেমেয়েদের কেউ বিশেষ বসবাস করুক চাই না। কিন্তু কী আর করা যাবে! তবে আমি মনে করি ছেলেমেয়ে হলে তাদের আর বিলেতে রেখো না। অন্তত স্কুলিংটা এদেশে হলে ভাল হয়। মাতৃভাষাটাও শেখা হয়ে যাবে। তারপর মাধ্যমিক পাস করলে না হয় আবার ফিরে গিয়ে হায়ার এডুকেশন ওখানে নেবে। কি বোলা ?

হেমাঙ্গ একেবারেই বুঝতে পারছিল না তা নয়। সে অন্তত এটা বুঝতে পারছিল যে, তার ব্যস্ত বাবা ডিটেলসে না গিয়ে, ভূমিক না করে শুধু স্যালিয়েন্ট পয়েন্টগুলো বলে যাচ্ছেন। বেশি কথায় সময় নষ্ট হয়।

হেমাঙ্গ অবাক হওয়ার ডান করে বলল, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।
দুর্গানাথবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, সেরকমই তো সব ঠিক হয়েছে শুনলাম। আমরাও তো মত দিয়েছি।

ঠিক এই সময়ে মা এসে ঘরে ঢুকল। মুখে বেশ একটু হাসি-খুশি ভাব। উজ্জ্বলতাও দেখা যাচ্ছে। জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন, ওঃ, ঠাকুরের কাছে কত মানত করেছি। ছেলের এতদিনে মতি হল।

হেমাঙ্গ গম্ভীর হল। কিংবা গম্ভীরের মুখোশ পরল। বলল, তামরা কি বিয়ের কথা বলছো মা ? কিন্তু আমি তো এখনও মনস্থির করিনি।

দুর্গানাথবাবু একটু অবাক হয়ে স্ত্রীর দিকে তাকালেন।
মা বলল, ওরে, অত লজ্জা পেতে হবে না। লাভ ম্যারেজ বলে কি আমার কেউ কিছু আপত্তি করেছে ? দিনকাল পাটোছে, এখন যুগের হাওয়া মেনে নিতে হবে বৈকি। মেয়েটাও ভারি চমৎকার।

হেমাঙ্গ দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, মা, আমি কিন্তু মতামত এখনও দিইনি। আমাকে ভাববার সময় দাও।
দুর্গানাথবাবু অবাক হয়ে বললেন, ভাববে! ভাববে কি ? তাঁরা যে প্রস্তাব দিয়ে ফেলেছেন! চারু তো বলে গেছে, তামার নাকি খুবই মত আছে।

চারুদিদি ঠিক কথা বলেনি।
দুর্গানাথবাবু ফের স্ত্রীর দিকে তাকালেন, কী লছে এ ?

মা বিরক্ত হয়ে বলল, ভূমি মিটিঙে যাও তো। আমি সব বুঝে দেখছি।
দুর্গানাথবাবু একটু তাড়হাড়ো করেই বেরিয়ে গেলেন। সংসারের সাতপাচের মধ্যে তিনি বিশেষ থাকতে চান না কখনও।

তারপর মা ধরে পড়ল তাকে, কী হয়েছে বল তো! চারু বলছে তোর নাকি ও মেয়ের সঙ্গে খুব ভাল। পাণ্ডুর বাড়ির লোকেও বলছে তাদের নাকি বোঝাপড়া হয়ে গেছে। তাহলে আবার ওসব বলছিস কেন ?

মা, বাঙালি ছেলেদের তো বিয়ে করা ছাড়া আর কোনও অ্যাচিভমেন্ট নেই। তা আমার সেটা হয়ে গেলে জীবনে আর কী থাকবে বোলা!

বিয়ে করা ছাড়া আর কিছু থাকবে না কেন ?

২৩৪

আর কী বলে তো! বাঙালিদের প্রেম হল সবচেয়ে বড় অ্যাডভেঞ্চার আর বিয়ে হল মন্ত কীর্তি। ব্যস জীবনের সব সার্থকতা হয়ে গেল।

কথা যোরাচ্ছিস! কী হয়েছে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বল তো। মেয়েটার সঙ্গে ঝগড়া করেছিস নাকি? সে যে বড় ভাল মেয়ে। বিলেত-ফেরত বলে মনেই হয় না। সহবাস জানে খুব।

একটু অধৈর্য হয়ে হোমস বলে, রশ্মি খুব ভাল মেয়ে। তাকে বিয়ে করতেও আমার আপত্তি থাকা উচিত নয়। তবে আমার একটু সময় চাই।

সময়? সে মেয়ে যে আর ক'মাস পর বিলেত চলে যাবে। তার নাকি সেখানেও আরও কী সব পড়াশুনো করার আছে, চাকরিও পাকা। ওর বাপ-মা এবার ওকে একা ছাড়বে না, বিয়ে দিয়ে বরের সঙ্গে পাঠাবে।

সেটা ওদের দিককার কথা। ওরা যা বলবে তা-ই আমাকে করতে হবে নাকি? আর এখন আমি বিলেত গেলে তোমার মন খারাপ হবে না বুঝি? যখন গিয়েছিলাম তখন তো প্রতিটি চিঠিতে 'ফিরে আয়, ফিরে আয়'।

মা হাসল, সে তখন একা ছিল বলে। এখন তো তা নয়। বড় সঙ্গে থাকবে।
হোমস কথা বুজে পাচ্ছিল না। শুধু বলল, আমাকে বিলেত যেতে হবে কেন তা-ই তো বুঝতে পারছি না। বিলেতে থাকা আমার পছন্দ নয়। ওদের সেটা ভাল করে বুঝিয়ে দাও।

মা চোখ কপালে তুলে বলে, বোঝাপড়া তো তোরাই করেছিস। আমরা এর মধ্যে মতামত দিতে গেলে কি ভাল দেখায়? যা বলার সে তো তু-ই ওদের বলতে পারিস। কে কোথায় থাকবি না-থাকবি তা কি আমরা জানি?

হোমস এত অসহায় বোধ করতে লাগল যে আর কোনও কথাই বলতে পারল না। রশ্মির সঙ্গে তার একটা ভাবপ্রবণ সম্পর্ক গড়ে উঠতে না-উঠতেই যে সেটা বিয়ের দিকে এত তাড়াতাড়ি গড়িয়ে যাবে এ তো সে স্বপ্নেও ভাবেনি। সবাই কেন ধরেই নিল যে, সে বিয়েতে রাজি? একটা মতামত জিজ্ঞেস করারও কেন কেউ প্রয়োজন বোধ করল না? কেন রশ্মিও নয়? বিভিন স্ট্রিট থেকে সে উদ্ভাস্তের মতো গরচায় ফিরে এল। বুঝতে পারল, তারা মাথা কাজ করছে না। তার মন অত্যন্ত চঞ্চল। সে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

রাত্রিবেলা সে নিজেই চাক্ষুশীলাকে ফোন করে বলল, তুই কী কাও করলি বল দেখি!

কি করেছি?

রশ্মির আর আমার মধ্যে কেবলমাত্র বন্ধুত্ব ছিল। সেটাকে রোমান্টিক করে তুললি কেন বল তো! শোন, ইয়ার্কি করিস না। ইয়ার্কির সময় এটা নয়।

চাক্ষুশীলা সাবধানী গলায় বলল, কেন, কি হয়েছে?

আজ বিভিন স্ট্রিটে গিয়েছিলাম। বাবা ডেকে পাঠিয়েছিল। ওখানে ফর্মাল বিয়ের প্রস্তাব গেছে। আর সেটা আমাকে না জানিয়েই।

তাতে দোষটা কি হয়েছে? অমন সিরিয়াস হচ্ছিস কেন?

হবো না? বিয়ে করব আমি, আমাকে সেটা জানানোই হল না। বিয়ের পর আমি কোথায় থাকব না-থাকব, ভারতে না বিলেতে তাও সব আমাকে না জানিয়েই ঠিক হয়ে যাচ্ছে! আমাকে কি পেয়েছিস তোরা?

সরি। কিন্তু তোকে নেগলেট করে এসব করা হয়নি রে। আসলে সবাই ধরে নিয়েছে যে, বিলেতে থাকতে তোর আপত্তি হবে না।

সেটা কে ধরে নিল?

চাক্ষুশীলা একটু চুপ করে থেকে বলল, রশ্মি আমাকে বলেছিল, বিলেতে থাকা তোর পছন্দ নয়। তখন আমি বলেছিলাম যে, তোকে আমিই রাজি করাব।

বিলেতে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। তারও আগে প্রশ্ন আছে। আমি বিয়ে করতে রাজি একথা আমি এখনও বলিনি।

সব কথা কি বলতে হয়? বোঝা যায় না?

ভুল বুঝেছিস।

মোটাই ভুল বুঝিনি। রশ্মি অত সস্তা মেয়ে নয় যে নিজেই বানিয়ে ওসব কথা বলবে।

রশ্মি কি বলেছে?

বলেছে, তোদের মধ্যে একটা আভারস্ট্যাভিং হয়েছে।

ওটাকে আভারস্ট্যাভিং বলে না। আমাদের সম্পর্কটা এখনও ভাল করে শুরুই হয়নি। উই আর স্টিল ওনলি ফ্রেন্ডস।

শোন লক্ষী ভাই আমার, তোর ইগোতে একটু লেগেছে বুঝতে পারছি। কিন্তু ওটুকু ক্ষমা-ঘেন্না করে নে। রশ্মি যে ভীষণ ভাল মেয়ে তা তো জানিস। এ মেয়েটাকে কিন্তু ডিচ করিস না। গ্লীজ!

ডিচ করব কেন? আমি তো কোনও কথা দিইনি। আমাকে কি জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল না একবার?

ছিল। একশবার ছিল। কিন্তু তোর হয়ে আমিই যে সব বলে দিয়েছি।

সেটা বুঝতে পারছি। তুই সাজাতিক ভুল করেছিস।

ওরে শোন, তোদের হয়তো আরও একটু সময় দেওয়া উচিত ছিল। মানছি। তবে কী জানিস, রশ্মি তো কিছুদিনের মধ্যেই বিলেত চলে যাবে। ওর হাতে সময় নেই। মেয়েটাকে আমি হাতছাড়া করতে চাইনি। এত ভাল একটা মেয়েটাকে হাতছাড়া করা কি উচিত? মাথা ঠাণ্ডা করে একটু ভাব তো!

আমার হয়ে সব ভাবনা তো তোরাই ভেবেছিস। আমার জন্য তো ভাববার মতো আর কিছু রাখিসনি।

রাগ করিস না। একটু ভাববার চেষ্টা কর। তোদের সম্পর্কটা হয়তো এখনও ততটা ম্যাচিওর করেনি। কিন্তু একদিন তো করবেই। সিচুয়েশনটা এমন হল যে, ম্যাচিওর করার জন্য অপেক্ষা করা চলে না। রশ্মির মা-বাবাও ওকে প্রেশার দিচ্ছে তাড়াতাড়ি ডিসিসন নেওয়ার জন্য। ওরা বিয়ে না দিয়ে রশ্মিকে ছাড়বে না।

সেটা ওদের ব্যাপার। তার জন্য আমাকে ক্লেপগেট করছিস কেন?

কেপগোট! সে কী রে! তুই কেপগোট হতে যাবি কেন? তোর সেটিমেন্ট না-থাক, রশিয়ার যে ভীষণ আছে। ও যে তোকে ভালবাসে সেটা বুঝতে পারিস না বুদ্ধ কোথাকার? ওর ভালবাসার দাম দিবি না?

হেমাঙ্গ ফের অঁথে জলে পড়ে গেল। ভালবাসার ব্যাপারটা সে খুব জোরের সঙ্গে অস্বীকারও করতে পারছে না।

তখনই সে বুঝতে পারল, তার কিছুদিন একটু তফাত হওয়া দরকার। গর-ঠিকানিয়া হওয়া দরকার। নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া দরকার। কলকাতার সিন্টেমের মধ্যে থেকে নিজেকে ঠিকমতো বুঝতে পারে না সে।

আজ সকালে বাঁধের ওপর দিয়ে ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে সে গোটো ব্যাপারটাকে বারবার ভাবছিল। সপ্তাহের শেষে দুটি দিন, শনি আর রবি তার পক্ষে একটু বিপজ্জনক। প্রায় প্রতি শনি আর রবিতেই রশিাদের বাড়িতে তার নিমন্ত্রণ হচ্ছে। সে এড়াতেও পারে না।

কিন্তু তার মন ভরে যায় বিশ্বাদে। রশিকে তার অপছন্দ নয়, কিন্তু এত তাড়াতাদি ধরে-বৈধে তাকে রশিয়ার সঙ্গে যুক্ত দেওয়া হচ্ছে বলেই তার ভিতরটা শক্ত হয়ে উঠছে। উপরন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিলেত-বাস।

হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর গেল হেমাঙ্গ। চারদিকে নিস্তরঙ্গ জীবন-যাপন, উত্তেজনাহীন প্রকৃতি, ধীর নৌকা, স্থির আকাশ ক্রমে মাথা থেকে দৃষ্টিস্তা ও উদ্বেগকে উড়িয়ে দিল।

বাঁ দিকের নাবালে ক্ষেতখামার আছে বটে কিন্তু সবুজের তেমন সমারোহ নেই। গাছপালা তেমন ঘনবদ্ধ নয়। এসব জায়গায় আগে হয়তো ঘন বন ছিল। বসত হয়ে জঙ্গল পিছু হটে গেছে।

অনেকটা হেঁটে বেশ খিদে পেয়ে গেল তার। ফিরে এল।

ফজল তার জন্য নাস্তা নিয়ে এল সকাল আটটা নাগাদ। রুটি আর আলুর তরকারি। ছেলেটা লাজুক এবং স্বল্পভাষী। কিন্তু মুখে একটি মিষ্টি হাসি লেগেই আছে। পরগণে লুঙ্গি আর একটা পাঞ্জাবি। নিভান্তই কিশোরবয়স্ক।

কোন ক্লাসে পড়িস রে ফজল?

ক্লাস সিনেয়ে।

বয়স কত হল?

পনেরো ষোলো হবে।

পাস করিস ঠিকমতো?

ফজল খুব লজ্জাটিক্সা পেয়ে বলে, দু'বছর ফেল মেরেছি।

ফেল মারিস কেন?

ফজল নিরন্তর।

খাওয়া শেষ করে হেমাঙ্গ বলল, যখন আমি এখানে আসব তখন আমার কাছে বই নিয়ে চলে আসবি। পড়া তৈরি করিয়ে দেবো। বুঝেছিস?

জী।

বাসন নিয়ে ফজল চলে গেল। জানালা খুলে ফের নদী দেখতে বসে গেল হেমাঙ্গ। ভাবল, কি দরকার তার কলকাতায় পড়ে থাকার? এই যে সভ্যতাবর্জিত, বিজ্ঞানরহিত, প্রগতিবিহীন একটি গরিব গ্রাম, সে তো বাকি জীবনটা এখানেই কাটাতে পারে। এখানে সে আবার পুরনো দিনের মতো অরণ্য সৃষ্টি করবে, খামার করবে, চারদিকে গাছপালা নিয়ে তার মধ্যে বসবাস করবে। খারাপ কি? যদি বিয়ে করতেই হয় সে তো এখানকার একটি গেরো মেয়েকেই বিয়ে করতে পারে। বেশ তো হবে তা হলে। শহরের কত লোক পালাচ্ছে প্রকৃতির কোলে।

দুপুরে খাওয়ার সময় সে বাঁকা মিঞাকে বলল, শোনো বাঁকা, আমি যদি এখানে আরও জমি নিতে চাই ব্যবস্থা করে দেবে?

আরও জমি? বাবুর দেখি মাথাটাই খারাপ হল। এখানে জমি নিয়ে করবেনটা কী!

চাষবাস করব, জঙ্গল তৈরি করব, ডেয়ারি করব।

বাঁকা খুব হাসল, সে তো ভাল কথা। কিন্তু শহরে থাকবেন আর এখানে জমিদারি পত্তন করবেন তা কি হয়? দিনকাল খারাপ। বেদখল হয়ে যাবে, লোকে পিছনে লাগবে।

তার জন্য তুমি আছে। ঠেকাবে।

এ গা আপনার মাথাটা খেয়েছে।

এ গা বলে নয়। আমার আর শহরে থাকতে ইচ্ছে হয় না।

কলকাতা এখন একটা নরককুণ্ড তা ঠিক। তবে এখানে চট করে একগাদা টাকা ঢেলে বসবেন না। ভাল করে ভাবুন। বাবুর সঙ্গেও পরামর্শ করুন। আপনার হল ছেলেমানুষী বুদ্ধি।

আমার ওপর তোমার বিশ্বাস নেই?

বাঁকা হেসে ফেলল, শোনো কথা! আপনারা কত বিদ্যে ধরেন, কত মাথা খাটান, দেশটা তো আপনার মতো লোকেরাই চালায়। তবে কিনা আপনাদের ক্ষতি হয়ে গেলে এই বাঁকার ঘাড়ের দোষ চাপবে। লোকে বলবে, আমিই আপনাকে এইসব বুদ্ধি দিয়েছি।

সেটা আমি বুঝব। তোমাকে কেউ দোষ দেবে না।

এ হল নোনা মাটির জায়গা। ফসল ভাল হয় না।

ফসলের জন্য মাথাব্যথা নেই। বড় গাছ তো হয়।

সব গাছ হবে না। তবে কয়েক ধরনের গাছ হয়।

আমি বড় গাছ করতে চাই। জঙ্গল।

সে তো মেলা জমি লাগবে। জঙ্গল রক্ষা করা কঠিন কাজ।

তবু তুমি জমি দেখ। সস্তা যেন হয়। এক লাগু অনেকটা।

এক-একটা দিন আসে সকাল থেকে রাত অবধি যেন ভাল জিনিসে ঠাসা। সেদিন যেন সুখ একেবারে উপচে পড়তে থাকে। সকালে সূর্যটা যেন অন্য রকম করে ওঠে, পাখি যেন অন্য রকম করে ডাকে, সেদিন মা সকালের জলখাবার দুটোর বদলে তিনখানা রুটি দিয়ে ফেলে এক চিমটির বদলে এক ডেলা গুড়, সেদিন ইকুলে মাটিরমশাইরা একবারও বেত মারেন না, সেদিন গোপাল সারাক্ষণ আনন্দের নানা রকম শব্দ করে, বাবা সেদিন একটুও মাতাল হয় না, ন'পাড়ার ছেলেরদের সঙ্গে সেদিন হঠাৎ ভাবসার হয়ে যায়, সন্ধের পর আধখানা চাঁদ ঠিক যেন সোনার নৌকোর মতো আকাশে ভেসে ভেসে বেড়ায়, বারান্দায় বসে দাদুর কাছে সেদিন ভারি চমৎকার একখানা রূপকথার গল্প পেয়ে যায় সে।

সেরকম দিন অবশ্য কমই আসে। অনেক সময় দিনটা অর্ধেক তার মনের মতো হল, বাকি অর্ধেকটা হল অন্য রকম। কিংবা সকালটা ভাল গেল, বিকেলটা মনমরা।

আজকের দিনটা কেমন যাবে তা বুঝতে পারছিল না পটল। লক্ষণ মোটেই ভাল নয়। সকালে মায়ের হাতে চড়াপড় খেয়ে ঘুম থেকে উঠেছে। উঠতেই মা ধাক্কা দিয়ে তাকে আর গোপালকে নামিয়ে দিয়েছে চৌকি থেকে, যা, যা, বেরো।

রাতে খুব ঝগড়া হাঙ্গল মা আর বাবাকে। প্রায়ই হয়। কাল লাগল কমলালেবু আর আঙুর নিয়ে। এ বাড়িতে ভাল জিনিস যা আসে তা দাদুকেই সবটা দেওয়া হয়। দাদু ইচ্ছেমতো খেয়ে কিছু বাঁচলে তারা ভাগজোখ করে প্রসাদ পায়। কাল সন্ধেবেলা বাবা কয়েকটা কমলালেবু আর এক খোলো আঙুর নিয়ে এসেছিল দাদুর জন্য।

রাতে ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার পর মা ফোঁস করল, অতগুলো লেবু আর আঙুর স্বপ্নরমশাইয়ের হাতে দিলে, আমার ছেলে দুটো জুলজুল করে চেয়ে দেখল। খুব ভাল করলে সেটা? উনি তো অনেক খেয়েছেন, খাচ্ছেন, আমার ছেলে দুটো কি খায়? সময়ের জিনিস একটু দিতে হয় না ওদের?

চুপ করো তো! ওদের সামনে অনেক খাওয়া পড়ে আছে। বাবা-মার তা নেই। বাপ-মায়ের আশীর্বাদের একটা দাম আছে।

ছাই আছে! উনি তো খান আর হাগেন। কী লোভী লোক বাবা। যা আনা হচ্ছে পেটে সইবে না জেনেও হামলে পড়ে রাক্ষুসের মতো খাবেন। পরদিন থেকেই হাগা ছোটো। আশীর্বাদ না হাতি! নজরও ছোট বাবা, দুটো অবোধ শিশু চেয়ে থাকে, কখনও বলেন না, ওরে পটল, ওরে গোপাল, নে একটু খা।

মিথ্যে কথা বোলো না। বাবা-মা কখনও ওদের না দিয়ে খায়?

দিয়ে মোটেই খায় না। আগে খায়, তারপর তলানি, কিছু পড়ে থাকলে দয়া করে দেয়। তা অমন অশ্বেন্দার জিনিস আমার ছেলেরা খাবে কেন? ওরা কি ভিথিরি? ওদের বাপের পরসাতাই তো ভালমন্দ জুটছে!

পটল সভয়ে বুঝতে পারছিল, আবহাওয়া গরম হচ্ছে। তার বাবা যেদিন মদ না খায় সেদিন মাটির মানুষ। খেলেই টং। কপাল খারাপ, মাতাল না হলেও বাবা একটু নেশা করে এসেছিল। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, চুপ! বেয়াদব, বাপ-মাকে খাওয়াই নিজের পরসায়, তোমার বাপের পরসায় নয়। বেশি কথা কইলে মুখ বেঙে দেবো।

মাও ছাড়বার পাকী নয়। বলল, মুখ ভাঙবে! ইস কত মুরাদ, বটতলার গুণ্ডার তো কান ধরে ওঠবোস করায়। তখন বীরভু কোথায় থাকে?

কে ওঠবোস করায়, বল মাগী। কে ওঠবোস করায়? কোন সুমুন্দির পুত?

জানি, সব জানি। ভগবান সইবে না বুঝবে, ভগবান সইবে না। দুটো দুধের শিশুকে বঞ্চিত করে রোজ তাদের চোখের সামনে গপ গপ করে খাওয়া—এরও বিচার আছে।

আলবাৎ খাবে। একশবার খাবে।

তারপর ঝগড়া কতদূর গড়িয়েছিল তা আর পটল জানে না। সে ঝগড়া শুনতে শুনতেই ঘুমিয়ে গিয়েছিল। সারাদিন মাঠ-ঘাট চষে, সাইকেল চালিয়ে, বাজারহাট করে, সাতার কেটে তার শরীর সন্ধের পরই ভেঙে আসে ঘুমে।

সকালে পিঠে পটাপটা চাঁটি খেয়ে ঘুম ভাঙতেই বুঝতে পেরেছিল, ঝগড়াটা সারা রাত ধরেই চলেছে বোধ হয়। মারধরও হয়ে থাকবে, সে টের পারিনি।

কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে সে আর গোপাল কাঠকয়লার গুঁড়ো দিয়ে দাঁত মাজছিল। ফটকিরি আর কাঠকয়লা পিষে মাজনটা মা-ই বানিয়ে দেয়।

দাঁত মাজতে মাজতে অবোধ ভাইটার দিকে চেয়ে পটল বলল, আজ দিনটা খারাপ যাবে রে গোপাল। বউনি ভাল হয়নি।

গোপাল খুব গম্ভীর হয়ে দাদার দিকে চেয়ে থাকে। শুনতে পায় না, বলতেও পারে না। কিন্তু গোপাল বুঝতে পারে। সব বুঝতে পারে।

কুয়ো থেকে জল তুলে আগে গোপালের মুখ ধুইয়ে দেয় পটল। তারপর নিজে মুখ ধোয়। সকালে জলখাবারের পাট আছে কিনা তা বুঝতে পারে না। মা রেগে গেলে রান্নাঘরের দিক মাড়ায় না। বেলা অবধি দেখে ঠাকুমা উনুন ধরতে বসে। তখন আর জলখাবারের আশা থাকে না।

রান্নাঘর থেকে উনুনের ধোঁয়া বেরোচ্ছে না দেখে পটল নিরাশ হয়ে দাওয়ায় মাদুর পেতে পড়তে বসে গেল। বাড়িতে গোলমাল বাঁধলে বরাবর সে বই নিয়ে বসে যায়। তাতে তার ওপর হাল্লা কম হয়। পড়ার সময় গোপাল তার গা ঘেঁষে চুপটি করে বসে থাকে। রোজ পটল পড়ে, গোপাল কি তা বুঝতে পারে?

হ্যাঁ রে গোপাল, তুই কিছু বুঝতে পারিস? এই খাতা নে, তো একটা অ লেখ দিকিনি।

গোপাল খাতা নেয়, পেনসিলও নেয়। কিন্তু কী করতে হবে তা বুঝতে পারে না। পটলের দিকে চেয়ে থাকে শুধু।

পটলের বিশ্বাস, গোপাল একদিন ভাল হয়ে যাবে। লেখাপড়া করবে। তার আশা, একদিন এক সন্ন্যাসী এসে হাজির হবেন। লম্বা জটাভূট, হাতে ত্রিশূল। গোপালকে শিকড়বাকড় বা মাদুলি দিয়ে ভাল করে দিয়ে যাবেন।

গোপালকে আরও কাছে টেনে নিয়ে একটি আদর করে পটল। যে যাই করুক, সে কখনও গোপালকে মারে না, বকে না, অবহেলা করে না। নিজের ভাগ থেকে ওকে খাবার দেয় পটল। পয়সা থাকলে মারবেল, ঘুড়ি বা লাঠি এনে দেয়।

খিদের চোটে সামলানো মুশকিল। পেটে চনচন করছে খিদে, কিন্তু রান্নাঘরে কোনও নড়াচড়া নেই। ওপাশের ঘরের দাওয়ায় দাদু বসে আছে রোদে পা মেলে। ঠাকুমা এখনও ওঠেনি। ঠাকুমা উঠে দাঁত মাজবে, কাপড় ছাড়বে, ঠাকুর পূজা করবে, তারপর রান্নাঘরে গিয়ে বউমার খোঁজ নেবে। উনুন ধরবে তারও পর।

পটল চাপা গলায় বলে, তোর খিদে পায়নি গোপাল ?
একথাটা যেন গোপাল বুঝতে পারল। একটা অদ্ভুত ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করল হঠাৎ এ শব্দের মানে শুধু পটল জানে। তার মানে, গোপালের খিদে পেয়েছে।

বাবা বাড়ি নেই। মা বোধ হয় ঘুমোচ্ছে। কী যে হবে!

খিদে পেলে সবসময়েই ভাল ভাল খাবারের কথা মনে পড়ে। এই যে কিছুদিন আগে মামাবাড়ি গিয়েছিল তখন একদিন ছোটমামা তাকে আর গোপালকে নিয়ে গিয়ে হিং-এর কচুরি খাইয়েছিল একটা দোকানে। সেই স্বাদটা যেন এখনও জিবে লেগে রয়েছে, নাকে গন্ধটাও আসছে যেন। এখন সেই কচুরি পেলে ক'খানা খাবে পটল ? গোটা কুড়ি উড়িয়ে দিতে পারবে না ? খুব পারবে।

একমুঠো মুড়ি পেলেও এখন হত। কিন্তু মা নিয়ম বেঁধে দিয়েছে জিজ্ঞেস না করে কোনও খাবার জিনিসে হাত দেওয়া যাবে না। কিন্তু জিজ্ঞেস করাটাই এখন সমস্যা। মা আর বাবায় যেদিন খুব ঝগড়া হয় তার পর দিন দুই সময়টা ভাল যায় না তাদের।

ও দাদু!

বিশুপদ ওপাশের দাওয়ায় বসে হাঁ করে পেঁপেগাছের ডগার দিকেই চেয়ে ছিল বুঝি। দাদু যে সারাদিন কি করে এত বসে থাকতে পারে সেটাই পটল বুঝতে পারে না। বসে থাকে আর চেয়ে থাকে। এ গাঁয়ের অন্যসব দাদুরা তার দাদুর মতো নয়। তারা নাতিপুত্রির সঙ্গে খুব মেলামেশা করে, গল্প করে, বেড়াতে নিয়ে যায়, লাঠিপেটাও করে। তার দাদু যেন বড্ড দূরের মানুষ। কোথা থেকে বেড়াতে এসেছে, আবার চলে যাবে। দাদু এ বাড়ির একমাত্র লোক যার সঙ্গে কারও ঝগড়া নেই, তর্ক নেই। দাদুকে যে যা বলে মুখ বুজে সয়ে যায়।

দাদু সাড়া দিল না দেখে পটল ফের চাপা গলায় ডাকে, ও দাদু!

সাড়া নেই। বেশি জোরে ডাকাও যাচ্ছে না। মার হয়তো ঘুম ভেঙে যাবে। দাদু বা ঠাকুমার ওপর মা মোটেই খুশি নয়। আড়ালে সবসময়ে রাগে গরগর করে। কেন যে রাগ তা বুঝতে পারে না পটল। দাদু ভালমন্দ খায় বলেই কি ? এই যে তার বাবা সবসময়ে দাদু আর ঠাকুমার জন্য ভালটা মন্দটা নিয়ে আসে এটা কি খারাপ কাজ ? দাদু আর ঠাকুমাকে একটুও খারাপ লাগে না পটলের।

পটল আর দাদুকে ডাকল না। সন্তর্পণে দাওয়া থেকে নামল। তারপর উঠোন পরিয়ে সোজা ঠাকুমার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ও ঠাকুমা, এখনও ঘুমোচ্ছে যে ?

নয়নতারা পাশ ফিরে বলল, এই উঠছি। কেন রে ?

মা ওঠেনি। বড্ড খিদে পেয়েছে যে।

তোর মা ওঠেনি কেন ?

মনে হয় উঠবে না। বাবার সঙ্গে রাতে ঝগড়া হয়েছে।

নয়নতারা একটু যেন কষ্ট করে উঠে বসল, কোমরটায় রস নেমে এমন অবস্থা যে, শোয়া থেকে উঠতে গেলে প্রাণটা বেরিয়ে যায়। তা কি নিয়ে ঝগড়া হল আবার ?

চালাক পটল সেটা ভাঙল না। বলল, তা জানি না।

ঝগড়ায় ঝগড়ায় সংসারটাই ঝাঁঝরা হয়ে গেল। গোপালটার মুখ তো দেখছি শুকিয়ে গেছে। আহা, অবোলা ছেলে। ওই ওখানে দেখ তো, তাকের ওপর কমলাবেলু রাখা আছে, দুটো নিয়ে গিয়ে দু'জনে খা। আমি ঠাকুর পূজা সেরে রুটি করে দিচ্ছি।

কমলাবেলুর ছিবড়ে কখনও ফেলে না তারা। সবটা গিলে ফেলে। জোটে অবশ্য খুবই কম। দু'ভাই গপাগপ কমলাবেলু খেয়ে ফেলল। কিন্তু একটু ভুল করে ফেলল পটল। খোসাগুলো সময়মতো ফেলে দিয়ে আসেনি। মাদুরের ওপরেই রেখে দিয়েছিল জড়ো করে, পরে ফেলবে বলে। কিন্তু সময় পাওয়া গেল না।

হঠাৎ রাজা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়াল, এসব কি ?

এ মা তার বোজকার চেনা মা নয়। রেগে থাকলে তার মা একদম অন্য রকম। সবসময়ে ফুঁসছে, দাঁত কিড়মিড় করছে সামান্য কারণেই, ফেটে পড়ছে রাগে। এ মাকে পটল ভীষণ ভয় পায়।

সে ভয়ে ভয়ে বলল, আমি চাইনি, ঠাকুমা দিল।

দিল। বলে মা মুখ ভেঙে হঠাৎ নিচু হয়ে তার চুলের মুঠি ধরে মাথাটা নামিয়ে ঠাস ঠাস করে কয়েকটা থাণ্ড বসাল পিঠে। পিঠ জ্বলে গেল পটলের।

লজ্জা কলন না ওই লেবু হাত পেতে নিতে ? কাঙালী না ভিখিরি ? কতকালের উপোসী তুই যে হ্যাংলার মতো নিলি ? যাদের জন্য সোহাগ করে এনে দিয়েছে তারাই গিলুক, তাদের অত নোলা কিসের ?

পটলকে ছেড়ে গুম গুম করে গোপালের পিঠেও কয়েকটা কিল বসাল রাজা। গোপাল কাঁদতে পারে না। শুধু বু বু করে কয়েকটা শব্দ করল মুখ দিয়ে।

দাওয়া থেকে নেমেই রাঙা কুয়োতলার দিকে চেয়ে চোঁচিয়ে উঠল, খবরদার আপনি কখনও আমার ছেলেরদের হাতে কোনও কিছু দেবেন না। কালীর দিবি রইল। আমার ছেলেরা ভিখির নয় যে দয়া করে তাদের এঁটোকাটা খাওয়ানেন। নিজেরা ঘরে বসে যেমন গিলছেন তেমনই গিলুন, আমাদের ভাগবাঁটোয়ারার দরকার নেই।

নয়নতারা বড্ড হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর মুখ কুলকুচো করে বলল, কি হল হঠাৎ? দুটো কমলালেবু দিয়েছি, তাতে দোষটা কি হল?

আপনাদের দোষ হবে কেন? আপনারা তো গৃহদেবতা। আর আমরা সব বানের জলে ভেসে এসেছি। খবরদার বলে দিলাম, আর কখনও ওদের দয়া দেখাতে আসবেন না।

পটল দেখতে পেল তার দাদুর চোখ। পের্পেগাছ থেকে নেমে এসেছে। চেয়ে আছে তার দিকে। চোখ দুটো বড্ড করুণ।

এ বাড়ি ছেড়ে পটল একদিন পালাবে। গোপালকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে। এ বাড়িতে বড় অশান্তি। কখন যে কার সঙ্গে কার লেগে যায় তার কিছু ঠিক নেই। জ্যাঠার মতো লেখাপড়া জানা থাকলে কত ভাল হত। জ্যাঠা এ বাড়ি ছেড়ে কবে চলে গেছে। ছোট্টকাকা গেছে। একদিন তাকেও যেতে হবে।

ঘণ্টা খানেক বাদে উনুনে আগুন ধরল। ভাত চাপল। কিন্তু তখন আর সময় নেই পটলের। ইস্কুল বসে যাবে। সে নিঃশব্দে উঠে পোশাক পরে বেরিয়ে পড়ল। কেউ পিছু ডাকল না, কেউ ডেকে বলল না, ওরে, দুটো খেয়ে যা।

ইস্কুলে যেতে যেতে কত কী ভাবল পটল। সে একটা জিনিস টের পায়, তাদের বড় পয়সার অভাব। অনেক টাকাপয়সা থাকলে তাদের এত অশান্তি হত না।

ইস্কুলে হেঁটেই যায় পটল। সাইকেল নিলে বন্ধুরা চড়তে চায়। চড়তে গিয়ে সাইকেল এখানে ওখানে ফেলে দেয় বা এবড়োখেবড়ো মাঠে চালাতে গিয়ে টায়ারের বারোটা বাজায়। কিন্তু হাঁটতে গিয়ে খিদেটা আজ চড়ে যাচ্ছে।

ইস্কুলে ঢুকই সে পেট পুরে টিউবওয়েল থেকে জল খেয়ে নিল। তারপর জামায় মুখ মুছে ক্লাসে গিয়ে ঢুকল। মাথা বিম্বিম্বি করছে। একটা বিম্বি-বিম্বি ভাব হচ্ছে।

সে শুনেছে, বড় জ্যাঠাও না খেয়ে বহু দিন ইস্কুলে গেছে। তখন এমন অবস্থা যে, রোজ ভাত রান্নাই হত না। জ্যাঠা শুধু পড়তই না, নিজের হাতে জমিতে লাঙল দিত, টিউশনি করত; জুতো জামারও জোগাড় ছিল না। জ্যাঠা পারলে সে পারবে না কেন? তবে একটু কথা, জ্যাঠা প্রতি পরীক্ষায় ফাস্ট হত, সে টেনেমেনে পাস করে মাত্র। জ্যাঠার মাথা ছিল, তার নেই।

পড়াশুনোয় কেন যে সে মন দিতে পারে না তা বোঝে না পটল। যতবার কোমর বেঁধে জোর করে মন দিতে গেছে, কিছুক্ষণ পরেই টের পেয়েছে, তার মনে নানা আজোবাজে চিন্তা চলে আসছে। আনমনা হয়ে যাচ্ছে সে। এক পড়া চৌদ্দবার পড়েও মুখস্থ হচ্ছে না।

আজও ইংরেজি কবিতা মুখস্থ বলতে গিয়ে ঠেকে গেল পটল। বেঙ্কের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে হল। অঙ্ক ক্লাসে একটা গাঁঠি বেঁতে হল মাথায়।

শেষ ক্লাসটা ছিল ড্রিলের। ড্রিল স্যার নেই বলে ছুটি হয়ে গেল আজ। বাড়িতে যখন ফিরল তখন শরীরটা বেশ কাহিল লাগছে।

রান্নাঘরে গিয়ে ভয়ে ভয়ে দেখল, না, ভাত ঢাকা রয়েছে। উপোস থাকতে হবে না। হাতমুখ ধুয়ে এসে ভাত ক'টা গোম্বাসে খেল সে। ঘরে গিয়ে দেখল মা আর গোপাল জড়াজড়ি করে ঘুমোচ্ছে। দৃশ্যটা বড় ভাল লাগে তার। মাকে সে ভালবাসে বড্ড। মাও তাকে বাসে। তবু মাঝে মাঝে কী যে সব ঘটে যায়! গোপালটা তো অবোধ, ও যখন মার খায় তখন বড় কষ্ট হয় তার।

বিকলে আজকাল বড্ড তাড়াতাড়ি সন্ধে হয়ে যায়। শীত পড়েছে খুব, কিছুক্ষণ মাঠে ফুটবল খেলে যখন ঘরে ফিরল পটল, তখন বাড়ির উঠানে অন্ধকার জমে উঠেছে। বারান্দায় মুড়িমুড়ি দিয়ে দাদু বসে আছে। ঘর থেকে ঠাকুমার পাঁচালি পড়ার আওয়াজ আসছে যেন।

হাতমুখ ধুয়ে কুয়োতলা থেকে আসার পথে দাদুর কাছে একটু দাঁড়াল পটল, দাদু, কী করো?

এই তো বসে আছি। কী আর করব?

একটা গল্প বলবে?

দাদু একটু হাসে, আমার কোন গল্পটা তোর শোনা নেই। আমার ষ্টক ফুরিয়ে গেছে।

পুরনো গল্পই বলো না!

পড়তে বসবি না এখন?

বসব'খন। গল্পটা আগে শুনে নিই?

তোর মা রাগ করবে যে! আজ রেগে আছে।

কথাটা মানতে হল পটলকে। মা রেগে থাকলে সামান্য কারণেই বিরাট চোঁচামেচি লাগিয়ে দেবে।

তা হলে গল্প থাক। তোমার কাছে এসে পড়ব?

বিষুপদ একটু অসহায় গলায় বলে, সেও বুঝেবুঝে আসতে পারিস।

মা খুব রেগে আছে? দুপুরে কি ঝগড়া হয়েছে ফের?

বিষুপদ একটু হেসে বলে, ওসব শুনে তোর কি হবে?

মা দুপুরে খেয়েছে?

বোধ হয় না।

বাবা দুপুরে বাড়ি এসেছিল?

এসেছিল।

তখন কি ফের ঝগড়া হয়েছে দাদু ?

সেসব শুনে কি করবি ?

পটলের বুক কাঁপছিল। সভয়ে বলল, খুব ঝগড়া হয়েছে নাকি ? ফাটাফাটি ?

ওই একটু কথা কাটাকাটি।

তুমি বাবাকে বকো না কেন দাদু ?

বকব ? আমি তো কখনও কাউকে বকিনি।

কখনও না ?

না। তোমার রাগ হয় না দাদু ?

বিষ্ণুপদ খুব হাসল, আমার বোধ হয় ওটাই একটা রোগ। কত কী রাগ করার মতো ঘটে কিন্তু আমার কেন যেন রাগ হয় না। আমার রক্তটাই ঠাণ্ডা। তোর বাপ কাকা জ্যাঠাকে আমি কখনও শাসন-টানন করিনি। যে যার মতো মানুষ হয়েছে।

পটল একটু চাপা গলায় বলে, বাবা যে মদ খায় দাদু, তুমি বারণ করো না কেন ?

বারণ করলে কি শোনে ? তবে বারণ করিনি তা নয়। এক-আধবার বলেছি। কিন্তু শোনেনি। রোখ চড়ে গিয়েছিল তো। দাদার সঙ্গে হিংসে করত। কিন্তু কৃষ্ণজীবনের সঙ্গে লেখাপড়ায় তো এঁটে উঠত না। তাই রাগে আক্রোশে নানা রকম করত। একবার রাগের চোটে রেড দিয়ে নিজের হাত কেটে ফালা ফালা করেছিল।

বাবা ভীষণ রাগী, না দাদু ?

পুরুষের রাগ নানা রকম হয়। রাগে কেউ নিজেকে মারে, কেউ আবার রাগের ঠেলায় কেঁটবিট্ট হয়ে পড়ে। রাগেরও নানা রকম আছে।

তোমার রাগ হয় না কেন দাদু ?

তা কি জানি! আমার ভেতরটা সবসময়ে কেমন যেন ঠাণ্ডা। দেখ না, সবসময়ে নিষ্কর্মার মতো কেমন বসে থাকি। ভাবি এ সময়ে কত কাজও তো করতে পারতাম। ইচ্ছেই যায় না, আমি হলাম জড়ভরত। আমার মতো কখনও হোসানি দাদা, আমাকে দেখে শিখতে হয় কেমনটি হতে নেই।

পটল দাদুর কথায় হি হি করে হাসল।

বিষ্ণুপদ নিজেও হাসল, তোর কি মা-বাবাকে খুব ভয় ?

রেগে গেলে ভয় করে। নইলে নয়। আর বাবা মদ খেলে কেমন যেন হয়ে যায়। কী সব খারাপ খারাপ কথা বলে।

ভাবিস না। তাড়াতাড়ি বড় হ। মা-বাপকে জুড়িয়ে দেওয়ার মতো কিছু কর, তা হলেই হবে। আমি আমার মা-বাপকে খুব ভালবাসতাম।

আমিও বাসি দাদু।

বাসবিই তো। বাসবারই কথা কিনা। তোর বাবাও বাসে। এত ভালবাসে যে তার জন্য কথা শুনতে হয়, তাও বাসে। দুনিয়ার ভাল-মন্দ আমি তেমন বুঝি না রে দাদু, তবে মনে হয়, মা-বাপকে ভালবাসলে মানুষের ভালই হয়।

জ্যাঠা তোমাকে কেমন বাসে দাদু ?

কৃষ্ণ! সে তো ভালই বাসত। কিন্তু থাকতে পারল না তো কাছে। দূরের মানুষ হয়ে গেল।

আমার খুব জ্যাঠার মতো হতে ইচ্ছে যায়।

সে তো খুব ভাল কথা।

জ্যাঠা কি তোমার কাছে পড়ত ?

তা পড়ত। প্রথম প্রথম আমি পড়া দেখিয়ে দিতাম। তারপর নিজেই পড়ত। মাথাটাই এত ভাল ছিল যে, পড়াতে হত না।

তা হলে তোমার কাছে আমিও পড়ি না কেন দাদু ?

বিষ্ণুপদ একটু হাসল, আমি যে একসময়ে পড়াতাম তা আজকাল কারও মনেই নেই। আমিও সব ভুলে গেছি।

মাকে জিজ্ঞেস করে আমি এবার থেকে তোমার কাছেই পড়ব দাদু। তাতে বোধ হয় ভালই হবে।

হ্যাঁ, মাকে আগে জিজ্ঞেস করে নিস। নইলে হিতে বিপরীত হয়ে বসবে।

পরদিন মায়ের মেজাজ ঠাণ্ডা বলে পটল কথাটা বলল, মা, দাদুর কাছে পড়া বুঝে নেবো ?

রাঙা প্রথমটায় ঐ কোঁচকাল, তোর দাদু আবার কি পড়াবে ?

বাঃ, দাদু যে ইকুলে মাস্টারি করত।

রাঙা একটু তাকিয়ে সস্তুপে বলল, ওঃ ভারি তো মাস্টারি! গায়ের প্রাইমারি স্কুল। তা তোর ইচ্ছে হলে পড়িস।

পটল সোৎসাহে বইখাতা নিয়ে দাদুর কাছে হাজির হল, দাদু, পড়াও, মা বলেছে।

দিন সাতেক যেতে না যেতেই পটল বুঝতে পারল তার মাথায় পড়া ঢুকছে। সে বুঝতে পারছে। অঙ্ক কষে যাচ্ছে, ভুল হচ্ছে না, কয়েকটা বাক্যরচনা লিখে ছুলে বাংলা স্যারের তারিফ পেয়ে গেল।

দাদুর পড়ানোটা এত ভাল যে পটল ভারি উৎসাহ পায়। দাদু কখনও বকে না, বা একথা বলে না যে, তোর ঘারা হওয়ার নয়। দাদু কেবলই বলে, বাঃ, এই তো পারছিস, এই তো হচ্ছে। এমন কি ভুল অঙ্ক করলেও দাদু রাইট দিয়ে দেয়। তারপর খুব আদর করে ভুলটা ধরিয়ে আবার অঙ্কটা কষায়। তার যে হবে, তার যে হচ্ছে একথাটা দাদু ছাড়া কেউ এতকাল বলেনি।

একদিন অঙ্কের স্যার অবধি বাহবা দিয়ে বলল, বাঃ, আজ যে সবকটা অঙ্ক রাইট করেছিস!

চয়ন যখন পড়ায় তখন বিভোর হয়ে পড়ায়। পড়ানোর মধ্যেই এক মাদকতা পেয়ে যায় সে। বিশেষ করে ছাত্র বা ছাত্রীটি ভাল পোলে। চারুশীলার দেবশিঙর মতো ছেলেটি সৈনিক দিয়ে তার অতিশয় প্রিয়।

সন্ধ্যাবেলা যখন ছাত্র আর মাস্টারমশাই মগ্ন হয়ে আছে ঠিক সেই সময়ে চারুশীলা অনেকটা স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে অবিন্যস্ত পায়ে ঘরে এসে ঢুকল। এবং অনেকক্ষণ থাকিয়ে থেকে বেশ কষ্ট করেই যেন চয়নকে চিনতে পারল। তারপর ক্র ক্রুচাকে হঠাৎ বলল, আচ্ছা, মেয়েটা কেমন বলুন তো?

চয়নকেও তার ঘোর থেকে বেরিয়ে আসতে হল। খুব অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, কোন্ মেয়ের কথা বলছেন?

যেন একটু বিরক্তি বা ধৈর্যহীনতা স্পর্শ করল, কণ্ঠস্বরকে, আপনি কিছু মনে রাখতে পারেন না। আমি রশ্মির কথা বলছি। চয়নের স্মৃতিশক্তি চমৎকার। তার মনে পড়ল। বাস্তবিক এদের বিরাট দলের সঙ্গে বনভোজনে গিয়ে সে এতই কৃতজ্ঞতা বোধ করেছিল যে বলার নয়। চারদিকে যেন মানুষ-বনস্পতি, আর সে যেন সামান্য তৃণ, তাই এইসব মহা মহা পুরুষ ও মহিলার প্রত্যেককে লক্ষ করেছিল সে। রশ্মিকে তার খুব মনে আছে। দলের মধ্যে সে ছিল সবচেয়ে কম কথা আর বেশি হাসির মেয়ে। দেখতে ভীষণ সুন্দর। তবে সে সৌন্দর্য উত্তেজক বা উত্তপ্ত নয়। একটু যেন শীতলতা মাখানো। হয়তো ক্লাসিক, কিন্তু এরোটিক কিছুতেই নয়।

খুব বিনয়ের সঙ্গে চয়ন বলল, দেখতে কেমন জিজ্ঞেস করছেন? দেখতে তো সুন্দরীই উনি। তবে উনি কেমন মানুষ তা তো জানি না।

আচ্ছা, আপনি কী বলুন তো! সিন্ধু সেনস্ নেই? মানুষকে দেখে কি কিছু বোঝা যায় না? মুখ নাকি মানুষের চরিত্রের দর্পণ!

চয়ন এই ছিটিয়াল, খামখেয়ালী ও অত্যন্ত উদার অর্থাৎ নানা বিপরীত গুণাবিতা মহিলার সামনে খুবই কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। সে এক প্রায়-অচেনা মহিলা সম্পর্কে কী মতামত দেবে! কিন্তু না দিলেও কি ছাড়বেন চারুশীলা? সে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বলে, উনি তো মনে হয় অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, রিজার্ভ্ড আর অত্যন্ত ভদ্র।

তা হলে?

এ প্রশ্নে আবার বাক্যহার্য হওয়ার কথা চয়নের। তবু সে কেবল মাত্র প্রতিধ্বনি করল, তা হলে?

তা হলে ওর সঙ্গে হেমাঙ্গর বিয়ের বাধা কিসের? কোথায় আটকায় বলুন তো! নিশ্চয়ই ওকে হেমাঙ্গর পছন্দ, তাই না? এরকম একটা ক্ষীণ আভাস চয়নও পেয়েছে। সে অত্যন্ত উদারতার সঙ্গে বলল, হওয়ারই তো কথা।

আপনার কি মনে হয় না যে, ওরা মেড ফর ইচ আদার?

হয়।

চারুশীলা উজ্জ্বল হয়ে বলে, হয়? তাহলে আমি নিশ্চয়ই ভুল করিনি! আচ্ছা, আপনি কথা চেপে রাখতে পারেন?

চয়ন উদ্বেগের সঙ্গে বলে, এসব কি গোপনীয় কথা?

না, এসব নয়। আপনি বোধ হয় জানেন না, হেমাঙ্গ বিয়ের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। উইক এন্ডে কোথায় চলে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, আপনি হেমাঙ্গবাবুর হাইড আউটের কথা আমাকে বলেছেন। সামনের শনিবার সেখানে আপনার যাওয়ার কথা।

হ্যাঁ, বাকী মিঞার গ্রামে। সেখানে ও একটা বাড়ি কিনেছে। শুধু তাই নয়, বনস্জান করবে বলে অনেকটা জমি কেনার চেষ্টাও করছে। বাকী মিঞা হেমাঙ্গর এসব কাণ্ড দেখে ভয় পেয়ে মামাকে জানিয়ে গেছে। তখনই ওর হাইড আউটের কথা আমরা জানতে পারি। হেমাঙ্গকে কি আপনার পাগলাটে বলে মনে হয়?

না তো! উনি তো বেশ স্মার্ট আর ডায়াসিং।

জানেন। আসলে একটা হাঁদামার। ওকে আমার মতো কেউ চেনে না। যখন এইটুকু ছিল তখন আমার সঙ্গে ছায়ার মতো ঘুরত। সারাদিন কেবল চারুদি আর চারুদি।

সেকথাও বোধ হয় একদিন বলেছেন।

বলেছি? ওটাই আমার দোষ। বলে ভুলে যাই। ডোট মাইন্ড। এসব কথা কিন্তু খুব গোপন রাখবেন।

খুব বিনয়ের সঙ্গে চয়ন বলে, গোপনই থাকবে। বলার মতো আমার কেউ নেইও।

আচ্ছা, হেমাঙ্গ কেন পালাচ্ছে বলুন তো! ব্যাপারটা খুব পাজলিং এবং অস্বস্তিকরও। একটা মেয়ের সঙ্গে ওর একটা আভারষ্ট্যান্ডিং হয়েছে, গার্জিয়ানরা সবাই মত দিয়েছে, তা হলে ও পালাচ্ছে কেন বলতে পারেন?

না, চয়ন তা বলতে পারে না। কিন্তু সে কথা কবুল করাটা যে ঠিক হবে না এ কাণ্ডজ্ঞান তার আছে। সুতরাং অত্যন্ত গভীরভাবে ব্যাপারটা যেন ভেবে দেখার একটা ভান করল সে। তারপর বলল, তাই তো!

আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

চয়ন সময়োচিত গাধীর্ঘ্য এবং একটা দুঃখের ভাব মুখে ফুটিয়ে রাখার চেষ্টা করতে লাগল। কে কাকে বিয়ে করতে চায় বা চায় না এটা নিয়ে এত মাথা ঘামানোর কী আছে সেটা সে জানে না। এদের সমস্যাও এত শৌখিন ও ফিনফিনে যে, সে অবাক না হয়ে পারে না। তার মতো সমস্যা তো এরা কখনও ভোগ করবে না। বিশ্বাসঘাতক এক শরীর নিয়ে সে যে টিকে আছে, প্রতি মুহূর্তে যার অশ্রু হারানোর ভয়, যাকে প্রতিদিন হাজারো অভাবের সঙ্গে লড়াই করতে হয়, যে কখনও তার যৌনকে টেরই পায় না, উপভোগ তো দূরত্ব। সুতরাং তার কাছে এসব সমস্যা অবাস্তব ও বাহুল্য। মানুষ তার সঙ্গে হেসে কথা বললে, ভাল ব্যবহার করলে, সমবেদনা প্রকাশ করলেই সে ভীষণ খুশি হয়ে যায়, তার বুকে যেন পূর্ণিমার জ্যোত্স্না এসে পড়ে।

আচ্ছা, আপনার সিন্ধু সেনস্ নেই?

চয়ন দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, আক্ষেপে না।

আপনি জ্যোতিষী জানেন ?

আজ্ঞে না।

কিন্তু আমার যে এখন এরকম একটা কিছু দরকার।

চয়ন ঢোক গিলে বলে, জ্যোতিষী তো অনেক আছে।

চারুশীলা বিরক্তির সঙ্গে বলে, সে আমিও জানি। একজন বিখ্যাত জ্যোতিষীকে আমি হাত দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আচ্ছা আমার হাজব্যান্ড কবে চাকরি পাবে বলুন তো, আর কি চাকরি পাবে ? জ্যোতিষী অনেকক্ষণ দেখে-টেখে বলল, আর দেড় বছরের মাথায় পাবে। কী চাকরি সেটা আর বলেনি। তখন আমার হাজব্যান্ড দু'হাতে পয়সা রোজগার করছে।

চয়ন জ্যোতিষীদের ব্যর্থতার কাহিনী শুনে দুঃখিতভাবে বলল, তাহলে কি করা যায় ?

চারুশীলা হঠাৎ তার মুখোমুখি একটা চেয়ারে ধপ করে বসে বলল, আচ্ছা আমার কেন কেবলই মনে হয় বলুন তো, যে, আপনার বোধ হয় সত্যিই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে।

চয়নের একবার বলতে ইচ্ছে হল, সিন্ধু স্নেপ আপনারই আছে, তাই বোধ হয় আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় টের পান। কিন্তু সেটা বলে ফেললে স্পর্ধার প্রকাশ হয়ে যেত। তাই সে আপাদমস্তক লজ্জিত হয়ে বলে, আজে, আমি অতি সামান্য মানুষ। আমার কোনও ক্ষমতা নেই।

চারুশীলা তার এলো ঢুল অবিন্যস্ত হাতে পাট করতে করতে বলল, আপনার বিনয় ব্যাপারটা আমার একদম সহ্য হয় না। ওরকম বিনয় করবেন না তো! মেরুদণ্ডটা নুয়ে যাবে যে! একটু অহঙ্কারী হতে পারেন না ?

কী বলবে তা তেবেই পেল না চয়ন। অসহায়ভাবে শুধু বলল, অহঙ্কার!

অহঙ্কার না থাকলে পুরুষমানুষকে কি মানায় ? মেয়েদেরও মানায় না। একটু অহঙ্কার থাকলে দেখবেন লোকে আর অবহেলা করতে সাহস পায় না। তবে অহঙ্কার করতে হলে বুদ্ধি চাই। অনেকে বোকার মতো নিজের গল্প নিজেই করে বেড়ায়। তাদের নিয়ে লোকে হাসাহাসি করে। ওরকম নয়, একটু মাথা উচু করে, নিজের ওপর বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা রেখে এবং কাউকেই— সে যত বড়ই হোক না কেন, বেশি মাথায় উঠতে না দিয়ে যদি চলেন তা হলে দেখবেন সবাই আপনার ওপর মনোযোগ দিচ্ছে।

প্রকাশ্যে নয়, তবে সংগোপনে চয়ন একটি হতাশার শ্বাস মোচন করল।

আর শুনুন, আমার কিন্তু আপনার বস নই, বন্ধু। আমার হাজব্যান্ড লেফটিন্যান্ট, একটু কমিউনিষ্ট মাইন্ডেড। উনি শ্রমের মর্যাদা জানেন। আমি অবশ্য ওর মতো নই, তবু আমি কোনও মানুষকেই সাফারিং আর ভেডে দেখতে ভালবাসি না।

চয়ন বিব্রত হয়ে বলে, তা জানি। আপনারা খুবই মহৎ।

ফের ? ওরকম বললে আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে কি করে ?

আজে, আর একটু সময় দিন।

চারুশীলা হেসে ফেলল, বলল, সময় দিলে আরও বাজে লোক হয়ে যাবেন। মনোভাবটা শুধু পালটে ফেলুন। আপনি আমার বাড়িতে এসে আপনার শ্রম ও মেধা দান করছেন। প্রাণ্য দক্ষিণা নিচ্ছেন। এর বেশি তো কিছু নয়।

যে আজে।

এবার আমার সমস্যাটার কথা একটু বলুন। এভাবে তো বসে থাকলে হবে না। হেমাঙ্গ আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। আপনি পুরুষমানুষ বলেই জানতে চাইছি, ও আসলে কী চায়! আমি মেয়ে বলেই হয়তো ওর ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।

চয়ন একটু সতর্কতামূলক নীরব থেকে বলল, হেমাঙ্গবাবুর সঙ্গে আমার এতই সামান্য পরিচয় যে, ওঁকে ঠিক বুঝবার মতো সময় পাইনি।

তাই তো বলছি, আপনার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কি বলে ?

বিপন্ন চয়ন বলল, বরং আমাকে ওর ঠিকানাটা দিন, একবার গিয়ে ভাল করে আলাপ করে আসি।

চারুশীলা মাথা নেড়ে বলে, তাতে লাভ নেই। ও একজন অপরিচিতের কাছে কি মনের কথা খুলে বলবে ?

তা হলে কি করব ?

সামনের শনিবার ওর হাইড আউটে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কী হয়েছে জানেন! আমার হাজব্যান্ড অনেকদিন বাদে দেশে এলেন তো। এখন বড় বড় ক্রায়েন্টরা ঘন ঘন পাটি দিচ্ছে। এমন সব ক্রায়েন্ট যাদের অ্যাভয়েড করা যায় না। আমার হাজব্যান্ডের অনারেই সব পাটি। শনি রবি দুটোদিনই আমরা ভীষণ এনগেজড। পরের উইক এভেডও।

প্রবলেমটা আমি অবশ্য ঠিক ধরতে পারিনি। হেমাঙ্গবাবু কি বিয়ে করতে চাইছেন না ?

সে তো কোনও পুরুষমানুষই প্রথমে চায় না। পরে সুড়সুড় করে গিয়ে পিড়িতে বসে। এটা একটু অন্য ব্যাপার। প্রেম, কিন্তু বিয়ে নয়।

এ সমস্যার সঙ্গেও চয়নের পরিচয় নেই। সে তবু অত্যন্ত সমঝদারের মতো মাথা নাড়ল।

চারুশীলা বলল, দেখুন, এটা একটা প্রেক্ষিভিজ ইস্যু। যদি হেমাঙ্গ বিয়ে না করে তা হলে আমাদের মাথা কাটা যাবে। রশ্মির মতো মেয়েকে বিয়ে না করতে চাওয়াটাই একটা অবাধ কাণ্ড।

চয়ন যদিও এ ব্যাপারে কিছুই জানে না, তবু হঠাৎ বলে ফেলল, হেমাঙ্গবাবু আর কাউকে ভালবাসেন না তো!

বিস্ত্রিত চারুশীলা কিছুক্ষণ চয়নের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, আর কাউকে ? পাগল নাকি ? ওর ভিতরে ভালবাসা জিনিসটাই নেই। মেয়েদের ভয় পায়, এড়িয়ে চলে। রশ্মির সঙ্গেও তো কিছু ছিল না। আমিই বলে-কয়ে ব্যাপারটা প্রায় ঘটিয়ে তুলেছিলাম। এখন কী হবে বলুন তো! আমার যে ভীষণ বিপদ!

চয়নের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নেই ঠিকই, কিন্তু সে ন্যালাখ্যাপাও নয়। দুইয়ে দুইয়ে চার হয় এই কাণ্ডজ্ঞান তার আছে। সে বুঝতে পারছিল এই আবেগত্যাগিত মহিলা হোমাক্সকে বোধ হয় আদৌ অনুধাবন করেননি। একটি সুন্দরী ও শিক্ষিতা মেয়েকে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছেন মাত্র এবং তাতে যে আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে চাইছেন তার মধ্যে একটি অহংবোধ কাজ করছে। আমি যা বলব হোমাক্স তাই শুনবে এরকম একটা কর্তৃত্বের ভাবও হয়তো আছে। চারুশীলা অত্যন্ত ভাল মহিলা। কিন্তু তিনি নিজের চশমায় দুনিয়াকে দেখেন। অন্যকে কমই অনুধাবন করার ক্ষমতা আছে ওঁর।

চয়ন খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল, বিপদ কেন বলছেন ?

চারুশীলা চোখ বড় বড় করে বলে, বিপদ নয় ? বিয়ে যদি ভুল হয় তা হলে সব দোষ যে আমার ঘাড় এসে পড়বে! চয়ন খুব সমবেদনার গলায় বলল, তা-ই বা কেন ? এই যে বললেন ওঁদের মধ্যে একটা আভারত্যাগিৎও হয়েছে!

তা তো হয়েছে।

একটু মাথা চুলকে চয়ন বলে, তা হলে ওঁরাই দুজনে ওঁদের সম্পর্কটা স্ট্রট আউট করবেন।

চারুশীলা বিস্মিত হয়ে বলে, মধ্যস্থের বিপদ নেই বলছেন ?

থাকার কথা নয়। ওঁরা তো অ্যাডাল্ট।

কিন্তু আমি যে ভীষণভাবে চাই, বিয়েটা হোক।

যদি হয়তো ওঁরাই সেটা ঘটাবেন। না ঘটলেও আপনাকে দোষ দেওয়ার কিছু নেই।

আপনি ভীষণ নেগেটিভ কথা বলেন। আচ্ছা আপনাকে ঠিকানা দিলে আপনি হোমাক্সর হাইড আউটটা খুঁজে বের করতে পারবেন ?

আমি!

কেন, আপনার কি ভয় করবে ?

চয়ন মহা ফাঁপরে পড়ে বলল, উনি যখন লুকিয়েই থাকছেন তখন সেখানে গিয়ে হাজির হওয়াটা কি ভাল হবে ? উনি হয়তো রাগ করবেন।

হোমাক্স তেমন রাগী মানুষ নয়। তা ছাড়া একটু রিক্স তো নিতেই হবে!

উনি কি কলকাতায় থাকছেন না ?

কবে আসছে, কবে চলে যাচ্ছে বুঝতে পারছি না। টেলিফোনে ধরতে পারলেও বেশি কথা বলতে চাইছে না।

আর রশ্মিদেবী কি ওঁর মনোভাব জানেন ?

এখনও নয়। রশ্মি একটা রিসার্চ পেপার নিয়ে খুব ব্যস্ত। তবে মাঝে মাঝে হোমাক্সর সঙ্গে ফোনে কথা হয়।

চয়ন একটু হেসে বলে, তা হলে ভাবছেন কেন ? ওঁরা তো সম্পর্ক রেখেই চলেছেন।

চারুশীলা খুব বিরক্তির গলায় বলে, তা রাখলেই বা লাভটা কি ? হোমাক্স যে আরও সময় চাইছে। অথচ রশ্মির হাতে যে মোটেই সময় নেই। বিয়েটা হয়ে গেলেই ও বিলেত চলে যাবে। এদিকে এই হাঁদারামটা বিলেত যেতে চাইছে না। আচ্ছা, এদেশে আছোটা কী বলুন তো! আইন নেই, শৃঙ্খলা নেই, ভিথিরি আর রোগভোগে ভরা, চারদিকে বিচ্ছিরি সব লোকজন, ধুলো, ধোঁয়া, এদেশে কিসের মধু ? বিলেতে গেলে কত ভাল থাকতে পারবে। অথচ কিছুতেই যেতে রাজি হচ্ছে না। কী করে যে ওর মত করাই ভেবে পাচ্ছি না। ওকে যে গিয়ে একদিন ধরব তাও সময় পাচ্ছি না। আমার রাজব্যান্ড আসায় এখন বড় ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। তিন চার মাস বাদে আমরা ওর সঙ্গেই আবার কিছুদিনের জন্য বিদেশ চলে যাব। সেসব নিয়েও আলোচনা হচ্ছে। আর ওই হাঁদারামটা আমার জন্য আর একটা প্রবলেম তৈরি করে রেখেছে। আপনি প্রিজ, আমাকে একটু হেল্প করুন না।

চয়ন বিপন্ন বোধ করতে লাগল। সে বুঝতে পারছে, উদ্রমহিলা পৃথিবীকে তাঁর নিজের মতো করে চালাতে চান। সে নিজে ওঁর আজ্ঞাবহ হতে রাজি আছে। কিন্তু তাতে যে কী লাভ হবে তা বোঝবার সাধাই তার নেই। সে তবু বিনীতভাবে বলল, যে আছে। হাইড আউটটায় গিয়ে আমার কী কাজ হবে তা যদি বলেন তো ভাল হয়।

আমি জানতে চাই ওখানে ও কী করছেন। কেনই-বা ও-জায়গাটা ও পছন্দ করল। আরও জানতে চাই, ও বিলেত যেতে চাইছে না কেন এবং বিয়েটাই বা কেন পিছোতে চাইছে। পারবেন না জেনে আসতে ?

চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু আমাকে উনি হয়তো গুরুত্বই দেবেন না।

আপনাকেও খুব ভালমানুষ বলে জানে। তা ছাড়া আপনি ইনোসেন্ট থার্ড পার্টি। আপনাকে বলতে ওর আপত্তি হবে না। শুধু মনে রাখবেন, আমি পাঠিয়েছি বলে যেন টের না পায়।

মানুষ তো আত্মহত্যাও করে, চয়নের এই অভিযান না হয় সেরকমই একটা কিছু হবে। মরিয়া হয়ে সে ঘাড় কাত করে দিয়ে বলল, ঠিক আছে।

চারুশীলা উজ্জ্বল হয়ে বলল, বাঁচালেন। কি ভাবে যাবেন বলুন তো ? আপনি বরং আমাদের গাড়িটা নিয়ে শনিবার সকালে ক্যানিং চলে যান। সেখান থেকে বোধ হয় লঞ্চ ছাড়ে। জিজ্ঞেস করে করে চলে যাবেন। গাড়িটা ওখানেই থাকবে। কাজ সেরে ফিরে আসবেন।

চয়ন হ্রান একটু হেসে বলে, গাড়ি! গাড়ির কোনও দরকার নেই। ক্যানিং-এ অজস্র ট্রেন যায়।

জি কুঁচকে চারুশীলা বলে, আপনি আমার কাজে যাচ্ছেন! আমার দায়িত্ব।

চয়ন বিনীতভাবে বলল, গাড়িতে সময় বেশি লাগবে। অকারণ অপচয়। কোনও দরকার নেই।

ঠিক আছে, তা হলে যাতায়াতের জন্য আমি আপনাকে এক হাজার টাকা দিয়ে দিচ্ছি।

চয়ন আতঙ্কিত হয়ে বলে, দশ বিশ টাকার বেশি লাগবে না।

আপনি কি ভিথিরির মতো যাবেন নাকি ? রাস্তায় খেতেও তো হবে।

খেতে ধরুন আর দশ টাকা লাগতে পারে।

তবু রাখুন। পথে বেরোতে সব সময়ে বেশি টাকা সঙ্গে রাখতে হয়।
আপত্তি করা সত্ত্বেও চারুশীলা হাজার টাকাই গছিয়ে ছাড়ল। বলল, সবটাই খরচ করবেন। কৃপণের মতো হিসেব করবেন না। ট্রেনে অবশ্যই ফাস্ট ক্লাসে যাবেন।
লোকাল ট্রেনে ফাস্ট ক্লাস নেই যে।
ট্যাক্সি রে যাবেন তা হলে। যা খুশি করবেন, কিন্তু কিছু ফেরত দিতে পারবেন না।
শনিবার তো এখনও দেরি আছে।
দেরি! কতখানি দেরি? মাঝখানে তো মোটে দুটো দিন!
চয়ন উঃ শগর সঙ্গে একটা শ্বাস ছাড়ল।
চারুশীলা আরও কিছু একটা গুরুতর এবং পাণ্ডল প্রস্তাব করতে যাচ্ছিল, ঠিক এমন সময় একটা মেয়ে ঘরে ঢুকে বলল, মাসি, আমি তোমাকে সারা বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি যে! এখানে বসে আছে!
ওঃ ঝুমকি! আমার যে কী বিপদ যাচ্ছে! চলে, ও ঘরে গিয়ে বসি।
ঝুমকিকেও চেনে চয়ন। তার দিকে চেয়ে চমৎকার দাঁতে ঝলমল করে হেসে বলল, ভাল আছেন চয়নবাবু?
চয়ন তটস্থ হয়ে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ।
ওরা উঠে যাওয়ার পর খানিকটা স্বস্তি বোধ করতে লাগল সে। এই খাপাটে মহিলার সঙ্গে যদিও উদ্বেগজনক, তবু চারুশীলাকে কখনও অপছন্দও করতে পারে না চয়ন। অনেকটা এক ঝলক টাটকা হাওয়ার মতোই এসে সব ওলটপালট করে দিয়ে যান।
শনিবার সকালে খুব উদ্বেগের সঙ্গেই রওনা হল চয়ন। কলকাতার বাইরে সে কমই গেছে। সুন্দরবন তার সম্পূর্ণ অঙ্গো রাজ্য। প্রথম প্রথম ভয়-ভয় করছিল। তারপর ট্রেনে হাজারো রকমের লোক দেখে তার মনে হল, মানুষ কত কাজে কত দিকে যায়, ভয়ের কী!
ভয় শুধু একটা। যদি হঠাৎ মাঝপথে অজ্ঞান হয়ে যায়। তার মৃগী রোগের তো কোনও সৌজন্যবোধ বা লজ্জা নেই। যেখানে সেখানে প্রকাশ ঘটে। এবারে অনেকদিন ঘাপটি মেরে আছে। হঠাৎ কখন যে লাফিয়ে পড়বে ঘাড়ের তার ঠিক নেই।
ক্যানিং পৌছে সে খোঁজ নিল। তারপর মজার নৌকো ভটভটিতে চেপে বসল। সাঁতার জানে না, তবু খুব একটা ভয় হচ্ছিল না তার। ভয় আসলে বসে আছে সামনের কোনও তীরবর্তী গ্রামে, হোমাস সেজে। লোকটা এমনতে ভদ্র ও সুজন। কিন্তু আজকের পর থেকে হোমাস আর সুজন থাকবে না তার কাছে। একটা লোকের সঙ্গে তার চিরবিচ্ছেদ ঘটবেই ঘটবে।
খুবই সাফল্যের সঙ্গে সে উদ্ভিষ্ট গায়ের ঘাটে ভটভটি থেকে নামল। তারপর সামান্য খোঁজ নিতেই হোমাসের ঘরখানা খুঁজে পেল। নদীর ধারেই ঘর। একটু গাছপালা আছে। ফাঁকা ও সুন্দর জায়গায় ঘরখানা দেখেই ভাল লাগল তার। বাঃ, বেশ তো! এরকম জায়গায় এসে থাকতে ভালই লাগার কথা।
উঠানে ঢুকে চয়ন একটু গলাখাঁকারি দিয়ে মৃদু স্বরে ডাকল, হোমাসবাবু!
কেউ সাড়া দিল না। ঘরের দরজা বন্ধ।
হোমাসবাবু কি আছেন?
আরও কয়েকবার ডাকার পর দরজাটা খুলে হোমাস বেরিয়ে এল। তবে প্রথম দর্শনেই যেন চিনতে পারল না। কিছুক্ষণ অবাক চোখে চেয়ে থেকে বলল, আরে!
চয়নের পালানোর বা পিছানোর উপায় নেই। সুতরাং সে দু'পা এগিয়ে বলল, আমি চয়ন।
হোমাস হঠাৎ হাসল। সমস্ত মুখটা উজ্জ্বলিত হল সেই হাসিতে। বলল, ইটস এ প্রজেক্ট সারপ্রাইজ! আপনি এখানে কি করে এলেন?
চয়ন আমতা আমতা করে বলল, এদিকটা দেখা ছিল না। তাই—
সে তো বটেই। এটা বেড়ানোর মতো জায়গাও নয় শহুরে মানুষের কাছে। কিন্তু আমি এখানে থাকি কে বলল আপনাকে?
গুনলাম।
আসুন, আসুন।
ঘরে তেমন আসবাব কিছু নেই। বেশ ন্যাড়া। একখানা তক্তাপোশ, একখানা মোড়া এবং খুবই পলকা ধরনের একখানা টেবিল আর চেয়ার। চেয়ারে তাকে বসতে দিয়ে হোমাস বিছানায় বসল। বলল, কিছু যাবেন?
না। একটু জল খেলেই হবে।
জলটা দিয়ে হোমাস খুব স্বাভাবিক গলায় বলে, চারুদি আপনাকে পাঠিয়েছে, না?
বিষম খেয়ে সামলে নিয়ে চয়ন বলে, কথাটা কবুল করা বারণ।
হোমাস হাসল, কবুল করতে হবে না। আমি জানি।
চয়ন গেলাসটো রেখে বলল, আমি আসতে চাইনি। উনি জোর করে—
বুঝতে পারছি। তবু মনের ভাল। আপনার বদলে চারুদি এলে অবস্থাটা খারাপ হত।
উনি কিছু জানতে চান!
হোমাস একটু মাথা নেড়ে বলে, তাও জানি। চারুদি অনেক কিছু জানতে চায়। কিন্তু কি জানাবো তাই যে আমি জানি না!
চয়ন সভয়ে বলল, উনি খুব ইনসিস্টিয়ান্ট।
আপনি বিয়ে করেছেন?

আজ্ঞে না।

মোহাশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, বিয়ে ছাড়া মানুষের আর কিছু করার আছে কিনা তাই আমি জানতে চাই। আপনি কী বলেন!

আমি! চয়ন একটু হাসল, আমি কিছু জানি না।

আপনি আজ আমার কাছেই থাকুন।

থাকব? কিন্তু—

থাকবেন। আপনাকে দেখে কেন যেন আমার ভাল লাগছে। কাল থেকে মনটা ভীষণ খারাপ ছিল।

॥ ৫৮ ॥

ঘটনাটা ঘটল সন্ধ্যাবেলায়। খুব দূরেও নয়। পারুল বলতে গেলে বীণাপাণির খুব নিকট পড়শী, মহেন্দ্রবাবুর মেজো মেয়ে। একটু কেমনধারা যেন মেয়েটা। বড় খোলামেলা, সবসময়ে বোকার মতো হিহি হাসি। যখন তখন সিনেমায় যাবে। যাত্রা, জলসা কিছু বাকি রাখবে না। একটু ঢলানিও আছে।

পারুল ম্যাটিনি শো দেখে ফিরছিল। বড় রাস্তা থেকে মাঠের পথে নেমে বাড়ি ফিরছে, এমন সময় চারটে ছোকরা তাকে ধরে টেনে নিয়ে যায়। বেশি দূরেও নয়। মৈনুদ্দিনের বাঁশঝাড়ের পিছনে একটা পতিত জমিতে নিয়ে কাপড়জামা টেনে ছিড়ে খুলে ফেলল পারুলকে ছিবড়ে করে ফেলে রেখে গিয়েছিল তারা। মেয়েটার জ্ঞান ছিল না।

একটু রাতের দিকে চৌচামেচি ডাক খোঁজ শুরু হল। বীণাপাণির বাড়িতেও খোঁজ করতে এলেন মহেন্দ্রবাবু।

পারুলকে দেখেছ বীণা? শুনিছি সিনেমায় গিয়েছিল, এখনও ফেরেনি।

না তো কাকাবাবু, দেখিনি।

বড় ভয়ের কথা হল। রাত প্রায় দশটা বাজে।

বীণা তার টর্চ বাতিটা নিয়ে ঘরে তালি দিয়ে বেরিয়ে এল, চলুন তো দেখি।

দাঁড়াও। খড়ের গাদায় হুঁচ খোঁজা হবে। পাড়ার ছেলেরদের জানানো না ভেবেছিলাম। এখন ভাবছি জানানোই ভাল।

বড় ভয় হচ্ছে।

কিছু বলে যাননি? দেরি হবে বলে কিছু বলেনি?

না। ম্যাটিনি শোয়ে গিয়েছিল। দেরি হওয়ার কথা নয়।

তা হলে ক্লাবের ছেলেরদের খবর দেওয়াই ভাল।

মহেন্দ্রবাবু চলে গেলেন, কিন্তু বীণা ঘরে গেল না। মেয়েদের যে কত বিপদ, কত লোভ-লালসার নজরবন্দী হয়ে যে তাদের থাকতে হয় সে কথাই সে ভাবছিল টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে।

আধ ঘন্টাও পার হল না, একটা শোরগোল উঠল। টর্চ হাতে এগিয়ে গেল বীণা। একটু এগোতেই দেখল, ছেলেরা ধরাধরি করে মাঠ থেকে তুলে আনছে পারুলকে।

ধর্ষিতা কোনও মেয়েকে এর আগে কখনও দেখেনি বীণা। আজ দেখল। খোলা দাওয়ায় শোওয়ানো ঠাণ্ডা, রক্তাক্ত জ্ঞানহীন দেহ। কবল দিয়ে ঢাকা দেওয়া হয়েছে। মুখে গ্যাজলা কাটছে। পারুলের মা, দিদি, ঠাকুমা কান্দছে, ক্লাবের ছেলেরা তড়পাচ্ছে, মহেন্দ্রবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসা। কিছু স্পর্শ করল না বীণাকে। সে শুধু পারুলকে দেখছিল। তার শরীরের ভিতর থেকে একটা হলকা যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। রাগে, বিদ্বেষে, ঘেন্নায় যেন পাগল হয়ে যাচ্ছে মাথা। রাত এগারোটার পরও পাড়াসুদ্ধ লোক এসে জুটেছে মহেন্দ্রবাবুর বাড়িতে। যেন একটা মস্ত পরব।

বীণার পিছন দিকেই একটা জটলা। মাঝবয়েসি কয়েকজন লোক চাপা গলায় কথা বলছিল। তাদের মধ্যে একজন বলল, মেয়েটাও সুবিধের ছিল না মশাই। রেপ কি আর অমনি হয়? এক হাতে তালি বাজলেই হল!

বীণা ঘুরে লোকটার মুখে টর্চের আলো ফেলল অভদ্রের মতো। বলল, আপনি কিছু দেখেছেন?

লোকটা চমকে উঠে বলল, কি দেখব?

আপনি পারুলকে দেখেছেন, রেপ হওয়ার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছিল?

নিজের কণ্ঠস্বরের তীব্রতা বীণাকেও চমকে দিল।

লোকটা একটু তেরিয়ে হয়ে বলে, দেখার কী আছে। সবাই জানে।

বীণা এক পা এগিয়ে গিয়ে বলল, কি জানে?

সেটা কি আপনাকে বলতে হবে নাকি?

বীণা সটান লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, হ্যাঁ। আমাকে বলতেই হবে। মেয়েটা খারাপ কি ভাল সে কথা পরে হবে, তার আগে বলুন রেপ করাটা ভাল না খারাপ?

লোকটা একটু ভড়কে গিয়ে বলে, রেপ ভাল তো বলিনি!

আপনি তো রেপ করাটাকেই সাপোর্ট করছেন। এই যে বললেন, এক হাতে তালি বাজে না। যেন মেয়েটাও রেপ হওয়ার জন্য মুখিয়ে ছিল। তাই বুঝি!

অন্য লোকেরা তাড়াতড়ি মধ্যস্থ হয়ে 'যেতে দাও, যেতে দাও' বলে লোকটাকে একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল। বীণার ইচ্ছে হচ্ছিল লোকটাকে জুতোপেটা করে।

ভাতার এল। কী একটু দেখেটোকে বলল, পুলিশে খবর দিয়েছেন? না দিয়ে থাকলে দেওয়া উচিত। আর হাসপাতালে রিমুভ করুন। থরালি পরীক্ষা হওয়া দরকার।

পারুলকে যখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন বীণা ঘরে ফিরে এল। দরজা বন্ধ করে বিছানায় বসে অনেকক্ষণ ধরে গরম শ্বাস ফেলল ফোঁস ফোঁস করে। বুক জ্বালা করছে। পারুলের সঙ্গে যে তার খুব একটা ভাব ছিল তা নয়। পাড়ার মেয়ে বলে চিনত। কিন্তু আজ পারুলের এই সর্বনাশ যেন পারুলের বন্ধু করে তুলল তাকে। দুনিয়ার যত ধর্মিতা নারীর জ্বালা যেন সে পেতে লাগল আজ রাতে।

কেন রেপ হবে মেয়েরা? কেন হবে? কেন তারা পুরুষের হাতে এরকম বেমকা লাঞ্ছিত হবে দুনিয়ার সব জায়গায়? কেন ফাঁস দেওয়া হয় না ধর্ষণকারীদের?

খানিকক্ষণ ঘরের মধ্যেই উদ্ভাস্তভাবে ঘুরে বেড়াল বীণা। বড় অস্থির লাগছিল তার। তারপর হঠাৎ জ্বালা, রাগ, বিদ্বেষ উড়ে গেল। একা ঘরে তার হঠাৎ ভীষণ ভয় করতে লাগল। তার নিরাপত্তা বলতে তো কিছুই নেই। সামান্য এই ঘরমাতা কত পলকা। ধর্ষণকারী তো ইচ্ছে করলে ঘরেই এসে তাকে আক্রমণ করতে পারে। যে-মাঠের রাস্তায় আজ রেপ হল সেখান দিয়ে তো তাকেও একা ফিরতে হয় মতো নান্দে। তা হলে সেও কি একদিন পারুলের মতো শিকার হয়ে যেতে পারে?

এই ভয় এমন ঠাণ্ডা করে দিল তাকে যে, বীণা সারা রাত ঘুমোতে পারল না। শীত পড়েছে, কিন্তু শরীরের এই ঠাণ্ডা তাই সে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল।

পরদিন সকালে সে কাকার ঠেক-এ হাজির হল গিয়ে।

কাকা, একটা ব্যবস্থা করো।

কিসের ব্যবস্থা বীণা?

শোনোনি কাল রাতে পারুল রেপ হয়েছে?

কে পারুল?

মহেন্দ্রাবুর মেয়ে।

কী মুশকিল! মহেন্দ্রাবুটাই বা কে?

আমাদের পাড়ার।

তিনি তো বিখ্যাত লোক নন যে চিনব।

বিখ্যাত না-ই বা হল। আমি তো চিনি।

রেপ হল কি করে?

ম্যাটিনি শো দেখে সন্কেবেলায় ফিরছিল, তখন হয়েছে।

তার আমি কী ব্যবস্থা করব?

তার ব্যবস্থার কথা বলিনি। পারুলের ব্যবস্থা যা করার ডাক্তার আর পুলিশ করবে। ব্যবস্থা আসলে কিছুই হবে না। বেস্টদের দিনলে পুলিশ ধরবে না। ধরলেও কেস খুলে থাকবে। আমি আমার ব্যবস্থার কথা বলছি। আমার আর ও-কোনো থাকতে সাহব হচ্ছে না।

কাকা একটু হেসে বলে, অত ভয় পেলে চলবে কেন? রেপ তো হয়েই থাকে। তা বলে মেয়েরা তো আর ঘরে বসে নেই।

ওটা কথা নয় কাকা। তুমি এমনভাবে বলছ যেন রেপটা জলভাত।

আরে, রাগ করছ কেন? শেফালি রেপ হয়েছে বলেই যে আর সবাই হবে তার কোনও মানে নেই।

শেফালি নয়, পারুল।

ওই হল। খোজ নিয়ে দেখ, হয়তো মেয়েটা ছেলেগুলোর সঙ্গে মিশত-টিশত। হয়তো একটু অ্যাডভেনচারাস টাইপের ছিল। সেই সব মেয়েই রেপ হয় যারা ওটা ইনভাইট করে।

বীণা হুঁসে উঠল, কাল ঠিক এরকমই একটা কথা বলছিল একটা লোক। তোমরা পুরুষমানুষেরা আসলে সবাই একরকম। তোমার কেন ধারণা হল যে, মেয়েটাই খারাপ?

আচ্ছা মানছি, মেয়েটা ভাল। কিন্তু রেপ হওয়ার মতো একটা পরিস্থিতি তো চাই। নইলে সব মেয়েই তো হত। তা যখন হচ্ছে না তখন ধরতে হবে—

দয়া করে চুপ করবে?

কেন, কী হল?

তুমিও ওই লোকটার মতোই খারাপ। শোনো কাকা, মেয়েরা সবাই জানে, পুরুষেরা কী রকম। সুযোগ পেলেই যে তারা মেয়েদের হিরি লুটের বাতাসা মনে করে তা আমি জানি।

তুমি বড় রেগে যাচ্ছ।

এর পরও রাগ না হয়ে পারে, বলো!

আচ্ছা আমি ক্ষমা চাইছি। এখন বলো তো কী হয়েছে!

বলেছি তো। আর শুনতে চেও না। আমার একটা ব্যবস্থা করবে?

কি ব্যবস্থা? তোমার সঙ্গে একটা মেয়েকে রাখতে বললাম, তা তো রাখলে না?

ওটা মোটেই কোনও ভাল ব্যবস্থা নয়।

তা হলে নিমাইকে ফিরিয়ে আনো।

নিমাই! সে কেন ফিরবে! ইয়ার্কি করছ? এসব নিয়ে ইয়ার্কি করা ভাল নয় কাকা।

দেখ, ফের রেগে যাচ্ছে! ইয়ার্কি মোটেই করিনি।

আপে আমাকে বলো তো, মেয়েদের আর কতদিন এরকম পাহায়া রাখতে হবে?

কাকা গম্বীর হয়ে বলে, যতদিন রেপিস্ট থাকবে ততদিন।

রেপিস্টদের ফাঁসি দাও না কেন? যাকগে, সেই মেয়েটা কোথায় আছে?

নেই। সে একটা ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেছে।

বাঁচা গেছে।

তুমি বরং ঘরটা ছেড়ে শহরের দিকে চলে এসো।

নিজের ঘর ছেড়ে দেবো?

উপায় কি?

বীণা কিছুক্ষণ শূন্য হয়ে বসে থেকে হঠাৎ বলল, আমার ঘনটা একদম বিগড়ে গেছে।

ব্যাপারটা তুমি বড় বড় করে দেখছ। পচা-গলা একটা সমাজে থাকো। কত পাশ হচ্ছে চারদিকে। গা বাঁচিয়ে দেও
মহোই তো থাকতে হবে আমাদের। আর লড়াই করতে হবে।

তুমি কি লড়াই করছ শুনি?

আমিও লড়াই বীণা। সামাজিক পাপের সঙ্গে আমার লড়াইয়ের হাতিয়ার নাটক। যার যা আছে সে তো তাই দিয়ে
লড়াই, নাকি? আমাদের আর কোন হাতিয়ার আছে বোলা!

বীণা গাঁজ হয়ে বসে থেকে কিছুক্ষণ পরে বলল, আমার বড় ভয় করছে। পাকুলের মুখখানা দেখে এত কষ্ট হচ্ছিল
কাল।

হওয়ারই কথা। ভোবা না, দলের কোনও মেয়েকে সঙ্গে কয়েকটা দিন রাখো। তারপর দেখা যাবে।

বীণা উঠল।

হাসপাতালে গিয়ে যখন পাকুলকে ফের দেখল বীণা তখন তার জ্ঞান ফিরেছে। তার মা বসে আছে পাশে। তাকে
দেখে পাকুল ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

কী হয়ে গেল বীণাদি!

কী হয়েছিল বলবে?

পুলিশকে বলেছি। পুলিশ আরও উল্টে এমন সব প্রশ্ন করতে লাগল যেন দোষটা আমারই।

পুলিশও যে পুরুষমানুষ। কি হয়েছিল?

যা হয়। একা ফিরছিলাম। চারটে ছেলে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল।

চারজন?

হ্যাঁ।

ফলো করে এসেছিল?

কী জানি। কাউকে লক্ষ করিনি আগে।

হঠাৎ এসে ধরল?

হ্যাঁ। চারজনকে দেখলাম রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে। পাশ কাটাতে যেতেই একজন হাত ধরে ফেলল। বলল,
আমাদের সঙ্গে যাবে? মেলা টাকা দেব।

এত সাহস?

ওরা আমাদের বেশ্যা বলেই বোধ হয় ভাবে। আমি ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে চোঁচাতে যাচ্ছি,
অমনি একজন মুখ চেপে ধরল।

তারপর?

আরও শুনতে চাও? টেনে নিয়ে গিয়ে পতিত জমিটায় ফেলে দিল। তারপর মনে হচ্ছিল যেন, মানুষ নয়, চারটে
কুকুর আমাকে ছিড়ে খাচ্ছে। আমার কী হবে বীণাদি?

কী আবার হবে? এ সমাজে কিছু হয় নাকি? সব মেনে নিতে হয়।

আমার যে বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছিল। পাকা কথা হয়ে গেছে। ওরা কি আর নেবে আমাকে?

বীণা থমকে গেল। তারপর বলল, কেন নেবে না?

ধ্যাৎ। রেপ হওয়া মেয়েকে কেউ নেয়?

বীণা শুদ্ধ হয়ে বসে থাকে কিছুক্ষণ।

পাকুল কাদতে কাদতে বলে, কিছুই পোপন থাকবে না বীণাদি। এতক্ষণে তাদের কাছে বোধ হয় খবর পৌঁছে গেছে।
কী হবে বোলা তো?

বীণা পাকুলের হাতটা শক্ত করে ধরে বলল, শোনো, ওরকম কথা বোলা না। বিয়েটাই মেয়েদের সব নয়। বিয়ে না
হলেও জীবনটা নষ্ট হয়ে যায় না। মেয়েরা এত সহজে ভেঙে পড়ে বলেই তো লড়াই করতে পারে না। শক্ত হও তো।
কয়েকটা কুকুর তোমার জীবন নষ্ট করে দেবে—তা কি হয়?

দিল তো।

মোটাই দিল না। আমি মনে করি, মেয়েরা পুরুষের ভুলনায় অনেক উন্নত মানুষ। তাদের অনেক কিছু করার আছে।

এমনকি বাবা অবধি আজ সকালে আমাকে বকাবকি করে গেছে, জানো?

কী বলেছেন উনি?

বলেছে, আমারই নাকি দোষ। কেন সন্দেহেলা আমি একা ফিরছিলাম, কেন আমি এত স্বাধীনচেতা, এইসব।

একা ছাড়া উপায় কি? আমাকেও কত রাতে একা ফিরতে হয়।

তোমার সম্পর্কে পাড়ার লোক তো কত কথাই বলে!

তুমি বোলা না তো!

না, বীণাদি। আমি জানি, তুমি কত কষ্ট করে সংসার করছ। নিমাইদার সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। নিমাইদা তোমার কথা কত বলেছে আমাকে।

কী বলেছে ?

বলত তুমি নাকি বেহুলার মতো অনেক সাধ্যসাধনা করে তবে নিমাইদাকে শক্ত অসুখ থেকে ভাল করেছে। স্বপ্ন-শান্তডিকে খাইয়ে পরিচয় রেখেছ। তোমার খুব প্রশংসা করত।

পারুলের ঘোমটা টানা মা এবার বীণার দিকে চেয়ে বলল, নিমাই আমার ছেলের মতো। কী সুন্দর গলা। কত কীর্তন শুনিয়েছে আমাদের। তাকে দেখছি না কেন ?

আছে।

তোমার কথা সত্যিই খুব বলত বাছা। এখন এ মেয়েকে নিয়ে কী করব বলো তো! সারা রাত কেঁদেছি। চোখের জল বোধ হয় ফুরিয়ে গেল। একটা পরামর্শ দাও তো মা।

বিয়ে যদি ভেঙে যায় তো যাক। ও নিয়ে ভাববেন না। পারুল গান গাইতে পারে ?

খালি গলায় গায়। ভালই গায়।

ও সুস্থ হয়ে উঠুক, আমি কাকাকে বলে ওকে যাত্রায় ঢুকিয়ে দেবো।

যাত্রা! যাত্রা করলে কী হবে! বিয়েটার কথা ভাবছি।

বিয়ের কথায় বিরক্ত হল বীণা। বলল, দেখুন মাসিমা, এদেশে এখনও মেয়েরা নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করতে পারে না। তাদের কেউ পছন্দ করলে, দরাদরিতে বনিবনা হলে তবেই বিয়ে।

তাই তো বটে।

লটারি খেলার মতো। বিয়ের জন্য বসে থাকলে মেয়েদের কিছু হবে ? দেশভর্তি ছেলেগুলো সব বেকার, বিয়ে করবে কে ? তারপর এই ঘটনা। বিয়ে নিয়ে ভাবছেন কেন ?

তাহলে ?

ওসব পরে ভাবা যাবে মাসিমা। আচ্ছা, পারুল, ওরা কারা ছিল জানো ? কাউকে চিনতে পেরেছিলে ?

পারুলের চোখের পাতা যেন একটু কাঁপল। একটা মেয়ে মিথ্যে কথা বললে অন্য মেয়ে তা যেন বুঝতে পারে। পারুল স্তিমিত গলায় বলল, না তো!

একটুও চেনা লাগল না কাউকে ?

না বীণাদি। বোধ হয় বাইরের ছেলে।

কত বয়স হবে ?

পঁচিশ-ছাব্বিশ বলে মনে হয়।

প্যান্ট-শার্ট পরা ?

একজনের পরনে পায়জামা ছিল।

আবার দেখলে চিনতে পারবে ?

জানি না। এত ভয় পেয়েছিলাম যে, কিছু মনে পড়ছে না।

বীণা জুঁকচে পারুলের দিয়ে চেয়ে রইল। তার মনে হয়, পারুল মিথ্যে কথা বলছে। ধর্ষণকারীদের কাউকে হয়তো সে চেনে।

তবে বীণা আর আকচাআকচি করল না। বলল, ডাক্তাররা কী বলছে! কবে ছাড়বে তোমাকে ?

দু-তিন দিন লাগবে।

পুলিশ কী বলে গেল ?

আরও নাকি জানতে আসবে। তুমি আমার কাছে একটু বসবে বীণাদি ? বসলে আমার একটু সাহস হয়।

আমি নিজেই তো ভীতু।

তুমি মোটেই ভীতু নও। একা একা কেমন ডাকাবুকোর মতো থাকো, তোমাকে সবাই ভয় খায়।

আমি বুঝি দেবী চৌধুরানী ?

তোমার বেশ তেজ আছে ? আমাদের নেই। আমাদের জায়গায় তুমি হলে ওরা পারত না।

বীণা বিজ্ঞানার একধারে একটু বসল। তারপর বলল, তোমার প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে করে না ?

খুব করে।

কি ভাবে নেবে ?

তা তো জানি না। ইচ্ছে করে ওদের ধরতে পারলে জলবিছুটি দিই। আমার ভবিষ্যৎটাই তো নষ্ট হয়ে গেল।

বীণা মাথা নেড়ে বলে, নষ্ট হবে কেন ? নতুন ভবিষ্যৎ তৈরি হবে। যারা রেপ হয় তারা পচে যায় না।

তুমি বেশ বলো। ঠিক যেন সিনেমার ডায়ালগ।

নাটক করি বলে বলছ ?

না না, ছিঃ। তা নয়। কথাগুলো সুন্দর। সাহস হয় শুনলে।

তোমার এখন সাহসই তো দরকার। অনেকে যা হয়েছে তা মেনে নেয়। তুমি মেনে নিও না।

কী করব তা বলে দেবে ?

ভেবে বলব। এখন নয়। আমারও অনেক লড়াই আছে। অনেক পথ যেতে বাকি।

কিন্তু তুমি তো রেপ হওনি বীণাদি। হলে বুঝতে।

পারুল হঠাৎ ফের ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল। কাদতে লাগল।

বীণা চুপ করে বসে রইল। সে ডায়ালগ দেয় বটে। কিন্তু তার ভিতরটা বড় শূন্য।

বাড়ির প্র্যান পাঠাতে হল মণীশকে, অপর্ণা পরিষ্কার বলল, তুমি যাকে দিয়ে প্র্যান করিয়েছো সে বড়লোকদের প্র্যানার। আমাদের মতো মধ্যবিত্তের জন্য নয়। নিচয়ই একগাদা টাকা নিয়েছে!

মণীশ খুব অস্বস্তিতে পড় গিয়ে বলল, না, তেমন কিছু নয়।

অপর্ণা জানে একটু হেসে বলল, শুনতে চাই না। শুনলে আমার মন খারাপ হবে। শোনো, তোমার রক্ত জল-করা টাকা ওভাবে ওড়াতে নেই। টাকা আমাদের কাছে সস্তা নয়। আমি অন্য প্র্যানারকে দিয়ে প্র্যান করিয়ে নিচ্ছি। তুমি আর বাড়ি নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

মণীশ লজ্জার সঙ্গে বলল, লোকটা আমার বন্ধু। ও আবার প্র্যান করে দেবে। আর ফি দিতে হবে না। কথা হয়ে আছে, প্র্যান অলটার করলে আর বাড়তি কিছু লাগবে না।

তাহলে শোনো, আমি অনেকদিন আগে থেকেই বাড়ির একটা রাফ স্কেচ করে রেখেছি। খুব ভেবেচিন্তে, আমাদের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই করেছি। সেটা ওই ভদ্রলোককে দিও। উনি ওটা দেখে প্র্যান করে দেবেন।

অপর্ণা বাস্তবিকই তার কাঁচা হাতে সাদা কাগজে প্র্যান করেছে। একটা নয়, একাধিক। দুপুরে বা বিন্দিত রাতে সে ভেবে ভেবে ঘর বারান্দা সিঁড়ি ঐকছে। এ তার স্বপ্নের বাড়ি। খুব বড় নয়। ছোট মিষ্টি একখানা, দোতলা, বাগানঘেরা, চটকদার নয়, কিন্তু ছিমছাম। কী রঙ হবে তাও ভেবে রেখেছে। সেই আঁকা কাগজ সে মণীশের হাতে দিয়ে বলল, ঠিক এরকম হবে। মনে রেখো। ঘর আর বারান্দার মাপও দিয়ে দিয়েছি।

মণীশ একটু কাঁচামাছু হয়ে বলে, দত্ত একটা কথা বলছিল। আধুনিক কনসেপশন হচ্ছে ছাদে সোলার প্যানেল লাগিয়ে নেওয়া।

সোলার প্যানেল! বলে চোখ কপালে তোলে অপর্ণা, কী হবে সোলার প্যানেল দিয়ে?

ঘরদোর শীতকালে গরম করা যাবে, গরম জলের অভাব হবে না।

অপর্ণা আকুল হয়ে বলে, কী মানুষ বলো তো তুমি! বান্ধা ছেলে নাকি? এটা কি সাহেবদের দেশ যে ঘর গরম করতে হবে? এ শহরে বছরের মধ্যে নয় মাসই তো গরম। আর গরম জল আমাদের কোন কাজে লাগবে? তোমাকে নিয়ে যে আর পারি না।

মণীশ একটু গম্ভীরভাবে কাগজগুলো দেখে নিয়ে তার অ্যাটাচি কেঁসে ভরে যখন রওনা হচ্ছিল তখন অপর্ণার বড় কষ্ট হল মণীশের জন্য। বান্ধা ছেলের হাত থেকে খেলনা কেড়ে নিলে তার যেমন অভিমানী মুখ হয় মণীশের মুখের অবস্থা ঠিক তেমনি। অপর্ণা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। দুহাতে মণীশকে জড়িয়ে ধরে বলল, রাগ করোনি তো!

মণীশ হাসল, বলল, না। তুমি প্রাকটিক্যাল আর আমি ড্রিমার। তুমিই ঠিক কথা বলছো। আমি শুধু ভাবি, ড্রিমারদের দিয়ে দুনিয়ার কিছুই বোধ হয় হয় না।

ওভাবে বোলো না। স্বপ্ন কি আমিও দেখি না! তোমার মতোই দেখি। কিন্তু মাটিতে পা রেখে। তুমি যে পাখনা মেলে উড়ে যাও কল্পনার রাজ্যে। দুঃখ পাওনি তো!

না। তোমার কথায় দুঃখ পাবো কেন অপু? তুমি তো বরাবর আমাকে তোমার সবটুকু দিয়ে আড়াল করে রাখতে চেয়েছো।

আজকাল তোমাকে বড্ড ভয় পাই। একটুতেই অভিমান করো যে!

মণীশ খুব ফ্যাকাসে একটু হেসে বলে, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কি তাহলে ফর্মাল হয়ে যাচ্ছে অপু? যদি বেশী মন বুঝে চলতে শুরু করো তাহলে যে আমি আর আমার আগের পাগলি, সোহাগী, ডমিনেটিং অপুকে খুঁজে পাবো না।

অপর্ণা দুহাতে মণীশের গলা জড়িয়ে ধরে বলে, আমি বুঝি বদলেছি? তুমিই তো বড্ড গোমড়া মুখ করে থাকো।

আমার মুখ গোমড়া করে দাও কেন? আমি তো হাসিখুশি থাকতে চাই।

অপর্ণা অবাক হয়ে বলে, আমি মুখ গোমড়া করে দিই? ওমা! বলে কী রে?

মণীশ তার অ্যাটাচি খুলে অপর্ণার আঁকা স্কেচগুলো বের করে বলল, দেখ অপু, একতলার ডিজাইনে তুমি একা হলঘর ঐকছে। এক কোণে ছোট করে লিখেছো "ব্যাঙ্ক অর অফিস।" কেন লিখেছো অপু? একতলাটা ভাড়া দিতে চাও?

অপর্ণার দুটি হাতই মণীশের গলা জড়িয়ে ধরে ছিল। হাত দুটি এ কথায় হঠাৎ শিথিল হয়ে গেল। একটু বিবর্ণ হয়ে সে বলল, ওঃ, ওটা এমনিই লিখেছিলাম। ভাবছিলাম একটু বড়ই তো হচ্ছে বাড়িটা। আমরা ক'জনই বা লোক বলা! মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাবে, বুঝকা কোথায় চাকরি করতে চলে যাবে হয়তো। তখন বুড়োবুড়ি কি করে থাকবে? বরং একতলায় একটা ব্যাংক বা অপিস থাকলে ততটা ফাঁকা লাগবে না।

মণীশ হাসল না। মৃদু স্বরে বলল, তাই বুঝি অপু?

হ্যাঁ গো, বিশ্বাস করো।

তুমি কিন্তু বরাবর বলে এসেছো, বাড়ি করলে কখনও সে বাড়িতে ভাড়াটে রাখবে না।

আহা, এ তো আর ফ্যামিলি ভাড়াটে নয়। অফিস বা ব্যাংক তো দশটা-পাঁচটা। তারপর তো আর ঝামেলা থাকবে না। কন্ট্রাষ্ট থাকবে। দু'চার বছর পর তুলেও দিতে পারা যাবে।

জীব দিবে শুকনো। ঠোট ভিজিয়ে মণীশ খুব মৃদু স্বরে বলল, আমি ভাবলাম বুঝি তুমি ভবিষ্যতে একটা আয়ের পথ খোলা রাখলে। হয়তো ধরেই নিয়েছো, আমি আর বেশি দিন নয়। তাই কি এইসব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা, অপু?

অপর্ণা এত কঠোর ও নগ্ন সত্যকে স্বীকার করে কি করে? সে কৃতকর্মকে চাপা দেওয়ার জন্যই যেন আরও আবেগে জড়িয়ে ধরে মণীশকে। মণীশের ইন্ট্রি-করা শার্টের কলার দুমড়ে যায়। অপর্ণা বলে, কি করে এমন কথা ভাবতে পারো তুমি? কি করে ভাবো?

আমি তোমার দূরদৃষ্টির প্রশংসাই তো করছি অপু!

না, তুমি সন্দেহ-বাতিকে ভুগছে। সবসময়ে সন্দেহ করছে যে, আমরা তোমাকে খরচের খাতায় ধরে নিয়েছি।

মণীশ একটু হাঁফিয়ে পড়ছিল। ধীরে সে অপর্ণার বাহুপাশ আলগা করে চেয়ারে বসল অবসন্নের মতো। বলল, একটু জল দাও। ঠাণ্ডা জল।

উদ্বিগ্ন অপর্ণা দৌড়ে গিয়ে ফ্রিজের জল নিয়ে এল, তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?

মণীশ মাথা নেড়ে বলে, না। মাঝে মাঝে একটু হাঁফ ধরে যায়। হার্ট একটা ভীষণ জরুরি জিনিস। তাকে বেশী উত্তেজিত করতে নেই।

দাও, প্র্যান্টো আমি এখনই ছিড়ে ফেলছি।

না অপু, থাক। আমার মনে হচ্ছে, তুমি ঠিকই করেছে। ও বাড়িতে আমাদের ফাঁকাই লাগবে।

আচ্ছা, আর এত রাগ করতে হবে না। নিচের তলাটা আমরা একটা হলঘরই রাখব। আমার অনেকদিনের ইচ্ছে, পাড়ার ওয়াকিং মায়েরদের বাচ্চাদের জন্য একটা ক্রেশ করি। কলকাতায় ভাল ক্রেশ নেই। আমি একটা কিছু নিয়ে থাকতে চাই। দেবে করতে?

মণীশ একটা গভীর শ্বাস ছেড়ে বলে, করো অপু।

হ্যাঁ গো, সত্যিই শরীর খারাপ লাগছে না তো! আজ তাহলে অফিস গিয়ে কাজ নেই।

মণীশ বলল, আজ জরুরি কাজ আছে অফিসে। যেতে হবে। শরীর ঠিক আছে অপু। তবে মনে হয়, আমার একটু চেষ্টা দরকার ছিল।

তাহলে চলো না, পুরী থেকে কয়েকদিন ঘুরে আসবে।

মণীশ স্নান হেসে মাথা নেড়ে বলে, অনেক কামাই হয়েছে অপু। আর ছুটি নেওয়া যায় না। কাজও অনেক জমে গেছে।

এই বলে মুখের বিবর্তটুকু নিয়েই বেরিয়ে গেল মণীশ। পিছনে একা ঘরে কেমন বিকল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল অপর্ণা। চোখ ভরে আসছে জলে। এ কান্নাকে থামানো যাবে না কিছুতেই। তার এখন কান্নাই দরকার। মণীশ কেন সব বুঝতে পারে? তার মনের কথা, তার ভবিষ্যতের গোপন চিন্তা, সবই যে ধরা পড়ে যাচ্ছে মণীশের কাছে! অথচ সে তো চায় মণীশ আরও একশো বা হাজার বছর বেঁচে থাকুক। সে কি তা চায় না? অবশ্যই চায়। আবার এও সত্য, সে বাস্তববাদী, সে কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন। ভাববেগে ভেসে যেতে নেই, বেশী বিস্তার করা উচিত নয় কল্পনার পাখা। সে তাই একতলাটা ভাড়া দেওয়ার কথা ভেবে রেখেছিল। কোনও দোষ হয়নি তাতে। অথচ মণীশ কত কী ভেবে নিল হয়তো।

এক একটা দিন যেন পাষণ্ডভার নিয়ে আসে। সারাটা দিন যেন দমচাপা, পাগল-পাগল, বিচ্ছিরি। আজকের দিনটা কিরকম যে যাবে, কে জানে! এরকম সব বিচ্ছিরি দিনে মাঝে মাঝে অপর্ণার ইচ্ছে করে কেরোসিনে স্নান করে একটা দেশলাই কাঠি ঘষে দেয় শরীরে।

এক বুক ভালবাসা আছে বলেই না এত জ্বালা! যাদের সে ভালবাসে না, তাদের জন্য তো জ্বালা-যন্ত্রণা নেই, উদ্বেগ নেই, অশান্তি নেই। কিন্তু যাদের ভালবাসে তাদের জন্যই সবসময়ে বুক দুক্ক-দুক্ক, তাদের মুখ একটুখানি হাস্যহীন দেখতেই বুক ফাঁকা লাগে। তাহলে ভালবাসার এত গুণগান করে কেন লোকে? ওই যে ফ্যাকাসে মুখখানা নিয়ে বেরিয়ে গেল মণীশ, এখন সেই মুখখানা সারাদিন চোখের সামনে ভাসবে, আর জ্বালাতন হবে সে। তার পাগল স্বামী তাকে একদিন বলেছে, পঁচিশ হাজার বছর বেঁচে থাকলে তারা নাকি আর পরস্পরকে ভালবাসতে পারত না। মণীশ পারত কিনা কে জানে! কিন্তু অপর্ণা পারত। খুব পারত। ভাগ্যিস পঁচিশ হাজার বছর তাদের বাঁচতে হবে না। হলে পঁচিশ হাজার বছর ধরে সহ্য করতে হত এই উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা। এই কয়েক বছরেই পঁচিশ হাজার বছরের অভিজ্ঞতা হয়ে গেল বোধ হয় তার।

বিকলে শুকনো মুখে মেয়েটা ফিরল।

অপর্ণা বলল, কি রে, মুখ শুকনো কেন?

ঝুমকি বড় শান্ত বিবেচক মেয়ে। একটু চুপচাপ আপনমনে থাকতে ভালবাসে। বলল, দেখ না মা, ওরা মোটে তিন শো টাকা মাইনে দেবে বলছে।

অপর্ণা উৎকণ্ঠ হয়ে বলল, ওরা কারা? অমন অর্ধেক করে কথা বলিস কেন?

একটা কম্পিউটার ফর্ম।

তিনশো টাকা মাত্র!

তিনশো টাকাতেই লোক পেয়ে যাবে।

অপর্ণা মেয়ের দিকে চেয়ে থেকে বলল, তুই ও চাকরি করবি?

ভাবছিলাম চাকরিটা ভাল না হলেও এক্সপেরিয়েন্স তো হবে।

চারুশীলার ভাই যে তোকে চাকরি দেবে বলেছিল, তার কী হল?

ঝুমকি মায়ের দিকে চেয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, ওসব কথার কোনও দাম নেই। লোকটার বোধ হয় আমার কথা মনেই নেই। তাছাড়া হেমান্সবাবুর এখন রোমান্টিক পিরিয়ড চলছে। এসব ছোটখাটো প্রবলেম নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই।

অপর্ণা সামান্য স্ক্যান্ডালের অভ্যাস পেয়ে বলল, রোমান্টিক পিরিয়ড? কার সঙ্গে?

বিলেত-ফেরত দারুণ সুন্দরী একটা মেয়ের সঙ্গে। রশ্মি রায় শুনতে পাচ্ছি বিয়ের পর দুজনেই বিলেতে চলে যাবে।

শোনো ঝুমকি, তোমাকে আর চাকরি চাকরি করে হনো হতে হবে না। চেহারাটা দিন-দিন যা হচ্ছে। কণ্ঠার হার বেরিয়ে গেছে, মুখ শুকিয়ে এতটুকু। এখন কয়েকদিন বাড়িতে বসে বিশ্রাম নাও। তোমার রেন্ট দরকার। যদি ভাল কোনও চাকরি পাও তখন দেখা যাবে।

ঝুমকি মায়ের দিকে একটা আনমনা দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বলল, আচ্ছা, মা পৃথিবীতে কিছু মানুষ খুব অন্যায় রকমের সুখে আছে, না ?

কী বলছিস ?

দেখ না, কিছু মানুষ এমন ভাগ্য করে এসেছে যে, তাদের কিছুই করতে হয় না। তাদের অনেক টাকা, গাড়ি বাড়ি, ব্যবসা বা চাকরি, যখন তখন বিদেশে চলে যাচ্ছে, আসছে। ডাবলে কেমন লাগে বলা তো ? আমার তো ভীষণ রাগ হয়।

অপর্ণা একটু হাসল, ওভাবে বিচার করলে রাগ হওয়ারই কথা। আবার আমাদের চেয়েও কত দুগুণে কষ্টে মানুষ আছে।

সেটা ভাবলে তো আরও রাগ হয় না। মানুষে মানুষে এত তফাত যে, সেটাকে লজিক্যাল বলেই মনে হয় না। কেন পৃথিবীটা এরকম বলা তো!

অপর্ণা মায়ের মাথায় একটু হাত বুলিয়ে মাথটা নিজের কাঁধে চেপে ধরে। ঝুমকি তার চেয়ে এক ইঞ্চি লম্বা। একটু হেসে বলে, বড়লোকদের হিংসে করে কী করবি ? যার যেমন কপাল।

কপালে আমার বিশ্বাস ছিল না। ভাবতাম, সবাই সবকিছু হতে পারে। যদি চেষ্টা করে। কিন্তু এখন দেখছি, চেষ্টাতে কিছু হয় না। একটা সামান্য ভদ্র মাইনের চাকরি পাওয়াই কঠিন!

ইদানীং ঝুমকির মুখে যে প্রগাঢ় ক্লান্তির ছাপ দেখতে পায় অপর্ণা, তা তার একটুও ভাল লাগে না। শুধু একটা চাকরির জন্যই কি এত আকাঙ্ক্ষা আর এত হতাশা ? চাকরির ওর এমন কি দরকার ? মেয়েদের একটু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকা যে ভাল, তা অপর্ণাও বিশ্বাস করে। কিন্তু তার জন্য এত তাড়াছড়োর কি আছে ? ঝুমকির বাবা তার সন্তানদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মুক্তহস্ত। দশ টাকা চাইলে বিশ টাকা দিয়ে দেয়। কিন্তু বুঝা বা অপু যেমন টাকা-পয়সা খরচ করতে ভালবাসে, ঝুমকি সেরকম নয়। সে বাবার কাছ থেকে ততটুকুই নেয়, যতটুকু না হলেই নয়। সেই হিসেবে ঝুমকি অনেকটা অপর্ণার মতো টাকা-পয়সা ওড়তে পছন্দ করে না। একটু হিসেবী। ইদানীং বাই চেপেছে বাবাকে সাহায্য করতে হবে। কিন্তু সেটা এখনই না হলেও হয়। অপর্ণার সন্দেহ হয়, চাকরি নয়, অন্য কোনও গুঢ় কারণে মেয়েটা ঝুঁকিয়ে যাচ্ছে। এমনিতেই এই বয়সের মেয়েদের ভিতরের কথা টেনে বার করা কঠিন। তার ওপর ঝুমকি ভীষণ চাপা। অন্য সব কথা দূরে থাক, ঝুমকি কী খেতে ভালবাসে বা কোন রং পছন্দ করে সেটা অবধি অপর্ণা ধরতে পারে না। তার ভিন ছেলেমেয়ের মধ্যে ঝুমকিই সবচেয়ে বেশী আবছা তার কাছে।

অপর্ণা মেয়ের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থেকে ওর মনের কথা বুঝবার একটা বার্থ চেষ্টা করছিল। বলল, তোর বুঝি চাকরি ছাড়া আর কিছুতে মন নেই ? হ্যাঁ রে, তোর কি একটাও ছেলে-বন্ধু নেই।

ঝুমকি যেন সামান্য অবাক হল। তারপর ড্র কঁচকে বলল, খুব পাকা হয়েছে তো মা! মেয়ের বয়স্ফেভের খবর নেওয়া হচ্ছে ?

আহা, আছে কি নেই, বল না!

আমার আবার বয়স্ফেভ! কী যে বলা না! এই তো তুমিই বললে আমার চেহারাটা হাড়গিলের মতো।

মিথ্যুক! আমি কক্ষনা তোকে হাড়গিলে বলিনি।

হাড়গিলে কথাটা হয়তো উচ্চারণ করানি, কিন্তু যা বিবরণ দিয়েছে, তাতে তাই দাঁড়ায়।

মেটেই না। চেহারা খারাপ হয়েছে তাই বলছিলাম। গায়ে মাংস লাগলে তোর পাশে কেউ দাঁড়াতে পারে ?

খুব পারে। নিজের মেয়েকে অত বাখানাতে হবে না। আমার চেহারা কেমন, তা আমি জানি।

খুব জানিস। ক'টা দিন রেষ্ট নে, আর ভাল করে খা। তারপর দেখিস আয়না অন্য কথা বলবে।

ঝুমকি একটু হাসল।

অপর্ণা বলল, তোর একটা কিছু হয়েছে। কী হয়েছে বলবি আমাকে ?

কী হয়েছে ? বলে ঝুমকি অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

তুই বলছিস না। কিন্তু আমি যেন টের পাচ্ছি।

ঝুমকি শান্ত গলায় বলে, তুমি সব সময়ে এত টেনশনে থাকো কেন মা ? আমার আর কী হবে ? চাকরি পাচ্ছি না, তাই মনটা ভাল লাগে না।

চাকরি তো তোর তত দরকার নেই। এমন নয় যে, তুই চাকরি না করলে আমরা খেতে পাবো না।

চাকরি পাওয়াটা শুধু খাওয়ার জন্য দরকার নয় মা। একটা প্রেস্টিজেরও ব্যাপার। চাকরি না-পাওয়া মানে আমাদের কেউ যোগ্য মনে করছে না। কম্পিটিশনে আমি হেরে যাচ্ছি।

আহা, ওসব ভাববার কি আছে ? সবাই কি একবারেই পায় ? সকলকেই চেষ্টা করতে হয়।

ঝুমকি একটু মাথা নেড়ে বলে, আমার কিছু হবে না মা। কিছুই হবে না।

অপর্ণার সন্দেহটা গেল না। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় হয়তো নেই, কিন্তু মায়ের মন বলে কথা! তার মনের মধ্যে একটু চিমটি থেকে গেল। মেয়েটা তাকে বন্ধু বলে ভাবে না, হয়তো বিশ্বাসও করে না, হয়তো ভাবে মা বুঝবে না। কিন্তু বললে অপর্ণা হাঁক ছেড়ে বাঁচত।

অনু ফিরল বিকেলের মুখে। এ মেয়েটা ঝুমকির মতো নয়। খুব হাসি-খুশি আর ইয়ারবাজ হচ্ছে দিনকে দিন। চেহারাটা ভরস্কা এখনই যৌবন ডাক দিয়েছে যেন। অনুর খুবই সুন্দরী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা।

বই-খাতা ফেলে এসেই অপর্ণাকে জড়িয়ে ধরল, হাই মাঝি, হোয়াটস দি নিউজ ?

অপর্ণা তার মাথায় হাত দিয়ে বলে, রোজ কি আর নিউজ থাকে ? আমাদের আবার নিউজ কিসের ?

হোয়াট অ্যাবাইট দি হাউস ?

হবে, তোমার বাবা আবার নতুন করে প্র্যান করতে দিয়েছে।

তুমি এক নম্বরের মাইজার। আগের প্র্যানটা কত বেটার ছিল। কত বড় আর কী সুন্দর ব্যাপারটা হত বলা তো!

আর টাকাটা আসত কোথেকে? তোর স্বপ্নের দিত?

ইউ আর ইমপসিবল। আমার বাবা কি বেকার? বাবা ঠিক পারত।

তোদের বুদ্ধি নিয়ে চললে সংসার একদিন ভেসে যাবে। আমরা যেমন, আমাদের বাড়িও ঠিক তেমন হবে।

মজা থাকবে না মা।

খুব থাকবে। মজা তো জিনিসে থাকে না, থাকে মনে।

আমাকে সেপারেট রুম দেবে তো?

দেখব।

প্র্যান হয়ে গেলে আর কি করে দেখবে?

দেখব নয়, দেখেছি। তোমাদের আলাদা আলাদা ঘরই হবে।

দ্যাটস্ মাই মাথি। বলে অনু তাকে একটু আদর করল।

এই মেয়েকে নিয়ে চিন্তা আছে অপর্ণার। বড় ইংরিজিয়ানা শিখছে। ট্যাগ স্কুলে পড়ে বলে নয়। সে তো বুবকাও পড়ে। ওর মধ্যে একটু বিলিতি নকলের রোম আছে। একটু ছেলে-ঘেমা। ওর অনেক বয়ফ্রেন্ড। মেয়েটার একটু ডোন্ট কেয়ার ভাবও আছে। তবে পড়াশুনায় অনু বেশ ভাল।

স্কুলের পোশাক না ছেড়েই অনু টেলিফোনের সামনে বসে গেল। রোজ গাদা গাদা ফোন করে। কাজের কথা হয় কিনা কে জানে, বন্ধুদের সঙ্গে বিস্তর হা-হা হি-হি হয়।

এই, না খেয়েই যে বড় টেলিফোন করতে বসলি?

খিদে নেই মা। আজ ফেট ছিল। স্কুলে খাইয়েছে।

টেলিফোনের বিল কত আসছে জানিস?

উঃ, তুমি না দারুণ মাইজার।

মোটাই মাইজার নই। ফ্রি কল-এর ওপরে আগের বারে অন্তত একশো কল হয়েছে, তা জানিস?

তিনটে ফোর করব মা। মাত্র তিনটে।

কাকে করবি?

ফ্রেন্ডদের।

তাদের কাছ থেকেই তো এলি এইমাত্র।

একটু দাও না মা। কত কথা থাকে জানো না তো। এগাফ্রী একটা দারুণ স্টোরি বলছিল। কিন্তু শেষ হওয়ার আগেই ওর স্টপ এসে গেল যে।

অপর্ণা চোখ কপালে তুলে বলে, এখন ফোনে স্টোরি শুনবি?

একটা করি না মা, মাত্র একটা।

না। এখন নয়। ও মেয়েটাও বাড়িতে গিয়ে এখন একটু হাফ ছাড়ছে। ওকে একটু সময় দাও। সন্দের পর করিস।

উঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারি না।

এক একদিন অপর্ণা টের পায়, মাঝরাতেও অনু কাকে যেন টেলিফোন করে। বন্ধুদেরই করে কি? নাকি—? সেসব কথা এখনই ভাবতে চায় না অপর্ণা। অনু এখনও ছেলেমানুষ। তবে আজকালকার মেয়ে, তাদের সম্পর্কে কিছু ধারণা করে রেখে লাভ নেই। তার কাছে ছেলেমানুষ, লোভী যুবকদের কাছে তো তা নয়। তাদের কাছে লোভনীয় সামগ্রী।

বুবকা আসে সবার পরে। স্কুলে আজকাল টিউটোরিয়াল ক্লাস হচ্ছে। তার পরেও ক্রিকেট প্র্যাকটিস থাকে প্রায়ই।

বুবকা এলে বুকটা ভরে যায় অপর্ণার। ভিতরে ভিতরে একটু পক্ষপাত তার হয়তো আছে। এ জান্না সেটা কাটবে না। ছেলের জন্য একটা বাড়তি তেস্তা তার থাকেই। একটু চিন্তাও। বুবকা বড্ড ভাল ছেলে। তার মধ্যে কোনও কমপ্লেক্স নেই। একটু বেশী সাদা আর সরল। উনিশে পা দিয়েছে, কিন্তু এখনও শিশুর মতো। কিন্তু এ সমাজে শিশুদেরই বিপদ বেশী। কে কোথায় ভুলিয়ে ভুলিয়ে ডুল পথে নিয়ে যাবে।

বুবকা সম্পর্কে একটু দুঃখের বোধও আছে অপর্ণার। বুবকা মাকে ভালবাসে খুব, কিন্তু বাপকে একটু বেশী। খুব শিশুকাল থেকেই ছেলেটা বাপ-ঝোকা, কি করে যে হল কে জানে। বুবকা তার বাবাকে যত ভালবাসে, যত বিশ্বাস করে, বাপের ওপর যত নির্ভর করে, তত আর কাউকে নয়, কারও ওপর নয়।

মা! বলে এক গাল হাসল বুবকা।

ইস ঘেমেছিস কেন? শীতে কেউ ঘামে?

আমার যে ফ্যাট আছে।

ফ্যাট! কে আবার ওকথা বলল?

তুমি খাইয়ে খাইয়ে রোজ আমার ফ্যাট বাড়িয়ে দিচ্ছে।

বলিস কি রে? কোথায় আবার ফ্যাট?

আছে মা। রোজ এত এত খাচ্ছি, সেগুলো যাচ্ছে কোথায়?

মোটাই তোর ফ্যাট নেই।

স্কুলে আমাকে আজকাল কেউ কেউ ফ্যাটসো বলে ডাকে।

তারা অন্ধ।

বুঝা নিঃশব্দে হাসল, তারপর বলল, কী টিফিন খাওয়াবে বেলো তো! আই অ্যাম হাংরি।

হাত-মুখ ধুয়ে আয়। নুডলস্ করে রেখেছি, চিংড়ি দিয়ে।

দ্যাটস্ ফাইন।

সঙ্গে অনেকটা গড়িয়ে মণীশ ফেরে। মুখখানা গম্ভীর। ছেলেমেয়েরা যে যার ঘরে পড়ছে। একা অপর্ণাই রিসিট করে তাকে।

গম্ভীর কেন গো?

গম্ভীর! না তো!

অপর্ণার আবার চোখে জল আসতে চায়। সে তো মণীশকে দুহাতে আগলে রেখেছে। তবু কোথায় যে ব্যবধান রচিত হয়ে যায়। সে কিছু করতে পারে না।

॥ ৬০ ॥

নদীর ধারে বাস করতে হোমাস্‌র কি নেশা ধরে গেল? গত শুক্রবার এসেছে। কলকাতায় বিস্তর বকেয়া কাজ পড়ে থাকা সত্ত্বেও আজ আর এক শুক্রবার অবধি রয়ে গেছে এখানে। কোনও খবরও দেয়নি কোথাও। না বাড়িতে, না অফিসে, না রশিকে। দায়হীন জীবন কি এরকমই হয়? গত সাত দিন সে নৌকোয় নৌকোয়, হেঁটে হেঁটে নানা গায়ে ঘুরেছে, বাঁকা মিঞার সঙ্গে বাঘের জঙ্গল অবধি। দাড়ি কামায়নি, শহুরে পোশাক পারেনি। ধুতি আর শার্ট। তাও ময়লা হয়েছে যথেষ্ট।

বাঁকা মিঞা না বলে পারল না, বাবু, কাণ্ডটা কী? এসব হচ্ছেটা কি? আপনি যে আর বাড়িমুখো হচ্ছেন না!

একটু হেসে হোমাস্‌র বলে, কী হবে বাড়িমুখো হয়ে? কী আছে বলো তো সেখানে!

এখানেই বা কোন মধুটা পাচ্ছেন আপনি? এখানে কী আছে?

এখানে আর যাই হোক, দায় তো নেই। এটা করতে হবে, সেটা করতে হবে বলে তো আর কেউ শাসাচ্ছে না।

সেদিন যে লোকটা এসেছিল কী বলে গেল আপনাকে?

চয়ন! সে তো চারুদিদির গুণ্ডচর। ছেলোটো ভাল। জানতে এসেছিল।

বাঁকা মিঞা মাথা নেড়ে বলে, কিছু একটা পাকিয়ে তুলেছেন বলে মনে হচ্ছে। একটু খোলসা হবেন কি?

হোমাস্‌র চুপ করে থাকে। তারপর বলে, খোলসা হতে বলছো? কিন্তু নিজেই তো জানি না তোমাকে কী বলব!

মাঝে মাঝে এমন এক একটা সংকটের সময় আসে যখন মানুষ সত্যিই বুঝতে পারে না, সে কী চায়। যেটা চায় না, সেটাই হয়তো চায়, যেটা চায় সেটা হয়তো তার সত্যিই প্রয়োজন নেই। এরকম সব সংকটের মুহূর্তে একজন প্রশ্নটারের অভাব বড় বেশী বোধ করে হোমাস্‌র। কে বুঝিয়ে দেবে, কে বলে দেবে?

বাঁধ ধরে সকালে অনেক দূর হাঁটে হোমাস্‌র। সূর্যোদয় দেখে। মাঠঘাট, নদী নিয়ে বিশাল বিস্তার জেগে ওঠে চোখের সামনে। মনে হয়, কোনও পিছুটান আর নেই। নোঙর ছেড়ে সে এখন অনির্দিষ্ট বার দরিয়ায়। যেন সে আর চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট নয়, যেন তাকে আর পয়সা রোজগার করতে হবে না, আর বিষয়-চিন্তা করতে হবে না, যেন তার কোনও দায়ভারই নেই পৃথিবীতে।

কিন্তু তিষ্ঠাতে দেয় না বাঁকা মিঞা। প্রায়ই এসে তাড়া দেয়, একবার কলকাতা ঘুরে আসেন গিয়ে। কাজকর্ম যে সব রসাতলে যাবে।

আমাকে চাষবাস শেখাবে বাঁকা?

সে সব হবে'খন। শব্দের শেখা শিখতে বেশী সময় লাগবে না। কিন্তু আপনার যা বিদ্যে তা তো এ কাজের জন্য নয়, সবাই চাষ করলে দুনিয়াটা চলবে কি করে?

দিন দুয়েক আগে সে রশিকে একটা চিঠি দিয়েছে। তাতে লিখেছে, নিজের সঙ্গে কিছু বোঝাপড়া আছে। তাই ক'দিনের ছুটি নিয়েছে। তুমি কিছু মনে কোরো না। এই ছুটিটার বড় দরকার ছিল আমার। বোধ হয় মানসিক ক্লান্তিই হবে। আমার ঠিকানা চারুদি জানে। সুতরাং নিরুদ্দেশ হইনি। তুমি বোধ হয় দিল্লি গেছ। সেরকমই তখনেছলাম তোমার মুখে। এসে এ চিঠি পাবে। পাওয়ার পর একটু অপেক্ষা করো। আমি গিয়ে বুঝিয়ে বলব। এমনই কপাল, বাংলায় শুঁছিয়ে একটু চিঠিও লিখতে পারি না। লেখার দোষে ভুল বুঝো না।

চিঠিটা পৌছে থাকবে। নাও পৌছোতে পারে। চিঠিটা দেওয়া উচিত হল কিনা তা বুঝতে পারে না হোমাস্‌র। উচিত হল কি? এই অজ্ঞাতবাসের জবাবদিহিই বা সে কেন করল?

গত চার দিন বাঁকা মিঞার ঘাড়ে আর থাকে না হোমাস্‌র। সে আজকাল রান্না করছে। প্রথম প্রথম পুড়ে বা গলে যেত তরকারি বা ভাত। আজকাল মোটামুটি হয়। তবে এত খারাপ রান্না জীবনে খায়নি হোমাস্‌র। খিদের মুখে খাওয়া যায়, এই মাত্র।

বাঁকা মিঞা যথেষ্ট আপত্তি তুলে বলেছে, আমি যতদিন আছি ততদিন রাখবেন কেন? আমি মরলে না হয়—

হোমাস্‌র বলে, না বাঁকা, তোমার ঘাড়ে বসে খেলে আমার এই অজ্ঞাতবাসটাই অর্থহীন হয়ে যাবে। কোনও মানে থাকবে না। নিজের ওপর নির্ভর না করলে মজাও থাকে না।

সাত দিনে সে বুঝতে পারছে, ব্যাপারটা একটু বোরিং। সাতটা দিন কাটছে খুব টিমে তেতালে। সে হিসেব করে দেখেছে এখানে এক ঘণ্টা কাটে কলকাতার আড়াই ঘণ্টার মাপে। এখানে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তে অনেক বেশী সময় লেগে যায়। গত সাত দিনে এখানে সে যত হেঁটেছে, গত দশ বছরেও সে এত হাঁটেনি। হাঁটা জিনিসটাও তার কাছে ক্লাস্তিকর। কারণ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে পথ যেন ফুরায় না।

এসব না ধরলে তার কিছু খারাপ লাগছে না। গায়ের অনেক মানুষজনের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে। দু-চারজন ডেকে নিয়ে চা-টা খাইয়েছে তাদের বাড়িতে। কিন্তু এটাও ঠিক জীবন নয়। অনেক ফাঁক, অনেক ফোকর।

শীত এসেছে। এখনে জাঁকিয়ে শীত পড়ে গেছে। নদীর ধারে তার আড়ালহীন ঘরখানা সারা রাত হিমেল হওয়ার ঝাপটা খায়। এত শীত করে ভোরের দিকে যে ঘুম ভেঙে সে উঠে বসে থাকে। অন্ধকার রাতে বাতাসের ছ-ছ বিরহের শব্দে এসে মেশে নদীর অবিরল ঢেউ ভাঙার ছলাৎছল। শেষ যামের শেয়াল ডাক দিয়ে যায়। শেষ রাতে সে মাঝে মাঝে বাইরে এসে দাঁড়ায়। কখনও বড্ড কুয়াশায় সব আবছা হয়ে থাকে। কখনও পাতলা কুয়াশার ভিতর দিয়ে জ্যোৎস্নারাত্তে এক অপার্থিব প্রেক্ষাপট দেখে সে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকে।

না, সে কোনও বোঝাপড়াই করে উঠতে পারেনি নিজের সঙ্গে। সে নিজের মনকে বুঝতে পারছে না। সে নিজেকে চিনে উঠতে পারছে না। নদী বা প্রকৃতি তাকে কোনও পথের সন্ধান দিল না। শুধু মুক্ত বায়ু তার ময়লা ফুসফুস পরিষ্কার করে দিল, একটু নেশা ধরিয়ে দিল।

বাঁকা, ভাবছি রোববারে কলকাতায় ফিরে যাবো।

যাবেন! তাই যান। এ বড় বাড়িবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। খবরও তো দিয়ে আসেননি।

কিন্তু আমি আবার শিগগিরই এসে কিছুদিন থাকব।

থাকবেন। তবে ওদিকটা সামাল দিয়ে আসবেন।

বিষয়ী বাঁকা তার সমস্যা বোঝে না। কিন্তু বাঁকা যা বলে তা বাস্তববাদীর কথাই। বাঁকা তার এই একাকী বাস করাটা পছন্দ করছে না। কিছু একটা সন্দেহ করছে। সেটা অমূলকও নয়।

দাড়িতে আমাকে কেমন লাগছে বাঁকা?

বাঁকা হাসল। বলল, কিছু খারাপ লাগছে না। তবে রাখার দরকারটাই বা কী?

দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে হেমাঙ্গ বলল, রেখে দেখাই যাক না। শুনেছি দাড়িতে র‍্যাডিয়েশন আটকায়, চোখ ভাল থাকে। তাছাড়া কেন কে জানে, দাড়ি কামাতে আমার বড্ড আলিসিয়।

কী যে বলেন!

শনিবার দুপুরে রান্না চাপানোর আয়োজন করছিল হেমাঙ্গ। উনুন ধরাতে, বাসন মাজতে, ঘর ঝাঁটপাট দিতে একটা মেয়ে আসে। তার নাম বাসন্তী। বয়স সতেরো-আঠারো এবং ভীষণ ফচকে। মোটেই লজ্জাবতী লতা নয়। বয়সটা বিপজ্জনক, তবে বাঁকা সার্টিফিকেট দিয়েছে, মেয়েটা ভাল। ঢলাঢলি করার মতো মেয়ে নয়।

বাসন্তী একটু বেশী কথা কয় বটে, কিন্তু সময়টা খারাপ কাটো না হেমাঙ্গর। আগে বাবু বলে ডাকত, আজকাল দাদা ডাকে।

ও দাদা, আজ কী রাঁধবে গো? যজ্ঞিবাড়ির আয়োজন দেখছি।

এটা অবশ্য ঠাট্টা। যজ্ঞিবাড়ির আয়োজন কিছুই নেই। কিছু আলু, কয়েকটা মূলো আর একটু বেগুন মাত্র আছে। হেমাঙ্গ একটা ঝোল আর ভাত রাঁধে। কখনও একটু সেন্দ্ব। এই-ই যথেষ্ট।

হেমাঙ্গ মৃদু একটু হেসে বলে, এতেই হবে।

তোমার তো সব তাতেই হয়। ঝোল রাঁধবে তো? এই ঝোলে কী দিতে হয় জানো? ডালের বড়ি।

ওসব লাগবে না।

বলো তো এনে দিই। শব্বর মা বড়ি বিক্রি করে, এই তো কাছেই বাড়ি।

বড়িফড়ির অনেক ঝামেলা।

তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। সারাদিন হাঁ করে গালে হাত দিয়ে কী ভাবছো আর সেন্দ্বপোড়া অখাদ্য সব সোনা মুখ করে খেয়ে নিচ্ছে। আমার হাতে খাবে? বলো তো রেঁধে দিয়ে যাই।

ভোর হাতে খেলে আমার মজাটাই মাটি।

উঃ, খুব তো মজা। কাল না গরম তেলের ছিটে লেগেছিল হাতে!

রাঁধতে গেলে ওরকম হয়।

তোমাকে বলছে! আমরা বুঝি রাঁধি না? তুমি যে কড়াইতে তরকারি ছাড়ার সময় ভয়ে সিটিয়ে থাকো, আর দূর থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দাও। ওতেই তো ছিটে লাগে।

হেমাঙ্গ লজ্জার হাসি হেসে বলে, কি জানিস, গরম তেলে তরকারি দিলেই যে প্রথমে ঝম করে ওঠে বা চিড়বিড় করে ওটাকে আমি একটু ভয় পাই।

বাসন্তী হি-হি করে হাসল। বলল, তাহলেই বোঝো কেমন রাঁধুনী হয়েছো। আমার হাতে যদি ঝাও তো কম তেল কম মশলায় ভাল করে রেঁধে দেবো। আমাদের গরিব ঘরে ওসব শিখতে হয়। তুমি শুষ্কের তেল মশলা নষ্ট করছো রোজ। অত লাগে না।

শিখব রে, আস্তে আস্তে শিখব সব।

তোমার শেখারই বা কি দরকার? বাঁকা চাচা বলে, তুমি নাকি বড্ড বড়লোক। তাহলে শিখবে কেন? রাঁধার তো লোক আছে।

তবু শেখা ভাল। সব শেখা ভাল। তাতে অন্যের ওপর নির্ভর করতে হয় না।

ই বাবা, সব যদি তুমিই করে নাও তবে আমাদের কে আর ঘরের কাজ করতে ডাকবে? শাবো কি তবে?

তুই বরের জন্য রাঁধবি।

আহা, আমাদের আবার বিয়ে, তার আবার বর। তোমাদের মতো নাকি? বর তো আজ আছে, কাল নেই। ছেড়ে চলে যায়।

তোরটা গেছে নাকি ?

একবার নয় গো, এই নিয়ে দুবার হল। আমাদের তো আর তোমাদের মতো বিয়ে রেজিস্টারি হয় না, ডিভোর্স করতে কেউ আদালতও যায় না। ধরলেই হল, ছাড়লেই হল।

সেটা তো ভালই। সম্পর্কে ধরাবাঁধা ব্যাপার নেই।

তোমার এরকম ভাল লাগে বুঝি ? পেটের চিন্তা থাকলে বুঝতে। তার ওপর যদি বাচ্চাকাচ্চা হয়। মরদের তো দায় নেই, যত দায় আমাদের। মরদ তো ছেড়ে দিয়ে আর একটাকে ধরে।

আর মেয়েগুলো বুঝি বরকে ছাড়ে না ?

বাসন্তী হি-হি করে হেসে বলে, তাও ছাড়ে। তবে কম।

তোর বয়স কত ?

ষ্টেট উল্টে বাসন্তী বলে, কে জানে কত! তবে খুব কম নয়।

সতেরো-আঠেরোর বেশী হবে না।

তাই ধরে নাও, হি-হি।

এই বয়সে দু-দুটো মরদ তোকে ছাড়ল ? হ্যাঁ রে বাসন্তী, তুই যে তাজ্জব করলি!

আমার দোষ বুঝি! দেখ গে আমাকে ছেড়ে আর একজনকে নিয়ে ঘর করছে। ফের তাকেও ছাড়বে। সবই আমাদের কপাল।

তা ভাল দেখে একটা মানুষকে বিয়ে করতে পারিস না ?

বিয়ে কি আর খোলামুকুটি ? ইচ্ছে করলেই ভাল পাব কোথায় ? কপালে যা জোটে। আমাদের ওরকমই সব হয়।

এ তো অরাজকতা রে!

তা যা বলো। তুমিই তো এক্ষুনি প্রশংসা করছিলে। বললে তো যে, ব্যাপারটা বেশ, ধরাবাঁধা থাকে না কেউ।

হেমাঙ্গ একটু হাসল, একদিক দিয়ে তো ভালই। কিন্তু সমাজবন্ধন বলে একটা কথা আছে, সেটা তুই বুঝবি না। তবে সমাজটাকে একটু ঝুটে বেঁধে না রাখলে মুশকিল। এরকম ভেঙ্গে বেড়ালে সমাজটাইতো গড়ে ওঠে না। পরিবার একটা মস্ত বন্ধু। সমাজের নিউক্লিয়াস।

বড্ড শক্ত শক্ত কথা বলো তুমি। হ্যাঁ দাদা, আজ মশলাটা কী হবে বল তো! জিরে হলুদ বেটে দিই ?

দে। আমার একটা হলেই হল।

শোনো, জিড়ে ফোড়ন দিও, একটা তেজপাতা দিও তার সঙ্গে। তুমি মাছ-টাছ খাও না ?

ক'দিন খাচ্ছি না।

কেন খাচ্ছো না ? ঝামেলার ভয়ে ? আমি কেটেকটে দিয়ে যাবোখন।

হেমাঙ্গ একটু হান হেসে বলে, আসলে, আমি মাছ রাখলে কেমন একটা আঁশটে গন্ধ থেকে যায়। খেতে পারি না।

হি-হি করে খুব হাসে বাসন্তী। বলে, সাতলাও না ?

সবই করি। তবু হয় না।

হি-হি। তুমি কিছু পারো না। শুধু লেখাপড়া আর বসে বসে ভাবা।

এরকমই ভাল। বেশী হাসামা করতে নেই। যত সহজ সরল থাকা যায়।

আমি মাছ রেঁধে দিয়ে যাবো কাল থেকে।

না রে। নিরামিষ তো খারাপ লাগছে না। ভাবছি এবার থেকে এখানে এলে নিরামিষই খাবো।

তোমার যে কী বুদ্ধি! এখানে তো একটা জিনিসই ভাল। মাছ। এত টাটকা মাছ কি কলকাতায় পাবে ? নগেনকে বলে দিলে সে একেবারে জ্যান্ত মাছ ঘরে পৌছে দিয়ে যাবে। কানকো উল্টে দেখার দরকার নেই। দাপানো মাছ।

হোক গে। আমার মাছ ভাল লাগছে না।

ধনেপাতা খাও ?

খাই। কেন ?

আমাদের উঠানে হয়েছে। কাল নিয়ে আসবো। ঝোলে একটু দিও। স্বাদ হবে।

আচ্ছা।

এইভাবেই সম্পর্ক রচিত হয় বুঝি। কোথায় ছিল সে, কোথায় বাসন্তী বা বাঁকা মিঞা বা এ গায়ের আর সবাই। কত তফাত তাদের জীবনযাত্রায়। এ গায়ে এই অজ্ঞাতবাস করতে এসেই না চেনা হল! এটা কি কম! মানুষের যা আত্ম ভাঙে জীবৎকালে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের প্রত্যেককে একবার হ্যালো বলে যাওয়ারও সময় নেই। কত দূর দূরান্তে শহরে গায়ে পাহাড়ে জঙ্গলে ছড়িয়ে রয়েছে মানুষ। এত মানুষের কত জনকে চেনে হেমাঙ্গ ? এই চেনাজানা হচ্ছে, পরিচয় বিস্তারলাভ করছে, এটাই হেমাঙ্গর মস্ত প্রাণ্ডি বলে মনে হয়।

উঠান ঝাড় দিতে দিতে হঠাৎ বাসন্তী চৈচাল, উঃ মা গো!

সাপে কামড়েছে ভেবে ভয় খেয়ে হেমাঙ্গ ঘর থেকে তার কোম্পানি ট্যান্ডারের বইখানা হাতে নিয়েই দৌড়ে বেরিয়ে এল, কী হল রে ? কী কামড়েছে ?

ওমা, কী সুন্দর মতো একটা মেয়ে ঘাটে নেমেছে দেখ ? এ হয় তোমার কাছে এসেছে, নয়তো ফিল্ম স্টার। শুটিং করতে এসেছে। সঙ্গে লোক আছে। দেখবে এসো না!

হেমাঙ্গর বুকটা ধক করে উঠল।

এক সেকেন্ড বাদেই বাসন্তী আর একটা আর্ডনাদ করল, ওমা গো, আর একটা সুন্দরমতো মেয়ে যে গো! কী শাড়ি! ওঃ, মম্বুরের মতো দেখাচ্ছে দুজনকে।

হোমস্ট্র উঠানে নামল এবং দেখল। চারুদি, রশ্মি, চয়ন। আর কে আছে দেখল না হোমস্ট্র। হঠাৎ তার এত লজ্জা করতে লাগল যে, পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হল।

বাসন্তী সম্মোহিতের মতো চেয়ে থেকে বলে, ও দাদা, এসব কি তোমার লোক? নাকি শুটিং?

হোমস্ট্র আস্তে করে বলে, আমারই লোক। তুই নগেনের কাছে যা। মাছ নিয়ে আস।

তোমার লোক! বলে খুশিতে হি-হি করে হাসল বাসন্তী, কী মজা বলে তো!

তোমার কথা মিথ্যাও নয়। সামনের জন আমার এক দিদি। একসময়ে ফিল্ম স্টার ছিল।

চোখ গোল করে বাসন্তী বলে, সত্যি? যাবো? গিয়ে নিয়ে আসবো ওদের?

আনতে হবে না। নিজেরাই চিনে আসবে। ওরা আমাকে খুঁজতেই এসেছে।

পিছনের মেয়েটা কে বলে তো?

ও আর একজন। বলে হোমস্ট্র অপ্রতুত ভাবে চুপ করে গেল।

হি-হি করে বাসন্তী হাসল।

হাসছিস কেন?

ও তোমার কে হয় বলব?

বলতে হবে না। নগেনের কাছে যা।

যাচ্ছি। আসুক না, একটু দেখে যাই। আর, মাছটা কিন্তু আমি রাখব।

রাখিস। আজ সবই তোকেই রাখতে হবে বোধ হয়।

সত্যি?

আমার রান্না আমি ছাড়া আর কেউ খেতে পারবে বলে মনে হয় না।

তুমি যে বড় দাঁড়িয়ে আছে? ফটক পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াও। ওঁরা তোমাকে দেখতে পেলে তো ইদিকে আসবে।

তুমি যেন বাপু কেমনধারা!

বাসন্তীর দিকে চেয়ে হঠাৎ মনে মনে একটু প্রমাদ শুনল হোমস্ট্র। টগবগে সপ্তদশী গৈয়ো যুবতীটিকে তার বাড়িতে দেখে ওদের কিছু সন্দেহ হবে না তো! বিশেষ করে চারুদিদি একটু সন্দেহবাতিকর। তার একবার ইচ্ছে হল, বাসন্তীকে গা-ঢাকা দিতে বলে। তারপর ভাবল, থাকগে, যা হওয়ার হবে।

আচর্যের বিষয়, ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এল বাঁকা মিঞা। মুখে একটু পাজি হাসি লেগে আছে। হঠাৎ এ সময়ে সে কেন ঘাটে হাজির ছিল, তা বুঝল না হোমস্ট্র। কিন্তু সন্দেহ হতে লাগল, এ ব্যাপারে বাঁকা মিঞার কিছু যোগসাজস থাকতেও পারে।

আগড় ঠেলে যখন উঠানে ঢুকছিল ওরা তখন হোমস্ট্র একটু আড়ালে সরে ছিল ইচ্ছে করেই। চট করে মুখোমুখি হতে বড্ড সংকোচ হচ্ছে। বুকটা টিপটিপ করছে বড়। দরজার আড়াল থেকেই দেখতে পেল, শুধু চারুশীলা, চয়ন, রশ্মিই নয়, পিছনে আরও দুজন। চারুশীলার বর সূত্র আর... আচর্যের বিষয় আর একজন হল ঝুমকি।

চারুশীলা উঠানে পা দেওয়ার আগে থেকেই বকবক করছিল, এই নাকি হাইড আউট বাঁকা মিঞা? এ তো ভীষণ বিচ্ছিরি আরোঞ্জমেন্ট! ও বাঁকা, ভূতটা এখানে থাকে কি করে? ও যে বরাবর ভীষণ শৌখিন।

বাঁকা হাসি-হাসি মুখ করে বলে, সেটাই তো বুঝে উঠতে পারি না। কেন যে আছেন পড়ে এখানে। জমি জায়গাও কিনতে চাইছেন। ঘোরতর পাগলামি।

কী যে মুশকিলে পড়েছি ওকে নিয়ে! এরকম বিচ্ছিরি জায়গায় লোকে থাকে?

সূত্র একটু পিছনে ছিল। সে মৃদুভাষী। কখনও অন্যের ওপর নিজের মত চাপানোর চেষ্টা করে না। কিন্তু এখন হঠাৎ অনুরু স্বরে সে বলে উঠলো, না চারু, জায়গাটা খারাপ নয় তো।

চারু স্বামীর দিকে এক ঝলক চেয়ে বলল, ভাল বলতে তো সিনিক বিউটি! সেটা তো বড় কথা নয়। আর কী আছে এখানে বলে! কিন্তু হাঁদা গঙ্গারামটা কোথায় গেল?

ধারেকাছেই আছেন। যাবেন আর কোথায়? এখানে যাওয়ার জায়গাটাই বা কই? বাঁকা মিঞা হেসে হেসে বলে।

চারু আচমকাই বাসন্তীকে দেখে থমকে যায়, ওমা! এ মেয়েটা কে বাঁকা?

এ হল বাসন্তী। খুব ভাল মেয়ে, দুঃখী মেয়ে। ঘরের কাজটাজ করে দিয়ে যায়।

বাসন্তী হঠাৎ গিয়ে টিপ করে একটা প্রণাম করে ফেলল চারুশীলাকে। তারপর পাইকারি হারে সবাইকে। সুন্দরী মেয়েদের দেখে তার চোখে পলক পড়ছে না। মুখ ফেটে পড়ছে খুশিতে।

যতখানি ক্যাজুয়াল হওয়া সম্ভব ততখানি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দরজা দিয়ে খুব ধীরে নিজেকে প্রকাশ করল হোমস্ট্র। খুব বিশ্বাসের সঙ্গে বলল, আরে তোরা!

এই অলম্বুশ! বাঃ বাঃ চেহারার কী ছিরি হয়েছে।

হোমস্ট্র অপ্রতিভ একটু হাসল।

চারুশীলা বেশ চোঁচিয়েই বলল, 'রশ্মি, দেখে নাও, এর গলায় মালা দিতে তোমার ইচ্ছে হবে তো!

রশ্মি একটু পিছনে। তার মুখে হাসি নেই, কিন্তু যেন একটা হাসির আভাস রয়েছে। এই সেটআপকে সে হয়তো অপছন্দ করছে না। চারদিকে চেয়ে দেখছিল। সবির শেষে তাকাল তার দিকে।

এসো রশ্মি। এসো, আসুন, আপনারা।

চারু বলল, থাক আর আহ্বান করতে হবে না। আমরা আসবো বলেই এসছি।

ঘরে ঢুক চারদিকটা খুব ক্রিটিক্যাল চোখে দেখছিল চারুশীলা। বলল, তোর টয়লেট নেই? না থাকলে তো সর্বনাশ! হোমস্ট্র হাসে, আছে। ভয় নেই।

তাড়াতাড়ি সে বসবার জায়গা তৈরি করছিল। জায়গা অবশ্য বিশেষ নেই। বিছানা, একটা চেয়ার, গোটা দুই মোড়া সম্বল।

বাঁকা মিঞা বলল, থাক থাক। কষ্ট করতে হবে না। ফজল চেয়ার নিয়ে এসে গেছে। আর খাবার বন্দোবস্তও আজ আমিই করেছি। আপনি ব্যস্ত হবেন না।

বাস্তবিকই ফজল আর তার কয়েক বন্ধু গুটিকয়েক চেয়ার নিয়ে এসে ফেলল। একটা ফেন্ডিং টেবিলও এনে রাখল বালদায়। বোধ হয় খাওয়ার সময় লাগবে।

হেমান্ন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বাঁকা, এসব তুমিই তাহলে করেছে!

বাঁকা হাসল, আপনার ভাবগতিক ভাল বুঝছিলাম না, তাই।

সবাই বলল।

মুখোমুখি একা হেমান্ন। যেন সামনে জুরিরা। সে আসামীর কাঠগড়ায়।

॥ ৬১ ॥

তাকে পড়াতে পড়াতে সব মনে পড়ে যাচ্ছে। কত কী ভুলে গিয়েছিলাম।

বিষ্ণুপদ খুব আত্মদেবের সঙ্গে হাসল। সামনে মাদুরে বসা পটল, তার পাশে শান্ত বোবা গোপাল।

পটল খাতা খুলে দেখছিল। গায়ের জ্বলে পরীক্ষা মোটে দুটো। হাফ ইয়ার্লি আর অ্যানুয়াল। কলকাতার ভাল ভাল ইংরিজি স্কুলে নাকি সপ্তাহে সপ্তাহে নানারকম পরীক্ষা হয়। পটলের এখন পরীক্ষার একটা ঝোঁক এসেছে। আজকাল দাদুই তার পরীক্ষা নিচ্ছে, নম্বরও দিচ্ছে। একখানা প্রশ্নের উত্তরে দাদু দিয়েছে দশে ছয়। উরিকবাস! ইংরিজিতে শতকরা ষাট নম্বর তো সে ভাবতেই পারে না।

ও দাদু, তুমি আমাকে বেশি বেশি নম্বর দাওনি তো!

বিষ্ণুপদ হাসল, প্রথম প্রথম তাই দিতুম। যাতে তোর নিজের ওপর ভরসা আসে। এখন বুঝেসুঝেই দিচ্ছি।

কিন্তু এ তো অনেক নম্বর।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, যখন ইকুলে পড়াতাম তখনও অবশ্য আমার নম্বর দেওয়ার হাতটা দরাজই ছিল। হেডমাস্টারমশাই ডেকে বলতেন, বিটুবাবু, নম্বরটা বড় বাড়াবাড়ি রকমের দিচ্ছেন। আমি ভাবতাম কি জানিস! নম্বর তো আর ঘরের গোলার ধান নয়, ক্যাশবাল্লের টাকাও নয়, তা হলে কেপ্পনের মতো দেবো কেন?

ও দাদু, তুমি কি আমাকে ওরকমভাবেই নম্বর দিয়েছো নাকি? আমার সে নম্বর চাই না। জ্যাঠার মতো লেখাপড়ায় ভাল হতে হবে যে।

ওরে না, তোকে ওরকমভাবে নম্বর দিইনি। তোর আজকাল দিবা ভাল হচ্ছে। মাথা খুলছে। বিশ্বাস না হয় ইকুলের মাস্টারমশাইকে দেখাস।

বিষ্ণুপদ খুব হাসতে লাগল। দাদুর ওপর পটলের খুব একটা নির্ভরতা নেই। তবে দাদুকে তার বড় ভাল লাগে। সবসময়ে ঠাণ্ডা, সুস্থির। রাগারাগি, চটোমেচি নেই। এ বাড়িতে দাদু আর ঠাকুমা ছাড়া বাকি সকলেরই মাথা গরম। ঠাকুমার চেয়েও দাদু ঠাণ্ডা। আর দাদু যে ভালই পড়ায় এটা আজকাল পটল বুঝতে পারছে খুব। দাদু পড়ালে মাথায় খুব বসে যায় পড়া।

বিষ্ণুপদ গলাটা নামিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, তুই জ্যাঠার মতো হতে চাস?

খুব চাই দাদু। অনেক লেখাপড়া শিখব, দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াব।

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, খুব ভাল। রোখ থাকা চাই। খুব গৌ ধরে যদি থাকিস তবে পারবি।

পারব দাদু?

মানুষ তো সবই পারে। কত কী কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলছে। মানুষের বুদ্ধির বহর দেখে তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি।

আমাকে জ্যাঠার কথা বলবে দাদু? জ্যাঠার গল্প শুনতে খুব ভাল লাগে।

বিষ্ণুপদ কৌতুকের দৃষ্টিতে নাতির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, সে তো অনেক বলেছি তোকে।

আবার শুনতে ইচ্ছে করে।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, শোনা অবশ্য ভাল। শুনলে ভিতরটা চান্দা হয়। কুম্ভর কষ্টের জীবন ছিল, আমাদের সকলেরই ছিল। কষ্টের ভিতর দিয়েই যা হওয়ার হয়েছে। আমিও তার কথা খুব ভাবি। যত ভাবি তত অবাক হই। কেন জানিস?

কেন দাদু?

তার ধারাটা এ বাড়িতে নেই।

তার মানে কী দাদু?

কুম্ভর যেমনটা হল ঠিক তেমনটা আর কেউ তো হল না। বংশের একটা ধারা তো থাকবে। তাই অবাক হই। তুই যদি কুম্ভর মতো হয়ে উঠিস, তা হলে একখানা কাণ্ডই হয়।

পারব না দাদু?

বললাম যে, মানুষের পারার যেন শেষ নেই। মানুষই তো পারে।

মাঝে মাঝে মনে হয় কি জানো? উরিকবাস, কত বই পড়তে হবে, কত কি শিখতে হবে, কত বুদ্ধি লাগবে, স্মৃতিশক্তি লাগবে, তবে না জ্যাঠার মতো হওয়া যাবে।

খুব গৌ ধরে থাক। কুম্ভরের কামড়ের মতো ধরে থাক।

পার্থিব—৩৩

আমি আজকাল কত মন দিয়ে পড়ছি না দাদু ?

হ্যাঁ। তোর খুব মন হয়েছে পড়ায়।

শুধু বাবা মাঝে মাঝে সব ভুল করে দেয় যে! এমন চোঁচামেচি ঝগড়া করে যে মাথাটা তখন গুলিয়ে যায়।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, তারও রোখ ছিল। দাদাকে খুব ভক্তি করত। সেই ভক্তি থেকেই আবার ফ্যাকড়া বেরোলো যে। তোর বাবা যা করে তাও একটা রাগ থেকে করে। দাদার সঙ্গে পাল্লা টানতে গেল যে! এ তো আর পাঞ্জার লড়াই নয়। তোকেও বলি, রোখ রাখিস, কিন্তু রাগ নয়, পাল্লা টানতে যাস না।

না, রাগ পটলের নেই, সে কারও সঙ্গে পাল্লাও টানতে চায় না। সে কিছু একটা হতে চায়। জ্যাঠা বড় ওপরে উঠে গেছে। অত ওপরে কি উঠতে পারবে সে? নাও যদি পারে, কাছাকাছিও যদি ওঠা যায় তবে তাই ঢের। আজ কোন বেহানবেলা থেকে পড়তে লেগে গেছে সে। ভোরের আলো ফোটেনি তখনও। নিবু নিবু হ্যারিকেন উক্কে বইপত্র নিয়ে বসেছে। একটু একটু আলো ফুটতেই বারান্দায় দাদুর কাছে এসে দাদুর পেতে সেই থেকে পড়া করছে, টান্ন করছে। গোপাল ঘুম থেকে উঠে গুটিগুটি এসে কোন ফাঁকে বসেছে তার পাশটিতে। গোপাল দাদা ছাড়া থাকতেই পারে না।

ও দাদু, গোপালের কি পড়া হবে?

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, কে জানে দাদা। বোবার মুখেও একদিন হয়তো মানুষ কথা ফোটাবে। কানে শুনতে পায় না তো, তাই বোল ফোটে না। কানের ব্যবস্থা হলে কথা ফুটতে কতক্ষণ?

বোবাদের ইচ্ছুক যদি দেওয়া যায়?

সেখানে কী শেখায়?

আমি জানি না।

খোজ নিস।

গোপাল যদি কথা কইতে পারত তা হলে একটা কাণ্ডই হত, না দাদু?

বিষ্ণুপদ একটু হাসল।

পটল বলল, আমি প্রায় রাতেই স্বপ্ন দেখি, গোপাল হঠাৎ আমাকে দাদা বলে ডেকে উঠল। আচ্ছা স্বপ্ন কি সত্য হয় দাদু?

বিষ্ণুপদ হাসল, সত্য হওয়াই কি ভাল? সব স্বপ্ন সত্য হলে ভারী বিপদ হত। ওই যে কালঘড়ি দেখেছিলাম দু' রাস্তির, তখন থেকে কথটা মনে হয়।

হয় না, না দাদু?

কে জানে ভাই। তবে সব স্বপ্ন যে হয় না তা জানি।

আমি লেখাপড়া করে যখন অনেক টাকা রোজগার করব তখন গোপালকে বিলেতে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাব।

কিসের চিকিৎসা?

বিলেতে তো দাড়া ডাক্তার আছে, তারা হয়তো অপারেশন করে গোপালের মুখে কথা ফুটিয়ে দিতে পারবে।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, পারলে তো খুব ভাল হবে।

গোপাল কিন্তু বোকা নয় দাদু, সব বুঝতে পারে। বুদ্ধিও খুব। শুধু কানে শুনতে পায় না আর কথা কইতে পারে না।

বিষ্ণুপদ মাথা নাড়ল, জানি।

বইখাতা গুছিয়ে দাদুর গুটিয়ে পটল ভাইকে নিয়ে চলে গেল।

বিষ্ণুপদ বারান্দায় বসে রইল। আজ হঠাৎ ছেলেবেলার কথা খুব মনে পড়ছে তার। খুব মনে পড়ছে। কী ছিল ছেলেবেলায়? এই এমনিই ভাঙা ঘরদোর, অনেকটা এরকমই দারিদ্র্য ছিল। ময়মনসিংহ জেলার এক অখ্যাত পাড়াগায়ে বাস ছিল। গাছে গাছে প্রকৃতিদণ্ড ফল ছিল বলে রক্ষা। নইলে উপোসে উপোসে প্রাণ বেরিয়ে যেত। সে-সব জাতের ফল নয়। কামরাঙা, করমচা, ডেউয়া, বেল কিংবা কাঁচা আম বা বরই। আর ছিল লটকা, পানিয়ল, খেতের আখ। কিন্তু দারিদ্র্য ছিল গায়ের ধূলো, ভিতরে ঢুকত না। না, ভিতরে কোনও দারিদ্র্য ছিল না তখন। বড় আনন্দ ছিল। গায়ের জামা খুলে ফেলে পুকুর বা নদীতে অনমনাসে ঝাঁপিয়ে পড়া যেত। গাছ বাইতে, ফুটবল খেলতে তখন কী ভালই লাগত। বাবা ছিল, মা ছিল, দাদু-ঠাকুমা ছিল, পিসি-কাকা-জ্যাঠা ছিল, ভাইবোন ছিল মেলা। কোথায় যে কালের বাতাসে সব উড়ে গেল! চিরুও নেই। এখানে সেখানে আছে কেউ কেউ, এখন আর খোজও রাখে না। যে যার নিজেরটা নিয়ে আছে। সকলে হয়তো নেইও। কে জানে বাবা!

ও বাবা, কী করছেন?

বামাচরণ নাকি? কিছু বলবি?

বামাচরণ বেরোবে বোধহয়। গায়ে হাওয়াই শার্টের ওপর সোয়েটার চাপানো, পরনে পাতলুন। গালে কয়েকদিনের দাড়ি। বিষ্ণুপদ লক্ষ করল।

বামাচরণ কিন্তু-কিন্তু করে বলে ফেলল, ভাগজোখের কিছু হল?

কিসের ভাগজোখ?

জমিজমার একটা বিলিব্যবস্থার কথা হয়েছিল, আপনার মনে নেই?

বিষ্ণুপদ ঝম করে অতীত থেকে বর্তমানের কঠিন মাটিতে এসে পড়ল। বলল, তোরা যা করিস, আমার তো আপত্তি নেই।

কিন্তু হচ্ছে কোথায়? আপনি তো হাত গুটিয়ে বইলেন। গায়ের মাতব্বরদের ডেকে সালিশি বসিয়ে সব বাঁটোয়ারা করে দেওয়ার কথা হয়েছিল যে!

বিষ্ণুপদ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলে, তা হয়েছিল বটে। তা হলে সেরকম কিছু করলেই তো হয়।

করবেন তো আপনি। জমিজমা তো আপনার। আপনি করছেন না, এদিকে রামজীবন তো গাপ করতে লেগে গেছে। আমার ঘরের পিছনের জমিটায় তো দেখছি রামজীবন সর্ষে বুনছে। এরকম অরাজকতা তো চলতে পারে না। জমির কতটা কার, কোনটায় কে চাষ করবে তার একটা বন্দোবস্ত না হলে তো বড়ই কঠিন হচ্ছে।

বিষ্ণুপদ প্রবল অশ্বস্তিতে পড়ে গিয়ে বলে, সবাইকে ডেকে একদিন বসে তোরাই ঠিক করে নে না। আমার মতামত দিয়ে কী হবে? আমার একটু মাথা গোঁজার ঠাই হলেই হয়।

আপনি তো বলেই খালস। কিন্তু মধ্যস্থ কে হবে? মধ্যস্থ একজন না থাকলে তো ফের লাঠালাঠি লেগে যাবে।

কৃষ্ণজীবনকে একটা খবর পাঠা না হয়। সরস্বতী আসুক, বীণাপাণি আসুক।

আপনি কি জমির ভাগ মেয়েদেরও দেবেন নাকি?

বিষ্ণুপদ আতান্তরে পড়ে বলে, আজকাল নাকি কি সব আইন-টাইন হয়েছে। মেয়েদেরও পাওনা হয়।

বামাচরণ রুঢ় গলায় বলে, মোটো তো দেড় দুই বিঘের ওপর আমাদের বসত। তা এতগুলো ভাগ হলে আর থাকবে কী?

তা হলে কী করতে চাস?

মেয়েদের বাদ দিন। বিয়ে দেওয়া হয়েছে, এখন তারা নিজেদের আখের বুঝুক। জমি তিন ভাগ হবে। চাম্বের জমি রামজীবন নিতে পারে, কিন্তু আমাদের ন্যায্য দাম দিয়ে নিতে হবে। যা হয় দু'-চার দিনের মধ্যেই ঠিক করে ফেলুন।

গলা ঝাঁকারি দিয়ে বিষ্ণুপদ বলল, সবাই মানলে আমার আর আপত্তি কিসের?

আপনার জন্যই ব্যাপারটা ঝুলে আছে। সরকারী দলিল তো আপনার হাতে। উদ্যোগ তো আপনাকেই নিতে হবে। চূপ করে বসে থাকলে তো হবে না। আমি দাদাকে চিঠি দিয়েছি। জবাবও এসে গেছে।

বিষ্ণুপদ ফের গলা ঝাঁকারি দিয়ে বলে, কী লিখেছে সে?

আসছে। আজই আসার কথা।

আজই! বলে চোখ রূপালে তোলে বিষ্ণুপদ।

নিজের ভাগ নিয়ে কি করবে, তা আপনাকে জানিয়ে দিয়ে যাবে। যদি ছেড়ে দেয় তো ভালই। জমি বাড়ি দু'ভাগ হবে। রামজীবন পাকা যে ঘরখানা তুলেছে সেটাও বে-আইনি। পঞ্চায়েতের একটা পারমিশন নেওয়া উচিত ছিল। তবে আমি গোলামাল করব না ও নিয়ে। আপনি আর মা ও-ঘরে উঠে যান, আমরা আপনার ঘরের দখল নেবো।

এ ঘরের?

তা ছাড়া আর ঘর কোথায়? আমি যে ঘরে আছি সেটার অবস্থা দেখেছেন? টিন ঝুরঝুর করছে, বেড়া ভাঙা। মেঝেটাও সারানো দরকার। আমি সারাচ্ছি না, তার কারণ ঘর কার দখলে পড়ে তার তো ঠিক নেই।

বিষ্ণুপদ কুণ্ঠিত গলায় বলে, কৃষ্ণ যদি তার ভাগ ছেড়ে দেয় আর মেয়েরা যদি ভাগ না বসায় তা হলে তো আর ঝামেলাই নেই।

হ্যাঁ। সেক্ষেত্রে বাড়ি দু'ভাগ হবে। ভাগ-বাঁটোয়ারা না হলে এ বাড়িতে থাকা কঠিন হচ্ছে। আমার বউকে তো শোওয়ার ঘরেই রান্না করতে হচ্ছে। দেখছেন তো!

তা অবিশ্যি ঠিক।

ঠিক তো বলছেন কিন্তু আমার কথা ভেবেছেন কখনও? আপনার হাবভাব দেখে তো মনে হয় আমি বানের জলে ভেসে এসেছি। ভাগ করে দিলে আমি আর কথা কইতে আসব না। ও ল্যাটা চুকিয়ে ফেলুন।

কৃষ্ণজীবন তা হলে আসুক।

আমি অফিসে বেরোছি। আজ তাড়াতাড়িই ফিরব। ফেরার সময় পঞ্চায়েতের বাঙ্কারামকেও নিয়ে আসব। তার সঙ্গে কথা হয়েছে। দাদার সঙ্গে যা কথা হবে তার একজন সাক্ষী থাকা ভাল। রামজীবনকেও থাকতে বলবেন।

কৃষ্ণজীবন তার ভাগ নেবে না? তাকে তাই লিখেছে?

নিয়ে করবে টা কি? এ বাড়িতে তো সে থাকতে আসবে না!

বিষ্ণুপদ একটু অসহায়ভাবে চারদিকে চাইল। তারপর খুব মিয়োনো গলায় বলল, সে কিন্তু অন্যরকম বলেছিল।

কি রকম?

কৃষ্ণজীবন বলেছিল, সে ফিরে আসবে। চাষবাস করবে। গাছপালা করবে।

তার চিঠি আমার কাছে আছে। সে লিখেছে বাড়ির ভাগ তার চাই না।

দুই হাত উল্টে বিষ্ণুপদ বলল, কি জানি কেন লিখল!

শহরের লোকেরা ওরকম বলে। গায়ে এসে থাকবেই বা কেন? কোন মধু আছে এখানে?

তা তো জানি না। তবে বলেছিল কিন্তু।

সে তো আসছে। কথা কয়ে পরিষ্কার করে নেবেন সব।

তাই হবে বাবা। ভুই গিয়ে তাড়াতাড়ি আয়।

ভাগজোখ মিটিয়ে ফেললে আমিও পাকা বাড়ি তুলব। অফিস থেকে লোন দেবে। কিন্তু জমির দলিল জমা না দিলে হবে না। কত অসুবিধে করে আছি দেখছেন তো!

বামাচরণ নতুন সাইকেল কিনেছে। বেশ বাহারী জিনিস। সেইটে চালিয়ে চলে গেল। তার বউ দরজার আড়াল থেকে সব শুনছিল বোধ হয়। এইবার বেরোলো। হাতে হাঁড়িকুড়ি। পুকুরে যাবে।

উনুন ধরানোর কাঠকুটো কুড়িয়ে আনতে বাগানে গিয়েছিল নয়নতারা। এক বোঝা ডালপালা নিয়ে এসে বারান্দার কোণে ফেলে বলল, ওগো, করছোটা কী?

বিষ্ণুপদ একবার নয়নতারার দিকে চেয়ে দেখল। বলল, কিছু করছি না।

আমার শরীরগতিক ভাল বুঝছি না। বড্ড হাঁফ ধরে যাচ্ছে আজকাল।

হাঁফ ধরছে!

একটুতেই আজকাল হাঁফিয়ে যাচ্ছি। ঘাম হচ্ছে এই শীতেও।

ডাক্তারকে একটা খবর দেবো নাকি?

দুটো দিন দেখি। বয়সের দোষই হবে। বামা কী বলছিল তোমাকে চুঁচিয়ে চুঁচিয়ে?

বাড়ির ভাগ চাইছে? পাকা বাড়ি তুলবে।

তা তুলুক না। কে ঠেকাচ্ছে?

জমির দলিল না হলে নাকি টাকা ধার পাবে না।

ওসব কথায় কান দিও না।

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, কান না দিয়েও উপায় নেই। বামা কৃষ্ণজীবনকে চিঠি দিয়েছিল। কৃষ্ণ নাকি আজই আসছে।

আসছে! বলে নয়নতারা ঝটিতি খাড়া হল, কখন আসবে? খাবে তো এসে! জোগাড়যন্তর করতে হবে যে!

ব্যস্ত হয়ে না। আগে আসুক। সে কাজের মানুষ। কখন ফুরসত পাবে তার ঠিক নেই। তুমি জিরোও। বরং একটা পান খাও বসে।

পান খাচ্ছি, কিন্তু জিরোনোর উপায় নেই। রান্ধার মাজায় ব্যথা। সে আজ আর রান্নাঘরে যেতে পারবে না। আমাকেই করতে হবে সব।

বিষ্ণুপদ একটু হাসল। তারপর বলল, একটা কথা কইব?

কি কথা?

আজ আমাকে তোমার যোগালি করে নাও।

সে আবার কি?

যোগালি বোঝো না? জল তোলে, মশলা করে, এটা-ওটা এগিয়ে দেয়।

যোগালি বুঝি। তা তোমার আবার এ ভীমরতি কেন হল?

তোমার শরীরটা যখন যুতের নেই, করলামই না হয় একটু কাজ।

সে কাজের দরকার নেই। আরও ভুল লাগবে। তার চেয়ে বাজারে যাও বরং কিছু নিয়ে-টিয়ে এসো। রেমো তো কাল রাত থেকে নেই। কেটনগর না কোথায় যেন গেছে।

যাচ্ছি।

একটু মাছ-টাছ এনো। শীতের সবজি। একটু তেলও লাগবে।

বিষ্ণুপদ উঠল।

একসময় বাজার করতে বড় ভালবাসত বিষ্ণুপদ। যথেষ্ট পয়সা ছিল না বটে, কিন্তু বাজারে ঘুরে বেড়ানোরও একটা আনন্দ আছে। ঘুরে ঘুরে দেখত। কিনতে পারত সামান্যই। দরাদরি করা, জিনিস পরখ করা এসবই করতে বেশি। দোকানীদের সঙ্গে আলাপ-সালাপও হত। আজকাল বাজারের নামে গায়ে জ্বর আসে যেন।

বটলয়ায় আগে বাজার বসত সপ্তাহে দু'দিন। আজকাল নিভি রমরমে বাজার। কিন্তু জায়গাটা আর ভাল নেই। গায়ে একখানা জামা চাপিয়ে থলি আর তেলের শিশি নিয়ে বেরিয়ে পড়ার পর বিষ্ণুপদ টের পেল, বাইরের দুনিয়াটা এখন অনেক অচেনা হয়ে গেছে। সর্ব্ব একটা রাস্তার শেষে একটু মাঠ, তারপর আবার মেটে রাস্তা। বরাবর গেলে পাকা রাস্তায় উঠেই বাজার। এটুকু পথ তার তো মুখস্ত। কিন্তু না-বেরোনোর অভ্যাস এমন হয়েছে যে, এটুকু পথকেই মনে হয় যেন তেপান্তর পেরোতে হচ্ছে।

কী নিতে হবে বলে দেয়নি নয়নতারা। বিষ্ণুপদ একটু পালং কিনতে গেল। দর শুনে ভিরমি খেতে হয়। ফুলকপি বাঁধাকপির দরও অবিশ্বাস্য। আজকাল এত দাম দিয়ে নাকি এসব কেনে লোকে? এ তো পয়সা চিবিয়ে খাওয়া।

মাছ কিনতে গিয়ে বিষ্ণুপদ বড় বেচাল হয়ে পড়ল। কী দাম বলছে! সর্ব্বনেশে ব্যাপার!

আনমনা ছিল বড়। একখানা বিশাল বাস এসে বটলয়ায় দাঁড়ানোর পর বেশ কিছু লোক নামল। আজকাল শীতলাতলা-বিস্তৃপুরে লোকের আনাগোনা বেড়েছে। অতি সুলক্ষণ। আনাগোনা মানেই জায়গাটা বর্ধিষ্ণু হচ্ছে। আগে লোকজন এদিকে মড়াতিই না।

সাহেবী পোশাক পরা একটা লোক হঠাৎ বিষ্ণুপদের সামনে দাঁড়াল এসে। বিষ্ণুপদ তটস্থ হয়ে পড়তেই লোকটা বলল, বাবা! আপনি কী করছেন এখানে?

বিষ্ণুপদ একগাল হাসল, কৃষ্ণজীবন! এই এলি?

হ্যাঁ। কী করছেন? বাজার নাকি?

তোর মা পাঠাল।

কৃষ্ণজীবন একটু হাসল। বলল, বাজার করতে হবে না। কলকাতা থেকে আমি এক ঝুড়ি সবজি এনেছি। ওই নামাঙ্কে বাসের মাথা থেকে।

বিষ্ণুপদ ফের হাসল। বলল, ভাল। তা হ্যাঁ রে, তোর যে গায়ে ফিরে আসার কথা ছিল, তুই নাকি আসবি না?

কে বলল বাবা?

বামাচরণকে নাকি চিঠিতে লিখেছিল!

আসব না লিখিনি। বামাচরণ চায় আমি আমার ভাগটা ছেড়ে দিই। আমি রাজি হয়েছি। তা বলে গায়ে ফিরে আসব না কেন? নতুন করে জমি-জায়গা কিনব, চাষবাস করব।

বিষ্ণুপদ সামান্য লজ্জাতুর গলায় বলে, বাপেরটা নিবি না তো!

তা নয় বাবা। ওরা আমাকে চায় না।

তা বটে। কে যে কাকে চায় আর কে যে কাকে চায় না, আজকাল আর বুঝতে পারি না।

বাড়ি চলুন বাবা।

চল। বলে বিষ্ণুপদ হাঁটতে থাকে।

॥ ৬২ ॥

একটা নদী কত কী করতে পারে! পালটে দেয় ভূ-চিত্র, পালটে দেয় জীবনের দর্শন, বদলে দেয় মনের অবস্থা। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে চয়ন যে আদিগন্ত বিস্তারকে দেখছিল তেমনি কলকাতার গলিতে বন্ধ তার আশিশব জীবনে সে দেখেনি। তার রোগক্লিষ্ট, অভাবত্যাগিত জীবনে প্রকৃতির শোভার কোনও স্থানই ছিল না। এক থালা ভাতের শোভা অনেক বেশী প্রয়োজন ছিল তার। একখানা বাড়তি টিউশনি পাওয়াই ছিল জীবনদর্শন। চারুশীলার কল্যাণে এই আঘাটায় এসে বুক ভরে শ্বাস নিয়ে পৃথিবীর মহত্ত্ব উপলব্ধি করে সে বুঝল, কলকাতায় এতকাল ধরে যে জীবন সে যাপন করে এসেছে তা হল এক পণ্ডর জীবন।

হেমাস্বর ঘরে একটা পারিবারিক মিটিং বসেছে। তার সেখানে থাকা উচিত নয় মনে করে সে এক ফাঁকে বেরিয়ে এসেছে। নদীর ধারে আত্মবিশ্রুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যদি রুজিরোজগার, জীবন ধারণের সমস্যা ইত্যাদি না থাকত, যদি মাত্র দুটি ভাতের ব্যবস্থা থাকত দু'বেলা, তাহলে সেও এরকম একটা জায়গায় বাস করতে এসে।

খুব নরম গলায় কে যেন ডাকল, চয়নবাবু!

চয়ন ফিরে তাকিয়ে ঝুমকিকে দেখে তটস্থ হয়ে বলল, আজ্ঞে।

বেরিয়ে এলেন যে!

চয়ন লজ্জিত হয়ে বলে, ওঁদের সব পারিবারিক কথা হচ্ছে, তাই বেরিয়ে এলাম। আমি বাইরের লোক। ঝুমকি ঠোঁটের একটি ভঙ্গিমা করল, বোধহয় তাচ্ছিল্যের। বলল, বাইরের লোক তো আমিও। চারুমাসি জোর করে নিয়ে এল বলে এলাম। ওঁদের কী ব্যাপার বলুন তো! প্রবলেমটা কী?

চয়ন সতর্ক হয়ে নিশ্চয় গলায় বলে, আমি ঠিক জানি না।

ঝুমকির মুখে যথেষ্ট বিরক্তি ফুটে আছে। সে হঠাৎ বলল, আমার কিছু খুব খিদে পেয়েছে। আপনার পায়নি?

চয়ন একটু হাসল। তার কত খিদে পায় এবং খিদে মরে যায়। সে মাথা নেড়ে বলল, আজ্ঞে না।

ঝুমকি খিদে ভুলে হঠাৎ নদীর দিকে, পরপারের দিকে চেয়ে থেকে বলল, কী সুন্দর জায়গা, না?

যে আজ্ঞে। খুবই সুন্দর।

হেমাবাবু বেশ জায়গাটি খুঁজ বের করেছেন। কিন্তু এখানে খুব শীত।

ঝুমকি তার টমেটো রঙের মাফলারটা গলায় ফের ভাল করে পেঁচিয়ে নিল। বলল, আমার খুব ব্রংকাইটিসের ধাত। জোলো বাতাসকে ভীষণ ভয় করে।

চয়ন ব্যস্ত হয়ে বলে, আপনি তাহলে ঘরে গিয়ে বসুন না!

ঝুমকি ঠোঁটটা তেমনি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে উশ্টে বলল, ঘরে যা সব ন্যাকামি চলছে। অসহ্য, দুজনেরই যদি দুজনকে পছন্দ তো বিয়ে করে ফেললেই হয়।

চয়ন সতর্কভাবেই চুপ করে রইল।

উঁচু পাড় থেকে ঘাটে নামবার পথটা খুবই ভাঙাচোরা। অনবরত লোকজন উঠে আসছে নৌকো বা ভটভটি থেকে। আবার যাচ্ছেও।

চুপচাপ কিছুক্ষণ লোক চলাচল দেখার পর ঝুমকি হঠাৎ স্বগতোক্তির মতো বলল, অথচ দুজনেই ম্যাচিওরড শিক্ষিত মানুষ। কিন্তু বিহেত করছে বান্ধা ছেলেমেয়েদের মতো।

চয়ন এ কথাটারও জবাব দেওয়া সমীচীন মনে করল না।

চয়নবাবু, আপনার খিদে পেলে খেয়ে নিতে পারেন কিছু। দেখলাম, মুড়ি, শশা, নারকোল, চানাচুর সব এসেছে। বাইরের টেবিলে সব সাজানো।

চয়ন বলল, আপনি খাবেন না? খিদে পেয়েছে বললেন তো।

ঝুমকি একটু রাগের সঙ্গে বলল, কেউ না খেলে খাওয়া যায়? ওরা কথায় এত ব্যস্ত যে কেউ খাচ্ছে না। তাছাড়া মুড়ি চিবাতে আমার একদম ভাল লাগে না।

চয়ন একটু ব্যস্ত হয়ে বলে, তাহলে কি হবে?

কিছু হবে না। ভাবছি ব্রেকফাস্টটা আজ স্কিপ করব। আচ্ছা, আপনি সাতার জানেন?

আজ্ঞে না।

আমিও জানি না। নৌকো না ভটভটি কি যেন ওটাতে উঠতে খুব ভয় করছিল। কিন্তু বেশ মজাও আছে, না?

আজ্ঞে তা আছে।

ঝুমকি একটু হেসে বলল, আচ্ছা আপনি আমাকে অত আপনি-আজ্ঞে করছেন কেন বলুন তো! আমি কি আপনার খুব সম্মানের পাত্রে?

চয়ন লজ্জা পেল। আপনি-আজ্ঞে সে করে অভ্যাসবশে। পৃথিবীর সব মানুষকেই সে অল্প-বিস্তর সমীহ করে। কেন যে করে তা সে ঠিকমতো ব্যাখ্যা করতে পারবে না। মাথা নিচু করে সে বলল, আমার ওটা একটা অভ্যাস।

ঝুমকি বলল, আচ্ছা নৌকো করে একটু বেড়িয়ে আসা যায় না? যাবেন?

চয়ন আবার তটস্থ হয়, বেড়াবেন ?

চলুন না! ততক্ষণে ঘরের নাটক শেষ হোক।

একটু দোনোমোনো করল চয়ন। ঝুমকিকে সে সামান্যই চেনে। এই শ্রীময়ী মেয়েটি চারুশীলার খুবই প্রিয়পাত্রী। ওদের বাড়িতে প্রায়ই আসে। শান্ত স্বভাবের রিজার্ভ মেয়ে। এ যখন বেড়াতে চাইছে তখন তারও সঙ্গ দেওয়া উচিত বলেই তার মনে হল।

চয়ন বলল, একবার বলে এলে ভাল হয়। ওরা যদি খোঁজেন ?

আমি বাঁকা মিঞাকে বলে এসেছি। ভয় নেই, খুঁজবে না। চারুমাসি এখন নায়ক-নায়িকাদের নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। চলুন তো, অত ভাবতে হবে না।

চয়ন ফের লজ্জা পেল। তার অভ্যন্তরে এক জন্ম-কৃতদাস বাস করে। যে যা বলে, সে তৎক্ষণাৎ তাতে সায় বা সম্মতি দেয়। যে যা হুকুম করে, সে প্রায়শই তা তামিল করতে রাজি থাকে। এই বশংবদ স্বভাবকে সে কিছুতেই টিট করতে পারেনি।

ঘাটে কয়েকটা ডিঙি নৌকো আছে। খেপ মারবে কি না কে জানে!

সামনে যেটা পেল তাতে একটা সতেরো-আঠারো বছরের ছেলে বৈঠা নিয়ে বসে আছে। ঢেউয়ে টগবগ করছে তার ছোটো নৌকো। সে আধঘণ্টা ঘুরিয়ে আনতে পাঁচটা টাকা চাইল।

টাকাটা কি তারই দেওয়া উচিত ? একটু ভাবল চয়ন। আগের বার চারুশীলা তাকে হোমস্‌গর কাছে আসার বাবদে হাজার টাকা দিয়েছিল। চয়নের খরচ হয়েছিল কুড়ি টাকার মতো। বাকি টাকা ফেরত দেওয়ার চেষ্টা করেছিল সে, চারুশীলা নেয়নি। সুতরাং এ টাকাটা সে দিতে পারবে।

নৌকায় ওঠার পর্বটা বেশ ঝামেলার হল। ঝুমকি যত বার উঠতে যায় ততবার দুই নৌকো একটু টাল খায় এবং সরে যায়। আতঙ্কে ঝুমকি চোঁচায় আবার হাসেও, অবশেষে মাঝি ছেলেটা নেমে নৌকো টেনে ধরে রইল, তারপর ঝুমকি উঠল। কিন্তু ওঠাটাও আর এক পর্ব। ছোটো নৌকো, একটুতেই টাল খায়।

মাঝি ছেলেটা অবশ্য বেশ চালাক-চতুর। ঝুমকি যতক্ষণ না বসল ততক্ষণ নৌকো ধরে রইল। চয়নের অবশ্য তেমন অসুবিধে হল না। সব অবস্থায় মানিয়ে নেওয়াই তার অভ্যাস।

ডিঙিতে পাটাতন বলে কিছু নেই। প্রায় সবটাই খোল। দুটো আড় কাঠ পাতা আছে। দুটোতে মুখোমুখি বসল তারা। ঝুমকির মুখে আতঙ্ক মেশানো হাসি।

কী রিক্সি জিনিস, তাই না ?

চয়ন মৃদু স্বরে বলে, তা বটে। তবে সহজে ডোবে না। ভয় পাবেন না।

ঝুমকি হিহি করে হেসে বলে, একটু ভয় না করলে মজাই হয় না।

নৌকোটা বড় গাঙের দিকে গেল না। খালের ভিতরে ঢুকে এগোতে লাগল। চওড়া নয়, বেশী ঢেউও নেই। মাঝি ছেলেটা চালাক। আনাড়ি দেখে বড় গাঙের দিকে নেয়নি।

ঝুমকি কিছুক্ষণ এই জলযাত্রাকে উপভোগ করল বটে, কিন্তু কেমন যেন শান্ত হতে পারছে না মেয়েটা। হঠাৎ চয়নের দিকে চেয়ে বলল, মেয়েটা একটু কেমন যেন, না ?

চয়ন অবাক হয়ে বলে, কোন মেয়েটা ?

রশ্মির কথা বলছি।

ও। বলে চয়ন সতর্কতা অবলম্বন করল। বলল, আমি ওঁকে সামান্যই চিনি।

বড্ড গায়ে-পড়া।

তাই নাকি ?

হোমস্‌বাবু যখন বিয়ে করতে রাজি হচ্ছেন না তখন হামলে পড়ার কী আছে বলুন! তাই না ?

তা তো বটেই। সঙ্গে সঙ্গে চয়ন একমত হয়।

মেয়েদের আর একটু সেলফ্‌ রেসপেক্ট থাকা উচিত।

তা তো ঠিকই।

ঝুমকি আবার কিছুক্ষণ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখল। খালের ভিতরে অবশ্য দৃশ্য বিশেষ নেই। দুদিকে উঁচু পাড়। দীন-দরিদ্র চেহারার কুটির, কিছু বাড়িঘর আর অজস্র আগাছার জঙ্গল।

ঝুমকি হঠাৎ বলল, আপনার কি মনে হয় ওদের বিয়ে হবে ?

চয়ন কঠিন সমস্যায় পড়ে গেল। বিয়ে হবে কি হবে না, তা সে জানে না। কিন্তু কোনটা বললে ঝুমকি খুশি হবে সেটা নির্ধারণ করাই কঠিন।

সে বলল, কিছু বলা যায় না।

আমার মনে হয়, হবে না।

সেটাও সম্ভব।

সম্ভব নয়। হবেই না। যদি হয় তাহলে ডিভোর্স হয়ে যাবে।

তাই নাকি ?

ঝুমকি বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, লোকটা যে বিয়ের ভয়ে পালিয়ে আছে সেটা তো আর বুঝতে কারও বাকি নেই। না ?

চয়ন একটু ভীত হয়ে বলে, আমি অত ভেবে দেখিনি।

ঝুমকি তার মস্ত খোঁপা ঠিক করল। তারপর হঠাৎ একটু হাসল। ভারী সুন্দর দাঁতের পাটি তার। বলল, রংটাই যা ফর্সা। মুখখানা এমন কিছু নয়।

চয়ন সভয়ে চুপ করে থাকে। তার কিছু বলার নেই।

ঝুমকি এর পর সম্পূর্ণ অনমনস্ক হয়ে গেল। নৌকাযাত্রা বা প্রকৃতি কোনওটাই তাকে আর স্পর্শ করল না অনেকক্ষণ। কথা যত না বলে ততই বোধহয় চয়নের পক্ষে ভাল। কারণ সে এসব বিপজ্জনক কথাবার্তার শরিক হয়ে থাকতে চায় না।

ঝুমকি দেবী, ঘাট এসে গেছে।

ঝুমকি ঘোর অনমনস্কতা থেকে জেগে উঠে বলল, ও মা!

যখন তারা ফিরল তখন ঘরে পারিবারিক মিটিং শেষ হয়েছে। বারান্দায় চারুশীলা আর সুব্রত বসে চা খাচ্ছে। তাদের

দেখে চারুশীলা বলল, একি, তোমরা আবার কোথায় গিয়েছিলে?

ঝুমকি বলল, একটু ঘুরে এলাম মাসি। তোমরা যা ব্যস্ত ছিলে!

চারুশীলা অসহায় মুখ করে বলল, যা একখানা পাগল ভাই আমার। ওকে নিয়ে আমিও পাগল হয়ে গেলাম। এই তো

দুটিকে পাঠালাম একটু ঘুরে আসতে। কী কাণ্ড বোলে তো! সব ঠিক আছে, তবু কোথায় যেন আটকাচ্ছে।

মৃদুভাষী সুব্রত কথার চেয়ে হাসে বেশী। মুখখানা সবসময়েই হাসিতে মাখানো। চায়ের কাপ থেকে মুখ তুলে বলল,

ওদের আর একটু সময় দেওয়া উচিত ছিল। তুমি বড় তাড়া দিচ্ছো ওদের।

চারুশীলা কেন কে জানে, তার মৃদুভাষী স্বামীটিকে একটু সমীহ করে। অন্য কেউ কথাটা বললে চারুশীলা পাত্তাই

দিত না। কিন্তু সুব্রত বলায় চারুশীলা তার দিকে চেয়ে বলল, কী করব বোলে তো! আমাদের হাতে কি সময় আছে?

সুব্রত একটু মাথা নেড়ে বলল, ওরা খুব ভাল বন্ধু। কিন্তু বন্ধুত্বকে ম্যাট্রিমনিতে কনভার্ট করাটাই প্রবলেম হচ্ছে বল

আমার ধারণা। মানসিক চেষ্টার জন্য সময় দরকার ছিল।

না সুব্রত। ও প্রবলেমটা শুধু হোমস্ফার। রশ্মির কিন্তু ওটা নেই। ও বিয়ের কথা ভেবেছে, মনকেও তৈরি করেছে।

হোমস্ফার আরও একটা প্রবলেম হল, ও ইংল্যান্ডে থাকতে চাইছে না।

ওয়াইজ অফ হিম।

তার মানে?

ইংল্যান্ডে থাকতে যাবে কেন?

করুণা গলায় চারুশীলা বলে, তাহলে বিয়ে হবে কি করে?

কেন, তোমরা রশ্মিকেই এদেশে থাকতে রাজি করাও।

তাই কি হয়? ওর কত প্রসপেক্ট ওখানে।

সুব্রত মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। তারপর বলল, তাহলে চালমাত।

তার মানে?

কোনও হেডওয়ে হওয়া মুশকিল।

চারুশীলা বলল, আহা, দেখলে তো, দুজনেই দুজনের প্রতি বেশ ইন্টারেস্টেড। ওদের মধ্যে ভাব ভালবাসা খুব

আছে।

তাহলে ঘটকালির দরকার হচ্ছে কেন?

কি করব বোলে, হোমস্ফার যে পাগল।

সুব্রত মৃদু মাথা নেড়ে বলে, একটুও পাগল নয়। মেটালি হয়তো ট্রুং নয়। বাট হি ইজ এ পারফেক্ট জেন্টেলম্যান।

চারুশীলা হতাশা মাথা মুখে ঝুমকির দিকে চেয়ে বলল, কি যে হবে!

কেন ভাবছো মাসি? সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার কিন্তু খুব খিদে পেয়েছে।

ওমা! খাবারের অভাব নাকি? কত মুড়ি রয়েছে, শশা, নারকোল। এসো, বসে যাও। চয়ন আপনিও আসুন তো!

আমার মনের যা অবস্থা, কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।

ঝুমকি এক মুটো মুড়ি-মাখা আর শশার টুকরো নিয়ে চিবোতে চিবোতে বলল, একটা লোক ব্যাচেলর থাকলে কী

এমন কৃতি হত বোলে তো!

ব্যাচেলর থাকবে? তাই কি হয়!

কেন হয় না?

দূর পাগল! এখন আমার তর্ক করতে ইচ্ছেই করছে না। তবে ব্যাচেলর থাকা ভাল নয়।

এ সবই অনুধাবন করে চয়ন, কিন্তু অংশ নেয় না। কত মানুষের কত বড় বড় সমস্যা থাকে, কত অদ্ভুত সব ঘটনা

ঘটে। তার তো তা নয়। তার সমস্যা সবই সাদামাটা। টিকে থাকা, শুধুমাত্র বেঁচে থাকা ছাড়া আর তো কোনও সমস্যার

কথা মনে হয় না তার।

অনেকক্ষণ বাদে যখন রশ্মি আর হোমস্ফার ফিরল তখন দুজনের অনুধাবন করল চয়ন। এদের সমস্যাটা কী? একজন

সুদর্শন পুরুষ, আর একজন সুন্দরী রমণী। দুজনের কারোই ভাত-কাপড়ের অভাব নেই। প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশীই

হয়তো আছে। এদের সমস্যা কি এদের এই প্রাচুর্যই?

দুজনের মুখই বেশ হাসিখুশি। দেখে মনে হয় যেন, দুজনের সমস্যা কিছুই আর নেই। সব মিটে গেছে। কিন্তু চয়ন

তার মধ্যেও একটু ছায়া দেখতে পায়। মুখে হাসি, কিন্তু হোমস্ফার চোখে যেন ক্লান্তি!

দুপুরে বাঁকা মিঞা গন্ধমাদন এনে ফেলল। ভাত, ডাল, তরকারির সঙ্গে দুরকম মাছ আর মুরগি। এলাহি ব্যবস্থা।

“গরম গরম খেয়ে নিন, গরম গরম খেয়ে নিন” বলে তাড়া দিতে লাগল সবাইকে। সেই তাড়া খেয়ে ঝুপঝুপ বসেও পড়ল

সবাই। টেবিল সরিয়ে বারান্দায় টানা শতরঞ্চি পাতা হল। শাল পাতার ওপর কলাপাতা বিছিয়ে দিবা ব্যবস্থা।

চয়ন এমন সুখান্দা জীবনে খুব কমই খেয়েছে।

খাওয়ার পরই ফেরার পালা। তাড়াতাড়ি না ফিরলে অন্ধকার হয়ে যাবে। প্রচণ্ড শীত পড়বে। কলকাতায় চারুশীলার বাস্কারা অস্থির হবে, ভুমকির বাবা-মা চিন্তা করবে।

হোমস্‌ও ফিরল তাদের সঙ্গে। একটু চুপচাপ, একটু লজ্জিত। এদিকের ঘাটে দুটো গাড়ি ছিল। দ্বিতীয় গাড়িটায় উঠল হোমস্‌ আর রশ্মি। গুদের বাড়ি কাছাকাছি। কি কারণে কে জানে হোমস্‌ হঠাৎ বলল, চয়ন, আপনি এ গাড়িতেই উঠুন। ও গাড়িটা একটু ক্রাউডেড। সংকোচে চয়ন এতটুকু হয়ে গেল। সে উঠলে গুদের প্রাইভেসি থাকবে না। চারুশীলাও বলল, না না, এ গাড়িতে অনেক জায়গা। আমরা তো মোটে তিনজন। আমি ভুমকি আর সুব্রত। তোরা যা না। না, আমি চয়নকে ওর বাড়িতেই ছেড়ে দিয়ে আসব। উঠুন তো। চয়ন বলল, আমি বরং বাসে বা ট্রেনে—

দূর পাগল! উঠুন।

চয়ন উঠে ড্রাইভারের পাশে সসঙ্কোচে বসল। তার মতামতের কোনও দাম নেই। সে আর কীই বা করবে? গাড়ি হু হু করে যখন কলকাতার দিকে এগোচ্ছিল তখনও ফটফটে দিনের আলো। চয়ন নিবিষ্ট মনে সামনের দিকে চেয়ে প্রকৃতি এবং দৃশ্যে শতকরা একশ'ভাগ মনোযোগী থাকতে চেষ্টা করছিল। তবু দু'একটা কথা উড়ে আসছিল কানে। পিছন থেকে।

কথাটা জানতে পারলে চারুদি শকড় হবেন।

হোমস্‌ হাসল, তা হবে।

তুমিও একটু উদ্ভূত। কেন যে সহজ হতে পারো না।

হোমস্‌ ফের হাসল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ রইল ওরা।

তারপর রশ্মি হঠাৎ বলল, সামারে এসো কিন্তু। আমি গ্রীনফোর্ডের বাড়িটা কিনে ফেলছি। আমার ওখানেই উঠবে। যা তো থাকবেই এখন কিছুদিন।

ঠিক আছে।

এলে পরে একটা প্যারিস ট্রিপ করা যাবে।

হু হু করে বাতাস আসছে বলে জানালার কাচ তুলে দিতে হয়েছে। তাই কথাগুলো স্পষ্ট কানে আসছে চয়নের। সে এমন কিছু জেনে যাচ্ছে যা আর কেউ জানে না।

সারা রাত্তা ওরা আরও নানা বিষয়ে কথা বলল। তার মধ্যে পেইন্টিং, মিউজিক, সিনেমা এবং সাহিত্যও ছিল। কিন্তু আর বিশেষ কিছু নয়।

কলকাতায় পৌছানোর আগেই অন্ধকার হয়ে গেল। কুম্ভাশা জমল। মনটা কেমন নির্বিকার হয়ে গেল তার।

রশ্মিকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নিজের বাড়িতে এসে গাড়িটাকে ছেড়ে দিল হোমস্‌। বলল, চলুন আপনাকে আমার গাড়ি করে পৌছে দিয়ে আসি।

চয়ন আতঙ্কিত হয়ে বলল, এখন মোটে সন্ধ্যা। কলকাতায় গাড়িঘোড়া চলছে। আমি ঠিক চলে যাবো।

আমার যে কথার খেলাপ হবে।

একটুও না। তাছাড়া আমি এখনই বাড়ি ফিরব না। ভাবছি, এক ছাত্রকে একটু পড়িয়ে যাবো।

তা হলে আসুন, এক কাপ চা খেয়ে যান।

চয়ন রাজি হল।

গরম চা নিয়ে দোতলার ঘরে মুখোমুখি বসে হোমস্‌ বলল, আপনার নিশ্চয়ই আমার সম্পর্কে কৌতূহল হচ্ছে?

চয়ন সংকুচিত হয়ে চুপ করে রইল।

হোমস্‌ একটু হেসে বলল, যেটা হওয়ার নয় সেটা আঁকড়ে থেকে লাভ নেই। আমি যে বনবাসে গিয়েছিলাম তার কারণ ছিল ওই একটাই। ভাল করে ভাবলাম। ভেবে দেখলাম, আমি কারও প্রেমে পড়িনি। কাজেই আজ রশ্মির সঙ্গে একটা মীমাংসা হয়ে গেল। আমরা বিয়েটা করছি না।

ও।

তবে আমরা বন্ধু থাকব, যেমন ছিলাম। আমি রশ্মিকে নানা কারণে পছন্দ করি। শী ইজ এ নাইস পারসন।

চয়ন মাথা নেড়ে জানাল, সে বুঝেছে।

হোমস্‌ হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, আজ খুব রিলিভড বোধ করছি। কিন্তু একটা কথা।

বলুন।

এখনই চারুদিকে ব্যাপারটা জানাবেন না। গ্রীজ।

আজ্ঞা।

ও কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞেস করবে।

কী বলব তাহলে?

বলবেন আমরা গাড়িতে খুব গল্প করছিলাম। বেশ ঘনিষ্ঠভাবে। ওকে এখনই হার্ট করতে চাইছি না। রশ্মি চলে যাক, তারপর জানতে পারবে।

ও। বলে চুপ করে থাকল চয়ন। এ তার গল্প নয়। এ তার জীবনের ঘটনা নয়। এ বড় দূরের কাহিনী। হৃদয় বিনিময়ের দূরূহ কথা। এ সবার সঙ্গে তার সম্পর্কই নেই। তবু সে চুপ করে গম্ভীর মুখে বসে রইল।

এরা মাটি ভাগ করতে চায়, ভিটে ভাগ করতে চায়, বাড়ি ভাগ করতে চায়। ভাগাভাগির একটা হাওয়াই এখন বইছে পৃথিবী জুড়ে। দুনিয়াকে যে কত ভাবে, কত ভাগে ভাগ করতে চায় মানুষ! এভাবে কি ভাগ হয়? গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন কৃষ্ণজীবন তার দুটি ভাইপোকে নিয়ে ক্ষেতের ধারে ধারে মন্থর পায়ে হাঁটছে। শীতের বাতাস আর রোদে মাখামাখি আজকের এই সকাল তাকে কোন শৈশবে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে আজ। সামনের ক্ষেতটুকু তাদের। আজ এর অনেক ভাগীদার। এই ক্ষেতটুকু আর ভিটেটুকু আঁকড়ে ধরে তার বাবাকে সে কঠিন বেঁচে থাকার লড়াই করতে দেখেছে। ঘাড়ে তখন অনেক পুথি। দেশ ভাগের পর আত্মীয়স্বজন জ্ঞাতি কত মানুষ একে একে এসে তাদের আশ্রয় নিয়েছিল। একখানা বড় খোঁড়ো ঘরে তখন গাদাগাদি করে থাকা হত। ক্ষেত থেকে ছ'মাসের খোরাকির ধানও উঠত না। তার বাবা বিষ্ণুপদ বিত্তর যোরাঘুরি করে অনেক দূরের এক গাঁয়ের প্রাইমারি স্কুলের মাস্টারি জুটিয়ে নিয়েছিল। বেতন লজ্জাজনক। এই ক্ষেত আর ওই চাকরি যেন ফুটো নৌকোয় দরিয়া পাড়ি দেওয়া। অসুখ হলে ডাক্তার-বন্দি ছিল না, ওষুধও না। টোটকা সঞ্চল। বিনা চিকিৎসায় কৃষ্ণজীবনের একটা ভাই আর দুটো বোন মারা যায়। অগ্রাসী দারিদ্রের সেই নগ্ন চেহারাটা বামাচরণ বা রামজীবন তেমন দেখেনি। ওরা তখন খুব ছোট।

একটা সজনে গাছের তলায় তিনজন দাঁড়াল পাশাপাশি।

পটল, এই ক্ষেত এখন কে চাষ করে জানিস?

জানি জ্যাঠা। বদরুদ্দিন চাচা।

সে ধানটান ঠিকমতো দেয়?

বেশী দেয় না।

বর্গা রেজিস্ট্রি হয়েছে কিনা জানিস?

না জ্যাঠা। ওসব বাবা জানে।

বহুকাল কৃষ্ণজীবন আর খবর রাখে না। এ জমি সে নিজে চাষ করেছে। তার বড় মায়ী।

আয়, এখানে একটু বসি।

ঘাসের ওপর, সজনের ঝিরঝিরে ছায়ায় বসল তিনজন। গোপাল কথা কইতে পারে না বটে, কিন্তু সে যে তার জ্যাঠাকে পছন্দ করে এটা সে নানাভাবে বুঝিয়ে দেয়। খুব ঘেষ হয়ে সে জ্যাঠার সঙ্গে লেগে বসে রইল। কৃষ্ণজীবনের বা ধারে পটল। আজকাল কৃষ্ণজীবন যখনই আসে এ দুটি তার সঙ্গে ঐটুলির মতো স্টেটে থাকে। তার তিন ছেলেমেয়ের মধ্যে একমাত্র দোলনই যা তার ন্যাওটা, অন্য দুজন নয়।

গোপালকে এক হাত দিয়ে নিজের বুকের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে কৃষ্ণজীবন বলল, পটল, তুই কখনও লাঙল চালিয়েছিস?

না জ্যাঠা।

কেন চালাসনি? ইচ্ছে হয় না?

ক্ষেত তো বদরুদ্দিন চাচা চাষ করে।

সে করে, কিন্তু তোর ইচ্ছে হয় না?

পটল কি বলবে ভেবে পেল না।

কৃষ্ণজীবন মৃদু তদগত গলায় বলে, লাঙল চালালে কি হয় জানিস? মাটির ওপর মায়া হয়, ভালবাসা হয়। ওই মাটির মধ্যে, চাষবাসের মধ্যেই আছে মানুষের প্রাণভোমরা।

পটল একটু উত্তেজিত হল। জ্যাঠার সব কথাই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, সে বলল, সত্যি জ্যাঠা?

সত্যি।

তুমি নিজে চাষ করেছো, না জ্যাঠা?

হ্যাঁ। তোর মতো বয়সেই শুরু করেছিলাম। লাঙল চেপে রাখা খুব শক্ত। এবড়োথেবড়ো মাটিতে লাঙল যখন চলত, আমি লাঙলের মুঠ ধরে বুলে থাকতাম। কতবার পড়ে গেছি। হাতে ফোসকা পড়ত। তবে হাল ছাড়িনি। রোজ অভ্যাস করতে করতে দিবা পারতাম।

আমাদের যে হাল-বলদ নেই জ্যাঠা।

তখনও ছিল না। হাল বলদ ধার করে আনতে হত। সেও বড় কষ্ট। যার হাল বলদ সে তো আর আমার সুবিধেমতো দেবে না, তাই হাঁ করে তার দয়ার জন্য বসে থাকতে হত। অপমানও হতে হত খুব। তবে গায়ে মাখতাম না।

দাদু বলে, তোমার নাকি খুব রোখ ছিল।

কৃষ্ণজীবন একটু উদাস হাসি হাসল। বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, রোখ ছিল, সাহস ছিল।

আমার সাহস নেই জ্যাঠা। আমি খুব ভীতু। ন'পাড়ার একটা ছেলে এই সেদিন আমাকে রথতলায় একা পেয়ে মেরে দিল। আমি কিছু করতেই পারিনি।

মারল কেন?

ওদের সঙ্গে পাড়ার ঝগড়া। একদিন গোপালকে সাইকেলে বসিয়ে আসছিলাম, একটা ছেলে এমন ঢিল মারল, আর একটু হলে আমার চোখ কানা হয়ে যেত। আর ঢিলটা গোপালের লাগলে মরেই যেত বোধ হয়। ইয়া বড় একটা পাথর।

ন'পাড়ার ছেলেরা বরাবরই একটু গুস্তা।

তুমি কখনও মারপিট করেছো জ্যাঠা?

কৃষ্ণজীবন একটু হেসে বলল, সে অনেক করেছে। রিলিফ নিয়ে, ডোল নিয়ে, জমির দখল নিয়ে কত হাস্যামা হত তখন। গাঁয়ের কয়েকটা খারাপ লোকও আমাদের পিছনে লেগেছিল। সে একটা বিশৃঙ্খলার সময়। তখন মার খেতাম,

আবার উঠে মারতামও। নইলে দখল থাকত না। দখল রাখাটাই অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় কথা। দখল রাখতে মানুষ সব করতে পারে। এই যে জমিটুকু, বাড়িটুকু, এটুকু রাখতেই আমাদের প্রাণান্ত হওয়ার জোগাড়। তার মধ্যে আবার আমাদের ঘাড়ের বসে থাকা খেত, সেইসব আত্মীয় আর জ্ঞাতিরাও এসবের ভাগ চাইতে শুরু করেছিল। সে খুব জটিল কাহিনী। আজ সেই জমি আর বাড়ি ভাগ হচ্ছে।

ভাগ হলে কী হবে জ্যাঠা ?

কিছুই হবে না। বামাচরণ তো চাষ করবে না, তার ভাগের জমি বেচে দেবে। রামজীবনও বোধ হয় তাই করবে। সরস্বতী আর বীণাপাণি কি করবে কে জানে! বোধ হয় দাদাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ভাগ ছেড়ে দেবে। ওরা তো জানে না, এই সম্পত্তি আসলে একটা ইতিহাস। ওরা টাকাটাই চেনে।

পটল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমার খুব ইচ্ছে করে, গোপালকে নিয়ে এ বাড়ি থেকে পালিয়ে যাই।

পালাবি! কেন রে, পালাবি কেন ?

আমার এখানে ভাল লাগে না, বড্ড ঝগড়া, অশান্তি।

তাই বলে পালাবি কেন ? নিজের কাজ নিয়ে ডুবে থাকবি। দুনিয়াতে পালিয়ে যাওয়ার আর জায়গা নেই। পালাতে হলে নিজের মধ্যে পালাবি।

সেটা কেমন জ্যাঠা ?

মানুষের পালানোর সবচেয়ে ভাল জায়গা হল তার মন। যদি সেখানে ঢুকে কপাট বন্ধ করে দিতে পারিস তা হলে আর কেউ তোর নাগাল পাবে না।

সত্যি জ্যাঠা ?

খুব সত্যি। আমি যখন দিনের পর দিন খিদেয় কষ্ট পেতাম, তখন খিদে ভুলতেও মনের মধ্যে ডুবে যেতাম। খিদের কথাও আর মনে পড়ত না। এরকম কতদিন গেছে। মনটাই হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে বড় শক্তি। যে মনটাকে সই করে নিতে পারে তার মার নেই। চারদিকে যা খুশি হোক, তুই নিজের কাজ নিয়ে, নিজের ভাবনা নিয়ে থাক, দেখবি কিছুই তোকে ছুঁতে পারবে না।

তুমি কাছে থাকলে আমার খুব ভাল হয় জ্যাঠা।

কৃষ্ণজীবন মৃদু হেসে বলে, আমি কাছে থাকলে তোর সবসময়ে আমাকে নকল করতে ইচ্ছে হবে। সেটা ভাল না। আমি দূরে থাকি বলেই আমার ওপর তোর টানটাও আছে। আমার মতো হওয়ার ইচ্ছাটাও আছে। এরকমই ভাল। আর একটু বড় হ'লে, তখন দেখতে পাবি, পৃথিবীতে নিজের মতো হয়ে ওঠাটাই সবচেয়ে বড় কথা।

পটল গম্ভীর হয়ে বসে জ্যাঠার কথাগুলি বুঝবার চেষ্টা করতে লাগল। আজকাল সে সব কিছু বুঝবার চেষ্টা করে।

তুই ইংরিজিতে কেমন ?

গত পরীক্ষায় একটু ভাল পেয়েছি। তাও বেশী নয়। দাদুর কাছে পড়ছি বলে একটু ভাল হচ্ছে।

বাবা তোকে পড়ায় নাকি ? খুব ভাল। বাবা তোর গোড়াটা বেঁধে দিতে পারবে। ইংরিজি আর অঙ্কটা খুব দরকার। আর দরকার শক্ত মন। খুব কঠিন হবি, সাহসী হবি। হিংস্র নয়, কিন্তু সাহসী। বুঝেছিস ?

ভিনজন আরও কিছুক্ষণ বসে রইল সজনে গাছের নিচে। খিরঝিরে ছায়া। শীতের বাতাস। কী ভাল চারদিকটা আজ! তারপর ভাইপো দুটিকে নিয়ে উঠে পড়ল কৃষ্ণজীবন। আজই ভাগাভাগির কাগজপত্র সই করে ফিরে যাবে সে।

দুদিন বাদেই রওনা হবে আমস্টারডাম। অনেক কাজ বাকি।

বাড়ি ফিরে সে তার বাবার কাছে বসল একটু। একজন উকিল আসবার কথা। এখনও আসেনি।

বিষ্ণুদ দাওয়ায় রোদে পিঠ দিয়ে বসে নিজের হাত দু'খানার দিকে চেয়ে থেকে বলে, এ ভালই হল, কি বলিস বাবা ? অশান্তির চেয়ে তো ভাল।

আমিও তাই বলি। ভাগজোখ হয়ে গেলে যদি ভাব হয়।

আপনি কি তাই ভাবেন ?

না বাবা, তা ভাবি না। আশা করি। একটা দুঃখ, তোর কোনও ভাগ থাকল না।

কি করব বাবা ভাগ দিয়ে ? আমার তো লাগবে না।

তা জানি। কিন্তু আমার সম্পত্তিতে তোর একটু ভাগ থাকলে তোকে আমার ছেলে বলে ভাবতে সুবিধে হয়।

কৃষ্ণজীবন মৃদু হেসে বলে, ও কি কথা বাবা, ছেলে বলে এমনিতে ভাবতে অসুবিধে কিসের ?

তুই যে বড় ওপরে উঠে গেছিস বাবা, আমি যে তোকে আর নাগালে পাই না। নিজের ছেলে তো ঠিকই, কিন্তু ছেলে যখন বড্ড বেশী কড়ী হয়ে ওঠে তখন যেন ছেলে বলে মনে করতে ভরসা হয় না। যদি এক কাঠা জমিও নিজের নামে রাখতি তবে বুকটা ঠাণ্ডা হত। ভাবতাম, ও তো আমার ওয়ারিশ।

আপনি যে কত অদ্ভুত কথা ভাবেন বাবা!

ওটাই তো আমার মস্ত দোষ। অকাজের মাথায় কত উদ্ভট চিন্তাই যে আসে। কি করি জানিস ? পটলের ভূগোল বইখানা খুলে ম্যাপ দেখি আর ভাবি, আমার কৃষ্ণজীবন এখন আমেরিকায় আছে। এই ইংলন্ডে আছে, এই অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছে। তোর সঙ্গে সঙ্গে আমিও যেন চলে যাই ওঁসব জায়গায়। ভাবি, কৃষ্ণ তো আমার সন্তারই অংশ, আমিই তো কৃষ্ণজীবন হয়ে জন্মেছি। তাই না ?

তাই তো বাবা।

বিষ্ণুদ খুব হাসে আর মাথা নাড়ে। বলে, এইসব ভাবি আর কি!

বাবা, আপনার কি বিদেশ দেখতে ইচ্ছে করে ?

বিষ্ণুদ সভয়ে বলে, ও বাবা, না।

কৃষ্ণজীবন মৃদু হেসে বলে, আজকাল যাওয়া কিছু শক্ত নয়। আমি বোধ হয় বছরখানেকের জন্য আমেরিকায় যাবো। আপনি যদি যেতে চান সব ব্যবস্থা হবে।

বিষ্ণুপদ হাঁ করে চেয়ে থেকে বলে, তুই যে বলেছিলি এটাই ঢের। আমার অত চাই না। আজকাল সবাই যায়।

তারার যাক। আমার সবই বে না।

কৃষ্ণজীবন চুপ করে রইল। তার বাবা বিষ্ণুপদের পক্ষে যে আমেরিকা যাওয়া ঘটে উঠবে না তা সেও জানে। অত সৌভাগ্য করে আসেনি তার বাবা। কিন্তু বিষ্ণুপদ কি দুর্ভাগা? তাও মনে হয় না কৃষ্ণজীবনের। বিষ্ণুপদ বরাবর নিজের দুর্ভাগ্যগুলিকে হাসিমুখে মেনে নিয়েছে। শান্ত সমাধিষ্ঠ থেকেছে। মনের মধ্যে ভুব দেওয়ার কৌশল কি উত্তরাধিকার সূত্রে বিষ্ণুপদের কাছ থেকেই পায়নি কৃষ্ণজীবন?

বাবা, কয়েকদিন কলকাতায় গিয়ে থাকবেন?

বিষ্ণুপদ আবার খুব হাসল। বলল, আজকাল শরীরে নাড়া দিতে ইচ্ছে যায় না। মনে হয়, যত নাড়াচাড়া কম হয় ততই ভাল।

কেন বাবা?

কেমন যেন মনে হয়, শরীরেরও কিছু নাশিল আছে। ছুটি চাইছে। বায়ুপুরাণ পড়িসনি?

পড়িনি, কিন্তু আপনার কাছে শুনেছি।

বইখানা পড়িস। অনেক জ্ঞান হয়।

জ্ঞান তো সবই বই থেকেই হয় বাবা।

তা হয়। তবে বায়ুপুরাণ একখানা বেশ বই। অনেক লক্ষণ চিনিয়ে দেয়।

বাংলাদেশে নিজের গায়ে একবার যাবেন?

কেন, সেখানে কী আছে?

দেশের গাঁ, পিতৃপুরুষের ভিটে দেখতে ইচ্ছে হয় না?

বিষ্ণুপদ হাসে আর মাথা নাড়ে, চোখে দেখে কি সুখ? বরং ভাবলে সুখ হয় একটু। সবই ভাবের জিনিস। নইলে কার মাটি, কার জমি, কার বসত? এগুলো কিছু না। দেশে কি খুব সুখে ছিলাম রে বাবা? খেয়েছি তো সেই কচু ঘেঁচু, বাস করেছি মাটির ভিটের ঘরে। তবু লোকের কেবল মনে হয় দেশে কত সুখে ছিলাম। ওটা হল ভাবের সুখ।

কৃষ্ণজীবন এই সত্যবাদিতায় মুগ্ধ হল। বাবার দিকে মায়াভরে চেয়ে থেকে বলল, বাবা, আপনি বড় ভাল বোঝেন। বিষ্ণুপদ ঘন ঘন মাথা নাড়া দিয়ে বলে, কিছু না, কিছু না। বুঝি কোথায়? এই শেষ বয়সে এসে যেন ফের হামা দিচ্ছি। এই দুনিয়াটা, আর এই আমি, কিছুতেই যেন এই দুইয়ে যোগটা খুঁজে পাই না।

আমিও পাই না বাবা। বোধ হয় কেউই পায় না।

বিষ্ণুপদ তার জ্যেষ্ঠ পুত্রটির দিকে উজ্জ্বল চোখে হাসিমুখ করে চেয়ে থেকে বলল, আমার কী তোকে দিই বল তো! জমি টমি কিছু নিলি না, ওয়ারিশ হলি না।

কৃষ্ণজীবন মৃদু হেসে বলে, ওগুলো তো বাইরের জিনিস বাবা। আপনার কাছ থেকেই তো সব পেয়েছি। আজই ডাবছিলাম, আপনি যেমন নিজের মনের মধ্যে ভুব দিয়ে বসে থাকেন, আমারও ঠিক অমনি স্বভাব। আপনার কাছ থেকে অনেক পেয়েছি।

বিষ্ণুপদ খুশি হয়ে মাথা নাড়ে খুব। বলে, তা অবশ্য ঠিক। স্ত্রীকে জায়া বলে, তার কারণ স্ত্রীর ভিতর দিয়েই তো পুরুষ আবার জন্মায় তার সন্তান হয়ে। এ তত্ত্বটা বড় ভাল, ভাবলে একটা বলভরসা হয়।

তাই তো বাবা।

তোর কথা ভেবে খুব তাজ্জ্বল হয়ে যাই মাঝে মাঝে। তোর মাকেও বলি, এই আমরা যেমন, তুই ঠিক সেরকম তো নোস। আমি ভাবি কি, আমার মতো মোটাবুদ্ধি মানুষের ছেলে হয়ে তোর এত বুদ্ধি কেমন করে হল?

কৃষ্ণজীবন খুব হাসল। বলল, বাবা আপনার মোটাবুদ্ধি কে বলে? দেশের গায়ে লেখাপড়ার চাড় ছিল না, চর্চা ছিল না, আপনারও তেমন উৎসাহ ছিল না। নইলে হয়তো দেখা যেত আপনি মস্ত মেধারই মানুষ। গায়ে গজে কত মেধা তো অনুশীলনেরই অভাবে নষ্ট হয়ে যায়।

তা বটে। বলে বিষ্ণুপদ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, কিন্তু কিছু টের পাইনি কখনও। সারাজীবন একটা কাজই করেছি। ভেবেছি। মেলা ভেবেছি। সবই হাবিজাবি। আর তেমন কিছু করিনি। অবিন্যস্ত চিন্তা। মনে হয় শুঁছিয়ে ভাবতে পারলে, ভাবনার পরস্পরা ঠিক থাকলেও মানুষ ভেবেই কত কী করতে পারে!

কৃষ্ণজীবন হাসতে হাসতে বলল, এই যে বলছিলেন আপনার মোটাবুদ্ধি! মোটাবুদ্ধির মগজ থেকে কি এসব কথা বেরোয়?

শোন, আমার তো বিশেষ কিছু নেই। একটা মাদুলি আছে। আমার মাদুলি। তোর ঠাকুমা কোথা থেকে এনে পরিয়েছিল আমায়। কোনও কাজ হয়েছিল কি না জানি না। তবে অনেকদিন আমার হাতে বাঁধা ছিল। এই বছরখানেক হল তাগা ছিড়ে যাওয়ায় আর পরিনি। আমার খুব ইচ্ছে হয়, ওটা তোকে দিই।

মাদুলি দিয়ে কী করব বাবা?

বিষ্ণুপদ সলজ্জভাবে মাথা নেড়ে বলে, কিছু করবি না, তোর কাছে রাখবি। ওইটেই তোকে দিলাম ওয়ারিশ হিসেবে।

কেন বাবা?

মাদুলি সামান্য জিনিস, ওর সঙ্গে স্বার্থ বা লোভের সম্পর্ক নেই। একটা কিছু দেওয়াও হল, পাঁচজনের চোখও টাটাল না, নিবি কৃষ্ণ?

কৃষ্ণজীবন দুটি হাত পেতে বলল, দিন বাবা। তাই দিন।

বিষ্ণুপদ উঠে ঘর গেল। বাস্তব খুলে একটা কৌটো বের করে আনল। কৌটোর ভিতর থেকে কালপ্রাচীন মাদুলিটি বেরোলো। মাদুলির তাম্রাভ বর্ণ কালচে হয়ে গেছে, ছেঁড়া তাগাটা তেলচিটে।

অপ্রতিভ বিষ্ণুপদ দ্বিধাশ্রিত করতলে মাদুলিটা নিয়ে বলল, এটাই। নিবি বাবা? ঘেন্না করবে না তো!

কৃষ্ণজীবনের চোখে জল এল। মাথা নেড়ে বলল, না বাবা। ঘেন্না কেন করবে?

বড়দ নোংরা হয়ে আছে। পুরোনো তো?

ওইরকমই থাক বাবা। ওতে একজন সং মানুষের স্পর্শ আছে। দিন।

বিষ্ণুপদ মাদুলিটা তার হাতে দিয়ে তৃপ্তির হাসি হাসল, মনে মনে ভাবছিলাম, তোকে কী দিই! কাল রাতে হঠাৎ স্বপ্ন দেখলাম, তোকে এই মাদুলিটা দিচ্ছি। স্বপ্নের তো মাথামুণ্ড থাকে না। তবু ভাবলাম, তা হলে দেওয়াই ভাল।

মাদুলিটা পকেটে রেখে কৃষ্ণজীবন বলল, এটা কি পরতে হবে বাবা?

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, না না। পরতে হবে না। তোর বাড়িতে রেখে দিস কোথাও। ওর কোনও ক্রিয়া নেই। শুধু একটা চিহ্ন।

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ।

বিষ্ণুপদ হঠাৎ বলল, হ্যাঁ রে, ইনঅ্যানিমেট যা সব আছে, সেগুলো কি সত্যিই ইনঅ্যানিমেট? তুই তো অনেক জানিস, তোর কি মনে হয়?

কৃষ্ণজীবন একটু অবাক হয়ে বলে, ইনঅ্যানিমেট তো জড়বস্তু।

বিষ্ণুপদ খুব লজ্জার হাসি হেসে শিশুর মতোই বলে, কি জানিস, যখন ছোট ছিলাম তখন কিন্তু মনে হত, সব জড়বস্তুই যেন জীবন্ত। প্রাণ কি না জানি না, কিন্তু আমাদের সবই ওরা দেখে, বুঝতে পারে, টের পায়। এখনও ঠিক সেরকম মনে হয়।

কৃষ্ণজীবন মৃদু হেসে বলে, তাতে দোষ কি বাবা? সেরকম হতেও পারে। বিজ্ঞান দিয়ে আমরা আর কতটুকু জানতে পেরেছি?

তোর ওরকম মনে হয় না, না?

না বাবা।

ওই যে মাদুলিটা নিলি, কত আদর করে নিলি, ওটা তো ইনঅ্যানিমেট। তাই না? আমার কেন যে মনে হয়, ওই মাদুলিটার মধ্যে আমার একটু তরঙ্গ, একটু স্পন্দন রয়ে গেল। জড় বটে, কিন্তু তবু যেন পুরোপুরি জড় নয়।

কৃষ্ণজীবন দ্বিত মুখে চুপ করে রইল।

বিষ্ণুপদ বলল, কত কী মনে হয়। গরুটা, কুকুরটা, ছাগলটা, গাছটা সব কিছুকেই যেন মনে হয়, মানুষের মতোই। হয়তো তেমন বুদ্ধি নেই, ক্রিয়া নেই, তবু যেন সবই মানুষ। সবই আমাদেরই ভিন্নরূপ।

এরকম হলে তো ভালই বাবা।

বিষ্ণুপদ খুশি হল। খুব হাসল। দুলে দুলে।

উটলি এল একটু বেলায়। বামাচরণই নিয়ে এল। রামজীবন, বামাচরণ, বিষ্ণুপদ আর কৃষ্ণজীবন মিলে একটা ভাগাভাগির বৈঠক বসল। ঝগড়া-কাজিয়া হল না। শান্তভাবে একটা মুসাবিদা করা হল। নিজের ভাগের সম্পত্তি দানপত্র করে দিল কৃষ্ণজীবন। সবই কাঁচা চুক্তি। পরে আদালত থেকে পাকা হয়ে আসবে। সাক্ষী সাবদও জুটে গেল কয়েকজন।

বিকলে অবসন্ন মনে ফেব্রার ট্রেন ধরল কৃষ্ণজীবন। একা। বড়ই ফাঁকা ট্রেন। এই একাকিত্ব কৃষ্ণজীবনের আশ্রয়ব সঙ্গী। বাইরে বন্ধুবান্ধব ছিল, আত্মীয়স্বজন ছিল, তবু সকলের মাঝখানে থেকেও কৃষ্ণজীবন মনে মনে ছিল একা, সঙ্গীহীন। বরাবর। বিয়ের পরও। আজ অবধি সেই একাকিত্ব কখনও ঘোচেনি তার। কিন্তু ঘুচবেই বা কেন? সে তো এই একাকিত্বকে আদ্যন্ত উপভোগ করে।

ঠিক একাও নয়। সে যখন একা হয় তখন গোটা বিশ্বজগৎ নিয়ে তার প্রিয় চিন্তা এক রূপকথার জগৎকে উন্মোচিত করে দেয়। সীমাহীনতা, সময়হীনতা পরিব্যাপ্ত হয়ে যে চরাচর, তার রূপ ও অরূপ, তার আলো ও অন্ধকার ডরে রাখে তার মাথা।

একা প্রায়াস্কার ট্রেনের কামরায় জানালার পাশে বসে সে আজ উপভোগ করছিল এই একাকিত্বকে। বিশাল বিশ্বজগতের অত্যা যখনই সে ভাবতে শুরু করে তখনই টুচ্ছ হয়ে যায় তার সব প্রিয়জন, তার চাকরি, সাফল্য, প্রতিষ্ঠা। এক নিমিহীন অভল অন্ধকার আচ্ছন্ন অসীম আল মহাকাশ—যার শুরু নেই, শেষও নেই—তাকে এসে সম্মোহিত করে দেয়।

পকেট থেকে আনমনে বাবার দেওয়া মাদুলিটা বের করল সে। চেয়ে রইল। কেন বাবা মাদুলিটা তাকে দিল তা অন্যো হয়তো বুঝবে না। কিন্তু সে বোঝে। সে বুঝেছে। বাবা এই সামান্য মাদুলিটি দিয়ে তার সঙ্গে লেগে থাকতে চায়। বিষ্ণুপদ এর বেশী আর কিছুই চায়নি তার কাছে।

নিরঞ্জনবাবুর কাছে বসে থাকলেও কত জ্ঞান হয়। পাকা মানুষ, কত অভিজ্ঞতা। আসাম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, কাছাড় থেকে বিহার অবধি কত ঠিকাদারি যে করেছেন একটা জীবনে তার হিসেব নেই। টাকা কামাতেই বটে, কিন্তু কাজটাও বড় ভালবাসেন।

একটু রাঙের দিকে নিরঞ্জনবাবুর কাছে এসে বসে নিমাই। কখনও গান শোনায়, কখনও বসে বসে কথা শোনে। আগে সন্দের পর একটু-আধটু মদ খেতেন, সিগারেটেরও নেশা ছিল। ডাক্তারের বারণ বলে ছেড়েছেন। এত ঝটুনিও ডাক্তারের বারণ। এ বারণটা শোনেনি।

সেই কথাই বলছিলেন, এখন কাজকর্ম ছেড়ে যদি ঘর-বসা হয়ে যাই তাহলে আর ক'দিন বাঁচবো? ডাক্তাররা বুঝতে চায় না, কাজই হল মানুষের আসল ওষুধ। কাজ বন্ধ করলেই আদি-ব্যাধি এসে ধরে।

নিরঞ্জনবাবু টৌকিতে বিছানায় চাদরমড়ি দিয়ে বসা। মুখোমুখি একখানা টুলে নিমাই। নিমাই মাথা নেড়ে বলে, ডাক্তাররা শরীর চেনে, রোগ চেনে, গোটাগুটি মানুষটাকে ভো বুঝে উঠতে পারে না। মনটায় যদি অশান্তি হয়, যদি ছটফট করে তবে কি দেহে শান্তি হয়?

তবেই বোঝা। আমার দুই ছেলে, ছেলেদের মা, বউমারা, মেয়েরা সবাই এমন গাজি গাজি করে ধরল, কিছুতেই কাজে বেরোতে দেবে না। তাদের ধারণা, টাকা রোজগার তো মেলা হল, এবার ঘরের সুখ ভোগ করলেই হয়। ঘরের যে কী সুখ তা তো আমি জানি। ছেলেদের দুটো দোকান করে দিয়েছি। একখানা রং আর হার্ডওয়্যারের, অন্যখানা পাশপেস্ট আর ইলেক্ট্রনিক্সিং। চলছেও ভাল। টাকার অভাব নেই। কিন্তু বাড়ির মধ্যে দেখবে দিনরাত মাথা গরম, দিনরাত ঝগড়া-কাজিয়া। ছোটোখাটো ব্যাপার থেকে কুরুক্ষেত্র হয়ে যায়। আমার যখন প্রথম স্ট্রোকের মতো হল ক'দিন বাড়িতে থাকতে হয়েছিল। বাড়ির আবহাওয়ায় আমার ফের স্ট্রোক হওয়ার জোগাড়। শেষে একটা নার্সিংহোম-এ গিয়ে পালিয়ে বাঁচি। এই বেশ আছি বাবা। কাজ করতে করতেই একদিন ফুটস করে মরে যাবো, সেই ভাল।

মরার কথা বলেন কেন? সে যখন আসার আসবে। বেঁচে থাকার কথা ভাবাই তো ভাল। বাঁচার ইচ্ছেটা জোরদার থাকলে তার জোরে আয়ুও খানিকটা বেড়ে যায়।

আমিও তাই বলি। চিরকাল মাঠে-ঘাটে কাজ করে করে আমার মনটা কেমন সবসময়ে উড়ু উড়ু থাকে। ঘর-সংসারের বাঁধা পড়লেই যেন ওসব মরুনে চিন্তা পেয়ে বসতে থাকে। এই যে শ'খানেক লোকের গ্রাসাচ্ছাদন হচ্ছে, একটা কিছু তৈরি করছি—এ সবের কি আনন্দ নেই?

দু'জনেই খানিক চুপ করে থাকে।

নিরঞ্জনবাবু হঠাৎ বলেন, তোমার কথা তো কিছুই খুলে বললে না আমায়? এ ক'বছর করলেটা কী?

নিমাই একটু হেসে মাথা নিচু করে বলে, সে এক লজ্জার কথা।

কেন, লজ্জার কী?

বিয়ে বসে প্রায় ঘরজামাই হয়েছিলুম। ক'টা বছর নষ্ট করলুম। না হল সংসার, না কাজকর্ম।

ঘরজামাই ছিলে! সে আবার কেমন?

ঘরজামাই যাকে বলে তা নয় অবিশ্যি। তবে বউয়ের পয়সায় দিন গুজরান হত।

বউ কোথায়?

সে আমাকে ত্যাগ দিয়েছে।

বউকে ত্যাগ করা মহা পাপ, তা জানো?

আমি ত্যাগ করার কে? বউই আমাকে একরকম ঘাড় ধাক্কা দিল যে।

বলো কি! এ তো ঘোর অন্যায়। কেন, তোমাকে তার পছন্দ নয়?

সে জানি না। ছিলুম তো একই সঙ্গে। তবে অন্য একটা বখেঁরা জুটল, সেটাই কাল হল।

অন্য কোনও ছেলেছোকরা নাকি?

না। সেটা বলা যাবে না।

যাত্রাদল নেমেছে সেটাতো ভাল কথা নয়। যাত্রা-খিয়েটার বাইরে থেকেই ভাল, ভিতরে নাকী যা।

তা বটে।

তুমি চেপে বসে থাকো। ব্যবসাতা বাড়িও। বউ যদি কখনও নিজের ভুল বুঝতে পারে তাহলে নিজেই ফিরবে। জীবনের ভুলগুলো মানুষ যতদিন নিজে না বুঝতে পারে ততদিন তাকে ফেরাতে চেষ্টা করে লাভ হয় না। গুটা হল নিশির ডাকের মতো।

তা বটে।

ব্যবসার কথা কিছু ভাবছো?

ক্যাটারিংটা ভালই চলছে।

দূর বোকা! গুটুকুতে আটকে থাকলে চলবে কেন? একখানা দোকানঘর দেখ। তোমার ব্যবসার মাথা আছে, রান্নার হাতও খুব ভাল। তার ওপর তোমার স্বভাবখানা নরম। তোমার হবে। শুধু দেখো, বাকি-বকেয়ার ফেরে পড়ে যেও না। ধার-বাকির পাল্লায় পড়েই অধিকাংশ দোকান লাটে ওঠে।

যে আছে।

দু'পাঁচ হাজার টাকা আমার কাছে সব সময়েই পাবে। তোমার কাছে আমার টাকা কখনও মার যাবে না। দু'চারটে লোককে যদি মরার আগে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যেতে পারি তাহলেই আমার সুখ।

নিরঞ্জনবাবুর দিকে চেয়ে চোখে জল আসতে চায় নিমাইয়ের। সে মাথা নেড়ে বলে, দোকানই দেবো।

দাও। বেশ গোড়া বেঁধে লেগে যাও। ব্যবসার পিছনে যেন একটু সেবাবুদ্ধি থাকে। বেশির ভাগ ব্যবসাদাররাই চায় লোকের ঘাড় ভেঙে পয়সা লুটতে। ওরকম মন থাকলে হয়ও না ভাল। তোমার মনটা হবে অন্যরকম। ব্যবসার পিছনে লোককে সেবা করার মতলব যদি থাকে, তাহলে দেখো কি থেকে কি হয়ে যাবে। একটু কম লাভ রেখো, আর লাভের অর্ধেক ব্যবসাতেই লাগাবে। তাতে ব্যবসা বাড়বে।

নিমাই এ সব কথা রাত জেগে জেগে বসে ভাবে। নিরঞ্জনবাবু বড় খাঁটি লোক।

নন্দর বউটা ইদানীং বড় ঘুর ঘুর করছে। লক্ষণ সব চেনে নিমাই। নন্দ বেশি পাত্তা দিচ্ছে না বউকে। ইদানীং ভাত-কাপড়ও বন্ধ করেছে। বউটা এখন আতান্তরে। তার এখন একজন পুরুষ চাই। এমন পুরুষ যে রাখবে। রাতের দিকে এসে আজকাল পাশটিতে বসে পড়ে, তারপর রাজ্যের কথা ফাঁদে।

ও নিমাইদাদা, অমন গোমড়া মুখ করে থাকো কেন গো ?
 মেয়েটার জন্য নিমাইয়ের কষ্ট হয় । সে তো জানে, মনো শরীরের টানে তার কাছে আসে না । আসে পেটের টানে ।
 দু'মুঠো ভাত, মাথার ওপর চাল, দু'চারখানা কাপড়, কয়েকটা টাকা এই হলেই বাঁধা মেয়েমানুষ ।
 নিমাই বলে, ঘরে যা মনো, শুয়ে থাক গে ।
 ঘুম আসে না বলেই তো আসি । রাতটা যে কাটতে চায় না ।
 এত রাতে এই যে আসিস, এটা ভাল দেখায় না ।
 খারাপেরই বা কি বলো ? আমাদের তো দু'কান কাটা । লজ্জা কাকে ? তোমার বউ তোমাকে কাঁচকলা দেখিয়েছে আর আমার বর আমাকে নেয় না । তো কাকে আর পরোয়া ?
 ওরকমভাবে বলতে নেই, ভাবতেও নেই ।
 তুমি বড্ড ভিত্তি মানুষ গো ।
 খুব ভিত্তি । আমাকে দিয়ে তোর কিছু হবে না ।
 কেন হবে না শুনি ? নন্দ নেয় না বলে তো আর পচে যাইনি ।
 পচতে চাইছিস কেন ?
 মনো চুপ করে ইঁটের ওপরে বসে থাকে । মাথা নিচু করে কান্দেও কিছুক্ষণ । ঘর বলতে সামান্যই একখানা খুপরি ।
 দেখানো তার ছোট্টো একটা মেয়ে ঘুমোচ্ছে । ঘরে তালো দিয়ে মনো চলে আসে রোজ ।
 দেখ মনো, তোর জন্য আমাকে না এ জায়গা ছাড়তে হয় । যদি জ্বালাতন করিস তবে আমি এখানকার পাট তুলে চলে যাবো কিন্তু ।
 পাঁচটা টাকা দেবে ?
 পরন্তু তো দিয়েছি ।
 পরন্তু টাকা আজ অবধি থাকে ? পাঁচ টাকায় কী হয় বলো !
 এরকম করে যদি রোজ চাস তাহলে আমার চলে কি করে ?
 তোমার আবার অভাব ! দিবা তো লুটেপুটে খাচ্ছে । দাও না পাঁচটা টাকা । দোকানে যে আর ধার দেয় না ।
 কাজে লেগে যা-না ।
 কাজ কি করি না নাকি ? তিন বাড়ি ঝি খাটি । তাতে হয় ? নন্দ ঘরভাড়া দেওয়া বন্ধ করেছে, হাতে একটা পয়সা দিচ্ছে না ।
 ও কি কাউকে পুষছে ?
 তা আবার নয় ? পরন্তু তো তাই নিয়ে কুরুক্ষেত্র হল । আর আসবে না ।
 সেবা-টেবা ঠিকমতো করতি ?
 কম করিনি গো । মদের পয়সা কম জুগিয়েছি ? নিজের রোজগারের পয়সা ভাঙতে নাকি ? শুধু ঘরভাড়া দিত আর বাজারটা করত আর মেয়ের খরচটা ।
 তবে তো মেলাই দিত ।
 ছাই ।
 শোন মনো, পুরুষ মানুষকে একটু তোয়াজে রাখলে সে তো পাপোশ । নন্দ লোক খারাপ নয় । ইলেকট্রিকের ভাল কারিগর । একা হাতে নিরঞ্জনবাবুর দুটো গোড়াউনের লাইন করেছিল ।
 তাতে কী হল বলো তো ! ভাল কারিগর মনেই কি ভাল মানুষ নাকি ?
 তা নয়, তবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার মতো তো নয় ।
 তুমি আর ধান ভানতে শিবের গীত গেও না তো ! বলতে আসি এক কথা, উনি শোনান আর এক কথা ।
 কী শুনতে আসিস মনো ? যা শুনতে চাস সেই বাক্য তো আমার মুখ দিয়ে বেরোবে না ।
 তুমি খুব সাধুপুরুষ !
 তা নই । তবে ভিত্তি ।
 ভয়টা কাকে ? আমাকে ? না সমাজকে ?
 সবাইকেই ।
 ওটা কোনও কথা হল ? আমি কি তোমার ক্ষতি করব বলে আসি ?
 নিমাই চুপ করে থাকে । এ কথার জবাব দিতে গেলে মনো খুব দুঃখ পাবে ।
 মনো নিজের মনেই বলে, তোমার হোটেলও তো ঝি লাগে । সেই কাজটাই না হয় দাও আমাকে । তোমার দুটো ভাতও ফুটিয়ে দেবো । আমার ঘরভাড়া আর খোরাকিটা দিয়ে দিও ।
 মনো, তুই আর কাউকে দেখ ।
 ইস, আমি যেন ওরকম । একটা না একটা ধরলেই হল বুঝি ? তোমার কাছে আসি কি এমনি ? ভাল লাগে বলেই না !
 আমাকে তোর ভাল লাগে কেন ?
 লাগলে কি করব ?
 তোমার মাথাটাই গেছে । আমি হলাম একেবারে অপদার্থ লোক । কড়ে আঙুলের মতো মানুষ ।
 ওই ডাইনি তোমার মাথাটা চিবিয়ে রেখেছে গো ! কিছুতেই আর তোমার অন্য দিকে নজর পড়ছে না । তা হ্যাঁ গো, নিমাইদাদা, পুরুষ মানুষের কি একজন নিয়ে চলে ? কত পুরুষ দেখলাম ।
 দেখেছিস ? ভাল ।

অমন ফাঁকা গলায় কথা কইছো কেন ? ওই যে নিরঞ্জনবাবু, কতটা চেনো ওঁকে ? যখন আগেরবার এখানে ঠিকাদারি নিয়ে এলেন তখন দেখেছি, রাতে ফুলিয়া বলে একটা কামিনকে রোজ ঘরে নিত।

জানি।

জানো ?

জানব না কেন ? সবাই জানে। ওটা হল দু'পক্ষের বন্দোবস্ত। এরও দরকার, ওরও দরকার।

তোমার বুঝি দরকার নেই ?

নিমাই মাথা নাড়ে, না। ভুই ঘরে যা।

ঘরে যায় বটে মনো, কিন্তু দু'তিন রাত্তির পর ফের আসে।

কয়েকটা টাকা দাও নিমাইদাদা, শোধ দিতে পারব না। অন্য দিকে পুষিয়ে দেবো।

ও সব বলতে নেই রে।

তুমি কী বলো তো!

আমি একটা কিছু না। বুঝতে তোর দেরি হচ্ছে কেন ?

তোমার বদনামের ভয় তো! এখানে কে তোমার বদনাম করবে ? সবকটাই তো বদমাশ।

সবাই বদমাশ হলে কি চন্দ্র সূর্য উঠত ? সবাই বদমাশ যদি বা হয় তাতেই কি আমাদেরও সব বাঁধ ভেঙে দিতে হবে ?

আচ্ছা লোক তুমি মাইরি।

শুয়ে থাকগে মনো। মাথা ঠাণ্ডা কর গে।

টাকা দেবে না ?

শুধবি কি করে ?

ঠিক শুধবো।

ও হয় না রে। আমাকে টাকার ফেরে ফেলিস না। আমি বড় গরিব।

মনো কাদে। হার মানে। শেষে বলে, মোটে বিশ-বাইশ বছর বয়স আমার, এই বয়সেই সব চলে গেল। তোমার মায়া হয় না ?

দূর পাগল! মায়া হবে না কেন ? মায়া হলেই কি ঘর করতে হয় নাকি ?

মনো চুপ করে বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, মেয়ে হয়ে জন্মালে বুঝতে পারতে কেনম ঘেন্নার জীবন আমাদের। একটা পুরুষ মানুষ না হলে আমাদের সব নেতিয়ে পড়ে। সেই পুরুষ আমাকে পছন্দ করবে কিনা, আমাকে রাখবে কিনা তাই নিয়েই সারাক্ষণ বুকের মধ্যে ধুকপুক। মেয়েমানুষের বেঁচে থাকাটাই কত ঘেন্নার কথা।

তুই অমন অস্থির হচ্ছিস কেন ? ধৈর্য ধরে দেখ কী হয়।

উপদেশ দিও না গো। সব জানি। আমাদের আবার কী হবে। লেখাপড়া জানি না, রূপ নেই, টাকা নেই। আমাদের মতো মেয়েদের গতি কি হয় জানো না ? শেষ অবধি গিয়ে ভাগাড়ে পড়তে হবে। শেয়াল-শকুনে ছিড়ে খাবে। মা গো!

উঃ! ও সব কথা বলিস না মনো।

বলব না ? চোখের সামনে যা সব দেখছি।

ব্যথিত, দুঃখিত নিমাই চুপ করে বসে থাকে। সে তো আর অন্ধ নয়। মেয়েমানুষের মাংস নিয়ে ব্যবসা সে কিছু কম দেখেনি।

তুমি লোক বড় ভাল গো, নিমাইদাদা। আমার একটা গতি করে দাও। নইলে কিন্তু কপালে আমার লাইনে নামাই আছে।

নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মনোর গতি সে কি করে করবে বুঝতে পারে না। তার ছোট্টো কারবারে তো বেশি লোক লাগে না। তার চেয়ে বড় কথা, মনো কাছাকাছি থাকলে তার বিপদের ভয়টাও থেকে যাবে।

মনো চলে যাওয়ার পরও নিমাই বসে বসে অনেকক্ষণ মেয়েমানুষ নিয়ে ভাবে। বীণাপাণিও মেয়েমানুষ। যখন বিয়ে হয়ে কিশোরী বীণাপাণি এল তখন ভিত্ত, ছোটোখাটো, অভিমানী, সোহাগী মেয়েটা যেন নিমাইয়ের অন্ধকার জীবনটাই আলোয় ভরে দিয়েছিল। বীণাপাণি আজও নিমাইয়ের কাছে পুরোনো হয়নি। আজও রোজ, সর্বদা মনের মধ্যে বীণাপাণির যাতায়াত। কিন্তু বীণাপাণি নিমাইয়ের কাছে যা, অন্যের কাছে তা নয়। সে যাত্রার নটী, একা, অভিজাবকহীন। সেও তো লোভী পুরুষের চোখে নারীমাংস ছাড়া আর কিছু নয়।

বুকটা বড় ব্যথিয়ে ওঠে নিমাইয়ের। বুকের মধ্যে যেন এক শূন্য প্রান্তরে শুকনো বাতাস হু হু করে বয়ে যায়। আজও বীণা তার খোঁজ নেয়নি। বছর ঘুরতে চলল।

পতিতপাবন দত্ত মশাইয়ের তুলো অন্ন তোশক-বালিশের কারবার উঠে যাচ্ছে। দোকানখানা বন্দোবস্ত নিয়ে ফেলল নিমাই। নিজের টাকাতেই কুলিয়ে গেল। তবে দোকান নিলেই তো হল না। চেয়ার টেবিল, বেসিন, কল, বাসনপাত্র নিয়ে মেলা খরচ।

নিরঞ্জনবাবু বললেন, টাকা দিচ্ছি। সব দিক সামলে ভাল করে দোকান দাও। হিসেবটা ঠিকমতো রেখো। হিসেবের ব্যাপারে তোমার গাফিলতি আছে। আর চৌকিদারের চাকরিটাও তোমাকে করতে হবে না। আমি অন্য লোক দেখে নিচ্ছি।

নিমাই হাতজোড় করে বলে, আজে না। ওটা ছাড়ব না। বেতন দিতে হবে না, ওটা আমি বেগার খেটে দেবো।

কোন দুঃখে ?

ওটা আমার পয়া চাকরি।

নিরঞ্জনবাবু হাসেন, পাগল আর কাকে বলে! রাত জাগলে দোকান করবে কি করে ?

আজে পারব!

এত খাটলে শরীর ঠিক রাখতে পারবে ?
শরীরের কথা ভাবলেই শরীর বেগড়বাই করে। ভগবান শরীর দিয়েছেন খাটানোর জন্য, বসিয়ে রাখার জন্য তো নয়।
তাহলে করো। বেতনও পাবে। কলিকালে সং আর সাধুদের তো কলকে নেই। তা তোমার যদি এই ঘোর কলিকালে
কিছু উন্নতি হয় তবে বুকে বল ভরসা পাবে। সাধু সজ্জনদের আজকাল বড়ই দুর্গতি।

আমাকে সাধু বলবেন না। তাতে সাধুদের অপমান।
খুব খাটুনি গেল দিন কতক। দোকান ঝাড়পোছ করা, রং লাগানো, সবই নিজের হাতে করতে হল তাকে। মিস্ত্রি
মেলা পয়সা চায়। আর নিজের হাতে করলে যে সুখটা হয় তা মিস্ত্রিকে দিয়ে করালে হয় না।
দোকানটা দাঁড়াল মন্দ নয়। সাইনবোর্ডের কথা একবার ভেবেছিল সে। তারপর ভাবল, চেনা বামনের পৈতে লাগে
না।

পালপাড়া থেকে মা-বাপকে আনাল নিমাই। নদেরচাঁদ এল সঙ্গে। পূজা-টুজো দেওয়া হল দোকানে। ঝাওয়া-দাওয়া
হল।

ও নিমাই, এ কি আমাদের হোটেল ? সত্যি ?
হ্যাঁ মা, এ নির্ঘস আমাদেরই হোটেল।
সোনার চাঁদ রে, কি করে করলি বাবা ? এ যে বিশ্বাসই হয় না। চেয়ার টেবিল আলো দিয়ে এ যে অশ্লীল
কাণ্ডকারখানা!

মা-বাপের মুখে হাসি ফোটাতে পারা সৌভাগ্যের কথা। ক'টা ছেলে করতে পারে তা ? নিমাইয়ের বুক ভরে উঠল।
একখানা লড়াইতে সে হেরে গেছে বটে, কিন্তু ভগবান তাকে আত্মাঝুঁড়ে ফেলে দেননি।

মাকে বলল, আর পালপাড়ায় পড়ে থাকার দরকার কী মা ? হোটেলের পিছন দিকে ঘর আছে। সেখানেই থাকতে
পারবে।

মা বলে, তা তুই যা বলিস। তবে সেটা নিজেদের বাড়ি তো। এ হল ভাড়ার ঘর।
নদে মাথা নেড়ে বলে, ও কাজ করতে যেও না নিমাইদা। পালপাড়ার ঠেকটা রেখো। আমি বলি কি একটু চাষের
জমিও কিনে রাখা গায়ে। জমির মতো জিনিস নেই।

নিমাই দোনামোনা করে বলল, তাহলে তাই হোক।
দিন যায়। ভালই যায়। হোটেল চলছে রমরম করে। সারাটা দিন শ্বাস ফেলার সময় থাকছে না নিমাইয়ের।
নানারকম নতুন নতুন খাবারের কথা মাথায় ঘোরে তার। গোটা কয়েক রন্ধনপ্রণালী কিনে ফেলল সে। দুটো বিয়েবাড়ির
অর্ডার পেয়ে মোটা লাভ হল তার। নিরঞ্জনবাবুর টাকা শোধ করতে তিন-চার মাসও লাগল না।

কিন্তু মাঝে মাঝে দুপুরের সামান্য ফাঁকে যখন একটু ঘুমিয়ে নিতে যায় নিমাই বা রাত জেগে গুদাম পাহারা দেয় তখন
মনে হয়, এই যে তার এত হচ্ছে-ট হচ্ছে, এ সব তো বীণা দেখছেও না, জানছেও না। আহা বীণা যদি একবার দেখত! তার
মুখে যদি একটু অবাক-হাসি আর সোহাগের ভাব ফুটত দেখে! এত পরিশ্রম সার্থক হত তাহলে।

কী নিমাইদা! চিনতে পারছো ?
নিমাই অবাক হয়ে দেখে ছেলোটাকে। তারপর অহ্লাদের গলায় বলে, পল্টু! আরে এসো এসো।
পল্টুর বনগায়ের লটারির দোকানে অনেক বসে থেকেছে নিমাই। ভাল ছেলে।
তোমার দোকানের কথা শুনেছিলাম। এদিকে এসেছিলাম একটা কাজে। বোনের জন্য সন্ধ্যা দেখতে। তাই এখানে
একটা টু মারলাম।

ভাল করেছে। বোস।
বসব! কোথায় বসব ? তোমার দোকানে তো দেখছি গিজগিজ করছে খন্দের!
তা একটু হয়। ওরে, এখানে কাউন্টারের পাশে একটা চেয়ার দে তো।
পল্টুর জন্য এক প্রেট মাংস আর পরোটার অর্ডার দিয়ে নিমাই বলল, তারপর গদিককার খবর কী বলো!
বীণাদির খবরও চাও নাকি ?

বীণা ভাল আছে ?
ভালই তো। বিশ্ববিজয় অপেরার তো এখন খুব নাম। বীণাদিরও হাল ফিরেছে।
থাক। ভাল থাকলেই ভাল। ঘরখানা কি পাকা করেছে ?
তা জানি না। তবে পথে-ঘাটে দেখি, চেহারা ভাল হয়েছে।
নিমাই চুপ করে থাকে। বীণা ভালই আছে। তার মানে তাকে ভুলেছে বীণা। মুছে ফেলেছে জীবন থেকে।
কাকা কেমন আছে পল্টু ?

আছে, ভালই আছে। সব ঠিক আছে। একবার যেও বনগায়ে। তোমার কথা খুব মনে হয়। এখানে এসে খুব ভাল
করেছ নিমাইদা। তোমার অবস্থা তো দেখছি ফিরে গেছে।

ভগবানের দয়া।
গিয়ে বীণাদিকে সব বলব'খন। অবশ্য বীণাদিও খবর রাখে।
রাখে ?
খুব রাখে। আমাকে একদিন বলছিল, জানো তো সেই নেমকহারাম লোকটা আমাকে ছেড়ে গিয়ে হোটেল খুলেছে!
বলছিল ?
কী বলছিল সেটা বড় কথা নয়। বলছিল যে সেটা বড় কথা।

জ্যোৎস্না রাতে ছাদের রেলিং-এর ধারে পাশাপাশি দুজন দাঁড়ানো। দৃশ্যটা আপাতদৃষ্টিতে বেশ রোমান্টিক। চয়ন তো বয়সে একজন যুবকই। এবং অনিন্দিতাও কি যুবতী নয়?

যদিও এটা শীতকাল। তবু আজ কলকাতায় শীত একদম নেই। একটু আগে চয়ন ফিরেছে। নিচে গিয়ে চৌবাচ্চায় হাত মুখ ধুয়ে যখন ওপরে আসছে তখন অনিন্দিতা পিছু পিছু এল।

ছাদে পা দিয়েই বলল, কাল একটা থিয়েটার দেখবেন?

থিয়েটার!

কেন, থিয়েটার দেখেন না?

চয়ন খুবই বিব্রত বোধ করল। সিনেমা থিয়েটার জলসায় সে কখনও যায় না, যাওয়ার কথা মনেই হয় না। এন্টারটেনমেন্ট জিনিসটাই তার মধ্যে নেই।

সে মাথা নেড়ে বলল, না। সময়ই হয় না।

কেন, আপনার এত সময়ের টানাটানি কেন হয়? টিউশনি আর এমন কী একটা কাজ?

চয়ন মৃদু একটু হাসল। কিছু বলল না। সত্যি কথাটা বললে মেয়েটা খুব অবাক হবে। সে মৃদু স্বরে বলে, অনেকদিন আগে মাঝে মাঝে সিনেমা দেখিছি। এখন কেন যে ইচ্ছে হয় না!

আপনি অদ্ভুত মানুষ। বাচতেই জানেন না। বড্ড শুকনো।

চয়ন মাথা নেড়ে বলে, তা ঠিক।

কেন এরকম আপনি? আমার তো থিয়েটারের ভীষণ নেশা। কিছু বাদ দিই না। কাল যাবেন? আমার কাছে দুটো কমপ্লিমেন্টারি টিকিট আছে।

এইসব প্রস্তাব মোটেই সুখাবহ নয় চয়নের কাছে। সর্বদাই তার একটা ত্রাস, বউদি বা দাদা যদি রেগে যায়? এ মেয়েটা ইদানীং প্রায়ই ছাদে আসে আড্ডা মারতে, মাঝে মাঝে ওদের ঘরে ঢেকেও চা খাওয়ায়। ওদের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতা চয়ন বজায় রাখতে চায় না। বউদি হয়তো ভাল চোখে দেখছে না। সে চিলেকোঠায় উঠে আসায় এবং ঘরের ভাড়া বাদদ মাসে মাসে বউদিকে কিছু টাকা দিতে শুরু করায় সম্পর্কটা ভাল আছে। কতদিন থাকবে তা বলা কঠিন।

চয়ন একটু অস্বস্তির সঙ্গে বলে, কাল তো সময় হবে না। ছাত্রীর পরীক্ষা চলছে।

অনিন্দিতা গম্ভীর হয়ে বলে, আসলে আপনি আমাকে অ্যাডভাইজ করতে চান।

তা নয়। বিশ্বাস করুন।

অনিন্দিতা বিশ্বাস করল না। একটু ম্লান হেসে বলল, এ যুগে এত লজ্জা সংকোচ আর ভয় থাকলে চলে না। ওসব ঝেড়ে না ফেললে বাঁচবেন কি করে?

চয়ন চুপ করে রইল।

অনিন্দিতা কি একটু সেজে এসেছে? ঘরের আলোর আভাষ তাই যেন মনে হল চয়নের। চুল পরিপাটি করে বাঁধা, মুখে একটু পাউডার এবং হয়তো বা কাজলও। কপালে একটা বড় আর একটা ছোট টিপ। কে জানে কেন, ব্যাপারটা লক্ষ করে সে অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করল।

আসুন, একটু গল্প করি।

এ প্রস্তাবের মধ্যে প্রত্যাখ্যানের কিছু নেই। অনিচ্ছুক চয়ন তাই বাধ্য হয়ে রেলিংয়ের ধারে অনিন্দিতার পাশে দাঁড়াল। বেশ একটা সুগন্ধ আসছে অনিন্দিতার গা থেকে।

খুব দুগ্ধ পেলাম জানেন, একটু ইনসাল্টেড ফিল করছি।

তটস্থ হয়ে চয়ন বলল, কেন?

আপনি রিফিউজ করলেন বলে। ইচ্ছে করলেই যেতে পারতেন। কী এমন টিউশনি করেন শুনি! তারা তো আর মাথা কিনে নেয়নি।

চয়ন কি বলবে তা ভেবেই পেল না। সে কাউকে তোয়াজটাও করতে শেখেনি।

অনিন্দিতা একটু বিষণ্ণ গলায় বলল, আপনার কথা ভেবেই দুটো টিকিট চেয়েছিলাম। অবশ্য আপনার মতটা আগেই জেনে নেওয়া উচিত ছিল।

চয়ন মেয়েটাকে খুশি করতেই বলল, আচ্ছা, আর একদিন যাবো।

অনিন্দিতা মাথা নেড়ে বলে, আপনি যে কখনও যাবেন না তা আমি জানি। আপনার অনেক অজুহাত বেরোবে। আমি ভেবেছিলাম, আপনাকে তো কোনওদিন টিউশনি ছাড়া আর কিছু করতে দেখি না। বড্ড ড্রাই জীবন কাটাচ্ছেন। তাই ভাবলাম, একটা নাটক দেখাই আপনাকে। হয়তো ভাল লাগবে।

চয়ন এ কথায় যথেষ্ট কৃতজ্ঞ বোধ করল। একটা মেয়ের সঙ্গে থিয়েটার দেখতে যাওয়া দোষেরও কিছু নয়। কিন্তু এই ঘটনা থেকে নানা রকম ব্যাখ্যা বেরোতে পারে। ভয়ের সেইটাই।

একটা কথা বলবেন? আপনি সব ব্যাপারেই এত ভয় পান কেন?

আমি ভীষণ ভিত্ত।

থিয়েটারে যাওয়ার মধ্যে ভয়ের কী আছে? কেউ খারাপ ভাববে? আজকাল আর ওসব কেউ ভাবে নাকি?

সে কথা নয়।

অথচ আপনার কত ফ্রিডম দেখুন। একে তো আপনি পুরুষমানুষ। মেয়েদের তুলনায় পুরুষদের ফ্রিডম অনেক বেশী। আপনার মাথার ওপর কোনও গার্জিয়ান নেই; কেউ শাসন করবে না। এত ফ্রিডম থাকা সত্ত্বেও কেন যে লজ্জা সংকোচ ভয়ে এমন কুকড়ে থাকেন!

পার্থিব—৩৫

খুব নিঃশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল চয়ন। তারপর বলল, আমার জীবনটা ঠিক আর পাঁচজনের মতো স্বাভাবিক নয়। অনিন্দিতা তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। বলল, কেন বলুন তো! আপনার এপিলেপসি আছে বলে? ওটা তো অনেকের থাকে! তা বলে সব বিসর্জন দিয়ে বিধবার মতো থাকতে হবে নাকি?

চয়ন বিষণ্ণ নরম গলায় বলল, এই অসুখটা আমার মনের জোর নষ্ট করে দিয়েছে। সব সময়ে একটা অস্বস্তি থাকে মনে।

তাই নিজেকে গুটিয়ে রাখেন?

চয়ন মাথা নেড়ে বলল, তাই। হয়তো ওটা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স।

অসুখের চিন্তা করেন কেন? এপিলেপসি একটা পাজি অসুখ। কিন্তু ফ্যাটাল তো নয়। আপনার কতদিন পর পর ওটা হয়?

তার কিছু ঠিক নেই। গত তিন মাস হয়নি। আবার হয়তো পর পর তিন চারদিন হবে। দিনে দু-তিনবারও হয়েছে। রাত্তাঘাটে বিপদে পড়তে হয় মাঝে মাঝে।

গত তিন মাস হয়নি বলছেন! এটা তো ভাল লক্ষণ। হয়তো সেরেই গেছে।

চয়ন হঠাৎ একটু যেন সচকিত হয়ে বলল, সারেনি।

কি করে বুঝলেন?

চয়ন হঠাৎ নাটকীয়ভাবে টের পেল তার চারদিকে একটা কুয়াশার ঘেরাটোপ তৈরি হচ্ছে। চোখে একটা অস্পষ্ট সিগন্যাল দেখতে পায় সে। কুয়াশা ভেদ করে একটা রেলগাড়ি খিকখিক করে এগিয়ে আসছে। তার বুড়ো আঙুল কেঁপে উঠল হঠাৎ

অস্ফুট গলায় চয়ন বলল, ওই যে!

কী ওই যে! কী হল আপনার?

প্লিজ! বলেই চয়ন দৌড়ে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে কোনওরকমে ছুঁড়ে দিল নিজেকে বিছানায়।

অনিন্দিতা ঘাবড়ে গেল না। দ্রুত পায়ে এসে তার কাছে দাঁড়াল। চয়নের হাত কাঁপছে। শরীর কাঁপছে। ধীরে ধীরে মুষ্টিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে আঙুল। সে প্রাণপণে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করতে করতে বলল, কাউকে ডাকবেন না কিন্তু, প্লিজ!

অনিন্দিতা ঘরে রাখা ছোটো প্রাস্টিকের বালতিটা থেকে আজলায় জল তুলে নিয়ে চয়নের চোখে ঝাপটা দিল একবার। এটুকু চয়ন টের পেল। তারপরই তলিয়ে গেল তার নিজের ভিতরে এক অন্ধকারে।

যখন চোখ মেলল তখন তার বুক, মুখ, জামা সব জলে ভেজা। খুব শীত করছে। শরীর অসম্ভব দুর্বল। বিছানার পাশে অনিন্দিতা দাঁড়িয়ে, কিন্তু তাকে সে কয়েক সেকেন্ড চিনতেই পারল না।

কেমন লাগছে এখন?

চয়ন শুধু চেয়ে রইল। মাথা এত সাদা যে কথাটা ভাল করে বুঝতেই পারল না। জ্বাব দেওয়ার ভাষাটাও বুঁজে পেল না কিছুক্ষণ। অবোধ চোখে শুধু চেয়ে থাকল।

চয়নবাবু! কেমন লাগছে?

চয়নের মাথার অস্পষ্টতা সরছে। মনে পড়ছে। সৌজন্যবোধ তার বড়ই বেশী। মৃদু একটু হাসার চেষ্টা করে সে বলল, ভাল।

করুণা আর মায়াময় নরম হয়ে আছে অনিন্দিতার মুখখানা। ছলোছলো চোখে সে বলল, খুব কষ্ট হচ্ছে?

চয়ন তার ঠাণ্ডা দুর্বল শরীর আর ভারী মাথা নিয়ে পাথরের মতো শুয়ে থেকো মৃদু একটু হেসে বলল, আমার অভয়াস আছে। এ তো আমার পুরনো বন্ধু।

একটু দুধ এনে দিই? গরম দুধ?

চয়ন আত্মধিকার এবং নিজের ওপর যেন্নায় মুখখানা সামান্য বিকৃত করল। তারপর খুব মৃদুস্বরে বলল, না। দুধ আমার সহ্য হয় না।

অনিন্দিতা তার মুখের ওপর একটু বুকে পড়ে বলল, এ সময়ে দুধ খেতে হয়। আমি নিয়ে আসছি।

অনিন্দিতা চলে গেল। আবার আসবে। চয়ন তার ঘরের সিলিঙের দিকে চেয়ে চুপ করে শুয়ে থাকে। উঠবার সাধ্যই নেই এখন। কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে সে উঠতে পারবে। কিন্তু শরীরটা অনেকক্ষণ দুর্বল আর অবশ থাকবে। অনেকক্ষণ ধরে তার শরীরের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বাজবে ঝিকি পোকার শব্দ। এই শরীর নিয়ে কি বাঁচা যায়?

হাঁ করে খুব বড় বড় শ্বাস নিচ্ছিল চয়ন। ভীষণ শীত করছে তার। গায়ের ভেজা জামাটা বদলানো দরকার। মুখ মাথা আর ভেজা বুক ভাল করে মোছা দরকার। খুব ধীরে ধীরে সে উঠবার চেষ্টা করল। এই চেষ্টাই তার যাবতীয় জীবনসংগ্রাম। লোকে কিছুতেই বুঝবে না, তার শুধুমাত্র বেঁচে থাকা আর শরীরটাকে টেনে শেষ অবধি নিয়ে যাওয়াটাই সবচেয়ে বড় কথা।

সে উঠে বসল। দেখল, জলের ঝাপটায় তার বালিশ আর বিছানাটাও অনেকটা ভিজে গেছে। চাদরটা পালটালে ভাল হয়। চৌকির নিচে একটা পুরনো সুটকেসে চাদর আছে। কিন্তু উবু হয়ে বসে সুটকেস খুলতে এই ছোট ঘরে যে কসরত করতে হয় তা করার সাধ্যই তার নেই। শুধু বালিশটা উল্টে দিল সে। এতেই আপাতত হবে। জামা বদলানো থেকে গা মোছা প্রত্যেকটা কাজই মনে হচ্ছে বেদম পরিশ্রমের ব্যাপার। তার বড্ড ঘুম পাচ্ছে। আজ রাতে রান্না বা খাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। কিন্তু অনিন্দিতা আসবে বলে সে ঘুমোতেও পারবে না এখন। অপেক্ষা করতেই হবে।

শুয়ে গিয়ে কবলটা টেনে জেগে থাকার একটা অক্ষম চেষ্টা করছিল সে। কিন্তু অনিন্দিতা আসতে দেরি করছে। ঘুম তাকে টেনে নিল চুষকের মতো।

মাথায় হাতের স্পর্শে ফের জাগল চয়ন। পাশাপাশি অনিন্দিতা আর তার মা দাঁড়ানো।

অনিন্দিতার মা জিজ্ঞেস করল, ঘুমিয়ে পড়েছিলে বাবা ? নাকি আবার অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে ?
চয়ন মৃদু হেসে উঠে বসবার চেষ্টা করতেই উনি বাধা দিয়ে বললেন, শুয়ে থাকো। উঠতে হবে না।
সে দুধ খায় না। কারণ দুধটুকু খাওয়ার কথা তার মনেও হয় না। তবে প্রতিবাদ করতে গেলে যে শক্তি ক্ষয় হবে তার চেয়ে বিনা প্রতিবাদে খেয়ে নিলে খলটা হবে কম। অনিন্দিতার হাতে কাচের গেলাসে দুধটা দেখে ভিতরের অনিচ্ছা চেপে সে ফের উঠতে গেল।

অনিন্দিতা বলল, উঠবেন না। হাঁ করুন, আমি খাইয়ে দিচ্ছি।
চয়ন হাঁ করে এক ঢোক দুধ খেল। সামান্য একটু ঝাঁঝ টের পেল সে।
অনিন্দিতা মৃদু স্বরে বলল, একটু ব্র্যান্ডি মেশানো আছে। তাতে দুর্বলতা কেটে যাবে।
দুধটা খাওয়ার পর সত্যিই তার শরীরটা একটু গরম হল। সে মৃদু স্বরে বলল, আপনাদের কষ্ট দিলাম। এত কিছুর দরকার ছিল না। খানিকটা ঘুমোলেই উইকনেসটা কেটে যায়।

অনিন্দিতার মা তার মাথার কাছটিতে একটু কষ্ট করেই বসলেন। বললেন, কষ্ট কিসের ? এটুকু আবার কষ্ট নাকি ?
তোমাকে তো দেখার কেউ নেই। অসুখ নিয়ে পড়ে থাকো। তোমার তো দেখছি বড় কষ্ট।

এই সহানুভূতি চয়নকে একেবারে কাদামাটির মতো নরম করে ফেলে। সে কৃতজ্ঞ গলায় বলে, কষ্ট করাই যে আমার অভ্যাস। আমার কোনও অসুবিধে হয় না।

তার চারদিকে কত দয়ালু লোক। রাত্তায় ঘাটে কতবার অজ্ঞান হয়ে পড়েছে সে। প্রতিবারই অচেনা মানুষেরা তাকে সেবা দিয়েছে। কেউ কেউ নিজের পয়সায় ট্যাক্সি ভাড়া করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে। সে তাই সকলের প্রতিই একটা বিশ্বজনীন কৃতজ্ঞতা বোধ করে।

অনিন্দিতার মা তার কপালে হাত রেখে বললেন, আমাদের পর ভেবো না বাবা, তোমার বয়সী আমার একটা ছেলেও তো থাকতে পারত!

এ ধরনের কথা চয়ন শরৎচন্দ্রের উপন্যাসেই হয়তো পড়েছে। হয়তো এধরনের কথা বাংলা সিনেমাতেও ব্যবহৃত হয়। কথাটা অর্ধসত্য। ছেলের সঙ্গে ছেলের মতো মনে করেও একটা পার্থক্য থাকেই। পরভূটা ঘুচতে চায় না। তবু চয়নের বড় ভাল লাগল কথাটা।

তুমি রাতে কী খাও বাবা ? ভাত না রুটি ?
চয়ন সসংকোচে বলে, ভাতই খাই। কেন জিজ্ঞেস করছেন ?
আমি আজ তোমার জন্য ভাত রান্না করি।

চয়ন খুবই বিব্রত হয়ে বলল, না না, আমি আজ আর কিছু খাবো না।
পাগল! তাই কি হয়! না খেলে আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। তুমি ভাল করে খাও না বল্লেই তো এরকম হয়।
চয়ন বড়ই অস্বস্তিতে পড়ে গেল। তার প্রতি এত সহানুভূতি, এই যত্নআত্তি কিছুই বউদির কাছে গোপন থাকবে না।

ব্যাপারটা বউদির ভাল চোখে দেখবে না কিছুতেই। সে বউদিকে চেনে।
মাথা নেড়ে সে বলল, আমার আর খিদে নেই যে। দুধ খেয়ে পেট ভরে গেছে।

ও মা! খিদে জন্ম তো গোটা রাত পড়ে আছে। এখন তো মোটে সাড়ে আটটা বাজে। অনিন্দিতা রইল এখানে, গল্পটুকু করে। সাড়ে নটায়ে খেও।

গোটা ঘটনাটা ঘটছে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। সে উদ্বেগে, অস্বস্তিতে কাঁটা হয়ে আছে। অখচ প্রতিরোধের কোনও ক্ষমতাও তার নেই।

অনিন্দিতার মা চলে যাওয়ার পর জায়গাটা নিল অনিন্দিতা নিজেই। বলল, ডাক্তার দেখাবেন ?
চয়ন মৃদু হেসে বলে, অনেক দেখিয়েছি। এর তো কোনও চিকিৎসা নেই।

তা জানি। কিন্তু আপনার শরীরটা যদি এমনিতে ভাল হয়ে ওঠে তা হলে অ্যাটাকটা হয়তো কম হবে। আপনাকে এক ফাইল ভিটামিন ক্যাপসুল দেব, রোজ একটা করে খাবেন তো।

তার দরকার নেই।
অত সংকোচ করছেন কেন ? আমাকে তো কিনতে হয় না। নার্সিংহোম-এ দেদার ফিজিসিয়ানস্ স্যাম্পল আসে। আমার ফ্রি পাই।

ও, ভিটামিন খেলে কিছু হয় ?
হয়। জীবন থেকে নিজেকে অত সরিয়ে রাখবেন না। নিজের ওপর বিশ্বাস এত কম কেন ?

চয়ন চুপ করে রইল। ঘরে একটা ঘাট পাওয়ারের বালব জ্বলছে। সেই আলোয় অনিন্দিতাকে তার এখন হঠাৎ দেবী বলে ভ্রম হচ্ছে। শোয়া অবস্থায় এই অ্যাসেল থেকে সে আগে তো কখনও অনিন্দিতাকে দেখেনি।

কী ভাবছেন ?
চয়ন সলজ্জ একটু হেসে বলল, আপনারা আমার জন্য এত করছেন বলে আমার ভীষণ লজ্জা করছে। অভ্যাস নেই তো। যতদিন মা ছিল ততদিন—

কথাটা শেষ করতে পারল না চয়ন। মা যতদিন ছিল ততদিন কি সে মায়ের কাছ থেকে অনেক পেয়েছে ? না।
শেষদিকে মা তো কিছুই পারত না। শুধু শুয়ে থাকত। স্ট্রোকের পর তো সে মনে মনে চাইত, মা তাড়াতাড়ি মরে যাক।

এত কষ্ট পাওয়ার চেয়ে সেটাই ভাল। তবু মা যে ছিল সেই থাকাটাই যেন অনেক ফাঁকফোকর, অনেক শূন্যতাকে ভরে রাখত। তখন টের পেত না চয়ন। এখন পায়।

মাকে খুব ভালবাসতেন বুঝি ?
চয়ন বলল, সেটা বড় কথা নয়। মা ছাড়া আর কেউ তো ছিল না আমার।

আপনার এক দিদি আছেন না ?
 আছে। সংসার নিয়ে ব্যস্ত।
 দাদা বউদিকে তো দেখছি। ছিঃ ছিঃ।
 চয়ন সতর্কভাবে চুপ করে থাকে।
 অনিন্দিতা তার মাথায় হাত রেখে নরম গলায় বলে, বাতিটা নিবিয়ে দেব ? চোখে লাগছে না তো!
 চয়ন আতঙ্কিত বোধ করে বলল, না না, থাক। আমার কোনও কষ্ট হচ্ছে না।
 ওঃ তাই তো! আপনার তো শুচিবায়ু আছে। ভুলেই গিয়েছিলাম।
 বলেই হাসল অনিন্দিতা। সেই সুন্দর দাঁতের চমৎকার হাসি। মেয়েটা সুন্দরী নয়, কিন্তু ওই হাসিটা যেন অন্য জায়গা থেকে আসে। একটা শুকনো, শ্রীহীন মুখকে ক্ষণিক সৌন্দর্যে উজ্জ্বল করে দিয়ে কোথায় চলে যায়।
 চয়ন লজ্জা পেয়ে চোখ বুজে ফেলে বলে, আপনি আমার সম্পর্কে খুব খারাপ ভাবেন, না ?
 ভাবলে কি বসে আছি এভাবে ?
 চয়ন করুণ গলায় বলল, আমাকে নিয়েই আমার যত সমস্যা। আর কেউ নয়, নিজেকে সামলাতেই আমার সমস্যা হয়।

তাই তো বলছিলাম, আপনার মনের জোর নেই।
 তা তো নেই-ই।
 কেন নেই ?
 কখনও ভেবে পাই না।
 আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ? কিছু মনে করবেন না ?
 না না, আমার মনে করার কিছুই নেই।
 আপনার আনিং কত ?
 চয়ন একটু হাসল, তারপর একটু হিসেব করে বলল, হাজার দেড়েক হবে।
 খুব খারাপ তো নয়!
 না। তেমন খারাপ নয়।
 তা হলে এখানে পড়ে আছেন কেন ? একটা ছোট ঘড়ি ভাড়া করলেই তো হয়।
 চয়ন মাথা নেড়ে বলল, হয়। কিন্তু ইচ্ছে করে না। এখানে অনেকদিন ধরে আছি তো।
 মায়ের স্মৃতি ?
 তাও হবে হয়তো। আর বউদিকে আমি সামান্য টাকাই তো দিই ভাড়া হিসেবে।
 অনিন্দিতা হঠাৎ চোখ বিস্ফারিত করে বলে, ভাড়া দেন ?
 হঠাৎ চয়ন বুঝতে পারল, ভাড়ার কথাটা বলা তার ঠিক হয়নি। সে ভাড়াতাড়ি বলল, বউদি বা দাদা ভাড়া চায়নি কখনও। আমি ইচ্ছে করেই দিই। বউদি নিতে চায়নি।
 অনিন্দিতা অবাক হয়ে বলল, নেবেই বা কেন ? নেওয়ার তো কথাই নয়।
 প্রিজ! আপনি কথাটা ভুলে যান। কাউকে বলবেন না।
 অনিন্দিতা আবার হাসল। তারপর বলল, অতি ভিত্তি বলেই আপনার কিছু হয় না। এত ভয় পান কেন ?
 আমার সব কিছুকেই ভয়।
 তার কপালে একটা হাত রেখে অনিন্দিতা বলল, ভাড়ার একটা রসিদ চেয়ে নেবেন এবার থেকে।
 রসিদ! রসিদ দিয়ে কী হবে ?
 ওটা তো আপনার পাওনা।
 চয়ন একটু হাসল। বলল, ওরকম সম্পর্ক তো নয়। আমি দাদার সংসারে একটু সাহায্য করি মাত্র।
 অনিন্দিতা মাথাটা হেলিয়ে তাকে মায়াভরা চোখে একটু দেখে নিয়ে বলল, আপনি পারবেন না।
 কী পারব না ?
 আপনি কোনও লড়াই জিততে পারবেন না। বড্ড বোকা।
 এটা আদুরে গলায় বলা। চয়ন আদরটা টের পেল। খারাপ লাগল না। কিন্তু তার কেন যেন মনে হল, সে ছোট্ট একটা পোকার মতো একটা মাকড়সার জালের মধ্যবিন্দুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।
 অনিন্দিতা একটু বাদে নিচে গিয়ে তার জন্য ভাত নিয়ে এল। এবং আশ্চর্যের বিষয় ভাতের থালা দেখে চয়নের ভীষণ খিদে জেগে উঠল। চটেপুটে খেল সে। রান্না চমৎকার।
 অনিন্দিতা খুশি হয়ে বলে, এবার দরজা বন্ধ করে ঘুমোন।
 ঘর অন্ধকার করে ঘুমোবার চেষ্টা করতে গিয়ে চয়ন টের পেল, তার মাথাটা গরম। কেমন একটা অস্থিরতা আর উদ্বেগ। অনিন্দিতা কি কিছু বলতে চাইছে ? তাও কি সম্ভব ? সে যুবক বটে, কিন্তু যুবকের মতো তো নয়।

আমি নিশ্চয়ই একটা গুণার দল খুলব। যত অন্যায় আর অবিচার আছে আর হচ্ছে সব কিছুকে তন্দরুস্থ করতে হবে।
 আমার এই ঘোষণা শুনে খুবই অবাক হয়ে গেল বুঝকা আর অভিজিৎ। বুঝকা বলল, গুণার দল খুলবে ? আপা, তোমার মাথাটাই গেছে।

আপা একটু উম্মার সঙ্গে বলল, তোমাদেরও মাথা আমার মতোই খারাপ হওয়া দরকার ছিল। কিছু তোমাদের কোনও ইনভলভমেন্ট নেই বলে হচ্ছে না। তোমরা আছ নিজের ধাক্কা। নিজের উন্নতি, নিজের ভবিষ্যৎ। আমার মতো যদি দুনিয়াকে দেখতে তো বুঝতে।

তা বলে গুণার দল!

আমাদের পিছনের বস্তি থেকে একটা লোক তার বউ আর তিনটে বাচ্চাকে রেখে আর একজনের বউ নিয়ে পালিয়ে গেছে। সেই লোকটাকে আমি অন্তত দশ জায়গায় খুঁজেছি। তারপর ধরেছি গোবিন্দপুর বস্তিতে। লোকটা আমার চেনা, পাশ আর পাইপ সারাতে নাম গোপাল। যখন ধরলাম তখন আমাকে তেড়ে এল, জানো? সঙ্গে আরও দশ-বারোটা লোক আর সেই ভেগে আসা মেয়েটা! আমাকে হয়তো মারধরও করত! কী গালাগাল!

অভিজিৎ অবাক হয়ে বলে, তুমি গেলে কেন? লোয়ার ক্লাসের লোকদের তো ওরকম কত হয়।

আপা অভিজিৎের দিকে ভৎসনার চোখে চেয়ে বলল, লোয়ার ক্লাস বলে উপেক্ষা করলে চলবে? ওই লোকটার বউ ডলি আমাদের বাড়িতে এক সময়ে ঘরের কাজ করত। গোপাল পালিয়ে যাওয়ার পর তিনটে বাচ্চা নিয়ে ভীষণ বিপদে পড়েছে। দুবেলা খাওয়া জট্টেছে না।

অভিজিৎ বলল, তুমি পুলিশকে জানালে পারতে। ইটস্‌ এ কেস অফ বাইগ্যামি। পুলিশ যা করার করত।

তুমি বডই ভাল ছেলে অভিজিৎ। বাইগ্যামি হল ভদ্রলোকদের টার্ম, নিচুতলার লোকদের কাছে ওসব শব্দ অচেনা। পুলিশের কথাও আর বলো না। আমাদের পাড়ার এটা ফ্ল্যাটবাড়ির পার্সপেক্টিভ চুরি গিয়েছিল। থানায় কি বলল জানো? বলল, কারা চুরি করেছে তা আমরা জানি, কিন্তু কিছুই করার নেই। করলেই এক ঘটনার মধ্যে পাঁচশো লোক এসে থানা ঘিরে ফেলবে। তাই আমি পুলিশের কাছে যাইনি। নিজেই গিয়েছিলাম, যদি লোকটাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করতে পারি।

বুবকা বলল, অ্যান্ড ইউ ওয়ার টট এ লেসন।

আপা একটু হেসে বলল, আমাকে অত সহজে শিক্ষা দেওয়া যায় বলে তুমি বিশ্বাস করো?

তা হলে তুমি এখন কী করবে?

আমি লোকটাকে জোর করে ধরে আনব। বউটাকেও। ওদের এরকম কাজ করার অধিকার নেই।

জোর করবে? তার জন্যই তোমার গুণা দরকার?

আপা মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ। তবে প্রফেশনাল গুণা নয়। তারা লোভী, অন্যায়কারী। আমার গুণারা হবে অন্যরকম। সমাজের ভালোর জন্য তারা সব করতে প্রস্তুত থাকবে। ঘাড় ধরে লোককে দিয়ে যেটা ভাল তা করিয়ে নেবে। কোনওভাবেই তাদের চরিত্র কেউ নষ্ট করতে পারবে না।

বুবকা খুব গম্ভীর গলায় বলল, আপা, তুমি যে একটু পাগল তা কি তুমি জানো?

জানি। আমার মতো পাগলই এখন দরকার। প্রিজ অনীশ, তুমিও একটু পাগল হও।

দেখ আপা, তোমার জন্য একবার আমিও পাগলামি করেছি। ড্রাগ পেডলাররা যখন তোমাকে আটক করেছিল—তখন জীবনে আমি যা করিনি—তাও করেছি। একজনকে ধরে বেধড়ক ঠেঁকেছি। মনে আছে?

আছে। সেই জন্য আমি তোমাদের ওপর রেগেও গিয়েছিলাম। ওদের মারাটা আমার প্রোগ্রামে ছিল না। কাজটা মোটেই ভাল করনি।

অ্যান্ড ইউ আর নট ইভন থ্রেটফুল।

কেন হব? তোমাদের বলেছিলাম লোকগুলোকে চিনে রাখতে। তোমরা ওদের মেরে ছাড়িয়ে দিলে। ওদের আর পান্সাই পাওয়া গেল না।

তা হলে ওরা তোমাকে মেরে ফেললেই ভাল হত নাকি?

মারলে মারত। কত লোক তো রোজ কত কারণে মারা যাচ্ছে। ওটা কোনও ঘটনাই নয়। আমি চাইছি এসব জিনিসকে একদম উপড়ে ফেলতে। তার জন্য এখন আমার সতিই একটা গুণা-বাহিনী দরকার।

অভিজিৎ ওয়েট লিফ্টার। সে রীতিমতো ব্যায়াম করে এবং বিভিন্ন কম্পিউশনে নামে। বিস্তর প্রাইজও পেয়েছে। সে বলল, আমি তোমার দলে নাম লেখাতে রাজি আছি। কিন্তু এটা তো জানো, এ যুগে শুধু গায়ের জোরে গুণামি চলে না, ইউ মাস্ট হ্যাভ আর্মস। তোমাকে পিস্তল জোগাড় করতে হবে, সাব মেশিনগান, চপার।

আপা হতাশভাবে বলল, ওঃ! বুদ্ধ আর কাকে বলে। ওসব দরকার হয় মানুষকে মারার জন্য। আমি তো তা করব না। আমি শুধু ফোর্স করে ফোর্স করে লোককে অন্যায় কাজ থেকে সরিয়ে আনব।

অভিজিৎ মাথা নেড়ে বলে, তুমি ইমপ্র্যাকটিক্যাল। শুধু ঘুমি দেখে আজকাল খুব কম লোকই ভয় পায়।

টিফিন পিরিয়ড চলছে। কুলের কম্পাউন্ডে অনেক ছেলেমেয়ে। তারা একটু তফাতে, একটা গাছের তলায় বসে।

আপা টোট উল্টে বলে, যাদের হাতে আর্মস থাকে তাদের কিন্তু নৈতিক জোর থাকে না।

তার মানে?

আপা একটু হেসে বলে, তোমরা আমাকে পাগল বলো। তা আমি একটু তো পাগলই। আমার মনে হয় মানুষ যখন হাতে কোনও মারণাস্ত্র পায় তখন তার নৈতিক সাহস আর দৃঢ়তা খানিকটা চলে যায়। ওই অস্ত্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে সে। অস্ত্রটা ব্যবহারের একটা অজুহাত খোঁজে সে।

বুবকা হেসে বলে, ওঃ, ইউ আর রিয়েলি ইমপারসিবল।

আপা করুণাভরে বুবকার দিকে চেয়ে বলে, শোনো বুদ্ধ, আমি যে গুণাদের কথা বলছি তাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হবে নৈতিক চরিত্র আর ব্যক্তিত্ব। সেটাই মানুষের সবচেয়ে বড় অস্ত্র।

ওসব কথা বইতে লেখা থাকে আপা। প্র্যাকটিক্যাল কথা ওটা নয়। আজকাল মর্যাদা কারেজের কোনও দামই নেই। একটা বোমা মেরে সব কারেজ-ফরেজ উড়িয়ে দেবে।

দিক না। একবার দু'বার পাঁচবার দেবে। তারপর দেখো, চাকা ঘুরে যাবে উল্টোদিকে। মানুষের হাতে বরাবরই তো অস্ত্র ছিল, তাই বলে কি সাহসী লোকেরা নিরস্ত্র অবস্থায় ভাল কাজ করেনি কখনও ?

যুগ পাশ্টে গেছে আপা।

যুগ আবার পাশ্টে দেওয়া যায়।

বুবকা বলল, তোমার নিরামিষ গুণার দলে আমি নেই আপা।

তোমাকে আমি আমার ডালিকার বাইরেই রেখেছি বুবকা।

বুবকা হেসে ফেলল, তোমার কি লিষ্ট তৈরি হয়ে গেছে ?

আপা হাসল না। গম্ভীর হয়ে বলল, হচ্ছে।

কী করবে তারা ? মারপিট ?

দরকার হলে করবে। কিন্তু মারপিটের চেয়েও বড় কথা, দেশে যে সব অন্যায্য, পাপ আর খারাপ ঘটনা ঘটছে তার একটা ছক আছে। ইংরিজিতে যাকে বলে প্যাটার্ন।

ইউ মিন নকশা ?

হ্যাঁ। এই নকশাটাকে ধরাই সবচেয়ে বেশী দরকার। মানুষ তো যা খুশি করছে। কেন করছে তা না জানলে কিছু করা যাবে না। এই যে গোপালের কথা বললাম, এ কোন সাহসে এরকম কাজ করল ? এর পিছনেও একটা নকশা আছে। ও জানে, এরকম একটা অন্যায্য করলেও কিছু হবে না। ওর বউ কয়েক দিন কান্নাকাটি করবে, দু-চার দিন হয়তো ওকে একটু বকাঝকা করবে। তারপর মেনে নেবে। তাই না ?

বুবকা গম্ভীর হয়ে বলে, এটা হল একটা পারমিসিভনেস। তুমি এটাকে আটকাতেও পারবে না।

আপার ক্লাসেও কি ওরকম হয় না ? কত ডিভোর্স হচ্ছে।

সেটা হোক। কিন্তু বউটার মাসোহারা গোপালের কাছ থেকে আদায় করে দাও তা হলে। উঁচু সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ হলে মাসোহারার ব্যবস্থা থাকে।

বুবকা মাথা নেড়ে বলে, তুমি বেসরকারি গোয়েন্দা আর সৈন্যবাহিনী গড়তে চাইছ কেন ? ওকে পুলিশে ধরিয়ে দাও। চেষ্টা করেছি। হয়নি। আইনে অনেক ফাঁক থাকে অনীশ। সেই ফাঁক দিয়ে অপরাধীরা গলে যায়। তুমি কি জানো শতকরা সত্তর-আশিটা রেশ কেস-এ আসামীর কোনও সাজা হয় না ?

আমি অত জানি না।

আমি জানি। পুলিশ কেস সাজায় না, সাক্ষীরা ঠিকমতো সাক্ষী দেয় না, আরও নানারকম ব্যাপার আছে। আইনের ফাঁক দিয়ে যেসব অপরাধী বেরিয়ে আসবে আমার গুণারা তাকেও ধরবে।

ধরে কি করবে আপা ?

তাকে দিয়ে অপরাধ কবুল করাবে, ক্ষতিপূরণ আদায় করবে, কৃতকর্মের জন্য তাকে অন্তত হতই হবে।

তুমি একটা প্যারালাল গভর্নমেন্ট তৈরি করতে চাও ?

ঠিক তাই চাই।

বুবকা আর অভিজিৎ হাসল।

অভিজিৎ বলল, আইডিয়া ইজ গুড।

বুবকা বলে, বাট ইমপ্র্যাক্টিকেল। আপা রবিন হুড হতে চাইছে।

অভিজিৎ বলে, চম্বলের ডাকাতরাও নাকি এরকম সব কী করত। কমন পিপল লাইকড দেম।

আপা বিরক্তির সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, ডাকাতের কথা উঠছে কেন ?

প্ল্যানটা অনেকটা ওরকম বলেই।

তোমরা আমাকে সমর্থন করছো না তা হলে ?

অভিজিৎ বলে, করছি।

বুবকা মাথা নেড়ে বলে, আমি করছি না।

টিফিন শেষ হওয়ায় ক্লাসে ফিরে যেতে হল তাদের। কিন্তু বুবকার মাথায় সারাক্ষণ আপার অদ্ভুত প্ল্যানটা ঘুরতে লাগল। আপা গুণবাহিনী তৈরি করতে চায়, এটা কোনও অদ্ভুত কল্পনা নয়। আপা হয়তো ওরকম কিছু একটা করবেও।

রাগিবেলা সে তার সবচেয়ে প্রিয় ও বিশ্বস্ত বন্ধু তার বাবাকে কথাটা বলে ফেলল, জানো বাবা, আপা একটা গুণার দল তৈরি করছে!

গুণার দল! বলিস কী ?

এটা সব ডু-গুডার গুণ। সোস্যাল ইনজাসটিস আর করাপশনের এগেনস্টে লড়বে। শী ইজ অলরেডি ডুয়িং ইট। রিক্রুটমেন্ট শুরু হয়ে গেছে। অভিজিৎ পাগা আজ আপার গুণার দলে জয়েন করেছে।

মণীশ একটু হাসল, আইডিয়াটা খারাপ নয়। কী করতে চায় আপা ?

বললাম তো, সব অন্যায্য অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চায়।

তাকে রিক্রুট করেনি ?

না, আমি বললাম, আমি ওসব পাগলামিতে নেই।

আপাকে বলিস ওর লিটে যেন আমার নামটা চুকিয়ে নেয়।

বুবকা অবাক হয়ে বলে, তুমি! তুমি আপার দলে জয়েন করবে ?

আমার অনেক দিনের ইচ্ছে, পৃথিবীতে যত গুণগামি আর শয়তানি হয় তার বিরুদ্ধে আর একটা গুণগামি গড়ে তুলতে।

তুমি আপাকে সাপোর্ট করছ বাবা ?

খুব। হান্ড্রেড পারসেন্ট।

বুবকা খুব হাসল। বলল, আইডিয়াটা আমারও খুব খারাপ লাগছিল না। কিন্তু ও বলছে, ওর গুণাদের কাছে আর্মস্ থাকবে না। শুধু মর্যাল ক্যারেকটার আর কারেকজ।

আপা হয়তো একটু গান্ধীবাদী। কিংবা হয়তো ভাবে আর্মস্ হাতে পেলে এইসব ধর্মগুণারা আসল গুণা হয়ে যাবে।

আপা আরও গোলমালে কথা বলছে। ওর ধারণা, আর্মস্ পেলে মানুষের নাকি মর্যাল ক্যারেকটার নষ্ট হয়ে যায়।

মণীশ হাসল, আর্মসের সঙ্গে লড়তে হলে আর্মস্ও দরকার। অন্তত প্রাথমিকভাবে। তারপর অস্ত্র সংবরণ করা যেতে পারে।

বুবকা একটু চিন্তিত হল। বলল, হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার আগে আপা এসব করে বেড়াচ্ছে, পড়ছে না। কিন্তু পরীক্ষায় দেখো, সবাইকে বিট করবে। এটা আপা কিভাবে পারে বাবা?

শী ইজ পারহ্যাপস এ জিনিয়াস!

আমার ধারণা কী জানো? আপা হায়ার সেকেন্ডারিতে ইচ্ছে করলেই ফাস্টও হতে পারে। কিন্তু পড়েই না। কেবল সোস্যাল ওয়ার্ক করে বেড়াচ্ছে। আমরা ক্যারিয়ারিস্ট বলে ঠাট্টাও করে।

মণীশ বলল, সেটাও হয়তো ওর দিক থেকে ঠিকই করে। কিন্তু তা বলে তুই আবার ক্যারিয়ারের চিন্তা ত্যাগ করিস না। সেটা ঠিক হবে না।

বুবকার ঘুম সাজাতিক। বালিশে মাথা রাখলেই ঘুমিয়ে পড়ে। আজ রাতে ঘুম আসতে পনেরো মিনিট সময় লাগল। কারণ, ওই সময়টায় সে আপার কথা ভাবল। আপা কি ঠিক বলছে? আর সে নিজে কি মস্ত ভুল করছে জীবনে? তার কি ক্যারিয়ারিস্ট হওয়া উচিত নয়? তার কি দরকার আরও সোস্যাল ইনভলভমেন্ট?

পরদিন সে আপাকে ফের ধরল টিফিন পিরিয়ডে, এই যে লেডি রবিন হুড!

আপা তার দিকে তাকিয়ে বলল, বস্কমচন্দ্রের দেবী চৌধুরানী পড়নি অনীশ! কী বোকা তুমি! আমাকে দেবী চৌধুরানীও তো বলতে পারতে।

অনীশ দেবী চৌধুরানী পড়েনি। বইটার নাম অবশ্য শুনেছে। সে লজ্জা পেল। আপাকে ঘিরে এক গাদা ছেলেমেয়ে দাঁড়ানো। তাদের যেন কী একটা বোঝাছিল আপা। সবাই আপার কথা মন দিয়ে শুনছিল। পাগলী আপার কথা যতই অসম্ভব হোক, সবাই শোনে। এমন কি মিসরা পর্যন্ত।

বুবকা বলল, বাবা তোমাকে সাপোর্ট করেছে, জানো তো!

কাকাবাবু সমঝদার মানুষ, তোমার মতো নয়।

ইট সিমস্ সো। এমন কি, বাবা তোমার গ্রন্থপে নামও লেখাতে চেয়েছে। হি ওয়ান্টস্ টু জয়েন ইওর গ্রুপ অফ থাগস্। আপা হাসল, কাকাবাবু খুব ভাল লোক। বোলো, আমি তাঁর নাম টুকে নিয়েছি।

ছুটির পর আজ আপার সঙ্গেই বেরলো বুবকা। আর কেউ ছিল না সঙ্গে।

বুবকা বলল, তুমি কোথায় থামবে আপা? ইউ আর লিভিং এ ডেনজারাস লাইফ।

আমার বাঁধা জীবনে বিশ্বাস নেই অনীশ। আমি ওরকম ভাবে বেঁচে থাকতেও পারব না। তা বলে ভেবো না আমি হিংস্রতা পছন্দ করি বা মারধর খেতে ভালবাসি।

তুমি একটি রোগা দুর্বল মেয়ে। তুমি ঠিক বিপদে পড়বে।

বোকারাম, দুর্বল আর রোগা আর মেয়ে এই তিনটে কোনও শর্তই নয়। জোর কি শুধু গায়ের? এই যে অভিজিৎ বা অরোরা, ওদের গায়ে তো অনেক জোর। তা বলে কি ওরা সবাইকে হারিয়ে দিতে পারবে? না কি পারবে সমাজব্যবস্থা পাল্টে দিতে? মনের জোরই হল আসল জোর। আমি তো শরীরের শক্তির ওপর ভরসা করিনি।

বুবকা বিবর্ণ মুখে বলল, আই অ্যাডমিট দ্যাট। তোমার খুব সাহস। কিন্তু ইউ আর লিভিং এ ডেনজারাস লাইফ আপা। কেউ কেউ তোমার ওপর রেগে যাচ্ছে নিশ্চয়ই।

আমি জানি। আমার যেমন অনেক শত্রু আছে, তেমন আবার অনেক বন্ধুও আছে।

বন্ধুরা কি তোমাকে সবসময়ে বাঁচাতে পারবে?

আপা অবাক হয়ে বলে, বাঁচাবে! বাঁচাবে কি করে, তারা তো সবসময়ে আমার সঙ্গে থাকে না। বাঁচানোর দরকারই নেই। আমি যা করতে চাইছি সেটা তারা বুঝতে পারলে আর সমর্থন করলেই যথেষ্ট।

তুমি এই বয়সে এত পাকা হলে কি করে?

আপা হাসল। বলল, আঠারো বছর বয়স ভয়ংকর। মনে আছে?

বুবকা অবাক হয়ে বলে, তোমারও মনে আছে?

তোমার আঠারো বছর বয়স পেরিয়ে গেল অনীশ, কিন্তু তুমি তো ভয়ংকর হতে পারলে না! কাকাবাবু মিথ্যেই চিন্তা করলেন।

ভয়ংকর হব আপা? সেটা কিভাবে হওয়া যায়? আমি তো পোয়েট্রিটা কখনও পড়িনি।

কেন পড়নি?

কোথায় পাব?

আপা হাসল, থাকগে, তোমার ওসব পড়ার দরকারও নেই।

তার মানে আমাকে তুমি পাভাই দিচ্ছে না?

আপা হাসল। বলল, হি-ম্যান-এর মতো চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়ালে আর পরীক্ষায় গাদা গাদা নম্বর পেলেই কি পাভা পাওয়া যায়? তোমার গায়ে কতটা জোর বা লেখাপড়ায় তুমি কতটা ভাল তা নিয়ে দুনিয়ার মানুষের তো মাথাব্যথা নেই।

তা হলে কী করব? ভয়ংকর কিভাবে হওয়া যায়?

তোমাকে কেউ ভয়ংকর হতে তো বলেনি। বলেছে, আঠারো বছর বয়সটাই ভয়ংকর। এই বয়সে এসে মানুষ সব কিছু ভাঙুর তছনছ করে দেয়। এই বয়সে যুবক-যুবতীদের বাধ ভাঙার সময়।

আমি ওসব একদম বুঝি না আপা।

অথচ কবিতাটা তোমাকে এক সময়ে খুব ভাবিয়ে তুলেছিল।

বুবকা একটু হাসল, কবিতাটা আমাকে একবার পড়াবে?

পড়াব। এখন বাড়ি যাও, ভাল ছেলে।

শেষ কথাটা বোধ হয় অপমান। আপা তাকে মাঝে মাঝে মৃদু অপমান করে। করতেই পারে। বুবকা এখনও কত কী জানে না, কত কিছুর খবর রাখে না। এমন কি দক্ষিণ ভারতীয় আপার কাছে বাংলা নলেজেও সে কত পিছিয়ে আছে!

সন্ধ্যাবেলা আজ মাকে বাড়িতে একা পেল বুবকা। বাবা ফেরেনি। দিদি বা অনুও নেই।

খাওয়ার টেবিলে বসে পায়ের দিগে লুচি খেতে খেতে বুবকা বলল, আচ্ছা মা, তোমরা আমাকে অ্যাডাল্ট হতে দিচ্ছ না কেন বলো তো!

অপর্ণা একটু অবাক হয়ে বলে, ও মা! সে কি কথা?

কথাটা কি ঠিক নয়?

তোকে অ্যাডাল্ট হতে দেব না কেন?

তোমরা যে আমার ওপর অনেক রেস্ট্রিকশন চাপাও, এটা করিস না, ওটা করিস না, এর সঙ্গে মিশিস না।

আহা, ছেলের ভালোর জন্য সব মা-বাবাই বলে। তাতে তোর অ্যাডাল্ট হওয়া আটকাচ্ছে কিসে?

আপাকে তার বাড়ি থেকে অনেক ফ্রিডম দেয়, তা জানো?

আপা! ওই হোদের সকলের মাথাটা খাচ্ছে। এবার আসুক, খুব বকব। কী বলছে আপা এখন শুনি!

শুনলে তুমি রেগে যাবে।

তবু শুনব।

আচ্ছা মা, আমি তো কখনও দুট ছেলে ছিলাম না, না?

না। দুটু কেন হতে যাবি?

আমি খুব ভাল ছেলে?

অপর্ণা হাসল, ভালই তো। খুব ভাল।

কেন আমি ভাল ছেলে মা? কেন দুটু নই?

এসব আজ কী বলছিস? কী পোকা ঢুকেছে মাথায়?

ভাল ছেলেগুলো ভীষণ ভ্যাতভ্যাতে টাইপের হয়, না মা?

কে বলল ও কথা?

ভাল ছেলেরা খুব আন-ইন্টারেস্টিং।

তোকে বলেছে!

দেখ মা, সেই ছোট্টো বেলা থেকে আমি ভীষণ শান্ত, সব কথা শুনে চলি, পড়াশুনো করি, ভাল নম্বর পাই, জিনিসপত্র ভাঙি না, মারপিট করি না। সব সময়ে গুড বুক-এ আছি।

ডানপিটে হওয়া কি খুব ভাল নাকি? তোর বাবা অবশ্য খুব ডানপিটে ছিল। খুব সাহসীও। বিয়ের পরও মারপিট করেছে।

ওয়াজ হি ইন্টারেস্টিং?

অপর্ণার চোখে একটু রোমান্টিক ছায়া পড়ল। সামান্য হাসল সে। বলল, সবাই কি একই রকম হবে?

আমি বাবার মতো হলে কেমন হত?

তুই তোর মতো হয়েছিস।

বুবকা মাথা নেড়ে বলে, না মা, আই অ্যাম নট হ্যাপি উইথ মিসেলফ্। আমার নিজেকে ভাল লাগছে না। একদম ভাল লাগছে না।

॥ ৬৭ ॥

হোমস্‌র দাড়ি ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। গৌফের আড়ালে ঢেকে যাচ্ছে ঠোঁট। মুখময় দাড়ির একটা রাণী ও সতেজ প্রকাশ। কিন্তু দাড়ি-গৌফ কিছুই ঢাকতে পারে না হোমস্‌। ঢাকা পড়ে না তার বিষাদ, তার নিঃসঙ্গতা। কাজটা কিরকম হল? হতে পারত। অথচ হল না। রশ্মি আর কয়েকদিনের মধ্যেই চলে যাবে ইংলন্ডে। ভীষণ ব্যস্ত সে। এবার তার পাকাপাকি যাওয়া।

বিচ্ছেদটা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না হোমস্‌। সে রশ্মিকে প্রত্যাখ্যান করেনি। সেই সাধাই ছিল না তার। সে প্রত্যাখ্যান করেছিল স্থায়ী বিলাত-বাসকে। রশ্মিকে বলেছিল, আমি পারব না রশ্মি। আমি বড় হোম-সিক, এই দেশে, এই কলকাতায় আমার বড় মায়া। আমি পারব না।

রশ্মি নরম প্রকৃতির মেয়ে, কিন্তু ভাবপ্রবণ নয়, তার আবেগও তাই বেশি নয়। একটু ভেবে বলেছিল, আমি তা জানি হোমস্‌। মানুষকে ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা বেশ কঠিন, যদি তার নষ্টলজিয়া স্ট্রিং হয়। আমি হয়তো স্বার্থপরতার মতো তোমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। যাকগে।

হোমস্‌ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করেছে, তাহলে?

রশ্মি একটু সাদা, একটু উদ্ভাস্ত মুখে বলেছিল, তুমি ভেবো না, আমি এটা সত্য নেবো।
আমি কি তোমাকে অপমান করছি রশ্মি? আমি—আমি সত্যিই তোমাকে এত ভালবাসি, থাকতেই পারব না।
রশ্মি কিছুক্ষণ তার বিদ্যমানতা মুখখানা আকাশের দিকে তুলে রেখেছিল। লৌকো দুলছিল। ঢেউ ভাঙার গভীর শব্দ হচ্ছিল নৌকোর গায়ে। রশ্মি চোখ নামিয়ে বলেছিল, আমাকে তুমি এ দেশে থাকতে বলছে?

প্রিজ, রশ্মি! প্রিজ! থাকো।

রশ্মি দাঁতে টোট চেপে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, দেখ হোমাস, শুধু বিয়ের জন্য যদি থাকি সেটা আমাকে আর তোমাকে পরে যত্নগা দেবে। কোনও সময় হয়তো মনে হবে, আমরা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমার এখনও অনেক কাজ পড়ে আছে ওখানে। এ দেশে কিছু হওয়ার নয়, তুমিও তো জানো।

খানিকটা জানি। কিন্তু কেন তুমি ফিরে আসবে না?

ফিরে আসব না, বলিনি। কিন্তু ততদিনে হয়তো বয়স থাকবে না, মনটা অন্যরকম হয়ে যাবে। বাঁধাবাঁধির দরকার কি বলা? মা-বাবা এবার চেয়েছিলেন আমি বিয়ে করে স্বামীর সঙ্গে বিলেত যাই। সেটা সম্ভব হত, তুমি রাজি থাকলে। তুমি যেতে চাইলে না, আমাকে একাই যেতে হবে কিন্তু তোমাকে কেন কতগুলো কন্ডিশনে বেঁধে যাযো? সহ্য করা কঠিন হবে, কিন্তু তবু কন্ডিশন না থাকাই ভাল।

কেন ভাল?

রশ্মি খুব গভীর মুখ করে বলল, এটা তো সেই আগের যুগ নয়, হৃদয়ের ব্যাপারটা নিয়ে যখন বাড়াবাড়ি হত। এখন আরও কত দিক আছে জীবনের।

যদি আমি অপেক্ষা করি?

কেন করবে?

তুমি রাগ করছো রশ্মি?

রশ্মি মাথা নেড়ে বলে, রাগ নয়, অভিমান নয়, অপমানও নয়। আমার বরং একটু একা লাগছে। তুমি কেন যেতে চাও না, তা আমি বুঝছি। আমি ইনকনসিডারেট নই।

শোনো রশ্মি, আমার বিয়ে করার কোনও ইচ্ছেই ছিল না। তোমাকে দেখে সেটা হয়েছিল। কিন্তু আর নয়। এবার আমি একাই থাকব। অপেক্ষা করব।

রশ্মি একটু চুপ করে থেকে বলল, নিজেকে মুক্ত রাখো হোমাস। ওরকম শর্ত নিয়ে থেকো না। আমরা অ্যাডাল্টেসেন্স-এর সময়টা পার হয়ে এসেছি। তাই না?

হোমাস চুপ করে থাকে।

রশ্মি খুব নরম করে বলে, এ-দেশে কেউই কেন যে সময়মতো অ্যাডাল্ট হয় না, বহুদিন অবধি ছেলেমানুষ থেকে যায়! তুমিও ছেলেমানুষ।

হোমাস মাথা নেড়ে বলে, তা নয় রশ্মি। আমি হয়তো একটু আবেগপ্রবণ। কিন্তু তোমাকে যে মনেপ্রাণে চাই।

রশ্মি তার দিকে একটু মায়াভরে চেয়ে থেকে বলেছে, আমিও তো তোমাকে চাই। কিন্তু আমি অন্য সব ব্যাপারগুলোকেও উপেক্ষা করতে পারি না। সেন্টিমেন্টাল হলে কি লাভ বলো! বিয়ের পরই পুরুষ আর মহিলাদের প্রেম একটু একটু করে নেমে আসে। দেখছো না, জোয়ারের জল সরে গেলে কেমন থিক থিক করে কাদা।

যাঃ, কী বিচ্ছিরি উপমা!

রশ্মি হাসল না, গভীর মুখেই বলল, বিয়ের পর হয়তো আমাদের নানারকম ক্যালকুলেশন আসত। তার চেয়ে বরং লেট আস কুইট অ্যাঞ্জ ফ্রেন্ডস।

যেরকম সাহেবদের দেশে হয়?

সাহেবরা খারাপ লোক নয় হোমাস। অনেক প্র্যাকটিক্যাল যে।

এইভাবেই এক দেশী নৌকায় দোল খেতে খেতে মাঝদরিয়ায় তাদের সম্পর্ক শেষ হল।

আবার হলও না। হোমাসের কোনও কাজে মন নেই। পাটনারদের হাতে অফিস ছেড়ে দিয়ে সে এই শীতে চলে গেল রানিফ্রেত। সেখানে চুপচাপ হোটলে বসে রইল কিছুদিন। তাতে শান্ত হল না। ফিরে এল।

কিন্তু নদীর ধারের কুটিরটি তাকে আকর্ষণ করতে লাগল ভীষণভাবে। টানা প্রায় একমাস হোমাস রয়েছে এখানে। ঘুরে বেড়ায়, নৌকায় চেপে বেড়িয়ে পড়ে, বইয়ে ডুব দিয়ে বসে থাকে। কেউ তার খোঁজ করে না। সে বাড়িতে জানিয়েই এসেছে।

বাকি মিঞা রোজ হাজিরা দেয়। টেনে নিয়ে গিয়ে মাঝে মাঝে দাওয়াত খাওয়ায়।

হোমাসের কাছে পৃথিবীটা অনেকটাই বিবর্ণ এবং জীবন অর্থহীন হয়ে গেছে। সেটা প্রেমের চেয়েও বেশি পাপবোধে। সে কি আঘাত করল রশ্মিকে? সে কি ভুল করল ওর প্রস্তাবে রাজি না হয়ে?

আজকাল নিজের বিছানায় একটানা অনেকক্ষণ ধ্যানস্থের মতো বসে থাকে সে। বাইরেটা স্থির, কিন্তু মনের মধ্যে ঝড়ের বাতাস বয়ে যায়।

বাকি মিঞা এক সকালে এসে তাকে ধরল, কী হয়েছে বলুন তো! না বললে ছাড়ছি না। আমার তো ভয় হচ্ছে, মনে কথা চেপে রাখতে রাখতে আপনি না পাগল হয়ে যান।

হোমাস একটু হেসে বলে, পাগল বলেই ধরে নাও না কেন?

ধরে নিলেই হল নাকি? আমরা চাষাভূষা যাই হই, তবু অনেকটা পথ তো পার হয়েছি জীবনে। বোকা নই। একটু খুলে বলুন তো। খুন-খারাপি তো করে আসেননি। ব্যাপারটা কী?

এক রকম খুনই।

এই তো হেঁয়ালি হয়ে যাচ্ছে!

হেঁয়ালি একটু রাখতে হচ্ছে। সব কথা খুলে বলা যায় না।

বাঁকা মিঞা একটু লজ্জা-লজ্জা ভাব করে বলে, সেই বিয়ের ব্যাপারটা নাকি ?

হেমাঙ্গ মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

জিজ্ঞাস করতে লজ্জা হয়। তবু বলি, ব্যাপারটা কেঁচিয়ে দিলেন কেন ? মেয়েটা দেখতে তো পরী মতো। তার ওপর কত লেখাপড়া জানে। অবশ্য আমাদের মতো গেরস্তের ঘরে ওসব মেয়ে অচল। কিন্তু আপনার তো তা নয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হেমাঙ্গ বলল, ঠিকই বলেছো। বড় ভাল মেয়ে। অত ভাল আমার সইল না।

তাই ঘরে বসে বসে কেবল বড় বড় শ্বাস ছাড়ছেন ? আপনার মতো ছেলের কি মেয়ের অভাব হবে ?

তা নয় বাঁকা, মনটা খারাপ।

এখন উঠুন তো। চলুন একটু ঘুরেটুরে আসবেন।

আমার যে একটু চূপচাপ থাকতে ইচ্ছে করছে। নড়তে চড়তে ভালই লাগছে না।

পাগল নাকি ? শরীর বসিয়ে রাখলে নানা আধিব্যাধি হয়। মনটাও একটু ফুর্তিতে রাখা দরকার।

কোথায় যাবো ?

চলুন আজ গোসাবার দিকে যাওয়া যাক। একটা মোম্বব আছে। কীর্তন-টির্তন হবে। বড় গানাদাররা আসছে।

হই-চই ভাল লাগবে না বাঁকা। বরং জঙ্গলের দিকে যাই চলো।

তাই চলুন।

গেল হেমাঙ্গ, নৌকায় করে নদী আর খাল ধরে বিস্তর ঘুরল। বাঘা-জঙ্গলের ধারেকাছেও ঘোরাক্ষেরা হল। কিন্তু মনের মেঘ কাটল না। এত বিবর্ণ এত নিস্তেজ তার কখনও লাগেনি চারপাশটাকে। তবু এ জায়গা বলে রক্ষা। কলকাতা! হলে সে পাগল হয়ে যাবে বোধহয়।

অনেক রাত অবধি বাঁকা আজ রইল তার কাছে। বেশি কথা বলল না। তবে একবার বলল, বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘে খায়।

হেমাঙ্গ জবাব দিল না। নদীর ঢেউ আর বাতাসের শব্দ শোনে। একঘেয়ে, একটানা, ছেদহীন। ধ্যানস্থের মতো বসে থাকে। রুজি-রোজগার, উন্মত্তি, সাফল্য, প্রতিষ্ঠা সব বৃথা মনে হয়। বেঁচে থাকাটাও কত দুর্বহ, কত অর্থহীন!

বাবু, মেয়েটাকে কি আপনার খুব পছন্দ ছিল ?

হেমাঙ্গ একটু হাসল, অপছন্দের কিছু আছে ?

তবে হল না কেন ?

সে অনেক কথা বাঁকা।

কথা বলে খোলসা হচ্ছেন না কেন ? বাঁকা মিঞা তো পাঁচকান করবে না।

হেমাঙ্গ আবার একটু হাসল, তুমি সাদা লোক। কিন্তু দুঃস্থবুদ্ধিতে কিছু কম নয়। চারুকিকে খবর দিয়ে আনিয়েছিলে।

সে আপনার অবস্থা দেখে। এখন তো অবস্থা আরও খারাপ দেখছি।

হেমাঙ্গ মাথা নেড়ে বলে, এ সমস্যার সমাধান বাইরের কেউ করতে পারবে না বাঁকা।

তা হলে আপনিই করুন না কেন ?

কী করব ?

একটা ভাল দেখে বিয়ে করে ফেলুন।

হেমাঙ্গ হাসিমুখে বাঁকার দিকে চেয়ে রইল। বাঁকার কোনও হৃদয়ঘটিত সমস্যা হয়নি কখনও। হবেও না। বাঁকা সব সমস্যার সহজ সমাধান করে ফেলতে পারে। হেমাঙ্গ পারে না। দুজনের এই ব্যবধানটাকে সে কিছুক্ষণ মেপে দেখতে চেষ্টা করল।

বাঁকাও তার দিকে চেয়ে ছিল। বলল, মেয়েমানুষ নিয়ে অত ভাববার কী আছে ? আমরা তো অত ভাবিটাবি না।

হেমাঙ্গ মাথা নেড়ে বলে, তা নয় বাঁকা, মেয়েটার বোধহয় অপমান হল।

বাঁকা একটু শব্দ করেই হাসল, তাহলে বিয়েটা করলেই তো পারতেন। আপনি নিজেই তো গিট পাকিয়ে তুলছেন। সেইজন্যই তো ভাবনা।

তুমি বুঝবে না বাঁকা। আমার মনটা বড় খারাপ।

কাল রাতে একটা যাত্রা দেখতে যাবেন ? নতুন দল। বনগাঁ থেকে এসেছে।

হেমাঙ্গ মাথা নাড়ল, ইচ্ছে করে না যে!

দেখুন না, ভালও লেগে যেতে পারে। কোরাকাঠিতে হচ্ছে। বেশী দূরও নয়। বিশ্ববিজয় অপেরার এখন বেশ নাম।

হেমাঙ্গ চূপ করে রইল। কোনও আমোদ-প্রমোদই তার ভাল লাগছে না। কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। এমনকি সকালের বেড়ানোটা পর্যন্ত ক্লাস্তিকর মনে হয়।

বাঁকা চলে যাওয়ার পর অনেক রাত অবধি জানালার কাছে বসে রইল সে। অসহ্য শীত। জল-ছোঁয়া বাতাসে হাড় অবধি অবশ হয়ে যেতে চায়। তবু বসে রইল। ঘুম আসতে চায় না।

শোওয়ার আগে তার হঠাৎ মনে হল, আজ কী বার ? ঘরে কোনও ক্যালেন্ডার নেই। পত্রিকা আসে না। রেডিও বা টেলিভিশন নেই। অটোমেটিক ঘড়িটা হাতে দেয় না বলে বন্ধ হয়ে আছে। গুয়ে গুয়ে অনেকক্ষণ ভাবল সে। আজ কী বার ? কত তারিখ ? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হল, কী হবে জেনে ? একটা দিন গেল—এই মাত্র।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল মেঘলা আকাশের ছায়ায়। আজকের দিনটা ভাল যাবে না— মনে হল হেমাঙ্গর। খুব হাওয়া দিচ্ছে। ঠুঁটি ঠুঁটি বৃষ্টি। শীত আরও বাড়বে। নিজে এক কাপ কফি করে নিয়ে ঘরে বসল হেমাঙ্গ। আজ কিছু করার নেই।

একটু বেলার দিকে বৃষ্টিটা রইল না। তবে মেঘলা ছাডেনি। হোমস্ বাইরে বেরিয়ে দূরের আকাশের দিকে চেয়ে রইল। কাজের মেয়েটা ক'দিন আসছে না। জুরে পড়ে আছে। তাতে কোনও অসুবিধে নেই হোমস্‌র। সে ঘর ঝাঁট দেয় না। সামান্য কয়েকখানা বাসন নিজেই মেজে নেয়। বাঁকা মিঞা টের না পেলে না-রেখেও কেটে যায় এক-আধ বেলা। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘাটের দিকে চোখ নেমে এল তার। একখানা ভটভটি এসে ঘাটে লাগল। লোক নামছে। তাদের মধ্যে একজনকে দেখে চমকে উঠল সে। যার কথা আজকাল দিন-রাত ভাবে সে। ভেবে মন খারাপ হয়। সে-ই। পিছনে চারুশীলার বর সূত্র।

খুব আশ্চর্য আশ্চর্য উঠে এল রশ্মি। একটু বোগা হয়েছে কি? একটু উসকোখুসকো?
ফটকের কাছে এগিয়ে দাঁড়াল হোমস্। বুকটা থরথর করছে। হতাশা আর বিহ্বলতায় নিজের বশে থাকছে না সে।
ঘাট থেকে ওপরে উঠে ডানদিকে তার বাড়িমুখে মোড় নিতেই একটু দূর থেকেই তাকে দেখতে পেল রশ্মি। একটু হাসল। হাসিটা কি খুব বিষণ্ণ! অন্তত প্রাণহীন।

ফটকটা খুলে দিয়ে হোমস্ বলল, এসো।
কী চেহারা হয়েছে তোমার! চেনাই যায় না যে!

দাড়িটা কাটছি না।
চুলও আঁচড়াও না বোধহয়! বাবির রাখছো?
একটু তফাতে সূত্র। ধীরে হাঁটছে। তাদের একটু সুযোগ দিতে চাইছে হয়তো।
আসুন সূত্রতদা।

তুমিই হোমস্ নাকি? আমি তো ভেবেছিলাম কোনও চাষীর বাড়িতে ভুল করে ঢুকে পড়ছি।
চাষীই তো! চাষী হওয়ারই চেষ্টা করছি।
সূত্র ঘরে ঢুকতে চাইল না। বলল, তোমরা ভিতরে গিয়ে একটু কথা বলে নাও। আমি বাইরে বসছি।
হোমস্‌র বুকটা কাঁপছিলই। কাঁপন দ্রুততর হল মাত্র। রশ্মিকে নিয়ে ঘরে ঢুকে সে অপ্রতিভ বোধ করতে লাগল।
একটা প্রত্যাশা জাগছিল মনে। হয়তো—

রশ্মি মৃদু স্বরে বলল, কাল চলে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে দেখা করে যেতে এলাম।
বোসো রশ্মি। একটু বোসো।
রশ্মি বসল। বলল, তোমার বাড়িতে ফোন বেজে যায়, কেউ ধরে না। চারুদি বললেন, তুমি কলকাতায় যাচ্ছেই না আজকাল। শুনে ভীষণ খারাপ লাগল।

তাই এলে?
আর দেখা হবে কি না কে জানে! আমি জানতে এলাম, এরকম করছো কেন? কী হয়েছে তোমার?
শ্পষ্ট করে বলব?
কেন বলবে না?
আমার কেবল মনে হচ্ছে, তোমার প্রতি বড় অন্যায় করছি।
রশ্মি হাসল, একটু ফ্যাকাশে হাসি। মৃদু স্বরে বলল, আমি তা মনে করি না।
তোমাকে আমি অজান্তে অপমানও করেছি হয়তো।
এসব ভেবেই সন্ধ্যা নেওয়ার চেষ্টা করছো?
না রশ্মি তোমাকে ভুলতে পারছি না। কেবল মনে হচ্ছে, ভুল করলাম।
শোনো, ভুল করলে তার সংশোধনের উপায় আছে। হচ্ছে করলেই তুমি সাতদিনের মধ্যে ইংল্যান্ডে গিয়ে হাজির হতে পারো। তাই না?

গেলে তুমি খুশি হবে?
হবে না? কিন্তু সেটা করার আগে একটু ভেবো। তুমি ভীষণ ভদ্রলোক, তাই তোমার কেবল মনে হচ্ছে আমার প্রতি অন্যায় করেছে! তা তো নয়। অকপট হওয়াই তো ভাল।
হোমস্ লজ্জায় রশ্মির মুখের দিকে তাকাতে পারল না। নতমুখ হয়ে বলল, আমার একটা আত্মগোপন হচ্ছে। আমি তোমাকে ভালবাসি রশ্মি।

আমি জানি। কিন্তু এরকমভাবে নিজেকে শান্তি দিচ্ছে কেন? তোমার আপনজনদেরও কষ্ট দিচ্ছে। আমাকেও।
হোমস্ মৃদু হেসে বলে, এখনও অ্যাডাল্ট হইনি যে!
সেটা বুঝতে পারছি। তুমি এরকম করলে আমারও খুব মনটা খারাপ লাগবে। এমনতেই লাগছে।
বিয়েটা হচ্ছে না বলে তোমার বাড়িতেও নিশ্চয়ই কথা হচ্ছে।
আমার বাড়িতে কেউ অবুঝ নয়। প্রবলেমটা সবাই বুঝতে পারছে, তাই সিচুয়েশনটা মেনেও নিয়েছে। যদিও তোমাকে সকলেরই খুব পছন্দ ছিল। কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল বাধাগুলোকে তো অস্বীকার করা যাবে না!
হঠাৎ হোমস্ একটু খুঁকে রশ্মির একখানা হাত স্পর্শ করে বলল কেন যাচ্ছে রশ্মি? কেন যাচ্ছে? আরও বড় হয়ে কী করবে?

রশ্মির চোখ দুটো এ-কথায় ছলছল করে উঠল। সামান্য বিষাদ-মাখা গলায় বলল, আমি কিভাবে বড় হয়েছি তা তো তুমি জানো। আমার ধারণাই যে অন্যরকম। কাজ আর পড়াশুনো ছাড়া আমার কাছে অন্য সবকিছুই আনইন্টারেস্ট। তুমি বিশ্বাস করবে না আজ অবধি তুমি ছাড়া আমার জীবনে কোনও পুরুষই ওয়েলকাম ছিল না। দো দেয়ার ওয়ার অফারস্ অ্যান্ড প্রোপোজালস্। কিন্তু ভেবে দেখেছি, এটা আমি সয়ে নিতে পারব। কোনও অসুবিধে হবে না। তুমিও এরকম ভেঙে পড়ো না। বলছি তো, যদি তোমার মন বদলায়, সত্যিকারের বদলায়, তাহলে চলে যেও।

হেমাঙ্গ করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রশ্মির দিকে।
রশ্মি মৃদু গলায় বলল, এবার ওঠো! আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। কলকাতায়।
যাবো! কিন্তু ইচ্ছে করছে না যে!
প্রিজ। কাল এয়ারপোর্টে আমাকে সি-অফ করতে হবে। আমি তোমার হাসিমুখ দেখে চলে যেতে চাই।
হেমাঙ্গ তবু খুম হয়ে বসে রইল।
একটু গলা খাঁকারি দিয়ে সুব্রত ঘরে এল। বলল, চলো হেমাঙ্গ! তোমার চারুদি দিনরাত তোমার কথা বলছে ইন
ফ্যাক্ট সে-ও খুব আপসেট।

কেন?
তোমাদের ঘটকালি তো চারুই করেছিল। চলো।
চারুদির কোনও দোষ নেই।
সেটা তাকে তুমিই বুঝিয়ে বলো। বিডন স্ট্রীটেও খুব ঝামেলা হচ্ছে। তোমার ওল্ল ম্যান আর ওল্ড লেডি দুজনেই খুব
আপসেট। তাদের ধারণা, তোমার আইবুড়ো অপমান আর ঘুচবে না।

যেতেই হবে?
রশ্মি বলল, হ্যাঁ। একা থাকছো বলেই তোমার মন ভার হয়ে থাকছে। নরম্যাল জীবনে ফিরলেই দেখবে, সব ঠিক
হবে যাবে। ওঠো! আজ ওয়েদার ভাল নয়। আমরা তাড়াতাড়ি ফিরব।
একটা কথা জিজ্ঞেস করবো রশ্মি?

বলো।
তুমি নিজের গরজে এসেছো, না চারুদি পাঠিয়েছে?
রশ্মি অবাক হয়ে বলে, কেন বলো তো!
এমনি।
কোনটা শুনলে খুশি হবে?
যেটা সত্যি, সেটা।
রশ্মি একটু হাসল। বলল, বড্ড সেন্টিমেন্টাল হয়েছো তো তুমি! সত্যি কথা হল, চারুদির কাছে শুনে আমি নিজেই
এসেছি। চারুদি বরং আসতে বারণ করেছিল। বিশ্বাস হল?

একটা গভীর স্বস্তির শ্বাস ফেলে হেমাঙ্গ বলল, হল। মন থেকে একটা ভার নেমে গেল।
সেটাই বা কেন?
তুমি নিজের টানে এসেছো, এটা কত ভাল লাগবে ভাবতে। তাই না, বলো!
তবে কি ভেবেছিলে টান সব ছিড়ে ফেলেছি?
তোমার কথা দিনরাত ভাবছি, তুমিও যে একটু ভাবো এটা জেনে এত ভাল লাগছে!
একটু! কী অদ্ভুত লোক তুমি বলো তো!
এই সময়ে সুব্রত নিঃশব্দে ফের বাইরে গেল।

রশ্মি বলল, তোমার কথা ছাড়া কিছুই ভাবিনি ক’দিন। অন্তত বিশ বার ফোন করেছি। হাতে সময় থাকলে আরও
কয়েকদিন আগেই চলে আসতাম। আজও কত কাজ ফেলে এসেছি।
হেমাঙ্গ উঠল। চারদিকে চেয়ে বলল, আমার কিছু গোছানোর নেই। শুধু পোশাকটা পাল্টানো দরকার। লুঙ্গি পরে তো
যাওয়া যায় না।

রশ্মি একটু হেসে উঠে বাইরে গেল।
খুব ধীরে ধীরে পোশাক বদলায় হেমাঙ্গ। যদি এই পোশাক বদলের মতো মনটাকেও বদলে ফেলা যেত!
উভটিতে রশ্মির কাছাকাছি বসে রইল সে। কিন্তু কথা আসছিল না। কথা হারিয়ে বসে আছে সে। মেঘলা ময়লা
আকাশের নিচে স্লান চরাচর, জল আর ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস। এ সবের মধ্যে একটা শীতল সমান্তর আভাস রয়েছে।
সে একবার জিজ্ঞেস করল, মনে থাকবে রশ্মি, আমাকে?
সে কথা তার চোঁট থেকে কেড়ে নিয়ে গেল লুঠেরা বাতাস। রশ্মির কানে পৌছলো না।
আপনমনে একটু মাথা নাড়ে হেমাঙ্গ। মনে রাখার দরকার কী? কেন বন্ধন? কেন মনের বাঁধনে আটকে থাকা?
কোনও দরকার নেই তো!

॥ ৬৮ ॥

নিজেকে মুক্ত রাখা কি সোজা কথা? অনেক কষ্টে কচ্ছপের মতো নিজের ভিতরে গুটিয়ে থাকা শিখেছি।
নয়নতারা পান মুখে দিয়ে বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে বসে বলল, তোমার মতো কি আমি পারি? আমি হলাম
মেয়েমানুষ।

বিষ্ণুপদ নয়নতারার দিকে চেয়ে একটু হেসে বলে, আজকাল মেয়েরা কিছু কম পারছে নাকি? তোমাতে আমাতে
তফাত করো কেন? তফাতটা কম বয়সে ছিল। বুড়ো হলে আর তফাতটাই বা কি?
নয়নতারা কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, ও পাপের কথা, মেয়েমানুষে আর পুরুষমানুষে তফাত থাকবে না, তাই কি হয়
গো?

বিষ্ণুপদ উঠানে পড়ে থাকা শীতের রোদের দিকে চেয়ে থেকে বলে, তফাত আছে, প্রকৃতির তফাত। কিন্তু ক্ষমতার নয়।

ওসব কি আমি বুঝি! পুরুষমানুষ চালায়, মেয়েমানুষ চলে—এই তো দেখে আসছি চিরকাল।

তুমি আর দেখলে কতটুকু? ঘরে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। আসল কথাটা আমার কি মনে হয় জানো? পুরুষমানুষের মধ্যে যা আছে, মেয়েমানুষের মধ্যে তা নেই। আবার মেয়েমানুষের মধ্যেও এমন কিছু আছে যা পুরুষের নেই। হরদরে দু'পক্ষই সমান। যিনি মানুষ তৈরি করেছেন তিনি তো আর আহাম্রিক নন, একচোখোও নন। সমান সমানই দিয়েছেন দুজনকে, তবে রকমটা আলাদা।

তোমার সব অলঙ্কারে কথা।

আমি যেমনটা বুঝেছি বললাম। তবে কি জানো, মেয়েমানুষ যদি পুরুষের সঙ্গে গায়ের জোরে পাল্লা দেয় বা পুরুষের যা জন্মগত গুণ সেইটে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে, তাহলে তো হেরেই যাবে। আবার মেয়েমানুষের যা বিশেষ গুণ সেখানে পুরুষ ভেড়া। বুঝলে? সৃষ্টিকর্তা দুজনকে দু'রকমভাবে গড়েছেন— এইটে বুঝতে লাগবে। নইলে হবে না। তাই বলছিলাম, তোমার সঙ্গে আমার যা তফাত সেটা প্রকৃতিগত।

ও বাবা, ওসব বুঝে আমার কাজ নেই। এ জন্যে আমার যা বুঝ হয়েছে তাই নিয়েই কাটিয়ে যাই।

বিষ্ণুপদ একটু হেসে বলে, পরের জন্মে যদি আমেরিকায় মেম হয়ে জন্মাও তখন কি হবে?

ও বাবা! ওসব খারাপ কথা বলছো যে! তোমার মুখের কথা ভীষণ ফলে যায়, তা জানো?

কেন, আমি কোন বাকসিদ্ধাইটা?

আছো একটু। দেখেছি তো, যা বলো তাই হয়।

তাহলে এটাও হোক।

নয়নতারা হেসে ফেলল। বাব্বা, রক্ষা করো, ফ্রক পরে, গা দেখিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারব না মরে গেলেও। কথা ফিরিয়ে নাও বলছি।

বিষ্ণুপদ খুব মজার হাসি হেসে বলে, খারাপ কি? তুমি মেম হয়ে জন্মালে আমিও না হয় সাহেব হয়ে জন্মাবো।

নয়নতারা চোখ কপালে তুলে বলে, তোমারও জন্মানোর দরকার নেই বাপু। গরুটর খায় ওরা। কত অনাচার করে।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, তা বললে চলবে কেন? সাহেবরা যদি খারাপই হবে তবে দুনিয়াটা চালাচ্ছে কি করে?

আমার দুনিয়ার খবরে কাজ নেই বাপু।

বিষ্ণুপদ খুব হাসল। মাথা নেড়ে বলল, কাজ নেই বললেই হয়? তোমার বড় ছেলে সারা দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছে, তুমি তার মা হয়ে একটু ভূগোল না জানলে লোকে বলবে কি?

নয়নতারা হেসে ফেলে বলে, এই বুড়ো বয়সে কি আমার ওপর মাষ্টারি করবে নাকি? ভূগোল শিখে এখন আর কী হবে?

দুনিয়ার হালচাল একটু জানা ভাল। চাল ভাল তেল নুন ছেলেমেয়ে স্বামী এসব নিয়ে তো কম ভাবো না। আর একটু বড় করে ভাবলে দেখা ভালই লাগবে।

নয়নতারা একটা দোজাপাতা ছিড়ে মুখে দিয়ে বলে, এই চিন্তাভেঁই বলে সময় পাই না। বামা আর রেমোতে কেমন লেগে-যাচ্ছে দেখছো তো! কুরুক্ষত্র হবে এইবার। ভয়ে মরি।

বিষ্ণুপদ হাসি-হাসি মুখ করে বলে, সেইজন্যই তো কচ্ছপের মতো হতে বলি।

তুমি পারো। আমি পারি না। বাড়ি ভাগ বাঁটোয়ারা হবে, তবে তার আগেই কিরকম লেগে যাচ্ছে দু'ভাইয়ে। বামা তো রোজ আমাকে ঘর ছেড়ে দিতে বলছে।

বিষ্ণুপদ। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, আমাকেও বলছে। ভাগের কাগজপত্র তৈরি হবে, আদালতে যাবে, তারপর তো! তাছাড়া বামা ভুলেই যাচ্ছে যে, বাড়ি জমি আমার নামে, আর আমি এখন বেঁচে আছি। বামাকে নিয়ে ওইটেই মুশকিল। ওর তর সয় না।

নয়নতারা একটু চারদিকে চেয়ে দেখে নিল। রামজীবন বা বামাচরণ বাড়িতে নেই। বউরা যে যার নিজের ঘরে। গোপালকে নিয়ে পটল গেছে খেলতে। পটলের বইখাতা এখনও বিষ্ণুপদের সামনে পাতা মাদুরে ছড়ানো। নয়নতারা হামাগুড়ি দিয়ে একটু কাছে এসে বসল। তামাকপাতার হেঁচকি তুলে বলল, আর জন্মে সাহেবদের দেশেই জন্মাবো দুজনে চলে। যদি তাতে একটু শান্তি পাই।

বিষ্ণুপদ হাসিমুখে বলে, শান্তি কি ভাল জিনিস?

নয়নতারা অবাক হয়ে বলে, নয়?

সবসময় নয়। শান্তিতে থাকলে মানুষের চনমনে টগবগে ভাবটা থাকে না। পাল্লা ভাতের মতো হয়। এই যে সংসারে নানা উপসর্গ নিয়ে আছে, এসবও জীবনের ঝাল-নুন। সবই দরকার হয়। সাহেবরাও যে শান্তিতে থাকে এমন নয়। ও জিনিস দুনিয়ার কোথাও নেই।

ভয় কি জানো? এরপর বামা না আমাদের জোর করে ঘর থেকে বের করে। তাহলে রেমোর সঙ্গে ওর লাগবে। রেমো তো ঘরখানা শেষ করতে পারল না। আমাদের রাখবেই বা কোথায়?

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, ওসব নিয়ে ভাবো না।

সবসময়ে যে মাথায় দৃষ্টিভঙ্গি, ভাবতে ভাবতে মাথাটা এমন করতে থাকে!

বিষ্ণুপদ নিচু হয়ে খুঁজে পটলের ভূগোল বই আর অ্যাটলাস তুলে নিয়ে বলল, কৃষ্ণ কোথায় আছে এখন জানো?

না তো! কোথায়?

বিষ্ণুপদ অ্যাটলাস খুলে ইউরোপের ম্যাপখানা বের করে দেখাল নয়নতারাকে, এই দেখ, এ হল হল্যান্ড। সমুদ্রে বাঁধ দিয়ে জল সরিয়ে জমি বের করে করে তবে দেশটা হয়েছে।

ও বাবা!

বিশ্বপদ হাসল খুব। বলল, ময়দানবের কাণ্ডকারখানা। বিশ্বকর্মার সঙ্গে পাল্লা টানছে। এই জায়গাটা হল আমন্টারডাম। কৃষ্ণ এখন এইখানে।

এখন থেকে কত দূর হবে ?
পাঁচ হাজার মাইলের কাছাকাছি হবে।

বাবা গো! ভাবলেই কেমন করে, না ?

আজকাল আর দূর বলে কিছু নেই। কলকাতা থেকে উড়ে দিনকে দিন পৌছে যাচ্ছে। এরোগেন্নে এক আজব জিনিস। এ জীবনে আর চড়া হল না।

আমাকে মেরে ফেললেও আমি এরোগেন্নে চড়তে পারব না। হ্যাঁ গো, কৃষ্ণ নাকি তোমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল আমেরিকায়।

তা চেয়েছিল। খুব ইচ্ছে, আমাকে একটু দুনিয়াটা দেখায়।

তুমি কী বললে ?

বিশ্বপদ হেসে বলল, কী আর বলব ? ছেলে হিসেবে সে চায় বাপকে একটু ঘুরিয়ে আনে। কিন্তু বড্ড খরচ। কৃষ্ণ হয়তো পিছপা নয় তাতে। কিন্তু ভাবি, বউমা রয়েছে, বাচ্চা-কাচ্চা রয়েছে, আমার জন্য এত খরচ করলে তাদের হয়তো ভাল ঠেকবে না। কি দরকার শেষ বয়সে অত খরচপত্র করে বাইরে যাওয়ার!

নয়নতারা বলল, সে ভাল করেছে। বড় বউমা লোকও খুব সুবিধের নয়। আর তোমাকে আমি যেতে দিতাম নাকি ? বিশ্বপদ নয়নতারার দিকে চেয়ে বলে, আটকে রাখতে নাকি ?

নয়নতারা চোখ বড় বড় করে বলে, তোমাকে অতদূরে ছেড়ে দেবো ? পাগল হয়েছে নাকি!

বিশ্বপদ খুব হাসতে লাগল, দুলে দুলে।

হাসছে কেন গো ? হাসির কথা কী বললাম ?

ভাবলাম, কতদিন আটকাবো! না ছেড়ে উপায় আছে! একদিন এরোগেন্নে ছাড়াই তো ফুরুৎ করে উড়ে যাবো। কত দূরে যাবো তার ঠিকানাই নেই।

নয়নতারা আজ একটু হাসল। বলল, অত সোজা নয়। বোকেনবাবু সেদিন কী বলল জানো ? বলেছে, আমি সধবা মরব।

বিশ্বপদও হাসল, সধবা মরে যে কী সুখ কে জানে! তবে বলি কি মরামরি নিয়ে ভেবে লাভ নেই। ও কেউ দুদিন এগিয়েও আনতে পারবে না, পেছিয়েও দিতে পারবে না। দিনটা ঠিক করাই আছে। তবে আমাদের জানা নেই, এই যা। অদৃষ্ট মানে যা দৃষ্ট নয়, গোচর নয়। তা সে-ই ভাল। জানা থাকলে কি ভাল লাগত ?

নয়নতারা আর একটু তামাকপাতা মুখে পুরে বলল, হ্যাঁ গো, তোমাকে যে কৃষ্ণ কত জিনিস এনে দিয়েছে, সেগুলো ব্যবহার করো না কেন ? খেউড়ি হওয়ার কি সব এনে দিল না ?

ওঃ, সে আর এক কাণ্ড। কৌটোর মধ্যে সাবানের ফেনা পোরা আছে। ওপরে একটা জায়গায় চাপ দিলেই ভস ভস করে এত বেরিয়ে আসে। কৃষ্ণ শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিল সব। হল কি জানো, টিপতেই সে এমন ফেনা বেরুলো যে গালের ওপর গন্ধমাদন দাড়িয়ে গেল। এই এত ফেনা। তার মধ্যে নিজের গালখানাই খুঁজে পাই না। তারপর থেকে আর ব্যবহার করি না। চাকা সাবানই ভাল।

নয়নতারা হেসে ফেলল। বলল, হাসতেও পারো বাপু। আর ওই সুন্দর গন্ধওলা জিনিসটা!

ওটা কামানোর পর লাগায়। আফটার শেভ লোশন। কেটেকুটে গেলে ওটা লাগালে আর বিষিয়ে যায় না।

তা লাগাও না কেন ?

গন্ধ মেখে হবেটা কি ? ফিটকিরিতেই কাজ হয়ে যায়। আছে জিনিসটা থাক।

বড্ড হিসেব করো তুমি। এনে দিয়েছে, ব্যবহার করলেই তো হয়।

বিশ্বপদ নয়নতারার দিকে চেয়ে বলল, আর তোমাকে যে ফোন্টিং ছাতা, ব্যাগ, শাড়ি এনে দিয়েছে তা ব্যবহার করো কি ? রেখে দিয়েছি। পটলের বউ এসে ব্যবহার করবে।

আমারটাও পটলকেই দিয়ে যাবো।

ম্যাপটা খুলে বিশ্বপদ দেখছিল, বলল, তোমার একদম মনোযোগ নেই। আমন্টারডামটা কোথায় এবার দেখাও তো। ডুলে গেছ ?

নয়নতারা আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিল, এইখানে তো!

ওঃ, পেরেছো তো, দশে দশ ১/২

নয়নতারা হাসল, আর আমার ওপর মাটির ফলাতে হবে না।

বিশ্বপদ একটু আনমনা হয়ে বলল, কৃষ্ণ এখন এইখানে। বুঝলে! হল্যান্ড। সমুদ্রে বাঁধ দিয়ে, জল হেঁচে তবে মাটি বার করা হয়েছে। সেখানে চাষাবাস হয়, বাড়ি ঘর করে লোকে থাকে, গাড়ি চলে। বাঁধ ভেঙে গেলে দেশ ভেসে যাবে চোখের পলকে। কিন্তু ভাঙে না। শয়ে শয়ে বছর ধরে দিবিয়া আছে।

হ্যাঁ গো, এই যে সমুদ্রকে হটিয়ে দিচ্ছে, এতে মানুষের পাপ হয় না ? এ যে খোদার ওপর খোদকারি।

বিশ্বপদ মাথা নেড়ে বলে, তা কেন ? মানুষকে যে এত বুদ্ধি, এত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা কাজে লাগাতে হবে না! আমার মতো ঠুটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকবে সবাই ? সে দেশে মাটির অভাব। সেই অভাব পুষিয়ে না নিলে চলবে কেন ? মাটির জন্যই দেখ না, এত ঝগড়া-কাজিয়া, মারপিট, ভাইয়ে ভাইয়ে মুখদর্শন বন্ধ।

নয়নতারা ফের সাদা পাতা ছিড়ছিল।

বিশ্বপদ একটু লক্ষ করে বলল, ডোজটা যেন বেশ বেড়েছে মনে হয় ?

নয়নতারা লজ্জা পেয়ে বলল, এবারের পাতাটায় ধকটা যেন কম।

তা নয়, তোমার নেশাও বাড়ছে। অত খেও না। অম্বল হবে।

আর অম্বল! মনটাই ভাল নেই।

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ম্যাপ দেখতে লাগল। কৃষ্ণ এখন আমন্টারডামে। কবচখানা সঙ্গে নিয়ে গেছে কি? না নিঃ, তাতে কিছু নয়। কৃষ্ণ তো তারই ছেলে। ছেলের মধ্যে বাপের অস্তিত্ব থাকেই। কৃষ্ণের মধ্যে বিষ্ণুপদও কি একটু নেই? আছে বোধহয়।

কী ভাবছো?

এই নানা কথা। উস্টো-পাস্টো। ঠিক থাকে না।

ভূগোল বইটা একটু আমাকে পড়ে শুনিও তো।

তুমি নিজেও তো পড়তে পারো।

অক্ষর চিনবো কি? ভুলে-টুলে গেছি বোধ হয়।

ভোলোনি। চেষ্টা করলেই পারবে।

তুমিই শুনিও।

বিষ্ণুপদ হল্যাণ্ডের বিবরণ একটু পড়ে শোনাল নয়নতারাকে। বলল, বুঝতে পারছো?

তা পারছি।

এসব জায়গায় যেতে ইচ্ছে করে না তোমার?

করলেই বা লাভ কি?

বিষ্ণুপদ হাসিমুখে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, আমারও ইচ্ছে হয়। আমি কি ভাবি জানো? কৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে আমার সত্তাটাও ঘুরে বেড়াচ্ছে নানা দেশ।

তুমি বেশ ভাবতে পারো। আমি পারি না।

ওই জন্যই তো কক্ষপ হওয়া তোমার আর হল না। ওইটে যদি পারতে তবে অনেক অশান্তি থেকে বেঁচে যেতে।

নয়নতারার স্বামীর দিকে চেয়ে বলে, ওইটেই তো তফাত।

বিষ্ণুপদ হাসিমুখে উঠানের দিকে চেয়ে বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, নতুন শুড় ওঠেনি?

না বোধ হয়। উঠলে রেমা ঠিক আনত। কেন, পায়ের খেতে ইচ্ছে যায় নাকি?

তা যায়।

এখানকার বাজারে বোধ হয় ওঠেনি। বলব'খন রেমাকে। বললেই এনে দেবে।

বিষ্ণুপদ একটু চুপ থেকে বলল, থাক। বলে! না। নিজে থেকে আনলে সেটাই ভাল হবে।

ও মা! ছেলের কাছে সংকোচ কিসের? সে তো ভক্ত হনুমানের মতো তৈরীই আছে।

তা জানি। তবু থাক।

কেন গো?

বিষ্ণুপদ সামান্য সংকোচের সঙ্গে বলল, নোলা জিনিসটা ভাল নয়। ভাবছি জিভকে একটু শাসনে রাখব।

আমার বাপ ওটা সহ্য হবে না। তোমার কিছু খেতে ইচ্ছে গেলে না খাইয়ে আমার শাস্তি নেই।

আবার বেশী খেলে তো টিক টিক করো।

তাও করি। আমি বলেই করি। তোমাকে নিয়ে আর কে ভাববে বলো তো, আমার মতো?

তা রটে।

আজই আনাবো।

বিষ্ণুপদ তবু মাথা নাড়ে, থাকগে। নবুর বাড়িতে অনেক খেজুর গাছ। তারা রস জ্বাল দেয়। করেও ভাল। বললেই দিয়ে যাবে। এখন থাক।

নয়নতারার উঠে গেল। রান্নাঘরের দিকে। যেতে যেতে বলল, রাঙা বউমা আজ রাঁধবে না। অতচি হয়েছে। কী রাঁধবো বলো তো?

কচু ঘেঁচু যা হয়।

ফুলকপির কোল রাঁধি।

রাঁধো। মাছ নেই বুঝি?

না। ডিম আছে। বাড়ির হাঁসের ডিম।

একটা ভেজে দিতে পারবে? ডালের মুখে খাবো।

দেবো'খন।

বিষ্ণুপদ ফের একা হয়ে যায়। একা হয়ে চেয়ে থাকে।

এই বাড়িঘর, বাগান নিয়ে যে এলাকাটুকু, এটার দলিল তার নামে। বামাচরণ সব ভাগজোখ করাল। দখল চাইছে। বাড়িতে বড় অশান্তি হচ্ছে তাই নিয়ে। হোক, যা খুশি হোক। বিষ্ণুপদ আর ভাবে না। সে বরং আমন্টারডামের কথা ভাবে। কৃষ্ণের কথা ভাবে।

এই অনামনস্কতার মধ্যেই দুটো সাইকেল এসে থামল উঠানে। কালো চেহারার দুটো লোক।

একজন একটু হেঁকেই বিষ্ণুপদকে বল, কোন ঘরে বামাচরণ থাকে বলুন তো!

বিষ্ণুপদ তটস্থ হল। বলল, বামা? বামা তো রাড়ি নেই।

সে আমরা জানি। তার বউ আছে তো!

আছে বোধ হয়। কী দরকার?

ডেকে দিন। দরকার আছে।

বিষ্ণুপদ একটু অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। এরা বোধ হয় রামজীবনের বন্ধুবান্ধবই হবে। কিন্তু মতলব ভাল নয়।

বিষ্ণুপদ গলা খাঁকারি দিয়ে বলে, তার বোধ হয় শরীর ভাল নয়।

একজন সাইকেল থেকে নেমে চারধারে চেয়ে দেখে নিয়ে বলল, ওই ঘরটা।

বিষ্ণুপদ সভয়ে দেখল, লোকটা এগিয়ে গিয়ে বন্ধ দরজায় দমাস করে একটা লাথি কাষাল।

এই, বেরিয়ে আয়।

বামার বউ দরজা খুলল না। কিন্তু ঝাঁপের জানালা তুলে সভয়ে বলল, কে? কী চাই?

তোকেই চাই। বেরিয়ে আয় তো!

জানালায় ঝাঁপটা ফেলে দিয়ে বউটা চৈঁচাল, বাবা! বাবা! শুনছেন! এরা সব গুণ্ডা। লোকজন ডাকুন...

বিষ্ণুপদ উঠল। হাতপায়ের জড়তা উঠতে দিচ্ছিল না তাকে। তবু উঠল।

কী হয়েছে? আপনারা কারা?

আপনি ঘরে যান। এর সঙ্গে কথা আছে।

গোলমাল শুনে নয়নতারা বেরিয়ে এসেছে রান্নাঘর থেকে। বলল, কী হয়েছে? তোমরা কারা?

আপনারা ঘরে যান।

বিষ্ণুপদ উঠানে নামতে নামতে বলল, এটা ঠিক হচ্ছে না। এ কাজটা ভাল হচ্ছে না।

লোকটা দমাদম কয়েকটা লাথি দিল দরজায়। সঙ্গে যে সব কথা বলল তা শুনে কানে আঙুল দিতে হয়।

বিষ্ণুপদ এত ভাষাচাকা খেয়ে গেল যে, বাক্য সরল না।

লোকটা বলল, এ গাঁয়ের পাট চুকিয়ে তিনদিনের মধ্যে যদি চলে না যাস তা হলে জোড়া লাশ ফেলে দিয়ে যাবো।

শ্যামলী ঘর থেকে চিৎকার করছে, বাবা! আপনি লোক ডাকুন। মেরে ফেলবে যে!

লোকটা আর একটা লাথি কাষাল দরজায়, কেন, বুড়ো শ্বশুরকে যখন ভিটেছাড়া করতে চাও তখন বাবা ডাক কোথায় থাকে রে মাণী? অ্যা! এখন নাকী কান্না কাদছে, বাবা—বাবা। শালী, যত নষ্টের গোড়া।

শ্যামলী বোধ হয় ভয়ে চুপ করে গেল।

লোকটা ফের সাইকেলে চেপে বলল, বামা আসুক, তার ব্যবস্থা হচ্ছে। শালাকে জানে মেরে দিয়ে যাবো আজ।

লোক দুটো যেমন এসেছিল, তেমনি হুস করে চলে গেল।

বিষ্ণুপদ বিহ্বল দাঁড়িয়ে রইল উঠানের মাঝখানে। রাঙা ঘর থেকে বেরোলো না। পিছনে দাওয়ায় বসে কাদছে নয়নতারা।

দরজা খুলে শ্যামলী বেরিয়ে এল। আতঙ্কিত মুখচোখ।

শুনলেন! শুনলেন আপনি? কী বলবেন এখন? রামজীবনের সঙ্গে সাট নেই আপনার?

আমার!

আপনারা সবাই সমান। সব এক দলে। আমি আজই পুলিশের কাছে যাবো। কোমরে দড়ি পরাবো আপনাদের সবাইকে।

নয়নতারা বলল, ওঁকে কেন বলছো? উনি তো ওদের চেনেনও না।

শ্যামলী মুখ ভেঙিয়ে বলে, চেনেন না! আহা, কী ন্যাকা রে। চেনেন না! ঠিক আছে, চেনেন কিনা তা পুলিশ এলেই বোঝা যাবে।

নয়নতারা বলল, তাই যাও। আমাদের বরং বেঁধে নিয়ে যাক। তাই ভাল।

॥ ৬৯ ॥

চারুশীলা যে কেন তাকে এয়ারপোর্টে ধরে এনেছে তা চয়ন জানে না। চারুশীলার কোনও সিদ্ধান্ত বা কাজেরই যুক্তি সঙ্গত ব্যাখ্যা করা মুশকিল। তবে তাতে চয়নের একটা লাভ হয়েছে। কন্সিনকালেও সে এয়ারপোর্ট দেখিনি। দেখা হয়ে গেল আজ।

চারুশীলা হুকুম করতে ভালবাসে এবং সেটা তামিল না হলে যে চারুশীলা মানসিক দিক দিয়ে ভেঙে পড়ে এই সূক্ষ্ম ব্যাপারটা চয়ন বোঝে। তাই সে পারতপক্ষে চারুশীলার মতের বিরুদ্ধে কিছু করে না, সামান্য গৃহশিক্ষক হলেও—কে জানে কেন—তাকে উদ্দমহিলা নানাভাবে নানা বিষয়ে জড়িয়ে দেন। হয়তো ভাবেন, এরকম নানা ব্যাপারে জড়িয়ে থাকলে চয়নের উপকার হবে। উপকার কিছু হয় না, বরং চয়নের অস্বস্তি বাড়ে।

আজকের ঘটনাটাই যেমন পড়াতে গিয়েছিল চয়ন। চারুশীলা তাকে দেখেই ঘোষণা করল, আজ আর পড়াতে হবে না। রশ্মি আজ লভন চলে যাচ্ছে। সি-অফ করতে আমরা সবাই যাচ্ছি। আপনাকেও যেতে হবে।

বিস্ত্রিত চয়ন বলে, আমি!

হ্যাঁ, আপনিও। ফিরতে অনেক রাত হবে। ডিনার এখানেই করে নিন, আর আমাদের সঙ্গেই ফিরে আসবেন। এখানেই রাতে থাকবেন।

এগুলো কোনও প্রস্তাব বা অনুরোধ নয়, সিদ্ধান্ত এবং ঘোষণা।

চয়ন ডেবেচিস্তে কিছু বলতে পারল না। কেবল চারুশীলার কথারই শেয়াংশ পুনরাবৃত্তি করল মাত্র, রাত্রে থাকব?

কেন, আপনার জন্য কেউ চিন্তা করবে নাকি?

চয়ন লাজুক মুখে বলে, না, তা কেউ করবে না।

বলেই চয়নের মনে হল, কথাটার মধ্যে একটু মিথো রয়ে গেল। তার জন্য চিন্তা করার লোক এতদিন কেউ ছিল না। আজকাল হয়েছে। অনিন্দিতা আর তার মা। যদিও ওদের উৎকণ্ঠা বা উদ্বেগ চয়ন এখনও পছন্দ করে উঠতে পারেনি। রাতে না ফিরলে ওরা অবশ্যই টের পাবে। দাদা-বউদিকেও বলতে পারে।

চারুশীলা বলল, তা হলে আর কী ?

চয়ন মৃদু একটু হাসল। ব্যক্তিত্বহীন হওয়ার অসুবিধে অনেক আছে, আবার সুবিধেও কি আর কিছু নেই! ব্যক্তিত্বহীন মানুষদের সঙ্গ বেশিরভাগ মানুষই পছন্দ করে। কেননা, তারা সব কথাতেই সাই দিয়ে, অকারণে অন্যায় প্রশংসা করে এবং হাবিজাবি কথাও মন দিয়ে শোনে। মানুষ নিজের ইচ্ছেমতো চালানোর জন্য এসব লোককে সবসময়েই সঙ্গী হিসেবে চায়। মানুষের ইচ্ছাপূরণে সাহায্য করে বলেই কিছু দয়া ও দাক্ষিণ্য তারা পেয়ে থাকে।

লোক বড় কম জোটায়নি চারুশীলা। সন্ধের পর একে একে এল রিয়া আর মোহিনী, এল ঝুমকি, এল দাড়িওলা এবং বিষণ্ণ হেমাঙ্গ। আরও জনা তিনেককে চেনে না চয়ন। দেখা গেল, সকলেরই ডিনারের নেমস্তন্ন। খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনও বেশ বিরাট।

সেদ্ধ ভাত খেয়ে খেয়ে চয়নের পেট মরে গেছে। আজকাল সে একদম বেশি খেতে পারে না। বিশেষ করে ঝাল-মশলার খাবার খেলেই তার পেটের গোলমাল হয়। কিন্তু বোধ হয় তার স্বচ্ছাচারে চারুশীলা খুশি নয়। তাই ডিনার টেবিলে তাকে নিয়েই পড়ল চারুশীলা, ও কী চয়নবাবু, ওটুকু মাছ নিলেন যে! ভাতটা আরও নিন তো! ...আর একটা মুরগির টুকরো নিতে হবে। ...হাত গুটিয়ে রয়েছেন যে, পুডিংটা নিন!

হেমাঙ্গ বিরক্ত হয়ে খেয়ে মানুষকে খাইয়ে মারতে চাস নাকি ? এটা বেশি ফুড ইনটেকের যুগ নয়। মানুষ যত কম খাবে তত বেশিদিন বাঁচবে।

চারুশীলা ঈষৎ রাগের গলায় বলে, আহা, বন থেকে বেরোলো টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে। এসব ফিলজফি কি সুন্দরবন থেকে শিখে এলি নাকি ? নিজের চেহারাটা তো চিমসে তালপাতার সেপাই বানিয়েছিস।

সুন্দরবনে শিখবো কেন ? তুই মডার্ন ওয়াশ্দের খবরই রাখিস না। বরং সুব্রতদাকে জিজ্ঞেস কর ঠিক বলছি কি না। সুব্রত শান্ত মানুষ, বেশি কথা বলে না। তর্কবিতর্ক একেবারেই করে না। শান্ত হেসে বলল, তোমার লাইফ স্টাইলটা খুবই স্পোর্টান হয়ে গেছে।

সেটা কি ভাল নয় ?

সুব্রত মাথা নেড়ে বলে, ভালই।

আমাকে ও চিমসে বলছে সুব্রতদা, শুনলেন ?

শুনেছি। আমার তো মনে হয় তুমি অনেক লিন হয়েছো, আর চটপটে। রংটাও বেশ ট্যান হয়েছে।

চারুশীলা একটু অবাক হয়ে বলে, তুমি ওর প্রশংসা করছো ? ধনি তোমাকে। ওকে চাষা ছাড়া আর কিছু মনে হয় এখন ? কী কালো হয়েছে, কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে গেছে, মুখে জঙ্গল।

সুব্রত মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। হেমাঙ্গ একটু মাথা তুলে বলল, টুকটুকে ফর্সা নাদুনুদুন ন্যাদসমার্কী চেহারা বুঝি ভাল ?

হাসতে গিয়ে ঝুমকি বিষম খেল। একটু জল চলকে গেল মোহিনীর হাতের গেলাস থেকে।

কিন্তু এইসব হাসিঠাট্টার মধ্যেও চয়ন লক্ষ্য করছিল, হেমাঙ্গের চোখ হাসছে না। একটা গভীর ক্লান্তি, হতাশা এবং হয়তো-বা একটা অপরাধবোধে ছেয়ে আছে তার চোখ। হেমাঙ্গ আর রশ্মির ব্যাপারটা চয়ন জানে বলেই আরও ভাল বোঝা গেল।

দুখানা গাড়ি হলেই হয়ে যেত। কিন্তু বন্দোবস্ত হয়েছে তিনখানা গাড়ির। চারুশীলার দুটো, হেমাঙ্গের একটা। চয়ন পড়ল হেমাঙ্গের ভাণে। সামনের সিটে পাশাপাশি বসে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে হেমাঙ্গ বলে, চয়নবাবু গান জানান ?

আজ্ঞে না।

জামলে আপনাকে আজ একটা গান শোনাতে বলতাম।

কী গান ?

যখন ডাঙল মিলনমেলা ডাঙল। কাল রাতেও স্তিরিওতে শুনলাম।

আপনার মনটা খুব খারাপ, না ?

একটা হাত স্টিয়ারিং থেকে তুলে দাড়ি আঁচড়াল হেমাঙ্গ। তারপর বলল, আমি বোধ হয় একটা ইমবেসাইল। কিন্তু কিছু করার ছিল না।

চয়ন চুপ করে থাকে। এ ব্যাপারে সে কথা বলার অধিকারী নয়।

হেমাঙ্গ বাইপাসের দিকে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে আনয়ন একবার পিছনের গাড়িগুলো ঠিকঠাক আসছে কি না দেখে নিল। তারপর বলল, অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না ? উই আর বোথ ইন লাভ উইথ ইচ আদার। কিন্তু কতগুলো মেটেরিয়াল কারণে, মাইনের পয়েন্টে আটকে রইলাম। দিস ইজ দা জোক অফ এ লাইফটাইম!

চয়ন মৃদু অস্বস্তি বোধ করছে। এই কথার মধ্যে সে একটা ভুল ধরতে পারছে। স্পষ্ট নয়, কিন্তু আবছা হলেও সত্যি। সে মৃদু স্বরে বলল, দুঃখের ব্যাপার।

আপনিও তাই মনে করেন ?

চয়ন সোজা সামনের দিকে চেয়ে থেকে বলে, তাই তো।

দোষটা কার বলুন তো ? আমারই, না ?

চয়ন মাথা নেড়ে বলল, না।

তবে কার ?

বোধ হয় ঘটনাচক্রে। আপনি তো রাজি ছিলেন।
আমার যে কেবলই মনে হয় আমি ওকে অপমান করেছি।
চয়ন খুব ভয়ে ভয়ে বলে, অপমান! কই, মনে হয় না তো!
কিন্তু প্রত্যাখ্যান মানেই তো অপমান।
চয়ন সংকোচের সঙ্গে বলে, প্রত্যাখ্যান! এটা কি তাই?

নয় তো?

হেমাঙ্গ কী শুনতে চাইছে তা চয়ন বুঝতে পারল। বলল, না, প্রত্যাখ্যান কেন হবে?
অন্তত লোকে তো তাই ভাববে?

চয়ন একটু ভাববার ডান করল। তারপর একটু সরল গলায় বলে, আমার তা মনে হয় না।

হেমাঙ্গ সামনের হেডলাইটে ডঙ্কল রাস্তার দিকে চেয়ে বলে, কি জানি, আমার তো সন্দেহ ছিল সবাই আমাকেই দায়ী করবে। ছি ছি করবে, খানিকটা সেই ভয়েই তো গায়ে পালিয়ে ছিলাম।

চয়ন মৃদু হেসে বলে, আপনার গায়ের বাড়িটা খুব সুন্দর।

আপনার ভাল লেগেছে? যাদের চোখ আর রুচি আছে তাদের ভালই লাগবে। বসবাস করার পক্ষে শহর একদম বাজে জায়গা। বুক ভরে দমটা অবধি নেওয়ার উপায় নেই। কৃষ্ণজীবনবাবু কি আর সাথে পরিবেশ-পরিবেশ করে এত অস্থির হন! আমার তো ইচ্ছে করছে কালকেই আবার গায়ে চলে যাই। যাবেন আমার সঙ্গে?

চয়ন একটু শঙ্কিত হয়ে বলে, আমার তো উপায় নেই।

টিউশনি?

আজ্ঞে।

আমারও তো কত কাজ কলকাতায়। কিন্তু জীবনের আনন্দটা যদি না থাকে তা হলে পরস্যা দিয়ে কী হবে?

তা তো বটেই।

আবার কিছুক্ষণ চূপচাপ গাড়ি চালান হেমাঙ্গ। তারপর বলল, তা হলে আপনি বলছেন রশ্মির সঙ্গে আমি বিয়ে করিনি!

না তো!

একটা যেন স্বস্তির শ্বাস মোচন করে হেমাঙ্গ বলে, রশ্মি খুব ভাল স্বভাবের মেয়ে। কাল নিজে গিয়ে আমাকে কলকাতায় টেনে আনল। একটুও রাগ করল না আমার ওপর।

চয়ন মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ, ওঁর মতো মেয়ে কমই দেখা যায়। যেমন ব্রিলিয়ান্ট, তেমনি বিনয়ী।

রশ্মির প্রশংসা শুনে খুশি হল হেমাঙ্গ। বলল, বিয়ে করলে ওরকম মেয়েকেই করতে হয়। আমার কপালটাই হয়তো খারাপ।

চয়ন সতর্কভাবে একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, আপনিও তো কম যান না!

আমি! হাসালেন মশাই। রশ্মির তুলনায় আমি নিতান্তই এলোবলে।

চয়ন মাথা নেড়ে বলে, না না, তা কি হয়? আপনারা দুজনেই সমান ভাল।

বলছেন?

হ্যাঁ। আর তাই আমার মনে হয়, বিয়েটা না হয়ে আপনার কোনও ক্ষতি হয়নি।

অ্যাঁ। ক্ষতি হয়নি মানে?

চয়ন ব্যস্ত হয়ে বলল, সমান ভাল দুজনের জোড় হয়তো মিলত না।

কথাটা শুনে এত অবাক হয়ে গেল হেমাঙ্গ যে, আর একটু হলে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলত। সামলে নিয়ে বলে, কী বলছেন চয়ন?

চয়ন ভীষণ সংকুচিত হয়ে বলল, বিজ্ঞানের নিয়মেই সগোত্র হওয়া ভাল নয়।

হেমাঙ্গ গাড়ির গতি কমিয়ে চয়নের দিকে অবাক একটি চাউনি হেনে বলল, আপনি তো ডেঞ্জারাস লোক মশাই!

চয়ন একটু ভয় পেয়ে গিয়ে বলল, আপনি রাগ করলেন?

হেমাঙ্গ আরও কিছুক্ষণ ধীর গতিতে গাড়ি চালান। ততক্ষণে ডান পাশ দিয়ে সাদা মারুতিটা বেরিয়ে গেল। জানালা দিয়ে চারুশীলা মুখ বাড়িয়ে বলল, এই হাঁদারাম, গাড়ি খারাপ হয়েছে নাকি?

না। সব ঠিক আছে।

গাড়িটা বেরিয়ে গেলে হেমাঙ্গ বলল, রাগ করাই বোধ হয় উচিত। কিন্তু রাগ হচ্ছে না। সগোত্র কথাটা খুব ইন্টেলিজেন্টলি পুট করেছেন তো! একজ্যাঁটলি যেন এই শব্দটাই আমি খুঁজছিলাম।

আমি কিন্তু ভেবেচিন্তে বলিনি।

তা না বললেও এ কথাটা যে আপনার মাথায় এসেছে এটা কম কথা নয়। আমার কখনও কখনও মনে হয়েছে আমাদের মধ্যে স্বভাবের একটা বড় মিল আছে। আবার নেইও। কিন্তু মিলটাই বোধ হয় বেশি।

চয়ন করুণ একটু হাসল। সে জানে হেমাঙ্গ এখন যা বলছে সেটাও সত্যি নয়। কারণ বাস্তবিক পক্ষে হেমাঙ্গের সঙ্গে রশ্মির মিলের চেয়ে অমিলই ঢের বেশি। চয়ন সগোত্র শব্দটা ব্যবহার করেছে অনিশ্চয় সন্দেহেও। ব্রেক আত্মরক্ষার জন্য।

হেমাঙ্গ একটু সময়ের ফাঁক দিয়ে বলল, আমি ওকে খুব ভালবাসি বটে, কিন্তু মনে হল আমাদের বিয়েটা যেন একটা চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করার মতো হয়ে যাবে। এরকম হওয়া উচিত নয়। কী বলেন? বিয়ে করলে ইংল্যান্ডে যেতে হবে, আমার শিকড় উপড়ে নিতে হবে। আমার পক্ষে এতটা কি সম্ভব?

চয়ন মাথা নেড়ে বলে, ঠিকই তো।

ঠিক নয় ?

চয়ন একটু চুপ করে থেকে বলে, লোকে ভালবাসার জন্য কত কী করে! কোনও মানে হয় না। প্রায়িক্যাল হওয়াই ভাল।

গাড়িটা আর একবার যেন টাল খেল। হেমাঙ্গ অস্ফুট স্বরে বলল, আপনি খুব ডেঞ্জারাস লোক মশাই।

আজ্ঞে তা নয়।

একটু বিষ্ফুটাইপের কি আপনি! বাইরে থেকে মনে হয়, ভাজা মাছ উলটে খেতে জানেন না! কিন্তু ভিতরে ভিতরে গভীর জলের মাছ।

চয়ন সভয়ে বলে, না না, আমি আসলে—

হেমাঙ্গ খোলা গলায় হাসল, আপনি কি বলতে চান যে, রশ্মি আর আমার মধ্যে সত্যিকারের ভালবাসা হয়নি ? তা তো বলিনি!

না, তা বলেননি। বিচ্ছুরা অত খোলাখুলি বলেও না।

আপনি ভুল বুঝেছেন।

ঠিক বুঝেছি। কিন্তু তা বলে রাগ করিনি। ভয় পাবেন না। আপনার আই. কিউ. কত ?

জানি না তো!

একবার মেপে দেখবেন!

কেন বলুন তো ?

মনে হচ্ছে আপনার আই. কিউ. রেটিং বেশ হাই।

চয়ন লজ্জা পেয়ে বলে, আপনি রাগ করেছেন।

হেমাঙ্গ মাথা নেড়ে বলে, করিনি। রশ্মি আর আমার ব্যাপারটার মধ্যে রোমান্টিক জিনিসটা ছিল না। আমরা দুজনেই পাক্সা প্রফেশনাল। কী জীবনে, কী কেরিয়ারে। বাট শী ইজ সাচ এ সফট্ বিউটিফুল উওয়ান।

চয়ন চুপ করে থাকে।

হেমাঙ্গ নিজেই আবার হঠাৎ বলল, কেন বলুন তো আমি ওর জন্য ঠিক পাগল হতে পারলাম না ? পাগল হতে পারলে ও যা চাইছে তা করা শুরু ছিল না। কেন পারলাম না ? কোথায় একটা ক্যালকুলেশন ঢুকে পড়ল আমাদের রিলেশনে ?

চয়ন একটু গলা ঝাঁকার দিয়ে বলল, ক্যালকুলেশন কেন ঢুকবে ?

হেমাঙ্গ গম্ভীর হয়ে বলে, ক্যালকুলেশনই। আমি নানাভাবে নিজেকে পরীক্ষা করেছি, প্রশ্ন করেছি। গায়ে বসে রাতের পর রাত জেগে বসে ভেবে দেখেছি। দেয়ার ইজ এ ফ্লাই ইন দি অয়েন্টমেট। মনে হচ্ছে, ওই মাছিটা হল আমার ভিতরকার চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টটা।

চয়ন ব্যস্ত হয়ে বলে, না না। তা নয়।

তা হলে ?

আমার মনে হয় আপনি ঠিক ততটা আগ্রহী ছিলেন না।

অত উদ্বেগ করে বলছেন কেন ? বী এ ফ্রেন্ড অ্যান্ড বী ফ্র্যাংক।

চয়ন লজ্জা পেয়ে বলে, আমি তো অত বুঝি না।

খুব অবুঝও আপনি নন। ঠিক আছে। এ নিয়ে পরে কথা হবে। দুটো গাড়িই আমাদের পেরিয়ে গেছে। ওদের ধরা যাক।

গাড়িটা আচমকা দারুণ জোরে চলতে শুরু করল। আর সিটে সিটিয়ে বসে রইল চয়ন।

এয়ারপোর্ট দেখে চয়ন মুগ্ধ। এত বড়, এত সাজানো, এত স্বকবকে ব্যাপার সে আগে বড় বিশেষ দেখেনি। লাউঞ্জে রশ্মিকে ঘিরে তার মেলা আত্মীয়স্বজন।

দুটো গাড়িকে পিছনে ফেলে হেমাঙ্গই পৌছেছে আগে। লাউঞ্জে ঢোকার মুখে সামান্য প্রোটোকল ছিল। সেটা ডিভিডে চয়নকে নিয়ে ভিতরে ঢুকেই সে বেশ নাটকীয়ভাবে ডাকল, রশ্মি!

রশ্মি হাসিমুখে একটু এগিয়ে এল, এসেছো ?

দুজনেরই হাসিমুখ। দুটো মুখই মেঘমুক্ত। কোনও টেনশন নেই। একটু দূর থেকে দুটো মুখকে এরকমই মনে হল চয়নের। এরা কি পরস্পরের খপ্পর থেকে বেঁচে গেল ? এরা কি পরস্পরের গ্রাস হতে হতেও হল না ?

চয়নের অবশ্যস্বার্থী অনিন্দিতার কথা মনে হল। অনিন্দিতা একটা কিছু ঘটিয়ে তুলতে চাইছে কি ? গতকালও থিয়েটারের টিকিট এনেছিল এবং তাকে অনিন্দিতার সঙ্গে যেতেও হয়েছিল থিয়েটারে। নাটকটা কেমন তা ভাল বোঝেনি চয়ন। তবে তার ভাল লাগছিল না। কিন্তু অনিন্দিতা মন্তঃমুগ্ধ হয়ে দেখছিল। ফেরার সময় একসঙ্গে কিছুক্ষণ। না, বিশেষ ইন্সটিভবহ কোনও কথা হয়নি। শুধু অনিন্দিতা একবার জিজ্ঞেস করেছিল, ভাল লাগল ?

ভালই তো!

কোনটা ভাল ?

কেন, নাটকটা!

আর আমি! বলে খুব হেসে ফেলেছিল অনিন্দিতা।

চয়ন একটু দূর থেকে দেখছে, রশ্মি কথা বলছে হেমাঙ্গর সঙ্গে। একটা ডোরাকাটা জামা আর জিনসের প্যান্ট পরে আছে হেমাঙ্গ। মাড়িতে তার মুখে একটা আলাদা সৌন্দর্য এসেছে। আর রশ্মি তো দারুণ সুন্দরীই। তার পরনে সবুজ আর সাদা মেসানো চুড়িদার। দুজনকে মুখোমুখি বেশ মানিয়েছে। যেন মেড ফর ইচ আদার। কিন্তু ব্যাপারটা যেমন দেখাচ্ছে তেমন নয়। পৃথিবীতে এরকম কত ভুল দৃশ্য আছে।

লাউগে ঢুকল এসে চারুশীলা অ্যান্ড পার্টি। হইহই ব্যাপার। এই ডামাডোলে কেউ লক্ষ্যই করল না চয়নকে। এরকমই ভাল। সে কারও লক্ষ্যবস্তু হয়ে থাকলে অস্বস্তি বোধ করে। ভয় একটাই, ফেরার সময় তাকে আবার ভুলে ফেলে না চলে যায়।

দল থেকে কিছুক্ষণ পর একটি মেয়ে শুটশুট করে এসে তার পাশে দাঁড়াল।

একা দাঁড়িয়ে যে!

চয়ন লাজুক গলায় বলে, এমনি।

আপনি ভীষণ মুখচোরা, না?

চয়ন মৃদু হেসে বলে, না, তা নয়। রশ্মি আর হোমান্সবাবু কথা বলছিলেন তো, তাই একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

ঝুমকি হেসে বলল, বিদায়-দৃশ্যটা কেমন হল? খুব ট্রাজিক?

চয়ন মাথা নেড়ে বলে, কি জানি! ঠিক বুঝতে পারিনি।

ঝুমকি দলটার দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলল, চারুমাশি আমাকে ভীষণ ভালবাসে। সব জায়গায় নিয়ে যায় জোর করে। নইলে আমার কিন্তু একদম আসার ইচ্ছে ছিল না।

চয়ন হঠাৎ প্রশ্ন করল, কেন?

এরা সবাই বড়লোক। অনেক টাকা। আমার যেন বড়লোকদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করতে অস্বস্তি হয়। আপনার হয় না?

চয়ন একটু অবাক হয়ে বলে, আমার! আমি তো সামান্য পড়ার মাস্টার।

আপনি এলেন কেন?

উনি জোর করে নিয়ে এলেন।

দূর থেকে চারুশীলা হাতছানি দিয়ে ডাকল ঝুমকিকে।

চয়ন বলল, আপনি যান। ডাকছে।

ঝুমকি চলে গেল। চয়ন একদৃষ্টে চেয়ে রইল। সে এই মেয়েটিকে নিয়ে ভাবছে। ভাবতে হচ্ছে। এই মেয়েটারও

একটা চাপা বক্তব্য আছে। সেটা ঠিক বোঝা যায় না।

বিদায় পর্ব শেষ হয়ে গেল। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এনকোজারে ঢুকে গেল রশ্মি। সে ফিরে যাচ্ছে নিজের ক্ষেত্রে। নিজের জায়গায়। মুখে হাসি। কোনও বিষণ্ণতা নেই। বিদ্যুৎমাঝ নেই।

চারুশীলা সবাইকে কফি খাওয়া। তারপর তারা উঠল ওপরে। যেখান থেকে প্লেনটা দেখা যায়। নানা আলো বিকীরণ করে প্লেনটা দাঁড়িয়ে গৌ গৌ করছে। আকাশজোড়া অন্ধকার। ওই অন্ধকারে একটু পরেই আকাশে উধাও হবে বিমান। তার ছোট্টো খোলের মধ্যে কয়েকটি মানুষ। হাজার হাজার মাইল পেরোবে। কী সামাজিক।

চয়নের পাশেই দাঁড়ালো হোমান্স। বলল, কুইটস্।

চয়ন চমকে উঠে বলে, কিছু বলছেন?

দাড়ি-গোফের ভিতর দিয়ে একটু হাসল হোমান্স। বলল, বললাম।

আজ্ঞে আমি বুঝতে পারিনি।

বললাম হিয়ার এন্ডস দি ড্রামা। ড্রপসিন।

ওঃ।

আমি আবার মুক্ত, ভারহীন, স্বাধীন।

চয়ন মৃদু একটু হাসল।

হাসলেন যে!

ভালই তো।

কাল গায়ে ফিরে যাচ্ছি।

কালকেই?

নয় কেন? দিন সাতকে বিরহের জ্বালাটা জুড়িয়ে আসি।

ও।

বিশ্বাস করলেন না?

কেন করব না?

মুখ দেখে মনে হচ্ছে আপনি বিরহে বিশ্বাসী নন।

চয়ন বিব্রত হয়ে বলে, তা নয়। আমি সব ঠিকমতো বোঝাতে পারি না।

আপনার কাছে অনেক কিছু শেখার আছে মশাই।

কী যে বলেন!

হোমান্স অনমনস্কভাবে প্লেনটার দিকে চেয়ে রইল।

চয়ন হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, প্লেনে চড়তে ভয় করে না?

হোমান্স তার দিকে ফিরে চেয়ে বলে, করে। আমার তো খুব করে। কেন যে এসব বিপজ্জনক জিনিস বানায় মানুষ। এ সবার চেয়ে নৌকা ভাল, পালকি ভাল, পায়ে হাঁটা ভাল বা ঘোড়ায় চড়া। বুঝলেন, পৃথিবী আবার একদিন সেই সব যুগে ফিরে যাবে।

চয়ন মৃদু হাসল।

প্লেনটা উড়ল আরও আধঘণ্টা বাদে। জীবনে প্রথম প্লেন উড়তে দেখল চয়ন। অনেকটা গড়িয়ে গিয়ে রানওয়েতে ঘুরল। তারপর একটা প্রচণ্ড গতি। একটা ঢেউ। তারপর জানালার পিদিমের সারি নিয়ে অন্ধকার আকাশে কী সুন্দর একটা ক্ষণিকের দৃশ্য হয়ে মিলিয়ে গেল।

চারুশীলার গাড়িতে ফিরে এল চয়ন। অনভ্যন্ত রাত্রিবাস।

সে অবাক হয়ে দেখল, তার জন্য চমৎকার বিছানা তো হয়েছেই, বিছানার পাশে একটা টুলের ওপর নতুন পায়জামা, গেঞ্জি আর তোয়ালে। সঙ্গে নতুন টুথব্রাশ আর টুথপেস্ট।

ওয়ে-পডুন। আমি বাতি নিবিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। বাথরুমটা চিনে রেখেছেন তো? পায়ের দিকে। ঘরে ডিমলাইট জ্বলবে। বালিশের পাশে টর্চও আছে। আর কিছু চাই?

চারুশীলার দিকে অবাক চোখে চেয়ে চয়ন বলে, আরও?

চারুশীলা হাসল না। বলল, দরকার হলে বাঁ দিকের বেড সুইচটা টিপবেন। ওটা কলিং বেল। বাজালে চাকরদের মধ্যে কেউ চলে আসবে।

চয়ন মাথা নেড়ে বলল, ঠিক আছে।

॥ ৭০ ॥

টাকা আসছে। খুব ধীরে আসছে। কিন্তু আসছে ঠিকই। বড়লোকদের যেমনধারা আসে তেমন নয়। কিন্তু গরিবদের মতো করেও তো টাকার আনাগোনা আছে। কাকার কাছ থেকে বাড়তি এক হাজার টাকা পাচ্ছিল বীণা। গত মাসে কাকা সেটা একশো টাকা বাড়িয়ে দিল। বলতে নেই, কাকারও দিনকাল ভাল। চোরাপথে ব্যবসার টাকা তো আছেই, বিশ্ববিজয় অপেরার কুইংও বড় কম হচ্ছে না। খুব নামডাক চারদিকে। বীণার মাইনে সেখানেও কিছু বেড়েছে। টাকা বেশ কিছু জমে গিয়েছিল বীণার হাতে। শ্বশুরবাড়িতে টাকা দেওয়া বন্ধ করেছে অনেকদিন। নিমাইকে আর টানতে হচ্ছে না। এই টাকা দিয়ে সে ঘরের মেঝেটা বাঁধিয়ে নিয়েছে। খুব পোড় একটা স্টেনলেস স্টিলের বাস্কের মধ্যে প্রাস্টিকে নিশ্চিন্দ করে উলার আর পাউডগুলো বেঁধে সে মেঝের অনেক গভীরে পুতে দিয়েছে। মেঝে বাঁধানোর পর হাফ ছেড়ে বেঁচেছে সে। পাকা বন্দোবস্ত হয়ে রইল—ব্যাঙ্কের ভন্টের মতো। পাকা মেঝের তলা থেকে তো আর কেউ বের করতে পারবে না সহসা, না জানলে। বীণা তবে দেখেছে, ওই উলার আর পাউড এখন তার কাজে লাগবে না। দরকারও নেই। ওটা ভবিষ্যতের জন্য থাক।

এই ভবিষ্যৎ কথাটা নিয়ে বীণা আজকাল খুব ভাবে। তার ভবিষ্যৎ কী? নিমাইয়ের সঙ্গে যুতে থেকে তার জীবনটা একরকম নষ্ট হচ্ছিল। আর ওই অলস লোকটাও হয়ে যাচ্ছিল অকেজো। বিদেয় হয়ে ভালই হয়েছে। এখন বীণাও স্বাধীন নিমাইও স্বাধীন। কিন্তু তবু বীণা একটা ভবিষ্যৎ দেখতে চায়। কলকাতার বড় দল বা সিনেমায় সে কি কখনও ডাক পাবে? তার মুখ কি কখনও দেখা যাবে দেওয়ালে সাঁটা পোষ্টারে? নাম বেরোবে কি কাগজে? ভবিষ্যৎ বলতে সে এসবই বোঝে। ঘরসপোর নয়, ছেলেপুলে নয়, তার ভবিষ্যৎ হবে ওরকমই কিছু। যদি ততটা নাও হয়, ক্ষতি নেই। খানিকটা সে এগিয়েছে, আরও অনেকটা নিশ্চয়ই এগোবে। বয়স এসে ধরার আগেই সে আরও একটু এগোতে চায়।

সুন্দরবনে এক জায়গায় পালা ছিল। মেলা লোক হ'ল আসরে। পালা জমেও গেল খুব। বীণাপানির ওপর সেদিন যেন কিসের ভর হয়েছিল। এত ভাল পাঁট করল আর এমন গান গাইল যে আসর মাত।

সেই রাতে পালার শেষে কাকা অবধি মুগ্ধ। আঙুল থেকে আংটি খুলে তাকে দিয়ে বলল, নাও বীণা, আজকের জন্য তোমার প্রাইজ।

বীণার সেদিন হাসি আর কান্না একসঙ্গে পাচ্ছিল। এত আনন্দও আছে জীবনে! আংটিটা দু-হাতের অঙ্গুলিতে নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে কাকাকে বলল, তোমার মুখ থেকে যা শুনলাম সেইটাই আমার সবচেয়ে বড় প্রাইজ। আংটিটা ফেরত নাও কাকা।

দেওয়া জিনিস কেউ ফেরত নেয়?

নাও, এটা তোমার কোন গ্রহবৈশুণ্যের জন্য তোমার বউ বানিয়ে দিয়েছিল। এ আমি নিতে পারব না। এটা পরার পর থেকেই তোমার উন্নতি হচ্ছে।

আরে, তাতে কি? আবার একটা বানিয়ে নেবোখন।

না কাকা, আংটিটা পরে থাকো। তুমি বেঁচে থাকলেই আমরা অনেকে বাঁচবো।

দোনোমোনো করে কাকা আংটি ফেরত নিল, কিন্তু তার বদলে কড়কড়ে দুটো টাকা দিল তাকে। বলল, এটাই রাখো তা হা। প্রাইজ।

বীণার সঙ্গে কাকার সম্পর্কটা খুব ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। তবে খারাপ কিছু নয় এখনও। একবার দলের পাণিয়া নামে একটা মেয়ে তাকে বলেছিল, ও বীণাদি, তুমি কাকাকে বিয়ে করো না কেন?

বীণা অবাক হয়ে বলে, বিয়ে! কী বলছিস? তোর মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

আলটপকা বলে ফেললাম বলে রাগ করো না। কিন্তু হলে কি খারাপ?

আমার একজন বর আছে। অপদার্থ হলেও আছে। কাকারও বউ আছে। তার চেয়ে বড় কথা আমাদের সম্পর্ক ওরকম নয় মোটেই। তোরা বুঝি এসব নিয়ে আড়ালে আলোচনা করিস?

পাণিয়ার মুখ একটু শুকিয়ে গেল। সে জানে, বিশ্ববিজয় অপেরায় এখন ক্ষমতার দিক দিয়ে কাকার পরেই বীণাপাণি। বীণাপাণি ইচ্ছে করলেই তাকে দলছাড়া করতে পারে। সে কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, কী জানো, আমি ভাবি তোমার আর কাকার জোড় হলে খুব ভাল হত। দুজনে যেন দুজনের জন্যেই জন্মেছে।

বীণাপাণি রাগ করেনি। সে জানে, পুরুষদের সঙ্গে গা ঘষাঘষি করে এই যাত্রা করে বেড়ানো, এর জন্য কানায়ুষো হয়ে থাকে। ওসব গায়ে মাখতে নেই। সে একটু হেসে বলল, মেয়েরাই মেয়েদের সবচেয়ে বড় শত্রু, জানি তো? একটু মেলামেশা হলেই কত কী ভেবে নেয় মেয়েরা। হ্যাঁ রে, মেয়েদের স্বাধীনতার কথা যে এত শোনা যায় সেটা কি তবে একটা হুজুগমাত্র? কাকার সঙ্গে আমার মেলামেশাটা কি বন্ধুর মতো হতে পারে না?

তা তো পারেই।

তা হলে হঠাৎ বিয়ের কথা ওঠে কেন? বিয়েটা কোন্ স্বর্গবাস বল তো! বিয়ে ছাড়া মেয়েদের বৃদ্ধি আর কাজ নেই? আমার ভুল হয়েছে বীণাদি। রাগ কোরো না।

বীণাপাণি বিষণ্ণ গলায় বলল, এইটুকু বয়সে, ভাল করে জ্ঞান হওয়ার আগেই আমার বাবা কোথা থেকে একটা লোক ধরে এনে বিয়ে দিয়ে দিল। তার ফলটা কী হল বলতো! ক'টা হাত-পা গজাল আমার? কোন্ আনন্দে ছিলাম? বিয়ের কথা শুনলেই তাই আমার পিঠি জ্বলে যায়। আর তোরাও হয়েছিস তেমনি, বিয়ের জন্য ল্যালা করে বেড়াস। যেন বিয়ে হওয়া মানেই মোক্ষলাভ।

ভুল হয়েছে বীণাদি। মাপ করে দাও।

এ কথা ঠিক যে বীণা সত্যিই আর ঘরসংসারের কথা ভাবে না। নিমাইকে ছেড়েছে বলে যে আর একজন পুরুষের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে হবে এমনটাতেও সে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু আবার এ কথাও ঠিক যে, তার আজকাল এক এক সময়ে বড় ফাঁকা আর একা লাগে। মাঝে মাঝে অশ্বলের ব্যাথায় সে ঘুমোতে পারে না বলে রাতে জেগে শুয়ে শুয়ে বড় নিখুম বোধ করে। মনে হয়, তার বৃকের ভিতরেও যেন অঙ্গকার, ঝিঝি ডাকছে, হা হা করে পাগলা বাতাস বয়ে যাচ্ছে।

বর্ষার শুরুতেই জ্বর হল বীণার। শুরুতেই একশো দুই। পরদিন জ্বর ঠেলে উঠল চারে। সঙ্গে কয়েকবার বমি আর দাউ। দুদিন জ্বর নিয়েও সে উঠে সব পরিষ্কার করতে পারল। তৃতীয় দিনে বড় কাহিল হয়ে পড়ল শরীর। পড়শী এক ডাকের মাসি এসে দেখে-টেখে বলল, এ জ্বর কিন্তু ভোগাবে।

কী করি বলো তো!

ডাক্তার ডাকিসনি?

না, কে ডাকবে? দুদিন তো কাউকে খবরও দিতে পারিনি। আজ তুমি এলে।

ডাক্তার ডাকা তো আর শক্ত কাজ নয়। অধীরকে গিয়ে পাঠাচ্ছি বৃন্দাবন ডাক্তারকে ডেকে আনতে। কিন্তু তোর যে এখন কাছে থাকার লোক চাই।

কাকাকে একটা খবর পাঠাবে? তা হলে দলের কোনও মেয়েকে পাঠিয়ে দেবেখন। কুসুমের কথা বলো। কুসুম এলে ভাল হবে।

তাই হবে মা। মাথাটা ধুইয়ে দিয়ে যাই। উঃ, এ যে অনেক জ্বর।

বৃন্দাবন ডাক্তার এল। দেখেটেখে বলল, টাইফয়েড বলেই তো মনে হচ্ছে। কয়েকদিন দেখা যাক, তারপর ক্লোরোমাইসিটিন দেওয়া যাবে।

বীণা একটু অস্থির হয়ে বলল, এখনই সারিয়ে দিন ডাক্তারবাবু। আমার যে অনেক কাজ।

কাজ বললেই শুনছে কে? প্রধানমন্ত্রীর তো তোমার চেয়েও অনেক বেশি কাজ, তাই বলে কি অসুখ হলে তাঁকে শুয়ে থাকতে হয় না?

আমি যে একা। কে সামলাবে সব?

সেটা তো বলতে পারি না। আর একাই-বা কেন? নিমাই কোথায় গেছে?

সে এখন এখানে থাকে না।

অঁ। তাই তাকে দেখি না আজকাল। কোথায় থাকে এখন সে!

কাঁচড়াপাড়ায়, দোকান দিয়েছে।

যাক, একটা হিলে হয়েচে তা হলে! শুকনো মুখে ঘুরে বেড়াত, দেখে ভারি কষ্ট হত। দোকান দেওয়ার ভারি শখ ছিল।

কুসুম এল বিকেলের দিকে।

কী হল বীণাদি?

ডাক্তার বলছে টাইফয়েড।

ও বাবা!

ভয় পেলি নাকি?

কুসুম একগাল হাসল, আমার আবার ভয়! বাবার ক্যাম্পার হয়েছিল, টানা ন'মাস সেবা করেছি। গু-মুত ঘেঁটে আমার অভ্যাস আছে।

সেইজন্যই তো তাকে ডাকা। শোন, বাড়িতে বলে আয়। কয়েকটা দিন আমার কাছেই থাকবি। পারবি তো?

বলেই এসেছি। তোমার চিন্তা নেই।

পারুলদের বাড়িতে একটা তক্তাপোশ পড়ে আছে, ব্যবহার হয় না। ওটা আজই ওরা পৌঁছে দেবে। ওটাতেই শুবি।

তক্তাপোশের কী দরকার ছিল? তোমার তো পাকা মেঝে। এখানেই শুতে পারতাম।

পাকা মেঝে মানে কি আর তেমন কিছু? ড্যান্স আছে।

জ্বরটা দুপুরের পর এত বাড়ল যে বীণাপাণি একটা ঘোরের মধ্যে ডুবে গেল। ডুবে গিয়ে একটা স্বপ্নের মতো কিছু দেখল। দেখল, বিশাল একটা রেষ্টুরেন্টে বসে সে খুব চপ কাটলেট খাচ্ছে। টেবিলে অনেক খাবার। এত খেয়ে শেষ করতে পারবে না।

কে যেন পিছন থেকে বলে উঠল, খাও খাও। খুব খেয়ে নাও, পয়সা লাগবে না। আমাকেও তো অনেক খাইয়েছে।
 মুখ ঘুরিয়ে সে নিমাইকে দেখতে পেল। কিন্তু স্বপ্নের চেহারাও অনেক বদলে যায়। এ নিমাই বেশ লম্বা, ভাল স্বাস্থ্য, ফর্সাও। তবু নিমাই বলে ঠিকই চিনল সে। বলল, শোধ দিচ্ছে নাকি?
 জিব কেটে নিমাই বলে, আরে ছি ছি। তোমার ঋণ কি শোধ করা যায়? তবে আমি নিমকহারাম নই।
 তুমি পয়সা নম্বরের নিমকহারাম।
 হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই নিমাই এক কাপ আইসক্রিম তার মাথায় উপড় করে দিল।
 বীণা চমকে উঠে বলে, করলে কি? চূলে যে আঠা হয়ে যাবে! আমাকে পালায় নামতে হবে না?
 মাথাটা গরম হয়েছে তোমার ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি।
 মাথায় সতিই ঠাণ্ডা টের পেয়ে চটকা ভাঙল বীণার। টের পেল কুসুম তার মাথায় জল ঢালছে।
 কী করছিস রে কুসুম?
 মাথা ধুইয়ে দিচ্ছি। জুরটা যে বড্ড উঠেছে। ভুল বকছো।
 ভুল বকছি? কী বলছিলাম?
 কি সব হাবিজাবি। কাকে যেন নিমকহারাম বলে গাল দিচ্ছিলে।
 প্রচণ্ড মাথা ধরা, শরীরের প্রণাড় দুর্বলতা সত্ত্বেও একটু হাসল বীণাপাণি। বলল, কাকে গাল দিচ্ছিলাম রে? জুরের ঘোরের মুখ ফসকে কত কথা বেরিয়ে যায়।
 কী খাবে বলো তো!
 খাওয়া! ও নামও উদ্ভারণ করিসনি। বমি পায়।
 ডাক্তার কী বলে গেছে জানো? ঠেসে খাওয়াতে। ভাত অবধি। জন্মো শুনিনি জুর হলে কাউকে ভাত দেওয়া হয়।
 আজকাল সব নিয়ম উলটে যাচ্ছে।
 স্নিগ্ধ জলের ধারায় বড় আরাম পাচ্ছিল বীণাপাণি। চোখ বুজল। ঘুম পাচ্ছে।...
 ওমা, এ কি তোমার বউ নাকি?
 নিমাই খুব লাজুক হাসি হেসে বলল, ওই আর কি।
 তার মানে?
 করে ফেললাম বিয়ে। করতেই হত তো। আমার বিরাট ব্যবসা, ওদিকেই পড়ে থাকতে হয়, যত্নআত্তি কে করে বলো!
 জুলে গেল বীণাপাণি। তবু বলল, খুব বীরত্বের কাজ করেছো তো! তা অমন একগলা ঘোমটা কেন? ঘোমটা সরিয়ে মুখখানা একটু দেখাও।
 নিমাই শশব্যস্তে বলল, দেখার মতো নয়। খেঁদিবুঁচি চেহারা। একেবারেই সাদামাঠা। তোমার ধারেকাছে নয়।
 আমাকে কি কোনওকালে সুন্দর দেখেছো তুমি?
 ও বাবা! তুমি সুন্দর নও। অমন মুখচোখ, অমন শরীর কটা মেয়ের আছে?
 থাক, আর খোসামোদ করতে হবে না। ঘোমটাটা খোলো, মুখটা দেখি।
 দেখলে তোমার খারাপ লাগবে। টাংরা, দাঁত উঁচু, কালো।
 তাই তো হওয়ার কথা। তোমার কি আর ভাল জুটবে? দোজবরে, তার ওপর অপদার্য।
 ঠিকই বলেছো। আমার মতো মানুষের তো তোমার মতো বউ হওয়ার কথা ছিল না। এ তোমাকে বরং একটা প্রণাম করুক। শত হলেও তুমি সম্পর্কে বড়।
 বউটা টিপ করে একটা প্রণাম করেও ফেলল।
 একটু পিছিয়ে গেল বীণাপাণি। বউটা যখন উঠে দাঁড়াল, তখন ঘোমটা সরে গেছে। বীণাপাণি অবাক হয়ে দেখছিল, টুকটুকে ফর্সা ভরাট লক্ষ্মী প্রতিমার মতো একখানা মুখ। দুখানা বড় বড় চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে।
 বীণাপাণি অবাক হয়েই বলে, এ তো ভীষণ সুন্দর! একে পেলে কোথায়?
 চারশো বিরাট অমায়িক গলায় বলল, তুমি নিজে সুন্দর বলেই ওকে সুন্দর দেখছো।
 তোমার কাছে সতি কথা শুনব না এ তো জানিই। কিন্তু কান্দছে কেন?
 ওকেই জিজ্ঞেস করো।
 বীণাপাণি মেয়েটার দিকে চেয়ে রইল। মুখটা চেনা ঠেকছে কেন? খুব যেন চেনা!
 ও মেয়ে, কান্দছো কেন?
 মেয়েটা বলল, আপনি আমাকে মাপ করুন।
 গলার শব্দটাও যেন কোথাও শুনেছে বীণা! চেনা, অথচ ধরা যাচ্ছে না।
 আমি মাপ করলুম, কিন্তু যার গলায় ঝুললে টের পাবে কেমন মানুষ!
 বউটা আরও কঁদে উঠে বলে, ও কথা বলবেন না। ওঁর মতো মানুষ হয় না। সাক্ষ্য দেবতা।
 বীণা ফুঁসে ওঠে, দেবতা! দেবতা! পুরুষকে দেবতা বানিয়ে বানিয়েই তো নিজেরদের বারোটা বাজালে। ওরা দেবতা নয়, হনুমান। তুমি একটা হনুমানের গলায় মুক্তোর মালা। বুঝলে! কিন্তু হনুমান তো মুক্তোর মর্ম বুঝবে না, চিবিয়ে দেখবে, টানহ্যাঁচড়া করবে, তারপর ছিড়ে ফেলে দেবে একদিন। অমন দেবতার মুখে আগুন।
 আপনি কেন পুরুষদের ওপর এত রেগে আছেন দিদি?
 দিদি! খবরদার আমাকে দিদি ডাকবে না। এমনি ডাকতে পারো, কিন্তু বড় সতীনকে ছোট সতীন যেমন দিদি ডাকে তেমন ভেবে নয়। বুঝলে? বরং বীণাদি ডাকবে। আচ্ছা, তোমাকে কোথায় দেখেছি, বলো তো?
 আমাকে!
 ভীষণ চেনা লাগছে। একেই বা জোটাতে কী করে?

মেয়েটা জবাব দিল না, মুখ নিচু করে পায়ের নখে মাটি খুঁড়ছে।
 খুব লাজুক বুঝি তুমি ?
 মেয়েটা বিষণ্ণ মুখখানা তুলে বলে, লজ্জাই তো ললনার ভূষণ!
 তাই বুঝি ? তবে আমি তো একদম ভূষণহীণ। আমার একটুও হায়া লজ্জা নেই। কেন, ও বলেনি তোমাকে ?
 না, তেমন কিছু বলেনি।
 ওর যে একটা বউ আছে বা ছিল সেটা বলেছে তো! নাকি সেটা চেপে রেখে বিয়ে করেছে তোমাকে ?
 সব বলেছেন। কিছু লুকোননি।
 যাক, তা হলে একটু সৎ সাহস এখনও আছে। তবে ভাজা ভাজা করে ছাড়বে, দেখো।
 নিমাই মিটি মিটি হাসছে। রাগটাগ কিছু নেই মুখে।
 আসল শয়তান কারা হয় জানো ? যাদের মাথা সবসময়ে ঠাণ্ডা, হাসি-হাসি মুখ, আর মনে জিলিপির প্যাচ। ওকে
 বাইরে থেকে দেখে, কেমন ভালমানুষটি!
 দিদি, পায়ের ধরি, ওঁকে নিয়ে ওরকম বলবেন না।
 কেন বলব না ?
 শুনলেও যে আমার পাপ হবে।
 আহা ন্যাকা, তোমার পাপ হতে যাবে কোন দুঃখে ? শয়তানকে শয়তান বলাইতো ভাল।
 উনি যে ভীষণ ভাল লোক।
 ছাই ভাল। কতদিন ঘর করেছে ?
 বেশি দিন নয়। কিন্তু বোঝা যায়।
 সজোরে মাথা নেড়ে বীণা বলে, কিছু বোঝা যায় না। আমারই বুঝতে কতদিন সময় লাগল। আচ্ছা, তোমার গলার
 স্বরটা কোথায় আগে শুনেছি বলো তো!
 জানি না তো!
 তোমাকে দেখেছি বলেও যে মনে হচ্ছে।
 নিমাই হঠাৎ খুব হাসতে লাগল।
 তুমি হঠাৎ হাসছো কেন ?
 চিনতে পারলে না ?
 না, কে ও ?
 ভাল করে দেখ।
 দেখলাম তো!
 তবু পারছো না!
 না তো!
 তোমার চোখ নেই। নইলে চিনতে দেরি হয় ?
 বলেই ফেল না।
 এ তো বীণা।
 তার মাগে ?
 বীণাপাণি। বিষ্ণুপদ বিশ্বাসের মেয়ে। গা শীতলাতলা বিষ্ণুপুর।
 বীণা স্তম্ভিত হয়ে বলে, কী যা তা বলছো ? মাথা খারাপ হল নাকি ?
 খুব হা হাঃ করে হেসে ওঠে নিমাই।...
 বীণা চোখ মেলে চায়। কপাল ভেজা। বোধ হয় জলপট্টি দেওয়া হচ্ছে। ঘর একটু আবছা অন্ধকার। বিছানার পাশে
 দুজন লোক দাঁড়ানো।
 কে ?
 আমি—আমি কাকা।
 ও। কখন এলে ?
 একটু আগে। জ্বরটা কি করে বাঁধালে ?
 ডাক্তার বলছে টাইফয়েড। কী হবে বলো তো!
 কিসের কী হবে ? জ্বরজারি তো মানুষেরই হয়।
 আমার যে রিহাসাল চলছে।
 কাকা আবার হাসল, প্রাণটা তো আগে। তারপর নাটক। কয়েকটা দিন রিহাসাল বাদ দিলে কোনও ক্ষতি হবে না।
 আমার ভীষণ খারাপ লাগছে।
 নাটক-নাটক করে আমিই পাগল বলে সবাই জানে। তুমি তো দেখছি আমার চেয়েও আরও এক ডিগ্রি বেশি পাগল।
 এ পাশ থেকে কুসুম বলে উঠল, জ্বরের ঘোরে অনেক ডায়লগও ছাড়ছে।
 তাই ? বলে কাকা আবার হাসল।
 অমন হেসো না তো। আমি জুলছি নিজের জ্বালায়।
 তোমার আবার জ্বালা কিসের ? ঝাড়া হাত-পা।
 কাকা, তোমাকে একটা কথা বলব ?

বলো না!

আমার একটা কাজ করে দেবে ?

নিশ্চয়ই।

কাঁচড়াপাড়ায় কাউকে পাঠিয়ে একটা খোঁজ নেবে ?

কার খোঁজ ? নিমাইয়ের ?

হ্যাঁ।

খবর দিতে হবে তো!

না না।

কাকা ফের হাসল। বলল, মেয়েদের তেজ বেশিক্ষণ থাকে না। তাই না ? যেই জ্বর হল অমনি সব বাঁধ ভেঙে গেল ? জ্বকুটি করে বীণা বলে, একটুও না। আমি মোটেই ওকে খবর দিতে বলিনি।

তবে কী বলছো ?

আমি শুধু জানতে চাই—বলে বীণা খেমে গেল। কী জানতে চায় সে ? কী জানতে চায় ? নিমাই সত্যিই আবার বিয়ে করেছে কি না ? করলেই কি ? তার কি যায় আসে ?

বীণা বলল, থাকগে।

আহা, লজ্জা পাচ্ছে কেন ? বলেই ফেল না।

তুমি হাসছো ? খুব মজা, না ?

মজারই ব্যাপার। তবে আনন্দও হচ্ছে।

কিসের আনন্দ ?

কাকা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে, নিমাই বড় ভাল লোক ছিল বীণা।

হঠাৎ এ কথা মনে ?

কি করে মনে বলি ? মনেটানে জানি না। কথাটা হঠাৎ মনে এল। তোমার যে এখনও নিমাইয়ের ওপর টান আছে এটাতেই আমার আনন্দ।

মোটেই টান নেই।

আচ্ছা, তাই হল। অত উত্তেজিত হয়ো না। নিমাইকে তা হলে খবর পাঠাতে হবে না তো! এখনও ভেবে দেখ।

না, কিছুতেই না।

তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো বীণা। রিহার্সালের জন্য মন খরাপ কোরো না। বর্ষাকালে তো আর বায়না নেই। পালানামতে দেরি আছে।

আমার তো আরও কাজ আছে।

সেসব আমি সামলে নেবো। ঘরটা বাঁধালে বুঝি ? ভাল কাজ করেছে।

কাকা চলে যাওয়ার পর বীণা খানিকক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থেকে বলল, হ্যাঁ রে, কুসুম, তোর কি আমাকে আর কাকাকে নিয়ে আড়ালে কিছু বলিস ?

হঠাৎ ওকথা কেন ?

সেদিন পাপিয়া হঠাৎ কেন আমাকে বলল, বীণাদি তুমি কাকাকে বিয়ে করো!

ওসব কথা-রাখো তো এখন।

বল না কুসুম, কেন বলল ?

কুসুম একটু হেসে বলে, ওই যে সুন্দরবনে কেরোকাঠি না কোথায় পালার পর কাকা তোমাকে হাত থেকে আংটি খুলে দিয়েছিল, সেই থেকে চাউর হয়েছে।

আংটি খুলে দিলে কী হয় ?

আহা, আংটি দিয়েই তো শকুন্তলা আর দুষন্তের বিয়ে হয়েছিল, মনে নেই!

বীণা হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বুজে বলে, ভগবান!

॥ ৭১ ॥

অপর্ণার ইদানীংকালের জীবনে সবচেয়ে বড় ঘটনাটা ঘটল পরতদিন, শুক্রবার। একজন ঠাকুরমশাইকে ধরে পাঁজি দেখিয়ে তবেই দিনটা স্থির করে রেখেছিল সে। সঠিক লগ্নিটি অবধি বয়ে যেতে দেখনি। করপোরেশনে সে বাড়ির প্রান জমা দিয়ে এল।

কিন্তু এত বড় ঘটনাটা শুধু তার কাছেই বড়। বাড়ির আর কারও কাছে নয়। ছেলেমেয়েরা কেউ ব্যাপারটাকে পাতাই দিল না, এমন কি মণীশ পর্যন্ত নিরুত্তাপ। কিন্তু একটা আনন্দকে সবাই মিলে অনুভব না করলে কি হয় ?

আনন্দটা অপর্ণার একার এবং নিজস্বই রয়ে গেল। সারা দিন নানা কাজের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ তার ভাবী বাড়িটার কথা মনে হয়। সুড়কি রংয়ের মিষ্টি একটা দোতলা। গেরুয়া বর্ডার থাকবে তাতে। চারদিকে গাছ-গাছালি থাকবে। দক্ষিণে একটা নিম গাছ, পাশে রাধাচূড়া আর কুম্ভচূড়া। একটা পলাশ গাছও থাকবে কোথাও।

কিন্তু বাড়ি হওয়ার আগে কত কি করার থাকবে অপর্ণার ? ইট আসবে, সিমেন্ট আসবে, বালি আর পাথরকুঁচি আসবে। মাটি খুঁড়ে ভিত গাথা হবে। পিলার উঠবে। ধীরে ধীরে দেওয়াল, গাঁথনি, ছাদ ঢালাই। একটা শূন্য স্থানে স্বপ্নের মতো, ম্যাজিকের মতো তৈরি হবে একখানা বাড়ি। আর কেউ না হোক অপর্ণা প্রথম থেকেই সাক্ষী থাকবে ঘটনাটার।

সারা দিন সে ছাড়া মাথায নিয়ে বসে থাকবে একটি কোণে। কাজ দেখবে, পাহারা দেবে, কাজের ফাঁকি ধরবে। আর এইসব করতে করতে ওই বাড়ির প্রতিটি ইটে, কাঠে, খাঁজে, কোণে সম্ভারিত হতে থাকবে তার মায়া আর ভালবাসা। একখানা বাড়ি এমনতেই কিছুই নয়। কিন্তু অপর্ণার বাড়ির মধ্যে সে নিজেও মিশে থাকবে ইট কাঠ সিমেন্টের মধ্যে।

আজ রবিবার। কিন্তু সব রবিবারই ঠিক রবিবারের মতো হয় না। আজকের রবিবারটা কেমন যেন গেমডামুখো, নীরব, নীরস আর ঘটনাহীন। ফি রবিবারের মতোই আজও কিছু ভালমন্দ রান্না হচ্ছে। মুগির মাংস আর ফ্রায়েড রাইস। এসব আজকাল খুব সাধনানে রাখতে হয় অপর্ণাকে। মণীশের রিচ খাওয়া বারণ। অপর্ণা তাই মাংসটা রাঁধে অনেকটা স্টু-এর মতো করে। ফ্রায়েড রাইস রাঁধে স্যালাড অয়েল দিয়ে। যাতে মণীশও খেতে পারে।

সকাল থেকে মণীশ আজ গোটা চারেক খবরের কাগজ নিয়ে বসেছে নিজের ঘরে। ব্রেকফাস্টের সময় রবিবার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হইহই করে। এমনই কপাল যে, আজ সেটাও ঘটেনি। বুঝকা সকালে জগিং করে এসেই চলে গেল কুলের ফেট-এ। অনু গেল ওয়েস্টার্ন মিউজিকের ক্লাস করতে। ঝুমকি আছে বটে, কিন্তু না থাকার মতোই। টনসিল ফুলে কষ্ট পাচ্ছে খুব। অনেক বেলা অবধি শুয়ে ছিল। একটি আগে উঠেছে। চা খেয়ে আবার শুয়েছে, জ্বর জ্বর ভাব।

বাসমতী দেবাদুন চালের ভাতটা চড়িয়ে একটি হাফ ছাড়ল অপর্ণা। হোক। মাংস হয়ে গেছে। কাজের মেয়েটা স্যালাড কাটছে, খাওয়ার মুখে একটু ভাজাভুজি করে দিলেই হবে।

প্রথমেই মেয়ের ঘরে হানা দিল সে।

কী করছিস, এই মেয়ে?

ঝুমকি করণ চোখ মেলে তাকাল, শুয়ে আছি, দেখছ তো!

কেমন লাগছে?

ভাল না। টোক গিলতে গলায় লাগছে।

কতবার করে বলি, বাইরে বেরনোর সময় গলাটা মাফলার দিয়ে জড়িয়ে নে! কখনও কথা শুনিস?

মাফলার গলায় দিয়ে বেরনো যায় বুঝি?

কেন যাবে না? রোগ হল সব করতে হয়।

এ মা, মাফলার যে বিচ্ছিরি জিনিস।

অন্তত একটা স্কার্ফ তো গলায় বাঁধতে পারিস! যার টনসিলের অসুখ তার কি ঠাইল করলে চলে?

উঃ, অত জোরে কথা বোলো না তো মা। মাথা ধরেছে, জোরে শব্দ হলে মাথা দপদপ করে।

সকালে তো কিছু খেলি না। এখন একটু দুধ খা।

ইচ্ছে করছে না! একটু শুয়ে থাকতে দাও চুপ করে।

খুব রেগে যাচ্ছিল অপর্ণা। রাগটা সামাল দিল। মেয়ের কপালে হাত দিয়ে দেখল, একটু টেম্পারেচার আছে।

ডাক্তার ডাকব রে?

না মা, টনসিল তো আমার পুরনো বন্ধু। চিন্তা কিসের?

বন্ধু না শত্রু? ওরকম বন্ধুর সঙ্গে ভাব না রাখলেই হয়।

ডাক্তার ডেকো না মা। শুষ্কের আন্টিবায়োটিক গেলাবে। ওসব খেলে আমার আরও শরীর খারাপ হয়।

আচ্ছা, বাড়িতে একজন শুয়ে থাকলে কি ভাল লাগে, বল তো!

ইচ্ছে করে শুয়ে আছি নাকি?

একটু উঠে রোদে গিয়ে বোস না।

না মা, এই বেশ আছি। বাবাকে একটু আমার কাছে এসে বসতে বোলো।

অপর্ণা স্থির চোখে মেয়ের দিকে চেয়ে বলে, আমি যে তোর কাছে বসে আছি সেটা বুঝি কিছু নয়? আমি কি তাদের কেউ নই?

ঝুমকি একটু হেসে মায়ের একখানা হাত ধরে বলল, কে বলে তুমি কেউ নও? বাবা কাছে এলে ভাল লাগে, তাই বলছিলাম।

আর আমি কাছে এলে ভাল লাগে না, না?

খুব লাগে মা। তুমিও থাকো। কিন্তু তোমাকে তো ডেকে পাই না। কত কাজ তোমার! একটু বসেই উঠে যাও।

আর তোর বাবা বুঝি সারা দিন বসে থাকে তাদের কাছে?

খুব হিংসুটি হয়েছো তো মা!

অপর্ণা ঠাটা করছিল না। তার দু' চোখ ভরে জল আসছিল। তার তিনটে ছেলেমেয়েই কোন এক আচর্য কার্যকারণে মণীশের ভক্ত। বাবা ওদের প্রাণ। সেটা মোটেই অপর্ণার খারাপ লাগে না। হিংসেও হয় না। কিন্তু তার মাঝে মাঝেই মনে হয়, ওরা তাকে ততটা ভালবাসে না যতটা ভালবাসা উচিত ছিল।

মায়ের মুখ দেখে দুঃখে করণ হয়ে গেল ঝুমকি, ও মা, তোমার চোখ ছলছল করছে কেন? আমি কী বলেছি বলো তো! শুধু তো বলেছি বাবাকে একটু আমার কাছে এসে বসতে বোলো। তাতে কি দোষ হল মা?

না, দোষ হবে কেন?

এ কথায় তো কিছু নেই মা।

সে আমি জানি আর ভগবান জানে। তোরা যে কেন আমাকে সহ্য করতে পারিস না।

ঝুমকি দু'হাতে অপর্ণার কোমরটা জড়িয়ে ধরে বলল, মা গো, রাগ কোরো না, লক্ষ্মী মেয়ে।

রান্নাঘর থেকে কাজের মেয়েটা হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠল, ই মা! গ্যাস যে ফুরিয়ে গেল!

অপর্ণা তড়িৎগতিতে উঠে দাঁড়াল, কী হয়েছে রে?

তোমার গ্যাস নিবে গেছে।

ফ্যান পড়ে নেবেনি তো? ?

না গো, ফ্যান পড়বে কি? ওখলায়নি তো এখনও।

ছোটখাটো দৃষ্টিভঙ্গীলোই করে খায় অপর্ণাকে। এই যে গ্যাস ফুরোলো এটা কোনও সমস্যাই হয়তো নয়; কিন্তু তার কাছে এখন এটাই মস্ত সমস্যা। ডরা সিলিভার রয়েছে তিনটে ঘর পেরিয়ে সেই বারান্দায়। দুর্ঘটনার ভয়ে তারা বারান্দায় সিলিভার রাখে। রান্নাঘর থেকে যেটা অনেকটাই দূর। এখন ওই ভারী সিলিভার টেনে আনবে কে? আগে মণীশ আনত, ইদানীং বুবকা। কিন্তু মণীশের পক্ষে অসম্ভব, কোনও ভারী কাজ করা তার একদম বারণ, বুবকা বাড়ি নেই। কী হবে এখন?

দেখলি তো কপালটা আমার! এখন কী করি?

ঝুমকি বলল, ভাবছো কেন? বুবকা এসে যাবে। তুমি বসে থাকো।

পাগল! আধসেক্ষ ভাত ফেলে রাখলে নষ্ট হয়ে যাবে। কত দামী চাল!

তোমার যে কত প্রবলেম মা!

অপর্ণা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, সংসারটা তো আমাকেই চালাতে হয় কিনা, তাই প্রবলেমগুলোও যে আমারই। যাই দেখি গে!

রান্নাঘরে এসে অপর্ণা সিলিভার ঝাঁকিয়ে বুঝল, গ্যাসই ফুরিয়েছে বটে। এবং ভাত খুব বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। এখনই আশুনে না বসালে নষ্ট হয়ে যাবে।

স্যালাড কুটতে কুটতে কাজের মেয়েটা বলল, বাবাকে বলো না, সিলিভার লাগিয়ে দেবে।

তোর যেমন বুদ্ধি! বাবা কত বড় অসুখ থেকে উঠেছে জানিস? যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

একটু উচ্ছ্বাসেই কথা হয়ে থাকবে। মণীশ শোওয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রান্নাঘরের সামনে দাঁড়াল। চোখে চশমা, হাতে খবরের কাগজ।

কী হল বলো তো! এনি প্রবলেম?

আর বোলো না। গ্যাসটা ফস করে ফুরিয়ে গেল।

ওঃ, তাতে কি হল? এখনই লাগিয়ে দিচ্ছি।

তুমি? বলে একটা আর্ত চিৎকার করে ওঠে অপর্ণা।

মণীশ যাওয়ার জন্য ঘুরেছিল খানিকটা, থমকে গিয়ে বলে, কী হল?

তুমি সিলিভার টানতে যাচ্ছ?

বরাবর তো আমিই লাগিয়েছি।

অপর্ণা দুখানা বড় বড় চোখে তার দিকে চেয়ে বলল, সত্যিই তুমি বোধ হয় মানুষও খুন করতে পারো। ওই ভারী সিলিভার টানলে তোমাকে আর ঝুঁজে পাওয়া যাবে? যাও, চুপচাপ ঘরে গিয়ে বসে থাকো। রান্নাঘরের প্রবলেম আমি সামলাব।

মণীশের খেয়ালই ছিল না যে, তার হাটের অসুখ। এ কথায় হঠাৎ সে আনমনে বাঁ হাতটা তুলে নিজের বাঁ পাজরে রাখল। তারপর বলল, আমি কি ততটা আনফিট?

অপর্ণা মেঘগর্জনের মতো বলল, ডাক্তারের বারণ, মনে থাকে যেন।

হ্যাঁ আটক হলে আর কি কোনওদিনই নর্মাল লাইফে ফিরে আসা যায় না অপু? সামান্য একটা সিলিভার লাগানো এমনকি শক্ত কাজ?

খবরদার বলছি। আর একটাও কথা নয়।

ঝুমকি ঘর থেকে উঠে এল। বাবার পাশে দাঁড়িয়ে তার কাঁধে দু' হাত দিয়ে একটু ভর রেখে বলল, না বাবা, তুমি এসব করবে না।

মণীশ একটু হেসে বলে, দেখ না একদিন এক্সপেরিমেন্ট করে। আমি শক্ত মালে তৈরি।

অপর্ণা চোখ পাকিয়ে বলে, তুমি কী দিয়ে তৈরি তা আমার জানা আছে। খুব বীরপুরুষ। কিন্তু বয়সটাও বসে নেই আর শরীরটাও লোহা দিয়ে তৈরি নয় এটা মনে রেখো।

ঝুমকি বলল, আচ্ছা মা, এক কাজ করলে হয় না? আমি আর বাবা ধরাধরি করে নিয়ে আসি না কেন?

অপর্ণা দৃঢ় গলায় বলে, না কখনও না। মেয়েদের ভারী জিনিস টানা একদম ভাল নয়।

বাঃ রে, আজকাল তো মেয়েরা ওয়েট লিফটিংও করে।

যে করে করুক। তোমাকে করতে হবে না।

মণীশ ঝুমকির মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, দ্যাটস্ এ গুড প্রোপোজাল। তবু তোমার যদি আপত্তি থাকে তবে তুমিও চলে হাত লাগাবে। তিনজনে মিলে আনলে সিলিভার ব্যাটা খুব জন্ম হবে। চলো।

বাসমতী অত্যন্ত সুখী চাল। একটুতেই গলে যাবে বা আঠা হয়ে যেতে পারে। চালটা নতুনও বটে। বুবকার জন্য আর অপেক্ষা করলে সমস্যা দেখা দিতে পারে। অগত্যা বেজার মুখে অপর্ণা বলল, তোমাকে ধরতে হবে না। আমি আর ঝুমকি বরং গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে আসি।

মণীশ মাথা নেড়ে বলে, তাতে মেঝেতে দাগ পড়বে। সরো, ফাঁকা সিলিভারটা সরিয়ে নিয়ে যাই।

না না, তুমি না।

মণীশ কথাটা কানে তুলল না। সিলিভারটা গিয়ে খুলে ফেলল। ঝুমকি গিয়ে ধরল তাড়াতাড়ি।

ছেড়ে দে। এটা হালকা, আমি পারব।

অপর্ণা ফের চৌচাল, তুমি তো সবই পারো। আমার গলাটা টিপে ধরতে পারো না?

আরে বাবা, এটা সত্যিই হালকা। ধরেই দেখ না।
আমি জানি। বলে অপর্ণা ঝুমকির দিকে চেয়ে বলল, হ্যাঁ রে, বাপের গাঙ্গে উঠে এলি বুঝি? এখন বুঝি আর শরীর খারাপ লাগে না?

দুজনে ধরাধরি করে যখন সিলিভার বারান্দায় নিয়ে যাচ্ছিল তখন অপর্ণাও গেল সঙ্গে সঙ্গে। মণীশ সব পারে। ওকে বিশ্বাস নেই। হয়তো ঝুমকিকে ফাঁকি দিয়ে নিজেই আনবে টেনে জগদল জিনিসটা। অপর্ণা আগেভাগেই গিয়ে সিলিভারের হাতল চেপে ধরল।

একটু হাসল মণীশ। ভরা সিলিভারটা তিনজনে মিলে তুলল বটে কিন্তু ঝুমকি বা অপর্ণার গায়ে তেমন জোর নেই। কার্যত মণীশই ওজনের সিংহভাগ বহন করল। সেটা টের পাচ্ছিল অপর্ণা, বলল, তুমি অমন ঝাঁকুনি দিলে কেন? ...ওই দেখ, তুমিই তো দেখছি বেশি ভার নিচ্ছ... আহা, অত তাড়াতাড়ি করো না...

সামান্য কাজ, তবু কত অসামান্য হয়ে গেছে আজকাল। মণীশের হাঁফ ধরে গিয়েছিল রান্নাঘর অবধি আসতেই। কিন্তু জোর করে হাঁফধরা শ্বাস গোপন করল সে। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক শ্বাস ছাড়ার চেষ্টা করতে করতে সিলিভারটা লাগিয়ে দিল সে।

বাবা!

কী রে!

আমার কাছে এসে একটু বসবে?

কেন, তোর কী হয়েছে?

শরীরটা ভাল নেই। জ্বর।

দেখ। বলে নিজের গালটা মেয়ের কপালে ঠেকিয়ে বলল, টেম্পারেচার তো আছে দেখছি।

বাবা, তোমার বুকেটা ধড়াস ধড়াস করছে কেন?

কোথায়! না তো!

করছে কিন্তু বাবা।

সামান্য। ওটা কিছু নয়।

অপর্ণা গ্যাস জ্বালাতে ব্যস্ত ছিল বলে এই ডায়লগটা শুনতে পেল না। পেলে বিপদ ছিল।

ঝুমকির ঘরে ঢুকে চারদিকে চেয়ে মণীশ বলে, বাঃ, ঘরটা তো বেশ শুছিয়ে রাখিস তুই?

মা রোজ বকে, জানো? বলে আমি নাকি ভীষণ অগোছালো।

কই, আমার চোখে তো অগোছালো ঠেকছে না।

বোসো না বাবা, একটু গল্প করি।

তোর শরীর খারাপ, শুয়ে পড়। আমি বসছি।

শোবো না। এখন ঘাম হচ্ছে। একটু ভাল লাগছে। বাবা, তোমার অফিসে আমার একটা চাকরি কি কিছুতেই হয় না।

চাকরি করবি কেন? তোর কিসের অভাব?

অভাব! অভাব তো কিছু নেই। কিন্তু বসে থাকব কেন?

তোর চাকরি করা উচিত নয়। যার চাকরির প্রয়োজন নেই সে যদি চাকরি করে তা হলে আর একজন নিডিকে সে বঞ্চিত করে।

আমার যে দরকার বাবা।

কিসের দরকার সেটা বলবি তো!

আমার নিজের পায়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে।

তোর মা তো চায় তোর বিয়ে দিতে।

বিয়ে? কক্ষনও না।

না কেন?

ওসব আমার ভাল লাগে না।

মণীশ একটু হাসল। চেয়ারে বসে দেওয়ালে একটা টিকিটিকির কিছু কোরামতি দেখতে দেখতে বলল, ভাল। খুব ভাল।

কি ভাল?

স্বাধীন থাকার ইচ্ছাটা।

তুমি আমাকে সাপোর্ট করছ তো?

করছি। তোর বিয়ে হলে আমি অনেকটা একা হয়ে যাব। হার্ট দুর্বল, হয়তো আর একটা অ্যাটাকও হয়ে যাবে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে, বেশ ভাল। আবার অন্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে মোটেই ভাল নয়।

ভাল নয় কেন বাবা?

এককথায় কি এর জবাব হয়? আমরা কেউ কোনও অবস্থাতেই স্বাধীন নই। স্বাধীনতা একটা রিলেটিভ ধারণামাত্র। এক ধরনের আই ওয়াশ। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা মানেই চাকরির অধীনতা, সেখানেও হুকুম করার লোক আছে, বাধ্যবাধকতা আছে। পুরো স্বাধীনতা কোথাও নেই।

তবু বিয়ের চেয়ে অনেক সম্মানজনক!

তাই কি?

সিটেমের অধীনতা মানা যায়, কিন্তু বিশেষ একজন পুরুষের বান্দী হয়ে থাকব কেন?

তোর মা কি আমার বান্দী ?

তোমাদের কথা আলাদা। তোমাদের মতো কপাল কটা আছে ?

বিয়ে হলে দেখাবি, তুইও তোর মায়ের মতোই। স্বাধীনতার ব্যাপারটা কেমন জানিস ? দুধ ফেলে পিটুলিগোলা ঝাওয়ার মতো। যে সব মেয়েরা সব সময়ে স্বাধীনতা স্বাধীনতা করে তারা একটু সাইকিক কেস।

বাবা! তুমিও একথা বলছ ?

মণীশ একটু ক্লান্ত হাসি হেসে বলে, ভালবাসার অভাব হলেই মানুষ একটা অলটারনেটিভ খোঁজে। স্বাধীনতা হল সেই জিনিস। স্বাধীনতা ব্যাপারটাই আমি বুঝতে পারি না।

সকাল থেকে দুপুর অবধি স্তিমিত রবিবারটা আবার একটু চাপা হল বুঝকা আর অনু ফেরার পর। মূর্গি আর ফ্রায়েড রাইস দুটোই জমে গেল খুব। হইহই হল।

ক্লান্ত মণীশ দুপুরে বেশ কিছুক্ষণ ঘুমল। বুকে একটা অস্বস্তি তার আছেই। ব্যথা নয়, খড়ফড়ানি নয়, শুধু মনে হয় কে যেন একটা আঙুলের ডগা তার বুকের বা ধারে ছুঁয়ে রেখেছে। এই অস্বস্তিটা সে প্রায় সবসময় টের পায়।

ঘুম থেকে উঠে যখন বাড়ি দেখল মণীশ তখন পৌনে চারটে। তার পাশেই ঘুমাচ্ছে অপর্ণা। ইদানীং একটু মোটা হয়েছে। চুলগুলো কিছু ফাঁকা। দু-একটা সাদার ঝিলিক।

মনটা খারাপ লাগল তার। বয়স হচ্ছে।

পত্রিকার পাতা নাড়াচাড়া করল আরও কিছুক্ষণ। আধঘন্টা পর উঠল অপর্ণা।

উঠেই বলল, এই তোমাকে অমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেন ?

ফ্যাকাসে ? যাঃ, আমি তো ভাল আছি।

কিন্তু কেমন দেখাচ্ছে বলো তো! টায়ার্ড ফিল করছ ?

না তো!

কতদিন চেক-আপ হয়নি! কাল চলো তো, চেক আপ করাবো।

মাসখানেক আগেই হয়েছে। অকারণ ভয় পেও না।

একটু চুপ করে থেকে অপর্ণা বলে, একটা কথা বলবো ?

বলো।

আমি যে বাড়ির প্র্যান্স জমা দিলাম তাতে তুমি খুশি হওনি ?

মণীশ একটু অবাক হয়ে বলে, আলাদা করে খুশি হওয়ার মতো ঘটনা কি সেটা ?

আমাদের বাড়ি হবে এটা ভাবতে তোমার ভাল লাগছে না ?

বাড়ি! বলে মণীশ কিছুক্ষণ যেন ভাবল। তারপর বলল, বাড়ি।

তার মানে কি হল ?

মণীশ একটু হাসে, বাড়ি তো ভাল জিনিস। নিজেদের বাড়ি।

ঠেস দিচ্ছ কেন ?

মণীশ হঠাৎ খুব অনামনক হয়ে গেল। শূন্য চোখে চেয়ে থেকে খুব ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, কোথায় বাড়ি কে জানে ?

ওটা আবার কেমন কথা ?

ওটাই কথা অপূ। বাড়ি যে কোথায় তা কি জানি! কে জানে সেই বাড়ির চেহারা কেমন ?

ফের ওসব বলছ ?

তোমার আনন্দ দেখে আমারও একরকম আনন্দ হচ্ছে। একটা খেলনা পেয়ে বাচ্চা যেমন ভুলে থাকে তুমিও তেমনি।

বাড়ি কি খেলনা ?

একটু সিরিয়াস খেলনা। একটু দামী। এই যা।

তোমার ফিলজফির জুলায় কি আমি পাগল হয়ে যাবো ?

মণীশ নড়েচড়ে বসে বলল, আচ্ছা, ভেবে দেখি আর একটু। এক কাপ চা করে আনো। ততক্ষণ ভেবে ফেলি।

থাক, তোমাকে আর ভাবতে হবে না।

অপর্ণা চা করে এনে দিলে, মণীশ জানালার ধারে চেয়ারে এলিয়ে বসে আছে। মুখচোখ ভাল নয়। দুর্বল। একটু

জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে।

কী হল তোমার ?

মণীশ অবাক হওয়ার ভান করে বলে, কী হবে ? তোমার যে রক্তচাপে সর্বপ্রথম হচ্ছে।

শরীর খারাপ নয় তো ?

না। শরীর ঠিক আছে।

শোনো। হাট এইলমেন্টে মনেরও একটা ভূমিকা আছে। তুমি আবার আগের মতো একটু ফুর্তিবাজ হয়ে ওঠো তো!

মণীশ চায়ে চুমুক দিয়ে জ্ব কুঁচকে কী ভেবে নিয়ে বলে, অপূ, তুমি বরং ঝুমকির বিয়ের চেষ্টা করো।

হঠাৎ একথা কেন ?

বিয়েটা দিয়ে যাই।

দিয়ে যাই কথাটার অর্থ জানো ?

জানি। জেনেই বলছি।

হ্যা গো, তোমার তবে সত্যিই শরীর ভাল নেই। ডাক্তার ডাকবো ?

না। এখনও ডাক্তারের দরকার নেই। কিন্তু যা বলছি শোনো।

কী শুনবো ?

ঝুমকির বিয়েটা এবার দেওয়া দরকার ।

মেয়ে কি আমার কথা শুনবে ? তুমি বুঝিয়ে বলো ।

একটু খোঁজ নাও । হতে পারে, শী ইজ ইন লাভ উইথ সামওয়ান । কিন্তু হয়তো প্রেমটা একতরফা । একটু খোঁজ নাও ।

কার কাছে খোঁজ নেবো ? ও মেয়েকে কেটে ফেললেও একটা কথা বের করা যাবে না ।

মণীশ চুপ করে রইল । অনেকক্ষণ বাদে বলল, তা হলে বাড়িটাই হোক ।

॥ ৭২ ॥

রশ্মি চলে যাওয়ার দিন চারেক পর ফের গাঁয়ের কুটির ফিরে গেল বটে হোমাস্প । কিন্তু বেশি দিন থাকা হল না । তার পাটনাররা তাগাদা দিচ্ছে, কাজকর্মে মন দাও । বিস্তর কাজ পেভিং ।

অস্বাভাবিকতারা হোমাস্পও বুঝতে পারছে । সে যদি কাজ না-ই করে তা হলে ফার্ম থেকে তার শেয়ার তুলে নিয়ে বেকার হয়ে যেতে হবে । তার চেয়েও বড় কথা, নিজের কেসগুলি যদি সে না করে তা হলে ক্লায়েন্টার অন্য ফার্মের কাছে চলে যাবে । তাতে বিস্তর ক্ষতি । শুধু তার নয়, পাটনারদেরও ।

সুতরাং হোমাস্প তার কুটির ছেড়ে কলকাতায় ফিরল । দাড়িটা কাটল না । রয়ে গেল । কলকাতায় ফিরেই আকর্ষণ কাজে ডুবে গেল সে । তার ফাঁকে ফাঁকেই ক্লায়েন্টের ডাকে যেতে হল বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, কানপুর । গাঁয়ে থেকে থেকে একটা জড়তা আসছিল শরীর আর মনে । কাজের জাতাকলে পড়ে সেটা কেটে গেল ।

দীর্ঘদিন আলস্যজড়িত সময় কাটানোর পর হঠাৎ এত কাজের চাপে প্রথমটা হাঁফ ধরে যাচ্ছিল হোমাস্পর । কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে সয়ে গেল । রশ্মির ফাঁকা জায়গাটা কি কাজ দিয়েই ভরাট করে নেওয়া যাবে !

প্রায় দু'মাস বাদে এক রাতে রশ্মির টেলিফোন এল লন্ডন থেকে ।

কোথায় থাকো বলো তো ! অন্তত তিনবার ফোন করেছি গত দু' মাসে । ফের কি গাঁয়ে ফিরে গেছ নাকি ?

না রশ্মি । অনেক দিনের কাজকর্ম জমে ছিল, বাইরে যেতে হল কয়েকবার । কেমন আছ ?

খুব ভাল । প্রথমটায় এসে এক বান্ধবীর কাছে ছিলাম কয়েকদিন । তারপর কাউন্সিলের ফ্ল্যাটে । এক সপ্তাহ হল

গ্রিনফোর্ডে একটা বাড়ি কিনেছি ।

বাড়ি কিনেছ ?

ছোট সুন্দর বাড়ি । বেশ অনেকটা জায়গা আছে । ছড়িয়ে ছিটিয়ে অগোছালো হয়ে দিবাি আছি । এবার এখানে ভীষণ ঠাণ্ডা । তুমি কেমন আছ ?

এই একরকম । একটু ফাঁকা লাগছে । তুমি নেই ।

রশ্মি হাসল, বোকা । আমি তো হাতের নাগালেই । কলকাতা থেকে কেউ কেউ আজকাল উইক-এন্ডেও লন্ডনে আসে, তা জানো ?

সে যারা পারে তারা যায় ।

সামারে চলে এসো না ! ওই সময়ে আমার মাও আসবে আমার কাছে । ইউরোপে একটা ট্রিপ দিয়ে আসব । আর শোনা, আমরা কিন্তু এখন অ্যাডাল্ট । কথাটা মনে রেখো ।

একটু বিমূগ্ন হাসল হোমাস্প । রশ্মি তাকে ডাকছে । সে গিয়ে রশ্মির সঙ্গেই থাকবে ? তার সঙ্গেই ইউরোপ ঘুরবে ? না, সেটা পেরে উঠবে না হোমাস্প ।

মুখে সে বলল, আচ্ছা, দেখা যাবে । গাড়ি কিনেছ ?

হ্যাঁ । একটা সেকেন্ড হ্যান্ড মার্সিডিস । দাড়িটা কি কেটে ফেলেছ ?

না । আছে ।

তা হলে কেটো না । দাড়িতে তোমাকে বেশ রোমান্টিক দেখাচ্ছিল ।

তোমার নিশ্চয়ই লন্ডনে গিয়ে ভাল লাগছে ?

দারুণ । তুমিতো জানোই এটাই আমার দেশ । এখানে আমি যত নিশ্চিন্ত বোধ করি ততটা আর কোথাও নয় । দিস ইজ মাই হোম । এখানেই জন্মেছিলাম, হয়তো এখানেই মরব ।

জানি । তুমি এখানে একদমই স্বচ্ছন্দে ছিলে না ।

না । আমার হাঁফ ধরে যেত ।

বরফ পড়ছে ?

আমি আসার পর একদিন পড়েছিল । সবুজ একটু মরে গেছে, কিন্তু তবু লন্ডন এই সিজনেও কলকাতার চেয়ে অনেক বেশি গ্রিন ।

কোনও অশান্তি নেই তো ?

লন্ডনে বরাবর কিছু অশান্তি থাকেই । তবে এখনও তো লন্ডন পুলিশ আর্মস ক্যারি করে না । ভয় পাওয়ার মতো কিছু নয় । গ্রিনফোর্ডে খুব পিসফুল এলাকা । সামারে আসবে ? কথা দাও ।

চেষ্টা করব ।

তোমার সেই শপিং-এর নেশাটা এখনও আছে ? নতুন কী কিনলে ?

হোমাস্প মৃদুস্বরে বলল, কিছু না । অনেক দিন কিছু কিনিনি । আজকাল খুব গৈয়ো হয়ে গেছি ।

তাই বুঝি ? এটা তো খুব ভাল খবর ।

রশ্মি, তুমি কাকে সবচেয়ে বেশি মিস করছ ?

জানো না বুঝি ? বলে রশ্মি একটু শব্দ করে হাসল, তোমাকেই মিস করছি।

ওখানে তোমার এখন নিচয়ই অনেক কাজ!

ও ভীষণ ! চাকরির পর বাড়ি এসে অনেক রাত অবধি পড়াশুনা করি। তার ওপর রান্নাটান্নাও করতে হচ্ছে। সময় একদম পাই না।

এইরকম আরও কিছুক্ষণ আগলা কথা হল। তারপর ফোন ছেড়ে দিল তারা। হেমাঙ্গ ভাবতে বসল, রশ্মির সঙ্গে কথা বলে তার কোনও ভাবান্তর হল কি ? বুকে দামাল রক্ত ছুটল কি পাগলা ঘোড়ার মতো ? আলো হয়ে গেল কি অন্ধকার মন ? না, ঠিক তা হল না। কিন্তু ভাল লাগল। সেই মৃদু ভাললাগা যেন আফটার শেভ লোশনের মৃদু গন্ধের মতো লেগে রইল অনেকক্ষণ তার মনে।

আজকাল চারুশীলা ফোন করে না। একটু রাগ করেছে। করতেই পারে। চারুশীলা খুব চেয়েছিল, বিয়েটা হোক। চেষ্টাও করেছিল যথাসাধ্য। অপমানটা ভুলতে পারছে না।

রশ্মির ফোন আসার দু'দিন বাদে সে চারুশীলাকে ফোন করল এক রাতে।

কেমন আছিস চারুদি ?

এই একরকম। তোর কি খবর ?

আমারও ওই একরকম। রেগে আছিস নাকি ?

রাগব কেন ?

আজকাল খেঁজ নিচ্ছিস না।

শুনতে পাচ্ছি তুই নাকি ভীষণ ব্যস্ত। দিল্লি-বোম্বাই করে বেড়াচ্ছিস।

ব্যস্ত ছিলাম।

রশ্মির কোনও খবর পেয়েছিস ?

দু'দিন আগে ফোন করেছিল।

কী বলে ?

ভাল আছে। ওটা তো ওর দেশ, জন্মভূমি।

আমাকেও ফোন করেছিল।

তাই নাকি ? কী বলছে তোকে ?

ভালই। তোর কথাও হল। তোকে মিস করছে।

জানি।

কী যে করলি তুই-ই জানিস।

প্রসঙ্গটা ভুলতে পারছিস না কেন ?

ভুলব ? রশ্মিকে কি ভোলা যায় ?

রশ্মিকে ভুলবি কেন ? কী বোকা তুই ! বিয়ের প্রসঙ্গটার কথা বলছি। ওটা তো এখন ইতিহাস।

ইতিহাস ভুলতে হয় বুঝি ?

ভুলে যা চারুদি। প্রিজ! ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন।

এখন ভগবানকে টেনে এনে নিজের দোষ ঢাকছিস ? বেশ ছেলে!

আচ্ছা চারুদি, তুই কেন আমার জীবনটায় অশান্তি ঢোকাতে চাস বল তো! আমার বহুকালের একটা মাত্র শখ, সেটা হল একা থাকা। অনেক কষ্টে বাবা-মাকে বুঝিয়ে বিভিন স্ট্রিটের বাড়ি ছেড়ে এখানে এসে দিবিয়া ছিলাম। তোরা তার মধ্যে একগাদা জটিলতা এনে ফেললি।

রশ্মিকে কি আমি এনেছিলাম ধরে ?

আমিও আনিিনি, রশ্মি একটা আকস্মিকতা, আমরা বন্ধুর মতোই তো ছিলাম। বিয়ের আইডিয়াটা তোর মাথায় খেলেছিল বোধ হয়।

সেটা তোর ভালর জন্যই। পরে পতাবি।

প্রসঙ্গটা থাক চারুদি। অনেক দিন আমাকে নেমস্তন্ন খাওয়ানি। একদিন খাওয়াবি।

যেদিন খুশি চলে আয়।

সুব্রতদা বাইরে চলে যাবিনি তো ?

না। এখন কিছুদিন থাকবে। ইউ পি-তে একটা বড় প্রোজেক্টের কাজ পেয়েছে। এখন তার বেস ওয়ার্ক চলছে।

কলকাতায় আছে তো ?

আছে। কালকেই আয়।

সন্ধের পর যাব।

চারুশীলা খুশি হল। বলল, তোর মস্ত সাপোর্টার হল তোর সুব্রতদা। কেন রে ?

আমি লোকটা যে ভাল।

হাই ভাল। ও কেবল বলে, হেমাঙ্গ ইজ এ গুড ডিসিশন মেকার। আমি শুনে হেসে বাঁচি না। শালুক চিনেছে

গোপালঠাকুর।

সুব্রতদা ইজ এ ওয়াইজ ম্যান।

দু'জনে দু'জনের পিঠ চুলকে গেলেই তো হবে না। তোরা দু'জনেই চূড়ান্ত ইমপ্র্যাক্টিক্যাল।

কাল যাচ্ছি তা হলে।

ফোন ছেড়ে দিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল হেমাঙ্গ। আজকাল টি ভি বা ভি সি আর ছাড়তে ইচ্ছে হয় না। গান শুনতে ইচ্ছে হয় না। বই পড়তে ইচ্ছে হয় না। শুধু চুপচাপ বসে থাকতে ইচ্ছে করে। বসে বসে যে কিছু একটা ভাবে তাও নয়। এলোমেলো নানা চিন্তা উড়ে যায় মাথার ভিতর দিয়ে ছেঁড়া মেঘের মতো।

তাকে কি আলসেমিতে ধরেছে?

পরদিন সন্দের পর হেমাঙ্গ গাড়ি চালিয়ে হাজির হয়ে গেল চারুশীলার বাড়িতে। ঢুকেই নানা সুখাদ্য রান্নার গন্ধ পেল বাতাসে। দেখল, তাকে উপলক্ষ করে আরও কয়েক জনকে নিমন্ত্রণ করে এনেছে চারুদি। তার একটা ঘনিষ্ঠমহল আছে। অবশ্যজ্ঞাবী তাতে থাকবেই কৃষ্ণজীবন সঙ্গীক, থাকবে অনু আর ভুমকিরা, ইদানীং থাকছে চয়নও। তারাই আছে। না, ভুমকি নেই, অনু আছে।

এত লোকের ভিড় আজকাল ভাল লাগে না হেমাঙ্গর। কথা বলতে ক্লান্ত লাগে।

তাকে দেখে অনুই প্রথম লাফিয়ে উঠল, হ্যাঙ্গো!

হেমাঙ্গ মুদ্র হেসে বলল, হ্যাঙ্গো। আরে! তুমি যে বেশ বড় হয়ে গেছে!

ছাই হয়েছে। একদম লম্বা হচ্ছি না যে!

তুমি কত?

পাঁচ ফুটের একটু বেশি।

তা হলে খুব লম্বা হবে। এটাই তো বাড়ির বয়স।

অনু মাথা নেড়ে বলে, কোনও চান্স নেই। ষোলোতেও মাত্র এতটুকু হাইট! ষোলোর পর কি আর মেয়েরা লম্বা হয়?

তা বলতে পারব না। তবে শুনেছি আঠারো পর্যন্ত সবাই বাড়তে থাকে।

উঃ, তা হলে বেঁচে যাই। পাঁচ চার বা পাঁচ হলে মোটামুটি চলে যাবে। পাঁচ সাত বা আট হলে তো কথাই নেই।

তুমি বুঝি খুব হাইট ভালবাস?

কে না বাসে বলুন, আপনি কিন্তু বেশ লম্বা। কত বলুন তো!

পাঁচ এগারো।

ওঃ, সুপার্ব!

একটু ইতস্তত করে হেমাঙ্গ জিজ্ঞেস করল, ভুমকি আসেনি বুঝি?

দিদির জ্বর হয়েছিল। উইক।

চাকরি পেয়েছে?

না তো!

একটু গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে কৃষ্ণজীবন বসেছিল এক ধারে। হেমাঙ্গকে দেখে একটু হাসল।

হেমাঙ্গ পাশের সোফাটায় বসে বলল, কেমন আছেন?

কৃষ্ণজীবন বিনীতভাবে বলল, ভালই। আপনার কি খবর?

ভাল।

দাড়ি রাখলেন বুঝি?

ঠিক রাখা নয়। রোজ শেড করতে ইচ্ছে হয় না।

দাড়ির একটা প্রাস পয়েন্ট আছে। র‍্যাডিয়েশন থেকে বাঁচায়।

তাই নাকি? আমি অবশ্য সেটা ভেবে রাখিনি।

শুনলাম কোথায় এক গ্রামে নদীর ধারে একটা বাড়ি কিনেছেন!

কে বলল?

চারুশীলা বলছিলেন।

হ্যাঁ।

বেশ করেছেন। শহরের মানুষেরা আজকাল একটু দূরে কোথাও ফার্ম হাউস বা খামারবাড়ি করছে। উইক এভে চলে যায়। একটু বিতৃষ্ণ বাতাসে দম নিয়ে আসে।

কাজটা তা হলে ঠিকই করেছি বলছেন? সবাই তো আমাকে পাগল বলছে।

কৃষ্ণজীবন মাথা নেড়ে বলল, মোটেই নয়। আমার তো মনে হয়, শহরের বাইরে একটা শেলটার করে রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

আপনি খুব শহর-বিরোধী, তাই না?

কৃষ্ণজীবন ম্লান হেসে বলে, তাও ঠিক নয়। শহর তৈরি করতে হলে তাতে লোকবসতির সঙ্গে সমানুপাতে প্রাকৃতিক পরিবেশও রাখা দরকার ছিল। মানুষের অস্তিত্বের জন্যই দরকার ছিল। ছেলেবেলার কলকাতার আকাশে চিল দেখেছেন?

অনেক দেখেছি।

আমরাও দেখেছি। দোকান থেকে খাবার আনার সময় প্রায়ই ছোঁ মেরে নিয়ে যেত। আজকাল আর দেখতে পান?

না।

তার মানে, কাছাকাছি চিল বসতে পারে এমন যে-সব গাছপালা ছিল সব লোপাট হয়ে গেছে। পাখি কমছে, জীবজন্তু কমছে। বাড়ছে শুধু ঘরবাড়ি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল হেমাঙ্গ। কৃষ্ণজীবন খুব বলিয়ে কইয়ে মানুষ নয়। নিজের বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ে কথা বলতে পারেই না।

হোমস্ বলল, কোথায় যেন গিয়েছিলেন আপনি ?

আমস্টারডাম। বলে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে হঠাৎ কৃষ্ণজীবন বলল, ওরা আমাদের একটা জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল। একটা অয়েল ট্যাঙ্কার ক্যাপসাইজ করে অনেকটা এলাকা জুড়ে সমুদ্র বিষিয়ে গেছে। মাছ মরছে, পাখি মরছে। সেইসব দেখাল ঘুরিয়ে।

হ্যাঁ। আমরা টেলিভিশনেও দেখতে পাই।

কী অপচয় বলুন তো! অত তেল নষ্ট হল, সমুদ্রের কত প্রাণী মারা গেল।

তা তো ঠিকই।

আমার মনে হয় কি জানেন ? আজকাল প্রায়ই অয়েল ট্যাঙ্কার লিক করে যে তেল পড়ে যাচ্ছে এর জন্য ওয়ার ফুটিং-এ একটা ব্যবস্থা করা উচিত। এমন যন্ত্র তৈরি করা দরকার যা দিয়ে জল থেকে তেল ফের তুলে নেওয়া যাবে। কাজটা খুব শক্ত হওয়ার কথা নয়। কারণ, তেল জিনিসটা জলে ভাসে। এটা সম্ভব হলে তেলটাও বাঁচে, সমুদ্রটাও বাঁচে।

ঠিকই বলেছেন।

কিন্তু এইসব জরুরি যন্ত্র তৈরি হচ্ছে না। হচ্ছে অকাজের জিনিস। তাই না ? ট্যাঙ্কারগুলোও যে কোন স্ট্যান্ডার্ডে তৈরি হয় কে জানে। আপনারা এটাকে বিজ্ঞানের যুগ বলে চিহ্নিত করেন, কিন্তু এসব দেখে মনে হয় মানুষ বিজ্ঞানের সঠিক ব্যবহার করছে না।

হোমস্ এই তদুগত লোকটার দিকে চেয়েছিল। বেশ আছে কৃষ্ণজীবন। বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্করহিত, ভাবনার ডুবজলে এর দিন কাটে। বেশ আছে কৃষ্ণজীবন। এর জীবনে একটা দুরন্ত ভালবাসা আছে। সে ভালবাসা পৃথিবীর প্রতি।

নিঃশব্দে কৃষ্ণজীবনের ডান পাশে এসে বসল অনু।

হোমস্‌র কেমন যেন মনে হল, আর বসে থাকার মানে হয় না। এদের দু'জনকে আগেও দেখেছে হোমস্। অসম বয়সী এই দুটি নারী ও পুরুষ—এদের একজনের চোখে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সম্মোহিত দৃষ্টি, অন্য জনের চোখে অনুকম্পা মেশানো প্রশ্ন। এখানে হোমস্‌র বহিরাগত। মানুষে মানুষে সম্পর্কের যে কতরকম কন্ট্রোলেশন হয়, কত জটিল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তার কোনও শেষ নেই।

এক নির্জন কোণে একা বসে ছিল চয়ন।

এই যে, কেমন আছেন ?

চয়ন তটস্থ হয়ে বলে, ভাল।

বসতে পারি ?

আরে কী যে বলেন! বসুন না।

হোমস্ বসল এবং হাসতে লাগল। বলল, আপনার কথা যতবার মনে হয় ততবার হাসি পায়।

চয়ন কাঁচুমাচু হয়ে রইল। প্রশ্ন করল না।

সেদিন এয়ারপোর্টে যাওয়ার সময়ে আপনার কথাগুলো নিয়ে আমি আজও ভাবি আর আপনমনে হাসি।

চয়ন ক্ষীণ একটু শ্রিতভাব মুখে ফুটিয়ে তুলে বলে, আমি খুব শুছিয়ে কথা বলতে জানি না। আপনার কোনও অসম্মান করিনি তো!

আরে না মশাই, না। আপনি আমাকে নিজেকে বুঝতে সাহায্যই করেছেন। অনেক সময়ে নিজের আবেগগুলোকে ঠিক চেনা যায় না কিনা!

যে আজ্ঞে।

প্রেম-ট্রেম করেছেন কখনও ?

চয়ন একটু সচকিত হয়ে বলে, আজ্ঞে না।

কখনও পড়েননি ?

চয়ন মাথা নেড়ে বলে, না। আমার জীবন ঠিক আর পাঁচজনের মতো নয়।

আপনি গরিব আর এপিএলপটিক বলে ?

চয়ন নিবে গিয়ে বলে, আমি ওসব ভাবতেই পারি না। সবসময়ে আমার অস্তিত্বের সংকট।

হোমস্ তার দিকে চেয়ে থেকে বলল, আপনার কোনও সংকট নেই।

আজ্ঞে, আপনি আমার সব খবর তো জানেন না।

কিছুটা জানি। বাকিটা অনুমান করে নিতে পারি। আপনি একটা কমপ্লেক্সে ভুগছেন। নিজেকে নিয়েই আপনার বেশি ভাবনা। ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স নয় তো!

চয়ন মৃদু হাসে, যে ইনফিরিয়র সে নিজেকে ইনফিরিয়র ভাবলে তা আর কমপ্লেক্স থাকে না।

কথা তো বেশ জানেন দেখছি। আমি বলি কি, আপনি কয়েক দিনের জন্য আমার বাড়িতে চলে আসুন। স্পেন্সার রুম, একটু বেড সব আছে। কয়েক দিন আপনার সঙ্গে আড্ডা দেওয়া যাক। আপনার প্রবলেমগুলো সলভ করা যায় কি না দেখব।

চয়ন করুণ হেসে বলে, যে আজ্ঞে।

বিশাল হলঘরের অন্য প্রান্তে মহিলামহল বসে গেছে। সেখান থেকে একবার হোমস্‌র উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল চারুশীলা। হোমস্‌ও হাতটা তুলল।

হঠাৎ চয়ন বলল, আপনার জন্য আজ একটা নতুন রান্না হচ্ছে।

হোমস্ অবাক হয়ে বলল, আমার জন্য ?

যে আজ্ঞে।

কি রান্না হচ্ছে ?

তা জানি না। শুনেছি আপনাকে সারপ্রাইজ দেওয়া হবে।

নাঃ, তা হলে তো সারপ্রাইজটা থাকল না।

তা হয়ত থাকল না। কিন্তু কে জানে ?

তার মানেটা কী হল ?

চয়ন একটু লজ্জা পেয়ে বলল, না, মানে কিছু নেই। সুনলাম আপনার জন্য একটা স্পেশাল মেনু হচ্ছে।

হেমাঙ্গ একটু চুপ করে রইল। কিছু বলল না। বুঝলও না।

বুঝল আর ঘটনাক্রমে বাদে। খাওয়ার সময়। সর্বশেষ শাক দিয়ে একটা দারুণ মুখরোচক তরকারি। এত সুন্দর জিনিস কখনও খায়নি হেমাঙ্গ।

কে রাখল রে ?

তাকে লুকিয়ে রেখেছি।

তার মানে ?

মুখ টিপে হেসে চারুশীলা বলল, এই, ডাক তো অঞ্জলিকে।

অঞ্জলি এসে খাওয়ার ঘরে দাঁড়াল। মুখে এক রাশ লজ্জা। ছিপছিপে, লম্বা, ফর্সা, চাবুকের মতো চেহারার এই তরুণীকে আগে কখনও দেখেনি হেমাঙ্গ। মুখখানাও ভারি সুন্দর।

হেমাঙ্গ চাপা গলায় বলে, কে রে ?

এ পাড়ায় নতুন এসেছে। ওরা পাক্কা নিরামিষাশী। সেই জন্য আমাদের সঙ্গে খেতে বসেনি।

ওঃ।

দেখতে সুন্দর নয় ?

হ্যাঁ। রাঁধেও ভাল।

অরিজিন্যালি গুজরাতি। তবে বাঙালি হয়ে গেছে। পছন্দ ?

॥ ৭৩ ॥

যেদিন ছেলেগুলো এসে বামাচরণের বউ শ্যামলীকে শাসিয়ে গেল, সেদিনকার ঘটনা গড়িয়েছিল অনেক দূর। রাতে দুই ভাইয়ে প্রথমে তুমুল ঝগড়া। তারপর বেদম মারপিট। বামাচরণ একটা দা নিয়ে এসেছিল অবশেষে। মাতাল রামজীবন হয়তো সেদিনই মারা পড়ত। শ্যামলী প্রায় উড়ে এসে কোমর জড়িয়ে ধরে বামাকে আটকায়। তবু দারের ডগাটা লেগেছিল রামজীবনের কপালে। ধারের দা, কপালের চামড়া আড়াআড়ি ইঞ্জি তিনেক ফাঁক হয়ে গলগল করে রক্ত গড়াতে লাগল। অনেকদিন ঠাণ্ডা মেরে ছিল বিষ্ণুপদ, মিইয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেদিন নতুন আনা বিজলি বাতিতে ছানিওলা চোখেও এই রক্তপাত দেখতে পেল। দেখে শরীরে একটা এমন কাঁপুনি উঠেছিল যে, তখনই দম বন্ধ হয়ে মরার দাখিল। নয়নভারা দৌড়ে গিয়ে রামজীবনকে জাপটে ধরে হাউমাউ করে চোচাতে লাগল। সঙ্গে রাঙাও। সেই চিৎকারে পাড়াপড়শীরা দৌড়ে এল। বাড়ির মধ্যে তুমুল হই-হুটগোল। এদিকে বারান্দায় বিষ্ণুপদ ধীরে ধীরে ঢলে পড়ছিল। কেউ লক্ষ করেনি তাকে। মূর্খা কাকে বলে তা জানেই না বিষ্ণুপদ। সেদিন বোধ হয় কয়েক মিনিট তার মূর্খাই হয়েছিল। আবার সেটা আপনা থেকেই কেটেও গেল। যখন চোখ চাইল তখন রামজীবন উঠে দাঁড়িয়েছে। কপালে একটা ন্যাকড়া বাঁধা, পুলিন ডাক্তার এসেছে, নিতাই এসেছে। আরও মেলা ভিড়। বামাচরণকে ঘরে টেনে নিয়ে দোর দিয়েছে শ্যামলী।

উঠতে গিয়ে বিষ্ণুপদ দেখল, শরীরটা খরখর করে কাঁপছে, মাথাটা চক্কর দিচ্ছে। কিন্তু এতো সুখের শরীর নয়। ইদানীং জরদগব হয়েছ বটে, কিন্তু একটা জীবন তো রোদে জলে, মাইল-মাইল হাঁটপথে, মজুরের অধিক পরিশ্রমে শরীর পোক্ত হয়েছে। বিষ্ণুপদ তাই পারি না-পারি করেও সিঁড়ি ভেঙে উঠোনে নামল।

পুলিন ডাক্তার তার দিকে চেয়ে খেঁকিয়ে উঠল, এইসব দেখার জন্য বেঁচে আছে ? মরতে পারো না ? না পারো তো কাশী, গয়া কোথাও গিয়ে ভিক্ষে করে খাও গে, তবু পাপচক্ষু এসব দেখতে হবে না।

বিষ্ণুপদের গলাটা বড্ড ধরা ছিল। মাথাটা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, মরার আগে এ সব হল প্রায়শ্চিত্ত। বুঝলে ? প্রায়শ্চিত্ত।

পুলিন কঠিন মুখ করে বলল, পরিষ্কার পুলিশ-কেস। সংসার আঁকড়ে আর পড়ে থেকো না হে বিষ্ণুপদ। বয়স হলে মানুষের যে কী জ্বালা, আজ হাড়ে হাড়ে টের পাই।

মাঝখানে দাঁড়ানো রামজীবন, তাকে ধরে তখনও কাঁধছে নয়নভারা। রাঙা নিজেদের দাওয়ার দাঁড়িয়ে বামাচরণের বাপাঙ্গ করছে চেঁচিয়ে। কিন্তু আচার্যের বিষয় রামজীবন একেবারে চুপ। একবার শুধু বিষ্ণুপদের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার কিছু হয়নি বাবা। সামান্য একটু রক্ত গেছে। ও কিছু নয়। আপনি গিয়ে শুয়ে থাকুন।

শোবো ? হঠাৎ শোবো কেন ? কতটা কেটেছে ?

সামান্যই।

নিতাই মাতব্বর লোক। এ গায়ের গাকীবাবা। লোকের উপকার করে বেড়ায়। এম এল এ হওয়ার ইচ্ছেও আছে। ইদানীং কী সব রাজনীতির কারণে কিছুদিন গ্রামছাড়া হয়ে ছিল। আবার ফিরেছে।

নিতাই বলল, জ্যাঠা, আপনার অনুমতি থাকলে পুলিশ ডাকবো। আজ যা হল এরপর তার চেয়ে অনেক গুরুতর ব্যাপার ঘটতে পারে।

রামজীবন ঠাণ্ডা গলায় বলল, না, পুলিশ ডাকার দরকার নেই। বাড়ির কেঁছা বাড়ির মধ্যেই থাকা ভাল।

যেটা তাদের ইচ্ছে। তবে পুলিশ ডাকলে ঘটনার একটা লিগ্যাল রেকর্ড থাকত।
বোঝা যাচ্ছিল, রামজীবনের নেশাটা কেটে গেছে। দার্শনিকের মতো একটু হেসে সে বলল, আমার বাপ-মা এখনও
বেঁচে আছে রে নিতাই। তাদের সামনে তাদের ছেলেকে ধরে নিয়ে যাবে—এটা কি হয়? ছেড়ে দে। যা ইওয়ার হয়ে
গেছে।

নিতাই মাথাটা নেড়ে বলল, ঠিক আছে। কিন্তু শ্যামলী বলছিল, কারা সেদিন এসে ওকে শাসিয়ে গেছে। কারা জানিস?

রামজীবন একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, জানি। বটভলার কাশী আর বিশেষ।

কেন শাসিয়েছিল?

সে অনেক কথা। আজ থাক। পরে একসময় শুনিস।

এরপর রামজীবন পাড়াপড়শীদের উদ্দেশ্যে হাতজোড় করে বলল, আজ আপনারা ফিরে যান। রাত হয়েছে। ঝগড়া-
কাজিয়া সব সংসারেই হয়ে থাকে।

মিনিট দেশেকের মধ্যেই বাড়ি ফাঁকা হয়ে গেল।

বিষ্ণুপদ বারান্দায় এসে বসল। শরীর জুতের নেই। রামজীবনকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে নয়নতারাও এল। পানের
বাটাখানা নিয়ে বসল কাছেই। নিঃশব্দে একখানা পান বানিয়ে মুখে দিয়ে বসে রইল।

বিষ্ণুপদ আড়চোখে দেখল নয়নতারাকে। গলা ঝাঁকারি দিয়ে বলল, সংসারে যখন এসব হয় তখন মৃত্যুভয় কেটে
যায়, না? তখন মনে হয়, মরণ রে, তুঁই মম শ্যামসমান।

নয়নতারার কান্নার একটা রেশ এখনও রয়েছে। হেঁচকি তুলতে গিয়ে সেটা প্রকাশ হল।

আর কেঁদো না। আজ অনেক কেঁদেছো।

মেয়ে হয়ে জন্মেছি, আর কান্দবো না, তাই কি হয়? কান্দতেই তো জন্মায় মেয়েরা।

সে তোমরা। আজকালকার মেয়েদের তা নয়।

আমি তো আর আজকালকার নই।

দেখে শেখো।

আর শেখা! কত শিখছি গো।

কথা আর এগোয় না। দুজনে বসে থাকে। রাত বাড়ে। মশা কামড়ায়।

অনেকক্ষণ বাদে বিষ্ণুপদ বলল, রেমোট কিরকম ধারা হয়ে গেল, দেখেছো? কেমন ঠাণ্ডা মেয়ে গেল।

নয়নতারা বলল, দেখছি। রেমোট তো ছেলে খারাপ নয়। মদ খেলেই যা একটু তড়পায়।

বন্ধুগুলো খারাপ। মেজো বউমাকে গুরুত্ব অপমান করে গেল সেদিন, কাজটা উচিত হয়নি।

তা বলে ভাইকে কাটতে যাবে?

একটু আস্তে বলে। রাত হয়েছে, শুনতে পাবে।

পাক গে। বলে নয়নতারা আবার পান খায়।

বিষ্ণুপদ চুপ করে থাকে। একটা হাই তুলে বলে, আজ শরীরটা বড় খারাপ লাগছে। শুয়ে পড়ি?

শোও গে।

তুমি?

আমি! আমার কি আজ ঘুম হবে?

তবু শুয়ে থাকবে চলে।

চলো।

দুজনে পাশাপাশি শুয়ে রইল। কিন্তু ঘুম হল না কারোই। বুকের মধ্যে নানা অশান্তি আর ভয় আজ নাড়াঘাটা খেয়ে
ঘুলিয়ে উঠেছে।

ঘটনার তিন দিন বাদে এক সন্ধ্যাবেলা বামাচরণকে ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে এল কল্লেকজন। মাথা ফাটা, ঠোঁট দিয়ে
রক্ত গড়াচ্ছে, কপালে একটা ডিবি ফুলে আছে, সর্বাঙ্গে আরও নানা ক্ষত। বামাচরণ কথা কইতে পারছে না। গোঙাচ্ছে।

সারা বাড়িতে তুমুল কান্নাকাটি আর চোঁচামেচি উঠল। শ্যামলী চোঁচাচ্ছিল, চোঁচিয়ে কান্দছিল নয়নতারা।

আবার নিজের শরীরের কাঁপুনি আর মাথার অন্ধকার টের পেয়ে বিষ্ণুপদ কিছুক্ষণ স্থবিরের মতো বসে রইল। যারা
ধরাধরি করে এনে দাওয়ায় শুইয়ে দিয়েছে বামাচরণকে, তাদের একজন বলল, মাঠের ধারে পড়েছিল।

আবার পুলিশ এল। পাড়াপড়শীরা এল। শুধু রামজীবনের কোনও পাত্তা নেই।

বিষ্ণুপদ কোনওক্রমে শুধু পুলিশকে জিজ্ঞেস করতে পারল, বাঁচবে?

পুলিশ মাথা নেড়ে বলল, বাঁচবে। হাসপাতালে নিলে ভাল হত। অনেক রক্ত গেছে। কলির শেষ হে, বিষ্ণুপদ। এ
হচ্ছে সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই। দেখে যাও, পাপস্থালন হোক।

শ্যামলী চিৎকার করে রামজীবনকে গালাগাল দিচ্ছিল। সেইসব গালাগালের মধ্যে শুয়োরের বাচ্চা, কুকুরের বাচ্চা,
বেশ্যার ছেলে, বেজান্না ইত্যাদির সঙ্গে, মুখে রক্ত উঠে মরার অভিশাপও ছিল। পুলিশ একটু বিরক্ত হয়ে বলল, চোঁচামেচি
করে কী লাভ হচ্ছে বলো তো! একে বরং ঘরে নিয়ে শোওয়াও গে। আর কাউকে পাঠিয়ে কয়েকটা ওষুধ আনিয়ে নাও।
তুলো আর ব্যালজও লাগাবে। তাড়াতাড়ি করো, আমি বেশিক্ষণ বসতে পারব না।

তাই হল। শ্যামলীর চোঁচানি একটু কম হল। বামাচরণকে ঘরে নিয়ে শোওয়ানোর পর সেটা আরও কমে গেল।

কাণ্ডটা যে রামজীবনের পরম বান্ধবরাই করেছে, এটা বুঝতে কারও বাকি নেই। পুলিশ ডাক্তার বিষ্ণুপদের পাশেই
একখানা টিনের চোয়ারে বসে বলল, মরতে কি তোমাকে সাথে বলি? এর জন্যই বলি। আগের দিনে যে পঞ্চাশোন্দের বনং
ব্রজেন নিয়ম ছিল, তারও কারণ হল এইসব।

বিষ্ণুপদ নীববে শুধু মাথা নাড়ল। কথা কওয়ার মতো অবস্থা নয়।

পুলিন কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলে, শুনেছো তো, আমার ছোটো পুত্রটির কাণ্ড। কথা নেই, বার্তা নেই, কোথা থেকে একটা গোদা মেয়েছেলে ধরে এনে বুক ফুলিয়ে বলল, এ আমার বউ। বরণ করো। বোঝো কাণ্ড! আমরা তো হাঁ হয়ে গেছি। তখন সে একখানা লেকচার বাড়ল। পুরনো বিয়ের নিয়ম-কানুন সে মানে না, এর সঙ্গে তার আশনাই হয়েছে, তাই একেবারে বিয়ে করে, শাখা সিঁদুর পরিয়ে এনে হাজির করেছে। জুতোপেটা করে তাড়াতে যাক্সিলাম, তা গিল্লি আড় হয়ে পড়লেন। মায়েরা তো সব ক্ষমার অবতার। আর মায়ের প্রশ্নেই যত কুলাঙ্গার তৈরি হয়। কী বলো?

বিষ্ণুপদ সামনের দিকে চেয়েছিল। বুকটা বড় হ-হু করছে। তার বড় ভরসা ছিল, রামজীবন উষ্টে কিছু করবে না। সেদিন দায়ের কোপ খেয়েও যেমন ঠাণ্ডা হয়ে রইল, রাগ দেখাল না, তাতেই মনে হয়েছিল, রেমোর বোধহয় একটা পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু সে যে ঠাণ্ডা মাথায় অন্য হিসেব কষেছিল, তা কি বিষ্ণুপদ জানত?

কী ভাবছে হে বিষ্ণুপদ? সংসারের কথা হলে, ও আর ভেবো না। ঘটিবাটি বেচে হলেও অন্য কোথাও গিয়ে থাকো। আমিও তাই ঠিক করেছে। হুগলিতে আমার মেজো ভাই আছে, সেখানে জমির একটু বন্দোবস্ত হয়েছে।

বিষ্ণুপদ গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, আমি বড় নিষ্কর্মা।

বলেই দ্বল, কথাটার কোনও মানে হল না। তাই ফের বলল, তুমি হলে করিবকর্মা লোক। আমার মতো হাবাগোবা নও। দেখ বিষ্ণুপদ, বহু বছর তোমাকে দেখছি। এই গায়ে উদ্ভাস্ত পণ্ডনের সময় থেকে সুখে দুঃখে একসঙ্গেই আছি। তোমাকে কি কিছু কম চিনি? সাত-পাঁচে থাকো না, সে ঠিক কথা। কিন্তু তা বলে বসে বসে এইসব দেখবে নাকি?

কোথায় পালাবো বলো? আমার যে যাওয়ার জায়গা নেই।

ওইটেই তো ভুল করেছে। একটা যাওয়ার জায়গা করে রাখতে হয়।

বিষ্ণুপদ চোখ বুজে খুব বুক ভরে গভীর শ্বাস টানল। মাথার চক্করটা টের পাচ্ছে সে। পুলিন আরও কিছুক্ষণ বকবক করল বসে। সে সব কথা তার কানেই ঢুকল না। তারপর পুলিন উঠে গেল বামাচরণের ঘরে। ব্যাভেক্ষ ঝাঁধবে, টেডভ্যাক ইনজেকশন দেবে।

কিছুক্ষণ বাদে শ্যামলী হঠাৎ দরজা খুলে বেরিয়ে এসে নাটকীয় ভাবে চৌচিয়ে বলল, আপনারা পুলিশে খবর দিন, পুলিশে খবর দিন। তারাই এসে দেখুক, এ বাড়িতে রোজ কী হচ্ছে!

পুলিন ডাক্তার ভিতর থেকেই বলে উঠল, চৌচিও না বউমা, এ রুগীর ঘর। মাথা ঠাণ্ডা রাখো।

বিষ্ণুপদর কাছে সামনের সব দৃশ্যই কেমন যেন কাচের ওপারের দৃশ্যের মতো হয়ে গেছে। যেন এসব অন্য এক জগতের ছবি। সব মিথ্যে, সব মায়া।

বাড়িটা নিস্তব্ধ হল প্রায় রাত বারোটা নাগাদ। সকলেই শুতে গেল। বিষ্ণুপদও। শুয়ে নয়নতারা বলল, হ্যাঁ গো, কৃষ্ণর কত বড় বাড়ি?

বড়ই। তবে জায়গা-বাসা বিশেষ নেই। কেন বলো তো!

আমরা গিয়ে যদি থাকি তো জায়গা হবে?

বলো কি, সেখানে গিয়ে থাকবে!

কেন, ফেলে দেবে নাকি?

বিষ্ণুপদ একটু হাসল, তা হয়তো ফেলবে না। কৃষ্ণ তো রাখতেই চায়। কিন্তু আবার কিন্তুও তো আছে! বউমা।

তা একটু গালমন্দ করবে, অশ্বেন্দা অবহেলা করবে। তা করুক না। খুনোখুনি তো দেখতে হবে না।

শেষ বয়সটায় এই যে কষ্ট পাচ্ছে, এও হয়তো ভালই। পাপ কাটছে।

অত পাপ কি করেছে? তুমি কী বলো?

আমার চোখে তো পড়েনি।

তা'হলে!

এই তা'হলের জবাব কি আর আমি জানি!

আমরা তো আর কাশী-বৃন্দাবন যেতে পারব না। ট্যাকের জোর নেই। হ্যাঁ গো, মেজো বউমা নালিশ করলে কি আমাদের পুলিশে ধরবে?

বিষ্ণুপদ একটু ভেবে বলে, তা ধরতে পারে।

এও কি কপালে লেখা আছে, শেষ অবধি?

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মাত্র।

নয়নতারা বলল, আমাকে ধরে ধরুক, সে সইবে। কিন্তু তোমাকে ধরলে যে আমাকে গলায় দড়ি দিতে হবে।

বিষ্ণুপদ মৃদু স্বরে বলল, একটু পান খেয়ে ঘুমোও। কাল কি হবে তা নিয়ে ভাবতে নেই। যা হওয়ার হবে।

ঘুম কি হবে?

একটু পান মুখে দাও। হবে।

বাস্তবিকই পান মুখে নিয়ে নয়নতারা ঘুমোলো। তখন বিষ্ণুপদ টচটা হাতে নিয়ে এসে বাইরে বসল। বুকের মধ্যে বড় উচাটন। বড় উত্থাল-পাত্থাল। একটা আশার আলো যেন বিদ্যুৎকমকের মতো ঝলসে উঠে মিলিয়ে গেছে।

বামাচরণের ঘর থেকে নানাবিধ শব্দ হচ্ছে। কখনও শ্যামলীর গলা, কখনও বামাচরণের "উঃ আঃ"।

অপমান করবে? তা করুক। বিষ্ণুপদ উঠান পেরিয়ে বামাচরণের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

বউমা, আমি বিষ্ণুপদ।

শ্যামলীর কঠিন জবাব এল, কী চান? শেষ তো করে ফেলেছেন মানুষটাকে।

বউমা, বামার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?

কষ্ট হলে কী করবেন ?

আমি বাইরেই বসা আছি। দরকার হলে ডেকো।

আপনাকে বসে থাকতে হবে না। নাকে তেল দিয়ে ঘুমান গিয়ে। উঃ, কত দরদ!

বিপদের সময়ে বিচলিত হতে নেই। হিতে বিপরীত হয়।

আপনি ঘরে যান। আমার উপদেশের দরকার নেই।

বিষ্ণুপদ একটু চুপ করে থেকে বলল, আমি বড় অপদার্থ, মা। আমাকে মাগ করে দাও।

একথাটার কোনও জবাব এল না। বামাচরণ শুধু একবার বলে উঠল, কে গো ? বাবা নাকি ?

তুমি ঘুমোও তো।

বাইরে কী বাবা ? ঘরে আসতে বলা।

শ্যামলী কঠিন গলায় বলল, না। তুমি ঘুমোও।

বামাচরণ একবার উঃ বলে কাতর আর্তনাদ করল। তারপর বলল, বাবা গায়ে হাত বোলালে ব্যথা সেরে যায় জানো ?
হেলবোলা...

আর বলতে পারল না বামা। বোধহয় ঝিমুনি এল।

শ্যামলী চাপা গলায় বলল, আমি বসে সেবা করছি আর উনি বাবা-বাবা করছেন!

বিষ্ণুপদ মাথাটা দুধারে নাড়ল। তারপর বড় ধীর পায়ে ফিরে এল দাঁড়ায়।

ধীরে ধীরে বামাচরণের ঘরের শব্দটুকু সব বন্ধ হয়ে গেল। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়ল দুজনেই।

বিষ্ণুপদের আজ দু'চোখ বড় জ্বালা করছে। দু-এক ফোঁটা জলও পড়ল বোধহয়। আজ তার বড় মরে যেতে হচ্ছে।
যদি এই মুহূর্তেই বুকের শব্দ থেমে যায়, তাহলে বেশ হয়।

একটা ছায়ামূর্তি চোর পায়ে উঠোনে ঢুকল। চারদিকটা আন্দাজ করছে।

বিষ্ণুপদ টটটা একবার পট করে জ্বালিয়েই নিবিয়ে দিয়ে খুব চপা গলায় বলল, আয়।

ছায়ামূর্তি কাছে এসে দাঁড়ায় বসল।

তোর জন্যই বসে আছি।

রামজীবন একটা শ্বাস ফেলল। বিষ্ণুপদ বাতাসটা শূঁকে বুঝল, রামজীবন আজ মদ খায়নি।

কোথায় ছিল এতক্ষণ ?

মন্টা ভাল নেই বলে একটু কলকাতায় ঘুরে এলাম। ফিরেছি অনেকক্ষণ, বটভলায় বসেছিলাম।

কী হয়েছে তা জানিস ?

জানি। শুনেছি।

এ কাজ করলি কেন ? সেদিন মার খেয়েও কেমন ঠাণ্ডা ছিলি, বুকে আমার ভরে গিয়েছিল। আজ বড় অস্থির লাগছে।

কেন করলি বাপ ?

নিজের জন্য করিনি বাবা।

কার জন্য করলি ?

ও যে আপনাকে আর মাকে উচ্ছেদ করতে চায়!

তা আর বেশী কথা কী ? চাইতেই পারে।

রোজ খুঁটঝামেলা ভাল লাগে না বাবা। একদিন একটু শিক্ষা হওয়া ভাল।

বিষ্ণুপদ মাথা নাড়ল, ও ভাবে কি হয় বাপ ? গুণ লাগিয়ে কি শিক্ষা হয় ? বামা যা চায়, তাতে তার হক আছে।

লোভী বলে ওর তর সয় না।

বাবা, বামাচরণ কখনও এ সংসারের জন্য কিছু করেছে ? আপনাদের সেবা দূরে থাক, কোনওদিন শরীর খারাপ হলে এসে জিজ্ঞেস করেছে, কেমন আছেন ? কোনওদিন একটা ফল হাতে করে এনেছে আপনার জন্য ? কিছুই করেনি, তবু ভাগ চায় কেন ? ভাগে ওর কী অধিকার ?

অন্য কেমন তা দেখে তোর দরকার কী ? তুই কেমন সেটা নিয়ে ভাবিস না কেন ?

আমি কেমন, বাবা ?

তোর অনেক গুণ বাপ। অনেক গুণ। কিন্তু বাপকে মাকে ভালটা মন্টা খাওয়ালে আর ভক্তি শ্রদ্ধা করলেই কি হয় ?
বুকে যে ডেঙে দিলি! দায়ের কোপ খেয়েও রেগে গেলি না, সেইটে দেখে যে বড় ভরসা হয়েছিল।

রামজীবন মাথাটা নিচু করে রইল। তারপর বলল, আমি তো খারাপই বাবা। আপনি আমার মধ্যে ভাল দেখেন কেন ?

মার খেয়ে যদি উল্টে মারলি, তবে শোধবোধ হয়ে গেল। যদি মার খেয়েও না-মারলি, তবে তোর তবিলে কিছু জমা হল। আমি আহাশ্বক, এরকমই বুঝি।

বামা যখন আপনাকে ঘরছাড়া করতে চায়, তখন আমার মাথার ঠিক থাকে না।

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, কাল হয়তো পুলিশ আসবে। আজ অবধি এ জীবনে কখনও পুলিশের সঙ্গে বোঝাপড়া হয়নি আমার। এবার হবে।

পুলিশে খবর দিয়েছে, আমি জানি বাবা। তবে এফ আই আর করেছে আমার নামে। থানা থেকেই জেনে এসেছি।

থানায় গিয়েছিলি ?

প্রায়ই যাই। কিছু হবে না। সাক্ষী নেই।

ঘরে যা।

যাই। মাঝরাত অবধি বসে আছেন, আপনার শরীর খারাপ হবে না ?

শরীর আর কিসের খারাপ হবে ? এখনও আছে, এই যথেষ্ট ।

ওরকম বলবেন না বাবা ।

আমার কখনও মরার ইচ্ছে হয় না । প্রাণটা যতদিন থাকে ততই যেন ভাল । কিন্তু আজ আমার বড় মরার ইচ্ছে হচ্ছিল ।

কেন বাবা ?

দুনিয়ার সঙ্গে আর লটকে থাকতে পারছি না । আলগা হয়ে গেছি যেন !

রামজীবন হাত বাড়িয়ে বিষ্ণুপদর পা দুটো ছুঁয়ে বলল, এই পা ছুঁয়ে যা প্রতিজ্ঞা করতে বলবেন আজ, তাই করব । বলেন বাবা ।

বিষ্ণুপদ নড়ল না । চুপ করে বসে রইল ।

বলেন বাবা, যা খুশি । আজ যা প্রতিজ্ঞা করাবেন, তাই করব ।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, না ।

না কেন বাবা ? যা বলবেন ।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, আমি বিচক্ষণ মানুষ হলে তোকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিতাম । কিন্তু আমার ভরসা হয় না বাপ । কী করতে কী করে ফেলি ! আমাকে মাপ কর ।

বলছি তো, আপনি যেমন চান আমাকে তেমন হতে বলুন । প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিন ।

তাই কি হয় বাপ ? আমি যেমন চাই, তুই তেমনটাই বা হবি কেন ? আমি চাইবার কে ? দুনিয়ার সব ভালমন্দ কি আমি বুঝি ? তুই নিজে বুঝে দেখ বাপ ।

আমি যে বুঝতে পারি না বাবা !

আমিও পারি না । এই তো দেখি, বামা মদ-বিড়ি খায় না, অন্য দোষও কিছু নেই বোধহয়, তবু তাকে কি ভাল দেখি ? আর এই যে তুই নেশাভাঙ করিস, গুগার দল নিয়ে বেড়াস, তুই কি ততটা খারাপ ? মানুষের ভাল-মন্দর বিচারটাও তো গোলমালে । আমার কাছে ভাল হলেই কি ভাল, খারাপ হলেই খারাপ ? গান্ধীবাবার মধ্যও তো লোকে খারাপ দেখেছে, নইলে মারে ?

রামজীবন আর একটু কাছ ঘেঁষে বসল । বিষ্ণুপদর পা দুখানা কোলে তুলে নিয়ে বলল, আপনি ক্ষমা করলেই আমার সব পাপ মুছে যাবে বাবা ।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, ওরকম বলিস না । আমি কি তোর মালিক, না সৃষ্টিকর্তা ? ওরকম বলিসনি, বাপ-মা তো ক্ষমা করার জন্য মুখিয়েই থাকে । তাদের ক্ষমায় কি ক্ষমা হয় ? আরও বড় জজ আছে ।

আমার কাছে আপনারা দুজনেই ভগবান ।

বিষ্ণুপদ একটু হাসল । বলল, বামা যা চায় দিয়ে দিতে পারবি ?

তা কেন পারব না ? আপনি বললেই পারব ।

দিতে বলিনি । দিতে পারবি কিনা জিজ্ঞেস করলাম ।

পারব বাবা ।

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল । বলল, ওতেই হবে ।

আপনি আমাকে কখনও মদ ছাড়তে বলেননি বাবা । কেন বলেননি ?

বলে কি লাভ ?

পা দুখানা বুকের কাছে চেপে ধরে ঝুম হয়ে বসে থাকে রামজীবন । তারপর বিষ্ণুপদ টের পায়, রামজীবন কাঁদছে । ফলে ফলে কাঁদছে । সেই কান্না বিষ্ণুপদ নিঃশব্দে বসে শুনে লাগল । নড়ল না । একটা কথাও বলল না । রামজীবনের কান্নাই যেন আকাশ থেকে অন্ধকার মুছে দিচ্ছে । বিষ্ণুপদর বুক থেকেও । বিষ্ণুপদ বহুকাল এত বুকভরা আনন্দকে টের পায়নি ।

॥ ৭৪ ॥

যারা টিউশনি করে তাদের কিন্তু টিউশনির একটা নেশা ধরে যায়, তা জানেন ? তখন আর চাকরিবাকরি করতেই চায় না । আমার মনে হয় আপনারও নেশা ধরে গেছে ।

কথা হচ্ছিল ছাদে । দুপুরবেলা । আজ অনিন্দিতার ছুটি । চয়ন আরও পরে বিকেলের টিউশনিতে বেরবে । শীতের রোদ ছাদময় ছড়িয়ে রয়েছে । কিছু লেপ, কবল, বাগ্লিশ রোদে দিয়েছে অনিন্দিতা । এ সময়টায় নিজের দুর্বল শরীরটাকে রোদে একটু স্নেহে নেয় চয়ন । মুখোমুখি দু'জন একটা তোশকের ওপর বসে আছে ।

যে যা বলে চয়ন তা মোটামুটি মেনে নেয় । তর্ক করে না, তেমন আপত্তিকর কথা হলেও আপত্তি তোলে না । ফলে সকলের সঙ্গেই তার সম্পর্কটা বজায় থাকে । সে অনিন্দিতার কথায় সায় দিয়ে বলে, বোধ হয় ঠিকই বলেছেন । তবে টিউশনিতে ছোট্টাছুটির পরিশ্রম বেশি ।

ছোট্টাছুটিই তো ভাল । ইন্টারেস্টিং । একঘেয়েমি থাকে না ।

চয়ন একটু হাসল, তা হলে কি আপনি টিউশনির পক্ষে ?

অনিন্দিতা মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, মোটেই তা নই । টিউশনি দু-একটা করা খারাপ নয় । কিন্তু সারাক্ষণ ছেলেমেয়ে পড়িয়ে বেড়ানো মোটেই ভাল নয় ।

চয়ন কথাটায় সায় দিয়ে বলল, অনেকটা বাড়ির কাজের লোকের মতো, তাই না ? প্রাইভেট টিউটরের তেমন সম্মানও নেই ।

৩১০

অনিন্দিতা একটু বিরক্ত হয়ে বলল, সে তো হল, কিন্তু টিউশনি করেই কি জীবনটা কাটিয়ে দেবেন ভেবেছেন ? আঙ্কা কুঁড়ে লোক আপনি !

চয়ন একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার কি কোনও ক্যারিয়ার থাকার কথা ? মা কী বলত জানেন ? বলত, শুধু বেঁচে থাক বাবা, তোর কাছে আমি আর কিছু চাই না। আমি ছেলেবেলা থেকেই তাই জেনে এসেছি, আমাকে শুধু কোনওরকমে বেঁচে থাকতে হবে।

এটা পুরুষমানুষের মতো কথা হল ?

পুরুষমানুষ কথাটা একটা মন্তব্য কথা ! সবাই তো সমান হয় না, হয় বলুন !

অনিন্দিতা তার দিকে স্পষ্ট চোখে চেয়ে বলল, নিজের সম্পর্কে আপনার ধারণা এত খারাপ কেন বলুন তো ! আত্মবিশ্বাস নেই একটুও ?

আজ্ঞে না।

কী যে করি আপনাকে নিয়ে ! সবসময়ে যেন জুজুর ভয়ে জড়সড় হয়ে আছেন।

চয়ন একটু হাসল। তারপর মৃদু গলায় বলল, সত্যিই, আমার মতো ভীতু বোধ হয় দুটো নেই।

আমি রোজ আপনাকে একটু একটু করে ইনস্পিরেশন দেওয়ার চেষ্টা করি সেটা কি বুঝতে পারেন ?

চয়ন লজ্জিত হয়ে বলল, আঙ্কে, তা পারি।

কিন্তু আপনি একটুও ইনস্পায়ার্ড হন না। তাই না ?

চয়ন মাথা নিচু করে হাসতে লাগল। তারপর বলল, কেউ আমার জন্য ভাবছে এটা জেনে আমার একটু উৎসাহ হয়।

আহা, কী কথা ! একটু উৎসাহ হয় ! কেন, গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সব ওলটপালট করতে হচ্ছে হয় না ?

ও বাবা ! কী ওলটপালট করব ?

সব কিছু।

চয়ন হাসতে লাগল।

হাসছেন কেন ? আমি কিন্তু সিরিয়াসলি বলছি।

আপনি অত সিরিয়াস হবেন না।

কেন হব না ? আমি আপনার জন্য ভাবি, কষ্ট পাই, তা জানেন ?

অপ্রতিভ হয়ে চয়ন বলল, কেন ভাবেন ? ভেবে কিছু তো লাভ নেই। আমার ভিতরে কোনও ঘুমন্ত বীরপুরুষ নেই যে তাকে জাগিয়ে তোলা যাবে। এমন ছাইচাপা আগুনও নেই যাকে আবার খুঁচিয়ে গনগনে করে তোলা যাবে।

নিজের সম্পর্কে কারোই পরিষ্কার ধারণা থাকে না। আপনারও নেই।

চয়ন লাজুক হেসে বলল, আপনার কথা খুব ঠিক। কিন্তু আমি অনেক দিন ধরে নিজেকে লক্ষ করছি। কখনও বন্ধুর মতো, কখনও শত্রুর মতো। কিন্তু নিজের মধ্যে আমি কিছু খুঁজে পাই না। মনে হয় ধ্বংসাবশেষে বৃথা গুণধন খুঁজে লাভ নেই।

আপনি আজকাল অন্ধ ছেড়ে কবিতা ধরেছেন দেখছি। কথায় কথায় উপমা আসছে কেন ?

চয়ন ভীষণ লজ্জা পায়। একটু হেসে বলে, তাই তো ! আজ যেন কেন আমার খুব উপমা চলে আসছে মাথায়।

আপনার ভিতরে যে এত উপমা আছে, তা কি এতদিন জানতেন ?

না। আজ কি সব হচ্ছে।

তেমনি আপনার ভিতরে আরও কি আছে তাও আপনি জানেন না।

ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মতো ? হঠাৎ জেগে উঠব ?

এবার অনিন্দিতা হেসে ফেলল, নাঃ, আপনি সত্যিই এর পর হয়তো কবিতা লিখতে শুরু করবেন।

একটু তটস্থ হয়ে চয়ন বলে, আর হবে না।

অনিন্দিতা স্মিত মুখে বলে, হচ্ছে হোক না। বোল ফুটছে, এ তো ভাল লক্ষণ। এমনিতে তো কথা বলতেই কাঁটা হয়ে থাকেন।

আমি এরকমভাবে কখনওই কথা বলি না। আজ একটু প্রগল্ভতায় পেয়েছে আমাকে।

প্রগল্ভতা ? আপনি কি আজকাল গোপনে ডিকশনারি পড়েন নাকি ?

চয়ন একটু স্তব্ধ হাসল। বলল, না।

রাগ করলেন ?

রাগ করার মতো কিছু তো হয়নি। আমার রাগই নেই।

একটু রাগ থাকা কিন্তু ভাল।

আমার কখনও রাগ হয় না।

শুধু ভয় আর লজ্জা ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

অনিন্দিতা চোখ বড় করে তার দিকে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, আজ একটা সাহসের কাজ করবেন ?

নাটক দেখতে যাওয়া ? না, আজ কিন্তু সত্যিই সময় নেই।

না, নাটক নয়।

আর কী সাহসের কাজ ?

আমাকে আজ থেকে তুমি করে বলবেন !

চয়ন প্রায় আঁতকে উঠে বলে, আপনাকে ?

কেন, আমি তো আর গুরুজন নই। বাধা কিসের ?

তুমি করে ?

হ্যাঁ। আমিও তোমাকে তুমি করে বলতে চাই। বলো চয়ন।

খুব অপ্রস্তুত হল। একটু লালও হয়ে গেল। তারপর বলল, আচ্ছা। চেষ্টা করব।

ওটা আবার কী হল ? এখনই বলতে হবে। চেষ্টা করব বললে ছাড়ছি না। বলো শিগগির!

বলছি। তুমি।

অনিন্দিতা খিলখিল করে হাসল। তার শাখ-সাজা চমৎকার দাঁতের সারি ঝিকিয়ে উঠল রোদে। বলল, বাঃ, এই তো বেশ হয়েছে।

একটা মস্ত পরিশ্রমের কাজ করে যেমন অবসাদের মতো হয়, অনিন্দিতাকে এই তুমি বলার পরিশ্রমে তেমনই অবসাদ বোধ করল চয়ন। মুখে হাসি টেনে বলল, এটা খুব সাহসের কাজ বুঝি ?

তোমার পক্ষে আমাকে তুমি বলতে গিয়ে তোমার মুখ-চোখের যা অবস্থা হল! উঃ কি একটা মানুষ তুমি! মধ্যযুগে বাস করছ এখনও ?

চয়ন ধাতস্থ হতে একটু সময় নিল। তারপর বলল, মেয়েদের সঙ্গে আমার বেশি মেলামেশা হয়নি তো। তাই একটু দূরত্ব ছিল।

তোমার কবে ছুটি বলো তো! রবিবার, না ?

মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে চয়ন বলল, সব রবিবার ছুটি নয়। মানিকতলায় একটি ছাত্র শুধু শনি আর রবিবারই পড়ে।

তোমাকে নিয়ে আর পারি না। রবিবারটা ফাঁকা রাখতে পার না ? তোমার বোধ হয় ছুটি ভাল লাগে না, না ?

চয়ন বলে, এ টিউশনিটা নতুন হল। আগে তো রবিবারটা ছুটিই থাকত।

টিউশনিটা কখন ?

সন্ধ্যাবেলায়।

সকালটা তো ফ্রি ?

হ্যাঁ।

তা হলে সকালে যদি একটা প্রোগ্রাম করি ?

কিসের প্রোগ্রাম ?

দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার ?

দক্ষিণেশ্বর! বলে অকূলপাথরে পড়ে গেল যেন চয়ন। সে কেন দক্ষিণেশ্বর যাবে ? তার তো ইচ্ছে করছে না! কেন অনুরাই তাকে সবসময়ে চালাবে ? কেন সে কঠিনভাবে কাউকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না ?

ও কি, একদম স্পিকটি নট হয়ে গেলে কেন ? মাকে নিয়ে যাচ্ছি সঙ্গে। দক্ষিণেশ্বর তোমার ভাল লাগে না ?

চয়ন মাথা নেড়ে বলে, ভালই। তবে ইচ্ছে করে না।

আচ্ছা, তা হলে থাক। তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি, এটা তোমার পছন্দ হচ্ছে না। যদি অন্য কোনও প্ল্যান করি ?

কি রকম প্ল্যান ?

ধরো, যদি একটা গানের অনুষ্ঠানে যাই ? কিংবা একটা নৃত্যনাট্য ?

চয়ন একটু হেসে বলে, ওসব আমি ভাল বুঝি না।

তবে তোমার কী ইচ্ছে ?

ইচ্ছে ? বলে চয়ন চূপ করে থাকে।

আবার চূপ করে আছ ? এবার কিন্তু চিমাটি দেব।

আমার যে কিছুই ইচ্ছে করে না।

কিছুই না ?

কিছুই না।

ধীরে ধীরে অনিন্দিতা একটু গম্ভীর আর বিষণ্ণ হয়ে গেল। তারপর বলল, তোমাকে এসব বলাই আমার তুল হয়েছে। তুমি আমাকে পাত্তাই দাও না।

না না। বলে চয়ন একটা অস্পষ্ট আপত্তি করল।

অনিন্দিতা বলল, তুমি আমাকে ভয় পাও না তো ? না কি ঘেন্না ?

হতভম্ব চয়ন বলে ওঠে, কী যে বলেন তার ঠিক নেই!

আবার আপনি ?

ও, তুমি! কী সব বলছ ভয়! ঘেন্না! পাগল নাকি ?

তা হলে আড্ডেড করতে চাও কেন ?

চয়ন কিছুতেই বলতে পারবে না একে যে, মানুষ যে তাকে উদ্ভুদ্ধ করতে চায়, তাকে শ্রেয়সা দিতে চায়, তাকে টগবগে করে তুলতে চায়, সেটা চায় তাদের নিজেদের তাগিদেই। তারা তাকে ব্যবহার করে গিনিপিগের মতো। সে যে নিজের মতো করে একটা গুটিপোকাকার খোল বানিয়ে নিয়ে তার মধ্যে বাস করছে সেখানে এসবের কোনও দাম নেই। সে নিজের মতো করে বেঁচে আছে, অন্যের পছন্দমতো সে বাঁচতে যাবে কেন ? তার তো দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার হতে ইচ্ছে করে না। মানুষকে এটা যদি সে বোঝানোর চেষ্টা করে তা হলে মানুষ অবশ্যিচত অপমান বোধ করবে।

চয়ন বলল, আড্ডেড করতে চাই না তো। তবে আমার কোথাও না যেতে যেতে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে, কোথাও যাওয়ার কথা উঠলেই অস্বস্তি হয়।

তুমি কিন্তু সুন্দরবনেও গেছ। এবং একা।

ওঃ, হ্যাঁ।

সেটা কি করে পারলে ?

দায়ে পড়ে।

মোটাই নয়। একা যেতে তোমার অস্বস্তি হয় না, কিন্তু কারও সঙ্গে যেতে হয়। তাই না ? যদি সেই কেউটা হয় অনিন্দিতা।

তুমি রাগ করছ ?

না। তবে আমার একটু অভিমান হয়েছে। যদিও সেটার কোনও দাম নেই তোমার কাছে।

কথাবার্তার হাওয়া কোন দিকে ঘুরছে তা বুঝতে পারছিল না চয়ন। কিন্তু তার বুক একটু কাঁপছিল। অস্বস্তি হচ্ছিল।

সে বলল, আমি শুভিয়ে কথাটাও বলতে পারি না। ঠিক আছে, রবিবার কোথাও একটা যাওয়া যাবে।

অনিন্দিতা মাথা নাড়ল, তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। আমি একটু মজা করছিলাম।

তার মানে ?

মানে হল, তোমাকে আমার মতো কেউ জানেও না, বোঝেও না। তুমি যে একা একা আপনমনে নিজের ছোট গণ্ডির মধ্যে থাকতে ভালবাসো তা আমি বুঝি। দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার কথা বলে তোমাকে একটু চমকে দিলাম। কিছু মনে করো না।

চয়ন একটু হাসল।

কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই শেষ হল না। সকালে, দুপুরে বা বিকেলে অনিন্দিতার সঙ্গে তার রোজই দেখা হয়। কথা হয়। আর এসবের ভিতর দিয়ে অনিন্দিতা তার খুব কাছাকাছি এসে পড়তে থাকে। যেন বন্ধ দরজায় ঘা দিচ্ছে এক আগতুক।

বাস্তবিকই ভয় পেয়ে যেতে থাকে চয়ন।

একদিন টিউশনি সেরে বেশ একটু রাতেই ফিরে সব স্টোভ ধরানোর চেষ্টা করছিল চয়ন। এমন সময় ছাদে উঠে এল তার দাদা অয়ন। দাদার সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাৎ হয়ই না। দেখে একটু অবাক হল সে।

অয়ন বলল, তোর সঙ্গে একটু কথা আছে।

চয়ন সভয়ে দাঁড়িয়ে বলল, বলো।

অয়ন একটু রুদ্ধ গলায় বলল, কী সব কাণ্ড হচ্ছে বল তো! ব্যাপারটা কী তোর ?

চয়ন অবাক হয়ে বলল, কিসের ব্যাপার ?

কী সব শুরু করেছিস ওই মেয়েটার সঙ্গে ?

চয়ন হাঁ করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কোনও কথা খুঁজেই পেল না।

শুনছি নাকি প্রায়ই ছাদে আসে। খুব মাখামাখি তোর সঙ্গে!

চয়ন এত ভয় পেল যে কথা বলতে গিয়ে তার গলা কাঁপতে লাগল। কোনওরকমে বলল, আসে তো, কিন্তু আমি কী করব ?

বাড়িতে একটা নোংরা ব্যাপার হচ্ছে, এটা কি ভাল ? আশপাশের বাড়ি থেকেও শোনা যাচ্ছে তোরা নাকি রীতিমতো মাখামাখি শুরু করেছিস!

চয়ন কাঁপা গলাতেই বলে, না না, সেরকম তো কিছু নয়।

তা হলে কি বানিয়ে বলছি নাকি ? তোর তো এসব দোষ আগে ছিল না। হঠাৎ পাখা গজাল নাকি ?

চয়ন আত্মপক্ষ সমর্থনের মতো উপযুক্ত কথা খুঁজে না পেয়ে বলল, আমাকে কী করতে বলছ ?

সে কথা পরে। আগে জানতে চাই, ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে ?

চয়ন শুধু বোবার মতো মাথা নেড়ে জানাতে চেষ্টা করল যে ব্যাপারটা এগোয়নি।

অয়ন সেটা বিশ্বাস করল না। বলল, ওই ধুমসি মেয়েটাও তো কম নয়। অত্যন্ত ঝগড়াটে টাইপের, বারমুখো। তুই ওর পাল্লায় পড়লি কেন ?

চয়ন তোতলাতে তোতলাতে বলল, আমি তো কিছু করিনি।

ও আসে কেন ? ছাদে কাপড় শুকোতে আসে বা চুল শুকোতে আসে, ঠিক আছে। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে, তোর বউদি পর্যন্ত ছাদে আসতে গিয়ে কতদিন দরজা থেকে ফিরে গেছে! ঝি-মেয়েটা অর্বাধি নাশিশ করে যে তোরা ছাদে থাকলে ওর আসতে নাকি লজ্জা করে।

চয়নের মাথা চক্কর দিচ্ছিল। কিছুক্ষণ হাত মুঠো করে, দাঁতে দাঁত চেপে সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, দাদা, আমার কোনও দোষ নেই। তুমি বিশ্বাস করো।

দোষ নেই! বেশ কথা তো! দোষ নেই মানে ? একটা বয়সের মেয়ের সঙ্গে ফটিনস্টি করছিস আর বলছিস দোষ নেই ? মেয়েটা তোর ঘরেটরে যায় না ?

না তো!

মিথ্যে কথা। শুধু যায় তাই নয়, সেবা-টেবাও করে বলে শুনলাম। এসব নোংরামি তো এখানে চলবে না!

চয়ন বিমূঢ় হয়ে বলল, আমি কি করব ?

বাড়ি ছেড়ে দে। দু' মাস সময় দিচ্ছি, অন্য ঘর দেখে উঠে যা।

উঠে যাব ?

আমরা ওদেরও উঠবার নোটিস দিয়েছি। এসব এ বাড়িতে চলবে না। বুঝেছিস ?

অয়নের দিকে চেয়ে ছিল চয়ন। এই দাদা তাকে চাঙাবাঙা করে মেরেছে, মাকে সুদ্ধু তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে

দিতে চেয়েছে, এবং এ বাড়িতে তাকে আর মাকে একঘরে করে ফেলে রেখেছে। সত্যি কথা, বাড়িটা ওর। কিন্তু মানুষগুলোও কি ওর নয়? মা বা ভাই? একটা বাড়ির অধিকারের জন্য মা বা ভাইকে এতটা অবহেলা অনাদর করা যায়? চয়ন হঠাৎ দানার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বলল, আমাকে বাড়ি ছাড়ার নোটিস দিচ্ছ? হ্যাঁ।

যে কারণে বাড়ি ছাড়তে বলছ সেটা সত্যি কিনা তা যাচাই করে দেখবে না?

যাচাই! যাচাই করার কী আছে? সবাই দেখছে, বলাবলি করছে।

অনিন্দিতাকেও কি কথাটা বলছ?

অয়ন কখনও চয়নকে মুখে মুখে কথা বলতে দেখেনি। আজ বোধ হয় এইসব কথা শুনে অবাক এবং বিরক্ত হল। বলল, সেটা আমার যা ভাল বুঝব করব। অনিন্দিতা পরের মেয়ে, তাকে এসব কথা বলা যায় না।

চয়ন হঠাৎ বলল, আর আমি?

তুই কী?

আমিও তো পরের ছেলে।

পরের ছেলে? তার মানে?

আমি তোমার কে?

তার মানে? এসব কথার অর্থ কী?

আমি কি তোমার ভাই? ভাই বলে মনে করো?

অয়ন এত রোগে গেল যে মুখখানা আচমকা রক্তাভ হয়ে গেল তার। কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। তারপর একেবারেই আচমকা ঠাস করে একটা চড় কবাল চয়নের গালে, অসভ্য! ইতর! জানোয়ার! দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষেছি এতদিন!

এসব কথা অবশ্য চয়নের কানেই গেল না। চড়টা খেয়ে সে নিজের শরীরটা একটা বোঝার মতো নিয়ে পড়ে গেল শানের ওপর। রিমঝিম করছে মাথা। কানে কোনও শব্দ আসছে না।

কিন্তু তবু অজ্ঞান হল না চয়ন। ঝিম ধরে পড়ে রইল।

অয়ন কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ চলে গেল।

সামলে নিয়ে উঠে বসতে অনেকটা সময় লাগল চয়নের। কিছুক্ষণ বোকা-মাথায় সে বসে রইল শানের ওপর। দুটো চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। চড়ের জায়গাটা জ্বালা করছে। ঘাড়টা যেন শক্ত হয়ে উঠছে ক্রমে।

আরও কিছুক্ষণ পর চয়ন উঠল। স্টোভটা নিবিয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

এ বাড়ি ছেড়ে সে কোথায় যাবে? বুকের মধ্যে অচেনা ভয় যেন পাকিয়ে উঠছে তার। অচেনাকে তার বড় ভয়।

চোখের জলে বাগ্লিশ ভিজে গেল তার। অথচ সে কাদছে না তো! কাদছে না। আপনা থেকেই তার চোখ তবে কেনে যাক্ষে কেন? এর কোনও মানেই যে হয় না।

একটু রাতে সে শুনতে পেল, নিচে অয়নের সঙ্গে অনিন্দিতার বাবার একটা কথা কাটাকাটি হচ্ছে যেন! সঙ্গে বউদির গলা। তবে অনিন্দিতা বাড়িতে নেই। তার ইভনিং ডিউটি, চয়ন জানে।

শরীরটা এত দুর্বল লাগল চয়নের যে, সে রাতে কিছু খেল না। দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ল।

অনিন্দিতা এল সকালে। খুব সকালেই।

কী হয়েছে তোমার বলো তো!

চয়ন মাথা নেড়ে বলল, বলার কিছু নেই।

আমি সব শুনেছি।

চয়ন একটা শ্বাস ফেলে বলল, সব ভুলে যাও।

তোমাকে কি অয়নদা মেরেছে?

চয়ন চুপ করে থাকে।

অনিন্দিতা শান্ত গলায় বলে, তোমাকে মারা তো সোজা। মারলেও তুমি কিছু করবে না, সবাই জানে।

ভুলে যাও অনিন্দিতা। আমার কিছু হয়নি।

তোমার হয়নি। আমার হয়েছে।

তোমার কী হয়েছে?

তোমার জন্য দুঃখ হয়েছে। আমার জন্যই তোমাকে এত অপমান সহ্য করতে হল তো!

আমার অভ্যাস আছে।

একটা কথা বলবে? দুর্বলকে সবাই কেন এমন করে মারে, অপমান করে? মানুষ এত নিষ্ঠুর হয় কি করে?

চয়ন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কিছু বলল না।

অনিন্দিতা বলল, পাশ্বে যেও না চয়ন। তুমি তোমার মতোই থেকো। তুমি খুব ভাল। আমি বলছি, তুমি খুব ভাল।

বলতে বলতে অনিন্দিতার ঠোঁট কাঁপল। গলা বুজে এল কান্নায়।

॥ ৭৫ ॥

পনেরো দিন জুরে পড়েছিল বীণা। মনে হচ্ছে জীবন থেকে একটা বিশাল কিছু হারিয়ে যাচ্ছে। চলে যাচ্ছে আয়ু, যৌবন, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে প্রতিভা।

আগাগোড়া কুসুম তার কাছে থেকেছে। মাথা ধোয়ানো, গা স্পঞ্জ করা, রান্না করে খাইয়ে দেওয়া। বেডপ্যানও দিতে চেয়েছিল। বীণা ওটা পারেনি, মরে মরেও উঠে উঠানের ওধারে গেছে।

সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল একজন সঙ্গী। সেই অভাব কুসুম খুব পূরণ করেছে।
জ্বরের শেষ দিকটায় বীণা একদিন সন্ধেবেলা বলল, হ্যাঁ রে কুসুম, আর জন্মে কি তুমি আমার মা ছিলি? মাও তো এত করে না!

কী যে বলো বীণাদি! কী আর করলুম। এটুকু সবাই পারে।

বীণা মাথা নেড়ে বলে, না রে, পারে না। পারলেও করে না। আমি শুধু ভাবি, তোর যদি অসুখ করত আমি কি যেতাম তোর সেবা করতে? নাকি পারতাম এতটা? তুমি বড্ড ভাল। এই যে এত সেবা করলি, আমার টাকা থাকলে তোকে একছড়া হার গড়িয়ে দিতাম।

কুসুম মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসল। বলল, হার দিলে তো শোধবোধ হয়ে যেত। তা হলে আর সেবাটার অন্য কোনও দাম থাকত না।

হ্যাঁ রে, জ্বরের ঘোরে তো মেলা ভুলভাল বকেছি। ফেরাস কিছু বলে ফেলিনি তো!

কুসুম জুঁকচে একটু ভেবে বলে, একটা জিনিস হল, নিমাইদাদাকে খুব গালমন্দ করেছে। প্রায় রোজ। আর একটা যেন ডলার আর পাউন্ড নিয়ে কী একটা কথা।

বীণার মুখ ভকিয়ে গেল, ডলার আর পাউন্ড! সে আবার কী রে?

কুসুম ঠোঁট উল্টে বলে, কী জানি কী! ডলার, পাউন্ড, খুন, পশু! এইসব মাঝে মাঝে বলেছে।

বীণার বুক ধকধক করতে লাগল। চোখ বুজে নিজেকে শক্ত করে সে বলল, কত কী মাথায় আসে, কে জানে বাবা! যখন ভুলভাল বকেছি তখন বাইরের কেউ সামনে ছিল না তো!

না। তোমার লজ্জার কিছু নেই।

জ্বর হলেই আমি ভীষণ ভুলভাল বকি। ছেলেবেলায় আমার তড়কা হত।

কুসুম খুব হাসছিল। বলল, হ্যাঁ গো বীণাদি, নিমাইদাদার ওপর তোমার খুব রাগ, না?

কেন বল তো!

যখন ভুল বকেছো তখন বুঝতে পারতাম তোমার ভিতরটা খুব জ্বলছে।

বীণা একটু চুপ করে থেকে বলল, বাইরে থেকে তো কিছুতেই বুঝবি না, লোকটা আমার সঙ্গে কত প্রবঞ্চনা করছে!

কিন্তু নিমাইদাদাকে তুমি এখনও মন থেকে মুছে ফেলতে পারোনি।

মুছে ফেলবে কি করে? দাগা দিলে কি ভোলা যায়?

ভুলতে কি চাও?

খুব চাই।

কুসুম কি একটা কাজে উঠে গেল। ঘন্টাখানেক বাদে যখন এল তখন বীণা বিছানায় বসে আছে।

বীণা বলল, দেখ কুসুম, জ্বরের মধ্যে আমি একটা অলক্ষ্যে স্বপ্ন দেখছি। একবার নয়, কয়েকবার। স্বপ্ন কি সত্যি হয়?

হতে পারে। অনেক সময়ে হয় বলেও তো শুনি। কী দেখেছো?

সে খুব খারাপ স্বপ্ন।

খারাপ স্বপ্ন বলে দিতে হয়। তা হলে আর ফলে না।

সত্যি?

সত্যি কি না কে জানে বাবা! মা খুড়িমার কাছে শুনেছি।

তা হলে তোকে বলে দিই। আমি দেখছি, ও আবার বিয়ে করেছে। বউটা দেখতে বেশ সুন্দর।

কুসুম একটুও হাসল না। বলল, যাঃ, নিমাইদা সেরকম লোক নয়।

বীণা গম্ভীর হয়ে বলল, পুরুষমানুষকে তুমি বিশ্বাস করতে পারিস, আমি একটুও করি না। ওরা সব পারে।

সব পুরুষ কি খারাপ হয় বীণাদি? নিমাইদাদা তো কখনোই খারাপ লোক নয়। ওর ওপর তোমার রাগ বলে বলছে।

বীণা কাহিল লগায় বলে, একটা কাজ করবি কুসুম? কাউকে কাঁচড়াপাড়ায় পাঠিয়ে একটু খবরটা নিবি?

এবার কুসুম হেসে ফেলল। বলল, পারোও তুমি বটে। কাঁচড়াপাড়া তো আর বিলেত-বিদেশ নয়, হরবন্ড লোক যাচ্ছে আসছে। বোজ নিলেই হবে। আমার দিদির স্বস্তরবাড়ি তো কাঁচড়াপাড়ায়। আমারই যাওয়ার কথা ছিল। তোমার অসুখের জন্য আটকে পড়লাম।

খবরটা আমাকে তাড়াতাড়ি আনিতে দিতে পারবি?

কবে চাই?

আজ পারলে আজই।

কুসুম হেসে ফেলে বলে, আজ যে রাত হয়ে গেছে সে বেয়াল আছে?

তা হলে কালই। পারবি না? আমার মনটা বড় অস্থির।

কুসুম বলে, নিমাইদাদাকে নিয়ে অত ভাবছো কেন? সে তোমাকে বড্ড ভালবাসত। ছুট করে কিছুতেই বিয়ে করবে না। সে তেমন লোক নয়।

নিমাই একটা ছেড়ে দশটা বিয়ে করলেও আমার কিছু যায় আসে না। আমি শুধু ভাবি, আমার মতো আর কোনও মেয়ের যেন সর্বনাশ না হয়।

কুসুম তার মাথায় হাত রেখে বলে, এখন শুয়ে একটু চোখ বুজে থাকো। জানো তো, অসুখের মধ্যে মনের উত্তেজনা ভাল নয়, বেশি ভালবেসে অসুখ বেড়ে যায়।

আচ্ছা।

কিন্তু বিশ্রাম হল না বীণার। মনের মধ্যে জ্বালা আর জ্বালা। বারবার একই স্বপ্ন দেখছে কেন সে, যদি স্বপ্নের মধ্যে কোনও মানেই না থাকে ?

আরও তিন-চারদিন বীণা বিছানায় পড়ে রইল। তার মধ্যে কোনও খবর আনিয়ে দিতে পারল না কুসুম। যোলো দিনের দিন সকালবেলা জ্বর ছেড়ে গা ঠাণ্ডা হল। শরীর তখন চুপসে গেছে। উঠে বসবার ক্ষমতা নেই। ভীষণ দুর্বল।

আরও দু'দিন পর কুসুম বলল, একটা খবর আছে বীণাদি।

কি খবর ?

নিমাইদাদা বিয়ে করেনি।

বীণা কুসুমের দিকে একটু চেয়ে থেকে বলে, ঠিক খবর তো!

খুব ঠিক খবর। তবে খুব রমরম করে ব্যবসা করছে।

বীণা চুপ করে রইল। লোকটা ছোট্ট একখানা দোকান করতে চেয়েছিল। হয়-হচ্ছে করে হল না। কেন হল না ? তখন ষড় বীণার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হত লোকটাকে। বীণার অন্য দিকে তাকানোর সময় ছিল না। লোকটা যে ভিতরে ভিতরে বড় হতাশ হচ্ছে, মনমরা হয়ে যাচ্ছে, এটা দেখেও দেখেনি বীণা। শেষ অবধি ভেবেছিল ডলার আর পাউন্ড বেচে একখানা দোকান করে দেবে। তাও হল না। সব ফাঁস হয়ে গেল। ধর্মপুত্রের নিমাই তো ও পাপের টাকা ছোঁবেও না। আজ য় লোকটা বীণার সাহায্য ছাড়াই দাঁড়িয়ে গেল সেটাও বীণার ঠিক সহ্য হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না, তা বুঝতে পারছে না বীণা। তার ইচ্ছে করে একদিন গিয়ে দোকানটা ভাঙচুর করে দিয়ে আসে।

হ্যাঁ রে কুসুম, আমি খুব স্বার্থপর ?

ওকথা কেন বলো বীণাদি ?

তোর নিমাইদাদার জন্য কি আমার কিছু করা উচিত ছিল ?

ও বাবা, ওসব আমি জানি না। তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার।

ওভাবে পাশ কাটাঁস কেন ? তোর কাছে ভাল ভেবেই জানতে চাইছি। মানুষ তো সব সময়ে নিজেকে বুঝতে পারে না!

আমিও বুঝি না গো বীণাদি। শুধু এইটুকু বলতে পারি, নিমাইদাদা লোক খারাপ ছিল না।

সবাই তাই বলে।

বীণা চুপ করে ভাবতে লাগল। তার ভাবনা-চিন্তাগুলো কিছু নিমাইয়ের পক্ষে গেল, কিছু বিপক্ষে গেল। তারপর কাটাকুটি হয়ে গেল। শুধু রইল বীণার বুকের জ্বালাটা।

আরও দু'দিন পর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল বীণা। সোজা হাজির হল রিহাসাল।

কাকা অবাক হয়ে বলে, টাইফয়েড খারাপ রোগ বীণা। অনেক সময়ে রিলাপ্স করে। তুমি এখনও কমজোরি। আরও সাত দিন বিশ্রাম নাও। তারপর রিহাসাল।

ও বাবা, তা হলে আমি মরেই যাবো! রিহাসাল ছাড়া আর আমার বাঁচা অসম্ভব। দম আটকে আসছে।

কাজটা ভাল করছো না বীণা।

খুব ভাল করছি। পার্ট করতে করতে যদি মরেও যাই তাতেও সুখ আছে।

তা হলে করো! অনেক সময়ে মানুষ যা ভালবাসে তা করতে করতে চাপ্তা হয়ে ওঠে।

শরীর দুর্বল, মাথা ঝিম ঝিম, তা সত্ত্বেও বীণা কাজে নেমে গেল। প্রাণ ঢেলে অভিনয় করতে লাগল।

রিহাসাল করতে রাত হয়ে গেলে দলের কেউ বীণাকে এগিয়ে দিয়ে আসে। অনেক সময়ে রিকশাতেও ফেরে। আজ কাকা তার সঙ্গে সজলকে দিল। সজল নতুন এসেছে। ছিপছিপে, লম্বা, শ্যামলা চেহারা। মুখচোখ খুব সুন্দর। দারুণ গাইতেও পারে।

সজল পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল, তুমি এত ভাল পার্ট করো কি করে বলো তো বীণা! তোমার কাছে অনেক কিছু শেখার আছে।

বীণা মৃদু একটু হাসল। কিছু বলল না।

এ দলে থেকে তোমার কী হবে ? সিনেমায় নামার চেষ্টা করো না কেন ?

কে চাপ দেবে ? সিনেমাওলারা কি গুণের দাম দেয় ? কাকা আমার জন্য অনেক করেছে। এখানেই ভাল আছি।

ওটা কোনও কথা হল না বীণা। পৃথিবীটা যে কত বড় তা এই বনগাঁয়ে পড়ে থেকে কোনও দিন বুঝতে পারবে না। তোমার অনেক ক্ষমতা, তা কি টের পাও ?

আগে স্তোকবাক্য শুনলে, প্রশস্তি শুনলে বীণা যত খুশি হত, আজকাল আর তা হয় না। কিন্তু খুশি না হলেও, একটু যেন ভাল লাগে ভিতরটা।

সজল বলল, তোমার হাজব্যান্ডের সঙ্গে কি ডিভোর্স হয়ে গেছে ?

বীণা গম্ভীর হয়ে বলল, না তো!

হবে নাকি ?

না, ডিভোর্স হওয়ার মতো অবস্থা এখনও হয়নি। কেন বলো তো!

এমনিই। তোমার জীবনে একটা দুঃখ আছে বলেই বোধ হয় এত ভাল অভিনয় করতে পারো! নইলে এই নাটকটা তো পুরো ঝুল। এ নাটক যদি দাঁড়ায় তবে তোমার জোরেই দাঁড়াবে।

অত প্রশংসা করতে হবে না। যদি আমি অত গুণের মেয়েই হতাম, তা হলে এত দিনে বড় জায়গায় চাপ পেতাম। কলকাতার যাত্রাপাড়ায় ঘুরে এসেছি, কেউ পাত্তা দেয়নি।

আমি বলি কি, তোমার সিনেমায় একটু চেষ্টা করা উচিত। কখনও চেষ্টা করেছো ?

না। সিনেমায় কে চাপ দেবে? আমার চেহারা মোটেই সিনেমায় নামার মতো নয়।
সজল অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে বলে, সে কি? তুমি তো রীতিমতো সুন্দরী। খুব ফটোজেনিক ফেস! কে বলল সিনেমার মতো নও?

আমি জানি।

ভুল জানো। সিনেমায় নামার খুব শখ ছিল আমারও। কিন্তু হল না।

ও মা! তোমার হল না কেন? বেশ তো চেহারাটি।

হল না কারণ, সিনেমার লাইনে ছেলেদের ভিড় বেশি, তাই চাহিদা কম। একজন ডিরেক্টর আমাকে বলেছিল, ভাই, তোমাকে চাপ দিতে পারব না, কিন্তু বোন-টোন যদি থাকে, নিয়ে এসো, তাকে চাপ দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি।

বীণা হেসে ফেলল। তারপর বলল, মেয়েরাই বা কম যাচ্ছে নাকি? সিনেমায় চাপ পেতে কত মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে স্টুডিওপাড়ায়।

সেসব হেঁজিপেঁজি। তোমার মতো গুণী মেয়ে ক'জন বলো?

বীণা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, কি জানো, আমাদের এত পেটের টান যে, কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছু থাকে না। এই আমার কথাই ধরো। যদি অভাব না থাকত তা হলে যাত্রাদলে আসার কথা কি ভাবতে পারতাম? আমাদের বংশে কখনও কেউ এসব করেনি।

ওটা আবার কুসংস্কার। অভিনয় একটা বড় ব্যাপার।

তা জানি। কিন্তু অধিকাংশই তো আসে পেটের টানে। শিল্প-টিশ্চন নয়। খানিকটা টাকা, খানিকটা হাততালি আর খ্যাতি, খানিকটা গ্ল্যামার। একটা গুজব আছে, সিনেমালাইনে অনেক পরস। কিন্তু পরসার যে গুণোগার দিতে হয় তা বুঝছে ক'জন?

আহা, তুমি তো আর অত বোকা নও।

আমিও আমার মতো করে বোকাই।

সত্যি করে বলো তো, তুমি কি অভিনয় করে নাম কিনতে চাও না?

বীণাপাণি মুদু হেসে বলল, তাও চাই। কিন্তু তার চেয়েও বেশি চাই, প্রাণভরে অভিনয় করতে।

বীণাকে বাড়ি অবধি পৌছে দিয়ে এক কাপ চা খেয়ে চলে গেল সজল। কিন্তু দু'দিন পর আবার বীণাপাণিকে এগিয়ে দিতে এল।

বীণা, তোমার একা লাগে না?

লাগে। মাঝে মাঝে লাগে। তবে স্বামীর জন্য নয়। এমনি।

আমি তোমার কথা খুব ভাবি, জানো?

কেন ভাবো?

তা কি করে বলবো? তোমার অভিনয়, হাটা-চলা, ফিগার, গলার স্বর, গান সব কিছুই এত ইমপ্রেসিভ।

বানিয়ে বানিয়ে আর মিথ্যে কথাগুলো বোলো না তো!

মিথ্যে? তাও কি হয়?

মিথ্যেই তো।

সজল খুব চিন্তান্তিত হয়ে বলে, আমার মনে হওয়াটা ভুল হতে পারে, হয়তো আমি তোমাকে যতটা মনে করছি, তুমি ততটা নও। কিন্তু তা বলে আমাকে মিথ্যাবাদী ভেবে না।

দু'দিন পর আবার দু'জনে একা হল। নির্জনতা ছিল, পথ অন্ধকার ছিল, সজল তার একখানা হাত ধরে বলল, বীণা, আমার মাথায় একটা পাগলামি এসেছে। প্রশ্নই দেবে?

নাটক করছে?

আমি একদম বাজে অ্যাকটর। অভিনয় জানিই না।

হয়তো, স্টেজের অভিনয় জানো না। অনেকে স্টেজে পারে না, কিন্তু জীবনে পারে, বাস্তবে পারে।

সজল হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলে, তা হলে থাক।

বীণা একটু মুচকি হাসল। কতদিনের জন্য থাকল, তা কে জানে? সজল যে সহজে হাল ছাড়বে এমনটা তার মনে হল না। অশুশিও হল না সে। পুরুষহীন জীবন একটু আলুনি তো বটেই। এ পর্যন্ত বীণা নিজেকে অনেক আটবান্ধ দিয়ে ধরে রেখেছে। কিন্তু এই যৌবন জলতরঙ্গ রুধিবে কে? টাইফয়েডের পর তার শরীর সেরেছে। একটু কি মোটাও হয়েছে সে? পুরনো অম্বলের অসুখটা আর নেই। এখন তার খুব খিদে পায়। ভাল ঘুম হয়। শরীর এখন অনেক কিছু চায়। মনটা বড় দোল খায় দিনরাত।

কাঁচড়াপাড়াই নিমাইয়ের দম ফেলার ফুরসত নেই। তার দোকান বড় খন্দেরদের জন্য নয়। ব্যাপারী, মুটে-মজুর, ঠিকাদারদের লোক, ট্রাকওয়ালার এদেরই ভিড় বেশি। দামে সস্তা, খেতে ভাল এমন খাবারের দোকান হলে ভিড় হবেই।

দুপুরবেলাটায় দুটো-আড়াইটের পর একটু ফাঁকা যায়। সে সময়টায় নিমাই একটু খেয়ে জিরিয়ে নেয়। রাতের চৌকিদারি এখনও ছাড়েনি বলে দুপুরের তন্দ্রাতৃক দরকার।

সেই তন্দ্রার মধ্যেই দোকানের ছোকরা এসে ডাকল, একজন আপনাকে খুঁজছেন।

নিমাই বলে, কী চায়?

বনগী থেকে এসেছেন।

বনগাঁ! নিমাই একটু চনমনে হল। উঠে বলল, যা, যাচ্ছি।
 চোখে জল-টল দিয়ে এসে যাকে দেখল, তাকে সে চেনে না। ছেলেটা বসে বসে মাংস পরোটা খাচ্ছে।
 কিছু বলবেন আমাকে?
 ছেলেটা তার দিকে চেয়ে হাসল। বলল, আপনার দোকানের খুব নাম শুনেছি। বেশ রান্না তো এখানে!
 ভগবানের দয়া। আপনি কি বনগাঁর লোক?
 আজ্ঞে হ্যাঁ। একটু কথা ছিল।
 নিমাই উল্টোদিকের চেয়ারে বসে বলল, খবর আছে কিছু?
 আছে। আমি কাকার দলে অ্যাকটিং করি।
 কাকার দল শুনে বুকেটা একটু চলকে গেল নিমাইয়ের। তার মানে বীণাকেও চেনে। ছেলেটার চেহারা ভাল। শক্তসমর্থ
 আছে। মুখখানাও বেশ।
 নিমাই বলল, ও।
 সজল হাত-মুখ ধুয়ে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে এসে ফের চেয়ারে বসল।
 একটা কথা বলবেন?
 বলুন না!
 বীণার সঙ্গে কি আপনার আবার মিল হতে পারে?
 এ কথার কি জবাব হয়? নিমাই তো হাত গুনতে জানে না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বীণা চাইলে হয়তো
 হয়। কিন্তু, বীণা আর চাইবে না।
 কেন, বলুন তো।
 সে অনেক কথা। সব বলা যাবে না।
 বীণা না চাইলে হয় না?
 না।
 আপনি কি চান?
 নিমাই মাথা নেড়ে দুঃখিতভাবে বলল, আমার চাওয়ায় কি এসে যায় বলুন! আমি তার চোখে পোকামাকড় বই তো
 নয়!
 ছেলেটা কিছুক্ষণ বাইরের দিকে আনমনে চেয়ে থাকে। তারপর বলে, ডিভোর্সের কথা ভাবছেন কি?
 ডিভোর্স! না, সেসব ভাবব কেন? আমাদের মধ্যে একটা গুণগোল আছে ঠিকই, কিন্তু ডিভোর্সের মতো নয়।
 এভাবে আলাদা আলাদাই থাকবেন দু'জনে?
 উপায় কি?
 উপায়! উপায় নিশ্চয়ই আছে। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে বাস না করলে বিয়ে জিনিসটাই তো মিথো হয়ে যায়!
 নিমাই হাসল, স্বামী মরে গেলে স্ত্রী বিধবা হয়। বিয়ে মিথো হবে কেন?
 আপনি শাস্ত্রের কথা বলছেন, আমি আইনের কথা বলছি।
 আইন! আমি তো আইন-টাইন জানি না। শাস্ত্রও জানি না। শুনে যা বুঝছি। ভুলও বুঝে থাকতে পারি। আপনার
 নামটা কী আজ্ঞে?
 সজল রায়। আমি নতুন এসেছি।
 হ্যাঁ। পুরনোদের আমি চিনি।
 ছেলেটা মাথা নিচু করে কি যেন ভাবল।
 আপনি কিছু একটা বলতে এসেছেন। সেইটে বলুন।
 সজল মুখ তুলে একটু হাসল। বলল, কি ভাবে বলব, তা ভেবে পাচ্ছি না।
 সোজা বলে ফেলুন।
 ছেলেটা মাথা নেড়ে বলে, আপনি রাগ করবেন।
 নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, রাগ করব কেন? আমার তার ওপর কোনও রাগ নেই। সে যা ভাল বোঝে
 করতে পারে, আমার কিছু আপত্তির কারণ দেখি না।
 ছেলেটা ফের অধোবদন হল। মুখ না তুলেই বলল, বীণারও কিছু সংস্কার আছে।
 নিমাইয়ের বুকে কোনও তোলপাড় হল না। ছেলেটা কী বলতে চাইছে তা সে স্পষ্টই বুঝতে পারছে। তবু বুকে ঝড়
 উঠছে না তার। শুধু যেন তার মনের মধ্যে সব আলো নিবে গেল হঠাৎ সামান্য ধরাগলায় নিমাই বলল, ডিভোর্স চায়
 পাবে। কোনও বাধা নেই। তাকে বলবেন।
 আপনি কী দাবি ছেড়ে দিচ্ছেন তা হলে?
 নিমাই হাসল, দাবির কী আছে? দাবি-দাওয়া অনেক বড় ব্যাপার। আমি তার উপযুক্ত ছিলাম না কখনও। তাকে
 বলবেন আমার দিক থেকে বাধা হবে না।
 ছেলেটা মাথা নিচু করেই বসে রইল।
 নিমাই বলল, খাবারের দামটা দিতে হবে না। আপনি বীণার লোক, কুটুমই একরকম। দামটা দেবেন না।
 ছেলেটা উঠে দাঁড়াল। খুব মৃদুস্বরে বলল, তা হলে আসি।

পার্কের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে ছিল লোকটা। পার্কের গায়েই বাস স্টপ। বেলা নটায় যখন আপা এসে বাস স্টপে দাঁড়াল তখন লোকটা তাকে ডাকল।

আপা, শোনো। জরুরি কথা আছে।

লোকটা মধ্যপ্রদেশের। নাম যশবীর সিং। ট্রান্সপোর্টের বিশাল চেন আছে। প্রচুর পয়সা। বিদেশি পারফিউম মাখে, দারুণ পোশাক পরে। মুখখানা একটু কর্কশ ধরনের হলেও ফর্সা, সুন্দর, লম্বা চেহারা। সন্দের দিকে একটু মদ খায় রোজ। ওর বউ বিমলার সঙ্গে খুব ভাল ছিল আপার। সেই ভাবসাব যশবীর ইদানীং পছন্দ করছে না। বিমলা মেলামেশা কমিয়ে দিয়েছে।

আপা ঘড়ি দেখল। হাতে বিশেষ সময় নেই। স্কুল শুরু হবে সাড়ে নটায়। তবু সব মানুষের প্রতি সদ্যবহারের যে নীতি সে অনুসরণ করে সেটাকে ডাঙল না। পার্কের ভাঙ্গা গেট দিয়ে ঢুকে সামনে দাঁড়িয়ে বাংলায় বলল, বলুন।

যশবীর ভালই বাংলা বলে। আপা যশবীরের মুখ দেখে বুঝতে পারল, লোকটা স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। পরনে চমৎকার পোশাক, গা থেকে সুগন্ধ আসছে, দাড়ি পরিপাটি কামানো, গৌফে কেয়ারি, সবই ঠিক আছে। তবু লোকটার চোখে একটা বিজ্ঞানি আছে। যশবীরের মুখে একটু হাসিও আছে, আপার সেটোও পছন্দ হল না। তাদের পাশের বাড়িতেই যশবীর থাকে, অনেক দিনের চেনা। আবার তেমন চেনাই বা বলা যায় কি করে? লোকটা উদয়াস্ত খাটে, সারা ভারতবর্ষে দৌড়ে বেড়ায় আর দু'হাতে টাকা রোজগার করে। টাকাই ওর নেশা। এ ধরনের রোবটকে চেনা মুশকিল হয় আপার পক্ষে। মনুষ্যত্বের শতকরা ভাগ কার মধ্যে কতটা আপা সেটা সবসময়েই নিজের মেধা ও বোধ দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করে। সেই হিসেবে এই লোকটাকে তার বোঝবার কথা নয়।

যশবীর প্রথমেই একটা অদ্ভুত কথা বলল, তুমি বাংলা বোলো কেন? বাংলা কি তোমার মাদার ল্যাংগুয়েজ?

একটু অবাক হয়ে আপা বলল, ভারতবর্ষের যে কোনও ভাষাই আমার মাদার ল্যাংগুয়েজ, যদিও আমি সব ভাষা জানি না।

বাট ইউ সাউথ ইন্ডিয়ানস্ আর অ্যান্টি-হিন্দি।

আপা বুঝল না লোকটা তার সঙ্গে খামোখা ঝগড়া করতে চাইছে কি না। সে ঘড়িটা দেখে নিয়ে বলল, আমার তো বেশ সময় নেই হাতে। কিছু বলবেন?

ইউ ক্যান স্পিক ইংলিশ।

আপা মাথা নেড়ে বলে, ইংরেজদের সঙ্গে ছাড়া আমি ইংরিজি বলতে ভালবাসি না।

হোয়াই নট হিন্দি?

আমি হিন্দি জানি না।

ইউ হেট হিন্দি।

না। কিন্তু আপনি কী বলতে চাইছেন?

রিগার্ডিং মাই ফ্যামিলি লাইফ।

ওঃ। কিন্তু এখন তো আমার সময় নেই।

শ্বেয়ার মি ফাইভ মিনিটস্। কথ্যটা জরুরি।

বলুন না!

বিমলা ইজ ট্রায়িং টু ডেজার্ট মি।

আপা অবাক হয়ে বলে, তাই নাকি?

বাট আই ওন্ট অ্যালাউ হার।

ওঃ। তা আমি কী করব?

যশবীরের ফর্সা মুখ আচমকা একটু লাল হল। সে একটু গরম গলায় বলে, আপা, ইউ আর বিহাইন্ড অল দিস।

আমি! আমি তো কিছু জানি না।

শী ওয়াজ এ ডেরি ওবিডিয়েন্ট অ্যান্ড সার্ভিৎ ওয়াইফ। তোমার সঙ্গে মিস্ত্র করার পর শী হাজ বিকাম ডিফারেন্ট। ও গড়িয়াহাটে একটা লেভিজ স্ট্রপের মেসার হয়েছিল। তুমি ওকে নিয়ে গিয়েছিলে। শী হাজ কনফেসড।

গলাটা বেশ চড়ে যাচ্ছিল যশবীরের।

আপা ঠাণ্ডা গলাতেই বলল, বিমলা ভাল মেয়ে। একটু একা। আপনি ওকে বুঝবার চেষ্টা করেন না কেন? ওকে আর একটু সঙ্গ দিন।

আই অ্যাম নট গোয়িং টু টেক অ্যাডভাইস ফ্রম ইউ।

আপা ফের বিনীতভাবেই বলল, আপনি বিমলার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন। ওকে মারেন, পা টেপান, রাগ হলে জিনিসপত্র ভাঙেন। বিমলা আপনাকে ভয় পায়।

বিমলা আর আমার ব্যাপারটা আমাদের পারসোনাল। তুমি কেন এর মধ্যে আসছ? তুমি কে?

বিমলা আমার বন্ধু।

শী ইজ ওন্ডার দ্যান ইউ। তুমি ওকে উইমেস লিভ শেখাচ্ছে? জানো তার কনসিকোয়েন্স কী হতে পারে? আই শ্যাল কিক হার আউট অব দি হাউস। তারপর কি তুমি ওকে খাওয়াবে?

আপনি চিৎকার করছেন কেন? ভিডু জমাতে চান?

ভিডু না হলেও চোচামেচি শুনে রাস্তা থেকে কয়েকজন উকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছে।

কিন্তু যশবীর ক্রমশ রেগে যাচ্ছে। গলা আরও এক পর্দা ওপরে তুলে বলে, আলবাৎ চোঁচাবো। বিমলা ওয়াজ এ ওড গার্ল। তুমি ওকে স্পয়েল করছ। ইন ফ্যাক্ট, শী হ্যাড এ কোয়ারল উইথ মি দিস মর্নিং। বিমলার কখনও আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার সাহস ছিল না। ওকে কে সাহস দিচ্ছে? হু? ইউ আর দি কালপ্রিট!

লোকটার রাগ দেখে আপনার মায়া হল। এই সেই আবহমানকালের পুরুষ যে স্ত্রীর কাছে কেবলই আশা করে বশ্যতা, মুগ্ধতা, নতশির দাসত্ব, প্রত্যুত্তরহীন অপমানের পাত্রী। এই সেই পুরুষ যারা গুহামানবের উত্তরাধিকার এখনও রক্তে বহন করে। যারা শয্যাসঙ্গিনী ছাড়া স্ত্রীকে আর কিছুই ভাবতে পারে না। এদের চাই একটি সুন্দরী জ্যান্ত রক্তমাংসের পুতুল।

আপা বলল, এসব কথা রাস্তায় না বললেই আপনার চলত না? আপনি তো আমাকে আমাদের বাড়িতে গিয়েই বলতে পারতেন বা আমিও যেতে পারতাম আপনারদের বাড়িতে।

নেভার! তুমি কখনও আমার বাড়িতে আসবে না। আই শ্যাল কিক ইউ আউট।

আপার হঠাৎ কেমন খটকা লাগল। লোকটা স্বাভাবিক নেই। লোকটা পাগলের মতো ব্যবহার করছে। এরকম করছে কেন?

আপা শান্ত গলায় বলল, আপনার কী হয়েছে বলুন তো? আপনি তো পাগল হয়ে গেছেন দেখছি!

এ কথায় যশবীর লাফিয়ে উঠে গলার শিরা ফুলিয়ে চোঁচিয়ে উঠল, পাগল হয়ে গেছি! তুমি জানো বিমলাকে আমি কত ভালবাসতাম! অ্যান্ড আই হ্যাড লস্ট হার ফর এভার! ফর এভার!

ফর এভার শুনে আপনার মাথা একটা চক্কর দিল। যশবীর কি বিমলাকে খুন-টুন কিছু করে এসেছে? তারপর প্রলাপ বকছে?

যশবীর চোঁচাচ্ছিল, ইফ শী কমিটস সুইসাইড ইউ উইল বি রেসপনসিবল। ইফ শী ডাইজ ইউ উইল বি দি কজ।

আপা হঠাৎ 'হায় ভগবান' বলে ঘুরে ছুট দিল। রাস্তাটা হরিণের মতো চকিতে পেরিয়ে সে গিয়ে ঢুকল পাশের বাড়িতে। ডোরবেল বাজাতে বাজাতে ডাকতে লাগল, বিমলা! বিমলা!

বিমলা জবাব দিল না। দরজাও খুলল না।

আপা জানালার কাছে গিয়ে দেখল, কাচের শার্শি বন্ধ, পর্দা টানা।

হঠাৎ যশবীর হাঁফাতে হাঁফাতে এসে কর্কশ হাতে একটা ধাক্কা দিল আপাকে, হোয়াট ডু ইয়া ওয়ান্ট? হোয়াট ডু ইয়া ওয়ান্ট? গেট আউট ফ্রম হিয়ার।

ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়েছিল আপা। রোগা কনুইটা ঠাকস করে ঠুকে গিয়েছিল শানে। পড়ে-থাকা অবস্থাতেই বলল, আপনি বিমলাকে কী করেছেন? ও দরজা খুলছে না কেন?

শী হ্যাড লেফট। নাউ ইউ গেট আউট।

আপা উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি না। বিমলা ঘরে আছে।

যশবীর ধমকে ওঠে, ইউ বিচ! ইউ রেচড গার্ল! গেট আউট! গেট আউট!

আপার চোখে জল আসছিল। বিমলা একটা ভারি সরল সোজা নরম প্রকৃতির মেয়ে। একটু অন্যমনস্ক ধরনের। কিন্তু হাসিখুশি, প্রাণময়। প্রায়ই আসত তাদের বাড়িতে। আপাও যেত। বিমলার সারা দিন সময় কাটে না। স্বামী বাড়ি না থাকলে সে শুধু ঘর গোছায়, টিভি দেখে আর টুকটাক মার্কেটিং করে। যশবীরের মা-বাবা থাকে ইউ পি-তে। মাঝে মাঝে তারা এসে থেকে যায় কয়েক মাস। তখন বিমলার খুব কাজ বেড়ে যায়। অবশ্য বিমলাদের কাজের লোক আছে। একজন রান্না করে, একজন টিকে মি অন্য কাজ করে দিয়ে যায়। সুখী পরিবার বলেই মনে হয় বাইরে থেকে। কিন্তু বহুরথানেক আগে বিমলা এসে একদিন অনেক কথা বলল আপাকে। নিঃসঙ্গতার কথা, স্বামীর অন্যান্য মেয়ে-বন্ধুর কথা, একঘেয়ে জীবনের কথা, স্বপ্নের-শাওড়ির সঙ্গে অবনিবনার কথা। সব মেয়েদেরই অভিযোগে মুটোমুটি একইরকম। বিমলারও আলাদা কিছু নয়। কথা হল, বিয়েতে বিমলার বাবাকে দু'লক্ষ টাকা নগদ বরপণ দিতে হয়েছিল।

ভালবাসা কি কেনা যায় আপা? যদি যায় তাহলে আমি দু'লাখ টাকার ভালবাসা কিনেছি।

খুব অবাক হওয়ার কিছু নেই। আপা জানে কোনও কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে এর চেয়েও অনেক বেশি পণ নেওয়া হয়। কিন্তু ছেলেমানুষ বিমলা স্বামীর কাছ থেকে একটু ভালবাসা চাইত। যশবীর অবশ্য কৃপণ নয়। বউকে বিস্তর প্রেজেন্টেশন দিয়েছে। ভালবাসা দিয়েছে কি না কে জানে!

বিমলাকে একটু চার-চৌখোস বানানোর জন্যই আপা তাকে মাঝে-মধ্যে একটু মেয়েদের অধিকার, তাদের সত্তা, তাদের ভবিষ্যতের কথা শোনাতে। বিমলা বলত, তুমি ঠিক বাঙালি মেয়েদের মতো কথা বলো! বাঙালী মেয়েরা কত ভাল আছে দেখ। আমাদের মতো মাথা নিচু করে থাকতে হয় না। অনেক স্বাধীন।

আপা বলেছে, তুমি তাহলে বাঙালিদের সঙ্গে আরও একটু মেশো। ভাল হবে।

লেডিজ ফ্রণ্টায় আপাই নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দেয় বিমলাকে। তারপর কি বিমলার খুব কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল? যতদূর আপা জানে, না। তেমন কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। রক্তের গভীর সংস্কার আর অভ্যাস কি সহজে পাশ্টায়?

আপা যশবীরের দিকে চেয়ে বলল, আপনি খুব বীরপুরুষ, না? আমি পুলিশের কাছে যাচ্ছি।

গো টু হেল।

আপা শেষ অবধি পুলিশের কাছে যায়নি। কারণ, বিমলাকে খুন করা হয়েছে এমন কোনও কথা হট করে পুলিশকে গিয়ে বলাটা ঠিক হবে না। হয়তো বিমলাকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে। কে জানে? সে স্কুলে দেরিতে পৌঁছলো, টিচারের বকুনি খেল এবং তারপর টিফিনের সময় বন্ধুদের জড়ো করে ঘটনাটা সবিস্তারে শোনাল।

পারগত বলল, হোয়াইল দেয়ার ইজ আপা, দেয়ার অলওয়েজ ইজ ট্রাবল। আপা অ্যাক্টুয়ালি ট্রাবল।

বুরকা একটু গরম হয়ে বলল, উই হ্যাড টু স্পাই অন দি ম্যান। আপা, তুমি ওর ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবি জোগাড় করতে পারবে?

পারব।

পরমা বলে উঠল, আরে লক তো পিক করাই যায়। আমরা সবাই মিলে আজ সন্কেবেলাতেই যাই চলো। লোকটাকে চেপে ধরি।

আপা মাথা নেড়ে বলে, না, সেটা বুদ্ধির কাজ হবে না। আমি আজ নজর রাখব। যশবীরের বাড়িতে টেলিফোন আছে। টেলিফোনেও খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করব। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে লোকটা পালিয়ে যাবে। মাথার ঠিক নেই এখন।

রাজেশ বলে, খুন করলেও বডি যে ঘরে আছে তার তো মানে নেই। যদি গাড়ি থাকে তো বডি নিয়ে গিয়ে ধাপা বা গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসতে পারে।

আপা বলল, ওদের গাড়ি আছে। কন্টেস।

রাজেশ বলে, তাহলে? উই হ্যাভ টু অ্যালার্ট দি অথরিটি।

বুবকা একটু হেসে বলল, পুলিশের দরকার কী? আপনার তো গুণ্ডার দল আছে। বলো আপা, এসব ঝামেলা মেটানোর জন্যই না তুমি গুণ্ডার দল খুলতে চেয়েছিলে?

আপা মৃদু হেসে বলল, তাহলে তুমিও তো মানো যে কেন একটা গুণ্ডার দল খোলা দরকার?

কিন্তু তোমার গুণ্ডারা তো অহিংসা গুণ্ডা। অহিংসা দিয়ে কি যশবীরের মতো লোককে টিট করা যাবে?

অঞ্জলি এতক্ষণ কথা বলেনি। এবার বেজার মুখে বলল, আপাটার সব কিছুতেই বেশি বেশি। তুই পুলিশে জানিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে থাক না। অত মাথা ঘামাচ্ছিস কেন?

আপা আস্তে করে বলল, মাথা থাকলে একটু ঘামাতেও হয়। বিমলা আমার বন্ধু ছিল।

অঞ্জলি একটু ঝামিয়ে উঠে বলল, বন্ধু ছিল তো ছিল। তুই আবার ওকে উইমেনস লিভ দেখাতে গেলি কেন? সেইজন্যই তো এসব হল। সাথে কি বলি আপাটার বড্ড বাড় বেড়েছে!

পারগত বাধা দিয়ে বলে, আরে বাবা, এসব না হলে লাইফটার কোনও ইন্টারেস্ট থাকত আমাদের? আপা, নাউ ইউ সে হোয়াট ইউ শুড ডু। আমি বলি কি আমরা কয়েকজন এখন তোমার সঙ্গে যাই। বাড়িটা ওয়াচ করি। ইফ যশবীর ইজ দেয়ার তাহলে তাকেও একটু দেখে রাখি।

না, সন্দেহ করবে।

করুক না, কী আছে?

সন্দেহ করলে ও সাবধান হয়ে যাবে।

পারগত হেসে বলল, দূর বোকা! সন্দেহ করলেও একটু ঘাবড়েও যাবে। ঘাবড়ে গেলে ক্লাভার করবে।

আপার মনটা খুব খারাপ। বিমলা কি সত্যিই খুন হল? হয়ে থাকলে খুব খারাপ ব্যাপার। সে পারগতের দিকে চেয়ে বলল, আজ আমি একাই ওকে ওয়াচ করি। কাল তোমরা যেও।

বুবকা সামান্য রেগে গিয়ে বলে, আপা, সব ব্যাপারেই তুমি একা এগিয়ে যেতে চাও কেন? ড্রাগ পেডলারদের সঙ্গে যখন লেগেছিল তখনও তুমি একা গিয়েছিলে। ফলে মার খেতে হয়েছিল, মনে আছে?

বাংলায় একটা কথা আছে, অধিক সন্ধ্যাসীতে গাজন নষ্ট।

পারগত বলে, আরে বাবা, ওসব কথা ছাড়ো। আমি বলি, যশবীর ইজ নাউ এ উন্ডেড টাইগার। তোমার যা স্বভাব হয়তো একাই ওকে ফেস করতে যাবে। তাহলেই বিপদ।

আপা একটু ভাবল। তারপর বলল, আমি তাতে ভয় পাই না। কিন্তু লোকটাকে ধরা দরকার। আমি আজ তেমন কিছু করব না। শুধু লক্ষ রাখব। দরকার হলে কাল তোমরা যেও। বিপদের ভয় নেই। আমি আজ বাবা আর মাকেও বলব।

তাই হল। স্কুলের পর আপার বন্ধুরা একটু উদ্বেগ নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

আপা বাস থেকে নেমে নিজেদের বাড়িতে ঢোকার আগে যশবীরের ঘরখানা আবার ভাল করে দেখল। ঘর অন্ধকার, তালা বন্ধ। কেউ নেই। আপা কিছুক্ষণ বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। চোখে জল আসছিল তার। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে ডানদিকে তাকাল আপা। দোতলার সিঁড়ি দিয়ে কেউ নেমে আসছে। ওপরে বাড়িওলা থাকেন একা। বুড়ো মানুষ। নিচের তলার ভাড়াটে হল যশবীর।

চোখের জলের ভিতর দিয়েও আপা বাড়িওলাকে দেখতে পেল। চেনা মানুষ।

এই যে আপা, কেমন আছ?

আপা হাসল, ভাল।

বিমলার কাছে এসেছ নাকি? ওরা কি বাড়ি আছে?

আপা একটু আকুল হয়ে বলল, কাকাবাবু, আপনাকে একটা জরুরি কথা জানানো দরকার। বিমলার কিছু একটা হয়েছে।

বুড়ো মানুষটি ভয় পেয়ে গেলেন। উদ্বেগের সঙ্গে বললেন, কী হয়েছে?

ঠিক বুঝতে পারছি না। আজ যশবীরের ভাবসাব দেখে কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছে।

কী সন্দেহ বলো তো?

ওদের মধ্যে কি কাল বা আজ ঝগড়া হয়েছে কাকাবাবু?

ঝগড়া! সে তো কিছুদিন যাবৎ রোজই হয়। হ্যাঁ, কাল রাতেও তো কথা কাটাকাটি হচ্ছিল।

আর কিছু শুনতে পাননি!

বাড়িওলার মুখ শুকিয়ে গেল। বললেন, কিছু মনে তো পড়ছে না। কী ব্যাপার একটু খুলে বলবে?

আমিও যে জানি না। শুধু ভয় হচ্ছে। আপনার কাছে কি এই ফ্ল্যাটের ড্রপিকটে চাবি আছে কাকাবাবু? ফ্ল্যাটটা একবার দেখা দরকার।

বাড়িওলা একটু চিন্তিত মুখে বললেন, কাজটা কি ঠিক হবে আপা ? ট্রেসপাসিং ।
 কাকাবাবু, আমার যে জানা দরকার । বিমলার যদি কিছু হয়ে থাকে তবে ঢুকে দেখলে দোষ নেই । আমি আজ সন্ধ্যা
 চেষ্টা করেছিলাম । কিন্তু যশবীর আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল ।
 বলা কি ? আচ্ছা তুমি দাঁড়াও । চাবি আনছি ।
 আপা নিচে দাঁড়িয়ে রইল । বাড়িওলা চাবি আনতে অনেক সময় নিষ্ছিলেন । আপা ধৈর্য হারান্ধে ।
 চটভুক্তোর শব্দটা শোনা গেল যেন এক যুগ পর ।
 এই নাও চাবি । কিন্তু সাবধান !

আপা দরজাটা খুলে ভিতরে ঢুকল । সন্ধের অন্ধকার হয়ে এসেছে । সে বাতি জ্বালল । প্রথম ঘরটা লিভিং রুম
 ডাইনিং । দারুণ সাজানো । টিভি, ভি সি আর, ফ্রিজ সব এই ঘরে । আপা পরের ঘরটায় উঁকি দিল । স্পেয়ার বেডরুম ।
 ওপাশে আর একটা বেডরুম । তার দরজাটা বন্ধ । আপা দরজায় একটা টোকা দিল । তারপর হাতল ঘুরিয়ে দরজাটা খুলে
 বাতি জ্বালতেই বিমলাকে দেখতে পেল । দেয়ালের পা ঘেঁষে কার্পেটে পড়ে আছে বিমলা । হাত পা পিছমোড়া করে বাঁধা ।
 মুখে একটা চওড়া লিউকো প্লাস্টি আটকানো ।

একটা শ্বাস ফেলল আপা । নিশ্চিন্তের শ্বাস । হাত পা যখন বাঁধা তখন হয়তো শ্বাস হয়নি এখনও ।
 কিন্তু দেখা গেল, খুনের খুব কাছাকাছিই ঘটে আছে । অশ্রুত, দুর্বল, ক্লান্ত, মার-খাওয়া বিমলা অজ্ঞান হয়ে গেছে ।
 হয়তো অনেকক্ষণ । হাত পা সাদা হয়ে গেছে রক্ত চলাচলের অভাবে । শ্বাস চলছে ধীরে ।
 আপা তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে একটু ছুরি এনে বাঁধন কাটিল । লিউকোপ্লাস্টিটা বড্ড সেঁটে বসে গিয়েছিল । খুলতে
 কষ্ট হল আপার ।

কাকাবাবু! একটু আসুন ।
 বাড়িওলা এলেন । নার্ভাস, ভীত ।
 এসব কী আপা ?
 দেখুন কী অবস্থা করে রেখে গেছে । মরেই যেত ।
 লোকটা তো খুব অমানুষ দেখছিল!
 আপনি, একজন ডাক্তার ডাকবেন কাকাবাবু ? বিমলার অবস্থাটা আমি বুঝতে পারছি না ।
 পুলিশেও কি খবর দেওয়া দরকার আপা ?
 না কাকাবাবু, পুলিশ ডেকে লাভ নেই । মেয়েদের কেউ বুঝবে না । ডাক্তারই ডাকুন ।
 চোখ-মুখে জল দেওয়ার পরই অবশ্য বিমলা চোখ খুলল । অনেকক্ষণ সেই চোখ রইল শূন্য, ভায়াহীন । এত দুর্বল
 যে একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারল না বিমলা ।
 ফ্রিজ থেকে দুধ বের করে গ্যাস জেলে গরম করে এনে তাকে একটু খাওয়াল আপা । অনেকক্ষণ বাদে বিমলা বলতে
 পারল, আপা, আমি তো মরবই । কেন কষ্ট করছ ?
 না, মরবে না । মরলে লড়বে কে ? উঠতে পারবে ?
 পারব ।
 তাহলে আমাদের বাড়ি চলে । এ বাড়ি তোমার পক্ষে নিরাপদ নয় ।
 কেন কষ্ট করবে আপা ? ছেড়ে দাও ।
 না । চলে ।

॥ ৭৭ ॥

ডারলিং আর্থ বইটা হাতে এসেছিল কয়েকদিন আগে । চারুশীলার বাড়িতে বাকমকে বইটা দেখে নিয়ে এসেছিল ।
 লেখক ডঃ কৃষ্ণজীবন বিসোয়াস । প্রকাশক লস এঞ্জেলসের একটা বই কোম্পানি । সাড়ে তিনশো পৃষ্ঠার শক্ত মলাটের
 বই । ভিতরে কিছু আর্ট প্রেট আর লাইন ড্রয়িং আছে । ত্রিশ ডলার দামটা বড্ড বেশি । লোকে কি কিনবে ?
 বইটা আনলেও পড়ার সময় পায়নি প্রথমে । অফিসের বকেয়া কাজ নিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছিল । এক শুক্রবার রাতে
 খাওয়ার পর বইটা নিয়ে শুয়ে পড়ল । খটোমটো টেকনিক্যাল বই নয় । যেন এ দার্শনিকের লেখা প্রবন্ধ-উপন্যাস । প্রথম
 পরিচ্ছেদের শুরুতেই এলিয়টের একটা উদ্ধৃতি, দিস ইজ. দি ওয়ে দি ওয়ার্ল্ড এন্ডস, নট উইথ এ ব্যাং, বাট এ হুইম্পার ।
 প্রথম পরিচ্ছেদেই প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত এক মানুষ বেরিয়েছে তার সঙ্গে পৃথিবীর ও বিশ্বজগতের সম্পর্ক অনুসন্ধান ।
 রোমান্টিক এক কবির মতো । কিন্তু রোমান্টিক কবি কখনও চায় না তার অনুসন্ধান চরিতার্থ হোক মীমাংসা, সমাধানে,
 প্রত্যুত্তরে । শুধু ওই অনুসন্ধানই তার কাম্য, তার প্রার্থিত হল ওই রহস্যময়তার ঘেরাটোপ । কিন্তু কৃষ্ণজীবন চায় ফটিকের
 মতো স্বচ্ছ সত্যকে । জড় থেকে চৈতন্যের স্তরে ক্রম অভিগমনকে নানা জুলন্ত প্রশ্নে, জরিপে, এষণায় উল্টে-পাল্টে দেখছে
 পাগল কৃষ্ণজীবন । খ্যাপার হাহাকার শুরু হল দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, যার শুরুতেই কৃষ্ণজীবন উদ্ধৃতি দিয়েছে, কুয়ো ভেদিস ?
 এক মহাকাশযাত্রীর চোখ দিয়ে দেখা পৃথিবীর দৃশ্য দিয়ে শুরু । আর তারপর এই উন্মাদ বৈজ্ঞানিক মানুষের সব
 ধ্যানধারণার ওপর যেন উপর্যুপরি আঘাত করতে চেয়েছে । কোথায় যাচ্ছে ? কোথায় চলেছো তোমরা ? এইভাবে এই গ্রন্থ
 এগিয়ে গেছে চূড়ান্ত রোমান্টিক পাগলামি আর বৈজ্ঞানিক পরিসংখ্যানে গাঁটছড়া বেঁধে । পড়তে পড়তে ঘুম কোথায় পাল্লা
 হেমাঙ্গর । শোয়া থেকে উত্তেজনা উঠে বসল । সাড়ে তিনশো পাতার বই শেষ হয়ে গেল লহমায় । তখন হেমাঙ্গর দু'চোখে
 টলটল করছে জল । বুক ভার । গলায় ঠেলাঠেলি করছে কান্নার ডেলা ।

রাত সাড়ে তিনটে । লভনে রাত দশটাও বেোধয় নয় । হেমাঙ্গ থাকতে পারছিল না । কাউকে এই বইটার কথা তাকে
 বলতেই হবে । দ্রুত রশ্মির নম্বর ডায়াল করল সে ।

আমি তোমাকে একটা বইয়ের কথা বলতে চাই রশ্মি।
 তুমি এখনও জেগে আছে? কী করছিলে?
 একটা বই পড়ছিলাম। সেই বইটার কথাই বলতে চাই। বইটা তুমি পড়ো। অবশ্যই পড়ো।
 কী বই বলো তো!
 ডারলিং আর্থ।
 ওঃ! বলে একটু হাসল রশ্মি। তারপর বলল, এতদিনে পড়লে? আমার কয়েকবার পড়া হয়ে গেছে।
 সে কী! তুমি বইটা পেলে কোথায়?
 কেন, এখানে তো খুব বিক্রি হচ্ছে। সাত-আটটা রিপ্রিন্ট হয়েছে। আমারটাও বোধহয় সেভেনথ ইমপ্রেশন।
 মাই গড! কৃষ্ণজীবন তা হলে এখন ওয়ার্ল্ড ফেয়াস!
 তাও বলতে পারো। তবে তুমি তো জানোই এসব দেশে বই এমনিতেই বেশি বিক্রি হয়। আর ওয়ার্ল্ড ফেয়াস হতে বেশি দেরিও লাগে না। কিন্তু ওয়ার্ল্ড ফেয়াসদের সংখ্যাও যে বড় বেশি।
 তা বটে। বই পড়ে তোমার কেমন লেগেছে বলা তো!
 এত প্যাশনেট লেখা অনেকদিন পড়িনি। তুমি ভীষণ ইমপ্রেসড মনে হচ্ছে!
 আমার মাথাটা একটু বিভ্রান্ত। ঠিক অ্যাসেস করতে পারছি না।
 তুমি তো ভাল অ্যাসেসর নও। অনেক কিছুই অ্যাসেস করতে পারোনি।
 রশ্মির হাসির শব্দটা শুনে একটু লজ্জা পেল হেমাঙ্গ। বলল, তোমার বোধহয় ততটা ভাল লাগেনি, না?
 আমি ভদ্রলোককে চিনি। চারুদরি বাড়িতে কয়েকবার দেখা হয়েছে। আমি ওঁর প্যাশনের কথা জানি। ডারলিং আর্থ-
 এ ইমপ্রেশন একটু বেশি। কিন্তু তবু ভাল। এখানকার কাগজে ভাল রিভিউ হয়েছে। এশিয়াবাসী বলে একটু ক্ষমাঘোষার
 ভাবও আছে। সাহেবরা যেমনটা হয় আর কি।
 বলছে, এ বই সাহেব লিখলে নোবেল প্রাইজ পেত?
 ও বাবা, তা জানি না। নোবেল প্রাইজ অনেক বড় ব্যাপার।
 আমার ক্ষমতা থাকলে দিতাম।
 ভাগ্যিস তোমার ক্ষমতা নেই! রোজ এত রাত অবধি জেগে থাকো নাকি?
 না। আজ বইটা পড়তে গিয়ে ঘুম চটে গেল। কৃষ্ণজীবনকেই ফোন করতাম। কিন্তু আনগডলি আওয়ার্সে ফোন
 করলে হয়তো প্রশংসাও ভাল মনে নেবে না। কিন্তু কাউকে তো বলা দরকার, তাই তোমাকে বলতে হল।
 বেশ করেছে। ডারলিং আর্থকে ধন্যবাদ। বইটার সুবাদে অন্তত তোমার গলা শোনা গেল।
 কেন, আমি কি তোমাকে প্রায়ই ফোন করি না?
 রশ্মি হাসল, মাসে দু'বার। আমি কতবার করি বলো তো! চারবার।
 আমাকে কৃপণ বলার চেষ্টা করছো নাকি?
 একটা আছে। সব ব্যাপারেই তুমি একটু কৃপণ। এমন কি হৃদয়ের ব্যাপারেও।
 তাই বুঝি?
 শুধু এই ডারলিং আর্থের ব্যাপারে দেখছি খুব অকৃপণ।
 বইটা তোমাকে কেন ইমপ্রেস করল না ভাবছি।
 রশ্মি একটু চুপ করে থেকে আন্তে করে বলল, দেখ, পৃথিবীকে নিয়ে কৃষ্ণজীবনের কিছু উদ্ভট ভয় আছে। তাই উনি
 কল-কারখানা বন্ধ করতে বলছেন, মোটরগাড়ির ব্যবহার কমিয়ে সাইকেল, ঘোড়া এইসব ব্যবহার করতে বলছেন। তা
 করলে যে আনএমপ্রয়মেন্টের সৃষ্টি হবে তার সমাধান কে করবে? আরও অনেক কথা আছে যা খুব লজিক্যাল নয়।
 একটু দমে গেল হেমাঙ্গ। তারপর বলল, জনসংখ্যা কমে গেলে আনএমপ্রয়মেন্টও কমবে।
 জনসংখ্যা কি করে কমবে? একটা থিওরি অব মাল্টিপ্লিকেশন আছে। সেটা অপটিমামে না গেলে রিভার্স ট্রেন্ডটা শুরু
 হয় না।
 তার মানে তুমি কি বলতে চাইছো পৃথিবীর জনসংখ্যা একটা চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছে তারপর কমবে?
 সেরকমই তো মনে হয়।
 ডারলিং আর্থ তুমি আর একবার পড়ো।
 কেন বলো তো!
 পড়লে দেখবে, পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে তৃতীয় বিশ্ব। উন্নত দেশগুলোতে নয়। আমাদের এই তৃতীয় বিশ্ব
 জনসংখ্যার চাপে গোলায় যাক, পশ্চিম দেশগুলো তাই চায়।
 সব ব্যাপারেই বুঝি আজকাল আমেরিকা ইউরোপের দোষ? থার্ড ওয়ার্ল্ডের পপুলেশন বাড়লে এদের কী করার আছে?
 আছে রশ্মি, আছে। থার্ড ওয়ার্ল্ড, ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড বলে এখন আর কিছু থাকা উচিত নয়। থার্ড ওয়ার্ল্ড ও ওয়ার্ল্ড। সেখানে
 ঘা হলে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড সাফার করবে।
 ওটা ফিলজফি।
 ফিলজফি মানে কি ফ্যান্ট নয়? আমার তো মনে হয় সমস্যার সমাধানে গোটা দুনিয়ার এগিয়ে আসা উচিত।
 রশ্মি মৃদু হেসে বলে, থার্ড ওয়ার্ল্ড চাইলে এরা জাহাজ ভর্তি কন্ট্রাসেপটিভ পাঠিয়ে দেবে। তাতেই কি হবে?
 না, তুমি বুঝলে না রশ্মি। কন্ট্রাসেপটিভ নয়, থার্ড ওয়ার্ল্ডের দরকার প্র্যাকটিকাল ইডিওলজির। কিন্তু তুমি কি খেতে
 বসেছিলে? চিবোনার শব্দ পাচ্ছি যেন।
 রশ্মি হেসে ফেলল। বলল, রাতে আমি কি খাই জানো? মাংস চারখানা ক্র্যাকার আর দুধ। তুমি যখন ফোন করলে
 তখন আমি সবে বিকুটে কামড় দিয়েছি।

ইস! ডিস্টার্ব করলাম। তুমি বরং খাও, আমি ছাড়ছি।
ছেড়ে না। আমি বরং পরে খাবো। বেশি রাত তো হয়নি।
এদিকে যে ভোর হতে চলেছে!

তুমি যা উত্তেজিত হয়ে রয়েছে, এখন তো ঘুমোতেও পারবে না।

ঘুমটা কি খুব প্রয়োজন? বরং বাকি রাতটা এইসব প্রবলেম নিয়ে ভাববো। কৃষ্ণজীবন অন্তত আমাদের ভাবতে
শেখাচ্ছে।

তা ঠিক। বইটা পড়ে আমিও কিন্তু ক'দিন খুব ট্রান্স-এর মধ্যে ছিলাম। ঠিক আছে, তুমি বরং ভাবো।

বইটার ক'টা এডিশন হয়েছে বললে?

সাত-আটটা তো বটেই। বেশিও হতে পারে।

সেটা কি বেশ বেশি বিক্রি?

খুব না হলেও মন্দ নয়।

সাত-আট এডিশনে কত কপি হয় বলো তো!

মিনিমাম সাত-আট লাখ। অলমোস্ট এ মিলিয়ন। কৃষ্ণজীবনবাবু ইজ নাউ এ ভেরি রিচ ম্যান।

রিচ ম্যান! দূর, সেটা কোনও কথা নয়। হি উজ রিচ ইন আদার ম্যাটার্স। ছাড়ছি রিশ।

বাই।

আরও খানিকক্ষণ জেগে রইল হোমাস। ক্যাসেট চালিয়ে চিঠিওতে আমার ঝাঁ সাহেবের হংসধ্বনি শুনল। তারপর
তলো এবং ঘুমোলো।

শনিবার আজকাল অফিস ছুটি থাকে। সকালেই সে ফোন করল কৃষ্ণজীবনকে।

ডারলিং আর্থ পড়লাম। অভিনন্দন।

কৃষ্ণজীবন শিশুর মতো শব্দ করে হেসে উঠল। বলল, কী আশ্চর্য! পড়েছেন? ইটস্ এ গুড নিউজ!

আপনার বইটা যে দারুণ বিক্রি হচ্ছে তা কি আপনি জানেন?

কৃষ্ণজীবন আর হাসল না। বলল, বিক্রি! তা জানি। কিন্তু লোকে ব্যাপারটা বুঝতে পারছে কি?

আমি বোধহয় বুঝছি।

কিন্তু অন্যরা? অনেকে বই পড়ে, কিন্তু বইয়ের কথাকে ভিতরে নেয় না। অনেক পণ্ডিত আছে বইয়ের মধ্যে
প্রতিবাদযোগ্য অংশগুলি খোঁজে। ডারলিং আর্থ হয়তো খুব কমপিস্টেন্ট রাইটিং নয়, কিন্তু কাঁচাচাতে আমি যা লিখেছি তার
উদ্দেশ্য হল, মানুষ আর একটু চিন্তিত হোক, একটু বিষণ্ণ হোক, একটু ভাল করে চারদিকটাকে লক্ষ্য করুক।

আমি বইটা পড়ার পর থেকে ঘুমোতে পারিনি। একটা কথা আছে। আপনি সামনের উইক এন্ডে আমার গায়ের
বাড়িতে যাবেন?

সামনের উইক এন্ড? বোধহয় আমি ম্যানিলায় যাব।

তা হলে আজই চলুন।

আজ? আজ!

ভাববেন না। ভাবলে আর যাওয়া হবে না।

একটা অসুবিধে আছে। রিয়া আজ কয়েকজনকে নেমস্তন্ন করেছে। তারা সব আসবে।

কখন?

আজ বিকেলে। যদি কিছু মনে না করেন, আপনিও আসুন। খুব ইনফর্মাল ব্যাপার।

না, সেটা ভাল দেখাবে না। আমি বাইরের লোক।

বোধহয় ইনভাইটিদের কাউকে কাউকে আপনার অপছন্দ হবে না। কারণ তাঁদের একজন আপনার দিদি চাক্ষুশীলা।

মাই গড। চার্লসি হলে তো আমি আরও যাবো না।

কেন বলুন তো!

ওঃ সে অনেক কথা। বিয়ে বিয়ে করে ও আমার মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। রিসেপ্টিবলি ও আর একটি মেয়েকে
আমদানি করেছে। ওকে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না যে বিয়েটা একজন মানুষের জীবনে সবচেয়ে ইম্পোর্ট্যান্ট ব্যাপার নয়।
একটা বয়সের পর কিন্তু বিয়েটা ইম্পোর্ট্যান্ট। ইভন এ রং ম্যারেজ ইজ ওয়েলকাম দ্যান নো ম্যারেজ।

আপনি একজন বুদ্ধিমান লোক হয়ে এ কথা বলছেন? রং ম্যারেজ যে মানুষকে নষ্ট করে দিতে পারে। ডিভোর্স,
সুইসাইড কত কী হয়!

শিরঃপীড়া হলে কি মাথাটা কেটে বাদ দিতে হবে?

বুঝছি। কিন্তু আমি বলতে চাইছি, বিয়ে জিনিসটা সবাইকে স্যুট করে না।

আচ্ছা, ঠিক আছে। ইনভাইটিদের সঙ্গে আপনাকে মিট করাবো না। আমি আর আপনি সামনের বারান্দায় বসব। হবে?
একটু ধরুন, রিয়া নিজে আপনাকে নেমস্তন্ন করবে।

আহা, তার দরকার কি?

আছে। ও আপনাকে খুব পছন্দ করে। খুশি হবে।

রিয়া এল এবং ফোন ধরেই বলল, আমার কি এমন ভাগ্য হবে যে আপনি আসবেন?

কেন, আমি কে এমন খাজা খায়ের নাতি?

সত্যি আসবেন?

আসতে বলেই দেখুন না! সেই যে হিং-এর কচুরি খাইয়েছিলেন আজও ভুলিনি।

ইস, ছিঃ ছিঃ, কচুরি কি একটা খাবার!

আমি খুব ভালবাসি।

আজ কিন্তু কচুরি নয়। ফুল ডিনার।

আপনি কি ডারলিং আর্থ বইটা পড়েছেন?

ডারলিং আর্থ? না। সময় পাই কোথায় বলুন!

আপনি কি জানেন যে কৃষ্ণজীবনবাবু এখন একজন ওয়ার্ল্ড ফেমাস লোক?

রিয়া হাসল, অতটা জানি না।

ইটস এ ফ্যাক্ট।

আসছেন কিন্তু।

যাবো।

ফোনটা রেখে দিল হেমাঙ্গ। এইজন্যই সে বিয়ে করতে চায় না। ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীর বইটা অবধি পড়েননি!

সারাদিন ধরে বইটা আবার পড়ল হেমাঙ্গ। এবার ধীরে ধীরে। ক্রিটিকের মতো। সজাগ ও সতর্ক। কিন্তু কৃষ্ণজীবন তার বইয়ের সমগ্র অধ্যায়ের ঠিকই টেনে নিল তাকে। শেষ অধ্যায়ের শুরুতে জীবনানন্দ দাশের একটি উদ্ধৃতি রয়েছে। হে নাবিক, হে নাবিক, জীবন অপরিমেয় নাকি—ও সেইলার, সেইলার, ইজন্ট দি লাইফ স্টিল ইনফিনিট। স্ক্যাপা বৈজ্ঞানিক তার বলগাহাড়া কলমে লিখে গেছে, তোমাকে কে বলে দেবে, একটি প্রস্তুতিত শিউলি ফুলের সৌন্দর্যে কেন তোমার এত আনন্দ? দূরের নক্ষত্রের দিকে চেয়ে শুয়ে আছো ছাদে, চিংপাত! তোমার সর্বস্ব হারিয়ে যাচ্ছে অনন্ত নক্ষত্রবীথির রহস্যময়তায়—তখন কে তুমি মনে পড়ে? ওই নক্ষত্র কি তোমার সঙ্গে কথা বলে? বলতে চায়? বিজ্ঞান কি ব্যাখ্যা করে এক মহৎ কবিতার অন্তর্লোককে? সুন্দর গানের মধ্যে কোথায় হারিয়ে যায় তোমার লজিক? হে মানুষ, কোন জড়বস্তু থেকে এল এত চৈতন্যের প্রাবল? ভালবাসা? মুগ্ধতা! কে ব্যাখ্যা করবে তা? বিজ্ঞান তো অন্ধের যষ্টি মাত্র। পথের ঠাণ্ডা দেয় কিন্তু সে তো নয় চোখ! বীজের ভিতরে বটবৃক্ষের সজ্জাবনা—এ কি ভাবতে পারা যায়? একটু ভাবো। ভাল করে ভাবো। ঈশ্বরীয় বা নিরীশ্বর যাই হও তুমি, দাঁড়াও। দুই হাত অঙ্গুলিবদ্ধ করে প্রার্থনা করো, জ্ঞানবান করো আমাকে। সৃষ্টির দুজ্জয় অবগুষ্ঠন সরিয়ে দাও। বুঝতে দাও, আমি-কে। বুঝতে দাও, তুমি কে!

আপনি কি খুব কবিতা পড়েন?

কবিতা! বলে কৃষ্ণজীবন লাজুক একটু হাসল, একটু-আধটু।

নিজ্ঞে লেখেনও নাকি?

না, না, কী যে বলেন!

হেমাঙ্গ একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার মনে হচ্ছিল, কবিতার প্রতি আপনার কিছু আনুগত্য আছে।

কৃষ্ণজীবন চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, অ্যাফুয়েন্ট দেশগুলোতে কবিতা লোপাট হয়ে যাচ্ছে। টেকনোলজি খেয়ে ফেলছে সাহিত্যকে। এইসব কবিতা-টবিতা যা কিছু সব আজকাল থার্ড ওয়ার্ল্ডের নিক্ষিপ্তদের পাসটাইম। জানেন?

কিছুটা জানি।

বাঁচোয়া। আর সব দিকে এগিয়ে গেলেও ওরা, ওইসব টেকনোলজিক্যালি হাই সোসাইটি, বোধহয় কবিতাকে আমদানি হাতে ছেড়ে দেবে।

তাই হোক।

বিকেল মরে সঙ্গে হয়ে আসছে। কৃষ্ণজীবনের সাততলার ঝুল-বারান্দা থেকে সূর্যাস্তের শেষ রশ্মি মিলিয়ে যেতে দেখেছে হেমাঙ্গ। অতিথিদের সমাগম এখনও হয়নি। কৃষ্ণজীবনকে একা পাওয়ার জন্য একটু আগেই এসেছে হেমাঙ্গ।

রেলিঙে থুতনির ভর হাতের পাড়ায় রেখে কৃষ্ণজীবন সামনের দিকে চেয়ে দূরাবলোকন করছিল। কেমন এক দূর গলায় বলল, আমার ছোটো দুটো ভাই সামান্য বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারপিট করে ও গুকে জখম করেছে। আমার একটা বোন যাত্রা করে বেড়ায়। আমার বাবা-মা কাঁচাঘরে বাস করে। আর আমি? সাততলায় থাকি। মোটা মাইনে পাই। আমেরিকা থেকে আমার বই বেরোয়। হেমাঙ্গবাবু, আমাকে যা দেখছেন, যতটুকু দেখা যাচ্ছে আমার, এটুকুই সব নয়। আমি যেমন বাইরের দৃশ্যের কথা বলি, তেমনি ভিতরের দৃশ্যের কথাও বলি। মানুষের জীবনযাপনের মধ্যে, তার মনের মধ্যে, মস্তিষ্কের মধ্যে কি কম পলিউশন?

হেমাঙ্গ চুপ করে কৃষ্ণজীবনের দিকে চেয়ে রইল।

কৃষ্ণজীবন মৃদু স্বরে বলল, মাঝে মাঝে আমি কেমন যেন মুক-বধির হয়ে যাই। এমন সব সিলুয়েশন তৈরি হয় যাতে আমি ভীষণ অসহায় হয়ে পড়ি, কিছুই করতে পারি না। তখন কি ভাবি জানেন? ভাবি, তোর ওপরে নেই ডুবনের ভার। মাঝে মাঝে ভাবি, আমি বৃথা চিৎকার করে মরছি, পৃথিবীর কেউ আমার কথা শুনছে না, গুরুত্ব দিচ্ছে না, হয়তো আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে।

আপনার কেন এরকম মনে হয়?

কৃষ্ণজীবন যখন মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল তখন হেমাঙ্গ লক্ষ করল কৃষ্ণজীবনের মুখে বিষণ্ণতার ছাঁই মাখানো। চোখের দীপ্তি হঠাৎ নিবে গেছে। মৃদু স্বরে বলল, ডারলিং আর্থ বইটা প্রকাশের আগে পাবলিশারের অনেক দ্বিধা ছিল। রিভিউয়াররা সবাই ফেবারেল ছিল না। অনেক আশ-পিছু, অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর ওরা ডিসিশন নেয় যে, বইটা শেষ অবধি ছাপা হবে। যখন বইটা নিয়ে ইনডিসিশন চলছে তখন আমার প্রায়ই মনে হত, ওই বইয়ের মধ্যে বোধহয় আমার পাগলামিই রয়েছে। কিন্তু এই পাগলামি ছাড়া আর যে আমি কিছুই পরি না।

কোনও কোনও পাগলামি হয়তো প্রতিভার লক্ষণ।

প্রতিভা! না না, ওসব আমার নেই। আপনি ঠিক বুঝবেন না, আমি খুব আনসাকসেসফুল ম্যান।

তার মানেটা কি হল ?

সাকসেস তাকেই বলে যখন মানুষ নিজের সঙ্গে এই গোটা বিশ্বজগতের প্রকৃত সম্পর্কটা আবিষ্কার করতে পারে। সারাজীবন আমি সেই চেষ্টাই তো করেছি। কিন্তু হল না। মনে হচ্ছে, একটা নিরেট দেয়ালে মাথা ঠুকে মরছি। কিছুতেই বুঝতে পারছি না, আমি কি। সত্যিই কে। এই যন্ত্রণা আমাকে মাঝে মাঝে পাগলের মতো করে দেয়। এই গাড়ি বাড়ি টাকা উল্টে সব যেন একমুঠো ধুলোর মতো অর্থহীন হয়ে যায়।

হোমস্‌ স্বিতমুখে বলল, অ্যান্ড দ্যাট ইজ সাকসেস। আপনার যন্ত্রণাটাও যদি আমার থাকত তা হলে নিজের পিঠে চাপড়ে বলে উঠতাম, সাবাস।

এই কি মানুষকে ভাবাবে হোমস্‌বাবু ?

কাদাবে।

আপনি ঠাট্টা করছেন না তো!

এই বুঝলেন এতক্ষণে ?

না না। ইউ আর সো কাইন্ড।

ডোরবল বাজতেই উঠে গেল কৃষ্ণজীবন। অতিথি সমাগম শুরু হল বোধহয়। ভিড় হয়ে যাবে। কত অর্থহীন কথার গাঁজলা উঠবে। বিষ্ণু, মন্সুর, গভীর যে সময়টুকু এই বারান্দায় ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল তা ডানা মেলে পালিয়ে যাবে।

কী রে কিছুত ?

হোমস্‌ ঘোর অনামনস্কতা থেকে মুখ তুলে কয়েক পলক মহিলাটিকে চিনতেই পারল না। মনে মনে অনেকটা দূরে সরে গিয়েছিল সে। এক মহাকাশচারীর মতো সে কালো আকাশে সবুজাভ নীল পৃথিবীর গোলকটিকে অবলোকন করছিল। সেও ভাবছিল, কেন জন্ম ? কেন এই চৈতন্য ? কেন এই বিশাল সৃষ্টির আয়োজন। এর কি কোনও মানে হয় না ?

চারুকীলাকে চিনতে তাই সময় লাগল। সে একটু হাসল। নিজেই টের গেল, হাসিটা ফুটল না। হাসিটা হাসির মতো হল না। অস্ফুট স্বরে সে বলল, চারুদি!

ডোরও নেমন্তন্ন ছিল বলিসনি তো! কৃষ্ণজীবনবাবুর কাছে শুনে তো আমি অবাক।

হোমস্‌ বেশ কষ্ট করেই নিজেকে বাস্তবে নামিয়ে আনল। বলল, নেমন্তন্ন ? ও হ্যাঁ, নেমন্তন্নটা আজ সকালেই হয়েছে। তোকে বলবার সময় পাইনি।

এত অনামনস্ক দেখাচ্ছে কেন তোকে ? কী হয়েছে ?

না, কিছু নয়।

ভেতরে আয় না! মুখ গোমড়া করে বসে আছিস কেন ? আয়।

হোমস্‌ উঠল।

মস্ত হলঘরটায় অতিথি সমাগম হচ্ছে। বেশির ভাগই চেনা মুখ। সুব্রত, অনু, চারুদির ছোলেমেয়েরা।

আপনি কিছু রোগা হয়ে গেছেন।

হোমস্‌ ফিরে তাকাল। যাকে দেখল তাকে চিনতেও একটু সময় লাগল তার।

রোগা হয়ে গেছি!

অনেক। কেন রোগা হলেন ? বিরহে নয় তো!

হোমস্‌র কান দুটো হঠাৎ একটু গরম হয়ে গেল। বিড় বিড় করে সে কয়েকবার আঙুল, বিরহ ? বিরহ ? কেন বলুন তো!

ঝুমকি একটুও হাসছে না। মুখটা থমথমে গভীর। বলল, এমনি জিজ্ঞেস করলাম। কিছু মনে করবেন না।

হোমস্‌ ছিপছিপে সুন্দর মেয়েটার দিকে চেয়ে ভাবতে লাগল, একে কী বলা যায়! মেয়েটা কি তাকে নিয়ে মজা করছে ? একটু সময় নিয়ে সে গভীর গলায় বলল, বিরহের কোনও কারণ তো দেখতে পাচ্ছি না।

ঝুমকি একটু হাসল। বলল, তা হলে বোধহয় ডায়েটিং করছেন।

ফাজিল মেয়েটির কাছ থেকে সরে যাওয়ার জন্য সে 'এই যে, চয়নবাবু' বলে এগিয়ে গেল।

কিন্তু সারাক্ষণ সে মাঝে মাঝেই টের পেতে লাগল, একজোড়া চোখ তাকে কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করছে, অনুসরণ করছে। কিছু বলতেও চাইছে কি ? গেরো।

॥ ৭৮ ॥

স্ট্রোক জিনিসটা কি বলো তো! ডিকশনারিতে যা লেখা আছে ডাক্তারি মতে তো তা নয়! ব্যাপারটা কি বলো তো!

পুলিন ডাক্তার একটু হেসে বলে, কেন, ওসব জেনে হবোটা কি ?

বিষ্ণুপদ অপ্রতিভ হেসে বলে, জেনে রাখা ভাল, মানুষের স্ট্রোক হয় শুনেছি, মারাও যায়। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।

ওসব অলক্ষ্যে ব্যাপার জানার দরকারটা কি ? দুনিয়ায় জানার আরও অনেক জিনিস আছে তোমাকে। তো চিনি। ভেঙে বললেই ওসব নিয়ে ভাবতে শুরু করে আবার একটা রোগ বাধিয়ে বসবে।

বিষ্ণুপদ ফের একটু হেসে বলে, মানুষ তো মরেই। বয়স হলে, সময় ফুরালো একটা না একটা ছলছুতোয় প্রাণপাশি ফুরক্ক হয়ে যায়। তা বলে বাঁচার ইচ্ছেটা কি মরে ? এই যে অত আতান্তরে আছি। তাও মরতে কেমন ইচ্ছে যায় না। আরও কথা কি জানো, সংসারের যা অবস্থা দেখছি তাতে ভুগে মরতে ভয় হয়। স্ট্রোক হলে শুনেছি, ফুরক্ক হতে এক লহমা লাগে।

এই বলছো মরতে ইচ্ছে যায় না আবার বলছো ফুরক্ক হতে চাও, তোমাকে নিয়ে তো মুশকিল দেখছি। এক নিশ্বাসে দুটো উল্টো কথা বলে ফেললে।

৩২৬

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে খুব হেসে বলে, উল্টোপাশটা ভাবি আর বলি বলেই তো আমি মনিষ্যির মধ্যে পড়ি না। ভাবছিলাম কি জানো, মরতে ইচ্ছে যায় না সে কথা ঠিক। তা বলে কি মরণ-বাবাজী আমাকে ছাড়বে? বুকে হাঁটু দিয়ে পা ওনা-গণ্ডা আদায় করে নেবে না একদিন? তা মরাটা যদি ওই স্ট্রোককে হয় তাহলে লাট্টা একটু কম, তাই না?

তোমাকে বলেছে! যারা ছুট বলতে মরে তারা ভাগ্যবান! ভোগে না, ভোগায় না। স্ট্রোক হলেই তেমনধারা হবে তার মানে নেই। অনেক সময় জড়ভরত হয়ে বেঁচে থাকে। পক্ষাঘাত হয়, আরও নানা জটিল জিনিস হয়। ফুরুৎ হতে চাইলে বরং গলায় দড়ি দেওয়া ভাল, নয়তো ঢকাঢক ফলিডল মেরে দাও, হাতের কাছেই রয়েছে।

তাতে পাপ হবে না?

তা হবে। সব দিক সামলে চলতে গেলে কি হয়?

আত্মহত্যা করলে নাকি আত্মা আকাশের সব অঙ্ককার গ্রহে ঘুরে বেড়ায়। মুক্তি হয় না।

তা হবে। তোমার মতো শাস্ত্রজ্ঞান আমার নেই। তবে একটা কথা জেনো, আত্মহত্যা হচ্ছে জোয়ান বয়সের ব্যাপার। বুড়ো বয়সে আর ওসব করার মতো বুকের পাটা থাকে না। তখন লাথি কাঁটা খেয়েও প্রাণটুকু নিয়ে বেঁচে থাকতে চায় মানুষ। আজকাল খুব মরার কথা ভাবছো নাকি?

দু'রকমই ভাবি। মরার কথাও, বাঁচার কথাও।

পুলিন ডাক্তার তার প্রশ্নের দেখার যন্ত্র আর স্টেথসকোপ বের করে বলে, দেখি প্রশ্নারটা।

বিষ্ণুপদ হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে একই হেসে বলে, তোমার ওই যন্ত্রখানার বয়স কত হল বলো তো! চল্লিশ পঞ্চাশ বছর হবে না?

তাতে কি? বিলিতি জিনিস!

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, আমার মনে হয়, যন্ত্রটা এবার পুরোনো লোহার দরে বেচে দিলে ভাল। যেমন তুমি, 'তেমন তোমার যন্ত্র।

বেশি বোঝো না হে, ত্রিশ বছর ধরে প্রশ্নের দেখে আসছি। এক চুল এদিক-ওদিক হয়নি।

হলেই বা ধরছে কে? তুমি হলে মোতাবনে খাটাস যায়।

পুলিন গম্ভীর হয়ে প্রশ্নের দেখে বলল, একটু বেড়েছে। মার্জিনাল। ওষুধ খাবে নাকি?

বিষ্ণুপদ জু কুঁচক বলে, কে যেন বলছিল খোড়ের রস খেলে প্রশ্নার কমে যায়।

তাও যায়। খেয়ে দেখতে পারো। তবে প্রশ্নারটা বেড়ে থাকলে কষ্ট। যা দিয়ে পারো বেঁধে রাখো। নইলে সামান্য উত্তেজনায় চড়াক করে উঠে পড়বে। তখনই বিপদ!

যন্ত্রখানা দেখছিল বিষ্ণুপদ। লম্বাটে সরু একখানা বাস্র, তার ডালায় বিরাট একখানা থার্মোমিটারের মতো জিনিস, নিচের খোঁদেলে রবারের পট্টি আর পাশপ দেওয়ার জিনিসটা গুছিয়ে রাখার জায়গা। বাস্রটা কট করে বন্ধ করল পুলিন। মানুষ কত যন্ত্রই না বের করেছে! যত ভাবে তত অবাক হয়।

বিষ্ণুপদ বলল, একই শরীর, তবু কত তফাত দেখ। এই শরীরেই তো নৌকোয় বৈঠা মেরেছি, লাঙল ঠেলেছি, বোঝা টেনেছি, দশ-বিশ মাইল সাইকেল চালিয়েছি, দু-তিন ক্রোশ এক চোপাতে হেঁটে মেরে দিয়েছি। আবার সেই শরীরটাই এখন কেমন লাতন হয়ে পড়েছে দেখ।

আহা, কালধর্ম নেই?

সে যে আছে তা তো দেখতেই পাচ্ছি। আমার কি মনে হয় জানো, মানুষের মরতে তত অনিচ্ছে নেই। কিন্তু বুড়ো হয়ে যেতে ভাল লাগে না। বুড়ো হওয়া মানে যেন ভেজা কাঁথা জড়িয়ে বসে থাকা। তোমরা ডাক্তাররা বাপু এর একটা বিহিত করতে পার না? যে ক'বছর বাঁচব বেশ ঠেঁড়েমুশে বগল বাজিয়ে বাঁচব। তারপর ফুরুৎ হওয়ার সময় হলে পট করে নেই হয়ে যাবো।

তোমার আমার ইচ্ছেমতো যদি সব হত তাহলে তো কথাই ছিল না। তবে কথাটা তুমি খুব আজগুবি বললেও মিথ্যে বলেনি। মাঝে মাঝে মনে হয়, বুড়ো বয়সটা যেন এক পাপ।

পাপও বলতে পারো, প্রায়শ্চিত্তও বলতে পারো। জীবনটা হেলাফেলা করে কাটিয়ে বুড়ো বয়সে তার গুনোগার দেওয়া।

তোমার আর গুনোগারটা কি? একটা ছেলে তো মানুষের মতো মানুষ হয়েছে। সেই ঢের। এত লোক তো এত ছেলে পয়দা করছে, ক'টা মানুষ হচ্ছে বলো তো! গরু ছাগলের মতো নম্রের বাড়ছে। একখানা যে সোনার টুকরো হয়েছে তাই মহা ভাগ্য বলে জেনো।

বিষ্ণুপদ মৃদু একটু হেসে বলে, সোনার টুকরো তো বটে, কিন্তু সে যে এখন পরের সিন্দুক।

তা হোক। ছেলে তো আর ট্যাকে গুঁজে রাখতে পারবে না। বাঙালি মা-বাপ তাই চায় বটে, কিন্তু তোমার ছেলের ওপর দুনিয়াটারও কিছু হক তো আছে।

তা যা বলেছো। মাঝে মাঝে তোমার মুখ দিয়ে একেবারে নির্ঘাত কথাটা বেরিয়ে আসে।

বামা তাহলে পাততড়ি গুটোলো?

বিষ্ণুপদ একটা শ্বাস ফেলে বলে, তাই তো দেখছি। বলেও গেল না একবার।

পুলিন একটু হেসে বলে, বলে গেল না মানে? বামার বউ চলে যাওয়ার সময় চেঁচিয়ে তোমাদের যে বাপান্ত করছিল তা তো গাঁ-সুন্ধু লোক শুনেছে!

বিষ্ণুপদ কাহিল হেসে বলে, হ্যাঁ, সে একরকম বলে যাওয়াই বটে।

তাহলে আর দুঃখ কি? স্বস্তরবাড়িতেই গিয়ে উঠেছে তো?

সেরকমই কথা।

আজকাল স্বপ্নদেবই কপাল। বেলা হল, চলি হে বিষ্ণুপদ। কাঁচা নুনটা খাচ্ছে না তো!

না। তেমন আলুনি লাগলে ওই একটু খাই আর কি।

ওই রোগেই তো ঘোড়া মরে। নুন-টুন খেও না বাপু।

নুন না খেলে ক'দিন এক্সটেনশন পাবো বলো তো! তোমার তো নিদান দিয়েই খালাস। কিন্তু গিলতে তো হবে আমাকেই। না কি?

তবে খাও। মনের আনন্দে খাও। নিজের শ্রাঙ্কের চিঠিটা নিজের হাতেই মুসাবিদা করো বসে বসে। নুন এমন কোন অমৃতটা শুনি! কয়েকটা দিন একটু আলুনি লাগে, তারপর দেখবে বিশ্বদটা চলে গেছে।

পুলিন চলে গেলে বিষ্ণুপদ ফাঁকা বাড়ি বুকে নিয়ে বসে রইল। বামাচরণ সত্ৰীক বিদেয় নিয়েছে। এ বাড়িতে তারা প্রাণের ভয়ে আর থাকতে নারাজ। তা বলে বাড়ির অধিকার ছেড়ে দিয়ে যায়নি। শ্যামলীর কোন কাকা পুলিশের লোক, তাকে বলে রামজীবনকে টিট করবে বলে শাসিয়ে গেছে। বাড়ির দখলও তারা নেবে, তবে সবাইকে ঝেঁটিয়ে তাড়িয়ে। কথাগুলোর কিছু ফাঁকা আওয়াজ, কিন্তু আবার তত ফাঁকা নয়। একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠবেই। যাওয়ার সময় বামা রা কাড়েনি। কিন্তু বিষ্ণুপদের ধারণা, বউ সামনে না থাকলে বামা তার বাপ-মাকে কিছু একটা বলে যেত। বামার ঘর ফাঁকা পড়ে আছে ভালাবন্ধ হয়ে। রাজা বউমাও কদিনের জন্য বাপের বাড়ি গেল কাল। বাড়িতে শুধু বুড়োবুড়ি। আর রামজীবন। রামজীবন বেহানো বেরোয়। দুপুরে কখনও খেতে আসে, কখনও আসে না। ফেরে রাতে। তার থাকা না-থাকা সমান।

বাগানে শাক তুলতে গিয়েছিল নয়নতারা। চুপড়ি কোলে নিয়ে ফিরল।

শাক পেলে?

হ্যাঁ। অনেক পেয়েছি। হ্যাঁগো, ব্যাঙের ছাতাও এনেছি কয়েকটা। খাবে?

বিষ্ণুপদ একটু দ্বিধায় পড়ে বলে, দেশের বাড়িতে তো কখনও খাইনি। তবে এদেশে সবাই খায় শুনি। চেখে দেখতে দোষ কি?

তাহলে রাঁধি? আমিও কখনও খাইনি। সেদিন কুমুমের মা বলছিল, মাসিমা, কী ভাল ছাত্ত হয়েছে আপনাদের বাগানে, খান না কেন? না খেলে আমাদের দেবেন।

বিষ্ণুপদ নড়েচড়ে বসে একটু হেসে বলে, তাহলে রেঁধেই ফেল। খেয়েই দেখি এমন কি জিনিস। সাহেবরাও খুব খায় জানি।

পুলিন ডাক্তার কী বলে গেল?

ডাক্তারদের কথা আর বোলো না। মাকাতার আমলের যন্ত্র দিয়ে কী দেখল ওই জানে। তবে তেমন কিছু নয়। কাঁচা নুন খেতে বারণ করে গেল আবার।

তাহলে আজ থেকে আর নুনটা পাতে নিও না।

না নিলাম। কিন্তু আমার তো চিকিৎসা হচ্ছে। তোমার ব্যবস্থা কী হবে? কোনদিন ডাক্তার দেখাও না, এ ভাল নয়।

রন্ধে করো। পুরুষ ডাক্তার বুক দেখবে, পেট দেখবে, ও আমার পোষাবে না বাপু। আমি বেশ আছি। শয্যা নিলে তখন দেখা যাবে।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, এ বয়সে আর লজ্জার কী?

আমার আছে বাপু।

বিষ্ণুপদ খুব হাসল। সবকিছু পাষ্টায়, কিন্তু নয়নতারার আর পাষ্টায় না। হাসি থামিয়ে বলল, শরীর এক জটিল যন্ত্র, বুঝলে? হাসো, কান্দো, কাজ করো, ঘুমেও, যা কিছু করো না কেন, সবই করছ শরীরের ভিতরকার নানা সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির জন্য। এ এক আশ্চর্য জিনিস। বাইরে থেকে বোঝাই যায় না যে ভিতরে এত সব কাণ্ডকারখানা।

তা হোক গে। আমার অত জেনে দরকার নেই।

আমিও যে জানি তা নয়। তবে তোমার চেয়ে একটু বেশি জানি, এই যা। জম্পেশ একখানা যন্ত্র বটে।

নয়নতারা রান্নাঘরে গেল। কথাটা আর এগোলো না।

আর একটু বেলা গড়ালে একখানা ঘটনা ঘটল। এমনটা অনেক আগে ঘটত বটে, ইদানীং ঘটছিল না। পিওন এসে পাঁচশো টাকার একখানা মানি অর্ডার দিয়ে গেল। ফর্মের টোকেনে কৃষ্ণজীবনের একটু লেখা, বাবা, অনেকদিন কিছু পাঠাইনি। গিয়ে থোক কিছু টাকা আপনার হাতে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল। সময়ভাবে হয়ে উঠছে না। রামজীবনকে বলুন, আপনার আর মায়ের ঘরটা পাকা করতে। খরচ আমি দেবো। মা ও আপনি, প্রণাম নেবেন। সেবকাম কৃষ্ণ।

টাকাটা হাতেই ধর থর করে কীপছিল। পাঁচশো টাকা এখনও তার কাছে অনেক টাকা।

টাকাটা নিয়ে উঠে রান্নাঘরের দরজায় এল বিষ্ণুপদ, কী গো, কানে কম শুনছে নাকি আজকাল?

নয়নতারা মুখ তুলে হাসল, কেন, ডাকছিলে নাকি? উনুনটা ধরতে আজ দেরি হল, এক হাতে সব কাজ। কোটা, বাটা, রাঁধা।

না। ডাকিনি। তবে পিওন এসেছিল, স্নতনে পাওনি!

পিওন! ও মা, তোমার হাতে একগোছা নোট যে! কে দিল?

কৃষ্ণ পাঠিয়েছে। এই পিওন এসে মানি অর্ডার দিয়ে গেল। পাঁচশো টাকা।

ওম্মা গো! পাঁচশো!

ভাল-মন্দ খাওয়া যাবে ক'দিন। আরও কথা আছে। আমাদের ঘরখানা পাকা করে দিতে চাইছে।

এতদিনে বুঝি মা-বাবার দুঃখ বুঝতে পারছে সে!

ইংরিজিতে একটা কথা আছে, বেটার লেট দ্যান নেভার। তা দেরি করেছে বটে, কিন্তু সে এককথার মানুষ।

নয়নতারার চোখে জল এসেছিল। আঁচলে চোখ দুটো মুছে নিয়ে বলল, বলছে সেই ঢের। বললেও তো বুলটা ঠাণ্ডা হয় গো। ছেলেমেয়েরা তো বোঝে না ওরা আদর করে এক টেলা মাটি এনে দিলেও মা-বাপের বুক ভরে ওঠে!

কেন্দো না। কান্নার মতো: কিছু হয়েছে নাকি ?

কৃষ্ণ আমার তো খারাপ ছেলে নয়। তার বুকে মায়া-দয়া কিছু কম নয়। কিন্তু ওই গোছো মাগীটাই যে খেল ওকে।

ওভাবে বলতে নেই। তাদের জীবনের ধারা আলাদা, আমাদের সঙ্গে কি বনে ? এসব কথা এখন তুললে আনন্দটো মার্টি হবে।

আচ্ছা, আর বলব না।

টাকাটা তোমার কাছে রাখো।

নয়নতারা হাসল, কেন, তোমার কাছেই থাক না!

ও বাবা! আমি লক্ষ্মীছাড়া মানুষ, আমি টাকা রাখব কি ? কোনদিন রেখেছি নাকি ? যতদিন মা বেঁচে ছিল, টাকা এনে মায়ের হাতে দিয়েছি। মা চলে যাওয়ার পর থেকে তোমার হাতে। টাকা আমার সয় না।

নয়নতারা হেসে বলল, আচ্ছা গো আচ্ছা। কিছুক্ষণ রাখো, রান্নাটা সেরে গিয়ে নিচ্ছি।

এ ঘর যদি কৃষ্ণ পাকা করে দেয় তাহলে আর রেমোর পাকা ঘরে আমাদের না যাওয়াই ভাল। বউমা, বাচ্চারা সব থাকবে খন ওখানে।

সেই বুদ্ধিই ভাল। কিন্তু হুট করে আবার রেমোকে এসব কথা বোলো না। হয়তো মান হবে।

বিষ্ণুপদ মাথাটা একটু নেড়ে বলল, এই তো বুদ্ধি! কিন্তু কেন যে সবসময় বলে বেড়াও যে তোমার নাকি বুদ্ধি নেই।

আহা, এ আবার কী এমন বুদ্ধির কথা হল শুনি!

আমার মাথায় তো আসেনি।

এসব ছোটো কথা তোমার মাথায় না আসাই ভাল। তুমি, আমার ভোলানাথ শিবঠাকুরটি হয়েই থেকো।

শোনো, আমার মাথাতেও ছোটো কথা আসে। কৃষ্ণ তো রেমোকে দিয়ে ঘর করতে চাইছে। কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে ? সে নেশাখোর মানুষ, টাকা হাতে পেলে কি করে না-করে তার ঠিক নেই।

নয়নতারার মুখ শুকালো, ও বাবা! এ কথাটা ভাবিনি তো! ঠিকই বলেছো। কৃষ্ণকে লিখে দাও যেন টাকা আমাদের কাছেই দেয়। তাহলে রাশ থাকবে।

হ্যাঁ। তাকে বাড়ির ঠিকানায় চিঠি দেওয়া বারণ। ইউনিভার্সিটির ঠিকানায় দিতে হবে। নইলে বৌমা আবার—

নয়নতারা একটু হাসল। বলল, ওসব পরে হবে। এখন স্নান করতে যাও। শাক আর ঝোল। হবে না ?

খুব হবে।

কাল বাজারে গিয়ে মাছ এনো। অনেকদিন খাও না। ইদানীং রেমোটার হাতে বোধহয় পয়সা নেই। বাজার-টাজার দেখে মনে হয় টানাটানিতে আছে।

বিষ্ণুপদ স্নানে গেল। শীত শেষ হয়ে আসছে। গায়ে জল ঢালতে আর কষ্ট নেই।

যেতে বসে বড় চমৎকৃত হল বিষ্ণুপদ। ব্যাঙের ছাতার ঝোল দিয়ে ভাত মেখে দু'গ্রাস খেয়ে বলল, এ তো অমৃত! একেবারে মাংসের মতো খেতে লাগে!

নয়নতারা চোখ বড় বড় করে বলে, তাই!

একটু খেয়ে দেখ না।

আচ্ছা তুমি খাও তো। সত্যিই ভাল ?

অপূর্ব জিনিস, এতদিন খাইনি বলে আফসোস হচ্ছে।

অজান জিনিস তো, রাখতে ভয় হত। কেমন লাগবে তোমার কে জানে।

খুবই ভাল জিনিস। সাহেবরা খায়। দামও নাকি খুব।

এবার থেকে তাহলে প্রায়ই রাখব।

খুব রোধো। অতি চমৎকার।

বিষ্ণুপদের উদ্ভাসিত মুখ দেখে নয়নতারা মৃদু মৃদু হাসতে থাকে। এই তার স্বর্গসুখ। আর বেশি সে কিছু চায় না।

দুপুরে দুজনে পাঁচশো টাকা নিয়ে বসল খরচের আগাম হিসেব কষতে। অনেক দিন এক সঙ্গে এত টাকা হাতে পায়নি তারা। কী করবে তা পরামর্শ করতে বসে একটু ছেলেমানুষ হয়ে গেল দুজনেই।

বিষ্ণুপদ বলল, কিছু তেল কিনে রাখো। তেল প্রায়ই ফুরিয়ে যায়।

না না। তেল খেয়ে শরীর খারাপ করবে নাকি ? তোমার লুঙ্গি দুটো তো ছিড়েছে। একজোড়া ভাল দেখে কিনতে হবে। একখানা গেঞ্জিও।

আরে পাঁচশো টাকা তো মেলা টাকা। লুঙ্গি ছাড়াও অন্য জিনিস কেনা যাবে। আমার পুরোনো লুঙ্গিতেই চলে যাচ্ছে।

শোনো, আমাদের বালিশ তোরকের অবস্থা দেখেছো ? তুলো জমে জমে আর তেলচিটে হয়ে একেবারে ছোটোলাকি চেহারা। বালিশ দুটো তো ইটের মতো শক্ত। এসব করলে একটু আরাম করে শোয়া যায়।

বিছানা! পুরোনো বিছানায় শোয়া অভ্যাস। বেশি নরম হলে আবার হয়তো ঘুম হবে না।

তাহলে টাকাটা দিয়ে করবোটা কী ?

দুজনেই খানিক ভাবল। তারপর বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বরং মাঝে মাঝে একটু ভাল-মন্দ খাওয়া-দাওয়া হোক। বাকি টাকাটা রেখে দাও।

নয়নতারা একটু স্নান হেসে বলে, তাই হবে। কিন্তু টাকা পুষে রেখে আমাদের কী লাভ বোলো তো! কে কবে আছি, কবে নেই, টাকাগুলো বেহাত হয়ে যাবে।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, তা ঠিক। কিন্তু তবু হাতে টাকা থাকলে মনে একটু বল ভরসা হয়। এখন রেমো যদি

বাজার-হাট না করতে পারে তাহলেও আমরা চালিয়ে নিতে পারব।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ।

ঘরটা যদি সত্যিই পাকা করে দেয় কৃষ্ণ তাহলে কত ভাল হবে বলো তো!

খুব ভাল। বর্ষার জল পড়় ঘর ভেসে যায়। শীতে ফুটো ফাটা দিয়ে হাওয়া ঢোকে। দরজা জানালার অবস্থাও তো ঝুরঝুরে।

দুজনোর চোখেই একটা আশার আলো। একটা আনন্দের অনুভূতি আজ দুপুরটাকে বড্ড ফুরফুরে করে দিয়েছে।

নয়নতারা বলল, হ্যাঁ গো, বামা আর শ্যামলী যে এত ঝগড়া করে গেল, ওদের ফিরিয়ে আনা যায় না?

আনতে চাও?

কি জানো, কেমন একটা কষ্ট হচ্ছে। বামাটা তো ষণ্ডা গুণ্ডা নয়। সে এমনিতে নিরীহ। সেদিন রেগে গিয়ে দা নিয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু সে অত খারাপ নয়। মারধর খেল। বউমা গালমন্দ করলেও বামা কিন্তু শেষতক কিছু বলেনি। চুপটি করে ছিল।

তোমার হল মায়ের মন।

একটা ভয় খাই, জানো? শ্যামলী বাপের বাড়ি গিয়ে তো ঘোঁট পাকাবে। তারপর রেমোর পিছনে পুলিশ লাগাবে। গুণ্ডাদেরও লেলিয়ে দিতে পারে। শেষ অবধি খুনোখুনি না হয়। তার চেয়ে আপসে মিটে গেলে হয় না?

বিষ্ণুপদ একটু চুপ করে থেকে বলল, দুনিয়াসুদ্ধ যত ঝগড়া-কাজিয়া তার কটা আপসে মিটেছে বলো তো!

এ ঝগড়া মিটলেও বাইরে বাইরে মিটবে, ভিতরে ভিতরে শত্রুতা থেকে যাবে। তবে লোভ দেখালে বামা ফিরতেও পারে। সে আমাদের ঘরখানা চেয়েছিল। এখন ঘরখানা পাকা হবে ওনলে সে লোভে পড়তে পারে।

নয়নতারা চুপ করে রইল। মুখখানা মলিন। কিছুক্ষণ পর বলল, শ্যামলী যে-সব কথা বলে গেল তা কি কেউ উদ্ধারণ করতে পারে, বলো! আমাকে বেশাও বলেছে, তোমাকে ... উঃ, সে কথা ভাবলে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে।

কথাই তো! কথার আর কী দাম বলো। এ যুগে সব দূষিত কথা লোকের মুখে মুখে এত ফিরছে যে কথাগুলোর ধার কমে গেছে। কেউ গায়ে মাখে না।

আমি তো কখনও এ সংসারে এইসব কথা কারও মুখে শুনিনি। এক রেমা মাতাল হয়ে এসে যখন চোঁচামেটি করে। তা সে মাতালের কথা। সে তো ধরতে নেই।

ভোলো, নয়নতারা, সব ভোলো। এই বয়সে আর কিছু শোধবোধ করতে পারবে না। লাখি খেলেও হজম করে যেতে হবে। ভুলে যাওয়াই ভাল। দশটা টাকা দেবে?

কী করবে?

নিতাইয়ের দোকানে বিকলে রসগোল্লা হয়। গরম রসগোল্লা নিয়ে আসি গে। তারপর বুড়োবুড়ি বসে বসে খাই।

নয়নতারা একশ টাকার একখানা নোট এগিয়ে দিয়ে বলে, ভাঙিয়ে নিয়ে এসো। টাকা ফেরত নিতে ভুল করো না।

বিষ্ণুপদ হাসে, ছেলেমানুষ পেলো নাকি?

ছেলেমানুষ ছাড়া কি? ভোলানাথ শিবঠাকুর।

॥ ৭৯ ॥

দাদার সঙ্গে সম্পর্কটা কি খারাপ হয়ে গেল। অমন তার চরিত্র নিয়ে তাকে আর অনিন্দিতাকে জড়িয়ে কুৎসিত ইঙ্গিত করেছে, চড় মেরেছে—এ সবই যেন এই চিলেকোঠায় বাস করার বিনিময়ে সে ভুলে যেতে পারে। চয়নের মনে হয় এ বাসা থেকে উৎখাত হলে তার আর আশ্রয় বলে কিছু থাকবে না।

অনিন্দিতাদের সঙ্গে বউদির আজকাল একটু-আধটু ঝগড়া হচ্ছে প্রায়ই। জল নিয়ে, ময়লা ফেলা নিয়ে, ছাদে যাওয়া নিয়ে। ঝগড়ার জন্য খুব গুরুতর কারণের দরকারও হয় না। ঝগড়াটাই যখন আসল তখন কারণ একটা বের করে নিলেই হয়।

অনিন্দিতা আজকাল ছাদে আসে না। চয়নের সঙ্গে দেখাও হচ্ছে না গত কয়েকদিন। একদিক থেকে ভালই। সম্পর্কটা এইভাবে শেষ হয়ে যাক। সম্পর্ক ছিলও না তেমন, একটা ক্ষীণ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল মাত্র। তার মধ্যে একটু বৈদ্যুতিক ঘটনা ঘটেছিল তাকে নিয়ে অনিন্দিতার 'তুমি' বলানো, কিন্তু সেটাও গুরুতর কিছু নয়। অনিন্দিতা তো পাগল নয় যে, তার সঙ্গে প্রেম করতে চাইবে।

তবু অবস্থাটা একটু অনিশ্চিত, অমন তাকে বাসা ছাড়তে বলেছে। কিন্তু রাগের মাথায় বলা, সেটাকে গুরুত্ব দেওয়ার মানে হয় না। ছাদের এই চিলেকোঠা নিশ্চয়ই ভাড়া দেবে না ওরা। হয়তো রাগ পড়ে গেলে কথাটা মনেও থাকবে না অয়নের। তবু এতসব ভেবেও নিশ্চিত হতে পারে না চয়ন। দৃষ্টান্তর একটা কাঁটা সর্বদা খচখচ করে।

একদিন বিকালে টিউশনিতে বেরোচ্ছিল চয়ন, সদর দরজার বাইরে গলির মধ্যে অনিন্দিতার বাবার সঙ্গে দেখা।

ভারাক্রান্ত মুখ, হাসি নেই। ওর মধ্যেই জোর করে একটু হেসে বললেন, বেরোচ্ছ নাকি?

চয়ন বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

বড় অশান্তি চলছে, বুঝলে?

অশান্তি যে চলছে তা চয়ন জানে। কিন্তু তার তো কিছু বলার নেই।

ভদ্রলোক চয়নের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল চয়ন। সময় হবে?

চয়ন মৃদুস্বরে বলল, হবে। বলুন না!

কোথায় বেরোচ্ছিল যেন, দেরি হয়ে যাবে না তো!

তাড়া নেই। টিউশনিতে যাচ্ছিলাম।

অনিন্দিতার বাবা গলির মুখ অবধি কথাটা ভাঙলেন না। বড় রাস্তায় অসংখ্য লোক চলাচল ও ট্রামবাসের শব্দের মধ্যে এসে নিশ্চিন্ত মনে বললেন, এখানে বলা যায়।

বাস্তবিকই তাই, কলকাতার রাজপথই গোপন কথা বলার সবচেয়ে ভাল জায়গা। চয়ন দাঁড়িয়ে বলল, বলুন।

কথাটা জিজ্ঞেস করতে একটু সন্কোচ হচ্ছে। অনিন্দিতার কাছ থেকে কথা বের করার উপায় নেই। বড় ভয় পাই ওকে।
কি কথা ?

তোমার দাদা-বউদি আকারে ইস্তিতে বলতে চাইছে যে, তোমার সঙ্গে অনিন্দিতার একটা সম্পর্ক হয়েছে। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

চয়ন মূদু হেসে বলল, না মেসোমশাই। ওসব কথা মিথ্যা করে রটানো হচ্ছে। সত্যি নয়।

ভদ্রলোক তার মুখের দিকে স্তিমিত চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, আজকাল ছেলেরা আর মেয়েরা তো আখছার মেলামেশা করে। এটাকে একটা ইসু করে তোলাটা কি ঠিক ? তোমার দাদা এই কারণ দেখিয়ে আমাদের তুলে দিতে চাইছে।

চয়নের মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভদ্রলোকের অবস্থা সে জানে। বাসা বদলানো ঐর পক্ষে শক্ত ব্যাপার। সে মূদু স্বরে বলল, আপনারা বুঝিয়ে বলুন যে ওদের সন্দেহটা সত্যি নয়।

মাথা নেড়ে অনিন্দিতার বাবা বললেন, মানুষ যখন গৌ ধরে তখন কিছুই বুঝতে চায় না। তোমাকে নাকি একদিন চড়ও মেরেছে শুনলাম। অত্যন্ত অন্যায়। ছিঃ।

চয়ন বলে, আমার জন্য ভাববেন না। আমি তো ভুলেই গেছি।

ভদ্রলোক ঘন ঘন মাথা নেড়ে বললেন, অনিন্দিতারও উচিত হয়নি তোমাকে বিপন্ন করা। তোমার অসুখের সময় যখন মা-মেয়ে সেবা করতে এল তখনও আমি বারণ করেছিলাম। বলেছিলাম, চয়নের দাদা-বউদি থাকতে তোমরা আগ বাড়িয়ে ওদের ডিঙিয়ে এসব করছ কেন ? কিন্তু ফ্যামিলিতে আমার তো ভয়স নেই। আমার মতামত বুদ্ধি পরামর্শকে ওরা গ্রাহ্যই করে না।

যা হওয়ার হয়ে গেছে, ও নিয়ে ভেবে আর কী করবেন ?

ভাবনা কি ছাড়ে ? দুখানা স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘরের জন্য মাসে আটশো টাকা ভাড়া দিচ্ছি। তাও সম্ভাব্য। এর কমে অদৃষ্ট বাসা তো পাওয়া যাবে না। আমার হার্ড আর্নড মানি। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সামান্য টাকা আর নামমাত্র পেনশন ভরসা। তা ভেঙেই চলছে। দিন দিন ব্যাক্তের টাকা কমছে। বড় ভয় হয়।

আপনি অত ভাববেন না, বরং বাড়িটা করে ফেলুন।

বাড়ি! বাড়ি করতে সব টাকা বেরিয়ে যাবে। খাবো কি ? আমি তো তোমার মাসিমাকে বলেছিলাম, টিনের ঘর তুলে থাকি চলো। তা তাতে মা-মেয়ের ঘোর আপত্তি। পাকা বাড়ি ছাড়া নাকি তাদের হবে না। মেয়েটার বিয়েরও তো খরচ আছে ?

চয়ন ভেবে পেল না, এই ভদ্রলোককে সে এবার কী পরামর্শ দেবে। সে মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

উনি বললেন, তোমার মাসিমা বা আমার শরীরও ভাল নয়। টুকটাক ডাক্তার বন্দি ওষুধবিসুধের জন্যও টাকা বেরিয়ে যায়। আয় কমেছে, কিন্তু ব্যয় তো আর কমেছে না।

চয়ন চুপ করে রইল, স্বগতোক্তির তো জবাব দেওয়ার দরকার হয় না।

ভদ্রলোক চশমাজোড়া চয়নের দিকে তাক করে মেনোনা গলায় বললেন, সব সমস্যার সমাধান হয় না জানি। তবু যখন যেটা দেখা দেয় সেটাই যেন আজকাল বড় কহিল করে ফেলে আমাকে। ঐই যে বাড়ি ছাড়ার জন্য হুড়ো দিচ্ছে, আমার রাতে ভাল ঘুম হচ্ছে না, প্রেসার বেড়ে গেছে, খাওয়ায় রুচি নেই। অথচ কত ভাড়াটে তো বাড়িওলার সঙ্গে যুক্ত আছে। আমি কাঁটা হয়ে আছি।

চয়ন এ কথারও জবাব খুঁজে পেল না।

শুনলাম, তোমাকেও নাকি তাড়াবে। সত্যি নাকি ?

চয়ন অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে বলল, বলেছিল একবার।

তাহলে এখন তুমি কি করবে ?

কী করব তা তো জানি না, ঠিক করিনি।

তোমার মাসিমা আর অনিন্দিতা তো বলছে, তারা ছেড়ে দেবে না। দরকার হলে মামলা-মোকদ্দমা অবধি করবে। আমি এসব শুনে বড় ভয় পাচ্ছি। ব্রী-বুদ্ধি বড় ভয়াবহ।

এবার চয়ন খুব সাবধানে বলল, অনিন্দিতা কিন্তু বেশ সাহসী মেয়ে। আপনি ওর ওপর নির্ভর করতে পারেন।

নির্ভর করব ? বোলো কি ? এ যুগে সাহসের কোনও দাম আছে ?

চয়ন একটা শ্বাস ফেলে বলে, আমি বড় ভীতু মেসোমশাই, আপনাদের চেয়েও ভীতু। কিন্তু কারও সাহস দেখলে আমার বড় ভাল লাগে।

ভদ্রলোক কথাটা শুনে সন্তুষ্ট হলেন না। মাথা নেড়ে বললেন, মেয়েদের সাহস ভাল জিনিস নয়। অনিন্দিতার সাহসের কথা বলছ! ওকে সাহস বলে না, অনিন্দিতা বেপরোয়া। ওতেই তো অশান্তি হয়। কাউকে মান্যগণ্য না করা কি ভাল ?

চয়ন ফের সতর্কভাবে বলল, মেসোমশাই, আপনাদের যা অবস্থা আমারও তো তাই, ভেবে কী হবে ? আপনারাও শুনেছি বউদির আত্মীয়।

ভদ্রলোক মুখটা একটু বিকৃত করে বললেন, আত্মীয়তা যেটুকু সেটুকু না ধরলেও হয়। আজকাল কেউ আত্মীয়তা মানে নাকি ? তোমাকে আর একটা কথা বলার ছিল, বলতে একটু লজ্জা পাচ্ছি।

বলুন না, আমাকে লজ্জা কিসের ?

ভদ্রলোক একটু কাছে এগিয়ে এসে চাপা গলায় বললেন, আমার একটা কথা মনে হয়, বলব ?

চয়নের বুকটা এবার একটু কেঁপে উঠল, মৃদু একটা শ্বাসকষ্টও টের পেতে লাগল সে। বোধ হয় এ কথাটা বলার জন্যই এত ভূমিকা, হঠাৎ চয়নের মাথার ভিতর একঝলক আলোর উদ্ভাস যেন তাকে জানিয়ে দিল, কথাটা কী। তবু সে অপেক্ষা করল, বিনয় এবং ধৈর্যের সঙ্গে।

ভদ্রলোক মুখটা তার কানের খুব কাছাকাছি এনে বললেন, আমার মনে হয় তোমাকে অনিন্দিতার খুব পছন্দ।
চয়নের কান গরম হল, শ্বাসকষ্ট বাড়ল। তবু সে নিপাট ভালমানুষের মতো বলল, হ্যাঁ। অনিন্দিতা আমাকে বন্ধু বলে মনে করে।

ভদ্রলোক এ জবাবে খুশি হলেন না। ঘন ঘন মাথা নাড়া দিয়ে বললেন, সে ব্যাপার নয়। ওর ছেলে বন্ধু তো আরও ছিল। তোমার প্রতি ওর মনোভাব একটু ডিপ। বুঝছ না?

না তো! চয়ন খুবই বিশ্বয় প্রকাশ করে।

ওর বোধ হয় হচ্ছে তোমার সঙ্গেই ঘর বাঁধে।

চয়ন জোর করে নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে, কিছুটা সফলও হয়, মৃদু হেসে বলে, অনিন্দিতা বুদ্ধিমতী, এরকম চিন্তা সে স্বপ্নেও করবে না।

দেন্ন বলে! তো! দোষটা কোথায়?

ঘর বাঁধা তো বিলাসিতা নয় মেসোমশাই। তার পেছনেও অনেক ব্যাপার থাকে। আপনি তো নিজেই জানেন কত সমস্যা! আমরা দিন কাটাই। আমার চালচলো নেই, টিউশনি সফল, আমাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন নিতান্ত আহাম্যকেও দেখেছে না। আপনি তুল বুঝেছেন মেসোমশাই।

ভদ্রলোক কথাটা স্বীকার করতে চাইলেন না, বললেন, ওটা কোনও কথা নয়। তোমার মধ্যে গুণও কিছু কম নেই, একদিন দাঁড়িয়ে যাবে। আর ফিটের ব্যামো? ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা বলে, ওতে বিয়ে সাদী চলতে পারে।

আপনারা অনেক দূর ভেবে ফেলেছেন, কিন্তু ওসব ভাবতেই আমার সংকোচ হয়, লজ্জাও হয়।

অনিন্দিতার বাবা মুখখানা কানের কাছ বরাবর রেখেই বললেন, আমি তো এর মধ্যে লজ্জার কিছু দেখছি না। অনিন্দিতার ভাবগতিক দেখে মনে হয়, ওর আগ্রহ আছে। তোমার শুধু একটু আত্মবিশ্বাসের দরকার।

চয়ন একটা হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আপনি বাড়ি যান মেসোমশাই, এ নিয়ে আর ভাববেন না। আমি বড় অপরাধী।

দাঁড়াও। কথাটা এখনও শেষ হয়নি। আমার পরিবার তো দেখেছে। তিন জনের সংসার। আমার ছেলেও নেই। আমার খুব মনে হয়, সংসারটা যেন অসম্পূর্ণ, আর একজন কাউকে যেন দরকার ছিল ফাঁকাটা ভরাট করতে। এদিকে তোমারও তো আসলে কেউ নেই। তোমারও একটা স্থায়ী এবং নিরাপদ আশ্রয় দরকার। যদি অনিন্দিতাকে বিয়ে করো তাহলে আমরা চার জন মিলেমিশে বেশ থাকতে পারব। আমাদের বড় জনের অভাব। যদি এর মধ্যে ঘরজামাই প্রথার কথা মনে হয় তাহলে সেটা ভুল হবে। অস্তিত্বের সংকটেই আমাদের একসঙ্গে থাকাটা দরকার। তোমাকেও দেখাশোনা করার লোক হবে। যদি রাজি থাকো তাহলে আমি হাতের পাতের যা আছে সব দিয়ে জমিতে একখানা বাড়ি তুলি। তারপর চার জন নিশ্চিন্তে গিয়ে সেখানে থাকি।

চয়ন ম্লান একটু হেসে বলল, আপনি কি অনিন্দিতার সঙ্গে কথা বলেছেন?

সরাসরি নয়। তবে হবেভাবে বুঝেছি।

আপনি আরও একটু ভাবুন। অনিন্দিতার সঙ্গে কথাও বলুন।

সে না হয় বলব, কিন্তু তোমার মনোভাবটা আগে জানা দরকার।

আমাকেও একটু সময় দিন।

আমার মনে হয় কি জানো? তোমাদের বিয়ে হলে সব সমস্যার সূট একটা সমাধান হয়ে যায়।

সমস্যার সমাধান! কি জানি, হয়তো নতুন সমস্যাই হবে একটা।

না না, কোথাও সমস্যা হবে না। তুমি একটু পজিটিভিভি ভাবে। নেগেটিভ ভাবলে কিছুই হতে চায় না।

ভাবব, এখন তবে আমি যাই?

এসো গিয়ে।

একা হতে পেরে চয়ন হাঁফ ছাড়ল। তারপর গভীরভাবে চিন্তিত হয়ে পড়ল।

তার চিন্তান্বিত মুখ দেখে আজ মোহিনীও জিজ্ঞেস করল, চয়নদা, আপনার শরীর আবার খারাপ করেনি তো!

না, ঠিক আছে।

তবে মুখ অত শুকনো কেন?

চয়ন একটু হেসে বলল, দুনিয়াটা একটা পাগলা, না?

বাঃ রে, তার মানে কী হল?

মানে! না, এর কোনও মানে নেই।

আপনি ঠিক আমার বাবার মতো হয়ে যাচ্ছেন। বাবাও মাঝে মাঝে অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথা বলে।

চয়ন একটু লজ্জা পেয়ে বলে, তাই নাকি?

মোহিনী হেসে ফেলে বলল, কাল রাতেই তো, খাওয়ার টেবিলে সবাই চুপচাপ বসে খাচ্ছি, বাবা হঠাৎ বলে উঠল, আজকে আমার মনের মাঝে ধাঁধা ধাপধাপ তবলা বাজে। আমরা তো অবাক!

চয়ন লজ্জিত মুখে চুপ করে রইল। কিন্তু পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে তার বুক কেঁপে কেঁপে ওঠে মাঝে মাঝে। একটু যেন শ্বাসকষ্ট হয়। বারবার আনমনা হয়ে যায় সে। তাকে নিয়ে এসব কী হচ্ছে?

পড়ানোর এক ফাঁকে চয়ন হঠাৎ বলল, ভীতু আর দুর্বলদের একটা অসুবিধে কি জানো ? তারা ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তাদের দিয়ে যে যা-খুশি করিয়ে নেয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ওরে ভীকু, তোর ওপরে নেই ভুবনের ভার।

মোহিনী হেসে ফেলল, চয়নদা, আজ নিশ্চয়ই একটা সিরিয়াস ঘটনা ঘটেছে, তাই না ? আজ আপনি ভীষণ আনমাইওফুল, কী হয়েছে ?

চয়ন মাথা নেড়ে বলল, বলা যায় না।

তাহলে বলবেন না, কিন্তু রাস্তায়-ঘাটে আজ একটু সাবধান থাকবেন। অত আনমাইওফুল হলে একটা অ্যান্ড্রিডেন্ট হয়ে যেতে পারে।

না, তা হবে না। তবে আজ আমি একটু চঞ্চল ঠিকই।

চয়ন উঠতে যাচ্ছিল, মোহিনী বলে উঠল, দাঁড়ান চয়নদা, আপনাকে যে চা দেওয়া হয়নি।

তাতে কি ? আজ থাক।

না না, বসুন, আজ মা বাড়ি নেই, বাবার সঙ্গে একটা রিসেশনে গেছে। আমাকে বলে গেছে যেন আপনাকে চা-টা দিই। দেওয়া হয়নি ওনলে মা ভীষণ বকবে। বসুন।

মোহিনী উঠে গেলো চয়ন চুপ করে বসে রইল। মনের ভিতরে একটা উত্থাপাখাল হচ্ছে। ভয় হচ্ছে, তার ভয়, সে প্রতিরোধহীন, বিয়ে করার প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু অনিন্দিতার বাবা যদি জোরজবদস্তি শুরু করে, যদি নানারকম কৌশলের আশ্রয় নেয়, তাহলে ? যদি প্রতিরোধ ভেঙে যায় তার ?

ডোরবেল বাজাল। দরজা খুলল। করিডোরে পায়ের শব্দ আর একঝলক বিদেশি পারফিউমের সুবাস ভেসে এল। পড়ার ঘরের দরজাটা খোলাই ছিল রিয়া উকি দিয়ে বলল, চয়ন একা বসে কেন ?

তটস্থ হয়ে চয়ন বলে, মোহিনী বসিয়ে রেখে গেল।

রিয়ার পিছনে কুম্ভজীবন, হাতে মস্ত ফুলের তোড়া আর একটা বড়সড় ঝলমলে সোনালি রঙের বাস্র। বলল, চয়ন নাকি ? কী খবর তোমার ? অনেকদিন দেখা নেই।

চয়ন শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল, আজ্ঞে ভালই।

কুম্ভজীবন আর রিয়া ঘরে ঢুকল, কুম্ভজীবন চারদিকটা চেয়ে দেখে অকারণেই বলে উঠল, বাঃ।

কেন বাঃ, কিসের বাঃ, তা বুঝতে পারল না চয়ন। কুম্ভজীবন হঠাৎ ফুলের তোড়া আর বাস্রটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, নাও, এগুলো তোমার।

চয়ন প্রচণ্ড অবাক হয়ে বলে, আমার!

নাও নাও।

আজ্ঞে আমি! বলে সঙ্কুচিত হাতে ফুলের তোড়া আর প্যাকেটটা নিল চয়ন। রীতিমতো ভারী দুটোই।

কুম্ভজীবন উদার হাসি হেসে বলল, উপহারে উপহারে আমি জর্জরিত। আর উপহার রাখার প্রয়োজন নেই। ওটা তুমি নিয়ে যাও। কোনও সুইটহার্ট থাকলে ফুলের তোড়াটা তাকে দিও। আর বাস্রের মধ্যে কী আছে তা আমিও জানি না। বাড়িতে গিয়ে খুলে দেখো, উইস ইউ এ গুড লাক।

রিয়া বলল, নাও চয়ন। লজ্জার কিছু নেই। চা-টা কিছু খাওনি এখনও ?

মোহিনী চা করতেই গেল।

তাহলে বোসো একটু। ওগো তুমি একটু চয়নের সঙ্গে কথা বলো, আমি একটু দেখে আসি মেয়েটা কী করছে।

কুম্ভজীবন বসল। এই সুপুরুষ, মহাপণ্ডিত এবং বিখ্যাত মানুষটির সামনে চয়ন বরাবরই অস্বস্তি বোধ করে। সে শুনেছে, এর একথানা বই ডারলিং আর্থ খুব হইচই ফেলে দিয়েছে বিদেশে। তাতে সে আরও সংকুচিত বোধ করে। নিজের সামান্যতা নিয়ে সে সর্বদাই বিব্রত।

কুম্ভজীবন বলল, তোমার একটা পারিবারিক অশান্তি ছিল না ? ডিটেলস্ ডুলে গেছি, বোধ হয় তোমার দাদার সঙ্গে গণ্ডগোল। সেটা কি এখনও আছে ?

চয়ন লজ্জায় মরে গিয়ে বলল, মা মারা যাওয়ার পর থেকে সম্পর্কটা ততটা খারাপ নেই।

ভাল। খুব ভাল। তাহলে মা ছিল দি স্টারলিং ব্লক ? বলে খুব হাঃ হাঃ করে হাসল। হাসি থামিয়ে বলল, চারদিকে খুব ভাগাভাগি ছড়ণ পড়েছে, দেখেছ ? সবাই ভাগ হতে চায়। স্বামী স্ত্রী চায়, মা-বাপের সঙ্গে সন্তান ভাগ হতে চায়, ভাইয়ে বোনে ভাগ হতে চায়। এমন কি দেশের নানা মানবগোষ্ঠীও চায় ভাগাভাগি করে আলাদা রট্টা তৈরি করতে। হাওয়ায় এ এক নতুন জীবাণু ঢুকেছে। সম্প্রীতি সংহতির কথা বলে আর কী লাভ বোলা তো! ওসব কথায় কেউ কানই দিচ্ছে না। মেয়েরাও বোধ হয় ভাগ হতে চাইছে। নারী স্বাধীনতা নিয়ে কী বিরাট হইচই!

চয়ন মাথা নেড়ে বলে, যে আজ্ঞে।

কুম্ভজীবন খানিকক্ষণ আনমনে একটা ক্যাবিনেটের দিকে চেয়ে থেকে বিভ্রিবিড় করে বলল, মানুষ ধীরে ধীরে বড় চিন্তা করতে ভুলে যাবে। চিন্তারাজ্যও খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে তার। সে ছোট করে ভাবতে শুরু করবে। ছোট ছোট কথা ভাববে। মানুষ কি খুব স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছে চয়ন ?

চয়ন একটু বিব্রত হয়ে বলে, যে আজ্ঞে।

কুম্ভজীবন হতাশায় একটু মাথা নাড়া দিয়ে বলে, আমার সংসারেও অনেক অশান্তি, আমার মা-বাবা এখনও বেঁচে আছেন। কিন্তু সে এক অদ্ভুত বেঁচে থাকা। দু' ভাইয়ের প্রচণ্ড ঝগড়া। এক ভাই আলাদা হয়ে গেছে—কেন এসব হয় বোলা তো!

কঠিন প্রশ্ন। চয়ন বিনীতভাবে চুপ করে থাকে।

কৃষ্ণজীবন মাথা নেড়ে বলে, কি মনে হয় জানো ? মানুষের কোনও গন্তব্য নেই, শুধু গতি আছে। সে কোথায় চলেছে তা সে জানেই না।

যে আক্ষেপে।

এরপর এক গভীর অনমনস্কতায় ডুবে রইল কৃষ্ণজীবন। চয়নকে ভুলেই গেল বোধ হয়। মিনিট পাঁচেক এই মানসিক অনুপ্রস্থিতির পর স্বপ্রাণিত্বের মতো মাথা তুলে কৃষ্ণজীবন তার দিকে চেয়ে বলল, ওঃ হো, তোমাকে একটা কথা বলাই হয়নি। আমার এক ছাত্র মস্ত এক কোম্পানির বড় কর্তা, তাকে তোমার কথা বলেছিলাম। সে তোমাকে দেখা করতে বলেছে। কিন্তু সে তো বোধ হয় মাস দুই আগের কথা। ভুলেই গিয়েছিলাম।

চয়নের বুক দুর্দুর্দুর করে উঠল। কিছু বলল না।

কৃষ্ণজীবন একটা শ্বাস ফেলে বলল, দেখ, আমার কাছে তোমার চাকরিটা এতই সামান্য ব্যাপার যে মনেই ছিল না। অথচ তোমার কাছে ব্যাপারটা বড় গুরুতর। কেন যে আজকাল আমার এমন সব ভুল হয়!

চয়ন বিনয়ের সঙ্গে বলল, তাতে কি ? আমি না হয় তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করব।

হ্যাঁ হ্যাঁ, বোধ হয় খুব দেরি হয়ে যায়নি। খুব বড় কোম্পানি! সবসময়ে লোক দরকার হয়। তুমি বোসো, আমি একটা চিঠি দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। কালই দেখা করো।

যে আক্ষেপে।

বিশাল উপহারের বাস্কে, ফুলের তোড়া এবং পকেটে কৃষ্ণজীবনের চিঠি নিয়ে চয়ন যখন বাড়ি ফিরল তখনও সে বুঝতে পারছিল না, আজকের দিনটা তার ভাল গেল না খারাপ! এক দিনে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে যাওয়ায় সে একটু বেসামাল বোধ করছে। মাতালের মতো।

তালা খুলে ঘরে ঢুকে সে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। ঘটনাগুলো বাস্তব কি না একটু সন্দেহ হচ্ছিল তার।

স্টোভ জ্বেলে যখন রান্না করতে বসেছে চয়ন, তখনই হঠাৎ মনে হল, অক্ষকার ছাদে জলের ট্যাঙ্কের পাশে কেউ দাঁড়িয়ে, তার দিকেই মুখ।

চয়ন তাকাতোই অনিন্দিতা চাপা গলায় বলল, অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি। চয়নের হাত পা হিম হয়ে গেল আজ। অনিন্দিতাকে তার তো ভয় পাওয়ার কথা নয়।

অনিন্দিতা এগিয়ে এল কাছে। বলল, বাবা তোমাকে আজ কী বলেছে বোলা তো ?

চয়ন লজ্জায় গুটিয়ে গিয়ে বলল, ও কিছু নয়।

বাবার মাথাটাই গেছে। কী সব আবোল-তাবোল ভাবে, প্র্যান করে, তার ঠিক নেই। তুমি বাবাকে সিরিয়াসলি নিও না।

চয়ন চুপ করে রইল।

এ কথাটা বলার জন্যই আজ রিক নিয়েও ছাদে এসেছি। তোমার দাদা-বউদি আমাদের ছাদে আসা বন্ধ করেছে, জানো তো ?

জানি।

তবু বাবার জন্যই আসতে হল। বাবাকে নিয়ে আমাদের অনেক সমস্যা পড়তে হয়। কিছু মনে করো না।

চয়ন হঠাৎ বলল, অনিন্দিতা, একটা জিনিস নেবে ? বলেই ফুলের তোড়া আর উপহারের বাস্কেটা ঘর থেকে এনে তাকে দিয়ে বলল, নিয়ে যাও।

এ কী ? এ দিয়ে কি হবে ?

নাও। নিলে আমার ভাল লাগবে।

অনিন্দিতা তার সুন্দর দাঁতে চমৎকার হাসল, আচ্ছা নিলাম।

॥ ৮০ ॥

চিঠিটা এল দুপুরে। মুখ আঁটা একটা খাম। হাতের লেখা অচেনা। বীণার ঠিকানায় চিঠি আসেও না বড় একটা। ন' মাসে ছ মাসে বিষ্ণুপুর থেকে মা কিংবা বাবা লেখে।

চিঠিটা খুলে বীণা খানিকক্ষণ বজ্রাহতের মতো বসে রইল।

নিমাই লিখেছে : কল্যাণীয়াসু, শ্রীভগবানের পাদপদ্মে তোমার কুশল কামনা করি। হয়তো পত্র পাইয়া অবাক হইবে। তোমার নাটকের দলের একটি ছেলের নাম সজল রায় দিনকতক আগে আসিয়াছিল। তোমার সম্পর্কে আমার দাবি-দাওয়া কর্তৃক তাহা জানিতে চায়। সে তৃতীয় ব্যক্তি, তাহার কাছে কী বলিব ? কিন্তু তাহার অগ্রহ ও ব্যস্ততা দেখিয়া মনে হইল, ইহার পিছনে অন্য কারণ আছে। বীণা, সজলকে পাঠাইলে কেন ? তোমাকে তো আমার অধীনস্থ কখনও থাকিতে হয় নাই। আমিই তো তোমার অনুদাস ছিলাম। কোন বাঁধনে তোমাকে বাঁধিব ? আমার না আছে জোর, না যোগ্যতা। তোমার বন্ধন তো কখনও ছিল না। বহুকাল আগেই তোমাকে বলিয়াছি, আমাকে ছাড়িয়া যদি অন্য কাহাকেও বিবাহ কর তাহাতে আমার অপমান হইবে না। আমার কোনও স্বত্ব-স্বামীত্ব নাই। তবু যদি আদালতের রায় প্রয়োজন হয় তবে পত্রপাঠ সেই ব্যবস্থা করিও। আমি আইনের বন্ধনটুকু খুলিয়া দিতে সাহায্য করিব। আমরা যে স্তরের মানুষ সেই স্তরের মানুষের কাছে আইন আদালতের প্রয়োজন হয় না। মোটা অপরাধ না করিলে দেশের আইন আমাদের স্পর্শ করিবে না। তোমার ও আমার বিবাহের কোনও দলিল নাই। সাক্ষীসাবুদও নগণ্য। তাহার চেয়েও বড় কথা আমার দিক হইতে তুমি সম্পূর্ণ মুক্ত। নিমাই অপদার্থ হইলেও, মিথ্যাবাদী নহে। নিশ্চিন্ত থাকিও। সজলবাবুর অগ্রহ দেখিয়া নিজেই তোমাকে সব জানাইয়া দিলাম। সর্বদাই তোমার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করি। শুভকামনা জানাইয়া রাখিলাম। অনর্থক আমাকে বাধা কল্পনা করিয়া পিতৃত্ব হইও না। ইতি নিমাইচরণ রায়।

বীণা চিঠিটা বার কয়েক পড়ল। কেন পড়ল এবং বারবার পড়েও যেন একটা সংকটবাক্য কেন উদ্ধার করতে পারল না তা নিজেও বুঝতে পারল না। ভরদুপুরে বন্ধ ঘরের মধ্যে বিছানায় অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। সজল গিয়েছিল তা সে জানে। এসে বলেছিল, বীণা, তোমার হাজ্যবাড়ের সঙ্গে আলাপ করে এলাম।

বীণা একটু অবাক হয়ে বলল, কেন?

এমনিই। মানুষটা কেমন তা একটু জরিপ করে এলাম।

তার কোনও দরকার ছিল কি?

আমার ছিল।

কেন, সেটা বলবে তো?

সজল একটু হেসে বলল, কেন বোকা সাজছ? কেন গিয়েছিলাম তা তুমি জানো।

বীণা একটু চুপ করে থেকে বলল, কী বলেছে ও?

তেমন কিছু নয়। তবে সে তোমাকে মনে মনে তাগ করেছে। ডিভোর্স দিতে রাজি।

সেটা আমি জানি।

তুমি কি মন থেকে ওকে ছাড়তে পারোনি এখনও?

বীণা একটু ভেবে বলল, তা হয়তো পেরেছি। কিন্তু বাড়াবাড়ির দরকার ছিল না। আমার কোনও কাজে বাধা দেওয়ার সাহস ওর নেই। আমি যখন যা খুশি করব, ওর অনুমতি বা মতামতের দরকার আমার হয় না। তুমি ওর কাছে গিয়ে বরং আমাকেই অপমান করেছে।

যাঃ, এ তো উল্টো কথা শুনিছ!

উল্টো নয় সজল। আমি তো কারও ক্রীতদাসী নই।

তা তো নও জানি।

না, জানো না। জানলে ওর কাছে দৌড়ে যেতে না। এ কথা কেন ভুলে যাও যে, আমার ভবিষ্যৎ আমারই হাতে! আমার জীবনটা আমারই। সেখানে কোনও পুরুষের কোনও ভূমিকা নেই। আমি ওকে মানি না। তোমার যা কিছু বলার তা আমাকেই বলতে পারতে। ওর কাছে কেন গেলে?

সজল একটু যেন ভয় পেলে। বলল, ভুল হয়ে গেছে বীণা। মাপ করে দাও।

সজলের সঙ্গে তার সম্পর্ক এর পর আরও একটু গাঢ় হয়েছে। সজল মেয়েদের ব্যাপারে সাহসী পুরুষ। অনেক পুরুষের শুধু এই একটা ব্যাপারে খুব সাহস আর আত্মবিশ্বাস থাকে। কিন্তু বীণাও কম পুরুষের সঙ্গে মেশে না। সে সজলকে একটু লাগাম পরিয়ে রাখল। খুব কাছাকাছি হতে দিল না।

সম্পর্কটা একটা জায়গায় থেমে আছে। বীণা শরীরের সম্পর্কে যেতে চায় না। ওটা ঘটে গেলে বেইমান পুরুষ ওইটেই চাইবে। দায়িত্ব নিতে পিছপা হবে।

সজল প্রায়ই আসে। চা খায়। রাত নটা দশটা অবধি গল্প করে। তারপর নানা ইশারা ইঙ্গিতের ব্যর্থ চেষ্টা করে চলে যায়। একদিন বলেই ফেলল, আজ জ্যোৎস্না রাত ছিল বীণা, দুজনে যদি সারা রাত একসঙ্গে জেগে থাকতে পারতাম!

বীণা তাকে একটা ধমক দিলে বলল, বাড়ি যাও।

তাড়িয়ে দিচ্ছ?

মেয়েদের সঙ্গে ফটিনটি করা ছাড়া যে-সব পুরুষের আর কোনও বড় কাজ থাকে না তাদের মেয়েরা পছন্দ করে না সজল।

আমাদের মতো ছেলের আর কী বড় কাজ থাকবে বলো তো বীণা? আমি ইকুল-কেরানির ছেলে, কস্টেস্টে বড় হয়েছি। লেখাপড়াও করেছি। কিন্তু ওসব লেখাপড়ায় তো কিছু হয় না। বাংলায় এম এ হয়েও একটা মাস্টারির চাকরিও জোটাতে পারিনি। অনেক টাকা দিতে হয়, তবে মাস্টারি মেলে। বড় কিছু করতেই তো সিনেমায় নামার জন্য ঘোরাঘুরি করতাম। হয়নি। ঘুরতে ঘুরতে কাকার দলে। কী বড় হবো বলো তো! কি ভাবে বড় হওয়া যায়? এ দেশে আমাদের মতো ছেলের জন্য ওপরে ওঠার কোনও সিঁড়ি নেই। এ তো তুমিও জানো বীণা।

জানি। কিন্তু তোমার মধ্যে চেষ্টাও নেই।

চেষ্টা নেই? না, কথটা ঠিক হয় না। এ কথা ঠিক যে, অভিনয়ে আমি খুব পাকা নই। কিন্তু শেখার চেষ্টা করছি। হয়নি, কি করবো বলো?

নাটক লিখতে পারো না? বাংলায় এম এ, তোমার তো লেখার হাত থাকা উচিত।

ছিল একসময়ে। নাটক নয়, কবিতা লিখতাম। কিন্তু ওসব পোষাল না। কবিতার লাইনেও বেজায় ভিড়। সব লাইনেই দারুণ কম্পিটিশন।

বীণা হেসে ফেলে বলেছিল, আজ বাড়ি যাও। জ্যোৎস্না রাতে আমার খুব ঘুম পায়।

তুমি যখন বলছ, নাটক লেখার চেষ্টা করব। কিন্তু তাতেও কিছু হবে না। আমি জানি।

তোমাকে বাড়িতে টাকা দিতে হয় না?

দিতে পারলে তো ভালই হত। টাকা কোথায়? তবে আমার এক ভাই স্টেট ট্রান্সপোর্টে চাকরি করে। কভার্টার।

সংসার সে চালিয়ে নেয়।

সজল সে রাতে চলে গেল। কিন্তু তা বলে সঙ্গ ছাড়ল না। সঙ্গ ছাড়ুক এটা তো বীণাও চায় না। কিন্তু তার কপাল এমনই যে, এক হাড়াভাতের বদলে এসে জুটল আর এক হাড়াভাতে। তফাতের মধ্যে এর চেহারাটা বড্ড সুন্দর। আর গানের মোহময় গলা।

তুমি তো গায়ক হতে পারতে সজল?

চেষ্টা কি করিনি ভাবছ ? আগে ফাংশনে গাইতাম। রেডিওতে তিনবার অডিশন দিয়েছি, হয়নি। বড় গুস্তাদের কাছেও তালিম নিতে গেছি। আমার গলায় নাকি ওসব সুর আসে না।

রিহার্সাল থেকে ফিরতে ফিরতে দুজনে কথা হচ্ছিল। বীণা টর্চ জ্বলে রাস্তা দেখতে দেখতে বলল, সেরকম চেষ্টা করেনি। আমার গানের কান আছে। তোমার গলা বেশ ভাল।

বেশ ভাল, জানি। সবাই বলে, বেশ ভাল। কিন্তু গলারও একটা ক্যারেণ্টার আছে। সেটা থাকলে লোকে গান শুনেই বলে উঠত, দারুণ ভাল, ইউনিক। তা কিন্তু কেউ বলেনি।

তোমার এই জিনিসটা আমার খুব ভাল লাগে।

কোন জিনিসটা ?

এই যে, নিজের সম্পর্কে তোমার চাচ্ছাছোলা মতামত। তোমার অহংকার নেই।

তাও ছিল। একেবারে নেই বোলো না। তবে ছেলেবেলা থেকে বাস্তবের ঘটনানি খেয়ে খেয়ে অহংটা ভোঁতা হয়ে গেছে।

তুমি এম-এ পাশ, চেহারা সুন্দর, গানের গলা ভাল, তোমার যে কোথায় আটকাচ্ছে বুঝতে পারি না।

সজল হাসল, আমার চেয়ে ঢের বেশি গুণী ছেলেরাও ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে বীণা। চান্স পাওয়া—কথাটা তো তুমি ভালই জানো। ওই চান্স পাওয়া যে কত শক্ত!

ঘরে এসে সজলকে চা করে খাওয়াল বীণা। তারপর বল, শোনো সজল, বনগাঁয়ে পড়ে থেকে নিজেকে নষ্ট কোরো না। আরও চেষ্টা করো, খুব চেষ্টা করো।

সজল মাথা নেড়ে বলল, ইচ্ছেটাই মরে যাচ্ছে।

কেন মরে যাচ্ছে ?

নিজেকে খুঁচিয়ে তুলবার আর উপায় নেই। তাই তোমার কাছে আমার একটা নিবেদন আছে। বলব ?

বলো। আমাকে যদি কেউ সবসময়ে তাড়না করে, ভালবেসে, উৎসাহ দিয়ে চালাতে পারে তাহলে হয়তো কিছু এখনও হয়। বীণা, তুমিই একমাত্র যে পারো।

আমি! সর্বনেশে কথা।

আমি জানি তুমি বিবাহিতা, তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এখনও মুছে যায়নি। তবু তোমাকে প্রথম দেখেই মনে হয়েছিল, তুমি ভীষণ তেজী, জেদী, একরোখা। তোমার মতো কাউকে পাশে পেলে হয়তো হয়।

বীণা হেসে ফেলল। বলল, এখন বাড়ি যাও। মাথা ঠাণ্ডা করো গে।

তুমি কি একটু নিষ্টির বীণা ?

না। আমি প্র্যাকটিক্যাল।

সজল চলে গেল বটে কিন্তু রেখে গেল তার ছায়া, তার মায়া। অনেক রাত অবধি তাকে নিয়ে এক মোহময় চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে রইল বীণা। সে কি এই চালচলোহীন সুন্দর ছেলেটির প্রেমে পড়ে গেল! কিন্তু এই কি প্রেমে পড়ার সময়! এখনও জীবনটা তো শুছিয়ে তুলতে পারেনি, সেবে একটা সম্পর্ক ছিড়ে স্বাধীন হয়েছে। এখনই কি আবার গলায় ফাঁস পড়ার দরকার হল ?

প্রেমে পড়েছে কিনা সেটা ভাল করে বুঝে ওঠার আগেই কিন্তু তাদের নিয়ে গুজব ছড়িয়ে গেল। কাকা একদিন তাকে ডেকে আড্ডালে বলল, বীণা, কি সব শুনছি। সত্যি নাকি ?

কী শুনছ ?

তোমাকে আর সজলকে নিয়ে।

বীণা চোঁট উল্টে বলল, গুজবে কান দাও কেন ?

তাহলে সত্যি নয় ?

না।

কাকা একটু ভেবে বলল, তোমার পারসোনাল ব্যাপারে আমার নাক গলানো উচিত নয়। কিন্তু একটু ভেবে দেখো। সজল সবে কিছুদিন হয় দলে এসেছে, এখানকার ছেলেও নয়। ওর সম্পর্কে একটু স্বাভাবিক নিয়ে তারপর এগোনো ভাল।

বীণা একটু অবাক হওয়ার ভান করে বলল, তার মানে তুমি আমার মুখের কথাটা বিশ্বাস করলে না ? ধরেই নিচ্ছ যে সজলের সঙ্গে আমার প্রেম হয়েছে ?

তোমার মুখে আরও কিছু কথা ফুটে উঠছে বীণা। সেগুলো তুমি উচ্চারণ করছ না বটে, কিন্তু গোপনও থাকছে না। আমার কাছে অস্বীকার করে কি লাভ ? সজলকেও তো দেখছি, বড্ড উড়ু-উড়ু ভাব। ওসব কি গোপন করা যায় বীণা ?

বীণা একটু রেগে গিয়ে বলল, সজলকে নিয়ে আমি মোটেই মাথা ঘামাচ্ছি না। আমার মাথায় অনেক চিন্তা, অনেক সমস্যা।

কাকা গম্ভীর মুখে বলল, রাগ কোরো না। যা করবে তা ভেবেচিন্তে করতে বলেছি। তোমার ভাল চাই বলেই বলেছি, অন্য কারও ব্যাপার হলে মাথাই ঘামাতাম না। যাত্রা থিয়েটার সিনেমায় এসব তো হয়েই থাকে। কেউ গায়ে মাখে না। আমারও শুচিবায়ু নেই। কিন্তু নিমাই চলে যাওয়ার পর থেকে তোমার ভালমন্দ নিয়ে আমার একটা উদ্বেগ থাকে।

সেটা তোমার দয়া কাকা, তুমি আমার জন্য অনেক করছ।

ওটা কথা নয়। আমি গুণের দাম দিই। তোমার গুণের কদর আমি আর কতটুকু করতে পারি ? কিন্তু কথাটা অন্য দিকে চলে যাচ্ছে। আসল কথাটা হল, যা করবে ভেবেচিন্তে করো।

ঠিক আছে কাকা।

সেদিন সজলকে এড়িয়ে একা ফিরল বীণা। কিন্তু পরদিনই সজল তাকে ধরল, বীণা, কী হয়েছে? অমন গভীর হয়ে আছ কেন?

তোমার জন্য আমাকে অনেক কথা শুনতে হচ্ছে।

সজল একটু হাসল, কথায় কি যায় আসে? কে তোমাকে কী বলেছে বীণা?

সেসব শুনে তোমার লাভ নেই। আমার মন খুব খারাপ।

সজল অসহায় মুখ করে বলল, তোমাকে কিছু বলতে আমার ভয় হয়। যা রেগে যাও! কিন্তু বীণা, আমার অপরাধটা কি?

তোমার অপরাধ কি কে জানে! কিন্তু আমাদের নিয়ে কথা হচ্ছে।

হোক না।

তুমি যত সহজে হোক না বলতে পারলে আমি তত সহজে বলতে পারব না। পুরুষমানুষদের অনেক সুবিধে, মেয়েদের তা নেই। সমাজের যত খবরদারি তো মেয়েদের ওপরেই। সেইজন্য আজকাল পুরুষ জাতটার ওপরেই আমার ঘেন্না হয়।

সজল লজ্জা পেয়ে বলে, আমার জন্য তোমার কোনও ক্ষতি হচ্ছে না তো বীণা? কিন্তু তোমার সঙ্গে মেলামেশা ছাড়া, চা খাওয়া ছাড়া আমি তো আর কিছু করিনি! তোমার সঙ্গে আমার ভাল লাগে, তোমাকে আমার ভীষণ প্রয়োজন বলে মনে হয়। কি করে এই ভাল লাগটাকে, প্রয়োজনটাকে অস্বীকার করি বলো!

বীণা একটু ভিজল। নরম গলায় বলল, কিছুদিন আমার সঙ্গে মিশো না। একটু দূরে থাকো।

ও বাবা! তোমাকে একদিন না দেখলে যে ভীষণ অস্থির লাগে!

বীণা হেসে ফেলল। তারপর বলল, তাহলে আড়াল থেকে দেখো। কাছে বেশি এসো না।

সজল মূদু হেসে মাথা নেড়ে বলল, বীণা, তুমি এত তেজী, এত স্বাধীনচেতা, ব্যক্তিত্বময়ী তবু মাঝে মাঝে এমন মধ্যযুগীয় মহিলার মতো হয়ে যাও কেন? লোকে কথা রটাচ্ছে বলে ভয় পেয়ে গেলে? আজকাল মেলামেশা নিয়ে কেউ কি মাথা ঘামায়? সিরিয়াসলি ঘামায় না। তবে পাসটাইম হিসেবে কটকটালি করতে পারে। তা করুক না, কি যায় আসে তাতে?

বীণা এই সুপুরুষ তরুণটির মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তুমি যদি মেয়ে হতে তো বুঝতে। স্বাধীনচেতা, তেজী হয়েও মেয়েদের কত বাধা থাকে।

জানি, সব জানি। কিন্তু আমি তোমাকে কখনও ঠকাব না, কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করব না তোমার সঙ্গে। আজ অবধি আমি তোমার মতো আর কাউকে খুঁজে পাইনি।

সজলের আবেগ প্রায় কণ্ঠরুদ্ধ করে দিচ্ছিল তার। বীণা তাই খুব কোমল কণ্ঠে বলল, তোমাকে আমারও খুব ভাল লাগে। কিন্তু জানো তো, একটা সম্পর্কের জ্বালা আমার এখনও যায়নি। আমার আর একটু সময় লাগবে। তুমি যেমন অস্থির হয়ে পড়ছ, আমি তেমনটা হতে পারছি না। ঘরপোড়া গরু তো!

সে ঠিক আছে, কিন্তু দূরে সরে থাকতে বলছ কেন? আমি তো শুধু সন্তুর্কুই চাই, তার বেশি এখন কিছু চাই না।

এই পাগলকে নিয়ে আর পারল না বীণা। তার প্রতিরোধ ভাঙল। তবু বলল, খুব বেশি নয় কিন্তু।

কিন্তু সেটা কথার কথা হয়ে রইল। রিহার্সালের পর একসঙ্গে ফেরা, চা খাওয়া এবং গল্পগুজন যথারীতি হতে লাগল। কথাবার্তায় অনেক ফেরতা, অনেক ইশারা ইঙ্গিত, চোখে চোখ রেখে মুগ্ধমুগ হয়ে বসে থাকা। স্রোতে ভেসে যাচ্ছে দুজন। টের পাচ্ছে, তবু ঠেকাতে চেষ্টা করছে না।

ঠিক এই অবস্থায় এল নিমাইয়ের এই চিঠি। হতবাক বীণা চিঠিটার দিকে চেয়ে রইল। নিমাইয়ের হাতের লেখা সে চিনত না, কেননা নিমাই এর আগে কোনওদিন তাকে চিঠি লেখেনি, তার দরকারও হয়নি। হাতের লেখাটা খুবই সুন্দর, ভাষা গোছানো। বীণা চিঠিটা বালিশের তলায় রেখে দিল। বক্তব্য নতুন নয়, এরকম কথা নিমাই তাকে আগেও বলেছে। নতুন হল, চিঠি।

কাঁচড়াপাডায় একদিন সকাল দশটা নাগাদ নিমাই তার দোকানের কোণটিতে বসে এক গelas ঘোল খাচ্ছিল। দোকানে এখন ভিড় নেই। দুপুরের খাবার তৈরি হচ্ছে। এগারোটার পর মানুষের গাদি লেগে যাবে। রান্নার গন্ধটা পাচ্ছিল নিমাই। রোজ সে এই গন্ধটা খুব ভাল করে পরীক্ষা করে। গন্ধেই তো স্বাদ। ঠিকমতো গন্ধ না বেরোলে গিয়ে রাধুনীকে একটু সমঝে দিয়ে আসে। সে সতর্ক মানুষ। কোথাও ফাঁক রাখতে চায় না। বাসি জিনিস মেশাতে দেয় না কখনও। রাতের বাসি বাড়তি খাবার নিয়ে যায় কিছু ভুখা মানুষ আর কচিকাঁচা বাচ্চারা। ওটা তার নিত্যকার কাঙালীভোজন। লোকে নানারকম বুদ্ধি পরামর্শ নিয়ে থাকে। লাভ বাড়ানোর ফন্দিফিকির বলে যায়, নিমাই সেগুলো শোনে, কিন্তু মানে না। সেই যে কথায় আছে, হাঁ জী, হাঁ জী করতে রহে, বৈঠো আপনা ঠাম। তলে মশলায় তার কোনও ফাঁকি নেই। যানির তেল, ছানি হলো। তার দোকানে বাসন, কাপ প্রেট ধোয়া হয় সযত্নে, কোথাও ফাঁক থাকে না নিমাইয়ের। শালপাতা, কলাপাতা, ভাঁড়ের ব্যবস্থাও আছে। এত সামলে চলতে গিয়ে মাথার মধ্যে আর অন্য চিন্তা পাক খায় না।

ঘোলটা শেষ করে হিসেবের খাতা টেনে নিয়ে বসতে যাবে, এমন সময়ে একটা লোক ঢুকল দোকানে।

নিমাই যে! ভাল আছ?

নিমাই শশবাস্তে উঠে দাঁড়াল। এরকম হেসে হাত জোড় করে বলল, কাকা! এতদিন পর নিমাইকে মনে পড়ল তাহলে? আসুন, আসুন, বসুন ডাল করে।

কাকা বসল। নিমাই বলল, একটু কিছু মুখে দিতে হবে। কী খাবেন বলুন তো!

ব্যস্ত হলো না। সকালে জিলিপি আর কচুরি ঠেসেছি, এখন আর খাওয়া নয়। এক কাপ চা দাও শুধু।

চায়ের হুকুম দিয়ে জুং করে বসল নিমাই মুখোমুখি। বলল, তারপর খবরটবর কি?

ভূমি তো আর বনগাঁ-মুখো হলে না!

নিমাই হাত উল্টে বলল, কি করতে যাবো? বনগাঁর পাট তো চুকেই গেছে। তা এখানে হঠাৎ আসা হল কেন?

একটা বায়নার ব্যাপার ছিল। কাল রাতেই এসেছি। আজ বনগাঁ রওনা হওয়ার মুখে তোমার সঙ্গে দেখা করে যাচ্ছি।
বীণার খবর-টবর নাও না?

নিমাই সলজ্জ হেসে বলল, তার কথা আবার কেন? যতদূর জানি ভালই আছে, নামটামও হচ্ছে।

কাকা মনুষ্যের বলল, তোমাদের মধ্যে কি হয়েছিল আমাকে একটু বলবে নিমাই? যদি বাধা না থাকে?

নিমাই একটু চুপ করে থেকে বলল, সব কথা কি খোলসা করে বলা যায় কাকা?

খোলসা করে বলতে বলছি না। স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার, আবডাল থাকাই ভাল। কিন্তু মোন্দা কথাটা কী?

নিমাই মুখখানা গম্ভীর করে বলল, আমাকে তার আর দরকার হচ্ছে না।

এটা কোনও কথা হল?

একটা মানুষ আর একটা মানুষের কাছে হঠাৎ যে কেন ফুরিয়ে যায় তা তো বলতে পারি না। মনের রহস্য কে ভেদ করতে পারে বলুন।

বীণাও কি তোমার কাছে ফুরিয়ে গেছে?

নিমাইয়ের চোখদুটো মেদুর হয়ে গেল! গলাটাও কি ধরে গেল একটু? সামান্য ভারী গলায় বলল, না কাকা। সে আমাকে যে চোখে দেখত আমি তো তাকে সে চোখে দেখতাম না।

ওইটেই তো আমি জানতে চাই।

নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমার জন্য অনেক করেছে বীণা। অনেক। অসুখবিসুখে যখন যেতে বসেছিলাম তখন সে-ই আমাকে যমের হাত থেকে ছিনিয়ে আনে। তার দয়ায় আমার মা-বাবা উপাসের হাত থেকে বেঁচে যায়। কত মুখে তার কথা বলব? সে আমার কাছে ফুরাবে কেন?

কাকা একটু চুপ করে থেকে বলল, সজল নামে একটা ছেলে এসেছিল তোমার কাছে?

নিমাই তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এসেছিলেন। বড় ভাল ছেলেটি।

কী বলতে এসেছিল?

নিমাই স্নান একটু হাসল, তিনি বোধ হয় আমার মনোবাসনা জানতে এসেছিলেন। তা আমি বলে দিয়েছি, আমার কোনও দাবিদাওয়া উঠবে না কখনও। মানুষকে কি দাবিদাওয়া করে, আইন আদালত করে আটকানো যায়?

কাকা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল। তারপর বলল, তোমার মতো মানুষ আমি বেশি দেখিনি নিমাই। তোমার রাগ হয় না?

জিব কেটে নিমাই বলে, রাগ! বলেন কি? রাগ কি আমার শোভা পায়। আজও তার ঋণে আমার কাঁধ ভারী হয়ে আছে। আমি অকৃতজ্ঞ নরাদম বলে তার ঋণ শোধ করতে পারিনি। শোধ করতে গেলে হয়তো উল্টো বুঝবে, তাই চেষ্টাও করিনি।

কাকা দৃঢ় গলায় বলে, তোমার কাছে বীণার অনেক শেখার ছিল। আমাদেরও শেখার আছে। দোকানটা তো দিবি দাঁড়িয়ে গেছে দেখছি।

ভগবানের দয়া।

এলেম তোমার কম ছিল না। হাত পা গুটিয়ে বসে ছিলে বলে হচ্ছিল না। তোমার উন্নতি দেখে যে কী খুশি হয়েছি তা বলার নয়।

আশীর্বাদ করবেন যেন টাকাপয়সা আমাকে খেয়ে না ফেলে। ভগবানে যেন বিশ্বাস-ভক্তি থাকে। একটা কথা বলব কাকা? আমার একটা কাজ করে দেবেন?

কী কাজ?

বীণার জন্য পাঁচ হাজার টাকা তুলে রেখেছি। এমনিতে সে হয়তো নেবে না। আমার নাম না করে টাকাটা তাকে দেবেন?

পাঁচ হাজার টাকা! সে তো অনেক টাকা!

টাকাই তো। কাগজ মাত্র। তবু এ দিয়ে তার যদি কিছু উপকার হয় তো আমি শান্তি পাবো। আপনি একটু অন্যভাবে দেবেন।

কী বলব তাকে?

সে আপনি ঠিক করে নেবেন।

মিথ্যে কথা বলতে বলছ?

জিব কেটে নিমাই বলে, না না, তা কেন? ধরুন, টাকাটা আমি আপনাকেই দিচ্ছি। এবার আপনার অভিকৃষ্টি।

ইতি গজ? বলে কাকা হাসল। তারপর হাত বাড়িয়ে বলল, দাও। এ টাকায় খেলে তার অনেক পাপ কেটে যাবে।

দাও।

নিমাই উজ্জ্বল হয়ে বলল, বাঁচলাম।

অফিসার, কিন্তু ঠাটঠমক বিশেষ নেই। কাজ-অন্ত প্রাণ। আপার দুই দাদার একজন আই আই টি-তে ইনজিনিয়ারিং-এর ফাইন্যাল ইয়ার পড়ছে খড়গপুরে। অন্য জন দিল্লিতে ম্যানেজমেন্ট শিখছে।

বিমলাকে সন্ধেবেলা যখন ঘরে তুলে আনল আপা তখনও তার বাবা ফেরেননি। মা একটু আতঙ্কিত হয়ে বললেন, এসব কী ব্যাপার ?

আপা সংক্ষেপে সব বলল, মায়ের কাছে সে প্রায় কিছুই গোপন করে না।

মা শুনলেন এবং শান্তভাবে বললেন, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ায় বাইরের লোকের ঢুকে পড়টা বিপজ্জনক। বিমলাকে ভিতরের ঘরে নিয়ে যাও। যশবীরে এলে তুমি বেরিও না। যা বলবার আমি বা তোমার বাবা বলব।

কেন মা, যশবীরকে তো আমি ভয় পাই না।

ভয় পাওয়ার কথা বলছি না। তুমি কাউকেই ভয় পাও না, তা আমি জানি। কিন্তু তুমি হয়তো গরম গরম কথা বলবে, তোমার বয়স তো অল্প। আমরা বুঝিয়ে বলতে পারব।

যশবীর যদি বিমলাকে নিয়ে যেতে চায় ?

যাতে না নেয় তা দেখব। তবে তুমি নিশ্চয়ই চাও না যে, ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাক ?

চাই মা। বিমলার যা অবস্থা করেছে তাতে তো ও মরেই যেত। এর পর হয়তো সত্যিই মেরে ফেলবে। যশবীর স্বাভাবিক অবস্থায় নেই।

তুমি তো দূরবীন দিয়ে দুনিয়াকে দেখছ, তাই এমন মনে হচ্ছে। যাকগে, তুমি বিমলাকে ভিতরের ঘরে নিয়ে শুইয়ে দাও। তুমি আজ ওর সঙ্গেই থাকবে। যশবীরকে আমরা সামলাবো। যশবীরকে আমি চিনি, আমাকে আন্টি বলে ডাকে।

বিমলাকে নিজের ঘরে নিয়ে এল আপা। তার ঝাটটা বেশ বড়। দুজনের অনায়াসে হয়ে যাবে। বিমলা বাথরুম থেকে চোখমুখে জল দিয়ে এসে বসল, তারপর বলল, কেন ঝামেলা পাকালে ? তোমার বোঝা হয়ে তো থাকা যাবে না।

আপা বলল, কেউ কারও বোঝা নয় বিমলা। কিন্তু বিপদে পড়লে একে অন্যের ওপর নির্ভর না করলে কি হয় ?

আন্টি আর আঙ্কলকেও বিপদে ফেলা হল।

ওগুণ ভেবো না। আমাদের পরিবারটা একটু অন্যরকম। আমরা নিজেদের নিয়ে থাকতে ভালবাসি না। আমাদের ভয়ভরও একটু কম। কিন্তু তোমাদের ব্যাপারটা আমাকে বলবে ?

বিছানায় গুটিসুটি হয়ে অসহায়ের মতো বসেছিল বিমলা। খুব দুর্বল দেখাচ্ছে। চোখ দুটিতে গভীর একটা হতাশা। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, বলতে গেলেই আমার খুব কান্না পাবে।

কান্দবে কেন ? মনটাকে শক্ত করার সময় এসেছে দেখাচ্ছে। এই টরচার সহ্য করা কি করে ? কী চায় যশবীর ?

যশবীর চায় অল অ্যাটেনশনশন। যখন বাড়ি আসবে তখনই আমাকে অ্যালাট থাকতে হবে। সে সময়ে বাইরে কোথাও গেলে বেগে যায় ভীষণ। অসম্ভব পজটিভ। আমাকে অনেকটা পুতুল বানিয়ে রাখতে চায়। সাজো-গোজো, টিভি দেখ, মার্কেটিং করো, ঘর সাজাও, কিন্তু গুণির মধ্যে থাকো। যেন আমার আলাদা মত নেই, সত্তা নেই, চরিত্র নেই। আমি দাসী না পুতুল, বেলো তো!

তুমি কোনোটাই নও, যশবীরকে সেটা বুঝিয়ে দেব।

প্রিজ! ওর সঙ্গে কনফ্রন্টেশনে গিয়ে বিপদে পড়ো না, ও কিন্তু খ্যাটাটে আছে।

আপা হাসল, তোমার মতো আমি ভিত্তি নই।

জানি আপা, তোমার খুব সাহস। কিন্তু যশবীর তো পত্তর মতো হয়ে গেছে। সাবধান হওয়া ভাল।

কাল রাতে কী হয়েছিল ?

রোজই হচ্ছে। ইদানীং ওর মাথায় এসেছে, আমি উইমেল লিব করছি। ওকে ঠিকমতো দেখভাল করছি না। কি করব বেলো ? লেডিজ ফ্রন্ডের হয়ে আমাকে কিছু কাজ করতে হচ্ছে। সারব্রিপশন, অ্যাকাউন্টস, মিটিং-এ কিছু সময় দিতে হয়। ইদানীং ফিরতে দেরি হয়ে যাচ্ছিল। প্রথম তাই নিয়ে ঝগড়া। বাঙালি মেয়েদের মতো স্বাধীন তো নই আমরা। আমাদের স্বামীসেবা করতেই হয়। সেটোতে ঢিলেমি দেখা দিলেই মুশকিল। কিন্তু আমার আর ভাল লাগে না। যশবীরের তো কোনও কালচার নেই। সারা দিন লরি, ট্রাক, খালাসি, ড্রাইভারদের সঙ্গে কাটায়, বাড়ি ফিরে হুইকি আর হিন্দি সিনেমা, তারপর খাওয়া আর শোওয়া। ছুটি দিনে মাঝেমধ্যে একটু আউটিং বা সিনেমায়া যাওয়া। লোকটাকে আমার আর একদম ভাল লাগছে না। জীবনের কত দিকে কত কী ঘটে যাচ্ছে, ও তার কোনও খবরই রাখে না। ওর অন্য সব ভাড়াটে মেয়ের সঙ্গেও সম্পর্ক আছে। ওর এক বন্ধু কিছুদিন আগে মারা গেছে। সেই বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গেও আছে। এগুলো কিন্তু সন্দেহ নয়, সব সত্যি।

ডাক্তার এলেন। বিমলার হাতপায়ের বাঁধনের জায়গা, মুখে ষ্টিকিং প্লাস্টারের দাগ সবই লক্ষ করলেন। গভীর মুখে নাড়ি, বুক সব পরীক্ষা করে দেখে আপার দিকে তাকিয়ে বললেন, ভেরি শকিং। কী হয়েছিল ?

পাড়ার চেনা ডাক্তার, আপা মৃদু স্বরে বলল, ওর স্বামী ওকে নিজের পৌরুষ আর কর্তৃত্ব দেখিয়েছে। ওর কেমন অবস্থা! ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তার দাশগুপ্ত গভীর মুখে বললেন, এমনিতে ঠিক আছে। কিন্তু যশবীরটা যে এরকম অমানুষ তা তো জানতাম না।

আপা বলল, ওর মাথায় হঠাৎ যেন ভূত চেপেছে।

ডাক্তারবাবু মাথা নেড়ে বলেন, তাহলে আপাতত ওদের সেপারেট থাকাই ভাল। একসঙ্গে হলেই আবার গণ্ডগোল হবে। আজকাল খুনোখুনিও হচ্ছে।

ডাক্তার একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে গেলেন। বললেন, রেষ্ট নিতে বেলো। একটু ঘুমের ট্যাবলেট দিয়ে গেলাম। ওটা কিন্তু অবশ্য খাওয়াবে। কোনওরকম উত্তেজনা বারণ।

ডাক্তার চলে যাওয়ার পর বিমলা বলল, ওর সব অত্যাচার আধিপত্য মেনে নিচ্ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ মনে হতে লাগল, এতে আমার কী লাভ হচ্ছে ? আমি কী পাচ্ছি ওর কাছ থেকে ? একেশনাল সেন্স আর শাড়িগয়না বা প্রেজেন্টেশন। এসব

দিয়ে কী হবে ? আমি কি শুধু যশবীরের বউ ? এ ছাড়া কি আমার অন্য পরিচয় কিছু নেই । আমাদের লেডিজ গ্রুপে এইসব নিয়েই তো কথা হয় । তাই ইদানীং আমি ওর মেজাজমজ্জিকেকে বেশি পাত্তা দিচ্ছিলাম না । ফলে ঝগড়া হতে লাগল, বুঝতে পারছিলাম ও আমার স্বাধীনতা, স্বাধীন চিন্তা, বাইরের কাজ সহ্য করতে পারছে না । ও চায় আমি সারা দিন ওর ধ্যান করি । কিন্তু ধ্যান করার মতো মানুষ তো আগে ওকে হতে হবে । ও তো একটা পরস্রা কামানোর যন্ত্র ছাড়া কিছু নয় ।

বেশির ভাগ মানুষই তাই । তুমি কি কিছু ভাবছ ?

কিসের কথা বলছ ?

যশবীরের সঙ্গে থাকবে, না আলাদা হবে ?

ডিভোর্স ? আমার বাপের বাড়ি খুব রক্ষণশীল পরিবার । তারা আমাকে ডিভোর্স করতে দেবে না ।

তাহলে ?

আমি সেপারেট থাকতে চাই । আমার লেডিজ গ্রুপ আমাকে হেস্ট করবে ।

আমরাও সাহায্য করব ।

আপা, তোমার ওপর যশবীরের খুব রাগ । ও তোমাকে দেখতে পারে না । হি ইজ এ ডেনজারাস ম্যান । আমাকে তোমাদের বাড়িতে এনে তুমি নিজের বিপদ ডেকে আনছ । আমি জানি তুমি খুব সাহসী মেয়ে । কিন্তু পুরুষের ইগো যে কী সাজাতিক হয় তা তো তুমি জানো না ।

আমি এ সবই শিখছি । জানছি । মানুষ ধীরে ধীরে শেখে । যশবীর যে আমাকে পছন্দ করে না তা আমি জানি ।

তবু রিক্স নিচ্ছ ?

রিক্স না নিলে কি জানতে পারব ? তুমি অত ভেবো না । এ পাড়ায় আমার কিছু বন্ধু আছে । পিছনের বস্তির লোকজন । আমি তেমন দরকার হলে তাদের ডাকতে পারি । আশা করি ততটা করতে হবে না । তুমি কিছু খেয়ে নাও । তারপর ওষুধ খেয়ে ঘুমোও । খুব টেনশন গেছে তোমার ।

পাড়ার দোকান থেকে ওষুধ নিয়ে এসে আপা দেখল, বিমলা খেতে বসেছে । কিন্তু কিছু খেতে পারছে না । বলল, ভিমিটি উটেন্সি হচ্ছে । কি করে খাবো ?

মা বললেন, আচার দিয়ে খাও । ভাল আচার আছে ।

বিমলা মাথা নেড়ে বলে, না আন্টি । আমি বরং শুধু ঘোলটা খাই । সলিড ফুড ভিতরে যাচ্ছে না ।

তাই খাও ।

ওষুধ খেয়ে বিমলা শুলো । আপা দরজা টেনে দিল বাইরে থেকে ।

মা খাবার টেবিল গোছাতে গোছাতে বললেন, তোমার এসব সোশ্যাল ওয়ার্কের জের আমাকে আর কত টানতে হবে ? আপা একটুও হাসল না । গম্ভীর মুখে বলল, আমাকে তো অনেক টানতে হবে মা । সমাজটা এত পচা-গলা ।

মা তার দিকে চেয়ে শান্ত গলায় বললেন, তোমার বিচার খুব একপেশে । যশবীর কিন্তু খুব খারাপ লোক নয় । মদ খায়, সে তো বহু মানুষ খায় । কিন্তু তার স্বভাব বা কথাবার্তা আমার তো খারাপ লাগে না । বিমলা কি খুব শান্তিপ্রিয় মেয়ে ভেবেছ ? রোজ যশবীর ফিরলেই অশান্তি করে ।

এটা কী হচ্ছে মা, তুমি যশবীরের পক্ষ নিচ্ছ ? আজ সকালেই আমাকে ও ধাক্কা দিয়েছে । বিমলাকে তো প্রায় মেরেই ফেলেছিল ।

মা গম্ভীর মুখে বলেন, ঘটনা ভাল করে জানো, তারপর বিচার করো । আমার ধারণা বিমলাকে যশবীর খুব ভালবালে । আর ভালবাসার মধ্যে একটু দখলদারি থাকেই, নইলে ভালবাসা কিসের ? যেমন আমাকে তুমি বোলা, আমার মা । ওই আমার মা কথার মধ্যে একটু দখলদারি থাকে না কি ?

এটা সে জিনিস নয় মা ।

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, কি জানি কি ! আজকাল সব পাস্টে যাচ্ছে ।

হ্যাঁ মা, পাস্টে যাচ্ছে । পরিবর্তনটা তুমি বুঝতে পারছ না কেন ?

তুমি কি বিমলাকে স্বাধীন হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছ ? ডিভোর্সের কথা বলেছ শুনলাম । কাজটা ভাল করনি । স্বাধীন হয়ে বিমলার লাভ হবে না । আরও কষ্টে পড়বে ।

তুমি কি বোলা ও অভ্যাচারী স্বামীর পা ধরে থাকবে ?

মা ব্যাজার মুখে বলেন, যশবীরকে আমার অভ্যাচারী বলে মনে হয় না । হতে পারে ওর মাথা গরম । তারও কারণ বিমলাই । তুমি বোধ হয় এবার আমাকে নারীমুক্তির কথা শোনাবে ! শোনো বোকা মেয়ে, নারীমুক্তি বলে কিছু নেই । প্রতি মুহূর্তেই পুরুষকে তার দারকার । কোনও মেয়ে যদি তার স্বামীকে না মানে, স্বাধীন হয়, তবে অন্য পুরুষরা তাকে ছিড়ে খাবে । স্বাধীন মেয়ের মতো এমন সহজ ভোগ্যবস্তু পুরুষের আর কী আছে ? বহুভোগ্যা হলে কি স্বাধীন হওয়া হয় ?

তাহলে মা, তুমিই স্বীকার করছ যে, পুরুষেরা পস্তর মতোই । সুযোগ পেলেই মেয়েদের ছিড়ে খায় ? তাহলে এই জাতকে মেয়েরা প্রভুর আসন দেবে কেন ?

উপায় নেই বলে । পৃথিবীতে মেয়েদের আর কোনও উপায় নেই, তাই ওই নিয়ম মানতে হয় । মেয়েতে মেয়েতে তো আর বিয়ে হয় না !

আজকাল তাও হয় মা ।

মা গম্ভীর মুখে বলেন, হয় যে তা আমিও শুনেছি । তোমার বাবা আমাকে মাঝে মাঝে সেসব খবর শোনায় । তুমি কি চাও সেইটেই স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে উঠুক ? ওটা তো কুৎসিত একটা বিকৃতি । তাও যদি মেনে নিই, তাহলেও জেনো, মেয়েতে মেয়েতে বা পুরুষে পুরুষে বিয়ে হলে কোনওদিনই আর সন্তান হবে না । প্রকৃতিকে কি এতটা অস্বীকার করা যায় ?

আপা একটু অবাক হয়ে মায়ের দিকে চেয়ে রইল। তার শান্ত মা এত কথা কদাচিৎ বলে। আজ বলছে, তার কোনও কারণ আছে।

হ্যাঁ মা, যশবীর কি তোমাকে ঘুষ দেয়? কী ঘুষ দেয় বলো।

মা হাসলেন না। গোমড়া মুখেই বললেন, আমি যশবীরের পক্ষ নিচ্ছি না। সে অন্যায় করেছে। কিন্তু আগে ভাল করে দেখ, সেই অন্যায়ের পিছনে, আর কারও আর একটা অন্যায় আছে কি না।

ভোরবেল বাজতেই একটু চমকে উঠেছিল আপা। কিন্তু দরজা খুলে দেখা গেল না, কোনও হামলাকারী নয়। আপার বাবা। দীর্ঘকায়, কালো মজবুত চেহারা, কাটা-পাকা চুলের মানুষটি খুবই শান্ত ও দৃঢ় প্রকৃতির। কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত অফিসার। সকাল থেকে অনেক রাত অবধি নিবিষ্ট মনে অফিসে কাজ করে।

জামাকাপড় পাল্টানোর আগে ভদ্রলোককে আপা ও তার মায়ের কাছ থেকে ঘটনাটা আদ্যোপান্ত শুনতে ইল। আপা প্রশ্ন করল, বলো বাবা, আমি অন্যায় করেছি?

আপার বাবা জু কুঁচকে বললেন, আমি কোনও অন্যায় দেখছি না। আমি চাই তুমি এরকম কাজই করো। কিন্তু কখনও যেন ভুল সিদ্ধান্ত নিও না।

তাহলে কি এটা ভুল হল?

যশবীর না ফিরলে তো বোঝা যাবে না। অপেক্ষা করো।

অপেক্ষা অবশ্য অনেকক্ষণই করতে হল। যশবীর ফিরল না।

রাত দুটো অবধি অপেক্ষা করল আপা। তারপর বইরের ঘরে সোফায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

যশবীর ফিল্ডল সকালে। উসকোখুসকো চুল, রক্তবর্ণ চোখ, ক্লান্ত। প্রথমে নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকেছিল, কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে সোজা আপাদের বাসায় এল। দরজা খুলল আপা-ই।

কী চাই?

যশবীর যেন সংকুচিত, ভীত। অপরাধী মুখ করে বলল, সি ইজ নট দেয়ার। বাট থ্যাংক ইউ। আই ওয়ান্ট হার ব্যাক।

আপা দরজা আটকে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, বিমলা যাবে না। কোনওদিনই যাবে না।

একটু যেন অবাক হয়ে চেয়ে রইল যশবীর। শুধু প্রতিধ্বনি করল, যাবে না?

না। আপনার নামে পুলিশ কেস করা উচিত।

যশবীর কেমন যেন গুটিয়ে গেল। মাথা নিচু করে একটু ভেবে বলল, বিমলার সঙ্গে আমার একবার দেখা হতে পারে কি?

না। বিমলা আপনার সঙ্গে দেখা করবে না।

নিঃশব্দে পিছনে মা এসে দাঁড়িয়েছেন, টের পাচ্ছিল আপা। মা বুদ্ধিমতী। তাকে টপকাতে চেষ্টা করলেন না। শুধু পিছনে আড়ালে থেকেই বললেন, ওদের দেখা হওয়াটা কিন্তু দরকার আপা।

আপা কঠিন মুখ করে নীরব রইল।

যশবীর তার দিকে তাকাল না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর মৃদু স্বরে বলল, তুমি ওকে নিয়ে এসেছ বলে থ্যাংকস দিচ্ছি আপা। ঠিকই করেছে। আমার সঙ্গে বিমলার আর না-থাকাই ভাল। আমি ভীষণ জেলাস। আই লাভ হার ভেরি মাচ। হয়তো সেই কারণেই আমার দিক থেকে ওর বিপদও বেশি। আই অ্যাম সরি ফর এভরিথিং।

এই বলে চলে গেল যশবীর। সে যে কোনও নাটক করল না, চোঁচামেচি করল না, গায়ের জোর দেখানোর চেষ্টা করল না এতে একটু অবাক হল আপা। হয়তো নিজের অপরাধের গুরুত্ব বুঝতে পেরে ভয় পেয়েছে। হয়তো ভেবেছিল, বিমলা মরে পড়ে আছে ফ্ল্যাটের মধ্যে, তাই মুখে অপরাধী ভাব। কিন্তু লোকটা যে আদ্যন্ত হৃদয়হীন তা তো মিথ্যা নয়।

আপা দরজা বন্ধ করে ফিরতেই মায়ের মুখোমুখি।

তুমি একটু মেজাজি আছ আপা।

আপা সামান্য রাগের গলায় বলল, আমি খুব ভাল মেয়ে মা, তাই ওকে পুলিশে দিইনি। ও তো খুনের চেষ্টাই করেছিল বিমলাকে।

ঠিক আছে। এখন বিমলাকে ঘুম থেকে তুলে খাওয়াও। ওর যে এখন কী হবে তাই ভাবছি।

স্বামী ছাড়াও মেয়েরা বাঁচে। তুমি ভেবো না।

মা আর কথা বাড়ালেন না।

বিমলা ওষুধের গাড়ি ঘুম থেকে উঠল বেলা নটায়।

ইস! কত বেলা হয়ে গেছে!

আপা বলল, তাতে কি? তোমার তো এখন রেন্ট-ই দরকার। কেমন আছ?

গায়ে হাতে-পায়ে কোমরে দারুণ ব্যথা। রাতে কিছু হয়নি তো!

না। যশবীর সকালে ফিরেছে। এসেছিল। তাড়িয়ে দিয়েছি।

বিমলা একটু চমকে উঠল, সহজে গেল?

গেল। ওর ভয় হয়েছে। বোধ হয় ভেবেছিল সকালে এসে তোমাকে মরা অবস্থায় দেখবে।

তাহলে কী করত?

কাপুরুষরা কী করে? তারা বউ খুন করে ফেরার হয়।

উঃ! বলে বিমলা দু'হাতে মুখ ঢেকে রইল কিছুক্ষণ।

তুমি যশবীরের কথা ভেবো না। তাতে শরীর খারাপ হবে।

আমি শুধু ওর নিষ্ঠুরতার কথা ভাবছি। ও যে আমাকে এত শান্তি দিতে পারে তা আমার ধারণাই ছিল না। ওর কথা ভাবলেই আমার এত ভয় করছে!

সাড়ে ন'টা নাগাদ ফোনটা এল।

আমি একটু কৃষ্ণমূর্তিজীর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

আপার বাবার আজ ছুটির দিন। শনিবার, পূজো-আঁকা সেরে সবে সকালের জলখাবার খেতে বসেছিলেন। উঠে এসে ফোন ধরলেন। কি একটু শুনে নিয়ে বললেন, আচ্ছা, আসছি।

ফোনটা রেখে আপনার দিকে চেয়ে বললেন, যশবীর কিছু বলতে চায়। আমি আসছি।

প্রায় ঘণ্টা খানেক বাদে বাবা ফিরলেন। বললেন, যশবীর চলে গেল।

মা বললেন, তার মানে ?

বাবা অনুত্তেজিত গলায় বললেন, ওর একটা অদ্ভুত ধারণা হয়েছে যে, বিমলাকে ও হয়তো হঠাৎ ইমপালসের মাথায় কোনওদিন খুন-টুন করে ফেলতে পারে। ও নিজের বশে নেই। বলে গেল যে, ওর ফ্ল্যাটে বিমলা একাই থাকতে পারে। জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের পাসবই আর চেকবই দিয়ে গেল। আর ফ্ল্যাটের চাবি। আরও বলেছে, বিমলাকে ডিভোর্স দিয়ে দেবে। যদি ও চায়।

বিমলা ভিতরের ঘর থেকে উঠে এসেছে। সব শুনে বলল, ওর কথায় বিশ্বাস কী ? রাতে যদি ফিরে আসে ?

কৃষ্ণমূর্তি শান্ত চোখে বিমলার দিকে চেয়ে বললেন, আমার চেয়ে তুমিই ওকে বেশি চেনো। কাজেই কোনটা করা ভাল হবে তা তুমিই ঠিক করো। তবে আমার মনে হল, যশবীরের মন খুব খারাপ। বেশ ভেঙেও পড়েছে। এক ড্রাইভারের অসুখ হওয়ায় কাল ট্রাক চালিয়ে আসানসোল গিয়েছিল। সারারাত ট্রাক চালিয়ে আজ সকালে এসে পৌছেছে। খুব টায়ার্ডও ছিল।

বিমলা মৃদু স্বরে বলল, আমি ওকে বিশ্বাস করি না আদল। আফটার ইয়েন্টারডেজ এক্সপিরিয়েন্স ওকে আর বিশ্বাস করা যায় না। আপা বুদ্ধি করে ফ্ল্যাটে না ঢুকলে আজ আমার ডেডবডিই পাওয়া যেত।

যশবীরও তাই বলছিল। খুব রিপেটেট। যাই হোক, নিজের জিনিসপত্র ও নিয়ে গেছে। ফ্ল্যাটটা তোমার জন্য রেখে গেছে। বলেছে, ও তোমাকে আর কখনও ডিস্টার্ব করবে না।

বিমলা একটা শ্বাস ছাড়ল। তারপর বলল, টু বি আন দি সেফ সাইড আমি আরও দু' দিন আপনাদের শেলটার চাই। ওর মতলবটা এখনও আমার বোঝা বাকি আছে।

ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম। তুমি আমাদের কাছেই এখন থাকো। তোমার চিকিৎসা এবং বিশ্রামও দরকার। যশবীরকেও ওয়াচ করা যাক। ডেন্ট ওরি।

আপা সব শুনল। দাবার খেলায় প্রতিপক্ষ যেন প্রত্যাশিত চালটা দিল না। এমন কুট চাল দিল যে আপা খেলাটা বুঝতে পারছে না।

সোমবার স্কুলে যেতেই বন্ধুরা ঘিরে ধরল, যশবীরের কী হল আপা ? বোলা তো আমরা গিয়ে খোলাই দিয়ে আসি।

আপা গম্ভীর মুখে বলল, তার দরকার হবে না। যশবীর হার মেনে নিয়েছে।

বুবকা হতাশার গলায় বলল, যাঃ, তাহলে তো অ্যাডভেনচারটা মাটি হয়ে গেল। হার মানল কেন ?

স্ট্র্যাটেজিক রিট্রিট হতে পারে। কিছু বোঝা যাচ্ছে না। যাই হোক, এখন আর তোমাদের কিছু করার নেই।

আরও তিন দিন বাদে বিমলাকে সঙ্গে নিয়ে তার ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিল আপা। ফ্ল্যাটের ভিতরে একটু ধুলো পড়েছে আর সোঁদা গন্ধ জমেছে একটু। আর সব ঠিকই আছে।

আপা বিমলাকে ঘরদোর পরিষ্কার করতে সাহায্য করল। তারপর বলল, এখন তুমি স্বাধীন।

বিমলা আপনার দিকে চিন্তিত মুখে চেয়ে বলল, আপা, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

কী বিশ্বাস হচ্ছে না ?

যশবীর ঠিক এরকম নয়। এত মিকুলি ও আমাকে রেহাই দেবে সেরকম মানুষ কী যশবীর ?

তোমার কি এখনও ভয় করছে ?

না। আর ভয় করছে না। এখন একটু চিন্তা হচ্ছে।

১১ চঃ ২২ ১১

দাড়ি আর গৌফের কতগুলো অসুবিধের দিক আছে। দাড়ি নেমে বুক পর্যন্ত ঝুলে পড়তে চায়। গৌফ ঢেকে ফেলে দুটো টোঁটেকেই। শিখরা দাড়ি জাল দিয়ে বেঁধে রাখে, কিন্তু সেরকমটা করতে যাওয়ার হ্যাঁপা আছে। তার চেয়ে কি একটু টিম কর নেওয়া বেশি সুবিধাজনক ? গৌফ নিয়েও কিছু অসুবিধে হচ্ছে হেমাঙ্গর। বিশেষ করে খাওয়ার সময়। চা খেতে গিয়ে সে প্রায় দেখছে, চায়ের কাপে টোঁট ছোঁয়ানোর আগেই তার গৌফ গিয়ে চায়ে ডুব দিচ্ছে।

অনেক ভেবেচিন্তে সে এক শুক্রবার সকালে ম্যাগনিফায়িং আয়না, চিরুনি আর কাঁচি নিয়ে বসল দাড়ি-গৌফকে উদ্বৃত্ত করতে। কিন্তু ছাঁটতে গিয়ে দেখল, তার সেই কৃতবিদ্যাতা নেই যা দিয়ে সুদক্ষ নাপিত গৌফটোফ ছেঁতে একটা ব্যালাপ নিয়ে আসতে পারে। তার হাতে বানরের রুটি ভাগের মতো বা দিকের গৌফ ছোট তো ডান দিকেরটা বড় হয়ে যাচ্ছে। ফের ডান দিকেরটা ছোট তো বাঁ দিকটা বড় থেকে যাচ্ছে। ডেবিট ক্রেডিট সমান হচ্ছে না, ব্যালাপ-শিট মিলছে না।

মাঝপথে হাল ছেড়ে দিল হেমাঙ্গ। যা হয়েছে তাই থাক। যা হল তা অবশ্য নয়নসুখকর নয়। আঁচড়ানোর পর দেখা গেল, নাকের নিচে দু'দিকে দুটো ছোটখাটো ঝাঁটা উচিয়ে রয়েছে। গৌফের এই ছিঁরি নিয়েই তাকে আজ বিকেলের ফ্লাইটে দিল্লি যেতে হবে, অফিসের কাজে।

ফটিকে ডেকে বলল, গৌফটা কেমন হল বলো তো ফটিকদা!

ফটিক খুব ভাল করে নিরীক্ষণ করার পর বলল, ভালই দেখাচ্ছে। মিলিটারিদের মতো।

তার মানে কি?

আজ্ঞে ভালই।

তুমি গৌফের কিছু বোঝো?

ফটিক এক গাল হেসে বলল, আপনিই কি আগে বুঝতেন? আজকাল গৌফদাড়ি রেখে মুখখানা সৌন্দর্য বানিয়ে কি মুখ হচ্ছে তাও তো ভেবে পাই না। দিন না ও আপদ নিকেশ করে। কামিয়ে ফেলুন।

হেমাঙ্গ আঁতকে উঠে বলে, ও বাবা! কামাতো কি? গৌফদাড়ি এখন আমার খুব দরকার।

সে দরকার হয় ফেরারিদের। খুনটুন করে যারা গা ঢাকা দেয়। আপনার ওসব কি দরকার? সুন্দর মুখখানা কি যে ছিরি করে রেখেছেন।

নাঃ, তুমি এর মর্ম বুঝবে না।

দিল্লি যাবে বলে আজ অফিসে যাওয়ার কথা নয় তার। কিন্তু ঘরে শুয়ে বসে সময় কাটাতেও তার আজকাল ভাল লাগে না। কোথাও যাওয়ার নেই তেমন। এলোমেলো উদ্দেশ্যহীন খানিকক্ষণ ঘুরে আসা যায় মাত্র।

পোশাক পরে বেরোতে যাবে ঠিক এমন সময়ে চারুশীলার ফোন এল।

ওরে হেমাঙ্গ, এবার আমি পাগল হয়ে যাবো।

সে তো তুই আছিসই একটু। নতুন করে হওয়ার কিছু নেই।

শোন, পিন্টু সাইকেলের জন্য ভীষণ বায়না করছে। সামলাতে পারছি না। তুই নাকি ওকে সাইকেল কেনার টাকা দিয়েছিস?

সাইকেল! সাইকেলের জন্য বায়না করছে তো কিনে দে না, এর জন্য পাগল হওয়ার কি আছে?

তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? পিন্টু দু'চারক সাইকেল চাইছে। বলছে এখন থেকে সাইকেলেই স্কুলে যাবে।

মাই গড!

তুই-ই ওকে লাই দিয়ে মাথায় তুলছিস। কেন যে টাকাটা ওকে দিতে গেলি। এখন এসে ভাগ্নেকে সামলা।

খুব জেদ ধরেছে নাকি?

ভীষণ।

ও তো জেদী ছেলে নয়। ঠাণ্ডা, শান্ত, বাধ্যের ছেলে।

কি জানি, কাকে দেখে যেন মাথায় ভূত চেপেছে। ওর এক ক্লাসমেট নাকি রোজ সাইকেলে স্কুলে যায়। তার মা-বাবারও বহিহারি বাবা, ওইটুকু দুধের শিশুকে সাইকেলে কলকাতার অসভ্য বাস মিনিবাস ট্যাক্সির মুখে ছেড়ে দিচ্ছে। একটু ভয় নেই! এখন তুই এসে যদি কিছু করতে পারিস।

পিন্টুকে খুবই ভালবাসে হেমাঙ্গ। আর একটু যখন ছোট ছিল তখন দেবশিশুর মতো লাগত। এখনও সুন্দর, তবে লম্বা হয়েছে একটু। সামান্য এক পর্দা ফারাক হয়েছে। আজকাল আর কোলে চড়ে না, হামি দেয় না, বন্ধুবান্ধব আর খেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। পিন্টু এখনও তার ভীষণ প্রিয়।

চারুশীলার বাড়িতে হাজির হয়ে সোজা দোতলায় উঠে হেমাঙ্গ হাঁক মারল, কোথায় রে পিন্টু?

নিজের পড়ার ঘর থেকে পিন্টু বেরিয়ে দরজায় দাঁড়াল। মুখে সলজ্জ হাসি।

বায়না করেছিলি?

পিন্টু মুখ লুকিয়ে ফেলল। তারপর বলল, মা সবসময়ে এত ভয় পায় কেন বলো তো!

তোর মায়ের চেয়ে আমি বেশি ভয় পাই।

রাজ্যের অবাক বিশ্বয় চোখে নিয়ে তার দিকে উর্ধ্বমুখে চেয়ে পিন্টু বলল, তাহলে যে তুমি কিনতে বললে?

আমার দোষ কি জানিস? অর্ধেক কথা বলতে ভুলে যাই। আমি তোকে বলতে চেয়েছিলাম, সাইকেল কিনে নিস আঠারো বছর বয়স হলে। ওই আঠারো বছরটা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।

আঠারো বছর বয়স হলে কেন?

কারণ আছে। আঠারো বছরে লোকে অ্যাডাল্ট হয়।

পিন্টু একটু হাসল, সত্যি?

সত্যি।

তাহলে টাকাটা তুমি নিয়ে নাও, আঠারো বছর বয়স হলে দিও।

না না, কিছু দিয়ে ফেরত নিলে কালিঘাটের কুকুর হয়। এক কাজ কর, টাকাটা মাকে দিয়ে দে।

মা কিনে দেবে না কিন্তু।

মা কিনে দেবে না, জানি। কিন্তু তোর আঠারো বছর বয়স হলে আমিই ও টাকা তোর মার কাছ থেকে নিয়ে কিনে দেবো।

মা আমাকে খুব বকেছে।

সেইজন্যেই তো তোর মায়ের সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে এসেছি। আজ দারুণ ঝগড়া করব। ফাটাফাটি হয়ে যাবে। শুনি নাকি ঝগড়াটা?

হি হি। তুমি তো হেরে যাও।

তোর মা আমার দিদি তো, বয়সে বড়, তাই মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে হেরে যাই। কিন্তু আজ দারুণ ফাইট দেবো। দেখবি?

পারবে ? মাও খুব ভাল ঝগড়া করতে পারে ।

রোজ করে নাকি ?

সবাইকে বকে তো । সেটাই তো ঝগড়া, না ?

হ্যাঁ, বটেই তো ।

পিন্টুর মাথায় একটু হাত বুলিয়ে ছেড়ে দিল হেমাঙ্গ । পিন্টু পড়তে গেল ।

তার পর দেয়ালে মন্ত অয়েল পেন্টিংটার দিকে নজর পড়ল হেমাঙ্গর । এটা আগে ছিল, না তো! কাছে গিয়ে দেখল, একটি গ্রাম্য বাড়ির উঠানে নানা ধরনের গৃহকর্মের রত কয়েক মহিলার ছবি । সকালের রোদ, গাছের সবুজ, উঠানের মেটে রং, ঘাগরা, চোলি সব আলাদা উজ্জ্বল রঙে দক্ষ হাতে আঁকা । সমস্ত ছবিটার মধ্যে একটা নৃত্যপূর আনন্দের আভাস রয়েছে । দেখলেই মনটা ভাল হয়ে যায় । একটু বৃক্কে ছবির নিচে ডান ধারে শিল্পীর স্বাক্ষর দেখে বিস্ময়ে ঙ্গ উচু হল তার । হুসেনের ছবি! এর তো অনেক দাম । পাওয়াও কঠিন । হুসেনের ছবি তো আঁকার আগেই আগাম বিক্রি হয়ে যায় । এ বাড়িতে ছবির সমঝদারই বা কে আছে ?

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আপন মনেই বলল, হুঁ ।

একটি ওরিয়ন্টাল হুসেনের দাম নিশ্চয়ই লক্ষাধিক টাকা । বা তারও অনেক বেশি হয়তো ডবল । কোনও কালেক্টরের কাছ থেকে কিনতে গেলেও আরও বিচ্ছিরি রকমের বেশি ।

ঝুজতে ঝুজতে চারুশীলাকে এই বিচিত্র বাড়ির আড়াইতলার একটা চাতালে পাওয়া গেল । একখানা চৌকো, প্রায় প্যানোরামিক জানলার চওড়া সিল-এর ওপর বসবার গদি পাতা । মুখোমুখি বসে খুব হাসাহাসি করছে চারুশীলা আর অন্য একটা মেয়ে ।

এই যে! কখন এলি ?

হেমাঙ্গ ঙ্গ কুঁচকে বলল, গত আধঘন্টা ধরে এই ভুলভুলাইয়াতে তোকে খুঁজে বেড়াছি ।

মিথাক! আমি জানলার ধারে বসে রাস্তার দিকে লক্ষ রাখছি । তোর গাড়ি এলে দেখতে পেতাম ।

গাড়ি আসেনি । তবে আমি যে এসেছি সেটা তো মিথ্যে নয়! পিন্টুর সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলছিলাম ।

কি হল শুনি!

ও টাকাটা তোর কাছে জমা দেবে । আঠারো বছর বয়স হলে সাইকেল কিনবে । আমাকে কথা দিয়েছে ।

বাঁচলাম বাবা । যা সমস্যায় ফেলেছিল ।

না, এখনও বাঁচিসনি । তোর আরও একটা ফাঁড়া আছে ।

কিসের ফাঁড়া ? বলে অকৃত্রিম বিস্ময়ে চাইল চারুশীলা ।

হলঘরের ছবিটা কে কিনেছে ?

কেন, আমি!

তুই!

কেন, আমি কিনতে পারি না ?

তুই শকুনের ডিমও কিনতে পারিস, কিছু অবিস্বাসের নেই । কিন্তু ছবির তুই কী বুঝিস ?

ইস, ছবি যেন তুই বড় বুঝিস!

হ্যাঁ, আমিও বুঝি না । কিন্তু আমার মজ্জেলরা তাদের ব্র্যাকমানি দিয়ে আজকাল ছবি কিনে রাখছে । সেটাও ব্যবসা ।

আর্ট না বুঝলেও ছবির কয়ার্শটা আমি জানি । তোর কি ব্র্যাকমানি প্রবলেম ? টাকাটা লগ্নি করে রাখলি ?

কী পাজি আর জংলি তুই! আমি বুঝি তোর পেটমোটা, পোভী, জোঁচোর মজ্জেলদের মতো ? ওরকম আনকালচার্ড, নডিস, আনএডুকেটেড ?

তুই যে ছবির ছ-ও বুঝিস তা তো জানতাম না । জীবনে একটাও এগজিভিশনে যেতে দেখিনি, ছবি নিয়ে কোনওদিন একটাও কথা বলিসনি । কবে সমঝদার হলি বল তো!

আমার বাড়িতে কত আর্টের বই আছে জানিস!

জানি । তুই সেগুলোর পৃষ্ঠাও উল্টে দেখিস না কখনও । বইগুলো সুব্রতদার । ভদ্রলোক আর্কিটেক্ট, তাকে আর্টের খোঁজখবরও রাখতে হয় । কিন্তু তুই! তোর কবে থেকে আর্টের নেশা হল ? নাকি স্ট্যাটাস সিঙ্কল । আজকাল ঘরে পেইন্টিং ঝোলানো অবশ্য একটা ফ্যাশন হয়েছে ।

চারুশীলা রাগ করতে গিয়েও হেসে ফেলল, একটা পেইন্টিং কিনেছি বলে কেমন হিংসেয় জুলে যাচ্ছে দেখ । তুই যে শুষ্কের আজোজ্জ্বল জিনিস কিনে ঘরে জঙ্গল বানাজিস!

হেমাঙ্গ ব্যথিত হয়ে বলল, আজকাল কিনি না । আমার বৈরাগ্য আসছে । কিন্তু তুই সত্যিই পরয়া খরচ করে হুসেনের ছবি কিনেছিস এটা ভাবা যাচ্ছে না । ওটার অনেক দাম ।

ভাল জিনিসের দাম একটু হবেই ।

হেমাঙ্গ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, সত্যিই আজকাল আমি তোকে আর বুঝতে পারছি না । তুই রহস্যময়ী হয়ে যাচ্ছিস ।

যে মেয়েটা চারুশীলার মুখোমুখি বসে আছে সে হাঁটুর ভাঁজে মুখ লুকিয়ে একটু হাসছে । শ্রুণ্টা চেনা । ঠিক চিনতে পারছিল না হেমাঙ্গ । সে বেশি তাকায়ওনি । মেয়েদের দিকে সে কমই তাকায় ।

চারুশীলা মেয়েটার দিকে চেয়ে বলল, শুনলি তুই ওর কথা ? আমি নাকি আর্ট বুঝি না, ছবি কেনা নাকি আমার ইনডেন্টমেন্ট! অ্যাকাউন্টপ্লি করে করে আর বদ লোকদের চুরির কাজে হেলপ করে করে ওর মনটাই হয়ে গেছে পিশাচের মতো । সবাইকেই সন্দেহ করে ।

মেয়েটা মুখ তুলল না।

চারুশীলা নেমে পড়ল সিল থেকে। অগোছালো চুল খোঁপায় বাঁধতে বাঁধতে বলল, তোর চেহারাটা দিন দিন ট্র্যাফিক পুলিশের মতো হয়ে যাচ্ছে কেন রে ? ইস, কি বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে! একটুও ভদ্রলোকের মতো নয়।

ওটা দৃষ্টিভঙ্গির তফাত। পৌরুষ জিনিসটা তুই তো বুঝিস না।

পৌরুষ বুঝি আজকাল দাড়ি-গোফে গিয়ে ঢুকেছে ?

হেমাঙ্গ সামান্য অন্ততঃ গলায় বলে, গোফটা আজ ছাঁটতে গিয়ে ডেবিট ক্রেডিট ঠিক মিলল না।

তাই বল! গোফ ছেঁটেছিস! তাই কেমন পাগলা মেহের আলি বলে মনে হচ্ছে।

মেহের আলি কে ?

চারুশীলা হঠাৎ নাটুকে গলায় হাত তুলে চোঁচিয়ে উঠল, তফাত যাও! তফাত যাও! সব বুট হ্যাঁয়!

ওঃ! ক্ষুধিত পাষণ!

যাক! আমি ভেবেছিলাম এটাও বুঝি ধরতে পারবি না! তোর পড়াশুনা এত কম। ঝুমকির সামনে কী লজ্জায় পড়তে হত তাহলে!

ঝুমকি! বলে অবাধ হয়ে মেয়েটার দিকে তাকাল হেমাঙ্গ। তারপর বলল, ইনি কোন ঝুমকি ?

ওমা, আমার কাছে আবার আর কোন ঝুমকি আসবে ? তোর মাথাটাই গেছে দেখছি। নাকি চোখের দোষ!

ঝুমকি মুখ তুলে হাসি মুখে বলল, উনি সেদিন মিস্টার বিশ্বাসের বাড়িতেও আমাকে প্রথমে চিনতে পারেননি।

হেমাঙ্গ লজ্জা পেয়ে বলল, তা নয়। আপনার চেহারা পাল্টে যাচ্ছে।

তাই নাকি ? কই আমি তো বুঝতে পারি না!

একটা শ্বাস ফেলে হেমাঙ্গ বলল, হয়তো কসমেটিক সার্জারি কিংবা যোগ, কিংবা আর কিছু করেছেন আপনি।

ঝুমকি এত হাসল যে ফের মুখ চাপা দিতে হল তাকে।

চারুশীলা তার মাথায় একটা গাঁট্রা মেরে বলল, বুদ্ধ আর কাকে বলে!

হেমাঙ্গ সত্যিই একটু অবাধ হয়েছে। এ মেয়েটা যে ঝুমকিই তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু ওর চেহারায যে একটা পরিবর্তন হয়েছে সেটাও মিথ্যা নয়। কিন্তু পরিবর্তনটা কিরকম তা সে ধরতে পারছে না।

চারুশীলা বলল, ঝুমকি, হয়তো এ বোকটা খুব একটা ভুলও বলেনি। হিসেবী চোখ তো। তোর চেহারা যে একটু ভাল হয়েছে সেটা ওর চোখ দিয়েই পরীক্ষা হয়ে গেল। চার কেজি ওজন বাড়ি সার্থক হল।

ওজন! বলে হেমাঙ্গ একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল। কিন্তু মুখে আর কোনও কথা এল না। ঠিকই, কৃষ্ণজীবনের বাড়িতেও মেয়েটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার এবং প্রথম দর্শনে সে কয়েক পলক চিনতে পারেনি একে। মেয়েটা একটু চেস দিয়ে কি এক-আধটা কথা বলেছিল তাকে। আর ঘুরে ঘুরে তাকে দূর থেকে লক্ষ্য করেছিল।

দোতলার হলঘরে এসে বসল তারা। কফি এল। হেমাঙ্গর অবাধ্য চোখ বারবার ঝুমকির মুখের ওপর এবং চারদিকে ওড়াউড়ি করছিল। মার চার কেজি মাংস বা চর্বি বাড়লে এতটা পাল্টে যায় মানুষ! ডেবিট ক্রেডিট আজ কিছুতেই সমান হতে চাইছে না। হিসেবের গণগোল হয়ে যাচ্ছে। ব্যালাপ শিট মিলছে না।

একটু আনমনা ছিল হেমাঙ্গ, চারুশীলা হঠাৎ বলল, তুই ঝুমকিকে অত লজ্জা পাচ্ছিস কেন বল তো!

হেমাঙ্গ অবাধ হয়ে বলে, লজ্জা! লজ্জার কী আছে ?

লজ্জার অবশ্য তোর একটা কারণ আছে। তুই ঝুমকিকে একটা চাকরি করে দিতে পারিসনি।

হেমাঙ্গ বিরত হয়ে বলল, উনি তো মোটে একবারই আমাকে অ্যাপ্রোচ করেছিলেন, তারপর আর কখনও বলেননি। আমি ধরে নিয়েছিলাম হয় উনি চাকরি পেয়ে গেছেন, নয়তো দরকার নেই।

ঝুমকি নিজের যোগ্যতাতেই একটা চাকরি পেয়ে গেছে। সামনের মাসে জয়েন করবে। খুব ভাল চাকরি অবশ্য নয়। মাইনে খুব কম। তবে পরে বাড়াবে।

হেমাঙ্গ ঝুমকির দিকে একঝলক চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে কফির কাপে মুখ দিতে দিতে বলল, ভালই তো। তবে আজকাল চাকরির বকলমে নানারকম এক্সপ্রয়টেশন হয়। সেটা সম্পর্কে একটু কেয়ারফুল থাকবেন।

ঝুমকি বলল, কিরকম এক্সপ্রয়টেশন ?

এক্সপ্রয়টেশনের ভারাইটি এবং ম্যাগ্নিচুড এত বেশি যে স্পেসিফাই করা মুশকিল। কখনও সূক্ষ্ম, কখনও স্থূল।

চারুশীলা একটা ধমক দিল, ওর কথা শুনিস না তো ঝুমকি! নিজে একটা চাকরি দিতে পারেনি, এখন জ্যাঠামশাইয়ের মতো উপদেশ দিতে লেগেছে।

হেমাঙ্গ একটু দম নিয়ে বলল, সেটা ওর ইচ্ছে। তবে তুই এত সুখের মধ্যে থেকে তো ওয়াকিং গার্লদের সমস্যা বুঝতে পারবি না। গোলাপি চশমা দিয়ে দুনিয়া দেখছিস।

আমার বর যদি আমাকে সুখে রেখে থাকে তাতে তোর হিংসে হয় কেন রে ? বেশ করব গোলাপি চশমা দিয়ে দুনিয়া দেখব।

যত খুশি দেখ, কিন্তু ওঁকে গোলাপি চশমাটা পরানোর চেষ্টা না করাই ভাল।

ঝুমকি এবার মৃদুস্বরে বলল, হেমাঙ্গবাবু ঠিকই বলেছেন মাসি। দেয়ার আর প্রবলেমস্। তবে আমি এত ভয় পাই না। আমাকে সহজে এক্সপ্রয়ট করা যাবে না।

হেমাঙ্গ জানে, সব মেয়েই এরকম ভাবে। কিন্তু চারদিকে এত সূক্ষ্ম জাল আর ফাঁদ থাকে যে, শেষ অবধি সামাল দিতে পারেনা। কিন্তু সে আর এ নিয়ে কথা বলল না। চুপ করে রইল।

চারুশীলা কোনও মুড়ই বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনা। হঠাৎ বলল, এই, তুই অমন গোমড়া মুখ করে আছিস কেন রে ? দু'চক্ষে গোমড়া মুখ দেখতে পারি না। আজ মাছের রোস্ট হচ্ছে, একটু খেয়ে যা।

আমার খিদে নেই।

ডায়টিং করছিস নাকি? চেহারা তো হাড়গিলের মতো হচ্ছে।

চেহারা! চেহারা নিয়ে তারাই ভাবতে পারে যাদের হাতে অচেল সময় আছে। আমাদের ফালতু সময় নেই।

জানা আছে। বেশি বকিস না। যখন সুন্দরবনে গিয়ে বিরহী যক্ষের মতো বসে থাকতি তখন সময় হয়েছিল কি করে?

সেটা অন্য ব্যাপার।

কাওয়ার্ড কোথাকার! সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেললি। এখন দাড়ি রেখে দেবদাস সাজছে।

হোমাস হেসে ফেলল। বলল, দেবদাস দাড়ি রাখত নাকি?

তা কে জানে! তোর ওপর এত রাগ আমার!

সক্রে সাতটার দিল্লি ফ্লাইটে প্রেনের আইল সিটে বসে হোমাস খুব আনমনে এক কাপ কফি খেল। খাবারটা নিলই না। কেন কে জানে আজ নিজেকে সে ঠিক বুঝতে পারছে না। যেন একই শরীরে দু'জন বসে আছে। চেনা হোমাস আর অচেনা হোমাস।

দিল্লিতে নেমে ট্যাক্সি নিয়ে পাঁচতারা কলমলে হোটেল পৌছনো, পাঁচতারা ওঠা, ঘরে ঢোকা, জামাকাপড় পাল্টানো, ক্রায়েটকে ফোন করে পৌছ-সংবাদ দেওয়া সবই যেন ঘটছিল একটা ঘোরের মধ্যে। এই হোটেলের ডাড়া, ডিনার-লাঞ্চ-ব্রেকফাস্টের পয়সা সবই দেবে তার ক্রায়েট। তবু ডিনারটা সে খেল না। ফ্রিজ থেকে একটা কোন্ড ড্রিং বের করে খুব আন্তে আন্তে খানিকটা খেল। তারপর বাতি নিবিয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকল সে।

মনটা বিষণ্ণ।

কখন ঘুমিয়ে পড়ল, টেরও পেল না সে।

রবিবার সকালের ফ্লাইটে তার ফেরার কথা ছিল। কিন্তু সে ফিরে এল শনিবার রাতেই। তার মনের মধ্যে একটা ভীষণ তাড়াহুড়া, একটা ভীষণ অস্থিরতা। যেন সময় বয়ে যাচ্ছে, যেন এখনই কী একটা কাজ তাকে সেরে ফেলতে হবে।

রবিবার ভোর রাতে উঠে সামান্য জিনিসপত্র গুছিয়েই সে বেরিয়ে পড়ল। ক্যানিং, নদী, নৌকো, তার পরই তার নদীর ধারের ঘরখানা। আঃ, কী আনন্দ! কী স্বস্তি!

বাসন্তী যেন হাওয়ার মুখে খবর পেয়ে ছুটে এল, ওমাঃ তুমি এসে গেছ? এবার কতদিন পর এলে বলো তো! আমি তো ফি শনিবার ভাবি, আজ আসবেই আসবে।

হোমাস অকপট হেসে বলল, ভাবিস?

ভাবব না? ও কি, দাঁড়াও, দাঁড়াও, হট করে বিছানায় উঠো না। ঘরদোর পরিষ্কার করি, বিছানা ঝেড়ে দিই, কাচা সাদর পাতি, তবে না! যাও, হাতমুখ ধুয়ে এসো ভাল করে।

আজ কী খাবো রে? বাজার তো নেই।

সে তোমাকে ভাবতে হবে না। দশটা টাকা দাও, সব নিয়ে এসে রান্না করে দিই। ততক্ষণ জিরোও।

হোমাস মাথা নেড়ে বলল, জিরোবো না। নৌকো করে একটু ঘুরে আসি। উঃ, কী যে ভাল লাগছে এসে!

হোমাস বেরিয়ে পড়ল। বিশাল নদী, বিশাল আকাশ, বিশাল ব্যাঙ চরাচর যেন কোল পেতে আছে তার জন্য। বাতাস এসে সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, খেলা করছে এলোমেলো চুলে, দাড়িতে।

নৌকো করে অনেক দূর গেল হোমাস। রূপমুগ্ধ দুটি চোখ দিয়ে পৃথিবীকে পান করতে লাগল। ভিতরে কী তেঁটটাই না জমে ছিল তার!

যখন দুপুরে স্নান করে খেতে বসেছে তখন বাঁকা মিঞা এল।

আবার এলেন! এবার বেশ দেরি করে এলেন। আমি তো ভাবলাম শখ মিটে গেছে।

হোমাস হাসল। বলল, না, শখ আরও বেড়েছে। আবার ঘন ঘন দেখতে পাবে আমাকে।

বিয়েটিয়ে কি শিকয়ে তুলে রাখলেন?

হোমাস ফিচেল হাসি হেসে বলল, ভাবছি এদিককারই কোনও গায়ের মেয়েকে বিয়ে করব। এখানেই থাকব। তুমি বরং পাট্টা খোজ করতে লেগে যাও।

বাঁকা মিঞার বাক্য হরে গেল। তারপর খুব হাসতে লাগল সে।

॥ ৮৩ ॥

বামাচরণকে প্রথমটায় চিনবেই পারেনি বিষ্ণুপদ। দু'গালে বিজবিজ করছে কাঁচা-পাকা দাড়ি, চুলও লম্বা হয়ে জট পাকানোর জোগাড়, চোখ ঘোলাটে। বেশ রোগাও হয়ে গেছে। চিনতে কষ্ট হল খুব। বামা প্রণাম করে দাঁড়ানোর কয়েক লম্বা পর বিষ্ণুপদ বলল, আয়, বোস।

বামা শানের ওপরেই বসে পড়ল। বিষ্ণুপদ লক্ষ করল, বামার জামাকাপড়ের অবস্থাও ভাল নয়। ময়লা হাকুচ একটা হাওয়াই শার্ট আর তেলচিটে একটা প্যান্ট। এত ময়লা যে রঙ বোঝা যায় না। চটিজোড়াও লক্ষ করল বিষ্ণুপদ। সিঁড়িতে ছেড়ে রাখা একজোড়া হাওয়াই। তলা ক্ষয়ে গেছে। বামার ছেলেপুলে নেই। পিওন বা আর্দলিগোছের চাকরি করলেও সরকারি পাকা চাকরি। তার এমন দুরবস্থা হওয়ার কথা নয়।

কি খবর রে?

এই এলাম। গলায় যেন জোর নেই বামার।

কোথায় আছিস এখন?

শ্বশুরবাড়িতেই ছিলাম এতদিন। এখন একটা ঘর ভাড়া করতে হয়েছে। শ্বশুরবাড়িতে খুব অশান্তি হচ্ছিল।

কিসের অশান্তি ?

সবকী আর তার বউ অশান্তি করছে। থাকতে দিচ্ছে না।

একটা শ্বাস ফেলে বিষ্ণুপদ বলল, তা কষ্ট করে থাকার দরকারটা কি ? তোর ঘর তো ফাঁকা পড়েই আছে এখানে।
তোর মায়েরও হচ্ছে।

কিন্তু শ্যামলী চাইছে না। কী করব বলুন তো!

বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বল। বউমার এখানে অসুবিধে কি ?

এখানে আসতে চায় না। বলছে তার ভাগের সম্পত্তি বাবদ যা টাকা পাওনা হয় তা দিয়ে দিতে। সেই জন্যই আসা।

বিষ্ণুপদ একটু চুপ করে থেকে বলে, টাকা! টাকাটা দেবে কে ? তোর ভাগের অংশটা যদি কেউ কেনে ভাবে হয়তো হয়। কিন্তু সে তো অবাস্তব কথা। এ হল দখলের জমি, সেই পাটিশনের পর কিছু মাতব্বর মুকুবি এসব জায়গায় আমাদের বসিয়ে দেয়। দলিরপত্রের কারবার ছিল না। এখানকার বসতবাড়ির ভাগ কিনবেই বা কে!

রামজীবনকে বলুন, সে কিনে নিক।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলল, তোরা কি রামজীবনের অবস্থা জানিস না নাকি ? সে টাকা কোথায় পাবে ? কিনবেই বা কেন ? ওসব বুদ্ধি করে লাভ নেই। এখানে বসবাস করতে পারিস, সেটাই সোজা।

বামাচরণ মাথা নেড়ে বলল, আমি কিছু জানি না। আমার টাকার দরকার।

বামাচরণের গলার আওয়াজটা হঠাৎ যেন একটু কেমন-কেমন ঠেকল বিষ্ণুপদের। বামাচরণ যেন আগের মতো নেই। অন্যরকম হয়ে গেছে। সেটা ভাল মনে হচ্ছে না তার।

বিষ্ণুপদ বলল, টাকার দরকার কার নয় ? কিন্তু ব্যবস্থা কি করে হবে তাই ভাবছি। তুই বরং আজকের দিনটা থেকে যা। রামজীবনের সঙ্গে কথা বলে দেখ।

বামা একটু কৃষ্ণ গলায় বলে, ওর সঙ্গে কথা বলতে যাবো কিসের জন্য ? আমি ওসব পারব না বাবা। ব্যবস্থা যা করার আপনিক করে দিন।

বিষ্ণুপদ অবাক হয়ে বলে, আমি! আমার টাকা কোথায় দেখলি তুই ? আমি টাকা দেবো কোথেকে ?

বামাচরণ যে তা জানে না তা নয়। খুব ভাল করেই জানে। তবু কেমন অসহিষ্ণু গলায় বলল, তা আমি জানি না।

গতিকটা ভাল ঠেকছে না বিষ্ণুদার। নয়নতারা বাড়িতে থাকলে একটু সুবিধে হত বিষ্ণুপদের। কিন্তু আজ বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীর জন্য বাতাসা আনতে দোকানে গেছে। একবার বেরোলে নয়নতারা চট করে ফেরে না, পাঁচ বাড়ি ঘুরে গল্পসল্প করে আসে।

বিষ্ণুপদ গলাখাকার দিয়ে অবস্থিতি ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে বলল, ঠাণ্ডা হয়ে বোস। তোর মা একটু বেরিয়েছে, আসুক।

বামাচরণ বসে বসে অন্য দিকে চেয়ে হঠাৎ বিড়বিড় করতে লাগল আপনমনে। এরকম আগে দেখিনি ওকে বিষ্ণুপদ। আগে তো এসব ছিল না! কী বিড়বিড় করছে তা শোনার জন্য বিষ্ণুপদ একটু ঝুঁকল। তার কানটা গেছে। ইদানীং কানে একটু যেন কম শুনতে পায়। তবু দু'-চারটে কথা কানে এল তার। বামাচরণ বলছে, চালাকি হচ্ছে ? অ্যা! চালাকি হচ্ছে ? বাপের নাম ভুলিয়ে দেবো... শুয়োরের বাচ্চা...

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিষ্ণুপদ ফেরে সোজা হয়ে বসল। নিজের ওপর কি বামার বশ নেই ? লক্ষণ তো ভাল নয়!

এ কথা ঠিক যে সব মানুষেরই ভিতরে নানা উল্টোপাল্টা কথা প্রায় সব সময়েই ভুরভুরি কাটে। সব মানুষই ভিতরে ভিতরে অল্পবিস্তর পাগল। পাগল ভিতরটাকে চেপে ঢেকে রেখেই মানুষকে চলতে হয়। যখন মানুষ নিজের ওপর বশ হারিয়ে ফেলে তখন বিড়বিড় করে, একা একা কথা কয়। বামার হলটা কী ?

বিষ্ণুপদ সম্বোধে ডাকল, বামা!

বামাচরণের বিড়বিড় খামল। স্বাভাবিক গলায় বলল, কি বলছেন ?

তিন-চার মাস কোনও খবর দিলি না। কেমন ছিলিটিলি সব খুলে বলবি তো!

বামাচরণ ভিত্তি গলায় বলল, আমার খবর জেনে আপনারদের কী হবে ? আমি যে আপনার ছেলে সেটাই তো আপনারা স্বীকার করেন না। ময়ের-ধরে বাড়ির বার করে দিলেন। এখন আর খবর জেনে কী হবে ? দাদাকেও এইভাবে তাড়িয়েছিলেন। তাতে দাদার কাঁচকলা হল। সে এখন সাততলায় থাকে, মোটা মাইনে পায়, এরোপ্লেনে ঘোরে।

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, কৃষ্ণকে বড় অপমান করা হয়েছিল, সে ঠিক কথা। অপমান যারা করেছিল তার মধ্যে তো তুইও ছিলি বাবা। ভুলে গেছিস সব ? তাদের ঠাণ্ডা করতে আমি তাদের হাতে-পায়ে অবধি ধরেছিলাম।

বামাচরণ চট করে কথা পাটে ফেলে বলল, ওসব পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে কী হবে ? ওসব ছাড়ুন। আমাকে যখন তাড়িয়েই দিয়েছেন তখন আমার ন্যায্য পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিন। আর জীবনে কখনও আপনারদের মুখদর্শন করব না।

বিষ্ণুপদ মৃদুস্বরে বলল, তোকে কেউ ত্যাগিনি। তুই নিজে থেকেই গেছিস। ঝগড়াঝাঁটি সব সংসারেই আছে। অত গায়ে মাখতে নেই।

ওসব উপদেশ দিয়ে লাভ হবে না বাবা। আমি ভাগের টাকা চাই। হিসেব করে দেখছি আমার যা ভাগ আছে তাতে আমার ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা পাওনা হয়।

কত বললি ?

ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার। কম করেই ধরেছি। টাকাটা ফেলে দিন, আর আসব না।

বিষ্ণুপদ অসহায়ভাবে মাথা নেড়ে বলে, এ সম্পত্তির কত দাম তার কোনও আন্দাজই নেই আমার। হিসেব শুনে কী হবে ? তবে টাকাটা অনেক টাকা বটে।

বামাচরণ একটু রুখে উঠে বলে, আপনার কি ধারণা আমি বেশি চাইছি ?
 বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, না রে, আমার কোনও ধারণাই নেই। বললাম তো। একটা কথা শুনবি আমার ?
 বলে ফেলুন।
 বউমাকে একবার নিয়ে আয়। তাকে একটু বুঝিয়ে বলি।
 সে আসবে না। এ বাড়ির ছায়াও মাড়াবে না। তাকে কী বোঝাতে চান আপনি ? বুঝিয়ে-টুঝিয়ে কিছু হবে না। টাকা দিয়ে দিন, আমাদের সঙ্গে আর সম্পর্ক থাকবে না।
 বিষ্ণুপদ মৃদু স্বরে বলল, বামাচরণ, সম্পর্ক ছাড়া আর কিসের জোরে তা হলে সম্পত্তির ভাগ চাইছিস ?
 তার মানে ?
 বিষ্ণুপদ একটু মান হেসে বলল, ছেলে তার বাপের সম্পত্তি পায় কিসের জোরে ? বাপ-ছেলে সম্পর্কের জোরেই তে। তা হলে সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক থাকবে না বলে জোরগলায় বলতে আছে ? সম্পর্কই যদি নেই তা হলে উত্তরাধিকার বর্তায় কিসের জোরে ?
 বাজে কথা রেখে দিন, ওসব শুনে আমার লাভ নেই।
 একটু ঠাণ্ডা হ বাবা, বড্ড মাথা গরম করে এসেছিস আজ। একটু বিবেচনা করে দেখ। আমাদের অবস্থা তো জানিস, নুন আনেতে পাভা ফুরায়। তুই যে টাকার কথা বলছিস আমি একসঙ্গে অত টাকা জীবনেও দেখিনি।
 তা হলে রাড়িটা বেচে দিন। তারপর টাকা ভাগ করে দিন সকলকে।
 বাড়ি বেচলে আমরা যাবো কোথায় ?
 তার আমি কি জানি ?
 বিষ্ণুপদ শুক্ক হয়ে গেল। বামাচরণ কি পাগল হয়ে গেল নাকি ? শুক্ক হয়ে সে দেখল, বামাচরণ ফের লেবুগাছের দিকে চেয়ে বিভিবিড় করে যাচ্ছে একনাগাড়ে। ভাল কথা বলছে না। ভিতর থেকে নানা রাগ, ক্ষোভ, অভিমান দৃষ্টিত কথা হয়ে বেরিয়ে আসছে।
 পড়ন্ত দুপুর। রাজা ঘুম ভেঙে উঠে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে এদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে গেল একটু। বামাচরণকে দেখে অবাক হয়েছে। তারপর পুকুরের দিকে চলে গেল। বামা অবশ্য জেফেপ করল না। শুধু বিভিবিড় করে যেতে লাগল।
 নয়নতারা ফিরল যেন এক যুগ পরে। এক হাতে বাতাসার ঠোঙা, অন্য হাতে আত্মপদ্মব, আরও কি যেন।
 বিষ্ণুপদ একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল, এলে ? বামা এসে কতক্ষণ বসে আছে দেখ।
 বামা! বলে এক গাল হাসল নয়নতারা, বামা এলি ? এতদিন পর মনে পড়ল বাবা ? এমন ভুলে থাকতে পারিস কি করে ? কাল রাতেও তো তোকে স্বপ্ন দেখলাম।
 বামা উঠে মাকে তাড়াতাড়ি প্রণাম করল। একটু কাণ্ডজ্ঞান যেন এখনও আছে বামাচরণের। বলল, তোমাকে দেখতেই এলাম।
 বউমাকে আনিসনি ? সে এল না কেন ?
 তার সময় হয় না।
 রাগ করে আছে নাকি এখনও ?
 বামাচরণকে এই প্রথম হাসতে দেখল বিষ্ণুপদ। হেসে বলল, তা রাগ তো হতেই পারে।
 বোস বাবা, বোস। আমি সব রেখে আসি। চা খাবি তো!
 বেলাবেলি রওনা হতে হবে। পথ তো কম নয়।
 বোস একটু। ভাল করে মুখখানা দেখি।
 নয়নতারা ঘরে গিয়ে জিনিসপত্র রেখে বেরিয়ে এসে আঁচলে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, চেহারাটা এমন খারাপ করলি কি করে ? এ তো দেখছি ভীষণ শরীর ভেঙে গেছে।
 বামাচরণ একটা শ্বাস ফেলে বলে, শরীর ভাল যাচ্ছে না। পেটে অস্থলের ব্যথা হয় খুব।
 ইস! অস্থল বড় খারাপ অসুখ। ওষুধ খাস।
 বামাচরণ ভাল মানুষের মতো মাথা নেড়ে বলল, খাবো। আমাকে চাট্টি শুকনো মুড়ি দাও তো মা, পেটে কড়ার নিচে ব্যথা হচ্ছে। এই ব্যথাটাই আমাকে মেরে ফেলবে।
 বলাই ঘাট। আজকাল কত ওষুধ বেরিয়ে গেছে। কত ভাল ভাল ডাক্তার। বলে নয়নতারা ঘরে গিয়ে এক বাটি মুড়ি এনে দিল। বলল, একটু দুধ দিয়ে মেখে খাবি ? ভাল দুধ আছে।
 না মা। বলে মুড়ি চিবোতে থাকে বামাচরণ।
 তা হলে শশা কেটে দেবো ?
 বামাচরণ এ কথাটার জবাব না দিয়ে হঠাৎ বলে উঠল, আচ্ছা, বাগানের ওপাশে কুয়ার ধারে অত ইট কেন বসেো তো! ইট দিয়ে কী হবে ?
 বিষ্ণুপদ সতর্ক চোখে একবার নয়নতারার দিকে চাইল। কিন্তু নয়নতারার চোখ ছেলের দিকে একগাল হেসে বলল, শুনিসনি বুঝি! কৃষ্ণ যে আমাদের ঘরখানা পাকা করে দিচ্ছে। ইট সিমেন্ট বালি সব এসে গেছে। আর দু'-তিন দিনের মধ্যে ভাঙা শুক্ক হবে।
 বামাচরণ হাঁ করে মায়ের দিকে চেয়ে থেকে বেশ একটু বাদে বলল, কে পাকা করে দিচ্ছে ?
 কৃষ্ণ রে। আর কে দেবে ?
 বলাই কি ? এ খবর তো বাবা আমাকে বলেনি!
 বিষ্ণুপদ একটা শ্বাস ফেলে বলল, ফুরসত দিলি কই ?

বামাচরণ খানিকক্ষণ শুম হয়ে থেকে বলল, পাকা ঘর মানে কি ছাদও ঢালাই হবে ?
বিষ্ণুপদ কিছু বলার আগেই নয়নতারা বলে ফেলল, ও মা! ছাদ ঢালাই কী রে ? মস্ত দোতলা হবে যে! তিনতলায় ঠাকুরঘর হবে, ছাদ থাকবে।

ওঃ ! বলে বামাচরণ কেমন যেন হয়ে গেল। উত্তেজিত, ত্রুদ্র! মুড়ির বাটিটা হঠাৎ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, তাও বাবা বলছে যে টাকা নেই ? মিথ্যাবাদী কোথাকার! দালান হাঁকড়াচ্ছে, আর আমার ক'টা টাকা ফেলে দিতে হাত কুঁকড়ে যাচ্ছে!

নয়নতারা অবাক হয়ে বলে, কিসের টাকা ? কে তোর টাকা নিয়েছে ?
বিষ্ণুপদ তাড়াতাড়ি বলল, বামা আজ এ বাড়ির ভাগ বাবদ টাকা চাইতে এসেছে।

নয়নতারা অবাক হয়ে বলে, ভাগ বাবদ টাকা! সেটা আবার কী ?

ও তুমি বুঝবে না।

বামাচরণ গলা তুলে বলল, বেশ আছ তোমরা! পায়ের ওপর পা তুলে দোতলা বাড়িতে থাকবে। আর আমার ব্যবস্থা কী হবে ? আমার কথা একবারও ভাবলে না ?

নয়নতারা বলল, তোর কথা কী ভাবব ? তুই কি ভাবনার তোয়াক্কা করিস ?

বামাচরণ ক্ষিপ্তের মতো লাফিয়ে উঠে বলল, তোমাদের সব ষড়যন্ত্র এখন বুঝতে পারছি। দাদার সঙ্গে আর রামজীসের সঙ্গে ঘোট পাকিয়ে আমাকে তাড়িয়েছে যাতে বেশ ফাঁদিয়ে বড় বাড়ি তুলতে পারো! সব মতলব আমি বুঝতে পারছি। কী ভেবেছ তোমরা, আমাকে বঞ্চিত করে নিজেরা সব ভোগদখল করবে ? আমি আজই উকিলের কাছে গিয়ে ইনজাংশন বের করব।

বিষ্ণুপদ বলল, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা কর বাবা। একটু ঠাণ্ডা হয়ে বোস। ওরকম লাফালাফি করিস না। যা ভাবছিস তা নয়।

বামাচরণ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, আমি কিছু শুনতে চাই না। আমার টাকা দিয়ে দিন। আপনারা তিনতলা বাড়িতে থাকুন, আমি অন্য জায়গায় আমার ঘর তুলে নেবো। দিন টাকা।

কেন যে টাকা-টাকা করছিস! টাকা-পয়সা আমাদের কাছে থাকে না। কৃষ্ণ ঠিকাদার দিয়ে কাজ করিয়ে দিচ্ছে। ঠিকাদারের সঙ্গে তার বন্দোবস্ত। এর মধ্যে আমরা নেই।

মিথ্যে কথা বলছেন! আপনাদের আমি খুব চিনি। বদমাইসের ধাড়ি আপনারা। টাকা না দিলে বাড়ি আমি কিছুতেই করতে দেবো না।

কোথাও কিছু নয়, হঠাৎ শান্ত নয়নতারা রুখে উঠে বলল, এই মুখপোড়া, চোঁচাচ্ছিস যে বড়, তোর লজ্জা হয় না ?

লজ্জা! কিসের লজ্জা ?

তোর যদি মনুষ্যত্ব থাকত তা হলে চোঁচামেছি করে মা-বাপের সঙ্গে বীরত্ব না দেখিয়ে মাথা নিচু করে বসে থাকতি। কৃষ্ণ আমার আর একটা ছেলে, তোরই ভাই, নিজের টাকা দিয়ে দুঃখী মা-বাবার জন্য বাড়ি করে দিচ্ছে। আর তুইও আমাদের আর একটা ছেলে, সারা জীবন কী করেছিস বল তো আমাদের জন্য ? দু' টাকার মিষ্টিও কিনে এনেছিস হাতে করে ? রামজীবন মাতাল-বদমাস ঘাই হোক, যত বদনামই করিস, সেও বুক দিয়ে মা-বাপের জন্য করে। এসব দেখে তোর লজ্জা হয় না ? মুখ লুকোতে ইচ্ছে করে না ?

বামাচরণ কেমন একটু খতমত খেয়ে গেল। তবু একটু তেজ দেখিয়ে বলল, আমার টাকা থাকলে আমিও করতাম।

টাকা থাকলে করার লোক তুই ? বউয়ের আঁচল ধরে এ বাড়ি থেকে বিদেয় হয়েছিস, ফের বউয়ের হুকুমেই এসেছিস ফন্দি করে টাকা আদায় করতে। তোর লজ্জাশরম থাকলে করতিস এরকমটা ? বাপকে হুমকি দিচ্ছিস, সে নিরীহ লোক বলে। পারবি রেমোকে হুমকি দিতে ? বিষদাত ভেঙে দেবে।

বামাচরণ তবু একবার তড়পানোর চেষ্টা করে, তা হলে তোমরা সবাই একজোট হয়েছ ? সবাই মিলে আমাকে ফাঁকি দিয়ে দিবি আরামে থাকবে ? এই তোমাদের মনে ছিল তা হলে ?

কে তোকে ফাঁকি দিয়েছে ? তোর ঘর ওই তা পড়ে আছে। কেউ ঢোকেওনি, দখলও করেনি। ইচ্ছে হলে ফিরে আসতে পারিস। তা কি আর তুই আসবি ? সম্পত্তি সম্পত্তি করে হৈদিয়ে মরছিস, ক'লাখ টাকার সম্পত্তি আমাদের ? তোর বাবা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, ধারকর্জ করে এই ক'লাখ ঘর তুলেছিল অনেকদিনের চেষ্টায়। তুই বাপের জন্য কিছু করিসনি, মায়ের কথা ভাবিসনি, সম্পত্তির ভাগের বেলায় খুব তো বুঝ আছে!

নয়নতারার এই তেজ বহুকাল দেখিনি বিষ্ণুপদ। ছেলেমেয়েদের কাছে ভয়ে কেঁচো হয়ে থাকাই তার স্বভাব। আজ হঠাৎ এই তেজী ভাব দেখে বিষ্ণুপদ খুব অবাক হল। কিন্তু এই বয়সে উত্তেজনা ভাল নয়। রেগে গেলে শ্রেণার চড়ে বসবে।

বিষ্ণুপদ বলল, ওগো, আর নয়। এবার চূপ করো। তোমার মুখ খুব লাল হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা হও তো।

নয়নতারা বলল, ঠাণ্ডা হবো ? ওর লজ্জা করে না তোমাকে না হোক অপমান করে যেতে ? এই সংসারের জন্য, মা-বাপের জন্য, ভাইবোনের জন্য ও কোনও কালে কিছু করছে ? যা, তোর বউকে গিয়ে বল আমার পয়সাকড়ি দিতে পারব না, যা পারে করুক।

নয়নতারা আর বিষ্ণুপদ বরাবর একতরফা কথা শুনে যায়। কোনও দিন প্রতিবাদও করে না। আজ হঠাৎ নয়নতারার এই সাজাতিক রূপ দেখে বামাচরণ ঘাবড়ে গেল। শরীরও বোধ হয় যুতপের নয়। ধপ করে দাওয়ার মেঝের ওপর বসে পড়ল। কিছুক্ষণ বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে রইল চুপচাপ।

বিষ্ণুপদ নয়নতারার দিকে চেয়ে বলল, তুমি বরং একটা পান খাও।

আঁচলে মুখের ঘাম মুছে বলল, সংসার না নরক। সাধি থাকলে বুড়োবুড়ি কাশীবাসী হতাম।

বিষ্ণুপদ একটু হেসে বলল, এও কাশী। এই কাশীতে পাপক্ষয় হবে তাড়াতাড়ি। একটু পান মুখে দাও।

রাঙা তাদের দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়ে খর চক্ষুতে এদিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। অবস্থাটা জরিপ করল। এতক্ষণ আশেপাশে থেকে সবই শুনেছে। চেয়ে থেকে তারপর ঘরে চলে গেল।

বিষ্ণুপদ জানে, কৃষ্ণজীবন যে দোতলা বাড়ি করে দিচ্ছে এটা কেউ ভাল চোখে দেখবে না। রামজীবনকে টেক্সা দিয়ে দিল কৃষ্ণজীবন। রামজীবনের পাকা ঘর এখনও শেষ হয়নি। ছাদ-ঢালাইয়ের মুখে গিয়ে থেমে আছে। টাকা নেই। কৃষ্ণজীবন বাড়ি করে দিচ্ছে শুনে সেও প্রথমটায় রেগে গিয়ে বলেছিল, এ তো জুতো মেরে গরু দান। ওর বাড়িতে তোমরা থাকবে কেন ?

বিষ্ণুপদ বলেছে, সে আমাদের কোনও কালে অপমান করেনি, অনাদর করেনি। বরং তাকেই এখন থেকে তাড়ানো হয়েছিল। তার বাড়িতে থাকতে বাধা কী ? আদর করে দিচ্ছে। তোর পাকা ঘর হোক, তোরও তো দরকার।

রামজীবন খুশি হয়নি। তবে মেনেও নিয়েছে।

নয়নতারা বলেছে, কৃষ্ণ যখন দোতলা বাড়িই করে দিচ্ছে তখন তুই-ই বা আলাদা ঘরে থাকবি কেন ? নিচের তলায় তুই থাকবি, ওপরতলায় আমরা। আর বুড়োবুড়ি মরলে সবটাই তোর হবে।

রামজীবন এ কথাটা ভেবে দেখেছে। বলেছে, দাদার টাকা হয়েছে, করে দিচ্ছে। আমার টাকা নেই মা, কিন্তু আমার কলজেরটা আছে।

জানি বাবা, খুব জানি। তোর মতো কলজে কটা ছেলের থাকে ? কৃষ্ণকে ভুল বুঝিসনি বাবা, সে বড় ভাল ছেলে।

এইভাবেই মীমাংসা হয়েছে। কিন্তু বামাচরণ আবার উৎপাত শুরু করল আজ।

বামাচরণ অনেকক্ষণ বাদে যখন মুখ তুলল তখন আর সেই তেজটা নেই। দুর্বল গলায় বলল, তা হলে আমার কী হবে বাবা ?

বিষ্ণুপদ বলল, তোর আবার কী হবে ? বউমাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে আয়। এখানেই থাক। সব দিক বজায় থাকবে তা হলে।

আপনাদের ঘরখানা আমারই পাওয়ার কথা ছিল, মনে আছে ?

বিষ্ণুপদ একটু হেসে বলে, আমাদের ঘর আবার কি ? আমার বয়স তো চলে গেছে। আর ক'দিন ? পাকাবাড়ি দালান-কোঠা দেখে যেতে পারব কি না তাও ঠিক নেই। যদি বা দেখেও যেতে পারি তবু ভোগ করব ক'দিন। যা থাকবে তোদেরই থাকবে। যদি বনিবনা করে থাকতে পারিস তবে আর চিন্তা কিসের ?

দোতলাটা কে পাবে ?

বিষ্ণুপদ একটু চুপ করে থেকে বলল, এটাও একটা ক্যাচালে প্রশ্ন। দোতলা কে পাবে সে তো দূরের কথা। আগে বাড়িটা হোক।

বামাচরণ কেমন যেন হতাশ হয়ে বসে রইল। তারপর বলল, আমাকে রেমা ঢুকতে দেবে না বাড়িতে। পাকাবাড়ি হলে ও সবটাই নেবে। দেখো।

তোর আর ক'টাই বা দরকার ? যদি আসতে চাস চলে আয়। তোর জন্য আমি আমার ঘরখানাই ছেড়ে দিয়ে যাবোখন। রামজীবন পিতৃভক্ত ছেলে, আমি বললে সে কথার অমান্য করবে না।

বামাচরণ তবু যেন উৎসাহ পেল না। বসে রইল। তারপর বলল, দাদাকে বেলো-না, আমার ঘরখানা নিয়ে আমাকে টাকা দিয়ে দিক।

বিষ্ণুপদ তার এই লোভী সম্ভানটির দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, সে কি কোটিপতি বলে ভাবিস ? সে নামে বড়, টাকায় নয়। বউমাকে না জানিয়ে গোপনে জমানো টাকা দিয়ে বাড়ি করে দিচ্ছে। বলেছে, এ তার প্রায়শ্চিত্ত। এসব একটু বুকে দেখ বাবা, একটু ভেবে দেখ। শুধু স্বার্থচিন্তা করলে মানুষ বড় ছোট হয়ে যায়।

বামাচরণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর উঠে পড়ল।

॥ ৮৪ ॥

লিফটে একাই ছিল চয়ন, দরজা বন্ধ করার সময়ে খুঁচ করে একটা লোক এসে ঢুকে পড়ল। লোকটার পরনে হাকুচ ময়লা প্যান্ট আর শাট, লম্বা রুক্ষ চুল, গালে বিজবিজ করছে দাড়ি। লোকটা অবিরল বিড়বিড় করে কী বকে যাচ্ছে। চেহারাটা একসময়ে খারাপ ছিল না। কিন্তু অথ্বে বা রোগে বা অভাবে স্তটকো মেরে গেছে। এইসব মানুষকে দেখলে চয়ন তার নিজের ভবিষ্যতের চেহারা কল্পনা করে নিতে পারে। সে হয়তো বয়সকালে এরকমই আধপাংগলা, ভাবলা, বিড়বিড় করে লোক হয়ে যাবে।

হঠাৎ লোকটা তার দিকে চেয়ে বলল, আচ্ছা কৃষ্ণজীবন বিশ্বাস যেন কোন তলায় থাকে ? জানতাম, কিন্তু ভুলে গেছি। আপনি তাঁর ফ্ল্যাটে যাবেন ?

হ্যাঁ, আমার দাদা। কোন তলা জানেন ?

জানি। আমিও তাঁদের ফ্ল্যাটেই যাচ্ছি।

অ। আপনি কে ?

আমি মোহিনীকে পড়াই।

লোকটা আর উক্তবাচ্য করল না। সাততলায় পৌঁছে তার পিছু পিছু নেমে এল। এ লোকটা কৃষ্ণজীবনের ভাই ব'লে বিশ্বাস করবে কে ? বয়সে যেন কৃষ্ণজীবনের চেয়ে বছর দশেকের বড়, আর গোশাক একেবারেই কৃষ্ণজীবনের ভাইয়ের মতো নয়।

ডোরবেল বাজিয়ে অপেক্ষা করার সময় লোকটা ফের জিজ্ঞেস করল, বউদিকে এখন পাওয়া যাবে ?

জানি না। সাধারণত এ সময়ে থাকেন।

দরজা খুলল মোহিনী। তার দিকে চেয়ে হেসে লোকটার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল। যেন চিনতেই পারল না।

চয়ন তাড়াতাড়ি বলল, তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে চান।

লোকটা খুব বিনয়ের গলায় বলল, আমি বামাচরণ। তোমার কাকা হই। চিনতে পারছ না? আগেও বার দুই এসেছি।

মোহিনী দরজা ছেড়ে দিয়ে বলল, আসুন।

বাইরের ঘরে বামাচরণকে বসিয়ে সে তার মাকে খবর দিতে গেল।

কলেজ থেকে ফিরে রিয়া এ সময়ে একটু শুয়ে থাকে। বেশিক্ষণ নয়। আধঘন্টা। তাকে একজন ডাক্তার বলেছিল, আফটার ডেজ ওয়ার্ক আধঘন্টা মনটাকে শূন্য রেখে শুয়ে থাকবেন। বালিশ ছাড়া। হেলপস্ টু টে ইয়ং। বলতে নেই, রিয়া নিজের শরীরে বয়সের লক্ষণ টের পাচ্ছে। একটু মেদের স্বপ্নের ঘটছে। মুখের চামড়া সামান্য শ্রুথ। বয়সের ব্যাপারটা তাকে ইদানীং একটু টেনশনে রাখছে। অথচ পাশাপাশি তার স্বামী কৃষ্ণজীবন এখনও কী টগবগে, প্রাণবান। ওকে বয়সে পায় না কেন? সবসময়ে তো পড়ছে, লিখছে, দুনিয়া নিয়ে ভাবছে, এ-দেশ সে-দেশ দৌড়ে বেড়াচ্ছে। তবু ওকে বয়সে পায় না কেন? ও কি গোপনে প্রেম করে? কে জানে! অনু প্রায়ই ফোন করে ওকে। একদিন এক্সটেনশন লাইনে ফোন ধরে কিছুক্ষণ শুনে রেগে গিয়েছিল রিয়া। চেপে ধরেছিল কৃষ্ণজীবনকে, ওইটুকু মেয়ে তোমার সঙ্গে অত পাকা পাকা কথা বলে কেন? কী চায় ও? কৃষ্ণজীবন অবাক হয়ে বলেছিল, পাকা? তা হবে হয়তো। আমি ঠিক বুঝতে পারি না। বেশ করে বকে দিয়েছিল রিয়া। সেই থেকে অনু মেয়েটাকে দেখতে পারে না সে। তবে জানে, অনু প্রায়ই কৃষ্ণজীবনকে ফোন করে, বাড়িতে এসে আড্ডা মারে, কোথাও দেখা হলে গা ঘঁষে থাকে। ওইটুকু মেয়েকে সন্দেহ করার মানেই হয় না। কিন্তু পাকামি দেখলে গা জ্বলে যায় তার। কালকেও চারুশীলার বাড়িতে নেমন্তন্ন ছিল, এমন ন্যাকামি করছিল কৃষ্ণজীবনের সঙ্গে যে একটা চড় কষাতে ইচ্ছে হয়েছিল তার।

শুয়ে শুয়ে বিষাক্ত মনে অনুর কথাই ভাবছিল সে।

মোহিনী এসে বলল, মা, শিগগির এসো। আমাদের সেই কাকা এসেছে। বামাচরণ না কী যেন নাম! কী নোংরা আর ময়লা, দেখ গিয়ে।

বামাচরণ! বলে অবাক হয়ে চোখ মেলে রিয়া, সে আবার কী চায়?

দেখ না গিয়ে!

উ, এরা জ্বালিয়ে খাবে। টাকাপয়সা চাইতে এসেছে বোধ হয়।

রিয়ার পরনে একটা নাইটি। টোকিও থেকে এনে দিয়েছিল কৃষ্ণজীবন। জাপানি প্রিন্টের দারুণ জিনিস। তবে এটা পরে বাইরের বিশিষ্ট লোকজনের সামনে বেরোয় না রিয়া। কিন্তু বামাচরণকে অতটা সম্মান দেখানোর প্রয়োজন বোধ করল না সে। উঠে চুলটা বেঁধে নিল এলো খোঁপায়। বাথরুমে গেল। তার পর শ্রুথ পায়ে এসে ড্রয়িং রুমের পর্দা সরিয়ে যে দৃশ্যটা দেখল তাতে মনটা বিরক্তিতে আরও ভরে গেল তার। একটা হাড়-হাডাতে ভিথিরির মতো পোশাকে বামাচরণ সোফায় বসে আছে গ্যাট হয়ে। বসে আপনমনে বিভ্রিভি করছে আর বাতাসে আঙুল দিয়ে আঁকিবুকি কাটছে। দেখলেই বোঝা যায়, মেন্টাল পেশেন্ট।

রিয়া খুব নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বামাচরণকে দেখে নিল। তারপর গলাটা সংযত করেই বলল, বামাচরণ, কেমন আছ?

বামাচরণ টপ করে উঠে এসে পদধূলি নিয়ে হেঁ-হেঁ করে হেসে বলল, বউদি, ভাল আছ?

শত হলেও আপন দেওর, একে তাড়ানো যায় না। রিয়া বলল, বোসো, তোমার খবর কী?

আর খবর! আমাকে তো বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, জানো না?

রিয়া অবাক হয়ে বলে, না তো! কি করে জানব? কেউ তো খবর দেয় না!

অনেকদিন যাও না দেশে। আমরা গরিব বলে?

রিয়া মুখটা গম্ভীর করে বলে, নিয়ে গেলে যেতে পারি। কিন্তু তোমার দাদারই তো সময় হয় না।

দাদা তবু মাঝে মাঝে যায়।

জানি। কিন্তু আমাকে তো নিয়ে যায় না।

বামাচরণ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বলল, তোমাকে একটা খবর দিতে এলাম বউদি।

খবর!

হ্যাঁ। দাদা তো দেশে তিনতলা বাড়ি করছে। জানো?

রিয়া অবাক হয়ে বলে, না তো! তিনতলা বাড়ি?

হ্যাঁ। দারুণ ব্যাপার। ইট সিমেন্ট সব এসে গেছে। আমি তো ওখানে এখন থাকি না। রামজীবন গুণ্ডা লাগিয়ে আমাকে মেরেধরে তাড়িয়ে দিয়েছে। দিন কুড়ি আগে হঠাৎ গিয়ে পড়েছিলাম। তখন দেখি, এই কাণ্ড। এলাহি ব্যাপার হচ্ছে।

কই, আমাকে বলেনি তো!

বামাচরণ মুচকি হেসে বলল, তোমাকে গোপন করেই হচ্ছে বলে শুনলাম।

গোপন করার কী আছে?

তা তো জানি না। কিন্তু অন্যায়টা দেখ। আমাকে ভিটে থেকে তাড়িয়ে তবে সব হচ্ছে।

রিয়ার মুখচোখ লাল হয়ে যাচ্ছিল রাগে। সে বলল, বাড়ি কার জন্য হচ্ছে?

মা আর বাবার জন্য। রামজীবনেরও ভাগ আছে।

বাঃ, বেশ কথা তো! অদ্ভুত ব্যাপার।

সবার জন্যই হচ্ছে, শুধু আমি বঞ্চিত। অবিচারটা দেখ।

রিয়া মুখ গম্ভীর করে বসে রইল। তারপর বলল, চা খাবে?

তা খেতে পারি। দাদা! কোথায় ?
তার ফিরতে রাত হবে।
আমি যে খবরটা দিয়েছি তা দাদাকে বোলো না।
কেন, দাদাকে ভয় পাও ?
কী দরকার বলে ? আমার ওপর রাগ করবে।
ঠিক আছে, বলব না। কিন্তু খবরটা সত্যি তো ?
বিশ্বাস না হয় কালকেই আমার সঙ্গে বিষ্ণুপুর চलो, দেখে আসবে। ঠিকাদার দু-চারদিনের মধ্যেই কাজ শুরু করে দেবে।
তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে বলছিলে, তা তুমি এখন কোথায় আছ ?
বামারের দূরত্বের গলায় বলল, কোথায় আর থাকব ? প্রথমটায় স্বস্তর বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলাম। তা সেখানে সুবিধে
হল না। একটা ভাড়া বাড়িতে আছি।
সেটা কি বিষ্ণুপুর থেকে দূরে ?
তিন চারটে গ্রামের ভ্রমতে।
তাড়াল কেন ?
সে অনেক কথা। তবে আমাকে তাড়িয়ে সব গাপ করে নিল ওই রামজীবন।
সে তো শনি মদট খায়।
সব দোষ আছে বউদি। গুণের অভু নেই।
ছিঃ ছিঃ। বলে চূপ করে থাকল রিয়া। মনটা বিরক্তি আর রাগে ঝিঁচড়ে গেল। উঠে গিয়ে কাজের মেয়েটাকে চা
করতে বলে ফের এসে মুখোমুখি বসে বলল, তোমার দাদা সব টাকাপয়সা দিয়ে ফেলেছে বুঝি বাড়ি করার জন্য ?
তা জানি না। তবে ঠিকাদার লাগিয়েছে। বাড়ি করাটা যদি আটকাতে পারো তবে বড় ভাল হয়। বাড়ির ভাগ আমিও
পাবো না, দাদার তো কথাই নেই।
তোমার দাদা তো বলেন রিটার্ন করে দেশে গিয়েই থাকবেন।
আর থেকেছে! তুমিও যেমন। দাদা এখন একজন ডাকসাইটে লোক। সে গিয়ে ওই ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে থাকে
কখনও ? টাকাটা জলে দিচ্ছে। আটকাতে পারবে না বউদি ?
রিয়া রাগ-রাগ মুখ করে বলে, আটকানো হয়তো সহজ হবে না। টাকা হয়তো দিয়ে ফেলেছে। কিন্তু আমরা বড়লোক
নই বামাচরণ। আমার মেয়ের বিয়ে বাকি। ছেলের পড়ার খরচ আছে। দোলনও তো বড় হচ্ছে। তোমার দাদা কোন
আক্কেলে যে বাড়ির টাকা দিতে গেল তা বুঝতে পারছি না।
আমিও সেই কথাই বলি। এ বাজারে এতগুলো টাকা! না হোক দেড় দুলাখ তো খসবেই।
আমি যদি বিষ্ণুপুর যেতে চাই নিয়ে যেতে পারবে ?
কবে যাবে বোলো, আমি এসে নিয়ে যাবো।
সামনের রবিবার তোমার সময় হবে ?
খুব হবে। মাঝখানে তো দুটো দিন।
সকালের দিকে চলে এসো। আমি যাবো।
ঠিক আছে।
বসে বসে আরাম করে চা খেল বামাচরণ। বিষ্ণুট খেল চায়ে ভিজিয়ে।
আর কিছু খাবে ?
ক্যাবলার মতো একটু হাসল বামাচরণ। খুব সংকোচের সঙ্গে বলল, সকাল থেকে আজ তেমন কিছু খাওয়া হয়নি।
তা হলে বোসো। বলে রিয়া উঠে গেল। ফ্রিজ থেকে মাখা ময়দা আর তরকারি বের করে কাজের মেয়েটাকে পরোটা
ভেজে দিতে বলে এল। তার মাথাটা উত্তেজিত। এইসব লোককে আত্মীয় বলে স্বীকার করা বা পরিচয় দেওয়াটাই এক
লজ্জার ব্যাপার। কৃষ্ণজীবনের মতো একজন বিশিষ্ট এবং বিখ্যাত লোকের ভাই বলে একে কে বিশ্বাস করবে ? কৃষ্ণজীবন
ছাড়া তার ভাইবোন বা বাপ-মাও ভদ্র শ্রেণীর মধ্যেই আসে না। গরিব বলে কথা নয়, কোনও কালচার বা শিক্ষাও তো নেই
এদের। একজনও কোনও ভদ্র পেশায় নিযুক্ত নেই। জীবন থেকে, মন থেকে এদের সম্পূর্ণ বর্জন করে দিয়েছিল রিয়া।
কৃষ্ণজীবনকেও চেয়েছিল ওদের সঙ্গে সম্পর্কহীন করে দিতে। এ কাজটা পেয়ে ওঠেনি সে। কৃষ্ণজীবন তাকে না জানিয়ে
মাঝেমাঝে বিষ্ণুপুর যায়। রিয়া ধরে ফেলেছিল, কৃষ্ণজীবনের ছাড়া শার্টের বুক পকেটে ট্রেনের টিকিট পেয়ে। এখন দেখা
যাচ্ছে, শুধু সম্পর্ক নয়, দায়দায়িত্বও ঘাড়ে নিচ্ছে এইসব অপোগন্দের।
তোমার বউয়ের নাম শ্যামলী না ?
হ্যাঁ। তোমার মনে আছে ?
আছে। সে কেমন মেয়ে ?
গায়ের মেয়ে, যেমন হয় আর কি।
বিয়ের সময় দেখেছিলাম একবার, ভাল করে আলাপ হয়নি।
চাও তো নিয়ে আসব'খন একদিন।
প্রমাদ গুনল রিয়া। এ সব লোকের সঙ্গে সম্পর্ক প্রলয়িত করার কোনও ইচ্ছেই তার নেই। সে বলল, এখনই এনো
না। আমার সব সময় তো থাকি না। উনি বোধ হয় কয়েক বছরের জন্য আমেরিকায় চলে যাবেন। আমরাও যাবো।
উরিব্বাস! আমেরিকা!
এখনও ঠিক হয়নি। তোমার দাদা তো দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চান না। কিন্তু ও সব দেশে না গেলে উন্নতিই
বা করবে কি করে!

আরও উন্নতি ? দাদা তো শুনি এখন একজন মস্ত মানুষ ।
হওয়ার কি শেষ আছে ? তোমার দাদার যা কোয়ালিফিকেশন, যা ক্ষমতা তার কতটুকু দাম এ দেশে পায় বলা ?
সাহেবরা খাতির করে বলেই যা দাম ।

এ সব উঁচু উঁচু কথার খেই ধরতে পারে না বামাচরণ । সববেগে মাথা নেড়ে বলে, তা বটে । আমেরিকা গেলে এ
ফ্ল্যাটটা কি করবে ?

কি করব মানে ? আমরা তো পার্মানেন্টলি যাচ্ছি না । কয়েক বছরের জন্য । এই ফ্ল্যাট থাকবে ।

যেন একটু হতাশ হয়ে বামাচরণ বলল, না ।

গরম পরোটা আর তরকারি এসে যাওয়ার পর লোভীর মতো ক্ষুধার্ত বামাচরণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে খেতে লাগল ।
খাওয়ার মধ্যেও কোনও কালচারের প্রকাশ নেই । হাপুস হাপুস শব্দ করছে । খাওয়ার আগে নোংরা হাতটা ধুয়েও নিল না ।
ঘেন্নায় মুখ কঁচকাল রিয়া ।

খেয়েদেয়ে উঠে পড়ল বামাচরণ, আজ তা হলে আসি বউদি ।

এসো ।

সামনের রবিবার আমি সকালের দিকেই চলে আসবো ।

ঠিক আছে ।

আবার একটা প্রণাম করে বামাচরণ চলে গেল । রিয়া দরজাটা বন্ধ করার আগে দেখল, বামাচরণ লিফটের চেষ্টা
করল না । সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল । একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রিয়া । এই একটা আনকালচার্ড, গেয়ো অসভ্য পরিবারের সঙ্গে
তার আত্মীয়তার সম্পর্কটাই তার জীবনের একটা কলঙ্ক হয়ে থাকবে চিরকাল ।

ঘরে এসে আর একবার শুভা বটে রিয়া, কিন্তু বিশ্রামটা আর হল না । মন অস্থির, উত্তেজিত থাকলে শরীরের বিশ্রামও
হতে চায় না ।

রাত দশটার পর কৃষ্ণজীবন ফিরে এল । হাতে মস্ত ফুলের বোকে । রিয়ার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ধরো ।

রিয়া ফুলটা নিয়ে ক্যাবিনেটের অভ্যন্তর জায়গায় সাজিয়ে রাখল । রাখতে রাখতে তার মনে হল, কৃষ্ণজীবনের বয়স
কত হল ? এ বাড়িতে কৃষ্ণজীবনের জন্মদিন পালন করার রেওয়াজ নেই । ছেলেমেয়েদের একটু শখ হয় বটে, কিন্তু
কৃষ্ণজীবন তাতে জল ঢেলে দেয় । রিয়ার হিসেব থাকে না, কিন্তু আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ ছাড়িয়ে গেছে । তবু আদ্যন্ত যুবক
চেহারার অক্লান্ত এই মানুষটির নাগাল বয়স বা সময় আজও পায়নি । সারা দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেও দিনান্তে সে যখন
ফেরে তখন কোনওদিনই তাকে শ্রান্ত-ক্লান্ত মনে হয় না । কোন ধাতুতে গড়া ও ?

রাতের খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত নির্বিঘ্নে পার হতে দিল রিয়া । দোলনকে ঘুম পাড়াল । বড় দুই ছেলেমেয়ে নিজেদের ঘরে
গিয়ে শুয়ে পড়ল । রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ কৃষ্ণজীবনের ঘরে হানা দিল রিয়া । কৃষ্ণজীবন রাত জেগে রোজই কাজ
করে । পড়ে, লেখে । মার্কিন দেশ থেকে তার আরও একটা বই বেরোনার প্রতীতি চলছে ।

শোনে, তোমার সঙ্গে কথা আছে ।

ভীষণ অন্যমনস্ক, দূরলগ্ন দুটি চোখ তুলে তার দিকে চেয়ে কৃষ্ণজীবন যেন প্রথমটায় চিনতেই পারল না । তারপর
একটু সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, এসো, বোসো । কিছু বলবে ?

হ্যাঁ । একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই ।

কৃষ্ণজীবন কী বুঝল কে জানে, হঠাৎ একটু হেসে বলল, তোমার মুড দেখে মনে হচ্ছে প্রশ্নটা খুব প্যালেটেবল নয় ।
কী জিজ্ঞেস করবে ?

আমি শুনলাম, তুমি বিষ্ণুপুরে তিনতলা বাড়ি করে দিচ্ছ ওদের । সত্যি নাকি ?

কৃষ্ণজীবনের হাসিটা হারিয়ে গেল । বলল, কে বলেছে ?

সেটা অবাস্তব কথা । খবর চাপা থাকে না ।

কৃষ্ণজীবন হাতের বইটা একটা মার্কার দিয়ে বন্ধ করে রাখল । তারপর তার ধীর স্বভাবসিদ্ধ গলায় বলল, হ্যাঁ । মা-
বাবা খুব কষ্ট করে থাকে । বর্ষায় ঘর জলে ভেসে যায় । পোকামাকড়ের উপাশ । সাপও ঢোকে শুনেছি ।

তোমার টাকা খুব সস্তা হয়েছে ? তিনতলা বাড়ি মানে এক কাঁড়ি টাকা । আমাদের কি এত বাড়তি টাকা আছে উড়িয়ে
দেওয়ার মতো ?

উড়িয়ে দেওয়া কি একেই বলে ?

তা ছাড়া কী ?

আমার তো মনে হয় টাকা দিয়ে এর চেয়ে ভাল কাজ আমি আর অল্পই করছি ।

এটা ভাল কাজ ? তোমার মা-বাবার জন্য তিনতলা বাড়ির কোনও দরকার ছিল কি ? বুড়োবুড়ি থাকবেন, তার জন্য
একখানা পাকা ঘর হলেই তো যথেষ্ট । সামান্য টাকায় হয়ে যেত । তিনতলা বাড়ি ওদের কোন কাজে লাগবে ? শেষ অবধি
তো বাড়ি ভোগ করবে ওই মাতাল আর লম্পট রামজীবন ।

কথার যৌক্তিকতায় একটু মিহিয়ে গেল কৃষ্ণজীবন । কথাটা মিথ্যে নয় । সে এ কথার জবাব খুঁজে পেল না । একটু
উদাস থেকে বলল, ভেবেছিলাম একটা ভাল বাড়ি করলে কখনও-সখনও আমরাও গিয়ে থাকতে পারব ।

তোমার মাথা খারাপ হয়েছে ? আমি বিষ্ণুপুরে গিয়ে থাকব ?

আমি আউটিং-এর কথা বলছি ।

আউটিং-এর জন্য অনেক সুন্দর জায়গা আছে । বিষ্ণুপুরে মরতে আউটিং-এ যাবো কেন ?

কৃষ্ণজীবন একটা অসহায় শ্বাস মোচন করে বলল, ছেলেমেয়েরা মাঝে মাঝে বলে ওরা বিষ্ণুপুর যেতে চায় । বিশেষ
করে দোলন ।

ওদের আমি যেতে দেবো না।

তা হলে আর কী করা যাবে! তোমরা কেউ না গেলেও আমি তো যাবো। তারা তোমাদের কেউ না হলেও, আমার তো আপনজন!

সেটা নিয়েও আমার কিছু কথা আছে। ওদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা রাখছি কেন?

কৃষ্ণজীবন একটু অবাক হয়ে বলে, তার মানে কি রিয়া?

তোমার হয়তো আত্মসন্ধান বোধ একেবারেই নেই, কিন্তু আমার আছে। তোমার এক ভাই মাতাল, আর একটার পাগলামির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। বোন যাত্রাদলের নটা। সম্পর্ক রাখার মতো মানুষ কি ওরা?

কৃষ্ণজীবন যেন ঘুঁষি খেয়ে কঁকড়ে গেল। ছোট হয়ে গেল। মুখে একটা ব্যথাতুর বিষণ্ণতা ফুটে উঠল হঠাৎ। হাঁফ-ধরা গলায় সে বলল, আমার পাপ বড় কম নয় রিয়া, তাদের জন্য আমিই দায়ী।

তুমি দায়ী? তুমি কেন দায়ী হবে?

কৃষ্ণজীবন দু'হাতে মুখ ঢাকা দিল। তারপর অস্ফুট একটা গোঙানির শব্দ করে মাথা নেড়ে বলল, আজ আর কিছু বোলো না রিয়া। আর বোলো না!

আমি কিছু বলতে চাইও না। আমি শুধু চাই, বাড়িটা তুমি করবে না। শুনেছি ইউ আর সিমেন্ট কেনা হয়ে গেছে। গেছে যাক। এবার ওরা যা করার করুক। তুমি আর একটা পয়সা দিতে পারবে না। পয়সা তোমার এল কোথেকে?

কৃষ্ণজীবন মুখ ঢেকে রেখেই বলল, শোনো রিয়া, এটা আমার প্রায়শ্চিত্ত। আমার যে কাজ করা উচিত ছিল তা আমি করিনি। আমি টেনে তুলিনি আমার ভাইবোনদের। তারা নষ্ট হয়ে গেছে অবস্থার চাপে। আমি পারতাম, করিনি। এখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

আমি তা মানি না। তুমি ওদের জন্য কী করতে?

কৃষ্ণজীবন মুখের ঢাকাটা খুলল না বলে ভৌতিক শোনাল তার গলা, তুমি জানো না রিয়া, আমার ভাইবোনরা কতটা আমার মুখাপেক্ষী হয়ে ছিল। কতটা আশাবরসা করত। বামা, রেমো, বীণা, সরস্বতী এরা তো কেউ খারাপ ছিল না। কেউ না। আমি মন দিলেই, চেষ্টা করলেই ওদের দাঁড় করাতে পারতাম। চেষ্টাই করলাম না। বিয়ে করে আলাদা হয়ে এলাম।

দোষটা কি বিয়ের? তার মানে কি আমাকেই ইনভাইরেটলি দায়ী করতে চাও? ভুলে যেও না, ওরা তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

মাথা নেড়ে কৃষ্ণজীবন বলল, তুমি বুঝবে না, ওই তাড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে রাগ নয়, ছিল অভিমান। বড় ভেঙে পড়েছিল ওরা।

আহা, কী কথা! একটা মানুষ চলে এল বলে সংসারের বাকি সবাই নষ্ট হয়ে যাবে? তুমি কি কব্জি অবতার নাকি?

না। তবে ওদের কাছে আমি যে কতটা সেটা কি তুমি বুঝতে পারবে?

বুঝবার দরকার নেই। তুমিও বোঝোনি। তোমার মাথায় ওরা কাঁঠাল ভাঙছে। তোমার বোধবুদ্ধি নেই বলেই গলা বাড়িয়ে দিচ্ছ। কত টাকা দিয়েছ বলে তো! টাকাটা এল কোথা থেকে?

টাকাটা আমেরিকা থেকে এসেছে। বইয়ের রয়্যালটি।

সে কি অনেক টাকা! কই আমাকে তো বলোনি?

কৃষ্ণজীবন কী বলবে ভেবে পেল না। এ কথা সত্যি যে পাবলিশারের দেওয়া বেশ কয়েক লক্ষ টাকার কথা সে রিয়ার কাছে প্রকাশ করেনি। জানে, রিয়া জানতে পারলেই টাকার ওপর একটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবে। কিছু টাকা হিসেবের বাইরে রাখা দরকার ছিল।

কত টাকা পেয়েছ?

আপাতত পনেরো লাখ। তার মধ্যে ইনকাম ট্যাক্স যাবে।

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রিয়া বলল, পনেরো লাখ? অথচ আমাকে বলোনি!

বলতাম। একটু সময় নিচ্ছিলাম।

কবে থেকে গোপন করা শিখলে?

কৃষ্ণজীবন এ কথারও জবাব জানে না। মুখ ঢেকে সে বসে রইল চুপ করে।

রিয়া অবিশ্বাসের গলায় আপনমনে কয়েকবার আওড়াল, পনেরো লাখ! প-নে-রো লা-খ!

কৃষ্ণজীবন একা স্বাস ফেলে বলল, টাকাটা একটু আনএক্সপেন্ডেড। তাই মা-বাবার জন্য বাড়িটা করে দিচ্ছি রিয়া।

রিয়া শব্দ হয়ে বলল, না। শুধু একটা ঘর পাকা করে দিতে পারো। আর কিছু নয়। রবিবার আমি বিষ্ণুপুর যাচ্ছি।

কৃষ্ণজীবন চমকে ওঠে, বিষ্ণুপুর যাচ্ছ?

হ্যাঁ। তাদের একটু শিক্ষা হওয়ার দরকার।

॥ ৮৫ ॥

বীণা এত অবাক হল যে, প্রথমটায় মনে করল স্বপ্ন দেখছে। তারপর অবিশ্বাসের গলায় বলল, পাঁচ হাজার টাকা? এত টাকা আমাকে দিচ্ছে কেন গো কাকা?

কাকা শান্ত গলায় বলল, দিচ্ছি, রেখে দাও। তোমাকে তো খুব বেশী কিছু দিতে পারি না। তোমার গুণের কদর হল কই?

তা বলে হঠাৎ এত টাকা! এ তো অনেক টাকা গো!

বীণা, মানুষ আর কতটুকু দিতে পারে? দেনেওয়াল ভগবান। তাঁর দান হিসেবেই নাও।

বীণা অবাক হয়ে বলল, আবার জল খোলা করলে যে—তুমি দিচ্ছে, না ভগবান দিচ্ছে ?

কাকা একটু শুকনো হেসে বলল, ভগবানই দিচ্ছে বীণা ।

এটা কিসের টাকা ? বোনাস ?

তাই ধরে নাও ।

বোনাস হলে তো সবাই পাবে ।

তার কোনও মানে নেই । আমি বলি কি, টাকা ডবল করার অনেক স্কিম হয়েছে আজকাল, সেরকমই একটা স্কিমে টাকাটা ফেলে রাখো । খরচ কোর না ।

উদাস গলায় বীণা বলে, আমার আর খরচ কি ? দু' মুঠো খাওয়া আর পরনের কাপড় । ফুর্তি তো আর করব না । কী ইচ্ছে করছে জানো ? আমার মা-বাবা তো গরিব, এ টাকা থেকে তাদের কিছু দিই ।

সেতো ভাল কথা । তাই নাও ।

বীণা একটু ভাবল । না, সেটা ভাল হবে না । তার ডলার আর পাউন্ডের কথা বাবা জানে । বাবা হয়তো সন্দেহ করবে এটা সেই ডলার বেচা টাকা । বাবার অ্যাটাং নেই, কিন্তু ঠ্যাটাং আছে । ট্যাকে পয়সা নেই, ওদিকে যুথিঠির । নিমাইয়ের সঙ্গে খুব স্বভাবের মিল । আর সেইজন্যই বোধ হয় হাড় হাভাতে স্কট্রিট্রটকে ধরে এনে গলায় খুলিয়ে দিল তার । না, বীণা এক পয়সাও দেবে না বাবাকে ।

কী ভাবছো বীণা ? পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে ভাবছো ? এ বাজারে ও টাকার আর কী-ই বা দাম-বলো! অত ভেবো না ।

আমার কাছে এ অনেক টাকা কাকা । কেন দিলে বলবে না ? যা বলছো তা যেন আলাপ-আলগা কথা । তোমার মুখটা বড্ড গম্ভীরও ।

না বীণা, মুখ গম্ভীর হবে কেন ? এই তো হাসছি ।

বীণা হঠাৎ একটু ধরা গলায় বলল, টাকা-টাকা করে আমাদের জীবনটা কিভাবে কাটে বলো তো ? কটা টাকার জন্য আমাদের কত হা-পিডোশ! এই যে এত টাকা হাতে এল, আমার এত আনন্দ হচ্ছে, কিন্তু কী যে করব টাকা দিয়ে তাই ঠিক করতে পারছি না । মাথাটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে ।

বাড়ি যাও বীণা । ওই টাকাটা থেকে পাঁচ টাকার একটা পুজো দিও ।

পুজো দেবো ? কিসের পুজো ?

আমি তার কী জানি! পুজো-আচ্ছা তো মেয়েরাই করে । তোমার কোনও ঠাকুর নেই ? লক্ষ্মী হোক সরস্বতী হোক, কালী বা শিব হোক ?

না গো, আমার কি ঠাকুর দেবতার কথা মনে থাকে ? সারাদিন যাত্রাপালা নিয়ে ভাবছি ।

ঠাকুর দেবতার কথাও বোধহয় একটু ভাবা ভাল ।

টাকার কথা কি গোপন রাখব সকলের কাছে ?

হ্যাঁ, খুব গোপন রেখো ।

আমিও তাই ভাবছিলাম । আমাকে হঠাৎ এত টাকা বকশিশ দিয়েছে জানতে পারলে সবাই তোমাকে ছিড়ে খাবে ।

বকশিশ! ছিঃ, কী যে বলো বীণা । ওটা বকশিশ হবে কেন ? বরং ভগবানের আশীর্বাদ বলে জেনো ।

তোমাকে আজ ভগবানে পেয়েছো গো ।

কাকা ম্লান হেসে বলে, ভগবানে পাওয়া ভাল । ভূতে পাওয়া ভাল নয় ।

বীণা একটু শুদ্ধ হয়ে বসে রইল । তার মনের মধ্যে নানা আবেগ, নানা চেউ । এই পাঁচ হাজার টাকাকে সে সহজভাবে নিতে পারছে না । কত কী মনে হচ্ছে!

আচ্ছা কাকা, তুমি কি একটা কথা জানো ?

কী কথা ?

কোরাকাঠিতে পালার পর তুমি আমাকে আংটি দিয়েছিলে, মনে আছে ?

কেন থাকবে না ? খুব মনে আছে । আংটি তুমি নাওনি ।

কিন্তু সেই ঘটনা থেকে কী রটেছিল জানো ?

কাকা ফের ম্লান একটু হেসে বলল, জানি বীণা । মানুষ তোমাকে আর আমাকে জড়িয়ে গল্প ফেঁদেছিল । হঠাৎ কথটা তুললে কেন ? পাঁচ হাজার টাকা দিলাম বলে কোনও সন্দেহ করছ নাকি ?

বীণা জিব কেটে বলে, ছিঃ ছিঃ, তুমি দেবতার মতো মানুষ । কোনওদিন পাপচক্ষুতে আমার দিকে তাকাওনি পর্যন্ত । পুরুষের চোখ তো আমি চিনি ।

কাকা হাসল, চেনো ? সত্যিই চেনো ?

খুব চিনি কাকা ।

কাকা একটু চিন্তিত হয়ে বলল, তোমার সঙ্গে ছিল একজন ভারী ভাল লোক । নিমাই । তাকে চিনেছিলে ?

বীণা অবাক হয়ে বলল, হঠাৎ তার কথা কেন কাকা ?

কাকা মাথা নেড়ে বলে, কি জানি কেন, নিমাইয়ের কথা আমার খুব মনে হয় ।

ওর কথা ভাবলে তো আমার গা জ্বালা করে ।

তা অনেকবার বলেছো । দোষঘাট ছিল না বলছি না, কিন্তু লোকটা তো সান্দা ।

সান্দা খুয়ে কি জল খাবো ? অপদার্থ ।

কাকা একটু হেসে বলল, নিমাইয়ের কোনও খোঁজ রাখো ?

জানি । কাঁচরাপাড়ায় দোকান দিয়েছে । সে দোকান নাকি ভালই চলে । ভাল থাকুক, আমার তাতে কী ?

সে তো বটেই। তবে তার হিল্লো হয়েছে শুনে আমার কিছু মনটা ভাল লাগে। কলিযুগে ওসব লোকের তো কোনও দাম নেই! কিন্তু তবু নিমাই যে নিজের জোরে সততা বজায় রেখে টিকে আছে এটা কিন্তু আমাদের মতো পাণী-তাপীদের কাছেও ভরসার কথা। চন্দ্র সূর্য কাদের জন্য ওঠে জানো? ওইসব মানুষের জন্য, তাদের ভাগ্যে আমরাও চন্দ্র সূর্যের ভাগ পাই। নইলে পেতাম না।

বড় যে গদগদ ভাব দেখছি তোমার।
লোকটাকে ফিরিয়ে নিতে পারোনা বীণা?
তোমার কি মাথা খারাপ হল?
কাকা একটু চুপ করে রইল বিমর্ষ ভাবে। তারপর বলল, সজল কী বলছে?
বীণা জুকুটি করে বলে, কী বলবে?
কোনও প্রস্তাব করেনি?
ও আমাকে বিয়ে করতে চায়।
আর তুমি?
বীণা খিলাখিলা করে হেসে বলে, দুদিন রোসো। পুরুষ মানুষের প্রেম হঠাৎ উথলে ওঠে, আবার মিইয়ে যায়।
ওটা কথা হল না বীণা। সজল ভাল ছেলে, অনেক গুণ। তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারা কি সহজ কাজ? শুনেছি ও নাকি নিমাইয়ের কাছেও গিয়েছিল।
কে বলল তোমাকে?

জানি!
বীণা জুকুটি করে বলে, সেটাই বা কোন অপরাধ হয়েছে?
কাকা মাথা নেড়ে বলল, ওর অপরাধ নয়। তোমারও অপরাধ নয়। ভাবছি, নিমাই ব্যাপারটা টের পেল কিনা!
পেলে পাবে। অত ভয় কিসের? শোনো কাকা, আমার জীবনটা আমারই। এটা কাউকে দাসখণ্ড লিখে দানপত্র করে দিইনি। একবার বিয়ে হয়েছিল বলে যে চিরদিনের জন্য এক খোঁটায় বাঁধা থাকতে হবে, তেমন নিয়ম আমি মানি না।
কাকা তার দিকে চেয়ে হাসছিল, বলল, তোমার নেত্রী হওয়া উচিত ছিল। বেশ শুছিয়ে বলতে পারো বটে। কিন্তু আমাদের জীবনটা তো গোছানো নয় বীণাপাণি। সব বেগোছ। যাকগে, আমাকে আবার শব্দ মনে করো না।
বীণাপাণি একটু গৌজ হয়ে থেকে বলল, কেন যে তোমরা সবাই ওই লোকটার পক্ষ নাও, তা বুঝি না।
কাকা অবাক হয়ে বলে, কে পক্ষ নিয়েছে? আমি মোটেই নিমাইয়ের পক্ষ নিইনি। নিমাইয়ের কথা খুব মনে হয়, সে কথাই বলছিলাম।

জানি গো জানি।
পাঁচ হাজার টাকা ভ্যানিটি ব্যাগে ভরে নিয়ে যখন বাড়ি ফিরে এল বীণাপাণি তখন তার মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন, অনেক দোলাচল। সে বোকা নয়। কাকা হঠাৎ তাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে ফেলল কেন সেইটে নিয়ে সে আগাপাশতলা ভেবে দেখতে লাগল। এ টাকা কি তার কোনও ভাবে পাওনা হয়? টাকাটা দিতে অনেক ভূমিকা করে নিয়েছিল কাকা। কাল রিহাসালের পর বলল, আগামী কাল সকাল দশটার সময় আমার কাছে একবার এসো বীণা। কথা আছে। ওই সময়টায় আমি একটু ফাঁকা থাকি। খুবই ফাঁকা ছিল কাকা। দরজা বন্ধ করে টাকাটা দিল। বীণা বুঝতে পারছে না, হঠাৎ এত বদান্যতা কেন! দুখের দিনে কাকা তার জন্য অনেক করেছে। এখনও যাত্রার জন্য, হিসেব রাখার জন্য দুটো খাতে কাকা তাকে মাসে হাজার টাকার ওপরেই দেয়। সেও অনেক টাকা। তবে আবার বাড়তি পাঁচ হাজার দিল কেন?

কুসুম আজকাল রোজই আসে। রান্না করে, ঘরের কাজ করে দিয়ে যায়। এমন করে। কুসুম তো তার কাজের মেয়ে নয়। ভালবেসে করে। আজ কুসুম আসতেই বীণা বলল, হ্যাঁ রে, আজ একবার বিষ্ণুপুর যাবো ভাবছি। রাতটা থেকে আসবো। তুই আমার বাড়ি পাহারা দিবি আজ?

কুসুম ঘাড় নেড়ে বলে, দেশে! যাও না। মা-বাবাকে দেখে এসো গিয়ে। অনেকদিন তো যাওনি।
বীণা গড়িমসি করে উঠতে যাচ্ছিল, কুসুম হঠাৎ বলল, একটা খবর আছে বীণাদি।
কী খবর?

আমার কাঁচরাপাড়ার জামাইবাবু এসেছে। বলল, পালপাড়ায় তোমার শাশুড়ি ঠাকরুন গত হয়েছেন।
মানে! মারা গেছে নাকি?
হ্যাঁ, চার পাঁচদিন হল। খবরটা তোমাকে দিতে বলছিল।
বীণা একটু স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। শাশুড়ি! হ্যাঁ, এখনও তো সম্পর্কটা সামাজিকভাবে আছে। কী করবে সে? তার কি কিছু করা উচিত?

কুসুম তার দিকে চেয়েছিল। খবরটা শুনে তার কী প্রতিক্রিয়া হয়, সেটাই দেখছে বোধ হয়।
বীণা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, কি করে হল?
তাতো জানি না। নিমাইদাদা নাকি উত্তম কুস্তম কান্নাকাটি করছে। জল অবধি খাচ্ছে না। ভীষণ অবস্থা। মাকে বড় ভালবাসত, তাই না?

বাসত। খুবই বাসত। নিমাইয়ের কাছে মা-বাপ ছিল দেবতার মতো। বিয়ে হয়ে এসে বীণা অনেক অভাবের কষ্ট সয়েছে, কিন্তু শাশুড়ির মুখনাড়া খায়নি কখনও। বড় নিরীহ মানুষ, বড় বোকাসোকা। অনেকটা তার মায়ের মতোই। আরও নিরীহ। আরও বোকা।

খবরটা কি তোর নিমাইদাদাই দিতে বলেছে আমাকে?
কুসুম একটু ইতস্তত করে বলল, না। তোমাকে সে খবর দিচ্ছে বলেনি।

ঠিক জানিস ?

কুসুম আবার একটু চুপ করে থেকে বলল, কি জানি বাবা, তোমাকে বলা উচিত হবে কিনা। তুমি যা নিমাইদাদার ওপর রেণে যাও।

কী গোপন করছিস বল তো ? এমন কী কথা!

আমার জামাইবাবু তো নিমাইদাদার সঙ্গেই পালপাড়া গিয়েছিল। নিমাইদাদা তাকে বলেছে, খবরটা বীণা যেন না পায়, দেখো। তার সুখের জীবন, এসব খবরে তার আনন্দ মাটি হবে। আমরা তো তার কাছে মুছে গেছি, এ খবরে তার আর দরকার নেই।

বীণা একটু জ্বলে উঠল, বলেছে! তাহলে খবরটা আমাকে দিলি কেন ?

কুসুম কাঁচুমাচু হয়ে বলে, জামাইবাবু বলল নিমাইদাদা ঠিক কথা বলেনি। শাওড়ি মরলে তো তোমার অশৌচ হয়। খবরটা না দিলে পাপ হবে।

অশৌচ!

হ্যাঁ, সেটাও তোমাকে বলে দিতে হবে নাকি ?

বীণা দাঁতে দাঁত পিষে বলে, অশৌচ হবে কেন ? সম্পর্কই যেখানে নেই, সেখানে অশৌচ হবে কেন ?

তুমি মানবে না অশৌচ ?

কেন মানব ?

কুসুম এ জবাবে খুশি হল না। বলল, না মানলে মেনো না। তবে অশৌচ কিন্তু হয়।

বীণা স্তব্ধ হয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, ওসব আমি মানি না। আমার কেউ নেই।

কুসুম খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, অন্তত নিরামিষটা তো খেতে পারো। চুলে তেল-টেল না দিলেই হল।

বীণা একটা শ্বাস ফেলে বলে, তোদের অনেক সংস্কার।

কুসুম মুখটা শুকনো করে বলে, তা যাই বলো, এসব মানতে হয়।

সাহেবরা তো অশৌচ মানে না, তাদের কোন ক্ষতিই হয়েছে শুনি ? দুনিয়াটা তো তারাই চালাচ্ছে। আমরা এত মানছি, তাতে কোন হাত পা গজিয়েছে আমাদের! ধুকছি।

কুসুম একটু অবাক হয়ে বলে, সাহেবদের কথা ভেবে কী হবে ? তারা আলাদা মানুষ। আমরা তাদের মতো নই। তুমি কেন রেণে যাও বীণাদি ? নিমাইদাদা কাছে থাকলে তুমিও কিন্তু মানতে। যাকগে বাবা, যা ভাল বোঝো করো। আমি আর কিছু বলব না।

আমি যাচ্ছি কুসুম। তুই ঘরদোর দেখে রাখিস।

এসো গিয়ে।

বীণা উঠল।

কুসুম হঠাৎ বলল, শোনো, এ খবর শুনেল মন করতে হয়।

বীণা বলল, না করে দেখিই না কী হয়!

বীণা শাড়ি পাল্টাল, মুখে একটু পাউডার দিল, সামান্য লিপস্টিক ছোঁয়াল। পাঁচ হাজার টাকা-ভরা ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। খুব ভীষ্ম চোখে আগাগোড়া লক্ষ করল তাকে কুসুম। কুসুম খুশি হচ্ছে না। কুসুম তাকে সমর্থন করছে না।

বীণা বাস স্ট্যাণ্ডে এসে দুপুরের রোদে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার কান্না পাচ্ছে না, কিন্তু কে জানে কেন মনটা খারাপ লাগছে একটু।

বিষ্ণুপুরে যখন পৌঁছলো তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে সে অবাক হয়ে থমকে দাঁড়াল। এ কাদের বাড়ি ? সে কি ভুল বাড়িতে ঢুকছে ? মা-বাবার ঘরখানা লোপাট। চারদিকে ইট কাঠ টিন স্ফাপকার ছড়ানো। অনেকগুলো মিস্তিরি গোছের লোক ধ্বংসস্থলের ভিতরে কি সব করছে।

সে চোঁচিয়ে ডেকে উঠল, মা!

নয়নতারার রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে একগাল হেসে বলে, ওমা, তুই এসেছিস ? আয়, দ্যাখ কী সব কাণ্ড হচ্ছে!

কী কাণ্ড মা ?

কৃষ্ণ আমাদের বাড়ি করে দিচ্ছে যে!

দাদা বাড়ি করে দিচ্ছে ? কই আমাকে খবর দাওনি তো!

বড্ড তাড়াতাড়ি সব হয়ে গেল কিনা! আমরা বামার ঘরটায় আছি। যা, গিয়ে ও ঘরে কাপড়-টাপড় ছাড়।

মেজদা নেই ?

না। সে চলে গেছে। অনেক কথা। পরে শুনিস।

বীণা অবাক চোখে ভাঙা ঘরের জায়গাটা দেখছিল। ফাঁকা ন্যাড়া অন্ধত দেখাচ্ছে। জন্ম থেকেই দেখে-আসা চেনা জায়গাটা কেমন হবে এবার!

কত বড় বাড়ি হবে মা ?

ওরে সে মস্ত বাড়ি হবে শুনছি। তিনতলা। বড় বড় ঘর হবে, বারান্দা হবে, দরদালান হবে, বাথরুম হবে, ঠাকুরঘর হবে, কল লাগানো হবে, পাম্প বসবে কুয়োয়।

বলো কী! দাদা এত করবে ?

করছে তো।

বীণার মনটা ভিজ্জে গেল। মা-বাবাকে সে চিরকাল কষ্ট করতেনই দেখে এসেছে। এত সুখ সবইবে তো!

বীণা একটা শ্বাস ফেলে বলল, যাক, তাহলে দাদার এতদিনে সুমতি হল।

ওকথা কেন বলছিস ? কৃষ্ণর কি কখনও কুমতি ছিল! ওই খাণ্ডার বউয়ের পাল্লায় পড়ে অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কৃষ্ণর মনটা তো আমি জানি। কষ্ট করে মানুষ হয়েছে, সেই কষ্ট তোরাও করিসনি। দুঃখীর ছেলে বলেই সে বরাবর আমাদের দুঃখ বুঝত। কিছু করতে পারত না, তা সেটা তার দোষ নয়।

তুমি তো বরাবর দাদার পক্ষে মা, দাদার এতটুকু নিন্দে সইতে পারো না।

নয়নতারা অহংকারে উজ্জ্বল মুখে বলে, আমার কথার কী দাম বল ? কিন্তু আজ যে দুনিয়াসুন্দ লোক আমার কৃষ্ণর নামে জয়জোকার দিচ্ছে। দেখতে পাস না আমার কৃষ্ণ কিরকম মাথা-উঁচু মানুষ। আমি কি এমনি এমনি পক্ষ নিই ?

বীণা মুখটা চুপ করে বলে, হ্যাঁ মা, দাদা আজ অনেক বড়, আমাদের নাগালের বাইরে। দাদা বলে ভাবতেও ভয় করে। পরিচয় দিলে লোকে বিশ্বাস করে না।

বীণা ধীর পায়ে ঘরে এল। কাপড় ছাড়ল। তারপর শুয়ে রইল একটু চুপচাপ। কী করবে সে এখন ? কী করা উচিত ? শাশুড়ির মরার খবরটা পেয়ে অবধি তার মন একটা অস্থিতি হচ্ছে। মন থেকে তাড়াতে পারছে না অস্থিতিটাকে।

বাবা কোথায় গিয়েছিল। গরমে ঘেমে ফিরে এসে তাকে দেখে বলল, কখন এলি ?

একটু আগে। তোমরা বেশ সুখে আছো, না বাবা ? পাকা বাড়িতে থাকবে।

বিষ্ণুপদ জামাটা ছেড়ে রেখে বসল। তারপর বলল, সংসারে সুখ বড় একটা নির্ভেজাল হয় না। তারমধ্যেও কত চোরা টান, কত শত্রুতা থাকে! বামা তো শুনছি আইন আদালত করবে। বাড়ির কাজ না বন্ধ হয়ে যায়।

কেন, বাড়ি হলে মেজদার ক্ষতি কী ?

সেটা কেন-ই জানে। গত রোববার সে বড় বউমাকে নিয়ে এসেছিল। বড় বউমা এসে মিষ্টি মিষ্টি করে অনেক কথা শুনিতে গেল। মনটা তাই ভাল নয়।

বউদি কথা শুনিতে গেল ? কেন বাবা ?

বিষ্ণুপদ অসহায় ভাবে ডাইনে বাঁয়ে মাথা নেড়ে বলে, সে সব বুঝবার মতো মাথা কি আমার আছে ? তোর মাও বোকা মানুষ।

কী বলছিল ?

সে শিক্ষিতা মেয়ে, পষ্টাপষ্ট তো ঝগড়া করে না। নানারকম কথা বলল। ইংরেজিতেও অনেক কথা। সব কি বুঝি ? তবে জানিয়ে গেল এ কাজটা ভাল হচ্ছে না।

এ বাড়িতে এল, ভাতটাতে খেয়েছে তো ?

না। খেয়ে এসেছিল। চা-টুকু খেয়েছিল। সেটাই ভাগ্য। তবে তার দোষ নেই। কৃষ্ণ খরচটাও তো কম করছে না! বউমার সেটা ভাল না লাগতে পারে। আমি সেই থেকে ভাবছি, এ বাড়ি কি আনন্দের বাড়ি হবে ? বামা ক্ষেপে আছে, বড় বউমা খুশি নয়, ওই দালানে থাকতে কাঁটা কাঁটা লাগবে না একটু ?

তা কেন বাবা ? টাকা তো বউদির নয়, দাদার।

হ্যাঁ। কৃষ্ণ পরদিন এসে সে কথাই বলল। বউমা যে কথা শোনাতে আসবে তা জানা ছিল তার। তাই পরদিনই এসে হাজির। আমাদের মন খারাপ দেখে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে গেল। তোর মুখটা অমন শুকনো কেন বল তো ?

রোদে এলাম তো!

তাই হবে।

বীণা বরাবর আনমনা হয়ে যাচ্ছে। বরাবর মনে হচ্ছে। অশৌচ! হঠাৎ হঠাৎ মনে হচ্ছে, পালপাড়া। মাঝে মাঝে বুকটা ধক করে উঠছে।

খাওয়ার সময় সে ইচ্ছে করেই জিজ্ঞেস করল, মাছ নেই মা ?

নয়নতারা বলল, মাছ তো রোজ আসে না। মাঝে মাঝে। তাও এখন ঘর ভাঙাভাঙির গণ্ডগোলে আমাদের খাওয়া-দাওয়া সব মাথায় উঠেছে।

রাঙা বলল, আজ রাতে তোমাকে ভাল মাছ খাওয়াবে।

রাতে! বলে একটু থমকাল বীণা। তারপর বলল, আজ রাতে আমি থাকব না তো!

ওমা! কেন ? গোপাল যে তোমাকে দেখে কত লাফালাফি করল! পটল তো বলছে, সাতদিন রেখে দেবে তোমায়।

না বউদি। আজ যেতে হবে।

এত অল্প সময়ের জন্য কেউ আসে ?

পরে এসে থাকবে। দালানও উঠে যাবে ততদিনে। কী বোলা ?

॥ ৮৬ ॥

গ্যারেজের ওপর একখানা ঘর, কাঠের পার্টিশন করা। সামনে রিসেপশন। ভিতরের ঘরে দুটো কম্পিউটার। এই ঘরেই একটা এয়ারকুলার চলে। বুঝকির নতুন অফিস। মাইনে তিনশো টাকা। কনফার্মড হলে বারোশ হওয়ার প্রতিশ্রুতি আছে। কিন্তু অফিসে প্রথম দিনেই বুঝকি বুঝতে পারছিল, প্রতিশ্রুতি বোধহয় শেষ অবধি রক্ষা করবে না এরা। কারণ একটা রোগা মেয়ে বাসবী তাকে চুপি চুপি বলল, আমি দু' বছর আছি। মোটে চারশ টাকা পাই।

তবে আছো কেন ?

এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করছি। কিছুদিনের মধ্যেই চাকরি পেয়ে যাবো।

পার্মানেন্ট হওনি এখনও ?

ওটা হচ্ছে খুড়োর কল। পার্মানেন্টও হবে না, মাইনেও বারোশ টাকায় পৌছবে না। দরকার কি বলো? তিনশ-চারশতেই তো আমাদের মতো ছেলেমেয়েদের পেয়ে যাচ্ছে। চলে গেলে সঙ্গে সঙ্গে অন্য একজন ঢুকে পড়ছে। চাকরির বাজার তো জানো।

তুমি চারশতেই দু' বছর আছো?

আছি। টাকার দরকার ছিল, তাই খুব খাটতাম প্রথম প্রথম। ভাবতাম বুঝি কাজ দেখে খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি পার্মানেন্ট করে দেবে। শেষে দেখলাম, খেটেই মরছি, এদের গা নেই।

এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে?

কিছুটা। সব সময়ে তো আর মেশিন অপারেট করতে দেয় না, রিসেপশনে বসিয়ে রাখে বা অন্য সব অফিসে লেগে ওয়ার্ক করতে পাঠায়। ছাত্র-ছাত্রীও তো বেশি হয় না। তিনটে শিফটে মোরকেটে জনা পনেরো। জায়গাও তো নেই।

একটু দমে গেল ঝুমকি। এই চাকরির জন্য সে বাবার সঙ্গে কত ঝগড়া করেছে। বাবা কিছুতেই তাকে চাকরি করতে দিতে চায়নি। সেও করবেই। তাও মাইনের কথা বাবা জানে না। জানলে বোধহয় বাবার আবার হাট আটাক হবে।

কে যে মালিক তা বোঝা মুশকিল। একজন চটপটে শার্ট ছোকরা তার ইন্টারভিউ নিয়েছিল। কিন্তু তাকে দেখতে পাচ্ছে না। একজন পেটমেটা যুবক বসে আছে সামনের ঘরে। হেলাফেলার ভাব। তাকে দেখে নড়লও না। জয়েন করতে এসেছে শুনে বলল, বৈঠ যাইয়ে।

পরে কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী এল, তাদের মধ্যে দুজন বেশ বয়স্ক লোকও আছে। কিছুটা শেখাল তাদের বাসবী। প্রথম দিন ঝুমকিকে মেশিন দেওয়া হল না। মেশিনে ছিল আর দুজন পুরুষ ট্রেনার। একজনের নাম শুভ, অন্যজন দেবদত্ত। দেবদত্ত গোমড়ামুখো, কথা-টখা বলে না। শুভ আলাপী না হলেও কথা-টখা বলল। জিজ্ঞেস করল, আপনি কি নীড়ি?

হ্যাঁ, অবশ্যই।

তা হলে এখানে সুবিধে নেই। অবশ্য আপনাকে দেখে নীড়ি মনে হয় না।

কেন বলুন তো!

এই তো মুশকিলে ফেললেন। চেহারা-টেহারা দেখে আন্দাজ করছি।

ঝুমকি একটু হাসল। বলল, আমার নীড়টা আর ক'দিন পরেই দেখা দেবে। আপনাকেও কি এরা কম মাইনে দেয়?

এখানে ম্যাক্সিমাম মাইনে পাই আমি আর দেবদত্ত। তাও ঝুলোঝুলি করে পাঁচশো।

ক'বছর আছেন?

প্রথম থেকে। সাড়ে তিন বছর।

মাত্র পাঁচশো টাকায়?

কী করব বলুন! কম্পিউটারের বাজারটাও স্যাচুরেটেড হয়ে যাচ্ছে। আমরা যা শিখেছি তা যথেষ্ট নয়। হায়ার ট্রেনিং থাকলে ভাল হত।

এখানে ও লেভেল কোর্স আছে?

শুভ হাসল, তাই তো বলে। কিন্তু ওই নামেই ও লেভেল। আপনি তো এসব না জানেন এমন নয়।

ঝুমকি এখনও অনেক কিছু জানে না। সে বলল, মেশিন তো মাত্র দুটো, আমাকে তা হলে কী করতে দেবে এরা?

শুভ হাসল, ঝুলঝাড়ুনি বা ঝাঁটাও ধরিয়ে দিতে পারে। রাগ করবেন না, প্রথম প্রথম আমাকে আর দেবদত্তকে তাও করতে হয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম এরা আমাদের আন্তরিকতার দাম দেবে। দেয়নি।

ঝুমকি বলল, এরা আসলে কারা? মালিক কে বলুন তো!

মধ্যপ্রদেশের লোক। যে আপনার ইন্টারভিউ নিয়েছিল সে হল মালিকের ছেলে। নবীন প্রসাদ। আর এখন যে বসে আছে সে হল নবীনের ভাই যমুনা।

লোক কেমন?

যেরকম দেখছেন সেরকমই। যত তাড়াতাড়ি পারে টাকা কামিয়ে নেওয়ার ধান্দা ছাড়া এরা আর কিছু বোঝে না।

ভারাক্রান্ত মনে সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরল ঝুমকি।

বাবা জিজ্ঞেস করল, কী হল?

ঝুমকি একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, কী আবার হবে? চাকরি করে এলাম।

মনীশ জুঁকচকে বলল, আমি জিজ্ঞেস করছি কনসার্নটা কেমন বুঝলে।

প্রথম দিনেই কি বোঝা যায়? ভালই।

মাইনে কত?

এখনও ঠিক হয়নি। এক মাস যাক তো।

তার মানে কি ওরা মাইনেটা কমিট করছে না? না কি তুই চেপে যাচ্ছিস?

আচ্ছা বাবা, অভিজ্ঞতারও তো একটা প্রয়োজন আছে। প্যাঙ্কিসে না থাকলে যে সব ভুলে যাবো। পয়সা খরচ করে শেখাটাই বৃথা হবে।

এটা শেখারও তো কোনও দরকার ছিল না। এম এ পাশ করতে পারতি।

লাভ কী বলো!

কিসের লাভ? চাকরির কথা ভেবে পড়াশুনো যারা করে তাদের পড়াশুনোটাও বৃথা। জানার জন্য যদি পড়তি তা হলে তার একটা দাম হত।

আজকাল তো কেউ জানার জন্য পড়ে না বাবা, চাকরির জন্যই পড়ে। জানার দাম আছে ঠিকই। কিন্তু দাম তো কেউ দেয় না।

মনীশ বলল, তোর জন্য আমার টেনশন হচ্ছে। এরা কেমন লোক জানি না, তুই একটা বয়সের মেয়ে, বিপদ হবে না তো!

কেন ডাবছো বাবা? বিপদ এত সহজ নয়। ওখানে আর একটা মেয়ে আছে। জমজমাট অফিস।

মনীশ চুপ করে গেল। মুখে একটুও হাসি নেই।

আজ বাবার সঙ্গে খুনসুটি করল না ঝুমকি, যা সে রোজই একটু করে। আজ সে সোজা নিজের ঘরে চলে গেল এবং ডাবতে বসল। চাকরিটা তার ভাল লাগছে না।

চাকরাসির ফোনটা এল রাত আটটা নাগাদ।

এই ঝুমকি, চাকরিতে জয়েন করলি আজ?

হ্যাঁ মাসি।

যাক বাবা, বাঁচা গেল।

কেন মাসি?

ডাবছি তোর চাকরির অনারে কাল ডিনার খাওয়াবো।

তার চেয়ে বেড়ালের বিয়ে দাও না। আগের দিনের বড়লোকরা তো এসব ছুতোয় টাকা ওড়াত।

ইয়ার্কি করছিস?

যা চাকরি এর অনারে ডিনার দিলে যে আমার লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করবে।

শোন, কাল শনিবার। তোর মা বাবা অনু বুঝকা সবাইকে নিয়ে চলে আয় সন্ধ্যাবেলা।

প্রীজ মাসি, এতটা কোরো না। আমার লজ্জা করছে।

যাঃ, লজ্জা কিসের?

তুমি সব সময়েই কেবল বাড়িটাকে একটা নেমন্তন্ন বাড়ি করে রাখো! তোমার বুঝি অকেশনেরও দরকার হয় না?

এটাই তো জীবন। শোন, সামনের মাসের শেষ দিকে আমি লম্বা ট্র্যারে বাইরে চলে যাচ্ছি। অন্তত ছ'মাস। নন্দনাকে হয়তো ওর বাবা আমেরিকার একটা স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে আসবে এবার।

ওমা! কেন? ওইটুকু মেয়েকে?

ওর বাবা খুব চায় মেয়েটা আমেরিকায় পড়ুক। অবশ্য এখনও সব ঠিক হয়ে যায়নি। আমার ইচ্ছেও নেই। যা সব শুনি আমেরিকার হালচাল তাতে ভয় করে। বারো-তেরো বছর বয়স থেকেই নাকি সেক্স শুরু হয়। ডাব তো একবার কী কাণ্ড!

তুমি রাজি হয়ো না মাসি।

এখনও হইনি। তা হাড়া এখন ছাত্র-ছাত্রীদের নিতেও চাইছে না আমেরিকা। সুব্রত খুব চেষ্টা করছে অবশ্য। আসল কথাটা হল, ছ'মাস তো আমি থাকব না, তাই এই ক'দিন একটু মেলামেশা করে নেবো সকলের সঙ্গে।

তুমি না থাকলে ছ'মাস যে আমারই কি করে কাটবে! খুব খারাপ লাগবে আমার।

কেন, চাকরি তো করছিস। ব্যস্ত থাকবি।

ছাই। আজ জয়েন করে মন এত খারাপ হয়ে গেল!

কেন রে? ওরা ভাল নয়?

একদম বাজে।

তা হলে ছেড়ে দে।

দিয়ে? কিছু তো করতে হবে।

আচ্ছা মুশকিল। করতেই হবে কেন? ভাল না লাগলে ছেড়ে দিবি।

অত সোজা নয় মাসি। বাড়িতে আমার প্রেস্টিজ বলে কিছু আর থাকবে না।

আচ্ছা, তুই কাল সবাইকে নিয়ে আয় তো। দেখা যাবে।

কী দেখবে মাসি?

কিছু একটা করতেই হবে তোর জন্য। আচ্ছা, আমার পি.সি.-তেই তো তুই এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করতে পারিস। চাকরির কী দরকার?

একা একা হয় না মাসি। দেখানোর লোক চাই। আমি এমন কিছু বেশি তো শিখিনি।

আচ্ছা, আয়। আমি সুব্রতর সঙ্গে কথা বলছি।

আবার আমার জন্য ওঁকে কেন জ্বালাতন করবে?

করব, আমার ইচ্ছে। ও হয়তো ইচ্ছে করলে পারে।

একজনকে তো যথেষ্ট জ্বালাতন করেছে। আবার আর একজনকে কেন?

কাকে জ্বালাতন করেছি? হেমান্তর কথা বলছিস? ও একদম কোনও কাজের নয়। এখন তো বলছে কাজকর্ম সব বন্ধ করে পৃথিবীকে দূষণমুক্ত করার কাজে লাগবে।

সে কী? এটা কবে থেকে?

কৃষ্ণজীবনবাবুর একটা বই বেরিয়েছে জানিস?

জানি তো।

সেটা পড়ে ওর মাথা গরম হয়েছে। একদম পাগল।

জোর করে একটা বিয়ে দিয়ে দাও। পাগলামি সেরে যাবে।

বিয়ের কথা আর বলিস না। রশ্মিকে নিয়ে কী ব্রীশী কাণ্ড করল বল তো। অত ভাল মেয়েটা।

ভাল মেয়ে অনেক পাবে।

রশ্মির মতো তো আর পাবো না। বেশ ছিল।

যাই বলো বাপু, আমার আবার তত ভাল লাগত না।

কেন রে ?

কী জানি! রশ্মির সব বেশি বেশি।

পড়ে তো থাকবে না। শুনছি তো তারও একটা হিল্লো হচ্ছে।

কী বলছো ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চারুশীলা বলল, কাল ফোন করেছিল। সেরকমই একটা আভাস দিল যেন।

কী বলল বলো তো ?

কাল বলব। আসবি কিন্তু। তোর মাকে ফোনটা দে। নেমস্তন্নটা আমারই করা উচিত।

ঝুমকির বুক কেন কাঁপছিল ? মায়ের হাতে ফোনটা ধরিয়ে দিয়ে সে নিজের ঘরে এসে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। তার যেন ঘাম দিয়ে একটা জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে। হাত-পা অবশ লাগছে। রিলিফ! কিন্তু কেন ?

পরদিন সন্কেবেলা চারুশীলার বাড়িতে একগাদা অতিথি দেখে অবাক হল ঝুমকি ? পারোও খরচ করতে মানুষটা।

এত আয়োজন কেন মাসি ? বলো না যে আমার চাকরির অনারে।

চাকরির অনারে না হোক, তোর অনারে।

আমার অনারেই বা কেন ?

আমার তো জানিস একটা ছুতো দরকার হয়। আমি আসলে মানুষ ভালবাসি।

সে জানি।

অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাতে একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ল চারুশীলা। ঘুরে ঘুরে হলঘরে সকলের মুখ দেখছিল ঝুমকি।

যারা চারুশীলার বাড়ির নেমস্তন্থে প্রায়ই আসে তারা সবাই আছে। বাদ শুধু হেমাঙ্গ। একটু অদ্ভুত ব্যাপারটা।

চারুশীলা একটু বাদে এসে বলল, চল কোথাও বসি। একটা ঠাণ্ডা খাবি ?

না। আমার টনসিলটা বেড়েছে বোধহয়। অফিসের কুলারটা সহ্য হচ্ছে না।

ছেড়ে দে।

কুলারে আমার অভ্যাস আছে। যেখানে শিখতাম সেখানেও কুলার ছিল। কিন্তু এই অফিসের কুলারটা বড্ড ঠাণ্ডা।

চাকরি করিস না ঝুমকি।

এবার বলো তো, রশ্মি কী বলছে ?

চারুশীলা একটু দ্বিধা করল। বলল, বলটা কি ঠিক হবে। আমাকে প্রাইভেটলি বলেছে। হেমাঙ্গকে বলতে বারণ করেছে এখন।

আহা, বলো না!

কাউকে বলিস না।

বলব না মাসি। বলো।

একটা বাড়লি ছেলের সঙ্গে ওর একটু আভ্যন্তরীণ হয়েছিল। ছেলেটা লভনের একটা বড় ব্যাঙ্কে মস্ত চাকরি করে।

আভ্যন্তরীণ মানে ?

তুই কি আভ্যন্তরীণ মানেও ভুলে গেলি ?

কিরকম আভ্যন্তরীণ ?

বলল, একা থাকা এখন বেশ বিপজ্জনক। ভালও লাগছে না। তাই ও শিগগিরই একটা ডিসিশন নিতে চায়।

বিয়ে করবে ?

ভাবছে।

এত ভাবার কী আছে ?

আছে রে আছে। বিয়ে সাম্প্রতিক জিনিস।

তা জানি। কিন্তু বেশি ভাবতে গেলে আবার কঁচো যাবে।

চারুশীলা হাসল। বলল, না, কাঁচবে না। রশ্মি খুব প্র্যাকটিক্যাল মেয়ে। সে বিয়ে করবে বিয়ের প্র্যাকটিক্যাল প্রয়োজনের জন্যই। ভাবাবেগ থেকে নয়।

রশ্মি সম্পর্কে আমার এ কথাটাই তোমাকে বলার ছিল মাসি। রশ্মি বড় বেশি প্র্যাকটিক্যাল, সহজ, বাস্তববাদী। সে আমাদের মতো নয়।

চিন্তিতভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে চারুশীলা বলল, সেটা কি আমি জানি না ? হেমাঙ্গর সঙ্গে ওই একটা জায়গায় ওর মেলে না। কিন্তু হেমাঙ্গ যে বড় বেশি স্বপ্নবিলাসী, বড্ড ভাবাবেগ! উদাসী ধরনের ছেলে। ডেবেলিলাম, রশ্মিই ওকে চালিয়ে নিতে পারবে।

ঝুমকি একটু হাসল।

চারুশীলা একটা শ্বাস ফেলে বলল, এই এক পাগলকে নিয়ে কি করি বল তো। কাল রাতে ফোন করেছিলাম। ওর চাকর বলল, দাদাবাবু নাকি কাল বিকেলেই তার গায়ের বাড়িতে চলে গেছে।

ও। বলে ঝুমকি বৃক্কের মধ্যে একটা পতনের শব্দ পেল কি ?

চারুশীলা আবার অতিথি অভ্যর্থনায় এগিয়ে গেল।

ঝুমকি সরে এল একটা কোণের দিকে। একা। তার বেশি কথা বলতে ভাল লাগছে না। মেলামেশা ভাল লাগছে না। রাগিবেলা যখন নিজের ঘরে একা হল ঝুমকি, অন্ধকারে জেগে থেকে তখন নিজের সামনে অকপট নিজেকে দাঁড় করাল সে। প্রশ্ন করল, সত্য বলা।

ঝুমকি বলল, তাই।

তাই? ঠিক জানো?

ঝুমকি বলল, মনে তো হচ্ছে।

ঠিক হল কাজটা?

কে জানে!

ভাবো। আরও ভাল করে ভাবো।

ভাবছি। দিনরাত ভাবছি।

কোনও ভুল নেই?

হয়তো ভুলই হচ্ছে। ভীষণ ভুল।

তার কথা কি গোপন রাখব সকলের কাছে?

॥ ৮৭ ॥

আর কী বাকি রাখলেন বলুন তো! নৌকো বাওয়া শিখলেন, মাছের জাল ফেলা শিখলেন, হাল চাষ শিখলেন! লেখাপড়া যা শিখেছিলেন সব তো ভুলে মেরে দেবেন এর পর।

শিখলাম আর কই? শুধু কায়দাটা শিখলেই কি হল? অভ্যাস করতে হবে না? নৌকো বাইতে বাইতে আর হাল চাষ করতে করতে যখন হাতে কড়া পড়বে, লোহার মতো শক্ত হয়ে যাবে তখন বুঝব যে শিখেছি।

আর লেখাপড়া যা শিখলেন তার গতি কী হবে? এই হাল চালানো, নৌকো বাওয়া বা মাছ ধরা এসব কি আপনার কাজ? এ শিখে কী হবে?

হেমাঙ্গ একটু হেসে বলে, এ শেখাটা তোমার কাছে কিছু নয় বুঝি?

এ তো সবাই পারে। কিন্তু মাথার কাজ তো সকলকে দিয়ে হয় না।

বাকা মিঞা, এ শেখার দাম তোমার কাছে না থাক, আমার কাছে অনেক। আগে বিচি দেখে গাছ চিনতে পারতাম না, কত বোকা আর অশিক্ষিত ছিলাম বলা তো? জীবনটাকে সাপটে ধরতে হলে এসবও দরকার হে।

আপনার দরকার আপনি বুঝবেন। কিন্তু বিভিন স্ট্রিটের বাড়িতে গেলে মা ঠাকরুন আমাকেই ধরে পড়বেন, ও বাকা, তোমার পাল্লাম পড়েই আমার এ ছেলেটা গোপ্লাম গেল।

গোপ্লাম আগে ভাগ করে যাই তবে তো!

যেতে আর বাকিটা কী? গত সাত দিন কলকাতায় যাননি। কত কাজকর্ম বকেয়া পড়ে আছে ভাবুন তো!

সেসব আমার পার্টনাররা সামলে নেবে বাকা, ভেবো না। জীবনের একটা দিক আমার একদম অচেনা থেকে গিয়েছিল, সেইটে ভাল করে চেনা দরকার।

বাকা মিঞা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, এ আবার চেনাচেনির কী আছে? চাষাভূষা, জেলে, মাঝির জীবনে কিছুই নেই। পেট আছে আর পেটের চিন্তা আছে। গতর খাটিয়ে চাষি যাওয়া। এর মধ্যে কোন মধু আছে?

সে তুমি বুঝবে না।

বুঝবে না বলে তো আমাকে ঠেকালেন, শেষে দায়টাও আমার ওপর পড়বে।

তা দায় তোমারও একটু আছে। এমন সুন্দর জায়গাটায় এনে ফেললে যে আমার যেতেই ইচ্ছে করে না।

মাঝে মাঝে না গেলে চলবে কেন? তা সেই যার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছিল তিনি কি চলে গেলেন?

হুঁ।

বিয়েটা হলে আপনার একটু ঘরমুখো ভাব হত।

হেমাঙ্গ হাসল, বিয়ের দরকার নেই বাকা মিঞা। বউ এসে আমার জীবনটাকে ছোট ফ্রেমে বাঁধিয়ে নেবে। তখন কি আর ইচ্ছেমতো চলে আসতে পারব? এই যে সাত দিন ধরে এক মুক্ত জীবন ভোগ করছি এ আর পারব?

আমারও তো সেই কথা। এ সব করার দরকারই বা কী?

হেমাঙ্গ মাথা নেড়ে বলল, তুমি কিছুতেই স্টো বুঝতে পারবে না। আচ্ছা বলা তো, এই জায়গাটাকে তুমি কি সুন্দর দেখ?

মুশকিলে ফেললেন। এখানেই আমার জন্ম।

আমারও জন্ম। আমি এখানে নতুন করে জন্মেছি। তুমি জানোছো বটে, কিন্তু এ জায়গা রোজ দেখেও দেখনি। তোমার চোখই যে পুরনো।

বাকা মিঞা মাথা নেড়ে বলে, নাঃ, আপনার রোগের চিকিৎসা নেই।

কথা হচ্ছিল দাওয়ায় বসে। একথানা মোড়ার ওপর বাকা মিঞা, আর জলচৌকিতে হেমাঙ্গ। বর্ষার পরে শরতের আসি-আসি ভাবটা চারদিকে খুব টের পাওয়া যাচ্ছে। হেমাঙ্গর শিউলি গাছ দুটোয় দুটো চারটে ফুল হয় আজকাল। আকাশে মাঝে মাঝে মেঘের সঞ্চারণ হয়, হুড়মুড় করে বৃষ্টি নামে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মেঘ কেটে গিয়ে এক আচ্ছন্ন রোদ্দুরে ঝলমল করতে থাকে চারদিক। কাশফুল ফোটে কাছপিটেই, নৌকো বেয়ে গিয়ে সেই কাশফুলের শোভা প্রায়ই দেখে আসে হেমাঙ্গ। স্পষ্টভাবে নয়, কিন্তু অস্পষ্টভাবে হেমাঙ্গ আজকাল এই জগতের সঙ্গে এই মহাবিশ্বের সঙ্গে নিজের ৩৬২

সম্পর্কের একটা স্ফূর্তিসূক্ষ্ম সূত্রকে টের পাচ্ছে। বাঁকা মিঞা সেই গভীর আবিষ্কারের খবর রাখে না। বাঁকা মিঞার কাছে তার এইসব আচার-আচরণ একটা মহাপতন, এক সাংঘাতিক সর্বনাশ।

তুমি আমাকে নিয়ে এত ভাবছ কেন বাঁকা ?

ভাবছি, তার কারণ আছে। আজ কলকাতায় যাব। বিডন স্ট্রিটে আপনাদের বাড়িতেও একবার যেতে হবে। মাঠাকরুন সুন্দরবনের মধু চেয়েছিলেন। তা, তার জোগাড় হয়েছে। সেইটে নিয়েই যাব। গেলে পর আপনাকে নিয়ে কথা উঠবে। কী বলব তাই ভাবছি।

হোমস্ হাঙ্গল, আমাকে কি তুমি জোর করে ধরেবেঁধে রেখেছ এইখানে ? আমি তো নিজের ইচ্ছেয় আছি।

সে তো ঠিকই। কিন্তু ইচ্ছেরও তো নানারকম ব্যাখ্যা হয়। দাড়ি লম্বা হচ্ছে, চুলে জট ধরছে, গায়ের রং তামাটে মেরে এল—এ তো ভাল লক্ষণ নয়। কিছু একটা হয়েছে আপনার, মুখে বলছেন না।

তা তো হয়েছেই। কী মনে হচ্ছে জানো ? এই দুনিয়ায় জন্মে এতকাল দুনিয়াটাকে চিনবার চেষ্টাই করিনি, দুনিয়াটার ভাল-মন্দ নিয়ে ভাবিওনি কিছু, এত যে মানুষজন তাদের সঙ্গে সম্পর্কও তৈরি করিনি। অনেক বকেয়া পড়ে গছে। দুনিয়াটাকে এখন নানাভাবে চিনবার চেষ্টা করছি।

বাঁকা মিঞা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে পড়ল। বলল, কলকাতা থেকে ফিরে কাল সকালে খবর দিয়ে যাব'খন।

খবর! না, কলকাতার খবরে আর দরকার কি আমার ?

বাঁকা মিঞা অবাক হয়ে বলে, মা-বাপ কেমন আছে সেটাও কি জানতে ইচ্ছে করে না আপনার ?

ভালই আছে বাঁকা, তারা ভালই আছে।

বড্ড চিন্তায় ফেলে দিচ্ছেন।

সকালের নরম রোদে উঠোন ভরে আছে। বাঁকা চলে যাওয়ার পর তার ছোট উঠোনে রোদের লালচে নরম আলো আর গাছের চিকরি-মিকরি ছায়ার কাঁপন চোখ ভরে দেখছিল হোমস্। কত পোকামাকড় আসে। কত অদ্ভুত ধরনের তাদের ওড়াওড়ি, ঘোরাঘুরি। আকাশের মেঘে কত আকার। আজকাল তার প্রকৃতিমুগ্ধতা এসে গেছে।

কী গো দাদা, বসে বসে হাঁ করে কী ভাবছ ? চা খাওনি এখনও ?

হোমস্ বাসন্তীর দিকে চেয়ে বলল, হ্যাঁ রে, চা খাওয়ার এখন কী দরকার ? ছেড়ে দিলেই তো হয়!

ওমা! ছাড়বে কেন ? তোমার চা করতে গিয়ে আমিও যে একটু করে খাই।

হোমস্ হেসে বলল, তাহলে কর।

আজকাল বড্ড আনমনা থাকো। কী হয়েছে বলা তো!

হোমস্ একটু বিরক্ত হয়ে বলে, তুইও কি বাঁকা মিঞার মতো হলি! সব সময়ে কী হয়েছে, কী হয়েছে। মানুষ মাঝে মাঝে একটু একা থাকতে চায়, একটু ভাবনাচিন্তা করতে চায়। সেটা কি দোষের ?

বাসন্তী আগে একটু সমীহ করত হোমস্কে। আজকাল আর একদম করে না। ঝংকার দিয়ে বলল, আহা, কী হয়েছে জানতে চাইলে বুঝি দোষ হয় ? তোমার ভাল-মন্দ নিয়ে ভাবব না তো আর কে ভাববে ? বাঁকা চাচা কি সাথে বলে বাবুর ঘাড়ে ভূত চেপেছে ?

চোখ পাকিয়ে হোমস্ বলল, বলেছে ?

হ্যাঁ বলেছে। তাতে হয়েছেটা কী ? বাঁকা চাচা তোমাকে কত ভালবাসে জানো ?

তোদের ভালবাসার জ্বালায় না আমাকে এ গাঁ ছাড়তে হয়।

ছেড়েই দেখ না। কলকাতায় গিয়ে ফের ধরে নিয়ে আসব।

তুই রাখতে চাস, আর বাঁকা তাড়াতে চায়। তার ধারণা হয়েছে আমি কলকাতায় না গেলে দুনিয়া অচল হয়ে যাবে। তোদের দুটিকে নিয়ে যে কী করি!

আর কিছু করতে হবে না, শুধু গোমড়া মুখে থেকো না। একটু কথাটখা কয়ো। আজ সকালেও নাকি আফজলের সঙ্গে নৌকো বাইতে গিয়েছিলে ?

হ্যাঁ তো। জাল ফেললাম।

মাছ পেয়েছ ?

পেয়েছিলাম। আফজলকে দিয়ে দিয়েছি।

ওমা! কেন ?

মাছে আজকাল আঁশটে গন্ধ পাই। আফজল নিয়ে গেল, কিছু খাবে, কিছু বেচে দুটো পয়সা পাবে।

বাসন্তী অসন্তোষের গলায় বলে, এই করে করে তোমার সব যাবে। মাছ আনলে আজ মাছের খাল করে তোমাকেও খাওয়াতাম।

ডাল ডাত তরকারিই তো পেট ভরে খাচ্ছি।

তবে ধরারই বা কী দরকার ? না-ই যদি খাবে তবে মাছ ধরা শিখছ কেন ?

শিখে রাখা ভাল।

তোমার শুধু ওই কথা।

বাসন্তী একটু গনগন করতে করতে ঠোঁড় জ্বলে চা করল। তারপর চা দিতে এসে হঠাৎ শিহরিত আতঙ্কিত একটা চিৎকার দিল, ই কী!

চমকে গিয়েছিল হোমস্। কাপের চা খানিক চলকে গেল। অবাক হয়ে বলল, কী হয়েছে ?

তোমার নখগুলো দেখেছে ? এ যে রাক্ষসের নখ হয়ে উঠেছে! মা গো!

হেমাঙ্গ নিজের নখগুলোর দিকে তাকাল। বাস্তবিকই অভদ্র রকমের বড় হয়ে গেছে। নেল কাটার নেই বলে কাটা হয়নি। লজ্জিত হয়ে বলল, কাটতে হবে।

আজই কাটবে। ছিঃ, ওরকম নখ নিয়ে কেউ থাকে? এর পর লোকে তোমাকে বলবে, পাগলা।

নেল কাটার নেই বলে কাটা হচ্ছে না।

আহা, কী কথা! নখ-কাটুনি নেই বলে আমরা বুঝি নখ কাটছি না? মদনদাকে খবর দিচ্ছি, এসে নরুন দিয়ে মুড়িয়ে কেটে দিয়ে যাবে।

নরুনকে হেমাঙ্গর বড় ভয়। যন্ত্রটাকে ছেলেবেলা থেকেই সে সুনজরে দেখে না। তা ছাড়া অন্যের হাতে নখ কাটানোর অভ্যাসও তার নেই। বলল, আচ্ছা, আমি নিজেই কেটে নেব'খন। মদনকে ডাকতে হবে না।

আজই কাটবে?

দেখছি। তুই যা তো, রুটি বানা। খিদে পেয়েছে।

বাসন্তী ঘরের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লে নিজের নখগুলোর দিকে ফের চেয়ে রইল হেমাঙ্গ। বাস্তবিক নখগুলোর একটা ব্যবস্থা না করলেই নয়। আজকাল ভাতের থালায় হাত দিলে নখের শব্দ হয়। নখের গোড়ায় অস্বাস্থ্যকর নীল ময়লাও জমেছে।

নখ নিয়ে অনেকক্ষণ ভাবল হেমাঙ্গ। তারপর একটা সিদ্ধান্ত নিল।

রুটি বেড়ে এনে বাসন্তী সামনে বসে বলল, হ্যাঁ দাদা, সেই সুন্দর মেয়েছেলেটার সঙ্গে বিয়ে হল না তোমার কেন বলে তো!

কতবার শুনবি?

আবার বলে। তোমার কথাগুলো এমন যে স্পষ্ট করে বোঝা যায় না। বারবার শুনলে বুঝতে পারব।

তুই জন্মেও বুঝবি না।

আচ্ছা, বিয়েটা হল না বলেই কি তুমি বিবাগী হয়ে আছ এখানে?

তাই ধরে নে।

না, স্পষ্ট করে বলে।

হেমাঙ্গ রুটি খেতে খেতে বলল, বিয়ে করে কোন বোকা? বিয়ে তো কয়েদখানা। এই বেশ আছি।

বেশ আছ না ছাই আছ। তোমার মুখচোখ মোটেই ভাল নয় বাপু। সব সময়ে দুঃখ-দুঃখ ভাব করে থাকো।

তাই বুঝি?

আচ্ছা, একটা কথা কইব?

বল না। তোর তো কথার শেষ নেই দেখছি।

কথা না কইলে বাপু আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। আমি নাকি ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও রাত বিরেতে জোরে জোরে কথা বলি। সেইজন্য আমাদের বাড়িতে নাকি কখনও চোর ঢোকে না। বলে হি হি করে খুব হাসল বাসন্তী। হ্যাঁ, সেই কথাটা।

বলে ফেল।

আচ্ছা সেই যে রোগামতো মেয়েটা এসেছিল, কী নাম যেন!

আবার তাকে নিয়ে ভাবচিস কেন?

তার সঙ্গে কিন্তু তোমাকে খুব মানায়। নামটা ঝুমকি না কী যেন?

একটু শুদ্ধ হয়ে থাকে হেমাঙ্গ। বুকের অন্তঃস্থলে থিতানো জলে একটু নাড়া পড়ে কি?

হেমাঙ্গ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, ও সব ভাবিস না।

কেন, ভাবলে বুঝি দোষ?

বিয়ে করার প্রশ্নই নেই। করলেও শহুরে মেয়ে নয়।

বাসন্তী চোখ বড় বড় করে বলল, তো কি গায়ের মেয়ে?

যদি কখনও বিয়ে করি তবে গায়ের মেয়েকেই করব।

বাসন্তী হঠাৎ হেসে গড়িয়ে পড়ল, বলে কী গো! গায়ের মেয়েরা যে ভীষণ বোকা আর ঝগড়ুটে হয়। কিন্তু ঠাইল জানে না। তোমার সঙ্গে মানাবে কেন?

আমি ঠাইল-জানা মেয়ে পছন্দ করি তোকে কে বলল?

লেখাপড়া জানে নাকি তোমার মতো?

লেখাপড়া না জানলেই ভাল। লেখাপড়া তো আর একটা আপদবিশেষ।

তোমাকে নিয়ে আর পারি না বাপু। তোমার ঘাড় ঠিক ভূত চেপেছে!

দুপুরে খাওয়ার পর হেমাঙ্গ বিনা ভূমিকায় তার ব্যাগ গুছিয়ে নিচ্ছিল।

বাসন্তী চৈতাল, ও কি? কোথায় চললে?

কলকাতায়। নখ কাটতে।

বাসন্তী চোখ বড় করে বলে, নখ কাটতে কলকাতায়?

হেমাঙ্গ একটু হেসে বলে, নেল কাটার ছাড়া হবে না, বুঝলি? এবার যখন আসব যন্ত্রটা নিয়েই আসব। পায়ের নখ এত বড় হয়েছে যে, হোচট খেলে এক-আধটা নখ উল্টে যেতে পারে। রক্তারক্তি কাণ্ড হবে তখন।

বাসন্তী কপালে হাত দিয়ে বলে, পোড়া কপাল! বাবু নখ কাটতে কলকাতায় চললেন। তাহলে আর তুমি ইহজন্মে গায়ের মানুষ হতে পারবে না। বুঝলে?

বুঝলাম। ঘরদোর দেখে রাখিস।

সে তোমাকে বলতে হবে না। কবে আসবে ?
 চলে আসব। খেয়াল হলেই চলে আসব।
 আমি এদিকে পাঠী দেখতে লেগে যাচ্ছি কিন্তু।
 মাথায় চাঁট খাবি। ফাজিল কোথাকার!
 বাসন্তী হাসল না। একটু ছলো ছলো চোখ করে বলল, তুমি চলে গেলেই না এ জায়গাটা আমার বড্ড ফাঁকা লাগে।
 কী করি জানো ? তোমার ঘরে এসে বসে থাকি। একা একা ভুতের মতো।
 হোমস্‌র মনটা একটু মেদুর হয়ে গেল। বলল, দেখিস যেন তোকেও আবার ভুত না পায়।
 ঘাট অবধি এগিয়ে দিয়ে গেল বাসন্তী। বলল, তাড়াতাড়ি চলে এসো কিন্তু।
 ভটভটিতে বসে হোমস্‌ ছেড়ে-আসা ঘাট আর নদীর ধারে তার ঘরখানার দিকে চেয়ে ছিল। বড় মায়ী জন্মে গেছে।
 এটা কি ভাল ? কলকাতার প্রতি তার কোনও টানই নেই। যেতে হচ্ছে বলে যাওয়া। কতটা মিথ্যা নয় যে, তার অনুপস্থিতি ক্রমে ক্রমে কলকাতায় কিছু অনিশ্চিত শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। তার পার্টনাররা অবস্থিতে আছে। উদ্বিগ্ন তার মহাজন ক্লায়েন্টরা। অথচ সে কীই বা করতে পারে ?
 ফটিক তাকে দেখেই একগাল হাসল, এলেন তাহলে ? না এলে কালই আমাকে সেই গায়ে গিয়ে আপনাকে ধরতে হত।

সে কী! কেন ?
 চাকরদিদি খবর পাঠাচ্ছেন বারবার। গতকাল এসে হাতে টাকা ভঁজে দিয়ে গেলেন। বললেন শুকুরবার গিয়ে যেন আপনাকে ধরে নিয়ে আসি। তাড়াতাড়ি তাকে ফোন করুন। বিডন স্ট্রিটের বাড়ি থেকেও খুব যোজ্জ হচ্ছে।
 এই খোজখবর, উদ্বেগ ইত্যাদি হোমস্‌র আর ভাল লাগে না। বিতৃষ্ণায় মনটা ভরে যায়। স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার সবচেয়ে বড় অন্তরায় এইসব আত্মীয়তা।
 হোমস্‌ আগে তার হাত আর পায়ের নখ কাটল। কফি খেল। বসে বসে অনেকক্ষণ ভাবল। সঙ্গে সাড়ে সাতটার বাংলা খবর শুনল টিভিতে। যদিও খবর তাকে স্পর্শও করল না।
 বিডন স্ট্রিটে প্রথম ফোনটা করল মাকে।
 মা প্রথম কথাই বলল, তুই ডেবেলিস্টা কী ?
 কিছু ভাবিনি মা। কয়েকটা দিন একটু—
 একটু ? একে একটু বলে ?
 শরীরটা একটু সারিয়ে এলাম।
 তোর যে কী চেহারার ছিри হয়েছে তা আমি জানি। টকটকে ফরসা রংটাকে জ্বলিয়ে দিয়েছিস। তারপর ওখানে নাকি নৌকা বাইহিস, জাল ফেলছিস, চাষ করছিস। এই এতক্ষণ সব বলে গেল বাঁকা মিঞা। তোকে আর গড়চার বাড়িতে থাকতে হবে না। কালকেই চলে আসবি। আমি তোর বাবাকে বলেছি ও বাড়ি বিক্রি করে দিতে।
 হোমস্‌ আতঙ্কিত হয়ে বলল, শোনো মা, শোনো। আমি আর না হয় এরকম করব না।
 না বাপু, এসব পাগলামিকে আমি সহ্য করব না। তোর বাবাই ভুলটা করেছেন। ও বাড়িতে তোকে পাঠানোটাই সব সর্বনাশের মূল। মায়ের কোলছাড়া হয়ে থেকে তোর এখন নানা বাই দেখা দিচ্ছে। এখন থেকে তোকে আমি নিজের কাছে রাখব।
 শোনো মা, এটা কোনও পাগলামি নয়। কলকাতার ভিড় ছেড়ে ফাঁকায় যেতে হচ্ছে করে না বলো! ঠিক আছে, সামনের শনিবার চलो, তোমাকে আর বাবাকে নিয়ে গিয়ে আমার গায়ের বাড়িটা দেখিয়ে আনি। দেখলেই তোমার মত পাল্টে যাবে।

রক্ষে করো বাপু, আমার আর ওই ধাপধারা গোবিন্দপুরে গিয়ে কাজ নেই। তোর যাওয়াও আমি বন্ধ করব। বিয়ে না দিয়ে আমি আর তোকে বিডন স্ট্রিটের বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে দেব না। ফটিককে খবর পাঠাচ্ছি সে আজই জিনিষপত্র গুছিয়ে রাখুক। কাল ট্রাক গিয়ে সব নিয়ে আসবে।
 মা, আর একটা মাস সময় দাও।
 এক মাস! এক মাসে কোন হাত-পা গজাবে তোর ? বাঁকা মিঞাকেও বলে দিয়েছি স্বদের দেখতে। গায়ের বাড়িটাও বিক্রি করে দিবি।
 সর্বনাশ!

কিসের সর্বনাশ ? ওই গা-ই তো তোকে খেল। বিয়েটা হয়ে থাকলে একটু নিশ্চিন্তি ছিল। সাধা লক্ষী পায়ে ঠেললি! অমন মেয়ে কি পড়ে থাকে ? এই তো কেমন বিয়ের ঠিকঠাক হয়ে গেল।

কার কথা বলছ মা ?
 আবার কার কথা ? রশ্মি কেমন বুদ্ধিমতী মেয়ে দেখ তো! বিলেতে-বিদেশে একা থাকবে না বলে কেমন বর জুটিয়ে ফেলেছে। আর তুই হাঁ করে গায়ে বসে আকাশ গিলছিস।
 হোমস্‌ একটু স্তব্ধ হয়ে থেকে বলল, এ খবর কে দিল ?
 খবর কি আর চাপা থাকে ? সে নিজেই খবর দিয়েছে চারুককে। চারু আমাদের বলেছে। অমন চারচৌকো মেয়ে তোর বউ হলে সব দিক দিয়ে ভাল হত।

হোমস্‌র হাত-পা শিথিল লাগছিল। কেন যেন একটু অপমানও বোধ করছিল সে। বলল, মা, আমি কালকেই তোমার কাছে যাব, অফিসের পর। সব বুঝিয়ে বলব। এক মাস সময় দাও আমাকে। তাড়াহুড়ো করো না।
 অফিসেও তোর কাজ পড়ে আছে। পার্টনাররা তোর বাবাকে জানিয়েছে, তোর নাকি কোথায় কোথায় যাওয়ার কথা ছিল, যাসনি। তারা হয়রান হচ্ছে। এ সব কী পাগলামি বল তো ?

আচ্ছা মা, কাল গিয়ে সব বলব।

কাল রাতে এখানেই খাবি। মনে থাকে যেন।

আচ্ছা মা।

হেমাঙ্গ ফোন রেখে স্তম্ভিত মাথায় বসে রইল কিছুক্ষণ।

এ কি সত্যি হতে পারে? এত তাড়াতাড়ি তার স্মৃতিকে মুছে ফেলে দিতে পারে রশ্মি? ঠিক কথা, হৃদয়াবেগ নিয়ে থাকার দিন চলে গেছে। কিন্তু তা বলে একটুখানি আবেগও কি থাকবে না? সামান্য সেন্সিটিভ?

ফোনটা আবার তুলে নিল হেমাঙ্গ।

চারুদি, কেমন আছিস?

কেমন আছি? তা দিয়ে তোঁর কি দরকার? আমাদের থাকা বা না-থাকায় তোঁর কী আসে যায়?

আমার খোঁজ করেছিল কেন?

চারুশীলা একটু চুপ করে থেকে বলল, এখন আটটা বাজে। আসতে পারবি?

টায়ার্ড লাগছে। কেন যেতে বলছিস বল তো!

কথা আছে।

হেমাঙ্গ একটু হেসে বলল, বিলিতি বৃত্তান্ত নাকি? ওটা মায়ের কাছে শুনলাম।

কী শুনলি?

রশ্মি কাউকে বিয়ে করছে।

চারুশীলা দুঃখিত গলায় বলে, বলতে বারণ করেছিল।

গোপন করার বিষয় তো নয়। বল ভালই করেছিস।

তুই কি একটু দুঃখ পেলি?

না। দুঃখ পাওয়ার কথাই তো নয়। আমিই রিফিউজ করেছিলাম, সুতরাং আমার তো কোনও দাবি থাকতে পারে না।

ওকে বাধ্য হয়ে করতে হচ্ছে। ইংল্যান্ডে এখন একা থাকা যে কোনও মেয়ের পক্ষেই খারাপ। ও ভয় পাচ্ছে।

আমি জানি। ইটস্‌ এ গুড ডিসিশন।

কাল আসবি?

কাল হবে না। মা ক্ষেপে গেছে। এ বাড়ি বিক্রি করে দিতে চাইছে। আমাকে পুনর্মুখিক হয়ে বিডন স্ট্রিটে ফিরে যেতে বলছে।

যাবি?

সেটা বুঝিয়ে বলতেই কাল মায়ের কাছে যাব।

তাহলে আজই চলে আস। এমন কিছু রাত হয়নি। কাছেই তো। ফটিককে রান্না চাপাতে বারণ করে আস।

হেমাঙ্গ একটু ভেবে অনিচ্ছার সঙ্গে বলল, আচ্ছা।

গাড়িতে পাঁচ মিনিটের পথ। পৌঁছে গিয়ে হেমাঙ্গ দেখল আজও চারুশীলার বাড়িতে অতিথি সমাগম। অতিথি ছাড়া ও থাকতেই পারে না।

চিনতে পারছেন তো! বলে মানি প্র্যান্টের পাশ থেকে একটি হাসিমুখ এগিয়ে এল।

একটু চমকে উঠল কি হেমাঙ্গ? একটা বিট মিস করল তার হার্ট। একটু অবরুদ্ধ গলায় সে বলল, পারছি।

॥ ৮৮ ॥

টাকা জিনিসটার যে কী মহিমা তাই বসে বসে দেখে বিষ্ণুপদ। টাকা যেন ফুঁ। সেই ফুঁয়ে বাড়িটা যেন বেলুনের মতো ফুলে-ফেঁপে উঠছে। দেখ-না-দেখ একতলা ঢালাই হয়ে গিয়ে দোতলার দেওয়াল উঠে গেল লিনটেল অবধি। পরন্তু থেকে শটারিং-এর কাজ। সামনের সপ্তাহে দোতলারও ঢালাই।

মুখোমুখি আজও রামজীবনের আধখ্যাঁচড়া বাড়িটা। তবে আজকাল আর মুখ ভ্যাংচায় না, যেন স্নান চোখে সামনের বুক ফোলালো দোতলা বাড়িটার দিকে চেয়ে থাকে জুলজুল করে। গায়ে এখনও ভারার মই একটা রয়েছে, তাতে শ্যাওলা ধরেছে। ইটগুলো কালে হয়ে এসেছে। ছাদহীন পাকা দেওয়ালগুলো ফাঁকা দাঁড়িয়ে হাছাকার করছে শুধু। দুটো বাড়ির মধ্যে এই রেবারেঘিটা—আর কেউ নয়—বিষ্ণুপদ টের পায়।

রামজীবন কি হেরে গেল? একেই কি হেরে যাওয়া বলে? প্রাণপাত চেষ্টা করে মা-বাপের জন্য পাকা ঘর তুলতে গিয়েছিল। পেরে ওঠেনি। সেইটেই কি তার পরাজয়?

কে জানে কি! তবে রামজীবনের আধখ্যাঁচড়া বাড়িটার ভিতর থেকে ব্যাভাস যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেরিয়ে আসে।

তবে রামজীবন শুকনো মুখে নতুন বাড়ির তদারকি করে যাচ্ছে। খুব ব্যস্ত। মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে কৃষ্ণ আসছে দেখাশুনো করতে। আসছে বামাচরণও। তবে তার মতলব আলাদা।

আদালত থেকে কী একটা ইনজাংশন বেরও করেছিল বামা। একদিন সেই কাগজ নিয়ে এসে হাজির। গাঁয়ের মাদকর মুকব্বিদদেরও জাড়া করেছিল। চেঁচিয়ে-মেঁচিয়ে একখানা নাটক জমিয়েছিল, দেখুন আপনাবা, বামাচরণের বৃকের ওপর বাড়ি হাঁকড়াচ্ছে এরা। ওই বুড়ো ভাম নিজের মুখে কবুল করেছিল, এ ঘরখানা আমায় দেবে। দেখুন অবিচার। আমাকে মোরধের তাড়িয়ে সেই জায়গায় বাড়ি তোলা হচ্ছে। এই দেখুন আদালতের অর্ডার। বাড়ির কাজ বন্ধ করতে হবে। নইলে জেল, জরিমানা সব ব্যবস্থা করে এসেছি। আপনাবা আমাকে সাহায্য করুন।

৩৬৬

কিন্তু বক্তৃতায় বিশেষ কাজ হয়নি। আদালতের হাত এই প্রত্যন্ত গায়ে বিশেষ পৌছয় না। আদালতের কাগজে কী লেখা আছে তাও কেউ জানবার জন্য আগ্রহী নয়।

পঞ্চায়েত ঘণ্টাপদ বলল, মা-বাপের জন্য ছেলে বাড়ি করে দিচ্ছে, তাতে তোমার এত আপত্তি হচ্ছে কেন হে বামাচরণ? সম্পত্তি তো আর বাপ-মা সঙ্গে নিয়ে যাবে না!

আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ওই শালা শুয়ারের বাচ্চা রামজীবন গুণ্ডা লাগিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। পাছে মা-বাপের বাড়ির ওয়ারিশ হিসেবে আমি দাবি করে বসি। আপনারা ষড়যন্ত্র বুঝতে পারছেন না? আমাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে যে!

খুব তুমুল বচসা হল দু' পক্ষ। কোনও ফয়সালা হল না। তার ভাগ্য ভাল যে, রামজীবন টু শব্দটিও করেনি। গালাগালি খেয়েও নয়।

পরদিন বামা এল শ্যামলীকে নিয়ে। শ্যামলী এসেই মড়াকানা জুড়ে দিল, বাড়ি উঠছে, আমাদের ঘরখানা অবধি দখল করেছে, এ কী কাণ্ড গো? এ যে পুকুরচুরি...

বাড়ির সবাই তটস্থ হয়ে রইল।

শ্যামলী শাপ শাপান্ত বাপ বাপান্ত করে হেদিয়ে পড়ল।

পরদিন তারা থানা থেকে পুলিশ নিয়ে এল। একজন সেপাই আর বোধহয় একজন সাব-ইন্সপেক্টর। তারা এসে চারদিক দেখেতনে বিষ্ণুপদকে বলল, এ কাজ তো ঠিক হচ্ছে না। বাড়ি তৈরির কাজ বন্ধ করতে হবে। কোর্টের অর্ডার।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, আমাকে বলে কোনও লাভ নেই। বাড়ি করছে কৃষ্ণজীবন, আমার বড় ছেলে। সে কলকাতায় থাকে। আদালতের অর্ডারের কথা সে বোধ হয় শোনেনি। তাকেই খবর পাঠাচ্ছি, যা হয় সে করবে।

সাব-ইন্সপেক্টর মুখে একটু তর্ক করল; বলল, ঠিকাদারকে বারণ করে দেবেন আর যেন কাজে হাত না দেয়।

বামাচরণকে চলে যেতে বলে সাব-ইন্সপেক্টরটি রয়ে গেল একটু। বামাচরণ সেপাইটির সঙ্গে হাসিমুখে চলে যাওয়ার পর সাব-ইন্সপেক্টর এসে বিষ্ণুপদের পাশে বসে বলল, জ্যাঠামশাই, কৃষ্ণ আর আমি এক ক্লাসে পড়েছি। বামাচরণ আমাকে চেনে না। বামার মাথাটাও একটু গোলমাল মনে হচ্ছে। ওর ওসব কথায় কান দেবেন না। বাড়িটা তাড়াতাড়ি তুলে ফেলুন। কিছু হবে না।

আদালতের অর্ডার আছে নাকি?

আছে। তবে ওসব সাজানো ব্যাপার। উকিলরা কত কী পারে!

কৃষ্ণ পরের রবিবার এসে সব শুনল। তারপর বলে গেল বামার দুঃখের কারণ নেই। চায় তো ওর ঘরটাও পাকা করে দেওয়া যাবে।

শুনে হাঁ হয়ে গেল বিষ্ণুপদ।

নয়নতারা বলল, কেন, তোর টাকা কি সস্তা হয়েছে? যে কাণ্ড বামা করে বেড়াচ্ছে ওর বউকে সঙ্গে জুটিয়ে, তাতে ওকে দানদ্রু করতে আছে? এক নম্বরের নেমকহারাম।

কৃষ্ণ মৃদু হেসে বলল, ঘুষ দিতে চাইছি মা, যাতে তোমাদের আর জ্বালাতন না করে।

ও যা ছেলে, চিরকাল জ্বালাবে বাবা। ঘর পাকা করে দিলে তো বাঘের ঘরে ঘোগের বাসাই হল। শান্তি থাকবে না। বরং যদি প্যারিস ওর মাথার চিকিৎসা করা।

মাথার চিকিৎসার দরকার নেই মা। ও করতে গেলে আরও সন্দেহ করবে। শুনলাম তোমাদের কাছে বাড়ির ভাগ বাবদ টাকা চাইতে এসেছিল?

হ্যাঁ বাবা, সে কী রাগ!

কত টাকা চায়?

সে অনেক টাকা। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার।

সেটা পেলে কী করবে?

ও-ই জানে। পিছনে থেকে বউ বুদ্ধি দিচ্ছে। ও কি আর ভেবেচিন্তে বলেছে?

ধরো সেই টাকাটা দিয়ে যদি লিখিয়ে নিই?

না বাবা। ওসব করতে যাস না। ওর লোভের শেষ নেই। টাকা নিয়ে আবার একটা ফাঁকড়া তুলবে। ওকে চিনি।

তা হলে থাক। বাবা, আপনি কি বলেন?

বিষ্ণুপদ তার কৃতী ছেলেটির দিকে চেয়ে তটস্থ হয়ে বলল, আমি আর কী বলব?

বামার উৎপাত তো বন্ধ করা দরকার।

উৎপাত আছে থাক, গায়ে না মাখলেই হল।

আপনার চিরকাল ওই কথা বাবা, কোনওদিনই কিছু গায়ে মাখেন না। কিন্তু আমি চাই শেষ জীবনটা অন্তত আপনারা একটু শান্তিতে থাকুন।

বিষ্ণুপদ খুব হাসল। মাথা নেড়ে নিজের পণ্ডিত এবং আহাম্মক ছেলেটির দিকে চেয়ে বলল, তোমারও বাস্তববুদ্ধি বলে কিছু নেই। টাকার ব্যবহারও শেখনি। আমার মতোই।

টাকাই তো চাইছে, টাকা দিলে যদি ঠাণ্ডা হয়।

নয়নতারা পাশ থেকে বলে উঠল, খবর্দার না। এখানে এক কাঁড়ি খরচ হচ্ছে বাড়ির পিছনে, ফের যদি আমার পিছনে টাকা ঢালিস তা হলে বউমা কুরুক্ষেত্র করবে।

সে জানবে না, মা।

তোকে বলছে! বামাই গিয়ে বলে দিয়ে আসবে।

তা হলে কী করা?

বিষ্ণুপদ বলল, আমি বলি কি, তুই অত ভেবে মরিস না। বামার সঙ্গে তো চিরটা কাল আছি। সব সয়ে গেছে। নতুন উৎপাত নয় বাবা। তবে আগে এত মাথা-গরম ছিল না, আজকাল বায়ু বেড়েছে।

কৃষ্ণজীবন দুর্গখিল মুখে বসে রইল। তারপর বলল, বামা গিয়ে আজকাল আমার ফ্ল্যাটে চড়াও হচ্ছে। যখন আমি থাকি না, তখন গিয়ে তার বউদির সঙ্গে বসে নানা খবর দেয়। কেন এসব করে বলো তো! ওর কাজকর্ম নেই? এই যে ইনজাংশন বের করল এতে ওর লাভটা কী? নিজের পায়ে কেউ কুড়ল মারে?

বিষ্ণুপদ প্রশ্ন গলায় বলে, মানুষ হিংসের জ্বালায় কত কী করতে পারে! বামাচরণ এসব করছে জ্বালায়। বড় লোভী ছেলে। অথচ ছেলেপুলে নেই, ওরটা খাবেই বা কে? নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ! গাঁয়ের লোক ডেকে এনে জমায়েত করল, হেঁকে ডেকে গালাগাল করল আমাদের, তাতে যে ওরও গৌরববৃদ্ধি হল না, সেটা বুঝবার মতো বুদ্ধিটাও নেই। ওকে টাকা দিতে চাইছো বাবা? তাতে আরও নষ্ট হবে। টাকা দিয়ে কি সব হয়?

কৃষ্ণজীবন কিছুক্ষণ দুর্গখিলভাবে বসে রইল। তারপর মেনে নিল।

বামা তবু আশায় আশায় আসছে। রোজ আসছে। শৈয়ালের মতো উকিঝুকি মারছে। বাড়ির গড়ন পেটন দেখছে। বিড়বিড় করছে। মাঝে মাঝে হুংকারও দিচ্ছে, সব শালাকে জেলে পাঠাবো।

আদালতের সেই কাগজখানা ছাড়া বামার পক্ষে এখন আর কেউ নেই। কেউই তার পক্ষ নিচ্ছে না। পুলিশও আসছে না। আদালত থেকে পেয়াদা আনানোর মতো দমও তার নেই। শুধু আক্রোশটুকুই যা স্বপ্ন। বিষ্ণুপদের একটু মায়্যাও হয়। ওই আক্রোশের বিষে, হিংসের বিষে তিলে তিলে ক্ষয় পাচ্ছে ছেলেরটা।

আজ সকালে বিষ্ণুপদ উঠোনে বসেছে। রোদটা খারাপ লাগছে না। বৃষ্টি-বাদলা ছেড়ে এখন বেশ মোলায়েম আবহাওয়া। গরমটা তেমন নেই।

নয়নতারা এক বাটি মুড়ি মেখে দিয়ে গেল।

খাও।

মুড়ি দিলে নাকি?

হ্যাঁ। সঙ্গে নারকোল কোরা।

বাঃ বেশ। তবে মুড়ি চিবোতে এখন কষ্ট। কষের দাঁত নড়ছে।

জল দিয়ে ভিজিয়ে দেবো?

না। জল ছিটিয়ে ঘটিরা মুড়ি খায়। আমাদের ও অভ্যাস নেই।

তা হলে দুধ দিই একটু? মুড়ি মুখে দিয়ে দুধে চুমুক দিলে মুড়ি নরম হয়ে যাবে।

ও বাবা, না। দুধে অভ্যাস নেই। পেট ছেড়ে দেবে।

তা হলে?

চালিয়ে দেবোখন। চিবোতে একটু সময় লাগবে, এই যা।

নয়নতারা চলে যেতে যেতে উর্ধ্বপানে চেয়ে বলল, ও মা গো! গোপালটা কোথায় উঠেছে দেখ। ও রাঙা বউমা, দেখ কাও! ছেলে পড়ে যাবে যে! হুম্যানটা কোথায় উঠে বসে আছে দেখ!

দোতলার একটা জানালার ফাঁকায় গোপাল পা ঝুলিয়ে বস। অবশ্য ভয়ের কিছু নেই। পায়ের নিচে একতলার রেন শেড। সারাদিন দুই ভাই এখন নতুন বাড়িতে বেয়ে বেড়ায়। এটাই তাদের নতুন খেলনা। এরকম আশ্চর্য কাণ্ড তারা কখনও দেখেনি। পটলের ইকুলের বন্ধুরা অবধি দল বেঁধে দেখতে আসে।

রাঙা বেরিয়ে এসে গোপালের দিকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। গোপাল নড়ল না। রাঙারও তেমন উদ্বেগ নেই। একটু চেয়ে থেকে ফের রান্নাঘরে চলে গেল।

নয়নতারা বিষ্ণুপদের দিকে চেয়ে বলল, পড়ে যাবে না তো!

বিষ্ণুপদ একটু হাসল। তোমার চোখের আড়ালেও তো কত কী করে। সবসময় কি তুমি সঙ্গে থাকো? পড়বে না। পড়লেও তলায় পা রাখার জায়গা আছে, তারার বাঁশ আছে, আত্মরক্ষার জৈবী তাগিদ আছে। ভয় পেও না।

তোমার কথা শুনেই বেশি ভয় লাগে। এমন করে বলো!

বিষ্ণুপদ একটু হাসল।

হ্যাঁ গো, তোমাকে বরং একটু চা দিই। চায়ে ভিজিয়ে মুড়ি খাও! তা হলে আর কষ্ট হবে না।

তা দিতে পারো। মাঝে মাঝে চা খেতে খারাপ লাগে না।

মুড়ি খেতে খেতেই চা দিতে এল নয়নতারা। উর্ধ্বপানে চেয়ে বলল, হ্যাঁ গো, যা বড় বাড়ি হচ্ছে শেষ হলে একেবারে রাজবাড়ি বলে মনে হবে, না?

মন্দ হচ্ছে না। বিরাট ব্যাপারই হচ্ছে।

যখনই বাড়িটার দিকে চাই বুকখানা ভরে ওঠে। আমাদের বুড়োবুড়ির জন্য এত আয়োজন! গা যেন সিরসির করে।

তা বটে। আমি ভাবি খরচটাও বড় বেশিই করে ফেলছে। আর একটু কম করে করলেও পারত।

ওগো, এই বাড়ির দিকে চেয়ে আমি যে কৃষ্ণকেই দেখতে পাই। কৃষ্ণ কি ছোট? সে বড় বলেই তার বাড়িও অমন। সে তো কৃপণ নয়।

বিষ্ণুপদ এক গাল হাসল, বড় ভাল বলেছো তো। দিবি্য কথা ফুটছে আজকাল। মাঝে মাঝে আমাকে তাক লাগিয়ে দাও।

হ্যাঁ গো, আমরা কি অনেকদিন বাঁচবো?

ও কথা কেন?

বেশি দিন না বাঁচলে ও বাড়ি ভোগ করব কেমন করে?

বিষ্ণুপদ চায়ে একটা পেট্রায় চুমু দিয়ে বলল, মরার তো দিনক্ষণ নেই। কে কখন কবে কোথায় ঢলে পড়বে। আর সেই জন্যই তো মানুষের এত ভোগ-দখলের জলদিবাজি। তবে আমি বলি কি, ও বাড়িতে দুটো দিন বাস করে মরলেও আমার বুকখানা ভরে থাকবে। বাড়িটা তো কথা নয়, ওই বাড়ির পিছনে যে ছেলোটোর টান আছে, সেইটেই অনেক।

ঠিকই বলেছো। উঃ, কী কাণ্ডই হচ্ছে!

আজকাল নয়নতারার মুখখানা সবসময়ে ঝলমল করে আনন্দে, গর্বে। অনেকদিন নয়নতারাকে এত খুশি দেখেনি বিষ্ণুপদ।

মিস্ত্রিরা এল নটা নাগাদ।

দুডুম দুডুম শব্দে কাজকর্ম শুরু হয়ে গেল। সারাদিন চলবে। কিছু খারাপ লাগে না বিষ্ণুপদর। বরং বেশ লাগে। শুধু মনটা খারাপ হয়, মুখোমুখি রামজীবনের অক্ষম বাড়িটার দিকে চাইলে।

রামজীবন রিকশা থেকে কয়েক বস্তা সিমেন্ট নামিয়ে বাড়িতে ঢোকাচ্ছে। ঠিকাদারবাবুর সঙ্গে জরুরি কথা সারল। তারপর দোতলায় উঠল কাজ দেখতে।

অনেকক্ষণ বাদে নেমে এসে বিষ্ণুপদর সামনে উঠোনে বসে একটু শুকনো হাসি হেসে বলল, আর মাসখানেকের মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে যাবে। গৃহপ্রবেশের দিনটা পুরনুত ডাকিয়ে ঠিক করে ফেলব নাকি বাবা?

তা করতে পারো। বলে আধ-খাওয়া মুড়ির বাটিটা রামজীবনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, যা।

রামজীবন উজ্জিষ্ট বাটিটা কপালে ঠেকিয়ে নিল। বলল, ব্যাপারটা জংশেশই হচ্ছে বাবা। টাকা থাকলে কত তাড়াতাড়ি কত বড় কাণ্ড করা যায়!

তা বটে। বলে চুপ করে রইল বিষ্ণুপদ।

কী ভাবছেন বাবা?

বিষ্ণুপদ একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তোর বাড়িটা কি ওরকমই থাকবে? কিছু করবি না?

রামজীবন উদাস মুখে বলল, আমি তো পারলাম না বাবা। ঠেকে গেল। দাদা আমাকে নতুন বাড়ির একতলাটা ছেড়ে দিচ্ছে। তাই ভাবছি ও বাড়ি দিয়ে আর হবেটাই বা কি? থাক পড়ে।

পড়ে থাকলে কি ভাল দেখাবে?

কী করব বাবা?

এ বাড়ি হওয়ার পর ইউ সিমেন্ট কিছু বাঁচবে না?

ঠিকাদার কন্ট্রাক্টে কাজ করছে। জিনিস সব তার। আমরা তো কিনে দিইনি। জিনিস বাঁচলে সে নিয়ে যাবে।

আমি ভাবছিলাম, বাড়তি জিনিস দিয়ে ও বাড়িটা শেষ করা যায় কিনা। এই মজুররাই করে দিত।

আপনি কি মেজদার কথা ভাবছেন বাবা? মেজদাকে এনে ও বাড়িতে বসত করানেন? সে হবে না। মেজদা আসবে না। তার টাকার দরকার। বাড়ি নয়।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, বাবার জন্য নয়। ভাবছিলাম, নতুন একটা বাড়ির মুখোমুখি ও বাড়িটা ভাল দেখাচ্ছে না। ওর মধ্যে যে আমি তোকে দেখতে পাই। কত কষ্ট করে বুকের রক্ত তুলে করতে চেয়েছিল। পারলি না, সে তো তোর দোষ নয়। কিন্তু ওটার দিকে চাইলে আমার কষ্ট হয়।

তা হলে ভেঙে দিই বাবা।

তা কেন? ভাঙবি কেন? গড়ছিল যখন, শেষ কর।

আরও কিছু টাকা লাগবে।

তা লাগুক। চেষ্টা রাখতে হয়।

কিছুক্ষণ মুড়ি চিবিয়ে রামজীবন বলল, আপনার আশীর্বাদ থাকলে হয়ে যাবে।

ওই যে বললাম, ওটাই আশীর্বাদ। লেগে থাক।

যদি করে উঠতে পারি তা হলে ও বাড়িতে কী হবে বাবা?

হয়ে থাক। আমার একটা সান্ত্বনা রইল যে, রামজীবনও পেরেছিল।

রামজীবন হাসল, তাই হবে বাবা। করব।

বিষ্ণুপদ একটু হাসল।

বামাচরণ আর শ্যামলী এল বেলার দিকে। যখন বিষ্ণুপদ স্নানে যাবে যাবেন করছে। দু'জনেরই উজ্জ্বল চোখ।

বামাচরণের চেহারা আরও একটু উদ্ভাস।

বামাচরণ বলল, আপনার কাছে আসা বাবা।

বস তোরা। দাওয়ায় মাদুর আছে। পেতে বস।

শ্যামলী মাদুরটা নিয়ে এসে পাতল। দুজনে বসল।

বামাচরণ গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, একটা কথা শুনে ছুটে এলাম।

কী কথা?

আমাদের তো ধনেপ্রাণে মারলেন। শুনছি নাকি দাদা আমার ভাগের টাকাটা দিতে চেয়েছিল। আপনি আর মা বাগড়া দিয়েছেন।

বিষ্ণুপদ একটু অস্বস্তি বোধ করল। হাসবার একটা বৃথা চেষ্টা করে বলল, টাকাটা সে দিতে চাইলেও তোর নেওয়ায় হকটা কোথায় তা একটু বুঝিয়ে বলবি?

তার মানে?

কৃষ্ণ তোকে কী বাবদে টাকাটা দিতে চাইছে?

পার্থিব—৪৭

৩৬৯

বাঃ, আমার সম্পত্তির ভাগ!

সম্পত্তি কি ভাগ হয়েছে? আইন মোতাবেক কি স্থির হয়েছে কার কতটা ভাগ?

তা না-ই বা হল!

তা যদি না-ই হয়ে থাকে তা হলে তোর পাওনাগণার কথা উঠছে কি করে?

বামাচরণ হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলল, গুয়ারের বাচ্চা বুড়ো, তুমি শালা বসে বসে শকুনির মতো মতলব আঁটছো? জুটিয়ে তোমার মুখ ছিড়ে দিতে হয়!

বিষ্ণুপদ স্তম্ভিত হল বটে, কিন্তু হার্টফেল হল না। এরকম হতে পারে বলে তার একটা আন্দাজ ছিল। সে শুধু বামার দিকে চেয়ে রইল।

নয়নতারা আর রাঙা বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। পটল আর গোপাল দৌড়ে নেমে এল ওপর থেকে। মিস্ত্রিরা কাজ বন্ধ করে মজা দেখছে।

বিষ্ণুপদ তাড়াতাড়ি দেখে নিল, রামজীবন ধারেকাছে আছে কিনা! এ বাড়িতে বামার রক্তপাত হোক তা আর সে চায় না। রামজীবন নেই। বাঁচোয়া।

শ্যামলী তাড়াতাড়ি বামাচরণকে টেনে বসিয়ে একটা ধাক্কা মেরে বলল, তোমার আক্কেল নেই! কাকে কী বলছো? ছিঃ ছিঃ! কথা বলতে যখন জানো না, চুপ করে থাকলেই হয়। বাবা, আপনি ওর কথায় কিছু মনে করবেন না, ওর মাথার ঠিক নেই।

বিষ্ণুপদর একটু হাঁফধরা গোছের ভাব হচ্ছিল। মুখে কথা এল না। শুধু মাথা নেড়ে বোঝানোর চেষ্টা করল, সে বুঝতে পেরেছে।

শ্যামলী বলল, বাড়ির চিন্তাতেই ওর মাথা এত গরম। দেখুন, যদি সত্যিকারের বিচার করে দেখেন তা হলে এ বাড়িতে আমরাই কেবল বঞ্চিত হচ্ছি। আমাদের ওপর খুব অবিচার করছেন আপনারা। দাদা এত টাকা খরচ করতে পারছেন আর আমাদের সামান্য কিছু টাকা ওঁকে দিতে দিচ্ছেন না আপনারা, এটা কেমন কথা?

নয়নতারা এগিয়ে এসে বলল, তাই ঝগড়া করে টাকা আদায় করতে এসেছো?

বামাচরণ তার মায়ের দিকে চেয়ে বলল, ওই আর এক বদমাশ মাগী!

শ্যামলী তাকে ফের একটা ধমক দিল, ফের মুখ খরাপ করছো?

নয়নতারা শ্যামলীর দিকে চেয়ে বলল, ওর আর বলতে কিছু বাকি নেই। সব বলা হয়ে গেছে। আমাদের আর নতুন করে অপমান হবে না। নতুন শুধু বাপকে গালাগাল দেওয়া। তা সেটাও তো হয়ে গেল। আমি বলি এবার ওকে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যাও। রেমে এলে অক্ষত ফিরতে পারবে না। যাও।

বামাচরণ লাফিয়ে উঠে বলল, কেন যাবো? কাকে ভয় খাই? রেমে শালা আমার এইটা করবে।

বলে এমন একটা কুৎসিত ভঙ্গি করল যে, নয়নতারা আর রাঙা চোখ ফিরিয়ে নিল।

ও শালায় গুস্তির তৃষ্ণি করে ছাড়ব। নির্বংশ করে দেবো।

শ্যামলী হঠাৎ উঠে বামাচরণের চুলের মুঠি ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বসিয়ে দিল। বলল, ফের ওরকম করলে কিন্তু মুশকিল আছে।

নয়নতারা বলল, বসছো কেন? বসে কিছু লাভ হবে না। তাড়াতাড়ি চলে যাও। পটল দৌড়ে গেল বোধ হয় বাপকে খবর দিতে। কাজটা ভাল করিনি এসে। ও তো পাগল, কিন্তু তোমার তো আর মাথার গোলমাল হয়নি। ওকে নিয়ে এসেছোই বা কেন?

শ্যামলী হঠাৎ শাতড়ির দিকে চেয়ে বলল, বাড়ি কি একা আপনার? আমাদের নয়? বে-আইনিভাবে বাড়ি তুলছেন, আবার বড় বড় কথা!

নয়নতারা বলল, যা বলছি শোনো। বাড়ি যাও। এখানে আর থেকো না। বামা তার বাপকে গালগাল দিয়েছে, রেমোর কানে গেলে আস্ত রাখবে না। যাও।

শ্যামলী উঠল। বলল, যাচ্ছি। কিন্তু আমাদের পাওনাগণা মিটিয়ে না দিলে কিন্তু বিপদে পড়বেন। বলে দিচ্ছি।

বামাচরণের হাত ধরে টেনে শ্যামলী বেরিয়ে গেল।

বিষ্ণুপদ তার জলচৌকি ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল। পারল না। হঠাৎ হাঁটু ভেঙে গোটা শরীরের ভার নিয়ে পুরনো বাড়ির মতো ভেঙে পড়ল উঠানে।

॥ ৮৯ ॥

তার ভিজিটিং কার্ড নেই, দেওয়ার মতো পরিচয় নেই, জানানোর মতো ডিগ্রি নেই, ভরসা কৃষ্ণজীবনের চিঠিটা। রিসেপশনিস্ট মেয়েটির হাতে একটু নার্ভাস হাতে সেইটেই সমর্পণ করল চয়ন। বলল, দয়া করে যদি এটা মিস্টার সেনের কাছে পাঠিয়ে দেন।

মেয়েটা বেয়ারা ডেকে চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়ে তাকে একবার দেখল। চয়ন আজ যথাসাধ্য সাজগোজ করে এসেছে। পরিষ্কার ইস্তিরি করা প্যান্ট, হাওয়াই শার্ট, আজ সে দাড়ি কামিয়েছে। এর চেয়ে বেশি আর কি সে করতে পারে? ব্যক্তিগত বলে একটা জিনিস আছে, যেটা সাজগোজকে টেকা মেরে যায়, আর স্মার্টনেস বলেও আর একটা জিনিস আছে যা এ যুগের পৃথিবীতে খুব বিকোয়। কিন্তু চয়নের ও দুটো নেই। মেধা? মেধা আছে কিনা তা সে ঠিক বোঝে না। সে ইংরিজি আর অঙ্কটা ভালই জানে, অন্তত ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে যে-টুকুর দরকার হয়। সেই মেধা এই আধুনিক বাণিজ্য সংস্থার কাজে লাগবে কিনা সেটাই প্রশ্ন। নিজেকে এত ঐশ্বর্যহীন, এত বিপদহীন, গুণহীন মনে হয় তার যে জড়সড় হয়ে গদি-আঁটা নরম চেয়ারে বসে সে তীক্ষ্ণ একটা হতাশাঃ বিদ্ধ হতে লাগল বারবার। হবে না সে জানে।

চয়ন শুনেছে, সেন বিদেশ থেকে এক কাঁড়ি টাকা আর নো-হাউ নিয়ে ফিরে প্রথম কিছুদিন চাকরি করে বাজারটা বুঝে নিয়েছিলেন। এখন বোম্বাইয়ের কাছে একটা আধুনিক কারখানা খুলেছেন। কিসের কারখানা তা ভাল জানে না চয়ন; তবে সেনের অবস্থা যে খুব ভাল, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। মাসে মাত্র দশ দশকের জন্য কলকাতায় আসেন, বাকি দিন ভাগ করা আছে দিল্লি ও বোম্বাইয়ের জন্য। এগুলো মূলত সেলস অফিস। সেন প্রায়ই বিদেশে যান। একটা মানুষ অনেক মানুষকে ছাড়িয়ে কি করে যে এত উঁচুতে উঠে যায় সেটাই ভেবে পায় না চয়ন। এসব অচেনা, রূপকথার জগতের মানুষের কাছে যেতে তার ভয় ভয় করে। আর একটা অনুভূতি হয়, নিজের জন্য লজ্জা।

আধ ঘণ্টা বসে থাকতে হল চয়নকে। তারপর একজন হলিছাম বয়োরা এসে তাকে নিয়ে গেল ভিতরে। শেকস্পিয়ার সরণির এই ফ্লোরটা বড় কল তার কোনও আশাজ্ঞ নেই চয়নের। শুনে সে হয়তো অজ্ঞান হয়ে যাবে।

অফিসটা যে খুব বড় তা নয়। এক বা দেড় হাজার স্কোয়ার ফুটের একটা ফ্ল্যাট। হলঘরটা পার্টিশন দিয়ে সামনে রিপেপশন। পিছনে ছোট অফিস। সব মিলিয়ে জনা সাত-আট লোক কাজ করছে। দুটো কম্পিউটার আছে। হলঘর, পেরিয়ে বাঁ দিকে একটা ঘরের দরজা ঠেলে তাকে ঢুকিয়ে দিল বয়োরা।

ভিতরটা বেশ সাজানো। সবুজ কার্পেট, দেয়ালে হালকা সবুজ রং। বেশ বড় একটা আধুনিক টেবিলের ওপাশে সেন সাহেব বসে। বয়স মধ্য ত্রিশ। চল্লিশের কাছাকাছিও হতে পারে। ফরসা, ভাল চেহারা। মাথায় বড় বড় চুল। মুখখানা লম্বাটে, নাকটা প্রবল, ঠোঁট দুটোয় একটা নিষ্ঠুর ভাব আছে। চোখ দুটো তীক্ষ্ণ এবং স্থপনীয়।

অদ্রলোক খুবই অদ্র গলায় বললেন, মিষ্টার বিশ্বাস আপনারা পাঠিয়েছেন? কিন্তু...

এই কিছুটাতেই সবচেয়ে বেশি ভয় পায় চয়ন। কতবার কিন্তু এসে তার পথ আটকে দিয়েছে। সে কিছু বলল না, শুধু ভয়াব্র্ত চোখে সেন সাহেব নামক অতি-সফল লোকটির দিকে চেয়ে রইল।

সেন চিঠিটা আর একবার দেখে বলল, বসুন।

নরম গদির চমৎকার চেয়ারে সে প্রায় ডুবে গেল বটে, কিন্তু শরীরের আরামটা তাকে প্রভাবিত করল না। সে খরগোশের মতো সচকিত ভঙ্গিতে বসে একটা-দুটো-তিনটে শুকনো টোক গিলতে লাগল।

সেন সাহেব সামান্য একটা হাসির রেখা মুখে ফুটিয়ে তুলে বললেন, বিশ্বাস স্যার আমার খুবই শ্রেষ্ঠ মাস্টারমশাই। নাউ হি ইজ এ বিগ অ্যান্ড রিনাউন্ড ম্যান। তিনি যখন পাঠিয়েছেন তখন আপনার জন্য আমার একটু চেষ্টা করা উচিত। আচ্ছা, আপনি কি একটু স্পেসিফিক্যালি বলতে পারেন, ঠিক কী ধরনের জব আপনি করতে পারবেন?

চয়ন আকাশপাতাল ভেবেও এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেল না। সে বিচ্ছিন্নভাবে অনেক কিছুই জানে। ডারউইন তত্ত্ব থেকে মার্কসবাদ, সে জানে ইংরিজি গ্রামার বা সাহিত্যের ইতিহাস, যে জানে অঙ্ক, ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি, কিন্তু বিশেষজ্ঞের জ্ঞান তার কোনও বিষয়েই নেই। নিজেকে উপস্থাপন করা বড় কঠিন মনে হচ্ছিল তার। সে খুব ক্ষীণ গলায় বলল, আমি তো জানি না।

সেন সাহেব কি একটু অবাক হলেন? কপালে বিষয়ের ভাঁজ-গম্ভীর মুখে বললে, যদি অফিস ওয়ার্ক হয়, যাকে ক্লারিকাল জব বলে, তাহলে কিন্তু কলকাতায় কোনও ভ্যাকান্সি নেই। যদি ওরকম সাদামাটা চাকরি করতে চান তাহলে আপনাকে বোম্বাই যেতে হবে। পারবেন? আমরা যা মাইনে দিই তাতে বোম্বাইতে বাসা ভাড়া করে থাকা বা সংসার চালানো খুব শক্ত ব্যাপার।

চয়ন দাঁতে ঠোঁট কামড়াল। তার কাছে কলকাতাও যা, বোম্বাইও তা। কিন্তু বোম্বাই গিয়ে তার কিছু লাভ হবে বলে মনে হল না। সে একটু অদ্রলোকের দিকে চিন্তিতভাবে চেয়ে থেকে বলল, ও তাহলে—

একটু ভেবে নিন। সামনের মাসে দশ তারিখের পর আমি আবার কলকাতায় আসব; যদি রাজি থাকেন তাহলে তখন দেখা করবেন। স্যালারিটা, ধরে নিন অ্যারাউন্ড টু থাউজ্যান্ড। বয়সের পক্ষে কিন্তু স্যালারিটা বেশ কমই। লোকাল পিপলদের হয়তো চলে যায়, কিন্তু—

আবার একটা কিছুতে হোঁচট খেতে হল তাকে। কিন্তুই তার সবচেয়ে বড় বাধা। শব্দটা যদি লোপাট করে দেওয়া যেত।

একটা কুস্তি নমস্কার করে বেরিয়ে এল চয়ন।

টিউশনি সেরে বাড়ি ফিরতে রাত নটা বেজে গেল। ছাদে উঠে যখন ঘর খুলছিল তখন অঙ্গকার ছাদের কোণে জলের ট্যাংকের পাশ থেকে মেয়েলি গলার স্বর জিজ্ঞেস করল, চাকরি হল?

চয়ন একটু হাসল, না।

অনিন্দিতা এগিয়ে এসে বলল, কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি তোমার জন্য। কেন হল না?

চয়ন মৃদু একটু হেসে বলল, হল না বললে ভুল হবে। অদ্রলোক বসেই চাকরি দিতে রাজি। মাইনে মাত্র দু' হাজার।

ধূস। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রিফিউজ করল বোধ হয়।

তাই হবে।

আমার কিন্তু খুব আশা ছিল, চাকরিটা তোমার হবে।

চয়ন মৃদু হেসে বলে, আশা করতে নেই।

শত হলেও কৃষ্ণজীবনবাবু নিজে চিঠি দিয়েছিলেন তো, হওয়া উচিত ছিল।

চয়ন মাথা নেড়ে বলে, কৃষ্ণজীবনবাবু খুব প্র্যাকটিক্যাল মানুষ নন। কাকে কী বলতে হবে, কোন অন্ধ-সন্ধি দিয়ে কাকে চাকরিতে ঢোকানো যাবে সেসব ভাববার সময় তাঁর কোথায়? হয়তো এরোপ্লেনে বা কোনও মিটিঙে ছাত্রটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাই বলেছিলেন। আমার মনে হয়, আমার কোয়ালিফিকেশন কী তাও কৃষ্ণজীবনবাবু ভাল করে জানেন না।

অনিন্দিতা কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের বাতির আভায়ে তার মুখের রান ভাবটা লক্ষ করল চয়ন। অনিন্দিতা একটু ধরা গলায় বলে, মনটা বড্ড খারাপ লাগছে।

আমার লাগছে না। চাকরি জিনিসটা করা তো আমার অভ্যাস নেই। চাকরি হয়তো আমার ভাল লাগবে না।
 অনিন্দিতা একটু অবাক হয়ে বলে, শুধুই টিউশনি করে জীবন কাটাতে চাও নাকি ?
 অকপটে চয়ন বলে, কটিবে না ? আমার তো মনে হয় বেশ কেটে যাবে।
 তোমার অ্যাম্বিশন বলে কিছু নেই কেন বলো তো! তোমার ওই একটাই ভীষণ দোষ।
 চয়ন চিন্তিতভাবে বলে, অ্যাম্বিশন থাকাই কি ভাল ? অলস চিন্তা আর অ্যাম্বিশন তো এক জিনিস নয়। অ্যাম্বিশন
 কথাটার মধ্যে হয়তো অ্যাচিভমেন্টও কিছুটা থাকে। আমার পক্ষে কিছু অ্যাচিভ করা কি সম্ভব ?
 তাই অলস চিন্তা করতে বৃষ্টি লাগে ?
 না অনিন্দিতা, আমি অলস চিন্তাও করি না। আমার মাথায় সেটাও আসতে চায় না।
 কী হবে তাহলে তোমার ?
 আমার কিছুই হওয়ার নয়।
 তুমি একটা কাজ করবে ? কৃষ্ণজীবনবাবুকে গিয়ে বলো, তাঁর চিঠিতে কাজ হয়নি। উনি নিশ্চয়ই আবার চেষ্টা করবেন।
 না অনিন্দিতা, উনি ব্যস্ত মানুষ। মাথায় অনেক চিন্তা। তার ওপর মনে হচ্ছে ওঁর একটা ফ্যামিলি ট্রাবল চলছে। এসব
 বলে ওঁকে ডিস্টার্ব করা ঠিক নয়।
 তোমাকে উমেদারি করতে বলছি না। যা হয়েছে সেটা তো বলতে পারবে!
 সুযোগ পেলে অবশ্যই বলব। আমার মনে হয় উনি যে আমাকে চিঠি দিয়ে এক জায়গায় পাঠিয়েছিলেন সেটাই ওঁর
 মনে নেই।
 তবু বলো। তোমার তো আর কোনও সোর্স নেই। আচ্ছা, সেই সুব্রতবাবুকে বলেছ ?
 উনি জানেন। কিন্তু উনিও আর একজন বিগ গাই। সারা পৃথিবীতে বাড়ির ডিজাইন আর কনস্ট্রাকশন করে বেড়ান।
 ওঁরও কি কথা মনে রাখা সম্ভব ?
 তা বলে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াবে নাকি ? তুমি শুধু মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দিয়েই দেখ না।
 ওঁরা বিরক্ত হবেন।
 তুমি চারুশীলাকেই ধরো না। শুনে তো মনে হয় মহিলা খুব ভাল।
 খুবই ভাল অনিন্দিতা। কিন্তু বায়না করা শুরু করলে বেশি দিন ভাল থাকবেন না। বিগড়ে যাবেন। তা ছাড়া চারুশীলা
 বেশি হয় কিছুদিনের জন্য বিদেশে যাবেন। খুব ব্যস্ত।
 যাঃ। তোমার কপালটাই খারাপ।
 যে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অত ভেবো না। আমি তো ভালই আছি।
 ছাই আছো। ভাল থাকা কাকে বলে তা তুমি জানোই না।
 দুজনেই একটু চুপ করে রইল। এত কাণ্ডের পরও যে অনিন্দিতা ছাদে তার কাছে আসে সেটা অদ্ভুত টানের
 জন্যই। তাদের মধ্যে প্রেম হয়তো নেই, কিন্তু একটা ভালবাসা আছে। অনিন্দিতা তাকে জীবনে দাঁড় করানোর একটা
 শপথ নিয়েছে হয়তো। কিন্তু—
 ওই কিছুই কুর-কুরে খায় চয়নকে। সব সময়ে একটা কিন্তু এসে সব কাজ ভুল করে দেয়।
 অনিন্দিতা হঠাৎ বলে, আচ্ছা, তোমার কাছে হোমান্সবাবুর কথাও তো খুব শুনি। উনি কিছু পারেন না ?
 কী পারবেন ? ওঁর একটা অডিট ফার্ম আছে। ইনকাম ট্যাক্স, আরও সব ট্যাক্স নিয়ে কারবার। সেখানে আমার
 হওয়ার নয়। ওঁর ক্লায়েন্টরা বেশির ভাগই ঝানু ব্যবসাদার। চাকরি দায়ে পড়ে দিলেও বেশিদিন রাখবে না। উনি নিজেই
 বলেছেন সেকথা। চাকরির বাজারটাই স্যাচুরেটেড।
 আচ্ছা, তুমি কেন কম্পিউটার শেখো না ?
 কত কী শেখার আছে অনিন্দিতা! শেখা হল কই ? আমার আর নতুন করে জীবন শুরু করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। টিউশনি
 বজায় থাকলেই হল। চলে যাবে।
 একটা কথা জিজ্ঞেস করব ? কিছু মনে করবে না ?
 না। বলো।
 টিউশনি করে তুমি মাসে কত পাও ?
 দু' হাজারের মতো।
 সেটা কি খারাপ ?
 না তো! খারাপ কেন হবে ?
 বাসা ভাড়া তো পরিশ্রম, তাই না ?
 হ্যাঁ।
 তাহলে তোমার চলে যায়।
 যায়।
 আমার কী ইচ্ছে করে জানো ? তোমার টিউশনিগুলো সব কেড়ে নিই। এই টিউশনি করে চলে যায় বলেই তোমার
 আর কিছু করতে ইচ্ছে করে না। এসো, রেলিঙের পাশে একটু দাঁড়াই—
 খুব সংকোচের সঙ্গে দাঁড়ায় চয়ন। তাদের নিয়ে এ বাড়িতে কথা হচ্ছে। মেলামেশাটা বন্ধ করতে পারেনি চয়ন।
 অনিন্দিতা বলে, যা হয় হোক, তোমার বন্ধুত্ব আমার দরকার।
 বন্ধুত্বটাই আছে। হয়তো তার বেশি কিছুই নেই। তবু দাদা আর বউদি কথা শোনাতে হাড়ে না। আজকাল অবশ্য
 বলে বলে তারাও কিছু ক্রান্ত।

অনিন্দিতা খুব কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, আমার কিছু তোমার মতো নয়। আমার অনেক অ্যাশিশন।
জানি।
আমি বসে থাকি না। বি এ পাস করেই টাইপ আর শর্টহ্যান্ড শিখেছিলাম। কোনও কাজে এল না। বি এড করলাম।
মাস্টারি জুটল না। এবার ভাবছি কম্পিউটার শিখব। কিন্তু এত টাকা লাগে যে বাবার ওপর প্রেশার পড়ে যাবে।
নার্সিং হোমে কেমন লাগছে?
ধূস। একদম বাজে। আমি তো আজকাল রিসেপশন আর অফিস ওয়ার্ক দেখি। কিন্তু কী জানো? ডাক্তার বাসু
লোকটা ভাল নয়। নানারকম আভাস ইংগিত গুরু করেছে।
সেটা কি রকম?
সেটাও বুঝিয়ে বলতে হবে নাকি? মেয়েদের যেভাবে ক্ষমতাবান পুরুষেরা ব্যবহার করতে চায় ঠিক সেরকম। গত
সপ্তাহেও উইক এন্ডে কোথায় যেন নিয়ে যেতে চেয়েছিল। আমি কাজ আছে বলে পার পেয়ে গেলাম। আমার বদলে শুক্লা
নামে একজন নার্সকে নিয়ে গেল। শুক্লার অবশ্য প্রেজুডিস নেই। ডিভোর্সি, এক ছেলের মা। আমার তো তা সম্ভব নয়। এর
পর যদি আবার ওরকম প্রস্তাব দেয় তাহলে বোধ হয় চাকরি ছাড়তে হবে।
চয়ন একটু চুপ করে রইল। মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল হঠাৎ। বলল, বুঝেছি।
নতুন কিছু নয়। দেশ জুড়ে এসব হয়। আমরা যারা সংস্কার আঁকড়ে থাকি, সত্যিভূ, কৌমার্য আঁকড়ে থাকি তাদেরই
কিছু হয় না। পড়ে মার খাই।
চয়ন মৃদু স্বরে বলল, এসব ভ্যালুজ একটু পারসোনাল অনিন্দিতা, যারা একবার হারিয়ে ফেলে তারা আর মূল্যটা
খুঁজেই পায় না। ভোঁতা হয়ে যায়।
তুমি কি মনে করো শারীরিক পবিত্রতার কোনও দাম আছে?
দাম নেই নাকি?
আছে? ওটা তো পুরনো অচল ধারণা। সংস্কার। আমরা কিছু বোকা মানুষ ওসব মেনে চলি।
লোভী লোকের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া কি সংস্কারমুক্তি?
অনিন্দিতা একটু ভেবে বলল, ঠিক তা বলছি না। কিন্তু প্রয়োজনে যদি শরীর দিতে হয়?
প্রয়োজনটাকে খুব বড় করে দেখতে গেলে অনেক গণগোল হয় অনিন্দিতা। বরং প্রয়োজনটা কাটছাঁট করা ভাল।
অনিন্দিতা হাসল, তোমার মতো?
তা বলিনি।
আচ্ছা, আমি পবিত্র থাকলে কি তুমি খুশি হও?
হই অনিন্দিতা।
কেন হও?
এমনি। আমি একটু প্রাচীন পন্থী বোধ হয়।
অনিন্দিতা সামান্য মন্তব্য গলায় বলল, ওটা আমার প্রশ্নের জবাব হল না। আমি পবিত্র থাকলে তোমার কি?
আমার কিছুই না।
কেন কিছুই না?
মুশকিলে ফেললে।
এবার অনিন্দিতা হাসল, আচ্ছা থাক, বলতে হবে না।
চয়ন বাঁচল।
কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অনিন্দিতা বলল, জানো, আমার খুব ইচ্ছে ছিল নাটকে অভিনয় করি। দু' চারটে করেছিও।
কিন্তু ফ্রপ থিয়েটারে চাপ পাওয়ার কোনও স্থিরতা নেই। পয়সাও পাওয়া যায় না।
ক'টা নাটকে অভিনয় করেছে?
করেছি কয়েকটা। কিন্তু ভাল রোল পাইনি। আমার চেহারাও তো ভাল নয়।
চয়ন চুপ করে থাকে। অনেকক্ষণ বাদে বলে, থিয়েটারে মেয়েদের এক্সপ্রায়মেন্টেশন নেই?
ওমা! নেই আবার! খুব আছে। তবে কী হয় জানো, প্রেম-ট্রেম হয়ে যায়। বিয়েও হয়।
তোমার হল না?
না তো! তবে একটা প্রেম হবো হবো হয়েছিল। যে ছেলেটার সঙ্গে হয়েছিল, পরে জেনেছি ওটা একটা হারামজাদ।
বউ আছে, তবে তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না।
তোমার অভিজ্ঞতা অনেক, না?
অনেক।
দুজনে ফের চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।
হঠাৎ তার হাতে একটা হাত রেখে অনিন্দিতা বলে, শোনো, তুমি হার মেনো না।
তার মানে কি অনিন্দিতা?
তুমি হার মানলে আমার খারাপ লাগবে।
চয়ন এই নাটকীয় ডায়াগনে একটু অবাক হয়ে বলে, হার মানবারও কিছু নেই। আমার অ্যাশিশনই নেই যে। আমার
শুধু মনে হয়, এই বেশ আছি।
এটাকে থাকা বলে না। তোমার ব্রেন ভীষণ শার্প। তুমি অনেক জানো। তোমার কিছু হবেই।
আমার বয়স ত্রিশের কাছাকাছি হল অনিন্দিতা।

তাতে কি ? ওটা কি বয়স ? আমারও তো পঁচিশ ।
দুজনে ফের কিছুক্ষণ চুপচাপ ।
আমি এলে তোমার খারাপ লাগে না তো !
না । ভাল লাগে ।

॥ ৯০ ॥

থেকে থেকে বৃকের মধ্যে যেন একটা শীখ বেজে ওঠে, মা! মা! বৃকটা বড় হা-হা করে, বড় ফাঁকা হয়ে যায়, ধু-ধু হয়ে যায় । ক'টা দিন বড় কৈদেছে নিমাই । এত কৈদেছে যে আজও তার মাথা ভার হয়ে আছে । পুরো এক মাস অশৌচ পালন করেছে সে, তারপর নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রদ্ধা । তার বোকা মা কোন অজানায় পাড়ি দিল, ভগবান তার সহায় হোক ।

মরণের কাছে যে মানুষ কত অসহায় তা যত ভাবে ততই দুনিয়াটাকে তার তুচ্ছ বলে মনে হয় ।

তার অবস্থা দেখে ভয় খেয়ে বাবা বলল, ওরে, তুই অত মনমরা হয়ে থাকলে মাথার দোষ হয়ে পড়বে । যা না, বন্ধুদের সঙ্গে একটু কথা-টখা কয়ে আয়, না হলে কাঁচরাপাড়ায় হোটেল গিয়ে খানিকটা সময় বোস ।

মা মারা যাওয়ার পর তার বাবা আছড়ি-পিছড়ি হয়ে কৈদেছে বটে, কিন্তু নিমাইয়ের অবস্থা দেখে বাবা ভয় খেয়ে চুপ মেরে গিয়েছিল । ছেলেটার না আবার কিছু হয়ে যায় । মায়ের শোকে হয়তো মরেই যাবে ।

খড়া গায়ে, উসকো-খুসকো ঢুল, এক মুখ দাড়ি নিয়ে বাবার আদেশে অশৌচের মধ্যেও কাঁচরাপাড়ায় গিয়ে হোটেলের কাজকর্ম দেখেছে নিমাই । কর্মচারী দুজন মিলে চালিয়ে নিয়েছে বটে, কিন্তু ক'দিনই বড় নোংরা করে ফেলেছে চারধার । প্লেট কাপও ঠিকমতো ধোয়া হয় না, ঝাট-পাট ঠিকমতো পড়ছে না, ঝুল-টুল জমেছে, তরকারির খোসা, মাছের আঁশ পচছে রান্নাঘরের কোণে । নিমাই থাকলে এসব হতে পারে না, তার দোকানের পরিচ্ছন্নতার নাম আছে । অশৌচের মধ্যে নিমাই কিছু ছোঁবে না, তবু দাড়িয়ে থেকে সব পরিষ্কার করল । দোকানের বাইরে একখানা টুলে চুপচাপ কুশানন পেতে উদাস ভাবে বসে রইল । চেনা মানুষরা এসে কত সমবেদনা প্রকাশ করে গেল ।

বৃকটা বড় ফাঁকা, বড় উদাস, বেঁচে থাকার রসটাই যেন মরে গেল মায়ের সঙ্গে সঙ্গে । বীণাপাণির সঙ্গে বনগা চলে গিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতে অনেকটা ফাঁক পড়ে গিয়েছিল । মায়ের জন্য কত কী করার ছিল তার, কত কী করেনি, সেসব ইন্সটোপাল্টা হয়ে বারবার মনে পড়ে আর চোখ জলে ভাসতে থাকে ।

বাবা একদিন খরখরে গলায় জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ রে, বীণাপাণি যে এল না!

তাকে খবর দিইনি বাবা ।

বাবা একটু স্তম্ভিত হয়ে বলে, খবর দিসনি ? এ খবর তো দিতেই হয় ।

নিমাই মাথা নেড়ে বলে, ঠিক কথা । কিন্তু সে তো আর আমাদের জন্য নেই বাবা । তার এখন অন্য রকম জীবন ।

বুড়ো মানুষ এখবর হেঁয়ালি বুঝতে পারে না । গম্ভীর মুখে খানিকক্ষণ বসে থেকে বলল, ঘরের বউ তো, তাকে না জানানো কি ঠিক হল ?

ঘরের বউ কি আর বাঁধা আছে বাবা ? সে যুগ আর নেই । এখন সব অন্যরকম হয়ে গেছে ।

বুড়ো মানুষটি তবু ঠিক বুঝতে চায় না । বলে, যাত্রা-টাত্রায় নামা ভাল কথা নয় । ওটাই একটা ভুল হয়ে গেছে ।

নিমাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বাঁচতে গেলে কত কী করতে হয়! তার কী দোষ বল ? সে তো আমাকে বাঁচাতেই রোজগার করতে নেমেছিল । দোষ তার নয় বাবা ।

বাবা কিছুই তেমন বুঝতে পারে না । চুপ মেরে যায় । মনটা ভাল লাগে না বোধ হয় ।

নিমাই বলে, এবার পালপাড়ার পাট তুলে দিলে হয় বাবা ।

তুলে দিবি ?

মা যখন নেই তখন আর এ-বাড়িতে থেকে তোমার কাজ কী ? কাঁচরাপাড়ায় দিবি থাকতে পারবে ।

বাবা কিছুক্ষণ তোষা মুখে বসে থাকে । তারপর বলে, ওই যে সব গাছপালা ওসব তোর মায়ের লাগানো, ওই যে কাপড় ওসব দেওয়ার দড়ি, ওটা সে টাঙিয়েছিল । সারা বাড়িতে এখনও ম-ম করছে তার গন্ধ । এ বাড়ি বেচতে পারবি ? আমার তো কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না । মনে হয়, মরেনি, কোথাও পাড়া-বেড়াতে গেছে । এখুনি এসে পড়বে ।

নিমাই এ কথা শুনে হাউ-মাউ করে কৈদে ওঠে, না বাবা, থাক তাহলে । এ বাড়ি থাক ।

শ্রদ্ধা ভালরকমই করল নিমাই । গায়ের সব লোককে নেমন্তন্ন দিল, খুব খাওয়াল । নিয়মভঙ্গের পরদিন বাবাকে বলল, তাহলে কি আমি আসব বাবা ? কাঁচরাপাড়ায় অনেক কাজ পড়ে আছে ।

এসো গিয়ে ।

একা লাগবে না তো তোমার ?

না না, একা কেন ? তোর মা তো আছেই । চারদিকে ছড়ানো রয়েছে স্মৃতি । বেশ থাকব, মাঝে মাঝে আসবি ।

সে তো আসবই । ভাবি, শরীর-টরীর হঠাৎ খারাপ করলে দেখবে কে ? আমাদের তো জন্মের অভাব ।

আমাকে নিয়ে ভাবিস না । পাড়ার লোক আছে । ভুরো রইল ।

ভুরো একজন বয়স্ক বিধবা । ইদানীং সে-ই রান্নাবান্না করে দিয়ে যায় । তবে তার ঘরসংসার আছে বলে এ বাড়িতে থাকে না । নিমাইয়ের চিন্তাটা তাই গেল না ।

হ্যাঁ রে, বীণাপাণি কি আর ফিরবে না ?

না বাবা ।

ছাড়ান কাটান হয়ে গেছে নাকি ?

সেরকমই ধরে নাও।

আমি ভাবি তোকে তাহলে দেখবে কে? তোরও তো বয়স হচ্ছে।

তোমাকে যে দেখবে, আমাকেও সে-ই দেখবে। ভয় কি?

কাঁচরাপাড়ায় ফিরে এল নিমাই একটা শাশান-বেরাগ্য নিয়ে। সবই করে যাচ্ছে, কিন্তু যন্ত্রের মতো। মাঝে মাঝে বুকের মধ্যে একটা শাঁখ শুধু বেজে উঠছে, মা!

একদিন সন্কেবেলা কাকা এসে হাজির।

নিমাই কেমন আছ?

নিমাই তটস্থ হয়ে উঠে দাঁড়াল, ভাল আছি কাকা।

তোমার মায়ের গত হওয়ার খবর পেয়েছি।

বসুন কাকা, কিছু খেয়ে যেতে হবে আজ।

তোমার কেবল খাওয়া আর খাওয়া। আজকাল খাওয়া অনেক বাদ দিতে হয়েছে। প্রেশার দেখা দিয়েছে। এখন আর আমদা খাওয়া-দাওয়া করি না।

তবু কিছু মুখে না দিলে ছাড়ছি না। কবে এসেছেন?

আজই। রাতের বাস ধরে ফিরে যাবো। শোনো, অনেক মিথ্যে কথা-টথা বলে বীণাপাণিকে সেই পাঁচ হাজার টাকা গছিয়েছি।

বড় ভাল লাগল শুনে। তাকে আরও কিছু দিতে পারলে হত। কিন্তু মায়ের কাজ গেল, অনেক খরচ হয়ে গেছে।

অত অস্থির হচ্ছে কেন? তার তো অভাব নেই।

জানি কাকা। তবে আমি বড় ঋণী হয়ে আছি।

স্বামীর জন্য স্ত্রী করলে কি ঋণ হয়?

নিমাই মাথা নেড়ে বলে, তা ঠিক। তবে আমাদের সম্পর্ক তো জানেন। ঠিক স্বামী-স্ত্রীর মতো নয়। সে আমাদের প্রতীপালন করেছে। কষ্ট করেই করেছে।

শাতড়ি মারা গেল, কিন্তু অশৌচটুকুও তো মানল না দেখলাম।

নিমাই জিব কেটে বলল, তাকে খবরই দেওয়া হয়নি।

কাকা অবাক হয়ে বলল, কে বলল খবর দেওয়া হয়নি? খবর সে সময়মতোই পেয়েছে। কিন্তু মানল না।

নিমাইয়ের মুখটা বিষণ্ণ হয়ে গেল, খবর পেয়েছে?

নিশ্চয়ই। কুসুম নিজে তাকে খবর দিয়েছে।

নিমাই একটু চুপ করে থেকে বলে, না মানুষ, সম্পর্ক তো আর নেই যে মানতে হবে!

কাকা একটু হাসল। বলল, তা বটে। তবে সম্পর্ক না থাক, এক সময়ে ঘর তো করেছে। সেই সুবাদে হবিষ্যি বা শ্রাদ্ধের বাবদ কিছু টাকাও তো পাঠাতে পারত!

নিমাই হাসল, ভগবানের দয়ায় তার আর দরকার কী? বীণাপাণির টাকায় আমার মা-বাপ একসময়ে খেয়েছে পরেছে, সেটাই যথেষ্ট।

কাকার মুখটা কিছু গম্ভীর হল। তারপর হঠাৎ গলা পাণ্টে গেল। একটু থমথমে গলায় বলল, আজ তোমার কাছে একটা বিশেষ প্রয়োজনে আসা।

গলাটা শুনে আর একবার তটস্থ হল নিমাই। বলল, আজ্ঞে, বলুন। গুরুতর কথা নাকি?

খুবই গুরুতর। একটু আড়ালে বলতে চাই। বাইরে চলো।

নিমাই চটিজোড়া পায়ে দিয়ে কাকার সঙ্গে বেরিয়ে এল। কাছেই একটা ফাঁকা জায়গা। লোক চলাচল নেই।

নিমাই, তোমাকে আমি সত্যবাদী বলে জানি। মিথ্যে কথা বলতে বোধ হয় তুমি জানোই না। আজ তোমার কাছে একটা কথা জানান দিতে চাইলে বলবে?

নিমাইয়ের বুকটা একটু কঁপে গেল। লক্ষণ সে ভাল বুঝছে না। কাকা যখন ভাল তখন অতিশয় ভদ্রলোক। কিন্তু কাকা যদি ক্ষেপে ওঠে তাহলে কুরুক্ষেত্র হয়ে যায়।

একটু ভয়ে ভয়ে নিমাই বলল, কিছু কবুল করতে হবে নাকি?

যদি করে তাহলে ভাল হয়।

নিমাই এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল, একটা কথা বলে নিই কাকা। যদি এমন কিছু কবুল করতে বলেন যা করলে কারও ক্ষতি হয় তবে আমি কিছু মুখ খুলতে পারব না।

কাকা একটু হাসল, তাহলেই হবে।

এবার বলুন।

তোমার কি মনে আছে বনগায়ে পগা নামে একটা ছেলে খুন হয়েছিল?

বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা একটা পেদ্রায় লাফ মারল নিমাইয়ের। দাঁতে দাঁত চেপে সে মৃদু গলায় বলল, আছে।

বীণার সঙ্গে তার একটু খাতির ছিল। তাই না?

যে আজ্ঞে।

পগার কাছে অনেক ডলার আর পাউণ্ড ছিল। যে রাতে সে খুন হয় সেই রাত থেকেই টাকাতুলো হাওয়া।

সব জানি কাকা।

ভোলায় কথা নয়। সেই ডলার আর পাউণ্ডের জন্য আমার দলের দুজন খুন হয়, আমার ব্যবসা লাটে ওঠার অবস্থা হয়। মনে আছে?

আছে কাকা।

সেই ডলার আর পাউন্ডের হদিশ আজও আমরা পাইনি।

নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

নিমাই, তোমার কাছে আজ কথটা জানতে চাই।

কী বলব কাকা?

সেই টাকাটার কী হল?

নিমাই মাথা নেড়ে বলল, জানি না।

কাকা তার দিকে একটু চেয়ে থেকে বলল, জানো না?

না কাকা।

কিন্তু টাকাটা কে নিয়েছিল, কার কাছে গচ্ছিত ছিল তা কি জানো নিমাই?

নিমাই চুপ করে থাকে।

এ কথাটার জবাব দেবে না?

না কাকা। এ কথাটার জবাব আমার কাছে চাইবেন না।

তবে কি তুমি জানো?

জানতাম।

শোনো, পল্টু আমাকে কয়েকদিন আগে বলেছে যে, ওর কাছে বীণাপাণি একবার ডলার ভাঙিয়েছিল। আর সনাতন গতকাল বলেছে যে, তোমাকে ও ঘরের ভিত খুঁড়ে ডলার আর পাউন্ড বার করতে দেখেছে। সত্যি?

নিমাইয়ের চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছিল। গলায় কান্নার হেঁচকি তুলে সে কাকার দু'খানা হাত ধরে বলল, কত বললাম ওকে, শুনল না। আমাকে কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিল। আজ ভাবি কোন পাশে সেদিন ইদুরের গর্ত বোজাতে গিয়ে ওই অলক্ষণে পাপের টাকাগুলো টেনে তুললাম গর্ত থেকে।

কেনো না নিমাই, তোমার তো দোষ নয়।

কাদতে কাদতে নিমাই বলল, কতগুলো প্রাণ চলে গেল কাকা। কত পাপ হল!

কাকা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, বীণাপাণি তার ঘরের মেঝে বাঁধিয়ে নিয়েছে। তোমার কি মনে হয় যে ওর কাছেই টাকাটা আছে?

আমি কিছু জানি না কাকা।

কাকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, দু-একজন সন্দেহ করছে যে, ওই টাকাটা বীণাপাণি তোমাকেই দিয়েছে। আর সেই টাকাতেই তুমি হোটেল খুলেছ। তোমাদের মধ্যে ঝগড়া ছাড়াছাড়িটা লোক দেখানো ব্যাপার।

নিমাই হাঁ করে কাকার মুখের দিকে তাকাল। তারপর কথা ঝুঁজ না পেয়ে চোখ বুজল। দুটো হাত মুঠো পাকাল, খুলল। তারপর হঠাৎ খুব শান্ত হয়ে গিয়ে বলল, যদি তাই হয় কাকা, তবে একটা কাজ করবেন? আমার যা আছে সব আপনি নিন। এই হোটেল, নগদ যা টাকা আছে আমার সব কালই লেখাপড়া করে দেবো আপনাকে। খুব কম হবে না কাকা। ঝগটা শোধ হয়ে যাবে।

কাকা তার কাঁধে হাত রেখে বলল, তুমি কি স্বীকার করছ যে, ডলার আর পাউন্ড তুমিই নিয়েছ?

কান্নার মধ্যেও হাসল নিমাই, আমাকে কবুল করতে বলছেন কেন? তার পাপের স্থানল হোক, আপনি আমার সব নিয়ে নিন।

তুমি কি ভাবো যে আমি ওসব কথায় বিশ্বাস করছি?

নিমাই ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, অবিশ্বাসেরও ব্যাপার নয়। আমার মাথাতেই শুধু খেলেনি। ঠিকই তো, বীণাপাণির হাতে ডলার আর পাউন্ড এল আর নিমাইও হোটেল খুলল, এ তো দুইয়ে দুইয়ে চার কাকা। অবিশ্বাসের কিছু তো নয়। আপনার হাত দিয়েই তাকে পাঁচ হাজার টাকা পাঠিয়েছি, সেটাও তো সন্দেহজনক। তাই না?

হ্যাঁ নিমাই, খুবই সন্দেহজনক। নিমাই, তোমাকে আজ না বলে উপায় নেই। ব্যাপারটা এতই সন্দেহজনক যে আমার দলের ছেলেরা খুবই গরম হয়ে আছে। তারা হয়তো ভেবেও দেখবে না, তুমি কতটা ভাল লোক বা সত্যবাদী। তারা বীণার ওপরেও রেগে আছে বটে, কিন্তু তাদের ধারণা টাকাটা তোমার কাছেই আছে। অবস্থাটা বুঝতে পারছ নিমাই?

নিমাই ঘাড় নেড়ে ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, পারছি কাকা। খুব পারছি। শুধু বলুন, আমাকে কী প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

প্রায়শ্চিত্ত? সেটা আবার কি রকম?

আমার যা আছে সব যদি দিয়ে দিই তাহলে কি হবে? নাকি আমাকে খুন করতে চায় তারা? তাহলেও আমার কোনও আপত্তি নেই কাকা। যখন যেকোনো বলবেন আমি হাজির হয়ে যাবো, যা শাস্তি দেবেন তা মাথা পেতে নেবো। বীণাপাণিকে শুধু ছেড়ে দেন আপনারা। সে অসহায় মেয়েমানুষ।

কাকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তুমি বড় গণ্ডগোলে ফেলে দিলে আমাকে। সোজা কথা বলো তো, টাকাটা কি তুমি নিয়েছ, না নাওনি?

হাতের পিঠে চোখ মুছে নিমাই বলে, আমি কিছু বলতে পারব না কাকা। মাপ করুন।

কাকা কিছুক্ষণ থম ধরে থেকে বলল, তুমি একবার বনগাঁয়ে যেতে পারবে?

এখনই!

না, এখন নয়। হুট করে হাজির হলে তোমার বিপদ হতে পারে। আমার ছেলেরা কেমন তা তো জানো।

জানি কাকা। তারা খারাপ তো নয়।

খুবই খারাপ। তারা ক্ষেপে আছে।

নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, একটা কথা বলি কাকা। আমাকে একটা ভিক্ষে দিতে হবে।

কী চাও নিমাই ?

আপনারা বীণাপাণিকে কিছু করবেন না। তার প্রাণটা ভিক্ষে চাই।

কাকা হাসল, বলল, বীণাপাণির অনেক গুণ। আমি গুণের খুব সমঝদার। তাকে কিছু বলা হয়নি, শান্তি দেওয়ার কথাও গুঠেনি এখনও। তবে ছেড়েও দেওয়া হবে না।

তার দায় যদি আমি ঘাড়ে নিই ?

বলেছি তো, তুমি আজ আমাকে খুব গল্পগোলে ফেলে দিয়েছ। আমি কিছু ভেবে পাচ্ছি না। বনগাঁয়ে ফিরে গিয়ে আজ রাতেই দলের ছেলেদের নিয়ে বসব। তারপর যা হয় ঠিক হবে। ওই ডলার আর পাউন্ডের জন্য আমাদের কত ক্ষতি হয়েছে তা তুমি জানো না। আমার দুটো লোক খুন হয়েছে, তার ওপর টেনশন, মারদাঙ্গা।

নিমাই দু' হাতে মুখ ঢাকল।

বীণার যদি মনুষ্যত্ব থাকত নিমাই, তাহলে সে এসব চোখে দেখেও চুপ করে থাকত না। অথচ তার দুর্দিনে আমার অনেক অসুবিধে সত্ত্বেও তার জন্য কম করিনি। দুধকলা দিয়ে কালসাপ পোষা হয়েছে।

নিমাই দু' হাত মুখ থেকে নামিয়ে কাকার হাত দুটো চেপে ধরে বলল, তাকে মারবেন না কাকা। প্রাণে মারবেন না।

কাকার মুখটা খুব থমথমে। বলল, আমি তোমাকে খবর পাঠাবো। খবর নিয়ে যে ছেলেরা আসবে তার সঙ্গেই বনগাঁয়ে চলে যেও। বুঝেছ ?

আমি আপনার সঙ্গে আজ রাতেই যাই না কেন ? আমার যে বড় উদ্বেগ হচ্ছে।

না নিমাই। বোকার মতো কাজ করো না। তোমাদের এক সময়ে ভাল চোখে দেখতুম, তাই তোমাদের ক্ষতি হোক তা চাই না। আগে আমাকে দলের ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে দাও।

যে আজ্ঞে। একটু দেখবেন দয়া করে।

কাকা চলে যাওয়ার পর মাঠের মধ্যে অন্ধকারে ভূতগ্রস্তের মতো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে নিমাই। তারপর হঠাৎ একটা ইন্টার টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে সজোরে নিজের কপালে মারল সে, প্রায়চিন্ত। প্রায়চিন্ত হোক ভগবান!

তারপর ফিরে এল নিমাই। কপাল ফেটে গাল বেয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে জামায়। চোখ মুখ উদ্ভ্রান্ত।

বিশে, বিলু ইত্যাদি তার কর্মচারীরা দৌড়ে এল, কে মারল আপনাকে বাবু ? ওই লোকটা নাকি ?

নিমাই মাথা নেড়ে বলে, না না, সে বড় ভাল লোক। সে কত করেছে আমাদের জন্য। আমরাই নিমকহারাম। পড়ে গিয়ে চোটে হল কপালে।

প্রায় সারা রাত কাঁদল নিমাই। এক ফোঁটা ঝিমুনি এল না তার শুদামঘরের গুমটিতে পাহারা দিতে বসে। সারা রাত ভগবানকে ডাকল, সারা রাত মনস্তাপে হাহাকার করল বুক। না, তার একটুও লোভ নেই। তার যা আছে সব সে দিয়ে দেবে কাকাকে। তারপর কাকা ছোরা বা গুলি যাই দিয়েই মারুক শান্তভাবেই মরবে নিমাই। কর্মফল ক্ষয় হোক।

ওদিকে রাত নটা নাগাদ বনগাঁয়ে বীণার দরজায় ধাক্কা পড়ল, বীণা দরজা খোলো শিগগির।

বিরক্ত হয়ে বীণা উঠে এল, এত রাতে জ্বালাতে এলেন বাবু। কী গো, কী চাই ?

সজলকে কিছু উদ্ভ্রান্ত দেখাচ্ছিল। বলল, বীণা, আমি ছুটতে ছুটতে আসছি। একটা কথা ছিল।

বীণা মুখ টিপে হেসে বলল, রসের কথা তো! অনেক বলেছ।

বীণা, কথটা জরুরি। তোমার বিপদ!

বিপদ!

॥ ৯১ ॥

আপাতত একতলা। দোতলাটা পরে হবে, যদি প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই "প্রয়োজনতা" নিয়েই আবার মণীশ আর অপর্ণার মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিচ্ছে। মণীশ বলল, দোতলাটা একবারেই করে ফেলা দরকার। দোতলাটা হবে লিভিং কোয়ার্টার, একতলায় থাকবে বসবার ঘর, ডাইনিং রুম, রান্নাঘর।

অপর্ণা মাথা নেড়ে বলে, দোতলার এখন কোনও দরকার নেই। দু' কাঠা জমি নিয়ে বাড়ি হচ্ছে। একতলাতেই অনেক জায়গা।

মণীশ আপত্তি করতে লাগল, একতলায় মশা বেশি। চোরের উৎপাত হবে খুব। জানালা দিয়ে লগি ঢুকিয়ে আলনার জিনিসপত্র টেনে নিয়ে যাবে।

অত সোজা নয়। জানালায় জাল থাকবে।

শোনো অপু, একতলায় আরও হ্যাজার্ড আছে। ক্রলিং ওয়ার্ম এসে ঢুকবে বর্ষাকালে। ব্যাঙ লাফাবে ঘরের মধ্যে, কেঁচো বেয়ে বেড়াবে, বিছে কিলবিল করবে।

হ্যাঁ গো, এরপর আমাকে ভয় দেখানোর জন্য রাক্ষস-খোঁকসের গল্পও ফাঁদবে নাকি ? একতলায় কি মানুষ থাকছে না ? সব একতলাই কি সুন্দরবন!

খুবই ব্যথিত হয়ে মণীশ বলল, একতলার হ্যাজার্ড তুমি স্বীকার না করলেও, আছেই। বেশি বৃষ্টি হলে ডুবেও যেতে পারে ঘরদোর।

অনেক কিছু হলে অনেক কিছুই হতে পারে। তা বলে সেসব ভেবে গুটিয়ে থাকতে হবে নাকি ?

তুমি ভীষণ আডামেন্ট অপু।

মোটাই নয়। আমি প্র্যাকটিক্যাল। এক গাদা টাকা খরচ করে দোতলা বানাবে। থাকবে কে বলো তো? মোটে তো পাঁচটি পাণী। অনু আর খুমকির বিয়ে হয়ে যাবে, বুঝকা হয়তো পড়তে চলে যাবে হোস্টেলে, তখন অত বড় বাড়ি হাঁ হাঁ করবে না? তুমি তো ভাড়াটেও বসাতে দেবে না।

না, না, ভাড়ার প্রশ্নই উঠছে না। কিন্তু দোতলা অনেক সেফ এটা লো মানো?

সাবধান থাকলে একতলাও সেফ। অত ভয়ের কিছু নেই।

আচ্ছা অপু, একটা কাজ করলে হয় না?

আবার কী?

ধরো, একতলাটা আমরা কমপ্লিট করলাম না, শুধু পিলার থাকল। শুধু পিলারের ওপর দোতলাটা করলাম। ডিজাইনটাও চমৎকার হবে আর দোতলায় থাকাও হবে।

মাথায় নতুন নতুন আইডিয়া এলেই তো হবে না। দোতলা মানেই দু' দফা ছাদ ঢালাই। খরচ কাছাকাছিই পড়বে।

মণীশ খুবই হতাশ মুখে বসে থাকে। মুখে থমথম করে ব্যাটা ছেলের মতো অভিমান। তারপর বলে, ঠিক আছে, ছেলেমেয়েদের মতও নেওয়া হোক। লেট আস পুট ইট টু ভোট।

অপর্ণা সববেগে মাথা দেড়ে বলে, কখনও নয়। তোমার ডেমনস্ট্রেশন চালাকি আমার জানা আছে। ছেলেমেয়েরা সবাই তোমার দলে। তোমার মতোই ইমপ্র্যাকটিক্যাল। ওরা যখনই বুঝবে যে, তুমি দোতলা করতে চাও তখনই ওরা তোমার পক্ষ নেবে। আমি তোমার ভোটভুটি মানি না।

তুমি একনায়কতন্ত্র চালাচ্ছে অপু।

তাই চালাবো। তোমাদেরও মানতে হবে।

আবার ভেবে দেখো অপু। তুমি বড় কুপণ।

আমাদের টাকা তো ছপ্পড় ফুঁড়ে আসে না!

প্রচুর আপত্তি, বাদানুবাদের পর ছেলেমেয়েদেরও চূপ করাতে পারল অপর্ণা। বাড়ি করার ব্যাপারে স্বপ্নশীল মণীশকে সে দূরে রাখল। ছেলেমেয়েদের সঙ্গেও কোনও পরামর্শই করল না। সে ধরল চারুশীলাকে।

আপনার হাজর্যাদ তো নামকরা মানুষ, যদি তাঁর চেনাজানা কোনও ঠিকাদার বা রাজমিস্ত্রি ঠিক করে দেন তো ভাল হয়।

ঢারু অবাক হয়ে বলল, তা কেন? সুব্রত নিজেই করে দেবে আপনার বাড়ি।

অপর্ণা শিহরিত হয়ে বলে, কী যে বলেন! আমাদের বাড়ি নিতান্তই ছোট আর সাদামাটা। গুঁর মতো মস্ত মানুষ কেন ওরকম বাড়ি করতে যাবেন?

তাতে কী? সাদামাটা বাড়ি করলে কি ওর জাত যাবে?

তা নয়। আপনার উনি ব্যস্ত মানুষ। আমার তো গুঁকে দরকার নেই। একজন ভাল রাজমিস্ত্রি পেলেই আমার হয়ে যাবে।

চারুশীলা অবশ্য এত সহজে ছাড়ল না। সুব্রতর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিল অপর্ণার। বলল, গুঁর বাড়িটা তোমাকেই করে দিতে হবে।

অপর্ণা তো লজ্জায় মরে।

কিন্তু সুব্রত এতটুকু বিব্রত বা বিরক্ত হল না। মিটিমিটি হাসিমুখে অপর্ণার বাড়ির প্র্যান্টা খুব খুঁটিয়ে দেখল। দু' একটা প্রশ্ন করল। তারপর বলল, বাড়ির প্র্যান্ট ভালই হয়েছে। সয়েলটা একটু স্টেট করিয়ে নিলে ভাল হত। জ্বলা বা পুকুরটুকুর ছিল না তো ওখানে!

তা তো জানি না।

তাহলেও একটু ভীপ ফাউন্ডেশন করবেন। আমি মিস্ত্রি ঠিক করে দিচ্ছি। তাকেই বুঝিয়ে বলে দেবো সব।

উঃ, বাঁচালেন! আপনি কি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ি করাবেন, না কি কন্সট্রাক্টে?

যদি নিজে করাই?

সুব্রত মিষ্টি হেসে বলল, করতে পারলে তো ভালই। কিন্তু প্রবলেমও আছে। মেটিরিয়াল চুরি হয়ে যাবে। চৌকিদার রেখেও সেটা আটকাতে পারবেন না। লোকাল মস্তানরা চাঁদা চাইবে। তারপর আপনার ফিজিক্যাল কন্সট্রা তো আছেই। অনেকে বাড়ি করাতে গিয়ে শেষে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

তাহলে কন্সট্রাক্ট দেওয়াই কি ভাল?

কলকাতায় সেটাই ভাল। একটু দেখাতনো করলেই হবে।

তাতে কি টাকা একটু বেশি লাগবে?

সুব্রত মিটিমিটি হেসে বলে, যে টাকাটা বেশি লাগবে সেটা নিজে করলেও লেগে যাবে। চুরিচুরি গেলে তো সেটাও এস্টিমেটের মধ্যে চলে আসবে কিনা।

তাহলে দয়া করে আমাকে একজন ঠিকাদার ঠিক করে দিন। আমার কর্তাটি কোনও কাজের নন।

কোনও সমস্যা হবে না। কাল বা পরও সকালেই ঠিকাদার গিয়ে আপনার বাড়িতে দেখা করবে।

আপনাকে বিব্রত করলাম।

আরে না। এ তো সামান্য ব্যাপার।

চারুশীলা এসব কথায় মোটেই খুশি হল না। বলল, তোমাদের কথার মাঝখানে কথা বলিনি। কিন্তু বাড়িটা তুমি করলেই পারতে।

সুব্রত একটুও বিব্রত না হয়ে বলল, পারতাম। কিন্তু আমাকে তো পরশুই আবার দিল্লি যেতে হবে। সময় কি হবে?

অপর্ণা বলল, না না, আপনাকে একটুও বিবৃত হতে হবে না। একজন ভাল ঠিকাদার পেলেই আমার হবে।
পরদিন সকালে যে লোকটি সুব্রতের রেফারেন্সে এসে অপর্ণার সঙ্গে দেখা করল তাকে দেখে অপর্ণা তটস্থ। লোকটা এসেছে একখানা ঝকঝকে মারুতি গাড়িতে। তার পোশাকআশাক এবং চেহারা এতই অভিজাত যে, ঠিকাদার কথাটা এর পরিচয়ের সঙ্গে মেলে না।

কিন্তু খুবই আচরণের বিষয়, লোকটি বিনয়ী এবং সুব্রতের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল। সে ইউ পি-র লোক তবে বাংলা বলতে পারে। বলল, কোনও চিন্তা করবেন না। মিস্টার রায় যখন বলেছেন তখন দেয়ার উইল বি নো প্রবলেম।

লোকটা প্যান খুটিয়ে দেখল। একটা পকেট ক্যালকুলেটরে হিসেব করল। আর বুক কাঁপতে লাগল অপর্ণার, এক্সিমেট যা দেবে তা সে সহিতে পারবে তো?

লোকটা যা এক্সিমেট দিল তাতে খুবই অবাক হল অপর্ণা। সে যা ভেবে রেখেছিল তার চেয়েও কম। ভুল শনেছে কিনা তা বুঝতে না পেরে বারকয়েক জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হয়ে নিল। তারপর বলল, আপনি কাজ শুরু করে দিন। কত টাকা দিতে হবে এখন আপনাকে?

লোকটা হাত তুলে বলল, নো মানি নাউ। পেমেন্ট করবেন আফটার কমপ্লিশন।

কমপ্লিশন! ভূতগ্রস্তের মতো চেয়েছিল অপর্ণা। বিশ্বাস হচ্ছে না।

লোকটা বলল, টাকা তো বেশি নয়, সামান্যই। ওদিকে আমার কাজও হচ্ছে। আপনি ভাববেন না। আপনি ভূমিপূজা করে নিন, তারপর আমাকে একটা খবর দেবেন। কাজ শুরু হয়ে যাবে।

লোকটা তার কার্ড রেখে চলে গেল।

অপর্ণা একটু অভিভূত হয়ে বসে রইল। চারুশীলা আর তার বরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় বুকটা ভরে উঠছিল তার। প্রতিদানে চারুশীলার জন্য কিছুই করার নেই তার। ওরা এত বড়লোক, এত ওদের ক্ষমতা, অপর্ণা কী করতে পারে ওদের জন্য?

সে চারুশীলাকে ফোন করে বলল, ভাই, আপনি যে আমার কী উপকার করলেন তো বোঝাতে পারব না। কন্ট্রাক্টর আজ এসে দেখা করে গেছে।

চারুশীলা বলল, উপকার আবার কিসের? জানেন তো, ঝুমকি আমার খুব বন্ধু। মাসি বলে ডাকে, কিন্তু আসলে আমার বন্ধুই। আমার ইচ্ছে ছিল বাড়িটা সুব্রত করে দিক।

আপনি বড্ড বাড়াবাড়ি করেন। আমার বাড়ি উনি করলে কি ওঁর মান থাকে? আমিও যে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না।

এক্সিমেট বেশি দেয়নি তো?

না। বরং আমি যা ভেবে রেখেছিলাম তার চেয়েও কম।

লোকটা কে বলুন তো! শর্মা নাকি?

না। এর নাম এ পি সিং।

চিনি না। ওর তো অনেক চেনা। আজ আসুন না বিকেলে আপনার বাড়ির সম্মানে ডিনার হোক।

উঃ, আপনাকে নিয়ে পারা যায় না।

আসবেন তো? সবাইকে নিয়ে কিন্তু।

দুপুরে আগে কেউ বাড়িতে থাকত না। অপর্ণা একা। আজকাল ঝুমকি সকালে বেরিয়ে দুপুরে ফিরে আসে। চাকরিতা ছেড়ে দিয়েছে। একটু আনমনা, কিন্তু খুব যেন হতাশ নয়।

ঝুমকি আজ ফিরতেই অপর্ণা সুসংবাদটা তাকে দিয়ে বলল, জানিস, একটা পয়সাও আগে দিতে হবে না, বাড়ি কমপ্লিট হলে টাকা।

খুব একটা খুশি হল কি ঝুমকি? খবরটা যেন তাকে স্পর্শই করল না। শুধু একটু হেসে বলল, তাই নাকি? বাঃ, বেশ ভাল তো!

চারুশীলার বর লোকটা খুব ভাল, না রে? একটা কথায় সব ঠিক করে দিল।

হ্যাঁ, খুব ভাল। সুব্রতদার কোনও তুলনাই হয় না।

তুই ওকে দাদা ডাকিস নাকি? এই যে শুনলাম, চারুশীলাকে মাসি ডাকিস!

ঝুমকি স্ক্রীণ হাসল, কি করব? চারুশীলার সঙ্গেই আমাকে মাসি ডাকিয়েছে। সুব্রতদাকে মেসো ডাকতে হয়নি, রক্ষা। আত্মীয় তো নয়, ডাকে কী আসে যায়?

ঝুমকির আনমনা ভাবটা অপর্ণার পছন্দ হয় না। তিন ছেলেমেয়ের মধ্যে একমাত্র ঝুমকিই ভীষণ চাপা। তার পেট থেকে কখনও কথা বের করতে পারে না অপর্ণা। ঝুমকিকে ঠিক বুঝতেও পারে না। তবু চেষ্টা করে।

বলল, হ্যাঁ রে, তোর কী হয়েছে বল তো! এত আনমনা কেন?

জবাবে সাধারণত রেগে যায় ঝুমকি। কিন্তু আজ রাগল না। হেসেই বলল, কত কী ভাবছি।

কী ভাবছিস, চাকরির কথা?

চাকরির কথাও। এই বিংশ শতাব্দীকে বুঝতে পারো মা?

কেন পারব না? আমি তো এ যুগেরই মেয়ে।

এই যুগটা খুব অদ্ভুত। কত নতুন ভ্যালুজ জন্মাচ্ছে।

আবার কেন ভ্যালুজ জন্মাল যা নিয়ে তুই এত চিন্তা করছিস!

আছে মা! সব কথা কি বলতে হয়?

তুই তো কিছুই বলিস না আমাকে।

যারা সব বলে দিতে ভালবাসে তারা কি ভাল ? তারা সরল হতে পারে, কিন্তু বোকা ।
 থাকগে বাবা, ওঁতে চাই না ।
 ঝুমকি আলগোছে নিজের ঘরে চলে গেল ।
 সম্ভবোলা আজ পারিবারিক মিটিং বসিয়ে সগৌরবে অপর্ণা কনট্রাক্টরের কথা ঘোষণা করল । মণীশকে বলল, বুঝলে
 মশাই, এখন তোমাকে একটি পরসাও ডাউন পেমেন্ট করতে হচ্ছে না ।
 মণীশ একটু অবাক হয়ে বলল, লোকটা তোমার প্রেমে পড়েনি তো অপু ?
 অপর্ণা চোখ পাকিয়ে বলল, ছিঃ ছিঃ, ছেলেমেয়ের সামনে ও তোমার কেমন ঠাট্টা ?
 বুঝকা বলে উঠল, কিন্তু মা, বাবা তো ঠিক কথাই বলেছে । এ যুগে কেউ এত লিনিয়েন্ট হয় ?
 অনু বলল, মম ইজ স্টিল বিউটিফুল অ্যান্ড ইয়ং অ্যান্ড ভেরি অট্রাকটিভ ।
 অপর্ণা রাঙা হয়ে বলল, ছিঃ ছিঃ, তোরা যে বাপের পাল্লায় পড়ে গোল্লায় গেছিস!
 বুঝকা বলল, যুগ পালটে গেছে মা, এখন এত লজ্জা পেতে হবে না । ইউ আর মাই বেস্ট ফ্রেন্ড ।
 মণীশ মিটিমিটি হাসছিল । বলল, যুদ্ধে হেরে যাচ্ছেো অপু । এখন সন্ধি করাই ভাল ।
 তোমার আর তোমার ছেলেমেয়েদের মতো অসভ্য আমি জানুে দেখিনি বাবা । তোমাদের সঙ্গে সন্ধি নয় ।
 আহা, বলেই না, লোকটাকে কি করে জপালে । হিপনোটিজম গ্র্যাকটিস করছো নাকি ?
 ওসবের দরকার হয়নি । মিস্টার সিং খুব ভাল লোক । তাছাড়া সুব্রত রায়ের চেনা ।
 মণীশ একটু অবাক হয়ে বলে, সুব্রত মানে চারুশীলার বর নাকি ? তুমি তাকে কনট্যাক্ট করেছিলে ? সে তো মস্ত
 আর্কিটেক্ট!
 তাতে কি ?
 না, তাতে কিছু না । তবে বলতেই হবে তোমার বুদ্ধি আছে । বাচ্চারা তোমার তোমাদের মায়ের নামে জয়ধ্বনি দাও ।
 বোলা, মাতাজীকি জয় ।
 অনু, বুঝকা আর ঝুমকি এমন হল্লাড় করে উঠল যে, কানে হাত চাপা দিতে হল অপর্ণাকে ।
 প্রাথমিক উত্তেজনা আর আনন্দ রইল কয়েকদিন । সিং-এর সঙ্গে আরও দু'বার দেখা এবং টেলিফোনে কয়েকবার কথা
 হল অপর্ণার । একদিন সিং এসে ডিনার খেল এবং সকলের সঙ্গে পরিচয় করে গেল ।
 বাড়িটা শুধু হল পুজোর আগো । ডিসেম্বরে ছাদ ঢালাই হয়ে বাড়িটা যখন একটা সম্পূর্ণতার চেহারা পেয়ে গেল তখন
 বড্ড অবাক লাগতে লাগল অপর্ণা । স্যাংশন করা প্র্যানেস মধেই বাড়িটাকে চমৎকার একটা আধুনিকতার ডিজাইন-যুক্ত
 করে দিয়েছে সিং । তার দক্ষ মিস্ত্রিরা টপাটপ কাজ করে ফেলছে । শূন্যতার মধ্যে একটা বাড়ি গজিয়ে ওঠার ঘটনাটা যেন
 অপর্ণার কাছে এক অষ্টম আশ্চর্য!
 এক রাতে অপর্ণা লেপের তলায় মণীশকে আঁকড়ে ধরে বলল, কেমন করে ফেললাম বাড়িটা, বোলা ।
 হ্যাটস অফ । কিন্তু অপু, দোতলা হল না ।
 প্রতিভাস তো রইল । দোতলাটা আমরা নিজেরাই দেখে শুনে করিয়ে নিতে পারব ।
 এ লোকটিকে দিয়েই তো করতে পারতে ।
 ওগো, বড় বাড়ি করলেই তো হবে না । পরিষ্কার রাখতে হবে যে! আর বড় বাড়িতে বড্ড ফাঁকা লাগবে ।
 তোমার কৃপণতাটা আর কিছুতেই গেল না । দোতলা করতে দাওনি ঠিক আছে । কিন্তু এবার আমার একটা কথা
 রাখো ।
 আবার কী কথা ?
 এসব ফার্নিচার, খাটফাট সব বেচে দেবো । নতুন বাড়িতে খুব মডার্ন ফার্নিচার দিয়ে সাজাবো ।
 পাগল নাকি ? আমার ফার্নিচারগুলো দেখেছো ? কী দারুণ মজবুত ভাল জিনিস! বেচলে আর পাৰো এরকম ? কত
 খুঁজে খুঁজে ঘুরে ঘুরে ঝুল কাঠের সেকেন্ড হ্যান্ড জিনিস কিনে পালিশ করিয়ে তবে সাজিয়েছি । গ্রাণ গেলেও বেচতে পারব
 না । হ্যা গো, তোমার কি পুরনো জিনিসের ওপর মায়ী হয় না ?
 একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মণীশ বলে, তোমার ওপর হয় । তুমি যে পুরনো ধ্যানধারণা কেমন আঁকড়ে ধরে থাকতে
 ভালবাসো! তুমি কেন আর একটু আধুনিক হলে না, বোলা তো!
 আমাকে বুঝি আজকাল আর পছন্দ হচ্ছে না ?
 না হচ্ছে না । আমি পাত্রী দেখছি ।
 দেখাচ্ছি । বলে এমন জড়িয়ে ধরল মণীশকে যে, মণীশ হাঁফসে পড়ল ।
 বলল, আচ্ছা, আচ্ছা, পাত্রী দেখব না ।
 খুব শখ, না ? এই প্রাচীনপন্থীকে নিয়েই এ জীবনটা কাটাতে হবে, বুঝলে ?
 আর পরের জন্ম ?
 যদি পরজন্ম থাকে তবে পরের জন্মেও ।
 ও বাবা, পরের জন্মেও তুমি ?
 হ্যাঁ, বরাবর আমি । আমি ছাড়া আর কেউ নয় । শোনো, তুমি একবার একটা খুব খারাপ কথা বলেছিলে, মনে আছে ?
 কী কথা ?
 তুমি বলেছিলে পঁচিশ হাজার বছর বেঁচে থাকলে আমরা কেউ কাউকে সহ্য করতে পারতাম না । বলেছিলে ?
 ঠিকই তো বলেছি অপর্ণা । পঁচিশ হাজার বছর যদি আমরা বেঁচে থাকতাম তাহলে কি সত্যিই আমরা দুজনে দুজনের
 কাছে পুরনো হয়ে যেতাম না ?

বলছি তো, না।

মণীশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, ভাগ্যিস সেই পরীক্ষাটা আমাদের দিতে হবে না।

ভাগ্যিস কেন? পঁচিশ হাজার বছর ধরেই আমি তোমাকে ভালবাসতে পারি। একটুও কমবে না ভালবাসা।

মণীশ একটু হেসে বলল, তোমার কথা আমার বিশ্বাস করতে হচ্ছে করছে অপু। হয়তো তোমার পক্ষে তা সম্ভব।

ফ্ল্যাটের অন্য একটা ঘরে আর একজনও ভালবাসার যন্ত্রণায় বিদ্ধ হচ্ছিল বিছানায় শুয়ে। খুব শীত। কিন্তু এই ঠাণ্ডাতেও সে বার বার উঠে জল খাচ্ছিল। সমস্ত শরীরে কেমন একটা সিরসিরে ভাব। একটা উৎকণ্ঠা। সঙ্গে অচেনা ভয়।

কয়েকদিন আগেই দেখা হয়েছিল। কী আশ্চর্য উদাসীন, বিষণ্ণ, গম্ভীর হয়ে গেছে লোকটা! ও কি সত্যিই রশ্মিকে ততটা ভালবাসত? কোনওদিন বিশ্বাস হয়নি ঝুমকির।

অনেক লোক ছিল সেদিন চারুশীলার বাড়িতে। তবু ঘুরেফিরে তাদের দেখা হয়ে যাচ্ছিল। চোখাচোখি হচ্ছিল বারবার।

শেষ অবধি তাদের দেখা হল একটা নির্জন ঘরে। কারা ক্যারাম খেলতে খেলতে ছিটানো গুটি ফেলে চলে গেছে। একা একা হেমাঙ্গ ষ্ট্রাইকারে টোকা মেরে গুটি ফেলার চেষ্টা করছিল।

ঝুমকি ঢুকেই বেরিয়ে আসছিল লজ্জায়।

হেমাঙ্গ ডাকল, শুনুন।

ঝুমকি দাঁড়াল।

হেমাঙ্গ হঠাৎ বলল, আপনি আমাকে খুব অপছন্দ করেন না?

অবাক ঝুমকি বলল, কেন? অপছন্দ করব কেন?

মনে হয়।

ও।

॥ ৯২ ॥

হেমাঙ্গদের বাড়িতে এখনও একটা মধ্যযুগীয় শাসনতন্ত্র বহাল আছে। এখনও এ বাড়ির ছেলেমেয়েরা যা খুশি করতে পারে না এবং করার কথা ভাবতেও পারে না। একটা অদৃশ্য শাসন এবং দৃশ্যমান জ-কুঞ্জন তাদের আতঙ্কিত এবং সতর্ক রাখে। প্রেমঘটিত বিয়ে অবশ্য একটা-দুটো ঘটেছে, কিন্তু তাও আবার বর্ণে মিললে তবেই। কাজেই এ বাড়ির ছেলেমেয়েরা প্রেমে পড়তে হলেও আগেভাগে হিসেব করে নেয়।

হেমাঙ্গ জানে, সেও স্বাধীন নয়। স্বাধীনতা একটা মনোভাব যা ব্যক্তিত্বের ব্যাপার। সেটা কেমন তা অবশ্য হেমাঙ্গ জানে না। হয়তো সেটা যথেষ্টাচার বা উচ্ছৃঙ্খলতাই হবে। যখন যা মনে এল করে ফেললাম, কারও তোয়াক্কা করলাম না। হেমাঙ্গ সেটা ইহজীবনে পেরে উঠবে বলে মনে হয় না।

এই যে গরচার বাড়িতে বসবাস বা মাঝে মাঝে গাঁয়ের বাড়িটিতে যাওয়া কিংবা গাঁয়ের প্রাকৃত মানুষের মতো জীবনযাপনের চেষ্টা, এর কোনওটাই মা বা বাবা সুনজরে দেখছে না বলে তার অস্বস্তি হচ্ছে, এটাই হয়তো মানসিক স্বাধীনতার মস্ত অন্তরায়। সে হচ্ছে করলেই কি মা-বাবার মতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যা করছিল তা করে যেতে পারে? পারে না। তার স্বাধীনতা এইখানেই মার খেয়ে যাচ্ছে।

হেমাঙ্গ অবশ্য কয়েক মাস ধরে মাকে বেশ কয়েকবার বোঝাতে চেষ্টা করল। কিন্তু মা শেষ অবধি একটা কথাই বলল, গরচার বাড়ি তোকে লিখে দেবো, গায়ে গিয়েও যা-খুশি করতে পারিস, কিন্তু শর্ত একটা। আগে বিয়ে কর। তারপর যা-খুশি করিস।

ওরে বাবা!

তোর বাবারও একই মত। বিয়ে করলে সব মেনে নেবো।

হেমাঙ্গ তাই আজকাল একটু বিমর্ষ। একটু আনমনা। বিয়ে খুব সুখের ব্যাপার নয়। একটা মেয়ের সঙ্গে নিজেকে আটপেট্টে জড়িয়ে ফেলার মানেই হচ্ছে জীবনটা ভোগে চলে যাওয়া। প্রেম জিনিসটা কম দামী সেন্টের মতো, গন্ধ টপ করে উবে যায়। একজন চিন্তাশীল, কল্পনাপ্রবণ মানুষ বিয়ের পর হয়ে যায় শ্রমিকের মতো। প্রেমের সমাধির ওপরেই তো বিয়ের সৌধ!

প্রায় দু'মাস ফোন করেনি রশ্মি। বোধ হয় লজ্জায়। তাকে বিব্রত করতে চায় না বলে হেমাঙ্গও করেনি। টেলিফোনের সম্পর্কটা বড্ড আনুষ্ঠানিক হয়ে যাচ্ছিল। কুশল প্রশ্ন এবং আলগা কিছু কথা ছাড়া কোনও গভীরতায় পৌঁছাচ্ছিল না। বাড়ছিল শুধু টেলিফোনের বিল। সম্পর্ক আর জিইয়ে রাখার কোনও মানেই হয় না।

কিন্তু দু'মাস বাদে একদিন রাতে রশ্মিই টেলিফোন করল।

কেমন আছ?

ভালই। তুমি?

আমি ভাল নেই।

কেন রশ্মি?

মন ভাল নেই। তোমার জন্য।

আবার আমি কি করলাম?

তুমি কিছু করনি। আমিই করেছি। কেবল ভাবছি কাজটা কি তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হয়ে গেল?

তা কেন রশ্মি? তুমি প্র্যাকটিক্যাল।

ঠেস দিলে না তো!

আরে না। আমি তোমার অসুবিধের কথা জানি।

এখন এখানকার অবস্থা তো খুব ভাল নয়। অনেক এথনিক গ্রুপ ঢকে পড়েছে, রিসেশন শুরু হয়েছে, দাস্তা-হাস্তায়া হচ্ছে। একা একটা মেয়ের পক্ষে থাকা খুব নিরাপদ নয়। অথচ আমাকে তো থাকতেই হবে।

জানি রশ্মি। তুমি কিন্তু অ্যাপোলাজাইজ করো না। আমি তো জানিই, একা তোমার পক্ষে ওখানে থাকার অসুবিধে আছে। পৃথিবী পাল্টে যাচ্ছে রশ্মি। এখন চারদিকে ভায়ালেঙ্গ।

হ্যাঁ হেমাঙ্গ। ভীষণ ভায়ালেঙ্গ। আর কত ছোট ছোট গ্রুপ তৈরি হচ্ছে, কত তাদের অভাব-অভিযোগ-দাবিদাওয়া তার সীমাসংখ্যা নেই। সবাই মিলিটারি, সবাই টেরোরিজমে বিশ্বাসী। ক্রমে ডিটোরিয়েট করছে। আমরা কী মনে হয় জানো? সব দেশেই গভর্নমেন্টগুলো এদের কাছে অসহায়। কিছুই করতে পারছে না।

ফিরে এসো রশ্মি।

ফিরে গিয়ে কী হবে বলো তো! আমাদের দেশে কোনও কাজ হয়? নাকি লোকে কিছু মাথার কাজ করতে চাইলে তা করতে পারে? একটা ভাল লাইব্রেরি অবধি নেই। কী হবে ফিরে গিয়ে? আমরা ভাবছি সুইজারল্যান্ডে সেটল করব। এখনও সুইজারল্যান্ড বোধ্য হয় কিছুটা ভাল। আমার হাজব্যান্ডটি অবশ্য আমেরিকা বেশি পছন্দ করছে। দেখা যাক।

তোমার বিদেশবাস ঘুচবে না, না রশ্মি?

আমার কাছে ইংল্যান্ড তো বিদেশ ছিল না কখনও। বরাবর ইংল্যান্ড আমার প্রিয় জায়গা। এটাই আমার দেশ। ছোট সুন্দর শান্ত পরিচ্ছন্ন সুশৃংখল একটা দেশ। হাতের কাছেই ইউরোপ। চারদিকে যত ইতিহাস আর ঐতিহ্য ছড়ানো। কিন্তু ধীরে ধীরে সব কেমন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ইংল্যান্ডই আমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা। সুইজারল্যান্ড বা আমেরিকায় সেটল করতে আমার একটুও ইচ্ছে করে না। কিন্তু বুঝতে পারছি না কী হবে।

হেমাঙ্গ খুব সন্তর্পণে একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল। সে খুব ভাগ্যবান যে রশ্মির প্রস্তাবে রাজি হয়নি। সে কিছুতেই বিদেশে থাকতে পারত না। নস্ট্যালজিয়া তাকে টানত, তাকে টানত আত্মীয়তা, তাকে টানত শিকড়। বিদেশে থাকার কথা হেমাঙ্গ ভাবতেও পারে না।

চুপ করে আছ যে! তোমার খবর তো কিছু বললে না।

আমার খবর কিছু নেই রশ্মি।

গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছে এখনও?

মাঝে মাঝে।

আমার কিন্তু তোমার নদীর ধারের বাড়িখানার কথা খুব মনে পড়ে। ভারি কিউট, সুন্দর বাড়িটি তোমার। যদি আমাদের বিয়ে হত তাহলে আমি তোমাকে ওখানেই হানিমুন করতে বলতুম।

একটু হাসল হেমাঙ্গ। বলল, খ্যাক ইউ।

তুমি এখানে বেড়াতে আসবে বলেছিলে। সত্যিই আসবে?

হেমাঙ্গ বলে, কী হবে বেড়াতে গিয়ে বলো তো! প্লেনের যা ভাড়া হয়েছে তাতে বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছেটাই চলে যায়। আর কী জানো, ভেবে দেখছি বেড়ানোর কোনও মানে হয় না। দেশ দেখে বেড়ানো একটা পণ্ডশ্রম মাত্র। বরং এই যে কাছেপিঠে যাই, নিজের দেশটাকে বুঝবার চেষ্টা করি, মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করি এতে অনেকটা গভীরতা খুঁজে পাই।

তুমি বরাবরই একটু অন্যরকম। অলওয়েজ ইন সাচ অফ সামথিং। সেই জন্যই তুমি সবসময়ে ইন্টারেস্টিং।

কী যে বলো! আমার মনের ভিতরটা যদি দেখতে পেতে!

দেখার চেষ্টা কি করিনি? সেই যে গায়ের কুলে অডিট করতে গিয়েছিলে সেই প্রথম দিনটি থেকেই তোমাকে লক্ষ করে আসছি। প্রথম দিন থেকেই মনে হয়েছিল তুমি নরম মনের মানুষ। তোমার খুব একটা ট্রুং পারসোনালিটি নেই ঠিকই, কিন্তু তোমার ভিতরে একটা কৌতূহলী শিশু আছে। পৃথিবীটা তোমার কাছে সহজে পুরনো হবে না। এটা কিন্তু একটা মস্ত কমপ্লিমেন্ট, বুঝেছ?

হয়তো ঠিকই বলেছ।

বিয়ে করার কথা ভাবছ নাকি?

না তো!

ভাল থেকে।

তুমিও ভাল থেকে।

এইভাবে শেষ হল টেলিফোন পর্ব। কিন্তু রেশ থেকে গেল। টেলিফোন রেখে দেওয়ার পর রশ্মিকে নিয়ে অনেক ভাবল হেমাঙ্গ। ভাবল প্রেম-ভালবাসা ইত্যাদি নিয়ে। ভাবল মানুষে মানুষে সম্পর্ক নিয়ে। তারপর তার মনে হল, দুটি কাঁটা যেমন ক্রমাগত উল বুনে বুনে তৈরি করে সোয়েটারের প্যাটার্ন, দুটি মানুষ কি তাই পারে? সম্পর্ক কি ওইরকম, উলের মতো নানা নকশা সৃষ্টি করে যাওয়া?

বিয়ে, প্রেম ইত্যাদি তামাদি হয়ে যাচ্ছে দুনিয়ায়। ইউরোপ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়ায় রোমান্টিক প্রেম কবেই নির্বাসনে গেছে। আছে কেবল দগদগে যৌন সম্পর্ক। ওই সম্পর্কের দিকেই ঝুঁকে পড়ছে মানুষ। বিয়ে করছে না, একসঙ্গে থাকছে, ছেলেপুলে হচ্ছে, বাঁধা পড়ছে না। পৃথিবীর ভবিতব্য কি তাহলে ওটা? কুকুর বেড়ালের মতো শুধু দেহের প্রয়োজনে একসঙ্গে হওয়া এবং ফের আলাদা হয়ে যাওয়া, ইচ্ছে হলেই?

হেমাঙ্গ কিছুটা অস্থির বোধ করতে থাকে। মাঝে মাঝেই জীবন থেকে বিষধর সাপের মতো নানা প্রশ্ন উঠে এসে তাকে ছোঁবল দিয়ে যায়। বিষ অনেকক্ষণ জর্জরিত রাখে তাকে।

আজকাল মা নিয়ম করে দিয়েছে, শনি আর রবিবার বিডন স্ট্রিটের বাড়িতে গিয়ে থাকতে হবে। নিয়মটা যে মানতেই হবে, এমন নয়। কিন্তু মা তার জন্য ইদানীং এত বেশি চিন্তিত আর উদ্ভিগ্ন যে, সে না গেলে বা যেতে না চাইলে মার প্রেসার বাড়বে, হার্ট প্যালপিটেশন হয়।

উইক এন্ডটা মায়ের কাছে বিডন স্ট্রিটে যেতে ইচ্ছে করছিল না। গায়ের বাড়িটা তাকে ডাকছে। দু' মাস যায়নি। বিডন স্ট্রিটে মাকে ফোন করে জানিয়ে দিল, শনিবার বাইরে যাচ্ছে। কোথায় তা অবশ্য বলল না। না বললেও বাঁকা মিঞার কাছ থেকে মা ঠিকই পরে খবর পেয়ে যাবে। কিন্তু পরের কথা পরে। এখন যে তার হাঁফ ধরে যাচ্ছে!

প্রচণ্ড শীত, মেঘলা আকাশ, টিপটিপ বৃষ্টি আর উত্তাল নদী পেরিয়ে যখন ভটভটি তার ঘাটে লাগল তখন মনটা ভাল লাগছিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে হাঁচি এবং শারীরিক অসুস্থি টের পাচ্ছিল সে। পিছল ঘাট বেয়ে ওপরে উঠেই বৃষ্টির সহস্র শরে বিন্দু হতে হতে সে ভাবল, মেরেছে। জ্বর হয়ে পড়ে থাকলে যে সব মাটি।

বাসন্তী এল, বাঁকা মিঞা এল, ফজল এল। অনেকে দিন বাদে যেন আপনজনদের কাছে ফেরা।

বাসন্তীই টের পেল সবাব আগে, ও দাদাবাবু, তোমার চোখ অমন ছলছল করছে কেন? মুখখানাও যে একটু লাল মতো! জ্বর বাঁধিয়েছ নাকি?

বাঁকা মিঞা নাড়ি ধরে কিছুক্ষণ নিবিশ্ট হয়ে থাকার পর বলল, একশ'র ওপর। এখন কী হবে বলুন তো! এখানে না পাবেন বন্দি, না ওষুধ। এর জন্যই তো বলি এখানে ঘাঁটি করার দরকার নেই।

কেন বলল, এখানে কি মানুষের জ্বরটর হয় না? তারা যা করে আমিও তাই করব।

তাদের শরীরের ধাত আর আপনার শরীরের ধাত কি একরকম? এখানকার ডাক্তার কে জানেন? ওই বিত্ত মুদি। অসুস্থ হলে লোকে গিয়ে বিত্তর কাছে ওষুধ চায়। বিত্তর সাত পুরুষে কেউ ডাক্তার নয়, তবু ওই বিত্তই ওষুধ বেচে। এমন কি পেনিসিলিন অবধি।

জানি।

আপনাকে বিত্ত ওষুধ দিলে খাবেন?

মোম্বাস হাসল। বলল, সামান্য সর্দিজ্বর। অত ঘাবড়াচ্ছ কেন? বিত্তর দোকানে যে ওষুধ পাওয়া যায় তাই ঢের। বিত্ত না জানুরু, আমি তো খানিকটা জানি। দরকার হলে ওষুধ আনিয়ে নেবো।

বাসন্তী বলল, এর আগে একবার কিছু তুমি কিছু ওষুধ এনে রেখে গিয়েছিলে। সেগুলো বের করে এনে দেবো?

না, থাক। তুই খুব গরম চা খাওয়া আমাদের। দুপুরে আজ রুটি করিস আর সন্দের পর ঘরে একটু তুষের আশুন করে দিয়ে যাস।

বাঁকা মিঞা মাথা নেড়ে বলে, তা হবে না। আমার একটা দায়িত্ব আছে। নদীর ধারের ঘরে থাকলে আপনার নিউমোনিয়া হয়ে যাবে। আমার পাকা ঘরখানায় থাকবেন। আমি গিয়ে সব ব্যবস্থা করছি। ফজল, নৌড়ে গিয়ে তোর মাকে বল তো, ঘরটা তৈরি রাখতে।

অত ভেবো না বাঁকা। আমি এখানেই থাকতে পারব। ঘরের জানালা-দরজা এঁটে দিলে হাওয়া লাগবে না।

তা বললে হয়? নদীর ধারে হাওয়ার নানা চঙ্কর। তার ওপর শীতের বাদলা, এ বড় ভয়ংকর খারাপ জিনিস। এ ঘরটা ড্যাশপ ও বটে। শেষে অসুখ গাড়িয়ে গেলে জবাবদিহিটা করব কি?

বাসন্তী তেমন না ভেবে-চিন্তে হঠাৎ বলে উঠল, আমি রাতে এসে থাকব'খন।

কথাটা মুখ ফসকা, বলে ফেলেই বোধ হয় লজ্জা পেয়েছিল। বাঁকা চোখ পাকিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি, না?

বাসন্তী খুব মিইয়ে গেল এ কথায়।

বাসন্তীর ওপর একটু মায়ী হল হেমাঙ্গর। বেচারী! কথাটার যে গর্হিত দিক আছে তা তো বোঝেনি। হেমাঙ্গর প্রতি টান থেকেই বলেছে। হেমাঙ্গ বলল, তাহলে বরং ফজল এসে থাকুক। পাশের খুপরিটায় তো চৌকি আছে। বিছানা আনলেই হবে।

বাঁকা বলল, ফজল থাকবে? থেকে লাভ আছে কিছু? ওরা যা ঘুম গায়ের ওপর দিয়ে মোষ হেঁটে গেলেও টের পায় না। ওর থাকাও যা না থাকাও তাই।

মাথাটা টিপটিপ করছিল হেমাঙ্গর। গা ভরে জ্বর আসছে। জ্বরটা সম্ভবত একটু ভোগাবে। আবহাওয়া আরও খারাপ হচ্ছে। বাতাসের জোর বাড়ছে, বৃষ্টি বাড়ছে। ঘরে এসে কব্বল চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ল সে। একটু কাঁপুনি হল। বাসন্তী তুষের আশুনটা দুপুরের আগেই এনে দিল ঘরে। বলল, বাঁকা চাচা তোমার জন্য কী একটা ব্যবস্থা করতে গেল গো দাদা। তুমি ওর বাড়িতেই চলে যাবে?

হেমাঙ্গ বলল, ওর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে এত যত্ন করবে যে তাতে আমার হাঁফ ধরে যাবে। কিন্তু কী করব বল! বাঁকা যদি নিয়ে যেতে চায় তো যেতেই হবে।

মাথাটা টিপে দেবো?

না, এখন থাক।

তাহলে পায়ের তেলোয় গরম তেল মালিশ করে দিই?

দে। তার আগে ওষুধের ষ্টকটা বের কর। দেখি কী আছে।

বাসন্তী একটা টিনের বাস্র নিয়ে এল। জ্বর আর ইনফ্লুয়েঞ্জার চার-পাঁচ রকম ওষুধ থেকে বেছে নিয়ে দুটো একসঙ্গে খেয়ে নিল হেমাঙ্গ। ওষুধ তার ভাল লাগে না।

বাসন্তী তার পায়ের খুব যত্ন করে গরম তেল মালিশ করে মোজা পরিয়ে পা কব্বলে ঢেকে দিয়ে গেল রুটি করতে।

আধঘন্টা বাদেই বাঁকা এসে বলল, কপালটাই খারাপ। এই শরীরে আপনি আমার বাড়িতে যাবেন, তা ভ্যানগাড়ি একটাও নেই এখন। কোথায় ধান তুলতে গেছে, বিকেলের আগে ফিরবে না। থাকলেও লাভ ছিল না। এ বৃষ্টিতে ছাতার আড়াল দিয়ে তো আর নেওয়া যাবে না। ভিজবেনই। তার চেয়ে ওবেলা বৃষ্টিটা ধরলে বরং নিয়ে যাওয়া যাবে। ফজলকে বলেছি, জানালার দিকটা আড়াল করে একটা ট্রিপল টাঙিয়ে দিতে। ফাঁকফোকর দিয়ে বাতাস না এসে চোকে।

হেমাঙ্গ শুধু অসহায়ভাবে হাসল।

বৃষ্টি আর বাতাস বাড়তে লাগল। রীতিমতো ঝড়ের গতিতে বাতাস বইতে লাগল দুপুরের পর। চারদিক অন্ধকার। এই চমৎকার প্রাকৃতিক ব্যাপারটি হেমাঙ্গ দেখতে পাচ্ছে না। তার ঘরের দরজা-জানালা এঁটে বন্ধ। নদীর দিকের জানালা ঢেকে ত্রিপল টাঙিয়ে দিয়ে গেছে ফজল। ওষুধের গুণে এবং ঘর গরম থাকায় একটু হাঁসফাঁস লাগে হেমাঙ্গর।

বাসন্তী গরম রুটি আর তরকারি খাইয়ে বাসন-টাসন ধুয়ে রেখে একবার বাড়ি গিয়েছিল। আবার চলে এসে ঘরের একধারে বসেছে।

কেমন লাগছে এখন তোমার ?

একটু ভাল। ওষুধের গুণটা কেটে গেলে অবশ্য আবার জ্বর উঠবে।

কী হবে গো দাদা ?

মরব না, তোর ভয় নেই।

ছিঃ, মরার কথা মুখে আনতে আছে ? আমি বুঝি সে কথা বলেছি ?

অত ভাবছিস কেন ? ঠাণ্ডা লেগে সর্দি-জ্বর। তুই আর বাঁকা এমন করিস যে আমার এখানে আসতে এখন ভয় করে।

আম্মা বলো তো, আমি কী করলুম আবার ? এখানে তোমার যত্ন-আত্তি করে করে বলো! তুমি শহুরে মানুষ, আমাদের মতো কি তোমার সয় ?

একটু বিরক্ত হয়ে হেমাঙ্গ বলে, আমি আর শহুরে লোক নেই। দেখছিস না কেমন লাঙ্গল চালাতে পারি, নৌকো বাইতে শিখেছি। আমার শরীর অনেক পোক্ত হয়েছে আজকাল।

বাসন্তী খুব হাসল। তারপর বলল, তোমার মতো কিন্তু মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। একখানা আন্ত পাগল।

দেশে পাগলের অভাব কি ? কত পাগলই তো দেখেছিস ?

আহা, তুমি কি তাদের মতো নাকি ? কী বললাম, কী বুঝলে। তুমি হচ্ছ ভাবের পাগল।

হেমাঙ্গ একটু অস্থিরতা বোধ করে বলল, ওরে বাসন্তী, অসুখে না হোক, দম বন্ধ হয়েই মরতে হবে দেখছি। জানালা হোক, দরজা হোক একটা কিছু একটু খুলে দে। ঘরে অকসিজেনের অভাব হচ্ছে।

অকসিজেন ? ওঃ, হ্যাঁ। দাঁড়াও। কিন্তু কী বৃষ্টি দেখেছে ? চতুর্দিক থেকে ছাঁট আসছে।

উঠানের দিকটায় একটা জানালা সামান্য ফাঁক করল বাসন্তী। বাইরে তুমুল ঝড়। জানালা ফাঁক হতেই হিম ঠাণ্ডা হাওয়া আর বৃষ্টির ঝাপটা দাওয়া পেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরে। ভয়ে পিছিয়ে এল, ও মা গো!

জানালাটা দড়াম করে খুলে ফের দড়াম করে বন্ধ হয়েই ফের খুলল। বাসন্তী ঝাঁপিয়ে পড়ে জানালা টেনে বন্ধ করে বলল, হবে না।

ঘরে একটা প্রদীপ জ্বলছিল। হাওয়ায় সেটা নিবে গেছে।

বাসন্তী হাতড়ে হাতড়ে দেশলাই বুজে সেটা জ্বালাল, হ্যারিকেনটা জ্বালাই দাদা ?

খবরদার না। হ্যারিকেনের গ্যাসে কত লোক মারা গেছে।

ও বাবা, তাহলে থাক।

শোন, খুপির দিকটার দরজাটা খুলে রাখ। আর খুপির ঝাঁপের জানালাটা একটু ফাঁক করে রেখে আয়, তাহলে ভেন্টিলেশনটা হবে।

তাই করল বাসন্তী। এসে ফের ঝাপ পেতে বসে বলল, এখন কেমন লাগছে ?

হ্যাঁ। ফ্রেশ বাতাস পাচ্ছি। খুব দুর্ধোগ, না রে ?

ভীষণ। ভটভটি বন্ধ হয়ে গেছে। নদীর সাক্ষাতিক ঢেউ দিচ্ছে। যা ঝড় আর বৃষ্টি! চারদিক ঘুটঘুটি অন্ধকার।

ঝড়বৃষ্টি চলতে থাকল। সন্দের পর জ্বর ফিরে এল হেমাঙ্গর। শীত করে কাঁপুনি দিয়ে। মাথায় তীব্র যন্ত্রণা। আর তার মধ্যেই বাস্তব আর ঘোর মিলেমিশে যেতে লাগল।

মাথায় একখানা ঠাণ্ডা হাত এসে পড়তেই সে বলে উঠল, কে, মা নাকি ?

না গো, আমি।

ওঃ, তুমি! কাকে বলল তা নিজেও বুঝল না হেমাঙ্গ। কিন্তু খুব চেনা একজনকেই বলল যেন। ফের একটা ঘোরের মতো এসে কোথায় যেন নিয়ে গেল তাকে।

অনেক রাতে ঝড়বাদল একটু কমতেই এসে হাজির হল বাঁকা আর ফজল।

বাঁকা বলল, ওঃ, কী লগভও কাণ্ডই হয়ে গেল। গায়ের বহু বাড়ি পড়ে গেছে। আপনারটা কী করে দাঁড়িয়ে আছে তাই ভাবছি। কপালের জোর বটে আপনার। আমি তো ঝড়ের গতিক দেখে ভাবছিলাম, গেল এবার বাবুর বাড়ি। আসার উপায় ছিল না। উড়িয়ে নিয়ে যেতে। আজ নির্ধাৎ কয়েকটা নৌকো ডুবেছে।

হেমাঙ্গ একটু ক্ষীণ হাসল। বলল, এ ঝড়টা আমার দু' চোখ ভরে দেখা হল না।

ওঃ, কী যে আপনার সব বাই চাপে! খুপরিতে আজ ফজল থাকবে। বিছানা নিয়ে এসেছে। বলে দিয়েছি রাত জেগে পাহারা দেবে।

কোনও দরকার নেই। ও ঘুমোক।

না না, ঘুমোলেই ও মড়া। জেগে বসে থাকবে।

হেমাঙ্গ ঘুমোলো। তারপর ঘুমের মধ্যেই ফের আধো-জাগা একটা ঘোরের ভিতরে চলে এল। বারবার একখানা আবছায়া মেয়ের মুখ চলে আসছে চোখের সাননে। মেয়েটা মাঝে মাঝে তার মাথার কাছটিতে এসে বসছে। চুলে বিলি কেটে দিচ্ছে।

ঠিক চিনতে পারছে না সে। আবার চেনা-চেনাও লাগছে। কে মেয়েটা ?

কে ?

আমি।

আমি কে ?

একটু হাসির শব্দ হল, আমি তো।

ওঃ তুমি!

হেমাঙ্গ বুঝতে পারল না। তবু যেন বুঝল। হাসল। ঘুমিয়ে পড়ল।

॥ ৯৩ ॥

বিষ্ণুপদ ক'দিন যাবৎ পুত্রকন্যা শব্দগুলির অর্থ খুঁজে বেড়াচ্ছে মনে মনে। তার চেয়েও বড় কথা সম্পর্কটা কিসের, কেন সম্পর্ক সেইটে—এত কিছু জানার পরও—নতুন করে জানতে চায় সে। এ বাড়িতে তেমন কোনও শাস্ত্রটান্ন নেই, ভাল ডিকশনারি নেই, নাগালের মধ্যে তেমন কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি নেই যার কাছে নতুন করে এ বিষয়ে পাঠ নেবে। তাই সারাদিন শুয়ে শুয়ে মনে মনে মানে খুঁজে যাচ্ছে সে। সব বিশ্বাস, সব বলভরসা পুরনো ইমারতের মতোই ধসে পড়ে গেল যে সেদিন, যেদিন বামাচরণ তার বাপান্ত করে গেল।

প্রায় দু-তিন ঘণ্টা বিষ্ণুপদের জ্ঞান ছিল না। প্রেশার ঠেলে উঠেছিল দুশোর ওপরে। পুলিশ তেমন দরের ডাক্তার না হতে পারে কিন্তু ঠেকা সে-ই দিয়েছিল। প্রেশারের ওষুধ দিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, হাতের শিরা কেটে খানিক রক্তমোক্ষণ করে দিয়েছিল। বলেছিল, ওরে বাবা, আমরা সেকলে লোক। আধুনিক চিকিৎসা না জানতে পারি, কিন্তু পুরনো চাল এখনও ভাতে বাড়ে।

দুদিনের মধ্যেই খবর পেয়ে কৃষ্ণজীবন কলকাতা থেকে একজন বড় ডাক্তারকে এনে দেখায়। ডাক্তার মেলা ওষুধপত্র দিয়ে গেল। বলেছে, শুয়ে থাকতে হবে কিছুদিন। তেমন ভয়ের নাকি কিছু নেই।

মানুষের অসুখটা যে কোথায় তা ডাক্তাররা কি ঠাহর পায় ? এই যে শরীরটা কাটা কলাগাছের মতো পড়ে গেল সেদিন, তার কারণ কি শুধু শরীর ? মন নয় ? বামাচরণের ওইসব কথা শোনার পর থেকেই শরীরের ভিত কৈশে গেল। সেই থেকে ভাবছে আর ভাবছে। শরীর হয়তো সারবে, মন সারায় কে!

ধা ধা করে বাড়িটা প্রায় উঠে গেল। মেঝেতে টালি বসানোর কাজ চলছে। জানালা দরজা বসানো হচ্ছে। ইলেকট্রিক মিক্সি লাইন বসানো। এলাহি ব্যাপার। জানালা দিয়ে সব দেখতে পায় বিষ্ণুপদ। জীবনের বারো আনা কেন, পনেরো আনাই কেটে গেল ভাঙা ঘরে। বাকি আর ক'টা দিন! তাও আয় ফুরোনোর আগে যদি বাড়ি শেষ হয় তবে পাকা ঘরে মরার সুখটা অন্তত পাবে। সারাদিন চেয়ে চেয়ে কাণ্ডটা দেখে বিষ্ণুপদের মনটা যেন কেমন হয়ে যায়। বাড়িতে সুখ নেই, টাকায় সুখ নেই, সংসারের সুখ নেই। সুখ যে কোথায় আছে কে জানে!

রামজীবন আর কিছু পারেনি তবে মাসটাক আগে হঠাৎ একটা দুধেল গাই বাছুর সমেত কোথেকে কিনে এনেছে। এনেই বলল, এখন আপনার একটু ছানাটানা খাওয়ার দরকার।

গরু দেখে বিষ্ণুপদের চোখ চড়কগাছ। বলল, ও বাবা, এ মরা পেটে দুধ ছানা সইবে নাকি ?

খুঁই সইবে। আপনার শরীরে তো সারবস্তু কিছু নেই। দুধ সহ্য না হোক, ছানা খাবেন। এ খুব তেজী গাই, দিনে দুবেলা মিলিয়ে পাঁচ সের দুধ দেয়।

বিষ্ণুপদ খুশি হয়ে বলে, তা হলে পটল আর গোপালও দুধ খেতে পারবে। ওদের বাড়ের বয়স, কচু-ঘেঁচু খেয়ে থাকলে কি বাড় হয় ?

আমরা কচু-ঘেঁচু খেয়েই বড় হয়েছি। বাড়ের বয়সে এমনিতেই বাড়ে। তা খাবে'খন ওরাও।

বিষ্ণুপদ বলল, গরুর পিছনে খাটুনি আছে বাবা। বড় সুখী জীব। যত্ন করতে হয়। তুই তো আলায় বালায় ঘুরিস, গরু দেখবে কে ?

রাখাল রাখব।

তবেই হয়েছে। এ কি ভাড়াটে লোকের কাজ ? নিজে হাতে করতে হয়।

তাই করব। আপনি বললে তাই করব।

গো-সেবা করলে অনেক শেখা যায়, জানা যায়। অবোলা প্রাণী। কিন্তু তারও বলার মতো কথা আছে। বুঝবার চেষ্টা করতে হয়।

সেই থেকে রামজীবন গরু নিয়ে খুব মেতে আছে। ঘাসের মাঠে বেঁধে দিয়ে আসে। দুবেলা জাবনা দেয়। স্নান করায় নিয়মিত। খোল ভূমি কিনতে হাটে যায়। ভেটেরিনারি ডাক্তার দেখিয়ে এনেছে। গরুটা যত্ন-আপত্তি পেয়ে বেশ তেল চুকচুকে হয়ে উঠেছে। দুধটাও দেয় খাসা। সকালে বাতাসার গুঁড়ো দিয়ে বেশ খানিকটা ছানা খায় রোজ।

সেই দৈনিক বরাদ্দটা নিয়ে রাঙা এসে ঘরে ঢুকল। হাতে গরম ছানার প্লেট।

বাবা, আপনার ছানা।

বিষ্ণুপদ উঠে বসে বলল, এটা থেকে তোমার শাতড়ি মায়েরটা কি তুলে রেখেছো ?

তাঁর জন্য আছে। আপনি খান।

বিষ্ণুপদ প্রশ্ন মনে প্লেটটা হাতে নিয়ে রাঙার দিকে চেয়ে বলে, আচ্ছা মা, আমি কি খুব লোভী মানুষ ?

রাঙা অবাক হয়ে বলে, ও কি বলছেন!

বিষ্ণুপদ খুব হেসে বলে, বলোই না! আমাকে তোমার খুব লোভী বলে মনে হয় না ?

না না, সে কী কথা!

বিষ্ণুপদ খুব হেসে মাথা নেড়ে বলে, স্বীকার কর বা না কর, আমি কিন্তু খুব লোভী মানুষ। সারা জীবন পেটে খিদে নিয়ে কেটেছে। ভরপেট বড় একটা থাকিনি, ভালমন্দ তো দূরের কথা। জিত তাই শেষ জীবনে শোধ তুলতে চায়। বুঝলে ?

পার্থিব—৪৯

৩৮৫

আপনি খান তো। ওসব ভাববেন না।

বলতে নেই, রাঙা আজকাল খাতির করে খুব। করারই কথা। সংসারে বাতিল স্বস্তর-শাতড়ির কল্যাণেই তারা এত বড় দোতলা বাড়িটা ভোগ দখল করবে। কাজেই এখন সে স্বস্তর আর শাতড়িকে একটুও কথা-টখা শোনায় না। সেবা-টেবাও খুব করে।

পাতিলেবুর গন্ধওলা ছানার একটুখানি মুখে দিয়ে চিবোতে চিবোতে বিষ্ণুপদ বলল, বড্ড দেহিতে সব হল, বুঝলে, তবু হল তো!

কিসের কথা বলছেন?

এই সব যা হচ্ছে। বাড়ি হল, গরু হল, ভোগসুখ হল। সবই হল, তবু গলায় যেন একটা কাঁটা খচখচ করে।

কিসের কাঁটা বাবা?

গলার কাঁটা ওই বামা। যখনই ওর কথা ভাবি, হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

ও সব ভাববেন না বাবা। মেজদাদার মাথাটাই গেছে।

সেটার কথাও ভাবি। মাথাটাই বা গেল কেন? আমাদের বংশে কেউ পাগল ছিল না। তোমার শাতড়ির বংশেও না। আগের দিনে বিয়ের সময়ে এ সব দেখা হত। আজকাল আর হয় না।

মেজদার পাগলামি তো বংশগত নয়। লোভের তাড়সে আর মেজদিদির জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে হয়েছে।

তাই হবে। সে কি আর আসে-টাসে?

না। আপনার সেজো ছেলে তাঁকে খুব শাসিয়ে দিয়েছে।

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আজ যেন ছানাটা খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। মুখের ছানাটা একটু জিভ দিয়ে নেড়েচেড়ে বলল, আমাদের সকলেরই বড় খিদে, না বউমা? বিষয়সম্পত্তি, খাবারদাবার, যশ-প্রতিষ্ঠা, খিদের যেন শেষ নেই।

রাঙা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বিষ্ণুপদ একটু হেসে বলল, আমি ভাবি কি জানো? মনে হয় সারা জীবন আমার যে সব খিদে চাপা ছিল তা ওই বামাচরণের ভিতরে ফুটে বেরিয়েছে। ভগবান ওকে সন্তান দেননি, সেটাও একটা কথা। ওরটা কে খাবে বলো তো! বসো বউমা, আমার কাছে একটু বসো।

বসছি বাবা, কিন্তু রান্না পড়ে আছে।

তোমার শাতড়ি কোথায়?

শীতলাবাড়ি গেছেন।

ভাঁর খুব পুজো-আন্টার বাই। বলে বিষ্ণুপদ হাসে।

রাঙা কাঠের চেয়ারটায় বসে বলে, আপনি আজ কিন্তু ছানাটা খাচ্ছেন না, নাড়ছেন শুধু।

এক একদিন রুচিটা থাকে না। রোজ কাঁচা ছানা না দিয়ে এক একদিন ছানা দিয়ে ডালনা রেঁধে তো মা। বোধহয় ভালই লাগবে। ছানার ডালনার কথা শুনেছি, খাইনি কখনো। জানো রাখতে?

সোজা তো। দেবোখন রেঁধে। আজ কষ্ট করে খেয়ে নিন।

বউমা, আজকাল আর রাতে রেমোর চোঁচোমচি শুনি না। জিজ্ঞেস করতে ভয় করে, সে কি মদ ছেড়ে দিয়েছে?

রাঙা একটু জিব কেটে বলে, একরকম তাই। গরুটা আনার পর থেকে খায় না।

কেন বলো তো?

তা জানি না বাবা। মনের কথা তো আর খুলে বলেন না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিষ্ণুপদ বলে, বটতলার বন্ধুরাও আসে না, না?

আজকাল আসে না। উনি তো দেখছি সন্ধেরাভেই বাড়ি চলে আসেন।

তোমাকে কিছু বলে না?

দুঃখ করেন, ওঁর তো খুব ইচ্ছে ছিল পাকা বাড়ি করে আপনারদের রাখবেন। উনি পারেননি, বড়দাদা করে দিলেন। এইজন্যই দুঃখ।

জানি। আমিও চেয়েছিলাম আমার হেরো ছেলেটা বাড়িটা করে দেখাক।

উনি পারতেন না বাবা। ওর টাকা নেশায় আর জুয়ায় খরচ হয়ে যাচ্ছিল। টাকা উপার্জনও তো ভাল পথে করত না।

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, আমারও সেই সন্দেহ ছিল।

বড়দাদা বলেছেন একটা দোকান করে দেবেন।

বলেছে? বলে আমিহে ঝুঁকে বসে বিষ্ণুপদ, কী বলেছে?

বটতলার একখান সাইকেলের দোকান করে দেবেন।

সাইকেলের দোকান? মানে সাইকেল সারাই নাকি?

না। সাইকেল আর সাইকেল পাটসের দোকান। এ দিকে নাকি সাইকেলের দোকান নেই।

কথাটা এগিয়েছে?

হ্যাঁ। শুনেছি, দোকানঘর হচ্ছে। প্রাস্টিকের জিনিস, স্টিলের বাসন, কেরোসিন স্টোভ এ সবও নাকি থাকবে দোকানে।

রেমো বলেনি তো আমাকে! এ তো গুরুতর খবর।

বড়দা বলতে বারণ করেছেন। আমি তো পেটে কথা রাখতে পারি না, তাই আপনাকে বলে ফেললাম।

বেশ করেছে। অনেক জ্বালাপোড়ার মধ্যে এই একটা ভাল খবর। বুকেটা ঠাণ্ডা হল। আমার মনে হয়, মদ ছাড়লে রেমো অনেক কিছু পারবে। তোমার কি ধারণা?

কে জানে বাবা! তবে ওঁর কথা তো কিছু বলা যায় না। আজ ভাল তো কাল খারাপ। মদের নেশা ছাড়া নাকি শক্ত।

বেশির ভাগ লোকই পারে না।

নেশা জিনিসটাই শক্ত জিনিস। তোমার শাওড়ি কি পারবে দোক্তাপাতা ছাড়তে ?

কটেস্টে ছানাটা শেষ করল বিষ্ণুপদ। তারপর ওষুধ খেল। তারপর বসে রইল। মিস্ত্রিরা কাজে এল সব। আজকাল মিস্ত্রির সংখ্যা কমে গেছে। বাইরে প্রাক্টারিং হবে বলে তোড়জোর হচ্ছে। ছাদে ট্যাংক বসেছে। বাড়িটা যেন বুক ফুলিয়ে হাসছে এখন।

জানালা দিয়ে সম্মোহিতের মতো চেয়ে থাকে বিষ্ণুপদ। এত বড় পাকা বাড়ি তাদের দেশেও ছিল না। জমিজমা ছিল কিছু, বাড়ির চৌহদ্দিও বড়ই ছিল। কিন্তু সবই কাঁচা ঘর। বলতে কি, এই প্রথম তারা পাকা বাড়িতে বাস করবে।

নয়নতারা ঘরে ঢুকে বলল, শুনলে তো, লোকে বলছে আজকাল নাকি অহংকারে আমার মাটিতে পা পড়ছে না।

বিষ্ণুপদ আচমকা গলার স্বর শুনে একটু চমকে গেল। বাড়ির দিকে চেয়ে এমন মজে ছিল যে, নয়নতারার আসাটা টের পায়নি। বলল, কেন ?

এই সবাই বলছে। এ গাঁয়ে তো এত বড় বাড়ি কারও নেই, তাই।

বিষ্ণুপদ একটু হাসল, এ সবও শুনতে হচ্ছে! তা ভাল। একটু শুনো নাও।

তা শুনছি। তা সত্যি কথা বলতে কি, আমার একটু দেমাকও হয়েছে বাপু। কী করব বলা তো!

বিষ্ণুপদ বলল, কখনও-কখনও একটু অহংকার করতে ভালই লাগে। কখনও তো করেনি!

সেই কথাই বলছি। অহংকার করার মতো তো কিছু ছিল না। এই হল। তা হ্যাঁ গা, গৃহপ্রবেশ করতে হবে না ? সাই

যে খুব ধরেছে ভালরকম ভোজ খাওয়ানোর জন্য। আমরা তো তেমন করে কাউকে কখনও নেমন্তন্ন করে খাওয়াইনি। ছেলেমেয়েদের বিয়ে নমো-নমো করে সারতে হয়েছে। তা এবার কি একটু ভাল করে করবে নাকি ?

বিষ্ণুপদ মাথা নেড়ে বলে, লোককে খাইয়ে হবেটা কি ? পয়সা উড়িয়ে দেওয়া বই তো নয়! লোকে পাত পেড়ে খেয়ে যায়, গিয়ে নিদ্দমন্দ করে—এটা ভাল হয়নি, ওটা বাদ গেছে। তার চেয়ে একটু পূজোটিজো দিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়লেই হয়।

নয়নতারা হেসে বলে, তা হলে আমার অহংকারের কি হবে ? লোকে যে বাড়ির কথা বলাবলি করছে তাদের কাছে মুখ দেখাব কি করে ? দুয়ো দেবে যে! কৃষ্ণ যে মাস মাস পাঁচশো টাকা করে দিচ্ছে তা তো জমেই যাচ্ছে। আমরা তো অত টাকা খরচ করার পথই পাই না। তা সেই টাকায় হয় না ?

বিষ্ণুপদ একটু ভেবে বলল, ইচ্ছে হলে দাও লাগিয়ে।

আমার বড় ইচ্ছে, একটা উপলক্ষ ধরে সবাই আবার একজোট হোক, সরস্বতী আর বীণাপাণিও আসুক।

আর বামা ?

তাকে ডাকব ? পাগল হলে নাকি! তোমাকে তো প্রায় মেরেই ফেলেছিল! ও ছেলেকে যে পেটে ধরেছিলাম সেইটে ভাবতেই লজ্জা হয়। কী কাওই করে গেল দুজনে!

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, যদি বামাকে নেমন্তন্ন না করো তা হলে আবার একটু খোঁচ থেকে যাবে। পাঁচজনের কাছে বলে বেড়াবে নানা কথা।

সে বলে বেড়াবেই! তাছাড়া ব্যাপার-বাড়িতে এসে সে যদি চৌচামেচি করে, তা হলে তো সব পণ্ড হবে!

বিষ্ণুপদ একটু ভেবে দেখল, কথাটা ঠিকই। বামাচরণের মাথার ঠিক নেই। শ্যামলীও সুবিধের মানুষ নয়। দুজনে মিলে কী যে করবে তার ঠিক কি ? বিষ্ণুপদ বলল, তাহলে থাক।

তাহলে মত দিচ্ছে তো ? গৃহপ্রবেশ একটু ভাল করেই হচ্ছে তাহলে।

তোমার যখন ইচ্ছে তখন আর অমত করি কি করে ? গৃহপ্রবেশের কথায় তোমার মুখখানা একেবারে ঝলমল করে উঠল যে!

নয়নতারার মুখ সত্যিই ঝলমল করছিল। হাসি আর ধরে না। বলল, দেমাকটা বড্ড চকমক করছে ভিতরে।

তাই দেখছি।

বামাচরণ এল আরও দুদিন বাদে, সন্ধ্যাবেলায়। বিষ্ণুপদ নতুন বাড়ির দালানে বসে ছিল। একখানা ডুম জ্বলছে মাথার ওপর। তাতে দালানখানা ঝকমক করছে। ওপরতলায় মেশিন চালিয়ে মেঝে পালিশ করছে মিস্ত্রিরা। এমন সময়ে শ্যামলীকে নিয়ে এসে ছুড়মুড় করে ঢুকল বামা।

একটু আঁতকে উঠেছিল বিষ্ণুপদ।

বামা পায়ের ওপর একেবারে উপড় হয়ে পড়ে বলল, বাবা, মাপ করে দিন। বড় অপরাধ হয়েছে।

বিষ্ণুপদ ব্যস্ত হয়ে বলল, ওরে, ওঠ ওঠ।

বামাচরণ উঠল না। হাপাস কাঁদতে লাগল।

শ্যামলী বলল, ক'দিন ধরেই কান্নাকাটি করছে। আমিও খুব বকাঝকা করেছি।

ওকে উঠতে বলো বউমা। আমার শরীর ভাল নয়। এ সব তেমন সহ্য হয় না।

শ্যামলী হাত ধরে টেনে বসল বামাচরণকে। বল, তোমার জন্যই যত অশান্তি। বাবা তো বলেইছিলেন দোতলাটা আমাদের দিয়ে দেবেন। তা হলে ওরকম করতে গেলে কেন ?

বিষ্ণুপদের বুকের মধ্যে একটা হাঁচোড়-পাঁচড় হচ্ছিল। হাঁফ ধরে যাচ্ছিল। বলল, তোমরা বসো। শান্তভাবে কথা কও। বেশি উত্তেজক কিছু হলে আমার কেমন হাঁফ ধরে যায়।

পরিস্কার মেঝের ওপর দুজনে পাশাপাশি বসল। বামা চোখের জল মুছে বলল, আমি মহা পাপী, আমাকে জুতো মাড়ান। নইলে নরকেও ঠাই হবে না।

বিষ্ণুপদ হাঁফধরা গলায় বলে, একটু দম নিতে দে বাবা। বড় চমকে দিয়েছিস।

দুজনে ভয় পেয়ে চুপ করে গেল।

সাদাশব্দে টের পেয়েই বোধহয় নয়নতারা কোথা থেকে উড়ে এল যেন।

এ কি, তোরা এখানে কেন? কি করতে এসেছিস?

বামাচরণ ভাড়াভাড়ি মায়ের পায়ের ওপর পড়তে গেল, মা! মা গো! মাপ করে দাও।

নয়নতারা দু' হাত পিছিয়ে গিয়ে বলল, ওরে বাপ রে, মাপ চাওয়ার কি ঘটা কেন রে মুখপোড়া, হঠাৎ মাপ চাইতে এসে হাজির হলি কেন? মতলবখানা কি তোর?

বামাচরণ উঠে বসল। বলল, একটা অপরাধ হয়ে গেছে মা, তা বলে কি আর তার মাপ নেই?

শ্যামলী বলল, আমাদের তো ভাড়িয়েই দিয়েছেন মা, নতুন করে আর কী শাস্তি দেবেন?

নয়নতারা বলল, শোনো বউমা, কথাটিখা যা আছে সব আমার সঙ্গে আর রেমোর সঙ্গেই বলো। ওঁর সঙ্গে নয়। ওঁর শরীর ভাল নয়। আগের বার এসে তোমরা যা করে গেছ তাতে ওঁর কি অবস্থা হয়েছিল, তা পাঁচজনে জানে। এসো তোমরা ওপাশের পুরনো ঘরে গিয়ে বসো। আমি আসছি।

শ্যামলী একটা ঠেলা দিয়ে বামাচরণকে তুলে দিল। বিষ্ণুপদ দেখল, বামাচরণের চেহারাটা আরও খারাপ হয়েছে। রোগা: পাঁচটে, কেমনধারা যেন।

বাবা, আসি তাহলে?

বিষ্ণুপদ ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানাল।

ওরা চলে যাওয়ার পর বিষ্ণুপদ কাঁপা বুক নিয়ে বসে রইল চুপটি করে। স্বাসকষ্ট হচ্ছে। শরীর কি আর দেবে? গৃহপ্রবেশের আগেই ফট হয়ে যাবে নাকি!

তা কামনা-বাসনা রাখতে নেই। গৃহপ্রবেশের আগেই হোক, পরেই হোক, শরীর যখন ছাড়ে ছাড়ুক, তবে কেন ব্যস্ত হওয়া?

উঠতে গিয়ে বিষ্ণুপদ টের পেল, হাঁটুতে বল নেই। ওঠা যাচ্ছে না। তাই ফের গা ছেড়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে চুপ করে রইল। পুত্র শব্দটার অর্থ খুঁজে পাচ্ছে না সে।

॥ ৯৪ ॥

হেমন্তের স্নিগ্ধ বিকেল। রবীন্দ্রসদনের দিক থেকে ডানহাতি ফুটপাথ ধরে দুজনে উত্তর দিকে হেঁটে যাচ্ছিল। রবীন্দ্রসদনের টিকিট পায়নি তারা। সম্ভবত অ্যাকাডেমিরও পাবে না। টিকিট না পেলে অবশ্য তাদের কিছুই যায় আসে না। টিকিট বা নাটক দেখাে একটা ছুতো মাত্র।

অনিন্দিতা বলল, তোমাকে নিয়ে আর পারি না। কোনও ব্যাপারেই তোমার কোনও আগ্রহ নেই কনে বলো তো! নাক হোক, ফিল্ম হোক, পেইন্টিং হোক, কোনও না কোনও বিষয়ে তো মানুষের কণামাত্র ইন্টারেস্ট থাকবে! তোমার কিছুতেই নেই।

চয়ন মনু হেসে বলে, আছে।

কিসে আছে তুনি?

আমি পড়তে ভালবাসি।

ওটা কোনও কথা হল? পড়তে ভালবাসেই কি হয়? জীবন কত ছড়ানো। কত কী হয়ে যাচ্ছে আর্টে, কালচারে!

তাই নাকি?

তুমি কোনও খবরই রাখো না। বড্ড কুনো স্বভাব বাপু তোমার।

তা ঠিক। ঘরের কোণ আমার খুব পছন্দসই জায়গা। লোকজনের জমায়েত দেখলেই আমার অস্বস্তি হয়।

কী যে করি তোমাকে নিয়ে! এই স্বভাবের জন্যই তোমার কিছু হয় না। যদি একটা বাকুনি মেরে জড়তার ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারতে, তাহলে কিন্তু তুমি অনেক কিছু করতে পারতে।

তাই কি? সবাই কিন্তু সব কিছু পারে না। আর একটা কথা শোনো, আর্ট কালচারে আমাকে ইন্টারেস্টেড করে তুলে কী হবে বলো তো! কত মানুষ তো ও সব ছাড়াই দিবা্য বেঁচে আছে।

ওকে বেঁচে থাকা বলে না। তোমাকে এ পর্যন্ত আর্ট-দর্শনাটক দেখালাম, তবু তোমার নাটকে আগ্রহ হচ্ছে না দেখে অবাক হচ্ছি। কেন হচ্ছে না বলো তো!

নাটক দেখতে তো আমার ভালই লাগছে।

মোটাই না। তুমি দেখতে হচ্ছে বলে দেখছে। জোর করে ধরে নিয়ে আসি, তাই।

না অনিন্দিতা, ঠিক তা নয়। নাটক বা ফিল্ম একটা কৃত্রিমতার গন্ধ থাকেই। কিছুতেই সেটা আমি ভুলতে পারি না।

আচ্ছা পাগল যা হোক! এইজন্যই বলি তোমাকে আর মানুষ করা গেল না।

অ্যাকাডেমিতেও টিকিট নেই। অনিন্দিতা মুখ ভার করে বলল, আজ যে কী হল! কোথাও টিকিট পেলাম না। নিশ্চয়ই তুমি মনে মনে ও রকমটা চেয়েছিলে। বেরসিক কোথাকার!

আমার ইচ্ছাশক্তির কি এত জোর আছে অনিন্দিতা?

আছে বোধহয়।

চলো হাঁটি। বন্ধ ঘরে বসে ও সব দেখার চেয়ে খোলা হাওয়ায় একটু হাঁটাইটি করা বরং অনেক ভাল।

হাঁটা একটা বিচ্ছিন্ন একঘেয়ে ব্যাপার। তুমি এত হাঁটতে ভালবাসো কেন?

হাঁটতে ভালবাসি তার একটা কারণ আছে। হাঁটতে হাঁটতে খুব ধীরে ধীরে চারদিকটাকে খুব ভাল করে অবজার্ড করা যায়। ডিটেলসে।

কি জানি বাবা, চারদিকটা তো রোজই একইরকম আর একঘেয়ে।
ঠিক বোঝাতে পারব না। জানোই তো আমার কথাটথা ভাল আসতে চায় না। অনেক কথা বুঝতে পারি, কিন্তু বোঝাতে পারি না।

অনিন্দিতা মৃদু একটু রহস্যময় হাসি হেসে বলল, আচ্ছা তোমার আর আমার সম্পর্কটা নিয়ে কখনও ভেবেছো ?
কী ভাববো ?

এই সম্পর্কটা আসলে কি ? প্রেম ভালবাসা, না বন্ধুত্ব ?

চয়ন একটু অবস্থি বোধ করে বলে, এটাও আমি ঠিক বুঝতে পারি না, অনিন্দিতা। আমি জীবনে কারও সঙ্গে প্রেমট্রম করিনি। আমার ভিতরে আবেগ এত কম!

দূর বোকা, প্রেম একটা বায়েলজিক্যাল ব্যাপার। ওর জন্য এক্সপেরিয়েন্স দরকার হয় না। তবে ভয় পেও না। তোমার আর আমার মধ্যে বন্ধুত্বটাই আছে। অন্য কিছু নয়। কি, শুনে স্বস্তির শ্বাস ফেললে তো!

চয়ন একটু হেসে বলল, তা হবে! তবে তোমাকে আমি কখনও অপছন্দ করিনি তো। তোমার সঙ্গ আমার বেশ ভাল লাগে।

সেটা আমারও লাগে। প্রেম জিনিসটা তার চেয়ে কিছুটা বাড়তি জিনিস।
তুমি কখনও কারও প্রেমে পড়েছো অনিন্দিতা ?
অনিন্দিতা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, একবার।
ও।
শুনবে সে কথা ?
চয়ন একটু মিটিমিটি হেসে বলল, সেটা কি ব্যর্থ প্রেম ?
তা তো বটেই! আমার মতো মেয়েকে তার পাস্তা দেওয়ার কথাই নয়। দেয়ওনি কোনোদিন। কিন্তু তার কথা ভাবলেই আমার চোখে জল আসে।

ও।
তুমি কৌতূহল দেখাচ্ছে না তো!
না। এ সব ব্যাপারেও আমার আগ্রহ নেই।
কেন নেই ?
প্রেমটাও একটা আবেগসর্বস্ব ব্যাপার। বিয়ে-টিয়ে করলে সেই আবেগটা অনেকটাই কেটে যায়।
উন্টোটাও আছে।
থাকতে পারে!
তুমি ভীষণ নেগেটিভ টাইপের লোক!
তা হবে।
মোড় অবধি এসে অনিন্দিতা থমকে দাঁড়িয়ে বলল, এবার কি করব বলো তো! কোনদিকে যাবো ?
চলো চৌরঙ্গি ধরে হাঁটি। এসপ্লানেড অবধি গিয়ে বাস ধরব।
উঃ, হাঁটতেও পারো বটে তুমি! আমার কিন্তু হাঁটু ব্যথা করছে। আচ্ছা, ফুচকা খেলে কেমন হয় ?
তোমার না খুব অঞ্চল হয় ?
সে তো আছেই! চলো ভিস্টোরিয়ার সামনে খুব ভাল ফুচকা পাওয়া যায়।
আমি যে ও সব খাই না। সহ্য হয় না।
সহ্য হয় কি না আজ পরীক্ষা হয়ে যাক। আমার ব্যাগে অ্যান্টাসিড আছে, ভয় নেই।
চয়ন মৃদু স্বরে বলে, আমি বোধহয় ও সব খেলে অজ্ঞান হয়ে যাবো।
মোটেই না। ওসব ভাবলেই তোমার হয়।
অনিন্দিতার ফুচকা খাওয়ার দৃশ্যটা মোটেই ভাল লাগছিল না চয়নের। বড্ড লোভীরা মতো খাচ্ছে। একটু বাদে ওর আইটাই অঞ্চল হবে, কড়ার নিচে ব্যথা হবে। তবু কেন খাচ্ছে ? চয়ন মাঝে মাঝে খুব ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে ঠিকই, কিন্তু সে কখনও যা-তা খেতে পারে।

তুমি শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে রইলে একটু ঝালমুড়ি অন্তত খাও।
না অনিন্দিতা। আমার সহ্য হয় না।
বড্ড সাবধানী, বড্ড গুড়ি গুড়ি তুমি।
চয়ন একটা শ্বাস মোচন করে বলে, আমি ঠিক আমারই মতো। অপদার্থ, অচল।
তোমার ওসব অটো সাজেশনই তোমাকে খেয়ে ফেলছে।
তাও জানি। তুমি আর খেও না। অনেক হয়েছে।
আচ্ছা আচ্ছা। একজন শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে থাকলে বেতে ভালও লাগে না।
ফুচকার দাম মিটিয়ে ফের দুজনে হাঁটতে লাগল। আজ রবিবার। ঈশ্বর শীতল সন্কেবেলায় ময়দানে মানুষের ঢল নেমে এসেছে। ভিড়ের জায়গা চয়নের ভাল লাগে না।
এবার বাসে উঠবে চয়ন ?
চলো।
বাসায় নিজের চিলতে ঘরখানার নির্জনতায় ফিরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল চয়ন। ছুটির দিনে আজকাল অনিন্দিতা তাকে টেনে হিচড়ে নানা জায়গায় নিয়ে যায় বা যেতে চেষ্টা করে। এই আউটিংটা তার একদম পছন্দ নয়। বড় নিরর্থক

আর ক্লাস্তিকর মনে হয়। নাটক দেখে বেড়ানোতেও সে তেমন কোনও আকর্ষণ বোধ করে না। এ বার সে অনিন্দিতাকে বলবে, আমি আর এসব পারছি না। ছেড়ে দাও আমাকে। বলাটা খুব শক্ত। সে কিছুতেই দৃঢ়ভাবে নিজের মত প্রকাশ করতে পারেনি কখনও।

অনিন্দিতার ফুচকা খাওয়ার দৃশ্যাট কেন বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছে তার? উর্ধ্বমুখ, মস্ত হাঁ, ফুচকাটা টপ করে হায়ের মধ্যে ফেলে দেওয়া, তারপর চিবোনো এবং মুখে অত্ৰাদ ও উত্তেজনা ফুটে ওঠা—সবটাই তার কাছে এত খারাপ লাগছে!

একটু রাতের দিকে অনিন্দিতা ফের ছাদে উঠে এল। চয়ন তখন স্টোভ জ্বেলে রাখতে বসেছে।

এই, শুনেছো। তোমার দাদা আর বউদি আজ বাড়ি নেই। কোন্নগর না কোথায় বেড়াতে গেছে, আজ ফিরবে না।

তাই আড্ডা মারতে চলে এলাম।

চয়ন একটু হাসল। দাদা বউদি থাকলেও আজকাল অনিন্দিতা প্রায়ই আসে। তবে সন্ধের পর বেশিক্ষণ থাকে না। সে বলল, ভালই তো! কিছু খোলা ছাদে ঠাণ্ডা লাগতে পারে।

কিছু হবে না। রান্না তাড়াতাড়ি শেষ করো। একটু গল্প করি।

তাদের গল্প করাটা কিন্তু অদ্ভুত। চয়নের কথা বিশেষ থাকে না। অনিন্দিতার অনেক থাকে। ও বক্তা, সে শ্রোতা।

সম্পর্কটা যে কোনদিকে গড়াবে তা ভেবে পায় না চয়ন।

তার পাশে উবু হয়ে বসে অনিন্দিতা বলে, কী রাখছো?

ভাত আর সন্ধ আজ আর বেশী কিছু নয়।

আহা, কবেই বা তুমি পঞ্চব্যঞ্জন রাধো! মা আজ মাংস রোধেছে, একটু নিয়ে আসব?

না না, মাংস আমার সহ্যই হয় না।

ওঃ, কী নিরামিষ লোক!

চয়ন মৃদু একটু হাসে।

আচ্ছা, তুমি ডিম খাও না কেন?

এ কথার জবাব দিলে তুমি আমার ওপর বিরক্ত হবে।

ও মা, কেন?

একই কথা বারবার বলতে হয় যে! আমার সহ্য হয় না।

মাছ তো খেতে পারো।

তা পারি। কিন্তু ঝামেলা। খাওয়াটা আমার কাছে উপভোগ্য ব্যাপার নয়। খেতে হয়, তাই খাই। খাওয়া না থাকলে

আমার খুব ভাল হত।

কিন্তু আছে। আমি কিছু খেতে ভালবাসি।

সেটাই স্বাভাবিক। আমি তো স্বাভাবিক নই!

স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে শুরু করলেই দেখবে তুমি আর পাঁচটা মানুষের মতো সব কিছুই ভালবাসবে।

হয়তো ঠিকই বলেছো।

আমার কী ইচ্ছে করে জানো? তোমাকে জোর করে স্বাভাবিক জীবনে টেনে আনি।

আমাকে নিয়ে কেন ভাবো অনিন্দিতা? দুঃখ পাবে।

অনিন্দিতা তার সুন্দর দাঁত ঝলসে হাসল, তবু ইচ্ছে করে।

চয়ন মৃদু একটু হেসে বলল, ইচ্ছেটাকে আর প্রশ্ন দিও না। তাহলে তোমাকে আমার ভয় করবে।

ও মা! কী কথা দেখ! আমাকে আবার ভয়ের কি?

ওই যে, জোর করতে চাও!

যাকে ভালবাসা যায় তার ওপরেই তো জোর করা যায়। তাই না?

চয়ন মৃদুস্বরে আত্মবিশ্বাসহীন গলায় বলে, তা বটে।

তা হলে?

আমার ওপর জোর খাটাতেও হয় না। আমি সবসময়ে অন্যকে খুশি রাখতে চেষ্টা করি। অনেক সময়ে ইচ্ছের বিরুদ্ধে। করি না, বলো?

হ্যাঁ, তা করো। যেমন ইচ্ছে না হলেও আমার সঙ্গে নাটক দেখতে যাও, বেড়াতে যাও। শুধু ফুচকাটা খাওনি।

আরও একটু জোর করলে তাও হয়তো খেতাম। তারপর সারা রাত জেগে থাকতাম অস্বস্তিতে। তাই বলি, আমার ওপর জোর করার দরকার নেই।

তাই বুঝি?

বলে আচমকা যে কাণ্ডটা করে বসল অনিন্দিতা তার কোনও যুক্তিসিদ্ধ অর্থ হয় না, না হয় তার কোনও ব্যাখ্যা। খুবই অকস্মাৎ সে দুই হাতে চয়নের দুটো কাঁধ ধরে নিজের শরীরের দিকে টেনে নিল তাকে। খোলা, বিপজ্জনক ছাদে তার দুখানা চৌঁট চেপে বসে গেল চয়নের চৌঁটে। কয়েকটা অদ্ভুত মুহূর্ত। তারপরই তাকে ছেড়ে দিল অনিন্দিতা।

বেসামাল চয়ন পড়েই যাচ্ছিল ছেড়ে দেওয়ার পর। সামলে নিল। কি হল কাণ্ডটা সে বুঝতেই পারল না প্রথমে। কি করল এটা অনিন্দিতা? কেন করল?

অনিন্দিতা উঠে দাঁড়াল। তারপর অসুট কণ্ঠে বলল, যাচ্ছি।

সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ যখন নেমে যাচ্ছিল তখন কাঁধে আর ঘাড়ের একটা ব্যথা টের পায় চয়ন। বড্ড হঠাৎ তাকে জাপটে ধরেছিল। বেকায়দায় লেগেছে।

হাতের পিঠ দিয়ে ঠোঁটদুটো মুখে ফেলে চয়ন। কিন্তু ঘটনাটা তো ও ভাবে মুছবে না। এর যে গভীর দাগ থেকে যাবে তার স্মৃতিতে। এটা কী করল মেয়েটা!

চারদিকে কাছাকাছি ছাদগুলোর দিকে চেয়ে দেখল চয়ন। না, কেউ কোথাও নেই। হয়তো কেউ দেখিনি। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল, এই ঘটনাটা ঘটিয়ে অনিন্দিতা কী বলতে চাইল তাকে?

স্টোভটা নিবিয়ে দিল চয়ন। তার ভিতরটা গুলিয়ে উঠছে। অদ্ভুত লাগছে। তার জীবনে এরকম অভিজ্ঞতা এই প্রথম। কিন্তু অভিজ্ঞতাটা ভাল না মন্দ তা সে বুঝতে পারছে না। তার ভাল লাগছে না। তার শরীর খারাপ লাগছে।

আধাসেদ্ধ ভাত স্টোভের ওপরেই পড়ে রইল। ঘরে ঢুকে বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়ল চয়ন। তার শরীর কাঁপছে থরথর করে। মনটা অস্থির। মাথাটা পাগল-পাগল লাগছে। শুয়ে থেকে নিজেকে সামালানোর চেষ্টা করল চয়ন। কিন্তু কেবলই মনে হচ্ছে, একটা অঘটন তার অস্তিত্বের ভিত বড্ড নাড়িয়ে দিয়ে গেছে। তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে ভীষণ।

অথচ একটা চূষন তো এমন কিছু দোষের ব্যাপার নয়। তার জীবনে হয়তো প্রথম। কিন্তু এ রকম তো হয়! অনিন্দিতার কাছ থেকে ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত ছিল বলেই কি তার একটুও ভাল লাগছে না?

অনিন্দিতা এ ভাবে কিছু কি বলতে চাইল তাকে?
কি বলতে চাইল, তা চয়ন জানে না। কিন্তু তার শরীর জেগে উঠল না এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায়। বরং তার চোখে জল এল। প্রেমহীন চূষন কত কষ্টকর হতে পারে! এমন কি যেখানে কামনাটুকু অবধি নেই!

প্রায় সারা রাত জেগে রইল চয়ন। যখন ঘুম এল না তখন চাদর মুড়ি দিয়ে ছাদে ঘোরোফেরা করল। রেলিং ধরে উদাস চোখে চেয়ে রইল দূরের দিকে। মানে হয় না, কোনও মানেই হয় না।

ধীরে ধীরে ভোর হয়ে গেল। আর কি কখনও অনিন্দিতার সঙ্গে সহজে মিশতে পারবে সে? পারবে ওর চোখের দিকে তাকাতো?

সারাদিন একটা ঘোরের মধ্যে রইল চয়ন। যন্ত্রের মতো সকালের টিউশনিগুলো সেরে এল। ভাল রাখল, খেল। তারপর বিকেলে গেল চারুশীলার বাড়ি। সবই ঘটছিল যেন স্বপ্নের মধ্যে। তাকে এই কঠিন বাস্তব যেন স্পর্শই করছে না।

চারুশীলা তাকে দেখেই বলে উঠল, এই চয়ন, তোমার কী হয়েছে বলো তো!
চয়ন এই সামান্য প্রশ্নেই ভীষণ খতমত খেয়ে বলে উঠল, না না, কিছু হয়নি তো!

না মানে? তোমার মুখ যে ভীষণ শুকনো। চোখ অমন লাল কেন?
চয়ন যেন ধরা-পড়ে গেছে এমন আতঙ্কের সঙ্গে প্রায় আত্নানাদ করে ওঠে, না, কিছু হয়নি আমার। কিছু হয়নি।

টেম্পারচার নেই তো! সিজন চেঞ্জের সময়, খুব জ্বর হচ্ছে চারদিকে।
না, জ্বর নয়। রাতে ঘুম হয়নি।

কেন হয়নি?
এমনিই।

আমার ভীষণ ঘুম, তা জানো? লোকে বলে ব্রেনলেসদের নাকি ভাল ঘুম হয়।
চয়ন এবার একটু হাসল। কিছু বলল না।

শরীর খারাপ লাগলে আজ পড়াতে হবে না। আজ ছুটি। বসো, তোমাকে একটা নতুন জিনিস খাওয়াবো।
আজ আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।

শোনো, আমি কিছু অফার করলে কখনও না বলবে না। নেগেটিভ জবাব আমার একদম পছন্দ নয়। একটু হলেও গাবে। এসো তো, ডাইনিং টেবিলে এসে বোসো।

অগত্যা একটা অচেনা ঝাল-নোনতা হালুয়া গোছের জিনিস অনিচ্ছের সঙ্গে খেতে হয় চয়নকে।
চারুশীলা জিজ্ঞেস করল, এক রাতেই তোমার চেহারাটা অন্যরকম হয়ে গেল কেন বলো তো!

চয়ন লজ্জায় মুখ নামিয়ে নিল।
তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, ইউ আর ইন এ শক।

না তো! কিছু হয়নি।
বলতে না চাইলে বোলো না। কিন্তু খুব শকিং কিছু নিশ্চয়ই হয়েছে। আচ্ছা, তুমি কি ওজন নাও?

না তো!
কেন নাও না? রেগুলার ওজন নিলে বুঝতে পারবে তোমার স্বাস্থ্য ভাল হচ্ছে কি না।

চয়ন বলল, আমার ভাল কিছু হবে না।
আমার তো মনে হচ্ছে উল্টোটাই। ইদানিং তোমার ওজন একটু বেড়েছে বোধহয়। চলো তো, তোমার ওজনটা একটু দেখি।

চয়নকে তাও করতে হল। ডাইনিং হল-এর কোণে দামী একটা ওজন নেওয়ার যন্ত্রে তাকে তুলে চারুশীলা স্কেলটা দেখে বলল, এখনও তুমি বেশ আভারওয়াটে। আরও দশ কেজির মতো বাড়লে তবে হয়।

চয়ন খুব লজ্জিত মুখে চুপ করে থাকে।
রাতে নিজের ঘরে যখন চয়ন ফের একা হল তখন একটা হতাশা আর বিভ্রান্তিতে সে কয়েক টুকরো হয়ে আছে।

কিছু করতে ইচ্ছে করছে না।
শুয়ে থেকে থেকে সে অনেক ভাবল। অনেক, অনেক ভাবল।

অনিন্দিতার সঙ্গে দেখা হল আরও তিনদিন বাদে।
সন্ধের পর অনিন্দিতা উঠে এল ছাদে।

ক্ষমা করো চয়ন।

চয়ন চূপ করে রইল।

তোমার মুখ দেখে বুঝতে পারছি, ভুল করেছি।

কেন করলে ?

তোমাকে শক দেওয়ার জন্য। ডেবেহিলাম ধাক্কাটা তোমার উপকার করবে।

॥ ৯৫ ॥

পালপাড়ায় গিয়ে একদিন বাবাকে প্রায় জোর করেই ধরে নিয়ে এল নিমাই। আসতে চাইছিল না, বলল, ও বাবা, আমি ভিটে ছেড়ে কোথাও যাব না।

নিমাই বলল, উপায় থাকলে কি নিয়ে যেতাম! আপনাকে একটু কাজ কারবার বুঝে নিতে হবে যে, আমার কবে কি হয়ে যায়!

তোর আবার কী হবে ?

সে আপনি বুঝবেন না, চলুন।

অনিচ্ছুক বাবাকে নিয়ে এসে দোকানে বসাল নিমাই, বলল, কাজকারবার একটু বুঝে নিন।

বাবা তো অবাক, আমি কাজকারবার বুঝব কি রে ? এ বয়সে এসব আমার মাথাতেই ঢুকবে না।

নিমাই থমকে যায়। কথাটা ন্যায্য। তার বাবার পক্ষে হোটেল চালিয়ে রোজগার বজায় রাখা অসম্ভব ব্যাপার। মাথা আর শরীর দুটোতেই মরচে ধরেছে। নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে হতাশ গলায় বলল, আপনার জন্য যে কী করি!

পরদিন নিমাই তার ইনসুরেন্স পলিসি বের করে বাবার হাতে দিয়ে বলল, এটা হচ্ছে পলিসি। পলিসি বোঝেন তো!

তা বুঝি। মরলে তার আত্মীয়রা টাকা পায়।

বাস, সেটুকু বুঝলেই হবে। আমার যদি ভাল-মন্দ কিছু হয়, তাহলে সিদ্ধিনাথ দাসের কাছে কাগজখানা নিয়ে যাবেন। ত্রিশ হাজার টাকা পাওয়া যাবে। বুঝলেন ?

বাবা একটু রেগে গিয়েই বলে, ভাল-মন্দ হবে কেন রে ? বুড়ো তুই, না আমি ?

বাবা, আপনাকে সব কথা বুঝিয়ে বলা যাবে না। আমার একটা বিপদ হতে পারে। যদি-র কথাই বলছি। দোকানটার একটা বিলিব্যবস্থা করে রাখতে হবে। অবশ্য যদি শেষ অবধি দোকানটা রাখতে পারি। হয়তো বা বেচে দিয়ে আক্কেলসেলামী গুনতে হবে। বড্ড বিপদ যাচ্ছে বাবা।

বাবা ভাবল চোখে নেয়ে বলে, কিসের বিপদ বুঝিয়ে বলবি তো! অমন ভাসা-ভাসা বললে কি বুঝতে পারি ?

সে অনেক কথা। বলতে গেলে মহাভারত। মরতে আমার তেমন ভয় করে না। শুধু ভাবি, আমি মরলে আপনার কী হবে! কে দেখবে আপনাকে! টাকাটা হাতে পেলেও কি রাখতে পারবেন ?

তুই তো আমাকে গুণগোলে ফেলে দিচ্ছিস বাপ! আমার মাথাটা কেমন করে!

তাহলে আর বুঝে কাজ নেই। যা হওয়ার হবে। ভগবানকে ডাকুন।

নিমাই ভিতরে ভিতরে বড় উচটান। বর্ণগা থেকে আর কোনও খবর বার্তা নেই। কাকা এসেছিল দিন পাঁচেক আগে। এর মধ্যে সেখানে যে কী হচ্ছে, কে জানে। কাকা তাকে যেতে পইপই করে নিষেধ করে গেছে। নইলে সে গিয়ে ঠিক হাজির হয়ে যেত। কাকা লোক পাঠাবে, তার সঙ্গে যেতে হবে।

বাঁচার কোনও পথ দেখছে না নিমাই। বীণাপাণি যে গুণগোল পাকিয়ে রেখেছে তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনও উপায়ও দেখছে না সে।

নিমাইয়ের আজকাল ঘুম হয় না, সব সময়ে বুক কাঁপে, মাথাটা পাথরের মতো ভার হয়ে থাকে দুশ্চিন্তায়, বীণাপাণির ওপর কাকার বড্ড রাগ। দলের ছেলেরাও ক্ষেপে আছে। মেরে-টেরে ফেলল না তো! একটা লোভের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারল না বীণা। আর সেই লোভই ডেকে আনল সর্বনাশ। আবহমান কাল ধরে এই লোভ আর তার পরিণাম নিয়ে কত কত রামায়ণ মহাভারত লেখা হল, তবু মানুষ আজও কিছু শিখল না, পাঠ নিল না।

মাঝে মাঝে নিমাই একা একা কাঁদে। মাঝে মাঝে তার ইচ্ছে করে এই পাপ পৃথিবী ছেড়ে স্বৈচ্ছায় বিদায় নেয়, রেললাইনে কাটা গিয়ে কিংবা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে। কিন্তু সেটা আর এক দফা পাপ হবে বলে চিন্তাটা পুষে রাখে না সে। তার খাওয়া ঘুচে গেছে, মুখে কিছু রোচে না। শরীরটাও বেশ দুর্বল।

কাঁচরাপাড়ায় তার বন্ধুবান্ধব মেলাই হয়েছে। নিমাইয়ের কখনও বন্ধুর অভাব হয় না। সিদ্ধিনাথ একদিন বলল, ওহে নিমাই, ব্যাপারটা কি বোলা তো! কাজকারবার মন্দা যাচ্ছে নাকি ? মুখ শুকনো কেন ?

না, কাজকারবার ঠিকই আছে। নানা কথা ভেবে মনটা ভাল নেই।

সিদ্ধিনাথ ইনসিওরেন্সের দালালি করে। লোক ভাল। নিমাইয়ের তাকে খুব পছন্দ। সিদ্ধিনাথ বলল, নানা কথা ভাবো, সে জানি। ঘরের বউকে যাত্রায় নামিয়েছো, কাজটা ভাল করোনি। এ হল গিয়ে ঘোমটার নিচে খ্যামটা নাচ। তা তোমাদের সম্পর্কটা কোথায় দাঁড়িয়েছে বোলা তো!

সম্পর্ক আর কোথায় ?

আইনে যদি না আটকায় তো একটা কথা বলি।

কি কথা ?

অমন শুকনো মুখে থাকো বলেই বলছি। আবার সংসার করো। হাতে ভাল মেয়ে আছে। গোত্রের বর্গ একেবারে ঠিকঠাক।

সেইই স্থান মুখে একটু হেসে বলে, পেরে উঠব না ভাই। এক বিয়ের নাকে খত এখনও চলছে। তা হ্যাঁ হে সিদ্দিনাথ, তো মাঝে মাঝে বনগায়ে যাও, তাই না ?

যাই সানে ? হুগায় দু-তিনবার তো বটেই। আমাকে পেটের দায়ে চরকিবাজি করতেই হয়।

টাপেটোপে একটা খবর এনে দেবে ?

কিসের খবর ? তোমার বউয়ের নাকি ?

হ্যাঁ : তারই।

কী খবর চাও বোলা।

গুণু জেনে এসো সে কেমন আছে।

বাস ?

হ্যাঁ। বেঁচে আছে কিনা, সেইটেই জানা দরকার।

তার আবার মরার কি হল ?

শুনছিলাম তার বিপদ যাচ্ছে। খবরটা টাপেটোপে নিও। সে যেন টের না পায়।

আরে না : গোবিন্দ ঘোষ আমার বন্ধু মানুষ। চেনো তো তাকে!

খুব চিনি। বাজারে মুদির দোকান আছে তো!

সে-ই সে হল ওখানকার গেজেট। কালই খবর পেয়ে যাবে। তবে একটু রাত হতে পারে।

হোক। খবরটা রাতেই দিও। বড় অশান্তিতে আছি।

রাতটা আর দিনটা খুবই উষ্মের মধ্যে গেল নিমাইয়ের। পরদিন রাত প্রায় এগারোটো নাগাদ যখন দোকান খোলাই হচ্ছিল সেইসময় সিদ্দিনাথ এসে হাজির। তাকে দেখে হৃৎপিণ্ডটা একটা ডিগবাজি খেয়ে গেল।

কী খবর সিদ্দিনাথ ?

সিদ্দিনাথের মুখটা কিছু গম্ভীর। মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে বলল, তোমার বউ ওখানে নেই, কিছুদিন হল বাপের বাড়ি গেছে। তবে পালিয়েই যেতে হয়েছে। কাকার দল নাকি তাকে খুঁজছে।

পালিয়ে গেছে ?

কী করেছিল বোলা তো তোমার বউ ? কি সব টাকাপয়সা চুরির কথা শুনলাম।

ঠিকই শুনেছো। পরে বলব সব।

আর সজল বলে কে একটা ছেলে আছে শুনলাম, তোমার বউয়ের সঙ্গে ভাব ছিল। তাকে খুব মেরেছে দলের ছেলেরা।

কেন, সে কী করেছিল ?

ঠিক জানি না, বোধহয় বীণাকে সে-ই পালানোর পরামর্শ দিয়েছিল। তবে বীণা রেহাই পাবে না। তুমি বরং ওদিকে আর যেও না, বুঝলে ?

নিমাই কথাটা শুনতে পেল না। কাঁপা কাঁপা বুক নিয়ে শুকনো মুখে বসে রইল।

পরদিন দোকানটা সকালে চালু করে দিয়ে, বাবাকে ক্যাশে বসিয়ে, ঠাকুর চাকরকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। যা হওয়ার হবে, এ উদ্বেগ আর সহ্য হয় না।

বাস ধরে বনগাঁ পৌছাতে বেশী সময় লাগল না। বাস থেকে নেমে সে একটু দাঁড়িয়ে চারদিক দেখে নিল। এই বনগাঁ জায়গাটাই তার বন্ধু ছিল একসময়ে। আজ এই শহরে কি তার লাশ পড়বে ?

বাস-আড্ডার কাছেই কাকার ডেরা। রাস্তায় মেলা লোকজন যাতায়াত করছে। একটু দ্বিধায় জড়িত পায়েরা সে বাজারে পিছন দিকটায় কাকার ঘরে গিয়ে উঁকি দিল।

কাকা আর দুটো ছেলে বসে আছে মুখোমুখি।

কাকা, আমি নিমাই।

কাকা তার দিকে তাকাল। মুখে হাসি নেই, চোখেও নেই অভ্যর্থনা। কাঠ গলায় বলল, এসো নিমাই।

নিমাই জড়সড় হয়ে ঘরে ঢুকল।

তোমাকে আসতে নিষেধ করেছিলাম না ?

নিমাই তার শুকনো গলায় একটা টোক গিলে বলল, আসতে হল, মনে শান্তি পাচ্ছি না বলে।

বসো নিমাই।

নিমাই লক্ষ করল, ছেলেদুটো নতুন। খুব মস্তান মার্কা চেহারা। তাকে টেরিয়ে টেরিয়ে দেখছে।

কাকা ছেলেদুটোকে বিয়ের করে দিল। তারপর তার দিকে চেয়ে বলল, বীণা পালিয়েছে, জানো ?

শুনেছি।

ডলার আর পাউন্ড সব নিয়ে গেছে সঙ্গে করে।

কি করে বুঝলেন ?

আমরা ওর ঘরে হানা দিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি ঘরের মেঝে ভেঙেছে শাবল দিয়ে। বেশ বড় গর্ত হাঁ হয়ে আছে। চিড়িয়া উড়ে গেছে।

নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তাকে মুখোমুখি পাননি ? জিজ্ঞেস করেননি সব কথা ?

তোমার কাছ থেকে ঘুরে আসার পর একটা জরুরি কাজ পড়ে গিয়েছিল। তবে ছেলেদের বলেছিলাম বীণার ওপর নজর রাখতে। তারা নজর রেখেছিল বটে, কিন্তু পালিয়েছে ভোর রাতে।

এখন কী হবে কাকা ?

তাকে পেলে তো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার হবে। বীণা পালিয়ে বাঁচবে না, বরং ভূমি তার কাছে যাও। গিয়ে বোলা, ডলার আর গাউন্ডগুলো সে যদি ভালয় ভালয় ফেরত দিয়ে দেয়, তাহলে এখনও তাকে বাঁচিয়ে দেওয়া যায়।

নিমাই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, এ কাজ আমার দ্বারা হবে না কাকা। সে আমাকে মানবে না।

তাকে বাঁচানোর ওইটেই একমাত্র পথ।

আমি একটা পারব না কাকা। এই নিয়েই বীণাপাণির সঙ্গে আমার বনিবনা হয়নি। সে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

কাকা এবার একটু হাসল। বলল, তোমাকে একসময়ে আমার সন্দেহ হয়েছিল নিমাই। কিন্তু ভেবে দেখলাম, সন্দেহটা অমূলক। ভূমি ঠিক সেরকম ফেরেবাজ বোধহয় নও।

নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বাঁচালেন কাকা, কলঙ্ক নিয়ে মরতেও বড় জ্বালা। তবে বীণার পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে আমি রাজি।

তা কি হয়? একজনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আর একজনকে দিয়ে হয় না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে নিমাই। তারপর বলে, আমি বীণার ঘরখানা একটু দেখে আসতে পারি?

যাও না। পাশের বাড়িতে চাবি আছে।

আপনি কি আমার সঙ্গে যাবেন?

আমি গিয়ে কি করব?

চলুন একটু ঘুরে সব দেখে আসি।

চলো তাহলে। বলে কাকা উঠল।

রিকশা করে দশ মিনিটের মধ্যেই বাড়ি পৌঁছে গেল তারা।

বাড়িখানা ভালই করেছে বীণা। দেওয়াল দিয়ে ঘর তুলেছে নতুন করে। পাকা মেঝে। একখানা দাওয়া হয়েছে। বেশ দেখাচ্ছে। শুধু সুখটা তার সইল না।

কাকা চাবি আনিয়ে ঘরে ঢুকল। পশ্চিম-উত্তর কোণে গর্তটা দেখিয়ে বলল, দেখে কাও!

গর্তটা ভাল করে দেখল নিমাই। একখানা শাবল পড়ে আছে পাশে। গর্তের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে নিমাই কিছু একটা খুঁজছে।

কি খুঁজছে?

মাপটা দেখছি।

কিসের মাপ?

গর্তের মাপ।

কেন বোলা তো!

নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আগের গর্তটা এখানে ছিল না। মাপটাও বড় ছিল।

কোথায় ছিল গর্তটা?

ওই দিকটায়। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। ওদিকটা আমি একটু খুঁড়ে দেখব কাকা?

তোমার কি ধারণা মালটা এখানেই ফেলে গেছে বীণা? তাহলে গর্ত খুঁড়ল কেন? ও জিনিস ওর সঙ্গেই আছে।

নিমাই খুব বোকাম মতো মুখ করে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, সঙ্গেই থাকার কথা। তবে কিনা আপনার ছেলেরা নগ্নর রাখছে টের পেয়ে সে জিনিসটা সঙ্গে নাও নিতে পারে। ধরা পড়লে তো হয়েছে গেল। তাই হয়তো বুদ্ধি খাটিয়েছে। সাপও মরল, লাঠিও ডাঙল না।

সেটা কিরকম?

ঘরে যে খানাতল্লাসি হবে সেটা বীণা জানে। তাই গর্তটা করে রেখে গেছে যাতে আপনার মনে হয় যে, মাল হাপিস হয়েছে।

ও বাবা! এ যে সামাজিক কথা বলছে!

লোভ মানুষকে দুটু বুদ্ধি জোগায়।

তাহলে ওদিকটা খুঁড়েই দেখ। যদিও আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি, তবু দেখ।

নিমাই শাবলটা নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মেঝেটা আগে ভাল করে দেখে নিল। তার চোখ খুবই ভাল। দেখতে পেল, একটা জায়গায় একটা টিপ ছাপ আছে। খুব হালকা, প্রায় চোখেই পড়ে না। গাথনি খুবই কাঁচা। সামান্য সিমেন্ট আর মেলা বালি দিয়ে সস্তায় কাজ সারা হয়েছে। নিমাই অল্প পরিশ্রমেই গর্ত করে ফেলতে পারল। তারপর ভিতরে হাত ঢুকিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করে প্রান্তিকে জড়ানো স্টেনলেস স্টিলের কৌটোটা বের করে আনল। তার হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। বুক কাঁপছে। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।

কাকা অবিশ্বাসের চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল নিমাইয়ের দিকে। মুখে বাক্য নেই।

নিমাইও কথা কইতে পারল না কিছুক্ষণ। তারপর স্থবির গলায় বলল, এই নিন। বোধ হয় এটাই।

দু'হাতে জিনিসটা বাড়িয়ে ধরল নিমাই। চোখে জল।

কাকা হাত বাড়িয়ে নিল। তারপর চৌকিতে বসে ধীরে ধীরে প্রান্তিকের মোড়ক খুলল। কৌটোর ঢাকনা খুলে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। কৌটোটার ভিতরে প্রান্তিকে মোড়া ঠাসা ডলার আর পাউন্ডের নোট। কাকা নোটগুলো বের করল, নীরবে গুনল। তারপর নিমাইয়ের দিকে চেয়ে বলল, সব ঠিক আছে নিমাই।

ঠিক আছে? বলে নিমাই মাথা নেড়ে বলল, কিছুই ঠিক নেই কাকা। মানুষ ঠিক নেই। মতলব ঠিক নেই। বুদ্ধি ঠিক নেই।

তুমি বড্ড ভেঙে পড়েছো নিমাই। বসো, দম নাও!

নিমাই মাথা নেড়ে বলে, কটাই বা টাকা বলুন! তার জন্য গুনোগার কত দিতে হল! মানুষ খুন হল, স্বামী-স্ত্রী ছাড়াছাড়ি হল, উদ্বেগ অশান্তি সন্দেহ কত কী দেখা দিল! তবু বীণাপাণি লোভ ছাড়তে পারেনি। হিসেব করে বলবেন তো, এই বিলিতি টাকায় আমাদের কত টাকা হয়।

হিসেব করতে হবে। তবু অনুমান পঞ্চাশ হাজারের মতো হবে।

বাস! বলে চোখ বুজল নিমাই।

কাকা একটু হাসল, আজ সত্যি করেই বলছি, তোমার মতো মানুষ আমি আর দেখিনি। আমি পাণীতাপী লোক বটে, কিন্তু যে ভাল, তাকে ভাল বলতে জানি।

হাত জোড় করে নিমাই বলল, দোহাই কাকা, আমার প্রশংসা করবেন না। ও শুনলেও পাপ হয়। কাজ হয়ে গেছে, এবার তবে আসি গিয়ে আমি।

আরে পাগল! এত সহজে ছাড়ব নাকি তোমায়? চলো, আমার ওখানে বসে একটু চা-মিষ্টি খেয়ে যাবে।

এসব আমার গলা দিয়ে নামবে না কাকা। আজ মাথাটা বড় চক্কর দিচ্ছে। বুকটাও হালকা। এখন বীণা আমাকে শত শাপশাপাশ করলেও কিছু না।

বান্ধটা আবার প্রাচিকে মুড়ে নিল কাকা। তারপর বলল, বীণার একটা ছেলের সঙ্গে নটঘট ছিল, জানোই তো! তাকে খুব মারধর করা হয়েছে। ছোকরা হাসপাতালে পড়ে আছে। এসব কাণ্ডের পর বীণাকে আর বনগায়ে থাকতে দেওয়া মুশকিল হয়ে দাঁড়াল।

নিমাই কাকার হাত দুটো চেপে ধরে বলল, ওকে মাপ করে দিতে হবে কাকা। আপনি যদি রক্ষা করেন তো কেউ ওর ক্ষতি করবে না, প্রাণটা রক্ষা করুন।

কাকা হাসল, তুমি কি বীণাকে এখনও এত ভালবাসো?

ভালবাসা জিনিসটা কিরকম তাই জানি না। আমার ওর ওপর কোনও দাবিদাওয়া বা লোভ নেই কাকা, তবে সে আমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছিল। রোগেভোগে যখন মরতে বসেছিলাম, তখন বীণা না বাঁচালে বাঁচা যেত না। সেই ঋণটা শোধ হওয়া দরকার।

কাকা একটু ভেবে বলল, আজ দলের সবাইকে ডেকে ঘটনাটা বলব, তারপর একটা কিছু স্থির করতে হবে। যাত্রার দলে বীণাকে আর রাখতে চাই না। তার বদনাম হয়ে গেছে।

সে আপনি যা ভাল বুঝবেন, করবেন। শুধু প্রাণে মারবেন না।

না, সে ভয় আর নেই। বীণাও শিগগির এদিকে আসবে বলে মনে হয় না।

নিমাই মাথা নেড়ে বলল, আসবে। ঠিক আসবে।

কি করে বলছো?

ডলার আর পাউণ্ডের লোভে আসবে ঠিকই। তবে দিনের আলোয় নয়, রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে আসবে। আমার ভয় তখন যদি আপনার দলের ছেলেরা তাকে ধরতে পারে তো বিপদ ঘটবে।

কাকা মাথা নেড়ে বলে, না। আমি বারণ করে দেবো। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

আর সজলবাবুকে সে যদি বিয়ে করতে চায় তো করতে পারে। যদি দেখা হয় তো বলে দেবেন।

এত বড় কথাটা বলতে বলছো!

বলছি। সে যাতে খুশি হয় তাই করুক। আমার আর কিছু এসে যায় না। আমি আসি গিয়ে কাকা?

চলো, তোমাকে বাসে তুলে দিয়ে আসি।

চলুন।

বাস স্ট্যান্ডে এসে নিমাই বাস ধরে ফিরে এল।

মনটা ভাল নেই। মানুষ পাপের জঞ্জাল জমিয়ে তোলে। একটা জঞ্জাল সাফ হয়, তারপর ফের জমে যায়।

ফিরে এসে কাজকর্ম মন দিল নিমাই।

বাবা বলল, ওরে, আর কতকাল আমাকে এখানে ধরে রাখবি? আমার এখানে মন বসছে না।

নিমাই বলল, চলুন, আজই পালপাড়ায় রেখে আসি আপনাকে।

সক্বেবেলা ফিরে এসে দেখল দোকানে রামজীবন বসে আছে।

আরে, আপনি কখন এলেন, বলে পায়ের ধুলো নিতে গেল নিমাই।

তাকে ধরে ফেলে রামজীবন বলল, বিকেল থেকে বসে আছি। সামনের সপ্তাহে আমাদের গৃহপ্রবেশ। বাবা তোমাকে নেমস্তন্ন করতে পাঠাল।

আমাকে? বলে নিমাই অবাক।

তোমাকেই। বড়দা বিরাট বাড়ি বানিয়ে দিয়েছে। মা বাবা থাকবে, দেখলে তাক্সব হয়ে যাবে।

কিন্তু—বলে নিমাই ঘাড় চুলকালো।

ওজর আপত্তি শুনতে আসিনি। তোমাকে যেতে হচ্ছে।

নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বীণাপাণি কি এখন ওখানে আছে?

আছে।

আপনাকে একটা কথা বলব?

বলেই ফেল।

তাকে বলবেন বনগায়ে গুণ্ণগোল মিটে গেছে।

কিসের গুণ্ণগোল?

ছিল একটা। সে ইচ্ছে করলে ফিরে যেতে পারে।
 রামজীবন একটু ভেবে বলল, হ্যাঁ। বীণাও বলছিল বাটে। ওর একবার বনগাঁয়ে যাওয়া দরকার।
 বলবেন যেন নির্ভয়ে যায়। কেউ কিছু বলবে না।
 আচ্ছা বলব। তাহলে আসি। তারিখটা মনে রেখো।
 যে আজ্ঞে। মনে থাকবে। তবে একটু বসে যান।
 বেশ কারবারটি ফেঁদেছো তো! ভালই চলছে দেখছি। সঙ্গে থেকে তো খন্দ্রের কামাই দেখছি না।
 চলে যাচ্ছে।
 আমিও দোকান করছি। কিরকম চলবে কে জানে। গাঁয়ে গজ্ঞে দোকান চালানো কঠিন।
 নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, যে আজ্ঞে।
 রামজীবনকে মাংস পরোটা ঠেসে খাইয়ে দিল নিমাই। রামজীবন মহা খুশি। বলল, ওঃ, অনেকদিন এরকম ভাল রান্না খাইনি। তাই বলি, দোকান এত চলে কেন?
 রামজীবন চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল নিমাই। গৃহপ্রবেশে সে যাবে না। সম্পর্কই চুকে গেছে।
 যাবে কেন? তবে স্বস্তির লোকটা বড় ভাল।

॥ ৯৬ ॥

মণীশের বাক্যহীন চেয়ে-থাকাটা আজকাল সহ্য করতে পারে না অপর্ণা। মণীশ রোগা হয়ে যাচ্ছে। চোখের নিচে কি কালিও পড়ছে? দুর্বল হৃদযন্ত্র নিয়ে মণীশের বেঁচে থাকা, আর ওপর যদি ওরকম বিষণ্ণতা চেপে বসে মাথায় তা হলে কি ভাল?

এ কথা ঠিক। যে বুঝকা আই আই টি-তে চলে যাওয়ার পর সকলেরই মন খারাপ। বাড়িটা হাঁ-হাঁ করছে ফাঁকা। তবু লোকে সব অবস্থাই তো সামলে নেয়। মণীশ পারছে না কেন?

জয়েন্ট এন্ট্রান্স পাশ করে বুঝকা যখন হস্টেলে গেল তখন আর এক উদ্বিগ্ন পেয়ে বসেছিল মণীশকে। আই আই টি-তে ভীষণ র‍্যাগিং হয়। মণীশ উদ্বিগ্নে প্রায় পাগল হয়ে বুঝকার সঙ্গে চলে গেল খড়গপুরে। হোটেলে রইল কয়েকদিন, যাতে বিপদে পড়লে বুঝকা তার কাছে পালিয়ে আসতে পারে। বুঝকা অবশ্য পালিয়ে আসেনি। র‍্যাগিং সহ্য করেছে এবং তারপর সকলের সঙ্গে মিশেও গেছে। ছেলের র‍্যাগিং নিয়ে এমন চিন্তায় পড়েছিল মণীশ যে, ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল। র‍্যাগিং-এর ভয় গেছে, কিন্তু মণীশ এখনও বুঝকার অভাবটা সামলে উঠতে পারছে না।

হ্যাঁ গো, ছেলে কি কারও বিদেশে যায় না। সবসময়ে বুকে আগলে থাকা যায় বুঝি? ছেলের ভবিষ্যৎ বলে কি কিছু থাকবে না?

মণীশ এ কথার সরাসরি জবাব দেয় না, কিন্তু চেয়ে থাকে শূন্য চোখে। তারপর বলে, নাউ হি ইজ অ্যান অ্যাডাল্ট। বড় হয়ে গেল!

সেটা কি কোনও ট্রাজেডি? ছেলে বড় হচ্ছে এটা তো আনন্দের কথাই গো!

মণীশ মাথা নেড়ে বলে, ঠিকই তো। বড় হওয়ারই তো কথা। কিন্তু এই যে আলাদা হয়ে গেল, এই কিন্তু ছাড়াছাড়ি শুরু।

সে আবার কী কথা! ছাড়াছাড়ির কী আছে? পাশ করে চলে আসবে।

না অপু, পাশ করে চাকরি করবে, হয়তো বিদেশে যাবে, তারপর বিয়ে করবে, তারপর আমার বুঝকা আরও অনেকের বুঝকা হয়ে যাবে। কথাটা স্বার্থপরের মতো শোনাচ্ছে হয়তো, ঠিক বোঝাতেও পারব না। তবে বুঝকা যেমন আমার অন্তর্ভুক্ত ছিল ঠিক তা তো আর থাকবে না। নিজস্ব মতামত হবে, ব্যক্তিত্ব হবে, চরিত্র হবে। এ জেন্টলম্যান অফ হিজ ওন।

সেই জন্য তুমি মন খারাপ করে আছো? আচ্ছা পাগল তো! তুমি নিজেরও তো বড় হয়েছো, আলাদা হয়েছো, তাতে কী অসুবিধে হল শুনি!

মণীশ মৃদু একটু হাসি মুখে টেনে বলে, বুঝকা আমার এত ক্রোজ ছিল বলেই বোধহয় বড় কষ্ট হচ্ছে।

তুমি বাপু বড় নরম। যা ভেবেছিলম তোমাকে তার চেয়েও অনেক বেশি নরম।

দুর্বল, তাই না?

তাও।

হ্যাঁ অ্যাটাকটা হওয়ার পর থেকেই আমার এরকম একটা ব্যাপার হয়েছে। বুঝকার বিয়ের কথা মনে হলে বা বুঝকা চাকরি করতে বাইরে যাবে ভাবলে কেমন যেন রি-অ্যাকশন হতে থাকে। মনে হয় ওদের দূরে কোথাও যেতে না দেওয়াই বোধহয় ভাল।

তোমার এ সব কথা বুঝকার কানে গেলে ও কিন্তু পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে চলে আসবে। হস্টেলে যাওয়ার সময় লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছে, তা জানো?

জানি অপু। তুমি ভেবো না। আমাকে একটু সময় দাও, ঠিক সামলে উঠব।

তোমার যা অবস্থা দেখছি আমার তো চিন্তা হচ্ছে। আমি তো মা, তবু তোমার মতো অবস্থা তো আমার হয়নি।

মণীশ একটু চুপ করে থেকে বলল, কাউকে কাছ-ছাড়া করতে ইচ্ছে হয় না। কেবল মনে হয়, আমার সঙ্গে যদি আর দেখা না হয়?

ছিঃ! ও কি অলক্ষণে কথা!

नानि

আগে

ঠিক ডিফাইন করা যাবে না। কিন্তু তোকে ঠিক আগের মতো দিদি-দিদি লাগছে না।
কিরকম লাগছে? পিসি-পিসি?
আরে নাঃ। মনে হচ্ছে তুই একটু পাল্টে গেছিস।
মাত্র এই কদিনে? তুই তো সবে এই সেদিন হস্টেলে গেলি!
তাই তো ভাবছি হোয়াট ইজ ডিফারেন্ট অ্যাবুটট মাই ডিয়ার দিদি?
অপর্ণা বলল, ঝুমকি তা হলে নিশ্চয়ই আরও রোগা হয়ে গেছে। হবে না! খাওয়া নিয়ে ওরকম বাজাবাছি যাদের থাকে তাদের শরীর শুকাবেই।
বুবকা বলল, না মা, দিদি আর শুকাবে কি করে? ও তো সম্পূর্ণ ডিহাইড্রেটেড। তা নয়, কিন্তু একটা অন্যরকম লাগছে, ধরতে পারছি না।
তোকে আর পঠিতী করতে হবে না। এই আপার খবর কি রে? পাশ করে তো দেখা করতে এল না!
পাশ করাটা ওর কাছে আবার একটা ব্যাপার নাকি? ও তো ডাক্তারিতে চান্স পেয়েছে।
সে তো জানি।
পড়ছে। পাশ-টাশ করে কোথাও সেবায় লেগে যাবে। ওর তো আমাদের মতো ক্যারিয়ারের ব্যাপার নেই, ওর হল মিশন।
কিরকম রেজাল্ট করেছিল?
ও বাবা, ও ছিল টুয়েলভথ। ভাল করে পড়লে ফার্স্ট হত।
তোর সঙ্গে আর তো দেখা হয় না!
না। তবে একটা চিঠি দিয়েছে।
কী লিখেছে?
হাই ফিলজফি। চিঠিটা আমি বাবার জন্য রেখে দিয়েছি। ওর ওই সব ফিলজফি বাবার খুব পছন্দ হবে।
মণীশ মৃদু হেসে বলে, ও মেয়েটাকে আমার খুব ভাল লাগে। বড় কিছু করবে দেখিস।
অপর্ণা বলল, বড্ড সাহস। মেয়েদের অত সাহস ভাল নয়।
বাড়ি ফিরে যখন সবাই এক প্রস্থ আড্ডায় বসল তখন বুবকা ফের বলল, দিদি, ইউ রিয়েলি লুক ডিফারেন্ট। তোকে আগে একটু কাঠখোঁট্টা লাগত, এখন লাগছে না।
ঝুমকি একটু নার্ভাস হাসি হেসে বলল, যাঃ, আমি বুঝি কাঠখোঁট্টা ছিলাম!
ছিল একটু।
আমি বদলাইনি মোটেই। বরং তুই একটু বদলেছিস। আগে কো-এডুকেশনে পড়তিস, একটু নরম ভাব ছিল। এখন হুমদো হুমদো ছেলেদের মধ্যে থাকিস, তাই তুই কাঠখোঁট্টা হয়েছিস।
বুবকা হাঃ হাঃ করে খানিকক্ষণ হেসে বলল, কথটা কিন্তু ঠিক। আমি এখন টোটাল ম্যাসকুলিন সারাউন্ডিংস-এ থাকি। মা নেই, অনু নেই, দিদি নেই, মেয়ে-বন্ধুরা নেই। কিন্তু ভালই লাগে।
অপর্ণা হঠাৎ বলল, তোর কার জন্য সবচেয়ে বেশি মন খারাপ লাগে?
বাবার জন্য অফ কোর্স। কিন্তু সকলের জন্যই। তবে কি জানো মা, এত বন্ধু আর অত পড়ার চাপ যে মন খারাপ-টারাপ সব উড়ে যায়। তারপর খেলাধুলা আছে, আড্ডা আছে।
মণীশ বলল, ইজ ইট থ্রিলিং?
ভেরি মাচ।
একটু গভীর রাতের দিকে যখন সবাই শুতে গেল তখন ঝুমকি এসে বুবকাকে ডাকল, এই ভাই, ঘুমিয়েছিস নাকি?
না রে। আজ এতদিন পরে বাড়ি এসে এত অস্থিত লাগছে যে ঘুম আসছে না। আয় না, গল্প করি।
ঝুমকি আলো না জ্বেলে চেয়ার টেনে বিছানার মুখে মুখি বসে বলল, আমাকে তোর অন্যরকম লাগছে কেন বল তো!
কি জানি রে দিদি, বুঝতে পারছি না।
তুই এমনভাবে বলছিলি যে আমার ভয় করছিল।
কেন, ভয়ের কি আছে?
কেমন মনে হচ্ছে, আমি বুঝি কোনও অন্যায্য করে ফেলেছি।
যাঃ, তোকে সেরকম লাগছে না মোটেই। মনে হয় তুই বোধহয় একটু ওয়েট গেন করেছিস। ওজন নিয়ে দেখিস তো।
তা হতে পারে।
সেটাই হবে।
ঝুমকি একটা শ্বাস ফেলে বলল, বাবা তোর জন্য খুব ভেঙে পড়েছিল, জানিস?
জানি, মা বলেছে। কিন্তু বাবা সামলেও গেছে। জীবনটা যে কত বড় তা বাড়িতে থাকলে বোঝা যায় না। হস্টেলে থাকলে বোঝা যায় খানিকটা।
কত বড় রে?
ঠিক আন্দাজ করা মুশকিল। এখানে তোরা আছিস, তুই, মা, বাবা, অনু সবাই মিলে কেমন একটা ঘেরটোপ। নিজেকে ঠিক স্বাধীনভাবে ফিল করা যেত না। আমি হয় কারও ছেলে, নয়তো ভাই, নয়তো দাদা। কিন্তু ওখানে তো তোরা নেই। হঠাৎ মনে হল অথৈ জলে পড়ে গেছি। তারপর ধীরে ধীরে মনে হতে লাগল, এই পৃথিবীটা অনেক বড় এবং এখানে তোরা ছাড়াও অনেক মানুষ আছে ঠিক বোঝাতে পারব না। হোয়েন আই অ্যাম অন মাই ওন তখন অন্যরকম ফিলিং হয়।

তোর ভাল লাগছে ওখানে ?

খুব ।

আমাদের ভুলে যাচ্ছিস না তো!

আরে নাঃ! দিদি, দাবা খেলবি ?

এত রাতে ?

আজ ঘুম আসবে না । আয় এক পাণ্ডি খেলি ।

ঠিক আছে ।

দাবায় দু'বার হেরে যখন মাঝরাতে ঘুমোতে গেল ঝুমকি তখন তারও ঘুম এল না । আজকাল মাঝে মাঝে এটা হয় । বুকের ভিতরে একটা হায়-হায়, শূন্য ভাব ভর করে থাকে । সে কি ধরা পড়ে গেছে বুঝকার চোখে ? তার গভীর গোপন একটা অন্তর্জগতের ঘটনা কি ছায়া ফেলছে তার মুখে বা শরীরে ?

অনেকক্ষণ জেগে শুয়ে রইল ঝুমকি । কাউকে সে কখনও বলতে পারবে না । মরে গেলেও না । চারুমাসি বিদেশে চলে যাবে, তারপর আর ও বাড়িতে যাওয়া হবে না । আর হয়তো দেখাই হবে না হেমাস্তর সঙ্গে ।

না হোক । দেখা হয়েই বা কী হত ? হেমাস্ত এখনও ডুবে আছে আকর্ষণ রশ্মির প্রেমে । রশ্মি বিয়ে করেছে শুনে প্রায় বিবাহী হয়ে গ্রামে গিয়ে থানা গেড়ে ছিল । আবার ফিরেছে বাটে, কিন্তু মেয়েদের আর লক্ষ্যই করে না সে । হয়তো মেয়েদের ঘেন্নাই করে মনে মনে ।

করুক, তাতে আর ঝুমকির কী ?

পরদিন বুঝকা সারাদিন বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখা করে এল । রাতের বেলা আড্ডা হল একটু । ভোর হতে না হতেই চলে গেল খড়গপুর । বাড়ি ফের ফাঁকা । এই ফাঁকাটা আর ভরাট হবে না সহজে । ফাঁকিই থেকে যাবে ।

ঝুমকি চাকরি ছেড়েছে । কম্পিউটার শেখা শেষ হয়েছে । মাঝে মাঝে প্র্যাকটিস করতে চারুশীলার বাড়ি যায় । চারুশীলা গোছগাছ শুরু করেছে । বলে, জানিস, আমার আর এ দেশ ভালই লাগছে না ।

তুমি তো সুব্রতদার সঙ্গে বিদেশেই থাকতে পারো ।

বিদেশেও কী বেশি দিন ভাল লাগে ভাবিস ? আমার মনটাই একটু চঞ্চল ধরনের । যখন ভাল না-লাগে তখন কোথাও ভাল লাগতে চায় না । আর নিজের ইচ্ছেয় জায়গা বদল করলে তো হবে না । ছেলেমেয়েদের পড়াশুনো আছে ।

ওদের বিদেশেই পড়াও না কেন ?

সুব্রত সেটা পছন্দ করবে না । মেয়েটাকে এবার আমেরিকায় ভর্তি করে দেবো ভাবছি । সুব্রতর খুব ইচ্ছেও ছিল । কিন্তু এখন বলছে, নাঃ, ওসব দেশে না রাখাই ভাল । কী যে করব বুঝতে পারছি না ।

তোমার যে কত সমস্যা ।

আমিই আমার সমস্যা ।

আর একদিন ঝুমকি গিয়ে কম্পিউটার খুলে বসেছে, চারুশীলা এসে হঠাৎ বলল, হ্যাঁ রে, তুই বিয়ে করছিস না কেন বল তো!

ঝুমকি অবাক হয়ে বলে, বিয়ে ? এখনই কিসের বিয়ে ?

এটাই তো বয়স ।

তোমার আমলে ছিল । এখন নয় ।

তোর কোনও অ্যাফেয়ার নেই তো ?

ঝুমকি লাল হয়ে বলল, থাকলে টের পেতে না ?

না । তুই ভীষণ চাপা ।

কাজ করতে দাও তো । বড্ড জ্বালাও ।

আমাকেও বলবি না ?

অ্যাফেয়ার নেই মাসি ।

বাজে কথা । তুই বলছিস না ।

তোমার কাছে কি কিছু লুকেই ?

চারুশীলা অন্য প্রসঙ্গে চলে যাওয়ায় সাময়িক রেহাই পেয়ে গেল ঝুমকি । কিন্তু দু'দিন বাদে আবার কথাটা উঠল । ঝুমকি বড্ড অস্বস্তি বোধ করে প্রসঙ্গটা উঠলেই ।

একদিন চারুশীলা করুক মুখ করে বলল, জানিস আমি আমার ওই পাগল ভাইটাকে বড্ড ভালবাসতাম । যতই গালাগাল করি আর বকি-খকি ওর মতো সাদা মনের মানুষ হয় না । কিন্তু ও বোধহয় সন্ধ্যাসী-টন্ধ্যাসীই হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত ।

ঝুমকি অবাক হয়ে বলে, কেন মাসি ?

তা যদি জানতুম তা হলে তো হতই । রশ্মি বিয়ে করেছে বলেই কি না জানি না, ও যেন কেমন বারমুখো আর উদাসীন হয়ে গেছে ।

ঝুমকির বুকাটা ধক ধক করছিল । বলল, ওঁদের মধ্যে কি খুব ভালবাসা ছিল মাসি ? আমার তো মনে হয় না । আমারও তা মনে হয় না । হেমাস্ত তো চিরকাল মেয়েদের ব্যাপারে উদাসীন । তবে কি জানিস, হয়তো রশ্মির বিয়েটা ওর পৌরুষে ঝাঁক দিয়েছে । তাই ওরকম হয়ে গেছে । মানুষের ভিতরের কথা কে জানতে পারে বল!

তুমি ভাল করে খোঁজ নাও । এত অনুমান করা কেন ?

কি করে খোঁজ নেবো বল তো । হেমাস্ত তো কলকাতায় থাকেই না । কখনও হিল্লি-দিল্লি করে বেড়ায়, কখনও গাঁয়ে গিয়ে বসে থাকে । আজকাল নাকি চাষবাস করছে, মাছ ধরছে, আরও কি কি সব করছে । কিন্তু বুঝতে পারছি না ।

ঝুমকি একটু চুপ করে থেকে বলল, ওসব করা তো খারাপ নয়।
কে জানে কী! তবে হেমাঙ্গ বড্ড পাল্টে গেছে। গত শনিবার এসেছিল। মুখে হাসি নেই, কথাবার্তা নেই। এমন এক
ভাল করে খেল না অবধি।

ওঃ। বলে ঝুমকি চুপ করে থাকে।

হেমাঙ্গর সঙ্গে তার আর কবে দেখা হবে তা জানে না ঝুমকি। কখনও দেখা হবে কি? মাঝে মাঝে তার মনে হয়
জীবনের নানা স্রোত ফেনা, ঘটনা বা ঘটনাহীনতার ভিতর দিয়ে হেমাঙ্গ বহু বছরের সেরে যাচ্ছে। সে কি কখনও জানবে না
টের পাখে যে একজন হৃদয় তার জন্য অপেক্ষা করে?

মুখ ফুটে কখনও বলতে পারবে না ঝুমকি। কখনও নয়। কাউকে নয়। কিন্তু হৃদয়ের কথা কি পৌঁছায় না তবু?

॥ ৯৭ ॥

সে বুঝতে পারছে ধীরে ধীরে এই পৃথিবীর রূপের জগৎ তার চোখের সামনে খুলে যাচ্ছে। খুব ধীরে ধীরে। অফিস
আর বাড়ি, টুর আর টাকা তাকে ক্রমে ক্রান্ত করে দিচ্ছিল। টাকার কুমিরদের সঙ্গে দিন-রাত ফন্দি-ফিকির করতে করতে
নিজেকে প্রায় কবর দিয়ে ফেলছিল হেমাঙ্গ। সেই কবর থেকে জীবনের ভার সরিয়ে সে কি একটু একটু করে উঠে আসছে
রোদে আর হাওয়ায়? এ কি তার উত্থান? লোকে বলছে, এ তার অধঃপতন, লোকে বলছে, এ তার পাগলামি। একটা
লম্বাটে ক্যাটারপিলার গোত্রের সরীসৃশ পোকাকে পেয়ারা গাছের ডালে আর পাতায় অনেকক্ষণ ধরে অনুসরণ করছিল তার
চোখ। সবুজ রঙের পোকাটার শুণ্ড দেহযন্ত্রটা লক্ষ করতে করতে বিশ্বাসে বৃন্দ হয়ে যাচ্ছিল সে। কত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের
সমাবেশ কত স্বচ্ছ ও শৌখিন তার চোখটা। শুণ্ড শরীরই তো নয়, ও তুচ্ছ পোকাটারও আছে বিপদ আঁচ করার অ্যান্টেনা,
আছে জৈব অনুভূতি, আছে ক্ষুধা ও প্রজনন, হয়তো আছে সন্তান পালন করার মতো দায়। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এইসব
পোকামাকড়কে যত দেখে সে ততই সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর এই জগৎ তার কাছে উন্মোচিত হয়। এর পরও আছে জীবাণুরা,
অনুরীক্ষণ ছাড়া যাদের দেখাই যায় না। অথচ জীবাণুরও আছে ইন্দ্রিয়সকল, আছে বংশবিস্তার, আছে নিজস্ব জগতের
অনুভূতি। কি করে এটা হয়? কে ঘটায় এই সমন্বয়? কে আছে এই মরকোট বা মেকানিজমের পিছনে? এই রহস্যের
কুলকিনারা না পেয়েই কি মানুষ অবশেষে ঈশ্বর নামক অলীককে কল্পনা করে নিয়েছিল?

অলীক! হবেও বা। তবে হেমাঙ্গ আজকাল এত সহজে কিছুই উড়িয়ে দিতে পারে না। আজকাল সে নদীর ধারে বসে
কত ভাবে। কত আকাশ-পাতাল চিন্তা করে। কোথাও পৌঁছায় না তার চিন্তা, কিন্তু হেমাঙ্গর তাড়া নেই। পৌঁছানো কি
একান্ত দরকার? থাকুক না কিছু অধরা!

আজকাল আসতে হয় উইক এন্ডে। গায়ে বেশি পড়ে থাকলে বিপদ আছে। মা রাগ করে। ছেলে বিবাগী হয়ে যাচ্ছে
এই ভয়ে মা কোমর বেঁধে লেগেছে তাকে গৃহবাসী করতে। পাত্রী দেখা চলছে খুব।

হেমাঙ্গ মাঝে মাঝে একা একা হাসে। তাকে পাত্রীস্থ করে কোনও লাভ হবে কি? বরং বউ হয়ে যে আসবে সেই
মেয়েটা কষ্ট পাবে। হেমাঙ্গ কি সংসারী হতে পারবে কখনও? জগতের বিশালত্বে সে একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছে, এই
ছড়ানো হেমাঙ্গকে কি আর গুটিয়ে এনে ছোঁটো কৌটোর মতো সংসারে পুরে রাখা যাবে? তা হলে কি বাঁচবে হেমাঙ্গ?

বাবা মাঝে মাঝে তার কাছে এসে বসে থাকে। খুব ঠাহর করে লক্ষ করে তাকে। সতর্ক চোখে তাকে জরিপ করতে
করতে বলে, সন্নিহী হওয়াই কপালে লেখা আছে আপনার।

তাই নাকি?

তা নয় তো কি?

এ ঠিক সল্ল্যাস নয় বাঁকা মিঞা। নৌকো বার-দরিয়ায় গিয়ে পড়েছে। সহজে ফিরবে না। সেটা সল্ল্যাস নয়, বাউতুলে
হয়ে যাওয়া বলতে পারো।

সেটাই কি ভাল?

জীবনটা যে কত বড় তা বোঝা?

আমাদের বোঝায় কেডা?

ও বোঝানো যায় না, আপনি বুঝতে হয়।

তা বটে। আমাদের বুঝও যে বড্ড কম। তবে আপনার বড্ড বেশি।

আমার গায়ের বাস তো মার কাছে লাগিয়ে ভাঙিয়ে প্রায় তুলেই দিয়েছে তুমি। এর পর আরও কি চাও?

গায়ের বাস তুলে দিচ্ছি আপনার ভালর জন্যই। এর পর একেবারে লম্বীছাড়া হয়ে যাবেন যে! গায়ের লোক
আপনাকে আড়ালে কি বলে জানেন? বলে পাগলবাবু, অবশ্য আদর করছি বলে, আপনার ওপর কারও কোনও খার নেই।
তবে ওসব শুনতে কি আমার ভাল লাগে, বলুন!

হেমাঙ্গ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমি তো পাগলই। লোকে যখনই জীবনের সবচেয়ে সত্য বস্তুর সন্ধান পায়
তখনই কি করে যেন লোকের চোখে পাগল বা ম্যাপা বলে মনে হয় লোকটিকে।

তা সে লোকে যাই বলুক আমার কিছুই যায়-আসে না।

আরও একটা কথা। আপনার বাড়ির লোকের ধারণা হয়েছে, আপনি এই গাঁ-গঞ্জে একটা বিয়েসাদি করে বসবেন
হয়তো। তা হলে যোলো কলা পূর্ণ।

হেমাঙ্গ একটু অবাক হয়ে বলে, তুমি এটাও মাকে বুঝিয়েছ নাকি? তুমি তো মহা বিপজ্জনক লোক!

জিব কেটে বাঁকা বলে, মিছে কথা বলব আপনার নামে? ওসব নষ্টামো করতে যাব কেন? কিছু বলিনি। তবে
আপনাকে একটা বিষয়ে একটু সাবধান করে দিই। নগেন সামন্তর মেয়েটা বড্ড ঘুরঘুর করছে আজকাল। অত আসকারা
দেবেন না।

পারুল! সে তো পড়তে আসে মাঝে মাঝে।

বয়সের মেয়ে, বুঝলেন না! গা-গঞ্জ জায়গা, পাঁচটা কথা উঠে পড়বে।

হেমাঙ্গ অবাক হয়ে বলে, সে তো বাচ্চা মেয়ে! তোমরা কিরকম মানুষ বলো তো! ওটুকু মেয়েকে নিয়েও কথা হয়?

টুকু আবার কি? ঘোলা বছর বয়স হল।

ধুস! বারোর বেশি হতেই পারে না।

আপনার কি দেখার চোখ আছে? অত উদাস থাকলে ওরকমই হয়। ও মেয়ের বয়স পনেরো পুরে এই ঘোলা চলছে। সন্দের পর টর্চ বাতি নিয়ে পড়তে আসার অতি কি গরজ? আর পড়া মানে তো হাঁ করে আপনার মুখের দিকে চেয়ে থাকা। আপনি আর ওসব একদম ঘাড় নেবেন না।

হেমাঙ্গ একটু অসহায়ভাবে চুপ করে রইল। পারুল তার কাছে পড়তে আসছে মাত্র মাসখানেক হল। তাও সপ্তাহে মাত্র দু'দিন, শনি আর রবিবার, হেমাঙ্গ এখানে আসে। নগেন সামস্ত নিজেই নিয়ে এসে বলেছিল একদিন, বাবু, আমার মেয়েটা লেখাপড়ায় ভাল। সবাই বলে, মাথা আছে। ক্লাসে ফার্স্টও হয়। যদি আপনি একটু দেখিয়ে দেন তাহলে আরও ভাল করবে।

সেই থেকে একটু করে পড়ায় হেমাঙ্গ। মেয়েটার মাথা সত্যিই ভাল। গায়ে-গঞ্জে— কে জানে কেন— ছেলেমেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার চাড়া এবং মেধা নেই। এই মেয়েটার আছে দেখে হেমাঙ্গ একটু উৎসাহ বোধ করেছিল। পারুল দেখতে খুব সাদামাটা গৈয়ো আর পাচটা মেয়ের চেয়ে সামান্য আলাদা চেহারার। চোখে বুদ্ধির দীপ্তি আছে। কিন্তু তার বয়স এতই কম যে তাকে পুরুষের চোখ দিয়ে কখনও লক্ষ্যই করেনি হেমাঙ্গ।

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ভুলটা আমারই। গায়ের মেয়ের বয়স আর শহরের মেয়ের বয়সের যে আলাদা হিসেব সেটা মনে ছিল না, বুঝলে বাঁকা?

আপনার বরাবরই হিসেবের ভুল। অথচ আপনি নাকি হিসেবের ওস্তাদ।

হেমাঙ্গ একটু ভয়ে ভয়ে বলে, গায়ে কি পারুলকে নিয়ে কথা উঠেছে নাকি? না আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?

বাঁকা মিঞা ঘাড় চুলকে বলল, কথটা ওঠেনি, তবে উঠে পড়বে। আমি আপনাকে আগাম একটা ইঁশিয়ারি দিয়ে রাখলাম। সামস্তকেও বলে দিয়েছি যেন বাবুকে আর ডিস্টার্ব করা না হয়।

হেমাঙ্গ হেসে বলল, তুমি আমার মাকেও ছাড়িয়ে গেলে দেখছি।

আমি হলাম আপনার লোকাল গার্জেন। ঠাকরুন তাই বলে দিয়েছেন।

তা হলে তো কথাই নেই।

আপনি কিন্তু আমার প্রথম কথাতার জবাব দেননি। বলছি এ ভাবেই কি চলবে। সাধা-সন্ধ্যাসীই হয়ে যাবেন শেষ অবধি?

তা আর হতে পারলাম কই। সাধুরা তো জপতপ করে, আমি তো তা করি না। আমি শুধু পৃথিবীটা দেখি। চার দিকে কত রূপ বলো তো! ছোট্ট একটা পোকা, একটু ফুল, একটা পাতার মধ্যেও কত সূক্ষ্ম মেকানিজম আর এসথেটিক্স! তুমি দেখতে পাও না?

তা পাই, তবে আপনার মতো অমন মজে যাই না। শুধু দেখে বেড়ালে কি জীবন চলে? এবার একটু সংসারী হওয়ার কথাও ভাবুন।

হেমাঙ্গ শুধু হাসল, কিছু বলল না। বাঁকা মিঞা আরও কিছুক্ষণ সদুপদেশ দিয়ে উঠে গেল। লোকটা যে তাকে ভীষণ ভালবাসে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু ওর ভালমন্দের বোধটা অন্যরকম।

গতকাল শুক্রবার ছিল। অফিস থেকে দুপুরবেলা বেরিয়ে সে সোজা চলে এসেছে এখানে। এখানে যেন গাছপালা, পোকা-মাকড়, বাতাসটা অবধি তার জন্য অপেক্ষা করছিল। এসব কথা সে কাকে বোঝাবে? এখানে আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা, জলের লহরী, পাতার কাঁপন, উড়ন্ত পোকার পাখনায় আলোর বর্ণালী সে ছাড়া আর কে দেখবে? এখানে এসে সে কত শিখেছে, কত কি বুঝতে পেরেছে, অনুভূতি হয়েছে কত সূক্ষ্ম! তাকে কেন পাগল ভাবে লোক?

উঠানে নতুন শীতের সকালবেলার রোদ চাদরের মতো বিছিয়ে পেতে দিয়ে গেছে। সেই চাদরে গাছপালার ছায়ার নানা নকশা। উঠানে নিকানো, তরকতক। এ সবই করে বাসন্তী।

বাসন্তীর কথা ভাবতে ভাবতেই বাসন্তী চলে এল। একদিন বাসন্তীকে বলেছিল হেমাঙ্গ, হ্যাঁ রে, অত নোংরা উলানুগুলো হয়ে থাকিস কেন? পরিষ্কার থাকতে পারিস না? সেই থেকে বাসন্তী এখন ফরসা শাড়িই শুধু পরে না, চুল বাঁধে, মুখে বোধ হয় পাউডারও দেয়, তারপর আসে।

আজ এসেই বলল, ও দাদা, গত সোমবার থেকে ব্রাশ আর পেস্ট দিয়ে দাঁত মাজছি, তা জানো? কী ভাল গো স্বাদটা! মুখটা যেন মিষ্টি হয়ে যায়।

হেমাঙ্গ একটু হেসে বলল, তুই বোধ হয় দাঁত মাজতে গিয়ে পেস্ট একটু খেয়েও ফেলিস!

লজ্জা পেয়ে বাসন্তী বলে, দু-একবার কি আর গিলে ফেলিনি। তবে ব্রাশে বাপু মুখে বড় জ্বালা করে প্রথমটায়। ছড়ে গিয়েছিল। এখন অবশ্য সয়ে গেছে। মুড়ি এনেছি, এই দেখ। সকালে ভাজিয়ে আনলাম সুবাসীর বাড়ি থেকে।

এই বলে একটা প্রাস্টিক ব্যাগ তুলে তাকে দেখায় বাসন্তী।

হেমাঙ্গ নিশ্চুপ গলায় বলে, চা কর।

লহমায় চা করে নিয়ে এল বাসন্তী। সঙ্গে গরম মুড়ি, একটু তেল আর আদাকুচি দিয়ে মাখা, ওপরে কয়েক দানা বাদাম ছড়ানো। বাসন্তী রোজ সকালে তার সামনে বসে চা খায় আর আগড়ম-বাগড়ম বকে।

তোমার মুখখানা আজ শুকনো দেখাচ্ছে কিন্তু দাদা।

হেমাঙ্গ গভীর চিন্তামগ্ন ছিল, বলল, হাঁ।

আজ কী খাবে বলো তো!

খাওয়ার এখনও দেরি আছে। অত তাড়া দিস না।

জোগাড়যন্ত্র তো করতে হবে। ফুলু বেলা দশটা নাগাদ মাছ দিয়ে যাবে। শুধু মাছের জোল আর ভাত করলে হবে? সঙ্গে একটা ভাজাভুজি করে দেবোখন। হবে? বলো না!

খুব হবে।

বাসন্তী উঠে গেল। তার অনেক কাজ এখন। ঝাঁটপাট, বাসন মাজা, নিকানো, বিছানা তোলা। বাসন্তী গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে কাজ করে, দাঁড়িয়ায় বসে গুনতে পায় হেমাঙ্গ। ধীরে ধীরে উঠে সে চটিটা পরে বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে। ইট বাঁধানো বিচ্ছিন্ন ভাঙারো রাস্তাটা ধরে সে গাঁয়ের মধ্যে খানিকটা হেঁটে যায়। যত দিন যাচ্ছে তত লোক বাড়ছে। বছরটাকের মধ্যে ঘাটপাড়ে নুন নতুন কয়েকটা দোকান হল। খুবই দীন দোকান। তবু তো দোকান। মানুষ বাড়ছে, ফাঁকা জায়গা ভরাট হচ্ছে, অরণ্য বা চাষের জমি কেড়ে নিচ্ছে মানুষের বসত আর রুজিরোজগার। কৃষ্ণজীবন লড়াই করছেন বটে, কিন্তু লড়াইটা থেকে যাচ্ছে ওপর মহলে। এখনও সেই লড়াইয়ের কোনও প্রভাব এসে পড়েনি এলাকার এইসব মানুষের জীবনযাপনে।

হাঁটতে হাঁটতে বসতি ছাড়িয়ে পতিত জমি আর আগাছার জঙ্গলে এসে পড়ল হেমাঙ্গ। নিতাই সে নতুন নতুন জায়গা আবিষ্কার করে। একটা করে নামও দেয়। তারপর সেই দেওয়া নাম ভুলেও যায়।

ভাঙচোরা জমি হঠাৎ খাদের মতো ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে। নিচে ক্ষয় জমি, ঘাসপাতা, কিছু অখ্যাত গাছ। তেমন শ্রী নেই জায়গাটার। তবু সকালের রোদের ঐশ্বর্যের কিছু ঝলমল করছে। ঢালুর ধারে একটু ঘাস-জমি খুঁজে নিয়ে সাবধানে বসল হেমাঙ্গ। আজকাল সে আর সুন্দর জায়গা খোঁজে না, হতশ্রী জায়গাতেও সৌন্দর্যের সন্ধান করে। আজকাল এটাই তার হবি। তার জগৎ অনেক বড় হয়েছে।

পাখি ডাকছে। একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে উত্তর থেকে। আজ হেমাঙ্গর মন ভাল নেই। আজ হোক, কাল হোক, তাকে ঘরবন্দী করার চেষ্টা একদিন ফলবতী হবেই হয়েছে। নিজেকে সে আর বিশ্বাস করে না। রশ্মির প্রেমে পড়ে বিয়ে প্রায় করেছে ফেলেছিল আর কি। কী যে হত তা হলে! ভাগ্যিস রশ্মি বিলেতে ফিরে যাওয়ার বায়না ধরেছিল। ওই শর্ত উপেক্ষা করলে আজ রশ্মি তার বউ হয়ে যেত। কোথায় থাকত তার এই স্বাধীনতা?

থেকে থেকে একটা বিশ্রী পচা গন্ধ আসছিল। কুকুর বেড়াল কিছু একটা মরে পচছে কোথাও কাছপিছে। এই গন্ধটার মধ্যে কোনও সৌন্দর্য আবিষ্কার করার চেষ্টা বুধা। গৌ ধরে খানিকক্ষণ বসে থেকে উঠে পড়ল সে। হাঁটতে হাঁটতে নদীর বাঁধে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নদী তার অদ্ভুত লাগে।

পৃথিবীর সব সভ্যতা, সব বড় বড় নগরের পশ্তন হয়েছে কোনও না কোনও নদীর ধারে। নদী ছাড়া কোনও মহানগর নেই। কারণটা হয়তো নৌবাহনের সুবিধে। কিন্তু নদী হেমাঙ্গকে পাগল করে দেয়। নদীর ধারে এসে দাঁড়ানোমাত্র তার চোখ মুগ্ধ আর নিম্পলক হয়ে গেল।

মন কেন ভাল নেই তার? কিছুতেই বুঝতে পারছে না হেমাঙ্গ। ইদানীং মাঝে মাঝে এটা হয়। মনটা কেমন বিগড়ে বসে থাকে। খুব অস্থির আর হতাশ লাগে তখন। কারণ ছাড়া কিছুই হয় না। মন খারাপেরও কারণ একটা আছেই। কিন্তু কেন, ধরতে পারে না হেমাঙ্গ?

ঘুরে ঘুরে, অনেকটা হেঁটে, অনেকের সঙ্গে কথাটখা বলে সে যখন ফিরল তখন রান্না সেরে হাঁ করে বসে আছে বাসন্তী।

এই তোমার ফেরার সময় হল? কটা বাজে বলো তো! দেড়টা। এর পর কখন চান করে খাবে? অবলা হয়ে যাবে না?

হেমাঙ্গ একটু হাসল, অত ছড়ো দিস না। ছুটির দিনটা একটু আমার মতো থাকতে দে।

আমার খিদে পায় না নাকি?

খেলিই পারতিস।

ও-বাবা! তোমার খাওয়া হয়নি আর আমি রান্নাশ্রী গিলতে বসব? যাও চান করে এসো গে।

একটু চা খাওয়াবি না?

চা? উঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারি না। বউ হলে তাকে জ্বালিয়ে খাবে বাপু।

বাসন্তী চা করে দিল অবশ্য। স্নান করে আসার পর ভাত বেড়ে দিল। তারপর বলল, হ্যাঁ দাদা, আমার কিছু একজনকে খুব পছন্দ।

অন্যমনস্ক হেমাঙ্গ মুখ তুলে বলল, কাকে পছন্দ হল আবার? তোর তো এখন একটা বর আছে।

আহা, আমার কথা বললাম নাকি?

তবে কার কথা?

তোমার কথা গো! তোমার জন্য একটা পাত্রী আমার পছন্দ হয়েছে খুব।

যাক বাবা। আমি ভাবলাম তোরই বোধ হয় আবার কাউকে পছন্দ হল!

আমার কথা বাদ দাও। এই মরদটাও দেখো, কিছুদিন পরই পিঠটান দেবে। ভাবগতিক ভাল নয়। কাজকর্মও তো নেই। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা সারা দিন।

ওরকম লোককে বিয়ে করল কেন?

না করে কী করব? কোন জজ-ব্যারিস্টার জুটবে এই পোড়া কপালে? এ-সবই জোটে এসে।

ঘরামী না কী যেন বলছিল!

ঘরামীই। কিন্তু কাজ নেই হাতে।

কোথা থেকে জোটালি ?
ঘাট পেরোনোর সময় ভটভটিতে আলাপ হয়েছিল ।
বাস! অমনি বিয়ে করে বসলি ?
অত অবাক হলো না তো । ওরকম হয় । আমাদের সব সয়ে গেছে ।
হোমস মাথা নেড়ে বলে, এটা কিন্তু ভাল নয় । বিয়ে কি এত সহজ ? জলভাতের মতো ? আমরা তো একটা বিয়ের
কথা ভাবতেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে ।
তোমার আবার সবভা'তেই বেশি বেশি ।
কী যেন বলছিলি ?
সেই রোগা মেয়েটা এসেছিল না, সে কিন্তু খুব সুন্দর!
কোন রোগা মেয়েটা ?
ঝুমকি গো!
হোমস একটা বিষম খেল । তারপর বলল, ওঃ, তাকে বুঝি তুই খুব সুন্দর দেখিস ?
সুন্দর নয় ?
হোমস ভাতটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, তাতে আমার কী ?
ওকে তোমার পছন্দ নয় ?
পছন্দ করে কী করব রে ? সে তো আর আমাকে পছন্দ করেনি ।
কী করে বুঝলে ?
ওসব বুঝতে কি দেরি হয় রে ।
তার বুঝি কেউ আছে ?
থাকতেই পারে ।
আমার মনে খুব ইচ্ছে, ওর সঙ্গে তোমার বিয়ে হোক । রশ্মিও খুব ভাল ছিল, কিন্তু বড্ড মেমসাহেবের মতো দেখতে ।
তাকে বুঝি তোর পছন্দ ছিল না ?
ছিল । তবে কেমন যেন একটু বিলিতি গন্ধ । এ মেয়েটা কেমন আটপৌরে ।
হোমস হেসে বলে, আটপৌরে মানে জানিস ?
ওই কথার কথা একটা ।
খাওয়া সেয়ে একটু উঠানের রোদে চেয়ার পেতে বসে থাকে হোমস । বাসন্তী চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরে অবধিও
তার কথাটা কানে বাজতে থাকে হোমসর । সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাত্র ।
চেয়ারে বসেই ভাতঘুমে কিছুটা আশ্রম হয়ে পড়েছিল সে । হিজিবিজি স্বপ্ন দেখছিল । তাদের বিভ্রম স্ট্রিটের বাড়ির
পাশেই নুটুবাবু বলে একজন থিয়েটারের লোক থাকে । পাড়ার লোকে বলে, নুটুবাবু নাকি মেয়ের দালাল । স্বপ্ন দেখল,
সেই নুটুবাবু বিয়ে করে ফিরেছেন । সঙ্গে নতুন বউ নিয়ে গাড়ি থেকে নামছেন । হোমস দেখল নতমুখী বউটি ঝুমকি ।
হোমস চোঁচাতে লাগল, ঝুমকি! পালিয়ে যান, এ লোকটা ভাল নয়! ঝুমকি তার দিকে চেয়ে একটু হাসল ।
কে জানে কেন স্বপ্ন দেখে মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল তার ।
পরদিন সারাক্ষণ মনটা বিগড়েই রইল । একটুও ভাল লাগল না । বিকেলের দিকে কলকাতা রওনা হল সে ।
সোমবার অফিস করে হঠাৎ অনেকদিন বাদে সোজা গাড়ি চালিয়ে চলে এল চারুশীলার বাড়ি ।
যাক বাবা, এতদিনে আমাকে মনে পড়ল ? দাঁড়া শীখ-টাখ বাজাই ।
হোমস একটু হাসল, গরিবদের কথা ভাবিস তা হলে ?
তুই গরিবদের চেয়েও খারাপ । তুই একটা ইডিয়ট ।
তাও বটে, এখন ভাল-মন্দ কিছু খাওয়া তো!
কেন, ভালমন্দ খাওয়ানোর জন্য আমি কেন ? বিয়ে করে বউ আন, সে খাওয়াবে ।
বউরা কি ভালমন্দ খাওয়ায় ? ওরা তো আটপৌরে ।
ইস্, কথা শিখেছে! আটপৌরে!
হ্যাঁ রে, ঝুমকি কোথায় বল তো!

॥ ৯৮ ॥

লোকটা বিনীতভাবে নমস্কার করে বলল, আপনি এই গ্রামের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন, আমরা তার কী প্রতিদান দিতে
পারি ? কত সামান্য আমরা । এই গ্রামের কোনও গৌরব কখনও ছিল না । আপনার সুবাদে আজ আমরা বলে বেড়াই এ হল
কৃষ্ণজীবন বিশ্বাসের গ্রাম ।

কৃষ্ণজীবন অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে বলল, গৌরব! গৌরবের কি আছে ? আমি সামান্যই করতে পেরেছি । কত কী
পারিনি ।

আপনার কৃতিত্ব কতখানি তার পরিমাপ করার মতো শিক্ষাও তো এ গাঁয়ের মানুষদের নেই । তারা শুধু জানে,
কৃষ্ণজীবন বিশ্বাস এখন মস্ত মানুষ । তবে আমি আপনার বইখানা পড়েছি । মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে, মনটা যেন কেমন হয়ে
যায় । অদ্ভুত আপনার ভাষা, তেমনি পর্যবেক্ষণ ।

কৃষ্ণজীবন খুশি হয়ে বলল, আমার বই আপনি কোথায় পেলেন ? এ দেশে তো বিশেষ পাওয়া যায় বলে শুনিনি ।

লোকটি অমায়িক হেসে বলে, পেপারব্যাক এডিশন বেরোলে হয়তো আসবে। এখনও আসেনি। তবে আমার এক ভাগ্নী নিউ জার্সিতে থাকে। তাকে আপনার বইটির কথা লিখেছিলাম। সে নিয়ে এসেছিল।

একটা তৃপ্তির শ্বাস ছাড়ল কৃষ্ণজীবন। সে খ্যাতি চায় না, প্রচুর টাকাও করতে চায় না, সে চায় তার কথা লোকে শুনুক, বুঝুক। সে তো এই পৃথিবীর মঙ্গল চায়, মানুষের জন্য চায় একটি সবুজ দৃশ্যমুক্ত পৃথিবী। সে চায় দোলনের নিরাপদ বড় হওয়া। ভাবীকালের মানুষেরা যেন তাদের অভিশাপ না দেয়।

লোকটি বলল, আপনার বাবাকে গত তিন দিন ধরে আমি বইয়ের বিভিন্ন অংশ অনুবাদ করে শুনিয়েছি। উনি খুব খুশি হয়েছেন।

কৃষ্ণজীবন আবেগে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। বাবাকে যে এ বইটির কিছু অংশ শোনানো দরকার এটাই তার মনে হয়নি। সে গাড় কণ্ঠে বলল, বড় ভাল করেছেন। কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেবো!

কী যে বলেন! এই বইটির কথা আমি অনেককে বলেছি। কিন্তু গ্রামের লোক তো ইংরিজি পড়তে পারে না। আপনি বরং এর একটা বাংলা ভাষা বের করুন।

কৃষ্ণজীবন স্নান হেসে বলে, বাংলা এডিশন বেরোলেও গ্রামের লোক পড়বে না। প্রথমত, তাদের বই পড়ার অভ্যাস নেই, দ্বিতীয় তাদের বই কেনার মতো সামর্থ্য নেই।

লোকটি মাথা নেড়ে বলল, ঠিক কথা। তবু বলি, ধীরে ধীরে এই বইয়ের কদর বাংলাতেও হবে। আমাদের গ্রামগুলোতে সভ্যতার কোনও খবরই পৌঁছতে চায় না। বড় পিছিয়ে আছে সব কিছু। তবু যদি লাইব্রেরিতে এক-আধ কপি করে রাখা হয় তা হলে এক-আধজনও তো পড়বে।

কৃষ্ণজীবন একটু হেসে বলল, আপনি এই বইয়ের প্রচার নিয়ে ভাববেন না। এ দেশের লোক আজ পর্যন্ত কারও কোনও শিক্ষাই নেয়নি। আমরাটাও নেবে না। ভাল কথা শোনে, বুঝতেও পারে, কিন্তু কাজের সময় পাশ কাটিয়ে যায়।

লোকটি বিনীত হেসে বলে, তবু কি হাল ছাড়লে চলবে?

কৃষ্ণজীবন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমার প্ল্যান কী ছিল জানেন? গান, যাত্রা, নাটক কবিগানের ভিতর দিয়ে এ সব মানুষকে শেখাবো। গাছ কেটে না, পৃথিবীকে দৃশ্যমুক্ত রাখো। কিন্তু পরে হাল ছেড়েছি। দেখলাম এরা এন্টারটেনমেন্টটা নেয়, শিক্ষাটা সাবধানে মাছের কাঁটার মতো বেছে ফেলে দেয়। •

লোকটি এ কথায় যেন একটু চিন্তিত হয়ে কৃষ্ণজীবনের মুখের দিকে চেয়ে রইল। মাত্র কয়েকদিন আগে লোকটির সঙ্গে পরিচয়। পটলের স্কুলের হেডমাস্টারমশাই। বহুর দুই আগে চাকরি নিয়ে এসেছে। একটু আত্মভোলা, পড়ুয়া ধরনের মানুষ। আশ্চর্যের বিষয় এর লেখাপড়া এবং জ্ঞান বেশ বিস্ময়কর। সতীশ ঘটককে কৃষ্ণজীবনের ভালই লাগে।

সতীশ ঘটক ওপর-নীচে মাথা নেড়ে বলল, হিন্দি সিনেমা আর ভিডিওর অত্যাচারও কম নয়। মানুষগুলোকে বড় ভোঁতা করে দিচ্ছে। গ্রামে আজকাল চিন্তাশীল, সচেতন লোক নেই। একটা কালচারাল গ্যাপও ঘটে যাচ্ছে। আপনার মতো মানুষকেই গ্রামে দরকার ছিল। কিন্তু গ্রাম আপনাকে তো কিছুই দিতে পারবে না। না চাকরি, না মর্যাদা।

সতীশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

কৃষ্ণজীবন উদাস গলায় বলল, আপনি জানেন না এই বিষ্ণুপুর শীতলাতলা আমাকে কত দিয়েছে আমার জীবনের বোধটাই তৈরি হয়েছিল এখানে। কিন্তু আপনার কথাও মিথ্যে নয়। বিষ্ণুপুর আজ আর আমাকে তেমন কিছু দিতে পারে না। তবু বিষ্ণুপুর আমার সঙ্গেই থাকে, পৃথিবীর যেখানেই যাই বিষ্ণুপুরের সঙ্গে মিলিয়ে সব কিছু দেখি। আপনাকে ঠিক বুঝিয়ে উঠতে পারব না।

আমি বুঝতে পারছি।

বিনয়ী মানুষটি উঠে পড়ল। বলল, আমরা স্কুল থেকে আপনাকে একটা সংবর্ধনা দিতে চাই। কবে আপনার সময় হবে? কৃষ্ণজীবন মাথা নেড়ে বলল, না। সংবর্ধনা মানেই মানপত্র-ট্রা তো! ওসব ভারী কৃত্রিম ব্যাপার। অনুষ্ঠানের দরকার নেই। যদি চান তো আমি একদিন ছাত্রদের মুখোমুখি গিয়ে বসব। কথা বলব।

সতীশ উজ্জ্বল হয়ে বলল, সেটাই ভাল হবে। একটা ডেট দিন। সবাইকে জানাতে হবে, ক্লাসে নোটিশ দিতে হবে।

কৃষ্ণজীবন বলল, কাল আমাদের গৃহবিশেষ। পরন্তু অবধি আমি আছি। পরতই করুন।

সতীশ ঘাড় নেড়ে “যে আজ্ঞে” বলে চলে গেল।

কৃষ্ণজীবন কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল বৈঠকখানায়।

এ বাড়িতে মোজেইক-করা বৈঠকখানা হয়েছে, তাতে সোফাস্টে সাজানো হয়েছে, রঙিন টি ভি এসেছে—এ সব প্রায় রূপকথার মতো। তবু হয়েছে। মিথ্যে নয়। এই পরিবর্তনটির কথাই ভাবছিল কৃষ্ণজীবন। তার অতীতের দারিদ্র্য, তার লড়াই, তার কষ্টের বড় হওয়ার ভিতর দিয়ে একটা সাফল্যের পরিণতি এসেছে। কিন্তু এটাকেই কি সফলতা বলে? দরিদ্র থাকে ধনী হয়ে ওঠা? অধ্যাত্ম থেকে খ্যাতির স্পষ্টতায় আসা? শুধু এইটুকু? কৃষ্ণজীবনের কাছে সফলতার সংজ্ঞা কিছু আলাদা। এখনও কত কী করার আছে তার। এখনও কত কাজ বাকি, কত সিঁড়ি ভাঙতে হবে তাকে। পৃথিবীর মুখ থেকে মৃত্যুর পাণ্ডুরতা যতক্ষণ দূর না হয় ততক্ষণ তার বিশ্রাম নেই, থামা নেই।

গৃহবিশেষ বড় করেই হচ্ছে। অনেক লোকের নেমস্ত্রন। টাকাটা কৃষ্ণজীবনই দিচ্ছে। এটুকু সে আজকাল পারে। ডারলিং আর্থ বাবদে সে পনেরো লাখ টাকা পেয়েছে, আরও দশ-পনেরো লাখ এসে যাবে। দ্বিতীয় বইয়ের জন্য প্রকাশক আগাম দিচ্ছে শিগগিরই। কৃষ্ণজীবনের সামনে এখন অভাবিত ঐশ্বর্যের দরজা খোলা। তবু তার মন থেকে বিস্ময়তা যায় না।

অভাব তাকে দুঃখী করে রেখেছিল ঠিকই, কিন্তু টাকা তাকে কখনোই সুখী করেনি। রিয়ার সঙ্গে এই টাকা নিয়েই অশান্তি হচ্ছিল। দিন কুড়ি আগে রিয়াকে পাঁচ লাখ টাকার চেক দিয়েছিল সে। রিয়ার মুখে হাসি ফুটল, সব অশান্তি দূর

হয়ে গেল। টাকার এই আশ্চর্য শক্তি শুধু কৃষ্ণজীবনের ওপরেই কেন যে ত্রিনাশীল নয়, কে জানে! টাকার খেলায় তার মা-বাবা-রামজীবনের মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। শুধু সে কেন পারল না খুশি হতে?

এ প্রশ্নটার জবাব খুঁজতেই যেন বেরিয়ে পড়ল কৃষ্ণজীবন। ডেকে নিল পটল আর গোপালকেও। সকালের আলোয় শীতের বিষ্ণুপুরের কিছু শোভা আছে। ন'পাড়ার মজা দীঘি, বিষ্ণুপুরই কত কি দেখাতে পারে। কৃষ্ণজীবনের রূপমুগ্ধ চোখদুটি আজও নষ্ট হয়নি।

পটল বলল, বড় জ্যাঠা, কোনদিকে যাবে?

যেদিকে খুশি চল।

হরিজ্যাঠার ওখানে খেজুরের রস পেড়েছে। খাবে?

কৃষ্ণজীবন হাসল, চল।

হরিহর গুড়ের কারিগর। মেলা খেজুরগাছ আছে তার। সুন্দর মেটেবাড়ি, নিকোনো দাওয়া।

হরিদা আছো নাকি? বলে কৃষ্ণজীবন হাঁক মারতেই হরিহর বেরিয়ে এল। গলায় কপ্তি, কপালে তিলক। গায়ে এই শীতেও একখানা বেনিয়ান মাত্র।

ওরেবাস রে! কেউবাবু যে! এসো, এসো!

সবই জানে, কৃষ্ণজীবন এখন মস্ত মানুষ। কতটা মস্ত তার আন্দাজ অবশ্য নেই। কিন্তু যার সঙ্গেই দেখা হয় সে-ই বিস্তার খাতির-টাতির করে। জ্যাঠার এই খাতির খুবই উপভোগ করে পটল। দেখ কেমন একখানা জ্যাঠা আমার! আছে তোমাদের এরকম?

হরিহর উঠানে মোড়া আর জলটোঁকি পেতে দিয়ে বসাল। তারপর রসের হাঁড়ি আর গেলাস এনে রস খাওয়াল। বলল, আজকাল তো আর আসা-টাসা হয় না? খুব নাকি বিলেত-টিলেত ঘুরে বেড়াও?

তা ঘুরি।

বেশ বেশ। আমাদের যে মনে রেখেছো এটাই ভাগ্যি। এক হাঁড়ি নতুন গুড় নিয়ে যেও এবার কলকাতায়। দিয়ে আসব'খন।

রস খেয়ে তারা আবার বেরিয়ে পড়ে।

জ্যাঠা, তুমি এখনও খুব হাটতে পারো, না?

তা পারি।

তোমার সঙ্গে হাঁটায় পাল্লা দেওয়া কঠিন কাজ।

কৃষ্ণজীবন একটু হাসল।

খানিকক্ষণ বাদে পটল হঠাৎ বলল, জানো তো বড় জ্যাঠা, আজকাল আমি ক্লাসে ফার্স্ট হই।

কৃষ্ণজীবন হঠাৎ থমকে গিয়ে বলল, তাই নাকি? কই, কেউ বলেনি তো আমাকে!

আমার লেখাপড়ার কথা বাড়িতে কেউ জানেই না। জিজ্ঞেসও করে না। দাদু কিছুদিন পড়তেন, আজকাল নিজেই পড়ি। হিমাদ্রি স্যার আমার রেকর্ডটি দেখে কি বলেছে জানো? বলেছে, এও কৃষ্ণজীবনের মতো হবে।

তাকে কেউ পড়ায় না?

না তো! এখন নিজেই পড়ি। শক্ত লাগলে হেডস্যার বা অন্য সব স্যারের কাছে পড়া বুঝে নিই।

কৃষ্ণজীবন একটু ভেবে বলল, কোন ক্লাস হল তোর?

নাইন।

ওরে বাবা, তুই তো বড় হয়ে গেছিস।

পটল হাসল, বড়ই তো।

কত লম্বা হয়েছিস বল তো!

মাপিনি তো! তবে সাড়ে পাঁচ ফুট বোধহয়। তুমি কিন্তু খুব লম্বা। আমি অত লম্বা হবো না বোধহয়।

খেলিস?

হ্যাঁ। ফুটবল, ক্রিকেট। স্পোর্টস-এও প্রাইজ পাই। তুমি পেতে?

কৃষ্ণজীবন হাসল, পেতাম। তবে তখন ভাল জুটত না, বেশি দৌড়ঝাঁপ করতে সাহস হত না, পাছে খিদে পেয়ে যায়। ওই খিদের ব্যাপারটা থাকা ভাল, বুঝলি? খিদে মরে গেলে জীবনটা আলুনি হয়ে যায়।

বুঝেছি।

খিদে কিন্তু নানারকম আছে। যত বড় হবি, টের পাবি।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে হেঁটে তারা একটা পুকুরের ধার পেরিয়ে গেল। কৃষ্ণজীবন জলের দিকে চেয়ে বলল, সাঁতার জানিস?

হ্যাঁ।

এই পুকুরটায় আমি সাঁতার শিখেছিলাম, মনে আছে।

বিশ্ময় আর আনন্দে পটল বলে উঠল, আমিও তো এটাতেই শিখেছি জ্যাঠা।

কৃষ্ণজীবন হঠাৎ প্রশ্ন করে, জল তোর কেমন লাগে?

জল! জল খুব ভাল লাগে।

বা ধারে একটা সজনেগাছে বৃষ্টিধারার মতো অজস্র কটি সজনে ঝুলে আছে। কৃষ্ণজীবন দৃশ্যটা দাঁড়িয়ে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর স্বগতোক্তি মতো বলল, জল আর ঝাটি, মাটি আর জল! কত কী করতে পারে।

বড় জ্যাঠাকে খানিকটা বুঝতে পারে পটল, অনেকটাই পারে না। এই যে জ্যাঠা কেমন আনমনা আর বিষণ্ণ হয়ে গেল, কেমন গুটিয়ে পড়ল নিজের একটা অদৃশ্য খোলের মধ্যে, এই জ্যাঠাকে বুঝতে পারে না পটল। তবে তার ঠিক জ্যাঠার মতোই হতে ইচ্ছে করে।

কৃষ্ণজীবন হঠাৎ প্রশ্ন করে, লাঙল চালাতে পারিস ?

না। কখনও চালাইনি।

শেখা ভাল। মাটির সঙ্গে একটা বুঝ হয়।

আচ্ছা জ্যাঠা।

গাছ চিনবি, বীজ চিনবি, ঝতুচক্র চিনবি, খনার বচন শিখবি। পাখি, পোকামাকড় এ সব লক্ষ করিস ? গাছপালা ?

একটু-আধটু।

একটু-আধটু নয়, ভাল করে। যা করবি ভাল করে করবি। শুধু বই পড়লে শেখা হয় না। জীবন থেকেই পাঠ নিতে হয়। চারদিকে তোর কত মাস্টারমশাই দেখেছিস ? ওই রোদ, আকাশ, গাছপালা, প্রজাপতি, চড়াইপাখি, সব তোর মাস্টারমশাই। পাঠশালা সাজিয়ে বসে আছে।

পটল হাসল, বুঝেছি।

কৃষ্ণজীবনও হাসল। বলল, আমি সামান্যই পেরেছি। তুই অনেক পারিস।

তুমি কত জানো!

শীতলাতলায় আজ হাটবার। মেলা লোকজন। গিসগিসে ভিড়। কৃষ্ণজীবন ভাইপোদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে হাট দেখল। দর জেনে নিল অনেক কিছু। তারপর বলল, এখানে বোধহয় একটু সস্তা।

হ্যাঁ জ্যাঠা, এখানে কলকাতার চেয়ে অনেক সস্তা। সবাই বলে।

জিলিপি খাবি ? আগে নিরাপদর দোকানে জিলিপি ভাজত, এখনও কি আছে সেই দোকান ?

পটল নাক কুঁচকে বলল, আছে। তবে আজকাল আর ভাল নেই। এখন ইন্দ্রনীল মিষ্টান্ন ভাগারে ভাল জিলিপি করে।

ইন্দ্রনীল বেশ পরিচ্ছন্ন দোকান। পাকা ঘর, টেবিল চেয়ার আছে।

কৃষ্ণজীবন পটলকে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ রে, এরা শালপাতার ঠোঙায় জিলিপি দেয় না ?

না জ্যাঠা, প্লেটে দেয়।

ধূস। শালপাতা না হলে জিলিপি খেয়ে সুখই নেই।

ইন্দ্রনীলের মালিক উমাপদ অবশ্য কৃষ্ণজীবনকে চেনে। সে শশব্যস্তে মান্য অতিথির জন্য শালপাতা নিয়ে এর, যত্ন করে বসিয়ে গরম জিলিপি ভাজিয়ে দিয়ে বলল, কেমন হয়েছে আজ্ঞে ?

কৃষ্ণজীবন জিলিপিতে কামড় দিয়ে নিম্নলিখিত চোখে উমাপদের দিকে চেয়ে বলল, আমাকে আপনি-আজ্ঞে করছো কেন ? তুমি তো আমার সঙ্গে পড়তে। ক্লাসমেট।

উমাপদ লজ্জায় ঘাড় নিচু করে বলল, সে কবেকার কথা! তুমি এখন কত বড় হয়েছে।

তাতে কি সম্পর্ক বদলায় ? তোমার ছেলে যদি দেশের প্রধানমন্ত্রীও হয়, তাকে কি আপনি-আজ্ঞে করবে ?

তা নয়। প্রথমটায় ভরসা পাচ্ছিলাম না, চিনতে পারবে কি না, মনে আছে কি না।

আমার স্মৃতিশক্তি সাংঘাতিক। কিছু ভুলি না।

উমাপদ বিগলিত হয়ে গেল। বলল, গরম সিঙাড়া খাবে ? কড়াইভটি আর ফুলকপি দিয়ে করে দিচ্ছি।

না উমাপদ, থাক। কত দাম বলো তো জিলিপির ?

ও তোমাকে দিতে হবে না। চিনতে পেরেছো এতেই আমার দাম উঠে গেছে।

কৃষ্ণজীবন তার জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা দামী ক্যালকুলেটর বের করে উমাপদের হাতে দিয়ে বলল, এটা রাখে, তোমার কাজে লাগবে।

ও বাবা, এ তো দামী জিনিস।

রাখো। হিসেবের সুবিধে হবে।

উমাপদ খুব লজ্জার সঙ্গে হাসল, আমাদের যা হিসেব তা তো মুখে মুখেই হয়ে যায়। যন্ত্র লাগে নাকি ?

ঠিক কথা। ক্যালকুলেটর হাতে থাকলে মানুষ দুইয়ের সঙ্গে দুই যোগ করতেও মাথা ঘামায় না, বোতাম টেপে। যন্ত্র খুব খারাপ জিনিস।

উমাপদ এক ঠোঙা জিলিপি বেরে পটলের হাতে দিয়ে বলল, তোর দাদুকে দিস। আগে খুব আসতেন, আজকাল আসেন না।

জ্যাঠা, এখন বাড়ি যাবে ?

না না, এখনই কি ? চল, এখনও কত দেখার আছে।

॥ ৯৯ ॥

চারুশীলার দীর্ঘকালের জন্য বিদেশ ফেরার পর একটু ফাঁকা লাগছিল চয়নের। চারুশীলা তার প্রতি খুবই দয়ালু ছিল। যাওয়ার আগে তাকে হাজার দুই টাকা, একগাদা শার্টপ্যান্ট, কলম, ক্যালকুলেটর, সুগন্ধী স্প্রে দিয়ে গেছে। চয়ন এয়ারপোর্ট গিয়েছিল। চারুশীলা খুব কাঁদছিল। কান্নার প্রধান কারণ, তাকে বিদায় জানাতে হেমঙ্গ আসিনি। যথাসময়ে খবর পেয়েও আসিনি বা কোনও খবরও দেয়নি। তবে শ্রিয়ছিল অনেকেই। ভিড়ে ভিড়াকার।

হেমাস্র লোকটাকে চয়ন খানিকটা বোঝে, রোমান্টিক, একা, ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা পছন্দ করে না। তার জীবনে একটা স্থায়ী ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি করতে চেয়েছিল চারুশীলা। ভাল ভেবেই করেছিল। কিন্তু সিদ্ধান্তটা ছিল ভুল। চয়নের বরাবর মনে হয়েছে, হেমাস্রর সঙ্গে রশ্মি ঠিক খাপ খাবে না।

এয়ারপোর্টে তাকে আলাদা ডেকে চারুশীলা ধরা গলায় বলল, শোনো চয়ন, হেমাস্র আজ আমাকে সত্যিকারের দুঃখ দিয়েছে। ওকে আমি কতটা ভালবাসি তা হয়তো বোকাটা জানেও না। আমাকে সি-অফ করতে আসেনি। বোধ হয় রাগে। তুমি প্রিজ ওর সঙ্গে একটু কাল বা পরশু দেখা করতে পারবে?

পারবো না কেন?

ওর অফিসে আজ ফোন করেছিলাম। ওরা বলল হেমাস্র আউট অফ স্টেশন। কোথায় গেছে বলতে পারল না। এরকম হওয়ার কথা নয়, আজ আমি চলে যাচ্ছি এটা ও ভালই জানে। তুমি ওর সঙ্গে দেখা করে বোলো, আমি খুব দুঃখ পেয়েছি। ভীষণ।

বলব চারুদি, আপনি চিন্তা করবেন না।

আমি আরও ওর কোনও ব্যাপারে থাকতে চাই না। বিয়ে করুক বা না করুক, কখনও কিছু বলব না। তা বলে সম্পর্ক কেন তুলে দেবে বলো তো! আমরা পিঠোপিঠি ভাইবোনের মতো মানুষ হয়েছি, আমাকে ভীষণ ভালবাসত ও। কেন যে এরকম হয়ে গেল!

আপনাকে এখনও উনি ভালবাসেন।

চান্স মাথা নেড়ে বলে, আর বাসে না, এখন ও অন্যরকম হয়ে গেছে, একেবারে বাড়িগুলো। হয়তো সন্ধ্যাসী হওয়াই ওর কপালে আছে। সেই জঙ্গলের বাড়িটাতে গিয়ে পড়ে থাকে। শোনো, দরকার হলে তুমি সেখানেও যেও।

যাবে।

ওকে একটু দেখো।

চারুশীলার যে কী গভীর মায়া হেমাস্রর প্রতি সেটা বুঝতে পেরে একটু ঠাণ্ডা হল চয়ন। এই ভালবাসাটা তার আর অয়নের মধ্যে নেই। খুব কম পরিবারেই ভাইবোনে এরকম ভালবাসা আছে। তাও চয়ন শুনেছে, হেমাস্র আর চারুশীলা আপন ভাইবোন নয়, পিসতুতো মামাতো। একসঙ্গে বড় হয়েছে মাত্র।

কথা খেঁখেছিল চয়ন। দু'দিন পর অফিসে ফোন করে জানল, হেমাস্র ফিরেছে, তবে ফের বাইরে গেছে।

আরও দু'দিন অপেক্ষা করল চয়ন। তারপর এক সোমবার হেমাস্রকে ধরল অফিসে, টেলিফোনে।

হেমাস্র খুব খুশির গলায় বলল, আরে হ্রেট চয়ন! কী খবর?

আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

চলে আসুন আজ বিকেলে আমার বাড়িতে। ধরুন সাতটা।

যাবে।

রাতের খাবারটা একসঙ্গেই খাবো দু'জনে, কেমন?

না না, তার দরকার নেই।

অত লজ্জা পাচ্ছেন কেন? আমি আজকাল খুব সিম্পল খাই। স্পার্টান লাইফ স্টাইল, ফুগাল মিল, আমার পরিবর্তনটা লক্ষ করে অবাক হবেন। চলে আসুন। আড্ডা মারা যাবে।

সাতটার পনেরো মিনিট আগেই পৌঁছে গেল চয়ন। হেমাস্র তখন নিজের হাতে কী একটা রান্না করছিল মাইক্রোওয়েভে, পাশে তার চাকরটিও বেশ ব্যস্ত।

তাকে দেখে সত্যিকারের খুশি হল হেমাস্র। তাকে দেখে খুশি হয় এমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম। হেমাস্র তাদের মধ্যে একজন। সে বলল, আরে বাঃ, আপনার চেহারার তো বেশ উন্নতি হয়েছে দেখছি।

চয়ন লাজুক হাসল, কথটা মিথ্যে নয়। তার চেহারার সম্প্রতি কিছু উন্নতি ঘটেছে।

বসুন বসুন, আগে কি একটু চা বা কফি খেয়ে নেবেন?

না, আমার নেশা নেই।

হালকা কিছু খাবার খাবেন? ইফ ইউ আর হাংরি?

না; চারুদি আমাকে যাওয়ার আগে একটা মেসেজ দিয়ে গেছে।

তাই নাকি? কিরকম মেসেজ?

আপনি সি-অফ করতে যাননি বলে উনি খুব দুঃখ পেয়েছেন, ভীষণ। খুব কান্নাকাটিও করছিলেন।

হেমাস্রর মুখ থেকে হাসিটা ধীরে ধীরে মুছে গেল। সে একটু মাথা নেড়ে বলল, চলুন বসি।

সোফা-সেটে সাজানো ড্রয়িং রুম মুখোমুখি বসে হেমাস্র ধীর গভীর গলায় বলল, খুব কান্নাছিল?

খুব, উনি আপনাকে বড় ভালবাসেন।

হেমাস্র মাথা নেড়ে বলে, জানি। খুব ছেলেবেলা থেকেই চারুদি আমাকে সারা দিন কোলেপিঠে করে রাখত। আমি ওর খুব ন্যাওটা ছিলাম। আমাদের বাড়িতে কড়া শাসন আর ডিসিপ্লিনের মধ্যে ওই চারুদিই আমাকে আড়াল করে রাখত। আমি দুষ্টিম করলে বা অন্যায় কিছু করলে আমার হয়ে নির্বিকারভাবে মিথ্যে কথা বলত। ওর নিজের ভাইবোন বলতে কেউ ছিল না। মা-হারা মেয়েকে ওর বাবা বাধ্য হয়ে আমাদের বাড়িতে রেখে দেয়। সেই থেকে ও আমার নিজের দিদির মতোই। তা ছাড়া ও আমার খুব বন্ধুও। একটু ডমিনেটিং, কিন্তু চারুদি অত্যন্ত অফ-বিট মেয়ে। লোভ নেই, সঞ্চয় করতে জানে না, টাকা ওড়াতে ভালবাসে, লোকের জন্য করেও অনেক। সবগুলো হয়তো প্রাস কোয়ালিটি নয়, কিন্তু তাতেই ও অফ-বিট। তাই না?

হ্যাঁ। ওকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি।

হেমান্স হেসে ফেলে, শ্রদ্ধা-ফ্রদ্ধা আপনার একটা রোগ। চারুদিকে শ্রদ্ধা করার কি আছে? সি ইজ এ ডেরি গুড ফ্রেন্ড। এরপর হয়তো বলবেন আপনি আমাকেও শ্রদ্ধা করেন। শ্রদ্ধা রোগটা আপনার সারানো দরকার।

চয়ন ফের লাজুক হাসল। বলল, উনি বলে গেছেন, আপনাকে আর ডিষ্টার্ব করবেন না।

হেমান্স একটু হেসে বলল, আপনাকে আর কষ্ট করে মেসেজ দিতে হবে না। বোম্বাইয়ের শাহর এয়ারপোর্টে প্রায় সারা রাত আমি চারুদির অনেক করুণ বিলাপ শুনেই এসেছি।

অবাক হয়ে চয়ন বলে, তার মানে?

চারুদি রওনা হওয়ার আগের দিন আমি বোম্বাই যাই।

ওঃ।

চারুদিকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্যই খবরটা আগে দিইনি। বোম্বাইতে আমার ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ক্লায়েন্ট আছে। তাদের একজনই আমাকে ট্রানজিট লাউঞ্জে ঢোকান ব্যবস্থা করে দেয়। চারুদি আর সুব্রতদা তো ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠেছিল। আর ছেলেমেয়ে দুটো যা খুশি হয়েছিল তা বলার নয়। ভোরে প্লেনে ওঠার আগে অবধি জোর আড্ডা হয়েছিল।

চয়ন একটা হাস ফেলে বলল, যাক, আপনি একটা খুব ভাল কাজ করেছেন। চারুদি এত আপসেট ছিলেন। তা ছাড়া অনেক দিনের জন্য চলে গেলেন তো!

হেমান্স জু কুঁচকে একটু ভেবে বলল, চারুদিকে যতদূর চিনি, ও বেশি দিন বিদেশে থাকতে পারবে না। ছেলেমেয়েকে ছেড়েও থাকা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। আমার মনে হয় ওর গোটা প্ল্যানটাই ভেঙে যেতে পারে। ডেভেলপড দেশগুলোর অবস্থা আমার ভাল বলে মনে হয় না। বড্ড পারমিসিভ। বড্ড বেশি ব্যক্তিগতধীনতা, বড্ড বেশি সেক্স অ্যান্ড অবসেশনস। সবচেয়ে বেশি লোনলিনেস। কিছুদিনের মধ্যেই দেখবেন ওসব দেশে সামাজিক মানসিক সংকট দেখা দেবে। অ্যাফ্লুয়েন্সন যে শেষ কথা নয় সেটা বুঝতে বেশি সময় লাগবে না।

চয়ন বিদেশ সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না। সে চুপ করে রইল।

হেমান্স বলল, চারুদি হয়তো ফিরে আসবে। আগেও একবার চেষ্টা করেছিল সুব্রতদার সঙ্গে বিদেশে সেটল করার। পারেনি।

চয়ন খাবে বলে বেশ ভাল আয়োজন করেছিল হেমান্স। তবে আমিষ ছিল না। হেমান্স বলল, আজকাল আমি নিরামিষ খাচ্ছি।

কেন?

এমনি, আমার মনে হচ্ছে, পশুপাখিদের ধরে ধরে খাওয়ার কোনও অধিকার আমার নেই।

তাই বা কেন? লোকে তো খায়।

লোকে কত কিছু করে। সব কিছুর মানে হয় না। আপনার কি নিরামিষ খেতে অসুবিধে হচ্ছে?

চয়ন মৃদু হেসে বলল, না তো! আমি তো নিরামিষই খাই। মাছ কেনার ক্ষমতা নেই, রাঁধেই বা কে? তবে প্রেজুডিস নেই। আচ্ছা, আপনার চারটে মিস্ত্রি কেন লাগে?

হেমান্স হেসে ফেলল, আগে নতুন নতুন জিনিস কেনার খুব ঝোক ছিল। বাজারে একটা নতুন প্রোডাক্ট এলেই কিনে ফেলতাম। ওসব তখনকার ব্যাপার। রয়ে গেছে। এখন একটাও কাজে লাগে না। আপনাকে একটা প্রেজেন্ট করে দিচ্ছি আজই।

আমি! আমি নিয়ে কি করব?

প্রোডাক্টটা হাতে এলে কাজে লাগানোর কথা মনে হবে।

না, দরকার নেই। আমার ঘরে জায়গাও নেই। চারুদি কত কী দেন, আমার সবই পড়ে আছে। কাজে লাগে না।

আপনিও একটু অফ-বিট, তাই না?

না, অফ-বিট নই। আমি যা হয়েছি তা অবস্থার চাপে!

ভিকটিম অফ সারক্যামন্ট্যাসেস? আমরা সবাই তো তাই। আচ্ছা একটা সত্যি কথা বলবেন? আপনার টিউশনি করে মাসে কত ইনকাম হয়?

চয়ন একটু হিসেব করে বলল, বোধ হয় হাজার দুই।

কত খরচ করেন?

হিসেব করিনি। তবে হাজার খানেক তো বাটে।

বছরে তাহলে আপনার বারো হাজার টাকা সেভিংস হওয়ার কথা। হয় কি?

চয়ন একটু অস্থিতি বোধ করে বলল, তা তো জানি না।

আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই?

আছে একটা।

তাতে কিছু রাখেন না?

হ্যাঁ, মাঝে মাঝে টাকা রাখি। কারণ ঘরে রাখলে চুরি যেতে পারে।

ব্যাঙ্কে কত জমা হয়েছে জানানো না?

পাস বই অনেকদিন এন্ট্রি করানো হয়নি।

আপনি কি মানি-কন্ট্রোল নন?

চয়ন লজ্জা পেয়ে বলে, ঠিক তা নয়। তবে মনে হয় ব্যাংকে আমার খুব বেশি থাকে না।

আমি অ্যাকাউন্ট্যান্ট। টাকাপয়সার ব্যাপারে মনে-হওয়াকে গুরুত্ব দিই না। কালকেই ব্যাঙ্কে গিয়ে জেনে নেবেন আপনার ঠিক কত টাকা আছে। আর পাস বইটা আপ-টু-ডেট করে নেবেন।

কেন বলুন তো ?

টাকাপয়সার ব্যাপারে ইনফর্মড থাকা ভাল। আপনি কি এখনও চাকরি খুঁজছেন ?

চয়ন একটু স্তিমিত গলায় বলল, না, আর খুঁজছি না। ওটা আমার হবে না।

দেশে তত চাকরিও নেই। যদি চাকরি একটা কষ্ট করে পেয়েও যান মাইনে পাবেন অত্যন্ত কম। খাটাবে বেশি।

এমপ্রায়দেই এখন যুগ।

তাই দেখছি।

যদি কিছু টাকা জমাতে পেরে থাকেন ডু সামথিং অন ইওর ওন।

কি করব ? ব্যবসা ?

আপনি তো পড়াতে পারেন। বরং একটা টিউটোরিয়াল খুলুন।

টিউটোরিয়াল অনেক আছে। আমারটা চলবে না।

নেগেটিভ আইডিয়া নিয়ে শুরু করলে হবে না। আদা-জল খেয়ে লাগুন না! কাজটা করতে শুরু করলেই দেখবেন, কিছু একটা হতে শুরু করেছে। স্টার্ট ইট রোলিং।

চয়ন একটু হাসল।

হেমাঙ্গ বলল, এদেশে দেখবেন কেউ কোনও ভেনচার করতে চায় না। একটা কাপড়ের দোকান কেউ করল, দেখাদেখি আর একজনও কাপড়ের দোকানই করল তার পাশে। ফের আর একজনও তাই করল। ফলে বিজনেসটা ভাগ হয়ে গেল। কারোই তেমন লাভ হয় না। কিন্তু মাথা খাটালে দেখতে পেত সেখানে হয়তো সেলুন খুললে বা স্টিম লন্ড্রি করলে বা ওরকম কিছু করলে কমিশন কম হত। এই মাথা খাটানোটুকুও নেই। আর একটা কথা কি জানেন ? এদেশের ব্যবসাদার বা দোকানদাররা সেবাবুদ্ধি কাকে বলে জানেন না। মানুষকে সেবা দেওয়ার মনোভাব থাকলে ব্যবসার ভাল পাশ্বে যেত। প্রত্যেকটা ব্যবসাই হওয়া উচিত ওয়েলফেয়ার বিজনেস। দিনরাত অসং লোকদের ট্যান্ড ফাঁকিতে সাহায্য করতে করতে আমি টায়ার্ড।

টিউশনি করতেও আমার তেমন ভাল লাগে না।

টিউটোরিয়াল হয়তো ভাল লাগবে। না হলে আমার সঙ্গে গ্রামে চলুন। চাষাবাস করবেন। পারবেন না ?

চয়ন এবার হাসল না। একটু ভাবল। তারপর বলল, আমার ঘারা বোধ হয় কিছু হবে না।

ভাবুন। ভাল করে ভাবুন। মাথা থেকে কিছু একটা বেরোবেই। তারপর হার্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড অনেসি অ্যান্ড সার্ভিস।

চয়ন মৃদু হেসে বলল, আপনি খুব প্র্যাকটিক্যাল। আমি তা নই। অথচ চারুদি আমাকে কী বলে গেছেন জানেন ? বলে গেছেন যেন আপনাকে আমি চোখে চোখে রাখি।

হেমাঙ্গ হাঃ হাঃ করে হাসল। বলল, ও আমাকে এখনও নাবালক বলে মনে করে।

ওর ভয় আপনি সন্ধ্যাসী হয়ে যাবেন।

হেমাঙ্গ গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে বলে, না, সন্ধ্যাসী হওয়ার কোনও চান্স নেই।

চয়নের ভিতরে মৃদু একটা বেল বেজে উঠল। সে জানে। সে টের পায়। কি করে পায় ? হয়তো রোগে ভুগে তার স্নায়ুতে এমন কিছু স্পর্শকাতরতার সঞ্চার হয়েছে যাতে সে অনেক সূক্ষ্ম জিনিস আবহা বুঝতে পারে।

মৃদু হেসে চয়ন বলল, সেটা আমি জানি।

অবাক হয়ে হেমাঙ্গ বলে, কি জানেন ?

আপনি হয়তো শিগগিরই ঘর-সংসার করবেন।

সে কী ? আমি তো সে কথা বলিনি!

না, আপনি বলেননি।

তাহলে ?

এমনি মনে হল।

এমনি মনে হল ? না মশাই, ওটা কথা নয়। খেড়ে কান্ডন।

চয়ন মৃদু হাসল শুধু।

আমি বলতে চেয়েছিলাম সন্ধ্যাসী হওয়ার হাজার্ডস্ আমার পোষাবে না। তা ছাড়া আমি তো ধর্ম করি না। সংসারী হওয়ার ইচ্ছে আমার নেই।

চয়ন মৃদুস্বরে বলে, হয়তো তার আছে।

কার ?

যাকে আপনি বিয়ে করবেন!

অবাক হেমাঙ্গ বলে, কাকে ?

ভেতরটা বলি বলি করে ওঠে চয়নের। সে বলে না। মৃদু হাসে শুধু।

আপনি তো সামাজিক লোক মশাই। জ্যোতিষী করেন নাকি ?

না।

তাহলে ?

মনে হয়।

কী মনে হয় ?

মনে হয় আপনি কাউকে ভালবাসেন। সত্যিকারের ভালবাসেন। কিন্তু টের পান না।

আমিই যদি টের না পাই তাহলে সেটা আপনি টের পান কেমন করে ?

আমিও পাই না।
 তবে বলছেন যে!
 আমার মাঝে মাঝে অদ্ভুত কিছু একটা মনে হয়।
 সেই অদ্ভুতটা কি?
 ওই তো বললাম, আপনি না জেনেই কাউকে ভালবাসেন। সেটা এত ভিতরের ব্যাপার যে টের পান না।
 তাই কি হয়? ভালবাসা টের না পেয়ে উপায় নেই।
 হয়তো সেটাকে ভালবাসা বলে চিনতে পারেন না।
 ওসব হেঁয়ালিতে আমি বিশ্বাস করি না। তবে আমি একজনকে খানিকটা ভালবাসার চেষ্টা করেছিলাম ঠিক কথা। সে
 রশ্মি।
 চয়ন চুপ করে রইল।
 হেমাস বলল, ভালবাসাটা ছিল বন্ধুর মতো। কিন্তু চারুদী সব গোলমাল করে দিল।
 উনি ভুল করেননি। বিয়ের চেষ্টা করে উনি আপনার উপকারই করেছেন। তাতে আপনি বুঝতে পারলেন যে রশ্মিকে
 আপনি সেরকম ভালবাসেন না।
 এরকম একটা কথা আপনি আগেও বলেছিলেন। আপনি কিন্তু একটু বিচ্ছু টাইপের আছেন। এবার বলুন তো, আজ
 যা বললেন তার সোর্সটা কি?
 আমি সত্যিই জানি না।
 না জেনেই বলছেন?
 মনে হয়, ব্যাপারটা এতই গভীর এবং গোপন যে, আপনি সেটা কনশাস্‌লি স্বীকার করতে চান না। তাই ব্যাপারটা
 আপনার কাছে ধরা দেয় না।
 এটা কি ফ্রয়েডের ব্যাপার নাকি মশাই?
 ফ্রয়েড আমি পড়িইনি।
 কিন্তু ভালবাসার জন্য তো একটা মেয়ে অন্তত চাই। সেটা কে?
 আছে হয়তো!
 কে হতে পারে?
 চয়ন মুচকি একটু হেসে চুপ করে থাকে।
 হেমাস তার চোখের দিকে চেয়ে বলে, আপনি কি তাকে চেনেন?
 হয়তো চিনি।
 আপনাকে আজ হয়তোতে পেয়েছে কেন?
 আমার অনুমানটাও এত পাতলা যে বলার মতো নয়।
 আমার পরিচিত মেয়ের সংখ্যা এতই কম যে অনুমানটা খুব ডিফিকাল্ট নয়।
 দুজনে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর হেমাস বলল, চলুন আপনাকে গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি।
 থাক। আমি চলে যেতে পারব।
 সেটা জানি। তবু আপনার কম্পানি আমার কিছুক্ষণ আরও দরকার।
 তাহলে চলুন।

॥ ১০০ ॥

এই যে এত আনন্দ হল বাড়িতে, গৃহপ্রবেশে এত লোক খেল, এত হইচই, এর মধ্যেও বীণাপাণি রইল আড় হয়ে।
 তার মনে একটুও সুখ নেই। সে শুনেছে ভিড়ের মধ্যে এক ফাঁকে এসে নিমাই নাকি শ্বশুর-শাশুড়িকে প্রণাম করে চলে
 গেছে। চোখাচোখিটুকুও হয়নি তার সঙ্গে। না হয়ে ভালই হয়েছে। বীণাপাণির যত অশান্তির মূলে তো ওই একটা লোক।
 ভয়ে বীণাপাণির বুক সবসময়ে দুরদুর করে। বনগাঁয়ে ফিরে যাওয়ার কথা ভাললেই বুক হিম হয়ে যায়। নিমাই নাকি
 ছোড়দাকে বলেছে, বীণাপাণি বনগাঁয়ে ফিরে যেতে পারে। কথাটার মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝেনি বীণা। সে বনগাঁয়ে ফিরবে কি
 না তা নিয়ে নিমাইয়ের মাথাব্যথা কেন?

বীণার সবচেয়ে দুঃখ, নাটকটাই জীবন থেকে বাদ হয়ে যাচ্ছে। সজল বলেছিল, কাকা টের পেয়ে গেছে। কাকা
 এমনিতে ভাল, কিন্তু চটলে সাড়ে সর্বনাশ। বীণা কি করবে তাই ভেবে পাচ্ছে না। ডলার আর পাউন্ড বাঁচাতে সে চট করে
 যা মাথায় এসেছিল তেমনই একটা কৌশল করে রেখে এসেছে বটে, কিন্তু তাতে বিপদটা রয়েছে। কাকা তাকে
 খুঁজবে, দরকার হলে খুনও করাবে। তবে বিটুপুর শীতলাতলার পান্ডাটা একটু দূরের, এইটুকুই যা ভরসা। উদ্বেগ
 টাকাগুলোর জন্যও রয়েছে। মেঝের নিচে গর্তের মধ্যে চাপা আছে ঠিকই, তবু নাগালের মধ্যে যে নেই সেটাও দুশ্চিন্তার
 কারণ। কী হচ্ছে কে জানে!

বাড়িটা যে দেখনসই হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। মা-বাবার মুখে হাসি ধরছে না। দাদা মেলা জিনিসপত্র কিনে ঘর
 সাজিয়ে দিয়েছে। সোফাসেট, লোহার আলমারি, নতুন খাট। এরকম রাজার হালে থাকার কথা মা-বাবা তো কখনও
 ভাবেনি।

তবে বিস্ময়পদ তাকে বলেছে, বড় অশ্বস্তি হচ্ছে, বুঝলি! প্রথম প্রথম তো! মনে হচ্ছে যেন পরের বাড়িতে ঢুক
 পড়ছি।

নতুন বলে হচ্ছে বাবা, দুদিনেই সয়ে যাবে।
 তা বটে। আজ ঝাঁঝরির চলে জান করলুম, ঠাণ্ডা না লেগে যায়।
 বুঝেবুঝে কোরো।
 কাল থেকে ভাবছি ওই কুয়োপাড়েই চানটা করব। এ ঠিক জুত হচ্ছে না।
 না বাবা, পুরনো অভ্যাস বজায় রাখলে নতুনটা আর অভ্যাস হবে না। দাদা এত আদর করে সব করে দিল।
 তা বটে।
 সবচেয়ে খুশি নয়নতারা। চোখে-মুখে সবসময়ে ডগমগ ভাব। মুখে উপচে পড়ছে হাসি।
 ও মা, তোমার যে দেমাকে মাটিতে পা পড়ছে না গো!
 নয়নতারা হেসে বলে, তা বাপু, একটু দেমাক আমার হয়েছে। সব ঘুরে ঘুরে দেখলি তো!
 মেঝেটা বাপু যেন তেলতেল করছে। সিঁড়িটিং সব দেখলি? আর রান্নাঘর? কত তাক, কত কাবার্ড।
 কাবার্ড কথাটা দাদা শিখিয়েছে মাকে। শুনে সবাই হাসে।
 বীণাপাণিও হাসল, আমাকে কোন ঘরখানা দেবে মা?
 কেন, দোতলায় তিনখানা শোওয়ার ঘর। আমাদের পাশের ঘরেই তুই থাকবি।
 দাদাকে বড় ডয় বীণার। অপরাধবোধও কম নয়। এই দাদাকে তারা এ বাড়ি থেকে অনেক অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তবু এতদিন বাদে দাদা কিছু মনে করে রাখেনি নিশ্চয়। তা না হলে এখানে এত বড় বাড়ি করে দিত না। খুব ভয়ে ভয়ে আর লজ্জার সঙ্গে গৃহপ্রবেশের পর দিন সকালে দাদার ঘরে গেল বীণা। প্রণাম করে বলল, কেমন আছ দাদা?
 কৃষ্ণজীবনের মুখে গভীর চিন্তার ছাপ। বলল, ভালই। তুই কেমন?
 ওই একরকম। আমাদের আর ভাল থাকা!
 কৃষ্ণজীবন গভীর গলায় বলে, তুই নাকি যাত্রায় নামিস?
 নামি দাদা। না নেমে উপায় ছিল না তখন।
 কৃষ্ণজীবন চিন্তিতভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে বলে, আমার যাত্রা সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই। কিন্তু লোকে বলে, যাত্রার দলে ভদ্রবাড়ির মেয়েরা যায় না। তুই যে কেন গেলি!
 সামান্য স্কেন্ডেলের সঙ্গে বীণাপাণি বলল, আমি কি ভদ্রবাড়ির মেয়ে দাদা? তুমি কি জানো না আমরা কত কষ্টে মানুষ হয়েছি? আর কীভাবে আমাকে একজন হাড়হাভাতের গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হল! ওরকম শ্বশুরবাড়ি যেন শত্রুও না হয়। কী গরীব ভামতে পারবে না। তার ওপর হল অসুখ, চিকিৎসার টাকা নেই, পথি জ্বাটে না। কী করতাম বলো তো!
 কৃষ্ণজীবন তার মুখের দিকে গভীর নিশ্পলক চোখে চেয়ে রইল। বলল, বল শুনি।
 কেনে ফেলল বীণাপাণি। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বলল, নিজেকে ভদ্রবাড়ির মেয়ে বলে ভাবতে কবেই তো ভুলে গেছি। এ গরিব বাড়ি থেকে আরও গরিব আর-এক বাড়িতে গিয়ে উঠেছি। ভদ্র পরিবেশ কোথায় পেয়েছি বলো তো! জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল আমার। তখন তো তুমি আমাদের পাশে ছিলে না। তুমি ছাড়া আর এ বাড়ির কেই-বা ভদ্রলোকের মতো বলো তো! মেজদা সেজদা এদের তো জানো। আজ মশু বাড়ি হয়েছে তোমার দয়ায়, কিন্তু এতদিন কিভাবে কেটেছে আমাদের?
 কৃষ্ণজীবন মাথা নেড়ে বলল, ঠিক কথাই তো। কিন্তু তবু যাত্রাদলে কেন গেলি সেটা বোঝা গেল না।
 ওই জন্যই তো। কাকা নামে একটা নাটক-পাগল লোক আছে, সে-ই বাঁচিয়ে দিল চাকরি দিয়ে।
 কিন্তু সেই লোকটা নাকি শ্বাগলার?
 হ্যাঁ, তাও ঠিক। তবে সে লোক ভাল।
 নিমাই কি খুব খারাপ লোক রে বীণা?
 মেরুদণ্ডহীন।
 কৃষ্ণজীবন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, অনেকদিন আগে তাকে একবার দেখেছিলাম। ফের দেখা হল গতকাল।
 আচরণের বিষয় হল, তাকে আমার ভীষণ ভাল লোক বলে মনে হয়েছে। কেন রে?
 কেন তা কি করে বলব? বাবাও বলে, তুমিও বলছ, আমি তো ভালর কিছু দেখি না। অকর্মার ধাড়ি।
 আমরা ছাড়া আর কেউ বলে না?
 বলে। ভাল লোক ভাল লোক শুনে শুনে কান পচে গেল। কিন্তু ভাল ধুয়ে কি জল খাবো?
 শুনি এখন সে কাঁচরাপাড়ায় হোটেল চালাচ্ছে। ভাল আয়।
 কে জানে কি!
 তোর সঙ্গে কি ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে?
 ওইরকমই।
 কেন হল?
 বনল না।
 কৃষ্ণজীবন মাথাটা একটু দু'ধানে নেড়ে বলল, খুব অল্প সময়ের মধ্যে সে একটা ব্যবসাকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে সে খুব অকর্মণ্য বলে আমার মনে হয় না।
 এতদিন তো পারেনি।
 কৃষ্ণজীবন তার চোখের দিকে চেয়ে বলল, সেইটেই তো তোর কাছে জানতে চাইছি, এতদিন পারেনি কেন?
 ও মা! তা আমি বলব কি করে?
 তোর সঙ্গে ছিল, অথচ তখন পারল না, তাকে ছেড়ে এসেই পেরে গেল তার মনেটা কী দাঁড়াচ্ছে?

কী বলা তো ?

তার মনে দাঁড়াচ্ছে কোনও কারণে ও তোর কাছে বাধা পেত, সাহস করে উঠতে পারত না, তোর মুখাপেক্ষী হয়ে ছিল। হ্যাঁ রে, নিমাই কি খুব স্নেহ ?

মোটাই নয়।

ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়। এনিওয়ে, তোকে ছেড়ে গিয়ে লোকটার তো উন্মত্তিই হয়েছে দেখছি।

হোক, আরও হোক। আমি তো আর ভাগ বসাতে যাচ্ছি না।

কৃষ্ণজীবন হাসল, কী কথার কী জবাব। বোস, ঠাণ্ডা হ। ওর ওপর তোর এত রাগের কারণটা আমাকে বলবি ? নিরীহ, সৎ একজন লোক, হয়তো-বা মুখচোরা, তার বেশি আর কি খারাপ হবে নিমাই বল তো!

তোমরা বুঝবে না। তোমরা সবাই ওর পক্ষে।

আমরাই বা কেন নিমাইয়ের পক্ষে সেটাও কি ভেবেছিস ?

তোমরা ওর সততাকে খুব দাম দাও।

সততাকে তুই দাম দিস না ?

দেবো না কেন, কিন্তু বেশি-বেশি করলে রাগ হয়। এটা কলিযুগ, সততা দিয়ে কি বাঁচা যায় ? কাকা ওকে একটা চাকরি দিয়েছিল, কেন নিল না জানো ? ওটা নাকি পাপের টাকার তহবিল। সেই চাকরি পরে আমি নিই।

সেটা কি নিমাই অন্যায় করেছে ?

করেছেই তো। তোমার নিমাই হল নিমকহারাম। এতদিন আমারটা খেল-পরল, আমার টাকায় মা-বাবার প্রতিপালন করল, আর আমাকেই বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলে গেল। এই লোকের কী যে গুণ দেখলে তোমরা!

কৃষ্ণজীবন হঠাৎ প্রশ্ন করে, বনগাঁয়ে তুই কি একা থাকিস ?

একা আবার কি ? সেখানে আমার নিজের বাড়ি, পাড়া-প্রতিবেশী আছে, চেনাজানা কত লোক। ওকে একা বলে না।

নিমাই আসে না ?

আসবার মুখ আছে নাকি ?

কৃষ্ণজীবন একটু উদাস হয়ে গিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, কাল নিমাই এসেছিল। চেহারাটা ভাল হয়েছে একটু। বেশি কথা বলল না। কিন্তু মুখখানায় এমন একখানা ভাব আছে যাতে ওকে ভাল লাগে। এরকম শুদ্ধ চোখ বড় একটা দেখি না।

কী বলল তোমাকে ? আমার নামে লাগায়নি ?

কৃষ্ণজীবন মাথা নেড়ে বলে, সেরকম লোকই নয়। তোর কথা তার মনে আছে বলেও তো মনে হল না।

কি করে বুঝলে ?

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

কী জিজ্ঞেস করেছিলাম।

তোর সঙ্গে দেখা করেছে কিনা। অবাক হয়ে বলল, আমি তো তার কাছে আসিনি। এ বাড়ির কর্তা আমার গুরুজন, তাঁকে প্রণাম করে চলে যাবো।

এত আশ্পর্ধা ?

কৃষ্ণজীবন হাসল, আমাকেও প্রণাম করেছে। বাবাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে প্রণাম করেছে।

পাঁচ হাজার ?

হ্যাঁ। বাবা অবশ্য নয়নি। ফিরিয়ে দিয়েছে।

কতক্ষণ ছিল ?

আধঘণ্টার বেশি নয়। দোকান খোলা আছে বলে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

বীণাপাণি চুপ করে বসে রইল। তার কান্না পাচ্ছে, রাগ হচ্ছে, সব লগুভও করে দিতে হচ্ছে করছে। ভগবান এমন একচোখো কেন ? আজ দান উল্টে বীণাপাণির রোজগার বন্ধ, আর ওদিকে নিমাইয়ের বরাত ফিরেছে। এরকম কেন হয় ?

কৃষ্ণজীবন হঠাৎ একটু নরম গলায় বলল, আমাকে একটা কথা বলে গেছে নিমাই। তোকে বলার জন্য।

কি কথা ?

বলেছে তুই বনগাঁয়ে ফিরে গেলে তোর কোনও অসুবিধে হবে না। বলে গেছে কাকা না কে যেন, তোকে আর কিছু বলবে না। মিটমিট হয়ে গেছে।

তড়িৎস্পর্শে উঠে দাঁড়ায় বীণাপাণি, বারবার খবরটা দিচ্ছে কেন বলো তো! আমার বনগাঁয়ে যাওয়া নিয়ে ওর এত মাথাব্যথা কেন ?

তা তো জানি না। আমিও ভাবছিলাম মেসেজটার মধ্যে একটা রহস্যের গন্ধ আছে।

না গো দাদা। কোনও রহস্য নেই। কাকার সঙ্গে আমার একটু মন কষাকষি চলছিল, তাই।

কৃষ্ণজীবন মাথা নেড়ে বলল, তা নয় রে বীণা। আমি বাবার কাছেও কিছু শুনেছি।

কী শুনেছ দাদা ?

তোর ডলার আর পাউন্ডের কথা। কাজটা ভাল করিসনি।

বাবাকে কে বলল ?

নিমাই, এখান থেকে যেদিন চলে গিয়েছিল মাঝরাত্তে, বাবার সঙ্গে দেখা হয়। তখন বলেছিল।

ওঃ। বলে বীণা শুদ্ধ হয়ে বসে থাকে।

ও টাকা তুই কেন যে বিপদ মাথায় করে নিজের কাছে রেখেছিলি!

ও টাকা তো কারও নয় দাদা ।
 সে তো ঠিকই । কারও নয় । তার মানে তোরও নয় ।
 কিন্তু গঞ্জিত ছিল যে ।
 তাহলেও সেটা যে গঞ্জিত রেখেছিল তার বাড়ির লোকের পাওনা । তোর পাওনা হয় কি করে ?
 তার বাড়ির লোককে পাবো কোথায় ?
 খুঁজেছিলি ?
 না ।
 ও টাকার জন্য তোকে বোধ হয় অনেক গুনাগার দিতে হল । না ?
 দাদা, আমি কি তবে চোর ?
 তুই বোকা ।
 আমি লোভী, না দাদা ?
 অভাবে পড়ে হয়তো লোভ করেছিলি ।
 তুমি আমাকে চোর বলবে না ?
 বললে কি তুই খুশি হোস ?
 না, বলোই না, চোর বলতে ইচ্ছে করে কি না ।
 না । চুরি করিসনি ঠিকই, তবে কাজটাও ভাল হয়নি ।
 এখন আমি কি করব দাদা ?
 কৃষ্ণজীবন মৃদু একটা ম্লান হাসি হেসে বলে, অনেক দুঃখের কথা শুনিয়েছিস আজ । তোর বিয়ে, সংসার, জীবনসংগ্রাম সব গুনলাম । কিন্তু এবার তোর সুখের কথাও গুনতে ইচ্ছে করছে ।
 সুখ কোথায় দাদা ? আমার মতো পোড়ারমুখি আর আছে ?
 অনেক আছে । তোর এখনই বা বয়স কী ?
 কী করতে বলো আমায় ?
 আমি বলি নিমাই যা বলে তাই কর । বনগাঁয়ে ফিরে যা । যাত্রাদলের চাকরি গেছে ভালই হয়েছে । আর ওপথে যাওয়ার দরকার নেই ।
 পেট চলবে কি করে ?
 পেট চালানোর ভার বাবা যাকে দিয়েছে তার ওপর আর একবার নির্ভর করে দেখ না !
 কার কথা বলছ ? নিমাই ? ওর সঙ্গে আর এ-জীবনে আমার মিল হবে না ।
 তাহলে যা ভাল বুঝবি করিস ।
 হ্যাঁ দাদা, তোমাদের নিমাই কাকার সঙ্গে মিটমাটের কথা বলে গেল কেন ? ঝগড়া তো আমার সঙ্গে কাকার, নিমাই মাঝখানে এসেছে কোথা থেকে ?
 তা জানি না ।
 বীণাপাণি সারা দিন কথাটা নিয়ে ভাবল । মিটমাট তো হওয়ার কথা নয় । মিটমাট হবে কি করে ?
 সারা রাতটা ঘুমহীন কাটল তার । সকালে উঠেই সে বনগাঁয়ে রওনা হয়ে গেল । সরেজমিনে ব্যাপারটা দেখতে হবে ।
 বুকটা দুঃস্বপ্ন করছে ।
 ঘোমটা টেনে বাস থেকে এক স্পট আগে নেমে পড়ল বীণা । তারপর অনেকটা হেঁটে দুপুরে নিজের ঘরে পৌঁছলো ।
 দরজার তালা খুলে ভিতরে ঢুকে শুক্ক হয়ে গেল সে । মিটমাট কিভাবে হয়েছে তা বুঝতে আর বাকি থাকল না ।
 তবু উপড় হয়ে গর্তটা ভাল করে খুঁজে দেখল বীণা । নেই । তার বুক-বুক করে লুকিয়ে রাখা অত ডলার আর পাউন্ড সব হাওয়া ।
 মেঝের ওপরই বসে পড়ল বীণা । বুকটা হাহাকারে ডরে গেল । দু' চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল ।
 দুঃখের দিনে ওই লুকোনো যথের ধনের কথা ভেবে কত ভ্রস পেরে সে । ভাবত সব গেলোও ওটা তো আছে ।
 আজ কিছু রইল না তার ।
 কাকাও তাকে আর বিশ্বাস করবে না কখনও ।
 সারা দিন রান্নাবান্না না করে না খেয়ে চুপ করে শুয়ে-রইল বীণা ।
 বিকলে তার কাছের প্রতিবেশীর মেয়ে সুমনা এসে বলল, ও মা! তুমি এসেছ বীণাদি! এদিকে কত কাণ্ড হয়ে গেল!
 তোমার জন্য খুব চিন্তা হচ্ছিল ।
 কী কাণ্ড রে ? বলে বীণা উঠে বসল ।
 তুমি কিছু জানো না ?
 না তো ।
 তোমাকে মারবে বলে কাকার দল ঘোঁট পাকিয়েছিল তা জানো ?
 না । তাও জানি না ।
 সজলদাকে তো খুব মেরেছে ।
 বীণা চুপ করে রইল ।
 ওরা নিমাইদাকেও ধরেছিল । নিমাইদা নাকি তোমার টাকা নিয়ে কাঁচরাপাড়া দোকান দিয়েছে । নিমাইদাকেও মারত ।
 মারেনি!

না। কাকা নিমাইদাকে খুব ভালবাসে তো!

তারপর বল।

নিমাইদা তোমাকে বাঁচানোর জন্য অনেক টাকা দিতে চেয়েছিল কাকাকে। এমন কি দোকান অবধি বিক্রি করতে চেয়েছিল। তা অবশ্য করতে হয়নি।

ঘরে গর্ত করল কে রে?

নিমাইদা এসে তোমার লুকানো টাকা বের করে কাকাকে দিয়ে দিয়েছে। নইলে নাকি তোমার বিপদ ছিল। হ্যাঁ, বীণাদি, এ নাকি সেই পগার টাকা?

বীণা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, একটু জল খাওয়াবি সুমনা? গলাটা শুকিয়ে আছে।

সুমনা দৌড়ে গিয়ে জল এনে দিল। তারপর বলল, তুমি নাকি আর যাত্রা করবে না বীণাদি?

কে জানে কী করব!

সজলদার সঙ্গে কি তোমার বিয়ে হবে?

কে বলেছে?

সবাই বলেছে।

না রে। ওসব বাজে কথাই কান দিস না। সজল কেমন আছে জানিস?

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে। ভালই আছে বোধ হয়।...

সন্ধের পর সজল নিজেই এসে হাজির। বীণা ঘরদোর ঝাটপাট দিয়ে হ্যারিকেন জ্বেলে স্টোভ ধরিয়ে চা করছিল।

সজল এসে বলল, বীণা, কেমন আছ?

আমার জন্য মার খেয়েছ সুনলাম।

তোমার জন্য সব পারি।

তোমার বীরত্বের দরকার ছিল না।

বীরত্ব কে বলল? তোমাকে পালানোর পরামর্শ দিয়েছিলাম বলে এই শাস্তি।

এখন কী হবে বলো তো!

তাই ভাবছি, দুজনেই বেকার।

॥ ১০১ ॥

আমাদের কত সামান্য হলেই চলে যায়, তবু দেখ, সেই সামান্যটুকুই হতে চায় না। রাজপ্রাসাদও নয়, বড়লোকদের ফ্ল্যাটবাড়িও নয়। দুখানা ঘর, একটু বারান্দা, কলঘর, একখানা রান্নাঘর, ব্যস হয়ে গেল। তা সেটুকুরও যা এন্টিমেট দাঁড়াচ্ছে তাতে চোখ উল্টে যায়। অনিন্দিতা আর তার মায়ের তাড়নায় না করের উপায় নেই, কিন্তু বড় ভয় পাচ্ছি বাবা, শেষ করতে পারব তো!

অনিন্দিতার বাবার মুখে দৃষ্টিভ্রমের রেখাগুলি সকালের স্পষ্ট আলোয় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল চয়ন, দেশের লক্ষ মানুষের মুখেও কি একই দৃষ্টিভ্রমের রেখা ফুটে নেই! একই গল্প, একই টেনশন, একই অনিশ্চয়তা, এরা মানুষের কাছে একটু আশা-ভরসার কথা শুনতে চান। চয়ন কীই বা শোনাতে পারে!

ইট, সিমেট, কাঠ যাতেই হাত দিতে যাই, হাতে যেন ছঁাকা লাগে। গত মাসখানেক ধরে কেবল দর জানতে বাজার ঘুরছি। যদি ছাদ ঢালাই না করে ওপরে টিন লাগাই তাহলে অনেকটা সস্তা হয়। কিন্তু এরা তো টিনের ঢাল শুনলেই ক্ষেপে যাচ্ছেন। এই যে তুমি টিনের ঢালের ঘরে আছো, তেমন কিছু খরাপ আছো কি? ওরা বুঝতেই চায় না।

চয়ন মৃদু স্বরে বলল, গুরু করলে ধীরে ধীরে হয়তো হয়ে যাবে।

দূর! সে চাকরি থাকলে হয়তো হত। তখন তো একটা আয় ছিল হে। এখন তো ঘরের টাকা ভেঙে খাচ্ছি। ফিস্ফুস ডিপোজিটে রেখে খানিক সুদ হয় বটে, কিন্তু তাকে কি চলে?

আপনার পেনশন নেই?

তাও আছে। তবে ওই যে বললুম, খরচ তো বাড়ে, কমে না।

ও। বলে চয়ন চিন্তিত হওয়ার একটা ভাব করল। কিন্তু অনিন্দিতার বাবার সমস্যা তাকে খুব একটা পীড়িত করছে না। করার কারণও নেই। বরং তার শুনতে একঘেয়ে এবং বিরক্তিকর লাগে। মানুষটিকে তার খুব পছন্দও হয় না। ইনি এখনও মনে করেন, অনিন্দিতার সঙ্গে চয়নের বিয়ে হওয়াটা উভয় পক্ষের আর্থিক সমস্যার সমাধান ও লোকবলের অভাব মেটানোর জন্য দরকার। এবং এ ব্যাপারে চয়নের মতামতের যে কোনও দাম আছে তাও ইনি মনে করেন না।

অনিন্দিতার বাবা মিটিমিটি চোখে তার দিক চেয়ে হঠাৎ বলল, তোমার তো বাবা ঝাড়া হাত-পা।

চয়ন একটু অবাক হয়ে বলল, অ্যাঁ!

বলছিলাম, তোমার তো দায়-দায়িত্ব কিছু নেই। নো লায়াবিলিটি।

চয়ন বলল, তা বটে।

টিউশনিতে আজকাল আয়ও তো ভালই।

চয়ন সংকুচিত হয়ে বলে, কোনওরকমে চলে যায়।

দেবে নাকি আমাকে কিছু ধার? আমি সুদ দেবো।

চয়ন একটু হাঁ করে থাকে। একজন লোক তার কাছে ধার চাইছে, এই ঘটনাটাই তার অবিস্বাস্য মনে হয়। সে আবার

কথা ঝুঁজে না পেয়ে বলে, অ্যাঁ!

বেশি নয়, হাজার দশেক পেলেই সামলে নিতে পারব।

চয়ন অবিশ্বাসের চোখে লোকটার দিকে চেয়ে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে তার পূর্বাঙ্গের ঘটনাগুলো মনে পড়তে থাকে। কদিন আগে হোমান্ন তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, ব্যাংকে তার কত টাকা আছে এবং তা দিয়ে কোনও একটা ব্যবসা বা টিউটোরিয়াল খোলা যায় কিনা, বাস্তবিকই তখনও সে জানত না, ব্যাংকে তার কত টাকা আছে।

না জানার কারণ হল, সে জানতে চাইত না। ভাবত অনেক টাকা জমলে সে একদিন নিজেকে নিজেই একটা সারপ্রাইজ দেবে। তার চেক-বই নেই, টাকাও তোলার দরকার হয় না। পাশ-বই এন্ট্রি করায় না। মাসে মাসে শুধু টাকা জমা দিয়ে যায়।

হোমান্ন যৌজা নিতে বলায় কয়েকদিন আগে সে ব্যাংকে গিয়ে যৌজা নিয়ে জানতে পারে, তার সুদে আসলে একান্ন হাজার টাকার ওপর জমা আছে। টাকাটা তার অনেক বলে মনে হল। এতটা আশাই করেনি।

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা সে ঘটনাটা অনিন্দিতাকে বলে।

অনিন্দিতাও অবাক হয়ে বলেছিল, একান্ন হাজার! তাহলে তো তুমি বড়লোক।

আমি ভাবছি কিছু একটা এই একান্ন হাজার দিয়ে শুরু করব।

করো। খুব ভাল হবে। কী করবে বলো তো!

এখনও ভাবিনি। তুমিও ভেবে দেখো তো কী করা যায়। আমার খুব ইচ্ছে করে একটা মনোহারি দোকান দেই। হরেক জিনিস থাকবে, নানারকম খন্দের আসবে, বিনিময় হবে। বেশ একটা জমজমাট ব্যাপার। বেঁচে থাকাটাকে টের পাওয়া যাবে।

করো, দোকানই করো।

কথা এইটুকু থেকে এতখানি গড়াল। অনিন্দিতা নিশ্চিত তার টাকার কথা ঐর কাছে গল্প করেছে। করতেই পারে। সেটা শুনেই লোকটা ধার চেয়ে বসেছে বোধহয়।

অনিন্দিতার বাবা একটু ব্যগ্র গলাতেই বললেন, ভেবো না যে, শোধ দিতে পারব না। বাড়িটা করলে বাসা-ভাড়াটা তো বেঁচেই যাবে। সেটা তো তোমাকে মাসে মাসে দিয়ে যাবো। ওখানকার একটা ওয়ুধের দোকানে একটা চাকরিও পাকা হয়ে আছে আমার। মাসে আট শো টাকা। সেটা হলে তো কথাই নেই।

লোকটার ওপর রাগ হল না চয়নের। মায়া হল, এ যে তার চেয়ে অপদার্থ লোক! চয়ন কিছুক্ষণ ভেবে বলল, আমার এত টাকা আছে বলে আপনার মনে হল না?

লোকটা অবাক হয়ে বলে, নেই? কিন্তু অনিন্দিতা যে বলছিল, তোমার নাকি অনেক টাকা আছে ব্যাংকে!

চয়ন একটু হাসল। বলল, অনেক কষ্টে জমিয়েছি। একটা দোকান দেওয়ার ইচ্ছে ছিল।

লোকটা চয়নের ডান হাতটা চেপে ধরে বলল, দোকান তোমার হবে। দশটি হাজার টাকা আমার বড় দরকার। বিশ হাজারই চাইতুম, কম করেই বলছি।

চয়ন নিজের দুর্বল হাতটা চেষ্টা করেও ছাড়াতে পারল না। বলল, আচ্ছা, আমি চেষ্টা করে দেখব।

চেষ্টা নয় বাবা, টাকাটা না দিলেই নয়। বড্ড বেঘোরে পড়ে গেছি। আমার বউ আর মেয়ে আমাকে বাড়ি-বাড়ি করে তিষ্ঠাতে দিচ্ছে না। মাঝে মাঝে আত্মহত্যা করতেও ইচ্ছে হয়। মেয়ের বিয়েটা আর হবে না। তা না হোক, বাড়িটাই করে ফেলি। হিসেব করে দেখছি এই দশ হাজার টান পরে আমার।

আপনি অত উতলা হচ্ছেন কেন? আমি ভেবে দেখছি।

কবে আসব বাবা?

চয়ন হাসল, আসবেন।

আমি বরং রোজই একবার তোমাকে মনে করিয়ে দিয়ে যাবো। কিন্তু একটা কথা। টাকার ব্যাপারটা যেন অনিন্দিতা বা তার মা না জানতে পারে তাহলে আত্ম রাখবে না আমাকে।

চয়ন মান হেসে বলল, ধার করা তো অপরূপ নয়।

তবু বলার দরকার নেই। আমি নির্লজ্জ বলে তোমার কাছে ধারটা চাইতে পারলুম। ওরা তো আমার সমস্যাটা জানে না।

অদ্রলোক চলে যাওয়ার পর চয়ন অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। মানুষকে প্রত্যাখ্যান করার শক্তিটাও যে তার কেন নেই! তার জানা আছে, এই ছাপোষা অবসরপ্রাপ্ত লোকটি কোনও দিনই তার টাকা শোধ দিতে পারবে না। তবু একে না দিয়েই কি সে পারবে? বাধা হবে চক্ষুলাজ্জা, বাধা হবে নিজের কাছে ছোট হয়ে যাওয়ার ভয়।

সকালের টিউশনি সেরে ফেলার পথে সে ব্যাংকে গেল এবং ভয়ে ভড়ে কাউন্টারে বলল, আমি যদি দশ হাজার টাকা তুলতে চাই তাহলে কী করতে হবে?

সুবেশ এবং সুভদ্র ক্লার্কটি বলল, অত টাকা তুলতে একটা প্রায়র ইন্টিমেশন দিতে হয়। আপনি ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করুন।

ম্যানেজারও একজন সুবেশ লোক, তবে কিছুটা গম্ভীর। শুনে-টুনে একটা চেক-বই ইস্যু করে বললেন, কাল এসে টাকা নিয়ে যাবেন।

রাত্রিবেলা অদ্রলোক আর একবার এলেন, গিয়েছিলে নাকি ব্যাংকে?

হ্যাঁ।

তুলেছো?

না। তবে কাল দেবে।

অদ্রলোক স্বস্তির শ্বাস ফেলে বললেন, বাঁচালে বাবা। টাকাটা পেলেই কাজ শুরু করে দেবো। রাজমিস্ত্রির সঙ্গে কথা হয়ে আছে।

এটা বলেই ভদ্রলোক চলে গেলেন।

পরদিন টাকাটা দুপুরে ভুলে আনল চয়ন। ভদ্রলোক রাত্রিবেলা এসে নিয়ে গেলেন। তারপর চয়নের একটু ফাঁকা-ফাঁকা লাগল। এর আগে সে আর কাউকে কখনও ধার দিয়েছে বলে মনে পড়ে না। এই প্রথম। এবং এতগুলো টাকা! তার একটু দুঃখও হচ্ছিল টাকাগুলোর জন্য। অনিন্দিতার বাবার যা অবস্থা তাতে ইচ্ছে থাকলেও টাকাটা শোধ করার উপায় ওঁর নেই।

টাকার কথাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে চয়নের একটু সময় লাগল। পরদিন বিকেল পর্যন্ত অন্যমনস্কতাটা রয়ে গেল তার। মোহিনী বলল, চয়নদা, আপনার কী হয়েছে? এত আনমাইন্তফুল লাগছে কেন?

ও এমনি।

আপনার সবই শুধু এমনিই।

কত কী ঘটে যায়! বলে চয়ন লাজুক হাসল।

মোহিনী বলল, মা বলে, চয়নটা যা অন্যমনস্ক রাস্তায় ঘাটে অ্যাকসিডেন্ট না করে বসে!

না, ওসব ভয় নেই। অন্যমনস্ক থাকি বটে, কিন্তু একটা ইনস্টিংট কাজ করে।

আচ্ছা, আপনি কি একটা খবর শুনেছেন?

কী খবর?

চারুমাসি ফিরে আসছে।

অবাক হয়ে চয়ন বলে, তাই নাকি!

হোমাসদা এসেছিল কাল। বলে গেল চারুমাসি নাকি ফোন করে কানাডা থেকে জানিয়েছে মাসের শেষেই ফিরে আসবে।

কেন?

একদম নাকি ভাল লাগছে না।

চয়ন, কেন কে জানে, খবরটায় খুশি হল। টিউশনি ফিরে পাবে বলে নয়, চারুমশীলা পরম উদারভাবে তাকে নানা উপঢৌকন দেবে বলেও নয়—যেন এক প্রবাসের আত্মীয় বা প্রিয়জন ফিরছে। এরকম তো তার আর কারও বেলায় হয় না!

টাকার কথাটা চয়ন ভুলে যেতে পারল এবার। আর কোনও কাঁটা খচ খচ করল না তার মনের মধ্যে।

দিন দশেক বাদে একদিন ভদ্রলোক এসে সন্ধ্যাবেলা বললেন, বাবা চয়ন, যা উপকার করেছে তা আর বলার নয়। কাজ ধাঁ-ধাঁ করে এগিয়ে যাচ্ছে। ভাগ্যিস একতলার গাঁথনিটা অনেক আগেই একটু করে রেখেছিলাম, বাড়িটা তাই টকাটক উঠে যাচ্ছে।

সেটা তো খুব ভাল কথা।

টাকায় একটু টান পড়তে পারে শেষের দিকে। যদি পড়েই, তুমি একটু দেখো বাবা।

টান পড়বে?

পাঁচ-দশ হাজার পড়তে পারে। ঠেকাটা পার করে দিও।

চয়ন লোকটার দিকে চেয়ে রইল। খুবই বিস্ত্রিত সে। কিন্তু বিরক্ত নয়। এ লোকটার আর কোনও সোর্স নেই।

একটা কথা ভেবেছি।

কি কথা?

বাড়ির অর্ধেকটা তোমার নামে লিখে দেবো।

সে কী! আমাকে দেবেন কেন?

আমার তো ছেলে নেই, একটা মাত্র মেয়ে। লিখে দিলে তোমার কাছে আমার ঋণেরও খানিকটা শোধ হয়।

চয়ন প্রায় আত্ননাদ করে ওঠে, না না, তার দরকার নেই।

ভদ্রলোক মৃদু হেসে বলেন, দুখানা তো মাত্র ঘর। তা হোক, একটা তুমি নাও।

আমি নিয়ে কী করব?

কেন, থাকবে! এ ঘরে তোমার কত কষ্ট হয়।

না, আমার কষ্ট হয় না। বেশ তো আছি।

তোমার মানিমারও খুব ইচ্ছে তোমাকেও নিয়ে যায়।

কেন! আমি গিয়ে কী করব?

ওই যে বলেছিলেন তোমাকে, সবাই মিলে একটা টিম করে থাকব। তোমাকে আমাদের খুবই পছন্দ।

চয়ন মৃদু হেসে বলল, জানি। কিন্তু সেটা ভাল দেখাবে না। আমারও সুবিধে হবে না। অত দূরে গেলে টিউশনির অসুবিধে হবে।

আহা দূর কিসের! আমাদের অফিসের একটা লোক ব্রাজ কাটোয়া থেকে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করত, জানো?

তা হয়তো করে। কিন্তু আমি ততটা শক্ত মানুষ নই।

ভেবে দেখো বাবা। একটু ভাবো।

চয়ন মাথা নেড়ে বলে, ভাববার কিছু নেই। এটা হয় না।

তাহলে ওই কথাই রইল। যদি শেষ দিকে ঠেকে যাই, পাঁচ-দশ হাজারের জন্য যেন কাজটা আটকে না থাকে, একটু দেখো বাবা। পাই পয়সা অবধি শোধ দেবো। সুদ সমেত।

আমি সুদ চাই না।

ন্যায্য পাওনা ছাড়বে কেন!

লোকটা চলে গেলে চয়ন দুঃখিত হৃদয়ে বসে রইল। সে কি একটুও কঠোর হতে পারে না!

মাস শেষ হয়ে নতুন মাসের শুরুতেই ফিরে এল চারুশীলা। মোট বারোটা স্যুটকেস এবং হ্যান্ডব্যাগ ভর্তি জিনিস। এয়ারপোর্টে নেমেই কোনওক্রমে কাস্টমস ডিভিজে বাইরে পা দিয়েই বলে উঠল, উঃ, বাঁচলাম বাবা!

চারুশীলাকে রিসিভ করতে একটা বাহিনীই হাজির ছিল এয়ারপোর্টে। তার মধ্যে চয়নও। সে চারুশীলার মুখে যে স্বস্তির প্রকাশ দেখল তাতে হাসিই পাচ্ছিল তার। আনন্দের হাসি। এই অস্থিরচিত্ত মহিলা চয়নের একটা নির্ভরতার স্থল। এই ফিরে আসা যেন চয়নের রক্ষণ শুদ্ধ জীবনে মেঘের সঞ্চার। দুর্বল হাতে সেও গোটা দুই স্যুটকেস বইল। তিনখানা গাড়ি এবং চারটে ট্যাক্সিতে বোঝাই হল মাল ও মানুষ।

বাড়িতে বসে গেল একটা সভা। সুব্রত আসেনি। ছেলেমেয়ে নিয়ে শুধু চারুশীলা। তিনজনের মুখেই আনন্দ আর স্বস্তির হাসি। এই ভিড়ের মধ্যে চয়ন এক ধারে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। তার শুধু চেয়ে থাকা। চেয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ তার চোখে একটা দৃশ্য ধরা পড়ল। এই ভিড়ে ভিড়াকার জমায়েত ও উচ্চকণ্ঠ কথাবার্তার মধ্যে দু' জোড়া চোখ মাঝে মাঝে পরস্পরের দিকে নিবন্ধ ও নিষ্পলক হয়ে থাকছে। তারপর দুজনেই যেন লজ্জা পেয়ে সরিয়ে নিচ্ছে চোখ। বার বার।

হোমস হঠাৎ চারুশীলাকে বলল, বারোটা স্যুটকেস এনেছিস, তোদের তিন জনের পাওনা তো মোটে ছটা স্যুটকেস!

তাও আমেরিকা থেকে এলে। বাকি ছটা কি মাশুল দিয়ে আনলি? কত গেল?

চারুশীলা চোখ পাকিয়ে বলে, সব জায়গায় তোর এত হিসেব কেন রে? মাশুল দিয়েছি বেশ করেছি।

আমেরিকার বাজার তো ফাঁকা করে দিয়ে এসেছিস দেখছি।

কিনবা না তো কি? কী সন্তায় কী সুন্দর সুন্দর জিনিস! যা দেখি তাই কিনতে ইচ্ছে করে।

ওইটেই তো তোর রোগ! কনজিউমারিজমের চূড়ান্ত।

আর তুই তুই কিছু কম যাস নাকি! বাড়টাকে তো জিনিসের মিউজিয়াম বানিয়ে রেখেছিস।

হোমস ব্যথিত গলায় বলে, অতীতের কথা। আজকাল আর কেনাকাটা করিই না। তোকে দেখেই বৈরাগ্য এসেছে।

বেশি বকিস না। জাহাজে আমার আরও জিনিস আসছে।

গোটা জাহাজ বোঝাই করে নাকি?

হলেই বা। তোর মতো সন্নিহি তো নেই। আমার বাপু টাকা ওড়াতে ভাল লাগে।

চয়নের দিকে চেয়ে চারুশীলা হঠাৎ বলল, এই চয়ন, অমন চুপচাপ কোণে দাঁড়িয়ে কেন? ইস, কতকদিন পরে চেনা মুখগুলো আবার দেখছি! আমার হাঁফ ধরে গিয়েছিল। এসো তো চয়ন, আমার সামনে এসে বোসো। তোমার জন্য অনেক জিনিস এনেছি।

চয়ন মৃদু হেসে বলে, অত জিনিস দিয়ে কি করব? আমি তো একটা মানুষ। আপনি কত শার্ট প্যান্ট দিয়েছেন।

তাতে কি? আরও দেবো। ওই হোমসের মতো বৈরাগী হয়ে থেকো না। ভাল পোশাক পরবে, ভাল খাবে-দাবে।

তোমার চেহারা একটু ফিরেছে।

বিদেশের গল্প উঠল। কফি আর বিদেশী বিস্কুট সার্ভ করা হল। সব কিছুর মধ্যে চয়ন শুধু দেখেছিল দুটি নিঃসঙ্গ মানুষের দু' জোড়া চোখ মাঝে মাঝে জোড়া লাগছে। সরে যাচ্ছে। বার বার।

চারুশীলার ফিরে আসায় কলকাতাটা অনেক ঝলমলে হয়ে গেল চয়নের কাছে। বাতাসে যেন একটা আনন্দের বার্তা বয়ে যাচ্ছে। বড় খুশি হল। আরও খুশি হল, দু' জোড়া চোখ দু' জোড়া চোখকে খুঁজে বেড়াচ্ছে বলে। '...'

তিন মাসের মাথায় হঠাৎ এক সন্কেবেলা অনির্দিষ্টা উঠে এল ছাদে।

শোনো, তোমার সঙ্গে সিরিয়াস কথা আছে।

চয়নের আজ শরীর ভাল নেই। বর্ষার শুরুতেই তার ঠাণ্ডা লেগে সামান্য জ্বর হয়েছে। টিউশনিতে যায়নি। ঘরে বসে বই পড়ছিল। উঠে বসে বলল, বেলো।

অনির্দিষ্টা দরজায় দাঁড়িয়ে তার দিকে গম্ভীর চোখে চেয়ে বলল, তুমি কি বাবাকে টাকা দিয়েছো?

চয়ন মাথা নত করে বলল, কে বলেছে?

বাবাই বলেছে। তবে সহজে নয়। আমরা বাবার লক্ষণ জানি। জেরা করে করে কথা বের করছি।

চয়ন মৃদু স্বরে বলল, উনি ধার নিয়েছেন।

কত টাকা?

আপাতত দশ হাজার।

আপাতত মানে! আরও দেবে নাকি?

উনি বলেছেন, আরও কিছু লাগতে পারে।

অনির্দিষ্টা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, হি।

রাগ করছো কেন?

রাগ করব না! তুমি কত কষ্ট করে চালাও তা তো আমি জানি। বাবা কী আঁক্কেলে তোমার কাছ থেকে টাকা নিল তা বুঝতে পারছি না। লোকটা সারা জীবন এইসব করে বেড়াচ্ছে।

চয়ন মৃদু হেসে বলল, ছিল, তাই দিলাম।

ছিল মানে! কষ্ট করে টাকা জমিয়েছো, ব্যাংক খাকলে সুদ হত। তোমার টাকার গল্পটা আমিই বাবা আর মায়ের কাছে করেছিলাম। সেইটেই ভুল হয়েছে দেখছি। টাকার গন্ধ পেয়েই তোমাকে এসে ধরেছে। আমাদের কিছু বলেনি। কিন্তু বাবার টাকার সব হিসেব আমরা জানি। বাড়তি দশ হাজারের হিসেব আমি ধরেছি। তারপর চোপ ধরায় বাবা স্বীকার করেছে যে, টাকাটা তুমি দিয়েছো। আচ্ছা চয়ন, বাবাকে টাকাটা দেওয়ার আগে তোমার কি উচিত ছিল না আমাকে একবার জিজ্ঞেস করে নেওয়া! তুমি তো জানো না, বাবা কিরকম লোক।

চয়ন একটু হাসল :

অনিন্দিতা বলল, কাজটা খুব খারাপ করেছে। আমরা না জানতে পারলে টাকাটা তুমি আর ফেরত পেতে না। বাবা খারাপ লোক নয়। কিন্তু গরিব তো! গরিবের চরিত্র বলে কিছু থাকে না। তোমার টাকাটা বাবার শোধ দেওয়ার ক্ষমতাই নেই।

সেটা আমি জানতাম।

জেনেও দিলে? তুমি অদ্ভুত মানুষ। দশ হাজার টাকা এক কথায় যে দিয়ে দেয় সে কিন্তু বোকাও।

কেন যে টাকাটা নিয়ে এত কথা বলছো! আমার লজ্জা করছে।

তোমার চেয়েও আমার লজ্জা ঢের বেশি। শোনো, বাবাকে আর একটি পয়সাও দেবে না। বাবাকে আমিও খুব বকে দিয়েছি।

তুমি আজ খুব উত্তেজিত।

আমার বড় সম্মানে লেগেছে। বাবা যদি টাকাটা শোধ দিতে না পারে তাহলে তোমার কী ধারণা হত বলা তো আমাদের সম্পর্কে?

খারাপ ভাবতাম না। লোকে তো অভাবে পড়েই নেয়!

তুমি জানো না। বাবার অভাব যতটা নয় তার চেয়ে বেশি হল উদ্বেগ। আমরা গরিব ঠিকই, কিন্তু একখানা ছোটো বাড়ি করার মতো টাকা বাবার ছিল। বসে থেকে থেকে সময় গেল, জিনিসের দাম বাড়ল, এই কৃপণতার কোনও মানে হয়!

চয়ন ফের মূদু একটু হাসল।

তোমাকে আজই বাবা এক হাজার টাকা দিয়ে যাবে। বাকিটা শোধ দিতে একটু দেরি হতে পারে কিন্তু দু' মাসের মধ্যে নিশ্চয়ই।

আরে, অত তাড়াহড়োর কি আছে!

তোমার নেই, আমার আছে। বুঝলে!

বুঝছি। বাড়ি কন্সট্রাক্ট?

ছাদ ঢালাই হয়ে গেছে। জানালা দরজা হয়নি, হবেও না। তবে বাঁশের ঝাঁপ দিয়ে কাজ চালানো যায়। দেখা যাক।

তুমি যে কেন এত উতলা হচ্ছে? বাড়িটা ওঁকে শেষ করতে দাও, তারপর টাকা শোধ দিলেও চলবে।

না, তা হয় না। তোমার কন্সট্রাক্টর টাকা, ও টাকা নেওয়া পাপ।

তা নয় অনিন্দিতা, আর কেউ ওঁকে টাকাটা দেবে না। সন্দেহ করবে, অবিশ্বাস করবে, কিংবা দিলেও চড়া সুদ নেবে।

সে তো ঠিকই। কিন্তু এভাবেই আমাদের চলতে হবে। ভেবো না।

তুমি অকারণে রাগ করছো।

অকারণে নয়। বাবাকে আমি চিনি। উনি তোমাকে পেয়িং গেস্টও রাখতে চাইছেন। লোকটা খুব বোকা। বাস্তব বুদ্ধি কিছু নেই। উনি ভাবছেন তোমাকে আর আমাকে একটা সম্পর্কে বেঁধে ফেলা যাবে।

চয়ন মূদু মূদু হাসতে লাগল।

অনিন্দিতা বলল, হেসো না। বাবার বোকামি দেখলে গা জ্বলে যায়।

আরও তিন মাস বাদে অনিন্দিতারা চলে গেল। বাড়ি যাহোক করে শেষ হয়েছে। বাকিটা বাড়িতে গিয়ে শেষ করবে। যাওয়ার সময় অনিন্দিতা খুব কঁদেছিল। বলল, তোমার মতো একটা মানুষ কি আর পাৰো? ভাল থেকে।

টাকাটা ওরা শোধ দিয়ে গেল। কিন্তু তাতে একটুও খুশি হল না চয়ন। মনে হল, না দিলেই বোধহয় ভাল ছিল। কত কষ্ট হল ওদের! হয়তো গয়না-টয়না বিক্রি করেছে।

॥ ১০২ ॥

কাকা তাকে ডাকল না, খোঁজও করল না। প্রথম দিন কয়েক আশায় আশায় ছিল বীণাপাণি। কাকা তাকে বড় আটটি করার স্বপ্ন দেখত। হয়তো সোম্বাট ভুলে গিয়ে ক্ষমা করে দেবে, ডেকেও পাঠাবে। কিন্তু একদম সাড়াশব্দ নেই।

দিন মাতেকে বাদে বীণাপাণি বুঝতে পারল, কাকা তাকে আর ডাকেবে না। হয়তো প্রতিশোধ নেবে না, কিন্তু তা বলে সব ভুলেও যাবে না। নিজের সম্মান বিসর্জন দিয়ে বীণা গিয়ে দাঁড়াতেও পারবে না কাকার সামনে।

কিন্তু দিন কি করে চলবে সেইটাই সমস্যা। পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিল কাকা। তখন সুনজরে দেখত, বোনাস না কি যেন বাবদে টাকাটা দিয়েছিল তাকে। ব্যাঙ্কে একটা ফিক্সড ডিপোজিট করে রেখেছিল সে। টাকাটা তুলতে হল।

সজল এসে প্রায়ই বলে, চলো, বিয়েটা সেরে ফেলি।

আজকাল বিরক্ত হয় বীণাপাণি। বলে, বিয়ে-বিয়ে করছো কেন বলা তো! ওটা একটা ব্যাপার নাকি? আমার জীবনে কত বড় সর্বনাশটা হয়ে গেল বলা তো! কোনও দল যদি না ডাকে তবে না খেয়ে মরতে হবে। ভাগ্যিস কিছু টাকা বোনাস দিয়েছিল কাকা, তাই চলছে।

সেই পাঁচ হাজার টাকা?

হ্যাঁ।

সজল একটু হেসে ম্লান মুখে বলল, বোনাস কে বলল?

কাকাই তো বলেছিল এরকম একটা কথা।

সজল মাথা নেড়ে বলল, বোনাস নয়। কাকাও দেয়নি নিজের ট্যাক থেকে।

তাহলে?

ওটা দিয়েছিলেন তোমার স্বামী নিমাইবাবু।
স্তম্ভিত হয়ে গেল বীণাপাণি, তার মানে!
কাকাই একদিন বলেছিল, নিমাই বীণার স্বর্ণ শোধ করতে টাকা পাঠিয়েছে। মিথ্যে কথা বলে টাকাটা তাকে গছাতে হয়েছে।

নিমাই দিয়েছে!

হ্যাঁ। আমি জানি বীণা।

বীণা বিছানায় অবশ শরীরে বসে পড়ে বলল, স্বর্ণ শোধ দিয়েছে?

সেরকমই শুনলাম। নিমাইবাবু মানুষটি বড্ড ভাল। আমি যখন গিয়েছিলাম তখনও মনে হয়েছিল, খুব সং ধর্মভীরু মানুষ। আমি মাংস-পরোটা খেয়েছিলাম, উনি দাম দিতে দেননি।

সেইজন্যই ভাল?

না বীণা, সেইজন্য নয়। কেমন যেন মনে হয়েছিল, উনি এই আমাদের মতো নন। অন্যরকম।

ওকে তোমরা কিছুই জান না। ভীষণ পাজি, নিমক-হারাম, শয়তান।

সজল মাথা নেড়ে বলে, তা ঠিক। বাইরে থেকে আর কতটা বোঝা যাবে! তবে দোকানটা কিন্তু খুব চলে। আমি গত সপ্তাহে কাঁচা পাড়া গিয়েছিলাম। দোকানটা দেখলাম আরও বড় হয়েছে। প্রচণ্ড বিক্রি।

বীণা রাগের গলায় বলল, তাই এত টাকার গরম! আমার স্বর্ণ শোধ দিয়েছে!

ভাগিস দিয়েছিল! নইলে তোমার এখন চলত কিসে? তোমারও চাকরি নেই, আর আমাকে তো তাড়িয়েই দিয়েছে অপমান করে।

বীণা চুপ করে রইল। বুকে আশ্রয় জুটছে।

বীণা, মিছিমিছি রাগ করে কী করবে? জীবনে এরকম খারাপ সময় সকলেরই মাঝে মাঝে আসে। আমি তোমাকে বিয়ের কথা কেন বলি জানো? দুজনে মিললে আমাদের একটা জোর হবে। একটা কিছু করতে পারব।

কী করবে?

ধরো যদি যাত্রার দল করি!

যাত্রার দল করা কি চাটখানি কথা!

খুব শক্তও নয়। এ অঞ্চলে তোমার বেশ নামডাক আছে। তোমাকে দাঁড় করালে ধীরে ধীরে একটা দল করা যায়।

তোমার অভিজ্ঞতা নেই বলে স্বপ্ন দেখছে। কাকার বিশ্ববিজয় অপেরা নিতান্তই ছোট দল, তবু তারও কত লোকজন, কত জিনিসপত্র লাগে দেখেছে? কাকা পয়সাওলা মানুষ বলে পেরেছে। আমরা পারব না।

চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি!

বীণা সবগে মাথা নেড়ে বলে, ওসব আমাকে বোলো না। নতুন দল গড়ে তারপর কেঁচে গঠন করা আমার পোষাবে না। ওসব তোমার জন্য। আমি অনেক ঠেকে শিখেছি।

কেন যে এত হতাশ হয়ে পড়ছে!

আমার সমস্যা তুমি বুঝবে না। তাই বিয়ের জন্য অমন হামলে পড়ছে।

আমরা তো একসঙ্গে থাকতেও পারি!

না সজল, তাও পারি না। আমাকে যত সস্তা বলে তুমি ভাবো ততটা সস্তা আমি নই। যদি শরীর চাও তাহলে বাজারে মেয়েমানুষের অভাব নেই। তাদের কাছে গেলেই পারো।

সজল লজ্জায় লাল হয়ে বলল, ছি ছি বীণা, আমি মোটেই ওভাবে বলিনি। আমি বলছিলাম নিমাইবাবুর সঙ্গে যখন তোমার ডিভোর্স হয়নি তখন বিয়েটা হয়তো অসামাজিক হবে। তাই বলছিলাম, আজকাল তো লিভিং টুগেদার হয়।

হতে পারে। কিন্তু ওসব প্রস্তাব আমার এখন ভাল লাগে না সজল। এখন তুমি যাও।

কথার মাত্রা রাখতে পারিনি। মাগ করে দিও।

সজল গেল। কিন্তু ছাড়ল না। মাঝে মাঝেই আসতে লাগল। সজলকে কিছু খারাপ লাগে না বীণার। কিন্তু এই অনভিজ্ঞ, কপর্দকহীন সুন্দর ছেলেটার হাতে নিজেকে সমর্পণ করার কথাও কেন যেন আজকাল আর সে ভাবতেই পারে না। বসে বসে গল্প করতে তার অবশ্য খারাপ লাগে না।

গল্প করে করে ভিন মাস কেটে গেল। তাদের সম্পর্ক একটুও এগোলো না। বীণা ঘোরাঘুরি করে এল চিংপুরের যাত্রাপাড়ায়। কোনও দলেই জায়গা নেই। অবস্থা ধীরে ধীরে খারাপ হচ্ছে। হাতের টাকা ফুরিয়ে এল প্রায়। দৃষ্টিভ্রান্ত রাত্তি ভাল ঘুম হয় না।

কুসুম এসে একদিন বলল, বীণাদি, কাজ করবে?

কী কাজ রে?

সেলাই ফোঁড়াই জানো? তাহলে সমীরবাবুর ওখানে কাজ হতে পারে। উনি সেলাই জানা লোক খুঁজছেন। কাঁথা ফোঁড় না কী যেন বলে, শাড়ির ওপর সেই কাজ করতে হবে।

ধূস! ওসব আমি পারি না।

কুসুম হেসে বলল, তাহলে কী করবে?

হ্যাঁ রে, কাকা আমার কথা কিছু বলে না?

না।

একদম না?

না গো, তোমার কথা আর কেউ বলে না।

নতুন পালা নামছে নাকি, জানিস ?

হ্যাঁ ; কাকা তো নতুন একটা পালা লিখল । বর্ষাকালটা জোর রিহার্শাল হবে ।

আমার বদলে এখন কে করবে মেইন পার্ট ?

পুতুল রায় বলে সেই যে মেয়েটা । সে-ই করছে ।

এঃ মা ! তার তো লেপাপোছা নাক-চোখ । জিবেবর আড় ভাঙেনি ।

এখনকাকা তো তাকেই তৈরি করছে ।

বীণার মন খারাপ হয়ে গেল । কুসুম তার ঘরের কাজকর্ম আজও করে । তাকে সঙ্গও দেয় । তার কাছে দলের অনেক খবর পায় বীণা । সেইসব খবর তার দীর্ঘস্থাসের কারণ হয় । এই যে পুতুল নামে মেয়েটা, ফিরে তাকানোর মতো চেহারাও নয় । আর অভিনয়ের কিছুই জানে না এখনও, এর কথা ভেবে আবার দীর্ঘস্থাস ফেলল সে ।

হ্যাঁ রে কুসুম, আমাকে একটা লক্ষ্মীর পট এনে দিবি ?

দেবো না কেন ? কী করবে ?

কোনওকালে পূজোআচ্ছা ধর্মকর্ম করিনি তো ! আজকাল মঝে মাঝে মনে হয়, এসব একটু করে দেখি ।

খুব ভাল হয় বীণাদি । লক্ষ্মীর পাঁচালিও কিনে আনব'খন । মন ভাল হবে । দেখো ।

শুধু লক্ষ্মী নয়, কয়েকদিনের মধ্যেই বীণার ঘরে লক্ষ্মী, শিবলিঙ্গ, কালী আর শীতলার পট চলে এল । একটা সস্তা জলটোকির ওপর তাদের বসানো হল । বীণা ব্যস্ত হয়ে পড়ল তাদের নিয়ে । ঠিক যেরকম ছেলেবেলায় পুতুল খেলত সেরকমই অবস্থা এখন তার ।

সজল এসে সব দেখে হাসে, কী করছে বলো তো ! হঠাৎ এত পূজোআচ্ছা কেন ?

কিছু নিয়ে তো থাকতে হবে !

কিছু নিয়ে থাকতে চাও তাহলে তো সবচেয়ে ভাল হত একটা দল করলে । নতুনদের নিয়েই করব ।

তুমি এখনও দল করার কথা ভাবছো ?

ভাবছি । আমার তো আর কোনও যোগ্যতা নেই । অভিনয়টাও ভাল জানি না, তবু বড় নেশা । একটু ভাবো না বীণা ! তোমাকে পাশে পেলে মনে হয়, অনেক কিছু করতে পারি ।

আমাকে পাশে পাওয়ার আশা ছাড়ো । আমি আর নতুন করে কিছুই শুরু করতে পারব না । আমার মন ভেঙে গেছে ।

ডলার আর পাউন্ডগুলো নিয়েই কি এত কাণ্ড হল ?

হ্যাঁ । ও টাকা কাকার নয় । আমার কাছে একজন গচ্ছিত রেখেছিল । ন্যায্য পাওনা আমারই হয় ।

আমাকে যদি একবার বলতে তাহলে ঠিক কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ব্ল্যাকে বেচে একটা ক্যাপিটাল করে ফেলতাম । আজ আর টাকার জন্য কিছু আটকাত না ।

আজ আর টাকাটার জন্য শোক নেই । তবে দল ছাড়তে হলে বলে কান্না পায় । কেউ আর আমাকে চিনবে না ।

চিনবে বীণা । তোমার ভিতরে যা আছে তা কম মেয়ের মধ্যেই পাওয়া যায় । আমি দল করার কথা ভাবছি । তুমি তাতে অভিনয় করতে রাজি তো ?

বীণা হাসল, গাছে কাঁঠাল, গাঁফে তেল ।

পারব বীণা, নিশ্চয়ই পারব ।

আচ্ছা আমার আজও জানা হয়নি তোমাকে ওরা মারল কেন ?

ও কথা থাক । মেরেছে তো কী হয়েছে ! আমি ওদের অন্য ভাবে মারটা ফিরিয়ে দেবো । সেইজন্য তো দল করার কথা ভাবছি ।

বরং বাড়ি ফিরে যাও সজল । সংসারে মন দাও ।

দূর ! আমার আবার সংসার কোথায় ?

মা-বাপ তো আছে ।

তারা আমার ধার ধারে নাকি ? ভাই তো আমাকে দেখতেই পারে না । যাত্রা করে বেড়াই বলে শ্রেষ্ঠিঞ্জও দেয় না ।

এখানেই বা কোন মুখে আছো ? কি করে চলে তোমার ?

সে কি ভুঁমি জানো না ? চেহারাটা উদ্ভলেকের মতো, গান গাইতে পারি, গল্প জমাতে পারি, লোকের দায়ে দফায় দৌড়ঝাপ করতে পারি, এইসব প্রায় পয়েন্ট থাকায় এর ওর তার বাড়িতে মাগা গৌজা বা দু-মুঠোর জোপাড় হয়ে যায় । দুটি মেয়েকে গান আর একটা ছেলেকে তবলা শেখাই । আবৃত্তি শেখানোর ক্লাসও খুলছি । একে কি বেঁচে থাকা বলে বীণা ? কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় কি বলো তো !

বিয়ের ভূত মাথা থেকে নেমেছে ?

বিয়ের ভূত ? কী যে বলে ! বিয়ে করার কথা কখনও মনেই হয়নি । তোমাকে দেখার পর মনে হল, হ্যাঁ, এরকম, কাউকে পেলে এ জীবনটার একটা সার্থকতা আসবে । এটা ঠিক শরীরের আকর্ষণ নয় বীণা, এ একটা অনারকম ব্যাপার ।

শোনো, আমার একটু তীর্থে যাওয়ার শখ হয়েছে । যাবে সঙ্গে ?

কোথায় যেতে চাও ?

প্রথমে তারকেশ্বরে যাই চলো । সকালে গিয়ে বিকেলে চলে আসব । তারপর একবার তারাপীঠ ।

কেন বলো তো ! তোমার হলোটা কী ?

কী যে হল তা বুঝতে পারছি না । দেখিই না এসব করে একটু । কোনওদিন তো ভগবানকে ডাকিনি ।

ঠিক আছে । কবে যাবে বোলো, সঙ্গে যাবো । তোমার সঙ্গে যাওয়ার তো একটা থ্রিল আছে ।

কথাটা কেন যেন ভাল লাগল না বীণার । কথাটা পবিত্র নয় ।

দু'দিন পর বীণা তারকেশ্বর গেল বটে, কিন্তু সঙ্গে সজলকে নিল না, নিল কুসুমকে। সারা দিনটা কেটে গেল যাতায়াতে। ভিড়ে, ঠেলাঠেলিতে। যখন ফিরল তখন শরীর ক্লান্ত, মনও ক্লান্ত।
হ্যাঁ রে কুসুম, তীর্থ করে এলাম তবু মনটা ভাল লাগছে না কেন রে ?
ওমা! ও কি কথা! আমার তো খুব ভাল লাগছে। বাবা তারকেশ্বর যেন গা থেকে পাপতাপ সব পুঁছে নিয়েছেন।
ঝরঝরে লাগছে।

তোর আবার পাপটা হল কিসে ?

আহা, কত পাপ অজান্তেও হয়।

তাহলে তোর জন্যই এইসব তীর্থতীর্থ। তোর মতো যদি সবার হতে পারতাম!

তোমার না মনটাই খুব চঞ্চল। সকলের তীর্থে গেলে আনন্দ হয়, তোমার কেন হয় না ?

আমি বোধহয় খুব পাপী।

যাঃ! তুমি খুব ভাল।

সে তোর কাছে। ভগবানের কাছে নয়।

একটা কথা বলব বীণাদি ?

বল না।

মেয়েদের কাছে কিন্তু স্বামীও ভগবান। কথাটা বললে তুমি রাগ করবে, নিমাইদাদাও কিন্তু বড় ভাল মানুষ। ভগবান যদি তোমার ওপর রেগে থাকেন তাহলে ওইজন্যই।

রেগে যেতে গিয়েবীণা হেসে ফেলল, তোর অঙ্ক খুব সোজা। সব একেবারে স্পষ্ট দেখতে পাস, না ?

তা নয় তো কী ?

তুই জীবনে খুব সুখী হবি। খুব অহ্লাদে থাকবি।

তুমি কেন নিমাইদাকে ভালবাসো না বলো তো! ওরকম মানুষকে ভাল না বেসে পারা যায় ?

তুই বুঝি নিমাইদার প্রেমে পড়েছিস রে মুখপুড়ি ?

কী যে সব অসভ্য অসভ্য কথা বলো!

অসভ্য কেন হবে! ঠিকই তো বলছি। এতই যদি পছন্দ তবে বিয়ে করে ফেল। এখন তো আর আমি তার বউ নই।

ইস! তোমার মুখের একেবারে আগল নেই। বীণাদি, ভগবান কিন্তু পাপ দিচ্ছেন।

বীণা খুব হাসল, বলল, দিক না পাপ।

খুব তো বলছো, ওদিক জুরের ঘোরের স্বপ্ন দেখে তো কাদতে বসেছিলে নিমাইদাদা আবার বিয়ে করেছে ভেবে। আমাকে খবর আনতে বলেছিলে, মনে নেই ?

তা আছে।

তবে অত বড় বড় কথা বলছো যে! তুমি মনে মনে ঠিকই নিমাইদাদাকে ভালবাসো, মুখে স্বীকার করতে চাও না।

খুব বুঝেছিস।

বুঝিনি ?

হাই বুঝেছিস।

কুসুম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, কি জানি বাপু, আমি মুখ্যসুখ্য মানুষ। যেমন বুঝি বলি। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বীণা শরীর হল। বলল, হয়তো তুই-ই ঠিক বুঝিস রে। কে জানে কে ঠিক আর কে ভুল!

বীণা চুপচাপ শুয়ে রইল। সারা দিন গরম আর ঘামে তার শরীর দুর্বল লাগছে। মনটা বিবাদে ভরা। এভাবে কি জীবন কাটবে ? এই কাজ-না-থাকা, পালা-না-থাকা, ক্ল্যাপহীন জীবন কিভাবে কাটবে তার ?

রাতে কিছু খেল না বীণা। রান্না করতেই ইচ্ছে করল না। শুয়ে মড়ার মতো ঘুমোলো।

সকালে উঠে তার মনে হতে লাগল, এভাবে জীবন কাটবে না তার। এভাবে কিছুতেই বেঁচে থাকা যাবে না। তাকে কিছু করতে হবে। কী করবে সে ? কী করবে ?

বেলা দশটা নাগাদ যখন দ্বিতীয়বার চা খেতে বসেছে বীণা, তখনই একটা ছেলে এল। সাধারণ চেহারা। বিনয়ী। বলল, আমাকে নিমাইদাদা পাঠিয়েছেন। এই যে চিঠি।

নিমাইয়ের চিঠি! খুব অবাক হল বীণা। মুক্তোর মতো হস্তাক্ষরে খামের ওপর তার নাম লেখা। চিঠিটাও মুক্তাক্ষরে। তবে সন্ধান নেই। শুধু লেখা: তোমার অবস্থা আমি জানি। যদি দোষ না ধরো তাহা হইলে সামান্য কিছু টাকা গ্রহণ করিও। এই অর্থে কোনও গ্লানি নাই। আমি-পরিশ্রম দ্বারা উপার্জন করিয়াছি। নিমাই।

বীণা চোখ তুলে চাইতেই ছেলেটা তার প্রান্তিকের ব্যাগ খুলে এক বাটল নোট বের করে দিল।

আত্মর্থের বিষয়, বীণা কিছু না ভেবেচিন্তেই টাকাটা নিল।

পাঁচ হাজার আছে। ওনে নিন।

শুনতে হবে না।

একটু যদি লিখে দেন তো ভাল হয়।

কী লিখবো ?

টাকাটা যে পেয়েছেন।

ও।

বীণা ঘরে বুঁজেপেতে একটা পাট মুখস্থ করার খাতার কাগজ ছিড়ে তাতে লিখল, টাকাটা পেয়েছি। বীণা।

সারাটা দিন বীণা আজ ঝুম হয়ে বসে রইল। রান্না করতে ইচ্ছে হল না। খিদে পেয়েছিল, মুড়ি চিবিয়ে চা খেয়ে খিদেটা মারল।

কুসুম সন্ধেবেলা এল ।
 কী গো বীণাদি, মুখ শুকনো কেন ?
 এমনি বসে আছি । মন ভাল নেই ।
 আবার কী হল ?
 তোমার নিমাইদাদার কাছে হেরে যাচ্ছি ।
 আহা, কী কথা! হারার কী হল ?
 তোমার নিমাইদাদা আমাকে খোরপোষ পাঠাচ্ছে ।
 সে আবার কী ?
 বউকে ভাগ দিলে খোরপোষ দিতে হয় না, তাই!
 কুসুম হাসল, টাকা পাঠিয়েছে বুঝি ?
 হ্যাঁ, আর আমিও নির্লজ্জের মতো নিলাম ।
 নেবে না কেন ? ও টাকা তো আশীর্বাদ!
 তোমার মতো করে ভাবতে পারলে বোধহয় ভাল হত । আমি যে পারি না ।
 না পারো, টাকাটা মাথায় ঠেকিয়ে খরচ করো । ওতেই হবে ।
 কী হবে রে ?
 ভাল হবে ।
 বীণা কিছু বলল না । আজ মনটা অন্যরকম লাগছে । অদ্ভুত লাগছে ।
 বীণাদিদি, একটা কথা বলব ?
 বলনা!
 যাও না একবার নিমাইদাদার কাছে!
 গিয়ে ?
 পায়ে পড়ো গিয়ে ।
 ওমা, কেন ?
 ক্ষমা চাও ।
 তাই বা কেন ?
 স্বামীর পায়ে ধরতে হয় ।
 তোমার মাথা!

॥ ১০৩ ॥

হ্যাঁ গো, গৃহপ্রবেশে আমরা কাকে কাকে নেমন্তন্ন করব ? রবিবারের এক সকালে বিষণ্ণ মণীশকে কথটা জিজ্ঞেস করল অপর্ণা ।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে । মেঘলা আকাশ নিবিড় মেঘে ছাইরঙা হয়ে আছে । মণীশ বসে আছে আবছা অন্ধকার ঘরে, জানালার ধারে তার পলকা ইজিচেয়ারে । পাশে একখানা টেবিল । ইংরেজি-বাংলা দুটো খবরের কাগজ জড়ো হয়েছে তার ওপর । মণীশ কাগজদুটো একটু উল্টেপাল্টে রেখে দিয়েছে, যেন পৃথিবীর কোনও খবরেই তার আর কোনও প্রয়োজন নেই । বিষণ্ণ দুটি চোখ জানালার বাইরে স্থাপন করে সে চুপ করে বসে আছে ।

ক্রমে ক্রমে মণীশের এই চুপ হয়ে যাওয়া ভাল লাগছে না অপর্ণার । আজকাল রাতে বিছানায় শুয়ে আগেকার মতো কিছুক্ষণ গল্প করার অভ্যাসটাও কমে যাচ্ছে তাদের । অপর্ণার অনেক কথা থাকে । বলেও, কিন্তু মণীশ নীরবে শোনে । জবাব দিতে চায় না । মণীশের কাছ থেকে কথা বের করতে না পেরে অপর্ণার নিঃশব্দ লাগে, ভয় হয় । ভয় জিনিসটার কোনও মাথাগুণ নেই । কতরকম ভয়, কত রকম যে অমঙ্গলের কথা মনে হয় সব সময়ে!

হ্যাঁগো, কী হল তোমার ? বলে মণীশের মাথায় সন্নেহে হাত রাখল অপর্ণা ।

মণীশ চোখ দুখানা তার দিকে তুলল । মুখে বিমর্ষতা ছাড়া আর কোনও এক্সপ্রেশন নেই । শুধু ছেলে হোস্টেলে গেছে বলেই কি এতটা মনখারাপ হয় কারও!

মণীশ একটু জোর করেই হাসল । বলল, কিছু হয়নি । আজকাল একটু গুটিয়ে যাচ্ছি নিজের মধ্যে । কী বলছিলে ?

আমি বলছিলাম, গৃহপ্রবেশে কাকে কাকে ডাকা হবে ? কার্ড ছাপিয়ে নেমন্তন্ন করতে হবে কি না । ক্যাটারার কাকে ঠিক করবে । অনেক কথা আছে যে তোমার সঙ্গে । এমন চুপ করে থাকলে তো আমার চলবে না!

মণীশ একটু উঠে সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করে বলল, এগুলো তো সব তোমার ব্যাপার । আমার তো কয়েকজন অফিস-কলিগ ছাড়া ডাকার কেউ নেই । আত্মীয়স্বজনই বা কে বলো! একটা ভাই, তা সেও বিকানিরে । তাকে নেমন্তন্ন করলেও আসতে পারবে না । আমি বলি, তুমি যাকে ইচ্ছে ডাকো । আমি আমার কলিগদের কয়েকজনকে ডাকতে পারি ।

তোমার অনেক বন্ধু ছিল একসময়ে । যখন খবরের কাগজে কাজ করতে তখনকার কলিগরাও তো আছে! ডাকবে না তাদের ?

মণীশ প্রস্তাবটা মাছি তাড়ানোর মতো হাতের ঝাপটায় উড়িয়ে দিল । বলল, আরে না না, ও চ্যাপটার কবেই ফ্রোজড হয়ে গেছে । কে হায় হুদয় ঝুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে ? পুরনো আমল ধরে টানটানি কেন ভাই!

কেমন দেখাবে বলো তো সেটা! আমার বাপের বাড়ির লোকেরা আসবে, তোমার কেউ আসবে না ?

মুখটা করুণ করে মণীশ বলল, আমার কেউ নেই যে অপু! কবে মা-বাবা মরে গেছে। এক কাকা ছিল, বছর পাঁচেক হল নেই। তার ছেলে নয়ন দিল্লিতে চাকরি করে, মেয়ে রাউরকেল্লায়। বহুকাল যোগাযোগ নেই। এদের ডাকার কোনও মানেই হয় না! কেউ আসবে না।

তাইতো বলছি, পুরনো বন্ধুদের ডাকো!

সেটাও অর্থহীন হবে। সম্পর্কই নেই, হঠাৎ নেমন্তন্ন করার মানে হয়?

আচ্ছা, একটা কথা বলবে?

কি কথা?

তুমি এক সময়ে দারুণ আড্ডাবাজ ছিলে। কিন্তু ধীরে ধীরে সব ছেড়ে দিলে কেন?

আবার জোর করে একটু হাসে মণীশ, মেজাজটা হারিয়ে গেছে।

কেন হারাল?

বিয়ে করার পর থেকেই কেন যেন বাইরে বাইরে কাটাতে ভাল লাগত না। তখন ফটোগ্রাফির জন্য খুব ঘুরে বেড়াতে হত। একটা ক্লাস্তি ছিল। তোমাকে পেয়ে ঘরমুখো হলাম। তারপর নতুন একটা ভাল চাকরি পেয়ে আড্ডাটা ছাড়তে হল। ছেলে-মেয়ে হওয়ার পর আরও সরে এলাম। এরকম সবারই অল্পবিস্তর হয়।

না গো, তুমি বড্ড বেশি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছো! তোমাকে এতখানি ঘরকুনো আড্ডাছাড়া করতে কি আমি চেয়েছিলাম, বলো তো?

একটু অবাক হয়ে মণীশ বলে, তুমি করেছো বলিনি তো! আমার নিজেরই ভাল লাগত না।

কাজটা বোধহয় ভাল করেনি। তোমার একটা বাইরের জগৎ থাকলে বোধহয় ভালই হত।

হান একটু হাসল মণীশ, এই-ই ভাল আছি।

বুবকার জন্য কি তোমার খুব বেশি কষ্ট হয়?

মণীশ মাথা নেড়ে বলে, না, বুবকা বড় হয়ে গেল, এখন তো দূরে সরে যাবেই। ওটা মেনে নিয়েছি। অত ভাবছো কেন?

তোমারমুখখানা যে ভীষণ করুণ দেখায় আজকাল।

ও এমনিই। আমার মনের কোনও ব্যালাস নেই। এই ভাল, এই খারাপ।

অফিসে কিছু হয়নি তো?

আরে না, অফিসে কী হবে!

তাহলে এমন মেলাকলিক হয়ে যাচ্ছে কেন? আগে তো ঝুমকি বুবকা আর অনুর সঙ্গে আড্ডা মারতে, মেয়ে দুটো তো আছে।

মণীশ হাসল, হ্যাঁ আছে। তবে ওরা পরভূৎ। ভাব করে কি হবে! কিছুদিন পরেই তো অন্যের ঘরে পালিয়ে যাবে।

উঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারি না। নিজের মেয়ে পরের ঘরে যাবে বলে তো খুব দুঃখ, আর পরের মেয়েকে যে তুলে এনেছো নিজের ঘরে! তার বেলা?

তা বটে। কিন্তু আমি তো জীবনের নিয়ম পাশ্টে দিতে চাই না অপু। যা ঘটবার তা ঘটবেই! বুবকা বড় হল, হস্টেলে গেল, এরপর হয়তো বিদেশে চলে যাবে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাবে। এসব ঘটনা তো স্থির হয়েছে। আমি শুধু একটু গুমরে মরব এই যা!

ইজিচেয়ারের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে অপর্ণা বলল, ওগো ওরকম করতে নেই। তুমি ওরকম করলে আমি যে ভীষণ দুর্বল হয়ে যাই। তুমি আগের মতো একটু হই-চই করলে আমার বুকটা ঠাণ্ডা হবে।

স্তিমিত গলায় মণীশ বলে, আমার ভিতর থেকে হৈ-চৈ ভাবটা উঠে আসছে না অপু। তোমাকে যদি আমার ভিতরটা দেখাতে পারতাম! যেন একটা অন্ধকার ঘর। শব্দ নেই, আলো নেই, কিছু নেই।

ও মা গো! শুনলে বুকটা কেমন করে।

ভয় পেও না। হয়তো একটা ডিপ্রেসন চলছে। ঠিক হয়ে যাবে।

বরং বুবকাকে তাড়াতাড়ি আসতে বলে চিঠি লিখে দিই।

না না, এই তো সামার ড্যাকেশন কাটিয়ে গেল। ওসব করতে যেও না। বুবকার জন্য নয় অপু। বুবকাও একটা ফ্যান্টারি বটে। কিন্তু আসলে হার্ট অ্যাটাকটাই আমার ভিতরে মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে। আজকাল কেবল এই বৃথা জীবনযাপনের অর্থটা হাতড়ে বেড়াই, কিছু পাই না।

তোমাকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে এবার ঠিক আমার হার্ট অ্যাটাক হবে। কী করলে তুমি ভাল থাকবে বলো তো?

তা তো জানি না। মাঝে মাঝে মনে হয় বেশ তপোবনের মতো যদি একটা জায়গা খুঁজে পেতাম। শান্ত, পবিত্র, নির্জন, চারদিকে নিবিড় গাছপালা, তাহলে বোধহয় সেখানে গিয়ে থাকতে ভাল লাগত।

সেরকম জায়গা বোধহয় খুঁজলে পাওয়া যাবে। কদিন ছুটি নিয়ে চলে ঘুরে আসি।

খুব উৎসাহ দেখাল না মণীশ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ওরকম জায়গা হয়তো পাওয়া যাবে, কিন্তু গিয়ে হয়তো আমার আর ভাল লাগবে না।

হঠাৎ অপর্ণা বলল, আচ্ছা, আমার মনে পড়ল, চারুশীলার ভাই হেমাঙ্গ এরকমই একটা কোন জায়গায় যেন গিয়ে মাঝে মাঝে থাকে। চারুশীলার সঙ্গে ঝুমকিও একবার গিয়েছিল। সুন্দরবনের দিকে বোধহয়। সে নাকি নদীর ধারে খুব সুন্দর নির্জন একটা জায়গা। দাঁড়াও, ঝুমকিকে ডাকি।

থাক অপু! ওসব পরে হবে। তুমি তোমার গৃহপ্রবেশের কথা কী বলছিলে?

অপর্ণা স্নান হয়ে বলে, আমার গৃহপ্রবেশের কথা তো কেউই শুনতে চাইছে না। বাড়িটা যেন একা আমার। কী সুন্দর দেখতে হয়েছে বাড়িটা! যে দেখছে সেই পছন্দ করছে। চারুশীলার বর সুব্রত নিজে ডিজাইন দেখে দিয়েছে। কত বড় আর্কিটেক্ট! শুধু এবাড়ির কারোরই গাল উঠছে না।

তা নয় অপু। আমার এখন আর জাগতিক কিছু প্রতিই আকর্ষণ নেই। তোমার বাড়ি খুব সুন্দর হয়েছে সন্দেহ নেই। আমার ভালও লেগেছে। তবে আমার আরও গভীর চিন্তার কারণ ঘটেছে বলেই বাড়িটা নিয়ে ভাববার বা আনন্দ করার মেজাজটা নেই।

সেইজন্যই তো আমার মন খারাপ। তোমার আনন্দ না হলে ও বাড়ি দিয়ে আমার কী হবে? আমার এত পরিশ্রম বৃথা গেল।

মণীশ মুদুরের বলল, আচ্ছা, আমি কি ইচ্ছে করে ডিপ্রেসড হয়ে আছি? মানুষের জীবনে মাঝে মাঝে এমন তো হতেই পারে যখন সে নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করে হেরে যায়।

আমি শুধু কারণটা জানতে চাই।

কারণটা যদি আমিও জানতাম! নিজের মনে পাঁতি পাঁতি করে খুঁজে দেখছি রোজ, বুঝতে পারছি না।

আমার মনে হয়, বুঝবার জন্যই।

হতে পারে। তবে কি জানো, আজকাল আমার একা চূপচাপ থাকতে ভাল লাগে। আমি বরাবর হৈ-চৈ ছল্লোড় ভালবাসি। নির্জনতা বরং সহিতে পারতাম না। আজকাল কেন লোনলিনেস ভাল লাগে!

তুমি কি ইনট্রোভার্ট হয়ে যাচ্ছে?

তাও জানি না। কিছুই জানি না। শুধু তোমাকে বলি, প্লীজ, আমাকে নিয়ে অত দৃষ্টিশীল কোরো না। কয়েকদিন যাক, স্পেলটা হয়তো কেটে যাবে।

অপর্ণার দু'চোখ টলটল করছিল জলে, এবার উপচে পড়ল। স্থলিত গলায় বলল, তোমাকে এরকম দেখলে আমার কত কষ্ট হয়তো জানো?

জানি অপু। আমি তো তোমার কাছেই আছি।

কোথায় কাছে আছো! কত দূর মনে হয় তোমাকে তা কি জানো?

তাও জানি। বিয়ার উইথ মি। আমার সঙ্গে এই সময়টা পার করে দাও।

আমার গৃহপ্রবেশের কী হবে?

গৃহপ্রবেশ হতে বাধা কি? হোক।

তুমি পার্টিসিপেট করবে তো?

কেন করব না? শুধু একটা অনুরোধ, অফিস থেকে এ বাড়িটার ভাড়া দিচ্ছে। আপাতত আমরা এ বাড়ি ছাড়ব না।

কেমন?

নিজের বাড়ি থাকতে আর পরের বাড়িতে কেন?

এখান থেকে অফিসে যাতায়াতের সুবিধে বেশি। তাছাড়া এ জায়গাটা আমার বেশ ভদ্র বলে মনে হয়।

গৃহপ্রবেশের পর কি বাড়ি তালাবন্ধ পড়ে থাকবে?

তাই থাক না কিছুদিন।

অপর্ণা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তাই থাক।

আজ মেঘলা বৃষ্টির দিনের চাপা অন্ধকারে অপর্ণার সকালটা মাটি হয়ে গেল। সে বীর পায়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। হল পেরিয়ে সামনের বারান্দায় এসে বৃষ্টির দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার এখনও কত অপূর্ণ সাধ রয়ে গেছে। বাড়িটা হল, এরপর ছিল বাড়ি সাজানোর পালা। এখনও রং হয়নি ভিতরে। প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে পলেস্তারা পড়েছে। ওপরে হবে হালকা খুশিয়াল রঙের প্র্যাক্টিক পেইন্ট। সামনের ঘরে ওয়াল পেপার লাগাবে বলে পছন্দও করে রেখেছিল একটা আয়নাও দৃশ্য। কী যে চমৎকার হত। নতুন কিছু আসবাব দিয়ে সামনের হলঘরটা ছবির মতো সাজাবে।

কিন্তু কী হবে আর? যাকে নিয়ে, যাকে ঘিরে তার জীবনের সব সাধ-আহ্লাদ, সে কেন এরকম মনমরা হয়ে যাচ্ছে?

কী হয়েছে মা? এনিথিং রং? কাদছো নাকি?

অপর্ণা ফিরে অনুকে একটু দেখল। অনু আর ছোটোটি নেই। তার কাঁধ ছাড়িয়ে উঠছে। লকলক করছে বয়স। ওদের আর ভুলিয়ে রাখা যায় কি?

অপর্ণা চোখ মুছল। ধরা গলায় বলল, বাপির কাছে যা। কথা বলিস না। কাছে বসে থাক। মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দে, যা।

অনু একটা চিন্তা করল যেন। তারপর বলল, বাপি ইজ ক্রুর্ডিং। ভেরি মাচ ইন এ ট্রান্স। বাপিকে ডিস্টার্ব কেন করবো মা?

তোমার বাবার কী যে হয়েছে বুঝতে পারছি না।

বোধহয় হি ইজ মিসিং দাদা ভেরি মাচ।

তাই তো ভাবছি। কিন্তু এতটা কি স্বাভাবিক? ছ' মাসের বেশীই তো হয়ে গেল। এখনও কেন মিস করবে?

বাবা যে দাদাকে ভীষণ ভালবাসে। কিন্তু তুমি এত আপসেট কেন মা? হোয়াই ইউ?

আমার ভাল লাগছে না। গৃহপ্রবেশে কত আনন্দ হবে বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু করতে ইচ্ছে করছে না।

অনু বেশ সুন্দরী। ফরসা, স্বাস্থ্য বেশ চমৎকার, মুখখানা চটক-সুন্দর। খুমকির সৌন্দর্য অন্যরকম। সে রোগার দিকে, লাভণ্যই বেশী। তাকে চোখে পড়ে না, কিন্তু একটু তাকিয়ে থাকলে খুমকি যে কত সুন্দর তা বোঝা যায়। অনু চট করে চোখে পড়ে। নিচের টোঁটো ঝকঝকে সুন্দর দাঁতে একটু কামড়ে ধরে সে বলল, আচ্ছা, আমি বাপির কাছে যাচ্ছি।

শোন, বেশি কথা বলসনি।
আচ্ছা মা। আমি আজকাল বাপিকে অন্য ধরনের কম্প্যানি দিই। কবিতা শোনাই, শেক্সপীয়র শোনাই, বিটোফেন শোনাই। বুঝেছো?

বুঝেছি, তুমি তো পাকা মেয়ে।
ঠিক কথা। আমি ম্যাচিওরড।
শোন, বরং এক কাপ কফি করে নিয়ে যা। তোর বাবা এসময়ে একটু কফি খায় ছুটির দিনে। আজ বৃষ্টিও হচ্ছে।
ঠিক আছে।
ঝুমকি উঠেছে?
কখন! শী ইজ অলসো ব্রুডিং।
কেন?
আজকাল দিদিও তো চুপচাপ মা। অল অফ ইউ আর কিপিং মাম।
অনু চলে যাওয়ার পর আরও কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখল অপর্ণা। তারপর হলঘর পেরিয়ে এল ঝুমকির ঘরে।
ঝুমকি এই সাতসকালে একটা মোটা বই খুলে পাশে রেখে টেবিলে খাতা খুলে কী লিখছে।
কী করছিস?
ঝুমকি তার ঠাণ্ডা হাসি হেসে বলল, একটু কাজ।
কিসের কাজ?
একটা প্রোথামিং। যার্শিখেছিলাম সব প্র্যাকটিসের অভাবে ভুলে যাচ্ছি।
তোর বাবা এত চুপচাপ হয়ে গেছে যে আমার মনটা ভাল নেই।
ঝুমকি একটু অবাক হয়ে বলল, ঠিক বলেছো তো মা! বাবা আগের মতো আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কিও করছে না আজকাল, তাই না?
এতদিনে সেটা টের পেলি?
ঝুমকি একটু লজ্জা পেয়ে বলে, আমি ভাবছিলাম, বুঝকার জন্য বোধহয় মন খারাপ।
যদি তাই হয় তবে কি আমাদের উচিত হবে না লোকটাকে একটু আনন্দের মধ্যে রাখা।
সে তো ঠিক কথা। আচ্ছা, আমি বাবার কাছে যাচ্ছি।
এখন দরকার নেই। অনুরূপে পাঠিয়েছি। এখন আবার তুই গেলে ভাববে আমিই দুজনকে পাঠিয়েছি।
তাহলে থাক। আমি বরং পরে যাবো। বাবাকে নিয়ে তুমি কি খুব চিন্তায় পড়েছো?
পড়ব না?
অত চিন্তা করো না, আমার বাবা একজন কারেজিয়াস সেলফ-মেড ম্যান। একটু সেন্টিমেন্টাল আছে, কিন্তু আমার বাবা সহজে কাবু হওয়ার লোক নয়।
অপর্ণা ময়ের দিকে একটু চেয়ে থেকে বলে, আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল একটা ট্রামের মধ্যে। সামনে একটা রক্তমাখা লাশ পড়ে আছে, তখনও ভাল করে মরেনি। ভয়ে কাঁঠ হয়ে আছি। অর্ধচৈতন্য। তোর বাবা ক্যামেরা খুলিয়ে উঠে এল। পটাপট ছবি তুলল, তারপর আমাকে দেখে খুব অবাক হয়ে কী যেন বলল। আমি জবাবও দিতে পারিনি। তখন আমাকে হাত ধরে টেনে নামিয়ে আনল। চারদিকে কাদানে গ্যাস, গুলি। এসপ্লানডেড ইস্টে পুলিশ লাঠিচার্জ করছে। কী সাহস ছিল লোকটার!

গল্পটা তারা বহুবার শুনেছে। ঝুমকি বলল, ছিল নয় মা, আমার বাবা এখনও সাহসী। বাবার মতো এরকম পুরুষ দেখাই যায় না। বাবা এই ফেজটা কাটিয়ে উঠবে।
তোমরা দুই বোন বাবাকে একটু সঙ্গে দিও। ছেলের জন্য তাহলে আর ততটা মন খারাপ করবে না।
আচ্ছা মা।
হ্যাঁ রে, হেমাস্ববুর একটা বাড়ি আছে না কোন গ্রামে যেন!
ঝুমকি হঠাৎ যেন একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। তারপর বলল, হ্যাঁ, নিশিপুর।
তুই একবার গিয়েছিলি না চারুশীলার সঙ্গে?
হ্যাঁ তো।
তোর বাবাকে সেখানে কয়েকদিন রাখা যায়?
ঝুমকি একটু ভেবে বলল, তার কি দরকার আছে মা?
কথাটার জবাব আগে দে। উল্টে প্রশ্ন করছিস কেন?
রাগ করলে?
তোর বাবা এটা নির্জন জায়গা চাইছে।
ঝুমকি ইতস্তত করে বলে, বলে দেখা যায়। হেমাস্ববুর প্রতি উইক-এও সেখানে চলে যান বলেই শুনেছি।
এক সপ্তাহ যদি আমি আর তোর বাবা গিয়ে সেখানে থাকতে চাই তাহলে রাজি হবে হেমাস্ব?
তা হবে বোধহয়।
একটু বলে দেখ না। হেমাস্ব তো চমৎকার মানুষ। যেমন বিনয়ী, তেমনি অদ্ভুতবোধ, ওর বাড়িতে ফোন আছে, ফোন করে দেখবি?
আজ রবিবার। বোধহয় আজ সেখানেই গেছে।
দেখ না একবার! যা বৃষ্টি হচ্ছে ক'দিন। হয়তো যায়নি।
নম্বর দিচ্ছি, লাইনও না হয় ধরে দিচ্ছি, তুমিই কথা বলো মা।

আমি! আমার সঙ্গে তো ততটা পরিচয় নেই। একটু আলাপ।

ঝুমকি ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলে, আমার বড্ড লজ্জা করছে মা। শুধিয়ে বলতে পারব না।

ওমা! মেয়ের লজ্জা দেখ। যখন চাকরি করতে গিয়েছিলি তখন এ লজ্জা কোথায় ছিল? দুটো মাত্র কথা জিজ্ঞেস করবি, অত লজ্জার কী?

ঝুমকি কাতর গলায় বলে, প্রীজ মা। আচ্ছা, আমি না হয় চারুমাসীকে দিয়ে বলিয়ে দিচ্ছি।

তবু নিজে বলবি না? ঠিক আছে, চারুকেই বল। সেটাই ভাল হবে বোধহয়।

ঝুমকি উঠল এবং চারুশীলার নম্বর ডায়াল করল।

তার গলা শুনেই চারুশীলা চৈতন্যে উঠল, এই ঝুমকি! শীগগির চলে আয়। আজ শাহী পোলাও করা হচ্ছে। সঙ্গে আলু মটর আর মুগাঁর দো-পেয়াজ। আসবি?

না মাসী। এ বৃষ্টিতে বেরোলে মরে যাবো।

আচ্ছা বাবা, গাড়ি পাঠাচ্ছি।

ঝুমকি হাসল, ফের বাড়াবাড়ি শুরু করেছে! তুমি কি একটুও একা থাকতে পারো না?

একা কী রে? জায়েন দ্য ক্রাউড। আমার বাড়িতে এই বৃষ্টিতেও কারা আজ এসেছে জানিস?

কারা?

রিয়া উইথ চিলড্রেন, মলয় নামে সুব্রতর এক বন্ধু উইথ ফ্যামিলি অ্যাও দেয়ার ইজ অ্যানাদার পারসন। গেস হ?

কি জানি বাবা।

দূর বোকা! পারলি না? হেমাঙ্গ! দ্যাট গ্রেট সল্যুসী ব্রাদার অফ মাইন। চলে আয়।

শোনো মাসী, আমার একটা কাজ করে দেবে?

কি কাজ রে?

আমার মা আর বাবা এক সপ্তাহের জন্য একটা আউটিং-এ যেতে চায়। হেমাঙ্গবাবুর সেই নিশিপুরের বাড়িটায় ওদের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে?

ধুস! এটা একটা কাজ হল?

দাও না তাহলে বলে।

তুই নিজেই বল না। ঐ তো হেমাঙ্গ ক্যারম খেলছে।

না মাসী। আমার লজ্জা করছে।

আচ্ছা তাহলে বলছি। কিন্তু কণ্ডিশন আছে।

কী কণ্ডিশন?

গাড়ি পাঠাচ্ছি, চলে আয়। এ বাড়িতে আসতে তো তোর নেমস্তনের দরকার নেই।

না, আজ থাক।

অবজেকশন ওভারক্লড। গাড়ি যাচ্ছে। পাঁচ মিনিটে তৈরি হয়ে নে।

আচ্ছা বাবা, গাড়ি লাগবে না। দু' মিনিটের তো ইটাপথ। আমিই যাচ্ছি।

না বাবা, তোর ঠাণ্ডার ধাত। ভিজলে আবার গল্পগোলা হবে। গাড়ি তো বসেই আছে। তৈরি হয়ে নে।

ফোনটা রেখে মায়ের দিকে চেয়ে ঝুমকি বলল, হল তো! ফোন করে ফ্যাসাদ ডেকে আনলাম। এখনও ও বাড়িতে যেতে হবে।

হেমাঙ্গর বাড়িটা পাওয়া যাবে?

তা যাবে। কিন্তু এখন আমাকে তৈরি হতে হবে যে! নেমস্তন।

তা যা না। চারু বড় ভাল মেয়ে।

ঝুমকি তৈরি হচ্ছিল। বুক কাঁপছে। গলা শুকোচ্ছে। সে নিজের কাছে ধরা পড়ে গেছে অনেক দিন। মনে মনে অনেক লড়াই করেছে। হেরে গেছে। কী করবে ঝুমকি? তার যে কিছুই করার নেই।

প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে সদরে একটা গাড়ি এসে থামল। দরজা খোলা ও বন্ধের শব্দ হল। তারপরই ডোরবেল।

দরজা খুলে অপর্যাপ্ত একটা অপ্রতীত। সামনে এক গাল হাসি নিয়ে হেমাঙ্গ দাঁড়িয়ে।

আরে, আপনি এসেছেন! আসুন।

গায়ের পাতলা বর্ষাতিটা খুলে হেমাঙ্গ ঘরে ঢুকে বলল, মণীশবাবু কোথায়?

বসুন, ডাকছি।

মণীশ এল। প্রসন্ন মুখে বলল, কী খবর?

আপনাকে আমার গায়ের বাড়িতে নেমস্তন করতে এলাম। কবে যাবেন বলুন!

মণীশ অপ্রতীত, বলল, যাবো'খন। তাড়া কি?

না না, আমার তাড়া আছে। আমি আমার বাড়িটা কয়েকজন সজ্জনকে দেখাতে চাই।

মণীশ হাসল।

অপর্যাপ্ত বলল, হেমাঙ্গবাবুর বাড়িটা নাকি খুব সুন্দর জায়গা। চলোই না কয়েকদিন বেড়িয়ে আসি।

মণীশ মাথা নেড়ে বলল, ছুটি নেই যে।

ছুটির দরকার নেই। চাকরি যাবে না। চলো।

ভিতরের ঘরে ঝুমকি শুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চারুমাসীটা যে কী? ওকেই পাঠাল কেন নিতে? ঝুমকির বুঝি লজ্জা করে না?

ছোট ফিয়াট গাড়ির মধ্যে তারা দুজন সামনের সিটে পাশাপাশি বস। চারদিকে বৃষ্টির ঝরঝড়া, সামনের উইন্ডস্ক্রিনে বৃষ্টির লহর খেলছে। চারদিক আবছা, মেঘলা আলোয় কিছু অপ্রসন্নতা। কিন্তু পৃথিবীর ঝড়চক্কর নিয়ম অনুযায়ী বাদলার সময় বৃষ্টিও তো হবে। আজ বুধি এই বৃষ্টির আলাদা কোনও প্রয়োজন ছিল ? কে জানে কী!

কলকাতার বৃষ্টি এরকম, নিশিপুরে কিন্তু অন্যরকম।

অনেকক্ষণ বাদে গাড়ির ভিতরকার নিস্তরুতায় এই একটামাত্র কথা শোনা গেল।

ঝুমকি বাঁ দিকে কাচের ভিতর দিয়ে বাইরে চেয়েছিল, চোখ ফিরিয়ে বলল, কিরকম ?

কলকাতার বৃষ্টি কি কারও ভাল লাগে ? শান বাঁধানো শহরে বৃষ্টির কোনও ভূমিকাই নেই, সৌন্দর্য তো নয়ই, প্যাঁচপ্যাঁচে, নোংরা শহরটা যেন আরও কুঞ্জিত হয়ে যায়।

আর নিশিপুরে ?

দেখেননি তো! মস্ত নদীর ওপর যখন মেঘলা আকাশের ছায়া পড়ে আর বৃষ্টির শব্দ মাদলের মতো বাজতে থাকে টিনের চালে, মাটির কোষে কোষে, ঘাসে, গাছে সব জায়গা যখন বৃষ্টি নেমে আসে তখন মন ভরে যায়। কী দামাল বাতাস!

ছোট একটু গলা খাঁকার দিয়ে ঝুমকি বলল, কলকাতায় কি বৃষ্টির দরকার নেই ? বৃষ্টি হলে শহরের রাস্তাঘাট ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়, আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয়, শুনেছি নাকি অসুখবিসুখও কমে যায়।

গাড়ি খুব ধীরে আর সাবধানে চালাতে চালাতে হেমাঙ্গ বলে, বৃষ্টির প্রয়োজন শহরেও আছে, কিন্তু বৃষ্টিকে তেমন করে উপভোগ করা যায় না। এখানে রাস্তায় জল জমে যায়, ট্র্যাফিক জ্যাম হয়।

আমার কিন্তু কলকাতার বৃষ্টি বেশ লাগে।

নিশিপুরে বর্ষাকালে গিয়ে কয়েকদিন থেকে আসলে আর কলকাতার বৃষ্টি তত ভাল লাগবে না।

ঝুমকি একটু হেসে হঠাৎ বলল, আচ্ছা, চারুমাসির বাড়ি যেতে আজ আমাদের এত সময় লাগছে কেন বলুন তো! আমি তো রোজ হেঁটেই চলে যাই।

উৎকণ্ঠ হেমাঙ্গ বলে, একটু ঘুরপথে যেতে হচ্ছে। সোজা রাস্তায় একটা ট্রাক ব্রেকডাউন হয়ে পড়ে আছে। সেখানে জ্যাম।

ও।

তাহাড়া রাস্তায় জল জমে আছে। বেশি জোরে চালালে ইঞ্জিনে জল ঢুকে যাবে। তখন গাড়ি ঠেলা ছাড়া উপায় থাকবে না।

ও বাবা!"

হেমাঙ্গ একটু হাসল, যন্ত্র নিয়ে ওইটেই তো অসুবিধে।

আপনি ঠিক কৃষ্ণজীবনবাবুর মতো হয়ে যাচ্ছেন, না ?

হেমাঙ্গ আহত হল। সে কারও মতো, একথা শুনে তার ভাল লাগার কথা নয়। সে গম্ভীর গলায় বলল, আমি আমার মতোই।

কৃষ্ণজীবনবাবুও খুব যন্ত্রবিরোধী লোক। উনিও খুব প্রকৃতি আর গ্রাম ভালবাসেন।

বুদ্ধিমান বিবেচক মানুষদের পক্ষে সেটাই তো স্বাভাবিক!

আচ্ছা, আমার তো শহরই বেশি ভাল লাগে। শহর কত ইন্টারেস্টিং। রোজ কত ঘটনা ঘটছে! আর গ্রাম যেন থেমে আছে। দিনের পর দিন একইরকম।

হেমাঙ্গ ফের একটু চুপ করে থেকে বলল, গ্রামেও ঘটে। অনেক কিছু ঘটে। চোখ থাকলে ঠিকই দেখা যায়।

কী ঘটে সেখানে ?

খুব ছোট ছোট ঘটনা। জোক কিভাবে চলে জানেন ?

না। আমি জোক দেখিইনি। কিরকম হয় বলুন তো ?

আপনার জন্য শিশিতে ভরে কয়েকটা নিয়ে আসব।

একটু বিবর্ণ হয়ে ঝুমকি বলল, কামড়ায় তো!

কামড়ে ধরে থাকে। সহজে ছাড়ে না।

ও বাবা!

জোকের কাছ থেকেও কিন্তু আমাদের শেখার আছে।

ঝুমকি হেসে ফেলল, জোকের কাছ থেকে আবার কী শেখার আছে ?

টেনাসিটি। ওই কামড়ে ধরে থাকাটা। সকলে কি পারে ধরে থাকতে ?

আমার শিখে দরকার নেই বাবা।

হেমাঙ্গ হাসল, ভয় পেলেন ? প্রকৃতিতে কিছুই ভয়ের নেই। শহরে লোকেরা যে কোনও পোকামাকড় সরীসৃপ দেখলেই ভয় পায়। আমিও পেতাম। এখন ভয়ের বদলে আনন্দ হয়। আমার উঠান দিয়ে কত সাপ যাতায়াত করে জানেন ?

মা গো!

কিন্তু আমার আর ভয় করে না। বেশিরভাগ সাপেরই বিষ নেই। বিষধরদেরও না ঘাঁটালে কিছু করে না। ওদের মতো ওদের থাকতে দিন ওরাও আপনাকে আপনার মতো থাকতে দেবে। আর সাপ কী সুন্দর প্রাণী বলুন তো! অমন চিত্রল শরীর ক'টা শাণীর আছে ?

উঃ, সাপের কথা তুনেই আমার গা সিরসির করছে। প্রিজ, আর বলবেন না।

হোমস্ গাড়িটা চারুশীলার বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়ে থামাল। তারপর স্বগতোক্তির মতো বলল, ইট ওয়াজ এ সুইট জার্নি। আসুন, সবাই আপনার জন্য বসে আছে।

মুখখানা কেন যে হঠাৎ রাজা হয়ে গেল ঝুমকির কে বলবে!

ঝুমকির ওই লালিমাতুক লক্ষ করল হোমস্, যখন নেমে ঘুরে গিয়ে বাঁদিকের দরজাটা ঝুমকির জন্য খুলে দিয়ে দাঁড়াল। একটু ভাবল সে, কোনও অন্যায় কথা বলে ফেলেনি তো! তাদের কথা হয়েছে শহর, গ্রাম, বৃষ্টি, জোঁক আর সাপ নিয়ে। লজ্জা পাওয়ার মতো বিষয়বস্তু তো একটাও নয়!

যখন তারা দোতলার হলঘরে ঢুকল তখন একটা কর্ডলেস টেলিফোনে চারুশীলা কাকে যেন এফুনি চলে আসার জন্য খুব করুণ গলায় অনুনয় করছিল, চলে আসুন না, প্রিজ... না না, এতে কিছু হবে না। জার্নি করে এসেছেন তো কী হয়েছে? আপনি তো দারুণ হার্ডি মানুষ!... দেখুন না আমি তো প্ল্যান করে কিছু করিনি আজ। হঠাৎ মনে হল এই বৃষ্টির দিনে সবাই মিলে একটু আড্ডা দেওয়া যাক... আচ্ছা, আপনি আমাদের অপছন্দ করেন না তো!... তা হলে চলে আসুন। প্রিজ, প্রিজ, প্রিজ!

টেলিফোন রেখেই চারুশীলা দৌড়ে এসে ঝুমকিকে ধরল, এসেছি! উঃ বাঁচলাম।

কিন্তু ভূমি তো আমাকে আগে বলেনি মাসি! আমার খুব রাগ হয়েছে।

আহা, এ বাড়িতে তোর আবার নেমন্তনের দরকার হয় নাকি? আগে থেকে ঠিক করা ছিলও না। হ্যাঁ রে, তোকে আজ এত সুন্দর দেখাচ্ছে কেন?

যাঃ! আমি আবার সুন্দর নাকি?

কেন, তুই বুঝি জানিস না যে তুই সুন্দরী? ন্যাকা!

বেশি বোলো না তো, শুনলেও লজ্জা করে।

না রে, তোকে আজ ভারি মিষ্টি দেখাচ্ছে। আয়, আজ তোকে একটা জিনিস দিই।

অনেক তো দিয়েছো মাসি! আর কেন?

আহা, কী আবার দিলাম তোকে?

তিনখানা জাপানি শাড়ি, দুটো দামী সেক্ট, এক ডজন লিপস্টিক আর মেক আপ, ভ্যানিটি ব্যাগ, কলম।

তাতে কি? আরও দেবো। আয় আমার সঙ্গে।

ভিতরের ঘরে হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে গার্ড থেকে একটা নতুন শ্বে সেক্ট বের করে তাকে দিয়ে বলল, নে।

আবার সেক্ট!

এটা এলেবলে সেক্ট নয়। যাকে চাইবি এই সেক্ট মেখে তার কাছে গেলেই সে তোকে ভালবেসে ফেলবে।

ঝুমকি একটু হেসে বলল, তাই নাকি? তাহলে এটা আমার আর দরকার নেই মাসি। আমি কাউকে হিপনোটাইজ করতে চাই না।

ইগোতে লাগল বুঝি? সেভাবে বলনি রে বোকা! ঠাট্টা করছিলাম। এটা একটা এক্সক্লুসিভ পারফিউম। এক বুড়ো ফরাসি নাকি নিজের হাতে বানায়। কিরকম জিনিস তা আমিও জানি না। মাখিনি কখনও। তোর ওপর দিয়ে একটু এক্সপেরিমেন্টে করছি।

আমি বুঝি তোমার গিনিপিগ?

নে না বাবা, যাই দিতে চাই তাইতেই সবসময়ে আপত্তি করিস কেন?

ঝুমকি মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, সবসময়ে এত দিও না তো। এত দিলে ভাল লাগে বলা? তোমাকে আমি কী দিই?

চারুশীলা চোখ পাকিয়ে বলে, আমাকে দিবি! সাহস তো কম নয়! আমি তোর বড় না? আর দেখ তো ভাই, জিনিসে জিনিসে বাড়িটাকে আমি কিরকম ওয়্যারহাউজ করে ফেলেছি! আমাকে জিনিস দিতে কি লোকের মায়া হয় না? কোথায় রাখব বল তো!

ঝুমকি হেসে ফেলে বলে, ঠিকই বলেছো। মাঝে মাঝে তোমাকে কিছু দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ভাবি, চারুমাসিকে দিয়ে লাভ কি? সবসময়েই তো কেনাকাটা করছে।

ওইটেই তো আমার রোগ। এই রোগটা হোমস্‌রও আছে। কী জিনিস কেনে ভাবতে পারবি না। আমাদের দুজনের ওই একটা ব্যাপারে খুব মিল।

জানি মাসি।

তবে আজকাল আর ওর কেনাকাটার ঝোঁকটা নেই।

বলতে বলতে চারুশীলা একটু আনমনা হয়ে গেল।

কী হল মাসি?

চারুশীলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কি যে হল হোমস্‌র! ও কি সাধু হয়ে যাবে রে?

ঝুমকি ফের একটু লাল হল। বলল, যাক না।

সাধু হবে? তাতে ভালোটা কি হবে?

সাধু হওয়া কি খারাপ?

খারাপই তো। সাধুরা যে ভিক্ষে করে খায়!

ঝুমকি হেসে ফেলে। বলে, তাতেই বুঝি তোমার ভয়?

হোমস্‌ ভিক্ষে করে খাবে! বলিস কি!

দেখ মাসি, তোমার ভাইটি অত সহজে সাধু হবেন না।

কি করে জানলি ?

জানবো কি করে আবার! মনে হল তাই বললাম।

না রে, তুই জানিস না। ওর কুষ্ঠিতে আছে কত বছর বয়সে যেন সন্ধ্যাস-যোগ।

তুমি বুঝি কুষ্ঠি মানো ?

মানি কিনা জানি না। কিসে কি হয় কে জানে বাবা! আমি যখন সুব্রতকে বিয়ে করি তখন তো ও তেরেভা ভাজে আর বিপ্লব করে বেড়ায়। এক জ্যোতিষী ওরে মাকে বলেছিল, একদিন নৃপতুলা টাকা হবে। কে বিশ্বাস করেছিল সে কথা ? অথচ দেখ ফলে তো গেল!

আমার ওসব বিশ্বাস হয় না।

অনেকেরই হয় না। আসলে কি জানিস, ভালটা না ফলেও খারাপটা ঠিকই ফলে যায়।

ঝুমকি ফের হাসল। বলল, সেটা নিজের জন সম্পর্কে সবসময়েই মনে হয়।

চারুশীলা খুব বিষণ্ণ মুখ করে বলল, কে জানে হেমান্নর জীবনটা আমিই নষ্ট করে দিলাম কিনা!

কেন মাসি, তুমি নষ্ট করবে কেন!

সুব্রত বলেছে, রশ্মির সঙ্গে হেমান্নর সম্পর্কটা ধীরে ধীরে আপনা থেকেই গাঢ় হত। আমি বিয়ের জন্য নানারকম প্রেশার ক্রিয়েট করাতেই নাকি ব্যাপারটা কেঁচে গেল।

ঝুমকি সবেরে মাথা নেড়ে বলল, তুমি কিছু বোঝো না।

বুঝি না!

একটুও না। তুমি বড্ড সরল। তোমাকে আগেই বলেছি রশ্মি একদম অন্য ধরনের মেয়ে। হেমান্নবাবুর সঙ্গে ওকে ঠিক মানায় না।

আমাকে এরকম কথা আরও কেউ কেউ বলেছে। কিন্তু কেন বল তো! আমার তো রশ্মি আর হেমান্নকে মনে হত মেড ফর ইচ আদার।

তুমি তোমার ভাইকে সংসারী করার জন্য এত বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে যে, তখন তোমার অত ঝুঁটিয়ে বোঝার মতো মনই ছিল না। সুন্দর দেখেই ঢলে পড়েছিলে।

খুব অসহায় মুখ করে চারুশীলা বলল, তাহলে হেমান্নর এখন কী হবে বল তো!

কী আর হবে! সাধু হয়ে যাবে।

চারুশীলা হাসল না। বিষণ্ণ গলায় বলল, রশ্মির বিয়ের খবরটা পাওয়ার পর থেকেই কেমন যেন হয়ে গেছে। একদম উদাস, বৈরাগী। ওর কথা ভাবলেই এত ভয় করে! ভয়ে আমি আর বিয়ের কথাও তুলি না। ওর বাড়ির লোকও হয়রান হয়ে যাচ্ছে।

তুমি ওঁকে নিয়ে এত ভাবছো কেন ? কিছু তো করতে পারবে না। কিছু ভেবো না, ওঁকে ওঁর মতো থাকতে দাও।

তাই তো দিচ্ছি। কিন্তু কি হচ্ছে বল তো! বিভিন স্ট্রিটের বাড়িতে ওর মা দুশ্চিন্তায় শুকিয়ে যাচ্ছে। রোজ আমাকে ফোন করে। কত মেয়ে দেখেছে তার ঠিক নেই। গাদা গাদা ফটো জমে গেছে। কী সুন্দর সুন্দর সব মেয়ের ছবি এসেছে দেখলে মাথা ঘুরে যায়!

কেমন যেন হঠাৎ ম্লান হয়েগেল ঝুমকির মুখখানা। বলল, বেশ তো। চেষ্টা করতে করতে একদিন ঠিক রাজি হয়ে যাবে। ছেলেরা তো আসলে হ্যাংলা।

যাঃ। হেমান্ন আর পাঁচজনের মতো নয়। হ্যাংলা একদম নয়। অত সুন্দর চেহারা, কিন্তু কখনও মেয়েদের দিকে ফিরেও চাইত না। ওকে তুই চিনিস না।

ঝুমকি হেসে বলল, নিজের ভাইকে সবাই একটু বেশি সুন্দর দেখে।

চারুশীলা চোখ পাকিয়ে বলল, এই পাঞ্জি! হেমান্ন কি দেখতে খারাপ ?

তাই কি বললাম ?

সুন্দর নয় ?

তেমন কিছু নয়।

হেমান্ন ম্যাসকুলিন, ছমছমে শরীর। মুখটার কাট দেখেছিস ? ফটোজেনিক নয়, লালটুও নয়। কিন্তু ওর হল পুরুষালি চেহারা।

একটু বুনো-বুনো, তাই না ? বলেই ঝুমকি হেসে ফেলল।

ইয়ার্কি হচ্ছে ? হেমান্নর নিন্দে করবি তো ফটাফাটি হয়ে যাবে। আয়, ভাল করে দেখে যা।

বলেই তার হাত দরে হিড়িহুড় করে টেনে নিয়ে চরল চারুশীলা।

ভয় খেয়ে ঝুমকি চাপা আতলাস করতে লাগল, ছাড়ো! ছাড়ো! আচ্ছা, ভুল বলেছি মাসি, কান মলছি। আর করব না।

না। আয়, দেখ ভাল করে। তুই কি অন্ধ যে হেমান্নকে সুন্দর দেখিস না!

কাতর গলায় ঝুমকি বলল, খুব সুন্দর মাসি। কী বড় বড় দাঁত, কী সুন্দর কেঁট ঠাকুরের মতো গায়ের রং... আচ্ছা মাসি, আর ইয়ার্কি করব না। ছাড়ো না প্রিজ!

হাড়ব ? দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা!

হলঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অতিথিরা বস। বাচ্চারা হইচই করছে। হেমান্ন ঘরে নেই।

এই, হেমান্ন কোথায় গেল রে ?

কেউ বলতে পারল না। চারুশীলা হাত ধরে ঝুমকিকে টানতে টানতে এঘর ওঘর ঘুরে বেড়াল। কোথাও হেমান্ন নেই।

আশ্চর্য! কোথায় গেল বল তো!

ঝুমকি সামান্য হাঁফ-ধরা গলায় বলল, চলে যাননি তো ?

আমাকে না বলে ? চল তো দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করি।

বাইরে হোমাস্বর গাড়িটা ছিল না। দারোয়ান বলল, হোমাস্বরবাবু একটু আগেই চলে গেছে।

কাদো-কাদো হয়ে চারুশীলা বলল, দেখলি! ওর আজকাল এরকম অদ্ভুত স্বভাব হয়েছে। কখন কী করে তার ঠিক নেই। একটু আগে যখন বলেছিলাম তাকে গিয়ে নিয়ে আসতে খুব রাজি হয়ে চলে গেল। বেশ হাসি-খুশি ছিল। আবার হঠাৎ কী খেয়াল হল কে জানে, দুম করে কাউকে না বলে-কয়ে চলে গেল!

ঝুমকির চোখে বিবর্ণ দিনটা হঠাৎ আরও বিবর্ণ হয়ে মরে গেল। বুকের ভিতরটা কেমন নিথর। হতাশায় তারও চোখে জল আসার উপক্রম হল।

চল যাই ভিতরে।

ভিঁমিত গলায় ঝুমকি বলল, চলো।

যখন দুটি হতাশ রমণী ঘরে ফিরে আসছিল ধীর পায়ে তখন পূর্ণ দাস রোড থেকে গোল পার্ক হয়ে ডান দিকে মুখ ফেরাল হোমাস্বর ছোট্ট ফিয়াট। চারদিকে আজ জলপ্রপাতের মতো বৃষ্টি নেমেছে। তার ছোট্ট গাড়ি যে-কোনও মুহূর্তে ফেঁসে যাবে।

সাদার্ন অ্যাভিনিউতে লেকের রেলিং ঘেঁষে প্রায় হাঁটু জলের মধ্যে গাড়ি দাঁড় করাল হোমাস্বর। তারপর চুপ করে বসে রইল।

কতবার ভুল করবে সে! আর কতবার ? তার কেন ওকে ভাল লাগছে ? কেন এত বেশি ভাল লাগছে ওকে ? এটা কি সম্ভব ? এটা কি হওয়া উচিত ?

নিজের সঙ্গে একটা লড়াই দরকার হয়েছে তার। এ লড়াই হেরে গেলে তার চলবে না। গাড়িটা খুব ধীরে, সাবধানে নিজের বাড়ির দিকে ফেরাল হোমাস্বর।

জলে গাড়ি বিশ্বাসঘাতকতা করল না এবারও।

হোমাস্বর ঘরে ঢুকে চুপচাপ শুয়ে রইল বিছানায়। টেলিফোন টানা বেজে যেতে লাগল। হোমাস্বর ধরল না। টেলিফোন থেমে গেল ধৈর্যহারা হয়ে।

ও মেয়েটিকে এবার থেকে অ্যাভয়েড করতে হবে হোমাস্বর, বুঝেছো ?

বুঝেছি।

শি ইজ টেকিং ইউ ওভার। বি ক্যোরামুল।

হ্যাঁ।

কিন্তু কী করবে হোমাস্বর!

দেখা যেন না হয় আর।

কিন্তু চিন্তায় হানা দেবে। সেটাও খারাপ।

খুব খারাপ।

ওর ডিস্টেন্ডলো খুজে বের করো হোমাস্বর। ট্রাই টু হেট হার।

শক্ত কাজ। কারও প্রতি দুর্বলতা এলে ডিস্টেন্ডলো নজরে পড়তে চায় না।

খুব সত্যি কথা, তা হলে!

চেষ্টা করতে হবে। এখনই এটা অঙ্কুরে বিনাশ না করলে পরে কষ্ট পেতে হবে।

খুব ঠিক কথা।

তুমি আর কিছুদিন এখন চারুশীলার বাড়িতে যেও না।

হঁ। কিন্তু চারুদি কি ছাড়বে! খোজ নেবে।

আজ নিশিপুরে চলে গেলে ভাল করতে তুমি।

এবার থেকে কোনও উইক এন্ড বাদ দেবো না।

পালাতেই হবে।

খুব ধীরে ধীরে ঘুম চলে এল। কিন্তু ঘুমটাও নিপাট হল না। কত হিজিবিজি স্বপ্ন এল।

ঘুম ভাঙল হঠাৎ টেলিফোনের শব্দে। সতর্ক ছিল না হোমাস্বর, ঘুম-চোখে উঠেই টেলিফোন ধরল, হ্যালো!

ওপাশে কিছুক্ষণ চাপচাপ।

হ্যালো! হ্যালো!

খুব চাপা একটা নারীকণ্ঠ বলল, ওভাবে চলে এলেন যে!

হোমাস্বর বুকুর মধ্যে হুধপিও একটা বিট মিস করল। তারপর হঠাৎ রেলগাড়ির মতো চলতে শুরু করে দিল। হোমাস্বর একটু শ্বাসকষ্ট হিচ্ছিল। তার ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল, ঘৃণা করো ওকে।

আমার জন্যই চলে এলেন ?

কে বলল ?

আমি জানি। যদি আমাকে অ্যাভয়েডই করার ইচ্ছে তা হলে নিয়ে এলেন কেন ?

অ্যাভয়েড করতে চাইনি বলেই।

মোটাই না ! বলতে বলতে একটা কান্নার সজাবনায় গলাটা স্থলিত হয়ে গেল একটু।

আপনি কেন ইনসাল্টেড ফিল করছেন ? আমি তো এমনতেই একটু খেয়ালি।

শুধু খেয়ালি ?
 আরও কিছু ?
 জানি না। মাঝে মাঝে আপনি এমন করেন যে—
 আমি খুব শান্তিতে নেই। আপনাকে যদি বলতে পারতাম!
 জানি। আপনি রশ্মির কথা ভেবে—
 কিছু জানেন না। রশ্মির কথা আমি কদাচিৎ ভাবি। ভাববই বা কেন ? কোনও কারণ ছিল না।
 তাহলে ?
 কথাটা আপনাকেই বলা যায় না।
 কেন যায় না ?
 আমি সত্যিই আপনার কাছ থেকে দূরে থাকতে চাই।
 তাই তো আছেন। আমি কী এমন করলাম ?
 জানেন না ?
 না তো!
 নাকি জানেন, স্বীকার করতে পারেন না!
 কি করে জানব ?
 হেমাঙ্গ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

॥ ১০৫ ॥

চারদিকে সুখ একেবারে উছলে পড়ছে। পাকা দোতলা বাড়ি, চরদিকে বুক-সমান ঘের-দেয়াল উঠেছে। যে বাড়িটা রামজীবন তুলতে গিয়ে পেরে ওঠেনি সেটার ছাদ-ঢালাই করে দিয়েছে কৃষ্ণজীবন। পলেক্তারা পড়ে গেছে, জানালা-দরজাও বসে গেছে। রং হলেই সে বাড়িও হসে উঠবে। পুরনো ঘরগুলো ভেঙে জায়গা চৌরস করে বাগান হচ্ছে। ময়দানবের কাণ্ড যেন, রামজীবনের আধখ্যাচড়া ঘর আর মুখ ভ্যাংচায় না বিষ্ণুপদকে। বিষ্ণুপদ এখন দোতলার চওড়া বারান্দায় বসে দুনিয়াটা দেখে। কিন্তু নতুন রকম লাগে কি ? তা তো লাগে না!

সুখের যে একটা বান ডেকেছে সেটা বুঝতে পারে বিষ্ণুপদ। কিন্তু এত সুখে যখন নয়নতারা উথলে ওঠে তখনও বিষ্ণুপদ কেন ঠাণ্ডা মেরে থাকে! কেনও সুখই কেন ভিতর অবধি গিয়ে সৈধ্যোয় না তার!

সুখের চিহ্নগুলো সারাদিন ধরে ঘরে-বাইরে খুঁজে বেড়ায় সে। বাড়ি হল, সার্হেবি সব আসবাব হল, আজকাল পাতে রাজ মাছ তো বটেই, তার সঙ্গে আরও দুই-তিন পদ। রামজীবনকে দোকান করে দিয়েছে কৃষ্ণজীবন। সে দোকানও চলছে। রামজীবন আজকাল মদদ খাচ্ছে না কিছুদিন! সবই সুখের বৃত্তান্ত।

কুয়োর ধারে বড় জমিটা মস্ত ভরসা ছিল সংসারের। আনাজপাতি না জুটলে ওই বাগান থেকে যা-হোক কিছু খুঁটে তুলে আনত নয়নতারা। শাকপাতা, কচু-ঘেঁচু, নিদেন একটা লেবু। আজকাল আর তার দরকার হচ্ছে না। অনটন নেই।

তবু বৃকে একটু টনটনানি থেকে যায় কেন! কী নেই ? আরও কী চায় বিষ্ণুপদ!

আগাছায় ভরা বাগানটায় বিষ্ণুপদ একদিন সকাল থেকে গিয়ে বসে রইল। আজ বাদলা মেঘ নেই। বৃষ্টি একটু থিড় রয়েছে। আতা গাছের ছায়ায় বসে বিষ্ণুপদ ভাবনাচিন্তার ঝাঁপি খুলে বসল। নিরিবিলি এরকম নিজের মোকাবিলা করা মাঝে মাঝে ভাল।

কিন্তু তার ভিতরটা চিরকালই বড় নিস্তব্ধ। সেখানে কথার ভুড়ভুড়ি কম, ভাবনা-চিন্তাও যেন খেই-হারা। সুখের কথাই ভাবছে বিষ্ণুপদ। এই যে বাড়ি হল, কতকালের কত অভাবের সঙ্গে লড়াই শেষ হয়ে গেল, এসব হওয়ার পরও সে কেন যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেছে ? একটা এই হতে পারে যে, তার পুরনো চেনা বাড়িটা লোপাট হয়ে যাওয়ায় কেন যেন নতুন বাড়িতে সে খাপে খাপে বসছে না। খুঁতখুঁতনি হচ্ছে, নতুন জুতো পরলে যেমন ধারা হয়! তাই কি! আর এক অস্বস্তি বামাচরণ। শোনা যাচ্ছে, তার চিকিৎসা শুরু হয়েছে। মাথার ব্যামো। লোডে, অশান্তিতে, আক্রোশেই কি পাগল হয়ে গেল ছেলেরা ?

সব মিলিয়ে বিষ্ণুপদের তেমন সুখ হচ্ছে না। কেমন যেন মনে হচ্ছে, পরের বাড়িতে বাস করছে সে। কেন এরকম হয়!

একখানা দা হাতে বোধ হয় গুলতির কাঠ কাটতে বাগানে ঢুকেছিল পটল। দাদুকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

দাদু, কী করছো ?

বসে আছি দাদা।

এ সময়টায় সাপ বেরোয় তো।

বিষ্ণুপদ মৃদু হাসল, হেলে টোঁড়া সব।

না দাদু, চক্করওলাও আছে।

বিষ্ণুপদ মাথা নাড়ল, নেই। ভিত খোঁড়ার সময় দু-দুটো বাতুসাপ মেরে ফেলল মিস্তিরিরা, দেখিসনি ?

আর নেই ?

বিষ্ণুপদ বলল, সাপও আজকাল কই ? আগে কত দেখা যেত। বসত বাড়িছে, সব নিকেশ হয়ে যাচ্ছে।

পটল বলল, সাপের বিশ্বাস কি! তুমি বারান্দায় গিয়ে বোসো।

বিষ্ণুপদ উদাস গলায় বলে, গাঁয়ের ছেলে হয়ে সাপকে ভয় পাস ?

খুব পাই দাদু।

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, আগে লোকে বাঘ-সিংহী ভয় পেত, আজকাল দেখ তাদের কী দুর্দশা! ফীত হয়ে হয়ে মাত্র কয়েকটিতে দাঁড়িয়েছে। এখন ভয় দেখা দিয়েছে, একদিন না এসব জন্তু লোপাট হয়ে যায়। সাপেরও সেই অবস্থা হয়ে এল। আগে বর্ষাকালে হেলে-টোডা কত কিলবিল করত চার ধারে। উঠানে, পুকুরে। আজকাল কোথায় ?

পটল একটু হাসল, তুমি বুঝি সাপখোপ বাঘ-সিংহ চাও ?

বিষ্ণুপদ নাতির দীঘল চেহারা আর কোমল মুখখানার দিকে চেয়ে বলল, তুই চাস না ?

না তো!

তোর বড় জ্যাঠা চায়। দুনিয়াটা এক অদ্ভুত জায়গা। প্রকৃতি এমন করে সৃষ্টি করেছিল সব যে পান থেকে চুন খসলেই গণ্ডগোল। প্রকৃতির ভারসাম্য না কী যেন বলে! তোর জ্যাঠা জানে। সে অনেক জানে, বুঝিয়ে বলতে পারবে। আমি তত জানি না। কিন্তু আমারও কেন যেন মনে হয়, সাপখোপ বাঘ-ভালুক না হয় থাকত কিছু, কী ক্ষতি হত তাতে!

সাপের কামড়ে যে কত মানুষ মারা যায় দাদু!

বিষ্ণুপদ একটু হেসে বলে, সাপের কামড়ে যত না মানুষ মরেছে তার চেয়ে লক্ষ গুণ সাপ মরেছে মানুষের লাঠিতে। বাঘ যত না মানুষ মেরেছে তার বহুগুণ বেশি বাঘ মরেছে মানুষের হাতে। সবসময়ে যে না মারলেই চলত না, এমন নয়। তবু মেরেছে। মানুষের দাঁতে নখে জোর না থাক, তবু মানুষের চেয়ে হিংস্র আর কে আছে বল তো!

পটল একটু ভাবল। তারপর দাদুর সামনে উবু হয়ে বসে মুখের দিকে চেয়ে বলল, দাদু, বড় জ্যাঠা এইসব নিয়ে লেখে, না ?

ও বাবা! সে পণ্ডিত মানুষ, কী নিয়ে লেখে তার আমি কী বুঝি ? তবে এসব কথাও নাকি আছে তার বইতে।

বইটা আমি জ্যাঠার কাছে চেয়েছি। বলেছে দেবে।

সে বই কি তুই বুঝবি ?

বুঝব দাদু। জ্যাঠার কথা আমি বুঝতে পারি।

বিষ্ণুপদ একটু আনমনা হয়ে গেল। আপনমনে শুধু বলল, সে বড় ভালবাসে দুনিয়াটাকে।

পটল এখন অনেকটাই বড় হয়েছে। সামনের বছর তার মাধ্যমিক পরীক্ষা। সে আজকাল ক্লাসে ফার্স্ট হয়। গোপালকে কলকাতার ডেফ অ্যান্ড ডাশ কুলে ভর্তি করে দিয়েছে কৃষ্ণজীবন। হোস্টেলেরও ব্যবস্থা হয়েছে। পটলের একটু ফাঁকা লাগে তাই।

পটল বিষ্ণুপদের দিকে চেয়ে বলল, জ্যাঠা এখন কোথায় আছে দাদু ? আমেরিকা না ইউরোপ ?

বিষ্ণুপদ এক-গাল হাসল, না রে, কলকাতাতেই আছে এখন। গিয়েছিল কাছেপিঠে কোথায় যেন! ম্যানিলা হবে বোধ হয়। ফিরে এসেছে। যদি ভাল করে লেখাপড়া করিস তাহলে তুইও তার মতো কত দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াবি।

কী যে বলে! জ্যাঠার মতো পারব ? উরিকাস! আগে মাধ্যমিকটা তো ডিঙাই।

পটল চলে গেলে বিষ্ণুপদ ফের ভাবতে বসল। ভাবনাগুলো বড় ছাড়া-ছাড়া, মোয়া বাঁধছে না। সুখের কথাই ভাবছে বিষ্ণুপদ। কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। একটা খোঁড়া লোকের যদি পা গজায়, একজন অন্ধ যদি চোখ ফিরে পায়, একটা হাভাতের যদি ভাতের ব্যবস্থা হয় তো খুব সুখ হয়। কিন্তু সুখটা বড় গড়ানে জিনিস। চুড়ায় বাস করতে পারে না। নেমে আসে। যার নতুন ঠ্যাঙ হল সে কদিন খুব খটর মটর করে ইটবে তারপর একদিন ঠ্যাং-এর কথা ভুলে যাবে। যার চোখ হল তার আনন্দও বেশিদিন নয়। হাভাতের ভাতের সুখও বড় ক্ষণস্থায়ী।

তুমি এখানে বসে! সারা বাড়ি খুঁজছি।

নয়নতারাকে দেখলেই বিষ্ণুপদের একটা মায়া হয় আজকাল। এই এক মানুষ যার সুখটা বেশ স্থায়ী হচ্ছে। ডগোমগো ভাবটা আর নেই, তবু মুখখানা সবসময়ে অহ্লাদে মাখা। সারাদিন ঘুরে ঘুরে বাড়ি ঝাড়পোছ করছে, যারা বহুবার দেখেছে সেইসব পাড়াপ্রতিবেশীদের ফের ডেকে এনে তার আকর্ষ্য বাড়ির অঙ্গিনিক্ষি দেখাচ্ছে। মজে আছে সব নিয়ে।

বিষ্ণুপদ বলল, এ বাগানটা একটু পরিষ্কার করলে হয়।

তা হয়। রেমোকে বললেই লোক লাগিয়ে দেবে। কিন্তু তুমি এখানে বসে কেন ? ওপরের বারান্দায় চেয়ার পেতে রেখেছি, সেখানে বসলেই তো হয়!

বারান্দায় তো রাজাই বসি। আজ বাগানে বসতে ইচ্ছে হল। ইচ্ছে তো নানা রকমের।

পুরোনো বাড়িটার কথা ভুলতে পারছো না, না ?

তা হয়। আসলে কি জানো, আমরা তো ভোগ করতে কোনওদিন শিখিনি। ভাল বাড়ি, ভাল জামাকাপড়, ভাল খাবার-দাবার এসব ভোগ করার জন্যও একটা ট্রেনিং লাগে, অভ্যাস লাগে। হঠাৎ বুড়ো বয়সে এইসব রাতারাতি হয়ে যাওয়ায় কেমন হাঁ ধরে যাচ্ছে! সেই হাঁফ ছাড়তেই বাগানে এসে বস।

তোমার মুখ থেকে যা বেরোয় বেদবাক্য। কথাটা বলেছো বড় ভাল। ভোগ করতে শিখতে হয়। তবে চেষ্টা করতে করতে শেখাটা হয়েও যায়। না গো ?

তোমার হচ্ছে, দেখছি। বলে বিষ্ণুপদ হাসল।

লজ্জা পেয়ে নয়নতারা বলে, মেয়েমানুষের মন তো বিষয়মুখী, তাই আমরা এগুলো তাড়াতাড়ি শিখি। তোমার মুখখানা আজ রসস্থ দেখছি যে! শরীর খারাপ নয় তো!

আরে না। তোফা আছি।

ভাঁড়িও না বাপু।

না গো, তোমার কাছে লুকোবো সাধি কি! শরীর ভালই আছে। মনটা ভাল নেই।

কেন, হলটা কী?

ছেলেটা দুহাতে কেন যে এত খরচ করল! বউমার সঙ্গে হয়তো অশান্তি হচ্ছে।

সে আর বলতে! খুব হচ্ছে।

জানো ঠিক?

আন্দাজ করছি। ছেলে মুখ-ফস্কা দু-একটা কথা বলেও ফেলে। আর বউমা তো স্পষ্ট কথা শুনিয়েই গেছে। ওসব গায়ে মাখলে তো চলবে না। ছেলে তার বাপ-মায়ের প্রতি কর্তব্য করেছে। বাপ-মাও তো ফ্যালনা নয়।

একটু কম করে করলেও হত। বউমা তো খুব অন্যায় কথা বলেনি।

সে বিদেশ থেকে মেলা টাকা পেয়েছে তাই করেছে। তার পরিশ্রমের রোজগার।

বিষ্ণুপদ কথাটা ঠিক স্বীকার করতে পারল না। একটু চুপ থেকে বলল, সবই বুঝি নয়নতারা। তবু বলি, এতট! না করলেও চলত। তাদেরও তো হক আছে, দাবি আছে। আমার কেবল মনে হচ্ছে এ যেন অন্যের মুখের গ্রাস।

নয়নতারা বলে, ওগো, তারও তো আমাদের জন্য প্রাণটা পোড়ে। সে তো এতকাল কিছু করেনি। বউ ছেলেমেয়ের সেবাই করেছে। এখন একটু মায়ী হয়েছে বলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হল!

কৃষ্ণটা হয়তো মনের কষ্টে আছে। বউমা হয়তো কথা শোনায। আমাদের তিনকাল তো কেটেই গিয়েছিল। আর কয়েকটা দিন কি চলতো না?

আমাদের চলত, কিন্তু কৃষ্ণ যে প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছিল তা তো হত না।

বিষ্ণুপদ একটু ভেবে বলল, তা বটে!

নয়নতারা একটু বিষণ্ণ গলায় বলল, কৃষ্ণ এত করেও তোমাকে কিন্তু খুশি করতে পারল না। হ্যাঁ গো, তুমি কেন খুশি হলে না, বলো তো!

বিষ্ণুপদ একটু হেসে বলল, সুখটা যে কোথায় থাকে তাই তো বুঝতে পারি না নয়নতারা। রোজ ভাবি, এই যে সাতসকালে বাগানে এসে বসে আছি সে এমন নয় গো, বসে বসে ভাবছি আর ভাবছি। তা আমার বাবনা কেমন জানো? যেমন লম্বা দড়ি জট পাকিয়ে যায় তেমনি। মেলা গিট, মেলা ফাঁস। কিছুতেই সরল হতে চায় না।

তোমার সুখ না হলে আমার মনটা খারাপ হয়, জানো তো!

তা জানি। তবে ভেবো না, ধীরে ধীরে সব অভ্যাস হয়ে যাবে।

তোমার পুরনো বাড়ির জন্য মন কেমন করে বোধহয়।

তাও করে। সে বাড়ি নিজের রক্ত জল করে করা। অনেক পুরনো দিনের নানা কথা জড়িয়ে ছিল তার মধ্যে, তা বলে ভেবো না আমি স্মৃতি নিয়ে পড়ে আছি। আমি ভাবছি সুখ জিনিসটার কথা। মনটা কেমন ছাড়া হয়ে আছে।

চলো তো, ওপরের বারান্দায় গিয়ে আমার সামনে বসবে। আমি কুটনো কুটবো এখন। তুমি সামনে থাকলে আমার বুকটা ঠাণ্ডা থাকে।

চলো তাহলে। বলে উঠে পড়ল বিষ্ণুপদ।

কৃষ্ণজীবন এল দুর্দিন বাদে। রবিবার। দোতলা থেকে তাকে প্রথম দেখল বিষ্ণুপদ। সে নয়নতারাকে ডাকাডাকি করল না। ছানি পড়া চোখে কৃষ্ণজীবনের লম্বা শরীরটাকে সটান হেঁটে আসতে দেখল সামনের মাঠের পাশ দিয়ে। দে'তল' থেকে অনেক দূর অবধি দেখা যায়। ছাদে উঠলে তো কথাই নেই।

কৃষ্ণ এল, বাড়িতে একটু তটস্থ ভাব হল। এলেমদার মানুষের কদরই আলাদা!

ওপরে এসে বাপের মুখোমুখি যখন বসল কৃষ্ণজীবন, তখন বিষ্ণুপদ ভাল করে ছেলের মুখখানা লক্ষ করল। কেমন আছে তার এই আলাভোলা ছেলেটা? ভাবের জগতে থাকে, দুনিয়ার নানা উন্টোপাল্টা ব্যাপার ভাল বুঝতে পারে না। বউমার সঙ্গে পট খাচ্ছে তো! অপমান হতে হচ্ছে না তো!

মুখখানা খুব একটা হাসিখুশি নয়। কেমন যেন থম ধরা।

বাবা, কেমন আছেন?

দিব্যি আছি বাবা। এর চেয়ে ভাল কখনও থাকিনি।

বলেই বিষ্ণুপদের মনে হল, মিথ্যে কথা বলা হল নাকি? দুনিয়ায় যত সাধুবাদ আছে তার মধ্যে একটু করে মিথ্যে ঢুকে থাকেই। যত প্রশংসাবাক্য আছে তার অধিকাংশই একটু বাড়তি কথা। কী আর করা যাবে!

কৃষ্ণ একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, যখন যা দরকার হবে বলবেন বাবা। নিঃসঙ্কোচে বলবেন।

বিষ্ণুপদ খুব হাসল। একেবারে ছেলেমানুষের মতো। সারা জীবনে এরকম কথা কেউ তাকে বলেনি। এ যেন হঠাৎ স্বর্গ থেকে দেবতা নেমে এসে বললেন—কী বর চাও বলো, দেবো। কিন্তু বিষ্ণুপদ ভাবে, সারা জীবন খিদে নিয়ে, অপরূপ ইচ্ছে নিয়ে, নিদারুণ অভাব কষ্ট নিয়ে বেঁচে থাকার একটা যে সময় গেছে তখনও তার চাহিদা তো খুব বেশী ছিল না! রাঙা চালের মোটা ভাত আর একটু ডাল হলেই হত। দুখানা মোটা ধুতি, দুখানা জামা হলেই হত। পায়ে এক জোড়া জুতো হলেই হত। তার বেশি আকাঙ্ক্ষাই তো তৈরি হত না মনে।

বিষ্ণুপদ হাসি থামিয়ে স্তিত্ব মুখে বলল, কী আর লাগবে বাবা? কিছুই তো লাগে না এখন। যথেষ্ট আছে।

কৃষ্ণজীবনও একটু হাসল। তারপর বলল, আপনার যে কিছুই লাগে না তা আমি জানি।

বিষ্ণুপদ একটা সরল শ্বাস ফেলে বলল, বড় কষ্ট করে বড় হয়েছে বাবা, তুমি জানবেন না তো কে জানবে? কত অল্পে কত সামান্য নিয়েও মানুষের চলে যায়, তা তুমি ভালই জানো।

কৃষ্ণজীবন মেদুর চোখে চেয়ে বসে রইল। জবাব দিল না। জীবনের গভীর গভীরতর মর্মস্থল থেকে মাঝে মাঝে উঠে আসে হলাহল, মাঝে মাঝে উঠে আসে অমৃত। মছন করো, জীবনের গভীরে দাও ডুব। নইলে ওপরসা ওপরসা ভেসে বেড়ানো হবে, লাগবে হাজার উপকরণ, বোঝাই যাবে না কেন জন্ম, কেন এই জীবনযাপন।
কৃষ্ণজীবন মৃদু স্বরে বলল, বামার বউ আমার কাছে গিয়েছিল। সে কিছু টাকা চায় আর ওই রামজীবনের বাড়িটা চায়।

তুই কি বলেছিস ?

আমি কিছু বলিনি। বলেছি, ভেবে, পরামর্শ করে বলব।

কত টাকা চায় ?

এক লাখ।

কেন ?

বলছে তাদের বড় অভাব, বামার চিকিৎসার জন্য মেলা খরচ হচ্ছে, এইসব আর কি!

বিষ্ণুপদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, টাকার জন্য আমার ওপরেও হামলা করেছিল। লোভে পাগল হয়ে গেছে।

আমার মনে হয় টাকাটা দিয়ে ওদের ঠাণ্ডা করে দেওয়াই ভাল। নইলে আবার এসে আপনাদের জ্বালাতন করবে।

তুমি অনেক শিখেছো বাবা, তবু লোকচরিত্র বোঝো না। ওদের লাখ লাখ টাকা দিয়েও কিছু হবে না। ওটা তো খিদে নয়, হাঁকাই। টাকা দাও, ফের কিছুদিন পরে এসে হাত পেতে দাঁড়াবে।

দেবো না তাহলে ?

না বাবা। তুমি গরিবের ছেলে হলে কি হবে, এখনও টাকার ওপর তোমার কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। ভাবো বুঝি টাকা দিয়েই সব সমস্যা মেটানো যায়! ওরকম ভেবো না।

কৃষ্ণজীবন একটু হাসল, সবাই যে টাকা-টাকাই করে।

তোমার টাকার ওপর মায়া হল না কেন বলো তো ?

মায়া ? কিসের মায়া বাবা ?

তুমি গরিবের ছেলে, নুন জুটতো তো পান্ডা জুটত না তোমার, জুতো জামা বই খাতা পেনসিলের জোগাড় ছিল না, সেই তুমি এখন টাকার মুখ দেখলে, তবু টাকাকে তোমার খোলামকুচি মনে হয় কেন বাবা ?

কৃষ্ণজীবন একটু হেসে বলে, টাকা নিয়ে ভাবতে বলেন নাকি বাবা ?

না, তবে টাকা বড় উড়ছে তোমার চারদিকে। ঠক জোচ্ছোরেরা ঘিরে ধরবে। শ্যামলীকে বেশি প্রশ্রয় দিও না। ওদের টাকার অভাব নেই। দুটি মোটে মানুষ, বামা চাকরিও করে। ওদের অভাব কি ? তবে রামজীবনের ওই বাড়িটায় এসে যদি থাকতে চায় তো থাকবে। রেমোর কাছে কথাটা পাড়ব'খন।

সেই বুদ্ধিই ভাল।

এ বাড়ির পিছনেও তুমি অনেক টাকা ঢেলেছো। এতটা না করলেও হত। বউমা আর ছেলেপুলেদের দিকটাও তো দেখতে হয়!

তাদের জন্যও অনেক আছে বাবা। বেশি টাকাও ভাল নয়। হঠাৎ হাতে বেশি টাকা পড়লে সংকাজে ব্যয় করা ভাল। নইলে ছেলেপুলে ওই টাকার পাল্লায় পড়ে নষ্ট হয়।

বিষ্ণুপদ একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ অনাবিল হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে বলল, একটা বড় ভাল কথা শুনলাম আজ। বেশ বলেছো বাবা।

কৃষ্ণজীবন চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থাকে। আজ যে ছেলের মেজাজ ভাল নেই তা বুঝতে পারে বিষ্ণুপদ। সেও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।

কৃষ্ণজীবন হঠাৎ বলে, আপনার বা চোখের ছানিটা বোধহয় ম্যাচিওর করে গেছে। কিছু দেখতে পান বা চোখে ?

বিষ্ণুপদ ডান চোখে হাত চাপা দিয়ে বাঁ চোখে চারদিকটা দেখে নিয়ে হাসতে হাসতে বলে, না। বড় ধোঁয়া ধোঁয়া। এই যে তোকে দেখছি, একটা কেউ বসে আছে বোঝা যায়। তার বেশী নয়। তবে ডান চোখে দেখি।

বা চোখটা কাটিয়ে নিতে হবে।

দরকার কি ? দেখার আছেই বা কি ? চলে তো যাচ্ছে!

না বাবা। বেশি ম্যাচিওর করে গেলে চোখটা যাবে। এসব পুষে রাখা ভাল নয়। আমি কলকাতায় ফিরেই ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলব। আজকাল ঝামেলা কম। মাইক্রো সার্জারি করলে এক দিনের বেশি আটকেও থাকতে হয় না।

আবার খরচের পাল্লায় পড়বে ?

কৃষ্ণজীবন হেসে বলে, মানুষ খরচ করলে তার বদলে কিছু পায়ও তো! শুধু খরচ দেখলেই কি হবে বাবা ?

সে তো খাটি কথা। কিন্তু লোকে ওই খরচটাই যে দেখে।

আপনি আর ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না—চোখটা না কাটালেই নয়।

এখানে হয় না ?

না বাবা। মাইক্রো সার্জারি করতে হলে কলকাতায় যেতে হবে। তাহেই বা কি ? কলকাতা তো একটুখানি রাস্তা। আমি আপনাকে গাড়ি করে নিয়ে যাবো।

ও বাবা! গাড়িতে কি কম তেল পুড়বে ? তার দরকার নেই। ট্রেনেই যেতে পারব।

শুক্রটা হল এইভাবে : মধ্যপ্রদেশের বাক্ষবগড় অরণ্যে এক শীতের বিকেলে আমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। সেই রাজকীয় বিশাল সুন্দর শরীর ধীর গতিতে উঠে এসেছিল একটা পাথরের চাতালে। আমি মুগ্ধ, সম্বোধিত। ভয় নয়, শ্রদ্ধা ও আবেগে আমার মাথা নত হয়ে এসেছিল তার সামনে। কী নিরাসক্ত, নির্ভীক আর উদাস তার চোখ। পৃথিবীতে তার ভয় পাওয়ার মতো কিছুই নেই। হা, এমন এক অসামান্য জীবকে চিড়িয়াখানার করুণ খাচার মধ্যে পুরে কী অপমানটাই না করে মানুষ! এমন দিনের কি আর দেরি নেই যখন রাজ্যহারা এই রাজা আশ্রয়হীন, খাদ্যহীন, বীতশ্রদ্ধ এই পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নেবে? ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হচ্ছে পাখি, পত, পতঙ্গের প্রজাতি।

প্রথম পরিচ্ছেদের নাম দিল কৃষ্ণজীবন, দি কিং ইজ ডায়িং।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম, দি ফানি ব্যালাস শিট। তাতে মানুষের সংখ্যা ও পৃথিবীতে উৎপন্ন ফসল ও খাদ্যের অনুপাত আর পশু ও তার খাদ্যের অনুপাতের বিস্তারিত পরিসংখ্যান, কতটা দৃশ্য ঘটছে পৃথিবীতে আর কতটাই বা শোষিত হচ্ছে সেই দৃশ্য, গাছপালা অরণ্যের হিসেবনিকেশ।

এইভাবে এগিয়ে গেল তার দ্বিতীয় গ্রন্থ, দি বলডিং হেড। কখনও পরিসংখ্যান, কখনও অঙ্ক, কখনও নীরস বিজ্ঞানের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে পুরাণ, গুপ্ত টেক্সট, কোরান, রিলকে, লোরকা, বোদলেয়ার, টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ, মিশে যাচ্ছে স্মৃতি, লোকগাথা, রূপকথা। বন্ধাধীন এক প্রবহমানতা। রূপসী বাংলার কত কবিতার যে অনুবাদ ঘটল সে! লিখতে লিখতে সংশয় আসে, এ কি তরল ছেলেমানুষী হয়ে যাচ্ছে? এ কি হয়ে যাচ্ছে একান্ত ব্যক্তিগত রচনা? মাঝে মাঝে তার কাউকে শোনাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কাকে শোনাতে? কার সময় আছে? কে শুনবে মন ও কান দুই-ই নির্বিষ্ট রেখে?

সংসার ছেড়ে হয়ত একদিন তাকে পরিব্রাজক হয়ে যেতে হবে। এ সংসার তাকে কিছুই দেয়নি, দিতে পারবেও না আর। রিয়া তাকে শাসন করতে করতে এমন একটা সীমারেখায় পৌঁছে দিয়েছে সেটা যেন ঘর ও বাইরের মধ্যবর্তী চৌকঠ। পেরোলেই মুক্তি। সে সহ্য করতে পারে না চটুল হিন্দি গান বা ভিসি আর-এ যখন তখন সিনেমা চালানো, জোরে কথা বলা, অকারণে রাগারাগি চৌচামেচি, ফি-এর সঙ্গে বিতর্ক তাকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। সে কখনও কাউকে শাসন করতে পারে না, তর্ক বা ঝগড়া সে কখনও করেই না। তবে কি তার রাগ হয় না? হয়। কিন্তু সেই রাগ যেন এক অন্ধ হাতির মত দাপাদাপি করে তারই ভিতরে। তার হৃদয়স্ত্রে, পাকস্থলীতে, ফুসফুসে, মস্তিষ্কে সর্বত্র সেই অন্ধ রাগের ধাক্কা গিয়ে লগে। তাকে ক্রান্ত করে দেয়, বিধ্বস্ত করে ফেলে, নিঃশ্বাস করে দেয়।

রিয়ার রাগ আজকাল এতই বেড়েছে যে সে আর ভ্রততার মুখোশটাও রাখছে না মুখে। বারবার সে পনের লক্ষ টাকা হারিয়ে চাইছে। বিটুপুরের বাড়ি নিয়ে তার দাপাদাপিও সামাজিক। তার ধারণা হয়েছে সব টাকা ঢেলে ফেলেছে সে গাঁয়ের বাড়ির পছনে। তাকে শোষণ করে নিচ্ছে তার আত্মীয়রা।

কোনও কথাই সে রিয়াকে বোঝাতে পারে না। একদিন চেষ্টা করতে গিয়েছিল, রিয়া হঠাৎ উন্মত্তের মতো প্রথমে একটা স্টিলের পেলাস ছুঁড়ে মারল তাকে। সেটা কৃষ্ণজীবনের কাঁধে সামান্য আঘাত করে ছিটকে গেল। পরের ঘটনা মারাত্মক। একটা রুটি বেলার বেলন দিয়ে ঘাড়ে, কপালে, গালে, হাতে এলোপাথাড়ি মারল তাকে। কৃষ্ণজীবন চূপ করে দাঁড়িয়ে শুধু ক্ষীণ আটকানোর চেষ্টা করে গেল। কোনও শোখ নিল না। সে অবাক দৃষ্টি চোখে ক্রোধ ও আক্রোশের বিকৃত চেহারাটা দেখছিল। এ সবই তার অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। এই পৃথিবী থেকে সে কত কিছু শেখে রোজ!

ঘটনার সময়ে ছেলেমেয়েরা বাড়িতে ছিল না। কিশোরী একটি ফি ছিল। সেই পরে এসে তুলো ভিজিয়ে তার ক্ষতস্থানের রক্ত মুছিয়ে দিয়েছিল।

না, কৃষ্ণজীবনের এত কিছু যায় আসে না। শুধু মনঃসংযোগ কেটে যায়। হারিয়ে যায় চিন্তার সূত্র। তাকে অপমান করবে কে! ধূলোমাটি থেকে সে উঠে এসেছে। তার অস্তিত্বের সর্বাস্থিই তো অবমাননার ধূলোমাটি লেগে আছে। তার কোনও জালা-যন্ত্রণা নেই।

সংসারে তার একটা মাত্র বন্ধু। দোলন। কিন্তু দোলনও কত বড় হয়ে গেল! আগে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে ঘুমোত। আজকাল একটু তফাত। আর আগের মত আবেল-তাবেল কথা হয় না তাদের মধ্যে।

সংসারের বান্দন কি শিথিল হয়ে এল তার? কাজের মধ্যে, লেখার মধ্যে যখন ডুবে যায় তখন তার তথাকথিত আনন্দজনেরা হারিয়ে যায় কোথায়। এই যে বলডিং হেড লিখছে সে, লিখতে লিখতে যেন কোন অতলে তলিয়ে যাচ্ছে সে। বারবার চলে আসছে কত তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা, কত স্মৃতির টুকরা, কত বৃষ্টির বিকেল, শীতের রাত, দেশ ও বিদেশের কত ল্যান্ডস্কেপ, ট্রামে বাসে ট্রেনে শোনা কথা, সংলাপের অংশ। লিখতে লিখতে নাওয়া-খাওয়া ভুল হয়ে যায়।

আমেরিকা থেকে পাবলিশার তার দ্বিতীয় গ্রন্থের জন্য অগ্রিম দশ হাজার ডলারের একটা চেক পাঠিয়ে দিয়েছে। এ টাকার কথা গোপন করতে হল তারে রিয়ার কাছে। কাজ কি অশান্তি বাড়িয়ে। সে মরে গেলে এ সব টাকা তো ওরাই পাবে। আঘাত টাকার কথাটা চাপা থাক।

কিন্তু টাকার এই আকর্ষণ, এই গুরুত্বকে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না সে। গরিব ঘরের ছেলে, প্রাণান্তকর কষ্টের মধ্যে বড় হয়েও কেন সে টাকার মূল্য বুঝছে না, এ প্রশ্নের জবাব সে তার বাবাকেও দিতে পারেনি সেদিন।

কৃষ্ণজীবন টের পায় দিন দিন সে এক গভীর নিঃসঙ্গতার মধ্যে চলে যাচ্ছে। তার বন্ধু নেই, আত্মীয় নেই, ভালবাসার লোক নেই কেউ। শুধু সে আর কাজ।

উত্তেজিত একটা টেলিফোন এল এক সকালে।

হ্যালো, আপনি কি মর্নিং নিউজটা শুনেছেন টিভি-তে?

না তো!

আমি হেমাঙ্গ বলছি। আপনি যে বিরাট একটা প্রাইজ পেয়েছেন!

কৃষ্ণজীবন উদাস গলায় বলল, আপনি কেমন আছেন? অনেকদিন আপনার দেখা নেই।

আরে মশাই, আমি ভালই আছি! আপনি যে প্রাইজ পেলেন সে বিষয়ে একটু রি-অ্যাকশন দেখান!

ওরা যে কেন আমাকে প্রাইজ দেয় কে জানে! পৃথিবী গোলায় যাচ্ছে, প্রাইজ দিয়ে কী হবে বলুন তো!

আচ্ছা মানুষ আপনি। একটু খুশি হবেন তো!

খুশি! তা খুশিই না হয় হলাম, ফর ইওর সেক। কিন্তু আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, প্রাইজ আসলে ঘৃণ। আমার প্র্যান বা পরামর্শ কিছুই ওরা নেবে না, ফাইল বন্দি করে ফেলে রাখবে। আর প্রাইজ দিয়ে বন্ধ রাখবে আমার মুখ।

আপনি একজন ইমপসিবল মানুষ! কিন্তু এরকমই থাকুন। খাঁটি লোক পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমে।

কৃষ্ণজীবন একটু হাসল, হারিয়ে যাচ্ছে না। তেমন মানুষ জন্মাচ্ছেই না আর। জ্ঞানও একটা বিজ্ঞান। মানুষ তা মানছে কই। অপমানুষে পৃথিবী ভরে যাচ্ছে।

আপনি ডারলিং আর্থ-এ এ কথা লিখেছেন।

লিখছি। বলছি। আর কী করতে পারি বলুন! কিছুতেই কাউকে বুঝিয়ে উঠতে পারছি না, এখন পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্য আমাদের একসঙ্গে বসা উচিত। জড়ো করা উচিত অল আওয়ার রিসোর্সেস। সবচেয়ে গুরুতর কাজ এখন এটাই। নইলে পৃথিবী চলে যাবে শয়তানের থাবায়। শুধু পরিবেশ তো নয়, মানুষকে ধরেছে আরও হরেক রকম ক্ষয়। আপনি কি জানেন হোমোসেকসুয়ালিটি একটা রোগ। মনোবিকার?

তাই তো মনে হয়।

এর থেকে পরিত্রাণ চাইছে না মানুষ। চাইছে তার এই রোগকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হোক। হোমোসেকসুয়াল আর লেসবিয়ান মানুষ ও মহিলারা জোটবদ্ধ হচ্ছে, মিছিল করছে, আলাদা অলিম্পিক করছে, যেন সেটাই স্বাভাবিকতা।

জানি।

আরও কি জানেন যে, বাপ-মায়ের সঙ্গে সন্তানের যৌন সংসর্গকে পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় তকমা এঁটে পাশ মার্কী দেওয়ার আয়োজন চলছে?

তাও জানি।

আপনি কি মানেন পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন?

মানছি।

এই অসুখ আমাকে দিনরাত কুরে কুরে খাচ্ছে। প্রাইজ দিয়ে আমি কি করব বলুন তো! কয়েক সেকেন্ড টিভি কভারেজ, মালা, রাষ্ট্রপতির হাত থেকে দৈত্যো হাসি হেসে পুরস্কার নেওয়া—গোটা ব্যাপারটাই এত কৃত্রিম! জীবনে বহুবার আমাকে এই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে।

হোমাস হেসে প্রসঙ্গান্তরে গেল, এবার বলুন বলডিং হেড কতদূর এগোল।

শেষের দিকে। প্রকাশকরা তাগাদা দিচ্ছে। আমি একটু সময় নিচ্ছি। লেখা শেষ হতে আরও মাসখানেক। তারপর রিভিশন।

সামনের বছর বেরোবে?

মনে হয়।

আমি অপেক্ষা করছি।

আপনি একজন অত্যন্ত ভাল লোক। আপনি সত্যিই পৃথিবীকে ভালবাসেন।

ধন্যবাদ।

আরও দু-চারটে কথার পর ফোন রাখল কৃষ্ণজীবন। মন তিক্ততায় ভরা।

রিয়া কাছেপিঠেই ছিল। ফোন রাখার সঙ্গে সঙ্গে সামনে এসে দাঁড়াল।

কে ফোন করেছিল?

হোমাসবাবু।

কী বলছিলেন উনি?

এমনি। কেমন আছি জিজ্ঞেস করলেন।

একটা প্রাইজের কথা শুনলাম যেন!

ও কিছু নয়।

কে প্রাইজ পেল? তুমি নাকি?

কৃষ্ণজীবন একটু লজ্জিত হয়ে বলল, হ্যাঁ, সেরকমই বলছিলেন।

কী প্রাইজ?

তা জিজ্ঞেস করিনি। বোধহয় সেন্ট্রাল গার্ডনমেন্টের কিছু একটা হবে!

অত তুচ্ছতাচ্ছল্য করার কী আছে? প্রাইজ তো একটা সম্মান।

হ্যাঁ। তা ঠিক।

তা হলে বলছ না কেন?

কৃষ্ণজীবন তার ক্লাস্ত বিষণ্ণ দৃষ্টি চোখে তার সুন্দরী স্ত্রীর মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে বলে, আমি জানি না রিয়া। রেডিও বা টিভি-তে হযত আবার বলবে। শুনে নিও।

তুমি ইন্টারেস্টেড নও?

না। প্রাইজ নিয়ে লাফালাফি করার কিছু নেই। যখন দেবে, হাত পেতে নেব। আর কি?

এতক্ষণ গলায় একটু ধমক ছিল রিয়ার। এবার হঠাৎ কোমল হল। বলল, তুমি কেন এরকম গো? তুমি কেন আর পাঁচজনের মত নও? তোমার জন্য যে আমার ভয় করে।

কৃষ্ণজীবন তটস্থ হল। অস্থিতি বোধ করতে লাগল। কিছু বলল না।

রিয়া বলল, এইজন্যই তো তোমার সঙ্গে আমার লেগে যায়। তোমার কোনও রি-অ্যাকশনই হয় না কোনও কিছুতে। এইজন্যই তো আমি মাঝে মাঝে পাগল হয়ে যাই।

কৃষ্ণজীবন মৃদু একটু হেসে বলল, আমি পাঁচজনের মতোই। তবে আমার তো অনেক চিন্তা, তাই বোধ হয় রি-অ্যাকশন কম হয়।

না, তা নয়। তুমি বোধ হয় একজন মস্ত মানুষ। আমি বোধ হয় তোমাকে ঠিক বুঝতে পারি না। না গো?

ঘন ঘন মাথা নেড়ে কৃষ্ণজীবন বলল, তা নয়, তা নয়। ওরকম ভাবতে নেই রিয়া। আমি কত সামান্য তা তুমি জানো না।

রিয়া তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। তার দু'চোখ বেয়ে টস টস করে জল গড়িয়ে নামে। একটু ফুঁপিয়ে উঠে বলে, আমি মাঝে মাঝে তোমার সঙ্গে রাফুসির মত ব্যবহার করি। কিন্তু তুমি যে...

কথা শেষ করতে পারল না রিয়া। ভেঙে পড়ল।

দ্বিতীয় ফোনটা এল গভীর রাতে, যখন কৃষ্ণজীবন তার রচনার মধ্যে ডুবে আছে। সে যে পরিচ্ছেদটা লিখছিল তার শিরোনাম কপালকুণ্ডলার সেই বিখ্যাত লাইন, পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?

কী করছেন আপনি এখন? লিখছেন তো!

হ্যাঁ। তুমি কেমন আছ?

আচ্ছা, আমি যে বড় হয়েছি তা আপনি লক্ষ করছেন?

কৃষ্ণজীবন হাসল, করছি।

কেমন লাগছে আপনার আমাকে এখন?

তুমি তো সুন্দর মেয়ে।

আহা, ওভাবে বান্ধবীকে কমপ্লিমেন্ট দিতে হয়? একদম গাইয়া হয়ে যাচ্ছেন কিন্তু।

গাইয়াই তো ছিলাম!

সে ছিলেন তো ছিলেন, এখন ইউ আর এ ফেয়াস ম্যান, এ সেলিব্রাইটি। আপনি যে একটা প্রাইজ পেলেন আমি জানি।

ওটা কিছু নয়।

তাও জানি। আপনি একটা খুব অহঙ্কারী লোক।

আমি তো উল্টো জানতাম।

মোটেই না মশাই। আচ্ছা বলডিং হেড কি আমি একটু অ্যাডভান্স পড়তে পারি না?

পারো। ইন ফ্যাক্ট আমি একজন কাউকে শোনাতে চাইছিলামও।

সত্যি? তা হলে কবে?

তোমার কখন সময় হবে?

আমার তো এক্ষুনি আপনার কাছে যেতে ইচ্ছে করছে।

পাগল। বলে হাসল কৃষ্ণজীবন। তারপর বলল, কাল আমার ক্লাস নেই।

আমিও স্কুল পালাব। কোথায় আর কখন?

একটু ভাবল কৃষ্ণজীবন। তারপর বলল, বেলা বারোটায় গোল পার্কের রেলিং-এর সামনে থেকো। তুলে নেব।

খিক খিক করে হাসল অনু। বলল, উইল ইউ বি সিক্রেট অ্যান্ড রোমান্টিক মিটিং?

নো, নটি গার্ল। ইউ উইল বি অ্যান অ্যাকাডেমিক মিটিং।

আচ্ছা বাবা, তাই হোক। তবু তো কিছুক্ষণ কম্পানি পাওয়া যাবে।

তোমার এখনও একটা বয়ফ্রেন্ড জুটল না?

কে বলল জোটেনি?

কে সে?

আপনিই তো আমার বয়ফ্রেন্ড।

কৃষ্ণজীবন হাসল। বলল, বড্ড পাকা হয়েছো।

কত বয়স হল জানান? এখন আমি আর গার্ল নই, এ উওয়ান।

পরদিন দুপুর বারোটায় জিন্স, সাদা শার্ট আর বড় রোদ চশমা পরা অনুকে যখন গাড়িতে তুলে নিল সে তখন কৃষ্ণজীবনের ভিতরে একটা কিছু হচ্ছিল। একটা সিরসিরে গোপন কাঁপন। মানুষ। এসব প্রবণতাকে বুদ্ধি ও বিবেচনা দিয়ে চাপা দেয়।

কোথায় যাব আমরা এখন?

কৃষ্ণজীবন হাসল, চল কোনও ভাল রেস্তুরেন্টে বসি!

আমার কিন্তু খিদে নেই।

এঃ হে, তোমাকে আজ লাঞ্চে ডাকলেই হত!

কেন ডাকেননি?

বড্ড ভুলে যাই যে!

এরকম আনমাইন্ডফুল বয়স্কে নিয়ে যে আমার কী মুশকিল!

আইসক্রিম তো খেতে পারবে!

পারব;

তা হলেই হবে। চল।

খুব দামী একটা হোটেলের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত রেস্টোরাঁয় তারা বসল। কৃষ্ণজীবন তার হাতে টাইপ করা কয়েকটি শিট দিয়ে বলল, পড় তো।

অনু যখন পড়ছিল তখন তাকে লক্ষ্য করছিল কৃষ্ণজীবন। মেয়েটা এমনিতে একটু ফাজিল, কিন্তু যে-ই পড়তে শুরু করল অমনি গম্ভীর, স্থির, একাধ্র হয়ে গেল। একবারও চোখ তুলল না। খুব খুশি হল কৃষ্ণজীবন। মেয়েটা হয়ত কেবল ফাজিলই নয়, ভিতরে ভিতরে সিরিয়াস।

কয়েকটা পাতা ধীরে ধীরে পড়ে শেষ করল অনু। তারপর মুখখানা যখন তুলে তার দিকে তাকাল, তখন মেয়েটার মুখখানা লাবণ্যে ভরে গেছে।

বুঝতে পারছ অনু?

পারছি না? কী যে বলেন! কী অদ্ভুত লেখা!

ওধু প্রশংসা করলেই তো হবে না। ক্রিটিক্যালি পড়লে তবে আমি নিশ্চিত হব।

ক্রিটিক্যালি! যা খুব সত্যি তাকে কি ক্রিটিসাইজ করা যায়?

ভোলাচ্ছ না তো!

না। আমি সে রকম গার্ল ফ্রেন্ড নই। আমি সিরিয়াস। আপনি একজন অদ্ভুত মানুষ। আমার কান্না আসছিল পড়তে পড়তে।

দ্যাটস গুড। দ্যাট ইজ ভেরি গুড। তোমার কি মনে হয় মানুষ এই লেখা পড়ে নড়েচড়ে বসবে? বই পড়লে মানুষের কিছু প্রতিক্রিয়া হয়। সেটা তাৎক্ষণিক। আমি চাই এমন লেখা লিখতে যা পড়ে মানুষ সত্যি করে কিছু করতে চাইবে এবং করবে।

অনু তার একখানা হাত বাড়িয়ে কৃষ্ণজীবনের হাতের ওপর রেখে একটু চাপ দিয়ে বলল, আপনিই হয়ত পারবেন। আমি তো অত বুঝি না।

তাও ঠিক। তোমার অভিজ্ঞতা কতটুকুই বা!

আমার আইসক্রিম কই?

আসবে। আমি বেয়ারাকে পরে আসতে বলেছি।

এবার ডাকুন।

কৃষ্ণজীবন অনুর জন্য আইসক্রিম আর নিজেদের জন্য কফির অর্ডার দিয়ে ততু মুখে বসল।

তিন মাস বাদে বলডিং হেড বেরল আমেরিকা থেকে। নিউ ইয়র্কে রিলিজের দিন উপস্থিত ছিল কৃষ্ণজীবন। টিভি থেকে ছোট্ট সাক্ষাৎকার নিল তার।

রাতে হোটেলের ঘরে অন্ধকারে একা বসে কাচের শার্সি দিয়ে বাইরে চেয়ে সেন্ট্রাল পার্কের দৃশ্য দেখছিল সে। দেখতে দেখতে সে চলে গেল বিটুপুর গায়ে, তার ছেলেবেলায়। কাদাজল ডেঙে ইকুলে যাচ্ছে। মাথায় কচুপাতা এক হাতে ধরা, জামার নিচে বইখাতা অন্য হাতে ধরা। খালি পা। চলেছে চলেছে। পথ ফুরোয় না আর। পিছল পথ। উঁচু নিচু পথ। কত দূরে ইকুল!

॥ ১০৭ ॥

মাসে মাসে পাঁচশো করে টাকা পাঠাচ্ছে নিমাই। মাসের প্রথমেই একটা ছেলে এসে দিয়ে যায়। হাত পেতে টাকাটা নিতে ইচ্ছে করে না বীণার। কিন্তু তবু নেয়। না নিলে তার চলবে কি করে? নিমকহারাম নিমাইয়ের জন্য তো সে কম করেনি। যদি সেই ঋণ শোধ করতে চায় তা হলে কল্কক। একটু বাধো-বাধো লাগলেও পুরনো কথা ভেবে বীণা নেয়।

যে ছেলেটা টাকা দিয়ে যায় সে আজ সকালেই এসেছিল। বীণা কোনওদিন তাকে বসতে বলে না, কোনওরকম আপ্যায়ন করে না। নিমাইয়ের লোককে সে তা করবেই বা কেন? তবে ছেলেটা ভারি ভদ্র আর বিনয়। খুব নরম গলায় কথা বলে। আজ যখন এসে ঘরমুণ্ড মুখে একটু হেসে পকেট থেকে টাকা বের করে হাতে দিল তখন বীণার একটু মায়া হল। হঠাৎ বলল, তোমার নামটা কী বল তো!

নির্মল রায়।

কী করো?

নিমাইদার দোকান দেখাশুনো করি, সঙ্গে থাকি।

একটু বসে জিরিয়ে নাও। চা খাবে?

চা আমি খাই না।

তা হলে জল খাও।

ছেলেটা অনাবিল আনন্দের হাসি হেসে বলল, একটু আগেই রাস্তার কল থেকে জল খেয়ে এসেছি। বাসে খুব তেষ্টা পেয়েছিল।

আমার ঘরে খাবারটাবার কিছু তেমন থাকে না। মুড়ি খেতে পারো। খাবে?

না। আমি খেয়েই বেরিয়েছি।

তাহলে তোমার সঙ্গে কি দিয়ে ভদ্রতা করি ?
ছেলেটা জিব কেটে বলল, কিছু লাগবে না দিদি।
নির্মলের হাসিটা বড় ভাল লাগল বীণার। সরল সোজা ছেলে। রংটা কালো হলেও মুখখানায় মায়ী মাখানো। এখনও
দুনিয়ার পাপ একে পায়নি।

তা হলে আসি ?

এসো গিয়ে।

নিমাইদাদাকে কিছু বলার নেই তো!

না। কী বলার থাকবে ? প্রথমবার তুমি টাকা দিয়ে একটা কাঁচা রসিদ লিখিয়ে নিয়েছিলে। মনে আছে ? আর নাও না তো!

ছেলেটা লজ্জা পেয়ে একটু হেসে বলল, আর লাগবে না।

ছেলেটা চলে গেছে। বিছানার ওপর টাকাগুলো পড়ে আছে অবহেলায়। বীণা এক ধারে চুপ করে বসে। এই
মাসোহারা ভাঙিয়ে তাকে বেঁচে থাকতে হবে নাকি ? এই দয়ার দানে ? চোখ থেকে মন থেকে ঝপুণ্ডলো সব মুছে যাচ্ছে।
আলো, হাততালি, উল্লাস, ভরা আসরে নেমে প্রাণ ঢেলে অভিনয়—সব কি মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেল ? এখন
গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য চেয়ে থাকতে হবে কাঁচরাপাড়ার দিকে ? তার যে বড় অপমান লাগে!

কিছুক্ষণ অঝোরে চোখের জল ফেলল বীণাপাণি। বুকেটা এত ভার হয়ে থাকে যে, বলার নয়। মাথা ধরে। শরীর
বিবশ হয়ে যায়। মনের কষ্টে তার কি একটা রোগ পাকিয়ে উঠছে ? মাথাটাও পাগল-পাগল লাগে আজকাল। কতকাল
পালা নেই, রিহার্সাল নেই, প্রশংসা নেই, এখানে ওখানে দল বেঁধে যাওয়া নেই। বনগাঁয়ে থেকে তা হলে আর কী লাভ ?

কিন্তু যাবেই বা কোথায় সে ? বাপের বাড়িতে ঝকঝকে দালান উঠেছে, একটু জায়গা সেখানে হতে পারে। কিন্তু
সেখানেই বা কী আছে ? কোন সুখ ?

আজ সকালটা বড় ভারী। কেমন যেন!

এতদিনে কি কাকার রাগ পড়েনি ? এককালে কাকা তো তাকে কতই স্নেহ করত। একবার যাবে নাকি কাকার কাছে ?
গিয়ে হাতজোড় করে বলবে, আর পারছি না কাকা, এ বারটা যদি ক্ষমা না কর তা হলে যে আমাকে গলায় দড়ি দিতে হয়।
না, কাকার কাছে আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে আর গিয়ে দাঁড়ানো যাবে না কখনই। কিন্তু কথটা নির্লজ্জের মতো মাঝে
মাঝে ভাবে সে।

সজল এল একটু বেলায়। একটু উত্তোখুস্কো চেহারা। বেচারি বড়লোক ধরার চেষ্টা করতে করতে হন্যে হয়ে গেল।
ভাল একজন স্পনসর পেলেই যাত্রার দল খুলবে। কিন্তু কেউ বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছে না।

চা খাওয়াবে নাকি বীণা ?

বীণা বিরস গলায় বলল, শরীর ভাল নেই।

কেন, কী হয়েছে ?

সে জানি না। আজ আমি কিছু করব না।

গলার স্বর শুনে মনে হয় কান্নাকাটি করেছ!

মেয়েমানুষ অনেক কাদে। ছুতো পেলেই।

তুমি তো শক্ত মেয়ে, সহজে কাদার পাত্রেী নও।

এককালে শক্ত ছিলাম। আজ নেই।

সজল টুলের ওপর বসল। বিছানার দিকে চেয়ে বলল, টাকাগুলো তুলে রাখো। হাওয়া দিচ্ছে, উড়ে যাবে।

বীণা হাত বাড়িয়ে টাকাগুলো খামচে বালিশের তলায় চাপা দিয়ে রেখে বলল, তোমার কী হল ?

কী আর হবে। চেষ্টা করে যাচ্ছি, হার মানছি না। তবে বাজার বড় সাম্ভাতিক। আমার মতো আনাড়িকে কেউ পাত্তা
দিতে চায় না। তোমার কথাও বলছি চারদিকে। আমার দলে তুমি থাকবেই। কিন্তু তাতেও কাজ হচ্ছে না।

আমার কথায় কাজ হবে কেন ? আমি কোন্ বিনোদিনীটা বল তো ?

আমার ধারণা ছিল এই অঞ্চলে তোমার খুব নাম। নাম যে নেই তাও নয়। সকলেই তোমাকে চেনে। কিন্তু উৎসাহ
দেখাচ্ছে না।

তুমি বোকা। ভুলে যাচ্ছ কেন যে, আমার বদনামও আছে ? কাকা তো আমাকে চুরির দামে তাড়িয়েছে।

ধুর! ওটা কোনও কথা নয়। যতদূর জানি কাকা তোমার বদনাম করে বেড়ায় না। তাছাড়া এ সব করার তার সময়
কোথায় ? সে এখন নতুন নতুন পালা নিয়ে ব্যস্ত। দল বড় হচ্ছে। চিংপুরে ঘর নিচ্ছে গুনলাম। পুরোপুরি পেশাদার
ব্যাপার।

সব জানি। আমার মতো চুনোপুটিকে নিয়ে ভাববার তার সময় নেই। তবু আমার বদনাম আমার চারদিকে একটা
বোড়া তুলে দিয়েছে। তুমি বরং বনগাঁ ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে দল করো।

সে চেষ্টাও কি করিনি ? এখানে দল করতে গেলে কাকা হামলা করতে পারে। সে হামলা না করলেও কম্পিটিশনে
তার সঙ্গে পারব না। কিন্তু কোথাও কিছু সুবিধে হচ্ছে না।

তা হলে আর আয়ুক্ষয় করছ কেন ?

কী করব তা বলতে পারো ? আমার তো মাথায় কিছুই আসছে না।

কাকার মতো শ্রাগলিং করো।

কী যে বলো! ও সব পারব না।

বীণা একটু হাসল। বলল, বড় শখের মূল্য দিতে হয়। নীতিকথা মেনে চললে হয় না।

নীতিকথা মানিও না। বাঁচার জন্য সব কিছু করা যায়। কিন্তু সবার তো সব রকম গাটস্ থাকে না। আমার ধাত ওরকম নয়। দেখ, শো বিজনেসের চেয়ে ভাল বিজনেস কিছু নেই। আমি পারলে ওটাই পারব।

বীণা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তা হলে চেষ্টা করে যাও।
করছি বীণা। তোমাকে একটা কথা বলব? অভয় যদি দাও।

বলই না। নাটক করার দরকার নেই।

তোমার হাজ্যার্ডের ব্যবসাসটা ভালই চলছে শুনি। উনি আরও একটা হোটেল খুলছেন। জানো?

একটু অবাক হয়ে বীণা বলে, না। কিন্তু হঠাৎ তার কথা কেন?

বলছিলাম কি, নিমাইবাবুর একবার অ্যাপ্রোচ করলে হয় না?

জুটুটি করে বীণা বলল, তার মানে?

উনি ইচ্ছে করলে আমাদের ফিনান্স করতে পারেন। দলের মালিকানা ওঁরই থাকবে, আমরা লাভের একটা অংশ পারিশ্রমিক নেবো।

বীণা প্রচণ্ড রাগের একটা উত্তাপ টের পেলে তার মাথায়। রগের শিরাগুলো দপদপ করতে লাগল। কঠিন চোখে চেয়ে সে বলল, তুমি কি জানো ও লোকটাকে আমি কত ঘেন্না করি?

সেটা তো পারসোনাল লেভেলে। কিন্তু প্রফেশনাল লেভেলে হেল্প নিতে ক্ষতি কী? ওরও লাভ, আমাদেরও লাভ। পিওর পার্টনারশিপ।

তুমি এক নম্বরের আহাম্মক বলেই এ কথা ভাবতে পারলে। যাত্রার দল খোলার কথা ভাবতে ভাবতে তুমি উন্মাদ হয়ে গেছ। সব জায়গায় পার্টনারশিপ চলে না। আত্মমর্যাদা বলে একটা জিনিস আছে।

সজল উত্তেজিত না হয়ে বলল, আচ্ছা, তুমি অত রেগে যাচ্ছ কেন? বাঁচার জন্য ঝগলিং করার চেয়ে তো এটা ভাল।

ও কথা আর মুখে এনো না। তা হলে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে না।

ঘাট হয়েছে বাবা। কিন্তু নিমাইবাবুর মাসোহারা তো নিচ্ছ বীণা। সেইজন্যই সাহস করে কথাটা পাড়লাম।

মাসোহারা নিই কে বলল?

তা হলে?

আমার কাছে তার অনেক দেনা আছে। কষ্টের দিনে নিজে না খেয়েও তার সংসার টেনেছি। এখন সে সেই দেনা শোধ করছে। সে কথা তোমাকে বলেওছি।

সরি বীণা। তোমার অতীতের কথাটা আমার খেয়াল ছিল না।

বীণা কিছুক্ষণ মুখটা জড়ো করা হাঁটুর মধ্যে গুঁজে রাখল। তারপর মুখ তুলে বলল, তাও নিতাম না, যদি কাকার চাকরিটা থাকত।

সজল কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে বলল, তোমার রেফারেন্স না দিয়ে যদি নিমাইবাবুরকে অ্যাপ্রোচ করি?

বীণা কঠোর গলায় বলে, কখনই নয়। ওকে ছেড়ে তুমি অন্য কথা ভাবো।

সজল ক্রুদ্ধ মুখ করে বলে, আর যে কাউকে রাজি করাতে পারছি না। শুনেছি উনি বেশ দয়ালু লোক।

দয়ালু নয়, দুর্বল লোক। কিন্তু ওকে ভুলে যাও সজল।

তা হলে একটা পরামর্শ দাও। এ ভাবে বসে থাকার মানে হয় না।

আমিও তো বসে আছি।

তোমাকেও বসে থাকতে হবে না। দল করতে পারলে তাতে তো তুমিও থাকবে।

থাকব কি না কে জানে! আমার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। গলার জন্য একগাছা দড়ি ঠিক জুটবে।

উঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারি না।

বীণা হঠাৎ বলল, আজ যাও সজল। আমার আজ আর বকবক করতে ভাল লাগছে না। মাথাটা ভীষণ ধরেছে। একটু চোখ বুজে শুয়ে থাকব।

সজল বিদায় নিল। সজল বোকা এবং আহাম্মক। নইলে নিমাইয়ের টাকায় দল খোলার কথা ভাবতে পারত না। কিন্তু নিমাই যে মালদার হয়েছে সেটা জানা ছিল না বীণার। ওর কি এতই টাকা? এমন বুদ্ধিই যদি ওর ছিল তা হলে এতকাল বউয়ের পয়সায় বসে বসে খেল কেন?

বীণা এই ধক্টা নিয়ে সারা দিন উপোসী পেটে বসে রইল। গুলো বটে, কিন্তু ঘুম এল না। সারা রাত কাটল এ-পাশ ও-পাশ করে।

খুব ভোরে উঠে সে মুখ হাত ধুয়ে বেরনোর জন্য তৈরি হল। মাথাটা আরও ভার হয়ে ছিঁড়ে পড়ছে। সারা গা জুরো রুগীর মতো গুত্ত। ঠাণ্ডা জল ঝুলে ছ্যাক ছ্যাক করছে। চোখে জ্বালা-জ্বালা ভাব। এক কাপ চা আর একটা ব্যথার বড়ি খেয়ে একটু সামাল দিল সে। খালি পেটে ব্যথার বড়ি খেলে অশ্বল উথলে ওঠে। কিন্তু কিছু মুখে দিতে ইচ্ছেই হল না তার।

যখন বাস ধরল তখন চারদিকে রোদ ঝলমল করছে। সেই রোদ চোখে লাগছিল খুব।

কাঁচরাপাড়ায় বড় রাস্তার কাছেই নিমাইয়ের দোকান। এই সাতসকালেও সেখানে রাজ্যের ভিড়। দোকানটা বাইরে থেকেই দাঁড়িয়ে একটু দেখল বীণা। চা, ঘুঘনি, পাঁউরুটি, চাপাটি আর জিলিপি খুব বিক্রি হচ্ছে। ভিতরে নিমাইকে দেখা গেল না।

একটা ছোকরা দরজার কাছেই একটা টেবিলে চা দিচ্ছিল। ভিতরে ঢুকে বীণা তাকেই জিজ্ঞেস করল, নিমাইবাবু কোথায় বলতে পারো?

ও বাড়িতে।

ও বাড়ি! সেটা কোথায়?

নতুন দোকানে। সামনে এগিয়ে গেলে বাঁ হাতে পাবেন।

বীণা ইতস্তত করছিল। হঠাৎ ভিতরের কোনও ঘর থেকে নির্মলকে বেরিয়ে এসে ক্যাশ কাউন্টারে বসতে দেখল সে।

বীণা এগিয়ে গিয়ে বলল, তুমি তো নির্মল ?

নির্মল দু-এক সেকেন্ড চেয়ে থেকেই টপ করে উঠে দাঁড়িয়ে সেই সরল হাসিটা হেসে বলল, দিদি! কখন এলেন ? এইমাত্র।

বসুন বসুন। চা খান এক কাপ। আর কী খাবেন বলুন ?

কিছু নয়। তোমার নিমাইদা কি নতুন দোকান দিলেন ?

হ্যাঁ। বড় দোকান। কাছেই তো। যাবেন ?

একবার দেখা করব।

চলুন তা হলে, আপনাকে নিয়ে যাই।

তুমি ব্যস্ত হয়ো না। আমি খুঁজে নিতে পারব।

আরিকবাস, তাই হয় ? আপনি এসে পড়েছেন যখন, তখন আমার ওপর সব ছেড়ে দিন। তার আগে একটু কিছু মুখে দিন।

আমার একটুও খাওয়ার ইচ্ছে নেই। মাথা ভীষণ ধরেছে।

অন্তত এককাপ চা! স্পেশাল করে দেবে।

আগে ওর সঙ্গে দেখা করি, তারপর।

তা হলে চলুন।

বাইরে এসে একটা রিকশা নিল নির্মল। বীণা বলল, দূর নাকি ? রিকশা নিচ্ছ কেন ?

দূর নয়। কাছেই। হেঁটে যাওয়ার দরকার কী ?

হেঁটেই যাই চল। হাঁটতে ভালই লাগবে।

তবে তাই চলুন। রিকশার অবশ্য ভাড়া লাগত না। আমাদেরই রিকশা। নিমাইদা তো অটোরিকশাও কিনছেন।

খুব ফলাও কারবার তো!

লোকে বলে নিমাইদা যা ধরেন তাই সোনা হয়ে যায়। বাজারে এক পয়সা ধার নেই। সবাই মানে।

তুনে বীণার বমি-বমি করছিল। এত পয়সা করল ওই লোকটা ? কি করে হয় ?

মিনিট কয়েক হাঁটার পর যে দোকানটার সামনে তারা পৌঁছলো সেটা আসলে একটা ধাবা। মস্ত জায়গা নিয়ে ছড়ানো ব্যবস্থা। সামনে মস্ত করুণগেটেড শেডের তলায় সারি দিয়ে খাটিয়া পাতা। ভিতরে মস্ত রেস্তুরেন্ট। মেলা টেবিল-চেয়ার। সবটা ঝকঝক তকতক করছে। তন্দুরি রুটি সৈঁকার গন্ধ, কচা মাংস হচ্ছে, কোন্ড ড্রিন্স সাজানো, মস্ত ফ্রিজ। বেশ কিছু খন্দের বসে আছে। উঠানের এক দিকে বাথরুম-পায়খানা, চৌবাস্তা ভর্তি জল, মগ, সব আছে। দোকানের সামনের দিকে এক কোণে পান সিগারেটের দোকান রয়েছে।

এইটেই। ভিতরে আসুন দিদি।

এটা কি ধাবা ?

হ্যাঁ। রাতে খুব ভিড় হয়। দুপুর থেকে শুরু হয় ভিড়টা।

কবে হল ?

মাস দুয়েক।

নিমাইকে পাওয়া গেল না। বাজারে গেছে। সুতরাং বসতে হল বীণাকে। কাউন্টারের গদিআটা চেয়ারেই তাকে বসিয়ে নির্মল হাঁকডাক শুরু করে দিল। সবাইকে বুঝিয়ে দিল দোকানের মালকিন এসেছেন।

খাটি দুধে লিকার করা চা আর মচমচে টেস্ট চলে এল সঙ্গে সঙ্গে।

খান দিদি। টোস্টে স্পেশাল মাখন লাগানো আছে। আমরাই মাখন বানাই।

বীণা খুব অনিচ্ছের সঙ্গে চাটা মুখে তুলল। শুচিবায়ু করে লাভ নেই। নির্মল হয়ত দুঃখ পাবে।

কিন্তু সুস্বাদু টোস্ট আর চমৎকার চা খাওয়ার পর শরীরটা অনেক ভাল লাগল তার। গতকাল সারা দিন উপোস গেছে। আজ ভীষণ দুর্বল লাগছিল শরীর।

দিদি, আপনাকে খুব টায়ার্ড দেখাচ্ছে। একটু বিশ্রাম করবেন ? ভিতরে ভাল ব্যবস্থা আছে।

এই তো বেশ আছি।

নিমাইদার আসতে হয়তো দেরি হবে। আজ একটু মোটা বাজার আছে। ততক্ষণ আপনি একটু গড়িয়ে নিতে পারেন। শরীর ভাল নয় বলছিলেন। আসুন আমার সঙ্গে।

কি জানি কেন বীণা উঠল। ধাবার ভিতরে পিছন দিকে বেশ কয়েকটা ঘর রয়েছে। বেশ সাজান-গোছান।

এ সব ঘর কার জন্য নির্মল ?

তিনটে ঘর। দুটো নিমাইদা ব্যবহার করেন। আর একটা আছে কোনও গেস্ট এলে থাকেন। এখনও কেউ থাকেনি এখানে। নতুন চাদর পাতা হয়েছে আপনার জন্য। একটু শুয়ে থাকুন।

আশ্চর্যের বিষয়, এই প্রস্তাবটিও বাক্যব্যয় না করে মেনে নিল সে। শরীরটা সত্যিই আর দিচ্ছিল না। বীণা শুয়ে পড়ল। বেশ নরম বিছানা। নির্মল জানালার পর্দা টেনে দিল। তারপর বেরিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে গেল সাবধানে।

বীণা শুয়ে শুয়ে ভাবছিল, সে তো ভাব করতে আসেনি। সে শুধু একটা কথাই বলতে এসেছে। লোভী সজল যদি বীণার ব্যগ্র না শুনে যাত্রার দল খোলার প্রস্তাব নিয়ে আসে তা হলে যেন নিমাই রাজি না হয়। সে যতদূর সজলকে চেনে, তাকে তার দৃঢ় বিশ্বাস, সজল তা করবে। ওর চরিত্র বলে কিছু নেই, বুদ্ধিও অবাস্তব। ও আরও একবার নিমাইয়ের কাছে পার্থিব—৫৬

এসেছিল বীণার ওপর অধিকার ছেড়ে দেওয়ার কথা বলতে। সেটা বড় লজ্জার ব্যাপার হয়েছিল বীণার কাছে। নির্বোধ সজল যাত্রার দল খোলার জন্য পাগল হয়ে গেছে। এখন তার পক্ষে সবই সম্ভব।

কিন্তু নিমাইয়ের অবস্থা দেখে বীণাও একটু হকচকিয়ে গেছে। এ কি ময়দানবের কাণ্ড? মাঝ দু-তিন বছরে এত কাণ্ড কি করে নিমাই ঘটিয়ে তুলল? আগে তো এখানেই একটা ফলের দোকান চালাত। তাতে পেটও চলত না ভাল করে।

ভাবছিল, খুব ভাবছিল বীণা। ভাবতে ভাবতে কখন ঘোরের মতো ঘুমের অতলে তলিয়ে গেল কে জানে! অতল গভীর ঘুমে ভলিয়ে যেতে যেতে সে ভাবছিল, কাজটা ঠিক হচ্ছে না।

যখন ঘুম ভাঙল তখন সকাল না বিকেল বুঝতে পারল না সে। জানালার পর্দা টানা, ঘরের দরজা ভেজানো। শুধু একটা জলের পরিষ্কৃত জগ আর ঢাকা দেওয়া চকচকে কাচের গেলাস কে রেখে গেছে যেন। আকণ্ঠ ভেঁটা টের পেল বীণা। ঢকঢক করে অনেকটা জল খেল। বাইরে এখনও দিনের আলো আছে।

মাথা ধরাটা ছেড়ে গেছে। শরীর দুর্বল হলেও তেমন জড়তা নেই। সামনে একটা ড্রেসিং টেবিল দেখে বীণা নিজেকে একটু শুছিয়ে নিল। লোকটা কি ফিরেছে?

বীণা উঠতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে দরজায় টোকা দিয়ে বাইরে থেকে নির্মল জিজ্ঞেস করল, দিদি কি উঠছেন?

হ্যাঁ।

দাদা ফিরেছেন। ডাকব কি?

ডাকো।

ডাকতে বলার পর থেকেই বুকটা হঠাৎ দুক্ক দুক্ক করতে থাকে বীণার। কেন করে কে জানে! নিমাইকে সে কোনওকালে পূর্ণাঙ্গ পুরুষ বলে তো মনেও করেনি। তার কি তবে ভয় করছে? নার্ভাস লাগছে? লাগলে সেটা খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার।

দরজায় টোকা দিয়ে নিমাই বলল, আসব নাকি?

জবাব দিতে গিয়ে গলাটা দেবে গেল বীণার। ফেসে যাওয়া স্তিমিত গলায় বলল, এস।

দরজা ঠেলে যখন নিমাই ঘরে ঢুকল তখন বীণা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়েছিল।

নিমাই বেশ দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে রইল। কিছু বলল না।

খুব আশ্চর্য চোখ ফেরাল বীণা। মানুষটা নিমাই বটে, আবার নয়ও। সেই ছোটখাটো চেহারা, তবে শরীরটা পোড় খেয়েছে। রঙটা আরও তামাটে। পরনে একটা ফর্সা ধুতি আর সাদা শার্ট। হাতে ঘড়ি। কিন্তু এ তো বাইরের খোলস। যেটা অবাক হওয়ার সেটা হল, নিমাইয়ের মুখচোখ। সেই ভীতু, আত্মবিশ্বাসহীন, জুলজুলে চাউনি আর নেই। বদলে ভরপুর, শান্ত, আত্মবিশ্বাসী একজোড়া চোখ।

বীণা বলল, বসবে না? কথা আছে।

নিমাই চেয়ারে বসল। কিন্তু কিছু বলল না। বড্ড চূপচাপ।

বীণা এই নিমাইকে ঠিক চিনতে পারছে না। কে জানে কেন, তার একটু ভয়-ভয় করছে। সে স্তিমিত ধরা গলায় বলল, একটা জরুরি কথা বলতে এসেছি।

ও। সংক্ষিপ্ত জবাব দিল নিমাই।

সজল বলে একটা ছেলে আছে বনগাঁয়ে। ছেলেটা যাত্রার দল খুলবে বলে পাগল। সে হয়ত তোমার কাছে এসে টাকা চাইবে। ওকে টাকাপয়সা দিও না।

সে ইতিমধ্যে বারকয়েক এসে ঘুরে গেছে।

বীণা সচকিত হয়ে সবিস্ময়ে বলল, এসে গেছে?

কয়েকবার। তোমার নাম করেই বলেছে যে, তুমি নাকি দল খুলতে চাও, টাকার দরকার।

সর্বনাশ! কী মিথ্যুক! তুমি দাওনি তো?

না। অতটা আহ্বায়ক হলে আমার চলে না। তবে তাকে বলেছি, বীণা যদি নিজে প্রস্তাব দেয় তবে ভেবে দেখব।

আমি কিন্তু ওকে পাঠাইনি। মিথ্যে কথা বলেছে।

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে তাই মনে হচ্ছিল।

একটু শঙ্কিত হয়ে বীণা বলল, ও তোমাকে আর কী বলেছে?

নিমাই মাথা নেড়ে বলে, আর কিছু নয়।

আমার সম্পর্কে কিছু বলেনি তো!

নিমাই একটু চূপ করে থেকে বলল, তোমাদের সম্পর্কের কথা বলে।

কী সম্পর্ক?

ভাব-ভালবাসার কথা। তোমরা বিয়ে করবে। ঘর বাঁধবে। এই সব।

বীণার মাথায় বজ্রাঘাত হল। সে শুধু বলল, কী সর্বনাশ!

॥ ১০৮ ॥

চারদিকে কত গাছ, তবু চড়াইপাখি সব সময়ে মানুষের ঘরে কেন বাসা বাঁধে বল তো।
বাসন্তী মশলা বাটছিল। বলল, তোমার সব উড্ডুটে প্রশ্ন বাপু। চড়াইপাখি কোথায় বাসা করে তাই নিয়ে সকালেই কেন ভাবতে বসলে বলো তো!

তুই কখনও লক্ষ করিস না যে অন্য পাখিরা গাছে বাসা বাঁধে কিন্তু চড়াই নয়?

কে জানে বাপু চড়াইয়ের বৃত্তান্ত। ঘরের মধ্যে বাসা করেছে নাকি? তা হলে ভেঙে দাও। ওরা ঘরদোর বড় নোংরা করে।

ভেঙে দেবো কি রে? ওরা আমার বন্ধু যে।

এখন কাক বক চড়াই শালিখ তোমার বন্ধু হচ্ছে নাকি? তুমি না পারো আমিই চড়াইয়ের বাসা ভেঙে দিয়ে যাবো।

খবরদার না, বাসায় যদি ডিম থাকে?

বাসন্তী অবাক হয়ে বলে, থাকলে কী হল? হাঁস-মুরগির ডিম ভেঙে দুনিয়াসুদ্ধ লোক খাচ্ছে না?

তোর মায়্যা-দয়্যা একটু কম আছে বাসন্তী। এত নিষ্ঠুর কেন তুই?

বাসন্তী ফিক করে হেসে বলল, রাগ করলে নাকি? তোমার যে সব অদ্ভুত কাণ্ড! অত মায়্যা করছ, কিন্তু দুনিয়াতে মানুষের খাওয়ার জন্যও তো ভগবান কিছু জীবকে পাঠিয়েছেন। জলের মাছ, ডাঙার পাঁঠা, খাসী, মুরগি এদের সৃষ্টিই তো খাওয়ার জন্য।

ভগবানের সঙ্গে তোর এসব নিয়ে কথা হয় নাকি?

আহা, সংসারের যা নিয়ম তাই বলছি।

সংসারের যে কি নিয়ম তা কেউ জানে না। যার যেমন প্রবৃত্তি সে সেরকম নিয়ম করে নেয়। বুঝেছিস?

বুঝেছি গো বুঝেছি। এখন তেনারা কখন আসবেন বলো। সকাল তো আটটা বাজে।

অস্থির হচ্ছিস কেন? আসবে। কলকাতা কি আর এক দৌড়ের রাস্তা? ধামাখালি পৌছতেই কত সময় লাগে। তারপর ভটভটি।

আমার খুব আনন্দ হচ্ছে কিছু।

তোর তো সব তাতেই আনন্দ।

গায়ে বড় একঘেয়ে জীবন, জানো তো! নতুন মানুষজন দেখলে একটু ভাল লাগে। সেই মেয়েটা আসবে তো!

হেমাঙ্গ সামান্য হেসে বলল, খুব পেকেছিস।

আহা, তাকে আমার প্রথম দেখেই ভীষণ ভাল লেগেছিল যে।

তোর কাকে ভাল না লাগে? সাজগোজ করা শহরে মেয়ে দেখলেই তো তুই হাঁ হয়ে যাস। তখন তোর চোখের পলক পড়ে না।

কী বলে গো মিথ্যে কথা! বলে বাসন্তী হি হি করে হাসল।

রাস্তার দিক থেকে বাকা মিঞাকে আসতে দেখা গেল। পিছনে দুটো লোকের মাথায় একটা ঢৌকি। তারও পিছনে ফজল। তার মাথায় শতরঞ্জিতে বাঁধা একটা বিছনা।

একমুখ হাসি নিয়ে বাকা আগর ঠেলে ঢুকল, সব নিয়ে এলাম।

হেমাঙ্গ বলল, বেশ করছে।

আপনি একটু ঘাটপানে যান। ততক্ষণে ফজল ঘরটা গুছিয়ে দিক।

এখনই ঘাটে গিয়ে কী হবে? তাদের আসতে দেরি আছে।

কিছু বলা যায় না। হয়তো খুব ভোর-ভোর রওনা হয়ে পড়েছেন।

হেমাঙ্গ একটু হাসল। এ যাবৎ নিশিপুরে কম লোক আসেনি তার বাড়িতে। কিন্তু আজ যারা আসছে তাদের জন্য বাকা মিঞা আর বাসন্তী একটু যেন বেশিই ভটহু। কারণটা কিছু ধরতে পারছে না হেমাঙ্গ। কোথাকার জল কোথায় গড়াচ্ছে কে জানে।

হেমাঙ্গ উঠে পড়ল এবং পায়ে পায়ে ঘাটের দিকেই এগোতে লাগল। ভারি বৃষ্টির পর শরৎকালটা ফুটে উঠছে সবে। এ সময়ে চারদিকে প্রকৃতির ঐশ্বর্য যেন থরে-বিথরে ফুটে ওঠে। এত সুন্দর স্বাস্থ্য আর হয় না। তার উঠোনে শিউলিফুল ছড়িয়ে থাকে অজস্র। গন্ধে যেন বাতাস গুঁজ হয়ে যায়।

নদীর ধারটায় এসে দাঁড়াতেই মুগ্ধ সম্মোহিত হয়ে গেল হেমাঙ্গ। জল আকাশ আর আদিগন্তের প্রসার যেন তাকে টেনে নেয় বৃকের মধ্যে।

আচর্যের বিষয়, ঘাটে এসে দাঁড়ানোর দশ মিনিটের মধ্যেই যে ভটভটিটা এসে ভিড়ল সেইটে থেকেই নামল মণীশ, অপর্ণা, অনু আর—না, আর কেউ নয়।

মৃত পায়ে আশ্তে আশ্তে এগিয়ে গেল হেমাঙ্গ। মৃত টোটে হাসল। মৃত গলায় বলল, আসুন, আসুন! কোনও কষ্ট হয়নি তো!

ঘাটে চাঙড় ফেলা। পাথরের চ্যাটালো চাতালটুকু সাবধানে ডিঙিয়ে, মাটি আর ইটের পিছল ধাপ ভেঙে ভারসাম্য রাখতে রাখতে উঠে আসছিল অপর্ণা। হেসে বলল, কষ্ট নয় তো কি? বাব্বাঃ, যা দূর!

অপর্ণার তুলনায় অনেক বেশি সপ্রতিভভাবে উঠে এল মণীশ আর অনু। ঘাটে দাঁড়িয়ে চারদিকে চেয়ে মণীশ বলল, বাঃ, এ তো দারুণ সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ!

হেমাঙ্গ বলল, ক্যামেরা এনেছেন?

না।

অনু বলল, আমি এনেছি।

একজন আসেনি। সেই না-আসাটা নিয়ে কোনও প্রশ্ন করতে পারল না হেমাঙ্গ। অথচ প্রশ্ন করাটাই তো স্বাভাবিক ছিল। চারজনের একজন কেন এল না? সেই অনুপস্থিতি যে এই তিনজনের আসার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বের সেটা হেমাঙ্গ টের পেল নিজের ভিতরে। তার চোখে এই শরতের সুন্দর সকাল, এই মায়ারী আলো, আদিগন্ত অফুরান বিস্তার সব যেন কেমন মিথ্যে-মিথ্যে লাগছে। সুর কেটে গেল, তালে ডুল।

অতিথিদের ঘরে নিয়ে এল হোমাস, এই আমার জঙ্গলবাড়ি। দেখুন কেমন লাগে!

সৌজন্যের বশেই হবে, অপর্ণা উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, বাঃ, কী সুন্দর বাড়ি আপনার! লাউডগা বুঝি চালের ওপর ? অনেক কিছু আছে। দেখবেন।

মণীশ চারদিকটা দেখে-টেখে বলল, আপনি এখানে প্রায়ই থাকেন, না ?

হ্যাঁ। আর তাই নিয়েই আমার আত্মীয়স্বজনের অশান্তি।

কেন ? তাঁরা আপত্তি করেন নাকি ?

খুবই করেন। বিশেষ করে মা। মায়ের ধারণা আমি সাধুসন্ত হয়ে যাচ্ছি।

মণীশ একটু হাসল, আজকাল অনেকেই কলকাতার বাইরে পলিউশন-ফ্রি এলাকায় বাড়ি-টাড়ি করে রাখে। ফুসফুস পরিষ্কার করার এর চেয়ে ভাল পদ্ম আর কী আছে ? শান্তিনিকেতনে ভিড় বাড়ছে তো এই জন্যই। কত টাউনশিপ হচ্ছে সেখানে।

বাকা মিগ্রা আর ফজল চলে গেছে। তারা ফের দুপুরে মুরগি রোধে দিয়ে যাবে। বাসন্তী ঘরের শেষ ঝাড়পোছ সাঙ্গ করে বেরিয়ে এল। একমুখ হাসি।

হোমাস বলল, এ হল বাসন্তী। এখানে ওই আমার সব দেখাশোনা করে।

বাসন্তী টিপ-টিপ করে সবাইকে প্রণাম করে চায়ের জল চড়িয়ে দিল স্টোভে।

অনু বলল, আমি চা খাবো না। একটু ঘুরে আসি মা।

হোমাস বলল, আরে দাঁড়াও। আমার সঙ্গে যাবে।

আচ্ছা।

ব্যাগ থেকে একটা ক্যামেরা বের করে অনু টুক করে বাড়িটার একটা ছবি তুলে নিল। অনু একটা খুব নরম ভূষো নীলচে রঙের চুড়িদার পরে এসেছে। ফর্সা ও লম্বা মেয়েটিকে দেখাচ্ছে ভারি সুন্দর। দুই বোনের মুখশ্রীর তেমন মিল নেই। কিন্তু অনুর চটক বেশি। সহজেই নজরে পড়ে।

বাসন্তী বারান্দায় চেয়ার সাজিয়ে রেখেছিল। মণীশ আর অপর্ণা বসল; অপর্ণা বলল, ঝুমকিটা এল না। আজ ও চারুশীলার সঙ্গে কোথায় যেন যাবে। ঠাকুর তো রোজ একটা না একটা কিছু আছেন।

হোমাস হেসে বলল, জানি।

ঝুমকিকে ভীষণ ভালবাসে তো! ঝুমকি বলল, আমি তো নিশিপুর ঘুরে এসেছি মা, তোমরা যাও।

এসব কথা শুনছে হোমাস, বুঝছে অন্যরকম। কেন আসেনি সেটা এরা কেউ জানে না। জানবেও না কোনও দিন। হোমাস জানে। গভীরভাবে জানে।

চা খাবার ইত্যাদির পর্বটা কোনও রকমে পার হল হোমাস। তারপর উদ্ভাতা করে বলল, আপনারা কি একটু বেড়াতে যাবেন ?

অপর্ণা বলল, আমার কিন্তু টায়ার্ড লাগছে।

মণীশ বলল, আমারও। একটু জিরিয়ে নিই, তারপর দেখা যাবে। বেরোনার খুব একটা দরকার আছে কি ? উঠোন থেকেই তো নদীটা দেখা যায়। ওইটে যথেষ্ট। সামনে একটা নদী থাকলে আর কী চাই ?

অনুকে নিয়ে হোমাস বেরোলো।

রাস্তায় পা দিয়ে অনু বলল, আপনি খুব ডিজহাটেনড, না ?

কেন বলো তো!

অনু হি হি করে হেসে বলে, দিদি আসেনি বলে!

হোমাস গভীর হওয়ার চেষ্টা করে বলে, তা কেন ? অনেকের অনেক জরুরি কাজ থাকতে পারে।

আচ্ছা, আপনি এরকম পিকিউলিয়ার কেন বলুন তো!

কি রকম ?

দিদিকে কি আপনি একদিন ফোনে বলেছিলেন যে ওকে আপনি অ্যাভয়েড করতে চান ?

তোমাকে কে বলল ?

মুনন, দু'জন বোন যখন কাছাকাছি হয় তখন কেউ কারও কাছে কথা লুকোতে পারে না। উই শেয়ার আওয়ার সিক্রেটস। বলুন না, বলেছিলেন!

হোমাস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আনফরচুনেটলি, ইয়েস।

দেন হোয়াই ডু ইউ ল্যামেন্ট ?

ল্যামেন্ট! কই ল্যামেন্টের কী দেখলে ?

ইউ আর ক্রেস্টফলেন, ইউ আর কিপিং মাম, ইউ লুক স্যাড। ইউ আর ল্যামেন্টিং সাইলেণ্টলি।

তুমি একটি বিজ্ঞ মেয়ে।

হি হি করে হাসল অনু। তারপর ফের গভীর হয়ে বলল, আমার দিদিটা বড্ড সেকলে। একদম ব্যাকডেটেড। এখনকার দিনে কেউ অত রোমান্টিক আর লাজুক আছে নাকি ?

এক-আধজন থাকলে দোষ কি ?

রোমান্টিক, লাজুক, পেটে খিদে মুখে লাজ এসব কি আজকাল চলে ? আমার যদি কাউকে ভাল লাগে আমি স্ট্রেট বলে দেবো, ডিয়ার ম্যান, আই লাইক ইউ।

হোমাস একটু হাসল।

অনু তার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে একটু চেয়ে বলল, আপনিও ওল্ড ফ্যাশনড আর রোমান্টিক, তাই না ?

কেন ? আমি আবার কী করলাম ?
 দিদিকে আপনি এত ভয় পান কেন ? মধ্যযুগীয় নায়কদের মতো বুক-টুক কাঁপে নাকি ?
 হোমস মুদ্রা একটু হাসল। বলল, তোমার দিদির সঙ্গে আমার এখনও কোনও সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। আই অ্যাম স্টিল এ
 ভেরি মাচ লোনার।
 মিথ্যুক।
 কেন, মিথ্যেটা কী বললাম ?
 তা হলে বোকা।
 গালমন্দ করছ কেন ?
 ইউ কান্ট কল এ স্পেড এ স্পেড।
 আমাকে নিয়ে কেন যে এত ভুল বোঝাবুঝি হয় কে জানে!
 অনু ক্র কুঁচকে বলল, ভুল বোঝাবুঝি! মাই গড! আর ইউ ট্রায়িং টু সে দ্যাট ইউ আর নট ইন লাভ উইথ দ্যাট রেচড
 সিস্টার অফ মাইন ভুমকি ?
 হোমস মুচকি হেসে বলল, তোমার ডান দিকে দেখ। এখান থেকে রাতে নদীর ওপর জ্যোৎস্না দেখলে তোমার মাথা
 খারাপ হয়ে যাবে।
 ওপেন আপ ম্যান! আরন্ট ইউ ইন লাভ ?
 হোমস একটা দর্শনশাস্ত্র ফেলে বলে, শোনো অনু, আমি নিজেকে ঠিক বুঝতে পারি না। শী ইজ এ গুড গার্ল। বাট...
 রাবিশ। ভীষণ বোকা আপনি।
 হোমস কাষ্ঠহাসি হেসে বলল, বোধ হয় কথাটা ঠিক।
 তবু স্বীকার করবেন না ? আচ্ছা গোয়ার লোক বাবা!
 স্বীকার করার কিছু নেই। ভুমকি তোমাকে কী বলেছে ?
 বলব কেন ? আফটার হোয়াট আই হ্যাভ হার্ড ফ্রম ইউ, আমি দিদিকে সাবধান করে দেবো। শী মে বি হ্যাচিং অ্যান
 আইডিয়া অফ লাভ অ্যাণ্ড ম্যারেজ। শী ইজ কমিটিং এ ব্লাভার।
 বলবে এ কথা ?
 বলাই উচিত।
 হোমস চুপ করে রইল। বাঁধের ওপর দিয়ে ধীর পায়ে তারা হাঁটছে। দুজনেই নিঃশব্দ, দুজনেই কিছু গম্ভীর।
 চারদিকের প্রকৃতি মিথোই নানা সৌন্দর্য প্রদর্শন করার চেষ্টা করছে তাদের। তারা দেখছে না কিছু।
 অনু ধমকমে মুখে হঠাৎ বলল, চলুন, ফিরি। আমার আর ভাল লাগছে না।
 বলেই আবার উট টার্ন হল অনু। উল্টোদিকে হাঁটতে লাগল। হোমস অপ্রতুত বোধ করল। মেয়েটা খুঁজালাচ্ছে তো!
 অনু, শোনো। রেগে যাচ্ছ কেন ?
 অনু মুখ ফিরিয়ে বলল, রাগব কেন ?
 শোনো শোনো। কথা আছে।
 অনু হাঁটার গতি কমিয়ে দিল, কিন্তু মুখের গম্ভীর বজায় রেখেই বলল, বলুন।
 তোমাকে আমি বোঝাতে পারছি না হয়তো।
 কী বোঝাবেন ?
 ট্রাই টু আভারস্ট্যান্ড। আমার মন এখনও স্থির নয়।
 ইউ হ্যাভ অলরেডি টোল্ড দ্যাট।
 কখন বললাম ?
 নট ইন সো মেনি ওয়ার্ডস, বাট ইউ হ্যাভ হিট্টেড ইট।
 তা হলে রেগে যাচ্ছ কেন ?
 আপনার ওপর রাগব কেন ? আমি ফিরে যাচ্ছি দিদিটার ওপর। ও কেন এত রোমাণ্টিক আর বোকা ? ও কেন যা নয়
 তাই মনে করে বসে আছে ?
 ভুমকি তোমাকে কী বলেছে অনু ?
 বারবার জিজ্ঞেস করবেন না, প্রিজ! আমাদের মধ্যে অনেক কথা হয়। সব কথা সবাইকে বলা যায় না।
 হোমস যেন একটা থাপ্পড় খেয়ে চুপ করে গেল। অনুর পাশাপাশি বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে তার ভিতরে ভিতরে
 একটা যন্ত্রণা আর গ্লানি ছিল। কী করবে সে ? কী করবে এখন ?
 তাদের দেখেই অপর্ণা বলে উঠল, এ কী! অনু, ফিরে এলি যে!
 ভাল লাগছে না মা। বিচ্ছিন্নি জায়গা। চলো, কলকাতায় ফিরে যাই।
 ও মা! এই তো এলাম! আজকের দিনটা থাকব না ?
 তোমরা থাকো, আমি একা ফিরে যাবো।
 হঠাৎ তোর হল কি ?
 হোমস ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছিল। মেয়েটা পরিস্থিতি খারাপ করে দিচ্ছে।
 অনু বলল, আমার কিছু হয়নি মা। জায়গাটা ভীষণ গুমি, ভীষণ নোংরা। আমি থাকব না।
 মণীষ চুপ করে মেয়ের দিকে চেয়ে বসেছিল। এবার বলল, তোর মেজাজ বিগড়েছে বুঝতে পারছি। আমার কাছে আয়।
 না বাবা। আমার কিছু ভাল লাগছে না। লীড মি অ্যালোন। বলে অনু নদীর দিকটায় চলে গেল। আড়ালে।

অপর্ণা হোমাস্বর দিকে চেয়ে বলল, আপনি কিছু মনে করবেন না যেন। ও একটু মুড়ি। হয়তো কিছুক্ষণ পর সব ঠিক হয়ে যাবে।

হোমাস্বর একটু কাঠহাসি হেসে বলল, ও কিছু নয়।

মেয়ের যা মুড দেখছি আজ হয়তো ফিরে যেতে হবে।

তা কেন? আমি একটু বাদে মাথা ঠাণ্ডা হলে ওকে বোঝাবো। আপনাদের জন্য সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে। আজ কেন ফিরবেন?

মণীশ বলল, আগেকার দিনে ছেলেমেয়েরা বাপ-মায়ের কথা শুনে চলত বা তাদের চলতে বাধ্য করা যেত। এখন বাপ-মাকেই ছেলেমেয়েরা চালায়। বুঝলেন? উই আর নাউ ইন এ হোপলেস টাইম। পেরেণ্টহুড বলে কিছু আর নেই। আপনি যদি কখনও বিয়ে করেন তা হলে প্রথম থেকেই সাবধান হবেন।

অনুকে ঘণ্টাখানেক বাদে ঘরের পিছনকার বাগানে গিয়ে একা পেয়ে গেল হোমাস্বর।

অনু, আই অ্যাম সরি।

অনু ঘাসের ওপর হাঁটু মুড়ে চুপ করে বসেছিল। মুখখানা গম্ভীর, চোখ দুরের দিকে। জবাব দিল না।

হোমাস্বর সাহস হাঙ্গিল না ওর পাশে গিয়ে বসতে। একটু পিছনে দূরত্ব রেখে বসে সে নরম গলায় বলল, ওঁরা তোমার ভয়ে আজই ফিরে যেতে চাইছেন। কেন যে আমাকে তুমি এত অপমান করছ!

অনু মুখ না ফিরিয়ে বলল, আমার দিদি খুব বোকা। তাই তাকে অপমান করাও খুব সোজা।

ঝুমকিকে আমি একটুও অপমান করিনি। তুমি জানো না বোকা মেয়ে, ঝুমকি আমাকে কিরকম হিপনোটাইজ করে ফেলেছে। কিন্তু আমি তো বিয়ে করব না কখনও সেই জন্য আমি ওর কাছ থেকে দূরে থাকতে চাই।

সেই কথাটা আমার দিদিরও জানা দরকার। দিদি হয়তো এতটা জানে না। আমি আজই গিয়ে দিদিকে বলব শী ইজ ইন পারসুট অফ এ ওয়াইল্ড শুজ।

হোমাস্বর হঠাৎ সামান্য রেগে গেল। চাপা গলায় বলল, তুমি কেন আমাদের মধ্যে আসছ বলো তো! আমাদের ব্যাপারটা আমাদেরই সেটল করতে দাও না কেন?

আমি আমার দিদিকে ভীষণ ভালবাসি। শী ইজ এ ভেরি সিম্পল টাইপ পার্স। ও হয়তো আপনার ফিলজফিটা বুঝতেই পারেনি। আই মাস্ট কশান হার।

হোমাস্বর আর কথা খুঁজে পেল না। চুপ করে রইল।

দুপুরে খাওয়ার পর একটু বেলা থাকতে থাকতেই ফিরে গেল ওরা। মণীশ যাওয়ার সময় গম্ভীর মুখে বিষণ্ণ গলায় বলল, ডোন্ট মাইন্ড। এর পর যদি কখনও আসি একা আসব। তখন থাকব। ইউ আর এ নাইস ম্যান।

ওরা চলে যাওয়ার পর এত ফাঁকা লাগল হোমাস্বর যে সে সহ্য করতে পারছিল না। বড্ড একা, বড্ড অসহায়। একটা তিক্ততায় ভরে আছে মনটা।

রাতটা কাটিয়ে পরদিন সকালেই সে ফিরল কলকাতায়। ধামাখালিতে রাখা থাকে তার গাড়ি। ঝড়ের গতিতে গাড়ি চালিয়ে সে দুপুরের আগেই পৌঁছে গেল চারুশীলার বাড়ি।

চারুদী, প্রবলেম।

কি হয়েছে তোর? এরকম দেখাচ্ছে কেন?

আমি একটা সমস্যা পড়েছি।

বোস। তোর তো সব সময়ে সমস্যা। কী হয়েছে ধীরে ধীরে বল।

হোমাস্বর বলল। ভাবল। তারপর বলল, মণীশবাবুর মেয়ে অনুকে তো চিনিস! মেয়েটা কেমন?

খুব ভাল মেয়ে। লেখাপড়ায় খুব ভাল। কেন?

মেয়েটা একটু পাঞ্জি, না?

না তো। কি সব বলছিস!

মেয়েটা নিশিপুরে গিয়ে এমন একটা সিন ক্রিয়েট করল যে, মণীশবাবু সস্ত্রীক চলে এলেন। দু'দিন থাকার কথা ছিল। থাকলেন না।

তাই বুঝি? দাঁড়া তো, আমি ঝুমকির সঙ্গে ফোনে একটু কথা বলি।

না। এখন থাক।

থাকবে কেন? অসভ্যতা কেন করেছে জানা দরকার।

তুই তো এখনও সবটা জানিস না, কী বলবি ঝুমকিকে?

কিছু বলব না, ডেকে পাঠাবো। ও এলে শুনবো।

তোকে কিছু বলতে হবে না। ঝুমকিকে বলিস আমাকে যেন সুবিধেমতো একটা ফোন করে। আমি বাড়িতে থাকব।

কিন্তু কি হয়েছে বলবি তো!

আজ নয়। আজ আমি টায়ার্ড। কাল-পরন্তু এসে বলব।

বাড়ি ফিরে হোমাস্বর কিছুক্ষণ ঘুমালো। রাতে তার একদম ঘুম হয়নি কাল। মাথা গরম, অপমানে গা রি-রি করছে।

ফোনটা এল রাত সাড়ে দশটায়। হোমাস্বর তখন বসে আকাশ-পাতাল ভাবছিল।

আমি ঝুমকি বলছি। আপনি ফোন করতে বলেছিলেন?

হ্যাঁ।

বলুন।

অনু আপনাকে কিছু বলেছে?

অনু! না তো!

কাল নিশিপুরে গিয়েছিল। রাগ করে ফিরে এসেছে। কিছুই বলেনি ?

না। তবে মা বলছিল ওর নাকি মুড অফ হয়ে গিয়েছিল।

হেমাঙ্গ একটু চুপ করে থেকে বলল, ঘটনাটা আপনাকে আর আমাকে নিয়ে।

আমাদের নিয়ে। কী ঘটনা একটু বলবেন ?

শী থিংকস্‌ দ্যাট উই আর ইন লাভ।

ঝুমকি কোনও জবাব দিল না।

শুনছেন ?

ঝুমকি ক্ষীণ গলায় বলল, শুনছি।

আপনি তো জানেন, আমি একটু একা টাইপের লোক। একা থাকতে ভালবাসি। জলে-জঙ্গলে ঘুরি। খেয়ালি। জানেন

তো!

জানি।

আমাকে মাঝে মাঝে ভুতে পায়। আমি যে কী করি তা বুঝতে পারছি না। অনু কাল আমাকে খুব অপমান করেছে। হয়তো করাই উচিত।

আমি অনুর হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। ওকে যা বলার আমি বলব।

প্রিজ, বলবেন না। অনুর নামে নালিশ করার জন্য ফোন করতে বলিনি। আর একটু গভীর কথা আছে।

কী কথা ?

গলা শুনে মনে হচ্ছে আপনারও মুড আজ ভাল নেই। কথাটা বলার জন্য একটু ভাল মুড দরকার।

ঝুমকি একটু হাসল। বলল, মুড ভালই আছে। বলুন।

বলব ? না কি আর একটু সময় নেবো ?

আপনার ইচ্ছে।

আমি আপনাকেই জিজ্ঞেস করতে চাই। কারণ আমার চেয়ে আপনিই হয়তো ভাল বুঝবেন।

কি জিজ্ঞেস করতে চান ?

অ্যাম আই ইন লাভ উইথ ইউ ?

ঝুমকি খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর প্রায় পিসপিস করে বলল, তার আমি কী জানি!

হেমাঙ্গ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমিও জানি না।

ঝুমকি চুপ করে রইল।

হেমাঙ্গ সামান্য বিষণ্ণ গলায় বলল, এই কথাটাই অনেকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম। ও ভুল বুঝল।

আপনি বারবার অনুর কথা বলছেন কেন ? ও ছেলেমানুষ, ওর কথা ধরবেন না।

হেমাঙ্গ স্বগতোক্তি মতো করে বলল, আমি যে কী ভীষণ সমস্যায় আছি তা বোঝাতে পারব না।

কিসের সমস্যা ?

আগে বলুন আপনি নিশিপুরে গেলেন না কেন ?

ঝুমকি একটু চুপ। তারপর খুব নিচু গলায় বলল, আপনি আমাকে অ্যাভয়েড করতে চান বলে যাইনি।

জানি। কিন্তু অ্যাভয়েড করতে চাইলেও পারছি না কেন ? আপনি যাননি বলে আমার খুব খারাপ লেগেছিল। দিনটাই মাতা হয়ে গেল যেন।

ঝুমকি চুপ।

আমি আপনাকে নিয়েই প্রবলেমে পড়েছি। রশ্মিকে নিয়ে আমার এই প্রবলেম ছিল না। আই নেভার মিস্‌ড হার। কিন্তু আপনাকে মিস করি কেন ?

ঝুমকি চুপ।

কিছু বলুন, প্রিজ!

ঝুমকি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কী বলব ?

তা হলে অন্য দিক দিয়ে বলুন, আমার সম্পর্কে আপনার মনোভাব কিরকম ?

ঝুমকি চুপ।

বলবেন না ?

ঝুমকি খুব ক্ষীণগলায় বলে, বলে কী লাভ ?

আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে।

আপনি ভাল থাকুন। ছাড়ছি।

না, প্রিজ!

ঝুমকি ফোন ছাড়ল না। ধরে রইল। ফোন ধরে রইল হেমাঙ্গও। কেউ আর কোনও কথা বলতে পারছিল না। কিন্তু টের পাচ্ছিল দুজনেই ফোন ধরে আছে।

পাঁচ মিনিট পর হেমাঙ্গ বলল, আমার কথা আসছে না।

ঝুমকি মৃদুতম স্বরে বলল, আমি কী করব ?

আপনি আমাকে একটু গাইড করতে পারেন তো, নাকি ?

ঝুমকি চুপ।

হেমাঙ্গ একটু ধৈর্য হারিয়ে বলল, আপনি কিচ্ছ পারেন না।

কী পারতে হবে তাই তো বলেননি।

আচ্ছা, কাল একবার দেখা হতে পারে?

কোথায়?

কোথাও।

পারে! কিন্তু কোথায় দেখা হবে না জানলে যাবো কি করে?

আপনি বিকেল তিনটের সময়ে আপনাদের বাড়ির কাছে ন' নম্বর বাস টার্মিনাসে থাকতে পারবেন?

পারব।

কিছু মনে করলেন না তো!

মনে করার মতো কিছু তো নয়।

আপনি কি সাদা রং পছন্দ করেন?

সাদা?

হ্যাঁ। সাদা খোলের শাড়ি?

ঝুমকি একটু হাসল, কেন?

এমনি।

আপনি পছন্দ করেন?

হ্যাঁ। সাদা রঙে মেয়েদের এত মানায়!

তাই বুঝি?

কিছু মনে করলেন না তো!

না।

বিরক্ত করলাম। ছাড়ছি।

ঝুমকি ক্ষীণ গলায় বলল, আচ্ছা।

ফোনটা রেখে দেওয়ার পর কৃতকর্মের অনুশোচনায় তার মন ভরে গেল। এ কী করল সে! ঝুমকিকে কাল সে কেন ডাকল? কী বলবে? অস্থির হেমাঙ্গ কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যেই পায়চারি করল। তারপর ধীর পায়ে উঠে এল ছাদে। চাঁদ নেই। এক বুড়ি তারা কলকাতার স্নান আকাশে ছড়িয়ে রয়েছে বিশৃঙ্খলভাবে।

॥ ১০৯ ॥

সকালেই হেমাঙ্গ হাজির হল বডন স্ট্রিটের বাড়িতে।

মা!

ছেলের দিকে তাকিয়ে মা একটু অবাক হয়ে বলে, এ কি, আজ অফিসে যাসনি?

না। আজ তোমার হাতের রান্না খেতে এলাম।

ও আবার কোন দিশি কথা! আমি আজকাল রাঁধি নাকি! রাঁধে তো ঠাকুর। কী খেতে চাস?

হেমাঙ্গ বুঝতে পারল না, কেন সে বিডন স্ট্রিটে এল। মায়ের হাতের রান্না? একেবারেই নয়। তার আজ খাওয়ার কোনও ইচ্ছেই হচ্ছে না। তবু কিছুক্ষণ মায়ের সঙ্গে আবোল-তাবোল কথা বলল সে। আবোল-তাবোলই। কারণ বেশির ভাগ সময়েই সে বুঝতে পারল না সে কী বলছে। দুপুরে খাওয়ার পরই সে বেরিয়ে পড়ল গাড়ি নিয়ে। আজ গাড়ি চালানো তার উচিত হচ্ছে না। সে সম্পূর্ণ অনামনকভাবে চালাচ্ছে। কিছু দেখছে না, কিছু শুনতে পাচ্ছে না। গাড়ি চালিয়ে নিচ্ছে তার রিস্ট্রেক্স।

গোলপার্কে কাছাকাছি যখন সে পৌছলো তখন দুটোও বাজেনি। সাদার্ন অ্যাভেনিউ ধরে অনেকটা গিয়ে সে ফিরে এল। আবার গেল। কিছুক্ষণ লেকের ভিতর দিয়ে চালাল। তারপর ঘুরে এল গোলপার্কে কাছে। মাত্র আড়াইটে। সময় এত ধীরে যায়? গাড়ি নিয়ে ফের ঘুরপাক খেল সে। অনেকক্ষণ। তবু তিনটের ঘরে কিছুতে পৌছচ্ছে না ঘড়ির কাঁটা। তাজব ব্যাপার!

ন' নম্বর বাস টার্মিনাসের কাছেই গাড়ি পার্ক করে বসে থাকে সে। ঝুমকি কোন রাস্তা দিয়ে আসবে তা সে জানে। পূর্ণ দাস রোডের দিকে পলকহীন চোখে চেয়ে থাকল সে।

ঘড়ির কাঁটা তিনটে পেরিয়ে গেল।

কেউই এল না। গাড়ি থেকে নেমে অনেকবার গোটা বাস টার্মিনাল চষে ফেলল সে।

সাড়ে তিনটে নাগাদ সে ফোন করল ঝুমকির বাড়িতে। কেউ ফোন ধরল না।

চারটের পর সে চারুশীলার বাড়িতে ঢুকল। কেমন মাতালের মতো লাগছে নিজেকে। এটা প্রত্যাখ্যান কি না তা সে বুঝতে পারছে না। তার অপমানিত বোধ করা উচিত কি না তাও না।

চারুশীলা বাড়িতে নেই। বাড়ির প্রকাণ্ড লিভিংরুমে একটা গভীর সোফায় ডুবে থেকে চোখ বুজে ঘটনাগুলিকে পরস্পরায় সাজাতে ব্যর্থ চেষ্টা করল কিছুক্ষণ। হল না। চোখ বুজে এল ক্লান্তিতে। কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়ল টেরও পেল না।

চারুশীলাই ডেকে তুলল তাকে, কি রে? শরীর খারাপ নাকি?

হাসবার একটা চেষ্টা করে হেমাঙ্গ বলল, কোথায় গিয়েছিলি? বসে আছি কতক্ষণ!

গিয়েছিলাম নার্সিংহোমে। এখনই আবার যেতে হবে।
 কেন? কার অসুখ?
 মণীশবাবুর। হার্ট অ্যাটাক।
 মণীশবাবুর! বলে হাঁ করে থাকে হেমাঙ্গ।
 তোর ওখান থেকে ফিরেই নাকি বুকে ব্যথার কথা বলছিলেন, আজ সকালে নার্সিংহোমে রিমুভ করতে বলে ডাকার।
 ঝুমকি ফোন করেছিল, গাড়ি নিয়ে গিয়ে পৌছে দিয়ে এলাম।
 হেমাঙ্গ বলল, ওঃ।
 আমি তো লালস্ব করতাই পারিনি। ভীষণ বিদে পাওয়ায় বাড়িতে এসেছি। এখনই যাবো। তুই যাবি?
 হেমাঙ্গ উঠে পড়ল। বলল, যাবো।
 মুখে চোখে জল-টল দে, ততক্ষণে আমি লাইট কিছু খেয়ে নিই।
 একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে হেমাঙ্গ। ঠিক বুঝতে পারছে না, এ সব অদ্ভুত ঘটনা অদ্ভুত সময়ে ঘটছে কেন। এ সব ঘটনা কি কোনও ইঙ্গিত?
 বিশাল নার্সিংহোমের রিসেপশনে শুকনো মুখে তিনজন বসে আছে। অপর্ণা, ঝুমকি আর অনু। হেমাঙ্গর বুকে চলকে উঠল কয়েক কোষ বাড়তি রক্ত। ঝুমকির পরনে কালো টেম্পল পাড়ের সাদা খোলের শাড়ি।
 তাদের দেখে তিনজনই উঠে দাঁড়াল। অপর্ণা একটু এগিয়ে এসে হেমাঙ্গর দিকে চেয়ে বলল, দেখুন তো কী কাণ্ড!
 কিভাবে হল?
 পরত তো আমরা ফিরে এলাম। সন্ধে থেকেই বলছিল, বুকে একটা পেইন হচ্ছে। খুব অ্যাকিউট নয়। কাল ছুটি ছিল, সারাদিন রেষ্ট নিল। আজ সকালে অসহ্য ব্যথা।
 ডাক্তার কী বলছে?
 আমাদের ভেঙে কিছু বলছে না। মুখটা গম্বীর।
 ডাক্তারটি কে?
 কে একজন ভট্টাচার্য। বড্ড কম বয়স। কেমন যেন ভরসা হয় না, অত বাচ্চা ডাক্তার কি পারবে? তবে অনেক নাকি ডিগ্রি।
 আগে কে দেখত?
 সে আর একজন। এখন বিদেশে আছেন।
 ওঃ। বলে চুপ করে রইল হেমাঙ্গ। ঝুমকি তার দিকে তাকাচ্ছে না। একটু তফাতে অনু আর চারুদির সঙ্গে কথা বলছে। বলুক হেমাঙ্গর বুকটা তৃপ্তিতে ভরা। ঝুমকি আজ সাদা খোলের শাড়ি পরেছে।
 হেমাঙ্গ আলগাভাবে প্রশ্ন করল, ইনটেনসিভ কেয়ারে নিয়ে গেছে নাকি?
 অপর্ণা বলল, আমরা তা জানি না। আমাদের তো ভেতরে যেতেই দেয়নি।
 জ্ঞান ছিল?
 ছিল। কী হবে বলুন তো! আমার ছেলে খড়পুর হোটেল। তাকে কি খবর দেওয়া দরকার?
 না, এখনই নয়। আমরা তো আছি। দেখা যাক। ভেমন দরকার হলে আমি আই আই টি-তে ফোন করে দেবো।
 ভাববেন না।
 রাশভারী বড় ডাক্তাররা কণ্ঠীর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বেশি মাথামাথি করে না। কিন্তু এ ডাক্তারটি তেমন রাশভারী নয়। ছিপছিপে, লম্বা, দারু। ফর্সা এবং অতিশয় সুদর্শন ডাক্তারটি খুব শ্রীট ভঙ্গিতে একটা কাচের দরজা ঠেলে লবিতে ঢুকে সোজা ঝুমকির সামনে চলে এল।
 ওয়েল; আপনারা এখন আর থেকে কী করবেন? আমি ওঁকে ভর্তি করে নিয়েছি।
 ঝুমকি তার দু'খানা অপরূপ চোখ তুলে ডাক্তারের চোখের দিকে চেয়ে বলল, বাবা কেমন আছে?
 ডাক্তার একটু হেসে বলল, এখনই বলতে পারছি না। তবে ই সি-জি-টা একটু গোলমালে।
 অবস্থা কি খুব খারাপ?
 কাল সকালে বলব। চিন্তা করবেন না। ম্যাসিভ অ্যাটাক নয়। ট্রিটমেন্ট শুরু হয়েছে।
 কথা বলতে বলতে দুজনে কাচের দরজাটার দিকে হেঁটে গেল পাশাপাশি। হেমাঙ্গর অন্তরাখা বলে উঠল, কী কথা তাহার সাথে? তার সাথে?
 অপর্ণা কিছু একটা বলছিল। হেমাঙ্গ বুঝতে পারছিল না।
 অপর্ণা ফের বলল, বড্ড বাচ্চা না ডাক্তারটি?
 হেমাঙ্গ বলল, হ্যাঁ। আমি বড় ডাক্তার আজই ডেকে আনব।
 না না, তার দরকার নেই এখনই। এও নাকি খুব বড় ডাক্তার।
 কাচের দরজার পাশে দুজন মুখোমুখি দাঁড়ানো। ডাক্তারটি মিটিমিটি হেসে কী যে বলছে! ঝুমকি অত উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে কেন?
 অপর্ণা ফের কী একটা বলল।
 হেমাঙ্গ খুব অবাক হয়ে বলল, অ্যাঁ।
 অপর্ণা ফের বলল।
 হেমাঙ্গ আর চেষ্টা করল না বুঝতে। সে আর বুঝতে পারবেও না।
 চারুশীলাও তাকে কিছু বলল।

হেমাঙ্গ ফ্যালফ্যাল করে তার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ।

ফের অপর্ণাও কিছু বলল।

হেমাঙ্গ হাল ছেড়ে দিয়ে সামনের সোফাটায় বসে পড়ল ধপ করে। রুমালে মুখ মুছতে লাগল। সে স্বাভাবিক নেই।
কেমন একটা জ্বালাপোড়া হচ্ছে বুকে।

অপর্ণা তার পাশেই এসে বসল। বলল, আপনি নিজেকে গিল্টি ভাবছেন না তো!

গিল্টি!

মানে আপনার ওখান থেকে ফিরেই তো হল! ওটা কিন্তু কারণ নয়। ওর তো একবার হয়ে গেছে। আপনাকে ভীষণ
আপসেট দেখাচ্ছে।

নিজের রাশ শক্ত হাতে ধরার একটা চেষ্টা করে হেমাঙ্গ। বলল, ইটস এ স্যাড কেস। অতটা জার্নি করা বোধহয়
উচিত হয়নি।

জার্নি তো এমন কিছু নয়। শুধু দুবার একটু চড়াই ভাঙতে হয়েছিল ঘাটে উঠতে গিয়ে।

হয়তো সেটাই কারণ।

তাতেই বা আপনার দায়িত্ব কি বলুন!

হেমাঙ্গ চুপ করে রইল। ডাক্তারটি এত কথা বলছে কেন ঝুমকির সঙ্গে? এত কথা কিসের?

নিচুই ব্যাচেলর, না? বলেই হেমাঙ্গ তাকিয়ে দেখল তিনজন মহিলা তার দিকে বিস্ময়ভরা চোখে চেয়ে আছে। এত
লজ্জা পেল সে যে উঠে একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসতে হল।

ফিরে এসে দেখল, ঝুমকি সোফায় মাথা নিচু করে মায়ের পাশে বসা।

অস্থির হেমাঙ্গ আবার বেরিয়ে এল। ফের ঢুকল। তারপর হঠাৎ বলল, ঝুমকি!

ঝুমকি তার দুখানা চোখ সমেত বিষণ্ণ মুখখানা তুলল। নীরব।

একটু এদিকে আসবেন? কথা আছে।

ঝুমকি ধীরে উঠল। এগিয়ে এল।

বলুন।

বাইরে।

অস্থির পায়ে বাইরে এসে ঝুমকির মুখোমুখি দাঁড়ায় হেমাঙ্গ।

সরি। ভেরি সরি।

ঝুমকি যে অনেক কঁদেছে তা তার মুখ দেখলেই বোঝা যায়। দুখানা টানা চোখ এখনও টলটল করছে। মৃদু স্বরে
বলল, কী যে হয়ে গেল হঠাৎ!

আমার খুব খারাপ লাগছে।

জানি। আপনি নিজেকে রেসপনসিবল ভাবছেন।

আমি তো খানিকটা রেসপনসিবলই।

না। তা কেন?

হেমাঙ্গ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ডাক্তার কী বলল?

ঝুমকি মাথা নেড়ে বলল, তেমন কিছু নয়।

অনেক কথা হচ্ছিল আপনার সঙ্গে।

হ্যাঁ। উনি অনেকগুলো কেস হিন্দুর কথা বলছিলেন।

কেস হিন্দি?

হ্যাঁ। এই সব ক্ষেত্রে কি কি হতে পারে? বলছিলেন ই সি জি রিপোর্ট তেমন খারাপ কিছু নয়। তবে জোর করে কিছু
বলা যাচ্ছে না।

ওঃ! আচ্ছা, আপনাদের বোধহয় আজ খাওয়া হয়নি!

খাওয়া! না, সে সব আমাদের মনেই নেই। চারুমাসি একবার বলেছিল। কিন্তু আমাদের কি এখন খাওয়ার সময়?

হেমাঙ্গ বলল, কিন্তু উইক হয়ে পড়বেন যে!

বাবার একটু ভাল খবর না পেলে খাবো কি করে? গলা দিয়ে নামবেই না।

তাই কি হয়? এরকম করতে নেই। আমি ওদের বুঝিয়ে বলছি।

গমনোদ্যত হেমাঙ্গর পথ আটকাল ঝুমকি, প্রিজ! কেউ কিছু খেতে পারবে না এখন। ডাক্তার এখনই আসবে খবর
দিতে। আমাদের অপেক্ষা করতে বলে গেছে।

খবর! বলে হেমাঙ্গ ঝুমকির দিকে চেয়ে চোখ নামিয়ে নিল।

আবার লবিতে এসে বসল তারা। চারজন মহিলা একসঙ্গে। একটু তফাতে হেমাঙ্গ। সে চুপ করে চোখ বুজে বসা।
মাথার পিছনে জড়ো করা দুটো হাত। মন অস্থির। মাথা পাগল পাগল।

পাশে কেউ এসে বসল। একটা পারফিউমের গন্ধ।

হেমাঙ্গদা!

হেমাঙ্গ চোখ খুলল। অনু।

আপনার কী হয়েছে? এত আপসেট কেন?

ও কিছু নয়।

ভীষণ আপসেট। আমাদের চেয়েও বেশি।

হেমাঙ্গ একটু হাসল।

আই অ্যাম ভেরি সরি। মাই অ্যাপোলজি।

কেন বলো তো!

পরশু আমি আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি।

হেমাঙ্গ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ভালই করেছিলে। তোমার বাবার হার্ট অ্যাটাকটা নিশিপুরে হলে কী বিপদ হত বলো তো!

ওখানে ডাক্তার নেই, না?

না। ওখানে কিছু নেই। কিছু নেই। ডাক্তার না, নার্সিংহোম না, অ্যাম্বুলেন্স না, গাড়ি না।

তা হলে কারও অসুখ করলে কী করে লোকেরা?

ডটডটডটে চাপিয়ে শহরে আনে। যদি না আনা যায় তা হলে ভগবানকে ডাকে।

ইস।

তোমার বাবা লাকি। তুমি রাগ করে চলে এসে ভালই করেছে।

আপনি সেই জন্য আপসেট?

না।

তা হলে?

হেমাঙ্গ একটু হাসল।

দিদিকে বাইরে নিয়ে গিয়ে কী বললেন?

বললাম তোমাদের কিছু খাওয়া উচিত।

মাত্র এই কথা?

হেমাঙ্গ হাসল, আর কী বলব?

অনু চুপ করে রইল।

কী ভাবছে অনু?

আপনার ভীষণ ইগো।

তাই বুঝি?

অথচ আপনি ভীষণ ভালও তো!

ভাল?

হ্যাঁ, ভাল।

কে সানে কী!

আমি জানি আপনি ভীষণ ভাল। যদিও ইউ আর নট মাই টাইপ অফ এ ম্যান। তবু আপনি আপনার মতো করে ভীষণ ভাল।

তোমার ফেভারিট টাইপ কেমন?

স্মার্ট, প্র্যাক্টিক্যাল, ড্যাশিং। ওই যে, ডাক্তার ভট্টাচার্য আসছে।

সুদর্শন ডাক্তারটি এসেই ঝুমকিকে ডেকে নিয়ে গেল। হেমাঙ্গর অন্তরাখা বলে উঠল, যেও নাকো আই যুবকের সাথে...

কাচের দরজাটা ঠেলে ওরা ভিতরে চলে গেল। বনিক দূর দেখা গেল ওদের। তারপর চোখের আড়ালে।

হেমাঙ্গ হতাশায় কেমন স্থবির হয়ে যাচ্ছে এখন। তার মনে হচ্ছে সে একটা ভুল করছে। এখনই তার যা করা উচিত তা সে করছে না। বয়ে যাচ্ছে একটা জরুরি সময়। এর পর দেরি হয়ে যাবে।

অনু বলল, আজ আপনি সত্যিই খুব রেস্টলেস। তাই না?

হেমাঙ্গ স্তিমিত গলায় বলল, মানুষ তো ঘটনাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

কিন্তু কী হয়েছে?

কথাটির জবাব দেওয়ার আগেই ঝুমকিকে দেখা গেল, ফিরে আসছে।

বাবাকে দেখে এলাম মা!

অপর্ণা চমকে উঠে বলল, কী দেখলি?

ব্যথাটা কমেছে একটু।

কথা বলল?

ডাক্তার বলতে দিল না। বাবা আমার হাতটা একটু ধরল।

কিছু বলল না?

একটু হাসল।

এখন আমরা কী করব?

ডাক্তারবাবু বলল, ভয় নেই। আপনারা বাড়ি চলে যান। অনেকগুলো টেস্ট করা হচ্ছে। কাল-পরশুর মধ্যেই অবস্থাটা বোঝা যাবে। হয়তো সিরিয়াস কিছু নয়।

বলল?

হ্যাঁ তো।

ঠিক শুনেছিস?

হ্যাঁ মা। চलो আমরা বাড়ি যাই।

ঝুমকিদের বাড়িতে নয়, চারুশীলা তাদের নিয়ে এল নিজের বাড়িতে। বলল, তোমাদের তো আজ রান্নাই হয়নি, বাড়ি গিয়ে রেখে খেতে হবে। আমার বাড়িতে সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করা আছে, চলে।

বিপর্যস্ত, দৃষ্টিভ্রান্ত একটি পরিবার জেড়া হল চারুশীলার বাড়িতে। আজ কারও মন ভাল নেই। হেমাঙ্গ চূপ করে ওদের পাশাপাশি বসে রইল সোফায়। একজোড়া চোখ তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। তার চোখও ছুঁয়ে আসছে ওকে। মাঝে মাঝে আটকে যাচ্ছে চোখে চোখ। হেমাঙ্গর ভিতরে একটা জ্বালা : ওই ডাক্তারকে সে ভুলতে পারছে না।

তিন দিন বাদে ছাড়া পেল মণীশ। জানা গেছে তার হার্টে কিছু হয়নি, পেটে গ্যাস জমে চাপ ধরেছিল বুক। আপাতত ভয় নেই।

॥ ১১০ ॥

বাংলাদেশে যাওয়ার আগে বিষ্ণুপদ বলে দিয়েছিল, পূর্বপুরুষের ভিটেটা একটু দেখে আসিস বাবা। আমার তো আর যাওয়া হবে না। তুই দেখে এলেই আমারও এক রকম দেখাই হবে।

ঢাকায় নেমে নানা কনফারেন্সে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল কৃষ্ণজীবন। তারপর একদিন বাংলাদেশেরই একটি অমায়িক ছেলে আনোয়ার তাকে একখানা টয়োটা গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে গেল তার গায়ে। যেতে যেতে বলল, কিছু চিনতে পারবেন না। সব পাল্টে গেছে।

কৃষ্ণজীবন হেসে বলল, চিনব কি? আমার তো কিছু মনেই নেই।

দু'বার ফেরী পেরিয়ে বেশ একটু ধকলের পর যখন গায়ে পৌঁছালো কৃষ্ণজীবন তখন দুপুর। সেই খাড়া শারদীয় রোদে সে দেখল, কিছু আহামরি গ্রাম নয়। একটু ছন্নছাড়া। ক্ষেতে ফসল আছে। গাছপালা বিশেষ রকমের সতেজ।

আনোয়ার দু-চারজনকে জিজ্ঞেস করে একটা বাড়ি খুঁজে বের করল। বলল, দাদা, এইটাই আপনাদের বাড়ি ছিল।

কৃষ্ণজীবন নির্বিকার চোখে চারখানা টিনের ঘর আর একটা কোঠাবাড়ি আর উঠান সমেত বাড়িটা নিরীক্ষণ করল। এই তাদের বাড়ি। এ বাড়ির স্মৃতিমেদুর মায়ায় বিষ্টপুরে এক বৃদ্ধ ন্যূজ হয়ে বসে থাকে আজও। কৃষ্ণজীবন পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। সামনে আনোয়ার।

খবর পেয়ে বাড়ির মালিক বেরিয়ে এল। মধাবয়স্ক একজন রোগা মানুষ।

আসেন, আসেন। বলে নিয়ে গেল ভিতরে। কোঠাবাড়ির বারান্দায় চেয়ার পেতে দিল। বলল।

দেখতে আসছেন? দেখেন, ভাল কর দেখেন।

কৃষ্ণজীবন একটু হেসে বলল, এ বাড়ি কি হাতবদল হয়েছে, নাকি আপনরাই প্রথম থেকে আছেন?

বিশ্বাসবাবুদের কাছ থেকে আমার আকাঙ্ক্ষা কিনেছিলেন। তারপর থেকে আমরাই আছি। এই কোঠাবাড়িটা ছিল না, আর ওই পশ্চিমের ঘরটা নতুন করে করা হয়েছে।

একটা পুকুর ছিল বলে শুনেছি। আছে?

আছে। এই কোঠাবাড়ির পিছনে।

একটা করমটা গাছ ছিল।

আছে।

এরা সম্পূর্ণ গৃহস্থ নয়। আবার একেবারে হা-ভাত জো-ভাতও নয়। এদের যা অবস্থা তার চেয়ে ভাল অবস্থা কি তাদের ছিল? মনে হয় না।

লোকটার নাম রজব আলি। মুখে হাসি লেগেই আছে। বলল, আজ এইখানেই দাওয়াত হোক। নিজের বাড়ি দেখতে এলেন, ছাড়ছি না।

কৃষ্ণজীবন মাথা নেড়ে বলল, উপায় নেই সাহেব। আমাকে এখনই ফিরতে হবে।

আনোয়ারও ঘড়ি দেখে বলল, আর পনেরো মিনিটের মধ্যে রওনা না হলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখা যাবে না।

পনেরো মিনিটের মধ্যেই বাড়িটা ঘুরে দেখল কৃষ্ণজীবন। গায়ের বাড়ি যেমন হয় তেমন। কোনও আলাদা বৈশিষ্ট্য নেই। এ বাড়িতে তাদের চার পুরুষের বাস ছিল। কিন্তু সেই ইতিহাস তো খুঁজে পাওয়া যাবে না কোথাও। শুধু স্মৃতি, শুধু মায়া নিয়ে অপেক্ষা করে থাকে তার বাবা। দেশ বলতেই ভিজে যায় মন।

রজব আলিকে আনোয়ার বোঝাচ্ছিল, ইনি একজন মস্ত মানুষ। চারদিকে নাম। দেশ-বিদেশের পণ্ডিতেরা চেনেন।

মোটামোটা কেতাব লেখেন।

রজব আলি এ সব শুনে যেন বিগলিত হয়ে যায়। নিজের ছেলেরা সবাই ক্ষেতখামারে কাজ করছে। তাদের ডেকে দেখাতে পারল না বলে দুঃখ করে বলল, আবার আসেন একবার। সারাদিন থাকবেন।

ফেরার সময় কৃষ্ণজীবন উঠানের বাইরে একটা খুপসি আমগাছের নীচে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, এটা কি পুরনো গাছ?

জী। আপনার বাপ-দাদার আমলের বড়ো গাছ।

একটা ছোট পল্লব ভেঙে নেবো?

রজব আলি শশব্যস্তে বলল, নিশ্চয়ই। দাঁড়ান আমি পেড়ে দিই।

আমিই নিষি।

একটা পাতাসমেত ছোট ডাল গাছ থেকে ভেঙে নিল সে। এটার চেয়ে মহার্য উপহার বাবার জন্য আর ভাবতে পারে না সে।

দু'দিন বাদে ঢাকা থেকে কলকাতায় ফিরল সে। তারও দু'দিন বাদে বিষ্টপুর।

বিষুপদ হাঁ করে অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে সব শুনল। তার যেন বিশ্বাস হচ্ছে না যে, গ্রামটা এখনও আছে, বাড়িটা আছে। বারবার তাকে স্পর্শ করল হাত বাড়িয়ে। বলল, সব দেখলি, অ্যা! সব দেখলি ?

হ্যাঁ বাবা, সব।

বল, আরও বল, সব শনি।

বাবাকে কদাচিৎ এত উত্তেজিত দেখেছে কৃষ্ণজীবন। একটা মানুষের কত টান থাকে তার পূর্বপুরুষের ভিটের ওপর! অথচ সেখানে কীই বা ছিল আলাদা রকমের ? কাঁচা বাড়ি, পুকুর, গাছপালা। কিন্তু ওভাবে তো দেখে না মানুষ। তার স্মৃতি, তার মায়ী, তার পক্ষপাতই অন্য একটা মাত্রা যোগ করে দেয়। তখন আর সাধারণ একটা বাড়ি সাধারণ থাকে না। হয়ে যায় রূপকথার মতো আলৌকিক।

উঠানের বাইরের দিকে একটা আমগাছ ছিল বাবা, মনে আছে ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। মধুকুলকুলি আম। আছে সেটা ?

আছে। তার একটা পল্লব এনেছি আপনার জন্য।

সম্রাধে পল্লবটা হাতে নিয়ে মাথায় ঠেকায় বিষুপদ। কয়েকদিনে পল্লবটা একটু শুকিয়ে গেছে। বিষুপদ তবু অবাক চোখে পল্লবটার দিকে চেয়ে থাকে। যেন অবিশ্বাস্য কিছু দেখছে।

যারা আছে তারা কেমন লোক ?

গরিব সাধারণ লোক। আদর-যত্ন করতে চেয়েছিল। সময় ছিল না।

করমচা গাছটা ?

আছে।

ঘরগুলো বোধহয় ভেঙে আবার করেছে! না ?

বোধহয়। তবে পরিবর্তন খুব একটা হয়নি শুনলাম।

বিষুপদ হাঁ করে শুনছে। স্মৃতিতে নতুন করে ঢেউ লাগছে। মন চলছে উজানে। দুখানা স্বপ্নাতুর চোখ বিটপুর ছেড়ে কোথায় কোন গহীন অতীতের স্বাক্ষর ভেদ করার চেষ্টা করছে।

নয়নতারাও সব শুনল। কিন্তু অত ভাবাবেগ নিয়ে নয়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ভাল করেছি গিয়ে।

বাবাকে খুশি করতে পেরেছি, এইটেই যথেষ্ট।

নয়নতারা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, মানুষটা মুখে তেমন কিছু বলে না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে দেশের কথা খুব ভাবে। কেন ভাবে কে জানে বাবা! আমি তো অত ভাবি না। দেশে যে কোন সুখটা ছিল! সেখানেও অভাবের সংসার, এখানেও অভাবের সংসার।

কৃষ্ণজীবন মৃদু হেসে বলে, তোমার হল প্রায়কটিকাল চোখ। বাবার তো তা নয়। বাবা অন্য চোখ দিয়ে দেখে। দেশে থাকতেও কচু-মৌচুই খেয়েছে তবু বলে, ওঃ, দেশে যা খেয়েছিলাম সেরকম আর হয় না। ওটা একটা মায়ী।

হ্যাঁ বাবা, তোর বাবার মতো করে আমি দুনিয়াকে দেখি না কখনও।

কৃষ্ণজীবন সারাদিন ধরে বাবাকে ঘুরে ফিরে দেখল। বিষুপদ বড় নিঃশব্দ হয়ে আছে আজ! কথা নেই। স্মৃতির তাড়নায় আজ বিষুপদ অনেক তফাত হয়েছে।

নয়নতারা একবার বলল, বড় ভয় লাগছে বাবা। ও যে মুখে একদম কলুষ এঁটেছে।

কৃষ্ণজীবন বলল, আজ আর বাবাকে ঘাঁটিও না মা। আপনমনে থাকতে দাও। আজ বড় পিছুটান।

আত্মপল্লবটা সেই যে ধরে বসে আছে, একবারও ছাড়েনি।

পরদিন আত্মপল্লবটা ঠাকুরের সামনে রেখে বিষুপদ একসময়ে স্নান করল, ভাত খেল। খেতে বসে নয়নতারাকে বলল, কোঠাবাড়িতে থাকতে ইচ্ছে যায় না।

ও মা! কেন গো ?

জুত পাই না। টিনের ঘর, মাটির ভিত সেই যেন ভাল ছিল।

তোমাকে নিয়ে আর পারি না। কৃষ্ণ এত পয়সা খরচ করে রাজার বাড়ি বানিয়ে দিল, তোমার তবু সয় না কেন ?

আমার আর্থ নেই গো। আমি বড় মাটির মানুষ যে!

তা জানি। বাবুগিরি তোমার কোনও কালে ছিল না। মোটা কাপড়, মোটা ভাত, এ সবই পছন্দ। তা জীবনে আরও তো ননারকম আছে। একটু চেখে দেখতে হয়।

চেখেই তো বলছি, এ আমার পোষাচ্ছে না।

হরি বোলা মন। এখন কি আবার দালান ভেঙে পুরনো ঘর খাড়া করতে বলব নাকি কৃষ্ণকে ?

বিষুপদ একটু হাসল। বলল, খুব ফুট কাটতে শিখেছো দেখছি। না, ওটার দরকার নেই। বললাম আর কি। তোমাকে ছাড়া আর কাকেই বা বলি!

আমাকেই তো বলে আর সেই জন্যই তো তোমার জন্য আমার কষ্টটাও বেশি।

আচ্ছা বোলা তো, তোমার দেশে ফিরতে ইচ্ছে করে না ?

সত্যি কথা বলতে কি, ভূমি যেখানে থাকো সেটাই আমার দেশ। আমি আর অন্য দেশ নিয়ে ভাবি না। দেশ বলতে আমার হচ্ছে জন।

বিষুপদ একটু হাসল, শোনো কথা! জন বলতে কি শুধু মানুষ, শুধু আত্মীয় ? আর কিছু নয় ?

আর কি ?

গাছপালা, ঘরবাড়ি, মাটিটা পুকুরটা সবটাই তো জন।

তুমি বললে তাই।

আমাকে এসবও বলে দিতে হবে, তবে তুমি বুঝবে ?

আমার বাপু অত মাথায় খেলে না। তুমি বোঝালে বুঝি।

বিষ্ণুপদ ভাতের পরাস নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, বুঝলে তুমিই হয়তো বুঝবে। তোমার মন বড় পরিষ্কার। কী জানো, এই চার ধারে যা কিছু আছে সবই যেন মানুষ। গাছটা, মাটিটা, ঘরটা সবই যেন বড় আপনার জন। দেশের বাড়িতে তাদেরই তো রেখে এসেছি কিনা!

এখানে এসে যে আবার নতুন করে সবাইকে পেলে। গাছ, মাটি, ঘর।

তা পেলাম। তবু পুরনোরা বেশি টানে। বাপ-দাদার ভিটে। পূর্বপুরুষদের বাস ছিল। ওর রকমটাই আলাদা। এই যে কৃষ্ণ একখানা গাছের ডাল হাতে করে এসেছে, কী বলব তোমাকে, সেই ডালখানাও যেন আমার সঙ্গে কত কথা কইল।

ওরকম হয়। তা বলে অমন চুপ মেরে যাও কেন ? আমার যে ভয় করে।

ভয়! না, ভয়ের কি ? পুরনো সব কথা মনে পড়ছিল। সামান্য সামান্য সব ঘটনা, তুচ্ছ সব কথা। তাই যেন মনটা রসস্থ হয়ে গেল।

তোমার বড় মায়ী গো!

সেই জন্যেই তো দেহ ছাড়ে না।

বালাই যাট। ওসব বলতে আছে ?

কৃষ্ণকে দেশের বাড়ি দেখতে পাঠালাম। তা তার চোখ দিয়ে যেন আমারও দেখা। মনটা কিছু অস্থির হয়েছে তাই।

হ্যাঁ গো, তোমার যদি এতই মায়ী তবে ঘুরে এসো না একবার। আজকাল কত লোক তো যাচ্ছে।

না না, সে ব্যাপারই নয়।

কেন বল তো!

গিয়ে কত পরিবর্তন দেখতে পাবো। সে কি ভাল লাগবে ? মনটা খারাপ হয়ে যাবে। আমাদের কোঠাবাড়ি ছিল না, এখন হয়েছে। ঘরদোর, গা সবই পাল্টে গেছে কত। ভাল লাগবে না। মন খারাপ হবে।

তাহলে বসে বসে ভাববে শুধু ?

বিষ্ণুপদ একটু হাসল, ভাবতেই ভাল গো! ভাবনাও এক রকমের ওষুধ। মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে।

আমি যে কিছু ভাবি না, তাহলে আমার কী হবে ?

তুমিও ভাবো। তবে নিষ্কর্মার মতো নয়। তোমার আলাদা একটা রকম আছে, বাস্তববোধও আছে। আমার হল অলস-চিন্তা।

বিষ্ণুপদ কয়েকটা দিন ভেসে রইল মনের এরোপ্পানে। মাটিতে পা দিল না। খুব রসস্থ মন, খুব আনমনা।

একদিন সকালে বিষ্ণুপদ নয়নভারাকে ডেকে বলল, আমার কত বয়স হলো বলো তো! হিসেব আছে ?

তা কেন থাকবে না ?

হিসেব করে দেখ তো বেশ করে।

হঠাৎ আবার বয়সের দরকার পড়ল কেন ?

অনেককাল বয়সের কথা ভাবছি না। একটু হিসেব করা ভাল। কত হল ?

বোধহয় ছিয়াত্তর সাতাত্তর।

উহঁ, বড় নামিয়ে ফেলছো। একটু ওপরে ওঠো।

অত চুলচেরা হিসেব কি আমরা পারি ? দু-এক বছরের তফাত হতে পারে।

যতই কমাও, প্রকৃতির নিয়মে আমার বয়স আশি পেরিয়েছে।

ওম্মা গো! কী বলে রে ডাকাত! আশি! তোমার কি মাথা খারাপ নাকি ?

আশি তো ছার, আমার হিসেবে বিরিশি।

কিছুতেই নয়, তোমাকে কি ভীমরতিতে ধরল, হ্যাঁ গো ?

না। সে তোমাকেই ধরেছে।

তা আজ বয়স নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কেন বাপু ? জন্মদিন করবে নাকি ?

এক গাল হেসে বিষ্ণুপদ বলে, তা করলে হয়। সেবার—কবে যেন—আমার জন্য রেমো একটা কেক এনেছিল।

এসে বলল, বাবা, জন্মদিনে সাহেবরা কেক খায় শুনেছি। তাই আনলাম। শুনে হেসে বাঁচি না। জন্মদিন কবে তারই ঠিক নেই, উনি কেক এনে হাজির। তবে জিনিসটা ছিল বেশ ভাল। এখনও মুখে স্বাদটা লেগে আছে। তা লাগাও একটা জন্মদিন। তারিখটা যখন মনে নেই তখন যে কোনও দিন লাগালেই হয়।

নয়নভারাও হাসছিল। বলল, অত সোজা নয়। শাওড়ি ঠাকরুনের কাছ থেকে আমি ঝুঁচিয়ে ঝুঁচিয়ে বের করেছি।

তোমার জন্য কার্তিকে।

তাই বুঝি ? সেজন্যই এমন পাথরচাপা কপাল।

কেন, কার্তিকে জন্মানো বুঝি খারাপ ?

লোকে বলে, কার্তিকে রবি নীচস্থ থাকে। এ মাসের জাতকের উন্নতি করা খুব কষ্ট। তবে হলে ধীরে ধীরে হয়।

কপাল তোমার মোটেই খারাপ নয়। কষ্ট ছিল, কিন্তু আমাদের মতো বর-বউতে এমন ভাব খুঁজে বের করো তো!

পাবো আর এক জোড়া ?

তা ঠিক।

আজকাল বর-বউয়ের ঝগড়ায় বাড়িতে কাক-চিল বসতে পারে না। আমাদের কোনওদিন ঝগড়া হয়েছে বলো ?

বিষ্ণুপদ মিটিমিটি হেসে বলল, সে একখানা বিশ্বরেকর্ডই বটে। জীবনে একবারটিও ঝগড়া করলে না। করলেও পারতে। তাতে একটু ঝাল-নুনের কাজ হত জীবনটায়।

কেন, ঝগড়া করিনি বলে কি আলুনি লেগেছে তোমার ?

বিষ্ণুপদর হাসতে হাসতে চোখে জল এল। বলল, না গো ঠাট্টা করলাম। তুমি কি তেমন মেয়ে ? কত কষ্ট দিয়েছি ভাত-কাপড়ের, কত খাটিয়েছি সংসারে, একবারটি নালিশ করেনি।

কেন করব নালিশ ? যার কাছে নালিশ করব সে কিছু কম কষ্ট করেছে ? তোমার কষ্ট দেখে নিজের কষ্টের কথা ভুলেই যেতাম।

সেই জন্যই তো তুমি রমণীরত্ন।

ও আবার কী ? অত প্রশংসা করতে হয় না।

প্রশংসা করলে কী হয় ?

লোকে বলবে বউয়ের আঁচলধরা।

তাহলে চোঁচিয়েই বলতে হয় কথাটা। লোকে নিন্দে করুক, তাতে আমার আনন্দই হবে।

ওমা গো! কী মানুষ তুমি গো ?

বিষ্ণুপদ হাসতে হাসতে বলল, যাঃ, এক ধাক্কা আমার বয়সটা বোধহয় সত্যিই কমিয়ে দিলে!

বয়স আবার কিভাবে কমল ?

আনন্দে কমে, ফুটিতে কমে। তোমার কথায় আজ খুব আনন্দ হচ্ছে আমার। ওই ছিয়াত্তর সাতাত্তরই থাক।

অতও হয়তো নয়। আমাদের মোটা হিসেব। দু-চার বছর কমই হবে হয়তো। হ্যাঁ গো, কেক খেতে ইচ্ছে হয়েছে নাকি ?

আনাবে ?

তা আনাতে পারি। রোমোকে বলে দেবো'খন।

বিষ্ণুপদ ঘুরে ফিরে গিয়ে অশ্রুপল্লবটা দেখে। শুকিয়ে আসছে। তা হোক। ওটার গায়ে যেন পুব বাংলার আকাশ, বাতাস, মাটির রস, গন্ধ, গায়ের ধুলো সব লেগে আছে। অশ্রুপল্লবটা হাতে নিয়ে মাঝে মাঝে বসে থাকে বিষ্ণুপদ। নয়নতারাকে বলে, হ্যাঁ গো, এটা পুতলে কি গাছ হবে ?

তাই কখনও হয়! তুমি তো আমার চেয়ে চাষ-বাস কম বোঝো না।

তা বটে। কলমের গাছ করলে হত। বলে দিলে কৃষ্ণ সেই বাড়ি থেকে একটা গাছের চারাও আনতে পারত।

ওগো, অত পুরনো আমল আঁকড়ে থাকতে নেই।

জানি। মনটা বড় উচাটন।

বিষ্ণুপদ সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে এই আশ্চর্য নির্মাণ দেখে। ভাঙা ঘর লোপাট করে রাজপ্রাসাদ উঠল। দুনিয়াতে এরকমই সব হয় কাণ্ডকারখানা।

ও দাদু! বলে পটল হুড়মুড় করে সাইকেল নিয়ে এসে ঢুকল।

কি রে ?

চলো।

কোথায় যাবো ?

পুলিন দাদুর হয়ে গেল।

পুলিন! পুলিনের কী হল ?

আজ টিউবওয়েল পাম্প করছিল সকালবেলায়। সেইখানেই স্ট্রোক।

বলিস কি ?

বটতলা থেকে ডাক্তার এসে দেখে বলল, হয়ে গেছে।

দূর! কী যে বলিস! পুলিন বয়সে আমার ছোটো যে!

চলো দেখবে।

বিষ্ণুপদর হাতে পায়ে হঠাৎ একটা থরথরানি উঠল। ক্ষীণ গলায় সে ডাকল, নয়নতারা!

নয়নতারা পান-দোন্ডা খাচ্ছিল দোতলার বারান্দায়। ডাকটা শুনতে পেল না। কানে একটু কম শোনে ইদানীং ও।

পটল তার হেঁড়ে গলায় ডাক ছাড়ল, ও ঠাকুমা ?

নয়নতারা মুখ বাড়িয়ে বলল, কী রে ?

পুলিনদাদু মারা গেল সকালে। দাদুকে নিয়ে যাচ্ছি।

সর্বনাশ! বলিস কি ?

বিষ্ণুপদ অসহায় মুখ করে বলল, আমার শরীরটা কেমন করছে। এসো তো!

নয়নতারা পক্ষিণীর মতো নেমে এল নিচে। বলল, কী হয়েছে তোমার ?

একটু ধরো তো! ঘরে নিয়ে যাও।

পটল আর নয়নতারা বারান্দা অবধি আনতে পারল বিষ্ণুপদকে। বারান্দাতেই শুইয়ে দিতে হল। হাতে পায়ে কাঁপুনিটাই বড্ড বেশি।

ওরে, ডাক্তার ডেকে আন।

পটল গম্ভীর হয়ে বলল, ডাক্তারই তো পটল তুলেছে। বটতলা থেকে মিত্তিরকে ডেকে আনি ঠাকুমা ?

তাই যা দাদা। তাড়াতাড়ি যা।

পটল গেল।

কিন্তু বিষ্ণুপদ ততক্ষণে এগিয়ে পড়েছে অনেক। ধুলোপায়ে রাস্তা হাঁটছে। মাথার ওপর আলোভরা আকাশ, দু'ধারে ধানক্ষেত। খালধার। তারপর গায়ের পথ। হাতে অশ্রুপল্লবটা ধরা। যাক, বহুকাল বাদে দেশে ফেরা হচ্ছে তাহলে!

শোকের এমন প্রকাশ বহুকাল দেখিনি চয়ন। এরকমও হয় নাকি আজকাল মা-বাপ মারা গেলে? শোকের প্রকাশ কত কমে গেছে মানুষের! আত্মীয়তা জিনিসটাই হয়ে গেছে একটা ফিকে ধারণা মাত্র। মা-বাপ বুড়ো হলে সংসারের মন্ত বোঝা। তারা মরলে মানুষ আজকাল কাঁদেও না ভাল করে। কৃষ্ণজীবনের গভীর শোকাহত মুখটা তাকে গভীর আঘাত করল আজ। এ মুখখানা সে বোধ হয় আত্মত্যাগ ভুলতে পারবে না।

ঘটনাটা ঘটল তার সামনেই এক বিকলে। মোহিনীকে পড়াচ্ছিল চয়ন। কৃষ্ণজীবন ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে বাইরের ঘরে বসে জুতো ছাড়ছিলেন। ঠিক সেই সময়ে টেলিফোন বাজল। রিসিভার ধরলেন কৃষ্ণজীবন নিজেই। দু'বার বললেন, হ্যালো। তারপর বললেন, অ্যা! তার পরই কর্ডলেস টেলিফোনটা তাঁর স্থলিত হাত থেকে সশব্দে পড়ে গেল মেঝেয়।

কী হল? বলে উঠে দাঁড়াল মোহিনী। সঙ্গে সঙ্গে চয়নও।

পাশের ঘরে দৌড়ে গিয়েই মোহিনী চিৎকার করে উঠল, বাবা! ও বাবা! তোমার কী হয়েছে?

চয়ন একটু নার্ভাস পায়ে গিয়ে পর্দা সরিয়ে দরজায় দাঁড়াল। টেলিফোনের টেবিলটার পাশে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণজীবন। মুখখানা ছাইবর্ণ, চক্ষু স্থির এবং অস্বাভাবিক বিক্ষারিত, দুটো হাত মুঠো পাকাচ্ছে আর বুলে যাচ্ছে। মোহিনী দু'হাতে বাবাকে আঁকড়ে ধরে প্রাণপণে কাঁকানি দিতে লাগল, বাবা! বাবা গো! ও বাবা! তোমার কী হল বাবা?

কৃষ্ণজীবন ধীরে ধীরে তাঁর বিক্ষারিত চোখ বুজলেন এবং চোখ ভরা জল দরদর করে নেমে আসতে লাগল।

চয়ন ফোনটা কুড়িয়ে নিয়ে ক্র্যাডলে রাখল। তারও হাত-পা কাঁপছিল নার্ভাসনেমে। এমন কীই বা ঘটতে পারে যাতে উনি এত ভেঙে পড়লেন? মোহিনীর মা তাঁর দুই ছেলেকে নিয়ে কোথাও গেছেন। বোধ হয় যোগব্যায়ামের ক্লাবে। সেরকমই আবছা জানা আছে চয়নের। একে সামলানোর জন্য এখন একজন শক্তসমর্থ লোক দরকার। সে বা মোহিনী কেউই সেই সামর্থ্য রাখে না।

সামলে গেলেন অবশ্য কৃষ্ণজীবন নিজেই। দু'হাতে নিজের অরণ্যের মতো চুলের গোছা খামছে ধরে ছেলেমানুষের মতো প্রথম ফুঁপিয়ে, তারপর ডুকরে কেঁদে উঠলেন শক্তপোক্ত কৃষ্ণজীবন। এই কান্নাটার দরকার ছিল। কান্দতে কান্দতে পিছু ফিরে একটু টলেমলো পায়ে হেঁটে সোফায় বসে পড়লেন। তারপর শ্বাসরোধকারী একটা শব্দ করতে করতে ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলতে লাগলেন, না...না...না...না...

মোহিনী পাশে গিয়ে বসল। বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, কাঁদে না বাবা, কাঁদে না, কী হয়েছে বাবা?

কৃষ্ণজীবনের এই শোক চয়নের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। শক্তসমর্থ, বিখ্যাত, প্রতিষ্ঠিত এবং বয়স্ক কৃষ্ণজীবন এত ভেঙে পড়তে পারেন তার ধারণা ছিল না। চয়নের ভয় হচ্ছিল যোগব্যায়ামের ক্লাসে গিয়ে দোলনের কিছু হল নাকি? সে জানে কৃষ্ণজীবন দোলনকে প্রাণাধিক ভালবাসেন।

প্রায় মিনিট দশেক কৃষ্ণজীবন ওরকমই বেহেড রইলেন। শুধু মোহিনী বাবাকে ছাড়ল না। ধীরে ধীরে—যেন মায়ের মতো—বাবার মাথাটা নিজের কাঁধে টেনে নিল, অবিকল মায়ের মতোই হাত বুলিয়ে দিতে লাগল মাথায় আর গালে, কাঁদে না বাবা, অত কাঁদে না। কী হয়েছে বলবে তো!

কৃষ্ণজীবন মেয়েকে আঁকড়ে ধরলেন হঠাৎ মুখ তুলে বললেন, এ কি হতে পারে বল তো! হতে পারে? বাবা নেই! বাবা কোথায় যাবে আমাকে ছেড়ে? কোথায়?

এ প্রশ্নের জবাব মোহিনী কি দিতে পারে? উদ্ভাসিত কান্নায় ভেসে গেছে মানুষটির যত জ্ঞান, যত অভিজ্ঞতা, শোক ভাসিয়ে নিয়ে গেছে গাণ্ডীও ব্যক্তিভূত, কৃষ্ণজীবন যেন এখন অসহায় শিশু।

চয়নের মাও মারা গিয়েছিল। সে মৃত্যু যেন শোক বয়ে আনেনি, এনেছিল প্রার্থিত মুক্তি। মায়ের জরাজীর্ণ অস্তিত্বের বন্ধন যেন অষ্টপাশে বেঁধে রেখেছিল চয়নকে। মা মরে যাওয়ায় কি শোক হয়নি তার? হয়তো তাও হয়েছিল। তবে নানা অনিশ্চয়তায় দিশাহারা, এপিলেপসির প্রকোপ, দাদার মুখাপেক্ষিতা সব মিলিয়ে এমন জট পাকিয়ে গিয়েছিল যে, শোকটাকে চিনতেই পারল না সে। এমন কি তার দাদা অয়নকেও কাঁদতে দেখেনি সে। গাণ্ডীর পোষ্টার মুখে সেটে দাঁড়িয়েছিল শুধু।

কৃষ্ণজীবনের প্রতি বড় শ্রদ্ধা হল চয়নের। এ তো ভালবাসার সময় নয়। জাত-কাপড়ের চেয়েও মানুষের অনেক বেশি অভাব এখন এই মহার্ঘ ভালবাসার। ওই এক জায়গায় মানুষ এখন দেউলিয়া। এখন মানুষের ভালবাসার লগ্নি বড্ড ছোট। বউ আর বাচ্চাকে নিয়ে ছোট ফ্রেমে ভালবাসাকে বাঁধিয়ে নিয়েছে সে।

মোহিনী মুখ তুলে চয়নের দিকে চেয়ে বলল, চয়নদা, মাকে একটু খবর দেবেন? ওই লালরঙা ফোন-বইতে হৃদয়রঞ্জন দাসের নম্বর।

কর্ডলেস টেলিফোনটা পড়ে গিয়েছিল। এখনও ঠিক আছে কি? চয়ন ফোন তুলে কানে দিয়ে দেখল, ডায়ালটোন আছে। নম্বটা বের করে নার্ভাস আঙুলে ডায়াল করল সে। মোহিনীর মাকে সহজেই পাওয়া গেল। বললেন, কী হয়েছে চয়ন?

আপনার স্বশ্রমশাই মারা গেছেন।

ওঃ! আচ্ছা আসছি। উনি কী করছেন?

উনি খুব ভেঙে পড়েছেন।

ভেঙে পড়েছে?

ভীষণ। সামলানো যাচ্ছে না।

অত ভেঙে পড়ল কেন? স্বশ্রমশাইয়ের বয়স হয়েছিল তো।

আপনি আসুন।

মোহিনী তার বাবাকে দুটি কিশোরী-হাতে ঘিরে রেখেছে। তাড়িয়ে দিতে চাইছে যতক শোকতাপ। পারছে না। কৃষ্ণজীবনের হেঁচকি উঠছে। তার মধ্যেই হাহাকার হয়ে বুক থেকে শ্বাসবায়ু বেরিয়ে আসছে, বাবা!

এইভাবেই আরও আধ ঘণ্টা কাটবার পর রিয়া এলেন। মুখে চোখে থমথমে ভাব। কান্না নেই।

কৃষ্ণজীবনকে তেমনি ধরে আছে মোহিনী। তবে কৃষ্ণজীবন এখন সোফার পিছনে মাথাটা সম্পূর্ণ এলিয়ে চোখ বুজে আছে। চোখ অবিরাম বর্ষণ করছে অশ্রুধারা:। কঁপে কঁপে উঠছে বুক। কত কালের জমা দীর্ঘশ্বাসসমূহ উপযুপরি বেরিয়ে আসছে বুক থেকে।

রিয়া দৃশ্যটা দেখল একটু থমকে দাঁড়িয়ে। তার পর হঠাৎ চয়নের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, এখন আসরা কী করব বলা তো!

চয়ন বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে বলল, আপনাদের একবার ওখানে যাওয়া দরকার। এখনই।

এখনই! কিন্তু এখনই কি করে?

কৃষ্ণজীবন দুটি অসহ্য রাঙা চোখ মেলে তাকায়। তারপর কান্নাজেজা গলায় বলে, তোমাদের যাওয়া দরকার নেই।

রিয়া কি সামান্য স্বস্তি বোধ করল? বলল, তুমি কি যাবে?

কৃষ্ণজীবন হঠাৎ যেন সচকিত হয়ে সোজা হলেন। তারপর দু'হাতে ফের মুখ ঢেকে ফেললেন। অদ্ভুত চ'পা একটা আতর্জন করে উঠলেন, মুখাণ্ণি বোঝো? মুখাণ্ণি? আমি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র, শ্রদ্ধাধিকারী। বোঝো এসব? আমি না গেলে হবে এসব? হবে? বাবা বারান্দায় শুয়ে আছে আমার জন্য। প্রাণ নেই, তবু অপেক্ষা করছে। জানো এসব? মানো?

রিয়া কাছে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায়। কোমল কণ্ঠে বলে, ওরকম করো না গো! অত ভেঙে পড়তে নেই। আমি কি তোমাকে একা ছাড়ব ভেঙেছে? আমরা সবাই যাবো। ওরা একটু তৈরি হয়ে নিক?

কৃষ্ণজীবন কিছুই বললেন না, আর একটা কান্নার ঘূর্ণি ঝড় যেন অন্ততল থেকে উঠে এল তাঁর। ভেসে যাচ্ছিলেন।

এইটুকু দেখে বিদায় নিল চয়ন। তার আর কিছু করার নেই। শোকসন্তাপে চেনা কৃষ্ণজীবনের ভিতর থেকে যে আর একজন কৃষ্ণজীবন বেরিয়ে এলেন তাঁকে এককাল চিনত না চয়ন। এ এক আশ্চর্য কৃষ্ণজীবন। ইনি গাছপালা, পশুপাখি ভালবাসেন এটা সে জানত। কিন্তু সেই ভালবাসার এই গভীর উন্মোচন আজ বড় লজ্জিত করে চয়নকে। এত ভালবাসা মানুষটার! এত! বৃদ্ধ গ্রাম্য সরল এক বাবার জন্য এই বিশ্বখ্যাত মানুষটার এত ভালবাসা, এত হাহাকার? কৃষ্ণজীবনের মতো মানুষকে দেখলেও বোধ হয় বহু জন্মের পাপ কাটে।

তুমি চালিও না, তুমি চালিও না, অ্যাকসিডেন্ট করবে। আমি ড্রাইভার ডাকছি। চারুকীলাদের একজন চকিৎস ঘণ্টার ড্রাইভার আছে।

দাঁতে দাঁত চেপে কৃষ্ণজীবন বলল, না, আমি পারব। আমাকে পারতেই হবে।

পিছনে তিন বিশ্বযাচিট ছেলেমেয়ে, সামনে রিয়া, কৃষ্ণজীবন গাড়ি ছাড়ল। তার চোখ আজ উষ্ণ প্রস্রবণের মতো ভেসে যাচ্ছে জলে। দীর্ঘশ্বাসে পাজর ভেঙে যাচ্ছে যেন।

এই তো সেদিন আত্মপল্লবটা বাংলাদেশ থেকে এনে দিয়েছিল সে। মুখে কী অপার্থিব হাসি ফুটেছিল বাবার! কী হল তোমার বাবা? হঠাৎ কী হল? এইভাবে যেতে হয় বুঝি?

কিছুই কি দেখতে পাচ্ছে না সে? সব যেন আবছা। চোখের জলে পথের আলো নানা বিব্রম ঘটাত্তে। কৃষ্ণজীবন তীব্র হর্ন দিয়ে দিয়ে চালাচ্ছে গাড়ি। বাইপাস ধরে উত্তর দিকে মুখ ঘুরিয়ে সে জোরে ছেড়ে দিল গাড়ি।

অত জোরে নয়, ওগো সাবধান!

কিছু হবে না। আমাকে কনসেন্ট্রট করতে দাও। কথা বোলা না।

রিয়া কথা বলল না আর। মাঝে মাঝে কুমালে চোখ মুছে নেয় কৃষ্ণজীবন। গাড়ি চালাতে থাকে।

এরা কেউ জানে না, তাদের সম্পর্ক রচিত হয়েছিল অভাবে খিদেয়, অনেক সর্বনাশকে ঠেকিয়ে। বাবা তাকে পড়া, চাষ করতে শেখাত। বাবা তাকে শিখিয়েছিল পৃথিবীকে ভালবাসতে। পিতা ধর্ম, পিতা স্বর্ণ, পিতাই পরমং তপঃ...

উড়ে গেল ভি আই পি, উড়ে গেল যশোর রোড। তার পর গায়ে যাওয়ার ভাঙা রাস্তা। গাড়ি লাফায়, টাল খায়, যায়।

পিছনে ঘুমিয়ে পড়েছে দোলন, আর দুজন চিত্রার্পিত বসে আছে। তারা জানে না কিভাবে শোক করতে হয়। তারা দানুকে ভাল করে চেনেই না।

গ্রামবাসী অনেক জড়ো হয়েছে উঠোনে। রামজীবন দাদাকে দেখে দৌড়ে এসে কাটা কলাগাছের মতো পড়ে গেল পায়ের ওপর, দাদা রে!

নয়নতারার চোখে আর জল নেই। সারা দিন ভুল বকে, কেঁদে হাফিয়ে এই এখন বিষ্ণুপদর খাট আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে নিরুন্ম হয়ে। তাকে কেউ সরতে পারেনি। মাঝে মাঝে বলে উঠছে, কালঘড়ি দেখেছিল না! কালঘড়ি! তখনই জানতাম। তখনই জানতাম ফাঁকি দেবে।

বাবার শিয়রে এসে দাঁড়াল কৃষ্ণজীবন। অপলক চেয়ে রইল মুখের দিকে। বাবার গালে তিন-চার দিনের দাড়ি। মুখ বড় প্রশান্ত। চোখভরা ঘুম। একজন শান্ত, নিরীহ, নিপাট মানুষ। এই পৃথিবীর কারও সঙ্গে তাঁর কোনোও বিবাদ ছিল না। ছিল না ঋণ, অভিযোগ, ক্ষোভ বা হিংসা। বাবার মুখের দিকে চেয়ে থাকে সেই গুণাবলীর উত্তরাধিকার আজ গ্রহণ করার চেষ্টা করছিল কৃষ্ণজীবন। এও জ্ঞান, এও বিদ্যা, এও দীনজনের মতো নতমস্তকে গ্রহণ করতে হয়।

কৃষ্ণজীবন তার বাবাকে প্রণাম করল।

হরিবোল, বিষ্ণুপদ কাঁধে উঠলেন। চললেন। রাত ভোর হওয়ার আগেই ছাই হয়ে গেলেন। পঞ্চভূতের শরীর নিয়ে নিল যে যার ভাগেরটা। যা রয়ে গেল তা স্মৃতি।

খালের নোংরা জলে স্নান করে যখন উঠে এল কৃষ্ণজীবন তখন তার বুক পাথরের মতো নিস্তব্ধ। যেন হৃৎপিণ্ডও থেমে গেছে। ব্রাহ্মমুহুর্তের বৈরাগ্যের রং চারদিকে। জীবন ও মৃত্যুর অর্থহীনতার মাঝখানে কী মহান এই পার্থিব জীবন! ক্ষণস্থায়ী, অচল কত বর্ণময়।

সকালের আলো ফুটল। শ্মশানযাত্রীরা ফিরে এল নিঃশব্দ পদসঙ্গরে। বিধ্বস্ত, বিহ্বল বাড়িটায় আজ সকালে জাগরণের কোনও কোলাহল শোনা গেল না। খুব নিশ্চয়।

কৃষ্ণজীবন যখন ধড়া পরে বারান্দার প্রান্তে একটি কুশাসনে নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল তখন কোমল কচি দুখানা হাত পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল তার গলা, বাবা!

বড় চমকে ওঠে কৃষ্ণজীবন। কে?

খুব কঁদেছে বাবা?

আয় দোলন।

দোলন পাশটিতে বসে বাবার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

কৃষ্ণজীবনের দু'চোখ দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ে জল।

কৃষ্ণজীবন আর কিছু বলে না। শুধু চেয়ে থাকে। এ বাড়িটা কাদের সে বুঝতে পারে না। এরা সারা তাও তার কাছে স্পষ্ট নয়।

বা পাশে কুয়োতলা, তারপর বাগান, সামনে উঠান। কৃষ্ণজীবন তার বাবার পরিধি দেখছিল। গত কয়েক বছর বাবা এই বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে বড় একটা যায়নি। যেখানে কৃষ্ণজীবন বসে আছে সেখানে ছিল একখানা দাওয়া। কৃষ্ণজীবন বারিষে মোজাইক করে দিয়েছে। দাওয়ার এই প্রান্তটিতে বসে থুম হয়ে চেয়ে থাকত। কী দেখত বাবা? কী দেখত? অভাবক্লিষ্ট জীবনের দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসে এই দাওয়ায় বসে আকাশ-পাতাল ভাবত। কলকিনারা পেত না, থৈ পেত না এই জীবনের, এই পৃথিবীর। কৃষ্ণজীবন বিদেশে গেছে সুনলেই বাবা পটলের ভূগোলের বই আর ম্যাপ খুলে বসত। এই মস্ত পৃথিবীর কোন সুদূর প্রান্তে গেছে তার ছেলে তা অনুধাবন করত। হয়তো-বা ছেলের চোখ দিয়েই দেখার চেষ্টা করত অনেনা বিদেশ। অজানা দেশ, অচিন দেশ কত কি দেখা হল না তার। বোঝা হল না এই জীবনের অর্থ।

বাবার সেই বিশ্বয়ের উত্তরাধিকার আজ কোলে নিয়ে বসে আছে কৃষ্ণজীবন। মাথার ওপর ওই যে মহাশূন্য, এই চারদিকে পরিব্যপ্ত বিশ্বজগৎ তার অর্থ কি কৃষ্ণজীবন জানে? এই যে মৃত্যু এসে নিয়ে গেল মানুষটাকে—এরই বা অর্থ কি? কোথায় যায়? নাকি... যায় না কোথাও?

দিনের আলোয় চেনা মুখগুলি ফুটে উঠল চারদিকে। শোকসন্তপ্ত একটা বাড়ির উঠানে, বারান্দায়, ঘরে সরস্বতী, বীণাপাণি, রামজীবন, বামাচরণ, নয়নতারা। বাচ্চা বউরা। বিষ্ণুপদ বিশ্বাস কি বেঁচে আছে এদের মধ্যে?

অম্পপল্লবটা মা যত্ন করে রেখে দিয়েছে বিছানার পাশে একটা ফুলদানিতে।

ওইটে ধরে বসে থাকত, বুঝলি? কেমন ধারা হয়ে গিয়েছিল।

জানি মা।

কী থেকে কী হয়ে গেল বাবা, বল তো! শেষ দিনটায় বয়সের হিসেব নিচ্ছিল। কেন নিচ্ছিল কে জানে!

মা'য়ের দিকে চেয়ে বিহ্বল হয়ে যায় কৃষ্ণজীবন। তার মা আর বাবা বিয়ের পর থেকে বোধ হয় একটি দিনও পরস্পরকে ছেড়ে থাকেনি। নিবিড় গভীর ছিল দুটি মানুষের সম্পর্ক। দুজনে মিলে নিঃশব্দে টানত সংসারের জোয়াল। কখনও মা আর বাবার ঝগড়া বা মতান্তর হয়নি। মা যে কী ভীষণ একা হয়ে গেল তা শুধু গভীরভাবে টের পায় কৃষ্ণজীবন। এই একাকিত্ব কি মা সহ্য করতে পারবে? মা হয়তো পারবে। সংসারের সঙ্গে জড়িয়ে-মড়িয়ে, নানিপুতি ছেলে-বউ নিয়ে হয়তো বা পারবে। কিন্তু বাবার বদলে মা যদি যেত তাহলে বাবা পারত না। আরও বোঝা হয়ে যেত, অসহায় হয়ে যেত। পুরুষরা তো সংসার নিয়ে জড়িয়ে-মড়িয়ে থাকতে পারে না।

কৃষ্ণজীবনের গভীর শোকাহত চেহারা দেখে দোলন আর নয়নতারা ছাড়া কেউই বড় একটা কাছে ঘেঁষছে না।

নয়নতারা শুয়েই আছে ওপরের ঘরে। মাঝে মাঝে নানা কথা ভুরভুরি কাটছে। তারপর দীর্ঘ বিরতি, চোখ বোজা। সেই চোখের কোলে জমে যাচ্ছে পুকুর।

বাড়ির আর সবাই সামলে উঠেছে। বাচ্চারা একটু খেলছে-টেলছে উঠানে, বাগানে, পাড়ার লোকেরা আসছে যাচ্ছে। জামতলায় গিয়ে বিড়ি টেনে এল বামাচরণ। সবই দেখতে পায় কৃষ্ণজীবন। কিছুই স্পর্শ করে না তাকে।

রিয়া একসময়ে এসে বলল, ছেলেমেয়েদের জ্বল কামাই হচ্ছে। দুটো-তিনটে দিন হলে ক্ষতি নেই। কিন্তু তার বেশি হলে মুশকিল। জানেই তো মোহিনীর ফাইনাল ইয়ার।

কৃষ্ণজীবন তার উদাস চোখ জোড়া রিয়ার চোখে স্থাপন করে বলে, যাবে? যাও তাহলে।

আজ শনিবার, না গেলেও চলবে। কিন্তু কাল গেলে ভাল হয়।

অক্ষুট গলায় কৃষ্ণজীবন বলে, যেও।

তারও কত গুরুতর কাজ পড়ে আছে কলকাতায়। কত মিটিং সেমিনারে নেমসন্তান অপেক্ষা করছে। কিন্তু কিছুই তার ভিতরে কোনও তাগিদ সৃষ্টি করছে না আর। সামনে এক শূন্যতা নিয়ে সে স্তব্ধ হয়ে গেছে বড়। বারবার বুঝতে চেষ্টা করছে উত্তরাধিকারের কথা। তার ভিতরে বাবা কতটুকু বেঁচে আছে?

কে একজন একটা কাটা ডাব হাতে নিয়ে সামনে এসে বলল, এটা খেয়ে নিন দাদা।

কৃষ্ণজীবন চেয়ে দেখল, নিমাই। ডাবটা হাতে নিয়ে সে বলল, কেমন আছ নিমাই?

ভালই।

নিমাই যে ভাল আছে তা তার পরিচ্ছন্ন ধূতি বা জামাতে নয়, প্রকাশ পাচ্ছে তার মুখোচোখে। উদ্ভাস্ত, তটস্থ, ভীতু সেই মুখখানায় অনেক আশ্বস্ত একটা ভাব। দেখে ভাল লাগে। নিমাই চুপ করে বসে রইল সামনে।

তুমি আর বীণা কি একসঙ্গে এলে নিমাই ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। গতকাল বীণা বনগাঁ থেকে কাঁচরাপাড়ায় গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে খবরটা দিল বিকেলবেলায়। তখনই চলে এলাম।

তোমরা এখনও একসঙ্গে থাকো না ?

আজ্ঞে না। সম্পর্কটা সেরকম নয়।

কৃষ্ণজীবন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কোনও সম্পর্কই আর বেঁধে রাখতে পারছে না মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে। এ বড় ভাগের সময় এল। বিষ্ণুপদ আর নয়নতারাদের আর পাওয়া যাবে না দুনিয়াতে। তারা হারিয়েই যাবে বুঝি।

একটু বেলায় শোরগোলটা উঠল। জামতলার দিকে তিনটে গলা উঠল সগুমে। বামাচরণ চোঁচাঙ্খিল, বিশ্বাস না হয় মাকে জিজ্ঞেস করে দেখ, দোতলাটা বাবা আমাকে দিয়ে গেছে কি না। দেখ জিজ্ঞেস করে। বাবা নিজের মুখে বলেছে আমি মরলে তুই দোতলাটা নিস।

বামার বউ গলা মিলিয়ে বলল, আমরা তো আর বলতে যাইনি। উনি নিজের মুখেই বলে গেছেন।

রামজীবন তেজের সঙ্গে বলল, দোতলা-ফোতলা ভুলে যাও। থাকতে হয় তো থাকতে পারো, কিন্তু দোতলা কেউ পারে না। মা থাকবে যেমন আছে। বাবার সব জিনিস সাজিয়ে রাখা হবে ওখানে।

বামাচরণ বলল, কেন ? এত বড় জায়গাটা ফাঁকা ফেলে রাখবি, এ কি গায়ের জোর নাকি ? দোতলা আমার পাওয়ার কথা।

কৃষ্ণজীবনের কানে আঙুল দিতে ইচ্ছে করছিল। এরা তার শোকভরনম্র দ্রব্য মনটাকে ছিন্তিভিন্ন করে দেবে। সে গভীর স্বরে ডাকল, পটল!

পটল দৌড়ে এল, বলো জ্যাঠা।

চল তো, ঘুরে আসি।

পটলের সঙ্গে হাটে-মাঠে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল কৃষ্ণজীবন। মনটা ছিছিকারে ভরা। তার বউ ছেলে-মেয়ে ওই কদর্য ঝগড়ার সাক্ষী থাকছে। বিষিয়ে যাচ্ছে তারা। দূষিত হয়ে যাচ্ছে চারপাশ।

যখন ক্রান্ত কৃষ্ণজীবন ফিরল তখন ঝগড়া থেমেছে। কিন্তু এ হল বাকুদের স্তূপের ওপর বসে থাকা। এই বাড়িঘর যতকৈ নির্মাণ এসব বাইরে থেকেই দেখতে ভাল। এর রক্তে রক্তে মিশে থাকে স্বার্থপরতা।

এ বাড়িটা তার বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে হল একবার।

সে ফিরে বারান্দার কোণে কুশাসনে চুপ করে বসে ছিল, এমন সময়ে রিয়া এসে সামনে দাঁড়াল, শুনছ ?

বলো।

খুব চাপা গলায় রিয়া বলল, এখানে কি থাকা যাবে ? ঝগড়া তো শুনলে!

শুনলাম।

কিরকম খারাপ খারাপ সব কথা বলছিল দু'জন। বাড়ি করে দিয়ে তুমি আরও বিপদ করছে।

কৃষ্ণজীবন চুপ করে থাকে।

চলো, চলে যাই। শ্রাদ্ধের সময় না হয় আসা যাবে। কী বলো ?

কৃষ্ণজীবন আরও খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, তাই চলো! তোমরা তৈরি হয়ে নাও।

দুপুরের খাওয়াটা হোক। তারপর।

কৃষ্ণজীবন স্তিমিত গলায় বলল, আচ্ছা।

কলকাতার দিকে গাড়ি চালাতে চালাতে কৃষ্ণজীবন ভাবছিল, বিষ্ণুপুরে তার কি আর ফিরে আসা হবে ? ওই ভাগের বাড়ি, তলায় তলায় আক্রোশ, রোজ ঝগড়া—এ সবেক মধ্যে হারিয়ে যাবে তার ধ্যান, তার প্রজ্ঞার অনুভূতি। না, বিষ্ণুপুর নয়। অন্য কোথা, অন্য কোনওখানে।

বর্ধমানের দিকে একটা খামারবাড়ি দেখে এসেছিল সে। লাগোয়া জমিই অনেকটা, চার বিঘের ওপর। প্রচুর গাছ আছে। বুড়ো মালিক বিক্রি করে দিতে চায়। এখনও কি আছে ? থাকলে কিনে নেবে সে। মাঝে মাঝে তার যে পালানো দরকার। সভ্যতা থেকে, আত্মীয়তা থেকে, সম্পর্ক থেকে।

বাড়ি এসে গুম হয়ে রইল কৃষ্ণজীবন। গুটিয়ে গেল নিজের মধ্যে। আর এই গুম হওয়া ভাবটা অব্যাহত রইল বিষ্ণুপদর শ্রদ্ধ অবধি। ন্যাড়া মাথায় ফিরে এল কলকাতায়।

তারপর একদিন অনুর ফোন, কতকাল দেখা হয় না বলুন তো! এখন কী নিয়ে ব্যস্ত আপনি বলিঙ হেডের কাজ তো শেষ ?

আমার বাবা চলে গেলেন।

সে তো জানি। স্যাড। আমার বাবারও খুব শরীর খারাপ হয়েছিল একদিন, জানেন! আমাদের এত ভয় হয়েছিল!

উনি এখন ভাল আছেন ?

হ্যাঁ। কিন্তু কবে দেখা হবে বলুন তো! আবার তো ফুরুৎ করে চলে যাবেন বিদেশে, না ?

কৃষ্ণজীবন হাসে, হয়তো যাবে।

কবে ?

সামনের মাসে। বেলজিয়াম।

উঃ, পারেনও বটে আপনি ঘুরতে।

তুমি বেড়াতে ভালবাসো, না ?

খুব বাসি।

আমি বেড়াতে যাই না, আমি যাই পৃথিবীটাকে বুঝতে। কত চেষ্টা করি, কিছুতেই আজও বুঝতে পারি না এ পৃথিবীটা কিরকম, এর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কী ?

আপনি আমাকে বুঝিয়ে দেবেন।

নিজে আগে বুঝি তবে তো!

শুনুন, একটা খবর আছে।

কি খবর ?

হোমস্ অ্যান্ড দিডি। বলে হি হি করে হাসে অনু।

॥ ১১২ ॥

এরকমও হয় ? এইভাবেই দান উল্টে যায় পৃথিবীর ? একতাল কাদার মতো একটা মানুষ ছিল তার হাতে। বশংবদ, জোরে কথা কইতে জানত না, সর্বদা বিগলিত হয়ে থাকত। একটা জায়গায় শুধু শক্ত ছিল। ধর্মভয়। কিন্তু তবু তাকে ইচ্ছেমতো চালিয়েছে বীণা। ছিল অনুদাস।

এখন সেই ছোট মানুষটা যে পাহাড় হয়ে দাঁড়াল। উঁচু, কঠিন, গায়ে আঁচড় বসানো যায় না।

শ্রাকের পর দিন একসঙ্গে ফিরছিল তারা। বাসে পাশাপাশি বসে। ঘটনাটা এমনি ঘটেনি। বীণা ঘটিয়েছিল। কেন ঘটল ? তার বড় ইচ্ছে হয়েছিল জানবার, নিমাইয়ের পরিবর্তন কতটা হল বা সত্যিই হল কিনা। তাই রওনা হওয়ার আগে সে গিয়ে বলল, তুমি যাচ্ছ ? আমিও তো যাবো, একসঙ্গে গেলে হয় না ?

নিমাই উদাস গলায় বলল, যাবে ? তা কথা কি ?

বাসে পাশাপাশি খানিকক্ষণ নীরবে বসে থাকার পর বীণা বলল, তোমার খুব মন খারাপ, না ?

নিমাই জানালার বাইরে চেয়ে দিল। একবার মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখে নিয়ে বলল, বড় উঁচু মানুষ ছিলেন। লোকে এ সব মানুষকে ঠিক বুঝতে পারে না।

বাবা তোমাকে খুব ভালবাসত। খুব ভরসা ছিল তোমার ওপর।

হঁ।

বীণা আর এক ধাপ এগিয়ে বলল, বাবা যে তোমার ওপর ভরসা করত তুমিও তার দাম দিয়েছ। তাই না ?

নিমাই একটু চুপ করে থেকে বলল, টাকাপয়সা কামাই করার কথা যদি বলো তা হলে বলতে হয়, সে রকম ভরসা উনি করেননি। ভরসাটা ছিল সত্যতার ওপর, ধর্মভয়ের ওপর। তার দাম দিয়ে থাকলে সেটাই কাজের কাজ হয়েছে। কত চোর ডাকাত পাঞ্জিরাও তো পয়সা কামাই করে।

বীণা হঠাৎ বলল, তুমি কি সং থেকেই বড়লোক হয়েছো বলো ?

নিমাই মৃদু হেসে বলে, একে বড়লোক বলে না। বড়লোকে রকম আলাদা। আসল বড়লোক তুমি দেখিনি। আমার একখানা হোটেল। ভগবানের দয়ায় চলে বলে রক্ষা। আর ধাবাটা কিন্তু আমার নয়। নিরঞ্জনবাবুর। উনিই টাকা ঢেলেছেন, আমার কিছু অংশ আছে। আমাকে বলে ওয়ার্কিং পার্টনার।

আর রিক্সা অটোরিক্সা ?

দুটা রিক্সা আর একখানা অটোরিক্সা আমার আছে। তাও কেন জানো ? মালপত্র আনা-নেওয়ার জন্য। বাকি সময়টা সওয়ারি টানে। আমার কোনও চুরিচুরির পয়সা নেই বীণা। তোমার বাবার বিশ্বাস বৃথা যায়নি এখনও। তবে আয়ু এখনও পড়ে আছে। যদি কখনও পা পিছলে যায় তখন এসে দুয়ো দিও।

তোমাকে দুয়ো দিলেই বুঝি আমার সুখ ?

তা নয়। জানতে চাইছিলে তাই বললাম।

বীণা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, জেনে খুশিই হচ্ছি। আমার মতো তুমি নও। আমি তো পাণীতাপী মানুষ। চোরও।

কে জানে কেন নিমাই এ কথাটার প্রতিবাদ করল না। বাইরের দিকে চেয়ে রইল নীরবে।

খানিক বাদে বীণা বলল, টাকাটা তো তুমি কাকাকে ফেরত দিয়েই দিলে, তাতেও কি আমার পাপ কাটে না ?

ফেরত তুমি দাওনি বীণা। তোমাকে বাঁচাতে সেই ডলার আর পাউন্ড আমি মেঝে বুঁড়ে বের করে ফেরত দিই।

কেন দিলে ? কাকার কি ওতে অধিকার ? কার টাকা কাকে ফেরত দিলে বলো তো! ওই ডলার আর পাউন্ড বেচে কাকা মস্ত দল করেছে জানো ? চিংপুরে ঘর ভাড়া করা হয়ে গেছে। পড়তি একজন ফিল্মস্টারকে অবধি নিয়েছে দলে। ওই টাকা তো চোরের ওপর বাটপাড়ি হল!

নিমাই ব্যথিত মুখে বলল, জানি। কিন্তু আমি কাজটা করেছি তোমাকে বাঁচাতে। কাউকে বিপদ থেকে রক্ষা করাটাই ধর্ম। কাকার দল তোমাকে মেরে ফেলত বীণা।

অত সোজা নয়। থানা পুলিশ আছে। তুমি কাজটা ঠিক করেনি। ওই টাকাতলো আজ আমার হাতে থাকলে আমিই একটা দল খুলে ফেলতে পারতাম। কাকার পরোয়া করতাম নাকি ?

থানা পুলিশ কাকে দেখাচ্ছি বীণা ? কাকা যদি তোমাকে মারতে চাইত তা হলে কি পারত না ? ও সব মানুষ দু-দশটা খুন অনায়াসে করতে পারে। পুলিশ কিছু করতে পারত না। তোমার অভিজ্ঞতা নেই বলে বলছ। ও টাকা তোমার ভোগে লাগত না। মেঘোরে মারা পড়তে শুধু। তবে কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ, পগার টাকা কাকার পাওনা হয় না। সে তোমারও হয় না। শুনেছি সেটা লাল সিং-এর টাকা। কিন্তু ওয়ারিশান খুঁজে বের করে তার হাতে টাকা তুলে দেওয়ার দায় তো আমার নয়। তোমার। আমি শুধু তোমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছি।

এটাকে কিরকম বাঁচা বলে বলো তো! আমি কি বেঁচে আছি নাকি ? এর চেয়ে মরলে জ্বালা জুড়োত।

তুমি কিভাবে বাঁচবে, কিভাবে বাঁচতে চাও তা তোমাকেই ঠিক করে নিতে হবে। এখন জীবনটা তোমার একার। মরলে জ্বালা থাকে না ঠিকই, কিন্তু মরা তো আছেই। জীবন না চাইলে মরণকে আর ডেকে আনতে হবে না।

অত কাঠ-কাঠ কথা বলছ কেন ? আমি তো আমার মতো করেই নিজের পথ করে নিচ্ছিলাম। তুমি এসে বাগড়া দিলে। মেঝে ঝুঁড়ে কোথায় টাকা আছে দেখিয়ে দিলে। দাওনি ?

শোনো বীণা, টাকা যে ওখানেই আছে তা আমার জানার কথা নয়। ও টাকার হদিশ আমি পেয়েছিলাম হঠাৎ করে। তুমি বলোওনি। টাকাটা তোমার হেফাজত থেকে কোথায় গেল তা কাকা ভেবে পাচ্ছিল না। তারপর তার নজর পড়ল আমার দিকে। ভাবল, ও টাকা তুমি আমাকেই দিয়েছ ব্যবসা করতে। ওপরে লোক-দেখানো ছাড়-ছাড়ির অভিনয় করতে করতে আসল কাজ হাসিল করছি। আমার বদনাম হচ্ছে।

বীণা একটু অবাক হয়ে বলে, এত কথা আমি জানতাম না তো!

জানার কথাও নয়। তুমি কাকার চোখে ধুলো দিতে ঘরে একটা ডুয়ে গর্ত ঝুঁড়ে রেখে বাপের বাড়ি পাליয়ে গিয়েছিলে। ওটা বড্ড ছেলমানুষী হয়েছিল। ওভাবে কি পার পেতে ? একদিন বনগায়ে ফিরতেই হত। তখন কী হত বীণা ?

আম্মা, তুমি কি আমাকে ঘেন্না করো ?

হঠাৎ এ কথা কেন ?

জিজ্ঞেস করছি। আমি তো চোর, পাপী, নটী। আমাকে কি আজকাল তোমার ঘেন্না হয় ?

কমলের লোম বাছতে গেলে তো কমলই কাবার, ঘেন্না করাটা আমার আসে না। সে তুমি ভালই জানো।

জানতাম। কিন্তু আজকাল সন্দেহ হচ্ছে।

ঘেন্না করলে তোমার ভাত খেতাম নাকি ? তোমার রোজগারে প্রতিপালন হয়েছি মা-বাপ সমেত। ঘেন্না করলে পারতুম ?

তখন করতে না। এখন করো। আমি তো বলেইছি, আমার কাছে পাপপুণ্যের দাম নেই। বাঁচার জন্য আমাদের মতো মানুষকে সব করতে হয়। ভগবান বলে যদি কেউ থাকে তবে তিনি সেটা বুঝবেন। তিনিই জানেন মানুষ কেন কোন কাজ করে।

একটু হেসে নিমাই বলে, ভগবানের ওপর তোমার এত বিশ্বাস থাকলে কবে; যা খুশি। ওটাও একটা দর্শন হতে পারে। আমি অত জানি না, বুঝি না। আমার একটা বিশ্বাস আছে মাত্র, সেইটে নিয়ে চলি। সেটা ভুলও হতে পারে।

বীণা চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। প্রসঙ্গটা পাল্টানো দরকার। কোন কথা থেকে কোথায় গড়ালি না, সে নিমাইয়ের সঙ্গে তর্ক বা বগড়া করতে তো চায় না।

কিছুক্ষণ ভেবে হঠাৎ বীণা বলল, আমার আর বনগায়ে পড়ে থাকার মানে হয় না।

নিমাই ধীর গলায় বলে, তবে পড়ে আছ কেন ?

কোথায় যাবো বলো তো! কোন চুলোয় ? থেকে থেকে ওখানেই একটা অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু ভাবি একা একা ওখানে পড়ে থেকে কী হচ্ছে আমার!

বিষ্ণুপুরে যাবে ?

বিষ্ণুপুর! সেখানে তো অবস্থা দেখে এলে! ভাইয়ে ভাইয়ে বাড়ির দখল নিয়ে কুরুক্ষেত্র হচ্ছে। দাদা আমাকে বলে গেল, তারা বুড়ো বয়সে বিষ্ণুপুরে এসে থাকার সাধ ছিল। এদের কাণ্ড দেখে সে ইচ্ছে চলে গেছে। কত বড় বাড়ি, দুখানা দালান, জায়গাও কত, ভরু দোতলা একতলা নিয়ে মাথা কুটে মরছে দুজনে। মেজদা চিরকালই স্বার্থপর, বউটা তো আরও। ওখানে কে থাকতে যাবে বাবা ?

তা হলে কী চাও ?

বীণা ঝামরে উঠে বলল, কী চাই তা জানি না।

রাগ করছ কেন ? রাগের কথা বলিনি। তোমার ভালমন্দ দেখার দরকার হলে দেখব। আমার সাহায্য পাবে। আর যদি কারও সঙ্গে ঘর বাঁধো তখন তার ওপর দায়িত্ব বর্তাবে।

মেয়েরা কি নুনের পুঁটলি ? এর ওর কাঁধে ভর দেবো কেন ?

নিমাই গম্ভীর মুখে চুপ করে রইল। তারপর শান্ত গলায় বলল, কী করতে চাও বীণা ?

বীণা চুপ করে থাকে।

নিমাই ফের তার শান্ত গলায় বলে, ফের দল করতে চাও ? সজলবাবু তো আমাকে সেরকমই বলে রেখেছিল। তুমি টাকা দিতে বারণ করেছ, ভাল কথা। কিন্তু যদি মত পাল্টাও, যদি সজলবাবুর সঙ্গে জোট বেঁধে দল করতে চাও তো আমাকে বোলো। আমার অত টাকা নেই বটে, কিন্তু কিছু দিতে পারব।

আমি দল করতে চাই না।

তা হলে কী করবে ?

ভাবছি।

তা হলে ভাবো কিছুদিন। আমার সাহায্য দরকার হলে বোলো।

বীণা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বাবার শ্রাদ্ধে তুমি পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছ শুনলাম।

হঁ।

কেন দিলে ? ওদের তো দরকার ছিল না।

দরকারের কথা তো ভাবিনি।

কাজটা ঠিক করেনি। দাদা তো খরচের কোনও কার্য্য করেনি। দেদার খরচ করেছে। সেজদার অবস্থাও এখন ভাল। তুমি খামোখা কেন দিতে গেলে ? এই জন্যই তোমাকে লোকে আহমক ভাবে।

নিমাই মৃদু গলায় বলল, আহাম্মকই তো। জন্ম-আহাম্মক। তবে আমার বড় ইচ্ছে হয়েছিল ওই মানুষটার শেষ কাজে আমারও কিছু দেওয়া থাক। আহাম্মকি হয়ে থাকলে হোক, আমার মনটা তাতে ভালই লাগছে।

বীণা পাশ-চোখে নিমাইয়ের দিকে তাকাল। লোকটা কতটা আহাম্মক সে আজ বুঝতে পারছে না। সে আজ বুঝতে পারে না একজন আহাম্মক কি করে আজ এতটা হয়ে উঠতে পারল। বীণা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

শোনো, একটা কথা।

নিমাই ধীরে মুখ ফিরিয়ে বলল, বেলো।

আমার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দাও।

চাকরি আমি কোথায় পাবো?

তোমার তো অনেক চেনা।

তা আছে। তবে তারা কেউ চাকরি দেওয়ার মতো নয়।

তা হলে আমি কী নিয়ে বাঁচব?

কী নিয়ে বাঁচতে চাও? চাকরি তো বেঁচে থাকার কোনও কারণ নয়।

আমাকে তো কিছু একটা করতে হবে, নাকি?

সেটা তুমিই ভাল বুঝবে।

আমি এ রকম হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব নাকি?

নিমাই একটু হাসল। বলল, আচ্ছা, ভেবে দেখব। তেমন কাউকে পেলে বলেও রাখব চাকরির কথা।

তোমারও তো হিসেব রাখার জন্য লোকের দরকার হয়। হয় না?

হয়। তবে আমার লোক আছে। আর যাই হোক, তোমাকে নিজের কর্মচারী বানানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

কেন, আমি তোমার কর্মচারী হলে ক্ষতি কী? সম্পর্কটা নতুন রকমের হবে। মালিক-কর্মচারী।

বীণা হাসল, কিন্তু নিমাই হাসল না। বলল, সম্পর্কটার আর দরকার কি? তোমার যাতে গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্টটা না হয় তা আমি দেখব বীণা।

সম্পর্কটা তুমি চাও না?

নিমাই চুপ করে জানালার বাইরে চেয়ে রইল।

বীণা তেতো গলায় বলল, তুমি ভাবো যে সজলের সঙ্গে আমি...?

নিমাই আস্তে করে মুখ ফেরাল। বলল, আর হয় না বীণা। আর হয় না।

কিছু হওয়াতে বলিনি। একটা চাকরির কথা বলেছি।

আমার চাকরি কেন করবে?

আচ্ছা বাবা, তোমার নয়, আর কারও চাকরি তো হতে পারে!

না, তাও পারে না। তোমার ক্ষমতা ছিল অভিনয়ের, তা ছাড়া আর কোনও কাজে তো তোমার অভিজ্ঞতা নেই। চাকরির বাজার খুব খারাপ বীণা। সহজে হয় না।

আমি যে পাগল হয়ে যাচ্ছি।

নিমাই তার দিকে ধীরে ফিরে তাকাল। তারপর বলল, কেন পাগল হচ্ছ বীণা? তোমার কষ্ট কিসের?

সে তুমি বুঝবে না। কোনওদিন আমার কষ্ট বুঝেছ?

ব্যথিত গলায় নিমাই বলে, বুঝেছি। তোমার কষ্ট নিজের চোখে দেখেছি। না বুঝে উপায় ছিল না।

তা হলে আজ বুঝছ না কেন? আমি যে মনে মনে ভিখিরি হয়ে গেছি, সেটা বুঝতে পারছ?

না, তা পারছি না। তোমার যাত্রার দলের কাজটা নেই, এটাই কি বড় কথা?

সেটাই বড় কথা। সেটা যে কত বড় কথা তা তুমি বুঝবে না।

নিমাই দু'ধারে মাথা নেড়ে বলল, না, আমি তা বুঝব না বীণা। আমার বুঝবার মতো মন নেই। তবে একটা কথা বুঝি। তুমি অভ্যাসের দাস হয়ে যাচ্ছ। যাত্রার দলের যে জীবন তার রকম আলাদা। বড্ড বারমুখী করে দেয় মানুষকে। ও রকম কি ভাল বীণা?

উপদেশ দিতে শুরু করলে নাকি?

না, তা কেন? উপদেশ নয়। ভেবে দেখতে বলি। শান্ত হও, মাথা ঠাণ্ডা করো, তারপর ভাবো।

মাথা ঠাণ্ডা থাকছে না। মাথা ঠাণ্ডা রাখাই কঠিন।

এত বড় একটা শোক পেলে, সেটাও তো একটা ক্রিয়া করবে!

শোক! ওং, তুমি বাবার কথা বলছ?

হ্যাঁ।

বীণা যেন একটু দ্বিধায় পড়ে গেল। তারপর বলল, হঠাৎ বাবার কথা তুললে কেন? বাবার মরার সঙ্গে আমার অবস্থার সম্পর্ক কী?

বলছিলাম, এ সময়টায় অত উত্তেজিত হতে নেই। শোক মানুষকে শান্ত সমাহিত আত্মমুখী করে দেয়। দেয় না?

আমি অতসব জানি না। বাপের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক কী ছিল বেলো তো! আমার বাপু অত সেন্টিমেন্ট নেই।

তাই দেখছি।

বীণা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, শোনো, আমার সঙ্গে কিন্তু সজলের কোনও সম্পর্ক নেই। ও তোমাকে যা বলেছে বানিয়ে বলেছে।

নিমাই একটু অবাক হয়ে বলল, সবটা বানিয়ে?

বীণা একটু লজ্জা পেয়ে বলে, সে রকম ভাব নয় । ও হয়তো চেয়েছিল, আমি চাইনি ।
 সজলবাবু বেকার, আমি জানি । যদি বেকার না হতেন তা হলে কী করতে বীণা ?
 কী আবার করতাম! কিছুই করতাম না ।
 নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, মানুষটি জোক্তোর নয়, ঠকবাজ নয়, মানুষটি ভালই । তোমার দুর্দিনে তোমার পাশেই থেকেছেন । শুনলাম তোমার জন্য মারধর খেয়ে হাসপাতালেও যেতে হয়েছিল । মানুষটিকে অমন তাচ্ছিল্য করছ কেন ? ওটা ভাল নয় ।
 বীণা খতমত খেয়ে বলল, তাচ্ছিল্যও করছি না । তোমার ভুল ভেঙে দিচ্ছি । তুমি একটা কিছু ধরে নিয়েছ । সেটা যে সত্যি নয় তাই বলতে চাইছি ।
 চাকদহে বীণার নেমে যাওয়ার কথা । চাকদহ এসে গেল । বীণা হঠাৎ বলল, হ্যাঁ গো, আজ বনগাঁয়ে চলে না!
 নিমাই অবাক হয়ে বলে, বনগাঁয়ে ? কেন ?
 অনেকদিন বাদে চলে না আমার ঘরটায় । দুজনে গল্প করব । সেই পুরনো দিনের মতো ।
 নিমাই হাসল । মাথা নেড়ে বলল, পাগল! আমার কত কাজ পড়ে আছে ।
 এক দিনে আর কীই বা ক্ষতি হবে ? হলে হোক । একবারটি পুরনো দিনের মতো চলে না দুজনে একটু একসঙ্গে হই ।
 নিমাই মৃদু মৃদু হেসে বলল, এ রকম হয় না বীণা । এ রকম হতে নেই ।
 কেন নেই ?
 তোমার আর আমার পথ আলাদা হয়ে গেছে ।
 তুমি আমাকে একসময়ে কী ভীষণ ভালবাসতে! আজ তার কিছু অবশিষ্ট নেই!
 সবটাই আছে । আমার মতো মঙ্গলাকাক্কী তোমার কেউ নেই ।
 তা হলে ?
 তোমার ভাল চাই বলেই এই প্রস্তাবে রাজি হলাম না বীণা । সম্পর্ক কখনও এত তরল হওয়া ভাল নয় । এত অবিবেচকের মতো হওয়া উচিত নয় ।
 কেন ও কথা বলছ ?
 স্বামী আর স্ত্রী এ বড় কঠিন সম্পর্ক বীণা । অনেক পরীক্ষায় পাস করে তবে স্বামী-স্ত্রী । আমরা পাস করিনি যে!
 কী যে বলো, বুঝতেই পারি না ।
 আবার দেখা হবে বীণা । তখন বুঝিয়ে বলব । তবে আমি যেমন বুঝি । তোমার হয়তো ভাল লাগবে না ।
 বীণা বনগাঁয়ের বাস ধরতে নেমে পড়ল । নেমে পড়েই হঠাৎ তার মনে হল, বিশ্বজোড়া খা-খা করছে একটা একাকিডু । কী সাজাতিক একা সে!
 সন্দের পর কুসুম এল ।
 বীণাদি, কেমন হল বাবার কাজ ?
 অন্যমনস্ক বীণা বলে, ভালই ।
 নিমাইদার সঙ্গে দেখা হল ?
 হ্যাঁ, একসঙ্গে চাকদা পর্যন্ত এলাম ।
 সত্যি! ভাব হয়ে গেল বুঝি ?
 না রে ।
 বলো কি ?
 বীণা মাথা নাড়ল, তোর নিমাইদা আর সেই নিমাইদা নেই । পাণ্ডাই দিল না ।
 যাঃ ।
 বীণা চোখের জল চাপতে পারল না । একটু চুপ করে থেকে বলল, আজ সে শোধ নিচ্ছে ।
 নিমাইদা তেমন লোকই নয় ।
 সে খুব ভাল লোক কুসুম, আর আমি খুব খারাপ । এই তো! তোর দুনিয়াটা সহজ সাদা-কালোয় ভাগ করা । বেশ তাই-ই মানছি ।
 রাগ করলে নাকি ? কী হয়েছে বলো না!
 বীণা কিছু বলল না । চুপ করে রইল ।

॥ ১১৩ ॥

মণিশের শরীর খারাপ হয়েছিল এ খবরটা বুঝকাকে পাঠানো হয়েছিল খুব সতর্কতার সঙ্গে পুজোর ছুটির আগে । যাতে বুঝকায় পড়াশোনার ক্ষতি না হয় । চিঠি পেয়েই বুঝকা ট্রাংক কল করল এক সন্কেবেলায় । সেই সরল বালকের মতো গলা এখনও ।

বাবা কেমন আছে মা ? আমাকে আগে কেন জানাওনি ?

ওরে, তেমন কিছু নয় । এখন ভাল আছে ।

কেমন ভাল ? হান্ড্রেড পারসেন্ট ?

হ্যাঁ । অফিসে যাচ্ছে তো ।

তোমাকে বলে দিচ্ছি মা, বাবার শরীর খারাপ হলেই আমাকে খবর দেবে । আমার পড়ার ক্ষতির কথা ভেবো না । ওসব আমি মেকআপ করে নেবো ।

আমরা তো আছিই তোর বাবাকে ঘিরে! চিন্তা কিসের ?

বাবার জন্য আমার ভীষণ টেনশন হয়। আচ্ছা মা, বাবা কি পারমানেন্ট হার্ট পেশেন্ট হয়ে গেল ?

না, ডা কেন ? সাবধানে থাকলে সেরে যাবে। ডাক্তার বলেছে ভয়ের কিছু নেই।

বাবা কি বাড়ি ফিরেছে ?

না তো।

এত দেরি হয় কেন ফিরতে ?

একটু বাদেই ফিরবে, রোজ যেমন ফেরে।

আমি আর তিন-চার দিনের মধ্যেই আসছি। কিপ হিম ফিট অ্যান্ড ফ্রেশ।

আচ্ছা রে আচ্ছা।

আধ ঘন্টা বাদে মণীশ ফিরল। শ্বিতমুখে বুবার ফোন করার কথা ভনল। বলল, তোমার কী যে দুর্ব্বিধি অপু! কেন ওকে আমার অসুখের কথা জানাতে গেলে ? ওর কত পড়ার চাপ বনো তো! আমার তো এমন কিছু হয়নি যে জানাতে হবে!

অপর্ণা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, এমনিতে জানাতাম না। কিন্তু পুজোয় তোমার সবাইকে নিয়ে কুলু-মানালি যাওয়ার কথা না ? বুবা হয়তো আশা নিয়ে আসবে, হয়তো বন্ধুদের কাছে গল্পও করবে। যাওয়াটা যে হচ্ছে না তা জানিয়ে দিলাম।

মণীশ অবাক হয়ে বলল, যাওয়া হচ্ছে না কে বলল ? কেনই বা যাওয়া হবে না ? যাওয়া-আসার রিজার্ভেশন কবে হয়ে গেছে।

অপর্ণা গম্ভীর হয়ে বলে, যাওয়া যে হচ্ছে না তার একটা খুব সহজ সরল কারণ আছে।

কি কারণ অপু ?

আমি যেতে দিচ্ছি না।

মণীশ ব্যথিত মুখে বলে, কেন অপু ? আমার তো কিছু হয়নি। ভাল আছি। ছেলেটা আশা করে আসবে। ছেলেটার কত ঝাটুনি যাচ্ছে, ওর একটু রিলিফ হত।

ওর বয়স পড়ে আছে। সারা দুনিয়া চেষ্টে বেড়াতে পারবে। কিন্তু তোমাকে আমি এই শরীরে কিছুতেই ঘরের বার হতে দেবো না।

মণীশ একটু হেসে বলে, এভাবে বাস্তব পুরে রাখতে চাও ? সেটাই কি বেঁচে থাকা ?

বেঁচে থাকো তো আগে, বেড়ানো অনেক হয়েছে। বেঁচে থাকলে আরও হবে। নিশিপুরের ধকলেই কেমন বিগড়ে গিয়েছিলে বলো তো। এখন দৌড়ঝাপ একদম বন্ধ।

খুব হতাশ করে দিলে ভাই। টিকিটগুলো কাটা ছিল। এই পুজোর বাজারে কনফার্মড টিকিট। তিন মাস আগে কেটে রেখেছিলাম।

কালকেই টিকিট ফেরত দাও।

করুণ মুখ করে মণীশ বলে, আর একবার ভেবে দেখ। আমি না হয় গিয়ে হোটেলের ঘরেই বসে থাকব, তোমরা ঘুরে বেড়িও।

অপর্ণা একটু ধমকের গলায় বলে, আচ্ছা, কী আছে বলো তো ওসব জায়গায় ? পাহাড় পর্বত আর প্রকৃতি তো ? রাজ্যের লোক সেখানে গিয়ে জুটছে প্রত্যেক সিজনে। এমন কিছু রিমোট বা নতুন জায়গাও নয়। আমরা তো ঘুরে এসেছি একবার।

তখন বুবা ছোট ছিল। ওর মনে নেই।

বড় হলে আবার যাবে। যদি ওর ইচ্ছে হয়।

মণীশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কথটা তুমি বোধ হয় ঠিকই বলেছ। নির্জন, দুর্গম, অচেনা বলে আর কোনও জায়গাই থাকছে না। সর্বত্র পিলপিল করে লোক যাচ্ছে। এমন কি এভারেস্টে এত লোক উঠছে যে তাদের ফেলে আসা আবর্জনা আর কৌটো-বাউটোয় নাকি এভারেস্টই এখন আত্মকুঁড় বলে স্বয়ং এডমন্ড হিলারি দুঃখ করেছেন। তা হলে এবারটা বাদ দিতে বলছ ?

নিশ্চয়ই।

কাছেপিঠে কোথাও ?

হ্যাঁ, গাড়ি করে একদিন দুদিনের জন্য বেরোতে পারি। তাও কাছেপিঠে। দূরে কোথাও নয়।

মণীশ একটু হাসল। বলল, তথ্যস্তু। তুমি হলে সপ্ৰিম কোর্ট, তোমার ওপর তো কথা চলে না। কিন্তু তোমাকে বলি, এবারে কিন্তু আমার হাটের প্রবলেম ছিল না। ডাক্তার তো বলেইছে পেটে গ্যাস জমে ওপর দিকে প্রশার দিয়েছিল বলে ওরকম হয়েছিল।

হয়তো ভাই। হয়তো নিশিপুরে যাতায়াতের ধকলটা তোমার সহ্য হয়নি।

মণীশ মাথা নেড়ে বলে, না না, তা নয়। নিশিপুর এমন কিছু দুর্গম জায়গা তো নয়।

বিস্ত্রিবি জায়গা। খাড়া খাড়া পাড় বেয়ে নামা ওঠা, তার ওপর ভটবটির ডিজেলের গন্ধ, ভাঁটির সময় কাদা। মাগো! কি করে যে ওরকম জায়গা হোমাল্য বেছেছিল ও-ই জানে!

শুনলে বেচারার দুঃখ পাবে।

পাক। ওর ঘাড় থেকে নিশিপুরের ভূত নামানো দরকার।

মণীশ হাসল, সবাই কি তোমার চোখ দিয়ে দুনিয়াটা দেখে ? যার কাছে যা সুন্দর লাগে তা লাগতে দেওয়াই তো ভাল। কেন বেচারার নিশিপুর তুমি কেড়ে নিতে চাও ?

কেন চাই ? সে তুমি বুঝবে না । বলে অপর্ণা একটু মুখ টিপে হাসল ।

বুবকার যেদিন আসার কথা সেদিনই একটু বেলার দিকে এল আপা । তার তেমনই শীর্ণ চেহারা । তেমনই অমনোযোগী পোশাক । তেমনই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখশ্রী । এসেই বলল, অনীশ এখনও আসেনি ? আমাকে যে চিঠি দিয়েছিল আজ, শনিবার আসবে । আমি যেন অবশ্যই আসি !

মণীশের আজ ছুটির দিন । ছুটি না থাকলেও সে আজ ছুটি নিত । আজ বুবকা আসবে, আজ একটা বিশেষ দিন । সে হেসে বলল, বুবকা এসে যাবে আপা । তুমি ঘরে এসে বোসো । কতকাল পরে এলে ! তোমার নতুন সব অ্যাডভেঞ্চারের কথা বলবে না আমায় ?

আপা হতাশার সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, আমার দ্বারা ডাক্তারি পড়া হবে না কাকাবাবু । আমি খুব হতাশ ।

দেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রীর মুখে হতাশার কথা শুনতে আমি রাজি নই আপা । এসো, তোমার প্রবলেমটা শুন ।

ওঃ, আমার যে কত সমস্যা কাকাবাবু । যেখানে যাই সেখানেই সমস্যা চোখে পড়ে । সবাই আমাকে কী বলে জানেন ? বলে, আপা ইনভাইটস্ প্রবলেমস্ ।

ঘরে এসে আপা ডাইনিং টেবিলের পাশের চেয়ারে বসল । তাকে দেখতে রান্নাঘর থেকে অপর্ণা, অন্য দুই ঘর থেকে অনু আর ঝুমকি বেরিয়ে এল । সকলের কাছেই আপা এক কৌতূহলের বস্তু । সে যে কখন কী করে বসে তার তো ঠিক নেই ।

বাতাসটা একটু ঠণ্ডে নিয়ে আপা বলল, উঃ, আজ তো দারুণ সব রান্না হচ্ছে কাকিমা ! নিশ্চয়ই ফ্রায়েড রাইস বা বিরিয়ানি ! আর মুগি বোধ হয় ?

অপর্ণা হেসে ফেলে বলে, তা হচ্ছে । বহুদিন বাদে বুবকা আসছে তো । তুমি আজ খেয়ে যাবে কিন্তু ।

আপা একগাল হেসে বলে, আমার পাকস্থলী কতটুকু জানেন ? একটা পিংপং বলের যতো ছোট । আমি তো একটু খানি খাই । তার ওপর আমরা কট্টর তামিল ব্রাহ্মণ, মাছ মাংস খাই না ।

ওঃ, তাই তো ! আমার মনে ছিল না । কিন্তু কোনও অসুবিধে নেই । নিরামিষ পদও অনেক হচ্ছে ।

ঝুমকি বলল, আমি দোসা ইডলি সব বানাতে পারি । খাবে ?

মাথা নেড়ে আপা বলে, ইডলি দোসা লাগবে না । আমরা কলকাতায় থাকতে থাকতে খাদ্যাভ্যাস অনেক পাল্টে ফেলেছি । সাদামাটা বাঙালি খাবারও চলবে ।

‘খাদ্যাভ্যাস’ কথাটা শুনে মণীশ হাসল, তুমি এখনও সাধু বাংলায় কথা বলো । ফুড হ্যাবিট না বলে খাদ্যাভ্যাস বললে । ভাল লাগল ।

ইংরিজিটা আমি সহজে বলি না । একটা দুটো বলে ফেললে কী করি জানেন ? ক’টা ইংরিজি বলেছি তা হিসেব করে রাতে শোওয়ার সময় ততবার নিজের কান মলে দিই ।

সবাই খুব হাসল ।

আপা মান মুখে বলল, একটু আগেই কিন্তু বলেছি ইংরিজি ।

কী বলেছ ?

বলেছি, আপা ইনভাইটস্ প্রবলেমস্ । দু’বার কানমলা পাওনা হয়েছে ।

হাসতে হাসতে মণীশের মনটা অনেকটা হালকা হয়ে গেল । বলল, তুমি ইম্পসিবল । কিন্তু প্রবলেমটা কি ?

সমস্যা কি একটা কাকাবাবু ? আর যত সমস্যা সব আমার এই পোড়া চোখেই পড়বে । ডাক্তারি পড়ছি তো, ডাক্তারির প্রথম কথাই হচ্ছে পরিষ্কৃত, জীবাণুমুক্ত পরিবেশ, শান্তি, নিশ্চিন্তা—না হলে রুগী ভাল থাকবে কি করে বলুন ! আমাদের হাসপাতালগুলো তো আপনি জানেন !

মণীশ যেন শিউরে উঠে বলে, নরক । যখন প্রেস ফটোগ্রাফার ছিলাম তখন কলকাতার হাসপাতাল নিয়ে একটা ফটো-ফিচার করেছিলাম । বীভৎস ।

সত্যিই তাই কাকাবাবু । টয়লেট থেকে শুরু করে বিছানাপত্র, খাবারদাবার সব কিছু এত খারাপ যে আমার মাথাটাই খারাপ হওয়ার জোগাড় ।

অনু বলল, এই আপাদি, তুমি কিন্তু এইমাত্র টয়লেট বলেছ ।

আপা হাসল, জানি । এই দেখ কড় ওনছি ক’টা হল । বলে সত্যিই আঙুল দেখাল আপা । কড়ে আঙুলের তিন নম্বর কড়ের ওপর বুড়ো আঙুলটা দেখে সবাই ফের হেসে খুন ।

অপর্ণা বলল, আহা ইংরিজি বললে কী হয় ? কত শব্দ তো ইংরিজি ছাড়া নেই । ইনজেকশনকে কী বলবে ?

ওটার বাংলা আছে কাকিমা । সূচিকাভরণ ।

অপর্ণা হেসে ফেলে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে ছিল না । কিন্তু সূচিকাভরণ বললে কেউ কি বুঝবে ?

আমি চালু করে দিয়েছি । তবে সূচিকাভরণ নয় । হিন্দিতে সুইয়া বলে, বাংলা করেছে ছুঁচ । রুগীকে বলি, এবার আপনাকে ছুঁচ দেওয়া হবে । প্রথম প্রথম অবাক হত । এখন হচ্ছে না ।

উঃ বাবা, তুমি অদ্ভুত মেয়ে । অণ্ড বাংলা তো মাতৃভাষা নয় ।

ওটাই তো ভুল কাকিমা । কে বলল বাংলা আমার মাতৃভাষা নয় ? ভারতের সব ভাষাই আমার মাতৃভাষা । আমি সব ক’টা ভাষা শিখবার চেষ্টা করছি ।

মণীশ বলল, তুমি বোধ হয় পেরেও যাবে । তারপর তোমার প্রবলেমের কথা বলো ।

তাই তো বলেছি । হাসপাতালে কাজ করতে গিয়ে এসব দেখে মাথা খারাপ হয়ে গেল । ঝাঁটা বালতি নিয়ে পায়খানা, কলঘর পরিষ্কার করে ফেললাম একদিন । রুগীদের বিছানার চাদর পাণ্টে দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম । তারপর হামলা চালালাম রান্নাঘরে, এসব কী খাবার দেওয়া হচ্ছে ?

সঙ্গে অন্য ছেলেমেয়েরা ছিল ? তাদের সাপোর্ট পেয়েছ ?

প্রথমে নয়। সবাই ভয় পেত। নতুন এসেছে তো, ব্যাপারটা বুঝতে সময় নিচ্ছিল। পরে অবশ্য দু-চারজন করে সমর্থক পেয়ে যেতে লাগলাম। কিন্তু লেগে গেল ধাওঁর মেথর ঝাড়ুদার ওয়ার্ডবয়দের সঙ্গে, তারপর সুপারের সঙ্গে, তারপর কায়েরী স্বার্থের লোকজন—অর্থাৎ ঠিকাদার, সাপ্লায়ারদের সঙ্গেও। অনু, আমি হিসেব রাখছি, আরও তিনটে হল। ওয়ার্ড বয়, সুপার আর সাপ্লায়ার।

অনু বলল, কিন্তু এগুলোর তো বাংলা হয় না আপাজি, এগুলো ক্ষমা করা যায়।

সাপ্লায়ারের বাংলা হতে পারে সরবরাহকারী। সুপারের হতে পারে তত্ত্বাবধায়ক। ওয়ার্ডবয়েরও বাংলা হয় বোধ হয়—না মনে পড়ছে না এখন। একটা কী যেন করেছিলাম। যাকগে, এসব করতে গিয়ে লেখাপড়া মাথায় উঠল। কর্তৃপক্ষ তাদানোর হুমকি দিতে লাগল। নিম্নবর্ণীয় কর্মীরা একদিন কাজ করল না। তাদের দাবি, আপাকে সম্মতে হবে।

তারপর ?

খুব অশান্তি গেল কয়েকদিন। আমি খুব গলাবাজি করলাম। ঠেলা ধাক্কাও খেললাম। যারা পেশাদার বস্ত্রদানকারী তারাও একদিন চড়াও হল। শুনছি, আমার নামে মস্তীর কাছে নালিশ গেছে। আমি ভয় পাচ্ছি না। কিন্তু ভাবছি, এসব করে কিছু হবে না কাকাবাবু। সবাই মিলে, অর্থাৎ শহরের সব লোক মিলে যদি হাসপাতালগুলিতে হানা দেওয়া যায় মাঝে মাঝে তাহলে হয়তো হয়। সরকার তো কিছু করতে পারে না। কোনও ক্ষমতাই নেই।

কেন পারে না আপা ?

সরকার তো দেশটার সব ডাইমেনশন দেখতে পায় না। তার দেখাটা হয় একবগা, একপেশে। তারপর সরকার চালায় রাজনীতি এবং দল। দল মানেই চোখে রঙিন চশমা, দলের গাইডলাইন মেনে বিচার বিবেচনা সিদ্ধান্ত করতে হয়। তাই নিরপেক্ষতা থাকে না। রাজনীতিকের চলেতে হয় দুর্নীতিবাজদের কাঁধে ভর রেখে। কী করে কী হবে কাকাবাবু ? সরকার তো কত নীতি বানায়, আইন বানায়, সেগুলো হয়তো খুব ভালও। কিন্তু মানুষ যে সেসব আইন বা নীতির খবরই রাখে না, হাসপাতালের রুগী কি জানে যে তার কতটা পাওনা আর কতটুকু তাকে দেওয়া হচ্ছে ? তার বিছানার চাদর কেন পান্টোনে হয় না, তাকে কেন বেডপ্যান দেওয়া হয় না, কেন শৌচাগারগুলো অমন নোংরা, এসব নিয়ে প্রশ্নই নেই তাদের। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মণীশ বলে, সব জানি আপা। সব জানি। তুমি একটু সাবধান থেকে। অর্গানাইজড না হয়ে ডিমরুলের চাকে ঢিল মারা ঠিক নয়।

আপা নির্বিকার মুখে বলে, আমি কাউকে শত্রু বা প্রতিপক্ষ বলে ভাবি না কাকাবাবু। আমি এদের বোঝানোর চেষ্টা করি যে, ইচ্ছে করলেই হাসপাতাল অনেক পরিষ্কার রাখা যায়, রুগীদের অনেক আরাম দেওয়া সম্ভব। কিন্তু কেউ নিজেকে পান্টোনে চায় না, যা হবে আসছে, যা চলে আসছে তার পরিবর্তন করতেও কেউ রাজি নয়। তারা বলে, এত রুগীর ভিড়, জায়গা নেই, ডাক্তার বা ওষুধের অভাব, মাইনে কম। সব সত্যি। তবু ওর মধ্যেই করা যায়। এদেশে কেউ তো যথাসাধ্য করে না। সবাই গা-ছাড়া ভাব। আমি তাদের উৎসাহ দিতে চেষ্টা করি মাত্র।

মণীশ মাথা নেড়ে বলে, তবু সাবধান থেকে আপা। টেক গার্ড।

আপা স্নিগ্ধ হেসে বলল, আমি একটা রোগী দুর্বল মেয়ে কাকাবাবু। আমাকে ক'জন মারবে ? ক'বার মারবে ? সবাই যে কেন আমাকে মারবে বলে হুমকি দেয় সেটাও বুঝি না। আমাদের হাসপাতালের একজন গুণ্ডা ধরনের লোক আমাকে শাসাতে এসেছিল, আমি তাকে বললাম, আপনি আমার চেয়েও দুর্বল। কারা মারতে চায় জানান ? যাদের নিজেদের সাফাই গাওয়ার মতো যুক্তি নেই, যারা ধরা পড়ার ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে, যারা অসৎ এবং দুর্বল। লোকটা আমাকে চড় তুলেছিল। অন্যরা ধরে ফেলায় মারতে পারেনি।

ট্যাক্সি থামল বাইরে। হাইহাই করতে করতে ঘরে এসে ঢুকল বুবকা। সঙ্গে সুটকেস-বিছানা আর দুজন বন্ধু। মুখে এক গাল হাসি।

মা! বাবা! মিট ভান্ডার অ্যান্ড পথিক। গুদের সময় নেই। আমাকে নামিয়ে ওরা একজন টালিগঞ্জ আর অন্যজন বেহালা যাবে। জাস্টি সে হ্যালো। ওঃ আপা! গ্রেট প্রেজার। হাই দিদি! হাই অনু!

বন্ধুরা খুব তাড়াহুড়া করেই চলে গেল। তারপর বুবকা ছেলেমানুষের মতো জড়িয়ে ধরল মণীশকে।

কী হয়েছিল বাবা তোমার ?

মণীশ বুবকার মাথাটা কাঁধে চেপে ধরে বলল, কিছু নয়। আই অ্যাম ফাইটিং ফিট।

তুমি যদি এরকম আর করো তাহলে আমি পড়া ছেড়ে চলেই আসবো বলে দিচ্ছি।

মণীশ একটু হাসল। বুবকার গা থেকে পুরুষ মানুষের মতো তাপ ও গন্ধ আসছে না ? কোমল দাড়ি ও গৌঁফে সমাচ্ছন ছিল মুখ। এখন দাড়ি কামাচ্ছে। গৌঁফ রাখছে। বুবকা এখন যুবক। পরিপূর্ণ মানুষ।

অপর্ণার মুখ খুশিতে উপচে পড়ছে। দৃষ্টি বোনের মুখ উজ্জ্বল। বাড়ির অনুপস্থিত একজন লোক ফিরে এলে যেন নিজের অস্তিত্বেরই একটি হারানো অংশ ফিরে আসে।

সকলকেই একটু একটু ছুঁয়ে দেখল বুবকা। তারপর আপার দিকে চেয়ে বলল, আপা, আই অ্যাম মিসিং অল ফ্রেডস ভেরি মাচ। আমরা চারজন আই আই টি-তে, তুমি ডাক্তারিতে, সঞ্জয় আর সিংজী যাদবপুর ইলেকট্রিক্যালসে। কোথায় কোথায় ছড়িয়ে পড়লাম আমরা। অল সেপারটেড। একটা গেট টুগেদার আরেঞ্জ করো না!

আপা মাথা নেড়ে বলল, আমার সঙ্গে প্রায় সকলেরই যোগাযোগ আছে। সহজে করা যাবে। ওখানে নতুন বন্ধু-বান্ধব কেমন হল ?

অনেক। তবে পড়ার চাপ আছে। বেশি আড্ডা হয় না। তবে তোমার কথা আমরা খুব বলি। তোমার নতুন অ্যাডভেঞ্চারের কথা বলো আপা।

আপা একটু হাসল, কাকাবাবু আর কাকিমার কাছে শুনে নিও। আমি এখন চলে যাবো অনীশ, অনেকদিন বাদে তুমি বাড়ি এসেছ, একজন বাইরের লোক বসে থাকলে তোমাদের ছন্দ কেটে যাবে।

অর্ণা হাঁ করে উঠল, বলে কী রে মেয়েটা? এই যে বললাম খেয়ে যাবো। তুমিও তো রাজি হলে। মুখখানা মান করে আপা বলে, আমাকে খাইয়ে আপনি খুশি হবেন না কাকিমা, আমি যে খেতেই পারি না। সে জানি। তোমাকে খাইয়ে দেখেছিও, তবু একটু কিছু মুখে দাও। সাদা ভাত আর পটলের কারি আছে।

দিন তবু ছোঁট করে। হাসপাতালে একটা পোড়া রুগী আছে। শতকরা পঁয়তাল্লিশ ভাগ পোড়া। সতেরো-আঠেরো বছর বয়সের ফুটফুটে মেয়ে। সে আমাকে খুব খোঁজে। তার জন্যই এখন যেতে হবে।

অর্ণা ছলছলে চোখে বলে, আহা রে। বাঁচবে তো?

ঠোট উন্টে আপা বলে, কে বলতে পারে কাকিমা? পঁয়তাল্লিশ ভাগ পোড়া তো ভাল হওয়াই উচিত। কিন্তু সেরকম যত্ন যদি পায়। নইলে দ্বিতীয় সংক্রমণে মরে যাবে। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি বাঁচানোর।

একটু অবাক হয়ে অনীশ বলল, আপা, আজকাল যে বক্সিমী ভাষায় কথা বলছ?

চেষ্টা করছি। তুমিও শুরু করে দাও। মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করলে দাঁড়ানোর জমি পাবে না। বাঙালিরা বড্ড তাড়াতাড়ি আন্তর্জাতিক হয়ে যায়। তাই তাদের শক্তি কম।

ও বাবা, তুমি তো আরও পেকেছ দেখছি। আগে তবু মাসিমা গোছের ছিলে, এখন তো দেখছি পুরো দিদিমা।

একটু হাসাহাসি, আরও কিছু খুনসুটির পর আপা তার চড়াই পাখির মতো খাবারটা শেষ করে উঠে পড়ল। বলে গেল, তোমার পুনর্মিলনের ব্যাপারটা সংগঠিত করছি। দেখা হবে।

নাঃ, তোমার সঙ্গে কথা বলতে হলে এখন থেকে বাংলা ডিকশনারিটা হাতে নিয়ে বসতে হবে দেখছি।

মণীশ বলে, ওকে ঠাট্টা করিস না বুবকা, ও যে একটা মিশন নিয়ে চলে, সেটা তো কম কথা নয়। আজকাল পাবি ওরকম মেয়ে?

বুবকা একটু গম্ভীর হয়ে বলে, তা ঠিক বাবা। আমরা ওকে ঠাট্টা করলেও ভীষণ রেসপেক্টও করি। আমি তো বলিই, আপার মতো এমন মহৎ বন্ধু আমার আর নেই।

অনু আর ঝুমকি মিলে বুবকার বাস্তব-বিছানা খুলে ফেলছিল। ঝুমকি টেঁচিয়ে উঠল, এঃ মা! জামাকাপড় কিরকম নোংরা করে এনেছে, দেখ মা!

অনু বলল, বিছানার চাদর আর বালিশের কভার দেখ মা, একদম ব্রাম ডুয়েলারদের মতো।

তুই কী রে বুবকা?

বুবকা হেসে বলে, না না, রেঙলার কাচি। এবার বাড়িতে আসব বলে গত দশ বারো দিন সব জমিয়ে রাখছিলাম।

অর্ণা বলল, আচ্ছা থাক না, কেচে দেওয়া যাবে। ও কি কখনও কাচাকুচি কবেছে? এই তো সব হাতেখড়ি। হ্যাঁ রে, তোদের হট্টলে লন্ড্রি নেই?

ধোবি আছে। তবে আমি নিজেই কেচে নিই। ধোবি শুধু মাঝে মাঝে ইস্তিরি করে দেয়।

সারা দিন গল্পে গল্পে কেটে গেল। বিকেলে বুবকা তার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গেল। একটু বেশি রাতের দিকে সবাই শুয়ে পড়লে বুবকা হানা দিল দিদির ঘরে।

আই দিদি, ঘুমোচ্ছিস?

ঝুমকি জেগেই ছিল। উঠে বসে মায়াজাদা গলায় বলল, আয়। বোস এসে।

বুবকা ঝুমকির চেয়ারটায় বসল। বিছানায় ঝুমকি।

হ্যাঁ রে দিদি, তোর নাকি বিয়ে হয়ে যাবে?

যাঃ কে বলল?

অনু বলছিল।

অর্নুটা খুব পেকেছে দেখছি।

ও তো বলছিল সব ঠিকঠাক। শুনে আমার এত মনটা খারাপ হয়ে গেল, বাড়ি এসে তোকে দেখতে পাবো না ভাবতেই পারি না। আচ্ছা, বিয়ের পর মেয়েদের পদবী-উদবী সব চেঞ্জ হয়ে যায় এটা কিরকম নিয়ম বল তো! তোর সব পরিচয় মুছে যাবে নাকি?

বাজে সব নিয়ম। কে যে করেছিল!

আচ্ছা দিদি, আর ইউ ইন লাভ? সত্যি করে বল তো! আমাকে ছুঁয়ে বল।

উঃ, তোকে নিয়ে আর পারি না। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। কোথায় কী!

অনু এমনভাবে বলল যে বিয়ে ছুট করে হয়ে যাবে। হেমাঙ্গদাকে আমি দু-একবার দেখেছি অবশ্য। এ পাবসোনেবল ম্যান।

ঝুমকি মুখটা একটু ঘুরিয়ে নিল। বলল, এখনও কিছু ঠিক নেই।

কেন ঠিক নেই?

ঝুমকি হঠাৎ মুখটা তুলে বুবকার দিকে চেয়ে বলল, বোধ হয় আমার পক্ষে ও একটা ভাল লোক।

ভাল লোক? তার মানে?

একা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঝুমকি মাথা নেড়ে বলে, জানি না। ও মেয়েদের ভগ্ন পায়। একা থাকতে ভালবাসে। নানা রকম খেয়াল নিয়ে চলে।

বাট হি ইজ এ নাইস ম্যান। ভদ্র, বিনয়ী, আন্তরিক।

সেটা তো সবাই বলে।

তোকে প্রোপোজ করেছে ?

না । প্রোপোজ করতেই তো ভয় ।

তাহলে অনু যে বলল, ভদ্রলোক তোর জন্য পাগল!

অতটা নয় । তবে কিছু সফটনেস্ আছে হয়তো ।

তোর ?

আমার! না, আমার তেমন কিছু ব্যাপার নেই ।

তুই রাজি নোস ?

তাও জানি না ।

লোকটাকে তোর ভাল লাগে ?

ঝুমকি একটু ভেবে বলল, সেটা তো প্রেম নয় ।

তাহলে কী রে দিদি ?

ঝুমকি হেসে ফেলল, তুই সেই ছেলেমানুষটাই রয়ে গেছিস ।

কেন রে ?

এখনও তারি সহজ সরল আছিস তুই । নইলে এভাবে জিজ্ঞেসই করতে পারতি না ।

বুবকা হাসল, বিয়েটা করেই ফেল দিদি । এ লোকটা ভাল । আই অ্যাক্রভ ।

॥ ১১৪ ॥

রাওয়াত নামে এক বন্ধু ছিল হেমাঙ্গর । কলকাতায় ইনকাম ট্যাক্সে চাকরি করত । দেশে ফিরে যাওয়ার মোহে সে একদিন চাকরি ছেড়ে দেশে গিয়ে নিজের বাড়িতে একটা স্কুল খুলে বসল । ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল । সরকারি সাহায্য দূরের কথা, অনুমোদন পর্যন্ত নেই । সেই থেকে খবরবার্তা বন্ধ ছিল হেমাঙ্গর সঙ্গে । কিছুদিন ধরে রাওয়াত তাকে চিঠি লিখছিল, একবার চলে এসো ; হিমালয়ের কোলে আমার ছোট স্কুল দেখে যাও । দেখে যাও আনন্দ কী মহান হতে পারে ।

দিল্লির অশোক হোটেলের পাঁচতলার ঘরের বারান্দায় রাত আটটার সময় চেয়ার টেনে বসে নানা কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ রাওয়াতের কথা মনে পড়ে গেল হেমাঙ্গর । দিল্লির কাজ শেষ হয়েছে । কলকাতায় ফিরবার তেমন তাড়া নেই । দু-চারদিন দেরি হলেও ক্ষতি হবে না । কাল কর্তৃত্বপ্রয়াগ রওনা হলে কেমন হয় ? বছর সাতেক আগে একবার কেন্দার-বন্দী গিয়েছিল সে । তারপর আর ও পথে যাওয়া হয়নি । কাল রাতটা হরিদ্বারে কাটানো যায় । বাজারের মধ্যে একটা রাবড়ির দোকান আছে । দারুণ করে জিনিসটা । রাবড়ি খাবে, হর কি পৌড়ির চাতালে বসে থাকবে সম্ভবেলা, আরতি দেখবে । পরণ্ড হরিদ্বার থেকেই রওনা দেবে কর্তৃত্বপ্রয়াগ । দুটো দিন রাওয়াতের ওখানে কাটিয়ে ফিরে আসবে । মন্দ কী ? ঘরে এসে কলকাতায় এস টি ডি করল সে । সিনিয়ার পাটনারকে জানিয়ে দিল, ফিরতে দেরি হবে তিন দিন ।

পরদিন রওনা হল হরিদ্বার । সেই রাবড়ি খাওয়া, হর কি পৌড়িতে বসে থাকা সবই হল, কিন্তু কেন যেন ভাল লাগল না আগের মতো । আগে যখন এসেছিল তখন দুজন বন্ধু ছিল সঙ্গে । খুব জমেছিল । একা একা জমল না একদম ।

ভোর রাতে বাস ধরল সে । বিচ্ছিরি চেহারার বাস । চলতে ঘরঘর শব্দে মাথা ধরিয়ে দিল । তার ওপর গম্ভীরান ভিড় । অনেকদিন কষ্ট করা অভাস নেই তার । ভিড়টা সহ্য হচ্ছিল না । জানালার ধারে সিট পেয়েছিল বলে রক্ষা । বাস চলতে শুরু করার পর তার মনে হল, রাওয়াত আর তার স্কুল বা কর্তৃত্বপ্রয়াগ কেউ তাকে টানছে না । তার যাওয়াটা হচ্ছে জোর করে । নিজেকে সে এক অনিশ্চুক যাত্রায় বাধ্য করছে যেতে ।

শীতের মুখে এসব জায়গায় খুব ঠাণ্ডা পড়ে গেছে । যত বাস ওপরে উঠবে তত বেশি ঠাণ্ডা । সকালে কুয়াশাও পড়েছে খুব । একটা মাফলারে মাথা আর কান ঢেকে একটু চুলছিল বসে হেমাঙ্গ ।

ঘটনাটা ঘটল দেবপ্রয়াগ পার হয়ে চড়াইয়ে গাঁৱের পর । হেমাঙ্গ তখনও চুলছিল । সহযাত্রীরা কেউ কথা বলার মতো স্ট্যান্ডার্ডের নয় । বেশির ভাগই পাহাড়ে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ, ব্যবসাদার, তীর্থযাত্রী । সুতরাং একা বসে গোলা ছাড়া উপায় কি ?

বিকট টায়ার ফটবার একটা আওয়াজে কঁপে উঠল হেমাঙ্গ । কিছু বুঝে উঠবার আগেই বাসটা একটা অস্বাভাবিক বাক নিয়ে ধাঁ করে ঘুরে গেল । তার পরই বাসসূচু লোকের প্রচণ্ড চিৎকার সমেত সোজা নেমে যেতে লাগল নিচে, নিরালম্ব । নিরালম্বের এই বোধ জীবনে ছিল না হেমাঙ্গর । হাত-পা যেন ভারহীন, শরীর যেন হঠাৎ একখণ্ড পালক । বাসটা একটা পাথর বা কিছুতে প্রচণ্ড শব্দে ধাক্কা খেয়ে উল্টে গেল এবং উল্টো অবস্থাতেই গড়িয়ে যেতে লাগল নিচে । কপালে আর পায়ের দুটো সাম্ভাঙিক বাথ্য পেল হেমাঙ্গ, চোখ আর মাথা গ্ল্যাক আউট হয়ে যাওয়ার আগে শুধু তার মনে হল, ভগবান! ট্যাকটায় আঙুল লাগবে না তো! তাহলে তো সব শেষ!

তার পরই জ্ঞান হারাল সে ।

জ্ঞান ফিরল দু'দিন বাদে ।

এত রক্তিত আর এত ব্যথা জীবনে কখনও আর বোধ করনি সে । সর্বাস্থই যেন অচল । যেন আর কোনওদিনই বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না । চারদিকে চেয়ে দেখে সে একটু অবাক হল । এ তো শোংরা, ভিড়াক্কার হাসপাতাল নয় । এ যে বেশ ঝকঝকে ভকভকে একখানা সিঙ্গল বেডের ঘর । ড্রিপ চলছে । মাথায় ব্যান্ডেজ, হাতে পায়ের ব্যান্ডেজ, নাকে অক্সিজেনের নল!

জ্ঞানটা বেশিক্ষণ থাকল না । আবার ঘুমিয়ে পড়ল সে । বারকয়েক সারা দিনে জ্ঞান ফিরল তার । কিছু বুঝতে না পেরে ফের ঘুমিয়ে পড়তে লাগল ।

তৃতীয় দিনের সকালে অসহ্য ব্যথার বোধ নিয়ে চোখ মেলল সে। কেউ তাকে মৃদু স্বরে নাম ধরে ডাকছিল। যে মুখটা দেখতে পেল সেটা প্রথমে আউট অফ ফোকাস। তার পর চোখ তীক্ষ্ণতর হলে সে বলল, রাওয়াত!

বলল, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরোল না তার। শুধু ঠোট নড়ল।

রাওয়াত বুকে পড়ে বলল, আর ইউ ওকে?

না। আমি বোধ হয় মারা যাচ্ছি।

এ কথাটাও শুনতে পেল না রাওয়াত। শুধু বলল, থ্যাংক গড। ইউ সারভাইভ।

কোন শ্রুতি নেই সেই দুর্ঘটনার। একটা বিকট শব্দ, নিরালস্য ভাব, তার পরই আছড়ে পড়া। কিন্তু নানা ব্যাথা-বেদনার ভিতর দিয়েও বিদ্যুৎচুম্বকের মতো অদ্ভুত একটা ঘটনা মনে পড়ল তার। বাসটা যখন উল্টে যাচ্ছিল, যখন ভিতরে যাত্রীরা পরস্পরের সঙ্গে তালগোল পাকাচ্ছিল আর দুমদাম বান্ধুপ্যাটরা এসে পড়ছিল তাদের ওপর তখন একটা শিশু কোথা থেকে ছিটকে এসে তার বুকে ধাক্কা খেয়েছিল। ওই সাংজাতিক অবস্থাতেও বাচ্চাটার জন্য হাত বাড়িয়েছিল হেমাঙ্গ। কিন্তু পারেনি। মাথাটা অন্ধকার হয়ে গেল নিজের অজান্তে। বচ্চাটা কি বেঁচে আছে? বোধ হয় না। এইসব ঘটনায় বাচ্চারাই তো আগে মরে।

চারদিনের দিন গলায় স্বর এল তার।

রাওয়াত! তুমি কি করে জানলে যে আমার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে?

রাওয়াত মাথা নেড়ে বলে, কি করে জানব? জানতাম না তো। তুমি আসবে বলে খবরও দাওনি। তবে অ্যাকসিডেন্ট হওয়ার খবর পেয়ে আমরা অনেকেই চলে এসেছিলাম স্পটে। এই পথে আমাদের চেনাজানা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সর্বসময়ে যাতায়াত করে। এসে রেসকিউতে হাতও লাগিয়েছিলাম। ঠিক পঁচিশ জনের পর তোমাকে তোলা হয়।

কতজন মারা গেছে?

একত্রিশ জন। আরও দু-চারটে যাবে।

আমার অবস্থা কেমন?

ইউ আর ওকে। দিল্লিতে নিতে পারলে মাথাটা স্ক্যান করা যেত।

আমি কোথায়?

হরিদ্বার। খুব রিক্স নিয়ে এতদূর এনেছি। কিন্তু না আনলে মুশকিল ছিল।

আমি বাঁচব?

বেঁচে গেছ। থ্যাংক গড। তুমি যাচ্ছিলে কোথায়? আমার কাছে?

হ্যাঁ।

সরি হেমাঙ্গ। ভেরি সরি। আমার কপালটাই খারাপ। এই ঘটনার পর তুমি আর বোধ হয় কোনওদিনই আমার ওখানে যাবে না?

কে বলল? নিশ্চয়ই যাবো।

আচ্ছা। নাউ টেক রেস্ট।

আমার ইনজুরি কতটা?

কিছু ফ্র্যাকচার আছে। ব্যাস।

এনি ভাইটাল উন্ড?

না না।

ভয়ে আর জানতে চাইল না হেমাঙ্গ। চোখ বুজে থেকে বলল, অ্যাকসিডেন্টের সময় একটা বাচ্চা আমার বুকে এসে পড়েছিল। বোধ হয় বাঁচেনি।

একটু বিস্মিত গলায় রাওয়াত বলল, এম... বাচ্চার কথা বলছ? দু-আড়াই বছর বয়স?

তা জানি না। ওই ভয়ংকর অবস্থায় কিছু ভাল করে দেখেছি নাকি?

অবাক কাণ্ড হল, তোমাকে যখন বের করা হয় তখন তোমাব দু'হাতে একটা বাচ্চা ধরা ছিল। সে বেঁচে গেছে।

বেঁচে গেছে?

খুব আশ্চর্যভাবে। লোকে তো ধরে নিয়েছিল ওটা তোমারই বাচ্চা। আমি তাদের ভুল ভাঙাই। তবে বাচ্চার মা বাঁচেনি।

আমি কিভাবে বাঁচলাম রাওয়াত?

ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছেন ভাই। একটা পাথরের চাঙড়ে আছড়ে পড়ে বাসটা দু'খন্ড হয়ে যায়। একটা খন্ড গড়িয়ে নিচে চলে গিয়েছিল। ওটায় যারা ছিল কেউ বাঁচেনি। তুমি পিছনের পোরশনে ছিলে বলে বেঁচে গেছ। এখন বলো, তোমার বাড়িতে কী খবর পাঠাবো! তারা হয়তো চিন্তা করছে।

একটু চিন্তা করে হেমাঙ্গ বলল, বাড়িতে অ্যাকসিডেন্টের খবর দেওয়া ঠিক হবে না। বরং আমার পার্টনারদের জানিয়ে দাও। আমার জিনিসপত্র কিছুই কি পাওয়া যায়নি?

এখানে লুটপাট বিশেষ হয় না। পাছাড়ি লোকেরা এখনও ততটা খারাপ হয়ে যায়নি। তোমার একটা সুটকেস ছিল কি? ইনিশিয়াল মিলে যাচ্ছে, চারকালো ব্ল্যাক রঙের?

হ্যাঁ। দরকারি কাগজপত্র আছে।

ঠিক আছে। আর কিছু?

আমার রিকভারি হতে কত সময় লাগতে পারে?

ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলে দেখব। ইউ উইল টেক টাইম।

সেক্ষেত্রে আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া যাবে কি ?

যে বি আফটার সাম টাইম। তার আগে তোমাকে দিল্লিতে শিফট করা দরকার। ফর দি স্ক্যান।

ব্যাখা আর ব্যাখা : আর অবসন্নতা। আর হতাশা। আর নিঃসঙ্গতা। হোমাস সারা দিন স্থবিরের মতো পড়ে থাকে। নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। ডাক্তার বা নার্স কিছু বলতে চায় না। সে অনুমান করে, তার বাঁ হাত আর বাঁ পা ভেঙেছে। সম্ভবত গোটা দুই পাঞ্জরও। মাথার ব্যাভেজ থেকে অনুমান সেখানকার চোটও সামান্য নয়। অনেক রক্তপাত হয়ে থাকবে, নইলে শরীরের এই অবসন্নতা হত না।

রাওয়াত, আমাকে কি রক্ত দেওয়া হয়েছে ?

অফ কোর্স। ইউ ব্রেড লাইক হেল।

শঙ্কিত হোমাস বলে, সেই রক্ত কি এইচ আই ভি ফি ? আজকাল ব্লাড থেকে কত এইডস্ হয় তুমি জানো ?

রাওয়াত হাসল, চিন্তা করো না। তোমার রক্তের গ্রুপ ইজি, আমি তোমাকে রক্ত দিয়েছি। আর দুজন বন্ধুকে ধরে এনেছিলাম। তাদের কারও এইডস্ নেই।

হোমাসর তবু একটু অস্বস্তি রয়ে গেল। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে ক্ষণে ক্ষণে একজনের কথা মনে পড়ছে। ভাবতে ভাল লাগছে। যদি অ্যাকসিডেন্টে মরে যেত তাহলে কী করত ও ? কাদত নাকি ? মন খারাপ করত ? তা হয়তো করত। কিন্তু স্বাভাবিক হয়ে যেতে এবং তাকে ভুলে যেতে কতই বা সময় নিত ?

দিন সাতেক বাদে একটানা অ্যাম্বুলেন্সে দিল্লি নিয়ে আসা হল তাকে। দুজন পার্টনার কলকাতা থেকে উড়ে এসেছে তার জন্য। খুব ভাল একটা নার্সিং হোমে ভর্তি করা হল তাকে। স্থানে তেমন কিছু ধরা পড়ল না।

বান্ধা ছেলের মতো সে মাঝে মাঝেই বলতে লাগল, বাড়ি যাবো।

পার্টনার দাশগুপ্ত বলল, বাড়ি বলতে তো গর্চ। সেখানে কে দেখবে তোমাকে ? যা অবস্থা করছে, বেশ কিছুদিন নার্সিং দরকার।

না দাশগুপ্ত, এভাবে হবে না। তোমরা আমাকে কলকাতায় নিয়ে যাও।

তোমার মায়ের পক্ষে কিন্তু ব্যাপারটা শকিং হবে। আমরা গুঁকে অ্যাকসিডেন্টের খবর দিইনি। শুধু বলেছি অফিসের জরুরি কাজে আটকে গেছে, ফিরতে দেরি হবে।

হোমাস চোখ বুজে গভীর ক্লান্তির সঙ্গে বলল, শোনো দাশগুপ্ত, রিকভারির জন্য মানসিক স্বস্তিও দরকার। এখানে আমার ভীষণ একা লাগছে। আমাকে নিয়ে যাও।

কিন্তু এখনও যে তুমি বিছানা থেকে উঠতে পারছ না।

স্ট্রেচারেই নেবে।

দাশগুপ্ত একটু ভাবিত মখে বিদায় নিল।

রাওয়াত কর্ণপ্রয়াগে ফিরে গিয়েছিল। আবার এল। বলল, আরে ভাই, ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? সাত আটটা দিন থাকো। তারপর একটু ফিটনেস এসে গেলে যেও।

একটা সত্যি কথা বলবে রাওয়াত ?

কী ?

আমার কোনও ভাইটাল ইনজুরি হয়নি তো ? হয়তো আমি টের পাচ্ছি না।

আরে না ভাই। হলে টের পেতে না ?

আমার কোমরে একটা ব্যাভেজ রয়েছে। আগে বুঝতে পারিনি। আমার স্পাইনাল কর্ড ভাঙনি তো ?

উঃ, তোমাকে নিয়ে পারা যায় না। ইউ আর অলরাইট ম্যান। আউট অফ ডেনজার।

অ্যাকসিডেন্টের প্রায় পনেরো দিন বাদে হাতে পায়ে প্রস্টার, মাথায় ব্যাভেজ নিয়ে হুইল চেয়ারে বসে সে প্লেনে উঠল এবং ফিরে এল কলকাতায়। নিজের ডেরায়।

ফটিক যে আর্তনাদটা করল সেটা মাইলখানেক দূর থেকেও লোকে শুনতে পেল বোধ হয়। এ কী দাদাবাবু! আপনি যে খুন হয়ে এসেছেন! অ্যা। এ কী কাণ্ড ?

ওরকম করো না ফটিকদা। আমি ভাল আছি।

নিজের ঘরে দোতলায় এসে একটা আরামের শ্বাস ছাড়ল হোমাস। স্থানেরও মায়া কেন তা সে বুঝতে পারে না। এই যে ঘরদোর, বারান্দা, চেয়ার টেবিল, চেনা আসবাব এদের কি সস্তা আছে ? নইলে এত টানে কেন ? কেন এই চেনা বাড়িতে ফিরে এসে তার এত স্বস্তি ? কী আছে এখানে ?

যারা সঙ্গে এসেছিল তারা বিদায় নেওয়ার পর হোমাস অনেকক্ষণ ক্যাসেট রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনল। মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাই সে কথা যে যাই পাসরি। পায়ের কাছে আগাগোড়া ছলোছলো চোখে ফটিক বসে আছে।

অত মন খারাপ করছ কেন ? মরেই তো যেতে পারতুম। কিন্তু মরিনি তো!

কালকেই কালীঘাটে পূজা দিয়ে আসব।

এই ভালবাসাটাকেও ব্যাখ্যা করতে পারে না হোমাস। রক্তের সম্পর্ক নয়, মনিব-ভূতোর সম্পর্ক, তবু তার কিছু হলে ফটিক কাদে কেন ? এইসব সামান্য সামান্য জিনিসের জন্যই বোধ হয় আজও মানুষের বাঁচতে ভাল লাগে। বড় বড় জিনিসের জন্য যারা বাঁচে বাঁচুক, কিন্তু এই সামান্য ভুচ্ছগলির জন্যই হোমাসর বুক তেঁটায় কাঠ হয়ে আছে।

না, আজ কাউকে কোনও খবর দিল না হোমাস। ফটিক আজ যত্ন করে রান্না করল। হোমাস অঘোর ঘুমোলো রাতে। শরীরের সব অস্বস্তি সবুও মনটা ভারি ভাল।

এ বাড়িতে হুইল চেয়ার নেই। বেডপ্যান দেওয়ার লোক নেই। কিন্তু একটা দুটো ফোন করলেই সব ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে। সকালে উঠে হোমাস ভাবল, দেখা যাক কতটা পারা যায়।

বা হাতটা কনুই থেকে নিচের দিকটা ভেঙেছিল। বাঁ পা ভেঙেছে হাঁটু বরাবর। দুটোর কোনওটাই ভাঁজ করার উপায় নেই। ডান পায়ে ভর দিয়ে সে দাঁড়াল এবং বাঁ পা মোঁথায় রেখে অল্প একটু ভার রাখল সে। কেমন একটা অবশ বিহ্বল হয়ে রয়েছে পাটা। কোনও সাড়া নেই যেন। ভয় হল, হয়তো বেশি ভর দিলে আবার মচাক করে প্রাণ্টারের মোড়ক সহই ভেঙে পড়বে। বোধ হয় এখনই এতটা অ্যাডভেঞ্চার না করা ভাল।

ফটিক অবস্থা দেখে বলল, দাদাবাবু, বিভূন স্ট্রিটে একটা খবর দিন।

পাগল! মা এ অবস্থা দেখলে হার্ট ফেল করবে। আমি যে কলকাতায় ফিরেছি সেটাই মাকে জানানোর দরকার নেই।

তাহলে চারুকিদিকে?

দূর! চারুকিদে চতুর্দিকে রাষ্ট্র করে বেড়াবে। ও পেটে কথা রাখতে পারে না।

ফটিক একটু ইতস্তত করে লাজুক মুখে বলল, তাহলে অন্তত দিদিমণিকে তো জানানো দরকার।

দিদিমণি! সে কে?

ওই যে। গত কয়েকদিন যাবৎ কেবল বোঁজ নিচ্ছেন ফোনে।

ও। বলে হেমাঙ্গ ভিতরে ভিতরে একটা উখলে ওঠা কিছু টের পেল। বলল, কী বলছিল?

বোঁজ নিচ্ছেন বোঁজ, আপনি ফিরলেন কি না জানতে।

তাকে খবর দিয়ে কী হবে?

একজন কাউকে জানানো দরকার।

থাক ফটিকদা, জানানোর দরকার নেই। কয়েকটা দিন যাক না।

কিন্তু হেমাঙ্গ বুঝতে পারছিল, তার টয়লেটে যাওয়া বা গা মোছানো, মাথা ধোয়ানোর জন্য একজন নার্স গোছের কাউকে দরকার। আবার বাইরের কেউ এলে তার স্বস্তিরও অভাব ঘটবে। কী করবে তা বুঝতে পারছিল না সে।

খানিকটা বেলায় সে টয়লেটে গেল বেশ কষ্ট করে। বাঁ পায়ে ভর না দিয়ে। একজোড়া ক্রাচ হলে কি সুবিধে হবে?

সারা দিন নিজের অবস্থার পর্যালোচনা করে দেখল সে। তারপর ক্রাচের সিদ্ধান্ত নিল। সিদ্ধান্ত নিল, নার্স রাখবে না। যতটা পারে নিজেই করবে। পারবে ঠিক।

কতকাল আর নিশিপুর যাবে না সে! এখনও কত কাল। নিশিপুর যেন দূরের এক রূপকথার জগৎ হয়ে গেছে এখন। সে যেন অলীক, মিথ্যে এক সাজানো জায়গা।

রাত আটটা নাগাদ টেলিফোনটা এল, ফটিকই ধরল। বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ এসেছেন। কী কাণ্ড! পাহাড় থেকে বাস সুছু পড়ে গিয়েছিলেন খাদে। শরীরের একটা হাড়ও আর আন্ত নেই!... অ্যাঁ, হ্যাঁ দিচ্ছি। ধরুন।

জরুটি করে হেমাঙ্গ বলল, কাকে ওসব বুঝাত দিলে?

একগাল হেসে ফটিক বলল, দিদিমণি। বড্ড ভাল মেয়ে। ধরুন ফোনটা।

কর্ডলেস টেলিফোনটা হাতে ধরিয়ে দিল ফটিক। হেমাঙ্গর শ্বাসকষ্ট হতে লাগল। বুকটার মধ্যে তোলপাড়।

ওপাশ থেকে কান্নাভরা একটা গলা বলল, কী হয়েছে? কথা বলছেন না কেন?

হেমাঙ্গ একটু হেসে বলল, আর বলবেন না! একটা বিচ্ছিরি অ্যাকসিডেন্ট।

পাহাড় থেকে পড়ে গিয়েছিল বাস?

হ্যাঁ।

উঃ। কী হয়েছিল বলবেন তো!

যা হয় আর কি। খবরের কাগজে যেমন বেরোয়, খাদে বাস, নিহত একত্রিশ, ঠিক ওরকম।

আপনার কী কী হয়েছে আমি জানতে চাই।

বাঁ হাত আর পা ভেঙেছে।

কি রকম ভাঙা?

প্রাণ্টার করা হয়েছে। ভালই ভাঙা। মাথায় চোট হয়েছিল। পাজরেও। কোমরেও।

ও পাশের কঠররে কান্নার কাঁপন আর চাপা রইল না, ইস! মা গো! আমি এখনই যাচ্ছি।

না না, এখন না। রাত আটটা বেজে গেছে।

তাতে কি? আমি মাকে নিয়ে যাব।

আচ্ছা, কাল সকালে এলেই ওেঁ হয়।

আমার ভীষণ খারাপ লাগছে যে!

তা জানি। কিন্তু রাতে আসার দরকার নেই। কাল সকালে এলে কিছুক্ষণ থাকলে খুশি হবো। থাকবেন কিছুক্ষণ?

মাকে নিয়ে যাবো? না একা?

একটু হাসল হেমাঙ্গ। তারপর বলল, একা।

হাঁটাচলা করছেন কি ভাবে?

কোনওরকমে। কাল থেকে ক্রাচ নিতে হবে।

ইস। কী কষ্ট!

আপনি কাদবেন না। কাদবার মতো কিছু হয়নি।

একটু হলেই তো মারা পড়তেন।

হ্যাঁ। বেঁচে আছি দেখে সবাই অবাক।

ইস!

একটা অদ্ভুত ঘটনা কি জানেন?

কী ?

ওই সাম্ভাবিক অ্যাকসিডেন্টেও নাকি আমি একটা বাচ্চাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বাঁচিয়ে দিয়েছি।

সত্যি ?

আমি তো জানি না। যারা প্রত্যক্ষদর্শী তারা বলছে।

আমি সব শুনতে চাই।

অনেক সময় নিয়ে আসবেন। কাউকে বলবেন না কিন্তু।

॥ ১১৫ ॥

বিষ্ণুপদর শ্রাদ্ধাদি মিটে যাওয়ার এক মাস পর বলডিং হেডের শেষাংশ লেখা সাক্ষ হল। কপি সংশোধনের জরুরি কাজটা দিনরাত খেটে করতে হচ্ছিল কৃষ্ণজীবনকে। প্রকাশক আমেরিকা থেকে তাগিদ দিচ্ছে টেলিফোনে। প্রোগ্রাম এবং শিডিউল নিয়ে তাদের কারবার। টার্গেট ডেট তারা পেরোতে দেবে না। ভূতের মতো খাটছিল কৃষ্ণজীবন।

ঠিক এই জরুরি কাজের মাঝখানে রামজীবন একদিন এসে হাজির।

দাদা, একবার বিষ্ণুপুর না গেলেই নয়।

কেন রে, কী হল ?

ছোড়দা বড্ড হুজুত করছে। বাড়ির দোতলাটা নাকি বাবা ওকেই দিয়ে গেছে। এখন পারলে মাকে তাড়িয়ে দোতলার দখল নেয়। গায়ের কিছু লোকও ওর পিছনে আছে।

কৃষ্ণজীবনের মুখ রাগে রাঙা হয়ে উঠল। বলল, দোতলায় ওর তো কোনও দাবি থাকতে পারে না।

সে কথা বুঝছে কে! দিনরাত এমন অশান্তি, গালাগাল, চোঁচামেচি যে, মা বলেছে, ওরে, আমাকে ওদিককার দালানটায় নিয়ে যা। ও-ই এখানে থাকুক।

তা তো হতে পারে না। মা যতদিন বেঁচে আছে দোতলা ভোগ করবে মা।

তুই একবার চল। তোকে একটু ভয় পায়। মাঝে মাঝে আবার এও বলছে, আমাকে দু'লাখ টাকা দিয়ে দে, আমি দাবি-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি।

মজা মন্দ নয়।

সরস্বতীও তার বরকে নিয়ে মাশখানে এসেছিল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলল, তার ভাগ সে ছাড়বে না। বাড়ির একটা অংশ তারও চাই। সেও বলে গেছে, লাখখানেক টাকা পেলে দাবি ছেড়ে দিতে পারে। ওর বরটা খুব বিষয়ী লোক। পঞ্চায়েতে জিতেছে নিজের গায়ে।

কৃষ্ণজীবন কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকে।

রিয়া আলাচনাতা শোনেনি : চা দিতে এসে বলল, কী ব্যাপার রামজীবন, বিষয়সম্পত্তি নিয়ে গণ্ডগোল লেগেছে নাকি ? তটস্থ হয়ে রামজীবন বলল, আর বোল না বউদি, বাবা যেতে না যেতেই কুরুক্ষেত্র।

ওইজনাই তো ওকে বলেছিলাম বড় বাড়ি করতে যেও না। অত বড় বাড়ি দেখেই সকলের দাবি-দাওয়া উঠছে।

রামজীবন গম্ভীর হয়ে বলে, বিষয় হল বিষ। দোতলাটা একটেরে রেখে দেবো ডেবেছিলাম, তা আর হল না। দাদা যদি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পারে।

ওকে আর এ সবের মধ্যে টানা কেন ? জরুরি কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। তোমরা একটা মীমাংসা করে নাও।

রামজীবন বলল, আমার পরামর্শ হল, দাদা নিজেই দোতলাটা দাবি করে রাখুক। তা হলে বামাচরণের আর কিছু বলার থাকবে না।

কৃষ্ণজীবন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমার একটা ইচ্ছেও ছিল যে, কয়েক বছর পর বিষ্ণুপুরেই গিয়ে থাকব। তা আর সম্ভব নয় দেখছি।

কেন সম্ভব নয় দাদা ? খুবই সম্ভব। তুই শুধু নিজের ভাগটা বুঝিয়ে দিয়ে আয়। বামাচরণ যদি বুঝতে পারে যে, দোতলাটা তুই নিজের জন্য করেছিস তা হলে আর রা কাড়বে না।

মাকে শান্তিতে রাখতে হলে এরকমই কিছু একটা করতে হবে। কৃষ্ণজীবন বলল, তুই যা, আমি রোববারে যাব। আমি আপাতত বামাকে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, ওকে গিয়ে দিস।

রামজীবন চিঠি নিয়ে চলে গেল।

সেই চিঠিতেই কাজ হল। রবিবার কৃষ্ণজীবন বিষ্ণুপুরে পৌঁছে দেখে, বামাচরণ রামজীবনের তোলা পাক্ষা ঘরখানায় আশ্রয় নিয়েছে। চিঠি পাওয়ার পর আর গোলমাল করেনি। কৃষ্ণজীবনকে এসে একটা প্রণাম করে বলল, তুই যদি থাকিস তা হলে তো কথাই নেই।

বামার বউও এসে পায়ের ধুলো নিয়ে হাসি-হাসি মুখ করে বলল, আপনিই এখন আমাদের গার্জিয়ান। আপনি যা বলবেন তা-ই হবে।

সমস্যাটা যে এত সহজে মিটে যাবে তা ভাবেনি কৃষ্ণজীবন। সে খুশিই হতে যাচ্ছিল। কিন্তু রামজীবন তাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলল, আমাকে যে দোকান করার টাকা দিয়েছিস এখন সেটা নিয়েই ওরা খুব ভাবছে।

ভাবছে ?

ভাবছে মানে আলোচনা করছে। বউদি ছোড়দাকে বোঝাচ্ছে, এক ভাইকে দোকান করার টাকা দিলে আর এক ভাইকেও দেওয়া উচিত। ওরা তোর কাছে টাকা চাইবে।

কিন্তু বামা তো চাকরি করে।

তা করলেই বা। দোকান বউদি দেখবে। সে কথাও হয়েছে।

কৃষ্ণজীবন একটু দমে গেল।

রামজীবন বলল, আমি বলেছি দাদা দোকান করার টাকা আমাকে ধার হিসেবে দিয়েছে, দোকান থেকে যা লাভ হবে তা থেকে সুদ সমেত ফেরত দেবো। কথাটা বিশ্বাস করেনি। বলছে, আমরাও না হয় ধার হিসেবেই চাইব। টাকাটা একবার হাতে পেলে আর শোধ দেবে না কিন্তু। তুই একটু শক্ত থাকিস।

কৃষ্ণজীবন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। দুট মানসিকতা বলতে যা বোঝায় তার তা নেই। সংসারের বিকট চেহারাটা তার কোনও দিনই ভাল লাগে না। সে সহ্যই করতে পারে না লোভ, লালসা, মিথ্যাচার, সন্ধীর্ণতা।

বামাচারণের হাঁড়ি আলাদা। সেখান থেকে আজ কৃষ্ণজীবনের জন্য নানা ভাল পদ রান্না করে দিয়ে গেল শ্যামলী। বলল, ও বেলা আমার ওখানেই যদি দুটি ডালভাত খান তা হলে ভীষণ খুশি হই। আপনার সেবা করার সুযোগ তো পাইনি কখনও।

আপনি করার কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছিল না কৃষ্ণজীবন। ভিতরে ভিতরে যদিও তার একটা অনিচ্ছে হচ্ছিল। শুধু বলল, রাতে আমাকে কাজ করতে হয় বলে। বেশির ভাগ সময়েই আমি নামমাত্র খাই। হয়তো একটু সুপ, না হয়তো একটু ডাল। আজকাল রাতের খাওয়াটা কমিয়ে দিয়েছি খুব।

না হয় সুপই করে দেবো।

পারবে? বলে একটু হাসল কৃষ্ণজীবন। বলল, তার দরকার নেই। দু'খানা রুটি আর একটু ডাল সেক্ষ হলেই হবে।

মোটো? ওটুকু খেয়ে থাকলে তো শরীর পাত হয়ে যাবে।

তা কেন? কম খেলেই শরীর ভাল থাকে। বেশি খেলেই নানারকম ট্রাবল হয়। আর একটা কথা শোন, আমি আজকাল মাছ মাংস একদম খাই না। ওসব কোরো না বরং একটু স্যালাড কোরো। তা হলেই হবে।

আচ্ছা, তাই করব।

রাতে খাওয়ার সময়েই কথাটা তুলল বামাচারণ, দাদা, আমি একটা কথা ভাবছিলাম ক'দিন ধরে।

কী কথা?

আমার চাকরিটা তো কিছুই নয়। পিওনের আর কতই বা বেতন? তা ছাড়া মাঝে মাঝে শরীরটাও খাবাপ করছে আজকাল। যাতায়াতের ধকল সহ্য হয় না।

কৃষ্ণজীবন একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। কথাটা মিথ্যে নয়। বামা অনেক রোগা হয়ে গেছে। চেহারাটা একসময়ে বেশ ভাল ছিল। সুপুরুষ বলতে যা বোঝায়। এখন দড়কচা মেরে গেছে। মাঝে মাঝে মাথা খারাপ হয়ে যায়, তখন শরীর জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে পড়ে।

শ্যামলী বলল, জানেন তো, রামজীবনের গুণ্ডরা ওকে বেদম মেরেছিল। তখন মাথায় চোট হয়েছিল খুব। আর সেই থেকেই মাথার গণ্ডগোল।

কৃষ্ণজীবনের ভিতরটা একটা ব্যথায় ভরে গেল। ঘটনাটা সে শুনেছে। বামা যেমনই হোক, মার খাওয়ার কথা শুনে বড় কষ্ট হতে থাকে কৃষ্ণজীবনের। পৃথিবীতে কত অনভিপ্রেত ঘটনাই যে রোজ কত ঘটে? কেন যে ঘটে? সভ্যতার ইতিহাস তো কম পুরনো নয়, তবু মানুষ সভ্যতার এলাকাতেই টুকতে পারল না এখনও। শুধু বস্তুপুঞ্জ দিয়ে কি কিছু শ্রমাণ করা যায়?

শ্যামলী ধরা-ধরা গলায় বলল, এ বাড়িতে আমাদের পক্ষে তো কেউ নেই। আমরা হলাম একঘরে। ওকে মারার পর ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম। স্বপ্তরমশাই ভরসা দেওয়ায় ফিরে এসেছি। কিন্তু আপনার ভাইয়ের শরীরের অবস্থা ভাল নয়। অনেক ছুটি নিতে হয়েছে বলে আজকাল মাইনে কাটে। ওরও চাকরির আর ধকল পোষাচ্ছে না।

চোখ তুলে কৃষ্ণজীবন বলল, কী করতে চাও?

শ্যামলী চুপ করে রইল। বামাচারণ বলল, রেমা তো দোকান দিয়ে বসেছে। চলছেও ভাল। বিটুপুর এখন বেশ গঞ্জ জায়গা। লোকজনের যাতায়াত আছে। ব্যবসা করতে পারলে চলে।

শ্যামলী বলল, আপনার অনেক টাকা বাড়ির পিছনে খরচ হয়ে গেছে, রামজীবনকেও দোকান করতে টাকা দিয়েছেন। কোন মুখে যে আপনার কাছে হাত পাতব তা ভেবে পাচ্ছি না। আপনার ভাইয়ের ইচ্ছে একটা স্টেশনারী দোকান দিয়ে বসে। কিন্তু অত টাকা আমরা কোথায় পাব বলুন! আমার গয়না বেচে দু-চার হাজার টাকা হতে পারে। কিন্তু তাতে তো হবে না!

কৃষ্ণজীবন বড় বিব্রত বোধ করতে লাগল।

বামাচারণ বলল, লাখ খানেক টাকা ঢালতে পারলে ভালই হবে। কিন্তু আপাতত যদি কমের মধ্যেই করি তা হলেও পঞ্চাশ হাজারের নিচে হবে না।

কৃষ্ণজীবনের মুখে রুটির টুকরো ঠেকছিল। তার কারণ, সে জানে, শেষ অবধি সে এদের সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। লোভী, হয়ত অভাবে পড়েই হয়েছে, হয়ত টাকাটা শোধ দেওয়ার ইচ্ছে নেই, তবু কি পারবে কৃষ্ণজীবন না দিয়ে? রামজীবন বারণ করেছে ঠিকই, কিন্তু সে কি করে ঠেকাবে এদের?

কৃষ্ণজীবন শান্ত গলায় বলল, তুই পারবি দোকান করতে?

কেন পারব না? রেমা পারলে আমিও পারব। দোকান করা তো সোজা কাজ। আমার বিশ্রামও হবে।

শ্যামলী বোধ হয় ভাবল, টাকার অঙ্কটা বেশিই বলা হয়ে গেছে। হয়ত তত টাকা কৃষ্ণজীবন দিতে চাইবে না। সে বলল, আমরা ধারই চাইছি। দু-দশ হাজার কম হলেও কষ্টেস্টে দোকান খুলতে পারব।

কৃষ্ণজীবন খাওয়া শেষ করে বলল, ভেবে দেখব'খন। তবে একটা কথা বলে রাখি, রামজীবন কিন্তু মাত্র চল্লিশ হাজার টাকায় দোকানটা খুলেছে। তারও দশ হাজার টাকা দিয়েছে ও নিজেই।

বামাচরণ বলল, চট্রিশ হাজারেও হয়। দু-পাঁচ হাজার টাকা আমরাও জোগাড় করতে পারব। চাকরি ছেড়ে দিলে প্রতিভেন্ট ফান্ডের টাকাটাও পাওয়া যাবে।

ভাল করে ভেবে দেখ। ভেবে বলিস। আমি মাসখানেকের জন্য বিদেশে যাচ্ছি। ফিরে এসে একবার আসব।

বামাচরণ আর শ্যামলীকে নিয়ে মাথা ঘামাতে আর ইচ্ছে হল না কৃষ্ণজীবনের। মানুষের আগুণ আর দোষঘাটের কথ্য ভাবলেই তার মন খারাপ হতে থাকে। এসব ভাবনাকে তাড়ানো দরকার।

শীত পড়তে শুরু করেছে। তবে তেমন তীব্র কিছু নয়। খেয়ে এসে মায়ের সঙ্গে একটু কথা বলে গিয়ে একটা চাদর জড়িয়ে ছাদে উঠে এল সে। এখন কোনও মহান চিন্তা ছাড়া এইসব জাগতিক চিন্তাভাবনা থেকে মনকে মুক্ত করা যাবে না। কিছু অর্থক্ষতি পালক আছে। যাক, কিছু টাকা যাক। তবু মনটা যেন নীচুতলায় না থিতিয়ে থাকে।

আকাশ এখানে বড় পরিষ্কার। নক্ষত্রমণ্ডলী হীরের ঝাঁপির মতো ঢাকনা খুলে দিয়েছে। আকাশ তার প্রিয় বিষয়। ওই অন্ধকার ও নিস্তব্ধ জগতে আর কোথাও কি আছে পৃথিবীর মতো একটি সজীব গ্রহ? থাকলেই বা তা জানা যাবে কি করে? মানুষের বৈজ্ঞানিক প্রয়াস সীমাবদ্ধ রয়েছে সামান্য পরিধিতে। পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্রটিও চার আলোকবর্ষ দূরে। কোনওদিনই মানুষ আলোর গতি সঞ্চারণ করতে পারবে কি কোনও মহাকাশযানে? যদি-বা পারে তা হলে আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী সেই মহাকাশযান যেইমাত্র আলোর গতি পাবে অমনি সে নিজেই পর্যবসিত হবে এনার্জিতে। সে আর বস্তু থাকবে না। যদি দুর্মহতর কল্পনায় ধরে নেওয়া যায়, মানুষ তাও পারল, তা হলেই বা লাভ কি? সবচেয়ে কাছের নক্ষত্রটির পরিমণ্ডলে পৌছতেই লেগে যাবে চার বছর। মানুষ পারবে না যেতে ওই গতিতে। কারণ মানুষের শরীর ওই অবিশ্বাস্য গতিবেগ সহ্য করার উপযুক্ত নয়। তা হলে কোটি অর্ধ-খর্ব আলোকবর্ষ দূরে দূরে ছড়িয়ে থাকা কোটি কোটি নক্ষত্রপুঞ্জের কাছে কোনওদিনই পৌছবে না মানুষ। কখনও নয়। কিছুতেই নয়। কল্পবিজ্ঞানে কত কী হয়। কিন্তু মানুষের বিজ্ঞান এখনও সেই অসম্ভব কল্পনার ধারেকাছে পৌছয়নি। তার বিজ্ঞান ততদূর পৌছতে না পৌছতেই শেষ হয়ে আসবে পৃথিবীর আয়ুষ্কাল। আর সেই অন্ধকার গ্রহে চাপা পড়ে যাবে মানুষের কাব্য-দর্শন-বিজ্ঞান, কোপার্নিকাস-আর্কিমিডিস-প্লেটো-শেকসপীয়ার-সক্রেটিস-রবীন্দ্রনাথ-আইনস্টাইন, সবাই এবং সব কিছু। তবে কি বৃথাই মানুষের এই বেঁচে থাকা? বৃথা এই প্রকৃতির এত আয়োজন? বৃথা প্রাণ? বৃথা এই অন্বেষণ? বার্থ ও মূল্যহীন মানুষের যতক সম্ভব? বাণিজ্য ও নির্মাণ? প্রেম ও পরিবার? আত্মীয়তা-গৃহ-কর্মকাণ্ড?

ঠিক বোঝাও যায় না সব কিছু। হাতের নাগালেই যেন কোথাও রয়েছে সেই অমোঘ সত্য। একটু আড়ালে। কিন্তু কিছুতেই তার অবগুপ্তন মেনে চলা যায়নি আজও। আজও জানা গেল না মৃত্যু কি, জন্ম কেন? আজও জানা গেল না এই প্রাণবন্ধ্যার অর্থ কি! সেইজন্যই কি আকুল মনুষ্যকণ্ঠ প্রশ্ন করেছিল, হে সূর্য, উন্মুক্ত করো তোমার সত্যের মুখ, আমাকে দেখতে দাও সেই সত্যকে।

অনেক রাত অবধি ঝুম হয়ে ছাদে দাঁড়িয়ে রইল কৃষ্ণজীবন। যখন ঘরে এল তখন ভোর হতে আর বাকি নেই। মন প্রশান্ত। মন ভাসমান। না, বামাচরণ বা শ্যামলী সেখানে পৌছবে না কোনওদিন।

আর বিছানায় গেল না কৃষ্ণজীবন। ভোররাতে মাকে জাগিয়ে বলল, আমি যাচ্ছি মা।

ও মা! কিছু খেয়ে যাবি না?

না মা। দেরি হয়ে যাবে। তুমি ঘুমোও। আমি আবার আসব।

‘আবার আসব’ কথাটা আজ তার পিছু নিল। আবার আসব! সত্যিই কি আবার আসা যায় একবার এ জীবন ছেড়ে চলে গিয়ে? কে জানে! কিন্তু কেবলই মনে হয়, অলক্ষ্যে একটা আসা-যাওয়ার বৃত্তাকার চক্রমণ চলেছে কোথাও। প্রাণ থেকে প্রাণে, দেহে দেহান্তরে। আবার আসব—এ কথাটা মানুষের বড় প্রিয়।

কলকাতায় তার জন্য অপেক্ষা করছিল কয়েকটা ক্লাস, কিছু মিটিং, কনফারেন্স। অপেক্ষা করছিল কয়েকটা ছোটখাটো কিন্তু গুরুতর ঘটনাও। খাদে বাস পড়ে যাওয়ায় মরতে মরতে বেঁচে ফিরে এসেছে হেমাঙ্গ। আপাতত ঘরবন্দী। দ্বিতীয় খবর হল, সরকার বাহাদুর কৃষ্ণজীবনকে তিন বছরের জন্য জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত করেছেন। তৃতীয় খবর হল, চয়ন তার কণ্ঠে অর্জন করা কিছু টাকা পৃথিবীর ভালর জন্য দান করতে চায়।

তৃতীয় খবরটাই তাকে চমকে দিল সবচেয়ে বেশি। এক সন্ধ্যাবেলা তার মুখোমুখি দীন ভঙ্গিতে বসে এপিপেলটিক, টিউশনি-নির্ভর ছেলেরা যখন অসুখ গলায় তার ইচ্ছেটা প্রকাশ করল তখন বিশ্বাসই হল না তার। বলল, কী করতে চাও বললে?

দান করতে চাই। পৃথিবীর যাতে ভাল হয় এমন কাজে।

কত টাকা চয়ন?

প্রায় পঞ্চাশ হাজার।

এ টাকা তুমি জমিয়েছ?

হ্যাঁ। দশ বছর ধরে টিউশনি করছি। আমার বিশেষ খরচ তো নেই। টাকাটা জমে গেছে।

এই ভাবপ্রবণ, আবেগতড়িত প্রস্তাবে কৃষ্ণজীবন একটু হাসল। বলল, পৃথিবীর কিসে ভাল হবে তা কি তুমি জান?

আপনার কাছে শুনেছি। খানিকটা পড়েওছি ডারলিং আর্থ বইতে।

কৃষ্ণজীবন মাথা নেড়ে বলে, আমার এক ছাত্রও আমেরিকা থেকে ডলার পাঠিয়েছিল যাতে আমি পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য টাকাটা ব্যয় করি। আমি ভেবেই পাইনি কী করব! টাকাটা তাকে ফেরত পাঠাতে বাধ্য হই।

কাতর গলায় চয়ন বলে, আমার টাকাটা আপনি নিন। এ টাকাটা আমাকে খুব জ্বালাচ্ছে।

কেন চয়ন জ্বালাচ্ছে কেন? এরকম আদ্ভুত কথা আমি জীবনে শুনি।

চয়ন লজ্জিত একটু হাসি হেসে বলল, টাকাটা আমি এমনিতেও রাখতে পারব না। আমার দাদা টাকাটা চাইছে।

কৃষ্ণজীবন অবাক হয়ে চেয়ে থাকে তার দিকে। তারপর বলে, কেন চাইছে?

বলছে কি সব শেয়ারটোয়ার কিনবে। আমাকে লোভ দেখাচ্ছে, তাতে নাকি অনেক টাকা লাভ হবে।
কষ্ট করে টাকা জমিয়েছ, সে টাকা তোমার দাদা নেবে কেন? এ তো অদ্ভুত কথা।
ও টাকা আমি রাখতে পারব না, দাদা নিয়ে নেবে।
তোমার চিকিৎসার খরচ আছে, দুর্দিনের জন্য কিছু সঞ্চয়ও রাখা দরকার। টাকাটা দান করলে তোমার চলবে কি করে?
তা ছাড়া টাকাটা খুব কমও নয়, ইচ্ছে করলে এ টাকা দিয়ে একটা ছোটখাটো ব্যবসাও করতে পার।
চয়ন মাথা নেড়ে বলল, হেমাঙ্গবাবু আমাকে তাই বলেছিলেন। ব্যবসা আমার দ্বারা হবে না। আর আমার নিজের চলে যাবে। আমি চাই টাকাটা একটা ভাল কাজে লাগুক। আমি চেক কেটেই এনেছি। আপনার নামে।
দাও। বলে কৃষ্ণজীবন হাত বাড়াল। চেকটা হাতে নিয়ে দেখে বলল, তা হলে তোমার অ্যাকাউন্টটা আর কিছু রইল না?

না।
ঠিক আছে। বলে চয়নের লগ্নাটে শীর্ষকায় মুখখানার দিকে চেয়ে কৃষ্ণজীবন যেন একটি পবিত্র ভাবকে অনুভব করার চেষ্টা করল। গরিব যখন দান করে তখন বোধ হয় স্বর্গে ঘণ্টাধনি হয়।
কৃষ্ণজীবন অবশ্য চয়নের আড়ালে চেকটা কুচিকুচি করে ছিড়ে ফেলে দিল। আজ আবেগবশে টাকাটা দান করলেও, কে জানে, কখনও আশু ভবিষ্যতে ও বিপদে পড়বে কি না, টাকাটা ওরই থাক, তবে ওর অজান্তে।
পৃথিবীর ভাল কিভাবে হবে তা কি চট করে নির্ধারণ করা সম্ভব? পৃথিবীর ভালর জন্য চাঁদার খাতা খোলার তো দরকার নেই। চাই শুধু আরও একটু চৈতন্য। নড়েচড়ে বসা। বুদ্ধি শানিয়ে নিয়ে নয়, হৃদয়বস্তা দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করা, মানুষের যতকৈ কর্মকাণ্ড কোনদিকে নিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীকে।
সম্প্রতি লন্ডনের একটি বিখ্যাত ম্যাগাজিনে ডার্লিং আর্থ বইয়ের রিভিউতে এক সাহেব-পণ্ডিত কিছু প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করার পরই অভিযোগ করেছেন, এই বইয়ের লেখক নিজে বিজ্ঞানের মানুষ হয়েও মহাকাশ গবেষণার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। ইনি পৃথিবীকে পিছিয়ে নিতে চান পঞ্চদশ শতকে। মানুষ এতখানি এগিয়ে আসার পর কি আবার পিছু হটতে পারে?

রিভিউটা পড়ে কৃষ্ণজীবন সামান্য উত্তেজিত হয়ে একটা জবাবী প্রবন্ধ খাড়া করার চেষ্টা করছে। নাম দিয়েছে: ব্যাক টু ফিউচার, আডভান্স টু পাস্ট। গোটা মনুষ্য সভ্যতার ইতিহাসে যে মানুষের সভ্যতার অগ্রগমন ঘটেছে প্রযুক্তির ঘাড়ে চেপে সেটাকেই আক্রমণ করেছে সে। সে বলতে চেয়েছে, এগোনো মানে কী? এগোনো মানেই কি আরও কলকারখানা? আরও যন্ত্র-নির্ভরতা? আরও আরাম-আয়েস? অগ্রগমন মানে কি সমকামিতা আর বিবাহ বর্জন? অগ্রগমন কি মানুষকে বাঁচতে শিখিয়েছে? অনুধাবন করতে শিখিয়েছে প্রকৃতির নিয়মানুসারে জীবনের ধাঁচ গড়ে নিতে? সভ্যতা কি কান্ডজ্ঞান লোপাট করতে চায়? সভ্যতা কি মানুষের ঠোঁটে তুলে ধরা এক পাতা হেমলক?

প্রবন্ধ সে এক জায়গার সভ্যতার অভ্যন্তরে স্ববিরোধের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছে, টিভিতে দেখতে পাচ্ছি ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি, বটোর, রকেট, বোমার আক্রমণে গুড়িয়ে যাচ্ছে শহর, মরছে মানুষ। আবার তার ভিতরেই রেডক্রস এসে তুলে নিয়ে যাচ্ছে হতাহতদের, মানুষকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। একই সঙ্গে মানুষ দুটো কাজই করছে কি করে? মারা এবং বাঁচানোর চেষ্টা? এখনও পৃথিবীতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যুদ্ধাস্ত্র তৈরি হচ্ছে, চলছে মারণাস্ত্র তৈরির গভীর গবেষণা। এখনও অস্ত্রের বাজার রমরম করছে দক্ষিণী দেশগুলিতে। সভ্যতা তা হলে কত দূর এগোল? কোনদিকে এগোল?
আজকাল বড় অস্থির লাগে তার। ছুটে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। সে কি মানুষকে বোঝাতে পারছে না তার কথা?

১১৬

শীতের গুরুত্বই দাদা-বউদি বেড়তে গেল দক্ষিণ ভারতে। বাসা পাহারা দিয়ে রাখতে পারত চয়নই। কিন্তু চয়নকে ওদের বিশ্বাস নেই তেমন। বাড়িতে বহাল করে রেখে গেল বউদির এক বিধবা দিদিকে। একতলায় নতুন ভাড়াটে এসেছে। অল্পবয়সী চাকুরে এক দম্পতি। ভদ্রলোক বড় কোম্পানির সেলসে চাকরি করেন, স্ত্রী রাইটার্সে। এদের সন্তান হয়নি এখনও।

উপরতলায় চিলেকোঠায় চয়ন একা। রাঁধে, খায়, শুয়ে থাকে, কখনও আকাশের দিকে চেয়ে থাকে, কখনও দিগন্তহীন দিগন্তের দিকে। চারদিকে সংসারী মানুষজন। সে ভাল আছে, না মন্দ আছে তা বুঝতেই পারে না। তবে সে যে আছে ভীষণভাবে আছে তা নিত্য টের পায় শরীরের নানা আদি-ব্যাদি আর বেদনার ভিতর দিয়ে। টের পায় মূর্ছার পর জ্ঞান ফিরে এলে অসম্ভব দুর্বলতার ভিতর দিয়ে। কেন এই থাকা? কেন মুছে যাওয়া নয়? কেন মিলিয়ে যাওয়া নয়?

চয়ন বুঝতে পারে এ জীবনটাকে আর টেনে নিয়ে যাওয়ার মানেই হয় না। সে কি জীযন্ত? তার তো মনে হয় সে নিজের শবদেহ বহন করে চলেছে মাঝে। মৃত এ শরীরটা দিয়ে কী হবে তার?

তবু ভুলে থাকা যেত। ভুলিয়ে রেখেওছে নিজেকে সে বহুকাল। কিন্তু আজকাল বড় বন্ধুহীন, বড় একা হয়ে যাচ্ছে। এক জায়গায় যেন ঠেকে গেছে সে। নন্দমার জালিতে যেমন আটকে থাকে কলার খোসা ঠিক তেমন।

বিপদটা কে ঘটাল কে জানে! সম্ভবত অনিচ্ছিতার বাবা। লোকটা বোকা এবং সরল। চয়নের টাকার কথা কোনও সময়ে ওই লোকটাই গল্প করে গেছে অয়নের কাছে।

অয়ন একদিন সন্ধ্যের পর হানা দিল ছাদে। অপ্রত্যাশিত।

কি রে তোার খবর-টবর কি?

চয়ন খুবই অবাক হল। তাকে কুশল প্রশ্ন করার মানুষই নয় অয়ন। তুলনায় বরং বউদি কিছুটা ভাল ব্যবহার করে, কিন্তু অয়ন নয়। সে বলল, ভালই আছি।

শরীর ভাল আছে তো ? সেই যে অজ্ঞান হয়ে যেতিস ?

ওটা তো সারার রোগ নয় ।

অয়ন যেন চিন্তিত হয়ে বলল, তা হলে তো তোর জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করে রাখা উচিত ।

জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট শুনে কিছুই বুঝতে পারল না চয়ন । হঠাৎ জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট কথাটা আসছে কেন ? সে বলল, তার মানে কি ?

এসব অসুখ থাকলে সাধারণত জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করে রাখাই সেফ ।

চয়ন বলল, ও ।

ব্যাঙ্কে তোর কত টাকা আছে ?

এ প্রশ্নেও খতমত খেতে হল চয়নকে । সে বলল, আছে সামান্যই ।

যত সামান্যই হোক, তোর একটা কিছু হলে টাকাটা জলে যাবে । বুকেছিস ?

তা হলে কী করা উচিত ?

বলছি তো জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করে নে, আইদার অর সারভাইবার ।

চয়ন একটু ভড়কে গেল, জবাব দিতে পারল না ।

অয়ন বলল, সেভিংস অ্যাকাউন্ট নাকি ?

হ্যাঁ ।

মুখটা বিকৃত করে অয়ন বলল, সেভিংস আর কীই বা সুদ দেয়! টাকাটা পড়ে পড়ে পচে যাচ্ছে । তুই এত বোকা কেন ? চারদিকে কত নতুন নতুন স্কিম চালু হয়েছে ।

আমি তো খবর রাখি না ।

অয়ন বলল, সবচেয়ে ভাল অবশ্য ষ্টক এক্সচেঞ্জে টাকাটা খাটানো । শেয়ারের বাজারটা এখন খুব তেজি । একটু ক্যালকুলেশন করে লাগাতে পারলে ছাকা লাভ ।

কিন্তু চয়ন এ কথাতেও উদ্বুদ্ধ হল না । চুপ করে রইল । তার টাকার দরকার ঠিকই, কিন্তু টাকা-মনস্ক সে নয় । টাকার পিছনে ছুটতেও তার ভাল লাগে না ।

অয়ন বলল, তোর তো আর নেক্সট টু কিন কেউ নেই, আমরা ছাড়া । তুই তোর বউদি বা আমাকে জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে নিয়ে নে । তাতে টাকাটা অন্তত বেহাত হবে না । বুকেছিস ?

না, চয়ন বোঝেনি । আবার বুকেছেও । তার মাথাটা একটু ভেঁ ভেঁ করছিল । সে চুপ করে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারল না ।

অয়ন একটু ওপরওয়ালার মতো আদেশের সুরে বলল, বেশি দেরি করাটাও ঠিক হবে না । দু-চারদিনের মধ্যেই যা করার করে ফেলতে হবে । কোন ব্যাঙ্কে তোর অ্যাকাউন্ট ?

চয়ন অসহায়ের মতো বলে দিল । না বলে করেই বা কি ? শত হলেও সে তো অয়নের বাড়িতেই থাকে । শত হলেও অয়ন তার আপন দাদা ।

অয়ন বলল, অত ভাবছিস কেন ? টাকাটা ওভাবে ফেলে রেখে ভুল করছিস । টাকা-পয়সা সবসময়ে খাটাতে হয় । আজকাল বোকরাই ওভাবে টাকা ব্যাঙ্কে ফেলে রাখে ।

চয়ন কী বলবে ভেবে না পেয়ে হঠাৎ বলে ফেলল, আমি একটা ব্যবসা করব বলে ভাবছিলাম ।

ব্যবসা! কিসের ব্যবসা ?

এখনও ঠিক করিনি ।

কত টাকা আছে তোর ?

খুব বেশি নয় ।

লাখ টাকা তো আর নেই ?

না, না, হাজার পঞ্চাশেক হবে ।

ও টাকায় কিসের ব্যবসা হবে ? ওসব বুদ্ধি করতে যাস না । টাকা মার হয়ে যাবে । আমি ব্যাঙ্কের লোক, সব জানি । ব্যবসা করার অনেক হ্যাঁপা আছে । বরং শেয়ারের খাটালে লাভ, সেটাও ব্যবসা ।

চয়ন মাথা নেড়ে বলল, ভেবে দেখব ।

এতে ভাবাবিবার কী আছে ? টাকাটা আপাতত জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করে রাখ । আমি শেয়ারে খাটিয়ে তোর অ্যাকাউন্টেই আবার জমা করে দেবো । বুকেছিস ?

চয়ন বুকেছে এবং হাড়ে হাড়ে বুকেছে । ঘাড় নাড়ল ।

অয়ন সেদিনকার মতো এত অসহায় বলে ধরে নিয়েছে । কিন্তু তার মতলবটা খুব পরিষ্কার । অয়নের টাকাটা সে শেয়ারে খাটিয়ে কিছু ঘরে তুলতে চায় । তার পর টাকাটা শোধ না দিলেও চয়ন কিছু বলতে বা করতে পারবে না । অয়ন এসব ধরেই নিয়েছে । আশ্বর্য্যের কোনও উপায় চয়ন ভেবে পেল না । ফর্মটা সে আনমনে ছিড়ে ফেলে দিল ।

কিন্তু অয়ন আবার হানা দিল দুদিন পর, কি রে, ফর্মটা জমা দিয়েছিস ?

বুদ দুদ দুদ করছিল চয়নের । বলল, ছাত্রের পরীক্ষা ছিল, বড্ড ব্যস্ত ছিলাম ।

অয়ন একটু অবিশ্বাসের চোখে তার দিকে চেয়ে থেকে বলল, দুদিনেও সময় পেলি না ? নাকি অন্য কিছু ভাবছিস ?

কী ভাবব ?

মানুষের মনে কত কী থাকে!

চয়ন ভয় পেয়ে চুপ করে গেল।

অয়ন রাগ করল না। বলল, ওরে শোন, টাকাটা যদি মারও যায় তা হলে সেটা মায়ের পেটের ভাইই তো মারবে! অত ভয় পাচ্ছিস কেন ? আমি ছাড়া তোর নেস্টট টু কিন তো কেউ নেই। ভাল করে ভেবে দেখ, তোর কিছু হলে টাকাটা ব্যাঙ্কেই পড়ে থাকবে সাসপেন্ড অ্যাকাউন্টে, আমি তো জানতেই পারতাম না বাই চাপ খবরটা না পেলে। টাকার জন্য ভয়ের কিছু নেই। আখেরে তোর লাভই হবে। আমি নিজেও শেয়ারে টাকা খাটাইছি। তাতে ঠকছি না।

চয়ন তবু চুপ করে রইল।

ফর্মটা জমা দিয়ে দিস কিছু। বলে অয়ন চলে গেল।

পরদিন রবিবার সকালে এল বউদি। মুখভর্তি হাসি। হাতে এক বাটি মুড়িঘন্ট। গরম। বলল, এটা আজ ভাতের সঙ্গে খেও। বুঝলে ?

চয়ন অবাক হল। বলল, আবার ওসব কেন বউদি ?

এমনিই। খাবে তো ?

খাবো। রেখে যাও। এক কাজ করো আমার বাটিতে ঢেলে দিয়ে যাও।

ওমা! তা কেন ? তুমি খাও, পরে আমার ঝি এসে এঁটো বাটি নিয়ে যাবে।

বউদি টাকা দেওয়া বাটিটা তার ঘরের একধারে রেখে হঠাৎ চাপা গলায় বলল, তোমার দাদা তোমার টাকাগুলো শেয়ারে খাটাতে চাইছে, না ?

হ্যাঁ।

বউদি চাপা গলাতেই বলল, আজ ও সকালেই বেরিয়ে গেছে। বলে গেছে তোমাকে যেন রাজি করিয়ে রাখি। তুমি কি রাজি ?

চয়ন বিমর্ষ মুখে বলল, আমার কেমন ইচ্ছে হচ্ছে না বউদি।

বউদি বলল, দিও না চয়ন। টাকাটা ও জলে দেবে। মাথায় আজকাল কেবল শেয়ার ঘুরছে। মাথায় কে যে শেয়ারের পোকা ঢুকিয়েছে! তুমি অ্যাকাউন্ট অন্য ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার করে নাও!

তা হলে দাদা খুব রেগে যাবে।

তা রাগবে। তোমাকে বলি, সাত দিন বাদে আমরা মাসখানেকের জন্য বেড়াতে যাচ্ছি। এই সাত দিন কোনওরকমে ঠেকিয়ে রাখো। পারবে না ?

চেষ্টা করব।

তোমার কষ্টের টাকা এভাবে নষ্ট হবে ভাবতেই আমার খারাপ লাগছে।

চয়ন তার বউদির দিকে একটু অবাক চোখে তাকাল।

বউদি বলল, আমি তোমার চোখে কেমন তা জানি। আমাকে খুব খারাপ ভাবো তো! ভাল আমি নইও। তবু জেনো, আমি তোমার শত্রু নই। সংসারের নানারকম অশান্তিতে নিজেকে ঠিক রাখতে পারি না। তোমার দাদার সঙ্গে আজকাল রোজ ঝগড়া হচ্ছে। কেন যে ও এত টাকা টাকা করে বেড়াচ্ছে আজকাল কে জানে!

দাদাকে কী বলব বউদি ?

তা কি আমি জানি ? তুমিই ভেবে দেখো।

আমার মাথায় কোনও বুদ্ধি আসছে না।

আমি একটা রিক্সা নিতে পারি।

কী রিক্সা ?

আমি তোমার দাদাকে বলব যে, তুমি রাজি হয়েছ এবং সব ঠিক আছে। তাতে তোমার দাদা একটু নিশ্চিন্ত থাকবে। বেড়াতে যাওয়ার আগে বোধ হয় টাকাটা তুলবার চেষ্টা করবে না। কারণ এ সবুজটা ওর নানা কাজ আছে। ব্যস্ত থাকবে। বুঝে ?

হ্যাঁ।

আমি যে বারণ করেছি তা বোলো না কিছু।

না বউদি। দাদা কিন্তু ঠিকই বলে। তোমরা ছাড়া আমার তো আপনজন কেউ নেই। দাদা বলছিল, হঠাৎ আমার কিছু যদি হয় তা হলে টাকাটা মার যাবে।

মাগো! অমন কথা বলেছে ও ? ছিঃ মৃগীরোগ নিয়ে কত লোক কত কি করছে। মৃগী রুগী বলেই ওরকম ভাবতে হয় নাকি ?

চয়ন চুপ করে থাকে।

বউদি বলে, ও খারাপ কথা বলেছে তোমাকে। মোটেই ওরকম বলা উচিত হয়নি।

বউদি চলে যাওয়ার পর আকাশপাতাল ভারতে বসল চয়ন। টাকাটা এক মাসের জন্য বাঁচালেও শেষ অবধি অয়নের থাবা থেকে টাকাটা বাঁচানো যাবে না, চয়ন জানে। তার তেমন প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই। টাকাটা শেয়ারের বাজারে গাঁটগন্ডা যাওয়ার চেয়েও কি কোনও মহৎ উপায়ে ব্যয় হতে পারে না ? টাকাটা জলে ধরে নিয়েই সে চিন্তা করল, টাকাটার একটা ভাল গতি হওয়া দরকার।

আজ সে অনেকটাই তৃপ্ত। টাকাটা যোগ্য হাতে গেছে। কৃষ্ণজীবন এই পৃথিবীটাকে ভালবাসেন। প্রাণপণে তিনি মানুষের সর্বনাশকে বাঁধ দিয়ে আটকানোর একটা চেষ্টা করছেন। পঞ্চাশ হাজার টাকা হয়তো কিছুই নয়, তবু এই পৃথিবীর জন্য তো কিছু একটা অবদান থাকল চয়নেরও।

আজ সকালে শীতের কবোফ রোদ নেই। হাওয়া দিচ্ছে, আকাশ মেঘলা। ঠুঁড়ি ঠুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে মাঝরাতে থেকে। চয়নের মন ভাল নেই।

আজ সকাল থেকে ঘরে শুয়ে শুয়ে মরার কথাই ভাবছিল চয়ন। বেঁচে থাকার প্রলম্বিত যন্ত্রণা তাকে রোজই পীড়িত করে আজকাল। এই জীবন যাপন করে যাওয়ার অর্থ কি? কেন তাকে বেঁচে থাকতেই হবে?

ভাবতে ভাবতে মৃত্যুর এমন প্রেমে পড়ে গেল যে সে নিজের মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করতে পারল। নিশ্চিত তাঁর মৃত্যু ঘটবে আত্মহত্যার পথে। সবচেয়ে সহজ উপায় কোনও হাইবাইজ বাড়ির ছাদে উঠে চোখ বুজে লাফিয়ে পড়া। সেইভাবেই মরবে স্নে। ঠিক করে ফেলল।

বেলা নটা নাগাদ যখন বিজ্ঞান ছেড়ে উঠল তখনই সিঁড়িতে লঘু পায়ের শব্দ। এবং তার পরেই তার দরজায় এসে যে দাঁড়াল তাকে এই মেঘলা দিনে প্রত্যাশাই করেনি সে। অনিন্দিতা।

অনিন্দিতা ঝলমলে হাসি হেসে বলল, কেমন আছ চয়ন?

চয়নের মনটা হঠাৎ আনন্দে ভারে গেল। সত্যিকারের খুশির হাসি হেসে বলল, তুমি এই বৃষ্টি মাথায় করে কোথা থেকে এলে?

চৌকির এক পাশে বসে অনিন্দিতা আগে বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাল। তারপর বলল, গতকাল পিসির বাড়িতে এসেছিলাম। আজ ফিরে যাওয়ার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করে যাচ্ছি। অনেক দিন তোমাকে দেখিনি।

তোমাকেও কতদিন দেখিনি অনিন্দিতা! তুমি চলে যাওয়ার পর থেকেই আমি একদম বন্ধুহীন।

সত্যি? আমি না থাকায় তোমার খারাপ লাগে?

খুব খারাপ লাগে।

তোমার কি শরীর খারাপ?

মুখটা একটু বিকৃত করে চয়ন বলল, শরীরই তো আমাকে খেয়ে ফেলছে। সারাক্ষণ শরীরের কথা ভাবতে ভাবতে আমি কি পাগল হয়ে যাবো অনিন্দিতা?

কেন, তোমার নতুন করে আবার কী হল?

আজকাল ফ্রিকোয়েন্ট অ্যাটাক হয় এপিলেপসির! কেন হয় তা বুঝতে পারি না। আজ একটু আগেই ভাবছিলাম, বেঁচে থাকা মানে যন্ত্রণাই যদি হয় তা হলে যন্ত্রণাকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি? আমি সুইসাইডের কথা ভাবছিলাম।

ছিঃ চয়ন! তোমাকে আমি খুব বকব আজ। কেন ওসব ভেবেছ তুমি? তোমার বেঁচে থাকাটা বুঝি শুধু তোমারই প্রয়োজন?

আর কার?

ভাল করে ভেবে দেখ তো, তোমাকে কেউ সত্যিকারের ভালবাসে কি না।

চয়ন অনাবিল হেসে বলল, তুমি বাসো।

তা হলে? বলে সেই ঝলমলে হাসিটা হাসল অনিন্দিতা।

কে জানে কেন আজ অনিন্দিতাকে বড় ভাল দেখাচ্ছে। স্বাস্থ্য হয়তো ভাল হয়েছে কিছুটা। একটা চটক এসেছে মুখশ্রীতে।

অনিন্দিতা বলল, ওখানে গিয়ে কিন্তু আমরা বেশ ভাল আছি। একটা বাগান করেছি। আমি ফুলের চর্চা করি, মা করে তরকারির চাষ। পলিউশন নেই। গ্রাম-গ্রাম ভাব। বেশ লাগে। সবচেয়ে ভাল লাগে কী জানো?

কী?

সকালে পাখির ডাক। কত পাখি যে আসে!

তোমার শরীর একটু সেরেছে।

সেরেছে মানে? মাঝখানে তো মুটিয়ে যেতে শুরু করেছিলাম। আমাদের নার্সিং হোমে একজন যোগ টিচার আসেন। তার কাছে রেন্ডলার ব্যায়াম আর আসন শিখছি।

মানুষ বেঁচে থাকতে ভালবাসে বলে বেঁচে থাকার জন্য কত কিছু করে। ব্যায়াম, আসন, ডায়েটিং। চয়নও কি বেঁচে থাকতে ভালবাসে না? খুব বাসে। কিন্তু তার জীবন তো অন্যের মতো নয়।

কী ভাবছ চয়ন?

কত কি! আমি তো সারা দিন ভাবি।

আমার সব অপরাধ কি ক্ষমা করেছ চয়ন?

অপরাধ! বলে চয়ন অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, কিসের অপরাধ?

ভুলে গেছ বুঝি? বাঁচলাম। আমি তো ভাবি চয়ন আমার সব খারাপ স্মৃতি মনে রেখেছে, আমার ভালটুকু ভুলে গেছে।

আমার স্বরণশক্তি খুব ভাল। তোমার কিছুই ভুলিনি। ভাবতে গেলেই সব ফোটে। প্রাফের মতো চোখের সামনে ভেসে ওঠে। রোগা-ভোগা লোকদের বোধ হয় শরীরের কারণেই স্মৃতিশক্তি প্রখর হয়।

স্মৃতিশক্তি এমনিতেই অনেকের ভাল হয়। তুমি কবে আমাদের বাড়ি বেড়াতে যাবে চয়ন?

কবে যাবো? যাবো একদিন।

নাঃ ওসব এড়ানো কথা। চলো না একদিন, তোমার খারাপ লাগবে না, এখানে তো একা মুখ বুজে পড়ে থাকো। ওখানে গেলে একটু কথা-টোকা তো বলতে পারবে। আজ যাবে?

আজ? নাঃ আজ মেঘলা করেছে।

তাতে কি? মেঘলা দিনে কি লোকে ঘরে বসে আছে? আমিও তো যাবো বাড়ি। চলো না চয়ন।

চয়ন ভাবছিল। সিদ্ধান্ত নিতে তার দেরি হয়।

অত ভেবো না, ভাবলে আর হবে না। চलो তো, উঠে পড়ো।

তা হলে একটু বোসো। আমি এখনও মুখে চোখে জলও দিইনি।

ঠিক আছে, বসছি। তুমি যাবে ভাবতেই এত আনন্দ হচ্ছে আমার। মা-বাবা ভীষণ খুশি হবে।

উত্তর চব্বিশ পরগনায় গঙ্গা মতো জায়গায় অনিন্দিতাদের বাড়ি। পাকা বটে, কিন্তু চেহারার দৈন্য তাতে ঘোচেনি। কিন্তু দৈন্য ঘুচিয়েছে সতেজ গাছপালা, দুর্বোধ্যাস আর আলো-হাওয়া। বাড়িটাকে কী যত্ন করে পরিষ্কার রাখে ওরা।

চয়নকে দেখে সত্যিকারেরই খুশি হলেন অনিন্দিতার মা আর বাবা। মা বারবার বলতে লাগলেন, তোমাকে ছেলের মতোই দেখি বাবা, ছেড়ে এসে মনটা খারাপ লাগত। চোখে জল এসেছে কতবার!

সত্যি ?

সত্যি নয় ? ওদের জিজ্ঞেস করো। ভাবতাম চয়নটা কী খায় কী পরে কে জানে! শরীর খারাপ হলে তো কেউ খোঁজও নেবে না।

চয়নের মন থেকে মৃত্যুচিন্তা উবে গেল। পৃথিবীর এই একটা কোণে এখনও তার জন্য তিনটি উত্তপ্ত হৃদয় উন্মুখ হয়ে থাকে। তার আর বেশি দরকার কি ? এটুকুর জন্যই কি বেঁচে থাকা যায় না। হয়তো যায়। ভেবে দেখবে চয়ন।

॥ ১১৭ ॥

নিমাইয়ের পাঠানো টাকা দু'মাস ধরে নিচ্ছে না বীণাপাণি। ছেলেটা টাকা নিয়ে আসে, বীণা দ্বিতীয় মাসে বলেই দিল, টাকা আর নেবো না। ওকে গিয়ে বোলো আর যেন না পাঠায়।

নিমাইয়ের সঙ্গে একটা মিটমিট তো করতেই চেয়েছিল বীণাপাণি। নির্লজ্জের মতো চাকরি চেয়েছিল ওর কাছে। বিষ্ণুপুর থেকে বাবার শ্রাকের পর ফেরার পথে একটা রাত বনগাঁয়ে থাকতে অনুরোধ করেছিল। তা নিমাই পাঠা দিল না। টাকা হয়ে লেজ ফুলেছে। সকলেরই হয়, নিমাই কি আলাদা রকমের হবে ? অত যার গুমোর তার টাকা হাত পেতে নেবে, এমন বেহায়া এখনও হয়নি বীণা।

একর একটা পেট চলে যায়। কিন্তু বেশিদিন কি যাবে ? পয়সাকড়ি তলানিতে এসে ঠেকেছে। এক পয়সাও যায় নেই। বীণা তো আর মানুষের বাড়িতে ঝি-গিরি করতে পারবে না। কুসুম একটা চাকরির প্রস্তাব এনেছিল। বেবি-সিটিং। সারা দিন বাচ্চা সামলাতে হবে, তিন শো টাকা। কিন্তু কেন যেন ইচ্ছে হল না। তার নিজের বাচ্চা নেই, বাচ্চা মানুষ করার অভিজ্ঞতাও হয়নি। কুসুমকে বলল, ও আমি পারব না। বেবি-সিটিং করতে হলে নিজের বাচ্চা মানুষ করার অভ্যাস থাকলে হয়।

কুসুম দুট্ট হাসি হেসে বলল, তোমারই বা হল না কেন বোলো তো ?

আহা! তখন নাটক-নাটক করে দম ফেলার সময় নেই। বাচ্চা হলে পারতাম ?

কিন্তু এখন তো বুঝছ, একটা কুঁচো-কাঁচা থাকলে কত ভাল হত!

কথাটা বীণারও খুব মনে হয়। নিমাই মুখচোরা মানুষ, কিন্তু এক-আধবার সেও বলেছে, একটা বাচ্চা হলে হত।

উল্টে ধমক দিয়েছে বীণাপাণি, দুটো পেটেরই জোগাড় হয় না, আর একটাকে এনে কষ্টের মধ্যে ফেলি আর কি!

আসল কথা তখন ফিগার-টিগারের কথা খুব মনে হত বীণার। যাত্রায় পরিশ্রম তো কম নয়। তার ওপর সিজনের সময় কোথায় কোথায় চলে যেতে হত। বাচ্চা থাকলে পারত ওসব ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, হয়নি বলে আমার দুঃখ নেই। অভাবের সংসারে তো কষ্টই পেত।

কুসুম চোখ বড় করে বলল, আর অভাবের দোহাই পারছ কেন গো বীণাদি ? নিমাইদার কি পয়সার অভাব ?

নিমাইদার পয়সা নিমাইদারই, আমার তো নয়।

তুমি নাও না কেন ?

বীণা একটু চুপ করে থেকে বলে, আজা বুঝতে পারছি সে আমাকে ঘেন্না করে। আমার বাতাসটাও সে সইতে পারে না।

কী যে বোলো না তুমি! নিমাইদা কি সেরকম মানুষ ?

আমি ঠিকই বুঝি। আমি যা বুঝি তা কি তোরা বুঝতে পারবি ? এ বুকটায় আজ বড় জ্বালা।

এবারও কি টাকা ফিরিয়ে দিলে ?

দিলাম। ওর টাকা আর নেবো না। বাঁধন যখন কেটেই গেছে তখন কোন লজ্জায় টাকা নেবো বল ?

এ বাঁধন কি কাটে ?

ওসব তোসের সেকলে ধারণা। অগ্নিসাক্ষী, নারায়ণসাক্ষী ওসবেরও কোনও মানে হয় না। মেয়েদের ভয় খাওয়ানোর জন্য ওসব চালাকি করা হয়। যাতে স্বামীর সঙ্গে বুঝতে না পারে। আজকাল কত ধর্মের বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে।

সব বিয়েই তো আর ভাঙছে না।

সব বিয়ে ভাঙবে কেন ? সকলের-কি সমান কপাল ?

কুসুম একটু চুপ করে থেকে বলল, সকলের কথা ছেড়ে দাও। তোমারটা নিয়ে ভাবো।

ভাবাবিধির কিছু নেই। বিয়ে আমার সইল না।

ওরকম করে বোলো না তো! আমার খারাপ লাগে। তোমার বিয়ে মোটেই ভাঙেনি। ছাড়াছাড়ি হওয়ার মানেই কি ভাঙা ? স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কত মন কষাকষি হয়।

এ তো সে নয়। ও আমাকে মন থেকে উপড়ে ফেলেছে।

তাহলে কি ফি মাসে টাকা পাঠাত ?

দয়ার্ধর্ম নেই সে কথা তো বলিনি। কিন্তু বউ কি শুধু দয়ার পাত্রেী ? আর কিছু নয় ? আমি তার দয়ার দান নেবো কেন ? তার আগে কি একগাছা দড়ি এ গলার জন্য জুটবে না ?

বভ্র মন খারাপ করে দাও তুমি। টাকাটা ফিরিয়েই বা দিচ্ছ কেন ? ফিরিয়ে দিলে বুঝি নিমাইদার অপমান হয় না ? একবার ফিরিয়ে দিয়েছ, তা সত্ত্বেও তো পরের মাসে পাঠিয়েছে!

বললাম তো, এ সব ওর দয়া।

কুসুম আর কিছু বলল না। কিন্তু দিন তিনেক বাদে কাঁচরাপাড়ায় দিদির বাড়ি যেতে হয়েছিল তাকে, দিদির ছেলের অনুপ্রাণনের নেমস্তন্ত্রে। পরদিন গিয়ে নিমাইকে তার দোকানে ধরল।

এই যে নিমাইদাদা, কেমন আছ ?

ওরে বাবা, এ যে কুসুম! আয় আয় বোস এসে। গরম চপ ভাজা খা দুটো।

খাওয়ার কথা পরে হবে। তোমার সঙ্গে ঝগড়া আছে।

ঝগড়া! না দিদি, সে পেরে উঠব না। জন্মে কারও সঙ্গে ঝগড়ায় এঁটে উঠিনি। তা বৃত্তান্তটা কী ?

তোমার বউ তো শুকিয়ে মরতে বসেছে, তা জানো ?

নিমাই একটু গম্ভীর হল। একটু বিষণ্ণ। বলল, তার কর্মফল আমি কি করে খণ্ডাই বলতো! যাত্রার চাকরিটা গেল। আমার টাকা নিচ্ছে না। এখন উপায় কী ?

উপায় অনেক আছে।

কী উপায় ?

তুমি অন্য লোকের হাতে টাকা পাঠাও কেন ? নিজে যেতে পারো না ?

কেন, বীণা কি তা নিয়ে কিছু বলেছে ?

তা বলেনি, তবে সে অভিমানী মানুষ। মনে হয় ওভাবে টাকা নিতে তার মানে লাগে।

নিমাই একটু ভেবে বলল, কিন্তু আমার যাওয়াটা কি ঠিক হবে ?

কেন হবে না ?

নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমি একজন পরপুরুষই তো হয়ে গেছি এখন। ভাবি, গেলে হয়তো আর কারও আঁতে লাগবে।

ওমা! কার কথা বলছ ?

সজলবাবুর কথাই বলছি। এই তো কালও এসে গেলেন। কবিরাজি কাটলেট করে খাইয়ে দিলাম। বীণাকে বিয়ে করবেন বলে বড় উচ্চাটন হয়ে পড়েছেন।

কুসুম একটু স্তব্ধ থেকে বলল, বীণাদিও কি তাই বলেছে তোমাকে ?

না। সে উল্টো কথাই বলে। তবে হয়তো লজ্জায়।

নিমাইদা, সজল কিছু ঠিক কথা বলছে না।

বেঠিক বলছে ?

কুসুম একটু দ্বিধাশ্রু হয়ে বলল, সজলবাবু যায় আসে ঠিকই। কিন্তু সম্পর্ক ওরকম হলে আমি জানতে পারতাম।

নিমাই উদাস গলায় বলে, আমার তো বেশি কিছু জানারও নেই। বিয়ে করতে চাইলে করুক না। সজলবাবু বলছেন, বিয়ের পর দুজনে মিলে যাত্রার দল খুলবেন। কিছু টাকা চান। আমি বলেছি, যাত্রাদল খোলার মতো টাকা আমার নেই। তবে দশ-বিশ হাজার হয়তো পেরে যাবো। টাকা যাক, তবু বীণা তো মনের মতো কাজ নিয়ে থাকতে পারবে। তার কাছে আমার মেলা ঋণ।

ছাই ঋণ! তোমাকে দুর্দিনে দেখেছে, সে তো বউ আর বর নিজেদের জন্য করেই। ওরকম ভাবে বলেই তো তোমরা কেউ কারও আপন হতে পারো না। একে অন্যের জন্য করবে বলেই তো বিয়ে, অত ভদ্রতা কিসের ? তোমার সব ভাল, কিন্তু ওই বিগলিত ভাবটা ভাল নয় কিন্তু। ঋণ-টিন কিছু নেই তোমার। আর শোনে, যার বউ পরে টেনে নিয়ে যায় সে কিন্তু মোটেই উঁচুদের লোক নয়। সজল এখানে আসে আর তুমি জোড়হাত করে তাকে কবিরাজি খাওয়াও, এ কেমন কথা! থাণ্ডা কষাতে পারো না।

ওরে বাপ রে! তোর যে দেখি আজ রণচণী মূর্তি।

আমার বভ্র রাগ হয় তোমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে। যেমন দেবা তেমনি দেবী। আচ্ছা, একটা সত্যি কথা বলবে ?

বল না!

তোমার কেউ নেই তো!

তার মানে ?

বলি, কাউকে পছন্দ-টছন্দ করে বসানি তো এর মধ্যে ?

নিমাই খুব হাসল, বলে কি রে পাগল! আমি কি মেয়েমানুষের দিকে তাকাই ? তবে বিয়ের প্রস্তাব যে আসেনি তা নয়। কিন্তু নাকে খত দিয়ে রেখেছি, ও পথে আর নয়।

যাক বাবা, বাঁচা গেল। ওদিকে বীণাদিদিও এইসব ভেবে ভেবে অস্থির। টাইফয়েডের সময়ে নাকি প্রায়ই স্বপ্ন দেখত যে, তুমি ফের বিয়ে বসেছ। একবার তো ঘুম থেকে উঠেই আমাকে তোমার কাছে তচ্ছুনি পাঠায় আর কি। বলল, যা গিয়ে দেখে আয় তো সত্যিই বিয়ে করেছে কি না।

নিমাই হাসল না। করুণ মুখ করে বলল, ওরকম সন্দেহের কোনও কারণ নেই।

সে আমি বলেছি। নিমাইদাদা সেরকম লোক নয়। তবু তার সন্দেহ যায় না। শোনো, কালই যাও। নিজের হাতে টাকাটা দিয়ে দেখ নেয় কি না। তার ধারণা তুমি তাকে ঘেন্না করো।

ছি ছি। কেউর জীব, তাকে ঘেন্না করব কি রে! আমার তো নেড়ি কুকুরটাকেও ঘেন্না হয় না।

সে কথাটা বুঝিয়ে দিয়ে এসো। তা বলে নেড়ি কুকুরের কথাটা তুলো না। তোমার তো আক্কেল নেই।
যাবো'খন।

না না। খন বললে হবে না। কালই যাও। হাতে একটু সময় নিয়ে যেও। গিয়ে ছুটোপাটি করে চলে এসো না। দুটো কথা বলার যেন সময় পায় বেচারি।

আমি গেলে টাকা নেবে?

নেবে। তার অবস্থা ভাল লাচ্ছে না। গিয়ে আবার বলে বোসো না যেন যে আমি কাঁচরাপাড়ায় এসেছি। তাহলে ভাববে আমিই তোমাকে পাঠিয়েছি। তুমি ভাবখানা করবে যেন নিজের গরজেই গেছে।

খুব হাসল নিমাই। বলল, অত শেখাচ্ছিস কেন? আমি তেমন আহাঙ্ক নই। এখন চপ খা।

দাঁড়াও। কথা এখনও শেষ হয়নি। বীণাদিকে নিয়ে ফের ঘর করবে তো!

নিমাই একটু ভাবিত হল। বলল, দেখ, ওসব তো চুকেবুকেই গেছে। ঘর করার মতো মন বীণার আর নেই। একবার বারমুখো হয়ে পড়লে মেয়েদের আর ঘরে মন বসতে চায় না।

তুমি তো সবজাত্তা কি না, খুব মন বসবে। তাকে একটা সুযোগ দাও।

মাথা নেড়ে নিমাই বলে, আমারও মনটা মরে গেছে কি না। আর কেমন যেন সম্পর্কটায় বিশ্বাস হয় না।

কাতর গলায় কুসুম বলে, ওরকম বোলো না গো। বীণাদিকে তো রোজ দেখছি। কত যে কাঁদে, কত যে পেড়ে তা তুমি জানো না।

সে তার যাত্রাদলের জন্য কাঁদে রে। আমার জন্য নয়। আমি যখন তার কাছে থাকতাম তখনও কি আমাকে মানুষ বলে মনে করত? ছিলাম অনুদাস। অতগুলো ডলার আর পাউন্ড নিয়ে চেপে বসেছিল, একবারটি বিশ্বাস করে আমাকে বলেনি পর্যন্ত।

এখন চপ খাওয়াও তো।

চপ খেয়ে কুসুমের মুখে হাসি ফুটল। বলল, বড্ড ভাল তো। আদাকুচি, হিং আরও কী কী সব দিয়েছ। খুব স্বাদ হয়েছে। এইজন্যই না তোমার দোকান এত চলে। আহা, এরকম একখানা দোকান বনগাঁয়ে থাকলে বেশ হত!

কুসুমকে আরও কয়েকটা পদ খাওয়াল নিমাই। কুসুম আহ্লাদে আটখানা। গরিবের মেয়ে, মরা জিব। ভাল-মন্দ বিশেষ জোটে না। সুখাদ্য খেয়ে আজ যেন মুখখানা আলো হয়ে গেল।

মুখ ধুয়ে মশলা মুখে দিয়ে কুসুম বলল, নিমাইদাদা, তোমার টাকা হয়েছে, সে ভগবানের দয়। কিন্তু তোমারটা খাবে কে বোলা তো! এত তো করলে, জন না থাকলে কি হয়? আমি বলি কি, বীণাদিকে ঘরে নিয়ে এসো। সে তো তোমার চাকরিও করতে চেয়েছিল।

তুই বললেই তো হবে না। তারও মতামত আছে। সেও তো একটা আন্ত মানুষ।

আচ্ছা সে নয় হল। তোমার অমত নেই তো!

আগে ভাবতে দে।

কুসুম চলে যাওয়ার পর সত্যিই ভাবতে বসল নিমাই। খুব ভাবল। ছোট্ট একটা মেয়েকে সেই যে বিয়ে করে আনল সেই দিনের ঘটনা থেকে এ পর্যন্ত সব ঝুঁটিনাটি ভাবল নিমাই। বিয়ের সময়কার সেই কিশোরীর চোখে ছিল স্বপ্ন। বুকভরা অসহায় ভালবাসা। নিমাইকে পেয়ে যেন উথলে উঠত। তারপর অভাবে কষ্টে সেই ভালবাসা মরল। নিমাইকে বাঁচাতে যাত্রাদলে গেল আর তখনই খানিকটা হাতছাড়া হয়ে গেল বীণা। আবার কিছুটা ফিরে পাওয়া গেল অন্যরকম বীণাকে। তাদের দাম্পত্য জীবনে অনেক রকম সম্পর্কের রদবদল হয়েছে। এখন বড় দূরের হয়েছে সম্পর্ক। বীণাকে এখন ছেড়ে দিতেই পারে নিমাই। কিন্তু তাতে বীণার কতটা ভাল হবে?

পরদিন সকালেই বনগাঁ রওনা হল নিমাই।

বীণার চেহারা এতই খারাপ হয়ে গেছে যে, তাকে দেখে চেনাই যায় না। মুখ শুকিয়ে এইটুকু। শরীরটাও যেন রোগা হয়ে ফুঁকড়ে গেছে। বীণা কোনওদিনই লম্বাচওড়া ছিল না। ছোট গড়নের বীণা রোগা হয়ে যাওয়ায় দেখাচ্ছে যেন বালিকার মতো। কিন্তু মুখে গভীর বিষণ্ণতা আর হতাশা তাকে বুড়িয়েও দিয়েছে অনেক।

দেখে বুকে একটা ধাক্কা খেলো নিমাই। সে জিজ্ঞেসই করল না, কেমন আছ? দরকার নেই। বীণা যে ভাল নেই তা তো দেখেই বুঝতে পারছে।

দরজাটা ছেড়ে দিয়ে বীণা বলল, ভিতরে আসবে কি? নাকি নষ্ট মেয়ের ঘরে ঢুকলেও তোমার জাত যাবে!

এই চিমটি-কাটা কথাটার জবাব দিল না নিমাই। জুতো ছেড়ে সে ঘরে ঢুকল। সেই আগের মতোই সব আছে। তবে দৈন্যদশটা আজ চোখে পড়ল নিমাইয়ের। বোধ হয় সে নিজে আজকাল ভাল থাকে বলে এ ঘরটার দারিদ্র্য তার বেশি করে চোখে লাগছে।

বিছানার একধারে সন্তর্পণে বসল নিমাই। কিছু বলল না।

বীণা জানালার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বসল, একটা খবর দিয়ে আসা উচিত ছিল। আচমকা দেখে আমি এত চমকে গেছি যে, বুকটা ধড়াস-ধড়াস করছে। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।

চমকে গেলে কেন?

তুমি কখনও আসবে বলে ভাবিনি তো!

মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল নিমাইয়ের। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, অম্বলটা কি খুব হচ্ছে নাকি আজকাল?

হ্যাঁ। আজকাল যেন জলও সহ্য হয় না।

খুব খালি পেটে থাকো বোধ হয়?

এ কথাটার জবাব দিল না বীণাপাণি। জবাবের দরকারও নেই। মেয়েরা একা হলে খাওয়াদাওয়ার ঠিক থাকে না। নিজের জন্য কে আর কষ্ট করে, এরকম একখানা ভাব নিয়ে হয়তো একবেলা রান্নাই চড়াল না। খিদে পেলে চা খেয়ে খিদে মেরে দিল।

ঠাকুরের আসনের দিকে চেয়ে দেখছিল নিমাই। মেলা পট আর ছবি গাদাগাদি করে রাখা। সামনে ফুল, বাতাসা, জল, নিবে-যাওয়া ধূপকাঠির দানি।

পূজোআচ্ছা করো বুঝি আজকাল ?

ও আমার পুতুলখেলা।

নিমাই একটু হাসল। চারদিকে চেয়ে দেখে বলল, মেঝেটা এর মধ্যেই ফেটেফুটে গেছে দেখছি।

হ্যাঁ। গাঁথনি তো তেমন নয়। ইট পেতে সিমেন্টের পলস্তার দিয়েছিলাম। ও কি টেকে ?

ঠাণ্ডা জল আছে ?

এ কথায় বীণা একটু শিউরে উঠল যেন। চাপা গলায় বলল, এ মা! ছিঃ ছিঃ! তোমাকে জলই দিইনি।

বলেই আবার থমকাল, অমার হাতে খাবে তো জল ?

কেন, দোষ হবে নাকি ?

হবে না! আমি তো নষ্ট মেয়ে।

নিমাই কিছু বলল না। বুকটা ব্যথিয়ে আছে। বীণা একটানা স্টিলের পরিষ্কার গেলাসে মাটির কলসি থেকে জল গড়িয়ে দিল।

জলটা খেয়ে নিমাই বলল, ডান হাতের আংটিটা কোথায় ?

নতমুখী বীণা একটু চুপ করে থেকে খুব চাপা গলায় বলল, গত মাসে বেচতে হয়েছে।

নিমাই থম ধরে রইল। বিয়ের সময় তারা অনেক কষ্ট করে ওই আংটিটাই নতুন বউকে দিতে পেরেছিল আশীর্বাদ হিসেবে। অল্প সোনার পলকা আংটি। বীণা যখন জল দিত, ভাত দিত তখন বরাবর নজরে পড়েছে নিমাইয়ের।

চা করবো ?

নিমাই একটু ভেবে বলল, করতে পারো। তবে শুধু এক কাপ। আমি খাবো। তুমি খাবে না।

বীণা একটু হাসল। বলল, তাই হবে। কিন্তু চা-পাতা ভাল নয়। তোমার ভাল লাগবে না। সত্যি চা তো।

আমার কি বাহাবাছি আছে ? নেশাও নেই। তবু করো একটু।

বীণা চায়ের সঙ্গে দুখানা বিকুটও দিতে পারল না। কোনওদিন বিকুট ছাড়া চা দেয়নি। আজ ভিতরে ভিতরেও বীণাপাণি ক্ষয়ে গেছে। অহংকারটুকু কি আছে এখনও ? সেটাই ধরতে পারছে না নিমাই। পোড়া কপালের কথা হল, তার নিজের চোখটাই আজ বড় ঝাপসা। বড় কষ্ট হচ্ছে বীণার জন্য। এ তার বউ ছিল বটে, কিন্তু আজ যেন মাঝখানে গহীন সমুদ্র।

চা করার সময়টুকু একটু ফাঁক পেল নিমাই। কী বলার আছে বীণাকে তার ? কিছু দিনের সম্পর্কহীনতায় তারা কি পরস্পরের কাছে পর হয়ে গেছে। আড় ভাঙছেন। লজ্জা-লজ্জা করছে। কথা আসছে না।

কমদামী চা-পাতা দিয়ে খুব যত্নে চা করে আনল বীণা। নিমাই বসে বসে চা খেল। খারাপ লাগল না। চা শেষ করে বলল, একটা কথা বলতে আসা।

বলো।

সজলবাবু একটা দল খুলতে চান। টাকার জন্য ঘোরাঘুরি করছেন। তোমার মত আছে বলে বলছেন। এমন কথাও বলছেন যে, আমাকে সেই যাত্রাদলের অর্ধেক হিস্যাদার করে দেবেন।

সভয়ে বীণাপাণি বললে, মা গো! এত মিথ্যে কথাও বলতে পারে মানুষ!

উনি যে সত্যি কথা বিশেষ বলেন না তা বুঝতে পারছি। সেইজন্যই তোমার কাছে যাচাই করে গেলাম।

আর কী বলেছে ?

ওইসব পুরনো কথাই।

ও বোধ হয় আমার নামে তোমার কাছে দুর্নামও করে, তাই না ?

না তো! সজলবাবু তোমার খুব প্রশংসাই করেন।

ওর কোন কথাই বিশ্বাস করো না। কিছু করার জন্য এত মরিয়া হয়ে উঠেছে যে ওর বুদ্ধি লোপ পেয়েছে।

ও কি তোমার কাছে আসে ?

না, আমি ওকে আর বিশ্বাস করি না। আসতে বারণ করে দিয়েছি।

মানুষটা খারাপ নন। তবে অভাবে স্বভাব নষ্ট।

ওকে টাকাপয়সা দিও না। নষ্ট করবে।

বড় নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে আছেন পেছনে। কী যে করি। চক্ষুলজ্জা বলেও তো কথা আছে।

চক্ষুলজ্জা! বলে বীণাপাণি রাগের গলায় বলল, চক্ষুলজ্জায় পড়ে একটা জোক্তোরকে টাকা দেবে! এসব কী কথা!

নিমাই খুব সংকোচের সঙ্গে বলল, আমি বড় দুর্বল মানুষ বীণা। লোক বিপদে পড়ে এলে আমার নিজের অতীতের কথা মনে হয়। ভাবি, কিছু সাহায্য করলে হয়তো এ লোকটা দাঁড়িয়ে যাবে।

বীণা তার দিকে একটু রুগ্ন চোখে চেয়ে বলল, দয়াদাক্ষিণ অনেক দেখাতে পারবে। কিন্তু তার জন্য সজল কেন ?

নিমাই বীণার চোখে চোখ রাখল। অনেকক্ষণ। তারপর বলল, আমাকে পাহারা দেবে কে বীণা ?

বীণা মাথা নত করল। ফের জানালার কাছে গিয়ে বাইরে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আজ তোমার রান্নার জোগাড় তো কিছু দেখছি না!

ক্ষীণ কণ্ঠে বীণা বলল, এখনও তো বেলা হয়নি। মোটে দশটা বাজে। আরও পরে রান্না চড়াই।

আজ কী রাঁধবে ?

কেন, তুমি খাবে ?

খেলে ?

রাঁধব । যা চাও রাঁধব ।

নিমাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হঠাৎ বলল, দোকানপাটে ধারদেনা কত আছে ?

বীণা একটু চুপ করে থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, আছে কিছু । শ' পাঁচেক হবে বোধ হয় । কেন ?

এভাবে চলবে না ।

না চললে উপায় হবে ।

কী উপায় ?

সে আছে ।

মরার কথা ভাবছ নাকি ?

ভাবলে ? বলে জানালার কাছ থেকে ফিরে তাকাল বীণা ।

নিমাই বীণার দিকে চেয়ে থেকে থেকে বলল, চেহারাটা তো নষ্ট করেছেই, রঙটাও কত কালো হয়ে গেছে ।

এসব যাওয়ার জন্যই । সব যাবে ।

নিমাই দুধারে মাথা নেড়ে বলল, তা হয় না ।

ঘন্টা দুই বাদে পাড়াপড়শিরা দেখল একটা সুটকেস আর গোটানো বিছানা পায়ের কাছে রেখে রিক্সায় পাশাপাশি বসে নিমাই আর বীণাপাণি বাস-রাস্তার দিকে যাচ্ছে । ঠিক যেমন গা-গল্গের নতুন বিয়ের বর-বউ বিয়ের পর বরের বাড়ি আসে । নতী বীণাপাণির মুখে যে কে নতুন কনের মতো লজ্জা মাখিয়ে দিয়েছে কে জানে !

॥ ১১৮ ॥

আপনি কি ভেবে দেখেছেন যে, এইসব প্রেম-টেম এবং বিয়ে-টিয়ে আর কতদিন সমাজপতির টিকিয়ে রাখতে পারবেন! একবিংশ শতকে কেমন হবে নর-নারীর সম্পর্ক ? দাম্পত্য জীবন বলে কিছু থাকবে ? থাকবে লাইফ-লং পার্টনারশিপ ?

ঝুমকি খুব সিরিয়াস মুখ করে বলল, কেন থাকবে না ?

সামান্য উত্তেজিত হেমাঙ্গ বলে, কী করে থাকবে ? ভারতবর্ষের এক কোণে বাস করে কি পৃথিবীর ট্রেড বোঝা যায় ?

ঝুমকি বলল, কেন যাবে না ? আমরা বুঝি পৃথিবীর খবর রাখি মা ?

তাহলে কী করে বলছেন যে, এসব থাকবে ?

থাকবে, কারণ মানুষ বারবার তার জীবনে একটা রিনিউয়াল ঘটায় । অনেক প্রথা অভ্যাস ভেঙে ফেলে । কিন্তু আবার সেগুলোকেই আঁকড়ে ধরে ।

হেমাঙ্গ যেন চিন্তিতভাবে ঝুমকির মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে, আপনি কি প্রগতি পছন্দ করেন ?

প্রগতি একটা ভেগ টার্ম । স্পেসিফিকালি বলুন, প্রগতি বলতে কোনটা!

চিন্তিত হেমাঙ্গ বলে, আমিও কি ছাই জানি! এই যা সব হচ্ছে আর কি ।

অনেক কল্প নতুন হচ্ছে, আবার পুরনোও থেকে যাচ্ছে তো । শুধু আমেরিকাই তো নেই, পৃথিবীতে ভারতবর্ষও তো আছে ।

হেমাঙ্গর ভাঙা শরীর জোড়া লেগেছে । বা পায়ে সামান্য একটু খোঁড়ানো ছাড়া আর কোনও দৃশ্যমান ক্রটি নেই । বা হাত কিছু কমজোরি । ফিঞ্জিও খেরাপি চলছে । আশা করা হচ্ছে মাসখানেকের মধ্যেই সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে যাবে । ঝুমকি গত দু' মাস ধরে রোজ বিকেলের দিকে আসত, সঙ্গে মাকে নিয়ে । কখনও কখনও একাও । গত সাতদিন হেমাঙ্গ অফিস করছে বলে আসা কমিয়েছে । শনি আর রবিবার সন্ধ্যার দিকে আসে । দুপুরে চলে যায় । এখনও তাদের মধ্যে আপনি সম্বোধন রয়ে গেছে । দৃশ্যত দু'জনে পরস্পরের দিকে এক চুলও এগোয়নি ।

ঝুমকি এক কাপ দুধে কফি গুলে এগিয়ে দিল হেমাঙ্গকে । হেমাঙ্গ কফিটায় একটা চুমুক দিয়ে বলল, ভারতবর্ষ কি পাল্টে যাচ্ছে না ? ব্রিটিশ আর আমেরিকান কালচার বরাবর ভারতবর্ষকে দূর থেকে রিমোট কন্ট্রোল করে ।

আপনি তো নিশিপুরে গিয়ে মাঝে মাঝে থাকেন । সেখানে কী দেখতে পান বলুন তো ?

ওঃ, গ্রামের কথা আলাদা । সেখানে অন্যরকম ।

গ্রামই তো ধরে রাখবে ।

সবগে মাথা নাড়ে হেমাঙ্গ, গ্রাম দুর্বল । দেশের কালচারে তার প্রভাব খুব কম ।

আচ্ছা, আজ আমরা এসব নিয়ে আলোচনা করছি কেন ?

হেমাঙ্গ একটু হেসে বলল, আমারই দোষ । কাল রাতে কী হল জানেন । একটা ক্যাসেট চালিয়ে গভীর রাতে মাইকেল জ্যাকসনের রক শুনছিলাম । শোনা এবং দেখা । দেখতে দেখতে মনে হল, এ লোকটা মূর্তিমান অ্যান্টি-কালচার, অ্যান্টি-এসথেটিকস, অ্যান্টি-মিউজিক । কী অশ্রীল সব জেসচার । এর জন্য দুনিয়া এত পাগল কেন ? এ লোকটা সারা পৃথিবীর কালচারে পচন ধরিয়ে দিচ্ছে না কি ? তার পর থেকেই মাথাটা এক লাইনে ভাবতে শুরু করে দিল ।

মাইকেল জ্যাকসনেরও হয়তো কিছু গুণ আছে ; আমরা তত বুঝি না বলে রস পাই না । কিছু না থাকলে লোকটা কি এত পপুলার হত ?

অসহায়ভাবে হেমাঙ্গ ঠোট উল্টে বলে, কে জানে! আপনি ওর গান শুনছেন এবং দেখেছেন কি ?

হ্যাঁ । তবে আপনার মতো রেগে যাইনি ।

ঝুমকি মুখ টিপে হাসল এবং হেমাঙ্গ অপ্রতিভ বোধ করতে লাগল ।

এক একদিন তাদের এক এক বিষয় নিয়ে কথা হয় । যেমন পরের রবিবার বা পায়ের স্বাভাবিকতা যখন অনেকটাই এসে গেছে তখন ঘরের মধ্যে হাঁটাইটি করতে করতে হেমাঙ্গ বলল, আচ্ছা ঝুমকি নিশিপুর কেমন লাগে আপনার ?

ঝুমকি বড় বড় চোখ করে বলল, নিশিপুর! কেন, বেশ তো জায়গাটা ।

না, না, ওরকম দায়সারাতাবে বলবেন না । আমি জানতে চাই নিশিপুর একটা রোমান্টিক জায়গা কি না ।

ঝুমকি একটু ভেবে বলল, হুঁ । রোমান্টিকই তো । কিন্তু মতলবটা কী ? নিশিপুর যাওয়ার ইচ্ছে নাকি ?

কতদিন যাইনি বলুন তো!

আগে হান্ড্রেড পারসেন্ট সেরে উঠুন । তারপর যাবেন ।

না, আমার তাড়া নেই । আমার শুধু মনে হয়, নিশিপুরে নদীর ধারে আমার ঘরখানা হা-পিতোশ করে আমার জন্য অপেক্ষা করছে ।

ঝুমকি একটু হাসল । বলল, নিশিপুর তো আর কেউ কেড়ে নিচ্ছে না ।

কাতর ভয়ে ঝুমকির দিকে তাকিয়ে হেমাঙ্গ বলল, নিশিপুরের বাড়িটার জন্য আমার বড় মায়া । বুঝলেন!

জানি তো!

আমি ওখানে মাঝে মাঝে পালিয়ে যাই বলে সবাই আমাকে বকে । আমার মা'র তো ধারণা আমি সাধু হওয়ার তালে আছি । আমার পার্টনাররা বলে, আমাকে নাকি নিশি-তে পেয়েছে । চারুদি তো সবসময়ে যাচ্ছেতাই বলছে । অথচ দেখুন, নিশিপুর একটা মুকি, একটা ছুটি । আমার যে কী ভীষণ ভাল লাগে!

একটু বিবশ হয়ে গেল ঝুমকি । আবেগতড়িত, ছেলেমানুষ এই লোকটিকে কি এইজন্যই তার এত ভাল লাগে ? মানুষটির ভিতরে একটা গভীর ব্যাপার আছে, মুগ্ধতা আছে । টাকা, কেরিয়ার, সাফল্য একে এখনও ছিবড়ে করে ফেলেনি ।

ঝুমকি সামান্য নরম করে বলল, কয়েকটা নতুন ধরনের ফুলের গাছ লাগাতে হবে । গেট-এর ওপর একটা লতা । আর একটা তুলসীমঞ্চ ।

হেমাঙ্গ অবাক হয়ে বলে, কিছু বললেন ?

ঝুমকি হেসে ফেলল, বলছিই তো! আপনি শুনলেন না ?

নিশিপুরের বাড়ির কথা ?

হ্যাঁ । সাজিয়ে নিলে আরও সুন্দর হবে । মাটিটা তো খুব ভাল, কেন যে ভাল ভাল গাছ লাগাননি!

হেমাঙ্গর চোখমুখ আলো হয়ে গেল । আবেগকম্পিত গলায় বলল, উঃ, একটা ভীষণ দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছিল ।

কিসের দৃষ্টিভঙ্গি ?

চারুদি বলছিল, আপনি নাকি নিশিপুর পছন্দ করেন না ।

চারুমাসি নিজেই করে না, তাই বলছে ।

আবার এক শনিবার দু'জনের দেখা হল হেমাঙ্গর বাড়িতেই । হেমাঙ্গ অনেকটাই সেরে উঠেছে । বা পায়ের ঝোড়ানিটা একদম নেই । মন দিয়ে একসারসাইজ করে সে । গরম-ঠাণ্ডা কমপ্রেস নিচ্ছে । মালিশ করতে বিশেষজ্ঞ আসছে । শনিবার যখন ঝুমকি এল ম্যাসিওর লোকটি তখন বিদায় নিচ্ছে । ঝুমকিকে বলল, আর দিন পনেরো ম্যাসাজ করলেই হবে । অলমোস্ট নরম্যাল ।

তাকে দেখেই আজ হঠাৎ খুব লজ্জা পেয়ে হেমাঙ্গ বলল, আমার মা আপনার জন্য একটা জিনিস পাঠিয়ে দিয়েছেন ।

ঝুমকি অবাক হয়ে বলে, তাই নাকি ?

এতে কিন্তু আমার কোনও ভূমিকা নেই । আপনি কিন্তু কিছু মনে করতে পারবেন না ।

হেমাঙ্গ ড্রয়ার থেকে একটা চ্যাপটা গয়নার বাস্ক বের করে ঝুমকির হাতে দিয়ে বলল, এইটে ।

ঝুমকি বাস্কটা খুলে অবাক হয়ে গেল । একটা সাবেক ভারী নেকলেস । লকেটে হিরের সেটিং । অন্তত বারো-চোদ্দ ভরি ওজন ।

কিছু মনে করলেন না তো!

ঝুমকি জবাব দিল না । নেকলেসটা গলায় পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একটু দেখল নিজেকে । তারপর হঠাৎ হেমাঙ্গর দিকে ফিরে বলল, কেমন দেখাচ্ছে ?

হেমাঙ্গ সলজ্জ চেখে চেয়ে দেখে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, এসব কি আধুনিক মেয়েরা পরে ?

আমি জিজ্ঞেস করেছি কেমন দেখাচ্ছে ।

ভালই তো!

ঝুমকি ফের আয়নায় নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল একটু । এমন স্বাভাবিক হাবভাব যেন নেকলেস পেয়ে সে একটুও অবাক হয়নি । হেমাঙ্গর দিকে ফিরে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, একটু পরে থাকি নেকলেসটা ?

হ্যাঁ । কিন্তু ওসব জিনিস পরে রাস্তাঘাটে চলাফেরা না করাই ভাল । ছিনতাইবাজরা পিছু নেবে ।

নিক না । আজ আমি এটা পরেই বাড়ি যাবো ।

হেমাঙ্গ সভয়ে বলল, সর্বনাশ!

যাবোই ।

হেমাঙ্গ বলল, তাহলে আমি গাড়ি করে পৌছে দিয়ে আসব।
গাড়ি চালানো এখনও বারণ, খেয়াল আছে ?
বারণ ছিল, এখন আর নেই। ডাক্তার কাল বলেছে এখন একটু-আধটু চালাতে পারি।
তার দরকার নেই। নেকলেসটা এখন এখানেই থাকবে।
হেমাঙ্গ নিজের নখ দেখছিল। খুব সলাজ ভাব। হঠাৎ মিনমিন করে বলল, আচ্ছা নর-নারীর সম্পর্কের মধ্যে গুরুজনদের এই যে ঢুকে পড়া এটা আপনার কেমন লাগে ?
কে, আমার তো বেশ ভালই লাগে। এরকমই হওয়া উচিত।
আপনি কিন্তু বেশ সেকলে আছেন।
সেকলেদের কি অপছন্দ নাকি ?
না না, তা বলছি না। বলছি, নরনারীর সম্পর্কে তো আজকাল তাদের একান্তই নিজস্ব ব্যাপার বলে ভাবা হচ্ছে পৃথিবীতে। এর মধ্যে আত্মীয় বা গুরুজনদের কোনও ভূমিকা থাকার কথা নয়। সেটাকে ইন্টারফ্যারেন্স বলে মনে করা হচ্ছে। তাই না ?
আমার তা মনে হয় না। আপনার বুঝি মনে হয় ?
হেমাঙ্গ খুব লজ্জিত হয়ে পড়ল। তারপর আরও মিনমিনে গলায় বলল, আসলে আমি একশ শতকের জীবনযাত্রার প্যাটার্নটার কথা ভাবছি। কি কি থাকবে, আর কি কি থাকবে না। পৃথিবী তো আন্তে আন্তে লজ্জাহীন হয়ে যাচ্ছে। সুইডেনে এমন সব দৃশ্য দেখেছি যে আমার একসময়ে নরনারী সম্পর্ক নিয়েই একটা রিপালশন তৈরি হয়েছিল।
একটু কড়া গলায় ঝুমকি বলল, সুইডেনে আর কখনও যাবেন না।
হেমাঙ্গ একটু ভড়কে গিয়ে বলল, আমি মোটেই যেতে চাইছি না। কিন্তু বলছি রোমান্স জিনিসটা তো পৃথিবী থেকে ধীরে ধীরে লোপাট হয়ে যাচ্ছে। দেখুন না, এখন বাঙালি ছেলেমেয়েরাও কত ফ্রিলি মেলামেলা করে। তাদের মধ্যে সেই রোমান্টিক ভীতু-ভীতু ভাবটা আর নেই। দে টক ফ্রিলি অ্যাবাউট এডরিথিং...। অল সর্টস অফ সেক্রেট থিংস।
ঝুমকি একটু হাসল। বলল, আমি কিন্তু সেকলে।
এ কথায় কে জানে কেন, আর এক দফা লজ্জা পেল হেমাঙ্গ।
হেমাঙ্গ এর পরের তিন দিন ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ল আর একটা সমস্যা। সমস্যাটা হল রোমান্টিক প্রেমটা বিয়ের পরই উবে যায়। আর রহস্য-রোমাঞ্চ থাকে না, প্রেমিক-প্রেমিকারা হয়ে যায় সাদামাটা স্বামী-স্ত্রী এবং তখন সহ রহস্যের সমাপ্তি। একটু ফাঁক, একটু দূরত্ব, একটু পিপাসা না থাকলে এই রহস্যময়তা টিকবে কি করে ? এমন কোন উপায় আছে যাতে স্বামী এবং স্ত্রী হয়েও নারী-পুরুষ পরস্পরের কাছে প্রেমিক-প্রেমিকার মতো ভীষণ আকর্ষক থেকে যেতে পারে ? এ বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে পারল না সে এবং ক্রমশ অস্থির হল।
সমস্যাটা অতঃপর টেলিফোনেই সে নিবেদন করল ঝুমকিকে। রাত দশটায়।
ঝুমকি বোধ হয় একটা হাই চাপবার চেষ্টা করে বলল, আচ্ছা এ ব্যাপারটা ভেবে দেখব।
সত্যি ভাববেন ?
হঁ।
এটা আপনার কাছেও কি প্রবলেম বলে মনে হয় ?
এখন হচ্ছে।
আচ্ছা আর একটা কথা।
কী ?
আমি দুদিন ধরে গাড়ি চালিয়ে অফিসে যাচ্ছি।
সাবধান কিন্তু। অনেক দিন অভ্যেস নেই।
না, কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। বলছিলাম, আগামী কাল অফিসের পর কি আপনাকে পিক-আপ করতে পারি ?
পারেন।
তাহলে ছটায় ? গোলপার্ক ননম্বর টার্মিনাসে।
তা কেন ? বাড়িতে এলেই তো হয়।
একটু লজ্জা করছে।
কিছু লজ্জার নেই। কাল কী রঙের শাড়ি পরতে হবে ?
নীল। কিংবা আপনার যা ইচ্ছে।
না, নীলই পরব।
তাহলে ছটায় ?
হ্যাঁ। কিন্তু বাড়িতে আসবেন। মা বোধ হয় কাল আপনার জন্য কোনও খাবার তৈরি করবে।
আরে! উনি কি জানেন যে আমি ফোন করছি ?
হ্যাঁ। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে।
ছিঃ ছিঃ। লজ্জা করছে। আমি কি খুব বেহায়া ?
মোটেই নয়। শুধু একটু রোমান্টিক।
যন্ত্রণাটা তবু হেমাঙ্গকে ছাড়ছে না। ফোন করার পর সে রাতে অনেকক্ষণ জেগে রইল। জীবনের এই একটা সময় কেটে যাবে। শেষ হবে বৃকের দুর্দুর্ক। তারপর শুরু হবে পুরনো হওয়া। বহু বহু পুরনো, ব্যবহৃত, জীর্ণ হয়ে যাওয়া। এর কি কোনও মানে আছে ?

তুফ্রবার বিনা নোটসে অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে হোমাস্ চল এল নিশিপুর। যেন হাজার বছর পর।
বাসন্তী খবর পেয়ে দৌড়ে এল, ওমা গো! দাদাবাবু যে!
আহ্লাদে সে আটখানা। ঘরদোর সাফ করাই ছিল। তবু আবার ঝঁটিয়ে, মুছে, বিছানা পাততে পাততে বকবক করতে
লাগল মেলা। বলল, এবার এমন কামাই দিলে ভাবলাম বুঝি দাদাবাবুর নিশিপুরের শখ মিটে গেছে। আর বুঝি এমুখো
হবে না।

বাকি মিঞা এল আরও রাতের দিকে। একমুখ হাসি।

এলেন তাহলে? খবর সব শুনেছি।

কী শুনলে?

বিডন স্ট্রিটে গেয়েছিলাম গেল হুয়ায়। মা ঠাকরোন সব বললেন।

হোমাস্ লাজুক হাসল। মায়ের ওই দোষ। সব কিছু সবাইকে বলে দেয়।

বাকি মিঞা বলল, তা আমিও ঠাকরোনকে বললাম যে, পাত্রী খুব সরেস হয়েছে। আমরা দেখেছি কি না। একটু
রোগার দিকে হলেও তারি মিঠে চেহারাখানা। স্বভাবও ভাল। ঠাকরোন খুব খুশি।

বাসন্তী রুটি সেকতে সেকতে গোল গাল চোখ করে শুনছিল। হঠাৎ বলল, সে-ই তো গো দাদাবাবু, না? উঃ, সে
বড্ড ভাল। ইস আমার যে কী আনন্দটাই হচ্ছে!

হোমাস্ মদু হেসে বলল, আনন্দের চোটে রুটি পুড়িয়ে ফেলিস না।

অনেক রাত অবধি এই শীতে পারঘাটে বসে রইল হোমাস্। এখানে খুব শীত আর হাওয়া। হোমাস্ গ্রাহ্য করল না এই
শীত। মনের যন্ত্রণা নিয়ে বসে রইল চুপ করে। সামনের অন্ধকার উত্তরোল নদী। দামাল হাওয়া। একটু কুয়াশার মসলিনে
ঢাকা আকাশ। এই বিপুল বিস্তারের সামনে একা, নির্জন, ছোট হয়ে বসে থেকে হোমাস্ অনেক ভাবল। আকাশ-পাতাল।
ভাবনার কোনও মাথামুড় নেই। পাগলামিতে ঠাসা। তার একটা জীবন শেষ হবে। শুরু হবে কি অন্যতর জীবন? কেমন
হবে সেটা? একজনের সঙ্গে জোড় বাঁধা এমন কি ঘটনা একটা? তবু তার মন ভাল নেই।

উত্তাল বাতাস এসে তার সব এলোমেলো করে দিতে চায় যেন, এই বিপুল বিস্তার আর ওই অন্ধকার থেকে আসে
প্ররোচনা; পালাও। কেন বাঁধা পড়বে সংসারে?

পালিয়েই এসেছে হোমাস্। ঝুমকিকে কিছুই জানায়নি। কাল শনিবার। ঝুমকি তার বাড়িতে এসে তাকে না-পেয়ে
অবাক হবে খুব। বিরক্ত হবে? উদ্ভিগ্নও কি? হোক। একটু হোক। হোমাস্ কেন এত দায়ভার নেবে? সে কি মুক্ত মানুষ
নয় একজন?

অনেক রাত্রে ঘরে ফিরে ঘুমলো হোমাস্। বেলায় উঠল। উঠেই মনে হল, ঝুমকি তার বাড়িতে এসে গেছে কি
এতক্ষণে? কেমন হয়েছে তার মুখখানা হতাশায়?

বাসন্তী চা করে দিল, কীগো দাদাবাবু, এমন শুকনো মুখে কী ভাবছ?

একটা মাথা নেড়ে হোমাস্ বলল, কিছু না।

শরীর খারাপ নয় তো!

হোমাস্ একটু হাসল। বলল, আচ্ছা বাসন্তী, আমি কি একটু পাগল?

বাসন্তী হি হি করে হেসে ফেলে বলে, তোমার মাথায় পোকা আছে।

তাই?

হ্যাঁ। পোকা না থাকলে কেউ নিশিপুরে এসে পড়ে থাকে? বাকচাচা বলে, তুমি নাকি মস্ত মানুষ। মেলা লেখাপড়া
জানো, মেলা টাকা।

দুপুরের দিকে ঝুমকি যখন বাড়ি ফিরে এল তখন তার শুকনো মুখ দেখে অপর্ণা বলল, কী হয়েছে রে? ঝগড়া
করেছিস নাকি হোমাস্‌র সঙ্গে?

ঝুমকি অবাক হয়ে বলল, ঝগড়া করবার জন্য তাকে পাওয়া গেলে তো! কাল অফিস থেকে বেলা বারোটায় বেরিয়ে
গেছে, আজও ফেরেনি। কাউকে কিছু বলেও যায়নি। ফটিকদা বলছে, ঠিক নিশিপুরে গেছে।

বড্ড পাগল। কী যে করি ওকে নিয়ে! ওর ঘাড় থেকে নিশিপুরের ভূত নামানো দরকার।

ঝুমকি মাথা নেড়ে বলল, না মা। ওটা ঠিক হবে না। যদি নিশিপুরে গিয়ে থাকে তো ভালই হয়েছে। হয়তো নিজের
সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে গেছে। ওর ওটা দরকার ছিল।

অপর্ণা সামান্য উদ্বেগের গলায় বলল, হ্যাঁ রে, শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যাবে না তো। রশ্মির বেলায় যেমন করেছিল?

ঝুমকি মাথা নেড়ে বলল, জানি না মা। তবে এ ব্যাপারে ওকে কিছু বোলো না তোমরা।

অপর্ণা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ঝুমকির কোনও দীর্ঘশ্বাস নেই। একটু উদ্বেগ আছে মাত্র। হোমাস্ যদি নিশিপুরে গিয়ে থাকে তাহলে চিন্তার কিছু
নেই। আর কিছু না হলেই হল। তার শুধু ধৈর্য ধরে থাকা।

দুপুরের খাওয়ার পর সে চাকরুশীলার কাছে গেল।

মাসি, কেমন আছ?

চাকরুশীলা খুশি হয়ে বলল, আয় আয়। কতদিন আসিসনি। আজকাল খুব গরীয় যাচ্ছিস, শুনছি।

লজ্জা পেয়ে ঝুমকি বলল, যাই মাঝে মাঝে।

যাস। ও যা পাগল, ঠিকমতো না বাঁধলে পরে ওকে নিয়ে মুশকিলে পড়বি। হ্যাঁ রে, কেমন বাসিস ওকে? খুব?

তা জানি না।

খুব জানিস।

শোনো, ও আবার কাউকে কিছু না বলে কোথায় চলে গেছে।

সর্বনাশ!

না না, অত ঘাবড়ে যেও না। ক'দিন খুব নিশিপূরের কথা বলছিল। বোধ হয় সেখানেই গেছে। কাউকে পাঠাতে পারো নিশিপূরে? বড্ড চিন্তা হচ্ছে।

একটু ভাবল চারুশীলা। তারপর বলল, কাউকে পাঠালে আবার তার ফিরে আসার অপেক্ষায় বসে থাকতে হবে। তার চেয়ে একটা কাজ করি চল। আমরাই চলে যাই।

যদি রাগ করে?

পাগল! ওখানে গিয়ে হাঁ করে তোর কথাই তো ভাবছে। গেলে খুশি হবে দেখিস।

না চারুমাসি। থাক, ওকে একটু একাই থাকতে দাও বরং।

চয়নকে পাঠাতে পারি। কিন্তু সে তো কালকের আগে হবে না।

বুকের উদ্দেশ্য নিয়ে ভেবে বুঝকি বলল, তাও থাক মাসি। পাঠাতে হবে না। আর একটা দিন যাক।

একটা দিন যে কী করে গেল তা বুঝকি বোঝাতে পারবে না কাউকে। অনেক রাত অবধি তার বালিশ ভিজল চোখের জলে। বুকে অনেক টেউ উঠল অনিচ্ছ্যতার। মায়ায় ভেসে গেল বুক। এ কোন সৃষ্টিছাড়ার সঙ্গে জটল সে?

শেষরাতে একটু ঘুমলো বুঝকি। তাও বারবার ছিড়ে গেল তন্দ্রা। বুকের মধ্যে উদ্বেগের দুগডুগি।

টেলিফোনটা এল সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ। তখনও বুঝকির ঘুম ভাল করে ভাঙেনি। কিন্তু একটা প্রত্যাশা আর উদ্বেগ ছিল বলেই টেলিফোন বাজতেই সে উঠে গিয়ে ধরল।

হেমাঙ্গর গলাটা কি সামান্য কাঁপছে? বলল, কাল সারা রাত ঘুমোইনি। জানেন? কাল সারাটা দিন নিশিপূরে সময়টা যেন কিছুতেই কাটছিল না। কাল ছিল আমার জীবনের মধুরতম দিন, অর্থহীন, রংহীন... কী বলব আপনাকে, বেশি বললে কাব্য হয়ে যাবে।

হঁ।

রাগ করবেন না। বেচারী হেমাঙ্গর ওপর রাগ করবেন না কিন্তু। রাত তিনটের সময় পারঘাটে এসে বসে ছিলাম। তখন ভটভটি চালু হয়নি। একটা মেছো নৌকো ধরে ধামাখালি এসে ঝড়ের মতো গাড়ি ছেড়েছি। ঝড়ের মতো।

শুনো আমি মোটেই খুশি হচ্ছি না। একটা অ্যাকসিডেন্টের ধাক্কা এখনও সামলে ওঠেননি, এর ওপর যদি আর একটা হত?

তবু জিজ্ঞেস করলেন না কেন এমনভাবে চলে এলাম?

বুঝকি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, জিজ্ঞেস করার কিছু নেই। জানি। কিন্তু খুশি হইনি। ধীরেসুস্থেই আসা যেত।

আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? আমার কেন পুরনো হয়ে যাওয়াকে এত ভয়? কেবলই কেন মনে হয় আপনি একদিন পুরনো হয়ে যাবেন, আমিও যাবো। আমরা পুরনো হয়ে যাবো বলে এত ভয় পাই কেন?

বুঝকি একটু হাসল, আমার নেকলেসটা আপনার কাছে রাখা আছে। খুলে দেখুন। কত পুরনো, তবু কী সুন্দর। যত পুরনো হবে তত দাম বাড়বে।

যেমন ভিডেক্টজ কার? ভিডেক্টজ মদ?

ওসব উপমা আমার পছন্দ নয়।

আচ্ছা, কিন্তু আপনার কথাটা আমি বুঝেছি। আজ কি একবার দেখা হতে পারে?

পারে।

আমি যদি যাই কেউ কিছু মনে করবে না তো!

আমি করব। আপনাকে আজ আর গাড়ি চালাতে হবে না। একদিনের পক্ষে যথেষ্ট পাগলামি হয়েছে।

তাহলে?

আমিই যাবো।

মেয়েরা ভীষণ দেরি করে।

আমার দেরি হবে না।

বুঝকি ফোন ছেড়ে দিল। অবিস্বাসের চোখে কিছুক্ষণ ফোনটার দিকে চেয়ে থেকে খুব ধীরে ধীরে ফোন রাখল হেমাঙ্গ। সে দৌড়ায়নি, পরিশ্রমের কাজও করেনি কিছু, তবু কেন যেন তার হাঁফ ধরে যাচ্ছে আজ। তার মানে হচ্ছে, বুঝকিকে তার একটা খুব জরুরি কথা বলার আছে। কিন্তু কথাটা সে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না।

ফটিক কফি নিয়ে এল। তার দিকে ভূত-দেখা চোখে চেয়ে রইল হেমাঙ্গ। গরম কফিতে অসাবধানে বড় চুমুক দিয়ে জিব পোড়াল এবং বিষম খেল। তার মনে হচ্ছে যে একটা অর্থহীনতার স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। ডুবে যাচ্ছে। সে কিছুই বুঝতে পারছে না।

হাতঘড়িটার দিকে সন্দিহান চোখে চাইল সে। না, ঘড়িটা বন্ধ হয়ে যায়নি। তবে খুব ধীরে চলছে কি? বড্ড বেশি ধীরে?

সামনের বারান্দায় শীতের রোদ খেলা করছে। দুটো বেতের চেয়ার পাতা পাশাপাশি। এই বারান্দায় আজ থেকে চল্লিশ বা পঞ্চাশ বছর পর এরকম এক সকালে এক সাদা দাড়ি-চুলের বুড়োর পাশে একজন পঙ্কেকেশী বৃদ্ধা বসে থাকবে কি? হাঁটুর কাছে দাঁড়ানো নাতি বা নাতনী? সবচেয়ে বড় কথা তখনও কি পরস্পরের জন্য কণ্ঠিত হবে হৃদয়? দুজনেই থাকবে? নাকি মাঝপথে খসে যাবে একজন? কিংবা দুজনেই?

কে জানে! জীবন এত অনিশ্চিত বলেই না এত ভাল এই জীবনযাপন!

ক্রাচে ভর দিয়ে হাসপাতাল থেকে যখন বেরিয়ে এল চয়ন, তখন সকাল। দিন দশেক এক নোংরা হাসপাতালের বন্দীদশা থেকে মুক্তি। সব ক্ষত সারেনি। মাথায় ব্যাভেজ আছে, বাঁ পায়ে প্রাষ্টার। শরীরে এখনও অন্তহীন ব্যথা। বাইরে সকালটা একটু মেঘলা, বিষণ্ণ। শীতের বৃষ্টি পড়ছে অশ্রুর মতো টিপটিপ করে। স্নাতানো হাওয়া।

বাইরে বেরোনোর আগে একটু দাঁড়াল চয়ন। কোথায় যাবে? যাওয়ার জায়গা তার একটাই। দাদার বাড়ির চিলেকোঠা। কিন্তু সেখানে যেতে আজ তার বড় লজ্জা করছে। অনিচ্ছে হচ্ছে। চেনা ঘরটা আজ যেন তেপান্তরের মতো দূর।

একটু ঝুঁড়িয়ে চয়ন হাসপাতালের বাইরে এসে দাঁড়াল। শীত করছে। ভিজে যাচ্ছে। কিন্তু এই চেনা কলকাতা আজ বড় অনোনা ঠেকছে তার। কোথায় যাবে?

তার মান-অপমানের বোধ তেমন নেই। শুধু আছে পশুর মতো মৃত্যু ও যন্ত্রণার ভয়। আছে বেঁচে থাকার অদ্ভুত সাধ। একবার অনিন্দিতার কথা মনে হয়েছিল তার। কিন্তু না, এভাবে সে-বাড়িতে হাজির হওয়া যায় না। সেটা হবে ওদের ওপর নিজেকে চাপিয়ে দেওয়া। তাকে ফেলবে না চারুশীলাও। কিন্তু এই অবস্থায় তাকে দেখে চারুশীলার প্রবল প্রতিক্রিয়া হবে। খুব লজ্জা করবে চয়নের।

সে কি শেষ অবধি সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হয়ে গেল? সে বুঝতে পারছে না। দুর্বলতায় তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। অন্যভ্যাসের ক্রাচ তার বগলে ভীষণ ব্যথা দিচ্ছে। তবু ভাগ্যিস পাড়ার পশু তার মৃত জ্যাঠামশাইয়ের দু'খানা ক্রাচ দয়া করে পরত দিয়ে গিয়েছিল তাকে। বলেছিল, এ দুটো তোমার লাগবে। বাঁ হাঁটু তো গুঁড়িয়ে গেছে।

কত কি ভেঙেছে চয়নের তার হিসেব কে রাখে?

আরও একটু হাঁটল চয়ন। হাঁটতে হাঁটতে ভাবল, সেই চিলেকোঠার ঘরে তার সর্বশ্ব রয়েছে। না গিয়েই বা সে করে কি?

একদিন হঠাৎ মোহিনীর পড়ার ঘরে কৃষ্ণজীবন হাজির হয়ে বললেন, চয়ন, গ্রাম তোমার কেমন লাগে?

কৃষ্ণজীবনের গ্রাম সম্পর্কে অবসেশন আছে, চয়ন জানে। সে ভাবল বোধ হয় উনি নতুন একটা কিছু ভেবেছেন, তাই নিয়ে আলোচনা করতে চান। সে বলল, ভালই লাগে।

কৃষ্ণজীবনের পরের প্রশ্নটা অনেক বাস্তবধৈর্য। বললেন, শুধু ভাল লাগলেই হবে না। গাঁয়ে গিয়ে থাকতে পারবে?

চয়ন অবাচ্য হল। একটু ভেবে বলল, বোধ হয় পারব।

কৃষ্ণজীবন ঙ্ক কুঁচকে তার দিকে চেয়েই কিছু চিন্তা করে বললেন, তোমার পক্ষে গ্রামের নিস্তরঙ্গ পরিবেশ ভালই হবে মনে হয়। কলকাতার প্রতি কোনও বিশেষ আকর্ষণ নেই তো!

না। তবে আমি জন্মাবধি কলকাতায়।

একটু ভেবে দেখবে নাকি?

আমাকে কি গ্রামে যেতে হবে?

কৃষ্ণজীবন একটু হাসলেন। তারপর বললেন, আমার বাবা একটা প্রাইমারি স্কুলে পড়াতে। তখন বেতন খুব সামান্য ছিল। এখন তা নেই। সেই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিতে আমি আছি। সেখানে একজন অঙ্ক আর ইংরিজি পড়ানোর লোক চাই। চাকরিটা তোমার হতে পারে। করবে? চয়ন একটুও না ভেবে বলল, করব।

ভাবতে সময় নিলে না। পরে যদি কলকাতার জন্য মন কেমন করে?

আমার তা করবে না।

ঠিক বলছ? তা হলে কাল সকালে তোমার চেক-বইটা নিয়ে আমার কাছে চলে এসো। যে টাকাটা তুমি আমাকে পৃথিবীর ভালর জন্য দিয়েছিলে সেটা আমি তুলিনি। ভেবেছিলাম ভাবাবেগের বেশে দিচ্ছি, পরে হয়তো টাকাটা তোমার দরকার হবে। এবার টাকাটা সত্যিই দরকার।

টাকাটা তো আপনাকে দিয়েই রেখেছি। আপনি যা খুশি করতে পারেন।

যা খুশি নয়। টাকাটা তোমার চাকরির জন্যই দরকার। কত বিচিত্র ধরনের ঘুষ যে আজকাল চালু হয়েছে তার লেখাজোখা নেই। তোমার চাকরির জন্য গ্রিশ হাজার টাকা ডিম্যান্ড করছেন ওরা। তাও আমার খাতিরে কিছু কম করে ধরেই। ভাবতে পারো ছাত্রছাত্রীদের চরিত্র গঠনের পবিত্র প্রতিষ্ঠানে তোমাকে ঢুকতে হচ্ছে ঘুষ দিয়ে? অদ্ভুত দেশ!

কিন্তু ও টাকা আমার চাকরির জন্য খরচ হলে তো আমার দান করাটা বৃথা হল।

কৃষ্ণজীবন মাথা নেড়ে বললেন, না, টাকাটা পৃথিবীর উপকারেই লাগল বলে ধরে নিচ্ছি। তোমার প্রতিষ্ঠা হলে পৃথিবীর উপকার হবে বলেই আমি মনে করি। ঘুষটা মানতে পারছিলাম না। কিন্তু উপায় যখন নেই তখন গুচিবাই ত্যাগ করাই ভাল।

পরদিন কৃষ্ণজীবন তাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে টাকাটা তুললেন। বললেন, আরও কুড়ি হাজার টাকা গ্রামের ব্যাংকে রেখে দিও। বিপদে আপদে কাজে লাগবে। আপাতত আমার কাছে থাক।

অয়ন ফিরে এসেই একদিন ছাদে চলে এল। হাবভাব বেশ কঠোর, কী রে? জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের দরখাস্ত জমা দিয়েছিলি?

চয়ন দাদার রুদ্রমূর্তি দেখে ভয় খেয়ে গেল। বলল, টাকাটা অন্য কাজে লেগেছে।

অয়ন যেন ভূত দেখছে, এমন চোখে চেয়ে বলল, তার মানে?

আমি একটা মাস্টারির চাকরির জন্য দরখাস্ত করেছিলাম। ওরা টাকাটা চাইছে।

থম ধরে কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে অয়ন বলল, মাস্টারির চাকরি না মামদোবাজি?

না না, আমি কৃষ্ণজীবনবাবুকে টাকাটা দিয়েছি।

কে কৃষ্ণজীবন ?

আমি তাঁর মেয়েকে পড়াই।

লোকটার ঠিকানা দে।

ঠিকানা! ঠিকানা দিয়ে কী হবে ?

আমি খোঁজ নিয়ে দেখব তুই সত্যি কথা বলছিস কি না। যদি সত্যিও হয় তা হল লোকটার কাছ থেকে টাকা ফেরত নিতে হবে।

কেন ?

দেখ, তোর চালাকি আমি বুঝতে পেরেছি। পাছে টাকাটা আমাকে দিতে হয় সেই ভয়ে তুই ওটা সরিয়েছিস।

চয়ন হঠাৎ সাহস করে বলল, কিন্তু টাকাটা তো আমার। আমি কি টাকাটা ইচ্ছেমতো খরচ করতে পারি না ?

হঠাৎ অয়নের চোখ মুখের চেহারা পাষ্টে গেল। খুনীর মতো ঠাণ্ডা গলায় বলল, তাই নাকি রে শুয়েয়ের বাচ্চা ?

দুধকলা দিয়ে এতকাল কালসাপ পুছেছি ? টাকাটা তোর ? আর তুই যে এতকাল বিনা ভাড়ায় এ বাড়িতে বসবাস করছিস! দে শুয়েয়ের বাচ্চা, বারো বছরের ভাড়া দে।

সে বউদির হাতে প্রতি মাসে আজকাল ঘরভাড়া বাবদ একশ টাকা করে দেয়, কিন্তু সে কথাটা বলতে তার সাহস হল না। সে চুপ করে রইল।

কিন্তু অয়ন চোঁচাতে লাগল, দে শালা, ভাড়া দে। বাপের জমিদারি পেয়েছিস ? গায়ের জোরে থাকবি এখানে ?

চয়ন একটাও কথা বলতে পারছিল না। এই গনগনে রাগে জল ঢালবে কে ? কোন কথায় কাজ হবে ? বরং চুপ করে থাকাই ভাল। সে শুধু সম্মোহিতের মতো অয়নের দিকে চেয়েছিল।

আশপাশের ছাদে দু-চারজন লোক জড়ো হচ্ছিল মজা দেখতে। অয়ন লোকলজ্জার তোয়াক্কা না করেই চিৎকার করতে লাগল, যা আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা। আজই যাবি। দেখি কোন কৃষ্ণজীবন তোকে রাখে!

বউদি এই সময়ে উঠে এসে অয়নকে একরকম টেনেই নিয়ে গেল নিচে। চয়ন অর্ধেক রান্না করেছিল। ঠোঁড় নিবিয়ে দিয়ে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে রইল। রাতে আর কিছু খেল না।

পরদিন অয়ন বেরিয়ে যাওয়ার পর বউদি এল।

চয়ন, তুমি কাকে টাকা দিয়েছ বলা তো!

কৃষ্ণজীবনবাবুকে।

তিনি কি ভাল লোক ?

ভীষণ ভাল বউদি। তিনি বিশ্ববিখ্যাত লোক।

তোমার দাদার ধারণা তুমি হয় ঠগবাজের পাল্লায় পড়েছ না হলে মিথ্যা কথা বলছ। কিন্তু আমি বলি, টাকাটা সরিয়ে ফেলে ভাল কাজই করেছ। তোমাকে তো বলেছি, শেয়ার মার্কেটের নেশায় ও এখন পাগল।

বউদি, দাদাকে তুমি বুঝিয়ে বোলাও, টাকাটা আমার সত্যিই দরকার ছিল। আজকাল মাস্টারির চাকরি পেতে নাকি টাকা দিতে হয়।

জানি তো। আমার পিসতুতো ভাই শিবনাথকেও টাকা দিতে হয়েছে। তোমার কি চাকরি হচ্ছে ?

হওয়ার কথা।

চাকরি হলে খুব ভাল হবে চয়ন।

আরও দুদিন পর চয়ন ছাদ থেকে গুনতে পেল দাদা আর বউদিতে কথা কাটাকাটি হচ্ছে। বউদি বলছিল, কেন ওর টাকা নেবে তুমি ? বেচারার কত কষ্ট করে রোজগার করেছে, কেন সে টাকা তুমি শেষারে খাটাবে ?

ও আমাকে অবিশ্বাস করে কোন সাহসে ?

অবিশ্বাস আমিও করি। তুমি আমার বিয়ের হারটা বেচে শেষারে খাটিয়েছ। বলেছিলে দুটো হার দেবে। দিয়েছ ? আমারটা গেছে যাক, ওরটা নেবে কেন ?

ওরে মাগী! খুব যে দরদ! বলি অন্য কিছু আছে নাকি ?

তবে চয়নের শরীর অবশ আর মাথা বিহ্বল হয়ে গেল। অয়ন কি সত্যিই পাগল হয়ে গেল ?

দোতলায় খগড়াটা তুঙ্গে উঠল, আবার ঝপ করে বন্ধ হয়ে গেল। এই বন্ধ হয়ে যাওয়াটাই অস্বাভাবিক। অয়ন বউদির গলা টিপে ধরেনি তো!

আশঙ্কায় কাঁটা হয়ে যখন ব্যাপারটা দেখতে নিচে যাবে বলে উঠে দাঁড়িয়েছে চয়ন, ঠিক তখনই সিঁড়ি দিয়ে রড হাতে নৌড়ে ছাদে উঠে এল অয়ন। দিঘিদিগজ্ঞানশূন্য, রাগে অন্ধ, কাণ্ডজ্ঞানহীন।

জীবনে এত মার খায়নি চয়ন। অবিশ্বাস্য। এভাবে কেউ কাউকে মারতে পারে ? এত জোরে ? এত নিষ্ঠুরভাবে ? পরম সৌভাগ্য তার যে, মারটা বেশিক্ষণ সহ্য করতে হয়নি তাকে, হাঁটুতে লাগতেই সে কাটা কলাগাছের মতো পড়ে গিয়ে জান্তব চিৎকার করছিল শুধু। যখন মাথায় লাগল তখন পরম শান্তির মতো মুহূর্ত এসে নোংরা নিষ্ঠুর পৃথিবীটাকে যবনিকায় ঢেকে দিল।

জ্ঞান ফিরল পরদিন দুপুরে। আশ্চর্য মানুষের জীবনীশক্তি। তার মতো দুর্বল, ক্ষীণজীবী মানুষও যে কি করে মাথায় ওই রডের বাড়ি খেয়ে বেঁচে রইল কে বলবে। পশু এবং পাড়ার ছেলেরা অবশ্য বলেছিল, সে পড়ে যাওয়ায় রডটা মাথায় ঠিকমতো লাগেনি। শানের ওপর ঘষটা খেয়ে তারপর লেগেছিল বলে ইমপাল্টা কমে গিয়েছিল। নইলে ঘিলু বেরিয়ে যাওয়ার কথা।

সে পশুকে বউদির কথা জিজ্ঞেস করেছিল।

পশু বলল, বউদিকে মেরেছিল টর্চ দিয়ে। মাথায় লেগে অজ্ঞান হয়ে যায়। তবে তেমন কিছু হয়নি। সামলে গেছে।

পুলিশ কেস ?

পল্টু লাজুক একটু হেসে বলল, ওটা আর করিনি। শালা পুলিশের হাতে তুলে দিলে নিশ্চিত হওয়া যায় না। কোথায় কোন কলকাঠি নেড়ে খালাস পেয়ে যাবে। পাড়ার লোকই অয়নদাকে চিট করেছে।

মেরেছ তোমরা ?

কিছু মনে কোরো না ভাই, ও চিজকে ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত। তার বদলে দু-চার ঘা আর বেশি কি ? পাড়ার সিনিয়ররা এসে না পড়লে সেদিন অয়নও ইমার্জেন্সি কেস হয়ে যেত। দুটো দাঁত ভেঙেছে, আর কনুই মুচড়ে গেছে। কিল চড় লাথি যা পড়েছিল তাতে দিন চার-পাঁচ শুয়ে থাকতে হবে। তুমি চাইলে পুলিশ কেস করতে পারো।

চয়ন গত দশ দিন যাবৎ ভেবেছে, এই নিষ্ঠুর পৃথিবীর সঙ্গে যুববার ক্ষমতাই তার নেই। সে বড় নরম, বড় দুর্বল, বড় ভীতু। মাথার পর একটু ছাদের জন্য অয়নকে তার আর বিব্রত করা উচিত নয়। এবার তার চিলেকোঠা ছাড়ার সময় হয়েছে। হাসপাতাল থেকে তার ছুটি হয়নি। মাথা স্ক্যান করার কথা বলেছে ডাক্তার। আরও কিছু মেরামতি কাজ বাকি।

কিন্তু হাসপাতালে আর থাকতে পারছিল না চয়ন। আজ সকালে কাউকে কিছু না বলে সে বেরিয়ে এল। কেউ আটকাল না। রুগীর ভিড়ে কে কাকে লক্ষ করে!

হাঁটতে তার কষ্ট হচ্ছে। শরীর কাঁপছে, ক্রাচে কষ্ট হচ্ছে। দম পাচ্ছে না। কোথায় যাবে ভেবেও পাচ্ছে না সে।

একটা হার্ডওয়্যারের দোকান থেকে সে একটা ফোন করল কৃষ্ণজীবনকে। বিরল সৌভাগ্যই বলতে হবে। কৃষ্ণজীবনের ফোন সচল আছে এবং উনি কলকাতায় আছেন। নিজেই ফোন ধরলেন।

স্যার, আমি চয়ন।

কি খবর চয়ন ? অনেকদিন আসোনি সুনলাম। শরীর খারাপ নাকি ?

হ্যাঁ স্যার। শরীর খারাপ।

কী হয়েছিল ?

আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

আজ শনিবার। আমার ছুটি। তুমি কি এখনই আসতে চাও ?

চাই স্যার। কিন্তু আমার কাছে এখন গাড়িভাড়া নেই।

চলো এসো ট্যাক্সি করে। মোহিনীকে আমি দশ মিনিট বাদে নিচে পাঠাবো। সে ভাড়া দিয়ে দেবে।

মোহিনী নিচেই দাঁড়িয়ে ছিল। ক্রাচ-সহ তাকে নামতে দেখেই একটা আর্ভানাদ করে দৌড়ে এসে তাকে ধরল, কী হয়েছে আপনার ? ইস, এ যে সাম্মতিক অবস্থা!

মান একটু হাসল চয়ন। বলল, দিজ আর দি উভস অফ লাভ। সেলফিস জায়েন্ট মনে আছে মোহিনী ?

মোহিনীর চোখ ছলছল করছিল, আপনার কি অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, সেরকমই। না, ধরতে হবে না। আমি পারব।

তাকে দেখে অবাক কৃষ্ণজীবন বলল, এ কী কাণ্ড চয়ন ?

ক্রিষ্ট হেসে চয়ন বলল, স্যার, সব কথা বলতে আমার লজ্জা করবে।

তার মানে কি চয়ন ? কেউ কি তোমাকে মারধর করেছে ? সে কি তোমার দাদা ?

চয়ন মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

কৃষ্ণজীবন কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, তুমি হাসপাতালে ছিলে ?

হ্যাঁ। আজ পালিয়ে এসেছি।

আমাকে আগেই জানাতে পারতে। তা হলে ব্যবস্থা-হয়ে যেত। তুমি তো এখনও সুস্থ নও।

না স্যার, আমি ভাল আছি। আপনি আমাকে একটা গ্রামে পাঠাতে চেয়েছিলেন। এখন আমি সেখানেই চলে যেতে চাই।

কৃষ্ণজীবন একটু হাসলেন, যাবে, তার জন্য তাড়া নেই। কিন্তু আগে পুরোপুরি সুস্থ হওয়া দরকার। তোমার তো মনে হচ্ছে গায়ে এখনও জ্বর। শরীর কাঁপছে। মুখ সাদা। বোসো। আমাদের বাড়ির কাছেই একটা নার্সিং হোম আছে। একটা ফোন করে দেখি।

লাগবে না স্যার।

লাগবে।

কৃষ্ণজীবন ফোন করলেন। এবং ঘণ্টা খানেক বাদে একটা নার্সিং হোমের পরিচ্ছন্ন ঘরে চয়ন আশ্রয় পেল। একজন ডাক্তার তার ক্ষত পরীক্ষা করে বললেন, আপনি এখনও হসপিটাল কেস। কে আপনাকে রিলিজ করল ?

কেউ না। আমি পালিয়ে এসেছি।

ডাক্তার একটু হেসে বললেন, এখনও কিছুদিন শুয়ে থাকতে হবে।

তা রইল চয়ন। তিনতলার নির্জন নিরিবিধি ঘরে বেশ শান্তিতে রয়ে গেল সে। দিন কয়েক বাদে কৃষ্ণজীবন এসে বললেন, তুমি মনের দিক থেকে প্রস্তুত তো চয়ন। এখনও ভেবে দেখ, গ্রামে থাকতে পারবে কি না। শহরে আরাম কিছু সেখানে নেই।

চয়ন অত্যন্ত উদ্বেল হয়ে বলল, আমাকে কি ওরা নেবে স্যার ?

নেবে। সে জন্য চিন্তা নেই। চিন্তা হল তোমাকে নিয়ে। তুমি পারবে তো ?

পারব।

কৃষ্ণজীবন একটু চুপ করে থেকে বললেন, তুমি হয়তো শুনে খুশি হবে না, আমি তোমার দাদার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করছি। আমাদের কথা হয়েছে।

অবাক চয়ন বলে, দাদার সঙ্গে ?

হ্যাঁ। তুমি কি জানো যে পাড়ার লোকেরা তোমার দাদাকে খুব মার দিয়েছে ?

জানি স্যার। আপনার সঙ্গে কোথায় দেখা হল ?

আমি তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম। ভয় পেও না, তারা আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি।

আপনি কেন এতটা করলেন ? আমার দাদা আপনাকে অপমান করতে পারত।

তা পারত। কিন্তু সে এখন অনুতপ্ত। খুবই অনুতপ্ত। তার ছেলেপুলে নেই, স্বামী-স্ত্রীর সংসার। শেয়ার মার্কেটের নেশায় কলঙ্কান লোপ পেয়েছিল। সে তোমাকে ও বাড়ি ফিরে যেতে বলেছে। কথা দিয়েছে আর কোনও গুণগোল হবে না। তুমি এখন কয়েকদিন চুপ করে শুয়ে ভেবে দেখ, গ্রামে যাবে, না এখানেই থাকবে। এখনই জবাব দিও না। হাতে সময় আছে। হয়তো এ শহরেই কোনওদিন তোমার একটা চাকরিও হয়ে যেতে পারে। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করলে হয়তো অসম্ভব নয়। এ শহরের একটা সামাজিক নেশা আছে। চট করে কলকাতাকে জীবন থেকে মুছে ফেলা যায় না।

আমি পারব স্যার।

তুমি তাজমহল দেখনি, না ?

না।

আমি প্রথমবার যখন তাজমহল দেখতে যাই তখন ওরকম একটা মাচ পাবলিসাইজড ইমারত দেখে তেমন কিছু ইমপ্রেশন হয়নি। কিন্তু আশ্চর্য কী জানো ? যখন দেখে-টেখে চলে আসছি তখন একটা ম্যাগনেটিক পুল যেন পিছন থেকে টানছিল। বারবার ফিরে তাকাতে হচ্ছিল তাজমহলের দিকে। আট্রাকশনটা যে কিসের তা আজও বুঝতে পারিনি। কলকাতার আকর্ষণ তাজমহলের মতো নয়। কিন্তু এই শহরেরও একটা মিষ্টিরাস আট্রাকশন আছে। লজ্জার কথা কী জানো, আমি এত গ্রাম-ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও কলকাতাকে কখনও অস্বীকার করতে পারি না। তাই বলছি, কলকাতাকে ডিভোর্স করার আগে ভাল করে ভেবে নাও।

বিচক্ষণ কৃষ্ণজীবন কতখানি সত্যি কথা বলেছিলেন তা তিন-চারদিন ধরে নানা কথা চিন্তা করার পর একটু একটু টের পেতে লাগল সে। হয়তো সত্যিই সে পারবে না আজ পাড়াগায়ে গিয়ে থাকতে। হয়তো বিষণ্ণ লাগবে, একা লাগবে। তাকে দেখতে এল চারুশীলা, ছেলেমেয়ে নিয়ে। দেখতে এল হেমান্ত। দেখে গেল খুমকি আর অনু। রোজ দেখে যায় রিয়া আর তার ছেলেমেয়েরা। তারপর, দিন সাতেক বাদে তাকে আপাদমস্তক চমকে দিয়ে এক বিকেলে এসে হাজির হল দাদা আর বউদি।

অয়নের সামনের দুটো দাঁত উড়ে মুখটা ফোকলা আর বোকা বোকা দেখাচ্ছিল। কেমন একটা সংকুচিত ভাব। বউদি বিষণ্ণ, ছলছলে।

প্রথমটায় কথা আসছিল না কোনও পক্ষেরই। শেষ অবধি অয়ন কষ্ট করেই বলল, আমিও তো মার খেয়েছি, দেখছি। শোধবোধ হয়ে গেছে।

চয়ন শান্তভাবে বলল, আমি গ্রামে চলে যাওয়ার কথা ভাবছি।

সে যাওয়ার হলে যাবি। কিন্তু কাজিয়াটা মিটিয়ে নে।

বউদি বলল, ছাদের চিলেকোঠাটা একটু বড় করে ছাদ ঢালাই হবে। বুঝলে ? তোমার জন্যই।

কেন বউদি ?

আমরা অনেক ভেবে দেখেছি, তোমার দাদার বা আমারও আপনজন বলতে কেউ নেই। আমি মা-বাপের একমাত্র সন্তান। আমাদের কে আছে বলো তো! ছেলেপুলেও হল না। বয়স হয়ে যাচ্ছে।

আমি যদি কলকাতায় থাকি তা হলে ওই চিলেকোঠাতেই থাকতে পারব।

বউদি একটু হাসল, পারবে না। চিলেকোঠা ভেঙে ফেলে ঘর করা শুরু হয়ে গেছে। আজ ঢালাইও হয়ে গেল।

কেন করতে গেলে ? কত খরচ!

বউদি মাথা নেড়ে বলল, তোমার জন্যই তো নয়। চিলেকোঠাটা এমনিতেই নড়বড়ে ছিল। ভেঙে করতেই হত। শোনো চয়ন, গ্রামে গিয়ে মাটির করতে চাও কেন ? সেখানে কোন উন্নতিটা করবে শুনি ? টিউশনি করেই তো তোমার বেশ চলে যাচ্ছে।

তোমরা কি আমাকে চাও বউদি ? আমার যে বিশ্বাস হতে চায় না। ভাবি, তোমাদের ঘাড় পেড়ে আছি বোঝা হয়ে।

বউদি একটু বিষণ্ণ হয়ে বসে থেকে বলল, সবকিছুই বুঝতে একটু সময় লাগে। বয়সও লাগে। আমার আজকাল মনে হয়, তোমাকে আমাদের আর একটু বোঝা উচিত ছিল। তুমি বড্ড নিরীহ বলেই বোধ হয় তোমার ওপর অত্যাচারটা বেশি হয়।

অয়ন মিনিমিনে গলায় বলল, কবে ছাড়বে এরা ?

জানি না।

ঠিক আছে। খবর নেবো। এসো নিয়ে যাবো খন।

দাদা বউদি চলে যাওয়ার পরই যেন সে বুঝতে পারল, সত্যিই সে কলকাতা ছেড়ে কোথাও গিয়ে থাকতে পারবে না। নিজের হাতের তেলার মতো চেনা তার এই শহর। প্রতিটি রাস্তাঘাট, এ শহরের সকাল বিকেল, গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত এ সবই তার আজ্ঞা চেনা। এ শহর ছেড়ে কোথায় যাবে সে ?

না, গ্রামে গিয়ে সে পারত না। বিচক্ষণ ও জ্ঞানী কৃষ্ণজীবনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে গেল।

ফ্রাচে ভর দিয়ে যেদিন নার্সি হোম থেকে বেরিয়ে এল সে, সেদিনই সে অবাক চোখে দেখল, শীতের সকালে কলকাতা যেন তারই অপেক্ষায় সেজে বসে আছে। সাজ কিছুই নয়, একটু রোদ, লোকজন, একটু ঠাণ্ডা হওয়া। সেই পুরনো কলকাতাই। তবু যেন এক অবিকারকের চোখে নতুন ভূখণ্ড দেখল চয়ন।

দাদা আর বউদি দু'ধারে, সে ধীরে ধীরে ট্যান্ডিতে গিয়ে উঠল।

“কলকাতা একটা অদ্ভুত শহর। এরা নিশ্চয়ই নিজস্বতা কিছু আছে। এই শহরে যারা একবার বসবাস শুরু করে তারা আর অন্য কোথাও যেতে আগ্রহ বোধ করে না। গেলেও তারা কলকাতায় ফিরে আসার কথাই বোধ হয় ভাবে। কিন্তু আমার মনে হয় লভন, নিউ ইয়র্ক বা মস্কোও কি তাই নয়? এইসব শহরের অধিবাসীরা কেউ আর কারও মতো নয়, প্রতিটি শহরেরই পরিবেশ ভিন্ন, ভিন্ন তাদের ভূগোল ও ইতিহাস, ভিন্ন তাদের জীবনযাত্রা। লভন, নিউ ইয়র্ক, মস্কো বা কলকাতা কেউ কারও মতো নয়। আবার এক অর্থে ওরা সবাই সেই মহানগরী—সেই নরক, যাকে হিন্দুশাস্ত্রে বলা হয় কুস্তীপাক। যার মধ্যে হাজারো রকমের মানুষকে মিশিয়ে পাক খাওয়ানো হচ্ছে নানা জীবিকায়, নানা মতলবে, নানা আশা বা বঞ্চনায়।

“আমি এইসব শহরের চুখকের মতো আকর্ষণের কথা ভেবেছি। কিসের এই আকর্ষণ? জীবিকা? বৃহত্তর সুযোগ? নানা সম্ভাবনা? হ্যাঁ, এ সবই সত্য। কিন্তু এর অতিরিক্তও কিছু আছে। মহানগরী মানেই একটি জঙ্গল, চলিষ্ঠতা। এখানে সারাদক্ষণ একটা জীবনের প্রবাহ চলেছে, চলেছে নানা কর্মকাণ্ড। এই জঙ্গলমতাই কি আকর্ষণ করে মানুষকে? কলকাতায় যে ঠেলাওলা দিনরাত খেটে দেশে টাকা পাঠায় সেও কি অনুভব করে এই আকর্ষণ?”

এইভাবেই কৃষ্ণজীবন শুরু করল তার ‘হোয়েন আই মিট মাইসেলফ’। গ্রন্থটির বিষয় কলকাতা এবং কলকাতার সূত্র ধরে পৃথিবীর আরও নানা শহর।

এক জায়গায় কৃষ্ণজীবন লিখল, “সেদিন শীতের এক সন্ধ্যায় আমি একটা বিয়েবাড়িতে গিয়েছিলাম। হিন্দু বিয়ে। হিন্দুরা বর্ণাশ্রম মানে। এই বিয়ের পাত্র-পাত্রীরাও একই বর্ণের। তাছাড়া তাদের মধ্যে পূর্বরাগও ঘটেছে। খুবই সুখী বিয়ে। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। সেই বিয়েবাড়ি আর পাঁচটা বিয়েবাড়ির মতোই হুবহু একরকম। ভাড়া করা বিয়েবাড়ি সাজানো হয়েছে ফুল আর আলোয়। বেনারসী ও গয়নার খিলিক চারদিকে। মৃদু হাসি, আড্ডা, ক্যাটারারের পরিবেশিত সুখান্দ সবই যেন একরকম। শুধু অবাক কাণ্ড, পাত্র-পাত্রী ও নিমন্ত্রিত ইত্যাদিদের দেখে আমার যেন মনে হচ্ছিল, এটা এর আগে একশোবার দেখা একটা বিয়েরই রিপ্রে। এই পাত্র-পাত্রীরা যেন এর আগে আরও বহুবার বিয়ে করেছে, একই নিমন্ত্রিতরা এসেছে, একই ক্যাটারার একই খাবার দিয়েছে। সেই বিয়েবাড়িতে হঠাৎ আমার মনে হল, মানুষ কি সজ্ঞবদ্ধভাবে নিজেরই পুনরাবৃত্তি করে মাত্র?”

লিখতে লিখতে কৃষ্ণজীবন আপন মনে হাসে, কখনও মাথা নাড়ে, কখনও দীর্ঘশ্বাস ফেলে। যে বিয়েবাড়ির কথা সে লিখছিল তা তার চোখের সামনে ভিড়িওতে তোলা ছবির মতো ভেসে যেতে লাগল। ঝুমকিকে একটা নীল বেনারসীতে চমৎকার দেখাচ্ছিল। পোশাক মানুষকে ততটা সুন্দর করতে পারে না, যতটা পারে অভ্যন্তরীণ আনন্দের আভা যখন বিকীর্ণ হয় তার অবয়বে। এক মনোরম গেট টুংগদারের মতো সেই বিয়ে কি বস্তুতই ছিল আরও পাঁচটা বিয়ের রিপ্রে? না, তা নয়। কৃষ্ণজীবন লিখবার জন্য লিখল। অনেক সময়ে আসল অভিজ্ঞতার ওপর একটা দার্শনিকতার প্রলেপ দিতে হয়।

সেই বিশাল বিয়েবাড়িতে অনেক আনাচকানাচ ছিল। যাকে ইংরিজিতে বলা হয় নুক্স অ্যান্ড করনাস্। একটা পামবীথি ছিল আর তার ওপাশে ছিল একটা ফুলের ঝোপ।

সে আর অনু বসেছিল পাশাপাশি।

অনু বলছিল, আচ্ছা বিয়েবাড়ি আপনার কেমন লাগে?

ভাল নয় অনু। আজকাল একদম ভাল লাগে না।

কেন ভাল লাগে না?

ভিড় আজকাল আমার সহ্য হয় না। গ্যাদারিং দেখলেই রিপালসন হয়।

যেখানে গ্যাদারিং-এ আমি আছি সেখানেও ভাল লাগে না?

তুমি খুব দুঃস্থ আছ।

বলুন না!

তার হোয়েন আই মিট মাইসেলফ-এ অকপট কৃষ্ণজীবন লিখল, “এ মেয়েটা কি আমার প্রেমিকা? এর সঙ্গে আমার বয়সের তফাত পঁয়ত্রিশ বা ছত্রিশ বছর। আমার মেয়ের বয়সী এবং তারই বান্ধবী। মোহগ্রস্ত দুখানা চোখে যখন আমার চোখের দিকে চেয়ে আকুলভাবে একটা মৃদু ও প্রশ্রয়ী হুঁ শব্দতে চাইছিল মেয়েটি তখন আমার দরকম কথা মনে হচ্ছিল। ইচ্ছে করলে আমি মেয়েটিকে এমন রুঢ় কথা বলতে পারি যাতে ওর মোহ ভেঙে খান খান হয়ে যায়। আবার ইচ্ছে করলে ও যা শব্দতে চাইছে তাই বলতে পারি। আমি একজন পঞ্চাশোর্ধ্ব মানুষ একজন তরুণীকে কী বলব? আমি যেন এক সূক্ষ্ম ভারসাম্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। এ মেয়েটির প্রতি কি আমি আসক্ত? আমি কি অন্ধ, বিচারবোধহীন, মোহগ্রস্ত কামের শিকার? এ কি গড়ানে বয়সে তরুণী-হৃদয়ের জন্য দুর্মির আকাজক্ষা? নাকি নর ও নারী এরা কোনও বয়স বা সম্পর্কের শর্তে আবদ্ধ নয়? কিন্তু আমি বহুদিন ধরে পশ্চিমী সমাজের বাস্তবচার ও যৌনবিকৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার। আমার বরাবরই অপছন্দ বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক। তবু কেন এই মেয়েটির চোখের দিকে চেয়ে আমি কিছুতেই বলতে পারছি না, না!

“বরং আমি বললাম—খুব পুষ্পিত ভাষায় না হলেও—বললাম, তোমার কথা আলাদা। তোমার টানেই তো আসা।

“এ আমি কী বললাম? এই অপরিণতবুদ্ধি, সবে বয়ঃসন্ধি পেরোনো, আবেগ-ভাঙিত, উদ্বেল-হৃদয় মেয়েটি আমার প্রেমে পড়ে গিয়ে থাকলেও একদিন যে এর চেতনা ফিরবে। ফিরবে বাস্তববোধ। এ যে কত বড় ভুল করেছিল তা যেদিন বুঝতে পারবে সেদিন কি ছুঁড়ে আমাকে আঁতাকুড়ে ফেলে দেবে না?

“কিন্তু পূর্বাপর চিন্তা করে মানুষ ক’টা কাজই বা করে? মেয়েটি উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে চেয়ে, আমার একটা হাত চেপে ধরে বলে উঠল, সত্যি বলছেন? শুধু আমার জন্য?

“আমার বড় মায়া আর করুণা হচ্ছিল। কীই বা ওর বয়স, কত সম্ভাবনা পড়ে আছে ওর জীবনে। এই পঞ্চাশোর্ধ্ব একজন মানুষের মুখের সামান্য স্তোকবাক্য শুনে ওর ঠোঁটে ভাঙছে বাঁধভাঙা আনন্দের হাসি, নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে আবেগ, গর্বে ভরে উঠছে বুক।

“সে আমার হাত ধরে বসে রইল অনেকক্ষণ। বিয়ে বাড়ি, যে কেউ যখন তখন এসে পড়তে পারে। কিন্তু তার পরোয়া নেই। এইটেই তো বেহিসেবী হওয়ার বয়স। কিন্তু আমার বয়স তো বেপরোয়া বয়স নয়। আমার হৃদয়ে আজ অনেক হিসেব-নিকেশ, অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। তবু তার হাতে হাতটি সমর্পণ করে বসে থাকা ছাড়া আর আমার কিছুই করার ছিল না।

“আমাদের এক বাঙালি কবি লিখেছিলেন, একটি কথায় দ্বিধাধরতর চূড়ে ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী।—বাস্তবিক আমার সেই সন্ধ্যায় বোধ হয় অমরাবতীর খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম।

“সে বলল, আমি আপনাকে এত ভালবাসি, কিন্তু আপনি আমাকে একটুও না।

“প্রেমিক প্রেমিকারা প্রলাপ বকেই থাকে। তাদের কথার কোনও মাথাযুগু হয় না। হলে তা আর প্রেমের সংলাপ থাকে কি? আমিও সেই সন্ধ্যায় প্রলাপের স্রোতে ভেসে গেলাম কিছু দূর। বললাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও... আমিও...

“আমি—পঞ্চাশোর্ধ্ব—তিন ছেলেমেয়ের বাবা, দায়িত্বশীল একজন মানুষ কি করে ভেসে যাচ্ছি?

“উজানে ফেরে না নদী। সেই সন্ধ্যায় আমি তবু ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেছি আমার কৈশোরকালে। আচ্ছা, এই যে আমাদের বয়স হয়, এই যে আমরা সেকেন্ড-মিনিট-ঘণ্টা-দিন-মাস-বছর পেরিয়ে আসি এটা আসলে কী? সময় বলে কিছু আছে? বয়স বলে কিছু। এ তো আমাদের মনগড়া একটা কল্পনা মাত্র। অ্যাবস্ট্রাক্ট। আসলে সত্যিই কি আমি মধ্যবয়স্ক? ওটা তো ধারণা মাত্র।

“মানুষ সবসময়েই চেষ্টা করে, তার যত দুর্বলতা, যত বৃষ্টি-প্রবৃত্তির তাড়না, যত লোভ-লালসা সব কিছুকেই একটা যুক্তিসঙ্গত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতো। সে হয়তো জানে, মনে মনে জানে, কাজটা ঠিক হচ্ছে না। তবু নানা পাল্টা গুঁড়ি দিয়ে সে সেটাকে সমর্থন করার পথ খোঁজে। ভেবে দেখলাম, মানুষ নিজের দুর্বলতাকে ছাড়তে চায় না। সে নিজের দুর্বলতাগুলিকে বড় ভালবাসে। ভালবাসে বলেই তাদের গৃহপালিতের মতো পুষে রাখে।

“সেই বিয়ের রাতটি এইসব কারণেই আমি ভুলব না। সেই রাতে বাড়ি ফিরে আমি ছাদে উঠে এসেছিলাম। শীতকাল। এত রাতে ছাদে কেউ নেই। আমি গভীর রাত অবধি ছাদে বসে থেকে এই মহানগরীর আলো ও অন্ধকার দেখতে দেখতে কত দূরে যে চলে গেলাম। মন—মনই তো সব মানুষের। সর্বোত্তম গুঁজিপাটা। মন দিয়েই মানুষ সব কিছু গড়ে নেয়। মনের মতো জগতিশালী কিছুই হয় না। মধ্যবয়স্ক আমাকে সে-ই পরিণয় দিতে পারে তারুণ্যের মুকুট। মনই রচনা করে প্রেম। মনই এই শহরের দেয়ালে দেয়ালে, আকাশে-বাতাসে একে দেয় নানা বর্ণের ছবি। মনই ভালবাসে, ঘেন্না করে, রাগ-আক্রোশ-বিদ্বেষ-মোহ—সবই তো মন। সে এক দুটু দামাল ছেলে, শাসন মানে না, আইন মানে না, সভ্যতা মানে না। এই দামালকে কি করে যে ঘরে ফেরাই!

“অনেক রাতে আমার ছোট ছেলে দোলন উঠে এল ওপরে। সে মাঝরাতে কখনও কখনও টয়লেটে যায়। তখন সে আমার ঘরে গিয়ে একবার আমাকে দেখে একটু আদর করে আসে। সে এখন আর ছোটটি নেই। বয়ঃসন্ধি পেরোচ্ছে। দোলনের সঙ্গে আমার একটা অদ্ভুত সম্পর্ক আছে। অন্য সকলের কাছে সে বেশ পরিণত এক কিশোর। কিন্তু যখনই আমার কাছে আসে তখনই সে একেবারে শিশু হয়ে যায়। হয়তো মানুষের মধ্যে শিশু হওয়ার একটা জন্মগত প্রবণতা থাকে। আমারও আছে। দোলন আমার সঙ্গে গল্প করতে ভালবাসে। তার প্রিয় বিষয় মহাকাশ। আমরা মাঝে মাঝে টেলিস্কোপ দিয়ে গ্রহাবলোকন করি। কখনও তাকে নানা নক্ষত্র চিনিয়ে দিই। ওই অসীম শূন্যের প্রতি তার আকর্ষণ তীব্র। মাঝরাতে সে যখন ঘরে আমাকে বুঁজে না পেয়ে ছাদে উঠে এল তখন আমি ভূতগ্রস্তের মতো বসে আছি।

“বাবা, তুমি কি করছ?

“আমি হেসে বললাম, বসে আছি। আজ ঘরে মন টিকল না। তুমি ঘুমোওনি?

“ঘুমিয়েছিলাম। টয়লেট থেকে ফেরার সময় দেখলাম, তুমি ঘরে নেই। ডাবলাম নিশ্চয়ই ছাদে এসেছো। তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না বাবা?

“লাগছে। তবে কলকাতায় আর তেমন শীত কই?

“দোলনের সঙ্গে নেমে এলাম আমার ঘরে। দুজনে পাশাপাশি লেপের তলায় গুয়ে কিছুক্ষণ গল্প হল। তারপর দোলন ঘুমিয়ে পড়ল। আমার ঘুম এল না। আমি ওর আবছায়া মুখখানার দিকে চেয়ে ভাবছিলাম, আমি যদি ব্যতিক্রমী হয়ে যাই তাহলে দোলন আমাকে কী চোখে দেখবে। আমি যদি ওর মাকে ডিক্টার্স করি মেয়ের বয়সী একটি তরুণীকে বিয়ে করে আনি তাহলে আমার এই রচিত সম্পর্কের সসার মিসমার হয়ে যাবে না কি? ডেঙে পড়বে সব সম্পর্ক। মানুষ এইসব ভেবেই তো সংহত রাখে নিজেকে। এইসব মূল্যবোধ অনেক সময় মানুষকে রক্ষা করে। অনেক সময়েই করে না। এইসব ভাঙচুর, এইসব সম্পর্কের অবসানই সারা পৃথিবীতে পরিবার-প্রথার অবলোপ ঘটানো। মানুষ হয়ে যাচ্ছে বিচ্ছিন্ন ও একা। নিত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মানুষও হয়ে পড়ছে অনাখ্যায়। এ এক বিষম পরিস্থিতি।

“গভীর রাতে সন্তানের ঘরের দিকে আমি সম্মোহিতের মতো চেয়ে ছিলাম। আমার প্রাণাদিক প্রিয় এই পুত্রটি আমি আমার বলে জানি, তাই এত ভালবাসি। কিন্তু এমন যদি হত যে, আমি জানি না যে, পুত্রটি আসলে আমার নয়, হয়তো অন্য কারও ছেলে, নার্সিং হোমে রদবদল ঘটে গেছে। সে ক্ষেত্রেও একটি বিভ্রম কাজ করবে—পুত্রটি আমার—এই বোধ। তাহলে কি আমি আসলে নিজের বলে না ভাবতে পারলে কোনও কিছুকেই তেমনভাবে ভালবাসতে পারি না? অহং-ই কি মানুষের ক্রীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে? আধুনিক মানুষ হয়তো এই অধিকারবোধ থেকে, প্রায় ও দায়িত্ব থেকে মুক্তি চাইছে। তাই

তারা তুলে দিচ্ছে বিবাহ নামক বাহুল্য অনুষ্ঠানটিকে। বিলোপ করছে পরিবারপ্রথা। তারা চাইছে মানুষের সন্তান-সন্ততি আর পিতৃপরিচয় বহন না করুক। তার দরকার নেই! হয়তো এ সমস্তই পুরনো কুসংস্কারমাত্র।

“যদি পৃথিবী ক্রমে ক্রমে সেই মুক্ত সম্পর্কের সমাজে পৌঁছয় তাহলে কেমন হবে সমাজের চেহারা? কেমন হবে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক? কেমন হবে সন্তানের সঙ্গে পিতামাতার আত্মীয়তা? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমার খুব ভয় হল। আমি হঠাৎ দু’হাত বাড়িয়ে আমার ছেলেকে আঁকড়ে ধরে বললাম, না না, এরকম হবে না। এরকম হতেই পারে না।

“আবার ভেবে দেখছি, আমি আঁকড়ে ধরতে চাইলেই বা কি? সন্তানসন্ততিরা তো সত্যিই আর বাবা-মায়ের সম্পত্তি হয়ে থাকে না। তারা বৃহত্তর কর্মযজ্ঞে চলে যায়, বাবা-মা পড়ে থাকে। আগে স্তন্যদান, জাপান হচ্ছে শিশুদের স্বর্গরাজ্য— সেখানে শিশুদের সমাদর সবচেয়ে বেশি, যৌবনের কদর আমেরিকায়, আর বৃদ্ধের সম্মান ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষে একসময়ে তাই ছিল। প্রবীণরা কখনও অবহেলিত ছিলেন না এখানে। পরিবারের কর্তা, সমাজের মাথা, পাঁচজনের পরামর্শদাতা। কিন্তু এখন কলকাতা এবং তার আশপাশে ক্রমেই বাড়ছে বৃদ্ধাশ্রম। অবহেলিত পিতামাতার জন্য এক একটা নির্বিকার অশ্রম। সন্তানরা আর মা-বাবার জন্য সময় দিতে পারছে না, নিতে পারছে না দায়িত্ব। আমিও তো পঞ্চাশ পেরিয়ে এলাম। বুড়ো বয়সের আর বাকি কী? আজ গভীর রাতে পুত্রের প্রিয় মুখশ্রী অবলোকন করতে করতে ভাবলাম, হায় মন, তুমি কত ভুলই না রচনা করলে, সৃষ্টি করলে কত কল্লময়া! প্রগাঢ় বিষাদে ডুবে আমি রাত কাটিয়ে দিলাম এইসব লিপিবদ্ধ করে।”

বুকের মধ্যে আজকাল একটা কষ্ট হয় কৃষ্ণজীবনের। সেটা শারীরিক কষ্ট নয়। মানসিক। সবসময়ে একটা হাহাকার যেন ধ্বনিত হচ্ছে ভিতরে। আজকাল সে প্রায়ই চলে যায় বিষ্ণুপুর। স্টেশনে নেমে হাঁটতে হাঁটতে দিগন্ত পেরোয়।

বিষ্ণুপুরে মা আছে। মায়ের কাছে চুপচাপ বসে থাকতে কিছুক্ষণ তার ভালই লাগে। সে আর শিশু কৃষ্ণজীবন নয়। বয়স্ক এক দায়িত্ববান পুরুষ। তবু কেন মায়ের কাছে এই বসে থাকা তার প্রিয়?

হোয়েন আই মিট মাইসেলফ-এ সে লিখল, “আমার এই দুঃখী ও দরিদ্র মা আমাকে কিছুই আর দিতে পারে না। তবু এই যে তার ছায়ায় এসে কিছুক্ষণ বসে থাকি সে শুধু একটা কারণেই। পৃথিবীতে বোধ হয় একদিন ‘মা’ ডাকটিরও অবসান ঘটবে। লন্ডনের এক বৃদ্ধ সাহেবের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। অশীতিপর সেই বৃদ্ধ আমাকে কেবলই বলে, ওম্ম লন্ডন কত ভাল ছিল। সেই লন্ডন আর নেই। লন্ডনের গল্প করতে করতে সে প্রায়ই বলে, তার মায়ের মতো এমন চমৎকার পাইই সে জীবনে আর কখনও খায়নি। সাহেবরা ভাবাবেগপ্রবণ জাত নয়। তারা মা-বাবার স্মৃতি নিয়েও পড়ে থাকে না। কিন্তু কারও কারও হয়তো এখনও কিছু বোধ আছে। মা এক মহান ও আশ্চর্য মহিলা। একজন মহিলা যখন মা হয় তখনই সে সন্তানের কাছে এক মহার্ঘ ও সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মানুষ। আমি এক দারিদ্র্যপীড়িত সংসারে জন্মেছি বলেই জানি, মায়েরা সন্তানের জন্য কত অনন্ত ত্যাগ করতে পারে। আমার এই মা সর্বদাই তার ভাগের খাবার থেকে এক মুঠো ভাত সরিয়ে রাখত আমার জন্য। আমার খিদে বেশি, অনেকটা পথ হটেই ইচ্ছা যেতাত্যাত করতে হয়, লাঙল চালিয়ে করতে হয় চাম্বাস। মা আমার খিদে বুঝত। একমাত্র মায়েরাই যা বোঝে। মা জাতিই পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবে কি?”

একদিন হেমাঙ্গর ফোন এল, কৃষ্ণজীবনবাবু, আমরা রোববার একটা গেট টুগোদার করছি। আসবেন?

রবিবার? বেশ তো।

আবার হুট করে বিদেশে চলে যাবেন না তো!

না। ফেক্সয়ারি পর্যন্ত লেখালেখির কাজ আছে। মার্চে যাবো।

এখন আপনি কী লিখছেন?

কৃষ্ণজীবন হাসল, আমার লেখার কিছু মাথামুণ্ডু নেই। আমি এখন যা লিখছি সেটা খানিকটা আত্মজীবনীর মতো। কিংবা তাও নয়। নাম দিয়েছি—হোয়েন আই মিট মাইসেলফ।

দার্শনিক লেখা নাকি?

অনেকটা। লেখাটা কিছু হচ্ছে বলে আমার মনে হয় না। শুধু রিফ্লেকশনস। ছোট ছোট ঘটনা। রিঅ্যাকশন।

কারা ছাপবে?

আমেরিকার পাবলিশার। ওরা বলেছে যা লিখব ছাপবে। সেই সাহসেই যা খুশি লিখছি।

লিখুন। হয়তো এটাও হবে মাস্টারপিস।

না, তা হবে না। তবে আমার ভিতরকার বিস্ময়তার একটা চিহ্ন রেখে যাচ্ছি।

আপনি কি বিস্ময় মানুষ?

কে জানে! আনহ্যাপি, ইয়েস। কিন্তু মেলাকলিক হয়তো নয়। এসব ভাবী কথা থাক। হানিমুন কেমন হল?

আমরা গিয়েছিলাম নিশিপুর।

একটু ভেবে কৃষ্ণজীবন বলল, ওঃ, আপনার সেই গ্রাম?

হ্যাঁ। যেখানে আপনাকে আজও নিতে পারিনি। যাবেন একবার?

যাবো। নিশ্চয়ই যাবো।

হোয়েন আই মিট মাইসেলফ-এ কৃষ্ণজীবন লিখল, “আমি আজকাল সুখী লোকদের স্রীক্ষা করি কিনা কে জানে। এই যে হেমাঙ্গ আর ঝুমকি এক তরুণ দম্পতি, এদের ঝলমলে মুখ, আর উজ্জ্বল সম্পর্ক আমাকে সুখী করল না। ওদের গোট টুগোদারে গিয়ে আমার কেবলই মনে হতে লাগল এ তো মায়া। এ তো রচিত সম্পর্ক। আঠা কই? জোড় কিসের? শুধু মন, শুধু বিভ্রম জুড়ে রেখেছে এদের।”

হোয়েন আই মিট মাইসেলফ্ লিখতে লিখতে মাঝে মাঝে ভীষণ অস্থিরতা বোধ করে কৃষ্ণজীবন। ঘরবন্দী থাকতে হচ্ছে করে না। মাঝে মাঝে লিখতেও হচ্ছে করে না। মাঝে মাঝে গভীর রাত অবধি ঘুম আসতে চায় না। মাঝে মাঝে মুক-বধিরের মতো আচরণ করে সে। দিনের পর দিন কথা বলে না কারও সঙ্গে। শুধু চুপচাপ বসে থাকে।

এক মধ্যরাতে রিয়া উঠে এল তার ঘরে। একটা ঢাকনা পরানো আলো-আধো অন্ধকার ঘরে কৃষ্ণজীবন বসে আছে পাথরের মূর্তির মতো। সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানরহিত। মাথার ভিতরে নানান চিন্তার সূত্র পরস্পরের সঙ্গে নানা অল্প ঘটানোর চেষ্টা করছে, পারছে না। অনেক ছিন্ন সূত্র খুলে আছে অর্থহীনতায়। কত ছোট টুকরো ঘটনার স্মৃতি গহীন আবছায়ার চেননার ভিতর থেকে উঠে আসছে। কত তুচ্ছ অর্থহীন ঘটনা। রিয়া যখন ঘরে এল তখন সে একটা অদ্ভুত ঘটনার কথা ভাবছিল। ছেলেবেলায় একবার হাতে একটা বাতাসা মুঠোয় নিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মাঝরাতে অজস্র পিপড়ে ছেকে ধরেছিল তাকে। পিপড়ের কামড়ে উঠে বসে চট্টিয়ে কেঁদে উঠেছিল সে। আলো জ্বলে দেখা গেল, লাল পিপড়ের ভরে গেছে বালিশ এবং আশপাশ। এই ঘটনার পর সে অবাক হয়ে ভাবত, পিপড়ের খবর দিল কে? কি করে তারা টের পেল কোথায় বাতাসটা আছে? পিপড়েরা কি রাতে ঘুমোয় না? তারা কি অন্ধকারেও দেখতে পায়? নিজের প্রশ্নে প্রশ্নে নিজেই জর্জরিত হত সে।

আজও হয়।

রিয়া দু'বার ঢাকবার পর কৃষ্ণজীবন ফিরে এল বর্তমানে।

কিছু বলছ?

এত রাত অবধি বসে আছ কেন? কী হয়েছে?

কৃষ্ণজীবন তটস্থ হয়ে বলে, কিছু হয়নি তো!

আজকাল এত অন্যান্যরূপ থাকো, আমার ভয় করে।

চল্লিশোর্ধ্ব স্ত্রীর দিকে কিছুক্ষণ অপরিচিতের মতো চেয়ে থাকে কৃষ্ণজীবন। কোনও কথা আসে না মুখে।

ধীরে ধীরে তুমি কিরকম হয়ে যাচ্ছ বলো তো! আগেও আনমনা থাকতে, চুপচাপও থাকতে। আজকাল যেন বাড়াবাড়ি। কী হয়েছে বলবে?

কৃষ্ণজীবন এবারও কথা বলতে পারল না। তার চোখের সামনে ভাসছে যোর বর্ষাকালের একটা দৃশ্য। তিনদিন ধরে তুমুল বৃষ্টি। ক্লব বন্ধ, বাজারহাট বন্ধ, উঠোনে হাঁটু জল। মা, বাবা, ভাই, বোন সবাই বারান্দায় বসে জল দেখছে। চুপচাপ। কারও মুখে কথা নেই। টিনের চালে শুধু বৃষ্টির ঝমাঝম। তারা চুপ করে বসে আছে। কিছু করার নেই। রান্নাঘর ভেসে গেছে বলে সেদিন রান্না হয়নি তাদের। পেটে মস্ত খিদে। তবু তারা নিশ্চেষ্ট হয়ে চুপচাপ বসে আছে। শুধু বৃষ্টি পড়ছে। শুধু বৃষ্টি পড়ছে। কেন মনে পড়ছে দৃশ্যটা? কেন এই অহেতুক স্মৃতি?

কৃষ্ণজীবন অসহায়ভাবে মাথা নেড়ে বলল, কি হয়েছে জানি না। কিছু জানি না।

রিয়া মুখোমুখি চেয়ারে বসল। হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করল হাতে। বলল, চুপচাপ থাকলে আরও বেশি চিন্তা হবে। ওগো, তুমি যা-খুশি কিছু কথা বলো। কথা বললে এই স্পেলটা কেটে যাবে।

কৃষ্ণজীবন বেদনার্ত চোখে রিয়ার দিকে চেয়ে থেকে শুধু মাথা নাড়ল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কাটবে না।

কেন কাটবে না? এত মানুষ, কই কেউ তো তোমার মতো এত ভাবে না! তুমি কেন এরকম হয়ে যাও? ছেলেমেয়েরা অবধি তোমার জন্য চিন্তা করছে। দোলন বারবার জিজ্ঞেস করে, বাবার কী হয়েছে মা? আমি বলি, তোমার বাবা বই লিখছে তো! তাই ভাবছে। কিন্তু আসলে তো তা নয়। তোমার ডিপ্রেসন চলছে। কেন গো?

বিস্ময়িত দুই চোখে রিয়ার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে কৃষ্ণজীবন অস্ফুট গলায় বলল, অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা। কি বলছ?

আজ যদি স্মৃতিভ্রষ্ট হই, কি করে বুঝবো যে তুমি রিয়া? বস্তুর চতুর্থ মাত্রা হল সময়। আইনস্টাইন বলেছিলেন। কিন্তু বস্তুর আরও কত মাত্রা আছে। পঞ্চম মাত্রা হল স্মৃতি, নইলে বুঝব কি করে কোনটা কী? ষষ্ঠ মাত্রা হল ইমাজিনেশন, পারসোনাল ডিশন। চারদিকে এই যে এত বস্তুপুঞ্জ দেখছো, সে সবই আমাদের কল্পনার রঙে রঙিন। নইলে কিছুই নয়।

রিয়া উঠে এসে কৃষ্ণজীবনের মাথাটা বুকে ঢেপে ধরল, এরকম করছ কেন? কেন এরকম সব অদ্ভুত কথা বলছ? আমি যে ভয় পাচ্ছি। কেন দূরে সরে যাচ্ছ?

রিয়ালিটিকে বুঝতে পারো রিয়া?

তোমার মতো করে কি পারি? আমি আমার মতো করে দেখি, বুঝি।

বুঝতে গেলে ইউ হ্যাভ টু লাভ, ইউ হ্যাভ টু লাভ। তুমি কি জানো মানুষ কত দেউলিয়া হয়ে গেছে ভালবাসায়? কত দেউলিয়া? ভাত কাপড়ে নয়, বস্তুপুঞ্জ নয়, মেধায় নয়, দেউলিয়া শুধু ভালবাসায়।

কেন ও কথা বলছ? এই যে আমি তোমাকে এত ভালবাসি এ কি মিথ্যা? তুমি ছাড়া আমাদের যে জগৎ অন্ধকার।

কৃষ্ণজীবন নিঃশব্দ হয়ে চোখ বুজে রইল। তার চোখের কোল বেয়ে ঝরে পড়তে লাগল চোখের জল।

হোয়েন আই মিট মাইসেলফ্-এ সে লিখল, “বস্তুর পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম মাত্রাতেই থেমে থাকে না তার প্রকৃত পরিচয়। আমাদের অজ্ঞাত আরও বহু মাত্রাও হয়তো রয়ে গেছে। আমরা কতটুকু জানি? অবিরত নানা মতবাদ, নানা দর্শন মানুষকে আবিল করে দেয়। মানুষের মন সব সময়েই জারিত হচ্ছে অন্যের ভাবনাকল্পনার প্রভাবে। সে যা দেখে, যা বোধ করে, যা বোঝে সবই ওই সব মতবাদ ও প্রভাবের দ্বারা চালিত হয়ে। যদি মানুষের মন রিক্ত থাকত, যদি হাঁসের পালকের মতো ঝেড়ে ফেলতে পারত সব প্রভাব তবে কি সে বস্তুর স্বরূপকে ধরতে পারত? আমি তাই প্রথম মানবের কথা ভাবি। একমাত্র সে-ই অনাবিল চোখ ও মন নিয়ে দেখেছিল এই বস্তুবিশ্বকে। আমি আজ ঠিক তার মতো মন আর চোখ চাই।”

শীতের কবোষ সোনালি রোদে ভরে আছে মাঠঘাট। মাঝে মাঝে কৃষ্ণজীবন বেরিয়ে পড়ে হারা-উদ্দেশ্যে। পায়ে হেঁটে হেঁটে দূরদূরান্তে চলে যায় অচেনা গায়েগঞ্জে। কখনও অচেনা চাষীবাড়িতে ঢুকে যায়। বসে, গল্প করে। কখনও গাছের মাথায় বসে-থাকা একটি পাখির দিকে চেয়ে থাকে। কখনও হাঁ করে চেয়ে দেখে, বাঁশগাছের ডগা দুলছে উত্তরে হাওয়ায়। এ পৃথিবী তার বড় প্রিয়। বড় প্রিয় এই মনুষ্যজীবন। মুখ নয়, তার মন নানা কথা বলে যেতে থাকে। বলে, ভালবাসা ছাড়া আর কী আছে মানুষের? মানুষ কেন ভুল মুক্তির খোঁজে নষ্ট করে ফেলছে এই মহার্ঘ জীবন?

“শীতের দুপুরে আমি বকুলপুর নামে একটা গায়ে এক তাঁতঘরে বসে দেখছিলাম, অনাখ্যায় সুতো কেমন টানা-পোড়নে পড়ে পরস্পরের সঙ্গে রচনা করছে সম্পর্ক। ফুটে উঠছে নকশা। তৈরি হচ্ছে ঘনবদ্ধ কাপড়। এই তো, কী সুন্দর একটা অভিজ্ঞতা! টানা-পোড়নে, টানা-পোড়নে। দৃশ্যটা আমার এত ভাল লাগল যে কী বলব! মনটা ভরে গেল।

“ভালবাসা এক অনুশীলনসাপেক্ষ ব্যাপার। ভাবের ভালবাসা বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। আমার জল-বসন্ত হয়েছিল বলে আমার এক প্রিয় বন্ধু আমার বাড়িতে আসা বন্ধ করে দিয়েছিল। আর আমার মা জেগে বসে থাকত আমার শিয়রে। দিনরাত সেবা করত। যাকে ভালবাসো তার জন্য কিছু করো। তাকে কিছু দাও। রোজ দাও। প্রতিদান চেও না।”

ডেফ অ্যান্ড ডাথ ক্লবের হস্টেলে একদিন গোপালের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল কৃষ্ণজীবন। তাকে দেখে কী আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে গেল গোপালের মুখ। ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে জড়িয়ে ধরল তাকে। কৃষ্ণজীবন তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিল। গোপালের বুকটা ধকধক করছে আনন্দে।

কেমন আছিস রে গোপাল?

গোপাল তার মুখের দিকে সম্মোহিতের মতো চেয়ে রইল। মুখে হাসি, কেবল হাসি। অনেকক্ষণ ছিল কৃষ্ণজীবন। গোপালের জন্য চকোলেট, বিস্কুট, টি-শাট এনেছিল। দিল। যতক্ষণ ছিল কৃষ্ণজীবন, গোপাল তার মুখ থেকে চোখ সরালই না।

ছেড়ে আসতে বড় কষ্ট হিছিল কৃষ্ণজীবনের। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, ভাল থাকিস। আমি আবার আসব।

ছুটিতে বিষ্ণুপুর গিয়ে গোপাল তার দাদুকে ঝুঁজেছিল এ-ঘর ও-ঘর। নানা শব্দে, ইশারায় জানতে চেয়েছিল দাদু কোথায়। মৃত্যু কী জিনিস তা সে আজও জানে না। তাকে বোঝানো যায়নি। যতদিন ছিল ততদিন দাদুকে ঝুঁজে বেড়াতে সে। এ-ঘর ও-ঘর সে-ঘর।

দৃশ্যটা হোয়েন আই মিট মাইসেলফ্-এ বর্ণনা করল কৃষ্ণজীবন। লিখল, “আমিও আজ ওই মুকবধির বালকটির মতো ঝুঁজে বেড়াচ্ছি এ-ঘর ও-ঘর সে-ঘর। ঝুঁজতেই হবে। ঝোঁজাই যে আমার কাজ। ঝোঁজাই যে জীবন। ...”

মাঝরাতে রিয়া ফের উঠে এল।

ঘুমোওনি?

কৃষ্ণজীবন তার বিক্ষারিত চোখে চেয়ে থেকে বলল, না।

রিয়া কাছে এল। নরম করে চেপে ধরল নিজের বুকো কৃষ্ণজীবনের মাথা।

শুয়ে পড়ো না গো! একটু বিশ্রাম নাও।

ঘুম আসবে না।

এসো আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিই।

কৃষ্ণজীবন রিয়ার মুখের দিকে শিশুর মতো চেয়ে থেকে বলল, আজ কাদব। আজ ঘুমোবো না।

ও মা! ও কী কথা? কাদবে কেন? ওরকম বোলো না, ভয় পাই।

কৃষ্ণজীবনের মুখ নয়, মন কথা বলছিল। বলছিল, এসো আমার সঙ্গে তুমিও কাদো, এসো কান্নায় একাকার হয়ে যাই। একাকার হয়ে যাই।